শিল্পী—শ্রীযুক্ত মুকুল দে

বিশ্রাম

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

আষাঢ়—১৩৫০

প্রথম খণ্ড	একত্রিংশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

ভানুসিংহের পদাবলী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্কিমচন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়াছিল। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার এই সর্ব্বশেষ বাণীতে যেখানে এই বাক্য, সেই সর্ব্বস্ব সমর্পণপূত [illegible] ভাগবত গোপী প্রেমের অনুভূতিই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমের আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্রের পদাবলী ব্যাখ্যা দেশাত্মবোধের অভিনব সংহিতা। মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা লিখিয়া পদাবলীর প্রতি আপনার শ্রদ্ধার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে পদাবলী পাঠের পরিচয় আছে। অক্ষয়চন্দ্র ও সারদাচরণ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে পদাবলীর সঙ্গে পরিচিত করিতে যত্ন লইয়াছিলেন। ইঁহাদেরই যোগ্যতম উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ কৈশোরেই বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সে দিনের কিশোর কবি পদাবলী বুঝিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের দিব্যানুভূতিই এই ভাগ্যবান্ কবিকে ভানু সিংহের পদাবলী প্রণয়নে প্রেরণা দিয়াছিল। অধুনা প্রকাশিত পত্রাবলীর মধ্যে [illegible] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্রে এই অনুভূতির ইঙ্গিত আছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতায় এই অনুভূতির প্রকাশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

শ্রীভগবান মাত্র পুণ্যের পুরস্কার দাতা ও পাপের দণ্ড বিধাতাই নহেন। তিনি আমাদের একান্ত আপনার জন। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইলেও করুণ এবং মধুর। এই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ বন্ধনের সাধনাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের গূঢ়তম রহস্য। শ্রীরাধিকার মহাভাব মানবানুভূতির অতীত বস্তু। সুতরাং [illegible] গোপীভাবের উপাসনাই এই ধর্ম্মের চরম ও পরম তত্ত্ব। শান্ত, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের উপাসনাও মাধুর্য্য পুষ্ট। কিন্তু কান্তাভাবের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। মাধুর্য্যের সার এই কান্তাভাব, ব্রজের মধুর ভাবই সর্ব্বভাবের নিদান। অপর তিনটী ভাবে আগে সম্বন্ধ, পরে পরিচর্য্যা, কিন্তু কান্তাভাবে পরিচর্য্যার অনুরূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ সম্বন্ধ এখানে সেবার অনুগামী। অপর তিনটি ভাবের মত মধুরেও সেবা কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য্যময়, তথাপি এই সেবার একটা বাঞ্ছা আছে। এই বাঞ্ছাই কান্তাভাবের বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যই পদাবলীর প্রাণ।

বিচার অনুগতস্বরূপে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে কৃষ্ণোচিত সেবাই দাসের পরম ধর্ম্ম। সখার অধিকার ইহাপেক্ষাও অধিক। কাঁধে চড়ায়, কাঁধে চড়ে। উচ্ছিষ্ট ফল আনিয়া মুখে তুলিয়া দেয়। কোনরূপ সঙ্কোচ নাই, বলে "তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম"! বাৎসল্য আরো মধুর। নন্দ যশোমতী জানিতেন এই শিশু আমাদেরই প্রতিপাল্য। ইহার ভালমন্দ বোধ নাই, ইহার হিতাহিত বুঝিয়া পুরস্কার তিরস্কারে আমাদেরই একমাত্র অধিকার। গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের শিশুত্ব নাই, কিন্তু ভাবের দিক্ দিয়া গোপীভাবের মধ্যে এই তিনটী ভাবতো আছেই, ইহার অতিরিক্ত আরো কিছু আছে। গোপীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ—

> "পতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
> প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ঃ॥"

মাত্রই করেন, তিনি ইহারও অধিক। আর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীগণের সম্বন্ধ—শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—

"সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥"

অর্জ্জুন, তোমার নিকট সত্য বলিতেছি—গোপীগণ আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বান্ধব এবং স্ত্রী। তাঁহারা যে আমার কি নহেন, আমি বলিতে পারিতেছি না।

এই গোপীবৃন্দের শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহের মধ্য দিয়া গীত প্রবাহ বৈষ্ণব পদাবলী। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার মধুর প্রবাহিনী বৈষ্ণব পদাবলী। এই পদাবলীর সাধক ও গায়ক ছাড়িয়াও শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর—রসচার্য্যের নির্দ্দিষ্ট ছন্দ, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের চরম সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রকে দেখিবার সৌভাগ্য অনেকেরই হইয়াছিল। ইঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ পদাবলীর রচয়িতা। যাঁহারা দেখিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত, তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, ভক্তগণের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রাকৃত প্রেম ও অলৌকিক ভাবনার কথা শুনিয়াছিলেন। এইরূপ কয়েকজন পদকর্তার অপরোক্ষানুভূতিই পদাবলীকে মধুর ও সুন্দর করিয়াছে। তাঁহাদের প্রেমাকুল অন্তরের উচ্ছ্বাসই এই পদাবলীকে মধুর, সঙ্গীত, চমৎকৃতিময় ও রূপ সম্ভোগে ভরিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদাবলীর অনুসরণেই ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

ভানুসিংহের পদাবলী আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথ পদাবলী প্রবর্ত্তকদের বহু পরবর্ত্তী যাত্রী। সে কালে একালে অনেক পার্থক্য। কালের সঙ্গে সঙ্গে দেশের এবং পাত্রেরও বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এ যুগে আর বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হইবে না। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা—প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তর বেদনা যদিও নিরন্তর প্রকাশেও সমাপ্তি-লাভ করে না এবং এমন কথাও বলা চলে না যে পদাবলীর মধ্যে তাহার প্রায় শেষ কথাটীই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি পদাবলীতে যাহা বলা হয় নাই, তাহার ইঙ্গিত এত গভীর, এমন ব্যাপক এবং এমনই চিরন্তন যে সেই বেদনার অভিব্যক্তি আজিও রসিক ও ভাবুকের প্রাণে নিত্য নূতন আস্বাদনের আনন্দ দান করিতেছে। সুতরাং আধুনিক কোন কবির রচিত প্রেমের কবিতায় নূতনত্ব থাকিলেও আমরা পদাবলীর ভাবধারা স্বাভাবিক ও সহজ প্রাপ্যরূপেই গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা সত্যই নূতন। এই নূতনত্ব তাঁহার ভানুসিংহের পদাবলীতে না থাকিলেও অপর অনেক কবিতায় আছে। পদাবলীর মত রবীন্দ্রনাথেরও কতকগুলি কবিতা বুঝিতে পারি, বুঝাইতে পারি না। যাহা অন্তরকে বিহ্বল করে, যাহা প্রাণের বস্তু, ধারণার সামগ্রী, যাহা আস্বাদন বেদনীয়, বোধগম্য। সেই বেদনার স্বরূপ অপরকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ভানুসিংহের পদাবলী আলোচনায় কবির কয়েকটী কথাও মনে রাখিতে হইবে। সন ১৩৪০ সালে প্রকাশিত কবি নিজ সঙ্কলিত সঞ্চয়িতার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"যে কবিতাগুলিকে আমি নিজে স্বীকার করি তার দ্বারা আমাকে দায়ী করলে আমার কোনো নালিশ থাকে না। বন্ধুরা বলেন ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা চাই, আমি বলি লেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে, তখন থেকেই তার ইতিহাস। এ নিয়ে অনেক তর্ক হোতে পারে সে কথা বলবার স্থান এ নয়।

সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চলছে একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ। বালক যদি প্রধানদের সভায় গিয়ে ছেলেমানুষী করে তবে সেটা সহ্য করা বালকের পক্ষেও ভাল নয়, প্রধানদের পক্ষেও নয়। এও সেই রকম। ঐ তিনটী কবিতাগ্রন্থ আর কোনো আসরে সেই রকম একটী অপরাধ লেখাগুলি করিয়া ভুল পারিনি। তিনের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখী হোয়ে ওঠেনি এটাতে কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু তাকে পাখী বলে দোষ দিতেই হবে।

ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই সঙ্কলনকে ঐ তিনটী বইয়ের যে কটী লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্তু সেই পর্ব্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙ্গা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।"

কবি সঞ্চয়িতায় ভানুসিংহের পদাবলী হইতে দুইটী কবিতা গ্রহণ করিয়াছেন। কবিতা দুইটী সর্ব্বজনপরিচিত। একটী "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"। অপরটী "কো তুঁহু বোলবি মোয়"। আমরা কবিতা দুইটী উদ্ধার করিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বক্তব্যও বলিতেছি।

১

মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজূট   রক্ত কমল কর, রক্ত অধর পুট
তাপ বিমোচন করুণ কোর তব   মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান॥
মরণ রে শ্যাম তোঁহারই নাম।
চির বিসরল যব, নিরদয় মাধব   তুঁহু ন ভইবি মোয় বাম॥
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর,   ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝর ঝর
তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর   তুঁহু মম তাপ ঘুচাও।
মরণ তু আওরে আও॥
ভুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি,   আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি   নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহু নহি বিসরবি, তুঁহু নহি ছোড়বি, রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন   অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহু বাঁশী বাজাওসি   অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা।

দিবস ফুরাওল অবহুঁ ম যাওব   বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব
কুঞ্জ-বাটপর অবহুঁ ম ধাওব   সব কছু টুটইব বাধা।
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,   তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব
শাল তালতরু সভয়-তবধ সব   পন্থ বিজন অতি ঘোর।
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,   যাক পিয়া তুঁহু কী ভয় তাহারে,
ভয়বাধা সব অভয় মূর্ত্তি ধরি,   পন্থ দেখাওব মোর।
ভানুসিংহ কহে "ছিয়ে ছিয়ে রাধা   চঞ্চল হৃদয় তোহারি।
মাধব পহু মম, পিয় স মরণ সেঁ   অব তুঁহু দেখ বিচারি॥

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে মৃত্যু কামনা স্বাভাবিক। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ বিয়োগ হইলে প্রাণে না জীয়য়।

কিন্তু শ্রীমতীর কথা স্বতন্ত্র। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

ঔর্ব্বস্তোমাৎ কটুরপি কথং দুর্ব্বলেনোরসা মে
তাপঃ প্রৌঢ়ো হরি বিরহজঃ সহ্যতে তন্ন জানে।
নিষ্ক্রান্তা চেদ্ভবতি হৃদয়াদ্ যস্য ধূমচ্ছটাপি
ব্রহ্মাণ্ডানাং সখি কুলমপি জ্বালয়া জাজ্বলীতি।

"সখি, কৃষ্ণ বিরহানল বাড়বানল হইতেও কঠোর, কেমন করিয়া সহ্য করিতেছি জানি না। এই তাপের ধূমটাও যদি আমার হৃদয় হইতে

থাকিত হয়, হয়তো সারা জনমটাই কাঁদিয়া যাইবে।" এই অসহনীয় বিরহের একমাত্র উপশম ছিল, যদি কোন দিন তাহার দেখা পাই—এই ক্ষীণ আশা। কখনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে মৃত্যু কামনা জাগিত, কিন্তু জন্মেও কোন বৈষ্ণব কবি সেই অসহায় অবস্থায়ও মৃত্যুকে শ্যাম বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়া এই অনুভূতিও অসম্ভব নয়, অবাস্তব নয়। বৈষ্ণব কবি জীবন মরণের যে সন্ধিক্ষণে মরণেও গোকুলচন্দ্রকে পাওয়া যাইবে বলিয়া মৃত্যু কামনা করিয়াছেন, সেই মাহেন্দ্র মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথের মনে "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান" এই একাত্মবোধ অসম্ভব কি করিয়া বলিব? বৈষ্ণব কবি মৃত্যু কামনা করিয়াছেন কিন্তু সেই সঙ্গে এই দুঃখও তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না যে মৃত্যুকালে একবার দেখিতে পাইলাম না।

"হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ায় না দেখিনু মুখ।"
(গোবিন্দ চক্রবর্তী)

"এই বড় শেল মোর মরমে রহিল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল।"
(নরোত্তম দাস)

বৈষ্ণব কবি মৃত্যু কামনা করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে এই কামনাও করিয়াছেন—

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ। হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ।
এ সখি বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ্ব। ঐছনে মিলই গোকুলচন্দ।
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথিমাহ।
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত।
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম। মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম।
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গোরি। সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি।

"বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ্ব" এই পাঠের ব্যাখ্যায় শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন—"হে সখি বিরহে মরণে মম নির্দ্বন্দ্বং নির্বিরোধ নিশ্চয়ঃ। ঐছনে যেন মরণেন গোকুলচন্দ্র প্রাপ্তির্ভবতি।" অর্থাৎ সখি বিরহে মৃত্যুই নির্বিরোধ, যে মরণে গোকুলচন্দ্রের প্রাপ্তি ঘটে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতেই আচার্য পরম্পরায় এই ভাবের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। প্রেমের গাঢ়তা ও গভীরতার দিক দিয়া এই অনবদ্য ভাবোপলব্ধির পরিমাপ হয় না। শাস্ত্রসম্মত বলিয়াই নহে, রসের দিক দিয়াও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান" ইহার মধ্যেও অনুভূতির একটা তীব্রতা ও সজীবতা আছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে যেমন মৃত্যু কামনা জাগিয়াছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে শ্যামের কথাই মনে হইয়াছে। সেই বিরহ মাঝে যদি অবকাশ না, ওগো মৃত্যু তোমার করুণা হইতে তো আমি বঞ্চিত হইব না। তুমি তো কোন দিন আমাকে ত্যাগ করিবে না, তোমার বিচ্ছেদে এ হৃদয় দীর্ণ হইবে না। শ্যাম আমারই, আমি তাহাকে জানিয়াছি, আর সেই সঙ্গে ইহাও নিশ্চিত জানিয়াছি, তোমার মধ্য দিয়া আমি তাহাকেই পাইব। আমি অমৃত লাভ করিব। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" কিন্তু এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে কবির মনেও দ্বন্দ্ব জাগিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"ভানুসিংহ কহে ছিয়ে ছিয়ে রাধা চঞ্চল হৃদয় তোহারি। মাধব পহুঁ মম পিয় স মরণসে অবহুঁ দেখ বিচারি।" কবি এই ভাবনায় বৈষ্ণব কবির চিরাচরিত পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। ভানুসিংহ বলিতেছেন ছি, ছি রাধা চঞ্চল তোমার হৃদয়। (বিরহ বিকারে অভিমানেই তুমি এমন কথা বলিতেছ) বিচার করিয়া দেখ, আমার প্রভু মাধব মরণ অপেক্ষাও প্রিয়। অবশ্য বৈষ্ণব কবি বলিবেন, যে তাঁহাকে পাইয়াছে, তাহার আর মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া—মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতত্ব লাভের প্রয়োজন থাকে না। সাক্ষাদ্দর্শনেই অমৃত। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সে এই জীবনেই মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে। কবিও পরে বহু কবিতায় তাহা বলিয়াছেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয়—অনেক কবিতায় কবি মৃত্যুকে বঁধুরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কবির সুবিখ্যাত কবিতা—"বালিকা বধূ" উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি। বলা বাহুল্য বৈষ্ণব কবিগণ যাঁহাকে প্রাণপতি বলিয়া বরণ করিয়াছেন, এই কবিতা সেই উপাস্যদেবের উদ্দেশে নিবেদিত হইতে পারে। অতঃপর মম যেন মরণ বিষয়ক কবিতাগুলি আমরা এইভাবেই গ্রহণ করিয়াছি। কবি নিজেও বলিয়াছেন—"কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটী বিশেষ ধারা নানা বাণীতে যার প্রকাশ"। আমাদের মনে হয় 'কড়ি ও কোমল' রচনার পূর্বেই ভানুসিংহের পদাবলী রচিত হইয়াছিল এবং কবির জীবনের পথে মৃত্যুর প্রথম আবির্ভাব ঘটে "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান" এই কবিতায়।

কবির শ্রীকৃষ্ণ ভানুসিংহের পদাবলীর অন্য "কো তুঁহু বোলবি মোয়"। ধীর সমীরে তরঙ্গায়িত নীলসলিলা যমুনার তটান্ত নিবিড় কুসুমিত উপবনে বিকশিত যৌবনা গোপবধূগণ যাঁহার বেণু গীতে পলকে আপনা ভোলাইয়াছিল সেই কবির মরণে তথা হৃদয়বিহারী রূপহরি বংশীধারী কবি ভুলিয়াছিলেন। তাই তাঁহার এই ব্যাকুল প্রার্থনা—

"কো তুঁহু কো তুঁহু সবহুঁ পুছয়ি অনুদিন সঘন নয়ন জল মুছয়ি।
যাচে ভানু সব সংশয় ঘুচয়ি জনম চরণ পর গোয়"।

ইহজীবনেই সফল হইয়াছিল। তিনি এই জীবনেই চিরসুন্দরের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। কবি এই মিলনের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। আকুল আবেগে গাহিয়াছিলেন—

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হলো অঙ্গ মম ধন্য হলো অন্তর। সুন্দর হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠলো ফুটি
হৃদ্ গগনে পবন হলো সৌরভেতে মন্থর। সুন্দর হে সুন্দর।
এই তোমারি পরশ রাগে চিত্ত হলো রঞ্জিত
এই তোমারি মিলন সুধা রৈল প্রাণে সঞ্চিত
তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মম জনমজনমান্তর। সুন্দর হে সুন্দর।

ভানুসিংহের পদাবলীর যে কবিতাগুলিকে কবি স্বীকার করেন নাই, তাহার মধ্যেও এমন দুই একটি কবিতা আছে, যাহাদের অধিকার করিতে আমাদের দুঃখ ও সংকোচ বোধ হয়। আবার ভানুসিংহের পদাবলীর বাহিরে এমন বহু কবিতা ও গান আছে, যাহার কোন কোনটী বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হইবে, কোন কোনটী বা বৈষ্ণব পদাবলীর সম পর্যায়ে স্থান পাইবার যোগ্য। "শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা নিশীথ যামিনীরে", "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে" প্রভৃতি কবিতা আমাদের মিষ্ট লাগে। "গহন তিমির নিশি ঝিল্লী মুখর দিশি শূন্য কানন তরুতলে। তুমি গোপনে আকুল কুসুম কাহার আপন ফুলে' চিত্তগুলি অশ্রুবরণ করে।

মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখি জাগো জাগো।
মেলি রাগ অলস আঁখি সখি জাগো জাগো।
আজি চঞ্চল এ নিশীথে জাগ ফাগুন গীতে
অয়ি প্রথম প্রণয় ভীতে মম নন্দন অটবীতে

পিক মৃদু মৃদু উঠে হাঁকি সখি জাগো জাগো।
জাগো নবীন গৌরবে নব বকুল সৌরভে
মৃদু মলয় বীজনে জাগ নিভৃত নির্জনে
জাগ আকুল ফুলসাজে   জাগ মৃদু কম্পিত লাজে
মধুর পবন মাঝে   মধুর মুরলী বাজে,
মম অন্তরে থাকি থাকি সখি জাগো জাগো।

মধুর পবন মাঝে এ কাহার মুরলী ধ্বনি! আমার অন্তরে থাকিয়া থাকিয়া এ কাহার আহ্বান গীতি ধ্বনিত হইতেছে সখি জাগো জাগো। অজ্ঞাতযৌবনা নায়িকার এই অপূর্ব পূর্ব্বরাগ একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গেই তুলনীয়। "ওগো পদ্মাবিণী দেখি আর কি হয়েছে তোর পদতায়। এত ভাব যদি মনি কেমনে রয়েছে যদি কোমল কমল কায় কায়"। জ্ঞানদাসের পদাবলীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। "আমার মন মানে না, দিন রজনী। আমি কি কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি। কি লাগিয়া মনে এ দুটী নয়নে উথলে সদাই বারি, ওগো সজনি। • • • আমি এ কথা এ ব্যথা সুখ ব্যাকুলতা কাহার চরণ তলে দিব নিছনি"।

"দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি"।
"ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বন মাঝে কি মন মাঝে"।
"ও গো শোন কে বাজায়"।

"এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি" প্রভৃতি গান কবীর মুখে শুনিলে নূতন পুরাতনের প্রশ্ন উঠে না, মনে চর্চিতের সম্বন্ধে অনুসন্ধান জাগে না।

"আমি নিশিদিন কত রচিব শয়ন আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে কুসুম চয়ন রে।

• • • •

এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব সাধিয়া সাধিয়া রে।
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা প্রভাতে চরণে ঝরিব।

ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল দেখে তারে আমি মরিব।" প্রভৃতি কবিতায় কবির নিজস্ব সুর বর্ণ স্পর্শ করে।

(১) আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজিবে বাঁশী যমুনা তীরে।
আমরা কি করব, কি বেশ করব কি মালা পরব
বাঁচব কি মরব সুখে।
কি তারে বলব কথা কি রবে মুখে।
শুধু তার মুখ পানে চেয়ে দাঁড়ায়ে ভাসব নয়ন নীরে।
(২) বাজিবে সখি বাঁশী বাজিবে।
হৃদয় রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি অধরে লাজ হাসি সাজিবে
নয়নে আঁখি জল করিবে ছল ছল সুখ বেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া সেই চরণ যুগ রাজীবে।

প্রভৃতি গান জ্ঞানদাসের গানরূপে গ্রহণ করা চলে।

বৈষ্ণব কবিগণ যে রাখাল দুলালকে অঙ্গের ধূলধূসর কর্দমিত বসনাঞ্চলে রাখালের বেশে গোচারণে যাইতে দেখিয়াছিলেন, যাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের চারিচক্ষের মিলন ঘটিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাও তাঁহাকেই দেখিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৃহকাজ ভুলিয়াছিলেন, নানান্ ছলে ঘরেবাইরে আপনাকে সাজাইয়াছিলেন। কিন্তু সে দিন পরস্পরে দেখাদেখি হয় নাই। সে দিনের কথায় কবি বলিতেছেন—

আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ যাবে সে সুদূর পুরে
শুধু সঙ্গের বাঁশী কোন্ মাঠ হ'তে বাজিবে ব্যাকুল সুরে,
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ পথে
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ রহিব বলো কি মতে।

রাজার দুলাল আসিলেন এবং চলিয়া গেলেন। কবি বলিতেছেন—

ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ পথে।
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণ শিখর রথে
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার রথের ধুলার পরে।
মাগো কি হলো তোমার অবাক নয়নে চাহিস কিসের তরে।
মোর হার ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে ধুলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ পথে।
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বলো কি মতে।

এই দর্শন, এই বক্ষের মণিহার দান বৃথা যায় নাই। এই রাজার দুলালই তাঁহাকে বাঁশরী সঙ্গীতে ঘরের বাহির করিয়াছিলেন। কবির সাধনা সার্থক হইয়াছিল। সে দিন তিনি উচ্চ আবেগে গাহিয়াছিলেন—

আমার বাঁশীতে ডেকেছে কে, সখি গো সখি।
ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না,
বাহিরে বাজিল বাঁশী বল কি করি।
না জানি কোন্ কুঞ্জ বনে যমুনা তীরে
সাঁঝের বেলায় বাজে বাঁশী ধীর সমীরে
তোরা জানিস্ যদি সখি আমায় পথ বোলে দে।
আমি দেখি গে, তার মুখের হাসি
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি।
বলে আসি তোমার বাঁশী আমার প্রাণে বেজেছে।

অতঃপর এই রাজপুত্র একদিন তাঁহার গৃহে আসিয়াই তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সেই অবকাশ বিদ্যুৎ বা বৃষ্টির মধ্যে কোন আয়োজন ছিল না। কিন্তু তেমন দুর্যোগেও মিলনের কোন অসুবিধা ঘটে নাই।

বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবির অবস্থা ইহার বিপরীত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রথম দর্শনেই তাহাদের চারি চক্ষের মিলন ঘটিয়াছিল। বৈষ্ণব কবির রাধা লুকাইয়া থাকিলেও ব্রজরাজ নন্দন তাহাকে দেখিয়াছিলেন। এই দর্শনের একটী চিত্র (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখার উক্তি)

তুয় যব চলিয়ে তব ফিরতি সঘনে মোহনতি বয়ান পরিবাদ।
কত যুবতি যুবতী পরখএ পেখলি কোই নাহি রাইক সমান।
অতএ বিহি তোহারি দুখ লাগি।
রূপে গুণে সাবনি দখিল ইহ মাধবি বদিয়ে বসি বসিয়ে চুয়া তাকি
বিরল খড় বাবিনি রাই অনুরাগিনি তোহারি কনি মাধ মহ জাগি।
নিয়রে নিতু সৌকুমা রাই মুগলোচনা অতএ তুঁহু উহারি অনুরাগী।
তরুণ অট্টালিকা উপরে বসি রাধিকা হেরি হরি অচল পদপাণি।
গহিত জন মানসে হরিগুণ সুধারসে জানি মহ শশিশেখর বাণি।

তাহার পর হইতে উভয়ের দেখা দিবার সে কত চাতুরী, দেখিবার সে কত ছলনা, মিলনের জন্য সে কি দুঃসহ সাধনা, অভিসারের জন্য সে কি দুঃখ বরণ। কত মান কত বিপ্রলম্ভ, কত লোক নিন্দা কত ভয় ভাবনা। কিন্তু এত সব সহ্য করিয়াও হৃদয়ের [illegible]

পলকে মিলাইয়া গেল, বিরহের দুস্তর পারাবার উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিল। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার বিরহ বেদনা যতটুকু অনুভব করিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ ভাষার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ দুঃখ বর্ণনা করেন নাই, তাহার কারণ গোপীপ্রেমই তাঁহাদের সাধ্যবস্তু ছিল, তাঁহারা গোপী প্রেমেরই সাধনা করিয়াছিলেন। বিরহ বেদনার সুতীব্র দহনেই তাঁহাদের মিলন পথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভস্মীভূত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ পৃথক পথের যাত্রী। রবীন্দ্রনাথের সাধনাও রসতত্ত্বের সাধনা এবং সে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; তথাপি বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে তাঁহার সাধনার পার্থক্য আছে। বাল্যকাল হইতেই এই বিশ্ব দৃশ্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই ভুবনকে তিনি সুন্দররূপেই দেখিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বের মধ্য দিয়াই বিশ্বরূপের অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। এই সুন্দর ভুবনের সৌন্দর্য্যই তাঁহাকে চিরসুন্দরের সন্নিধানে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। কত ভাবে কত রূপে তিনি তাঁহাকে আস্বাদন করিয়াছেন। অনুভূতি যেমন বিচিত্র, সুবিচিত্র তেমনই তাহার প্রকাশ। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতি ভাবের উপাসক এবং রসস্বরূপ বহু আনিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য, বৈষ্ণব কবিগণ সর্বত্রই বিশ্বরূপেরই দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। সেই রূপ তাঁহাদের নয়নে লাগিয়াছিল এবং এই রূপের আলোকেই বিশ্বের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় ঘটিয়াছিল। উপলব্ধির পার্থক্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য স্বাভাবিক।

ভাবের বাজারে রসের কারবারে আমি জাতিভেদ মানি না। রস বিশ্লেষণ ব্যাপারে আমি অপরাধ বলিয়াই মনে করি। কিন্তু অধিকারী ভেদের কথা আমি অস্বীকার করি না। রবীন্দ্র কাব্যের রসাস্বাদনে আমার কতটুকু অধিকার, আমি তাহা জানি। তথাপি যে এই অনধিকার চর্চা করিতেছি, রবীন্দ্রকাব্যের অসাধারণ মাধুর্য্যই তাহার কারণ। কিন্তু সেই বহু বিচিত্র কবিতা ও সঙ্গীতের আলোচনায় দিক নির্ণয়ও আমার সাধ্যাতীত। মূলগ্রন্থও আমার [illegible]। দুই চারিটী কবিতা ও গান মাত্র আমার সম্বল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাকে রোগজীর্ণ দেহের অসুস্থ মনের দুর্বল স্মৃতির উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে সুতরাং কবিতা ও গানের পাঠোদ্ধারে কোন ত্রুটী থাকিলে আমি তাহার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈক বন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক সিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে।

বলিয়া যাঁহাকে দেখিবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় বৈষ্ণব কবি প্রার্থনা জানাইয়াছেন, কবির ভাষায় আমি তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছি। একদিন তো আসিয়াছিলে বন্ধু, আর একবার এস।

"এস এস ফিরে এস। বঁধু হে ফিরে এস।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত নাথ হে ফিরে এস।
ওহে নিঠুর ফিরে এস, আমার করুণ কোমল এস
আমার সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এস।
আমার নিতি সুখ ফিরে এস হে, আমার চির দুখ ফিরে এস
আমার সব সুখ দুখ মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এস।
আমার চির বাঞ্ছিত এস, আমার চিত সঞ্চিত এস
ওহে চঞ্চল হে চিরন্তন ভুজবন্ধনে ফিরে এস।
আমার বক্ষে ফিরিয়া এস, আমার চক্ষে ফিরিয়া এস।
আমার শয়নে স্বপনে বসন ভূষণে নিখিল ভুবনে এস।
আমার মুখের হাসিতে এস, আমার চোখের সলিলে এস।
আমার আদরে আমার ছলনে আমার অভিমানে ফিরে এস।"

জাগরণ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শত-কোটী পদ্ম-সরোবরে
জাগিয়ে দিয়ে মধুকরের ভোজ,
ঊষা যখন উঠল প্রভাত হয়ে
তখন থেকেই নিইনি কারো খোঁজ।
আপন কোণে ছিলাম খেয়াল গানে
পাইনি সময়—তাকাই কারো পানে,
আপ্‌নি গেয়ে আপ্‌নি শুনে' কাণে
চিত্ত আমার মত্ত ছিল ঝোঁকে—
রুদ্ধ-পাতা চক্ষু দুটোর ফাঁকে
সাধ্য কি যে আলোয় কোথায় ঢোকে!

শেষ-বেলাতে হঠাৎ এল কানে
ঈশান-মেঘের কাল-বোশেখী হাঁক—
নিমেষ-মাঝে ঢুকল মনের ফাঁকে
ভয়-জাগানো মৃত্যু-ভেরীর ডাক!
খুশীর নেশা অমনি গেল ছুটে'
ক্ষ্যাপা খেয়াল কোথায় গেল টুটে'
ভাবগুলোটা পায়ের কাছে লুটে
হারিয়ে ফেলে আপন বাঁধা সুর;
পালিয়ে এলাম আগুন ছেড়ে যেন,
চিত্ত তখন দীপ্ত রুদ্র-পুর!

ঊর্দ্ধ-আকাশ বহ্নিশিখায় রাঙা,
ঘরে-ঘরে ভীষণ ভয়ের সাড়া,
উচ্চ কণ্ঠে আপন জনে ডেকে
জড়ো করে মিলছি সকল পাড়া!
ডাইনে বাঁয়ে দূরে এবং কাছে—
কতক আগে, কতক আসে পাছে
যেথায় যত সঙ্গী-সাথী আছে
ত্রস্ত চোখে আমার পানে চেয়ে!
পরাণ আমার হঠাৎ জেগে যেন
মুক্তকণ্ঠে উঠল শুধু গেয়ে— বন্দি মায়ে, বন্দে মাতরম্;
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল সবে,
জগন্মাতা ডাক দিল স্বয়ং!

বিচিত্র

শ্রীপ্রতিভা বসু

দরজা খুলেই সুমিতা চমকে উঠলো। বেলা বোধহয় তিনটা। একটা ভূত দেখলেও মানুষ অমন চমকে ওঠেনা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর হঠাৎ ত্রস্ত হাতে মাথার কাপড়টা প্রায় গলা অবধি টেনে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

বিস্ময় বিমূঢ় শঙ্করনাথ প্রথমে একটু লজ্জিত হলো—তারপরেই সেটা কাটিয়ে উঠে গলা খাকারি দিয়ে বল্ল,'কই, সব গেল কোথায়?

কথাটা সে যার উদ্দেশ্যে বল্ল—তাকে আর দেখা গেল না। একটি বৃদ্ধ ভৃত্য গামছা কাঁধে ঘরে এসে দু হাত জোড় করে বিনীতভঙ্গীতে দাঁড়াল।

শঙ্করনাথের চোখে রাগের ঝিলিক দেখা গেল কিন্তু সেটা সে সামলে বল্ল 'দেখ, বাইরে ট্যাক্সিতে আমার একটা বাক্স আর একটা বিছানা আছে, নিয়ে এসো—আর ড্রাইভারকে এই ভাড়াটা দিয়ে দাও।'

ভৃত্য চলে যেতেই বাড়ির ভেতরে যাবার জন্য একবার পা বাড়িয়ে তখনি থমকে গেল। ভৃত্যটি ফিরে আসতেই বল্ল—সুমিতাকে বল গিয়ে আমার শরীর অসুস্থ, কোন ঘরে থাকবো তাড়াতাড়ি তার একটা ব্যবস্থা করে দিতে।'

'আজ্ঞে আচ্ছা।'

একটু পরেই ভৃত্যটি ফিরে এসে শঙ্করনাথকে দোতলার ঘরে নিয়ে গেল। এর মধ্যেই খাটের উপর পরিপাটি কোরে বিছানা পাতা হয়েছে, ছোট একটি আলনাও খালি করা আছে পায়ের কাছে। যদিও শঙ্করের জীবনের বড় অংশটিই এ বাড়ির এই ঘরে কেটেছে তবুও ঘরে ঢুকে সে খুব উৎফুল্ল হতে পারলোনা। তার পূব দক্ষিণ খোলা মার্বেলের মেঝেযুক্ত বৃহৎ ঘরের আরামটির জন্য মনটা একটু ব্যাকুল হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সুমিতার এই অপরিসর পুরোনো ভাঙা সিমেন্টের ঘরটির জন্য মনের কোথায় যেন একটা ব্যথা ও খচ খচ করে উঠলো বুকের মধ্যে। পকেট থেকে দামী সিল্কের রুমালটি বার কোরে ঘাড় মুছতে মুছতে পাখাশূন্য সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে চোখ নামালে।

ওদিকে সুমিতা ভেবে পেলোনা এই মানুষটি কি চায়—কেনই বা এসেছে। সাত পাঁচ চিন্তা কোরে সে রান্না রাঁধতে বসলো—যখন এসেইছে—আর সে তো জানে যে মানুষটি ভারী আরাম-বিলাসী—তখন তার ইচ্ছা না থাকলেও যাতে খাবারটাবারগুলো ভালো হয় তা দেখা উচিত। ভৃত্যকে ডেকে বল্ল রামু, তুমি বাবুর কাছে কাছেই একটু থাক গিয়ে, এখানে সব আমিই করে নেব। ডাকলে—এসে চা নিয়ে যেও। বহুদিনের বিশ্বস্ত ভৃত্য রামশরণ নিতান্ত অনিচ্ছায় মার আদেশ পালন করতে দোতলায় চলে গেল।

সুমিতা বোসে বোসে লুচি বেললো—নানা আকৃতির নিমকি তৈরী করলো, তারপর চায়ের জল চাপিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো। একসময়ে রামশরণ নেমে এসে বল্ল 'মা বাবু এই ব্যাগটা রেখে দিতে বল্লেন—' মোটাপুরু চামড়ার ব্যাগটি প্রায় ফেটে যাবার মত হয়েছে টাকাপয়সার ভারে। সুমিতা একটু নেড়ে চেড়ে বল্ল 'বাবুকেই দিয়ে এসো এটা, আমি কোথায় রাখবো?'

'এই যে চাবিও দিলেন—'

'বাক্স খুলে বাবু জামা-কাপড় বার করে দিতে বল্লেন। চান করতে চাইছেন।'

সুমিতা একটু অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলো। আবদারও তো মন্দ না। একবার ভাবলো—চাবিসুদ্ধ স্যুটকেসটা উপরে পাঠিয়ে দেয়; কিন্তু কি মনে করে চাবিটা হাত পেতে নিয়ে বল্ল, 'চায়ের জলটা বোধহয় ফুটলো, দেখোতো—' নিচু হয়ে সে স্যুটকেসটা খুলে ফেল্ল। খুলতেই একটা মধুর গন্ধে ভরে উঠলো বাতাস—হঠাৎ এই চেনাগন্ধে একটুখানির জন্য সুমিতার মনটা যেন কেমন করে উঠলো। দুমড়ানো ভাঁজশূন্য সব দামী দামী শান্তিপুরী ধুতি—পাঞ্জাবীগুলোর ইস্তিরি নেই—কোণের দিকে কয়েকটা ভাঁজ করা সিল্কের গেঞ্জি আর পাজামা। তার উপরে বাথ-পাউডার, সেণ্ট, একবাক্স সাবান, সেণ্টের শিশি, ল্যাভেণ্ডার। বাবুগিরিটি ঠিক আছে এখনো। কাপড়ের ভাঁজ না থাকলে আর পাঞ্জাবীর ইস্তিরি না থাকলে শঙ্করনাথ কোনদিনও সে জামা-কাপড় ছোঁয়না। সুমিতা ধুতি আর গেঞ্জি বার করে ইস্তিরি করা জামা খুঁজতে লাগলো।

চা ভিজিয়ে রামশরণ বল্ল 'মা, আপনার হল?'

'এই যে'—ব্যস্তভাবে সুমিতা হাতের কাছে যা পেল তাই উঠিয়ে বাক্সটা বন্ধ করতে গিয়েই আবার খুলে তেলের শিশি খুঁজতে লাগলো। বাক্সের ডালা তুললেই যে গন্ধটি সুমিতার নাকে ঢুকলো সে গন্ধের নেশা ওকে পাগল কোরে তুল্ল। অনেকদিন পর্যন্ত সুমিতার বাক্স খুল্লেও এই গন্ধ বেরুতো। সুমিতার দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ চুলে এখন তেল পড়েনা—কিন্তু সেণ্ট! সেণ্ট! সে কবেকার স্বপ্ন।

নিঃশ্বাস ফেলে বল্ল, 'রামু, তুমি জিজ্ঞেস কোরে এসো বাবুকে—চা খেয়ে চান করলে চলবে কিনা।'

শঙ্করনাথ বাঁ হাত কপালে রেখে আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট টানছিল। সবল দীর্ঘ দেহ, পরিষ্কার গায়ের রং, ঘনচুল ব্যাকব্রাশ করা—মুখচোখ ঈষৎ বিবর্ণ—দেখলে মনে হয় অত্যন্ত ক্লান্ত। রামশরণকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বল্ল 'কী হে, তোমার মা চা' টা খানতো—আমিতো এই মুহূর্তে এক কাপ চা না পেলে বাঁচবোনা।'

'আজ্ঞে না—মা চা খান না। তবে আপনার জন্য তিনি তৈরী করেছেন—বল্লেন, এখনি চান করবেন, না চা খেয়ে নিয়ে—'

'নিশ্চয়! তুমি আগে চা নিয়ে এসো। আর শোন, তোমারি মা সকালে বিকেলে কোন সময়েই চা খাননা?'

'আজ্ঞে না।'

'কী খান?'

'আজ্ঞে সকালে বিকেলে তেমন খাবার অভ্যেস নেই, দুপুরে ভাত খান।'

'আর রাত্তিরে—?'

'রাত্তিরেতো পেরায়ই খায়না, বলেন ক্ষিদে নেই।'

'হু, তুমি কদ্দিন আছ ?'....

রামশরণ হেসে বল্ল 'আমি, আজ্ঞে বহুদিনের লোক—যাকে আমি ছোটবেলায় কোলে কাঁখে নিয়ে বড় করেছি। মাঝে অনেক দিন ছিলাম না। পেরায় দশবছর রেঙ্গুনে একবাবুর কাছে ছিলাম। আবার এই বছর চারেক যাবত কোলকাতা এসেছি। হঠাৎ মার সঙ্গে দেখা হল, আর সেই থেকে এখানেই আছি।'

'ও, তাহ'লেতো তুমিই মার অভিভাবক।'

'আজ্ঞে ছ'মাস হলো বুড়োবাবু মারা গেছেন, সেই থেকে আমি আর বামির মা-ইতো মার কাছে আছি।'

'বুড়ো বাবুটি কে ? তোমার মার বাবা বুঝি ?'

'আজ্ঞে।'

'আর, বামির মা ?'

'ঐতো—' আঙুল দিয়ে দিক নির্ণয় কোরে রামশরণ বল্ল 'সূর্য্য-সেনের ভায়ের বৌ! তারও তো মার মতনই দশা বাবু,—এই তিনচারটা কাচ্চা ছেলে—' হঠাৎ পেছন ফিরে তাকিয়ে রামশরণ শঙ্কিতভাবে থেমে গেল।

রামশরণ থামতেই শঙ্করনাথ দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখলো—একহাতে চায়ের কাপ আর এক হাতে এক প্লেট খাবার নিয়ে সুমিতা রামশরণকে চোখ রাঙাচ্ছে।

ব্যাপারটা শঙ্করনাথ দেখতে পেল কিন্তু সুমিতা সেকথা জানতে পারলোনা; কেননা তার মুখ পাশের দিকে ফেরানো: শঙ্করনাথ অনিচ্ছা সত্বেও চোখ ফিরিয়ে নিল।

সুমিতা রোগা হয়ে গেছে। হবেনা ? দিনে একবার খেয়ে মানুষ বাঁচে কেমন কোরে ?

রামশরণ চা আর খাবারের প্লেট টিপয়ের উপর রাখলো। বিষণ্ণ মুখে শঙ্করনাথ বল্ল, 'আমাকে কেবল চা' টাই দাও রামশরণ, ওসব আমি খাবনা।'

রামশরণ নিজের বুদ্ধিতেই ভদ্রতা করলো 'না বাবু সে কি হয়, মা নিজে বানালেন এত কষ্ট করে।'

'রামশরণ, কষ্ট যে করে তারই খাওয়া উচিত। আমাকে অত না বোলে ওরকম কোরে মাকে খাওয়াতে পার না ?'

তবু রামশরণ বল্ল 'মা দুঃখিত হবেন।'

'নিয়ে যাও তুমি'—কথাটা এমন ভাবে বলা হলো যার পরে রামশরণ আর কিছু বলতে সাহস করলো না। চায়ের কাপটা রেখে ব্যস্তভাবে খাবারটা নিয়ে নীচে নেমে গেল।

চা খেয়ে শঙ্কর উঠলো বিছানা থেকে। শরীরটা ভারি ক্লান্ত বোধ হল। অমন অসুরের মত স্বাস্থ্যেও তার ঘুণ ধরেছে। স্নান করবার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠলো। বুড়োটাকে কখন বলেছি কাপড়-জামা আনতে—সুমিতা কি এতদিনের সব অভ্যেস ভুলে গেল ?

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল বারান্দার শেষপ্রান্তে বাথরুমের দরজাটি খোলা। তার কাছেই বাইরের দেয়ালে তার পাটভাঙা কুঁচোনো ধুতি, একটি সিল্কের গেঞ্জি ও একটি আদ্দির পাঞ্জাবী-শোভিত একটি ছোট র‍্যাকেট। মনটা মুহূর্ত্তে খুসী হয়ে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে দেখলো বাথরুমের ভেতরকার ছোট সিমেণ্টের তাকটিতে তার ম্যাকেনার অয়েলের শিশি থেকে টুথ-ব্রাশটি পর্য্যন্ত পরিপাটি কোরে রাখা হয়েছে। শঙ্করনাথ চুপ কোরে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

সেদিন রাত্তিরে একতলার ঘরে শুয়ে সুমিতার আর ঘুম এলো না। কত কথা যে ভিড় কোরে এলো তার মনের মধ্যে। এতদিন পরে ও কেন এলো ? কেন এলো ও ? কী চায় ? বাড়ীর অধিকার ? হয়তো তাই। একদিন তাকে সে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল আজ তারই প্রতিশোধ নিতে ও এসেছে।

সুমিতার কত দুঃখ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এই অন্তরে তা কি শঙ্করনাথ জানে ? তার কেমন কোরে চলে তা কি ভাবে শঙ্করনাথ ? কিন্তু এ বাড়ি যদি ওরে ছাড়তেই হয় তবে সে যাবে কোথায় ? শেষে কি ওর কাছেই হাত পাততে হবে সুমিতার ? না, না, কখখোনা। যার কাছে ও ছিল রাণী, তার কাছে ও যাবে ভিখারিণী হয়ে। না, না, না, অস্ফুটে সুমিতা উচ্চারণ করলো না, না, না। সব সইবে কিন্তু এ তো আমি সইতে পারবো না। গভীর উত্তেজনায় সুমিতা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। উঃ কী অসহ্য গুমোট আজ। একতলার এই বদ্ধ ঘরে এখনি যেন দম আটকে যাবে। সুমিতা ছটফট করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো।

উপরের ঘরে শুয়ে শঙ্করনাথের চোখেও ঘুম এলো না। এই ঘর—কত আশার আনন্দকুঞ্জ। কত স্বপ্ন দেখেছে সে এই ঘরে। আর এই ঘরে এই খাটে এমন নিঃসঙ্গ শয্যায় আজ কাটছে তার বিনিদ্র রাত্রি ! এও তার ভবিতব্য ছিল ? শাস্তি কি তার এখনো ফুরোলো না ? কোথায় সেই সুদূর বোম্বাই, আর কোথায় এই কলকাতা। অতবড় চাকরী, অত প্রতিপত্তি কোন্ আকর্ষণে সেসমস্ত ছেড়ে পাগলের মত সে এখানে চলে এলো ? ভুল করেছিল শঙ্কর, কিন্তু শঙ্করের অন্যায়েরও যদি শেষ না থাকে সুমিতার অভিমানেরও তবে শেষ নেই। আজও সুমিতা তাকে দেখলে মুখ ঢাকে। সুমিতা—মিতা শঙ্করনাথ অস্ফুটে বল্ল 'আমি কি তোমার ক্ষমারও অযোগ্য ?'

বিছানা ছেড়ে সে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়লো—নীচের বারান্দার ও থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি মনুষ্য মূর্ত্তি। আকাশের মৃদু আলোতে অনায়াসেই সেই মানুষটির সুঠাম শরীরের দাঁড়াবার বিশেষ ভঙ্গীটি চিনতে পেরে শঙ্করনাথের বুকের মধ্যে ঢেউ খেলে গেল। নিজের অজ্ঞাতেই তার পা একবার এক-তলার সিঁড়ির মুখে এলো তারপর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ঘরে ফিরে এলো।

প্রচলিত অর্থে সুমিতা হয়তো সুন্দরী নয়, কিন্তু তার ছিপছিপে শ্যাম-শরীরে কী যে মাধুর্য্য ছিল যা একবার দেখলেই মন থেকে মুছে যায় না। তার চোখে মুখে এমন একটা সজল আভা ব্যাপ্ত হয়ে থাকতো যে শঙ্করনাথ তাকে দেখে আর মন ফেরাতে পারেনি। কত হাঙ্গামা কত মান-অভিমান চল্লো মা-বাবার সঙ্গে, তারপর এলো সুমিতা তার ঘরে। সুমিতা, সুমিতা। একটা নামের মধ্যেও এত মোহ ! একটা মানুষের মধ্যে আরেকজন

মানুষের এত আনন্দ ? শঙ্করনাথ বিভোর হয়ে রইল। আর তার ঐ বেসুরো মোটা গলাও গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠলো, 'তুমি মধু, তুমি মধু, মধুর নিত্য মধুর সাধে আমার পরাণ বঁধু।'

সুমিতা বলে 'বাবারে বাবা, এমন মিষ্টি গানতো আর আমি কখনো শুনিনি।' মুখ বন্ধ করে দিয়ে শঙ্করনাথ মনে মনে বলে ভগবানের অবিচারটা দেখো একবার—কবি হইনি, ও মুখের বর্ণনা করতেও পারি না—ভাষা দেন নি, দেবীর স্তুতি করতে পারি না—গান গেয়ে যে মনের আনন্দটা একটু ব্যক্ত করবো তাও আবার গলাটা নিতান্তই সুরহীন। ভেতরের চাপ কেবল বেড়েই চলে অথচ প্রকাশের দ্বারগুলো সবই রুদ্ধ। মিতা, আমি একদিন মরে যাব।'

সুমিতা রাগ করে।

শঙ্করনাথ তখন সবে এম্-বি পাশ কোরে বেরিয়েছে, সুমিতা আই-এ পরীক্ষার্থী। বাবা বল্লেন, এবার তুই বিলেত গিয়ে ডিগ্রিটা নিয়ে আয়—বৌমাও তদ্দিনে আই এ-টা পাশ করুন।'

শঙ্করনাথ মার কাছে জানাইল—অসম্ভব!

'কেন, অসম্ভব কেন ? আগাগোড়াইতো তাই ঠিক।'

বিদ্রোহের মত শঙ্করনাথ বল্ল—আগাগোড়া বুঝি সুমিতা ছিল।'

গম্ভীর মুখে মা বল্লেন 'তাই বলে তুই ভবিষ্যত নষ্ট করবি ? বৌতো রইলোই আমার কাছে। কদিনের ব্যাপার—দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

'না, মা, না।'

রাত্রে সুমিতা বল্ল 'মা যা বল্লেন তাই তো—'

'ভাল ?' অভিমানে শঙ্করনাথ মুখ ফিরিয়ে শুয়ে বল্ল 'আপদ বিদেয় হলেই ভাল না ? এ কিনা ডাওড়া-দিগুজা ! জান, সে দেশ সাত সমুদ্র তেরনদী পারে ?'

'পাগল' গভীর অনুরাগে সুমিতার বুক ভরে যায়। মনে মনে ভাবে সত্যিই তো শঙ্কর যাবে অতদূরে, আর সে এখানে টিকবে কেমন করে ?

অবশেষে নিরাশ হয়ে অগত্যা অমরনাথ ছেলেকে একটা ডিস্পেনসারি খুলে দিলেন।

ডাক্তারীতে শঙ্করনাথের হাতযশ ছিল। শক্ত শক্ত অসুখ যা অনেক সময় তার বোধগম্যও হত না, এমন রোগীও দু'চারজন তার হাতে এসে ভাল হয়ে গেল। হয়তো ভাল হত তারা নিজে থেকেই, নাম হ'ল শঙ্করনাথের। আস্তে আস্তে পাড়ার মধ্যে, পাড়ার বাইরে অবশেষে অনেক দূরেও তার সুনাম ছড়িয়ে পড়লো।

সুমিতাকে বল্ল 'কি হ'ত বিলেত গেলে ? আমি সব সময়ে ভাবলেই যাই না তাই, নইলে যা উপার্জ্জন করতুম তাতে টাকার বিছানায় শুইয়ে রাখা যেতো তোমাকে। আমি হতভাগা তো ঐ শ্রীচরণেই—'

'আচ্ছা, আচ্ছা'—মুখের এক অপরূপ ভঙ্গী কোরে সুমিতা হেসে ওর মুখে হাত চাপা দিত এবং সে হাত ছাড়িয়ে নিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হত।

সুগভীর আনন্দে, আশায়, আর অনুরাগে চরম আসক্তিতে সুদীর্ঘ তিন বছর তাদের চোখের পলকে কেটে গেল। কিন্তু মানুষের চরিত্র বড়ই বিচিত্র। যে সুমিতার আকর্ষণে বিশ্বসংসারই তুচ্ছ ছিল শঙ্করনাথের কাছে, একদিন তাতে ভাঙন ধরলো। হঠাৎ সুমিতা বুঝতে পারলো—ধীরে ধীরে যেন একটা ব্যবধান গড়ে উঠছে তাদের মাঝখানে। শঙ্করের ডাক্তারীর উৎসাহ যেন অকস্মাৎ বড় বেশী রকম বেড়ে গেল এবং সেটা হল হাসপাতালে চাকরী নেবার পর থেকেই। নেবার ইচ্ছে তার নিজের একটুও ছিল না, কিন্তু তার বাবা আর সুমিতারই ইচ্ছা ছিল বেশী। আড়াইশ টাকা মাইনে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কাজ,—সুমিতা বল্ল 'নাও না, এতে যখন প্রাইভেটপ্র্যাকটিস্ বারণ নেই—'

'সারাটা দিন তো তাহ'লে হাসপাতালেই কাটবে, আর যেই ফিরে আসবো অমনি পড়বে রোগীর ডাক—'

শঙ্করের অভিমানভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সুমিতা হেসে বল্ল, 'আচ্ছা, আমি কি পালিয়ে যাব যে তুমি ওরকম কর ? লতার মত দুই হাতে সে চেয়ারের পেছন থেকে শঙ্করনাথের গলা জড়িয়ে ধরলো। বলিষ্ঠ হাতের মুঠোর মধ্যে সুমিতার হাত চেপে রেখে শঙ্করনাথ বল্ল, 'পালিয়ে নাইবা গেলে—কিন্তু জীবনটা কি এতই দীর্ঘ যে সময়গুলো ওরকম অপব্যয় করতে পারি ? তুমি যে কি, তুমি যে কতখানি—এত ভাল লাগা—মিতা, এত ভালবাসা—এর ভার যে কী অসহ্য কেমন কোরে আমি তোমাকে বোঝাবো ? আর তার তুলনায় কত ছোট এই হৃদয়ের পাত্র। মনে হয় কি জান ? এক সমুদ্রেও যা ধরেনা তার ভার আমি সইবো কেমন কোরে ?'

'সেই জন্যেই তো ভয়'—দুষ্টুমিতে ভরে উঠেছে সুমিতার মুখ—পাত্র যদি ছোট হয় তা হ'লে নিশ্চয় উপচে পড়বে ; আর কোন বুদ্ধিমান মানুষ যদি টের পায়—একথা তাহ'লে নিশ্চয়ই একটি বড় পাত্রের সন্ধান দিয়ে সমস্ত সুধা কেড়ে নিয়ে যাবে আর আমি বোকার মত শূন্য পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো হাঁ করে।'

'চালাকি !'—সুমিতার দুই ঠোঁট—শঙ্করনাথ সবেগে বন্ধ করে দিয়েছে।

সেই শঙ্করনাথ ক্রমে এমন হয়ে উঠলো যে সুমিতা সহসা কিছুই ভেবে পেলোনা সে কি করতে পারে।

রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে সুমিতা টের পেল শঙ্করনাথ ফিরে এসেছে হাসপাতাল থেকে। বিছানার উপর উঠে বোসলো সে। গভীর গলায় বল্ল, 'হাসপাতালে কি রাত দু'টো পর্য্যন্ত কাজ করতে হয় তোমাকে ?'

সুমিতার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে শঙ্করনাথ পেছন ফিরে তাকালো। একটু চুপ কোরে থেকে বল্ল 'নিশ্চয়ই হয়, নাহলে তো আর ঘুরে বেড়াইনা।' 'যদি তাই হয়, কাল থেকে তুমি কাজে যাবে না।'

'তোমার কথাই যে চরম কথা, এতখানি আত্মবিশ্বাস না থাকাই উচিত ছিল।'

'আমি যা বল্‌বো তা তুমি শুনবে না ?' সুমিতার মুখে কথাগুলা কেমন অদ্ভুত শোনালো।

'স্ত্রীলোকের সব আব্দার শুনলে তো সংসারে চলে না।'

'তুমি বললে আর দৌড়ে গিয়ে অত ভাল চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে এলুম এটা সম্ভব নয়।' বিদ্রূপের হাসিতে শঙ্করনাথের মুখ ভরে উঠলো।

'নিশ্চয়ই সম্ভব।' সুমিতার গলা চিরে কথা বেরুলো, সঙ্গে সঙ্গে তার ছিপছিপে পাতলা শরীর যেন হাওয়ায় উড়ে এলো

শঙ্করনাথের কাছে—আমি তোমাকে সন্দেহ করি, তোমার অধঃপতন হয়েছে, আমি কি বুঝি না তোমার চালাকি? কার চোখে তুমি ধুলো দিচ্ছ? কাল থেকে তুমি হাসপাতালে যাবেনা, যাবেনা, যাবেনা'—শঙ্করনাথের হাত ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি দিয়ে কেঁদে ফেল্ল সুমিতা।

'কি মুস্কিল!' সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্করের মনটা হঠাৎ কেমন হয়ে গেল—সুমিতাকে সে দুঃখ দিচ্ছে, সে কাঁদছে এ চেতনা তার অবচেতনকে মুহূর্তের জন্ত একটা নাড়া দিল। হাত বাড়িয়ে বল্ল 'মিতা তুমি কি পাগল?'

কিন্তু চাকরী সে ছাড়লো না। কয়েকদিন পরে এমন হল যে রাত্রিতে বাড়ি আসাই প্রায় ত্যাগ করলো। অমরনাথ নিভৃতে স্ত্রীকে বল্লেন 'খোঁজ নিয়েছিলাম, সে একটা ফিরিঙ্গী নার্স।'

কথাটা সুমিতার কানেও গেল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে চুপ কোরে বোসে রইল।

এ দিকে শঙ্করনাথের সঙ্গে দেখা হওয়া দুর্লভ ব্যাপার। সকালবেলা বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত একটায়। যে দিন দুপুরে ফেরে সেদিন রাত্তিরে আসে না। সুযোগ বুঝে একদিন সুমিতা বল্ল 'আমি বর্দ্ধমান যাব।'

'বেশ তো।'

'তুমি সঙ্গে যাবে।'

'বটে!' ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে শঙ্করনাথ বল্ল 'আমার মরবার সময় নেই তা শ্বশুরবাড়ি। আর সেখানে বলতে তো ঐ একমাত্র বুড়ো ভদ্রলোক'—

ব্যথিত হয়ে সুমিতা বল্ল 'ঐ বুড়ো ভদ্রলোকটি তো একদিন তোমার কম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না। তা ছাড়া আমার বাবা আমার মার অভাবও পূরণ করেছেন।'

বিরক্ত মুখে শঙ্করনাথ বল্ল 'বেশ তো যাও না—আমি তো বারণ করছি না।'

'বারণ করবার মনুষ্যত্ব তোমার আছে নাকি? তা হ'লে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হয়ে ও সব ইতরমি তুমি করতে পারতে না। একটা দুশ্চরিত্র নার্স'—

'কী বললে?'

'যা বলবার তাই বল্লাম। গলার স্বর তুমি আর এক পর্দা চড়াবে না। রাগ করবার বাসা তো তোমার আছেই—সেখানে যেয়ো।'

'স্যাট্‌আপ্! এ বাড়ি আমার। স্পর্দ্ধা করবার জন্ত তোমারও বর্দ্ধমান আছে, এখানে—আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙাবার সাহস আর তুমি দ্বিতীয়বার দেখিয়ো না।'

আগুনের শিখা দপ্ কোরে জ্বলে উঠলো সুমিতার দুই চোখে। কঠিন গলায় বল্ল, 'না এটা আমার শ্বশুর বাড়ি। তিনি যদ্দিন জীবিত আছেন, তদ্দিন এ বাড়ির কোন অধিকারও তোমার নেই জেনো। উচ্ছন্নে গেছ—ভাল কোরেই যাও। তোমার ও মুখ আর আমি দেখতে চাই না।'

পাশের ঘর থেকে শাশুড়ী বেরিয়ে এলেন, 'কি করছিস্ তোরা ছেলেমানুষের মত'—

মাথার কাপড় ঈষৎ টেনে দিয়ে সুমিতা বল্ল, 'মা ওঁকে বলুন, এ বাড়ি আমার শ্বশুরের, ওঁর না।'

লাফ দিয়ে শঙ্করনাথ বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।'

শাশুড়ি রাগ করে বল্লেন, 'কী করলে তুমি? বার করে দিলে বাড়ি থেকে? এত তেজ ভাল নয়।'

থর থর করে কেঁপে উঠলো সুমিতা। দুই হাতে খাটের বাজুটা ধরে কোন মতে শরীরের টাল সামলালো।

পরের দিনই সে চলে গেল তার বাবার কাছে। সুদীর্ঘ দু'মাস কাটিয়ে সে যখন ফিরে এলো শুনলো—বড় চাকরী পেয়ে শঙ্করনাথ কালিম্পং গেছে। এমন কথাও শোনা গেল সেই নার্সটিকে সে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সুমিতা কোনরকমে দুই চোখ বুজে চোখের জল ফেললে। শঙ্করের মা বল্লেন 'তুমি তাকে ঠেকাতে পারতে, কিন্তু তোমার দর্পই তোমার সর্বনাশ করলো।'

অমরবাবু বল্লেন 'অমন কথা বোলোনা তুমি। বৌমা যা করেছেন বেশ করেছেন। ওর মুখ দেখবার আমারও সাধ নেই। যে একবার উচ্ছন্নে যায় তাকে কি কেউ ঠেকাতে পারে?'

এর এক বছর পরেই হঠাৎ অমরনাথ মারা গেলেন হার্টফেল কোরে। শঙ্করনাথ খবর পেয়েই চলে এলো, মা তাকে দেখে ডুকরে উঠলেন। আর সুমিতা একগলা ঘোমটা দিয়ে সেই যে গিয়ে ঘরের কোণে লুকোলো—যে কদিন শঙ্করনাথ থাকলো সে কদিন চন্দ্র সূর্য্যের মুখও সে আর দেখলো না। শাশুড়ি বল্লেন—বৌমা, এ সুযোগ অবহেলায় হারিয়ো না। ওর মুখের দিকে দেখেছ? ওর কথার ভাবেও আমি বুঝেছি যে ও শান্তিতে নেই। ওকে তুমি ঘরে বাঁধ।'

সুমিতা নির্ব্বিকার মুখে বসে রইল। শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেলে মা-ই বল্লেন ছেলেকে 'শঙ্কু, দুঃখতো তুই অনেকই দিলি, এবার আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, সেখানেই বাকী জীবন কাটুক।'

'বেশতো। কত টাকা লাগবে তোমার?'

'আর ঐ অভাগী? সে কোথায় যাবে তা ভেবেছিস্?'

বেদনায় শঙ্করনাথের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো—ভাঙা গলায় বল্ল 'তার যা লাগে দেব।'

আহত কণ্ঠে মা বল্লেন 'হতভাগা, টাকাটাই কি সব? শুধু টাকা দিয়েই ওর উপর সব কর্ত্তব্য তোর শেষ হয়ে যাবে? একথা তুই বলতে পারলি?'

'মা, আমি নিরুপায়।'

'তা হ'লে লোকে যা বলে সব সত্যি?'

অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে শঙ্করনাথ বল্ল 'লোকে কি বলে আমি জানি না; তবে আমি যে ফাঁদে সাধ করে পা দিয়েছি তার থেকে আমার অব্যাহতি নেই'—একটু ইতস্তত করে বল্ল, 'মা, ওকে আমার কয়েকটা কথা বলবার ছিল।'

মা মনে মনে পুত্রবধূর নির্ব্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিতে দিতে বল্লেন—'সেই ভাল, যা বলবার যা বোঝাবার ওকেই তুই বুঝিয়ে যা।' পরে গিয়ে বল্লেন 'বৌমা শঙ্কর তোমাকে ডাকছে।'

সুমিতার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো, জবাব দিল না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে তাকিয়ে রইল শাশুড়ির দিকে। শাশুড়ি রূঢ় স্বরে বল্লেন 'যা বলছি তাই কর—ওর ঘরে যাও তুমি। যাও'—শেষের 'যাও'টা তিনি এমন স্বরে বল্লেন যে সুমিতা সে আদেশ অমান্য করতে সাহস পেলে না। ঘোমটা টেনে নিঃশব্দে সে গিয়ে দাঁড়ালো শঙ্করের ঘরে।

'এই যে'—শঙ্করনাথ ব্যস্ত হয়ে নড়ে চড়ে বোসলো; তারপর অনেকক্ষণ কাটলো। গলা পরিষ্কার করে এবার সে বল্ল 'আমি যেখানে থাকি মা-তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে বলছেন, তোমার কাছে অকপটেই স্বীকার করছি যে সেখানে আমি একা থাকি না। যা দরকার, যত টাকা লাগে সব আমি পাঠাবো—আর দয়া কোরে যদি অনুমতি দাও মাঝে মাঝে—' কথার মাঝখানেই সুমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। থমকে গিয়ে শঙ্করনাথ যতক্ষণ দেখা গেল তাকিয়ে রইল সেদিকে, তারপরে দুই হাতে মুখ লুকালো।

এর পরে আর তিন দিন ছিল শঙ্করনাথ। শাশুড়ি গেলেন কাশী, সুমিতা এলো বর্ধমান। কিন্তু বর্ধমানে সে টিঁকতে পারলো না। শতস্মৃতিবিজড়িত সেই তালাবন্ধ বাড়িটি তাকে আবার টেনে আনলো কল্‌কাতা। বুড়ো বাপকেও ধরে নিয়ে এলো সে। এই বাড়ি, এই বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাবের মধ্যে পর্যন্ত তার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ জড়ানো, এ ছেড়ে সে যাবে কোথায়? এখানে আসবার কয়েকদিনের মধ্যেই শঙ্করনাথের কাছ থেকে দু'শো টাকার একটা মণিঅর্ডার এলো। সুমিতা সেটা ফিরিয়ে দিতেই তার বাপ বল্লেন 'সুমি, এটা কি ভাল করলি? অভিমান তো পেট মানবে না মা—আমি মাত্র চল্লিশটা টাকা পেন্‌সন্ পাই—'

সুমিতা বল্ল 'বাবা, এর চেয়ে যে ভিক্ষে করাও ভাল।' তার বাবা চুপ কোরে রইলেন।

পরের মাসে আবার এলো। এবার খামে ভরা চেক্। ছোট্ট দু লাইন লেখা ছিল তার মধ্যে 'গ্রহণ কোরো'—লেখাটা সুমিতা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো—চোখ সজল হয়ে উঠলো তারপর আস্তে আস্তে চেকটি কুচি কুচি কোরে ছিঁড়ে রাস্তা গলিয়ে ফেলে দিল।

সন্ধ্যাবেলা সে তার বাবাকে বল্ল 'বাবা, এতগুলো ঘর দিয়ে কি হবে—ছোট একটা দিক রেখে বাকীটা ভাড়া দিয়ে দি।'

বাবা কথাটা শুনে নিজের মধ্যেই মগ্ন হয়ে রইলেন। সহাস্যে সুমিতা বল্ল 'তুমি বুঝি ভাবছ আমার কষ্ট হবে? কিন্তু কষ্ট হবে না—তাই ভাল বাবা—বাড়িটা একটু প্রাণ পাবে। কি রকম খাঁ খাঁ করে দেখছো না?' বড় অংশটা ভাড়া দেওয়া হলো। কিন্তু ত্রিশ টাকার বেশী পেলো না। সুমিতা তাইতেই খুশী—। দুঃখের দিন গড়িয়ে গড়িয়ে কাটলো পাঁচ বছর। এবার সুমিতার বাবা একদিন বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে বল্লেন, 'সুমি, আমার একটা কথা তোকে রাখতেই হবে—বল্ রাখবি?'—বৃদ্ধ সুমিতার হাত চেপে ধরতেই সে চমকে উঠলো। 'বাবা, তোমার হাত এত গরম কেন? দেখি তো।'—তাড়াতাড়ি সে বাবার কপালে বুকে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে বিমর্ষ হয়ে বল্ল 'বাবা তোমার জ্বর হয়েছে, কেন তুমি বেরিয়েছিলে এই বৃষ্টির মধ্যে—কদিন থেকেই দেখছি কোথায় যেন তুমি যাও, কি যেন তুমি ভাব'—

চোখ বুজে বৃদ্ধ বল্লেন 'সুমি আমি সব খবর জেনে এসেছি আজ—তুই আমার কথা রাখ সুমি, তুই চলে যা ওর কাছে—কলেজে ও মস্ত লোক—তার কত মান কত প্রতিপত্তি—তাছাড়া তাছাড়া'—ইতস্ততঃ করে তিনি বল্লেন—'তাছাড়া ও সেখানে একাও আছে।'—

'বাবা, তুমি শোও'—গম্ভীর মুখে সুমিতা বাপকে শুইয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

ভাল আছেন, ভাল থাকুন—এ ছাড়া আর তো কোন প্রার্থনা নেই সুমিতার। বাবার স্নেহোদ্বিগ্ন মুখখানা দেখে ভারি আঘাত লাগলো তার। মনটা কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। দ্রুত পায়ে নেমে এসে বল্ল 'রামশরণ, তুমি একজন ডাক্তার নিয়ে এসো এখনি—বাবার বড্ড জ্বর হয়েছে।'

কিন্তু সুমিতার সকল প্রার্থনা সকল আশা ব্যর্থ করে বৃদ্ধ পনেরো দিনের দিন শেষ নিঃশ্বাস ফেল্লেন। আর তারি দু' মাস পরে শঙ্করনাথ ফিরে এলো এখানে। কিন্তু ও কেন এলো? সে কথাই সুমিতা ভেবে পায় না।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে শঙ্করনাথের যথেষ্ট বেলা হয়ে গেল। চোখ চেয়েই সে দেখতে পেল মাথার কাছে টিপয়ের উপর ঢাকা চা পড়ে আছে, সামনে রামশরণ দাঁড়িয়ে। রামশরণ বল্ল, 'আজ্ঞে, এবার ডিমটা নিয়ে আসি—ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল দেখে'—

'না, না কিছু দরকার নেই ডিমে'—খাটের বাজু থেকে পাঞ্জাবীটা টেনে গায়ে দিয়ে এক কাপ চা ঢেলে নিলেন।

রামশরণ বল্ল, 'আজ্ঞে আপনার চাবিটা কাল থেকে মার কাছে ছিল'—হাত বাড়িয়ে চাবিটা রাখলো খাটের কোনে। শঙ্করনাথ সেদিকে না তাকিয়েই বল্ল, 'চাবিটা আমি কোথায় রাখবো, মার কাছেই রাখতে বল গিয়ে। আর বল সকাল বেলায় খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি—কিছু যেন না করেন।' বিস্মিত রামশরণকে হতভম্ব করে দিয়ে শঙ্করনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো; বারান্দায় এসেই দু'পা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লেন 'আমার কাপড় চোপড় বার করে দিতে বোলোতো মাকে।' 'আজ্ঞে, আপনার স্যুটকেস্ তো মা উপরে পাঠিয়ে দিয়েছেন—সেই জন্যেই তো চাবিটা পাঠিয়ে দিলেন—আর ওর মধ্যে আপনার ব্যাগটাও আছে।' শঙ্করনাথ থমকে দাঁড়ালেন—কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বল্লেন; 'ও, আচ্ছা যাও তুমি।'

সকালবেলা উঠেই শঙ্করনাথের স্নান করা অভ্যাস—বাথরুম পর্যন্ত গিয়েও আর স্নান করা হো'লোনা।

ভেতরে এসে বিরাট স্যুটকেসটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অভিমানে তার দুই চোখে জল ভরে উঠলো।

নীচে রান্নাঘরে বোসে সুমিতা সমস্ত কথা শোনা সত্ত্বেও ময়দায় ঘি ঢাললো। খাবে না!—খাবে না কেন? কবে থেকে বাবুর সকালবেলায় আহার গেল? চা! চা না খেয়ে যেন সে থাকতে পারে। নিশ্চিন্ত মনে সে খাবার তৈরী করতে লাগলো। রামশরণ এসে বল্ল 'মা, এসব করছেন কেন? বাবু বারণ করলেন।' সুমিতা একবার রামশরণের মুখের দিকে তাকিয়ে সিঙাড়ায় পুর দিল। একটু পরে বল্ল' 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। তুমি একটু অপেক্ষা করে খাবারটা দিয়েই—তার পর বাজারে যেয়ো। শোন, আজকাল বাজারে মাছ টাছ তো মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না। চাঁদা মাছ পাওয়া যায়? বাবু খুব চাঁদা মাছ খেতে—' হঠাৎ থেমে গিয়ে—'চাঁদা মাছটা খেতে তো ভালই, দেখতেও বেশ।' আর আসবের ভাল মাংস দুটো ডিম এনো—এই আনতে ভুলোনা' কিন্তু, বলতে বলতে রামশরণের মুখের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জা পেল সুমিতা; তাড়াতাড়ি বল্ল, 'এই সব আর কি—একটু দেখে শুনে বাজার কোরো—পুরুষ মানুষের খাওয়া তো, বুঝলে না!'

রামশরণ নিঃশব্দে মাথা নাড়লো। সন্ধ্যাবেলা শঙ্করনাথ বল্লে, "আমার বিছানা আজকে নীচে পেতো—আমি উপরে শোব না।"

রামশরণ মাথা চুলকে বল্লে। এজ্ঞে ?

'যা বলি তাই কর রামশরণ! আমি একটু বেরুচ্ছি, ফিরতে দেরী হতে পারে।'

সুমিতা কিছুতেই বিছানা নীচে আনতে দিলনা। বেচারা রামশরণ এদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে মনে নানা কথা ভেবে চুপ কোরে রইল। বাহিরে ফিরে শঙ্করনাথ যখন দেখলো তার বিছানা উপরেই আছে তখন সে বিনাবাক্যব্যয়ে সুমিতার বিছানার উপরেই হাত পা ছড়ালো।

এই নাকি সুমিতার বিছানা? চাদর তুলে শঙ্করনাথ দেখলো—তলায় একটি কম্বল, আর তার তলায় শতরঞ্চি। শিয়রে বালিশ কই? একটা নিঃশ্বাস পড়লো শঙ্করনাথের! বাহিরে থেকে উঠেও সে উপরে গেলনা।

সেই শক্ত কম্বলের বিছানায়—হাতের উপর মাথা রেখে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। একে মেঝের বিছানা তার উপর তোষক নেই, বালিশ নেই—অত্যন্ত কষ্ট হল তার—ক্রমে রাত বাড়লো, বাড়িঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল, এক সময়ে তার চোখও জড়িয়ে এলো ঘুমে।

হঠাৎ শেষরাত্রিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল কে যেন এইমাত্র তার শিয়রে দাঁড়িয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে তার মাথার তলায় দুটি নরম বালিশের আরাম অনুভব করে লাফ দিয়ে উঠে বসলো। তারপর আর একমুহূর্তও দেরী না করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো উপরে। নিঃশব্দে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আবছা আলোয় সে দেখলো সুমিতা খাটিতে দু'হাতে-মুখ ঢেকে বসে আছে—তার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগে ফুলে ফুলে উঠছে তার দেহ। সমস্ত পিঠময় পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মত চুল ছড়ানো। শঙ্করনাথ চৌকাঠ পার হয়ে আস্তে আস্তে তার কাছে এলো। গভীর স্নেহে পিঠের উপর হাত রেখে নিজের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করে ডাকলো, 'সুমিতা।' চমকে উঠে সুমিতা মুখ তুলে পর মুহূর্তেই কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেল্লে মুখ।

জোর করে শঙ্করনাথ তার মুখের কাপড় সরিয়ে দিল। সুমিতার দুইচোখ বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। শঙ্করনাথ মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে তারপর—পাখীর মত ছোট নরম মানুষটিকে অনায়াসে বহন করে এনে খাটের উপর শুইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

পল্লীর পত্র

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পল্লীগৃহে এসেছি ফিরিয়া,
দাঁড়ায় মাটির খাঁটি মালিকেরা আমারে ঘিরিয়া।
না চিনে আমারে তেড়ে এল বেঁড়ে কুকুরের দল,
লাঠি দেখে দূরে থেকে ঘেউ ঘেউ করে কোলাহল।
পানা পচা পুকুরের সোঁদা গন্ধে ভ'রে গেল নাক,
বহুদিন পরে, পুন শুনি বুনো শিয়ালের ডাক।
দাদুরীর কলরোল রাত ভ'র, কে বলে অসহ?
ছাড়িলা কাটে না তার, কাটে বটে কর্ণের পটহ।
দিনে মাছি ভন্‌ভনে, রাতে মশা করে ঐক্যতান,
পালা ক'রে ঝিঁ ঝিঁ সাথে শুনাতেছে আগমনী গান।
অঙ্গে চ'ড়ে আরশুলা অবিরত জানায় আদর,
দোরে ঘুরে মাকড়শা, তাঁত তার পায়ের চাদর।
কেঁচো ও কেন্নুই লুটে পদতলে, চলি যবে পথে
মাটির সন্তানগণে বাঁচাইয়া হাঁটি কোন মতে।
সাড়া হ'তে ধূল ঝরে খোলা চোখে, খাটে যবে শুই
সজ্জিত মাটির অর্ঘ্য বর্ষে মুখে চা'ল হ'তে উই।
প্রতি খাদ্যে দেখা পাই পিল পিল পিপীলিকা দলে,
স্বাগত জানায় মোরে ছারপোকা বহি শয্যা তলে।
গুব্‌রে পোকার সাথে শ্যামা পোকা, উচ্চিংড়ে ঘুর্ঘুরে,
সন্ধ্যা হ'লে মহানন্দে দলে দলে মোরে ঘেরি উড়ে।

বহুদিন পরে আজ শুনি পুন ছুঁচোর কীর্ত্তন,
গণেশের বাহনেরা চারি পাশে করিছে নর্ত্তন।
দাদ, চুলকানি, খোস, প্যাচড়ার কীটাণুর দল,
অলক্ষ্যে আসিয়া মোর প্রতি অঙ্গে শুধায় কুশল।
মাথায় শকুন সম উকুনেরা বাঁধিছে কুলায়,
সোঁয়া দিয়ে শুঁয়া পোকা খেলা গায়ে পরশ বুলায়।
যা ভাবি এখানে এসে সবি তার সত্য বলা চলে,
কারণ দিবস রাত্রি টিকটিকি 'ঠিক ঠিকই' বলে।
নামিলে পুকুর জলে জোঁক গুলি লেগে রয় গায়,
আমার রক্তের চাপ বেশী জেনে চুষিয়া কমায়।
বিছার চুমনে মিছা অন্ধকারে সাপে কাটা বলি'
ভুল করি ভয়ে মরি, পড়শীরা হেসে পড়ে চলি'।
সাপ ঘুরে আশে পাশে মিথ্যা নয়, পল্লীভ্রাতা তারা,
দংশেনি আমারে কেউ, মিছে আমি ভয়ে হই সারা।
তাদের চেয়ে বেশী বিষ যার তারে নাহি ভয় পাই,
সঙ্গে আছে পিসিতুতা কূটনিনী যাকে তাকে খাই।
প্রবাসী আত্মীয় আমি ফিরিয়াছি বহু দিন পরে,
পল্লীর সন্তানগণ ঘেরি মোরে মহোৎসব করে।
পল্লী বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত আছি, সম্পাদক ভায়া,
কবিতা চেয়েছ বটে, ছেড়ে দাও কবিতার মায়া।

শরভপুরেশ্বর নরেন্দ্রের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএইচ-ডি

গত ফাল্গুন মাসের মধ্যভাগে কয়েকদিন আমি বগুড়া জেলার অন্তর্গত কলাইকুড়ি গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত ছিলাম। ঐ লিপির তারিখ গুপ্তাব্দের ১২০ বর্ষ, অর্থাৎ ৪৩৯ খৃষ্টাব্দ। উত্তর বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে কলাইকুড়ির তাম্রশাসন দামোদরপুর, পাহাড়পুর, বাইগ্রাম ও নন্দপুরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপিসমূহের ন্যায় মূল্যবান্। লিপিটির পাঠ এবং ব্যাখ্যা সম্বলিত একটী বাংলা প্রবন্ধ যেদিন শেষ করিলাম, সেইদিনই অপর একখানি মূল্যবান্ তাম্রপট্টের প্রতিলিপি আমার হস্তগত হয়। ঐ দিনের চিঠিপত্রগুলির মধ্যে একখানি মধ্যপ্রদেশ হইতে আসিয়াছিল। দেখা গেল, উহাতে একজন পুরাতত্ত্বানুরাগী ব্যক্তি আমাকে একখানি নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কারের সংবাদ দিয়াছেন এবং পাঠোদ্ধারের জন্য পত্রের সঙ্গে নবাবিষ্কৃত শাসনের সীলমোহর ও প্রথম ফলকের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। প্রতিলিপি হইতে বুঝিলাম, তাম্রশাসনটীর কোন অংশই বিকৃত হয় নাই। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ সীলমোহর এবং প্রথম পৃষ্ঠার পাঠোদ্ধার হইয়া গেল। লিপিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। প্রকৃতপক্ষে তাম্রশাসনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ অংশেরই প্রতিলিপি আমাকে পাঠান হইয়াছিল।

তাম্রশাসনটী চতুষ্কোণ পেটিকাকারের মাত্রাসম্বলিত অক্ষরে (box-headed script) উৎকীর্ণ। মধ্যভারতের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর লেখমালায় এইরূপ লিপির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। লিপির দিক হইতে বর্তমান তাম্রশাসনটীকে বেরার অঞ্চলের বাকাটকগণ, শরভপুরের রাজগণ এবং দক্ষিণ কোশলের পাণ্ডববংশীয় আদি নরপালগণের লেখমালার সহিত তুলনা করা যায়। আবার ইহার সীলমোহরের নিম্নাংশে যে শ্লোক আছে, উহাও পূর্বোক্ত রাজগণের মোহরে ব্যবহৃত পরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকের অনুরূপ। শ্লোকটী এই—

খড়্গ বারিজিতভুবঃ শরভপ্রাপ্তজন্মনঃ।
নৃপতেঃ শ্রীনরেন্দ্রস্য শাসনং রিপুশাসিনঃ।

অর্থাৎ, "ইহা সেই শত্রুদমনকারী নরপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের তাম্রশাসন, যিনি অসিধারার সাহায্যে ভূমণ্ডল জয় করিয়াছেন এবং শরভ হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন।" শরভপ্রাপ্তজন্মা কথাটির অর্থ—শরভের পুত্র। শ্লোকটীর প্রথম চরণে ছন্দোভঙ্গ দোষ দেখা যায়। যাহা হউক, এই শ্লোকের রচনাভঙ্গীর সহিত বাকাটক, শরভপুরীয় এবং পাণ্ডববংশীয় কোশলরাজগণের পরিচয়জ্ঞাপক শ্লোক তুলনীয়।

১। বাকাটক রাজ দ্বিতীয় প্রবরসেনের সীলমোহরে—
বাকাটকললামস্য ক্রমপ্রাপ্ত-নৃপশ্রিয়ঃ।
রাজ্ঞঃ প্রবরসেনস্য শাসনং রিপুশাসনম্।

২। প্রবরসেনের মাতা প্রভাবতী গুপ্তার সীলমোহরে—
বাকাটকললামস্য ক্রমপ্রাপ্ত নৃপশ্রিয়ঃ।
জনন্যা যুবরাজস্য শাসনং রিপুশাসনম্।

৩। শরভপুরের জয়রাজের সীলমোহরে—
প্রসন্নহৃদয়স্যৈব বিক্রমাক্রান্তবিদ্বিষঃ।
শ্রীমতো জয়রাজস্য শাসনং রিপুশাসনম্।

৪। শরভপুরের সুদেবরাজের সীলমোহরে—
প্রসন্নহৃদয়স্যৈব বিক্রমাক্রান্তবিদ্বিষঃ।
শ্রীমৎসুদেবরাজস্য শাসনং রিপুশাসনম্।

৫। দক্ষিণকোশলের পাণ্ডববংশীয় তীবরদেবের সীলমোহরে—
শ্রীমত্তীবরদেবস্য কোশলাধিপতেরিদম্।
শাসনং সর্ব্বকৃত্যেষু স্থিরমাচন্দ্রতারকম্।

যাহা হউক, রাজা নরেন্দ্রের সহিত শরভপুরের নৃপগণেরই সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজগণের সীলমোহরের ঊর্দ্ধভাগে গজলক্ষ্মী মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। বর্তমান তাম্রশাসনের মোহরেরও ঊর্দ্ধাংশে গজলক্ষ্মী মূর্ত্তি আছে। আবার শরভপুররাজগণের তাম্রশাসনসমূহ তাঁহাদের রাজধানী শরভপুর নগর হইতে প্রদত্ত হইত; বর্তমান লিপিটিও ঐ একই স্থান হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং রাজা নরেন্দ্রও শরভপুরেশ্বর ছিলেন। তাঁহার তাম্রশাসনের প্রথম ফলকের প্রথম পৃষ্ঠার পাঠ এইরূপ—

১। ও স্বস্তি (।০) শরভপুরান্মহারাজশ্রীনরেন্দ্রঃ
২। নন্দপুরভোগীয়-শর্করাপদ্রকে ব্রাহ্মণা—
৩। দীন্ প্রতিবাসিকুটুম্বিনো বোধয়তি (।০)
৪। এষ গ্রামো রাহুদেবেন স্বপুণ্যাভিবৃদ্ধ-
৫। যে ব্রাহ্মণ বাজসনেয় আগ্নিবেশ্যগোত্র (০ লেখোচ্ছেদ ০)

শরভপুরের নৃপগণের মধ্যে প্রসন্নমাত্র, তাঁহার পুত্র জয়রাজ ও মানমাত্র এবং মানমাত্রের পুত্র সুদেবরাজ ও প্রবররাজের নাম জানা গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে জয়রাজ ও সুদেবরাজ শরভপুর হইতে এবং প্রবররাজ শ্রীপুর হইতে শাসন দান করিয়াছেন দেখা যায়। অন্য রাজগণের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। পূর্বোক্ত পাণ্ডববংশীয় রাজগণ এই শরভপুরের রাজবংশকে উৎসাদিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তীবরদেবের তাম্রশাসনও শ্রীপুর হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।

শ্রীপুর বর্তমান মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার অন্তর্গত এবং রায়পুর শহর হইতে ৪০ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত সিরপুর নামক স্থান। শরভপুরের অবস্থান নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। তবে সম্ভবতঃ ইহা শ্রীপুর হইতে বহুদূরে অবস্থিত ছিল না। বোধহয়, প্রবররাজ পিতৃপুরুষের প্রাচীন রাজধানীর সন্নিকটেই নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ নরেন্দ্রের তাম্রশাসন শরভপুর হইতে প্রদত্ত হইয়াছে; আবার তাঁহার পিতার নাম শরভ। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে এই শরভই শরভপুর নামক নগরের প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য সীল মোহরের শ্লোকটীতে তাঁহাকে রাজা বলা হয় নাই; কিন্তু ছন্দোবদ্ধ রচনায় এই ত্রুটী মারাত্মক নহে। যদি বিশ্বাস করা যায় যে রাজা শরভের নামানুসারে তদীয় রাজধানীর শরভপুর নামকরণ হইয়াছিল, তাহা হইলে এই শরভ এবং তৎপুত্র নরেন্দ্রকে পূর্বোল্লিখিত শরভপুর রাজবংশের প্রথম দিকে অর্থাৎ প্রসন্নমাত্রেরও পূর্বে স্থান দিতে হইবে। মহারাজ নরেন্দ্রের সহিত প্রসন্নমাত্রের কি সম্পর্ক ছিল, নূতন আবিষ্কার না হইলে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

এই সম্পর্কে আরও একটী অনুমানের অবসর আছে। ৫১০ খ্রীষ্টাব্দের তারিখ সম্বলিত এরাণের একখানি শিলালিপিতে গুপ্তবংশীয় সম্রাট ভানুগুপ্তের একজন সামন্তের উল্লেখ আছে। তাঁহার নাম গোপরাজ; সম্ভবতঃ তিনি পূর্বমালবের অথবা উহার নিকটস্থ কোন জনপদ শাসন করিতেন। শিলালিপিতে তাঁহাকে শরভরাজের দৌহিত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এরাণলিপির শরভরাজ এবং শরভপুরপতি মহারাজ নরেন্দ্রের পিতা শরভ অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। এই অনুমান সত্য

হইলে মহারাজ শরভ পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। এই লিপির অনুসারে শরভপুরেশ্বরগণের এবং পরবর্ত্তী পাণ্ডুবংশীয় কোসলরাজগণের মোটামুটি কালনির্ণয় সম্ভব। সম্ভবতঃ প্রসন্নমাত্র হইতে প্রবররাজ পর্য্যন্ত শরভপুরপতিগণ প্রায় সকলেই ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগেই শরভপুরেশ্বরদিগের নব রাজধানী শ্রীপুর পাণ্ডুবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। পাণ্ডব-বংশীয়েরা মূলতঃ শ্রীপুরের অধিপতি ছিলেন না। কিন্তু কোন্ পাণ্ডব নরপতি কোন্ শরভপুরেশ্বরের হস্ত হইতে শ্রীপুর কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তবে পাণ্ডুরাজ তীবরদেব সম্ভবতঃ শ্রীপুরপতি প্রবররাজের অধিক পরবর্ত্তীকালের লোক ছিলেন না। আমি অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে তীবরদেব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন; কারণ তিনি অন্ধ্র দেশের বিষ্ণুকুণ্ডীবংশীয় প্রথম মাধববর্ম্মার (৫৩৫-৫৮৫ খ্রীঃ) সহিত বিগ্রহে লিপ্ত হন। সুতরাং বোধহয় তীবরদেবই প্রবররাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

কথা

শ্রীসুবোধ ঘোষ বি-এ

থার্ড মাষ্টার যতীশবাবু অঙ্ক কষাইতেছিলেন। ছেলেদের দিকে পেছন করিয়া এক মনে খস্ খস্ করিয়া লিখিয়া যাইতেছিলেন। সব চুপ-চাপ। হঠাৎ একটি ছেলে দাঁড়াইয়া উঠিল। দেখিতে সুশ্রী। রং কালো হইলেও মুখখানা লাবণ্যময়। মোটা-সোটা—আঁট-সাট গড়ন। বলিল—'স্যার'।

যতীশবাবু মুখ ফিরাইলেন না। এক মনে অঙ্ক করিয়া যাইতে লাগিলেন। আবার ছেলেটি ডাকিল, "কালকের সে প্রবলেম্‌টা বুঝিয়ে দেবেন স্যার?"

'পরে হবে'—বলিয়া শিক্ষক মহাশয় দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহার কার্য্যে মন দিলেন।

'বুঝেছি স্যার সেটা আপনি পারবেন না'! বলিয়া ছেলেটি ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই যতীশবাবু হাতের চক্‌খানা ছেলেটির দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। বেঞ্চের ধারে লাগিয়া চকখানা গুঁড়া হইয়া গেল। তিনি কতক্ষণ ছেলেটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন;—তারপর বলিলেন—'এমন কথা কেউ বলতে সাহস করে নি যতীশ ঘোষালকে এই দশ বছরের মধ্যে—শুধু আজ—'বলিয়া দ্রুতবেগে তিনি ক্লাস হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

থার্ড মাষ্টারের এই রূপ কেহ দেখে নাই—বিশেষ করিয়া সদাহাস্যময় পুরুষের ঐ রকম চক ছুঁড়িয়া মারা যেমন আকস্মিক তেমনি অভিনব! ছেলেরা সকলে মিলিয়া ঐ ছেলেটিকে ঘিরিয়া ধরিল—'তুই যে অমন কথা বলবি কালী তা আমরা ভাবতেই পারি না। যতীশবাবুর মত লোককে এমন কথা—তোর চ'স কি—বলত'!'

কালিদাস কোন কথা বলিতে পারিল না। সে যে অপরাধ করিয়াছে তাহা তাহার চোখ-মুখ দেখিয়াই বোঝা যায়।

তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

তাহার মুখের অবস্থা দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারিবে না, সে অমন কথা বলিতে পারে। নিতান্ত গো-বেচারী মানুষ—ক্লাসে ও কথা বলে খুব কম। ছেলেরা চাপ দিল যে তাহাকে ক্ষমা চাহিতে হইবে। সে স্বীকার করিল। কিন্তু শিক্ষকদের বসিবার ঘরের নিকট যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কি বলিবে সে? 'ক্ষমা করুন স্যার'—না, এমন কথা সকলের সামনে সে বলিবে কি করিয়া। তার কেমন যেন লজ্জা করিল। ছুটির পরই বলা যাইবে। কারণ তখন একেলা থাকিবেন। কিন্তু ছুটির পরও সে যাইতে সাহসী হইল না। ভাবিল যদি বেশী হইয়াছে বলিয়া তিনি রাগ করেন? তখন! অবশেষে ছেলেরা তাহাকে এক রকম টানিয়া লইয়া গেল যতীশবাবুর কাছে। নীরবে মাথা হেঁট করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না!

ছাত্র শিক্ষকের মনোমালিন্য ঘুচিয়াও ঘুচিল না!

এমনি অনেক ছোট-বড় ঘটনা তাহার আঠারো বছরের জীবনকে ভরিয়া রাখিয়াছে। কথা বলিবার পূর্ব্বে সে বুঝিতে পারে না যে সে কত বড় কথা বলিতে যাইতেছে। মুখ হইতে কথাটা বাহির হইয়া গেলে সে তাহার গুরুত্ব বুঝিতে পারে। পরকে আঘাত দিবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সে আঘাত দিয়া বেদনা পায়। নিজের এই স্বভাব সে ফিরাইতে চায়। লোকের সঙ্গে কথা বলিতে চায় কারণে অকারণে। সে অসুবিধায় পড়ে, বক্তব্য বিষয় দুই কথায় শেষ করে, অথবা বেশী কথা বলিতে গেলে লোকে অনেক সময় মনোযোগ দেয় না, শ্রোতা শুনিতে চায় না অথচ সে বলিতে চায়—এমন অবস্থা হইলে অস্বস্তি অনুভব করে। সে মিশুক হইতে চায়—পারে না। তার জড়তা কাটে না। অনেক করিয়াও সে তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। তাই যখন কর্ম্ম-কোলাহল মুখর কলিকাতাতে সে আসিল তখন সে খেই হারাইয়া ফেলিল। গ্রামে সে চুপচাপই থাকিত; তাহাতে বাধা ছিল না—কিন্তু এখানে তা চলিবে না কারণ এখানে ত' কথা বেচিয়া খাইতে হয়। তাই কালিদাসের বাবা যখন লিখিলেন, 'তোমার পড়ার খরচ আমি দিতে পারি কিন্তু থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা তোমাকে করিতেই হইবে';—তখন কালিদাস পড়িল মহা বিপদে। কি করা যায়! ভাগ্য তাহার সুপ্রসন্ন তাই দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইল না; কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনেই তাহার গৃহশিক্ষকের কাজ জুটিয়া গেল।

ভদ্রলোক অতি ভালমানুষ; বেশী কথা বলেন না। ব্যবসায়ী লোক হইলে কি হইবে, শিক্ষিতের সবগুলি চরিত্রগুণই গজেন্দ্রবাবুর আছে। বিনা বাক্যব্যয়ে হয়তো বা কালিদাসের মুখচোরা ভাব

দেখিয়া তাঁহাকে নিয়োগ করিয়াছেন। কালিদাস হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। রূপকথার রাজপুত্রের মত কে যেন তাঁহাকে মেসের কেরোসিন কাঠের তক্তপোষের উপর হইতে সোনার পালঙ্কে বসাইয়া দিল!

গজেনবাবুর স্ত্রী বড় ঘরের মেয়ে। বিবাহও হইয়াছে বড় লোকের সহিত। সংসারে স্বামী আর দুইটি ছেলেমেয়ে। দিনগুলি তাঁহাদের বেশ কাটে। কলিকাতায় প্রকাণ্ড বাড়ী—দেউড়িতে দরোয়ান, গাড়ী, কিছুরই অভাব নাই তাঁহার। সদা হাস্যময়ী আনন্দের প্রতিমা।

কালিদাসকে আনিয়া গজেনবাবু স্ত্রীকে বলিলেন, 'এই নেও তোমার মনো ও সবির গুরু—যাও তুমি, উনি সব ব্যবস্থা ঠিক করে দেবেন।' বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

এমন অবস্থায় যে তাহাকে পড়িতে হইবে তাহা কালিদাস ভাবে নাই। অন্তঃপুরে এক অপরিচিত মহিলার সম্মুখে সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল! এই রকম বিপদে বোধকরি সে জীবনে পড়ে নাই!

গজেনবাবুর স্ত্রী প্রতিমা দেবী ছেলেটির দিকে চাহিলেন; বোধহয় তাঁহার বয়সটা অনুমান করিলেন, তারপর হাসি মুখে বলিলেন, 'এস ভাই এখানে—ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন—এসো আমার সঙ্গে,' —বলিয়া তিনি হাঁক দিলেন—'ওরে মনো—ওরে সবি—দেখে যা কে এসেছে'।

উপরের দোতলা হইতে দুড়্-দুড়্ করিয়া দুইটি ছেলে-মেয়ে নামিয়া আসিল। ছেলেটি বড়, মেয়েটি ছোট। ছেলেটির বয়স সাত আট বছরের বেশী হইবে না। মেয়েটি দু'-এক বছরের ছোট হইবে।

কালিদাসকে লইয়া প্রতিমা দেবী একটি সুসজ্জিত কক্ষে আসিলেন। 'এই ঘরে তুমি থাকবে আর ওরা পড়বে। এই দেখ, তোমাদের মাষ্টার মশাই।'

মনোহন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাহার নূতন শিক্ষককে দেখিতে লাগিল। সবিতা দৌড়াইয়া গিয়া কালিদাসকে জড়াইয়া ধরিল ও কানের কাছে মুখ দিয়া আস্তে আস্তে বলিল—'জানো আমার বাক্সটা দাদা ভেঙে দিয়েছে, আমাকে একটা পুতুলের বাক্স কিনে দিও, দেবে ত' ?'

কালিদাস কি বলিবে! সে ভাবিতেও পারে নাই যে এমন করিয়া মেয়েটা তাহার কাছে আসিতে সাহস করিবে। তাহার মুখ হইতে অস্ফুট একটা স্বর বাহির হইল, 'আচ্ছা দেব'।

প্রতিমা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এর আগে কোথায় ছিলে তুমি ?'

'কলুটোলার একটা মেসে।'

'তোমার দেশ কোথায় ?'

'বাইনান—২৪ পরগণায়।'

'ও' বলিয়া প্রতিমা দেবী একটু চুপ করিলেন।

'ওখানে আমারও আত্মীয় আছে'।

'আপনার বাপের বাড়ী বুঝি ?' কালিদাস ফস করিয়া বলিয়া বসিল। বলিয়াই সে লজ্জায় মরিয়া গেল। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলিবার রীতি তাহার জানা নাই। নীরবে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। প্রতিমাদেবী বুঝিলেন।—কিন্তু হাসিয়া বলিলেন, 'ও গ্রামে নয়—তবে ঐ জেলাতেই আমার বোনের বিয়ে হয়েছে।' তারপর কথার মোড় ফিরাইয়া দিলেন—'তা হলে তোমার বিছানা এখানে করতে বলে দেব। পাশেই বাথরুম আছে—কোন অসুবিধা হবে না তোমার, হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও। তার পর বইটই গুলো গুছিয়ে নিও।'

ঘাড় নোয়াইয়া সে শুধু বলিল—'আচ্ছা'।

প্রতিমাদেবী লাজুক ছেলেটিকে আর ঘাঁটাইলেন না। নিজের ঘরে যাইয়া চাকরকে দিয়া সব বন্দোবস্ত ঠিক করাইয়া দিলেন।

এই গেল প্রথম পরিচয়ের পালা। কয়েকদিন বাদেই নূতন পরিস্থিতিটা তাহার গা সওয়া হইয়া আসিল। ছেলেমেয়েদের রীতিমত পড়াইতে লাগিল কালিদাস। শিক্ষকতার দিক দিয়া তাহাকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। খাওয়া-দাওয়ার দিক দিয়া ত' সে রাজার হালে আছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য দিক দিয়া।

বাড়ীর সবাই তাহাকে আপন লোক বলিয়াই মনে করিত। তাই তাহার সঙ্গে মৌখিক একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। মনে মনে হয়তো সে জোড় জোড় করিয়াছে, কিন্তু তাহার আর সাহসে কুলায় নাই। অন্যের বেলায় যাহা হউক প্রতিমা দেবীর বেলায় সেটা কেমন যেন বেমানান বোধ হইত। প্রতিমাদেবী স্নেহশীলা। ওকে যত্ন করেন ছেলের মত। মনে মনে কালিদাস তাহাকে মাতৃপদ দিতে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু কিছু বলিতে পারে না, তাহার প্রকৃতি বাধা দেয়।

একদিন সে তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ কাজ করিয়া বসিল। মনোহন ও সবিতাকে পড়াইবার সময় সে তাহার সমস্ত জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, 'একটা কথা তোমাদের এতদিন বলি নি।' সে থামিল।

'কি মাষ্টার মশাই ?' মনোহন জিজ্ঞাসা করে।

'তোমার মাকে দেখতে ঠিক আমার দিদির মত! আমি যখন প্রথম দেখলুম তখন চমকে উঠেছিলুম, হুবহু চেহারার সঙ্গে তাঁর মিল দেখে!'

কালিদাসের বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল—যেন কি ভীষণ কথা সে বলিয়া ফেলিয়াছে। সে সবিতার দিকে চাহিল। মেয়েটা মিটি মিটি হাসিতেছিল! হঠাৎ বলিয়া উঠিল—'তাহলে আপনি ত' মাষ্টার মশাই নন, আপনি ত' কালিমামা।' বলিয়া সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

কালিদাস লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বেহায়া মেয়েটা বলে কি? তাহার শরীর রী রী করিয়া উঠিল।

তারপর হইতেই মনোহন ও সবিতা তাহাকে মামা বলিয়া ডাকে। কিন্তু লজ্জার মাথা খাইয়াও সে প্রতিমা দেবীকে দিদি বলিয়া ডাকিতে পারে নাই। গজেনবাবু খুব সন্তুষ্ট তাহার ব্যবহারে। কালিদাসের সঙ্গে নূতন সম্পর্ক পাতানোর জন্য তিনি খুশী হইয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে তাঁহার ছেলেমেয়েদের ও কালিদাসের মধ্যে ছাত্র শিক্ষক সম্বন্ধ ছাড়া আর একটা সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ রচিত হইয়াছে।

প্রতিমা দেবীও অখুশী নহেন, কিন্তু ভাইফোঁটার দিন স্বামী-স্ত্রীতে এক ব্যাপারে মতের অনৈক্য হইল।

ভাই ফোঁটার দিন সকালে সবিতা ছুটিয়া আসিয়া কালিদাসকে বলিল, 'কালিমামা, মা আপনাকে ডাকছেন উপরে। আজকে যে ভাই ফোঁটা! জানেন আপনি?'

'না জানিনে ত'। কি হয় তাতে। ভাইকে ফোঁটা তিলক কেটে বৈরেগী সাজতে হয় বুঝি?' মুখরা মেয়েটার পাল্লায় পড়িয়া এখন সে কথা বলিতে শিখিয়াছে।

'ওমা ভাই ফোঁটা কি তা বুঝি জানেন না—বে—রে বলে দেব সবাইকে।' বলিয়া চঞ্চলা বালিকা হাততালি দিতে লাগিল। তারপর মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল—'আচ্ছা কালিমামা, আপনার বোন নেই?'

'না। ছিল মরে গেছে।'

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কালিদাসের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—'এবার—আমি দেব আপনাকে ফোঁটা কেমন? ফোঁটা দেবার সময় কি বলতে হয় জানেন ত'—

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা—'

কি জানি আর মনে নেই। আচ্ছা দাঁড়ান কাগজটা দেখে আসছি। এখনি মুখস্থ করে ফেলব।' বলিয়া ছুটিতে ছুটিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দোতলা হইতে প্রতিমা দেবী ডাকিলেন, 'কালিদাস তুমি যাও ত' একবার শ্যামবাজারে আমার দিদিকে নিমন্ত্রণ করতে। সেখান থেকে এসে আবার তোমাকে যেতে হবে বাজারে ফুল ও দূর্বা আনতে। অনন্তকে পাঠিয়েছি মিষ্টি কিনতে—তার কতক্ষণ লাগ্বে কে জানে।'

কালিদাস বর্ত্তাইয়া গেল। তাহাকে আপনার জনের মত কাজের ভার প্রতিমা দেবী কোন দিন দেন নাই। স্নেহের পরশ পাইয়া সে নিজেকে ধন্য মনে করিল।

শ্যামবাজার হইতে প্রতিমাদেবীর ভগিনী আসিলেন। দূর্ব্বা, চন্দন, ফুল আনা হইল। বাড়ীতে লুচি ভাজা হইতে লাগিল। রেকাবীতে মিষ্টি সাজাইতে লাগিলেন সবিতার মাসি। কালিদাস কাছে বসিয়া সব দেখিতেছিল। ঘৃতের প্রদীপ জ্বালা হইল। লাল ও শ্বেত চন্দন, ধান দূর্ব্বা শোভিত পুষ্পপাত্র আনা হইল। প্রতিমা দেবী নিজের হাতে ফুল-তোলা আসন আনিলেন। সবিতা পাতিল তার দাদা বসিল। তার পর আরম্ভ হইল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। সবিতা অপূর্ব্ব সুর করিয়া ছড়াগুলি আবৃত্তি করিল। একটুও ভুল করিল না। শ্বেত ও রক্ত চন্দনে মনোরঞ্জনের কপাল ভূষিত হইলে মেয়েরা হুলুধ্বনি করিয়া উঠিল।

কালিদাস দেখিতেছিল। মনে পড়িতেছিল বহুদিন আগে—সেও তাহার দিদিকে নমস্কার করিয়াছিল। দিদির সঙ্গে সে সব সময় ঝগড়া করিত কিন্তু ঐ দিন কেন যেন মনে হইয়াছিল দিদির চাইতে আপনার জন বুঝি আর কেহ নাই। দিদির মুখের ছড়াগুলির অর্থ সে তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তবে 'যম দুয়ারে কাঁটা—' কথাটা তাহার মনে আছে। তখন সে মনে করিত যে, তাহার দিদির মুখের মন্ত্রের জোরেই যমদূত বিপর্য্যস্ত হইবে। দিদি আর নাই!

অনুষ্ঠান শেষ হইল। কালিদাসের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। এখনি তাহাকে ডাক দিবে প্রতিমা দেবী। তাহার নূতন দিদি। প্রদীপের কম্পমান শিখাটির দিকে চাহিয়া রহিল কালিদাস। হঠাৎ প্রদীপটি ফুঁ দিয়া নিভাইয়া দিলেন প্রতিমা দেবী! কালিদাসের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! তবে কি?

প্রতিমা দেবী তাহার দিকে একখানা খাবারের থালা আগাইয়া দিলেন। থালা খানা লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার ঘরে আসিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে গজেনবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। পাশের ঘরে তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে কথা বলিতেছেন। 'কেন তুমি ওকে ফোঁটা দিলে না। আহা বেচারা!—বোন নেই!' 'কেন দেব, এক দিনও ডেকেছে আমাকে দিদি বলে। মুখের কথাটা বলতে ওর এত অপমান—থাকুক ও, ওর মান নিয়ে—'

'মুখের কথাই বেশী হ'ল।'

'হ্যাঁ তাই। আমরা তাই চাই—অত ভেতর কে দেখে যতই হোক' আর শোনা গেল না।

কালিদাস শুনিল।

'যতই হোক'—সে যে মাষ্টার। মুখের কথা বেচিয়াই তাহাকে খাইতে হইবে! সব স্বচ্ছ বলিয়া মনে হইল। সে আর কাঁদিল না। টেবিলের উপর হইতে মূল্যবান খাবারগুলি শেষ করিয়া ফেলিল!

যুদ্ধের গান

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

শুভ্র প্রভাতে তুলিয়া শির
এস কেবা আছ যুব বীর,
দানব দলিতে হও অটল।
হও অটল, হও প্রবল,
সাহসে ভরাও বক্ষতল,
লও তরবারি মুষ্টিতল।

পাপী যত কর সবে বিনাশ,
পুণ্যবানের ঘুচাও ত্রাস,
অত্যাচারীর কর বিফল।

নাশে যেবা আজ মানব-সুখ,
বিদ্ধ করিছে নিরীহ বুক,
তার বুকে হানো তীর প্রবল।

মাতা ও শিশুরে কর হে ত্রাণ,
কর ত্রাণ যত দলিত প্রাণ,
ম্লান মুখে দাও হাসি অমল,
নিপীড়িত পাক্ প্রাণ উজল,
সাহস ও বল।

মার্ক্সবাদ—প্রথম পর্ব

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম-এ, পিএচ-ডি, সি-আই-ই

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে কার্ল মার্ক্সের জন্ম হয়। তিনি জাতিতে ছিলেন জার্মান ইহুদী। তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন ইহুদী পুরোহিত এবং পিতা ওকালতী করতেন। তাঁর বয়স যখন ৬ বৎসর তখন তাঁদের পরিবার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ১৭ বৎসর বয়সে বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন, তার পর বৎসর (১৮৩৬) তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁর জীবনীলেখক Beer বলেন যে তিনি বিধিমত পড়াশুনা করতেন। এই সময় তিনি বিশেষভাবে দর্শনশাস্ত্র, আইন এবং গ্রীক লাটিন অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি কবিতাও লিখতেন এবং তিনখানি কবিতার বই প্রকাশ করেন। তিনি ক্রমশঃ হেগেলের গ্রন্থ পড়তে আরম্ভ করেন। ১৮৩৭ সালে তাঁর পিতার নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন "from the idealism which I had cherished so long I fell to seeking the ideal in reality itself...I have read fragments of Hegel's Philosophy, the strange rugged melody of which had not pleased me. Once again I wish to dive into the midst of the sea, this time with the resolute intention of finding a spiritual nature just as essential, concrete and perfect as the physical, and, instead of indulging in intellectual gymnastics, bringing up pearls in sunlight (1). ক্রমশঃ তিনি গভীরভাবে হেগেলের চর্চা আরম্ভ করেন, তাঁর কবিতার খাতাগুলি পুড়িয়ে ফেলেন এবং ছোট গল্প লিখবার যে কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তা' নষ্ট করেন।

হেগেলের দর্শনশাস্ত্র তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত Dialectic বা বিরোধ-বিপাক-ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ন্যায়ের স্বরূপ বিচার করিতে গিয়ে হেগেল একখানি গ্রন্থ লেখেন, তার নাম Logic (ন্যায়)। এই গ্রন্থে তিনি Dialectic-ন্যায়ের বিশ্লেষণ করেন। ন্যায়শাস্ত্রের সাধারণ বিধিতে 'ভাব' ও 'অভাব' এই দুটি পদার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে পরস্পরকে খণ্ডন করে এবং উভয়ে একত্র কিছুতেই থাকতে পারে না। যদি 'রাম বেঁচে আছে' এই বাক্য সত্য হয় তবে সেই একই কালে রাম সম্বন্ধেই যদি বলা যায় 'রাম বেঁচে নেই', তবে এই দ্বিতীয় বাক্যটি অসত্য হবে। পরস্পর বিরোধী বাক্যের মধ্যে একটি সত্য হ'লে অপরটি মিথ্যা এবং উভয়ে যুগপৎ সত্যও হ'তে পারে না, মিথ্যাও হ'তে পারে না। সত্য ও মিথ্যা, দুটি একান্ত কোটি, এদের অন্তর্বর্তী তৃতীয় কোন কোটি নেই। হয় 'ক', নয় 'ক নয়'—মধ্যবর্তী আর কোন পথ নেই। 'ক' একই সময় 'ক' এবং 'ক নয়' এ হ'তে পারে না। সাধারণ ন্যায়শাস্ত্রে একে বলে Law of Identity, Law of Contradiction, এবং Law of Excluded Middle। কিন্তু হেগেল তাঁর ন্যায়শাস্ত্রে একটি অদ্ভুত প্রণালী আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন যে কোন বিশেষণে অবিশেষিত কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ভাবসত্তা বা শুদ্ধ সত্তা এবং কোন বিশেষণে অবিশেষিত শুদ্ধ অসত্তা এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আমরা কোন কল্পনা বা চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার করতে পারি না। সত্তা এবং অসত্তায়, বিশেষণ থাকায় (অর্থাৎ, এ সৎ বা এ অসৎ, এরূপ ভাবে সৎ বা অসৎভাবের যখন কোন বিশেষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়) যে বিরোধই দেখা যাক্ না কেন, বিশুদ্ধ সত্তা ও বিশুদ্ধ অসত্তার মধ্যে কোন বিরোধ' দেখান যায় না। যদি বিরোধ দেখান সম্ভব না হয় তবে বিশুদ্ধ সত্তা ও বিশুদ্ধ অসত্তা এই উভয়ের আত্যন্তিক ঐক্য স্বীকার না করে' উপায় নেই; অথচ, সত্তা এবং অসত্তাকে যুগপৎ ঐক্যসূত্রে দেখতে গেলে আমরা একটা বিরোধের আভাস পাই। এই বিরোধের আভাসই ক্রিয়ারূপে আমাদের নিকট প্রকাশ পায় এবং এই ক্রিয়ার ফলে বিশুদ্ধ সত্তাকে আমরা ক্রিয়াশীল সংরূপে অনুভব করতে পারি। এই প্রণালীতে আলোচনা করে' আমাদের দৈহিক জগতের যাবতীয় পদার্থই যে স্বগর্ভবিরোধের স্বকীয় স্বাভাবিক বিপাকে ক্রমধারায় পরিণত হয়েছে হেগেল এ দেখাতে চেষ্টা করেন। হেগেল প্রবর্তিত Dialectic-ন্যায়কে অবিরোধ-ন্যায়ের (Law of Contradiction) বিরুদ্ধ বলা যায় না; কারণ কোন বস্তুর লক্ষণ দিতে গেলেই সেই লক্ষণের মধ্যে তার ব্যাবর্তক ধর্ম সন্নিবেশিত করতে হয়। ব্যাবর্তক ধর্মের উল্লেখ না করে' কোন লক্ষণের নির্বচন করা যায় না। যদি বলি, 'জীবন নশ্বর' তবে 'জীবন' কা'কে বলে, বোঝাতে গেলে বলতে হয় 'যা প্রাণহীন থেকে বিভিন্ন।' 'নশ্বর' কি তা বোঝাতে হ'লে বলতে হয় যে 'যা চিরস্থায়ী নয়' তাই 'নশ্বর'। কোন ভাবপদার্থ বোঝাতে গেলে তদবচ্ছিন্ন অভাবপদার্থের বিশেষণ ব্যতিরেকে ভাবপদার্থকে বোঝান যায় না। আমাদের দেশের বৌদ্ধেরা তাঁদের অপোহবাদে এই কথাটি পরিষ্কার করে বলেছেন, রত্নকীর্তি তাঁর 'অপোহসিদ্ধি'তে বলেছেন:

"নাস্মাভিরপোহশব্দেন বিধিরেব কেবলোঽভিপ্রেতঃ। নাপি অন্যব্যাবৃত্তিমাত্রম্, কিন্তু অন্যাপোহবিশিষ্টো বিধিঃ শব্দানামর্থঃ।"

অতএব অপোহবাদের নির্বচন করতে গিয়ে বলেছেন: "বিকল্পবিকল্পজ্ঞাপি বস্তুনঃ অবিশেষেণোপকারশক্তিব্যক্তির্বিজ্ঞায়মানোঽপ্যপলভ্যতে (ন্যায়মঞ্জরী)।"

হেগেলের বিরোধবিপাক ন্যায়ের বিশেষত্বই এই যে বিশুদ্ধ সত্তা থেকে আরম্ভ করে' তদন্তর্গত স্বগতবিরোধের স্বাভাবিক প্রেরণায় কেমন করে' দৈহিক ও জাগতিক সমস্ত পদার্থ, সমাজ, নীতি, ধর্ম, রাষ্ট্র, প্রভৃতি ক্রমধারায় একই পরিণামসূত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাই দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর নীতি অবলম্বন করলে আমরা যে কোন পদার্থের মধ্যে ব্যাবর্তকধর্মরূপে যে বিরোধ বা বিরুদ্ধবিকল্প রয়েছে তা' পারম্পর্যক্রমে পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষিত হ'লে আমরা তা'র শেষ প্রান্তে বিশুদ্ধ সত্তায় বা বিশুদ্ধ অসত্তায় এসে পৌঁছতে পারি এবং আর একদিকে তদন্তর্বর্তী বিরোধের ক্রমশঃ ক্রমশঃ পূর্ব থেকে পূর্বতর পাকের ফলে জাগতিক সমস্ত ব্যাপারের ও পদার্থের অন্তর্নিহিত কারণ ও প্রেরণার স্বরূপ নির্ণীত হ'তে পারে। হেগেলের দর্শনের বিস্তারিত আলোচনার এখানে কোন অবকাশ নেই, কিন্তু হেগেলের দর্শনের যে মূল তত্ত্বটির এখানে ব্যাখ্যা করা গেল সেটি সংক্ষেপতঃ এই:—এই জগৎ চিৎশক্তির বিকাশ। চিৎএর স্বাভাবিক ধর্ম প্রেরণা ও গতি, চিৎএর মধ্যে যে সৎ ও অসৎ গর্ভিত হয়ে রয়েছে তাদের পরস্পরের বিরোধে নানা বিশেষণের পৃথগ্রূপে সৃষ্টি হচ্ছে। এই ক্রমপরিবর্ধমান বিশেষণধারায় সৃষ্টির ফলে চিৎও সেই সেই বিশেষণে বিশেষিত হ'য়ে বিশিষ্ট পদার্থরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই অসংখ্য ব্যক্তিগত প্রকাশগুলির ভিতর দিয়ে চিৎএর যে সমষ্টিগত প্রকাশ তাহাই God বা ঈশ্বর।

১৮৪৪ সালে লিখিত Die heilige Familie (১) গ্রন্থে এঙ্গেল্সের

---

(1) Beer লিখিত Life and Teaching of Karl Marx.

(১) Mehringএর Aus dem literarischen Nachlass Marx-Engels. 1902 দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(class-struggle) পরিচয় দিতে গিয়ে মার্ক্স হেগেলীয় বিরোধ-বিপাকন্যায়ের অনুসরণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত স্বত্ব—সংস্থাপনীয়, আর ইহার অন্ত—শ্রমিক-স্বত্ব। এই উভয়ের বিরোধে ক্রমশ: ক্রমশ: ব্যক্তিস্বত্ব অপগত হয়ে সর্বস্বত্ব অপগত হয় এবং ফলে স্বত্বহীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বিরোধবিপাকের (Dialectic) এই সাধারণ ব্যবহার ছাড়া অন্য দিকে মার্ক্সের সহিত হেগেলের কোন মতের ঐক্য দেখা যায় না। মার্ক্স বলেন যে প্রাকৃত বিশ্লেষণের দ্বারা হেগেল জগতের যে চিত্র খাড়া করেছেন তা'তে দৃশ্যজগতে অবিসংবাদিতা সমস্তই একান্তভাবে বিকৃত হয়েছে, কেবল রয়েছে একটি কল্পনার কাঠামো।" এইজন্যই মার্ক্স বলেন যে হেগেলের দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্যই এই যে জড় ও চৈতন্যের যে দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ব্যক্ত হয়েছে তা'কেই পরিবর্ত্তিত করে' তিনি জড় সত্ত্বাকে চৈতন্যের মধ্যে বিলুপ্ত করতে চেষ্টা করেছেন। মার্ক্স ছিলেন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরবিরোধী। তাঁর Doctorate এর প্রবন্ধে (১) তিনি লিখেছিলেন :

"In one word, I hate all the gods।" কি নীতি অনুসারে, কি প্রণালীতে সমাজের পরিণতি ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে কোন্ দিকে সমাজ গড়ে' উঠবে এইটিই ছিল মার্ক্সের প্রধান আলোচনার বিষয়। যে বিরোধ-বিপাকন্যায়ের (Dialectic) দ্বারা হেগেল সমস্তের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন সেই ন্যায় অবলম্বন করেই মার্ক্স সমাজের পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। মানুষের চিন্তা ও প্রযত্নের ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ গড়ে' ওঠে এবং তাদের পরস্পরের দ্বন্দ্বে ক্রমশ: পরিণতির দিকে চলে। মার্ক্স মনে করতেন যে শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বই সমাজের পরিণামের একমাত্র পদ্ধতি এবং এই দ্বন্দ্বের ফলেই একদিন শ্রেণীবিভাগ একেবারে বিলুপ্ত হবে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে দ্বন্দ্বের কল্পনা মার্ক্স করেছিলেন তা'র মধ্যে যে ক্রিয়ার বা ব্যাপারের ক্রম দেখা যায় তা হেগেলকল্পিত জ্ঞানের স্বগতবিরোধের কল্পনা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শনশাস্ত্রের উপর Doctorate এর প্রবন্ধ লিখে মার্ক্স অধ্যাপকের পদপ্রার্থী হলেন। কিন্তু ঐ কাজ না পাওয়াতে তিনি সাংবাদিক ও সমালোচকের কাজ করতে লাগলেন। প্রাচীন মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তীব্রতম সমালোচনা দিয়ে তিনি জার্মানীর রাষ্ট্রীয় স্বাধীন চিন্তার পথ উন্মুক্ত করতে উদ্যত হলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মার্ক্স ২৪ বৎসর মাত্র বয়সে একটি সংবাদপত্রের (২) সম্পাদক হন। মার্ক্স এই সময় Economics বা অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রচুর চর্চ্চা করেন এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সাংবাদিকের পদ পরিত্যাগ করে' Jenny von Westphalen কে বিবাহ করেন। এই সময় থেকেই তিনি সমাজ-বিজ্ঞানে বিশিষ্ট হন এবং Fourier, Proudhon Cabet প্রভৃতির গ্রন্থ বিশেষভাবে অনুধাবন করেন। কিন্তু এই সমস্ত অধ্যয়নের মধ্য দিয়েই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজ কি ভাবে গড়ে' উঠেছে তা'র আলোচনা করা। নানা আলোচনার ফলে তাঁ'র মনে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছিল যে বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন করতে হ'লে তা' কেবলমাত্র শ্রমিকদের চেষ্টা দ্বারাই সম্ভব, ধনিকদের নিকট থেকে এ বিষয়ে কিছু আশা করা যায় না। হেগেলের Philosophy of Law গ্রন্থের ভূমিকায় মার্ক্স বলেন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী (bourgeois) আপন দৃষ্টতে আপনি দূষণিত, কিন্তু শ্রমিক সমাজ যখন বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন চায় এবং ব্যক্তিগত স্বত্বের বিধান অস্বীকার করতে চায় তখন তা'রা এই কথাই সূচনা করে যে বর্ত্তমান ব্যবস্থা নিরাকৃত হ'লে এবং ব্যক্তিগত স্বত্বের বিধান দূরীভূত হ'লে শ্রমিক ধনিকের কোন ভেদ থাকবে না। মার্ক্স এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বর্ত্তমান ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করা। কোন একটি স্বতন্ত্র মত খাড়া করে' সেই মতটিই সর্বকালের জন্য সত্য ও নির্ভরযোগ্য, এ রকম ভাবে কোন সত্য নির্দেশ করা মার্ক্সের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না।

১৮৪৪ সালে মার্ক্স এর সহিত ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ এর (১৮২০-১৮৯৫) বন্ধুতা হয় এবং পরবর্ত্তীকালে উভয়ে সমান দিকভাবে একই সাধনার সাধক হন। এঙ্গেলস্ অনেকগুলি গ্রন্থ লিখেছিলেন (৩) এ ছাড়া তিনি মার্ক্স এর অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। মার্ক্স-এঙ্গেলস্ এর সহযোগে Holy Family নামক গ্রন্থ লেখেন। তিনি এই গ্রন্থে তাঁ'র বন্ধু Bruno Bauer এর মতের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে কোন যুগকে যথার্থভাবে জানতে হ'লে সেই যুগের বাণিজ্য ও উৎপাদক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিচিত হওয়া আবশ্যক। তিনি আরও বলেন যে, যে জাতীয় কল্পনা জনসাধারণের উপকারে আসে তাই যথার্থভাবে কার্য্যকরী হয়, অন্যথা বিভিন্ন কল্পনায় বিভিন্ন প্রকারের উত্তেজনা আনতে পারে কিন্তু সে কল্পনা ফলবতী হ'তে পারে না।

এই সময় প্রুশীয় রাজসরকার মার্ক্স-এর এই নানাবিধ চিন্তাবলী প্রকাশ করবার অপরাধে মার্ক্স-এর উপর এত উত্ত্যক্ত হয় যে ফরাসী সরকারের নিকট অভিযোগ করে তা মার্ক্সকে প্যারীনগর থেকে তাড়িয়ে দেয়। মার্ক্স বাধ্য হয়ে ব্রুসেলস্ এ আসেন এবং এখানেই ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে Proudhon এর সমালোচনা করে' Misere de la Philosophie লেখেন। পরবর্ত্তী বৎসরে Communist Manifesto তে শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব ও সমাজের পরিবর্ত্তন বিষয়ে তিনি যে সমস্ত মত প্রচার করেন এই গ্রন্থে তাহাই সংক্ষেপে ও সরলভাবে বিবৃত হয়েছিল।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে জার্মান দেশের শ্রমিকেরা League of the Just নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করে। এই সংঘের পরবর্ত্তীকালে নাম হয় The League of the Communists এবং ১৮৪৭ সালে লণ্ডনে এদের প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে এঙ্গেলস্ উপস্থিত ছিলেন। ঐ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এর যে দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তা'তে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ উপস্থিত ছিলেন এবং এদের দুইজনের উপর ঐ সংঘের কার্য্যপদ্ধতির ভার পড়ে। মার্ক্স রচিত এই কার্য্যপদ্ধতির নাম Communist Manifesto বা সর্ব্বসাধিস্বত্ববাদের ইস্তাহার। মার্ক্স এই সংঘের উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে বলেছিলেন যে এই সংঘের উদ্দেশ্য এই যে এই দল মধ্যবিত্ত ধনিকের উৎখাত করবে এবং যে সমাজ মধ্যবিত্ত ধনিকগোষ্ঠির উপর প্রতিষ্ঠিত তাও ধ্বংস করবে, শ্রমিকদের শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করবে এবং এমন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করবে যা'তে একটি নূতন শ্রেণীহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই সমাজে কোন শ্রেণীবিভাগ থাকবে না এবং কোন বস্তুর উপর কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বত্ব থাকবে না।

যদিও মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ উভয়ে মিলে Communist Manifesto রচনা করেন তথাপি এই রচনার কৃতিত্ব প্রধানত: মার্ক্স-এরই। এই Communist Manifesto র প্রধান বক্তব্য এই যে, যে কোন ঐতিহাসিক যুগে সে যুগে প্রচলিত ভোগোৎপাদনব্যবস্থা, ভোগ্যবস্তুর বিনিময় এবং তা'র উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থা সেই ঐতিহাসিক যুগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং যে কোন যুগের রাষ্ট্রীয় বা অন্যবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস কেবলমাত্র এই দৃষ্টিতেই ব্যাখ্যা করা যায়। আদিম যুগ থেকে মানুষের ইতিহাস শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। যা'রা কেড়ে নিতে পারে তাদের সহিত যা'দের নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে

---

(১) Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie.

(২) Rheinische Zeitung.

(৩) এঙ্গেলসের প্রধান গ্রন্থ এইগুলি—Socialism from Utopia to Science, Condition of the Working Class in England in 1844, Origin of the Family and Feuerbach. The Roots of the Socialist Philosophy.

তাদের এবং শাসকের সহিত শাসিতের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। এমনি করে' সমগ্র ইতিহাসে শ্রেণীতে শ্রেণীতে কেমন করে' দ্বন্দ্ব চলেছে তা'র ইতিহাস স্পষ্টতর হয়ে এসেছে। এই দ্বন্দ্বের ইতিহাসের ফলে বর্তমানকালে এমন একটা যুগ এসেছে যখন শোষিত এবং শাসকের মধ্যে, ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব এমন একটা উৎকট অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে সমস্ত দ্বন্দ্বকে একান্তভাবে চিরদিনের জন্য নির্মূল করতে না পারলে এই ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হ'তে পারে না। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অবসান হচ্ছে শ্রেণীবিলোপে।

এই সুপ্রসিদ্ধ Communist Manifesto (১) চারটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে মধ্যবিত্ত ধনিক সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনিক ও শ্রমিকের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে প্রথম যুগে দেখা যায় দাসত্বপ্রথা এবং উপজীবী-ক্ষেত্রাধিকার-ব্যবস্থা (Feudalism)। এই ব্যবস্থায় প্রকাশ্যভাবে ভূম্যধিকারীরা বৃত্তিধারী ক্ষেত্রিকদের উপর এবং দাসদের উপর অত্যাচার করতে পারতেন এবং এর ফলে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়ে নবতর প্রকারের সমাজ গড়ে' উঠতে পারত। আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নব যুগের আরম্ভ হল এবং একটি পৃথক ধনিকসমাজের সৃষ্টি হ'ল। উপজীবি-ক্ষেত্রাধিকার-ব্যবস্থায় অন্যান্য শিল্পজাত শ্রমিকদের গণ বা সঙ্ঘের (guilds) হাতেই নিবদ্ধ থাকত। পরবর্তীকালে এই গণ বা সঙ্ঘের পরিবর্তে যন্ত্র উপায়ে শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবস্থা হয়েছিল। নানা যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন উৎপাদন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হ'ল তেমনি আমদানি রপ্তানি ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হ'ল। যাতায়াতের সুবিধাসুযোগের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের বিনিময় পূর্ব্বাতীত পরিমাণে হ'ল।

ধনিকশ্রেণীর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই এই ধনিকেরা মানুষের সহিত মানুষের অন্য প্রকার সমস্ত সম্বন্ধ দূর করে' কেবল স্বার্থের সম্বন্ধকেই জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। আর সমস্ত সম্বন্ধ দূর হয়ে' কেবল দেনা-পাওনার সম্বন্ধই বড় হয়ে উঠেছে; ধর্মের উৎসাহ, সাহিত্যেপ্সার উৎসাহ একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে। মানুষের মূল্য দাঁড়িয়েছে পণ্যের মূল্যে। ধর্মের ভাণ, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভাণ, দেশহিতৈষণার ভাণ যতই করা হোক না কেন, মূলে দাঁড়িয়েছে বাণিজ্যগত স্বার্থ। সর্ববিধ মূল্য এবং আদর্শ দূরে গিয়ে প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রমত্ত বিত্ত, সকল প্রেমকে গ্রাস করেছে বিত্তৈষণা। এই বিত্তৈষণায় প্রমত্ত বর্তমান ধনিকসমাজ অনেক অদ্ভুত ও দুষ্কর কার্য্য করেছে, কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বকে করেছে ক্ষুণ্ণ। পৃথিবীময় পণ্যদ্রব্যের বিনিময় চলেছে এবং তা'র ফলে প্রত্যেক জাতির সহিত অপর প্রত্যেক জাতির একটা পোষ্য-পোষকতার স্থাপিত হয়েছে। অল্প মূল্যে পণ্যদ্রব্য প্রচার করে' ধনিকবৃত্তি দেশগুলি অপর দেশগুলিকে করায়ত্ত করেছে। এই পণ্যব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে বিশ্বজনীনতা ফুটে উঠেছে তা'র প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা ও সভ্যতার বিশ্বজনীনতায়। এই ধনিকসভ্যতার ফলে নগরে জনসংখ্যা বেড়েছে এবং উৎপাদনব্যবস্থা ও ধনধান্য কেন্দ্রীভূত হয়ে অল্প লোকের হাতে নিবদ্ধ হচ্ছে, ফলে ধনিকসম্প্রদায়ের হাতে অসাধারণ ক্ষমতা ও অসাধারণ উৎপাদন শক্তি একত্রিত হয়ে নানা অদ্ভুত কার্য্য করতে সমর্থ হচ্ছে। প্রকৃতির শক্তি মানুষের দাস হয়েছে। এমন কি, রাষ্ট্রশক্তি ধনিকদের কল্যাণের জন্যই সমস্ত বিধিনিষেধের ব্যবস্থা পালন করছে।

আদি-নিয়ন্ত্রিত উপজীবিকাগত ক্ষেত্রিক-ব্যবস্থায় (Feudalism) সমাজে নানা জাতীয় এমন বিরুদ্ধ শক্তি উৎপন্ন হয়েছিল যে তা'র ফলে সমাজ ক্রমশঃই শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েছিল এবং এমন একটা সময় এসেছিল যখন এই সমস্ত শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে টুটে' গেল। বর্তমান ধনিকপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থায়ও এমন একটা সময় এসেছে যে এই সমাজ-ব্যবস্থাও ভেঙে চুরমার হবে। অল্পকাল পরে পরেই বাণিজ্যজগতে এমন সব দুঃসময় ফিরে ফিরে আসে যা'তে এই বর্তমান সমাজব্যবস্থার দুর্বলতা প্রতিপদে প্রমাণ করে' দেয়। বর্তমান ধনিকসমাজে এত ধন সঞ্চিত হয়ে উঠেছে যে তা' সংরক্ষণ করবার যেন আর উপায় নেই। কালে কালে উৎপাদন-শক্তিকে ধ্বংস করে' কোন রকমে ধনিকসমাজ আত্মরক্ষা করে। কোন সময় বা পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের নূতন নূতন স্থান আবিষ্কার করে অথবা পূর্ব্বের স্থানগুলিকে পূর্ণতরভাবে শোষণ করে'। কিন্তু এর ফলে ক্রমশঃই দুর্গতির প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ধনিকসমাজকে ধ্বংসের দিকে প্রেরিত করছে। আরও একটি প্রধান কথা এই যে ধনিকসমাজের ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট শ্রমিকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বর্তমান যুগে এই শ্রমিকেরা যন্ত্রেরই সামিল হয়ে উঠেছে। যতই বিশাল বিশাল যন্ত্রের মধ্যে শ্রমবিভাগের দ্বারা প্রত্যেক শ্রমিকের কাজ অত্যন্ত সহজ এবং একঘেয়ে হয়ে উঠছে, ততই তা'র যথার্থ মূল্য কমে' যাচ্ছে এবং তা'কে গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র দিয়ে বাকী সমস্ত উৎপন্ন ধন ধনিকের কুক্ষীগত হচ্ছে, অথচ পরিশ্রমের ভার তা'র উপর আরও অধিকতরভাবে ন্যস্ত হচ্ছে, অথচ এই শ্রমিক তা'র নিজের কাজের দ্বারা তা'র কোন ব্যক্তিত্ব দেখাবার অবসর পায় না, তা'র কোন স্বাধীনতা নেই। এদিকে হয় তো তা'র পরিশ্রমের নির্দিষ্টকাল বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথবা অল্পকালের মধ্যে অধিক কাজের দাবী করা হচ্ছে। যন্ত্রের সঙ্গে সমানে দিয়ে তা'র চলতে হবে। তার কোন মনুষ্যত্ব নেই (২)।

এই ধনসভ্যতার আর একটি ফল এই যে ছোট ছোট ব্যাপারীরা বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না এবং তা'রা ক্রমশঃ তাদের অবস্থা থেকে চ্যুত হয়ে শ্রমিকের পর্য্যায়ে নেমে আসে। যতই ধনলোলুপ হয়ে ধনিকেরা শ্রমিকদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে বাকী সমস্তটাই আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করে ততই শ্রমিকে ধনিকে ব্যক্তিগতভাবে লড়াই বেধে ওঠে। পরিশেষে ব্যক্তিগতভাবে লড়াই না চালাতে পেরে তা'রা সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। আজকাল যে সব ট্রেড ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়েছে তা'দের কাজই হচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধনিকের সঙ্গে শ্রমিকের পক্ষ হয়ে লড়াই করা। এই সমস্ত সঙ্ঘ থেকে রাষ্ট্রশাসক পরিষদের মধ্যে অনেকে সভ্য মনোনীত হয়ে শ্রমিকের পক্ষে উপকারী আইনকানুন প্রচার করতে চেষ্টা করেন। আবার ধনিকেরা স্বদেশী ও বিদেশী ধনিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শ্রমিকদের সাহায্যপ্রার্থী হন। কাজেই রাষ্ট্রশাসকসম্প্রদায় বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের সাধারণ এবং রাষ্ট্রিক

---

(১), Communist Manifesto, by Marks and Engels, Rand School Edition.

(২) Owing to the extensive use of machinery the division of labour, the work of labour has lost its individual character and its charm. The worker becomes an appendage of the machine, and it is only the most simple, the most monotonous and most easily acquired knack that is required of him. Hence, the cost of production of a workman is restricted almost entirely to the means of subsistence that he requires for his maintenance, and for the propagation of the race...In proportion as the use of machinery and division of labour increases, in the same proportion the burden of toil increases, whether by prolongation of the working hours, by increase of the work exacted in a given time, or by increased speed of the machinery,……

—Communist Manifesto.

শিক্ষাদান করে' থাকেন। ক্রমে যখন শ্রমিক ও ধনিকের দ্বন্দ্ব তীব্রতর এবং তীব্রতম হয়ে ওঠে এবং শ্রমিকদের জয়ের আশা প্রবলতর হয়ে ওঠে তখন ক্ষমতার লোভে রাষ্ট্রশাসক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ছোট ছোট দল এসে শ্রমিকদের পক্ষ সমর্থন করে। এমনি করে' রাষ্ট্রশাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রমিকদের প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা বেড়ে ওঠে। এমনি করে' শ্রমিকদের পক্ষাবলম্বী যে দল গড়ে' ওঠে তা'কে বলা যায় Labour Party। ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর অল্পবিস্তর দ্বন্দ্ব ঘটতে পারে, কিন্তু শ্রমিকেরাই এখানে যথার্থভাবে বিদ্রোহী। শ্রমিকের নিজের কোন বিত্ত নেই, ধনিকের দাস হওয়াতে তার কোন জাতীয়তা নেই। ধর্ম, নীতি, আইন, এ সমস্তই ধনিকদের স্বার্থ লুকানোর মুখোস মাত্র। সমস্ত সামাজিক কাঠামো ও তা'র ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত না হ'লে শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে না। পূর্ব্বকালে শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বে ছোট ছোট শ্রেণীর স্বার্থই ছিল প্রধানতঃ দেখবার বিষয়, কিন্তু শ্রমিকে ধনিকে দ্বন্দ্বে বিরাট শ্রমিকসমাজ কিছুতেই মাথা তুলে' দাঁড়াতে পারে না, যদি না সমস্ত শ্রেণীবিভাগ বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রথমতঃ দেশে দেশে শ্রমিক ধনিকের সংগ্রামে যতদিন না শ্রমিকেরা ধনিকদের পরাভূত করবে ততদিন ভুবনব্যাপী শ্রমিকদের অভ্যুত্থান সম্ভব নয়।

ধনিকের ধন যত বেড়ে উঠবে শ্রমিকেরা ততই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে ধনিকদের শ্রমিকদের উপর প্রভুত্ব করবার কোন দাবী নেই। বেতন দিয়ে শ্রমিক না রাখতে পারলে ধনিকের ধনাগম হয় না। শ্রমিকে শ্রমিকে প্রতিযোগিতায় বেতনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু যখনই শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে আরম্ভ করে তখনই জানতে হবে যে ধনিকদের আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয়েছে। অতি ধনসঞ্চয়ের ফলে ধনিকদের ধনিকত্ব বিলুপ্ত হবে।

এমনি করে' মার্ক্স Communist Manifestoর প্রথম খণ্ডে ধনিকদের অবশ্যম্ভাবী পতন এবং উৎপাদক-শ্রমিকদের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুত্থান বর্ণনা করে' Manifestoর দ্বিতীয় খণ্ডে কম্যুনিষ্ট বা সর্ব্ব-সাধিকবাদিদের সহিত শ্রমিকদের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে বলেছেন যে উভয়েই একপদস্থ। কম্যুনিষ্টদের সহিত অন্য শ্রমিকদলের যেটুকু বিভেদ আছে সেটুকু সংক্ষেপতঃ এই:—কম্যুনিষ্টরা বিচার করে যে দেশে দেশে শ্রমিকদের সকলের মধ্যে যে সাধারণ স্বার্থ আছে, সে স্বার্থ জাতি ও দেশ-নিরপেক্ষ। তা' শ্রমিক সাধারণের সামান্য স্বার্থ। সকল শ্রমিকেরই এই শ্রমিকসাধারণের সামান্য স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকধনিকের দ্বন্দ্বে শ্রমিকমাত্রেরই সর্বথা সর্বদেশে সর্ব্ব-শ্রমিকের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করা উচিত। সর্ব্বদেশেই অন্য সকল শ্রেণী অপেক্ষা শ্রমিকেরাই সব চেয়ে দৃঢ়ব্রত এবং বলবত্তম। তা'রা এই সমগ্রভাবে তাদের গন্তব্য পথ আবিষ্কার করতে পারবে এবং তাদের ভাবী চরম সাফল্য প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে। সাধারণভাবে কম্যুনিষ্টদের কার্য্যপদ্ধতি হচ্ছে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, ধনিকের প্রভুত্ব দূর করা এবং রাষ্ট্রের সমস্ত বল নিজেদের হাতে নেওয়া। Manifestoর দ্বিতীয় খণ্ডে এর পর কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয় তা'র খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে। মার্ক্স বলেন যে কম্যুনিজমের উদ্দেশ্য এ নয় যে এ কোন ব্যক্তিকে সমাজে উৎপন্ন শিল্প বা খাদ্যজাত থেকে বঞ্চিত করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে কোন ব্যক্তিকে এমন বল রাখতে দেওয়া হবে না যা' দ্বারা সে অন্যের শ্রমের উপর আধিপত্য করতে পারে। যে বলের দ্বারা ধনিকেরা শ্রমিকের উপর প্রভুত্ব করে তা'দের হাত থেকে সেই বল নিজেরা কেড়ে নেবে—এইটিই হ'ল কম্যুনিজমের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নূতন ব্যবস্থায় উৎপাদকেরাই হবে ভূ-স্বামী বা ধনস্বামী। এতাবৎকাল ধনিকেরা অন্য শ্রমিককে কেবলমাত্র যন্ত্রবৎ পরিচালিত করে' এসেছে। কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে বলা হয় যে তা'রা স্ত্রীজাতির সাধারণস্বত্ববাদী। কিন্তু যথার্থভাবে কম্যুনিষ্টদের উদ্দেশ্য এই যে স্ত্রীলোককে যেন কেবলমাত্র অপত্যোৎপাদনের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা না হয়। যথার্থভাবে বাণিজ্য সম্বন্ধে স্ত্রীলোককে যদি নিয়ন্ত্রিত করা হয় তবে তা'র ফলে গণিকাশ্রেণী বিলুপ্ত হবে।

শ্রমিকেরা বিত্তহীন, সেইজন্যই তা'দের কোন জাতীয়তা নেই। কতকগুলি বিভিন্ন স্বার্থ আছে বলে'ই ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হয়েছে। শ্রমিকদের এখন কাজ হচ্ছে এই যে তা'রা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেড়ে নেবে। বাণিজ্যের নিরঙ্কুশ প্রসারে জাতিতে জাতিতে ভেদবুদ্ধি ক্রমশঃই কমে' আসছে। শ্রমিকদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বন্দ্ব অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হবে। ব্যক্তির উপর ব্যক্তির অত্যাচার যতই দূরীভূত হবে ততই জাতির উপর জাতির অত্যাচার দূরীভূত হবে। শ্রমিকদের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে তা'রা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তা'দের হাতে নিয়ে রাষ্ট্রের হাতে সমস্ত ধন ও উৎপাদন-ব্যবস্থা সংহত করবে। এমনি করে' শ্রমিকেরা সংহত হয়ে শাসক সম্প্রদায় হয়ে উঠবে এবং উৎপাদন-শক্তিকে দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে চলবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করবার জন্যে ব্যক্তিগত ভূ-স্বামিত্ব উঠিয়ে দিয়ে জমির সমস্ত খাজানা সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত করতে হবে। আয়কর বাড়াতে হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে কোন স্বত্ব উৎপন্ন হবে না। একমাত্র রাষ্ট্রেরই বাণিজ্যাধিকার থাকবে। যানবাহনের ব্যবস্থাও রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। সমস্ত উৎপাদনব্যবস্থাও রাষ্ট্রের করায়ত্ত থাকবে। নির্দ্দিষ্ট কোন পদ্ধতি অনুসারে সমস্ত অনাবাদী জমি চাষ এবং জমির উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। সকলেরই শ্রমে সমান অধিকার থাকবে। কৃষির সহিত যান্ত্রিক উৎপাদনের সহযোগ স্থাপন করতে হবে। যা'তে নগরে ও গ্রামে জনসংখ্যা ক্রমশঃ সমান হয়ে ওঠে তা'র চেষ্টা করে' নগর ও গ্রামের পার্থক্য যথাসম্ভব দূর করা কর্তব্য। স্কুলে ছেলেরা যাতে বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে তা'র সুব্যবস্থা করা আবশ্যক। বালকদের দ্বারা শ্রমের কাজ যা'তে না করান হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সাধারণ শিক্ষার সহিত যান্ত্রিক উৎপাদনের শিক্ষাও দেওয়া আবশ্যক। মার্ক্স আরও বলেন যে ধনিক সমাজের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা যখন শ্রমিকসমাজের হাতে চলে' আসবে তখন আর ধনিক সমাজ বলে' কোন স্বতন্ত্র শ্রেণী থাকবে না এবং কাজেই সমস্তই একশ্রেণী হয়ে যাওয়ায় কোন শ্রেণীর উপর কোন শ্রেণীর অত্যাচার সম্ভব হবে না।

মার্ক্স তাঁর Manifestoতে শ্রমিক সাধারণের মধ্যে যে ভাব অব্যক্ত অস্ফুট হয়ে ছিল একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টি দ্বারা তা'কেই স্ফুট করে' তুলেছেন এবং শ্রমিকদের চিত্তের মধ্যে তা'দের দ্বারা কিসের কি পরিবর্ত্তন হ'তে পারে সে সম্বন্ধে একটা নব চেতনা, নব জাগরণ উদ্বোধিত করে' তুলেছেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় মানুষেরা যেমন তাদের জন্মগত অধিকারের দাবী করত Manifestoতে সে রকম কোন দাবী নেই বা কোন দর্শনের তত্ত্বও আলোচনা করা হয় নি। এতে যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুতে শ্রেণীবিভাগ, ধনবিভাগ, উৎপাদন ও উৎপাদন-ব্যবস্থার একটা বিশেষ দৃষ্টিতে সমালোচনার ফলে সমাজের বর্তমান সংস্থান সম্বন্ধে একটি অন্তর্দৃষ্টি এবং আগামী সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ঘাটিত হয়েছে।

Communist Manifestoর তাৎপর্য্য বুঝতে গেলে তৎসমসাময়িক ইউরোপের অবস্থা বোঝা আবশ্যক। এঙ্গেল্‌স্ Condition of the Working Class in England, 1844 নামক একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই সময় যন্ত্রের সাহায্যে ইংলণ্ডে এত বস্তু উৎপন্ন হচ্ছিল এবং ধনিকেরা এমন করে' সাধারণ শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করছিল এবং কোনরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ না করায় শ্রমিকেরা এমনভাবে নিপীড়িত হচ্ছিল এবং শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রমিকদের প্রতিনিধি না থাকায় শ্রমিকেরা এত নিরুপায় হয়ে পড়েছিল যে চারিদিকে নানা বিদ্রোহ ও আক্রমণ প্রবল হয়ে উঠেছিল। Manifestoর পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায়

পাঠাবার অল্পকাল মধ্যে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্যারিসে এমন একটি বিদ্রোহ হয় যে রাজা লুই ফিলিপ্‌ রাজ্যত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ফরাসী দেশে গণতন্ত্র উত্থাপিত হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই ভিয়েনাতে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। ফলে প্রধান মন্ত্রী Metternich পদত্যাগ করেন। চেকদেশেও ঐরূপ বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ ছাড়া ইটালি, হাঙ্গেরিয়া, জার্মানি ও বার্লিনেও ঐ জাতীয় বিদ্রোহ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ফ্রান্সে গণতন্ত্রের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং অন্য সমস্ত দেশেও বিদ্রোহবাদীরা বিপর্যস্ত হয়। এই ব্যাপারবিপর্য্যয়ের ফলে কম্যুনিষ্টদল একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। সমস্ত দলের অনেকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং দলের অবস্থা এমন বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়ে যে এই সঙ্ঘের যে কোন ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্ভব বা এর আদর্শ যে ভবিষ্যতে ফলবান হবে' ইহার এমন কথা তখনকার দিনে কেউ মনে করে' উঠতে পারত না।

বর্তমান প্রবন্ধে মোটামুটিভাবে যে সব কথা আলোচিত হ'ল সে সমস্ত বিষয়ে স্পষ্টতরভাবে জ্ঞান লাভ করতে হ'লে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পড়া আবশ্যক:—M. Beer কৃত History of British Socialism, ২য় খণ্ড, ৩য় ভাগ; M' Beer কৃত Life & Teaching of Karl Marx. 1925, ৩য় অধ্যায়; C. J. H. Hayes কৃত A Political & Social History of Modern Europe, ২য় খণ্ড; Labour Research Study Group; Scott Nearing, কৃত The Law of Social Evolution, 1926; Karl Marx এবং Friedrich Engels কৃত The Communist Manifesto; Karl Marx কৃত The Civil War in France; Karl Marx কৃত The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, 1852; Karl Marx কৃত Revolution & Counter-revolution (১৮৫১ খৃষ্টাব্দে লিখিত এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত); R. W. Postgate কৃত Revolution from 1789 to 1906; John Spargo কৃত Karl Marx—His Life & Works; Coates কৃত The Life & Work of Engels; Loria কৃত Karl Marx; Riaza..ov কৃত Karl Marx and Engels; Laidler কৃত A History of Socist Thought.

কম্‌প্লেক্স

শ্রীজনরঞ্জন রায়

নলিনী ঘোষ সম্প্রতি নলিনী মিত্র হইয়াছে। সে মেয়ে-কলেজের প্রফেসার। তার এখন ক্লাশ নাই। প্রফেসারদের রুমে সে একখানা বই পড়িতেছিল। বইটা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। সে হঠাৎ ঠোঁট কুঁচকাইয়া মৃদু হাসিল। হাসিটা ক্রমে প্রবল হইল। আবার হাসিল···আবার হাসিল। এতো হাসিল যে চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। পাশের ঘর হইতে বেয়ারা আসিয়া হাজির হইল। বেয়ারার দিকে চাহিতে তার সম্বিত হইল। বেয়ারা তাকে সেলাম দিল। সে বলিল—কুছ নেহি। বেয়ারা চলিয়া গেল। সে একখানা নোট বহি নিয়া লিখিতে বসিল। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের ঐ পদটির ভাব নিয়া ইংরাজীতে কবিতা লিখিতে লাগিল।

নলিনী এম-এতে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট। যৌবনের মধ্যাহ্ন যেন পার হইয়া গিয়াছে। সেমিজের নীচে বুকের-টানা বাঁধিয়া এত দিন বুক বাঁধিয়া থাকিয়াছে। কারণ বুকের 'সোনর' অমিল ছিল। তার ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হইয়াছিল কাল্। তার ধবল-বিনিন্দিত অতি সাদা দাঁতও নয়···তার বিড়ালের মতো কটা চোখ দুটোও নয়···কেশ-বিরল ভ্রূ দুইটাও নয়···বকচঞ্চু দীর্ঘ নাসাটিও নয়—যত অপরাধী ঐ ফার্ষ্টক্লাশ ফার্ষ্ট!' তার কাছে কোনো ছোকরাই ঘেঁসিত না ঐ ভয়ে। পাউডার, লিপষ্টিক, রুজ···কোনো কিছুতেই সে ছোকরা টানিয়া আনিতে পারে নাই। সে অন্তরে অন্তরে বুঝিল বাংলা দেশের ছোকরাদের শিক্ষিতা নারী ভীতি কত বেশি। যৌবন যখন অপরাহ্নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে পড়ে, তখন সে একটি বেকার গ্রাজুয়েটকে বিবাহ করিল। এই সে দিন বিবাহ হইয়াছে। বিয়ের-বাতাস লাগিয়াছে প্রাণে মনে···তাই এত হাসি। বিবাহ করিল তাকেই—যাকে সে তার ফ্ল্যাটের নীচে দিয়া চাকরির চেষ্টায় কত দিন ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াছে। আগে নীল চশমা চোখে আঁটিয়া পাঞ্জাবী গায় সিগারেট ফুঁকিয়া চঞ্চল পদে যাইত। এখন হইয়াছিল ছেঁড়া খদ্দরের পিরাণ···বিড়ি মুখে···ধীর মন্থর গতি। এই ছোকরাকেই সে এক দিন বৈকালে ডাকিয়া আনিল চা খাইতে। তার পর দিনও ডাকিল···তৃতীয় দিনও ডাকিল। চতুর্থ দিনে বলিল—আমরা বিবাহিত জীবন যাপন করি···আপনার এতে মত কি? ছোকরা বলিল—আমি বেকার···আর আপনি···। বাধা দিয়া নলিনী বলিল—আমি···আমি···আমি কিছু নই···আমি কি তা আমি জানি···এতে আপনার কি আপত্তি আছে? তার ঠোঁট কাঁপিতেছিল। সে বলিয়া গেল—আমি···আমি···ছিঃ ছিঃ ছিঃ:···আমি! সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তারপর তাদের বিবাহ হইয়াছে।

ছোকরাটি এখনো বেকার। তবে খানিকটা কাবে পড়িয়াছে। নলিনী ভোরে উঠিয়াই চা টোষ্ট খায়। তার বোর্ডিং জীবনে সেই যে ভোরে উঠিত এখনো সেই অভ্যাস আছে। ছোকরাটি তার সঙ্গে তাল রাখিতে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। সে চোখেমুখে জল দিয়াই ত্রস্তে ব্যস্তে ঝিকে ডাকে···পাছে চা আনিতে দেরি হয়। নলিনী চা খায়···ছোকরাটি দাঁড়াইয়া থাকে। নলিনী বলে—তুমিও চা খাও···তোমাকেও তো দিয়েছে। সে বলে—না না তুমিও খাও···আপনি খান···আমি পরে খাব···আপনাকে তো এখনি কলেজে বেরুতে হবে। সে ঝিকে নিয়া তাড়াতাড়ি বাজারে চলিয়া যায়। বাজার আসিতে দেরি হইলে কলেজে যাওয়ার বিলম্ব হইবে যে।

স্বামীর এই পরিচর্য্যায় নলিনী ভালবাসার রসাস্বাদ করে। তার কাগজপত্র গুছান হইতে আরম্ভ করিয়া শাড়ি সেমিজ যোগাড় বাড়ি দেওয়া পর্য্যন্ত সব কাজ নিখুঁতভাবে চলিতেছে। মাঝে মাঝে তার মহিলাবন্ধু পুরুষবন্ধুরাও আসে। তখন ছোকরাটি অন্তরালে লুকায়। লুকাইয়াও ঝিকে দিয়া ঠিকমতো চা-খাবার

পাঠায়। একদিন কাদম্বিনী ও রেবা বৈকালে চা খাইতে আসিয়াছে। রেবা বলিল—খুব বশম্বদ স্বামীটি পেয়েছ যা হোক। ফিরিয়া যাইতে যাইতে রাস্তায় রেবা বলিল—খানসামা বিয়ে করেছে না-কি? কাদম্বিনী বলিল—না, না…। রেবা বলিল—তবে…? কাদম্বিনী বলিল—এটা ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স…মনের বিকার, নিজেকে ছোট ভাবে…কারণ সে বেকার ছিল, এখনো বেকার, স্ত্রীর খায়…তাই স্বামিত্বের ওজন রাখতে পারে না।

রেবা ও কাদম্বিনী দু'জনেই মিস্। দু'জনেই প্রোফেসার। রেবা কাদম্বিনীর চেয়ে অনেক ছোট, নলিনীরও ছোট। কথাটা রেবার কানে কেমন লাগিল। রেবা বলিল—বিয়ে কোরে নলিনীর অনার বোধটা খুব বেড়েছে। কিন্তু বিয়ে করেছে যাকে, নিজে তাকে অনার দেয়না কেন?…এটা তার ভারি অন্যায়।

কাদম্বিনী বলিল—কে কাকে অনার দেবে? ওজন ভারি নিয়ে তো অনার? তা স্ত্রীর ওজন ভারি যেখানে, স্বামী তাকে খাতির কোরবেই যে। নইলে স্বামী নাম থাকলেই তার অনার বেশী হয়—আমি তো তা কোথাও দেখি নে।

রেবা—আমি তো শুনেছি ছোটবড় কম্‌প্লেক্স স্বামী স্ত্রীর মধ্যে থাকে না…কিছুদিন যেতেই তাদের মধ্যে ইকুএল্ পার্টনারশিপ আসে…তারা দু'জনে সুখদুঃখ ভাগ কোরে নেয়।

কাদম্বিনী—ডঃ ইন্দ্র বিলাত থেকেই তোমায় এতটা শেখাতে পেরেছেন তা বুঝতে পারিনি তো!

রেবার চোখমুখে গোলাপী আভা ফুটিয়া উঠিল। ডক্টর ইন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিলেই রেবার সঙ্গে বিবাহ হইবে।

কিছুদূর গিয়া কাদম্বিনী বলিল—জীবনে কতবার এগিয়েছি…কতবার পেছিয়েছি। এগুনো পেছনর হাত হতে এখন নিস্তার পেয়েছি। এখন একটি দিন প্রাণে লাগে বসন্তের হাওয়া…স্মৃতি যত দিন মুছে না যাবে ততদিন এ হাওয়া লাগবে। আজ আট বছর এই স্মৃতি আমার প্রাণে বসন্ত উৎসব আনছে। এই শুক্রবারে সেই উৎসব। তুমি আর নলিনী ছাড়া এ উৎসবে আর কাউকে ডাকতে পারি না। এর মর্য্যাদা আর কেউ তো বুঝবে না…আসবে তুমি?

রেবা বলিল—নিশ্চয় আসবো।

ফাল্গুনের শেষ তারিখ এটা মহেন্দ্রবাবুর মৃত্যু দিন। কাদম্বিনীর প্রথম যৌবনের প্রণয়পাত্রী ছিলেন মহেন্দ্রবাবু।

নলিনী মনে করে বান্ধবী মহলে তার মর্য্যাদা যে এত বাড়িয়াছে এর মূল হইয়াছে তার স্বামী তাকে সেবা করে। সে এখন প্রসন্ন অভিভাবকের ভঙ্গীতে তার স্বামীর সঙ্গে ব্যবহার করে। সেটা যে ঠিক অবজ্ঞা তা নয়। তবে একটু মাত্রা ছাপাইলেই তাহা হইয়া পড়িবে তাচ্ছিল্য। আর সে যে মাত্রা…তাও উনিশ-বিশের মাত্রা।

সেই উনিশ-বিশের মাত্রাটি শেষে ছাপাইল।

সে দিন একটি বান্ধবীর বিবাহ। খুব বেশি দূর নয়…কিন্তু বান্ধবীরা রাত্রে আসিতে দিল না। রাত্রে থাকিতে তার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পাছে কেহ বলে স্বামীর ভয়ে চলিয়া যাইতেছে…এই স্বাধীনভর্ত্তৃকা-বিভ্রম তাহাকে আরো আটকাইয়া রাখিল। তবে সে একখানা চিঠি দিয়া একটা লোক পাঠাইল। লোকটাকে বলিয়া দিল—আমার বেয়ারাকে দেবে…তাকে বলবে আজ রাত্রে মেম সাহেব আসবে না।

উৎকর্ণ হইয়া নলিনীর স্বামী অপেক্ষা করিতেছিল। বিয়ে বাড়ি হইতে এতক্ষণ তো ফিরিবার কথা। বেয়ারা বেয়ারা করিয়া দুয়ারে কে চিৎকার করিতেছে। সে দুয়ারটা খুলিল। পত্রবাহক ভৃত্যটি বলিল—আপনি কি বেয়ারা?…মেম সাহেব বলেছেন এই চিঠি বেয়ারাকে দিতে…আর বলেছেন আজ রাতে তিনি আসবেন না।

চিঠিটা সে কাড়িয়াই লইল…উনিশ-বিশের মাত্রা ছাপাইল। তারপর দড়াম করিয়া সে দরজা বন্ধ করিল…দুম্‌দুম্ করিয়া উঠিয়া গেল উপরে…জোরে একটা লাথি মারিল শুইবার ঘরের কপাটে…চিঠিটা ছিঁড়িয়া টুকরা করিয়া পায়ের তলায় ফেলিয়া লাথির উপর লাথি মারিল…তারপর দেরাজ হইতে মনিব্যাগটা নিয়া ঝড়ের মতো উধাও হইয়া গেল।

রাত দিনের ঝি বিমলা। সে কতক শুনিল…কতক বুঝিল। ব্যাপারটা যে জটিল হইয়া গেল তাহা সে বেশ অনুভব করিল। দরজা বন্ধ করিয়া সে উপরে গেল। টেলিফোন গাইডের নীচে কোনো কাগজ পাইল না। আগে রাত্রে কোথাও গেলে সেই বাড়ির টেলিফোন নম্বর একটা কাগজে লিখিয়া নলিনী টেলিফোন গাইডের তলায় রাখিয়া যাইত। দরকার হইলে দাসী সেখানে টেলিফোন করিত। এমন কতবার করিয়াছে। কিন্তু বিবাহের পর দু'বৎসর নলিনী কোথাও রাত্রে থাকে নাই। বৃদ্ধা বিমলা জাগিয়া রাত্রি কাটাইল।

সকালে নলিনী সেখান হইতে ফিরিল। বিমলা চা আনিয়া দিল। পুরাতন দাসী…তীব্র অনুযোগের স্বরে সে বলিল—তাঁকে আপনি এমন কথা বলেন কি কোরে দিদিমণি…তিনি কি বেয়ারা?

নলিনীর চায়ের বাটি হাত হইতে কাঁপিয়া পড়িয়া গেল।

সমস্ত দিন একটা ট্যাক্সি নিয়া সে স্বামীকে খুঁজিয়াছে। হঠাৎ একটা ঝুপড়ীর কাছে সে গাড়ি থামাইল। কে জড়িতকণ্ঠে চিৎকার করিতেছে—এসো এসো…যত রোগ আছে নিয়ে এসো…তাকে দেবো…বিষ নিয়ে এসো…বিষ…তীব্র জ্বালা বিষ—।

কিন্তু বিষ খেলেও লোক মরে না…আমি মরবো না…জ্বালা দাও…বিষ দাও…তুমি এসো—এই বলিয়া নলিনী গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল।

P30434

ভবিষ্যতে জগতের ব্যবস্থা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের অনাড়ম্বর জীবনের অনাবিল শান্তি ভঙ্গ করিয়াছে নাকি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এই 'পৈশাচিক লীলা' ইতিহাসের কোন সন-তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় অনেকেই বিড়ম্বনায় পড়িবেন। সুখোজ্জ্বল জীবনের খোঁজে আমাদের মত জীবনের কোন অধ্যায়ে কত হাজার বৎসর পিছাইয়া যাইতে হইবে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুষ্কর। মানুষের দেহের গঠন যে ভাবের তাহাতে দন্ত-নখ আস্ফালন করিয়া অরণ্যে বাস করা অসম্ভব বলিয়াই না মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। জঙ্গলের জন্তুর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইয়া মানুষ থাকিতে পারে নাই বলিয়াই গুহা হইতে বাহির হইয়া গোষ্ঠী গঠন করিয়াছে; নদীর ধারে বসতি বানাইয়াছে। জমি চাষ করিয়া ফসল ফলাইয়াছে। এই যে নিত্য নূতন প্রয়োজন বোধ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকৃতির সম্ভারকে বিবর্দ্ধিত ও বিবর্তিত করিয়া মানুষ আজ আর সভ্যতার প্রথম যুগের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ 'গ্রামের মানুষ' বা 'মহল্লা-পাড়ার মানুষ' নাই। বিশ্বের মানুষ একসূত্রে গাঁথা পড়িয়াছে। সমুদ্র পারাপার হইতেছে, আকাশে খবর পাঠাইতেছে এবং সারা জগতের ভাবধারার ও উৎপাদনের আদান প্রদানের ব্যবস্থা ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইতেছে। মানবের জীবনযাত্রায় বিজ্ঞানের আবির্ভাব আচম্বিতে উল্কাপাতের মত নয়। যেদিন হইতে মানুষ আত্মশক্তি লাভ করিয়া নিজের জগৎ গড়িয়া তুলিতে শুরু করিয়াছে সেইদিন হইতেই প্রতি কাজেই ওতঃপ্রোতভাবে মানুষের বুদ্ধি ও কর্মশক্তি একত্রে কাজ করিতেছে। ক্ষুধার তাড়নায় মাংসের যোগাড় প্রাণী মাত্রেই করে, কিন্তু এই মাংস যোগাড়ের কাজের সঙ্গে পরবর্ত্তীকালে অনুরূপ অবস্থার জন্য সংস্থান করা বুদ্ধির প্রয়োজন। মানুষই আত্মসাৎ যেটুকু পারিয়াছে বলিয়া আজ জন্তু হইতে এত দূরে বিস্তীর্ণ পরিধিতে আসিয়াছে। কোন অবস্থা সম্বন্ধে বোধ ও তাহার বিচার করাই বিজ্ঞানের ভিত্তি।

বাস্তবিকই মানুষের জয়যাত্রা বৈজ্ঞানিক অভিযানেরই অভিব্যক্তি। বর্তমানের গলদ বিজ্ঞান-সাধকের নহে। বিজ্ঞান-সাধনাকে সাধারণ মানুষের কাছে এক অস্পষ্ট জগতের ছায়া বলিয়া ধরা হইয়াছে। মানুষের চিন্তাশক্তির পরিস্ফুরণে ইহার কার্য্যকারিতাকে অবহেলিত করা হইয়াছে। এতদিনের কাজে বৈজ্ঞানিক ভাবধারা আমাদের গৃহ অন্ধকার কোণে স্থান পাইয়াছে। যে সব সাজ সরঞ্জাম এতদিনে আমার বিজ্ঞান-কৌশলে স্থান পাইয়াছে তাহার ব্যবহার অতি সহজ ও সরলভাবে আমাদের জীবনে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি (বা খুব ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে, বোধ-বিচারের শক্তি) এখনও সমাজে মাথা উঠাইতে পারে নাই। বৈজ্ঞানিক-গোষ্ঠীর মধ্যে যদি অন্তর্নিহিত ভাবে মানবীয় উগ্র থাকিত তাহা হইলে ভুল পদক্ষেপে এই সাধনার ধারা এইরূপ ধরিয়া আসিতে পারিত না। বৈজ্ঞানিক তাহার যথার্থ স্থলে পতিত হন নাই, বৈজ্ঞানিকের কাজ সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানুষের অব্যবস্থার স্বার্থই আজ চতুর্দ্দিকে সাজান বাগান ধ্বংস করিতেছে। ক্ষীণবুদ্ধি আপাততঃ সন্তুষ্ট লোক-সমাজ দলের স্বার্থের অভিসন্ধিতে আজ বিজ্ঞানের তুচ্ছকে আসর জমাইবার সুযোগ দিয়াছে। মানুষের মস্তকে আজ মোচড় দিয়া মোড় ঘুরাইবার সময় আসিয়াছে। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ছাড়িয়া আমরা আজ যতটুকু চোখে আসিয়াছে তাহা লইয়া হানাহানি করিতেছি, যে তথ্য সমস্যা সমাধান করিতে পারে তাহার অনুধাবন ও অনুশীলন না করিয়া প্রাকৃতিক বাধা ধ্বংস করিবার মান-[illegible] নিজেদের সর্বনাশ করিবার জন্য নিয়োজিত করিতেছি। যাহা কিন্তু জীবনে সুখৈশ্বর্য্য আনিতে পারে তাহা আমাদের গোচরে আসিলেই কাড়াকাড়ি করিয়া অন্যকে বঞ্চিত করিয়া নিজের জন্য অসামঞ্জস্য পুঁজি বাড়াইবার চেষ্টা আমাদের সমস্ত পরিশ্রমকে পণ্ডশ্রমে পুঞ্জীকৃত করিতেছে। আয়োজন ও প্রয়োজনে তফাৎ কেবল বাড়িয়া চলিয়াছে, বৈজ্ঞানিক যে প্রাকৃতিক সম্ভার ও শক্তির পরিচয় লাভ করিয়াছে তাহার পরিমাণ বৈজ্ঞানিকই জানে। বণ্টন ব্যবস্থাটা তার মত সমঝদারের হাতে হওয়া উচিত না কি?

সভ্যতার পাদ-মহলের সিঁড়ি হইতেছে বিজ্ঞান। জ্ঞানের সন্ধান ও জ্ঞানপ্রসূত ফলের বিনিময়ব্যবস্থা জ্ঞানীদের দিয়া আমরা হইতে দিই না। জড়পিণ্ড লইয়াই এতকাল বিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কাজের ধারা সমান-অসমানকে ভাগাইয়া বিচার পর্য্যন্ত রাখে। তাঁহাদের অনুশাসন কেবল বাক্যবাগীশের প্রকাশ নহে এবং ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের [illegible] বিচারসাপেক্ষ নহে। তথ্য পরম্পরায় অবিনশ্বর সত্য উদ্ঘাটন করাই তাঁহাদের ব্রত।

প্রাণবান্ জগতে একটা সুব্যবস্থা করিবার জন্য অনেকেই কামনা করিয়াছেন। তিন শ্রেণীর লোক নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হইয়া জগৎকে নবীন ছাঁচে ঢালিবার প্রেরণা যোগাইয়াছেন। প্রথম যাঁহারা যুগযুগান্তের রাজনীতির আলোচনা করিয়া স্বার্থবিহীন এক রাজ্য শাসনের ফিরিস্তি ঠিক করেন। দ্বিতীয় যাঁহারা জড়পিণ্ডকে গড়িয়া পিটিয়া মানুষের কাজে লাগাইয়াছেন এই রকম বৈজ্ঞানিক, তৃতীয় যাঁহারা মানুষের অভাব মিটাইবার জন্য নানা দেশ হইতে নানা জিনিস আনিয়া ব্যবসা গড়া করিয়াছেন।

পৃথিবীকে এক সমগ্র রাজ্যে পরিণত করিয়া রাজনীতিবিদ্‌গণের কাছে ভিন্নরকম বিধান পাওয়া যায়। প্রত্যেকেরই প্রতি জিনিসের উপর অধিকার থাকিবে (অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য অবশ্য ম্যাজিষ্ট্রেটের দরকার হইবে), না হয় নিজস্ব বলিয়া কোন জিনিসই থাকিবে না, আর না হয়, কাহারও অধিকার নির্দিষ্ট নাই— যাহার প্রয়োজন ও শক্তি আছে তাহারা ব্যবহার করিয়া প্রয়োজন মিটাইতে হইবে। এই বিধানের চিন্তার মূলে একটা অতি স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক সমস্ত পৃথিবীকে একসূত্রে গাঁথিবার অছিলায় যাবতীয় মানুষ ও জিনিসের উপর নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবেন। গোড়ার গলদটা এই যে রাজনীতিবিদেরা মনে করিতে পারেন না যে তাহাদের বক্তৃতার ভিত্তি অতি প্রাচীনযুগের মনোবৃত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে—যে সময় বুদ্ধিমান লোক অল্প ছিল—বাদ বাকী সব পশুজাতীয় প্রজা বা দাস শ্রেণীভুক্ত।

বৈজ্ঞানিক গোড়াতেই মানুষের বাঁচিবার প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর কাজ আরম্ভ করিতে চায়। তাহার পরীক্ষামূলক সাধনাকে আরো বড় করিয়া বিস্তৃত করিতে ব্যগ্র। বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে নিয়মানুবর্ত্তী করিবার আনন্দ ছাড়া বৈজ্ঞানিকের কোন স্বার্থ নাই। বৈজ্ঞানিককে সব সময়েই নিজেকে দূরে রাখিয়া কাজ করিতে হয়। তাহার নিজস্ব সংস্কার বা খেয়াল যাহাতে কোথাও গোলমাল না করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক খাদ্য-সম্ভার ও লোক সংখ্যা এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে দুই উপায়ে সাহায্য করিতে পারেন। অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন, বা হয় লোক জন্ম নিয়ন্ত্রণ, ঠিক এই রকম ভাবে পৃথিবীর মাল-মসলার বিলি ব্যবস্থা জিনিসের আধিক্য বুঝিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানে লোকের বসতি নির্ম্মাণ করিয়া দেশে দেশে কাড়াকাড়ির মধ্যে একটা সংযম আনিতে বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করিতে চান। তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি—কি আছে কি

নাই আর কি দরকার ও কি জোগাড় করা যাইতে পারে—এই সব খবরের উপর নির্ভর করে। কিন্তু লোকের মনে যে স্তরে স্তরে অনেক আবর্জনা স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছে তাহা পাহাড়ভাঙা ডিনামাইটের কাছে নিষ্ফল। মানুষের মন পরিষ্কার করিতে একমাত্র সে মিস্ত্রীই কৌশলী, বাহিরের সরঞ্জাম মনের ময়লা টানিয়া বাহির করিতে পারিবে না।

ব্যবসাদার যে জগত কল্পনা করেন তাহাতে তাহার দোকানের পরিধিটাকে কেবল বাড়াইয়া সারা জগতময় শাখা ছড়াইয়া দিতে চাহেন। তিনি যে ভাবে এ যাবৎ অনেক লোকের উপকার করিয়াছেন সেই রকম উপকারের মাত্রাটা আরো বিস্তীর্ণ করিতে চান। তাঁর ব্যবসা যখন ধাপে ধাপে বাড়িয়া চলিয়াছে তখন ইহাকেই জগতের আয়োজন-প্রয়োজনের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ব্যবসাদারের যুক্তি যে তাহার ব্যবসার মূল যে কোথায় আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে তাহা তাঁহার নজরে আসে নাই। ব্যবসাদার অর্ধাহারী, অনাহারী (যাহাকেও বোধ হয় ভদ্রতার মানরক্ষার জন্য একশত বার ভান করিতে হয়) ও অপচারকারী প্রভৃতি খরিদ্দার জোগান দিয়া তাহার জীবনকে [illegible] খণ্ডিত করিয়াছে এবং সেই জীবনকে বৃহদাকারে প্রতিফলিত করিতে চাহেন।

বর্তমানের বৃহৎ যুদ্ধ বৈজ্ঞানিকের সাধনাকে রাষ্ট্রকর্তারা বহুলভাবে পরিপোষিত করিতেছেন। তাহা হইলে আমাদের জীবন ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিকের গরিষ্ঠ প্রয়োজনের সূত্রপাত হইয়াছে ধরিয়া লইব কি?

মানদণ্ড

ইন্দ্রযব

ভোর বেলা। ঠাকুর্দার চায়ের দোকানের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। আটদশজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। ঠাকুর্দা বাক্সের সামনে বসিয়া শীতে কাঁপিতেছেন, আর ছোকরা চাকরটাকে কাজ করিতে উপদেশ দিতেছেন।

এমন সময় চা'র জন্য আমিও ঠাকুর্দার দোকানে ঢুকিলাম, ঠাকুর্দা একগাল হাসিয়া বলিলেন—"এই যে এস, এস। হরেন বড়বাবুকে এক কাপ চা দে তো।"

চা আসিল : সঙ্গে প্লেটে একটী কেক্।

আসর জমিয়া আসিয়াছে ; আমি আমার একেবারে ষোল কলায় পূর্ণ! এবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বড় বড় সেনানায়কদের দোষত্রুটী যখন নখদর্পণে ভাসিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল তখন এক মহা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল।

"ক্রিং-ক্রিং" ঘণ্টা বাজাইয়া সুন্দরবাবুর সাইকেল একটা পাক্ খাইয়া বাঁ দিকের রাস্তা দিয়া বেশ্যালয়ের দিকে অদৃশ্য হইল। সাইকেলের সামনে একটা বাজারের থলির মধ্য হইতে মুলার পাতা ঘাড় বাগাইয়া ছিল।

আলোচনার বিষয় বস্তুর কেন্দ্রস্থল বদল হইল ; একেবারে মহাসমর হইতে সুন্দরবাবু! সকলেরই ব্যাপারটা জানা ছিল। কমলা নামে একটী গণিকার জন্য রোজ ভোরে তাহার বাজার করা চাই।

উকীল মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, একেবারে স্কাউণ্ড্রেল মশাই, ভদ্রঘরের ছেলে একটা বেশ্যার জন্য রোজ বাজার করা—

মোক্তার জগবন্ধুবাবু বলিলেন—"মশাই শুধু কি তাই, বাড়ীতে সুন্দরী স্ত্রী রয়েছেন, তাঁ'র দিকে একবার ফিরেও চায় না। একেবারে অপদার্থ।"

কলেজের বাংলার ছাত্র মুকুল বলিল—আপনারা শুধু ঐ একটা দিকই দেখছেন। পড়েন নি ত, 'দেবদাস'? গণিকাদের মধ্যেও মশাই সতীর অভাব নেই। এ হয়ত সত্যিকারের কোন প্রেমের বন্ধন।

"তোমার মাথা" ঠাকুর্দা হাসিয়া বলিলেন "ঐ কমলার একলাখ টাকার চেক্ আছে। সুন্দরবাবুকে উইল করে দেবে কথা দিয়েছে।"

মুকুল শুধু বলিল—"একলাখ!"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—"বেশ ধড়িবাজ লোক ত!"

জগবন্ধুবাবু বলিলেন—"বাহাদুর বেটা!"

অন্যান্য সকলের চোখ ঈর্ষা ও বিস্ময়ে গোল হইয়া উঠিয়াছে!

ঠাকুর্দা বসিয়া মুচকি হাসিতেছেন।

সঙ্গীত ও সমাজ

শ্রীসুধাময় গোস্বামী গীতিসাগর

মানুষের সমাজ সৃষ্টি সম্বন্ধে মনীষীরা যা'ই বলুন না কেন, একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য কোরলে মনে হবে যে সমাজ সৃষ্টির মূলে আছে সম্মিলিত আনন্দের উপভোগ-স্পৃহা। মানুষ মানুষকে চায় 'আনন্দকে' পাবার জন্য। একাকী আনন্দের স্ফূর্তি হয়না বলেই মানুষের মানুষকে চাওয়া স্বাভাবিক। যাঁরা বলেন, সমাজের মূল ব্যক্তিগত জীবনে নিহিত আছে, কিম্বা যাঁরা বলেন, সমাজের নৈসর্গিক অর্থের স্বার্থে, তাঁরা সমাজ সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ করেন, কিন্তু সত্যই সমাজের মূল যেখানে, সেখানে তাঁরা দৃষ্টি দেন না। সে মূল হচ্ছে বহুর ভিতর দিয়ে এক-কে আস্বাদ করা, একের ভিতর দিয়ে বহুর আস্বাদ করা। একের এই বহুকে চাওয়া—বহুর এই এককে চাওয়া একটা নৈসর্গিক আনন্দেরই বিকাশ মাত্র। সমাজ জীবনের ভিত্তি এইখানে। জীবনের ভিতরে এই ভিত্তি মহিমায় সুদৃঢ়। তাই দেখ্‌তে পাই যে বৈদিকদের উপাসনা সকলও শুধু তাঁর নিজের ভিতরেই আবদ্ধ ছিলনা, একটা নৈসর্গিক নিজকে ছড়িয়ে দিল সারা বিশ্বে। মানুষের ভিতরে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা আছে, যা' তাকে তার আপন কেন্দ্র হ'তে বিশ্বকেন্দ্রে আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণই হচ্ছে—সমাজ সৃষ্টির মূলে। এই আকর্ষণই মানুষের যা' কিছু সৃষ্টি ও শক্তিকে সমাজের সেবায় নিয়োজিত ক'রে মানুষের সমাজকে সুন্দর কোরে তুলেছে বিরাটের অনুভূতি স্পর্শে। সমাজের ভিতরেই মানুষ দেখেছে সেই বিরাটের মূর্তি ও ছায়া।

মানুষের সৃষ্টি সকল অবদানের ভিতরে সঙ্গীত একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। এখানে বিবেচ্য এই, সমাজে সঙ্গীতের কি প্রভাব এবং সমাজের ক্রমবিকাশকে কিরূপে সঙ্গীত সাহায্য করে। বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত মানুষের ভিতর সব সময়ই সর্বাধিক পরিমাণে আনন্দ দেয়। তার গতি হ'চ্ছে স্থূল হ'তে সূক্ষ্মে। মানুষের জীবন প্রায়শঃই বিশৃঙ্খলতায় বাধিত পরিপূর্ণ, নানাবিধ বিরুদ্ধ শক্তির সমাবেশে এই বাধা বা দুর্দশার উৎপত্তি প্রায়ই হয় মানসিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের অভাব থেকে। এই সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনকে সৌন্দর্য্য দান করে। সঙ্গীতের প্রধান কাজ হচ্ছে জীবনের ভিতর এই সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত করা। এ'র ভিতরে এমনই একটা শক্তি আছে যা আমাদের চিত্তকে এক দিব্যছন্দে লীলায়িত করে। শুধু তাই না, সঙ্গীতের সুর তরঙ্গ আমাদের চিত্তবৃত্তিকে অপূর্ব সূক্ষ্ম রসানুভূতির শক্তিতে সমৃদ্ধ করে, ব্যাপকতা সম্পাদন করে, আমাদের চেতনাকে ঊর্ধ্ব উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে মানব জীবনকে সকল সুষমায় মণ্ডিত করে। সঙ্গীতের ভিতর এমনই 'রসধ্বনি' আছে যা' ক্রমশ: আমাদের চিত্তকে তার সমুদয় ক্লেশ হ'তে মুক্ত ক'রে বিশ্বদেবের সহিত পরিচয় করিয়ে পরিচালিত করে। সঙ্গীতের এই হ'ল শ্রেষ্ঠ অবদান।

বিধাতাতে উদ্বুদ্ধ হ'তে হ'লে সঙ্গীত যত সাহায্য ক'রতে পারে এমন বোধ হয় আর কিছুতে সম্ভব হয়না। বিশ্বপূর্ণ সত্য 'সুর' ক্রমেরই শব্দের বিকাশ। আমাদের চিত্তের উপর সুরের অদ্ভুত প্রভাব আছে। এই জন্য আমরা দেখ্‌তে পাই, মানুষের প্রাথমিক বিধাতাকে উদ্দেশ হ'য়েছে সঙ্গীতে। মানুষের হৃদয়ে সঙ্গীতময় প্রকাশ দেয় সঙ্গীতের রূপ। কথা যেখানে পঙ্গু, ভাষা যেখানে পরাহত, সুরই একমাত্র সেখানকার গতি। বিশ্বের অচিন্ত্যপূর্ব অনন্ত সৌন্দর্য্য সুষমা মানুষকে যখনই আকৃষ্ট করেছে ঈশ্বরীয় সত্তার দিকে, তখনই মানুষের চিত্তবৃত্তির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হয়েছে; সুরে ও সঙ্গীতেই। এই ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণাবাহক সঙ্গীত, আমাদের বিশ্বচেতনার সহিত পরিচয় করিয়ে দিয়ে শুধু একটা সাময়িক আনন্দই দেয়না, ইহা বিরাটের জ্ঞান দেয়। সঙ্গীতের সব চেয়ে পূর্ণ সার্থকতা এইখানেই। সঙ্গীতের এই পরম সার্থকতা বহু লোকের জীবনেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এ ছাড়া সঙ্গীতের আরও সার্থকতা রয়েছে; আমাদের জীবনে ভাবের নানা বৈচিত্র্য সম্পাদন করা। সুর চিত্তে আঘাত ক'রে অন্তরে বৈপুল্য সৃষ্টি করে। সুর-মূর্চ্ছনা হয় ভাব-মূর্চ্ছনার কারণ। একটি রাগের ভিতর সঙ্গীত কতো না ভাব জাগিয়ে দিয়ে আমাদের জীবনকে আনন্দময় করে তোলে। সঙ্গীত শুধু একটা রসেরই সৃষ্টি করে না বহুবিধ রস জাগিয়ে তোলে। সঙ্গীত বিশেষ বিজ্ঞানালোকে সঙ্গীত বিশেষ প্রাণলোকে নানা উদ্দীপনা জাগায়। প্রাণশক্তি ভাবশক্তি এবং বিজ্ঞানশক্তিকে উদ্বোধিত করাবার এমন সহজ উপায় আর নাই।

কিন্তু সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্যক্তিগতভাবেই এই শক্তিগুলোকে জাগায় না, সমষ্টিগতভাবে এদের উদ্বোধ করে। সমষ্টির ভিতর এক-প্রাণতা একতাবোধমূলকতা একবিশ্বাসপ্রতিষ্ঠা—সঙ্গীত যেমন কোরতে পারে তেমনটী আর কিছুতেই হয় না। সঙ্গীতের এই সমষ্টিশক্তি সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর। একজন সঙ্গীতজ্ঞের অনুভূতির ধারা অনেকের ভিতর আপনি প্রবাহিত হয়। সমষ্টির ভিতর জ্ঞান ও আনন্দকে প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজের অন্তরকে সঙ্গীত পবিত্র এবং কমনীয় করে তোলে; সমষ্টিগত পবিত্রতা ও কমনীয়তা সঙ্গীত অন্যাপেক্ষা দ্রুতগতিতে প্রতিষ্ঠিত করে। এই জন্যই সর্বদেশে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত উপাসনায় সঙ্গীতের একটা প্রধান স্থান আছে। কারণ সুরের স্পন্দনে অন্তর জড়তা হ'তে মুক্ত হয় এবং ক্রমশ: দিব্যভাবে পূর্ণ হয়। সঙ্গীত চিরকালই মানুষের এই আনন্দস্পৃহা জাগিয়েছে ও চিরকাল জাগাবে। ফলত:—সুর অনুভূতির প্রাবল্য সম্পাদন করে দেহস্তরে, বোধস্তরে, এবং আনন্দস্তরে। এইজন্য সঙ্গীতের যেমন একদিকে উপকারিতা আছে, তেমনি অন্যদিকে অপকারিতাও আছে। সঙ্গীত বিশেষ আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে প্রখর করে দেয়, কখন কখন ভুল আনন্দলোকের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এ সম্ভাবনা সেইখানেই হয়, যেখানে সুর আমাদের অন্তঃকরণের উচ্চ গ্রামগুলিকে স্পর্শিত না ক'রে নিম্নগ্রামগুলিকেই স্পর্শ করে। যেখানে সঙ্গীত প্রাণের মূর্চ্ছনাকে সংহত না করে উৎক্ষিপ্ত করে, সেইখানেই এরূপ সম্ভাবনা আসে। এইজন্যই বোধহয় চিত্তবিভ্রমকর উন্মাদন-কারী সঙ্গীত অপেক্ষা শান্ত ও সুসংযত সঙ্গীতের দাম অতি উচ্চে। এইজন্য তাল-সঙ্গীত অপেক্ষা ভাবোদ্বোধিনী-শক্তিশালী সঙ্গীতের কার্যকারিতা বেশী।

তোমার লাগি

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

আজকে রাতের অন্ধকারে
        বাহির হব দুয়ার খুলে,
তোমার অভিসারের লাগি
        মন যমুনার কূলে কূলে।
    তোমার বাঁশীর সুরে সুরে,

গুঞ্জরিত মোর নূপুরে
দুলায়িত অলক মাথায়—
        উড়বে জলে কূলে কূলে
তোমার লাগি বাহির হব
        বঁধু, আমার দুয়ার খুলে।

গুপ্তসম্রাটগণের আদিবাসস্থান

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ্ ডি

গত অগ্রহায়ণ মাসের "ভারতবর্ষে" আমি ইৎসিঙের বিবরণের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে গুপ্তসম্রাটগণের আদি বাসস্থান বরেন্দ্রী ছিল। গত চৈত্র মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ডক্টর সরকার মনে করেন ইৎসিঙের বিবরণ খাঁটি ইতিহাস হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহাতে শুধু এই মাত্র প্রমাণ হয় যে, মালদহ কিংবা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত মৃগস্থাপন শ্রীগুপ্ত নামক নরপতির রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল।

ইৎসিঙের বিবরণ কেন গ্রহণযোগ্য নয় এই সম্বন্ধে ডক্টর সরকার কোন কারণ দেখাইতে সমর্থ হন নাই। মিঃ এলান ও ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ইহা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ এলান ইৎসিঙের মহারাজ শ্রীগুপ্ত ও গুপ্তলিপিতে উল্লিখিত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পিতামহ মহারাজ শ্রীগুপ্ত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। ডক্টর রায়চৌধুরী ইৎসিঙের গুপ্তকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পিতামহের কোন এক পূর্বপুরুষ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে মহারাজ শ্রীগুপ্ত ক্ষুদ্র জনপদের শাসক ছিলেন। বরেন্দ্রী ভিন্ন অন্য কোন জনপদ শ্রীগুপ্তের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যেহেতু গুপ্তেরা পৌরাণিক মগধে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সুতরাং মগধ গুপ্তের শাসনাধীন ছিল এইরূপ যুক্তি অর্থহীন।* এই সব কারণে শ্রীগুপ্তের রাজ্য বরেন্দ্রীতে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ ডক্টর সরকার মনে করেন—বায়ু, ভাগবত, বিষ্ণু প্রভৃতি "প্রাচীন পুরাণসমূহ গুপ্ত যুগের প্রথম ভাগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ এই যে এইগুলিতে ঐতিহাসিক রাজবংশসমূহের বর্ণনা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে আসিয়াই শেষ করা হইয়াছে।" বায়ু, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে আছে যে "গুপ্তবংশীয় নরপালগণ গঙ্গার নিকটবর্তী প্রয়াগ, সাকেত এবং মগধ শাসন করিতেন। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে এই বর্ণনায় সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পূর্বকালীন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অর্থাৎ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে।" এই বর্ণনায় বাঙ্গলা দেশের কোন অংশেরই উল্লেখ নাই। আদিম গুপ্তরাজগণের আধিপত্য যে বাঙ্গলা দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না ইহা তাহার "প্রবল প্রমাণ।" এই প্রমাণের তুলনায় ইৎসিঙের বিবরণটি নিতান্তই মূল্যহীন।

ডক্টর সরকার মূল "প্রাচীন পুরাণ"গুলির পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিলে তাহার এই মন্তব্যগুলির অসারত্ব নিজেই বুঝিতে পারিতেন। গুপ্তবংশের রাজারা প্রয়াগ, সাকেত ও মগধ শাসন করিতেন ইহা বায়ু, ভাগবত ও বিষ্ণু পুরাণে আছে এইরূপ মনে করা ভ্রমাত্মক। এই সম্বন্ধে উক্ত পুরাণগুলিতে যে পাঠ পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বায়ুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে—(বঙ্গবাসী, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেতং মগধাংস্তথা।
এতান্ জনপদান্ সর্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ।

. . . .

কোশলাংশ্চান্ধ্র পৌণ্ড্রাংশ্চ তাম্রলিপ্তান্ সসাগরান্।
চম্পাঞ্চৈব পুরীং রম্যাং ভোক্ষ্যতি দেবরক্ষিতান্।
কলিঙ্গা মহিষাশ্চৈব মহেন্দ্র নিলয়াশ্চ যে।
এতান্ জনপদান্ সর্বান্ পালয়িষ্যতি বৈগুহ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খৃঃ ১০৬৬ অব্দে এবং খৃঃ ১৫০০ অব্দে লিখিত দুইখানা বিষ্ণুপুরাণের পুঁথি আছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত বিষ্ণুপুরাণের কোন পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই দুইখানা পুঁথিতে বিবৃত হইয়াছে—

অনুগঙ্গং প্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ মগধান ভোক্ষ্যন্তি
কোশলোড্র পুণ্ড্র তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীঞ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিতাতি।
কলিঙ্গ মাহিষকমাহেন্দ্রো ভৌমান্ গুহাঃ ভোক্ষ্যন্তি।

বঙ্গবাসী সংস্করণের বিষ্ণুপুরাণে আছে—(১৯০ পৃষ্ঠা) অনুগঙ্গা প্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি। কোশলৌড্র তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীঞ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিতাতি। কলিঙ্গ মাহিষিক মাহেন্দ্র ভৌমা গুহাঃ ভোক্ষ্যন্তি। কৃষ্ণশাস্ত্রী গুর্জর কর্তৃক মুদ্রিত বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে (৪র্থ খণ্ড, ৩৩ পৃঃ)—অনুগংগা প্রয়াগং মাগধাঃ গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি কোশলোড্র তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীং চ দেব রক্ষিতো রক্ষিতাতি। বিষ্ণুপুরাণের কোন পুঁথিতে সাকেত এবং মগধের উল্লেখ নাই। কৃষ্ণশাস্ত্রীর সংস্করণে গুপ্তাশ্চ স্থলে গুহাশ্চ পাঠ আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগবতপুরাণের পুঁথিতে এবং ভাগবত-পুরাণের বঙ্গবাসী ও বোম্বাই সংস্করণে বিবৃত হইয়াছে—

অনুগঙ্গমা প্রয়াগং গুপ্তাং ভোক্ষ্যন্তি মেদিনীম্।

চতুর্দশ শতাব্দীতে শ্রীধরস্বামী ইহার টীকা করিয়াছেন—অনুগঙ্গা গঙ্গাদ্বারমারভ্য প্রয়াগ পর্যন্তং গুপ্তান্ পালিতান্ মেদিনীং ভোক্ষ্যন্তি। অর্থাৎ গুপ্তেরা গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রয়াগ পর্যন্ত শাসন করিবে। ভাগবত পুরাণে দেবরক্ষিত এবং গুহদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। Burnouf এর Paris সংস্করণে "গুপ্ত" শব্দটি পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত বায়ু, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের পাঠ হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে বায়ু পুরাণের মতে গুপ্তেরা সাকেত, প্রয়াগ ও মগধ শাসন করিবে; বিষ্ণু পুরাণের মতে তাহারা শুধু প্রয়াগ ও মগধ শাসন করিবে; ভাগবত পুরাণের মতে তাহারা হরিদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে "গুপ্ত যুগের প্রথম ভাগে লিখিত" * এই পুরাণগুলির মধ্যে গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে বর্ণনায় বিষম পার্থক্য

---

* হর্ষবর্ধন ও প্রতিহার ভোজ কনৌজে রাজত্ব করিতেন। কনৌজ তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের শাসনাধীন ছিল না।

* "প্রাচীন পুরাণ"গুলিতে গুপ্তবংশের পরবর্তী আর কোন রাজবংশের উল্লেখ নাই দেখিয়া মিঃ পার্জিটার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইহারা গুপ্তযুগের প্রথমভাগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সঙ্কলিত হইয়াছিল। নিছক কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে যে এই সিদ্ধান্ত বজায় রাখা যায় না তাহা মিঃ পার্জিটারের পুরাণ সম্বন্ধে সমালোচনা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। মৎস্য পুরাণে অন্ধ্র বংশের পরবর্তীকালের আর কোন রাজ বংশের উল্লেখ নাই। উপরোক্ত যুক্তানুসারে সিদ্ধান্ত হইবে যে মৎস্যপুরাণ অন্ধ্রদের পতনের পর ও গুপ্তবংশের উত্থানের পূর্বে রচিত হইয়াছে। কিন্তু কতগুলি বিশেষ কারণে মৎস্যপুরাণ বায়ুপুরাণের পরবর্তী যুগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া সকলেই মনে করেন। ইহা দ্বারা যে যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া বায়ুপুরাণের তারিখ ঠিক করা হইয়াছে তাহার অসারত্ব প্রমাণ হইবে। এই গোলযোগের মীমাংসার জন্য মিঃ পার্জিটার অনুমান করিয়াছেন যে মৎস্য পুরাণের রাজবংশ বিবরণের অধ্যায় অন্ধ্র বংশের পতনের অব্যবহিত পরে রচিত হইয়া

আছে। এমতাবস্থায় ইঁহাদের "সমসাময়িক বলিয়া ভাবিয়া ইতিহাস রচনার উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করিলে ভ্রমে পতিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

উপরে বায়ুপুরাণ হইতে যে পাঠটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা মিঃ পার্জ্জিটার শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ডক্টর সরকার এই পাঠই প্রমাণ স্বরূপ তাহার প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলেও বায়ুপুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না। উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে বিবৃত হইয়াছে যে—"গুপ্তবংশ প্রয়াগ, সাকেত ও মগধ শাসন করিবে, দেবরক্ষিতেরা কোশল, অন্ধ্র, *পুণ্ড্র*, তাম্রলিপ্ত ও চম্পানগরী শাসন করিবে এবং গুহ কলিঙ্গ, মাহিষ ও মহেন্দ্রপর্ব্বতবাসীদের শাসন করিবে। গুপ্তবংশীয়েরা, দেবরক্ষিতেরা এবং গুহ যে একই সময়ে নিজেদের রাজ্য শাসন করিবেন তাহা বায়ু এবং বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে (তুল্য কালম্ ইত্যাদি)। ডক্টর সরকারের মতানুসারে বায়ুপুরাণের এই বিবরণ "সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বকালীন" রাজনৈতিক অবস্থা উল্লেখ করিতেছে। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপি হইতে বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। এলাহাবাদ লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই সময়ে অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে কোশলের রাজা মহেন্দ্র, বেঙ্গির (অন্ধ্র) রাজা (সালঙ্কায়ন বংশের) হস্তিবর্ম্মা, কট্টুরের রাজা স্বামীদত্ত, পিষ্টপুরের রাজা মহেন্দ্রগিরি, এরণ্ডপল্লির রাজা দমন, এবং দেবরাষ্ট্রের রাজা কুবের ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কট্টুর, পিষ্টপুর, এরণ্ডপল্লি এবং দেবরাষ্ট্র কলিঙ্গ দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বলা বাহুল্য সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বায়ুপুরাণের সহিত এলাহাবাদ লিপির কোন মিল নাই। এলাহাবাদ লিপির ঐতিহাসিক মূল্য যে বায়ুপুরাণ হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এমতাবস্থায় উপরে উল্লিখিত বায়ুপুরাণের বিবরণ যে কবির কল্পনাপ্রসূত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া আমার "দিগ্বিজয়ের সম্ভাবনা সন্দেহ করা" যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

এলাহাবাদ লিপিতে সমুদ্রগুপ্তের বরেন্দ্রী (উত্তর বঙ্গ) বিজয়ের উল্লেখ নাই, অথচ সমতট, ডবাক, ও কামরূপের নৃপতিগণের তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকারের কথা আছে। ইহা হইতে আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে বরেন্দ্রী গুপ্ত রাজ্যভুক্ত ছিল ! ডক্টর সরকার এই মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এলাহাবাদে বর্ণিত সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত আর্য্যাবর্ত্তের নয় জন নরপতির একজন যে বরেন্দ্রীর শাসনকর্তা ছিলেন না ইহা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। এই তালিকায় বাঙ্গালী রাজার নাম থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব।

ডক্টর সরকার যদি তালিকাভুক্ত নরপতিবৃন্দের মধ্যে কোন ব্যক্তি বরেন্দ্রীর শাসনকর্তা ছিলেন তাহা উল্লেখ করিতেন তবে এ বিষয়ে আলোচনা করা সহজসাধ্য হইত। উক্ত নরপতিবৃন্দ কোন কোন দেশের শাসক ছিলেন সেই সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ একটা মোটামোটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ নয়জন আর্য্যাবর্ত্তের রাজার মধ্যে কেহ উত্তর বঙ্গের শাসক ছিলেন বলিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ মত প্রকাশ করেন নাই।*

উপরে উল্লিখিত সমালোচনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে ডক্টর সরকারের যুক্তিগুলি সম্পূর্ণ মূল্যহীন। গুপ্ত সম্রাটগণের আদি নিবাস বরেন্দ্রী ছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।†

পুরাণ হইতে নকল করা হইয়াছে। ভবিষ্য পুরাণের বর্দ্ধিত সংস্করণ গুপ্ত যুগের প্রথম ভাগে রচিত হয়। বায়ুপুরাণের রাজবংশের বর্ণনা ভবিষ্যপুরাণের এই বর্দ্ধিত সংস্করণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই জন্যই বায়ুপুরাণে গুপ্তদের উল্লেখ আছে এবং মৎস্য পুরাণে তাহা নাই। মিঃ পার্জ্জিটারের এই অনুমানের মধ্যেও যে বিশেষ অসামঞ্জস্য আছে তাহা ডক্টর হাজরা মহাশয় তাঁহার কৃত Pauranic Records on Hindu rites and customs পুস্তকে সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। ডক্টর হাজরা অনুমান করেন যে মৎস্যপুরাণের রাজবংশ বর্ণনা গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে রচিত বায়ুপুরাণের প্রথম সংস্করণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভাগবত পুরাণে গুপ্তগণের উল্লেখ আছে কিন্তু সমসাময়িক দেব রক্ষিতদের ও গুহের উল্লেখ নাই। যে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মিঃ পার্জ্জিটার ও ডক্টর হাজরা মৎস্য পুরাণের রচনার তারিখ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা দ্বারা ভাগবত পুরাণের রচনার তারিখ নির্ণয় করা সহজসাধ্য হইবে না। সুতরাং "প্রাচীন পুরাণ" সমূহের রচনার যে তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা যে অনেকটা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

* আমার মূল প্রবন্ধে আমি বিশেষজ্ঞদের "মতের দোহাই" দিয়াছি বলিয়া ডক্টর সরকার অসন্তুষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রতিবাদ পত্রে তিনি নিজেকে অনুরূপ দোষে দুষ্ট করিয়াছেন দেখিয়া এই প্রবন্ধে কোন কোন স্থলে পুনরায় বিশেষজ্ঞদের "মতের দোহাই" দিতে সাহসী হইলাম।

† ডক্টর সরকার তাহার প্রতিবাদ পত্রের পাদটীকায় সমুদ্রগুপ্ত ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া ইহার সমালোচনা করা আবশ্যক বোধ করিলাম না। ফাল্গুন মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত [illegible] রায় মহাশয় প্রবল যুক্তি দ্বারা এই মতের অসারত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদের উত্তরে ডক্টর সরকার যে সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই মূল্যহীন বলিয়া মনে হয়।

দয়িত দরশ

কবিরঞ্জন শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

চোখের দেখায় যা দেখি গো
সে তো আমার নয় দেখা!
হাজার জনের আলিঙ্গনেও
হায় যে আমি রই একা!

প্রেমের রঙিন আলোক জেলে,
দেহলো মনের মনন জেলে,
এই রঙীন অন্তর-মন—
চাই না বাহির রূপ-রেখা!
চোখের দেখায় যা দেখি গো
সে তো আমার নয় দেখা।

কমল হাতের আলতকে,
পরশ দিল আমার বুকে,—
অন্তর মাঝে পাই যে কবে
মোর দয়িতের পদ্ রেখা।
হাজার জনের আলিঙ্গনেও
তবুও যে হায় রই একা!

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় মূর্তিপূজা ও মন্ত্রশক্তি

শ্রীভবানীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ মূর্তি পূজার পক্ষপাতী হবেন না একথা জানা থাকলেও এ বিষয়ে সাধক রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য। বস্তুতঃ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ সকল সম্প্রদায়ের অতীত ছিলেন। আসল রবীন্দ্রনাথকে আমরা সেখানেই পাই। ১৩১৭ সনের মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্ম সমাজের চেয়ে অনেক বড়ো; এমন কি, এ'কে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও এ'কে ছোটো করা হবে। আমি বলছি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব।...আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলব না এই সত্য মনে নিয়ে আমি এসেছি, যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত ক'রে দেখ্‌ব; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ; এর ক্ষুদ্রতা নেই।" এই সত্যের আলোকে পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মানুভূতির উপায় হিসেবে মূর্তিপূজা এবং মন্ত্র বা মন্ত্রের উপযোগিতা সম্বন্ধে যা বলেছেন তারই আলোচনা সংক্ষেপে করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মানুভূতির সহজ উপায় স্বরূপ যাঁরা সাকার মূর্তি অবলম্বন করেন, রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁরা উপনিষদ্ অবহেলা করেন। তাঁর মতে, ঐকান্তিক সহজ কঠিন বলে কিছু নেই। সাঁতার দেওয়ার চেয়ে পায়ে চলা সহজ একথা স্বীকার্য; কিন্তু জলের উপর দিয়ে পায়ে চলার চেয়ে সাঁতার দেওয়া সহজ, একথা মানতে হবে। তিনি বলেন, সেই রকম, অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে মনের দ্বারা জানার চেয়ে প্রত্যক্ষ পদার্থকে চোখের দ্বারা দেখা সহজ, কিন্তু তাই বলে অতীন্দ্রিয় পদার্থকে চক্ষু দ্বারা দেখা সহজ না, এমন কি অসাধ্য। সাকার মূর্তির রূপধারণা সহজ সন্দেহ নেই, কিন্তু সাকার মূর্তির সাহায্যে ব্রহ্মের ধারণা একেবারে অসাধ্য, এই এই তাঁর মত। কারণ, ন কুম্ভকারাকৃতিভিঃ পরোঽসৌ। যিনি সত্যম্, কাল ও সাকার মূর্তি থেকে ভিন্ন এবং শ্রেষ্ঠ, তাঁকে আকৃতির মধ্যে বদ্ধ করে ধারণা করা এত কঠিন যে, রবীন্দ্রনাথের মতে "তাহা অসাধ্য, অসম্ভব, তাহা স্বতোবিরোধী।"

এইস্থলে রবীন্দ্রনাথ একটি গুরুতর প্রশ্ন করেছেন। তিনি বলেছেন, "কিন্তু সহজ কঠিনের কথা উঠে কেন? আমরা সহজ চাই, না সত্য চাই?" যদি আমরা সত্য চাই তবে কঠিন হলেও তাকে চাই, তার স্থলে কল্পনা চাই না। সত্য যদি সহজ হয় ত ভাল, যদি না হয় তবু সত্য বই গতি নেই। তিনি বলেন, পৃথিবী সূর্যের পিঠে প্রতিষ্ঠিত একথা ধারণা করা যদি কারও পক্ষে সহজ হয়, তবু সত্যের মুখ চেয়ে বিজ্ঞানপিপাসু তাকে অবজ্ঞা করেন। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিককে বালুকাসিক্ত এনে দেওয়া সহজ, কিন্তু তৃষ্ণা তাতে যায় না। সংসারে আমরা যখন অধ্যাত্মপিপাসা মেটাতে চাই, কল্পনার বালুসিক্ত তখন তা মেটে না। যত দুর্লভ হোক্, সেই তৃষ্ণার জল, সেই আত্মার একমাত্র প্রার্থনা পরমাত্মাকেই চাই। রবীন্দ্রনাথ বলছেন "ধর্মপথ ত সহজ নহে, ব্রহ্মলাভ ও সহজ নহে, সে কথা সকলেই বলে—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—সেই জন্যই মোহনিদ্রাগ্রস্ত সংসারীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ঋষি উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত'—না উঠিলে না জাগিলে এই ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম দুরত্যয় পথে চক্ষু বুজিয়া চলা যায় না—এবং অন্ধ ক্রীড়াচ্ছলে কল্পনাবাহিত মনোরথের গম্য নহেন। সংসারে যদি বিত্তলাভ, বিদ্যালাভ, অন্নলাভ সহজ না হয়,—তবে ধর্মলাভ, সত্যলাভ, ব্রহ্মলাভ সহজ, এমন আশ্বাস কে দিবে এবং সে আশ্বাসে কে ভুলিবে।"

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ", "প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ", "যদ্যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"—এই সকল ঋষি প্রবর্ত্ত উপদেশ স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, গৃহী ব্যক্তিকে কেবল ভক্তিতে নয় জ্ঞানে, কেবল জ্ঞানে নয় কর্মে, হৃদয়ে-মনে এবং চেষ্টায় সর্বতোভাবে ব্রহ্মপরায়ণ হতে হবে। অতএব সংসারে থেকে আমরা সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করবো, অন্তরাত্মার মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান অনুভব করবো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, সর্বদা সর্বত্র তাঁর সত্তা উপলব্ধি করতে হলে, চতুর্দিকের জড়বস্তুরাশিকে অপসারিত করে ব্রহ্মের মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন এবং আবৃত অনুভব করতে হলে, তাঁকে সাকাররূপে কল্পনাই করা যায় না। তিনি বলেন, "অনন্ত প্রাণের মধ্যে সমস্ত বিশ্বচরাচর অহর্নিশি স্পন্দমান রহিয়াছে, এই ভাব কি আমরা কোন প্রকার হস্তপদবিশিষ্ট মূর্তিদ্বারা কল্পনা করিতে পারি?" তাঁর মতে, সেই জগদ্ব্যাপী, জগদতীত এবং অনন্তপ্রাণ ব্রহ্মকে কোন নির্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ আকারের মধ্যে কল্পনা করতে গেলে, আকৃতির কঠিন ব্যবধানে মূর্তির '[illegible] অন্তরালে' তিনি আমাদের কাছ থেকে, আমাদের অন্তর থেকে দূরে ও বাইরে গিয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমার অশরীরী অনির্বচনীয় প্রাণ আমার আপাদমস্তক অখণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।...আবার আমার এই ক্ষুদ্রতম প্রাণের মধ্যে সেই পরমপ্রাণ আমার শরীরকোষের প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত সূক্ষ্মতম নক্ষত্রবর্তী বাষ্পাণুর প্রত্যেক আন্দোলনকে এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে, এক অপূর্ব অপরিমেয় ছন্দোবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা অনুভব করিয়া এবং অনুভবের শেষ করিতে না পারিয়া কি আমাদের চিত্ত পুলকিত প্রসারিত হইয়া উঠে না?" তারপর তিনি বলেছেন, "কোনও মূর্তির কল্পনা কি ইহা অপেক্ষা সহজে আমাদিগকে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন, খণ্ডতার কারাপ্রাচীর হইতে মুক্তিদানে সহায়তা করিতে পারে, অনন্তের সহিত আমাদের এমন অন্তরতম ব্যাপকতম যোগ সন্নিবদ্ধ করিতে পারে? সাকার মূর্তি আমাদিগকে সহায়তা করে না, ব্রহ্মকে দূরে লইয়া দুষ্প্রাপ্য করিয়া দেয়।"

রবীন্দ্রনাথ বলেন, যেই অদৃশ্যকে দৃশ্য, অশরীরীকে শরীরী, নির্বিশেষকে সবিশেষ এবং নিরাধারকে আধারবিশিষ্ট করলে ব্রহ্মের সঙ্গে দূরত্ব স্থাপন করা হয়, আর তখন আমাদের আত্মার অভয় প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়। কারণ ঋষি বলেছেন, "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি",—অর্থাৎ, সাধক যখন সেই অদৃশ্যে, অশরীরে, নির্বিশেষে, নিরাধারে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। আবার "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি"; অর্থাৎ, তিনি যখন কিন্তু এতে একটুও অন্তর অর্থাৎ দূরত্ব স্থাপন করেন তখন তিনি ভয়প্রাপ্ত হন। নিজের বক্তব্য সমর্থন করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঋষির এই সকল বাণী উদ্ধৃত করেন, কারণ, রবীন্দ্রনাথের সাধনা আমাদের প্রাচীন ভারতের ঋষিদের সাধনা।

এই সাকার মূর্তিপূজার সপক্ষে প্রধানতঃ দুটি কথা বলা যায়। একটি হচ্ছে, নিরাধার নির্বিশেষ অনন্ত ব্রহ্মকে ধারণা করা কঠিন, বিশেষতঃ সাধনার প্রথম অবস্থায়। অতএব অধ্যাত্ম সাধনার উচ্চ অবস্থায় উঠবার সোপান হিসেবে অনন্ত ব্রহ্মের প্রতীকস্বরূপ মূর্তিপূজা চলে। যাঁরা এই সোপান অতিক্রম করেছেন এবং নির্গুণ ব্রহ্মের সঠিক ধারণা করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে প্রতিমাপূজা অনাবশ্যক। অপরটি-হচ্ছে

এই যে, দুর্বল মানবপ্রকৃতির সকল রকম পূর্ণতা ও চরিতার্থতা আমরা ঈশ্বরের মধ্যে পেতে চাই; আমাদের যে প্রেম তা কেবল জ্ঞানে বা ধ্যানে তৃপ্ত হয় না, সেবা করতে চায়। আমাদের এই চিরন্তন সহজ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য আমরা ঈশ্বরকে মূর্তিতে আবদ্ধ করে সেবা করি। প্রথমটি সাধনার সাফল্য লাভের জন্য উচিত অনুচিত কর্তব্যের কথা, দ্বিতীয়টি মানবমনের সহজ প্রেরণার কথা।

অনন্ত ঈশ্বরের প্রতীক হিসেবে প্রতিমাপূজার বিপদ্ হচ্ছে এই যে, প্রতিমার পূজা করতে করতে আমরা ভুলে যাই যে প্রতিমা পূজা সোপান মাত্র, ভুলে যাই যে তাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। আমরা অনন্ত ঈশ্বরকে ত্যাগ করে প্রতিমাতে বদ্ধ হয়ে পড়ি এবং এইভাবে সাধনার পথে পেছিয়ে যাই। বলা বাহুল্য, প্রতিমা পূজার যথার্থ উদ্দেশ্য হতে ব্যর্থ হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন, মানুষ হাতে গড়া মূর্তি না থাকলে দৃশ্যমান সমস্ত জগৎকেই প্রতীক হিসেবে নিয়ে অনন্ত ব্রহ্মের ধারণার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, কিন্তু মানুষগড়া প্রতিমা নিয়ে সারাজীবন খেলা করা কখনই ধর্ম নয়।

দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, সংসারের সমস্ত কর্তব্য পালনই ব্রহ্মের সেবা, বিশেষ মূর্তির প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, প্রতিমাকে অন্নবস্ত্র পুষ্পচন্দন দান ক'রে আমাদের কর্ম চেষ্টার কোন মহৎ পরিতৃপ্তি হতেই পারে না; তাতে আমাদের কর্তব্যের আদর্শকে তুচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ করে আনে। তাঁর মতে, ব্রহ্মের প্রতি যার গভীর নিষ্ঠা, সে পরিবারের প্রতি, দেশের প্রতি, সকলের প্রতি মঙ্গল চেষ্টা বিস্তার ক'রে ভক্তিবৃত্তিকে সফলতা দান করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দীনকে অন্নদান, দুঃখিতকে অভয়দান ইহাতেই আমাদের সেবা চেষ্টার সার্থকতা। প্রতিমার সম্মুখে অন্নজল উপহরণ করা ক্রীড়ামাত্র, তাহা কর্ম নহে, তাহা ভক্তিবৃত্তির মোহাচ্ছন্ন বিলাস মাত্র, তাহা ভক্তিবৃত্তির সত্য সাধনা নহে। এই খেলায় যদি আমাদের মূঢ় হৃদয়ের কোন সুখ সাধন হয় তবে সে ত আমাদের আত্মসুখ, আমাদের আত্মসেবা, তাহাতে দেবতার কর্ম সাধন হয় না।" অনন্ত ঈশ্বরকে ধারণা করা কঠিন বলে তাঁকে মূর্তিতে আবদ্ধ করে যে পূজা হয়, তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—মহাজ্ঞানী হওয়া, প্রকৃত নিষ্ঠা দুঃসাধ্য, মহৎ কর্মের অনুষ্ঠান দুরূহ সন্দেহ নাই; তাই বলে তাকে লঘু করে, খর্ব করে, মিথ্যা করে আমরা সুফল লাভ করবো না। এতে মানব প্রকৃতির সর্বোচ্চ শিখরকে ক্রমেই মৃৎপিণ্ডে পরিণত করা হয় মাত্র। এই মৃৎপিণ্ডের খেলাকে আশ্রয় করে, অন্ধ যুক্তি আর অন্ধ ভক্তি দ্বারা ভাবপ্রবণতাকে আশ্রয় করে, ক্রমশ মন ও আত্মার মধ্যে আলস্য ও সঙ্কীর্ণতার বহুপ্রকার বীজ বপন করে আমরা ক্রমে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব অবনতির দিকেই চলেছি।

রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রতিমার চেয়ে বরং কোন কোন বিশেষ মন্ত্র বা শব্দ অপার ব্রহ্মের আভাস বা প্রতিচ্ছায়া আমাদের মনে জাগাতে সক্ষম। এখানে 'মন্ত্র' বলতে গায়ত্রী মন্ত্র এবং উপনিষদের বিশেষ বিশেষ শ্লোকগুলি, যা তিনি প্রায়ই উদ্ধৃত করেন, তাদেরই বোঝাচ্ছে। ঈশ্বরকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে সমস্ত চিত্তক্ষোভ থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার জন্যে এক একটি মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করাকে তিনি কার্যকরী বলে মনে করেন। শোনা যায় রামমোহন রায় গায়ত্রী মন্ত্রকে এইভাবে আশ্রয় করেছিলেন। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমিও উপনিষদের কোন কোন শ্লোককে এইরূপ আশ্রয়ের মত অবলম্বন করে থাকি। এইরকম এক একটি মন্ত্র তুফানের সময় হালের মত কাজ করে।"

ব্রহ্মের আরাধনায় রবীন্দ্রনাথ শব্দশক্তির প্রভাবও স্বীকার করেন। মানুষ সর্বদা রূপকের সাহায্যে চিন্তা করে। ধর্মের প্রধান ভাবোদ্দীপক শব্দগুলি তাদের পশ্চাতের চিন্তার রূপক হয় অর্থাৎ শব্দগুলি এক একটি চিন্তা বা ভাবের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। যেমন তার থেকে বাইরের ভাবোদ্দীপক বস্তু সহজেই এসে থাকে, তেমনি ঐ শব্দগুলিও তাদের আদি ভাবোদ্রেকে সমর্থ। প্রাচীন ভারতে পরমাত্মাকে এইভাবে 'বিদ্ধ' করবার শব্দ ছিল—ওঁ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, বাহ্য প্রতিমা আমাদের মানসিক ভাবকে খর্ব ও আবদ্ধ করে, কিন্তু এই ওঁ ধ্বনির দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করে দেয়। তিনি বলেছেন, "ওঁ একটি ধ্বনি মাত্র—তাহার কোন বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থ নাই। সেই শব্দ চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, কোন বিশেষ আকারে বাধা দেয় না। সেই একটিমাত্র ওঁ শব্দের মহা সঙ্গীত জগৎ সংসারের ব্রহ্মাণ্ড হইতে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে। সঙ্গীতের সুর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনির্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ওঁ শব্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি আমাদের উপাসনার মধ্যে একটি অনির্বচনীয়তা অবতারণা করিয়া থাকে।"

আধুনিক সমস্ত রকম ভারতীয় আর্যভাষায় যেখানে আমরা হাঁ বলি, রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রাচীন আর্য অর্থাৎ সংস্কৃত্ ভাষায় সেই স্থানে ওঁ শব্দের প্রয়োগ ছিল এ কথা জানা। ওঁ শব্দের অর্থ, হাঁ; সুতরাং ওঁ হচ্ছে স্বীকারোক্তি। আছে এবং পাওয়া গেল এই কথাটাকে স্বীকার। এই যে স্বীকারোক্তি ওঁ, এ ব্রহ্ম-নির্দেশক শব্দ হিসাবে প্রাচীন ভারতে গৃহীত হয়েছিল। "এই যে পরিপূর্ণতা বা সমস্তকে নিয়ে—অথচ যা কোনো খণ্ডকে আশ্রয় ক'রে নয়—যা চন্দ্রে নয় সূর্যে নয় মানুষে নয় অথচ সমস্ত চন্দ্র সূর্য মানুষে—যা কানে নয় চোখে নয় বাক্যে নয় মনে নয় অথচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে—সেই এককেই, সেই হাঁকেই, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই পরিপূর্ণতাকেই স্বীকার হচ্ছে ওঙ্কার।"

আমরা কে কাকে স্বীকার করি সেই সূত্রে আত্মার মহত্ত্ব। সংসারে কেউ একমাত্র ধনকেই স্বীকার করে, কেউ মানকে, কেউ শক্তিকে ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ জগতে একমাত্র ব্রহ্মকে স্বীকার ক'রে আত্মার শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। ঋষির এই স্বীকারের প্রতীক কোন প্রতিমা ছিল না, ছিল ওঁ শব্দ। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "উপনিষদের ঋষিগণ বলিলেন জগতে ও জগতের বাহিরে ব্রহ্মই একমাত্র ওঁ—তিনিই চিরন্তন হাঁ, তিনিই Everlasting yea। আমাদের আত্মার মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশকালকে অতিক্রম করিয়া তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ। এই মহৎ, নিত্য এবং সর্বব্যাপী যে হাঁ, ওঁ ধ্বনি ইহাকেই নির্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোন প্রতিমা ছিল না, কোন চিহ্ন ছিল না—কেবল এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল ওঁ।"

রবীন্দ্রনাথের সাধনা উপনিষদেরই সাধনা। উপনিষদের যুগে প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোন প্রতিমা ঋষিগণ আশ্রয় করতেন বলে শোনা যায় না। তাই উপনিষদের সাধক রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগেও ব্রহ্মের প্রতীক স্বরূপ কোন প্রতিমা স্বীকার করেন নি। কোন সাকার মূর্তি অপেক্ষা "অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়," বা "শান্তং শিবমদ্বৈতম্," বা "পিতানোঽসি," বা "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং" ইত্যাদি মন্ত্র এবং গায়ত্রী মন্ত্র এবং ওঁ শব্দ ব্রহ্মানুভূতির দুরূহ পথে আমাদের এগিয়ে দিতে অধিকতর সক্ষম বলে তিনি মনে করতেন।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু পাড়ার দশটা বখাটে ছোকরার অনুগ্রহ দৃষ্টি এমনভাবে তাহাকে দিনরাত তাড়া করিয়া ফিরিতে লাগিল যে সে অস্থির হইয়া উঠিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইল। তাহার দায়িত্ব নিতে রাজী হইলেন বলরাম ভিষকরত্ন স্বয়ং—চর-ইস্‌মাইলের সভ্যতা-বিবর্জিত দুর্গম দুর্গে বসিয়া পৃথিবীর ফেনাইয়া-ওঠা কলরব ভুলিয়া থাকা যাঁহার পক্ষে সব চাইতে সহজ। শুধু ভার লওয়াই নয়—মুক্তর প্রতি বলরামের স্নেহটা উদগ্র হইয়া উঠিল।

মিশিবার মতো লোক এখানে নাই। ভদ্রলোক যাহারা আছে তাহারা পত্নীসঙ্গহীন প্রবাস জীবন যাপন করে। অবশ্য তাই বলিয়া নারী সঙ্গহীন নয়। তিনশতাব্দী আগে পর্তুগীজদের সঙ্গে যে আরাকানীর দল এখানে আসিয়াছিল, বাংলা দেশের মাটির স্যাঁৎসেঁতে স্পর্শ লাগিয়া বংশক্রমে নোনা ধরিয়াছে তাহাদের। সামান্য কিছু ব্যয় করিলে তাহাদের মধ্য হইতে নৈশ-সঙ্গিনী সংগ্রহ করা কঠিন নয়।

কিন্তু তাহাদের সহিত বনাইয়া লওয়াটা সম্ভব নয়। মুক্তর দিন একাই কাটে একরকম। অবসর সময়ে বসিয়া বসিয়া সে দড়ি পাকাইয়া সিকা তৈরী করে, মনে মনে ভাবে সরঞ্জাম পাইলে ছোট ফাঁসের একখানা খেপ্‌লা জালও সে আরম্ভ করিয়া দিতে পারে।

অবসরও অবশ্য খুব বেশি সে পায়না। বলরামের জীবন-যাত্রায় যেন বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া চলিতেছে একটা। বাহিরের জগৎকে এক সময় খুব বেশি প্রশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় আজ সে জগৎটার উপরে প্রতিশোধ লওয়া চলিতেছে। ওজন করিয়া ধানের বস্তা বড় বড় নৌকায় চাপাইয়া দেওয়া, সুপারীর দাদন লইয়া দর কষাকষি, ইহার ফাঁকে ফাঁকে অবকাশ পাইলেই বলরাম আসিয়া মুক্তর আঁচলে মাথা গুঁজিতে চান। প্রথম প্রথম মুক্ত খুশি হইয়াছিল, কিন্তু আজকাল একটু একটু করিয়া সন্দেহ আসিতেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, শুধু আঁচলের আশ্রয় পাইলেই হয়তো বলরাম খুশি হইবেননা।

বাহিরে বন্ধুরা আজো আসিয়া জড়ো হয়। কিন্তু তামাক-সরবরাহে রাধানাথের আজকাল উদাসীনতা দেখা দিয়াছে। জীর্ণ বালিশটার তলায় রাখা তাসজোড়াকে সব সময়ে জায়গা-মতো পাওয়া যায়না; আবার যখন পাওয়া যায়, তখন এদিকে ওদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া রান্নাঘরখানায় হদিস মিলাইতে হয়।

সবচেয়ে বেশি করিয়া যিনি ব্যাপারটা উপভোগ করেন, তিনি হরিদাস।

হরিদাসের হাসির ভঙ্গিটা মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়া ওঠে। হাঁপানির টানের মতো সে হাসিটা বিচিত্রভাবে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। সরু গলা হইতে জিল্‌জিলে বুকখানার উপর ঝুলানো হাঁপানির চৌকোণা মাদুলিটা তাহারি সঙ্গে সঙ্গে দুলিয়া ওঠে, বয়োজীর্ণ কপালের ও গালের কতকগুলি বিশৃঙ্খল রেখা নানা আকারে যেন হাসির স্বরূপটা ব্যাখ্যা করিয়া দেয়।

দেখিয়া, বলরামের সমস্ত মনটা তিক্ত হইয়া ওঠে।

হাসি থামিলে হরিদাস বলেন—বুড়ো বয়সে বুঝি রং লাগছে কবিরাজের?

বলরাম লজ্জিত হন। কিন্তু বর্ণদোষে মুখের উপর লজ্জার রক্তিম আভা না পড়িয়া কালো রংটির উপর যেন বার্ণিশ লাগাইয়া দেয়। বলেন, বাঃ, কী বলছ।

হরিদাস অকস্মাৎ চোখ দুটি ছোট করিয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে বলরামের সর্বাঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। ঘরে আর লোকজন না দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়েন: বলি, সত্যি সত্যিই প্রেমের দায়ে তো?

বলরাম চমকিয়া বলেন, তার মানে?

হরিদাসের হাসি অশ্লীল হইয়া ওঠে। তারপর কানের কাছে মুখ লইয়া চাপা স্বরে কি যেন বলেন কবিরাজকে।

বলরামের চোখে মুখে সুস্পষ্ট কাতরতার ছাপ পড়ে।

—কী সব আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছ? তোমার মুখে কি কিছুই আটকায় না নাকি? ছি—ছি—ছি—

ছি-ছি-র মাত্রাধিক্যে হরিদাস চুপ করিয়া যান। তবু মনে হয় ধিক্কারের মাত্রাটা যেন একটু অসম পরিমাণে অধিক। নিজের প্রচ্ছন্ন দুর্বলতাটাকে ঢাকা দিবার জন্যই যেন বলরাম এত বেশি পরিমাণে সশব্দ হইয়া ওঠেন। কিন্তু বুঝিতে পারিয়াও হরিদাস কিছুই বলেননা। প্রকৃতির আত্মকেন্দ্রিক অসীম স্বতন্ত্রতার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম সামাজিকতার বন্ধনই এখানে ঢিলা হইয়া গেছে। অনুকূল পৃথিবী ও সমাজের দৃঢ় সংহতির মাঝখানে যেখানে প্রাচুর্য্য আছে চরিত্রহীনতার নিন্দা সেইখানেই সম্ভব; কিন্তু স্থানকালপাত্র হিসাবে সমাজের সংজ্ঞাটাই এখানে বদলাইয়া গেছে। মগ কিংবা আরাকানী অথবা পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি মেয়েদের সত্যি সত্যিই এমন কিছু বিবাহ করা চলেনা, কিন্তু তাই বলিয়া—জীবনের কোনো নির্দিষ্ট পরিধি যেখানে নাই, সেখানে মুক্তো বলরামের স্বগ্রামবাসিনী অথবা আর কিছু ইহা লইয়া আলোচনা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন।

• • •

[মণিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"বৃহস্পতিবার। শেষ রাত্রিতে বোট ছাড়িয়াছে। বুকের নীচে বালিশ দিয়া বাহিরে আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি—সমস্ত পৃথিবীটাকেই বিচিত্র বলিয়া মনে হইতেছে।

অন্ধকারের গাঢ় রংটা ক্রমশ ফিকা নীল হইয়া আসিতেছে। আকাশটার চেহারা দেখিতে দেখিতে কী দ্রুত ভাবেই বদলাইয়া গেল—যেন প্রকাণ্ড একখানা কার্বণ পেপারকে কে উল্টাইয়া ধরিল। তারাগুলির রঙ লাল হইয়া গেছে, একটু পরেই ঝরা

কাঁচের মতো ঘোলাটে হইয়া যাইবে। এই মুহূর্তে শুকতারার একটা তির্যক আলোর রশ্মি অদ্ভুত ভাবে আমার চোখমুখে আসিয়া পড়িতেছে।

নিজেকে যেন চিনিতে পারিতেছিনা। পিছনের হালের গোড়া হইতে কাঁচ্ কাঁচ্ করিয়া গোঙানির মতো কাতর শব্দ উঠিতেছে, পালে বাতাস ভরে ভাটার টান পাইয়া বোট আগাইয়া চলিতেছে তর তর করিয়া। মাঝে মাঝে ভাসিয়া-চলা কচুরির ঝাঁক হইতে পরিচিত এক ধরনের গন্ধ পশ্চিমী বাতাসে নাকে আসিয়া লাগিতেছে। মনে হইতেছে, আমার ভিতর হইতে কে আর একজন বাহির হইয়া আসিয়া এই জলভরা নদী আর আকাশকে অনুভব করিতেছে—এতদিন সে আমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, তবু কোনো সুযোগে আমি তাহার পরিচয় পাই নাই।

পৃথিবীকে আমরা কতটুকু জানি! আদিমতম যুগে আমাদের যে বর্বর পূর্বপুরুষেরা গুহা-গহ্বরে বাস করিত, পাথরের বল্লম দিয়া হিংস্র জন্তু বধ করিত, প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য হইতে শুকনো ডাল পালা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইত, আর সেই চকমকির আগুনে পশুর মাংস আধপোড়া করিয়া ক্ষুধা মিটাইত—তাহারাই তো পৃথিবীকে জয় করিবার সাধনা শুরু করিয়াছে।

তারপরে কত যুগ পার হইয়া গেল। সেই বর্বর মানুষদের মধ্যে বাহুবলে যে বড় হইল, সে হইয়া দাঁড়াইল দলপতি। প্রকৃতির বিশাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চারিদিক হইতে তাহাদের ঘিরিয়া আছে—সে বাধাকে জয় করিবার জন্য সৃষ্টি হইল মন্ত্রতন্ত্র, রচনা হইল দেবতার। আদিম পুরোহিত বা যাদুকর, তারপর কোন্ মুহূর্তে তাহার মাথায় সর্বশ্রেষ্ঠত্বের রাজমুকুট আর কপালে নররক্তের রাজটীকা আসিয়া পড়িল, অলিখিত ইতিহাসের পাতা হইতে তাহা মুছিয়া গেছে।

সেই হইতে শুরু হইয়াছে সংগ্রাম। সমাজের বুকে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অগ্রগামী মানুষ পৃথিবী হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়াছে। কৌতূহলের আকর্ষণ খানিকটা আছে, কিন্তু দেহে মনে তাহাকে পূর্ণরূপে আস্বাদন করিয়া, তাহার সহিত একাত্ম হইয়া যাইবার স্পৃহা তাহার নাই। তাহার জন্য আছে পার্লিয়ামেন্ট, আছে আইন, আছে গীর্জা এবং ধর্মমন্দির, আছে বিবাহ আর আছে যুদ্ধ।…

ভোর হইয়া আসিতেছে। সামনে শুকতারাটা একখণ্ড সাদা মেঘের তলায় লুকাইয়া গেল। অস্তেই নামিল হয়তো। একটা হালকা কুয়াশা দূরের নদীর উপর ধোঁয়ার মত ভাসিতেছে, এপার ওপার দেখা যায়না, হঠাৎ চমকিয়া মনে হয়, আমার এ যাত্রা বুঝি কখনো কোনোদিন সমাপ্তির ঘাটে গিয়া পৌঁছিবেনা।

কিন্তু পৃথিবী বিচিত্র। মনে হইতেছে, বাহিরের জল-বাতাস হইতে একটা অনাঘ্রাণিত গন্ধ, একটা অননুভূত স্পর্শ যেন যাদুমন্ত্রের ছোঁয়া বুলাইয়া আমাকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলিতেছে। কিন্তু ঘুমাইয়া পড়িতে ভয় করিতেছে আমার। হয়তো জাগিয়া উঠিয়া আমি আর আমাকে খুঁজিয়া পাইবনা—হয়তো দেখিব, আদিম পৃথিবীর আকাশে বাতাসে প্রাক্-সৃষ্টির অসংখ্য জীবাণুর সঙ্গে আমি মিশিয়া গেছি; হয়তো দেখিব প্রথম সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া-বেড়ানো প্রোটোপ্লাজমের মতো আমি জীবকোষের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। অন্তরের অণু-পরমাণুতে আমি যেন এই মুহূর্তে প্রথম পৃথিবীর ডাক শুনিতে পাইলাম।…

কিন্তু কানুপাড়া অনেক দূর। সন্ধ্যার আগে সেখানে গিয়া পৌঁছানো যাইবে না। সম্মুখে প্রসারিত নদীপথ সকালের আলোয় অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—সৃষ্টির চিরন্তন রহস্যের মতো দিক হইতে দিগন্ত-চক্রবালে তাহা প্রসারিত।

ডি-সুজার বয়স হইয়াছে, কিন্তু রক্তের জোর মরিয়া যায় নাই। লোকটা অক্লান্তভাবে খাটিতে পারে। ধান সুপারীর যে কারবার তাহার আছে, তাহা এমন প্রচুর নয় যে তাহাতে নিশ্চিন্তে সম্বৎসর খাইয়া থাকা যায়। সুতরাং ডি-সুজাকে অত্যন্ত খাটিতে হয়। এই বয়সেও তাহাকে নৌকা লইয়া প্রায়ই ঘুরিতে হয়, ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া সে সহরে যায়। দুইবার তাহার নৌকা ডুবিয়াছিল, কিন্তু সে মরে নাই। প্রথম বারে আড়াআড়ি মাইল তিনেক সাঁতরাইয়া সে পটুয়াখালির এক চড়ায় গোলপাতা বনে গিয়া উঠিয়াছিল, দ্বিতীয়বারে জামসের হাটের খেয়া ডুবিলে সে এক বোঝা পানের সহায়তায় তেঁতুলিয়ার ভৈরব রূপকে অস্বীকার করিয়াই পারে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিল।

সুতরাং ডি-সুজা দুঃসাহসী। এই সমস্ত অঞ্চলের সবরকমের বাধার সঙ্গেই সে একবার লড়াই করিয়া দেখিয়াছে। ফলে, সে যে শুধু ভয়কেই জয় করিয়াছে তা নয়, ইহার পুরস্কারস্বরূপ ডি-সুজা প্রয়োজনের অনেক বেশি রোজগার করে।

অবশ্য সেটার বাহিরে কোনো প্রমাণ নাই। লোকে সন্দেহ করে, মাটির নীচে কোথাও কোনো প্রচ্ছন্ন ধনভাণ্ডার আছে ডি-সুজার। অক্লান্ত ভাবে সে টাকা জমাইতেছে। কিন্তু এই টাকাটা কোথা হইতে, কী সূত্রে যে আসিতেছে, তাহা অনুমান করা কঠিন।

কোনো আভাস দিলে ডি-সুজা চটিয়া লাল হইয়া যায়।

লোকটার মুখ খারাপ। অশ্রাব্য একটা গালাগালি দিয়া বলে, একটু ভালো দেখছে কিনা, তাই চোখ টাটায় সকলের। আমার টাকা থাক বা না থাক, আমার যা ইচ্ছে করি বা না করি, তাতে কার কী আসে যায়?

ডি-সুজার সম্পর্কে সমালোচনা করে কিন্তু প্রতিবেশী ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ই বেশি। ইহাদের মধ্যে আবার ডি-সিল্ভা অগ্রণী। ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণ একটু আছে ডি-সিল্ভার।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। লিসি বড় এবং বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে তাহার সঙ্গে কোর্টশিপ্ করিবার ইচ্ছা অনেকেরই মনে মনে চাড়া দিতেছে। লিসির রংটা তামাটে আর নাকটা থাঁদা হইলেও মোটামুটি সুন্দরীই বলিতে হইবে তাহাকে। তাছাড়া নেপথ্য হইতে ডি-সুজার ধন-ভাণ্ডারের একটা দীপ্তি লিসির চোখে মুখে পড়িয়া তাহাকে আরো বেশি সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। বলা প্রয়োজন, লিসি ছাড়া ত্রিসংসারে ডি-সুজার আর কেউ আছে বলিয়া কাহারো জানা নাই।

অতএব সাহসে বুক বাঁধিয়া ডি-সিল্ভা একদা ডি-সুজার কাছে প্রস্তাবটা করিয়াই ফেলিল।

শুনিয়া ডি-সুজা প্রথমটা বিশ্বাস করিতে পারিল না একরকম। খানিকক্ষণ সে ডি-সিল্ভার মুখের দিকে মূঢ়ের মতো চাহিয়া রহিল,

রাজহাঁসের পাখার মতো সাদায়-কালোয় মিশানো তাহার ভ্রূ দুইটা চোখের উপরে যেন দুইটা উল্টানো জিজ্ঞাসা-চিহ্নের সৃষ্টি করিল। তারপর সেই উল্টা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দুইটা একটু একটু কাঁপিতে লাগিল। চোখ দুইটা রাগে পিট পিট করিয়া ডি-সুজা বলিল, বটে!

সাহস পাইয়া ডি-সিলভা কাছে যাইয়া বলিল।

—ভেবে দ্যাখো, কথাটা নেহাৎ মন্দ বলছিনা আমি। যা ভেবেছ, বয়সও আমার তেমন বেশি হয়নি। তা ছাড়া আমার যা কিছু আছে—

বৃদ্ধ ডি-সুজা হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো নাচিয়া উঠিল। আনন্দে নয় অসহ্য ক্রোধে। দুই হাতের দুইটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ডি-সিলভার নাকের সামনে দোলাইয়া বলিল, তোমার আছে এই কাঁচকলা! তা ছাড়া ওই নাদাপেট, আর চল্লিশ বছরের একটা টাক—কথাটা বলতে একবার লজ্জা করলনা?

ডি-সিলভা চটিয়া গেল: আমার নাদা পেট, আর তোমার পেট বুঝি আমার চাইতে ছোট? নাতীর বয়সও তো পঁচিশ পেরোতে চলল তার হিসেব রাখো?

—তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন ভালোমানুষের মতো সুড় সুড় ক'রে বেরোও আমার বাড়ী থেকে।

—কী! অপমানে ডি-সিলভা আগুন হইয়া উঠিল: আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে চাও, এত বড় সাহস তোমার।

—হাঁ, সাহসই তো। যাও—বেরোলেনা? বটে, মতলব আমি যেন কিছু আর বুঝতে পারিনা। প্রথম থেকেই দেখছি নজর আমার মুরগীর খোঁয়াড়ের দিকে, বড় মোরগটা নিয়ে কি ভাবে সটকে পড়বে তারই সুযোগ খুঁজছ! আর দ্বিতীয়বার লিসিকে বিয়ে করতে চেয়েছ কি—হয় টাক ফাটিয়ে দেব, নইলে ভুঁড়ি দেব ফাঁসিয়ে। মনে রেখো কথাটা।—ডি-সুজার মূর্তি প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছিল।

এক পা এক পা করিয়া খিড়কির দিকে পিছাইতে লাগিল ডি-সিলভা। পেট এবং বুদ্ধি লোকটার একটু বেশি পরিমাণে স্থূল, সাহসের মাত্রাটাও সেই অনুপাতে কম। কেবল যাইবার সময় অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া গেল, যেশুর নাম করে বলছি, এর শোধ আমি নেবই।

ডি-সিলভা ভীরু মানুষ, সুতরাং অনেকটা হাল ছাড়িয়াই দিল সে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার রসনা মরিয়া গেল না। ডি-সুজা সম্বন্ধে নানারকম অলীক গাল-গল্প ছড়াইয়া বেড়ায় লোকটা। শুধু গাল-গল্পই নয়, গালাগালিও করে।

বলে, "হতভাগা বুড়ো মরে' জিন হয়ে থাকবে।"

কিন্তু জোহানকে আঁটিবার জো নাই। ছেলেবেলা হইতেই সে ডি-সুজার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে, লিসির সঙ্গে একত্র হইয়া খেলা করিয়াছে। চট্ করিয়া তাহাকে কিছু একটা বলিয়া বলা যায় না। তা ছাড়া সে কোনো স্পষ্ট প্রস্তাব লইয়া কখনো সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু তা সত্ত্বেও ডি-সুজা অনুভব করে, তাহার অজ্ঞতার পশ্চাতে থাকিয়া একটা প্রচণ্ড আকর্ষণে জোহান লিসিকে তাহার কাছ হইতে দূরে সরাইয়া লইতেছে, লিসির মনোজগতে ডি-সুজা এখন অনেকটা নেপথ্যে।

এই কারণেই জোহানকে দেখিলে তাহার সর্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া যায়। ডি-সিলভাকে দেখিলেও বোধ হয় তাহার এতটা বিদ্বেষ বোধ হয় না। অনেকটা এই জন্যই বড় মুরগীটা অপহরণের দায়িত্ব জোহানের কাঁধে চাপাইয়া দিয়া সে শান্ত হইতে চায়।

কিন্তু লিসির বিবাহ দিতে তাহার যে নিতান্ত অনিচ্ছা, তা নয়। পাত্র তাহার ঠিক হইয়াই আছে এবং ডি-সুজার মতে এমন সুপাত্র দুর্লভ।

পাত্রটির নাম গঞ্জালেস্।

গঞ্জালেস্ দেখিতে সুপুরুষ। ছয় ফুট দীর্ঘ চেহারা, গায়ের তাম্রাভ বর্ণে এখনো আর্যামির ছাপ আছে। চোখের তারা পুরোপুরি কালো নয়, চুলগুলিকে মোটামুটি কটা বলা যাইতে পারে। চোয়ালের প্রশস্ত দু'খানি হাড়ের মাঝামাঝি দীর্ঘ নাসাটি খড়্গের মতো সমুন্নত হইয়া আছে।

চট্টগ্রামে তাহার শুঁটকি মাছের কারবার। নিম্ন বাংলা হইতে শুরু করিয়া "জান্দির" দেশ ব্রহ্ম এবং চীনের উপকূল পর্যন্ত তাহার ব্যবসা বিস্তৃত। আরাকানী রক্তের মিশাল থাকিলেও গঞ্জালেস্ মূলত এখনো পর্তুগীজ। পূর্বপুরুষদের দস্যুবৃত্তি কালক্রমে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ব্যবসায়-বুদ্ধিটাকে গঞ্জালেস্ আজ পর্যন্তও জীয়াইয়া রাখিয়াছে। নানা ঘটনাচক্রে ডি-সুজার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে এবং সেই হইতেই ডি-সুজা তাহাকে নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছে। গঞ্জালেস্ প্রতিপত্তিশালী লোক। তাহার আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে কাজটা যে অনেক নিরাপদেই চালানো যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তা ছাড়া গঞ্জালেসের আর একটি বিশেষত্ব আছে। সেটাও ডি-সুজাকে আকর্ষণ করে কম নয়।

খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে নিম্ন বাংলায়, বিশেষ করিয়া সুন্দরবন অঞ্চলে পর্তুগীজ জলদস্যুদের যে অত্যাচার শুরু হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের উগ্র গোঁড়ামির সহিত দস্যুতার অবাধ প্রেরণা মিশ্রিত হইয়া পর্তুগীজেরা প্রেত-তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কেন্দ্রীয় কোনো শাসন-শক্তি তাহা সংযত করিতে পারিত না, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের একেবারে প্রত্যন্ত সীমায় আসিয়া সমুদ্রচারী এই দস্যুদলকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার দাঁড়াইয়াছিল।

তখন বাঙালির বহির্বাণিজ্য ছিল। সিংহল, জাভা, বালী, সুমাত্রা, শ্যাম এবং সুদূর চীন জাপানেও বাঙালি সওদাগরেরা সপ্ত ডিঙা মধুকর ভাসাইয়া বেসাতি করিতে যাইতেন, 'বস্ত্র বদল' করিয়া হরিদ্রার পরিবর্তে আনিতেন স্বর্ণ, আর্দ্রকের পরিবর্তে মুক্তা এবং নারিকেলের বিনিময়ে গজমোতি। মঙ্গল-কাব্যের রূপকথার পৃষ্ঠাগুলিতে সে-সমস্ত দিনের এক একটা স্বপ্নময় রূপ আজো দেখিতে পাওয়া যায়।

বড় বড় নদীর ধারে, সমুদ্রের মোহানায় তখন সমৃদ্ধ জনপদের অন্ত ছিল না। এখন যে সুন্দরবনের ছায়াগভীর অন্ধকারের মধ্যে রয়্যাল্ বেঙ্গল টাইগারের ক্ষুধার্ত চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে, বড় বড় নলখাগ আর হিজল বনের আড়ালে আড়ালে শঙ্খচূড়ের বিষাক্ত বিশাল ফণা দুলিয়া ওঠে, আর খাঁড়ির ধারে ধারে—জোয়ারে জল নামিয়া গেলে যেখানে ঝিনুকের অসংখ্য আঁকা-বাঁকা লেখা পড়ে—বড় বড় মানুষ-খেকো কুমীর শালগাছের গুঁড়ির মতো পড়িয়া

পড়িয়া রোদ পোহায়, ওখানেও একদিন মানুষের বস্তি ছিল। সুন্দরী গাছ আর লতাপাতার জঙ্গল কাটিয়া ভেদ করিয়া আরো একটু ভিতরে ঢুকিয়া দেখো, চোখে পড়িবে ঘন জঙ্গলে-ঘেরা মস্ত মস্ত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, মজিয়া আসা দীঘির শেষ চিহ্ন। কোথাও কোথাও এখন সাঁই ফকিরদের ধুনি জ্বলে, কোথাও বা বাঘিনী কাচ্চাবাচ্চা লইয়া সংসার পাতিয়া বসিয়া আছে, আবার কোথাও বাঘের চাইতে ভয়ঙ্কর মানুষের দল ঝাঁকড়া, বাবরী চুল দুলাইয়া খাঁড়া-সড়কিতে শান দিতেছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সমস্ত জায়গা এমনি ভয়ঙ্করের পীঠস্থান ছিল না। তখন এখানে মানুষ বাস করিত—উৎসব চলিত—বড় বড় নদীর মোহানায় নতুন নতুন উপনিবেশ বসিয়া বাঙালির ঐশ্বর্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু এই ক্রম-বিবর্ধমান সমৃদ্ধি বেশিদিন রহিল না। ভাস্কো-ডা-গামার প্রদর্শিত পথ ধরিয়া হার্মাদেরা একদিন সর্বগ্রাসী পঙ্গপালের মতো বাংলার এই বাণিজ্য অঞ্চলগুলিতে হানা দিল।

যুদ্ধবাজ দুঃসাহসিক জাতি এই পর্তুগীজেরা। নিজেদের দেশ তাহাদের উষর ও অনুর্বর—দারিদ্র্য সেখানে লাগিয়াই আছে। এই দারিদ্র্যকে জয় করিবার জন্য একদল বেপরোয়া মানুষ সমুদ্রের উপর দিয়া অজানার পানে ভাসিয়া পড়িয়াছিল। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ পর্তুগালের রুক্ষ উপকূল হইতে যখন তাহারা বাংলা দেশের উজ্জ্বল শ্যামলতা-মণ্ডিত সমৃদ্ধ তীরতট দেখিতে পাইল, যখন দেখিল অনুকূল বাতাসে আকাশছোঁয়া সারি সারি পাল উড়াইয়া ধনপতি, লক্ষপতি অথবা পুষ্পদন্ত সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙা দেশ-বিদেশের মণিমুক্তা লইয়া ঘরে ফিরিতেছে, তখন তাহাদের আর মাথা ঠিক রহিল না। রাত্রির নিস্তব্ধ শান্ত আকাশকে শিহরিত করিয়া তাহাদের রক্তরাঙা মশালগুলি জ্বলিয়া উঠিল, তাহাদের বন্দুকের গর্জনে নিদ্রিত পল্লীর তন্দ্রা টুটিয়া গেল। যুদ্ধবিমুখ, স্বচ্ছলতায় পরিতৃপ্ত ক্ষীণকায় বাঙালি এই নতুন শক্তির আক্রমণের মুখে শিশুর মতো অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল।

সে অত্যাচারের তুলনা নাই। ভারতবর্ষে শক আসিয়াছে, হূণ আসিয়াছে, তৈমুরলঙ্গ, নাদির শাহের আবির্ভাবে রক্তবন্যা বহিয়া গেছে; কিন্তু আরাকানী ও পর্তুগীজের দল তলোয়ারের মুখে সেদিন যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিল, নাদির শাহের রক্তলোলুপতাও তাহার কাছে হার মানিয়া যায়।

সে অত্যাচারের সীমা ছিল না—বিচার ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ কেহই তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। চৌদ্দ ডিঙা মধুকরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সেগুলি বঙ্গোপসাগরের নোনা জলে ডুবিয়া গেল, রাশি রাশি মৃতদেহ জোয়ারের জলে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, বরিশাল আর সুন্দরবনের কূলগুলিতে আসিয়া ভিড়িতে লাগিল। বাঙালির বাণিজ্যযাত্রা চিরদিনের মতো বন্ধ হইল, সমুদ্রযাত্রার উপরে শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন বসিয়া গেল।

উপদ্রব তাহাতেই থামিল না। নদী, সমুদ্র ছাড়িয়া পর্তুগীজেরা এবার গৃহস্থপল্লীতে অভিযান আরম্ভ করিয়া দিল। হত্যা ও লুণ্ঠন তাহারা নির্বিচারে করিত। বয়োবৃদ্ধ ও অক্ষমদের হত্যা করিয়া সমর্থ যুবকদের বাঁধিয়া লইয়া যাইত—ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিবার জন্য। মেয়েদের উপরে তো অত্যাচার আর নৃশংসতার সীমাই ছিল না। হাতের চেটোয় গর্ত করিয়া সরু বেতের সাহায্যে যে ভাবে তাহারা এই সব বন্দীদের 'হালি' গাঁথিয়া রাখিত এবং পাখীর আধারের মতো যে ভাবে মাটিতে আধসেদ্ধ ভাত ছড়াইয়া তাহাদের খাইতে দিত—বর্বরতার নিদর্শন হিসাবে সে-সমস্ত কাহিনী অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

সায়েস্তা খাঁ এবং বার ভূঁইয়ার কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ, মসনদ আলী প্রভৃতির সাহায্যে ইহাদের দমন ঘটিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের অত্যাচার আবার প্রবল হইয়া ওঠে। এই সময় ইহাদের নেতা হইয়া দাঁড়ান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস্। এই সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস্ যে দুর্ধর্ষ জলদস্যুবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং নদীর মোহানায় ছোট ছোট চরে ইহাদের যে-সমস্ত দুর্গ ছিল, সেই দুর্ধর্ষ বাহিনী ও দুর্গগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে বাংলার নবাব আলীবর্দীকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। চর্ ইসমাইলও পর্তুগীজদের সেই গৌরবদিনগুলিরই অবশেষ মাত্র।

গঞ্জালেস্ এই সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের বংশধর। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধসূত্র না থাকিলেও সিবাষ্টিয়ানের রক্ত তাহাতে আছে।

শুধু সিবাষ্টিয়ানের নয়। গঞ্জালেস্ নিজের মধ্যে নাকি হিন্দুদের প্রভাবও কিছু কিছু অনুভব করে। সে সম্পর্কে তাহাদের পরিবারে ভারী চমৎকার একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সেটা তাহারই কোনো ঊর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষের গৌরব কীর্তির কাহিনী।···

···অবশ্য কয়েক শত বৎসর আগেকার কথা। কোনো এক গঞ্জালেসের কাছে সংবাদ আসিল, কয়েক মাইল দূরে এক জমিদার বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন হইয়াছে। খবরটা পাইয়া গঞ্জালেসের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহাদের লাভ বেশি। অনেকগুলি মানুষ, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোককে একত্রে পাওয়া যায়, তা ছাড়া লুণ্ঠনেরও মন্দ সুবিধা হয় না।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। জমিদার বাড়ীতে তোরণে নহবৎ বাজিতেছে, আলোয় চারিদিক আলোময়, কলরব কোলাহলে উৎসব রাত্রি মুখরিত। বর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লগ্নের দেরী নাই, অন্তঃপুরে মেয়েকে কনে-চন্দনে সাজানো হইতেছে।

কিন্তু মুহূর্তে সে উৎসবের সুর কাটিয়া গেল।

বন্দুকের শব্দ আর মশালের আলো—অর্থটা বুঝিতে কাহারো এক মুহূর্ত দেরী হইল না। দু' চারজন পাইক পেয়াদা যাহারা বাধা দিতে সম্মুখে দাঁড়াইল, বন্দুকের গুলিতে তাহারা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বাকী সকলে প্রাণ লইয়া কে যে কোন্ দিকে ছুটিয়া পলাইল, তাহার আর ঠিক ঠিকানাই মিলিল না।

বরযাত্রীরা পলাইল বটে, কিন্তু বর কোথা হইতে এক গাছা সড়কি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, পরণে রক্ত চেলি, সুশ্রী মুখ চন্দন-লেখায় চর্চিত। তাহার পেশল বাহুতে সড়কির উজ্জ্বল ফলকটি একবার থর থর করিয়া কাঁপিল, পরক্ষণেই সেটা সোজা নিক্ষিপ্ত হইল একেবারে গঞ্জালেসের বুক লক্ষ্য করিয়া। চট্ করিয়া সরিয়া গিয়া গঞ্জালেস্ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিল, কিন্তু তাহার পাশের লোকটি বিকট কণ্ঠে একটা আর্তনাদ করিয়া সোজা মাটিতে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেল। চক্ষের পলকে বর সড়কিটা আবার হাতে তুলিয়া লইল এবং গঞ্জালেসের বাম বাহু ঘেঁষিয়া তাহা আর একজন পর্তুগীজের কণ্ঠ ভেদ করিল।

কিন্তু পর্তুগীজেরা আর নিশ্চেষ্ট রহিল না। এক সঙ্গে চার পাঁচটি বন্দুক গর্জিয়া উঠিল, বর রক্তাক্ত দেহে পৃথিবী গ্রহণ করিল। ভারী বুটজুতার তলায় তাহার দেহটাকে নির্মম ভাবে মাড়াইয়া গঞ্জালেস্ ও তাহার দল ঢুকিল অন্তঃপুরে।

অন্তঃপুরের রুদ্ধ দুয়ার তাহাদের আঘাতে ভাঙিয়া খান খান হইয়া গেল—ভীত কাতর নারীসংঘের সামনে দাঁড়াইয়া গঞ্জালেস্ আনন্দধ্বনি করিল। তারপর সাদা চন্দনে সাজানো কনেটির দিকে তাকাইয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল—এত রূপ! বাঙালী মেয়ে যে এত সুন্দরী হইতে পারে, সে তাহা কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। এক মুহূর্ত সে স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হাত বাড়াইয়া মেয়েটাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল।...

লুণ্ঠিত ধনসম্পদ এবং স্ত্রী পুরুষের সকল লইয়া পর্তুগীজদের জাহাজ আবার যখন নদীতে ভাসিয়া পড়িল, তখন সে বিশাল জমিদারবাড়ী আগুনে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া পৈশাচিক ভাবে একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি করিল গঞ্জালেস্। বলিল, সব ঘরে আটকে রেখে এসেছি, সব ব্যাটারা এখন ওখানে ইঁদুরের মতো পুড়ে মর।

...সেই কনেটিই বিংশ শতাব্দীর গঞ্জালেসের কোনো এক অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী। তাই গঞ্জালেস্ মাঝে মাঝে পরিহাস করিয়া বলে, আমি তো আধাআধি হিন্দু।

...অতীতের এই গৌরবময় ইতিহাসটা পেছনে আছে বলিয়াই ডি-সুজা গঞ্জালেসকে এক হিসাবে শ্রদ্ধা করে। ডি-সুজা নিজে বাঙালী হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে বটে, কিন্তু পিতৃপুরুষের কীর্তি কাহিনী স্মরণ করিয়া এখনো গর্বে ফুলিয়া ওঠে তাহার মন। এ জন্য গঞ্জালেস্ আসিলে সে যে কী ভাবে তাহার অভ্যর্থনা করিবে তাহা যেন ভাবিয়াই পায় না।

কিন্তু লিলির মনোভাব এখনো কিছু স্পষ্ট করিয়া জানা যায় নাই। গঞ্জালেস্-সম্পর্কে তাহার ব্যবহারটা খুব পরিষ্কার নয়। তবে তাহাকে দেখিলে সে যে ডি-সুজার মতো অতিরিক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে না এ তো চোখের উপরেই দেখা যায়। অবশ্য তাই বলিয়া এখনো এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে লিলি গঞ্জালেসের পক্ষপাতী নয়।

ডি-সুজার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এর মূলে কোথায় যেন জোহানের প্রভাব আছে। কথাটা ভাবিতেও সে ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে জোহান। আচ্ছা দাঁড়াও, বেশীদিন এসব আর চলিতেছে না। এবার গঞ্জালেস্ আসিলেই হয়। (ক্রমশঃ)

অপরাধ-বিজ্ঞান

(২)

শ্রীআনন ঘোষাল

অপরাধ স্পৃহা

সাধারণতঃ তিনপ্রকারের অপরাধী দেখা যায়, উহাদের যথাক্রমে (১) স্বভাব-অপরাধী (২) অভ্যাস-অপরাধী ও (৩) দৈব-অপরাধী বলা হয়। এই তিন প্রকারের অপরাধী তিনপ্রকার অপরাধস্পৃহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। তাই প্রথমেই অপরাধ স্পৃহা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই অপরাধপ্রবণতা বা অপরাধস্পৃহা জীবমাত্রেরই আদিমতম অভ্যাস। উদ্ভিদ জগতেও এমন অনেক হিংস্র উদ্ভিদ আছে, যারা পোকামাকড় বা জীবজন্তু হনন করে আহারের যোগাড় করে। প্রাণীজগত সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। প্রাণীজগতে এইরূপ অপরাধ অপরাধই নয়। বরং উহা তাহাদের কাছে ধর্মবিশেষ। আক্রমণাত্মক স্বভাব বা পরদ্রব্য হরণের অভ্যাসই প্রাণী-বিশেষের জীবন ধারণের একমাত্র উপায়। আদিম যুগের মানুষও ঠিক এই উদ্ভিদ বা প্রাণীবিশেষের মত অপরাধপ্রবণ ছিল, পরদ্রব্য বা পরস্ত্রী-হরণ ছিল—তখন তাহাদের কাছে একটা বাহাদুরীর বিষয়। তাহাদের এই সকল দুষ্কার্য তৎকালে অপরাধ বোলে ও স্বীকৃত হতই না, অধিকন্তু তাহাদের সেই অকাজ ও কুকাজসকল বীরত্বের আখ্যায় ভূষিত হত, এই সকল অকাজ ছিল তৎকালীন সমাজের অতি সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কালক্রমে মানুষ তার সেই পুরাণ অভ্যাস ও স্বভাব ত্যাগ করেছে। হয়তো মানুষের মনে বাহ্যতঃ অপরাধস্পৃহার স্থান নেই, আদিম যুগের অপরাধমূলক অভ্যাস ও স্বভাব আজিকার সভ্যসমাজে বিরল।

আদিম যুগের মানব বলতে আদিম কালের একচারী মানব বুঝায়, দলবদ্ধ বা গোষ্ঠির মানব বুঝায় না, দলবদ্ধ মানব অপেক্ষা একচারী আদিম মানব অধিক পরিমাণে অপরাধ প্রবণ হত।

(লুইরী সাহেব আজকালকার আদিম জাতিগুলির সঙ্গে কিছুদিন বাস করেন। তাঁর মতে তারা ভিন্নগোষ্ঠির মানবদের উপর অবশ্য অত্যাচার করে বটে, কিন্তু নিজ গোষ্ঠির মানবের উপর কোনও অপরাধমূলক কার্য্য করে না। এই কারণে তিনি গোত্রানুক্রম মতের তীব্র সমালোচনা করেন। আলোচনার মধ্যে দলবদ্ধ মানবের আরও পূর্ব্বেকার একচারী মানবদের তিনি স্থান দেন নি। পৃথিবীর সমুদয় আদিম গোষ্ঠি ও তাদের বিভিন্ন স্তরের সভ্যতার সহিত তিনি পরিচিতও নন। এই জন্য তাঁর মতটি গ্রহণযোগ্য নয়।)

আদিম যুগের এই প্রকৃতি-বিশেষ বাহ্যতঃ পরিত্যক্ত হলেও মানব মনো অন্তঃপ্রদেশ হতে আজও উহা বিদূরিত হয়নি। মানুষের এই সহজাত আদিম অপরাধস্পৃহার এক তৃতীয়াংশ সকল মানুষের মধ্যেই অন্তরিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান। উহা আমাদের স্নায়ু ও মজ্জার মধ্যে নিহিত। অনুকূল অবস্থায় এই সহজাত স্পৃহা বহুমুখী হয়ে আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় অপরাধপ্রবণ করে। এই আদিম অপরাধস্পৃহার দুই তৃতীয়াংশ নিহিত থাকে মানুষের বীজকোষে এবং ⅓ অংশ থাকে দেহকোষে! এই সম্বন্ধে অধিক কিছু বুঝতে গেলে, প্রথমেই বুঝা দরকার বীজকোষ এবং দেহ কোষ কাকে বলে। একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। মানুষের দেহে দুই প্রকারের কোষ বা cell দেখা যায়, Somatic cell বা দেহ-কোষ এবং Germ cell বা বীজকোষ। মানুষের অস্থিমাংস, স্নায়ু ও মজ্জা, আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি সমস্তই দেহকোষ দ্বারা নির্মিত, কিন্তু এই দেহকোষ ছাড়া মানব-দেহে আর একপ্রকার কোষ রক্ষিত আছে, উহাকে আমরা বীজকোষ বলি। এই সকল বীজকোষই পরবর্তী বংশধরদের জন্ম দেয়। উহারা বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ দেহকোষের সৃষ্টি করে ও সেই সঙ্গে কিছু বীজকোষ

সেই সকল দেহকোষ দ্বারা নির্মিত দেহের মধ্যে, পরবর্তী বংশধরের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে অবশিষ্ট থেকে, বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। মানুষের আদিম অপরাধ-স্পৃহার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নিহিত থাকে এই বীজকোষের মধ্যে এবং এক তৃতীয়াংশ মাত্র দেহ কোষের মধ্য দিয়ে স্নায়ু ও মজ্জার মধ্যে তথা মানব মনের অন্তর্দেশে স্থান পায়। সাধারণতঃ মানুষের এই আদিম অপরাধ-স্পৃহার ⅔ অংশ বংশ পরম্পরায় বীজকোষেই নিবদ্ধ থাকে। দেহকোষে সংক্রামিত হয় না। কিন্তু কদাচিৎ এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। বহু পুরুষ ধরে বংশের কোনও কোনও সন্তানের দেহ-কোষে উহা দৈবক্রমে সংক্রামিত হয়। তখন বীজকোষস্থিত অপরাধ স্পৃহার ⅔ অংশ, দেহ-কোষের স্বাভাবিক ⅓ অপরাধ স্পৃহার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বংশের সেই সন্তানটিকে করে তুলে একজন উৎকৃষ্ট অপরাধী। এইরূপ অপরাধীকে বলা হয় স্বভাব অপরাধী। অপরদিকে কেবলমাত্র দেহকোষ নিহিত ⅓ অপরাধ স্পৃহার বহিঃপ্রকাশ দ্বারা যে সকল ব্যক্তি অপরাধমুখী হয়ে উঠে, তাদের বলা হয় অভ্যাস-অপরাধী। অভ্যাস অপরাধীরা স্বভাব অপরাধীদের ন্যায় উৎকৃষ্ট অপরাধী হয় না, কারণ তারা বংশগতির আদিম স্পৃহার মাত্র ⅓ অংশের উত্তরাধিকারী।

এই অপরাধ স্পৃহার সহিত যৌন স্পৃহাও মানুষের দেহ ও বীজকোষে নিহিত থাকে। স্বভাব অপরাধী, অভ্যাস অপরাধী ও দৈব অপরাধীর ন্যায়, মানবের মধ্যে, স্বভাব-লম্পট, অভ্যাস-লম্পট ও দৈব-লম্পট এবং মানবীর মধ্যে, স্বভাব-বেশ্যা, অভ্যাস বেশ্যা ও দৈব-বেশ্যা দেখা যায়; মানবের লাম্পট্য অবস্থাভেদে অপরাধের সামিল, কিন্তু মানবীর পক্ষে বেশ্যা-বৃত্তি অপরাধ নয়। বেশ্যা-বৃত্তির সঙ্গে চৌর্য-বৃত্তি প্রভৃতির একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য এই বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। চৌর্য-বৃত্তির ন্যায় এই বেশ্যা-বৃত্তিও পৃথিবীর আদিম ব্যবসা। আদিম কালে চৌর্য্যবৃত্তির ন্যায় বেশ্যা-বৃত্তিও দোষনীয় ছিল না। এইজন্য বেশ্যা-বৃত্তির স্পৃহাও বংশানুক্রমে মানবী লাভ করে। বেশ্যা-বৃত্তি স্পৃহার ⅓ অংশ থাকে তাদের দেহকোষে ও ⅔ অংশ থাকে তাদের বীজকোষে। এই বিশেষ স্পৃহা স্বল্প অবস্থায় সকল মানবীর মধ্যেই কিছুটা না কিছু বর্তমান আছে। সাধারণতঃ মেয়েরা চোর হয় না। চোরের সঙ্গে বাস করলেও না। যৌবনটা মেয়েদের [illegible] পাপেই অতিবাহিত হয়। অপরাধী হওয়ার সুযোগও তাদের কম। নারীদের মধ্যে দৈব-অপরাধীর সংখ্যাই বেশী। মেয়েরা কখনও স্বভাব-অপরাধী হয় না। কদাচিৎ দুই একটী স্ত্রী-অপরাধীকে অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে নারী-সুলভ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তাদের হাবভাব ও গঠনাদি প্রায়ই পুরুষোচিত হয় এবং নারীত্ব সম্বন্ধে তারা প্রায়ই অচেতন থাকে। এই ধরণের মেয়েদের পুরুষরূপেই বলা উচিত। মনের দিক থেকে এরা পুরুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। মেয়েদের "কটির মাওর" বৃত্তি ও "বেদুনার" হ্রাস ঘটিলে যে কোনও মেয়ের মধ্যে পুরুষের ন্যায় ভাব আনা যায়। ১৩ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ও ৪৫ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক নারীদের মধ্যে পুরুষের ন্যায় ভাব বর্তমান থাকে। এই কারণে ইহাদের মধ্যেই কিছুৎ পরিমাণে অপরাধ-স্পৃহা স্থান পায়। প্রকৃত নারীরা সাধারণত স্বভাব-অপরাধী বা অভ্যাস-অপরাধী হয় না। সেই স্থলে তারা হয় স্বভাব-বেশ্যা বা অভ্যাস-বেশ্যা। হয় তাদের মধ্যে অপরাধ স্পৃহা সমধিক পরিমাণে বর্তায় না, না হয় তাদের দেহ মধ্যে বিশেষ বিশেষ রস-পিণ্ডের অবস্থান হেতু স্বাভাবিক কারণে উহা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। প্রায়ই দেখা যায়, ভাই স্বভাব চোর হলে বোন হয় স্বভাব-বেশ্যা। অভ্যাস-চোর বা অভ্যাস-বেশ্যা অবস্থা গতিকে হয়। তাই ভাই অভ্যাস-চোর হলেও বোন সব সময় অভ্যাস-বেশ্যা হয় না। মেয়েরা অপরাধীদের অপরাধ করতে প্ররোচিত করে বটে, কিন্তু নিজেরা অপরাধ করে খুব কম। মেয়ে-চোরদের মধ্যে অপরাধ-রোগীর সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। অনেক সময় তারা উত্তেজনাবশতঃ অপরাধ করে এবং তাদের সেই সকল অপরাধ বৈজ্ঞানিক মতে সঠিক বা প্রকৃত অপরাধের মধ্যে পড়ে না।

গর্ভ, রজস্বলা ও স্তন্য অবস্থায় নারীরা এই উত্তেজনা ভোগে থাকে। ফরাসী পণ্ডিত লেগরাণ্ড ডু ১০৫টী স্ত্রী অপরাধীকে কোনও এক ফরাসী কারাগারে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষান্তে তিনি নিম্নোক্তরূপ ফল পান।

উন্মাদ	...	৪৭
অপরাধ-রোগী	...	২০
রজস্বলা	...	৩১
গর্ভবতী	...	৫
রোগী		১০
		১০৫

বিষ প্রয়োগাদি কার্য্যে কখনও কখনও মেয়েদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় বটে কিন্তু তারা এইরূপ অপরাধ করে প্রায়ই প্রতিহিংসা চরিতার্থ বা আত্মরক্ষার জন্য। যৌন কারণেও তারা এই সব কাজে হাত দেয় বটে, কিন্তু বিত্ত লাভের জন্য অপরাধ করে তারা কদাচিৎ। এদিকে পুরুষের উপরই তারা নির্ভরশীল থাকে। দৈব চোর ছেলে ও মেয়ে উভয়ই হতে পারে এবং হয়ও। অপরাধ স্পৃহা সম্বন্ধে বলা হল, এইবার অপরাধ বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাউক। অপরাধীদের এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ, কেবলমাত্র প্রকৃত অপরাধীদের উপরই প্রযোজ্য।

অভ্যাস-অপরাধী

এক্ষণে অভ্যাস-অপরাধী সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। পূর্বেই বলেছি মানুষের আদিম অপরাধ-স্পৃহা বাহ্যতঃ পরিত্যক্ত হলেও মানব মনের অন্তঃপ্রদেশ হতে উহা আজও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নি। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে (বৈশাখের ভারতবর্ষ দ্রষ্টব্য) পাপ ও অন্যায়রূপ দুইটী শব্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। মনুষ্য সমাজে এই পাপ ও অন্যায়, প্রাবল্য মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ-স্পৃহার একটী বিশেষ প্রমাণ। জল সমুদ্র থেকে উপচে পড়া জলের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। কোনও ভূমি-খণ্ডের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড দেখে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যেমন বলে দিতে পারেন যে সেই ভূমিখণ্ডের তলায় খনি আছে, তেমনি মনুষ্য সমাজে এই অন্যায় ও পাপের প্রাবল্য দেখে আমরাও বলতে পারি যে মানুষ মাত্রেরই মন অপরাধপ্রবণ। প্রত্যেক মানুষেরই মনে অপরাধ-স্পৃহা অল্পবিস্তর বিদ্যমান। আদিম যুগের মনোবৃত্তি সকল মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু রয়ে গেছে। কারও মধ্যে কম, কারও মধ্যে বা বেশী। শিক্ষার প্রাচুর্য্য ও সাহসের অভাব সকল মানুষকে এইরূপ ইচ্ছা থেকে রক্ষা করে রাখে। কখন যে কোন দুর্বল মুহূর্তে কার মধ্যে এই ইচ্ছা প্রকাশ পাবে তা কেউ বলতে পারে না। নীচের স্বীকার উক্তি থেকে উক্তরূপ সত্য প্রতীয়মান হবে।

"আমি বিনা ধূমপানে বহু দূর চলে এলাম। হঠাৎ এক জায়গায় দেখলাম, লেখা আছে ধূমপান নিষিদ্ধ। হঠাৎ জেগে উঠল আমার আদিম অপরাধ-স্পৃহা; বহু চেষ্টাতেও আমি ঠিক থাকতে পারি নি। কেন জানি না ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েই ধূমপান করবার একটি দুর্নিবার ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসল।"

উপরিউক্ত কাহিনী থেকে আমরা বুঝতে পারি কোনও মানুষই আদিম-বৃত্তি একেবারে ভুলেনি। সকলের মধ্যেই অপরাধ-মূলক মনোবৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে। যে কোনও দুর্বল মুহূর্তে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে। দুঃখ, লোভ, ক্রোধ, হিংসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পারিপার্শ্বিক বা সামাজিক অসমতা, দুর্বলতা প্রভৃতি দোষ মানুষের এই মনোবৃত্তির আত্মপ্রকাশের সহায়ক হয়। যে কোনও সৎ লোক মনের দুর্বলতাজনিত বা কুসঙ্গে পড়ে অপরাধী-পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। কি ভাবে তা সম্ভব হয়, তা নীচের একটী স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যাবে।

"একটা দোকানে জিনিস কিনতে এসে দোকানীর অজ্ঞাতেই কিছু দ্রব্য তুলে ব্যাগটা আমি ভরে নি। তুচ্ছ দ্রব্য বিধায় দোকানীর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন মনে করি নি। কিন্তু এই দ্রব্য নেওয়ার ব্যাপার দোকানী লক্ষ্য করতে পারেনি দেখে, আমি কি জানি কেন বেশ একটু আত্মতৃপ্তি লাভ করলাম। আমার মধ্যকার সুপ্ত অপরাধ-বৃত্তি যেন জাগ্রত হয়ে উঠেছে। পরদিন দোকানে যাবামাত্র আমার মন আবার অপরাধ-মুখী হয়ে উঠে। দোকান থেকে একটা জিনিস উঠিয়ে নিয়ে দাম দেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি। অন্যান্য খরিদ্দারদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দোকানী আমায় লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ কি মনে হ'ল জানি না, আমি দাম না দিয়েই সরে পড়ি। এমনি ভাবে লোভ বেড়ে যায়। পরে অন্য দোকানেও গিয়েছি। কুসঙ্গও জোটে, পরামর্শেরও অভাব নেই। কোকেন খেতে শিখি। শেষে একদিন ধরা পড়ি। একবার, দুবার, তিনবার বহুবার জেল খেটেছি। কয়েক বৎসরের ব্যবধান। আমি একজন দাগী চোর।"

এই হচ্ছে মানব মনের সত্যকার অবস্থা। আইনের ভয়, শিক্ষা ও পুরুষানুক্রম সংস্কার প্রভৃতি, মানুষের এই স্বভাব-সুলভ অপরাধ স্পৃহাকে সংযত রাখে মাত্র। ভয় বলতে এখানে আইনের ভয়ের ন্যায় ধর্মের ভয়ও বুঝায়। কেহ ভয় করে ইহলোকের শাস্তিকে, কাহারও বা সংস্কারবদ্ধ মন ভয় করে পরলোকের শাস্তিকে। এই উভয়বিধ ভয়ই ইচ্ছা সত্ত্বেও মানুষকে অনেক দুষ্কার্য্য থেকে বিরত রাখে। এই ভয় ও সংস্কার মানব মনের চেতন এবং অবচেতন উভয় স্তরেই বিদ্যমান। ভয়, সংস্কার ও শিক্ষাকে আমরা খনির উপরকার শক্ত মৃত্তিকা স্তরগুলির সহিত তুলনা করতে পারি। উপরকার কঠিন স্তূপের জন্য যেমন আমরা, খনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারি না, তেমনি শিক্ষা সংস্কার ও ভয়ের জন্য আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অপরাধ প্রবণতা সকল সময় অনুভব করি না। এই শিক্ষা সংস্কার ও ভয়ের গভীরতা যত হবে, মানুষের মন কম বেশী অপরাধ প্রবণ হয়। এক কথায়, শিক্ষা, সংস্কার ও ভয় বেশী থাকলে, অপরাধ-স্পৃহা অন্তর্মুখী হয় অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অপর দিকে শিক্ষা সংস্কার ও ভয় কম থাকলে বা বিপরীত শিক্ষা ও সংস্কার প্রবল হলে বা ভয় অপসারিত হলে, এই অপরাধ প্রবণতা বা অপরাধ স্পৃহা বহির্মুখী হয় অর্থাৎ জাগ্রত হয়। এই অপরাধ স্পৃহার বহির্মুখী হওয়ার প্রথম বাধা হচ্ছে মানুষের জন্মগত সংস্কার; পুরুষানুক্রমে সৎ থাকার পর, হঠাৎ অসৎ হওয়ার পক্ষে ইহা একটা মস্ত বাধা, দ্বিতীয় বাধা হচ্ছে শিক্ষা ও দীক্ষা। সৎ বংশের ছেলেদের পক্ষে এই দ্বিতীয় বাধা প্রথম বাধাকে আরও শক্ত করে। ভয় হচ্ছে তৃতীয় বাধা, এই ভয় প্রথম ও দ্বিতীয় বাধাকে আরও শক্ত করে। আইনের সার্থকতা এইখানেই। এই ভয়, শিক্ষা ও সংস্কার স্ব স্ব উপস্থিতি ও ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের এই স্বভাব সুলভ অপরাধ স্পৃহাকে সংযত করে বলেই আমার বিশ্বাস। মানুষের এই অপরাধ-প্রবণতা 'ভলকানিক' পদার্থের ন্যায় মানুষের শিক্ষা ও সংস্কারের পাথর ফুঁড়ে বাইরে আসতে চায়। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কারের প্রাবল্য তখন তাদের এই অপরাধ-স্পৃহাকে দাবিয়ে রাখে। খনির উপরকার মৃত্তিকা স্তর না সরালে যেমন খনিজ দ্রব্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। তেমনি শিক্ষা ও সংস্কারের বাঁধ না ভাঙলে অপরাধ-প্রবণতার স্বরূপ বুঝা যায় না। খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের জন্য প্রচুর সময় ও যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন হয়। ঠিক এইরূপই সৎবংশের বনীয়াদী কোনও ব্যক্তির ভিতরকার অপরাধ স্পৃহা জাগ্রত করতে হলেও কিছু সময় ও কার্য্যকারণের প্রয়োজন হয়। মানুষের লোভ ও অভাব বা প্রয়োজনকে উল্লিখিত যন্ত্রপাতির সঙ্গে, মানুষের সংস্কার শিক্ষা ও ভয়কে খনির উপরকার মৃত্তিকা স্তরের সঙ্গে এবং বহির্মুখী খনিজ দ্রব্যের সঙ্গে অপরাধ স্পৃহার তুলনা করা চলে। যন্ত্রপাতি সাহায্যে যেমন ধীরে ধীরে, মৃত্তিকা স্তর অপসারণ করে খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন করা হয়, ঠিক তেমনি লোভ ও অভাবের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে মানুষের শিক্ষা সংস্কার ও ভয় দূরীভূত হয় এবং অপরাধ স্পৃহার আবির্ভাব ঘটে। এই লোভ অভাব ও কুসঙ্গ তাদের স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী আঘাত হেনে মানুষের শিক্ষা সংস্কার ও ভয়কে অপসারিত করে, তার অন্তর্নিহিত অপরাধ স্পৃহাকে যে কোনও মুহূর্তে বহির্মুখী করতে পারে। এই অপরাধ স্পৃহা বহির্গমন মানুষের শিক্ষা, সংস্কার ও ভয়রূপ প্রস্তরের কাঠিন্য বা প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে।

পূর্ব্বেই বলেছি, এইরূপ বিপর্যয় একদিনে সাধিত হয় না। আমরা এমন অনেক বিশ্বাসী দরোয়ান দেখেছি, যে লাখ দুই তিন টাকা নিরাপদে গত বিশ ত্রিশ বছর ধরে ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিয়েছে, কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করে নি। কিন্তু যখন সে পালালো মাত্র হাজার দুই টাকা নিয়েই পালালো। ব্যাঙ্কের বিশ্বাসী ট্রেজারার ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্য চেষ্টার তার ত্রুটী নেই। হঠাৎ একদিন শোনা গেল সে বিশ হাজার টাকার তহবিল তছরূপ করেছে। সাধারণতঃ আমরা এই সব বিশ্বাসী বন্ধুদের কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক হই। এইরূপ ঘটনা কিরূপ অবস্থায় ঘটে, তা নিম্নের বিবৃতি মূলক দৃষ্টান্তটী থেকে কিছুটা বুঝা যাবে।

"তোমার কাছে ভাই কোনও কথাই গোপন করব না। তোমরা জানতে আমি একজন নামজাদা সওদাগরী অফিসের বড় সাহেবের পেটোয়া ও মোটা মাইনের হেডক্লার্ক। কিন্তু আমার সংসারের জন্য প্রতি মাসে কত খরচ হত, তার হিসাব তোমরা রাখ নি। চাঁদার খাতা নিয়ে সকলেই এলো, দিয়ে গেল একটা মোটা অঙ্ক। বন্ধু বান্ধবকে ধার দিয়ে ও দান করে আমি ফতুর হয়েছি, কিন্তু কাউকে কখনও বিমুখ করি নি। পরিচিতদের কাছে মান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্যে দেনাও করেছি অনেক। তাগাদার জ্বালায়, অস্থির হয়ে একদিন ভাবলাম, অফিসের ক্যাশ থেকে কিছু নিয়ে দেনার টাকাটা মিটিয়ে দি। কথাটা কিন্তু মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চমকে উঠি। ভাবি, তাও কি কখনও হয়, এর চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল। এই রকম একটা কুকাজ করা উচিত কিনা, ধরা না পড়ে কাজ হাসিল করা সম্ভব কিনা, অভাবের তাড়নায় প্রায়ই আমি অলস কল্পনা করতাম নিজের মনেই। পরক্ষণেই কিন্তু আমার মনে এইরূপ চিন্তার জন্য ধিক্কার আসত। মানুষের নাম সম্ভ্রম, যা খোয়ান যায় তাই নয়। কিছুদিন পরে দেখলাম এইরূপ কল্পনা আমার কাছে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে, এইরূপ চিন্তার মধ্যে যেন আর গ্লানি নেই, প্রায় শুনি ও পড়ি, অমুক ব্যক্তি অমুক জায়গা থেকে লাখ দুলাখ মেরে বেশ আছে। আইন আদালত তার কিছুই করতে পারে নি। এমনি ভাবে এমনি করে, এই এই করলে ধরা নাও পড়তে পারি। কোম্পানীর অনেক টাকা আছে, কি আর এমন তাদের ক্ষতি হবে। দুত, শালোরা গরীব মেরে পয়সা করে। আমিও ত গরীব, দিন রাত খাটিয়ে নেয়। কতই বা মাইনে দেয় আমাকে। এইরূপ পরামর্শ পূর্ব্বে কেউ আমাকে দিলে তাকে আমি মেরে বসতাম। পরে কিন্তু এইরূপ পরামর্শের জন্যই আমার মন পাগল হতে থাকে। একদিন এক ধনী ও সুখী পরিবার সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তাঁদের পূর্ব্ব পুরুষ না'কি তহবিল তছরূপ করে বড়লোক হন। হাজার হাজার লোক তাঁকে সম্মান করত। দান ধ্যান ছিলও তাঁর বিস্তর। পূর্ব্ব থেকেই মনও প্রস্তুত ছিল। বহুদিন ধরে যা আমি কল্পনা করেছি, আমার মন তাকে সেদিন রূপ দিতে চাইল। এদিকে আর্থিক অবস্থা আমার মন্দ থেকে আরও মন্দ হয়ে উঠছে। একদিন চাপ'ও পড়ল খুব বেশী। কিছু টাকা সেইদিনই চাই। কপালগুণে সুযোগ হল, সেইদিনই সব চেয়ে বেশী। কি ভাবে কাজ হাসিল করতে হবে পূর্ব্ব হতেই তা আমার জানা ছিল। কিছু মাত্র অসুবিধে হ'ল না। রাশীকৃত বারুদ যেন একটা দেশলাইয়ের কাঠির অপেক্ষায় ছিল। আমি তহবিল তছরূপ করে বসলাম। বিচারে শুনেছ আমার আট মাস জেল

হয়েছে। বউ ও বাচ্চা ছেলেটাকে খা'তে পারিনি। একটু দেখ তাদের ভাই। তারা যেন কষ্ট না পায়।"

ধর্মঘটঘটিত অপরাধসমূহও এইরূপ চিত্ত-প্রকৃতির প্রভাব ফল। শান্তিপূর্ণ ভাবে শ্রমিকেরা কাজ করে চলেছে। হঠাৎ তারা একযোগে কর্মত্যাগ করে ম্যানেজারকে নিহত করল। ঘটনাটি বাস্তবঃ একদিনে সংঘটিত হলেও অপরাধীদের মন-চিত্ত এর জন্য বহুদিন ধরে প্রস্তুত হয়েছে। অভাব ও অত্যাচার জনিত আক্রোশ বহুদিন ধরে তাদের চিত্ত মধ্যে সঞ্চিত ছিল। বারুদের স্তূপ চাইছে অগ্নি-সংযোগ। এই সময় কোনও নেতা এসে তাদের উত্তেজিত করলে তারা একদিনেই অপরাধ-মুখী হয়ে উঠবে।

অনেকের বিশ্বাস যারা পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে তাদেরই অভ্যাস-অপরাধী বলা হয়। কিন্তু তা সত্য নয়। যারা একবার অপরাধ করে, কিন্তু এই অপরাধটির জন্য চিত্তকে বহুদিন থেকে প্রস্তুত করে, তাদেরও অভ্যাস-অপরাধী বলা হয়।

কুসঙ্গ লোভ স্বভাব প্রতিশোধ-স্পৃহা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বাধ্যতা, চক্ষুলজ্জা প্রভৃতির ন্যায় উৎপত্তি দ্বারাও মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ স্পৃহার বিকাশ লাভ হয়। কোকেন একপ্রকার ঔষধ। নিয়মিত কোকেন প্রয়োগ দ্বারা যে কোনও সৎ মানুষকে অপরাধীতে পরিণত করা যায়। মানুষের অপরাধ-স্পৃহা গ্রন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোকেন প্রভৃতি ঔষধ স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে। কাহারও কাহারও মতে কোকেন দেহাভ্যন্তর গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করে। ফলে রস-গ্রন্থিগুলি হতে রস নির্গত হয়। এই রস স্নায়ুগুলিকে প্রভাবান্বিত করে। কারণ যাই হোক কোকেন প্রভৃতি ঔষধ মানুষকে অপরাধ-প্রবণ করে। এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। প্রায় দেখা যায়, পুরাণ চোরেরা ছোট ছোট ছেলেদের পানের সঙ্গে কোকেন খাওয়ায়। এই ভাবে তারা তাদের অপরাধ-স্পৃহা জাগ্রত করে, দলের জন্য ছেলে সংগ্রহ করে। যে-জাতিতে কোকেন চালু মত স্থান বিশেষে চৌর্য আদি অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি উহার একটি বিশেষ প্রমাণ। এই কোকেন ছেলেদের চোর এবং মেয়েদের বেশ্যায় পরিণত করে। কলিকাতায় এমন অনেক সংগ্রাহিকা (Procuresses) আছে, যারা নানা অছিলায় অন্তঃপুরে যোগাযোগ করে এবং বাড়ীর যুবতী কন্যা কিশোরীদের খেতে দিয়ে পানের সঙ্গে তাকে কোকেন খাওয়ায়। এই ভাবে ধীরে ধীরে মেয়েটির মধ্যে নিশ্চিত যৌন স্পৃহার আবির্ভাব ঘটিয়ে সংগ্রাহিকা আপন উদ্দেশ্য হাসিল করে। হঠাৎ মেয়েটিকে সংগ্রাহিকার অনুসরণ করতে দেখে বাড়ির সকলে অবাক হয়, কিন্তু সমস্যা সমাধান হয় না। কোকেন আদি ঔষধ যেমন চৌর্য আদি অপরাধের সহায়ক হয়, তেমনি মাদক আদি ঔষধ সহায়ক হয়, খুন, জখম আদি অপরাধসমূহের। প্রথম উক্ত অপরাধ সমূহকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় (without violence) অপরাধ ও শেষোক্ত অপরাধ-সমূহকে বলা হয় সক্রিয় (with violence) অপরাধ। মাদক দ্রব্যের সর্বাধিক প্রচলনের সঙ্গে শেষোক্ত অপরাধের সংখ্যা বর্ধিত হয় বলে মনে হয়। তবে কোকেন আদির ন্যায় মাদক আদি সম্বন্ধে জোর করে কোনও কথা বলতে আমি অক্ষম। কারণ এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও অনুসন্ধান হয় নি। অনেকের মতে মাদক দ্রব্য মানুষের সহজাত অপরাধ স্পৃহার দ্রুতবেগে বিকাশ ঘটায় এবং এইজন্য অনেকে অপরাধ করবার পূর্বে মদ খায়।

এই সব অভ্যাস-অপরাধীরা অপরাধকে অপরাধ বলে বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে অনুতাপও আসে, তবুও তারা অপরাধ করে। তারা অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছে। সমাজে তাদের আর স্থান নেই। অজ্ঞান-বেপরোয়াদের মতই তারা নিরুপায়। কিন্তু এরা আত্ম-বিস্মৃত হয় না। এরা টাকা চেনে ও বোঝে, এরা চালিত হয় বুদ্ধির (Intelligence) দ্বারা—প্রেরণা (বা Instinct) দ্বারা নয়। বিশেষ চিন্তা করে এরা কাজ করে। কখনও বেপরোয়া হয় না। কুসঙ্গে পড়ে এরা যেমন অপরাধী হয়, সৎসঙ্গে পড়ে আবার এরা ভালও হয়ে উঠে। প্রাথমিক অবস্থায় অজ্ঞান অপরাধীর ন্যায়, অজ্ঞান-বেপরোয়াও অনেক কার্যের জন্য লজ্জিত থাকে। বিপরীত অবস্থায় পড়লে এরা চোর বা বেশ্যা না হয়ে সৎ বা সতী হতে পারত। এদের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী তাদের ভাগ্য।

স্বভাব-অপরাধী

গোত্রগত অপরাধীদেরই আমরা স্বভাব-অপরাধী বলি। একটা দুর্দমনীয় অপরাধ-স্পৃহা নিয়েই এরা জন্মগ্রহণ করে। এই স্পৃহা তাদের মৃত্যুর দিন পর্যন্তও অবিচল থাকে। এই দুর্দমনীয় অপরাধ-স্পৃহা তাদের মধ্যে কিরূপে আসে এবং আসেই বা কেন, সেই সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। প্রায়ই দেখা যায়, সাধুর ছেলে চোর হয় এবং চোরের ছেলে সাধু হয়ে উঠে। সুতরাং এই অপরাধ-স্পৃহা যে বংশগত তা ঠিক বলা যায় না। ইহা ঠিক বংশগত নয় তবে ইহা গোত্রগত। ইংরাজীতে ইহাকে গোত্রানুক্রম বা Atavism বলে। গোত্রানুক্রম দুই প্রকারের, মানসিক ও দৈহিক। পূর্বেই বলেছি, মানুষের বীজকোষস্থিত ½ অংশ অপরাধ-স্পৃহার সহিত তার দেহ কোষস্থিত ½ অংশের অপরাধ-স্পৃহার সংযোগ সাধনের দ্বারাই স্বভাব অপরাধীর জন্ম হয়। এইরূপ সংযোগ মানসিক-গোত্রানুক্রম দ্বারাই সাধিত হয়। মানসিক গোত্রানুক্রম সম্বন্ধে বুঝতে হলে, প্রথমে বোঝা দরকার দৈহিক গোত্রানুক্রম কাকে বলে। অনেক সময় আমরা দেখেছি, কি মাতা, কি পিতার দিক হতে দুই তিন পুরুষ কৃষ্ণকায় হলেও দম্পতি বিশেষের শ্বেতকায় পুত্র হয়েছে। কিরূপে উহা সম্ভব হয় তা ভেবে আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু বিস্মিত হবার কিছুই নেই। এইরূপ হলে বুঝতে হবে, তার অনেক পুরুষ পূর্বেকার কোনও ব্যক্তি শ্বেতকায় ছিল।

এই শ্বেতবর্ণ অনেক পুরুষ সুপ্ত অবস্থায় থেকে সহসা শিশুটির মধ্যে বিকাশ পেয়েছে। এইরূপ আকস্মিক বিকাশকে বলা হয় গোত্রানুক্রম। ইহা একটি বংশ-গোত্রানুক্রমের দৃষ্টান্ত। এই বংশ-গোত্রানুক্রমের ন্যায় জাতি-গোত্রানুক্রমও দেখা যায়। আমাদের বাঙালী জাতির মধ্যে কাহারও কাহারও মুখাবয়ব ঠিক চীনা বা জাপানীদের মত হতে দেখি। একে বলে জাতি গোত্রানুক্রম। এ থেকে বুঝতে হবে, কোনও এক বিস্মৃত যুগে আমাদের মধ্যে কিছু মঙ্গোলীয় রক্ত মিশেছে। এ ছাড়া আমাদের পূর্বপুরুষ যে বানরের ন্যায় কোনও লোমশ জীব ছিল, তারও প্রমাণস্বরূপ কদাচিৎ কোনও কোনও মানুষের ক্ষুদ্র লোম দেখা যায়। রুশদেশীয় কুকুর-মানুষ এর একটি দৃষ্টান্ত। এই ভাবে গোত্রানুক্রম কখনও দশ পুরুষ, কখনও সাত পুরুষ, কখনও বা বিশ পঁচিশ পুরুষ সুপ্ত অবস্থা থেকে হঠাৎ কোনও এক বংশধরের মধ্যে আবির্ভাব হয়। এই দৈহিক গোত্রানুক্রমের ন্যায় মানসিক গোত্রানুক্রমও দৃষ্ট হয়।

এই মানসিক গোত্রানুক্রমের জন্যই অনেক সময়ে স্বভাব-অপরাধীর জন্ম দেখি। সৎ বংশে জন্মে, সৎভাবে বর্ধিত হলেও তারা অপরাধ-মুখী হয়ে উঠে। আদিম যুগে মানুষ যখন বর্বর ছিল, তখন মনুষ্য সমাজে অনেক অপরাধকে অপরাধ বলেই ধরা হত না। এ যুগে যা গুরু অপরাধ, সে যুগে তা বীরত্বের আখ্যায় ভূষিত হয়েছে। নরহত্যা ও নারী-হরণ প্রভৃতি তখনকার এক সহজ সামাজিক ব্যাপার। পরে মানুষ যতই সভ্য হতে থাকে, তাদের স্বভাবও সেই পরিমাণে বদলায়। পূর্বের অনেক স্বভাব ও অভ্যাস মানুষ ত্যাগ করেছে। কিন্তু ত্যাগ করলে কি হয় তাদের বীজ-কোষে আদিম-অপরাধ-স্পৃহার ½ অংশ থেকে গেছে। সাধারণতঃ পুরুষানুক্রমে উহা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বীজ-কোষে নিহিত থাকায় উহা বাহিরে প্রকাশ পায় না। কিন্তু গোত্রানুক্রম দ্বারা যদি পরবর্তী কোনও এক পুরুষে দৈবক্রমে উহা স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হলে সেই প্রাপ্ত স্বভাব নিবৃত্তির আর উপায় নেই। সেইজন্যে আদিম অপরাধ

স্পৃহার ঐ অংশের অবস্থান হেতু মানুষের মন স্বভাবতঃই অপরাধ-প্রবণ থাকে। ইহার সহিত গোত্রানুক্রম দ্বারা বীজ-কোষস্থিত অপরাধ স্পৃহার ঐ অংশের সংযোগ হলে শিশুটি স্বভাবতঃই হয়ে উঠে একজন উৎকট স্বভাব-অপরাধী। তার স্বভাব চরিত্র হয় ঠিক আদিম যুগের মানুষের মত। অপরাধকে অপরাধ বলে সে কিছুতেই বুঝতে চায় না। পরস্বাপহরণ তার কাছে একটা জন্মগত অধিকার। যতই তাকে বোঝান যাক, সে ওতে কোনও দোষই দেখে না। কোনও একটা অপরাধ না করে সে কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। আমি এক বালক-স্বভাব-অপরাধীকে জানি। পিতার নিকট হতে প্রত্যহ খুচরা ৫০ টাকা পাওয়া সত্ত্বেও সে সুবিধা পেলেই ৫ বা ১০ টাকার জন্য চুরি করেছে। এই সব অপরাধীরা অতি মাত্রায় সাহসী ও বেপরোয়া হয়। এরা খায় দায় স্ফূর্তি করে, কিন্তু অর্থ সঞ্চয় করে না। সামান্য কারণেই এরা উত্তেজিত হয়ে উঠে, আবার হঠাৎ ঠাণ্ডাও হয়ে যায়। এদের দৃষ্টি ক্রূর ও স্বভাব পশু-তুল্য। এরা চালিত হয় প্রেরণা বা instinct দ্বারা বুদ্ধি বা যুক্তি তর্কের তারা ধার ধারে না।

এদের কাহারও কাহারও মধ্যে কেবলমাত্র মানসিক গোত্রানুক্রম দেখা যায়। কাহারও কাহারও মধ্যে মানসিক ও দৈহিক উভয় গোত্রানুক্রমই দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত কারণে পূর্বেকার অনেক মনীষী দৈহিক গোত্রানুক্রমকেই স্বভাব অপরাধীর জন্মের জন্য দায়ী করতেন। ফলে 'খাপকো বেটা সিপাইকো ঘোড়া, কুছ নেই ত থোড়া থোড়া' ও ও 'কটা দুষ্ট কালো বামন বেঁটে মোছলমান তিনই সমান' প্রভৃতি প্রবাদের প্রচলন হয়। দার্শনিক সাক্রেটিস্ একজন এই ধরণের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অবয়বের সহিত আদিম যুগের মানবের কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নাকি উত্তরে বলেছিলেন—হাঁ আমার মন অত্যধিক অপরাধ-প্রবণ। কিন্তু আমার এই অপরাধ-স্পৃহা আমি দমন করে থাকি। পুরাতন অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ্-পণ্ডিতদের মধ্যে লমব্রোসো এবং গোরিঙ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। লমব্রোসো সাহেবের মতে যাদের চোয়াল লম্বা হয়, চক্ষু শূকরের মত দেখা গেল, লজ্জার অভাব ঘটলে ব্যক্তি বিশেষ সাধারণতঃ স্বভাব-অপরাধী হয়। বলা বাহুল্য, এই সকল চিহ্নগুলি দৈহিক গোত্রানুক্রমের চিহ্ন। আদিম যুগের মানুষের মধ্যে এই সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যেত। লমব্রোসোর শিষ্যরা আবার আরও এগিয়ে যান। তাঁদের মতে এই সকল উঁচু কপাল, লম্বা চোয়াল ঝুলো কান থ্যাবড়া নাক প্রভৃতি চিহ্ন থেকে ব্যক্তি বিশেষ কি ধরণের অপরাধী অর্থাৎ সে একজন চোর বা খুনে বা যৌন অপরাধী তা নাকি জানা যায়। কিন্তু গোরিঙ সাহেব তাঁদের এই ভুল ভেঙে দেন। তিনি বিলাতী জেলসমূহে প্রায় ৩০০০ কয়েদীর দেহ পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে অপরাধ স্পৃহার সঙ্গে অপরাধী দৈহিক চিহ্নগুলির কোনও সম্বন্ধ নেই। গোরিঙ সাহেবের মতে চিত্ত দৌর্বল্যের জন্যই মানুষ অপরাধ করে। চিত্ত দৌর্বল্য বা feeble mindedness সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। একজন ১০ বৎসর বয়স্ক বালকের যেরূপ বুদ্ধি থাকা উচিত একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির যদি তাহা অপেক্ষাও দুই বা চারি বৎসরের কম বয়সের (বালকের) ন্যায় বুদ্ধিশুদ্ধি হয় ত সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বলা হবে একজন চিত্ত-দুর্বল ব্যক্তি। গোরিঙ সাহেব মতে, এই সকল চিত্ত-দুর্বল ব্যক্তিরাই হয় স্বভাব অপরাধী। তিনি পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ বহু চিত্ত-দুর্বল অপরাধী বার করেন। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যদের মধ্যে এইরূপ অনেক পরীক্ষা করা হয়। এই সব পরীক্ষাতে দেখা যায় প্রায় ১০ লক্ষ সৈন্যের বুদ্ধিমত্তা ঠিক ১২ বা ১৩ বৎসর বালকদের মত। কিন্তু তাদের মধ্যে কেহ কখনও কোন অপরাধ করে নি। এইভাবে গোরিঙ সাহেবের মতবাদও পরে ভুলরূপে প্রমাণিত হয়।

আমার মতে মানসিক গোত্রানুক্রমেই স্বভাব-অপরাধীদের জন্ম দেয়। এই মানসিক গোত্রানুক্রমের সঙ্গে দৈহিক গোত্রানুক্রমের কোনও সম্বন্ধ নেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই দৈহিক ও মানসিক গোত্রানুক্রম একত্র দেখা যায় বটে কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই মানসিক গোত্রানুক্রম এককই দৃষ্ট হয়। কেবলমাত্র মানসিক গোত্রানুক্রম তাহাদের মধ্যে দৈহিক গোত্রানুক্রমের কোনও চিহ্ন মাত্র নেই। অপরাধীদের অন্তর্ভাব তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব চলন দৃষ্টিভঙ্গি কথোপকথন প্রভৃতির মধ্যে কিছু কিছু পরিস্ফুট হয়, তবে তাদের এই বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিগত আকৃতিগত নয়। ক্লিপটো-ম্যানিয়াগ্রস্ত রোগী অপরাধীরা চুরি করে তাদের ইচ্ছাবৃত্তির উপশমের জন্য, (ভারতবর্ষ বৈশাখ সংখ্যা দেখুন), বিত্ত লাভের জন্য নয়। কিন্তু এই স্বভাব-অপরাধীরা চুরি করে তাদের লাভের-লোভের ও ব্যবহারের জন্য। অভ্যাস-অপরাধীদের ন্যায় কখনও তারা তাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয় না। চৌর্য আদি দুষ্কার্য্য তাদের কাছে "অধিকারের" সামিল। অতি অল্পসংখ্যক অপরাধীই স্বভাব-অপরাধী হয়। অভ্যাস-অপরাধীদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশী। স্বভাব-দুর্বৃত্ত (criminal tribe) জাতিগুলির মধ্যে, কিন্তু স্বভাব-অপরাধীদের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। এই সব জাতিরা তাদের আদিম-স্বভাব আজও ত্যাগ করে নি। এখনও পর্য্যন্ত 'অপরাধই' তাদের প্রধান উপজীবিকা। দেহের দিক থেকে পরিবর্তিত হলেও, মনের দিক থেকে তারা প্রায় আদিম যুগেরই মানুষ।

দৈব-অপরাধী

দৈব-দুর্বিপাকে বা দুঃখের জ্বালায় কেউ যদি কোনও অপরাধ করে ত' তাকে আমরা দৈব অপরাধী বলি। আমার মতে এদের অপরাধীর পর্য্যায়ে না ফেলাই উচিত। দৈব অপরাধীরা নিজেদের প্রায়ই শুধরে নেয়, অবশ্য যদি সুযোগ পায়; তবে অভ্যাসজনিত দৈব অপরাধীদের অভ্যাস অপরাধীতে রূপান্তরিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। এ অবস্থায় দৈব-অপরাধকে অভ্যাস অপরাধের প্রাথমিক অবস্থা বলা যায়। খাদ্যের অভাব ঘটলে দৈব-অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নিম্নের বিলাতী তালিকা দুইটি প্রণিধানযোগ্য। Criminality and Economic Condition পুস্তকের ৭২ পৃ দ্রষ্টব্য।

ইংলণ্ড

বৎসর	যবের মূল্য	অপরাধীর সংখ্যা
১৮১৫	৭৮'৬	৯০৮১
১৮১৭	৯৩'১১	১৩,৯০২
১৮৩৫	৪৪'৮	২৩,০৭২
১৮৩৭	৫৯'৮	২২,৪৫১
১৮৪১	৬০'৯	২৪,৪৪৩
১৮৪৩	৫৩'৩	২৭,১৮৭
১৮৪৪	৭২'৫	২৭,৭৫০
১৮৪৫	৭৪'৮	৩১,৩০৯
১৮৪৬	৬৯'২	২৯,৫৯১
১৮৪৭	৫৩'৪	২৬,৫৪২
১৮৪৮	৪৪'২	২৪,৩০৩

দৈব অপরাধীদের ন্যায় দৈব-বেশ্যাও পরিলক্ষিত হয়। দৈব-বেশ্যাদের মধ্যে অনেকেই আবার অবস্থা বিপর্য্যয়ে, অভ্যাস-বেশ্যা হয়ে উঠে। তবে তা, তারা একদিনে হয় না, ধীরে ধীরে হয়। অনেকে সাধারণ রূপ-জীবিনীর পর্য্যায়ে নেমে আসে, বাধ্য হয়ে। কিরূপ অবস্থায় তারা সৎ ও সতী হতে পারত, তারাই অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে অসৎ ও অসতী হয়। নিম্নের স্বীকারোক্তিটি প্রণিধান যোগ্য।

"আমার বাস ছিল বাংলার এক দূর গ্রামে। ১৩ বছর বয়সে এক ৪৮ বছর বুড়োর সঙ্গে আমার সাদি হয়। ১৪ বছর বয়সে আমি স্বামীর ঘরে আসি। আমার দেবরের বয়স তখন ১৬। যৌবন উন্মাদনার নাটক প্রভৃতি, সবরকম বিলাস, আমার দেবরের সঙ্গেই আমি কামনা করতাম। আমাদের দুজনের মধ্যে একটা নিষ্পাপ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। একদিন এক চাঁদনি রাতে গাঙের ঘাটের বকুল গাছটার তলায় দু'জনে গল্প করছিলাম। হঠাৎ আমার দেবর আমাকে তার বুকের কাছে টেনে নিল, প্রতিবাদ করে উঠে দাঁড়ালাম, পিছন ফিরে দেখি আমার সোয়ামী। চুপ করে তিনি আমাকে পদাঘাত করলেন, কত অনুনয় করলাম, কাঁদলাম, কিন্তু বাড়ী ঢুকতে পেলাম না। বাড়ী বাড়ী ঘুরলাম, কিন্তু কেউ আশ্রয় দিল না, এমনকি দেবরেরও দেখা মিলল না। 'গাঁয়ে-ঠেলা' মাগ্‌না বাণী গাঁয়ের শেষ সীমানায় থাকত। কোলকাতা হ'তে বুড়ী মেয়েকে দেখতে এসেছিল। আদর করে সে আমায় কোলকাতায় নিয়ে এল। অন্নবস্ত্রের জন্য অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু পাইলাম না। বাপ'মাকে চিঠি লিখলাম, উত্তর পেলাম না। এখন এমন বাড়ীওয়ালীর পেটেই আমার আয় যেত। শেষে চালান হলাম। লোক চিনতেও শিখলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। সমাজ আমায় আশ্রয় দেয় নি। যাঁকে আশ্রয় করে একনিষ্ঠ হতে চেয়েছি, সেই আমাকে ঠকিয়ে সরে গেছে, সমাজ তাকে কেড়ে নিয়েছে, আমাকে অবহেলা করে। আমার সর্বনাশকদের সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু আমাকে দেয় নি। তাই সমাজের মান্য মান্য ছেলেদের নষ্ট করে আমি আনন্দ পাই। তাদের দেখলেই আমার প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠে। এই ভাবে আমি সমাজের উপর প্রতিশোধ নি। লেখাপড়াও শিখেছি, এতে আমার ব্যবসার সুবিধে হয়।"

আমার বিশ্বাস সুযোগ ও সুবিধা দ্বারা এই দৈব ও অভ্যাস-অপরাধী ও বেশ্যাদের আবার সমাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনা খুবই সহজ। কিন্তু স্বভাব-অপরাধী ও স্বভাব-বেশ্যাদের সম্বন্ধে সেই কথা বলা যায় কি? প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছি, ঔষধাদি দ্বারা মানবের এই আদিম-বৃত্তি জাগ্রত করা যায়। তাই যদি হয় ত অন্য কোনও ঔষধাদি দ্বারা তাদের এই স্বভাব-বৃত্তির নিবৃত্তি হয় কিনা—এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত। পূর্বাপর সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করলে এই অপরাধী ও বেশ্যাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা আসে না, আসে সহানুভূতি। তাদের জন্য আমাদের কি কিছুই ভাববার বা করবার নেই?

(ক্রমশঃ)

ডেলিনিউজ

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভোর হবার আগেই পদ্মার কোল থেকে নৌকো ছাড়লো। তিন নৌকো ভর্তি, ছেলে বুড়ো বন্দুক শিকারী আর খাবার। কে আগে যাবে, এ রেষারেষি সবাইকার মনেই। কাল যে পথে নৌকো চলেছে, আজ পদ্মার সেখানে যে একটা চর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—এ খবর কে জানে।

কেবলই নৌকো ঠেকতে লাগলো। মাঝিরা নেমে ঠ্যালে। আমরা বলাবলি করি, পদ্মার একটা ডেলিনিউজ নেই কেনো? তাতে থাকবে—কোথায় গ্রাম-ভাঙনের চিড় লেগেছে। কোথায় কলসী-সুদ্ধ গ্রামের দুটি বৌ চোরা বালিতে তলিয়ে গেছে। কোথায় নোতুন চর জাগলো। কোথায় স্রোতের বাঁক হঠাৎ ফিরতে লেগেচে। কোথায় ঘূর্ণিপাকে নৌকো টানে। কোথায় নির্জন চর আর ডাঙার তেপান্তরের মাঝে দাঁড়িয়ে, পদ্মার পাড় ভেঙে ঝাঁপ খায়। কোথায় পদ্মার নোতুন জাগা সাহারার মতন চরে, ঘূর্ণিবালির পাক ওঠে, এমন সাতটা অশোক স্তম্ভের মতন উঁচু। তাতে নিঃসঙ্গ গোরুকে টেনে নিয়ে কুমোরের চাকের মতন ঘোরাতে ঘোরাতে এনে ফ্যালে পদ্মার জলে। কোথায় নেমেছে মানস সরোবর থেকে রাজহাঁসের দল এসে। কোনখানে ছোটো হাঁসের বাজার বসেচে। কোন সদ্য-জাগা চরে, পাখীর ভীষণ লড়াই হোয়ে গেছে, তার পালক পোড়ে আছে, শিমুল তুলোর মতন; আর নখের দাগে কাঁচা মাটি ক্ষতবিক্ষত।

আমাদের পরামর্শ হোলো। পদ্মার বিস্তার অনেক। তার খবর অনেকেই সাগ্রহে পোড়বে। অতএব কাগজ-ওয়ালাদের কাছে দরখাস্ত করা যাক। তবে রিপোর্টারের কাজ আমরাই চাই। বাজে লোককে দিলে চলবে না। আমরা কোয়ালিফায়েড্ বৈকি। পদ্মার মাঝিদের সুপারিশ না হয় জোগাড় কোরবো। কিম্বা কতকগুলো গ্রাম-বাসীদের। তাহলে হবে তো।

নববর্ষে

শ্রীসুবোধ রায়

যদিও আকাশে ঘনাইয়া কালো মেঘ
ঈশানের কোণে এমন ভ্রুকুটি হেরি,
মর্ত্তে অশনি এমন ঘন বেগ
চূর্ণিতে ধরা অধীর—সময় দেরি।
এরি মাঝে তবু হৃদয়ে আসন পাতি'
নবীন বর্ষে সাদরে বরিয়া ল'ব,

জীবন ভরে প্রীতির মালিকা গাঁথি
আনন্দময় অভয়মন্ত্র ক'ব।
তিমির-সাধনা শেষ হবে যেই ক্ষণ
জ্যোতির সিদ্ধি আনিবে নবীন ঊষা,
মৃত্যুতীর্থে স্নান করি সনাতন
মানব আবার পরিবে নবীন ভূষা।

পাঠাই মনের এ চারু মধুগীতিকা
তোমাদের করে—হোক তাহা মঞ্জুলা।'

রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম-প্রীতি ও তাঁহার স্বাজাতিক আদর্শ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত, সেই বৎসর তাঁর বয়স ৭০ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। সেই উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসী ও সকল সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁর জয়ন্তী উৎসবের প্রয়োজন সম্পর্কে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট গৃহে একটি সভা হয়, আর সে সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সভাপতির অভিভাষণে শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমেই বলেছিলেন—'বঙ্কিমের প্রতিভার অনতিক্রমণীয় প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে নবযুগের উদীয়মান শক্তিরূপে আশীর্বাদ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর ফলপ্রদ হয়েছিল এবং তাঁর আবির্ভাব একটি যুগ-যুগের অবতারণা করায় রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ: উর্দ্ধলোকে আরোহণ করলেন। ৩০ বছরের মধ্যে তাঁর খ্যাতি কেবল চীন থেকে পেরু পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেনি, টেরাডেলফুগো থেকে আলাস্কা, এবং কামস্কাটকা থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি ঊর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধলোকে আরোহণ করলেন, এবং সেই জগতের সমগ্র রহস্য কবির নিকট উদ্ঘাটিত হচ্ছে। তাঁর রচনাবলী জীবন্ত, কালজয়ী। তাঁর বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ এবং ব্যঙ্গ তীব্রতর। তিনি প্রাচীন কবিদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছেন। তাঁর ব্যাকরণ-জ্ঞান ও শব্দ-বিজ্ঞান আমাদের অধিকাংশকে ছাড়িয়ে গেছে। তিনি একাধারে কল্পনাপ্রবণতা, বিস্ময়ের অবদান, আশ্চর্য্য নিপুণতা এবং উচ্চ শ্রেণীর মানসিক ক্ষমতা ও মনোহর দৈহিক সৌন্দর্য্যের অধিকারী। যে জীবন তিনি বেছে নিয়েছেন তা যেন প্রকৃতিই তাঁকে দান করেছেন, তিনি যে ব্রত গ্রহণ করেছেন, যেন তিনি শৈশব থেকে প্রকৃতি, সমাজ, শিক্ষা ও সাহচর্য্যের ভিতর থেকেই সেটি পেয়েছেন। নিজের জন্যই তিনি কেবল খ্যাতি অর্জন করেন নি, বিশ্বের দরবারে তাঁর নিজের দেশ ও নিজ জাতির যশও তিনি অর্জন করেছেন। হাজার বছর আগে সিদ্ধ আলংকারিক 'রাজশেখর' আদর্শ কবির যে বর্ণনা করে গেছেন—রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শে জীবনযাপন করেছেন। তিনি তার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করেছেন, সমগ্র জগৎ তাঁকে সম্মানিত করেছে, পৃথিবীর নৃপতি ও মনীষীবৃন্দ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা দিয়েছেন—যেখানেই তিনি গিয়েছেন, সেখানেই জনমণ্ডলী তাঁর কথা শুনে ধন্য হবার জন্য—তাঁকে সম্মান করবার জন্য—তাঁকে পূজা করবার জন্য তাঁকে ঘিরে রয়েছে।' অল্প কথায় বিশ্বকবির সম্বন্ধে সকল প্রশস্তি আমরা এই অভিভাষণে পাই।

এই অভিভাষণে বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ লাভের যে প্রসঙ্গ আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে কবির উক্তি থেকে এখানে যদি উল্লেখ করি—বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ছাত্র সভার এক বার্ষিক সম্মিলনীতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তরুণ কবির সাক্ষাৎ হয়। সভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে কবি দেখলেন যিনি সকলের থেকে স্বতন্ত্র—যাঁকে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবার জো নেই। কবি এ সম্বন্ধে লিখেছেন—"সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখলাম যে তাঁর পরিচয় জানবার কৌতূহল সম্বরণ করতে পারলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র, তিনি কে, এই জানবার জন্য প্রশ্ন করেছিলাম। যখন উত্তরে শুনলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড় বিস্ময় জন্মাল। লেখা পড়ে এতদিন যাঁকে মহৎ বলে জানতাম, চেহারাতেও তাঁর বিশিষ্টতাই যে এমন একটা চিহ্নিত পরিচয় আছে সে কথা সেদিন আমার খুব মনে লেগেছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গ নাসায়, তাঁর চাপা ঠোঁটে, তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বুকের উপর দুই হাত বদ্ধ করে তিনি যেন সকলের নিকট হতে পৃথক হয়ে চলেছেন—কারো সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশী করে আমার চোখে ঠেকেছিল। তাঁর যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব ছিল তা নয়, তাঁর ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।"

এর পর বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার জন্য কবির বিশেষ আগ্রহ থাকলেও উপলক্ষ ঘটে ওঠে নি। দুই একবার দেখা সাক্ষাৎ হলেও আলাপ করবার সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু কয়েক বছর পরে কবির 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' কাব্যখানি সে সুযোগ রচনা করে দেয়। রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কবি নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যান। রমেশবাবু বাড়ীর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে নিমন্ত্রিতদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছিলেন। বঙ্কিমবাবু সেই সময় দুয়ারে উপস্থিত হলে, রমেশবাবু সাদরে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছেন, ঠিক সেই সময় রবীন্দ্রনাথও সেখানে এসে পড়লেন। বঙ্কিমবাবু কবিকে দেখেই তাড়াতাড়ি মালা ছড়াটি রমেশবাবুর হাত থেকে নিয়ে বললেন—'এ মালা এঁরই প্রাপ্য—রমেশ তুমি সন্ধ্যা সংগীত পড়েছ?' রমেশবাবু বললেন—'না।' বঙ্কিমচন্দ্র তখন সন্ধ্যা-সঙ্গীতের প্রশংসা করে কবির গলায় মালা ছড়াটি পরিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লিখেছেন—'বঙ্কিমবাবু কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলেন তাতে আমি পুরস্কৃত হয়েছিলাম।'

বঙ্কিম-সাহিত্য-সংস্থার উদ্যোগে রবীন্দ্র স্মৃতি সভার আয়োজন হয়েছে বলেই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শুভ সংযোগের কাহিনীটি উল্লেখ করলুম। অপ্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে যদি ত্রুটি মার্জনা করবেন।

তবে একথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, তৎকালের প্রগতিশীল সমাজের রুচির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন দুঃসাহসের সহিত লেখনী চালনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি জাতির জীবনপথে অন্তরায় স্বরূপ সামাজিক বিধি ব্যবস্থা বা রীতি নীতিকে খাতির করেন নি, রেহাই দেন নি। যুক্তিহীন আচারবাদ যে গ্রাহ্য নয়, তার অন্তরালে যে নির্বুদ্ধিতা ও আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তি মানুষের মনে নীড় রচনা করে—সেই জিনিসটি তিনি ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন তাঁর গল্প উপন্যাস নাটক ও অসংখ্য কবিতার ভিতর দিয়ে।

জাতির আত্মসম্মানে যখনই আঘাত লেগেছে তখনই শাণিত খড়্গের মত তাঁর প্রতিবাদ তীব্র হয়ে উঠেছে। তুলসী দাস তাঁর এক দোঁহায় বলেছেন—

সহ কল দারুণ দুঃখ নানা
সহ-তে কঠিন, জাতি অপমানা।

পৃথিবীতে দুঃখের অন্ত নেই সত্য, কিন্তু জাতির অপমানের মত দুঃখ আর নাই। রবীন্দ্রনাথও জাতির এই অপমান অনেক ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপারে উপলব্ধি করেছিলেন। জাতির উপর যে লাঞ্ছনা ও অপমান শুরু হয়—রবীন্দ্রনাথের অন্তরে তা দারুণ আঘাত দিয়েছে। এই অপমান চরমে উঠেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর নির্যাতনে। জাতি বলতে রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালীকেই গ্রহণ করেন নি—ভারতবাসী মাত্রই তাঁর দৃষ্টিতে জাতি। তাই তিনি রাজদত্ত অভিবাঞ্ছিত নাইট উপাধি ত্যাগ করে—জাতির অন্তরের উপর শাসক শক্তির আঘাতের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন।

তাই তিনি জাতীয় ভাষাকে খুঁজে বার করে পুনরায় জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন।

জাতীয় চৈতন্যের মত জাতীয় ভাষাকেও রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন। সুরাট কংগ্রেস ভঙ্গের পর পাবনায় যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন হয়, রবীন্দ্রনাথ তাতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করে সর্বপ্রথম বাংলায় তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করে বাংলা ও বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

১৯৩৭ সনে সর্বপ্রথম চিরাচরিত নিয়মভঙ্গ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ যখন অভিভাষণ দেবার জন্য আহূত হলেন সেই সময় সভায় বাংলায় গবর্ণর বাহাদুরের সামনেই বাংলা ভাষায় রচিত অভিভাষণ পাঠ করে বঙ্গ-সম্মানিত ভাষা-জননীর গলায় আর এক সম্মানের মালা পরিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়—সভার নব নামকরণ করলেন—পদবী সম্মান বিতরণ উৎসব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে—নবধারা প্রবর্তন সম্পর্কে—রবীন্দ্রনাথের এই অভিভাষণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সেই অপূর্ব অভিভাষণে দেশের আশার প্রতীক ছাত্র সমাজকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দিলেন:

আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে, তার পরে পরের শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্মানিত শক্তি হতে পারবে। নিজের শ্রেষ্ঠতা দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি। তাতেই মঙ্গল, আমাদেরও, অন্যেরও। দুর্বলের প্রার্থনা যে কুণ্ঠাগ্রস্ত দান সঞ্চয় করে, সে দান শত ছিদ্র ঘটের জল, সে আশ্রয় চায় কোনো বাদিতে, সে আশ্রয়ের ভিত্তি নাই।

দূর কর মূঢ়তার অযোগ্যের পদে
মান মর্যাদা বিসর্জন
চূর্ণ কর যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসঙ্কোচে মস্তক তুলিতে দাও—
অনন্ত আকাশে
উদার আলোকে মুক্তির বাতাসে।

(১৩৫০-২৫শে বৈশাখ বঙ্কিম লিটারারী-সোসাইটির অধিবেশনে পঠিত)

বঙ্গদেশে নারিকেল তৈল ও ছোবড়া শিল্প

শ্রীবীরেন সেনগুপ্ত

নারিকেল তৈল

বঙ্গদেশ—গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। এখানে নিত্যস্নান খানিকটা বাধ্যতামূলকও বলা চলে। সুতরাং প্রসাধন দ্রব্য হিসাবে নারিকেল তৈলের ব্যবহার বাংলা দেশে অত্যন্ত অধিক। নারিকেল তৈলকে আরও নানা রকমে কাজে লাগান যাইতে পারে; যেমন, সুগন্ধি তৈল, জালানি তৈল, প্রদীপের তৈলরূপে। মোমবাতি প্রস্তুতে, উদ্ভিজ্জ ঘি তৈয়ারী করায়, মার্গারিণ, সাবান আর মাথার তৈল ও মাখনের "বিকল্প" বিস্কুট, কেক্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে; রসায়ন কিম্বা রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতেও ইহার প্রচলন যথেষ্ট। সাবান ও উদ্ভিজ্জ-ঘির ব্যবসায় দৈনন্দিন ক্রমোন্নতিশীল, উহাতে নারিকেল তৈলের যথেষ্ট ব্যবহার থাকাতে ইহার কাটতিও যে উত্তরোত্তর বাড়িতেছে—এই সত্যই প্রমাণিত হয়।

আমার পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধ সরিষার তৈল সম্পর্কে মুখবন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, নারিকেল তৈল সম্বন্ধেও এক-ই কথা চূড়ান্ত রকমে খাটে;—কারণ বাংলাদেশে প্রতি বৎসর ৩৫ লক্ষ গ্যালন নারিকেল তৈল আমদানী হয়—তাহার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশী শুধু বাহ্যপ্রয়োগেই ব্যবহৃত হয়।

এই তৈল সাধারণতঃ মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, সিংহল ও মালয় দেশ হইতে বাংলাদেশে চালান আসে। এই আমদানী তৈলের মূল্য হিসাবে এবং বাঙালীর ঘর-দুয়ার বাঁধাই ও মেরামতির কাজে যে সমস্ত দড়ি-দড়া আমদানী হইয়া থাকে তাহার বিনিময়ে প্রতি বৎসর বাংলাদেশকে ৬০ লক্ষ টাকা বিদেশে সঁপিয়া দিতে হইতেছে।

ভাবিলে দুঃখ হয়, নারিকেল চাষের অনুকূলে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশে বর্তমান আছে, বাংলার সাগর উপকূলে নারিকেল গাছও প্রচুরই জন্মায়, তাহা সত্ত্বেও এর আবাদ করিবার প্রথাটা—সিংহল অথবা নারিকেল উৎপন্নকারী ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশগুলির মত বাংলাদেশে আদৌ অবলম্বিত হয় নাই;—এই কারণে, নারিকেল তৈল বা তজ্জাতীয় শিল্প, বলিতে গেলে, কিছুই নাই।

ঝুঁকি লওয়ার অভাব,—আর "উৎকৃষ্ট তৈলের পক্ষে বাংলার নারিকেল যথেষ্ট উপযোগী নয়"—এমন একটা ধারণা,—এই দুই হেতু সংবদ্ধ হইয়া বাংলার নারিকেল শিল্পের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটাইতেছে।

নিম্নে যে বিকলন বর্ণনা (Analytical Report) উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে যে শুধু বাংলার নারিকেলের "মিথ্যা গ্লানি"-ই অপনোদিত হইবে—তাহা নহে, বরং শুষ্ক শাঁসের প্রাচুর্য বিবেচনা করিলে প্রতিবেশী প্রদেশ সমূহে উৎপন্ন নারিকেল হইতে ইহা যে অনেক উচ্চ শ্রেণীর—এরূপ মন্তব্যের ভিত্তিও সুদৃঢ় হইয়া যাইবে। তবে একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংলাদেশের উৎপন্ন নারিকেল আকারে সাধারণতঃ ছোট।

দেশ ও প্রদেশগুলির নাম	তৈল নিষ্কাশনের শতকরা হার	
	বলদটানা ঘানি	শক্তিচালিত ঘানি
বঙ্গদেশ	৫৫%	৬৫%
কোচিন	৫৩%	৬৩%
কলম্বো ...	৫৪%	৬৪%

কি কি পদার্থের সমবায়ে নারিকেল ফল জন্মে—তাহার বর্ণনা :

	দক্ষিণ ভারত	মালাবার	বঙ্গদেশ (নোয়াখালী)
শাঁস	১৮%	৩০%	৩০%
জল	১২%	২৪%	২৩%
ছোবড়া	৫৭%	৩৪%	২৯%
খোলা	১৩%	১২%	১৫%

নারিকেল গাছকে টাকার গাছ বলিলে অতিশয়োক্তি করা হয় না; কেন না, এই গাছের প্রতিটি অংশ শিল্প হিসাবে কোন না কোন কাজে লাগান যায়। প্রকৃতপক্ষে, নারিকেল তৈল-শিল্পের লাভ লোকসান নির্ভর করে তাহার উপ-শিল্পগুলির উপর। মূল তৈল শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে দড়ি, গদি, পা-পোষ, হুঁকা, খোলা-ভস্ম (charcoal), গ্যাস-মুখোসের কার্ব্বন্, বোতাম, খেলনা—অর্থাৎ খোলা হইতে যাহা কিছু প্রস্তুত হইতে পারে—সেই সমস্তকে ইহার উপ-শিল্পরূপে গড়িয়া তুলিতে পারিলে, লভ্যাংশ এত অধিক হইবে যে মাত্র দুই মাসের মধ্যেই কারবারের মূলধন ঘরে ফিরিয়া আসিবে। শুষ্ক শাঁস হইতে তৈল বাহির করিয়া লওয়ার পর কিছু শাঁস ও ছিবড়া থাকিয়া যায়, তাহাকে চলতি কথায় 'খইল' বলে;—এ খইল গো-খাদ্য হিসাবে ত বটে-ই সাররূপে ব্যবহৃত হইলেও সুফলপ্রদ ও লাভজনক হয়। এই জিনিষটিকে ব্যবহারে লাগান উচিৎ। বাজারের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত উপ-শিল্পগুলিকে চালাইয়া যাওয়া নারিকেল-তৈল-শিল্পের সাফল্য লাভের চাবি-কাঠী।

বাজারে বিভিন্ন উপায়ে সংগৃহীত ১০০০ নারিকেল হইতে গড়ে ২০০টি নারিকেল সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট তৈলের এবং সুদৃশ্য হুঁকার পক্ষে উপযোগী হয়। ঐ ২০০টি নারিকেলকে তৈল ও হুঁকার জন্য পৃথক করিয়া রাখিলে এবং বাকী ৮০০টিকে খুচরা বা পাইকারী বিক্রয় করিলে উচ্চতম হারে লাভ পাওয়া যায়। এই চয়ন-ব্যবস্থায় উৎপন্ন তৈল যে উৎকৃষ্ট হইবে, তাহাতে নিঃসংশয় হওয়া যায়, আর ভাল তৈল প্রস্তুতের পক্ষে যে সকল নারিকেল অনুপযোগী বিবেচিত হয়, তাহা হইতেও একটা মুনাফা তুলিতে পারা যায়। ফলে দাঁড়ায় এই যে, তৈল-শিল্পের গোটা ব্যাপারটাই উপ-শিল্পে পর্য্যবসিত হইয়া একরকম নি-খরচায় সম্পন্ন হইয়া যায়। হুঁকার খোলের চাহিদা বাংলা দেশে যথেষ্ট আছে, এইজন্য মনে হয়, উল্লিখিত উপায়ে প্রস্তুত হুঁকার খোল সৌখিনতা এবং সুলভতার গুণে বাজারে অন্য খোলগুলির স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারিবে।

নারিকেল তৈল শিল্পের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমস্ত যুক্তি বিবেচনা করিয়া এই কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলিতে পারা যায় যে বাংলাদেশে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। যতদিন না বাংলাদেশে সুনিয়ন্ত্রিত নারিকেল গাছের আবাদ হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত বৃহৎ পরিকল্পনায় এ শিল্প চালিত হইতে পারিবে না। অতএব, বর্ত্তমানে বাংলার সাগরোপকূলে ছোট ছোট অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাই সঙ্গত।

ভারতে নারিকেল উৎপন্নকারী স্থান সমূহ—

ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত অঞ্চল সমূহে নারিকেল বৃক্ষ জন্মায়।

বঙ্গদেশ—	বাংলার সাগরোপকূল, যথা—চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর।
বোম্বাই—	রত্নগিরি জেলায়
মাদ্রাজ—	মালাবার উপকূল, পূর্ব্ব-গোদাবরী, দক্ষিণ কানাড়া, উত্তর আর্কট ও কোয়েম্বাটোর
উড়িষ্যা—	কটক ও পুরী জেলা
ত্রিবাঙ্কুর—	কোচিন

তৈল নিষ্কাষিত করিবার বিধি

প্রথমে নারিকেলের শাঁস খোলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া লবণাক্ত জলে ধুইয়া লইতে হয়। তারপর, ঐগুলিকে হয় সূর্য্যতাপে না-হয় শুকাইবার কামরায় (Drying Chamber) রাখিতে হয়। পেষণকালে ঘানিতে যে ছিদ্র থাকে তাহা দিয়া তৈল নিষ্কাশিত হয় ও একটি আধারে সঞ্চিত হয়। অতঃপর ঐ তৈল পরিস্রুত করিবার পাত্রে রাখিয়া পরিষ্কৃত ও পরিস্রুত হইলে বাজারে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু, যে নারিকেল তৈল বাজারে প্রসাধন তৈল (rifine Coconut oil) হিসাবে বিক্রীত হয় তাহার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। পরিশোধিত তৈলে খানিকটা সোডি-বাই-কার্ব্ব মিশ্রিত করিয়া শতকরা ২৫ ভাগ জলের সহিত ৪০°ডি তাপে উত্তপ্ত করিয়া লইতে হয়। এই মিশ্রিত পদার্থ কয়েক মিনিট আলোড়িত করিয়া অন্ততঃ পক্ষে ১২ ঘণ্টা অচঞ্চল অবস্থায় থাকিতে দিতে হয়। অতঃপর উহাকে ২০°সি তাপে আর একবার গরম করা দরকার; ঠাণ্ডা হইলে উহাকেই আবার শতকরা ৪ ভাগ কার্ব্বন যোগ করিয়া মৃদুতাপে কিছুক্ষণ থাকিতে দিবার পরে ফ্যান্সকেল্টস্ সহযোগে পরিস্রুত করিবার ব্যবস্থা সম্বলিত পরিস্রুত করিবার ভাণ্ডে পরিস্রুত করিয়া লইতে হয়। এই পরিস্রুত করিবার কাজ নিষ্পন্ন হইলে সংমিশ্রিত পদার্থ অপর পাত্রে ঢালিয়া লইয়া উহাতে মিশ্রিত পদার্থটিকে জমিতে দেওয়া হয়। তৈল তখন জলের উপর ভাসিতে থাকে এবং পাত্রটির তলায় যে ছিদ্র থাকে তাহার দ্বারা জল বাহির করিয়া লওয়া হয়; অবশিষ্ট পদার্থ যাহা পাত্রে থাকিয়া যায় তাহাই হইল পরিস্রুত নারিকেল তৈল; বাজারে চালাইবার জন্য তখনই উহা ভাণ্ডারজাত করিয়া রাখিতে হয়।

পরিকল্পনা *

৩৪০০৲ টাকা মূলধনে ১,০০০ নারিকেল হইতে প্রত্যহ ২।/০ মণ তৈল প্রস্তুত করিবার একটি পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হইল।

মোট ব্যয়

দুইটি ঘানি—	
শুখাইবার ঘর—	
দুইটি পরিস্রুত করিবার পাত্র—	
পরিস্রুত করিবার ঘর—	
চারিটি ভাণ্ডার-জাত করিয়া রাখিবার আধার—	১৫০৲

---

* এই দামগুলি যুদ্ধকালীন নহে, বাজারের স্বাভাবিক অবস্থার অনুপাতে ধার্য্য করা হইল।

৪ অশ্ব-শক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন—	৮০০৲
যন্ত্রপাতি ও বিবিধ উপকরণ	১৮৲
চলতি কারবারী মূলধন—২ মাসের উপযোগী—	১৬৮২৲
মোট—	৩৪০০৲

৩।/০ মণ তৈল পাইতে হইলে ৮/০ মণ নারিকেলের শাঁস আবশ্যক, আর নারিকেলের ৮/০ মণ শুষ্ক শাঁস পাইতে হইলে ১,০০০ নারিকেলের দরকার হইবে। এই ১,০০০ শুষ্ক নারিকেল বাংলার উপকূল বিভাগ হইতে সংগ্রহ করিলে যানবাহনাদির ব্যয় সহ খড়ে ২৭৲ টাকার অধিক লাগিবে না।

প্রতিমাসে যে খরচ লাগিবে

(মাসিক ২৬ দিন কাজ করাইলে)

১ জন কর্মচারী—	৩০৲
৪ জন শ্রমিকের মজুরী—	৬৪৲
নারিকেল—	৭০২৲
বেটে তৈল—	৩০৲
বাড়ী ভাড়া—	১৫৲
অন্য খরচ—	৫৲
মোট—	৮৪৬৲

আয় :

দৈনিক তৈল উৎপাদন— ৩।/০ মণ

(নিম্নলিখিত পরিমাণে সাধারণ ও উৎকৃষ্ট তৈল (refine oil) উৎপন্ন করিলে, নিম্নলিখিত দরে বাজারে বিক্রয় হইবে। সাধারণ তৈল হইতে বাধার মাথা (refine oil) তৈল বাজারে চালাইতে পারিলে লাভ হইবে অনেক বেশী।)

(ক) ২¼ মণ সাধারণ তৈল ১২৲ টাকা মণ দরে—	২৭৲
(খ) ১ মণ উৎকৃষ্ট তৈল (refine oil) ১৮৲ টাকা দরে—	১৮৲
(গ) ২¾ মণ খইল ১৷০ মণ দরে—	৪৶
দৈনিক মোট—	৪৯৶০

মাসিক উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য—১,২৭৭৲ টাকা (আনুমানিক)

বাদ

কর, অপচয় ও মূলধনের সুদ ও মরামতী খরচ—	১০০৲
বাজার দালালী ১০% ফিঃ—	১৩০৲
মোট—	২৩০৲
মোট খরচ (৮৪৬৲ যোগ ২৩০৲)—	১,০৭৬৲
মোট লাভ (১,২৭৭৲ বাদ ১০৭৬৲)—	২০০৲

(আনুমানিক)

নারিকেল ছোবড়া শিল্প

বাংলাদেশে 'ছোবড়ার কারবার'কে স্বতন্ত্র শিল্পরূপে পরিচালনা করা যুক্তি সঙ্গত হইবে না; কারণ তাহাতে উৎপাদন খরচ অত্যন্ত বেশী পড়িবে সুতরাং—নারিকেলের তৈল-শিল্পের উপশিল্প হিসাবে ছোবড়ার কারবার অন্য যে সব স্থানে পরিচালিত হয় ও বাংলা দেশে চালান আসে—তাহার সহিত স্থানীয় মাল প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবেনা।

সুতরাং, ছোবড়ার শিল্পকে স্বতন্ত্র শিল্পরূপে গ্রহণ না করিয়া তৈল শিল্পেরই একটা উপ-শিল্পরূপে গ্রহণ করা উচিৎ;—কেননা, বিনামূল্যেই ছোবড়া সংগৃহীত হইবে।

সাধারণতঃ দুই রকমের ছোবড়া নারিকেল হইতে পাওয়া যাইতে পারে। একটি পাকা নারিকেলের ছোবড়া, অপরটি শুষ্ক নারিকেলের ছোবড়া। প্রথমোক্তটি দেখিতে হলুদবর্ণের—আর তাই "হলদে ছোবড়া" (yellow coir) অপরটিকে বলা হয়, শুখ্না ছোবড়া (dry coir)। ইহাদের মধ্যে হলদে ছোবড়াই সবচেয়ে ভাল—দামও বেশী ইহা হইতে কাছি প্রভৃতি দড়ি, দড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

'ইয়েলো কয়ের' বাস্তি ফসল পাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ছোবড়া ছাড়াইয়া লইলেই পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা দেশের নারিকেল ব্যবসায়ীদের নিকট উহা পাওয়া দুষ্কর, কারণ বাংলা দেশের বাজারে বিক্রয়ার্থ যে সমস্ত নারিকেলের চালান আসে তাহা বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া বাজারে চালান আসিতে সময় বেশী লাগে সেই কারণে পাকা নারিকেল শুখাইয়া যায়। পক্ষান্তরে, ভারতের অন্যান্য নারিকেল তৈল উৎপন্নকারী প্রদেশে, নারিকেল তৈল প্রস্তুত কারকগণ পাকা নারিকেল বৃক্ষচ্যুত করার সঙ্গে সঙ্গেই কিনিয়া লন, এজন্য একমাত্র তাঁহারাই, পাকা নারিকেলের ছোবড়া কাজে লাগাইয়া তাহা হইতে "হলদে ছোবড়া" তৈয়ার করিতে পারেন।

শুখ্না ছোবড়া শুখ্না নারিকেল হইতেই পাওয়া যায়। বাংলা দেশের নারিকেল উৎপন্নকারী স্থান সমূহে বিস্তর নারিকেল ব্যবসায়ী আছেন—তাঁহাদের নিকট হইতে অবশ্য এগুলি অতি সহজেই সংগৃহীত হইতে পারে; কিন্তু আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে নারিকেলের ছোবড়া-শিল্পকে স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে গণ্য করিয়া তাহার জন্য পৃথক ছোবড়া খরিদ করিতে হইলে ব্যবসায়ে লাভ দাঁড়াইবে না।

সংগৃহীত নারিকেলের ছোবড়া হইতে—ছোবড়াগুলি সিক্ত করার (soaking) তারতম্যানুসারে ২ শ্রেণীর দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল দড়ি কমপক্ষে ছয়মাস লবণ জলে ভিজান ছোবড়া হইতে প্রস্তুত হয় তাহাকে ১নং শুখ্না ছোবড়া (malta coir) বলে। ১নং ছোবড়া রেল কোম্পানী ও কাঠের আসবাব পত্র বিক্রেতাগণ প্রচুর ব্যবহার করিয়া থাকেন। অল্পকাল ভিজান শুষ্ক ছোবড়া হইতে যে ছোবড়া প্রস্তুত হয় তাহা খুব মসৃণ হইতে পারে না;—এই ছোবড়া ২নং শুখনা ছোবড়া বলা হইয়া থাকে। শেষোক্ত প্রকারের ছোবড়া, জাজিম, পা-পোষ, গদী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। উভয় শ্রেণীর ছোবড়ারই ভারতবর্ষের বাজারে চাহিদা আছে।

পরিকল্পনা *

নারিকেল তৈল শিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত ব্যবস্থানুযায়ী তৈল-শিল্পের উপ-শিল্প হিসাবে মাসিক ২৬ হাজার নারিকেলের ছোবড়া কাজে লাগাইয়া একটি দড়ি ও পা-পোষ প্রভৃতির কারখানা

---

* এই হারগুলি যুদ্ধকালীন নহে, বাজারের স্বাভাবিক অবস্থার অনুপাতে ধার্য্য করা হইল।

জঙ্গম

বনফুল

১

প্রমথ ডাক্তার বেশ করিৎকর্মা ব্যক্তি। বছর তিনেকের মধ্যে উৎপলদের এই প্রাইভেট ডাক্তারখানাটিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি নিজের বেশ একটি 'ফিল্ড' 'ক্রিয়েট' করিয়া লইয়াছেন। যে সম্প্রদায় ডাক্তারের মধ্যে কেবল চিকিৎসকই নয়, ধূর্ত ফন্দীবাজ বন্ধু কামনা করেন (যিনি আইনজ্ঞ অথচ নিরঙ্কুশ) সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রমথ ডাক্তার বেশ পসার জমাইতে পারিয়াছেন। মিথ্যা সার্টিফিকেট লিখিয়া, দারোগাকে তোয়াজ করিয়া, জেলার গভর্ণমেন্ট অফিসারদের সহিত ভাব-সাব রাখিয়া, উৎপল এবং শহরের তোষামোদ করিয়া তিনি নিজের আসনটি বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইন্‌জেক্‌শন-বিশারদ বলিয়া এ অঞ্চলে তাঁহার একটা বিশেষ খ্যাতি হইয়াছে। 'অকসন্' দিয়া তিনি বহু দুঃসাধ্য ব্যাধি নাকি সারাইয়াছেন।

গুলাব সিং আসিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি শহর হইতে ইন্‌জেক্‌শনের সম্বন্ধে ওয়াকিব-হাল হইয়া ফিরিয়াছেন। গোঁফ চুমরাইতে চুমরাইতে সালঙ্কারে নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন।

"হড়বড় মে থে হুজুর, ভুখভি লগা থা, হালওয়াইকো কহা জলদি করো ভাই। উ তুরতে চলা যাঁয় খাতে চলে। কুছ দের মে খেয়াল পড়া ই তো গলতি কাম কর রহে হেঁ—ই শালা তো কাচ্চা পুড়ি খিলা রহা হা। খেয়াল হোনেকা সাথহি খানা বন্দ কর দিয়া—মগর তব ভি ভোগনা পড়া ডাক্তারবাবু"

"ক্যা হুয়া"

"কাচ্চা আঁটা পেটমে লদক্ গিয়া"

"লদক্ গিয়া ?"

"লদক্ গিয়া। দো রোজ মস্ত নহি উতরা, বাই তক ভি গায়েব—ঠস্-ঠোস্। এক ডাকটর কো বোলায়ে। উ আ কর এক দুই দিহিন এক পুরিয়া দিহিন পাঁচ রুপিয়া ফিস্ লিহিন। নেহি উৎরা। দুসরা এক ডাকটর বোলায়ে ইস ডাকটর নে দো দুই দিহিন এক শিশি দাবাই দিহিন ফিস লিহিন আট রুপিয়া। কুছ নেহি হুয়া। পেট বেশী ফুলা দিহিস্। যাঁয় আর দেরি নেহি কিয়া, ভড়াক শহর চলে গয়ে। ডাকটার চৌধুরি কো বোলায়ে। ডাকটার চৌধুরি আচ্ছা তরে সে দেখিন্, পেটমে বহুত বৈঠাইন থাঁ নে কিতা লণ্টাকে প্রিসার দেখিন্, পেসাব জাঁচিন্ কিহিন্—পাঁচ রুপিয়া ফিস দেনে পড়া পেসাব জাঁচিন কা বাস্তে। দেখ্ শুন্ কর ডাকটর চৌধুরি কহিন্—দেখো ভাই ইসকা দো তরে কা অকুসন্ হা লেনা পাদ—এক বড়া, এক ছোটা। বড়া অকুসন্ লেনে সে চার ঘণ্টা কা অন্দর পাখানা উতর যাবে গা—ছোটা মে দো রোজ লাগে গা। বড় অকুসন্ কা কিমৎ ষোল রুপেয়া, ছোটা কা পাঁচ রুপেয়া, অব তুমহারা ক্যা খাইস কহো। ম্যয় কহা বড় অকুসনই দিজিয়ে হুজুর, জান যা রহা হ্যায়। ইয়া বড়া এক অকুসন্ চুতড় মে ঘোঁচ্ দিহিন, আউর পিন্‌রিকে লায়েক এক দাবা ছ চামুচ জেকে গরম পানি মে ঘোরকে পিলা দিহিন। জহরকা লায়েক তিতা। মগর হ্যা—"

উল্লাসিত মুখে গুলাব সিং চুপ করিল।

"হো গিয়া ?"

"একদম সাফ। দোহি ঘণ্টে মে—"

ইহা শুনিয়া প্রমথ ডাক্তার চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করত মাথা নাড়িয়া তাহা হিন্দিতে অভিমত প্রকাশ করিলেন যে অভিজ্ঞ ডাক্তার ঠিক ঔষধটি নির্ব্বাচন করিয়া যদি 'অকুসন্' দেন ফল তো হইবেই !

"বেশক"

গুলাব সিং গোঁফ চুমরাইয়া অতঃপর তাঁহার আগমনের কারণটি ব্যক্ত করিলেন।

"আজ হুজুর মেরা ঘর পর তশ্‌রিফ্ লাইয়ে"

"কাহে"

"মেরা জনানা কো এক অকুসন্ লেনা পড়ে গা"

"ক্যা হুয়া উন্‌কো ?"

"উ যব চলতি ফিরতি হ্যায় তব তো ঠিক হ্যায়—কোই তক্‌লিফ নহি। মগর যব হি উ বাচ্চে কো গোদ মে লে কর বৈঠী—যব্ তক্ সিধা বঠি তব্ তক্ তো ঠিক রহি—মগর যব্ ভি দুধ পিলানো কো লিয়ে সামনেহ ঝুকি—কচ্—"

গুলাব সিং কোমরে হাত দিয়া দেখাইয়া দিলেন 'কচ্' করিয়া ব্যথাটা কোথায় লাগে।

"এক ঘণ্টা বাদ আওয়েঙ্গে"

"একঠো বড়া অকুসন্ লেনা পড়ে গা"

"আচ্ছা"

"বাত তব পাকা ?"

"পাকা"

পাকা কথা করিয়া গুলাব সিংহের মনে হইল দর্শনীটা অগ্রিম দিয়া দিলে ব্যাপারটা আরও পাকা হইয়া যাইবে। ন্যায্য খরচ করিতে তিনি কোন কালেই পশ্চাৎপদ নহেন। ট্যাঁক হইতে ডাক্তারবাবুর দক্ষিণাটি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং জোড়-হস্তে কহিলেন—"উঠা লিয়া যায় হুজুর"

ডাক্তারবাবু টাকা চারিটি তুলিয়া লইয়া নমস্কার করিলেন। গুলাব সিংহও প্রতি-নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

ডাক্তারবাবু একাই থাকেন, পরিবার দেশে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই 'কল' সারিয়া ফিরিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত ছিলেন। ভাবিলেন এক চটকা ঘুমাইয়া লইয়া তাহার পর গুলাব সিংহের স্ত্রীকে একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়া আসিবেন। ইন্‌জেক্‌শন্ একটা দিতেই হইবে, না দিলে গুলাব সিংহের তৃপ্তি হইবে না। ঘুমাইতে যাইবেন এমন সময় নন্তু আসিয়া উপস্থিত হইল।

"ডাক্তারবাবু বিরজু মরে গেল না কি"

"বিরজু কে ? কি হয়েছে"

"আপনি কিছু জানেন না ? বিরজু কাঠ কাটছিল, হঠাৎ কুড়ুলটা ফসকে তার পায়ে লাগে। রক্ত কিছুতে বন্ধ হচ্ছিল না দেখে তাকে আমি আপনার কাছে পাঠালাম যে—"

"কতক্ষণ আগে"

"তা প্রায় ঘণ্টা দুই হবে"

"আমি ছিলাম না। 'কলে' বাইরে গিয়েছিলাম"

"লোকটা বিনা চিকিৎসাতেই মল তাহলে ?"

"না, আমাদের কম্পাউণ্ডার খুব এক্‌স্‌পার্ট লোক—যা করবার করেছে ঠিক—চলুন দেখি, কি ব্যাপার—"

হাসপাতালে গিয়া দেখা গেল বিরজুর মৃতদেহের পাশে বসিয়া তাহার যুবতী স্ত্রী বুক-ফাটা চীৎকার করিতেছে। এক্‌স্‌পার্ট কম্পাউণ্ডারবাবু তাঁহার যথাসাধ্য করিয়াছেন কিন্তু তৎসত্বেও বিরজু মারা গিয়াছে। কম্পাউণ্ডারবাবুর 'যথাসাধ্য' যে কতদূর তাহা ডাক্তারবাবুর অবিদিত ছিল না অবশ্য, কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন না, বরং বলিলেন—"সবই তো করা হয়েছে দেখছি, সিরাম একটা দিলে ভাল হ'ত অবশ্য—কিন্তু তা তো আমাদের হাসপাতালে নেই—"

শঙ্কর এসব কিছুই শুনিতেছিল না। ওই শোকার্ত্ত বিধবাটার গগন-বিদারী ক্রন্দনে সে যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল আহা, অমন জোয়ান লোকটা অপঘাতে মারা গেল! ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বলিতেছিলেন কিছুই শঙ্করের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। হঠাৎ তাহার কানে গেল "আমাদের একটা বড় সিরিঞ্জ পর্য্যন্ত নেই সার—গ্লুকোজ টুকোজ দিতে এমন অসুবিধে হয়—টেন সি সি সিরিঞ্জ দিয়ে—মানে, বার বার খুলে খুলে দিলে—"

শঙ্কর বলিল—"কি কি জিনিস আপনাদের দরকার তাতো আপনারাই ঠিক করে দেন—আমরা টাকা দিয়েই খালাস। যা যা দরকার তা তো আপনাকেই জানিয়ে দিতে হবে—"

"সার্টেনলি। দিয়েছিলামও—কিন্তু সিভিল সার্জ্জন ঘচাঘচ কেটে দিলেন সব—এমন কি অ্যান্টিভেনিন্‌ পর্য্যন্ত কেটে দিয়েছে সার—"

"টাকা আমরা দিচ্ছি, সিভিল সার্জ্জন কেটে দেবার কে"

প্রমথ ডাক্তার হাত উলটাইয়া এমন একটা সহাস্য মুখভাব করিলেন যাহার অর্থ—"ওই তো! আর বলেন কেন! ও লোকগুলোর সব জায়গাতেই ফপরদালালি করা স্বভাব!"

"আমি ভাবছি—"

কথাটা বলিয়াই শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থামিয়া গেল।

"কি ভাবছেন—"

"ভাবছি ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাকটিস্‌ বন্ধ করতে না পারলে হাসপাতালের কাজ ভাল হওয়া সম্ভব নয়"

"সার্টেনলি। কিন্তু তাহলে মাইনেও বেশী দিতে হবে——পঁচাত্তর টাকায় কুলোবে না—"

"কত টাকা হলে কুলোয় ?"

"অন্তত শ' পাঁচেক"

"শ পাঁচেক !"

মৃদু হাসিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তার কমে কি করে হয় বলুন—"

"অত আমাদের বাজেটে কুলোনো শক্ত"

"সার্টেনলি। বাজেট নিয়েই তো যত গোলমাল। সিভিল সার্জ্জন যে ঘচাঘচ্‌ কেটে দেন—তাঁরও অজুহাত ওই বাজেট। আপনারা ওষুধ-পত্তরের জন্যে যত টাকা দেন—"

"আচ্ছা চললাম—"

হঠাৎ শঙ্কর হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর কম্পাউণ্ডারের দিকে চাহিয়া ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"এ সব কবি টবি নিয়ে চলাই দুষ্কর বাবা—"

কম্পাউণ্ডার একটু হাসিল।

ডাক্তারবাবু ডাক্তারখানায় আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিলেন না—গুলাব সিংহের স্ত্রীকে ইনজেকশন দিতে যাইতে হইবে। ক্যাল্‌সিয়াম বা ভিটামিন বা ওই জাতীয় কিছু একটা দিতেই হইবে। লোকটা ডবল ফি দিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বাসায় আসিয়া দেখেন তাঁহার অপেক্ষায় একটি লোক এক হাঁড়ি দই, কিছু ভাল চিঁড়া এবং কয়েক ছড়া চমৎকার কলা লইয়া বসিয়া আছে। ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া লোকটি উঠিয়া ঝুঁকিয়া নমস্কার করিল এবং দেহাতি হিন্দিভাষায় যাহা নিবেদন করিল তাহার সারমর্ম এই: গুলাব সিংহের পত্নী ডাক্তারবাবুকে নমস্কার জানাইয়া এই ভেটগুলি উপহার পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ডবল ফি-ও পাঠাইয়াছেন এবং অনুরোধ করিয়াছেন তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া ইন্‌জেক্‌শন্‌ দিবার জন্য না আসেন, কারণ তিনি কিছুতেই ইনজেকশন লইবেন না। স্বামী কিন্তু না-ছোড়, তাই তিনি লুকাইয়া ডাক্তারবাবুকে এই অনুরোধটি জানাইতেছেন ডাক্তারবাবু যেন টাল-বেটাল করিয়া কোনরকমে ব্যাপারটা গোলমাল করিয়া দেন।

ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে ভেটসহ ফিসটি হস্তগত করিয়া বাম গুম্ফপ্রান্তে মৃদু-মৃদু তা দিতে দিতে সমস্ত ব্যাপারটি প্রণিধান করিলেন। তাহার পর বলিলেন—মাইজিকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিও, ইনজেক্‌শন্‌ আমি দিব না। কিন্তু গুলাব সিংকে ফাঁকি দিবার জন্য ইন্‌জেকশন দিবার একটা অভিনয় করিতে হইবে। তাঁহার গায়ে ছুঁচ ফুটাইব না—কিন্তু মাইজিকে এমন একটা ভাব করিতে হইবে যেন ফুটাইলাম। এইরূপ না করিলে গুলাব সিং হয় তো অন্য ডাক্তার ডাকিবে এবং সে ডাক্তার হয়তো মাইজির এ অনুরোধ না-ও রক্ষা করিতে পারেন।

এই বার্ত্তা লইয়া লোকটি প্রসন্ন মনে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবুও অনুগমন করিলেন।

৮

বাড়ি ফিরিয়া শঙ্কর দেখিল স্যুট পরিহিত একটি তরুণকান্তি যুবক তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। পদশব্দ শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শঙ্করকে দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল, মুখভাবে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। শঙ্করও কম অবাক হয় নাই।' কিন্তু এ বিষয়ে কোন বাক্য-বিনিময় হইবার পূর্ব্বেই যুবকটি পকেট হইতে কার্ড বাহির করিয়া শঙ্করের হাতে দিল এবং বলিল—"আমি এই কোম্পানীকে রেপ্রেজেণ্ট করছি। আপনার হাতে অনেকগুলো ডাক্তারখানা, আমাদের যদি অর্ডার দেন ভারী উপকৃত হব। হাসপাতালের জন্যে আমাদের স্পেশাল রেট আছে—এই দেখুন—"

হেঁট হইয়া চামড়ার ব্যাগ হইতে কাগজপত্র বাহির করিতে লাগিল। শঙ্কর সবিস্ময়ে চুপ করিয়া চাহিয়া ছিল—তাহার মুখ

দিয়া কথা সরিতেছিল না। নিজের চক্ষুকে সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এ চেহারা তো ভুল হইবার নয়! যুবকটি খুব সপ্রতিভভাবে নিজের কাগজপত্র দেখাইতেছিল বটে, কিন্তু একবারও সে শঙ্করের চোখের দিকে চাহে নাই। নিজের কাগজপত্রের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়াই কথাবার্ত্তা চালাইতেছিল। ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছিল প্রয়োজনীয় আলাপ শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতে পারিলে সে যেন বাঁচে। শঙ্কর একটিও কথা বলে নাই, কেবল সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

বক্তব্য শেষ করিয়া যুবকটি একগোছা কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গেও একটু দেখা করে' যেতে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন আমাদের কথা। আচ্ছা, আমি এখন চলি—"

"কোথা যাবেন"

"ষ্টেশনে"

একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর অবশেষে বলিল, "কিছু যদি মনে না করেন একটা প্রশ্ন আপনাকে করব—"

"কি বলুন"

"বেলা মল্লিক বলে' কি আপনার কোন বয়স্ক ভগ্নী ছিলেন?"

ভ্রূভঙ্গী সহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া যুবক বলিল, "না। আচ্ছা আমি এখন চলি—"

বারান্দার নীচেই বাইক ছিল। দ্রুতপদে নামিয়া যুবক তাহাতে চাপিয়া বসিল এবং নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বিস্মিত শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও বেলা মল্লিককে চিনিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। বেলা মল্লিক? বেলা অবশেষে তাহার নারীত্বকেই অবলুপ্ত করিয়া দিল। প্রায় জীবনের এক ঝাঁক স্মৃতি মনের মধ্যে ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বেশীক্ষণ কিন্তু সে সব লইয়া বসিয়া থাকিতে সে পারিল না।

"বাবা, তল, তা তান্দা হত্তে"

খুকী আসিয়া হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। তাহার পর আসিল স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী এবং বলিল—দশ পাউণ্ড কুইনিন অবিলম্বে দরকার। সেদিন তো অত কুইনিন দিল, আবার কুইনিন চাই! শঙ্করের সন্দেহ হইল—কুইনিন বোধহয় চুরি হইতেছে। কিন্তু ভদ্রসন্তানকে সে কথা বলা যায় না।—তাছাড়া অমিয়ার সহিত উহার স্ত্রীর বন্ধুত্ব হইয়াছে। শঙ্কর কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল বলিল—"কাল আসবেন"

৯

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে।

নিজের ঘরে ঝকঝকে পিতলের পিলসুজে মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া নিবিষ্টমনে চরকা কাটিতে কাটিতে হাসি পুত্রটিকে কবিতা মুখস্থ করাইতেছিল। হাসির পরিধানে শুভ্র খদ্দরের থান, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই, চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রখর জ্যোতি। সে যেন ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছে। জ্বালা যে কেন তাহা সে নিজেও জানে না। যাহা উচিত যাহা বিবেক-সঙ্গত—সমস্তই সে করিতেছে তবু সমস্ত অন্তর যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া গেল।

ছেলেটি ঠিক বাপের মতো হইয়াছে। মৃন্ময়ই যেন শিশু-রূপে আবার তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। তেমনি ধপধপে রং, তেমনি লালচুল, তেমনি চোখ-মুখ সব। হাসি তাহার নাম রাখিয়াছে "তুমি"।

"কই বলছ না, বল আবার—

'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারই লাগি তাড়াতাড়ি—'

দুই একবার ভুল করিয়া 'তুমি' অবশেষে ঠিক করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিল। চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাসি বলিয়া চলিল—

"সন্ধ্যাকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজী দিল তুলে
বন্দার এক ছেলে
কহিল ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে—"

এই ভাবে রোজ চলে। হাসি সকালে রাঁধে, নিজে পড়ে ছেলেকে পড়ায়। মৃন্ময়ের একটা ছবি সম্মুখে রাখিয়া ফুল-চন্দন দিয়া পূজাও করে। দুপুরে স্কুল। বৈকালে ছেলের সঙ্গে থাকে। তাহার সহিত খেলাও করে। বাহিরে কোথাও যায় না, কাহারও সহিত মেশে না। এমন কি শঙ্করও যে তাহার নিকট বারবার আসে ইহাও সে পছন্দ করে না। ইহাই তাহার বর্ত্তমান জীবন। নিঃসঙ্গ এবং কর্ত্তব্যময়।

১০

ব্যাঙ্কে আজ ধার লইবার দিন। অসম্ভব ভীড় হইয়াছে। কেবল সহি করিতে করিতেই শঙ্কর শ্রান্ত হইয়া পড়িল। কাহার ধার পাওয়া উচিত, কাহার উচিত নয়, কাহার ধার শোধ করিবার সংস্থান আছে কাহার নাই—এসব বিচার করিতে গেলে শুধু যে বিলম্ব হইয়া যায় তাহা নয় কেনারাম চক্রবর্ত্তীকেও অসন্তুষ্ট করিতে হয়। তিনি যাহাকে যাহাকে সুপারিশ করিয়াছেন শঙ্কর তাহাদেরই দরখাস্ত মঞ্জুর করিতেছে। কেনারামবাবু অবশ্য প্রত্যেক দরখাস্তেই ইহা লিখিয়া দিয়াছেন যে শঙ্কর নিজে ভাল করিয়া খোঁজ-খবর করিয়া যদি ধার দেওয়া নিরাপদ মনে করে তবেই যেন ধার দেয়। কিন্তু তাহা শঙ্করের পক্ষে করা অসম্ভব। সে নির্ব্বিচারে সহি করিয়া চলিয়াছে। মাথা পিছু টাকা অবশ্য বেশী নয়, কেহ দশ, কেহ বিশ, কেহ পঁচিশ—কিন্তু মাথা অনেকগুলি, প্রায় দুই শত। ইহাদের প্রত্যেকের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর লওয়া শঙ্করের সাধ্যাতীত।

কাল ছট্ পরব। প্রত্যেকেরই টাকার দরকার এবং টাকার দরকার পড়িলে ধার করা ছাড়া অন্য কোন সদুপায় ইহাদের জানা নাই। উৎপলও বলিয়াছে পর্ব্বের সময় কাহাকেও যেন নিরাশ করা না হয়। আসেনের ভগ্নীকে ভুলে নাই, অনুরোধ করিয়াছে।

সকলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল। পথে হঠাৎ সেকিরাম মাড়োয়ারির সহিত দেখা হইল।

"রাম রাম, শোংকোরবাবু, রাম রাম। হাঁ খুব কিয়া আপ লোনো—সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে—"

হিন্দি বাংলা মিশ্রিত অদ্ভুত ভাষায় নেকিরাম দন্ত বিকশিত করিয়া সোল্লাসে উৎপলের এবং শঙ্করের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"গরীব লোক সব কাঁহাসে রুপিয়া লানবে। হামি লোগ তো সব চোষ লিয়া। আপনেলোগ খুব করলেন। সামনে ছট পরব, কাঁহাসে রুপিয়া মিলবে বেচারাদের। খুব কিয়া—খুব হো গিয়া—সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে—হা হা হা হা হা—"

খানিকক্ষণ এই জাতীয় বক্তৃতার পর 'রাম রাম' করিয়া নেকিরাম পাশের গলিতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। শঙ্কর মনে মনে বেশ একটু পুলকিত হইল। নেকিরাম কাপড়ের দোকান ছাড়া মহাজনী কারবারও করে। এই ছট্ পরবের মরশুমে গরীব চাষীদের বেশ চড়া সুদে টাকা ধার দিয়া বেশ কিছু বাণিজ্য করিত, এবার বেচারার সে গুড়ে বালি পড়িল। সত্যই ইহারা গরীবদের রক্ত শোষণ করে। নিজের মুখেই আবার বলা হইতেছে—"হামি লোগ সব চোষ লিয়া—"। ইহারা না গেলে দেশের উন্নতি নাই। নিশু ঠিকই বলে। এই ক্যাপিটালিস্টরাই দেশের শত্রু, ইহাদের সর্বগ্রাসী লোভ দেশের সর্বস্বই গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। অথচ ইহাদের বাদ দিয়া চলিবারও উপায় নাই। অর্থবানদের অর্থেই দেশের যত কিছু সৎকার্য্য হয়। ধনীদের বদান্যতাতেই গরীবদের উপকারের আশা। ক্যাপিটালিস্ট উৎপল যদি টাকা না দিত তাহা হইলে তো এসব কিছুই হইত না। কমিউনিস্টদের মতে এই উৎপলই কিন্তু উচ্ছেদযোগ্য! অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর যখন বাড়ি পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অমিয়া তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিতেছিল। কমিউনিস্টদের মতে ভক্তিপরায়ণা অমিয়াও উপহাসাস্পদ।

প্রণত অমিয়ার পাশে খুকীও হেঁট হইয়া বলিতেছে "নমো—নমো—"

নিকার-বোকার পরানো থাকাতে ভাল করিয়া হেঁট হইতে পারিতেছে না, কিন্তু বেচারার চেষ্টার ত্রুটি নাই। কুঁথাইয়া কুঁথাইয়া যথাসম্ভব পিঠ বাঁকাইয়া চোখমুখ লাল করিয়া মাথাটা নত করিয়াছে।

শঙ্করের পদধ্বনি শুনিয়া তাহার প্রণাম করা ঘুচিয়া গেল। ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—কে? (মানে, কে?)

তাহার পর শঙ্করকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাহার হাঁটু দুইটি জাপটাইয়া ধরিয়া উদ্ভাসিত মুখে বলিল—

—"ভম্ ভম্ ভম্ ভম্ বাজে—"

শঙ্কর বলিল—"কিছু হল না"

"কিচ্ছু হলো না?"

"না—"

খুকী পুনরায় চেষ্টা করিল। চোখ বড় বড় করিয়া দুইবার আবৃত্তি করিল, "ভম্ ভম্ ভম্ ভম্ বাজে—ভম্ ভম্ ভম বাজে—"

শঙ্কর তাহাকে কোলে তুলিয়া চুমু খাইয়া বলিল, "কিছু হচ্ছে না—"

আজ সকালে নিমাই আসিয়াছিল এবং সে খুকীকে ভারতচন্দ্রের ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে লেখা দুইলাইন কবিতা শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ ভর্ব্বম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে—"

খুকী কেবল শিখিয়াছে—'ভম্ ভম্ ভম্ বাজে' এবং তাহাই সমস্ত দিন যখন তখন আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। কোলে উঠিয়াই খুকী শঙ্করের বুক-পকেটে হাত চালাইয়া সিগারেট-কেস ও ফাউন্টেন পেনটি হস্তগত করিয়া ফেলিল এবং সতৃষ্ণ নয়নে হাত-ঘড়িটার পানে চাহিল। বাবার এই জিনিসগুলির উপর তাহার টান সব চেয়ে বেশী। চকচকে সেলুলয়েডের পুতুল অথবা দম-দেওয়া মোটরের উপর তাহার তাদৃশ মমতা নাই; প্রথম প্রথম যে মোহ ছিল এখন আর তাহাও নাই। মোটরের চাবিও খারাপ হইয়া গিয়াছে, পুতুলটাও খুব সুস্থ নয়। বাঘা কুকুরটা চিবাইয়া তাহার একটা পা শেষ করিয়া দিয়াছে এবং দুইটা জিনিসই বারান্দার কোণে অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। খুকুর টান বাবার এই জিনিসগুলির প্রতি। সিগারেট হোল্ডারটা তো দখলই করিয়া লইয়াছিল, এখন অবশ্য সেটা হারাইয়া গিয়াছে, তাহার কথা মনেও নাই।

"দাও, ওগুলো দাও—"

খুকী মাথা নাড়িয়া আপত্তি করিল।

"দাও তো লক্ষ্মী। ও বাবা তোমার কি সুন্দর কোট হয়েছে—দেখি দেখি—"

কোটের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেই কোট সম্বন্ধে তাহার সত্য মতামত সে অকপটে ব্যক্ত করিয়া ফেলিল।

"কোত্ত খুলে দাও—"

অমিয়ার জেদাজেদিতেই ওগুলা পরিতে হয়! কোট-পাজামা পরিয়া থাকিতে তার মোটেই ইচ্ছা করে না।

"বাবা, খুলে দাও—"

"আবো খুকু ইধার আবো—"

উঠানের অন্ধকার কোণ হইতে কে কথা কহিয়া উঠিল। খুকী সঙ্গে সঙ্গে কোল হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার প্রিয় পরিচিত কণ্ঠস্বর।

"যমুনিয়া না কি—"

অমিয়া ভাঁড়ারঘরে ধূনা দিতেছিল—বাহির হইয়া বলিল, "আবার কে, কাল ছট্, টাকা দাও—"

মুশাই গাড়োয়ানের বউ যমুনিয়া।

"এখুনি তো মুশাই কুড়ি টাকা ধার নিয়ে গেল—"

"ওকুমসে একো পয়সা কি হামকো মিলতে! পনর রুপিয়া লেতেই নেকি মাড়ওয়ারিয়া আর পাঁচ রুপিয়া লেতেই ওহি মুসকবানি ছোঁড়ি—"

"কি রকম?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

যমুনিয়া সবিস্তারে যাহা বর্ণনা করিল তাহাতে শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। নেকি মাড়োয়ারি, রাজীব দত্ত এবং মুকুন্দ—এ অঞ্চলের এই তিনজন মহাজন না কি তাহাদের সমস্ত খাতকদের ডাকাইয়া শাসাইয়াছেন যে আজ সন্ধ্যার মধ্যে যদি সকলে তাহাদের ঋণ সুদসমেত পরিশোধ না করে তাহা হইলে প্রত্যেকের নামে নালিশ করা হইবে এবং বন্ধকী জিনিস কাহাকেও আর ফেরত দেওয়া হইবে না। সত্যই নালিশ করিলে আদালতের বিচারে কি হইবে তাহা যদিও ঠিক জানা নাই, কিন্তু নালিশের নামেই গরীব লোকেরা ভয় পায়। তাহারা ভাল করিয়াই জানে

যে যাহার প্রচুর অর্থ আছে আদালতে শেষ পর্যন্ত তাহারই জয় হয়। তাহারা আজ সকলে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়াছে উহাদেরই ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত। সুদ সমেত ঋণ পরিশোধ করিলে ছটের জন্য আবার তাহারা নূতন ঋণ পাইবে এ আশ্বাসও মহাজনেরা অবশ্য দিয়াছে। কিন্তু বুধনিয়া আর চড়া সুদে আর টাকা ধার করিতে পারিবে না, কারণ বন্ধক দিবার মতো তাহার আর কিছুই নাই। তাহার যাহা কিছু ছিল সব উহাদের গর্ভেই গিয়াছে। বুধনিয়া মলিন বস্ত্রাঞ্চল চোখে দিয়া কাঁদিতে লাগিল—বুধাই আজকাল তাঁহাকে দেখে না, আজকাল রাত্রে বাড়ি পর্যন্ত যায় না, ওই মুসহরনি ছুঁড়িটার কাছে পড়িয়া থাকে, ছুঁড়ি তাহার স্বামীকে 'গুণ' করিয়াছে—ও মানুষ নয়, ডাইনী। তাহার পর সহসা চক্ষু হইতে বস্ত্রাঞ্চল নামাইয়া শঙ্করের দিকে সে আগাইয়া গেল এবং একটু ঝুঁকিয়া মুখ বাড়াইয়া তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তোঁহি তো বলিয়া যে যে করিকে ওকরা এইসন্ হালত্ করলি—"

শঙ্কর একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। কারণে-অকারণে বুধাইকে সে টাকা দেয় তাহা সত্য।

"ছট্ করবি তুই কার জন্যে—"

"ওকরে বাস্তে"

ওই স্বামীর মঙ্গলার্থেই সে উপবাস করিয়া ছট্ পূজা করিবে।

"ক' টাকা চাই—"

"দশঠো।"

শঙ্কর বিনা বাক্যব্যয়ে দশটা টাকা বাহির করিয়া দিল।

অমিয়া কিছু বলিল না' মুচকি হাসিল। তাহার সমস্ত অন্তর যেন আনন্দে গর্বে ভরিয়া উঠিল। পূর্ব্বে শঙ্করের যথেচ্ছ খরচ দেখিয়া তাহার কষ্ট হইত, এখন আর হয় না। এই লোকটির মনের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া চলিতে পারিলেই আনন্দ পাওয়া যায় ইহা সে বুঝিয়াছে।

বুধনিয়া চলিয়া গেল না। টাকাটা খুঁটে বাঁধিয়া খুকীকে কোলে লইয়া হিন্দি ছড়া বলিতে বলিতে ঘুম পাড়াইতে লাগিল—"চান্দ্ মামু, চান্দ্ মামু, আরে আবো বারে আবো, নদীয়া কিনারে আবো, সোনাকা কটোরা মে দুধু ভাতু লেলে আবো—"

শঙ্কর বাহিরের আরাম কেদারাটার অন্ধকারে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল তাহাদের ব্যাঙ্কের এতগুলা টাকা ওই মক্কেলদের মহাজনদের সিন্দুকে গিয়া ঢুকিল! গরীব প্রজারা এক পয়সা পাইল না!

"সব কোই ধন্ ধন্ বোল্‌তা। খুব কিয়া আপলোগ—" মেকি মাড়োয়ারির বিকশিত-দন্ত মুখচ্ছবিটা তাহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

জুঁইএর দুঃখ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্বর্ণবর্ণ কাঁটালী চাঁপার পাশে
ছোট জুঁই আমি কেমনে বসিয়া থাকি,
ঈগলের পাশে, ক্ষুদ্র পাখীটির মত
প্রাণটা আমার আই ঢাই করে না কি!
আমি করি তাই পাতার আড়ালে বাস,
পূজার পিয়াসা ভরা প্রতি নিঃশ্বাস,
আকাঙ্ক্ষিতের পথ চেয়ে রয় আঁখি।

২

প্রদর্শনীর ফুলের বাজারে মোর—
প্রবেশ করার কোন প্রয়োজন নাই,
বর্ণের বাহার, বিলাসের তোড়জোড়
বিধি দেন নাই, বলো আমি কোথা পাই!
অদ্ভুত আঁখির বাহবা পাবার মত
রঙিন ফুল আছে সেথা শত শত,
আমার যা কিছু অনুরাগী তরে রাখি।

৩

তীব্র সুবাস মাতাল করে যা হাওয়া,
নাহিক আমার, আমার নাহি সে পুঁজি।
দুর্লভ যাহা—অতি সহজেতে পাওয়া
নাই এ ভাগ্যে সে কথাও বেশ বুঝি,
মোর বুক চেয়ে বুকে ধরিবার মত
দেবতা না হোক্, সুরসিক অনুরত
এ প্রাণ করে যে তাহাদেরে ডাকাডাকি।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এম-এস-সি

মিশ্র—একতাল

আমি চেয়েছিনু আকাশের চাঁদ
মধুর মিলন লগ্নে
বঁধুর লাগি বেঁধেছিনু বীণা
নীরবে পরম হর্ষে।
সহসা আসিল বাদলের মেঘ
নিরাশা-তিমিরে নিভালো আবেগ—
বুকের বীণার ছিঁড়ে গেল তার
হৃদয়ের আশা তাই।

জীবন পথের ধুলার তীর্থে
হয়েছি কত না রিক্ত
চিত্তের তলে তবু দীপ জ্বলে
হয়নি তো আঁখি সিক্ত।
হয়তো এমনি দুঃখের শেষে
দেখা দিবে প্রিয় সুন্দর বেশে—
বিগত কথার রবে না চিহ্ন
দয়িতের সুখ-স্বপ্নে।

টিপ্পনী :—"আধুনিক বাংলা গানে" বা Modern Bengali song-এর বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এতে গানের পদের ভাব অনুযায়ী সুর বাঁধতে হয়। পদের ভাব-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর ও রাগের বৈচিত্র্য ও সংমিশ্রণ এতে প্রয়োজনীয়। পদের ভাব ও রাগের ভাবের মিল চাই। তাই অন্ধভাবে যা তা সুর বসানো নয়, অনুভূতির সহিত যথাযথ রাগ-চয়ন করলেই আধুনিক গান সুষ্ঠু হ'তে পারে। দরকার মত বিদেশী সুর বসানো গর্হিত নয় তবে সে সুরও বেখাপ্পা হ'লে চলবে না।

সুরকার

স্থায়ী :—দেশ

+ ৩ ॰ ১
II রা রনা ধা   ণা র্সণা ধা | পধা নপধা ^মা   -মগা মগা -ররা I
আ মি॰ চে   যে ছি নু   আ॰ কা॰॰ শে   ॰ র্ চাঁ॰ ॰ দ্

+ ৩ ॰ ১
রা গা রা   পা মা গা   রা গা রসা | -ন্‌সা -া I
ম ধু র   মি ল ন   ল ॰ গ্নে॰   ॰॰ ॰

+ ৩ ॰ ১
সা -রা রা   পা পা ধা   মা পা না | র্সা না র্সা I
ব ॰ ধু   র লা গি   বেঁ ধে ছি   নু বী ণা

+ ৩ ॰ ১
র্রা র্জ্ঞা র্রা   র্সা না র্সা | পনা -র্সর্রা -র্সর্রা | ণা -ধা -পা II
নী র বে   প র ম   হ॰ ॰॰ ॰॰   র্ষে ॰ ॰

অন্তরা :—মল্লার ও জৌনপুরী

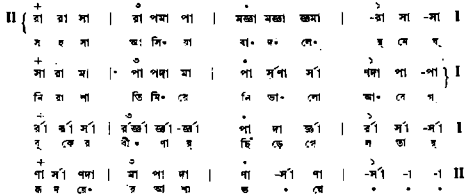

সঞ্চারী ও আভোগ :—দুর্গা, ঝিঁঝিট ও দেশ

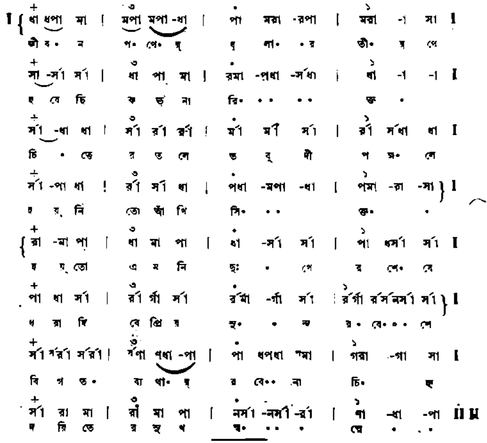

বেয়ান বিভীষিকা

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলিয়ামপুরের গোপীনাথ চট্টো বা গুপী চাটুয্যে,—সে যুগের অ্যাংলো ভার্ণেকুলার স্কুলে পড়া ভালোছেলে ছিলেন,—অর্থাৎ "ফাষ্ট' বয়" ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর। বাপের স্বাস্থ্য ভাল ছিলনা, প্রায়ই রোগ ভোগ করতেন, আর শুয়ে শুয়ে ভাবতেন—গুপীর স্কুলের পড়া শেষ হোলেই, তাকে ক্যাম্বেল মেডিকেলে ডাক্তারী পড়তে দেবেন। ডাক্তারের দর্শনী আর বিলের টাকা, যোগাতে আর পারেন না।

গোপীনাথ স্কুল থেকে বেরিয়ে কিন্তু মোক্তারির ঝোঁকে পড়ে গেল। সে জেলার আবহাওয়াই তাকে টেনেছিল। দেশে যত মজবুত বাড়ী বাগান,—করলো যেন মামলাবাজদের দিয়ে রেখেছেন। বাপকে সহজেই বুঝিয়ে দিলে—"দেশে ডাক্তারি করার চেয়ে নকমারি আর নেই বাবা। গ্রাম—জ্যেঠা খুড়ো, মাসি পিসিতে পোরা। তখন আত্মীয়ের অভাব থাকবেনা। সকলের অবস্থাও তো জানেন,—ভিজিট তো নিতেই পারবো না, আর দেবেই বা কে! ওষুধের 'বিল্' করাই হবে, একটা আল্মারি জোড়া করে' তা ধরাই থাকবে। কিন্তু মোক্তারিতে নিত্য নগদ পয়সার মুখ দেখা যায়, আর পয়সা থাকলে ডাক্তারকে ঘরে বাঁধাও যায়। আপনি ভাবছেন কেন, আশীর্বাদ করুন—বছর না পার হতেই তার পরিচয় যেন দিতে পারি। বুঝছেন না,—ডাক্তার হলে, অপ্রয়োজনেও পাশের গাঁয়ের পঙ্কা পিসি অমনি ডাক্তারের কাছে ছুটে আসবেন—"শিগ্ গীর ওঠ, বাবা আমার নরী কেমন করছে, হরি রক্ষা করো—ষাট, ষাট,—ফিরে দেখ"। তখন পায়ে পায়ে যেতেই হবে। ননীর হুলায় নাকি শান্ত হয়েছিল। দিতে কিছু তাকে পেয়ো পাছে পাব! "ও কিছু নয়" বললে শোনে কে? তারপর শিশির সঙ্গে শিশি চাপিয়ে! অসময়কালেও ওষুধ চাই! যেহেতু "আমার কাছে আবার দাম চাইবে কে?" যাক্, এখন আপনি যেমন বলবেন"—

গুপীর যুক্তির কাছে বড়রাও টুপি খোলেন। বাপ আর কথাটি কইতে পারেন নি,—আশীর্বাদই করেন। তখনকার লোকের আশীর্বাদ নাকি ব্যর্থ হ'তনা, মোক্তারিতে গুপীর অর্থ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ যথাযুক্ত দাঁড়ায়। গ্রামের লোক, সকল কাজেই গুপীর পরামর্শ মত চলে! পাশা—আইন জানা লোক সমতাজা হয়, যাই পরিচালনার "রাশ" তাদের হাতেই থাকে—সব দেশেই। বুদ্ধির জন্যই বৃহস্পতির খ্যাতি। গুপীও বাল্যাবধি বুদ্ধিমান।

এ হেন গুপী মোক্তার ডাবা হুঁকোর নল লাগিয়ে, চিন্তাকুল অন্যমনস্কভাবে বেতালা ফুড়ুক্ ছাড়ছিলেন,—তামাক পুড়ে ধোঁয়া যে দিকে বেরোচ্ছে সে দিকে লক্ষ্য নেই। গ্রামের অনেকেই তাঁর বৈঠকে—কালে বা অকালে, নিত্য হাজির দেন, ফড়ুক্ টেনে যান। আজও এসেছিলেন।

নষ্টু জ্যেঠা তাঁকে তদবস্থ দেখে, অসহিষ্ণুভাবে বললেন—"কি হয়েছে কি? একেবারে বেহুঁস্ যে? কাল তো কে-ই বাড়ী মেয়ের সংবাদ নিতে গিয়েছিলে শুনলুম। এত মনমরা ভাব কিসের, রোগটা কি? জমোট, মেয়ে কেমন? সব ছেড়ে বলো,—খাও হুঁকোটা ছাড়ো। তামাটা যে বাঘের খাবার পড়েছে!"

মতি মাষ্টার বললেন—"তা ভালোই বল আর মন্দই বলো, মণিমালার অসুখ শুনে যাচ্ছ, দিনটা মন্দ হলেও বলে' বাধা দিইনি তাই। কেমন, সব কুশল তো?"

আশু খুড়ো মাঝে মাঝে ইংরিজি কন্, বললেন—A man is Known by the company he keeps—ছেলেদের সঙ্গে থেকে থেকে পণ্ডিতদের বুদ্ধি ষাট বছরেও আঠারোর আটকে থাকে। বললি, তো দশার কথা আর এখন শোনাবার কি তাড়াটা ছিল!"

মতি মাষ্টার অপ্রস্তুতভাবে—"তা তা, সে সময় তো কেটে গেছে"…

পদ্মুদা বললেন—"থামো থামো—থাক্। সকলেরি মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে, আগে গুপীর কথা শুনতে দাও—যে জন্যে আসা। আমার বেই-বাড়ী 'পাঁচ' পেরিয়েছে ও স্থান সম্বন্ধে আমার জানতে কিছু বাকি নেই ও আফগানিস্থানের বাবা! প্রায়ই কোঁদলবাদি আদালতের কাছাকাছি বা 'ফাউ'। দিনার নৌকো তুমি কি কোনদিন্ ভয় বটে, ওগুলি নিরগুণেই মধুর আড্ডা—মিষ্ট কথায় ছলে ভরা মৌচাক্। তবে গুপী আমাদের পরম বন্ধু বুদ্ধিমান, ঢেউ কাটাবার "বুদ্ধি গণেশ"। দিনের দেখে শুনে কাজ করেছেন। সে দুর্ভাবনা নেই।"

এতক্ষণে গুপী মোক্তার—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসলেন ও ভৃত্য পেল্লাদকে তামাক দিতে হুকুম করে' বললেন—

—"তোমরা আমার বহুকালের বন্ধু, এক সঙ্গে খেলেছি, তালপাতায় লিখেছি, পালকী চড়ে সে করে' এসেছি। এখন পৌঢ়ত্ব পেরিয়ে, চুল পাকিয়ে বৃদ্ধ হয়ে' বসেছি। নাতী নাতনী নিয়ে সংসার করছি, ছেলেদের মানুষ করেছি। মানুষ আর কাকে বলে,—রোজ করে' রোজ্ দু' পয়সা আনছে তো! ছেলের প্রার্থনা আর কিসের জন্যে! দু'পয়সা আনলেই জন্ম সার্থক,—আর বিবাহ কোরে বংশরক্ষা করতে পারলেই বাহবা,—কি বলো? তাও তারা মন্দ করছে না।"

সর্বদাস রায়,—ফড়ুক টেনে খক্ খক্ করে' কাসতে কাসতে বললেন—"বয়সের দোষে যে ভাই, 'দোষ-টান্' আর সয়না। ঘরে বাইরে লাঞ্ছনা! নাও আশু খুড়ো, যে সর্বগ্রাসী নজর হানছ', তামাক আর জ্বলবেনা, নাও।"

—"ওতে আর কিছু রেখেছ কি—নস্যচ কাটা টান। সর্বজ্ঞেনে অজ্ঞদাবের সর্দার পোড়ো ছিলে, হবে বইকি! দেখে পেয়াজ—কলকেটা বললে যে বাবা!—হ্যাঁ, যে কথা শোনবার জন্যে আমরা ব্যস্ত হয়ে রয়েছি, তুমি তো গুপী সে দিকে মাড়াচ্ছনা। যা আমার

করেছ সে সবি ঠিক। ছেলেরাও লায়েক হয়েছে—ভারতচন্দ্রের মহাভারত কণ্ঠস্থ তাও ঠিক। সে অন্যদিন শুনবো। অমন অস্বাভাবিক রকম চেঁচো মেরে ছিলে, তা'তে আমার যে পিলে চমকে দিয়েছ। আগে মণিমালার অসুখটা কি, সে কেমন আছে ইত্যাদি বে-ই বাড়ীর সংবাদ শোনাও।"

গুপী মোক্তার তাঁর ব্যবসাগুণেই বক্তার লোক। আজ মামলা মাথায় না থাকলেও, পাঁচজনকে পেয়ে অভ্যাসই কাজ করছিল, গোড়াপত্তন করে' নিচ্ছিলেন। কাঁচা পাকা গোঁফে দু'বার হাত বুলিয়ে বললেন—"শুনবে আর কি, সত্যনারায়ণের কথার মত সবি তোমাদের জানা কথা,—শম্ভুদা তো বলেই দিলেন।– কেবল "বেই বাড়ি, বেই বাড়ি" কথাটার প্রয়োগ, আমার Caseএ ভুল হচ্ছিল। আমার বে-ই বাড়ি নেই—"বেয়ান বাড়িই" শুদ্ধ প্রয়োগ"···

"অ্যাঁ"—তা তো শুনিনি! বেই কবে—কতদিন,—তাঁর শ্রাদ্ধ তো লোকে খিল্ দিয়ে-হবার কথা নয়,—অ্যাঁ!

গুপী সহাস্য ভাবে—"আরে না না শম্ভুদা, বে-ই বেশ আছেন, ভালো আছেন। বাল্যকালে সেই "সেনিক্স প্রাইমার" পড়া Silent Itএর কথা মনে আছে তো? সংসারে তিনি সেই ভাউয়েলটি হয়ে আছেন। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, আছেন কেবল আমার বেয়ানের কটাক্ষের আঁচে—ঝলসে!—"আমার বেই হরিশ মুখুয্যে শিবালয়ের ছোটোখাটো জমিদার,—ঠিক জমিদার নন, বউমাইদের বাজার ভাণ্ডারের পত্তনীদার—ভালো-মানুষ—শিবালয়ের শিব বললে হয়। পল্লীর আওতায় পড়ে' মুসড়ে গেছেন। মাতঙ্গিনী দেবী হাতে বছরে টাকা দেবার আমদানী সঙ্গতিও আছে। সেকেলে তিনমহল বাড়ীর মধ্যে তাঁর আওয়াজে সকলে তটস্থ। সর্ব্বদাই চুপি চুপি ধ্রুপদী কণ্ঠে লক্ষ রাম জপ করেন। পথের লোক চমকে যায়। হরিশ মুখুয্যে তখন ও পাড়ায় রাম খুড়োর বাড়ি তামাক খেতে পালান। বাড়ীর লোকের "বিপদি ধৈর্য্যম্" ছাড়া উপায় থাকেনা। দুর্গাপুরের দোয়ারীবাবু ধ্রুপদী, তিনি বলেন—ধ্রুপদের উৎপত্তিস্থান নাকি আমার বেয়ানের গর্ভে বা গলায়। নিন্দা ভেবনা, আমি প্রমাণ-সহ কথাই বলছি।"

নটু ম্যাঠা বললেন—"বলো, আমরা অবিশ্বাস করছিনা। তোমরা সত্যি ছাড়া মিথ্যা বলনা জানি, বলো। কিন্তু আসল কথাটা যে"···

""হাঁ—এই যে। সেই বেয়ান ঠাকরুণের একখানি পত্র বা পরোয়ানা পত্রও পাই। তার মর্ম্ম—তাঁর কথাতেই বলছি। "তোমার মেয়ে কদিনই বা,—এখনো আড়াই বছরও হয়নি—এ বাড়িতে এসেছে। জমিদার বাড়ীর অন্ন খেয়ে সেই কাটি চেহারা সোহাগী দাঁড়িয়েছে। আলনায় রোদ খাওয়া বালা আর অনন্ত আঁটে মেরেছে, না বদলালে নয়। যাক্, সে পরে দিও। তোমাদের মত এ বনেদী বাড়ীর উঠোন আর রোয়াক তো একলা নয়। তার তোমার আদুরে মেয়ের গুণ অনেক—অসাধারণীর একটি। ভাতের থালা নিয়ে 'ভোজ-বাবাগুর' আসতে পড়ে গিয়ে কর্ত্তাদের আমলের কাঞ্চননগরের খাঁটি কপসাই কাঁসার থালা ভেঙেছেন। তার আর আমার নেই। তা চুলোয় গেলো, আবার কেঁতোনি কি! বউমানুষের বেহায়াপনা ত্যাখো। সেই যে শুয়েছেন, আজো সেই হরিশরামেই আছেন। শুনেছি নাকি স্বল্প আমাশা ছিল, তার ওপরে মুখপুরে অবও জুটিয়েছেন? পেট কামড়ানির সত্যি মিথ্যে মানুষের ধরার তো জো নেই! যে বাড়ীতে রুই-কাতলা ছাড়া কোনোদিন পুঁটি চিংড়ি ঢোকেনি, ওদের বউয়ের পথ্যের জন্যে এখন কাঁড়িকাঁড়ি গেঁড়িগুগ্‌লি ঢুকছে। এ অধমোও অদেষ্টে ছিল! ঘেন্নায় আমার নস্য বাড়ী ছেড়েছে। করতে তো কিছু বাকি রাখছিনা? নায়েব কপিল শুনে বললে—রোগের নামটি যে "সেপাত্তরি" ডিসেপ্টিক্ না! যেমন ছোঁয়াচে তেমনি ছুচুটে।" শুনে বললুম—"আসলে রক্ত আমাশা তো, তবু ভালো। কেউতো বলতে পারবেনা—বউকে না খাইয়ে নিকেশ করে রেখেছিল, ভগবান আছেন লজ্জা নিবারণ করেছেন। এতো হাঘোরের বাড়ী নয়। কিন্তু আর নয় কপিল,—হাঁড়ি চাঁচা হাঁড়ি ব্যবস্থা আর নয়।" এসে নিজে দেখে যা করতে হয় করো, শেষ না বলো খবর দেয়নি। কখনো ত' আসা নেই, কেউতো তোমাকে ভদ্র লোকের চিরকেলে প্রথামত, কিছু হাতে করে' আসতে—মাথার দিব্যি দেয়নি। এখন দয়া করে' একবার পায়ের ধুলো দিলে কেতার্থো হবো। সাবাস্ মেয়ে দিয়েছ,—সেই যে 'বাবা বাবা' বুলি ধরেছে—তা থাকুক, আমরা বাঁচি। বাড়ীর ওঁর যে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে সে আক্কেলও নেই। মাঝে মাঝে উঠে খাড়া করতে যান। হুঁ, সেই মেয়ে কিনা, সেই শিক্ষাই পেয়েছে কিনা." ইত্যাদি।—

"পত্র পড়ে তো আমার হাতে পায়ের খিল ঢিলে হয়ে গেল।"

"বলো কি মোক্তার—কোন্ মেয়ের বাপের না যাবে—ঘটোৎকচেরও যেত। এসব কথার কোনো আভাস তো এতদিন তোমার মুখে পাইনি। টাকা তো কম খরচ করনি গুপী,—আমরা তো সব জানি, নিজেরাই তো দাঁড়িয়ে থেকে সব করেছি, একি! শিবালয় একটি বর্দ্ধিষ্ণু স্থান, সমাজও আছে, মনুষ্যও আছেন—"

"সবি আছেন, কাজ দেয়নি কেবল আমার নিজের বুদ্ধি, অর্থাৎ "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়"। বাবার আদেশ ছিল—"শ্রেষ্ঠ কুল দেখে মেয়ে দেবে—আর কিছু দেখতে হবেনা। তাতে ভগবানের আদেশ অমান্য করে নিজের নিধনং ডেকে আনা হয়েছে। এখন দেখে শুনে নীরবেই বিষ হজম করছি। তোমাদের নিয়ে ভুলে থাকি,—ও ভুল ত' আর শোধরাবার নয়।"

শুনে শম্ভুদা বললেন—"ও দুঃখ কোরনা—ও দুঃখ কোরনা। আমরা অনেকেই ওর আস্বাদ ভোগ করেছি, করছিও। কে আর ব'লে বেড়ায় বলো। যাক্ তার পর সেই বৈতরণী পার হ'লে কি করে?"

"সে এক মহাভারত দাদা,—উদ্যোগ পর্ব্বটাই নয় শোনো।—"আমাদের ঘরের ডাক্তার রাজকুমারকে নিয়ে সারাপথ তাগিদ দিতে দিতে, ঘোড়ার গাড়ি করে হাজির হই; দুর্গানাম আর হৃৎকম্পও সঙ্গে ছিলেন কারণ একবার মেয়ে আনতে গিয়ে শুনে আসতে হয়—"কেনো, মেয়ে জলে পড়ে আছে নাকি? দু'বেলা কুলীনের অন্ন পেটে যাচ্ছে—তা জানো? তার ভালোটা এখন আমরা দেখব'—তোমরা নয়"—ইত্যাদি।

—"বেয়ানই এগিয়ে এলেন—ঘোমটা তাঁর নথপরা নাকের ডগা পর্য্যন্ত থাকে—বাক্য না বাধা পায়—সেটি জাত সাপের

blood বা রক্তের দ্যোতক। বেয়াই পেন্টালুন পরা সপুরুষ দেখে একটু থমকে গেলেন। আমি পরিচয় দিলুম,—"ইনি আমার পরম বন্ধু—কলকাতার স্বনামধন্য নীহার ডাক্তার। একসঙ্গে পড়েছিলুম। আমি বিপন্ন তাই দয়া করে' এসেছেন। ওঁকে পাওয়াই কঠিন—কলকেতার বাইরের লোক ক'জনই বা ওঁকে পাবার অবসর পায়।—

—"বেয়ান আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তিরস্কার করে' বললেন—"তিলকে তাল করা তোমাদের কেমন স্বভাব! নয়া বড়লোকদের ওটা হয় বটে। টাকার পরিচয় এই সব কাজেই পাওয়া যায়। কি হয়েছে কি এমন? এ দেখছি বউয়ের অসুখ। তা এসেছ যখন, একবার দেখে যাও—মেয়ের কান্না কমুক"—ইত্যাদি—

—"গিয়ে যা দেখা গেল, তার বর্ণনা শুনে ফল নেই। আমার ত' মাথা ঘুরে গেল। তখনি বোধ করি একটা পাথর বাটী করে' একটু ফিকে রংয়ের বালি এনে রাখা হয়েছে। মেয়েটা ছটফট্ করছে।—"ডাক্তার থার্মোমিটারটা বার করে বেয়াই গিন্নির হাতে দিতে গেলেন। তিনি সাততাড়াতাড়ি সরে গেলেন—"আমার এখনো জপ শেষ হয়নি।"

—"বাড়ির ঝি দাঁড়িয়ে ছিল—"এখন ত' সকলেই দেখতে জানে" বলে ডাক্তার তার হাতেই দিলেন।

—"কিন্তু আপনাকে যে চাই মা—বউয়ের পাশে একবার বসুন, আমি যে জায়গাটা দেখিয়েছি আপনি না হয় হাত দিয়ে দেখুন। সকালে ১০৩° জ্বর থাকবার তো কথা নয়, কারণটা বুঝলে সেইমত ব্যবস্থা করতে পারি।"

বেয়ান রুক্ষ মুখে বললেন—"ও-সব এ বাড়ির রেওয়াজ নয়, এ সে বাড়ি নয়।

"তা বুঝতে পারছি মা, কিন্তু caseটা গোলমেলে পাছে দাঁড়ায়···তখন···তা না হয় কোনো মেয়েকে ডেকে দিন্‌না। শেষে আপনাদেরই বড় ভুগতে হবে যে"···

বেয়ান মনে মনে ভয় পেলেও একটু হাসি টেনে বললেন—"ওসব কলকেতায় করতে হয় বটে নইলে পসার থাকেনা জানি। ঐ একটা কাঁচের কাঠির কথা শুনে তোমাদের কাজ তো! ওরূপ কথাতেই লোকে বড় বিশ্বাস করে!"

ডাক্তার সবিনয়ে বললেন—"আমরা আপনাদের ছেলেপুলের মত, বউটুকু জানি—রোগটা বুঝতে ওসব যে করতে হয় মা! আর ঐ কাঁচের কাঠির কথা,—তা মা ওর সাহায্যেই আমাদের লাটের অসুখও দেখতে হয়।"

"তুমি ভদ্র ঘরের ছেলে দেখছি। না হয় আর একবার নাইবো। এ বিছানায়" বলে ঠোঁট বেঁকিয়ে, সারলে—"রোগীর বিছানা কিনা!"

ডাক্তার বললেন—"তা ত' ঠিক কথাই। কষ্ট হবে তা বুঝছি মা। আমিও না অনেক কষ্ট ফেলে বাল্য বন্ধু ওঁর ভায়ার অনুরোধ এড়াতে না পেরে এসেছি। আপনার অসুবিধে বুঝতে পারছি, কেটে গেলে এর পর আপনাদের বিব্রত হ'তে না হয়—তাই। আমি ত' আর বার বার আসছি···। হাঁ, এই থানটায় একবার হাত দিন মা।"

"না" বুলিটাই কাজ দিলে। বেয়ান সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে হাত দিতেই রোগী "বাবাগো" বলে কেঁদে উঠলো।

"চুপ করো বেহায়া মেয়ে,—বাপ এসেছে কিনা···"

ডাক্তার একটু গম্ভীর মুখে চুপ করে থেকে শেষ বললেন—এখানে নিশ্চয়ই ভালো ডাক্তার আছেন, কিন্তু···

মণিমালা পড়েছিল সিঁড়ির ডান দিকে—তা'তে অবশ্য পেটের কোণ লাগে, তার তাড়সেই বেদনা ও জ্বর বৃদ্ধি। ডান দিকে লাগার আভাস ডাক্তার একটু পেয়েছিলেন। রোগীর মুখ থেকেও বারে right abdomen কথাটির সঙ্গে appendi পর্যন্ত নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে, আপনা আপনি ভাবার মত। ডাক্তার সজাগই ছিলেন—miss করেন নি। ডাক্তারের কথাই মাতঙ্গিনী দেবী একাগ্রে শুনছিলেন। তাঁর গাড়া জিভেদের মত মুখ বা ভালাছিল, চক্ষুর চঞ্চলতা ছিল না। বললেন—

—"তুমি বাবা ভদ্র ছেলের মত। আমার বয়েস হয়েছে,—কর্তা মানুষ নন, নানা ঝঞ্ঝাট মাথায় নিয়ে ঘর করি, সন্ধ্যেটি পর্যন্ত নিতে পাকাই,—আবার উনি মেয়েটা সময় বুঝে বিউতে এসেছে! আমাকে খুলে বলো—তুমি আবার 'কিন্তু' বলেই অমন করে' রইলে কেনো? রক্ত আমাশা তো হামেশা লোকের হয়, গেঁড়ি গুগলির ঝোল আর আমরুলের ঘন খাওয়ালেই সেরে যায়, তাতে তোমার মত ডাক্তারের মুখে অমন "কিন্তু" বেতালা কেনো?"

ডাক্তার বললেন—"আজ্ঞে, আমি আপনার মত বুদ্ধিমতি দেখিনি মা, ওটুকুও লক্ষ্য করেছেন। আপনার একটি কথাও বেঠিক পেলুম না। রক্ত আমাশা সত্যিই তেমন মারাত্মক রোগ নয়—ভোগায় বটে। তার জন্যে "কিন্তু" বেরয়নি মা। তবে বউ আপনার বেকায়দায় পড়ে গিয়ে বোধ করি মোক্ষম আঘাত পেয়েছিলেন, তার জন্যেই এই বিপদটি ঘটেছে। সকালে ১০৩° জ্বর দেখেই চমকে গিয়েছিলুম। যা অনুমান করছি তা যদি হয়, ভগবান না করুন, হ'লে মেডিকেল কলেজ ছাড়া উপায় নেই, এখানে বা বাড়ীতে তা সে সম্ভব নয়, তাই মুখ থেকে "কিন্তু" বেরিয়েছিল মা। পেটে বোধ হয় ফোঁড়ার সূত্রপাত হয়েছে যাকে "এপিণ্ডিসাইটিস্" বলে"—

বেয়ান হঠাৎ বিচলিত ও রুক্ষভাবে বললেন—"তুমি কি রকম ডাক্তার, এসব তো বাপের জন্মে শুনিনি। না হয় বা জ্বর হোতো, কতো ত' হচ্ছে। আমার মাথা খেতে আসা কেনো? বউকে কেউবা বেকায়দায় পড়তে বলেছিল! আর আবার "এপিণ্ডিস" ব্যবস্থা করতেই বা বলেছিল। হাড়ে নাড়ে জ্বালালে, এখানে যদি না হয় তোমাদের সেরে নিয়ে যাও তোমাদের বাপ-বাড়ীতে। একটা বউয়ের জন্যে এ বাড়ীর বংশ মর্য্যাদাতো নষ্ট করতে পারব না—যাচ্ছেতাই কি···"

"ও কি করেছেন মা—স্থির হোন্। আপনি এত বিচলিত হলেন কেনো। ভাবনার কি হয়েছে? রাগ করেই বলুন আর মনের দুঃখেই বলুন—ঠিক কথাটি বলেছেন। এ অবস্থায় ওর চেয়ে ভালো ব্যবস্থাও যে আর নেই। ক্রোধের অবস্থায় বললেও শুনেছি যাদের পুজো পাঠের শরীর তাঁদের মুখ থেকে ভুল বেরয় না। বেশ নিয়ে যাওয়াই ভাল—রোগটা এই সবে দেখা দিয়েছে, ভগবানের দয়া হলে এখনো বেঁচে যেতে পারে—সেই চেষ্টাই করে দেখা চাই। আরো অনেক ল্যাঠা আছে। উষা-মার (মেয়ের) আসন্ন প্রসবের অবস্থা শুনছি—আপনারো

কম ল্যাঠা নেই। আপনাকে সব দিক্ দেখতে হবে তো। যা বলেছেন, ও ভগবানের বলানো। এখন দু' জায়গায় ঝঞ্ঝাটের ভাগ থাকাই ভালো মা। মাস তিনেক পরে, তখন বউ আনলেই হবে—কি বলেন ?"

মাতঙ্গিনী দেবীর সে প্রলয়ঙ্করী ভাব, ডাক্তারী প্রলেপে ক্রমে শান্ত হয়ে এসেছিল—একটু হাসিটানাভাবে বললেন—"আমাদের আনাআনি নেই বাবা, বেইকেই সঙ্গে করে এনে রেখে যেতে হবে, এ বাড়ীর নিয়ম তাই। কিছু মনে করনা বাবা, একা মানুষ কতদিক আর সামলাব—মাথার ঠিক থাকে না, যেন আগুন ধরে যায়। মুখ থেকে যখন বেরিয়েছে—নিয়েই যাও। আমিও মেয়েমানুষ—সব বুঝি তো—বাপ মার কাছে গেলে মন্দ হয় না। আমাদের কষ্ট হয় হোক—আপত্তি নেই বাবা। বাপ-মার কাছে সব কথা সহজে বলতে পারবে, এখানে তো পারে না—বউমানুষ কিনা"···

ডাক্তার বললেন—"দেখুন দেখি, আমার মায়ের চেয়ে এমন বিবেচনার কথা কে এমন বুঝবে। রুগী তো ও প্রস্তাব করতে সাহস পায় না, তাই বোধ করি চুপ করে আছে।"

"ওমা—সে কি কথা। তবে মোক্তারি করেন কি করে ? ওঁর মেয়ে উনি নিয়ে যাবেন তাতে আবার"···

আমি তখন বলতে বাধ্য হলুম—"যে বাড়ীতে কত চেষ্টা করে মেয়ে দিতে পেরেছি—সে বাড়ীর মর্য্যাদা কতো তা'ত আমি জানি। তাঁদের সনাতন নিয়ম রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য, সেটা ভঙ্গ করতে সাহস কি করে পাবো বেয়ান ! তাই ওকথা মুখে আনতে পারিনি।"

"তা ঠিক কথাই বলেছ, কিন্তু তোমার মেয়ে যে অনাছিষ্টি করে বসেছেন। এ বাড়ী চিন্‌তে ওর অনেক দেরী···"

"এটিও আপনার ঠিক কথা মা, এখনো ওঁর ঘর বুঝে নেবার—যাক্। মা যখন অনুমতি দিচ্ছেন, এখন তোমার তো আর বাধা নেই ভাই।

"না—এখন আর আমার বাধা কি ডাক্তার। কিন্তু তুমি তো ভাই বলে রেখেছ—এখান থেকে সোজা কলকেতায় পাড়ি দেবে···

ডাক্তার বললেন···"সেই কথাটাই ভাবছি ভাই। (বেয়ানের দিকে ফিরে)—কিন্তু সঙ্গে একজন ডাক্তারের পৌঁছে দিয়ে আসতে যাওয়ারও যে দরকার হবে না। দু একটা ওষুধও সঙ্গে থাকা চাই—ডাক্তারদের ওটা রাখতে হয়"—

"তোমার সঙ্গেও আছে নাকি ?"

"তা আছে বইকি মা, ডাক্তারদের দায়িত্ব যে অনেক, পাড়া-গাঁয়ে পথে ঘাটে কারো কিছু ঘটলে, কোথায় কি পাবো"—

"তা হলে বাবা—তুমি সঙ্গে থাকলে আমার দুর্ভাবনা থাকে না, সেটা আজ হতে পারে না কি ?"

"আজ ! শরীর ভয়ঙ্কর দুর্ব্বল দেখলুম যে।" একটু চিন্তিত ভাবে আপনা আপনি—"দু একদিনে বেড়েও ত যেতে পারে—তখন আর—"

"আচ্ছা, আমরা বাইরে গিয়ে বসছি। আপনি একটু আধা-আধি জল মেশান গরম দুধ—চামচ চামচ করে বউকে খাইয়ে দিতে বলুন। আমি আধ ঘন্টা পরে আর একবার দেখে যা হয় ব্যবস্থা করব।"

"উঠুন বাইরের বৈঠকখানায় এলুম।—"

—"একটা কথা বলতে ভুলেছি—বেয়ানের স্বহস্তে পাকানো মার্বেলের মত আটটি তামাকের গুলি—বরাদ্দ মত রোজ নিত্য পেয়ে থাকেন। আমরা আসছি দেখে তামাক সাজবার জন্যে তিনি তার তিনটে গুলি একত্রে চট্‌কাবার উপক্রম করছিলেন। নচেৎ তারা সে অগ্নিস্পর্শেই উবে যায়···"

—"মাতঙ্গিনী দেবী, সঙ্গেই এসে পৌঁচেছিলেন। গুড়ুকের দুর্গতি দেখে বললেন—"ও আবার কি হচ্ছে !" হরিশবাবু থতমত ভাবে বললেন—"ভদ্রলোকেরা এসেছেন, তিনটে এক সঙ্গে না দিলে যে বেইয়ের"···

"বেইয়ের না তোমার ? আট ছিলিমেও পার নেই—সংসারের শনি !—আচ্ছা !"···বাকিটা তাঁর চক্ষুই বলে দিলে, আর ঐ "আচ্ছার" মধ্যেই রইল।—"যাই দুধ খাওয়া হয়েছে বোধ হয়, দেখিগে।"

ডাক্তার বললেন—"হাঁ না—ওটা আগে।"

"—শোনা গেল, ভেতরে কে বলছে—বাড়ীতে দুধ কোথায় ?"

একজন জিজ্ঞাসা করলে—"বৌয়ের সঙ্গে কি কি যাবে মা ?"

বেয়ান বলছেন—"যাবে আবার কি ? রোগ নিয়ে বাপের বাড়ী যাচ্ছে—দু'খানা আটপৌরে কাপড় দিলেই হবে।"

"আর গহনা টহনা ?"

"তোরা আমায় পাগল করবি"—আর শোনা গেলনা।

হরিশবাবু ভবিষ্যৎ ভেবে সব কটা গুলি চুলিতে চড়িয়ে দিলেন।

আমি বুঝলুম—"শুভস্য শীঘ্রম্।" ডাক্তারও সেই সঙ্কেতই করলেন। তামাক টানতে টানতেই মাতঙ্গিনী দেবী হাজির।

ডাক্তার বললেন—"মা, নিয়ে যাওয়াই ঠিক করলুম, এখন বাড়ের মুখ, কি জানি যদি···তখন আর···। আপনি গাড়িতে তুলে দিন, আমি শোবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"একি আদা তোলো ! দেখি—করতে বলতেও সাহস হয়না। হারামজাদা চাকরটা সেই গেছে—পথ চেয়ে বসেছি। কিন্তু মুখে দিয়ে না গেলে যে"···

"না মা, আজ এ অবস্থায়, বুঝতেই পারছেন···আপনার আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট।"

তার পর আর কি শুনবে দাদা ! কাল রাতে মেয়েকে নিয়ে বাড়ী ফিরেছি। সবই রাজকুমারেরই কৃপা, নচেৎ সে যমপুরী থেকে বার করবার উপায় শত সাবিত্রীও করতে পারতেন না। বেয়ানের ভাবটা—"বউটা গেলেই লাভ।"—হাজার দুই টাকার জিনিষ—হাতে রাখলেন। যাক্ তোমাদের আশীর্ব্বাদে আর ডাক্তারের কল্যাণে, এখন মেয়েটা বাঁচলেই যথেষ্ট।

রাজকুমার ডাক্তার বললেন—"রুগী ভায়া গাড়িতে যাবার সময় আমাকে যেন পাখী পড়াতে পড়াতে গেছেন। সে তালিম পেলে কার্ মামলা জিত্ না হবে। উপদেশ ছিল বেয়ানকে বিনয়ে একেবারে "মা" করে নেওয়া চাই। মাথা নীচু করে বসেছিলেন বটে, কিন্তু দরকারে চোখের কোণ্ আর পায়ের তাল্ কথা কইছিল। ইঙ্গিৎগুলোর মানেও বুঝিয়ে রেখেছিলেন। বলেও ছিলেন—রক্ত-আমাশায়ে সে বেয়ানের মন ভুলবেনা তখন ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবস্থা—ওই 'এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্'। এ সব দাবা রাস্তা শিখিয়েছেন। বড় মোক্তার ও ফাঁকি দিয়ে হয়নি—দুধ খেয়েছেই ওর বুদ্ধির পত্তন্ ছিল—তোমরাও তো জানো। সে বাঘিনীর

বাসা থেকে অত কোনো মিঠাই খেয়ে আনতে পারতো না—এ আমি শপথ করে বলতে পারি"···

গোপীনাথ বললেন—"কিন্তু তোমার সাহায্য না পেলে পারতুম না ভাই। বড় বড় দুধর্ষ পাণ্ডিত সাক্ষীদের ঘাবড়ে যেতে দেখেছি, তাদের ভুলে বাবলাও দেখেছি, কিন্তু তুমি ভাই···"

বাঞ্ছারাম—Thank you for the Certificate আর নয়, মাপ্ করো। তুমি উত্তরসাধক রূপে না থাকলে আমার সাধ্যও ছিলনা ভাই।

"আমরা কিন্তু জেনে রাখলুম" বলে সকলেই হাসলেন।

গোপীনাথ চিন্তিত ভাবে—"এখন ভাই মেয়েটোর"···

ডাক্তার—"ওর জন্যে ভেবনা, বন্দিবালা এক সপ্তাহেই সেরে উঠবে। আমি ভাবছি তোমার বেচারা বেহাইয়ের জন্যে—তাঁর হুড়্কের পালা হয়ে গিয়ে থাকবে। তুমি তাঁর হুড়্কের আড্ডায় মাঝে মাঝে সের পাঁচেক ক'রে ভালো তামাক পাঠিয়ে দিও ভাই—এইটি আমার অনুরোধ রইল।"

গোপী—"নিশ্চয় দেব ভাই। উঃ কি জঞ্জাল!"

আশুখুড়ো বললেন—"নিজের জন্যে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে' ফেল ভণী, আর মেয়ের জন্যে স্বস্ত্যয়ন। শিবু আচার্য্যিকে আজই ডেকে পাঠাও।"

"সেই কথাই ভাবছি খুড়ো—দৈব ছাড়া বল্ নেই—পথও নেই।"

নটু জ্যাঠা বললেন—"এমন হয়, অমন হয়, পুরুষদের হাঁক্ ডাক্ চিরদিনই বাইরে—অন্দরে নয়। ছাঁদনা তলা থেকেই ওঁরা পুরুষদের কাঁধে চড়ে বড় হয়ে আসেন, 'বর বড় না কনে বড়'র সাতপাকটা মনে নেই? সেই দড়ীতেই আমাদের খাবি-খাওয়ার। ও ছেড়ে দাও, যাক্—এত কথা কইলি, কিন্তু "সোনা" ফেলে। তোমার জামাই—নন্দদুলাল নাম না? তার উল্লেখ পর্য্যন্ত যে পেলুম না। জামাই ভালো হ'লে সব সয়ে যাবে বাবা।"

"ক্ষ্যামা দিন জ্যাঠামশাই—গরিবের ঘরে সোনা না ঢোকাই ভালো। তিনি বেয়ানের 'মাদুলি-মোহন',—দেবতার দোরধরা ছেলে। অধুনা কলকেতার কপচান পক্ষীর পোষাকের শিক্ষা—লক্ষীর পেঁচায় পাকছেন!"

"দুঃখু ক'রে আর কি হবে ভণী, দুনিয়াটাই এমনি। বেশী বয়সে বুদ্ধিমানদেরই পা খানায় পড়তে দেখি। তা না ত' তুমি কুলীনের কবলে পড়! যাক্, বলছিলে না—ছেলেরা লায়েক হয়েছে—মানুষ হয়েছে—অর্থাৎ কেরাণী হয়েছে। এইটিই আমাদের ধাতে সয়—"অক্ষয়-সন্তান" থাবে ভয় নেই। বাড়-বৃদ্ধি দু টাকা বছর, নজর বাড়তে দেবেনা—বড় কুলীনের বা বড়দের কাছে ঘেঁষবেনা।"

আশুখুড়ো বললেন—"Hear, Hear!"

সভা ভঙ্গ হল।

শিমলার কথা

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এক

তিন রাত্রি ট্রেনে কাটিয়ে চতুর্থ দিন ভোরে এসে পৌঁছনো গেল কালকায়। শীতের আমেজ বেশ অনুভব করছিলাম ব'লে ট্রেন থেকে নামার আগেই গরম জামার শরণ নিতে হ'ল। দীর্ঘ এই ট্রেনযাত্রার পর শরীর যেমন শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, মনও হয়েছিল তেমনি বিরক্ত। মিনতি বললেন, "চলো, এবার মোটরে ক'রেই শিমলা যাওয়া যাক্। এতো দূর ট্রেনে আসা গেল, আর কেন?" কালকা থেকে শিমলা পর্য্যন্ত বরাবর কার্ট রোড চলেছে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে। দূরত্ব হ'চ্ছে ৫৮ মাইল। মেজর কেনেডির তত্ত্বাবধানে এই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয় ১৮৫০ সালে। কিন্তু আমাদের মন চাইছিল ট্রেনে যেতে। শুনেছি, এই রেলপথ (দূরত্ব ৫৯½ মাইল) বসাতে নাকি ১,৮০,০০,০০০্ টাকা খরচ হয়েছিল। এই লাইন দিয়ে প্রথম ট্রেন যায় ১৯০৩ সালের ৯ই নভেম্বর। পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেকটা স্ক্রু-র মতো ট্রেন নাকি ওপরে উঠতে থাকে। অনেক সময় ছোট ছোট পাহাড়ের ভেতর দিয়েও ট্রেন যায়। মিনতিকে এই সব কথা বুঝিয়ে বলতে তিনি সম্মত হ'লেন। আমরা কালকায় আবার ট্রেনে চেপে বসলাম।

পাহাড়ের কোল বেয়ে ট্রেন ধীরগতিতে ক্রমেই ওপরে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে টানেল। পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে ট্রেনের সে যেন বিচিত্র যাত্রা। এক ধারে খাড়া পাহাড়, আর এক ধারে গভীর খাদ। নিচের দিকে তাকালে বুকটা ভয়ে কেঁপে ওঠে।

পাহাড়ের রূপ গভীর সৌন্দর্য্য মনকে কেমন উদাস ক'রে দিল। ভুলে গেলাম আমাদের গন্তব্য। শুধু মন নীল আকাশ আর পরিব্যাপ্ত পাহাড়ের দৃশ্যে অভিভূত হ'য়ে পড়ল। মাঝে মাঝে ক্ষীণাঙ্গী ঝর্ণা চোখে পড়তে লাগল। পাহাড়ের বুক চিরে সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলে গেছে। পাহাড়ের গায়ে এক জাতের অজস্র গাছ দেখলাম। এগুলোকে বলে চিড়, দেখতে অনেকটা ঝাউ গাছের মতো। শুনলাম, এর হাওয়া নাকি খুব ভালো। ট্রেন যেতে যেতে মাঝে মাঝে কার্ট রোড নজরে পড়ছিল। জনবিরল পথ; দু'একজন পাহাড়ী মোট নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মতো তারা শীত-কাতুরে নয়। তালি-দেওয়া ঢিলে কুর্তা আর পাজামা তাদের পরনে। দারিদ্র্যের চাপে শীতকেও তারা জয় করেছে। বড়োগের টানেল পেরোলাম। এই টানেলটা হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো; ৩,৭৫০ ফিট লম্বা। ছোট বড়ো ১০৩টা টানেল পেরিয়ে অবশেষে আমরা এসে পৌঁছলাম শিমলায়। তখন প্রায় বেলা ছ'টো।

শিমলা ষ্টেশন দেখে আমরা দু'জনেই কতকটা বিস্মিত হ'লাম। শিমলার এতো নামডাক, অথচ ষ্টেশন এতো ছোট! একটি প্ল্যাটফর্ম মাত্র, দৈর্ঘ্যে প্রস্থেও এমন কিছু বড়ো নয়। কালকা-শিমলার রেল লাইন বা ট্রেনই না হয় ছোট! কিন্তু তা ব'লে এতোটুকু ষ্টেশন! হাওড়া ষ্টেশন তো দূরের কথা, বাংলার মফঃস্বলের যে-কোনো ছোট ষ্টেশনও বোধ করি এর চেয়ে বড়ো। বড়ো বড়ো ষ্টেশনের কোলাহলমুখর বৈচিত্র্য এখানে একেবারেই নেই। হাওড়া বা দিল্লীর কাছে শিমলা নিস্তব্ধ।

মনে পড়ে গেল এই প্রসঙ্গে ডেট্রয়েটের রেল-ষ্টেশন সম্পর্কে সেই বিখ্যাত কবিতা।

দুই

শৈলমালার ওপর অবস্থিত শিমলা জেলার আয়তন হ'ল প্রায় ১০০ স্কোয়ার মাইল। একটি শহর, ২৫৩টি গ্রাম, আর ২০টির ওপর পার্বত্য স্টেট নিয়ে এই জেলা। শিমলা হ'ল প্রধান শহর। এর উচ্চতা ৭,২৬২ ফিট। ১৮১৫ সালের আগে শিমলায় ইংরেজরা পদার্পণ করেন নি। স্থানীয় দলপতিরা যখন গৃহবিবাদের ফলে পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন হ'য়ে পড়েন, সেই সময়ে গুর্খা বিজেতাদের উৎপাতে এখানকার অধিবাসিরা উত্যক্ত হ'য়ে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৮১৫ সালের মে মাসে জেনারেল স্যার ডেভিড অক্টারলোনির অধিনায়কত্বে ইংরেজরা অত্যাচারিদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে শিমলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনার পরেই শিমলাকে স্বাস্থ্যনিবাসরূপে গড়ে তোলার কথা তাঁদের মাথায় আসে।

সঞ্জৌলীর পাহাড়

শিমলায় প্রথমে এসে নবাগতের আরাম লাগবে এখানকার মনোহারী আবহাওয়া। এমন সুন্দর মুক্ত আবেষ্টনীর মধ্যে সকলেই প্রায় সর্বক্ষণ কোনো-না-কোনো কাজে ব্যস্ত। কলকাতার সে কোলাহল নেই, জীবনের সে উত্তাল গতি নেই—চারিদিকেই প্রশান্তি বিরাজ করছে। তবু দেখি, অধিকাংশ লোকই স্ফূর্তিহীন, অফিসের কাজের পর তাদের দিন যেন শেষ হয়ে যায়। আনন্দহীন একঘেয়ে কাজের নিষ্পেষণে মানুষের আনন্দ নেওয়া বোধ করি বিলুপ্ত হ'তে বসেছে; বর্তমান সভ্যতার হাওয়ায় সে ভুলে যাচ্ছে বিস্মিত হ'তে। কৃত্রিমতা কলকাতায় না হয় মেনেছি; শিমলাও তো কৃত্রিম। কিন্তু চোখ থাকতেও অন্ধ হ'য়ে থাকা কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কাজ করতে হ'বে ব'লে জীবন-রসে বঞ্চিত হ'ব কোন্ দুঃখে? অবশ্য স্থানীয় সকলেই যে এ-রকম, তা নয়। রায় বাহাদুর বিপিন বৈদ্য মশায় এখানকার একজন বড়ো ডাক্তার। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও তিনি এখনও নিয়মিত অফিসের ছুটির পর মহানন্দে যে-ভাবে শিমলা টহল দিয়ে বেড়ান, তা দেখলে আমাদের মতো যুবকদেরও লজ্জা হয়। প্রাণখোলা মানুষ; স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পরোপকার ক'রে থাকেন, বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করেন না। বাঙালী তো দূরের কথা, এখানে এমন অ-বাঙালীও অনেক আছেন যাঁরা বৈদ্য মশায়ের আতিথেয়তায় মুগ্ধ। দু'বার সাগরপারে গিয়েও তিনি সাহেব ব'নে যান নি, চলনে-বলনে পুরো দস্তুর বাঙালীই আছেন। বাংলা থেকে কেউ তাঁর জন্যে পাটালী গুড়, নারকেল বা কীর্তন দিয়ে এলে তিনি শিশুর মতো খুশিতে মেতে ওঠেন। প্রৌঢ়ত্ব মানে যে স্থবিরত্ব নয় তার প্রমাণ এই বৈদ্য মশায়।

তুষারাচ্ছাদিত রিজ

শিমলার কুলিরা এক আশ্চর্য জাত। শিলা বৃষ্টি বা তুষারপাতকে গ্রাহ্য করলে তাদের চলে না। অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে কোনো রকমে তারা দিনাতিপাত করে। দু মণ ওজনের জিনিস এক সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে সেগুলোকে পিঠের ওপর ফেলে তিন চার মাইল রাস্তা অবলীলাক্রমে তারা ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে। বরফের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে তিন চার জন কুলি রিক্সা ঠেলে নিয়ে চলেছে। তারা দরিদ্র, কিন্তু অবিশ্বাসী নয়। কাশ্মীরী মাঝে এক পাহাড়ী কুলির সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার কথাবার্তা হয়। শিমলার আবহাওয়া, হিমকোনার গুজব, পাহাড়িয়া ভূত বিশ্বাস করে কিনা—এই সব বিষয়ে। তার সারল্য ভুলবার নয়। এখানকার পাহাড়ের নানা বিবরণ তার কাছ থেকেই আমি প্রথম শুনি।

শিমলায় পাঁচটি প্রধান পাহাড় আছে, জ্যাকো (উচ্চতা ৮,০৫২ ফিট), ইলিসিয়াম হিল (উচ্চতা ৭,৮০৪ ফিট), প্রসপেক্ট হিল (উচ্চতা ৭,১৪০ ফিট), অবজারভেটরী হিল (উচ্চতা ৭,০৫০ ফিট), ও সামার হিল (উচ্চতা ৬,৯২২ ফিট)। এই সব পাহাড়ের স্তরে স্তরে গ'ড়ে উঠেছে শিমলা শহর। লাল করোগেটের ছাদের বাড়িগুলো দূর থেকে দেখলে মনে হয় সুন্দর থাক্ থাক্ সাজানো। এমন কি রাস্তায় পর্যন্ত পাহাড়ের ছাপ বর্তমান। চড়াই-উৎরাই নেই এমন রাস্তা পাওয়া ভার। তাই রাস্তাগুলো প্রথমে বড়ো অদ্ভুত লাগে। এখানকার প্রধান রাস্তার নাম মাল। তেমন চওড়া না হ'লেও শিমলার মাল স্মরণ করিয়ে দেয় কলকাতার চৌরঙ্গীকে। পরিচ্ছন্ন পথ, দোকানগুলিও পরিপাটি ক'রে সাজানো। গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় নেই; নিশ্চিন্ত মনে সকালে-বিকেলে গল্প করতে করতে বেড়ানো যায়। মালের ঠিক নিচেই লোয়ার বাজার, কলকাতার বড়বাজারের ছোট সংস্করণ। লোয়ার বাজারে জিনিসপত্রের দাম কিছু সস্তা। তাই সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে মাল শুধু বেড়ানোর পক্ষেই ভালো।

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে এখানে যাঁরা আসতে চান, শরৎ কালই তাঁদের উপযোগী। বর্ষাঋতুতে শিমলার সৌন্দর্য কম উপভোগ্য নয়। বৃষ্টির জলে পাহাড়ের মলিনতা ধুয়ে যায়; গাছ সবুজ আর ধরণী রঙের

সন্ধ্যেবেলা পাহাড়ের এরূপ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। সূর্য্যাস্তের সময় পর্ব্বত-চূড়াগুলোও কেমন ধীরে ধীরে বিদ্যুলোত হ'য়ে ওঠে; মনে হয় অস্তগামী সূর্য্য বুঝি বা পাহাড়ের ওপর আবীর ছড়িয়ে দিয়ে গেল। আকাশে খণ্ড মেঘের মেলা। শীত বাংলার পৌষের মতো। এই সময়ে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে যান গ্লেন্‌-এ পিকনিক্‌ করতে। দেখবেন, গভীর খাদের মধ্যে দেবদারু, পাইন আর ওক গাছ পরিবৃত পরিষ্কার একখণ্ড তৃণাচ্ছাদিত জমি। পাশ দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে ঝির ঝির ক'রে শীর্ণা এক পাহাড়ী নদী। নব দম্পতিরা Lovers' Walk ঘুরে আসবেন। -নির্জ্জন পথ, লোকজনের ভিড় নেই। কল্‌টু স্থানে ছেড়ে এখানে একটু প্রগল্‌ভ হ'লে ক্ষতি নেই। তাই কি তাঁরা উচ্চ কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এখানে আবৃত্তি ক'রে বলতে পারেন:

"উড়াব ঊর্দ্ধে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।"

অবশ্য বেড়িয়ে আসুন এনানডেল, ডিম্বাকৃতি প্রশস্ত মাঠ—খেলাধুলো আর ঘোড়দৌড়ের জন্যে তা প্রসিদ্ধ। পাহাড়ে ওঠার যদি শখ থাকে তো চড়ুন জ্যাকো; হনুমানজীর মন্দির দেখতে ভুলবেন না। তারা দেবীও দেখে আসতে পারেন। কার্ট রোড ধ'রে গেলে লাগে দশ মাইল। কেভেণ্টার্সের ডেয়রী ফার্ম এই তারা দেবীর ওপরে। সামার হিলে চাড্‌উইক্‌ ফলস্‌ও দেখতে পারেন। প্রকৃতি সিমলাকে সাজাতে কোনো দিক থেকেই কার্পণ্য করে নি।

সিমলার দৃশ্য

তিন

এখানকার বাঙালী-জীবন নিস্তরঙ্গ। কলকাতায় প্রথম জাপানী বিমান হানার খবর শুনে তাঁদের মধ্যে যা-একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। পুরুষেরা অফিস করেন, তাস খেলেন; মাঝে মাঝে সিনেমা দেখেন আর থিয়েটার করেন। মেয়েরা দুপুরে মজলিস বসান, নয় তো নভেল পড়েন। কালীবাড়িতে একটি লাইব্রেরী আছে; সেটি প্রধানত মেয়েদের কল্যাণেই চলে। ষ্টেশন লাইব্রেরী বা সিমলা মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীতে বাংলা বই নেই। এখানে তিনটি সিনেমা আছে; রিগ্যাল, রিভোলি আর রিজ্‌। কিন্তু বাংলা ছবি দেখানো হয় না। তার কারণও স্পষ্ট।

পাঞ্জাবী মহিলারা স্বাধীন ভাবে বেড়িয়ে বেড়ান। এটা তাঁদের দেশ তো বটে। অনুপুষ্ট দেখা যায় পাশ্চাত্য পৌষীদের। কিন্তু বাঙালী মেয়েরা অসূর্য্যম্পশ্যা না হ'লেও বোধ করি গৃহগতপ্রাণা। তাই কদাচিৎ রাস্তায় পা বাড়ান। তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু আধুনিক, তাঁদের দৌড় বড়ো জোর কফি হাউস পর্য্যন্ত। ডেভিকোয় তাঁরা ঢোকেন না। শুনেছি, কেউ কেউ নাকি তারা দেবীতে মেলা দেখতে যান; তাও সকলে কিনা সন্দেহ। কালী বাড়িতে অবশ্য কোনো না কোনো উপলক্ষে সকলেই বছরের মধ্যে দু' একবার গিয়ে থাকেন। দুর্গোৎসবের সময় সারা সিমলার মেয়েপুরুষ ভেঙে পড়েন কালী বাড়িতে। যদিও এখানে প্রতিমা হয় না, ঘটপূজো হয়। কালীবাড়ীতেই সাধারণত থিয়েটার হয়। তাতে বাঙালিদের এতো ভিড় হয় যে প্রায় এক ঘণ্টা আগে না গেলে বসার জায়গা পাওয়া যায় না।

বিশ্ব জুড়ে যে বিরাট যুদ্ধ চলছে তা' এখান থেকে বুঝবার উপায় নেই। বাজারে গেলে তা টের পাওয়া যায় জিনিসপত্রের দাম থেকে। ভালো চালানী মাছ দেড় টাকার কমে পাওয়া যায় না; তাও বিস্বাদ। মাংস সস্তা বটে, কিন্তু সিদ্ধ হতে অনেক সময় লাগে। মাঝারি একটা মুরগী প্রায় তিন টাকা। চালটা বড়ো ভালো। ভাতের সুগন্ধে মন মাতিয়ে দেয়। কাঠ-কয়লা একবার দু' টাকাতেও মণ কিনতে হয়েছে। অথচ এই কাঠ-কয়লা ছাড়া কাংরা জেলে বা উনুন ধরানো মুস্কিল। চায়ের পাউণ্ড তিন টাকা ক'রে। মোটের ওপর, সুখ নেই।

প্রচণ্ড শীতের সময় Chill blain বা হিমকোষায় ভোগেন না, এমন লোক খুব কমই আছেন। এতে হাত বা পায়ের আঙুলের গোড়া লাল হয়ে ফুলে ওঠে; বেশ ব্যথা হয়। রাত্রে শোবার পর কেবল চুলকোতে থাকে, ঘুমোয় কার সাধ্য। হিম কোষা যাঁর হ'ল না, তিনি ঈর্ষার পাত্র। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে রাত্রে শোওয়াই তো এক কাণ্ড। এই সময়ের temperature সাধারণত ৩০° থেকে ২৮°-এর মধ্যে ওঠা নামা করে। বিছানার ওপর কম্বল পেতে গরম জামা আর মোজা পরে কম্বল ও লেপ মুড়ি দিয়েও অন্তত পনের মিনিট লাগে কাঁপুনি থামতে। কেউ কেউ আবার hot water bag বা গরম জলের বোতল নিয়ে শোন।

শোনা যায়, সিমলায় এলে সকলেরই নাকি স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে। কথাটা আংশিক সত্য। এখানকার আবহাওয়া ভালো বটে; কিন্তু কারো কারো মতে জল তেমন ভালো না। বর্ষাকালে পেটের অসুখ করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা' সারতে দু' তিন মাস সময় নেয়। শীতের সময় সর্দ্দি কাশি তো লেগেই আছে। রাস্তায় বেরুলেই নাক সড়্‌ সড়্‌ করতে থাকে। তবু যাঁদের শীতটা স'য়ে যায় তাঁদের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

এখানে চুরি ডাকাতির কোনো ভয় নেই। ঠাকুরচাকরও অবিশ্বাসী হয় না। যদিও তাদের আত্মসম্মানবোধ একটু প্রখর। শীতকালে গরম কোট, সোয়েটার, কম্বল প্রভৃতি পেলে তারা খুশি হ'য়েই কাজকর্ম্ম করে। কিন্তু এ-বছর দেওয়ালির দিনে এখানে এক অদ্ভুত ঘটনা

ঘটেছে। ন'দশ বছরের একটি বাঙালী মেয়েকে সন্ধ্যার পর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজ করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। পুলিশও হার মেনে যায়। কিন্তু কয়েক দিন পরে এক পাহাড়ে মেয়েটির মৃত দেহ পাওয়া যায়, মুণ্ডহীন অবস্থায়। কেউ কেউ সন্দেহ করেন, পাহাড়ীরা দেওয়ালির দিনে এই মেয়েটিকে ধ'রে নিয়ে এসে বলি দিয়েছে। তাদের নাকি এটা একটা রীতি। জানি না, এটা কতোদূর সত্যি। তবে এই ঘটনা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মর্মান্তিক।

চার

প্রতিভাশালিনী চিত্রশিল্পী অমৃত শের-গিলের আঁকা ছবি দেখবার জন্যে একদিন সেথায় যাবার ছিলো। ভারতীয় নারীদের মধ্যে অল্প বয়সেই অমৃত শের-গিল যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা বাস্তবিকই অসাধারণ। দেশী-বিদেশী শিল্প-সমালোচক কেউই তাঁর চিত্রের কম প্রশংসা করেন নি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, প্রায় আটাশ বছর বয়সেই তাঁর জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়।

অমৃত শের-গিল জন্মগ্রহণ করেন হাঙ্গেরীর অন্তর্গত বুডাপেস্টে ১৯১৩ সালে। তাঁর বাবা সর্দার উমরাও সিং শের-গিল হ'চ্ছেন পাঞ্জাবের একজন সম্ভ্রান্ত শিখ। ফার্সী কাব্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে। অমৃতর মা ম্যাডাম শের-গিল হাঙ্গেরীয় মহিলা। বাল্যকাল থেকেই ছবি আঁকার প্রতি অমৃতর বিশেষ ঝোঁক ছিল। সেই জন্যে তাঁর মা ১৯২৪ সালে তাঁকে ফ্লোরেন্সের SS. Annunciata-তে ভর্তি ক'রে দেন। এখানে তিনি মাটির মডেল থেকে ড্রইং শেখেন। কিন্তু এগার বছরের মেয়ে অমৃতর পছন্দ হল না এই অভিজাত স্কুলের বাঁধ-বাঁধন। কাজেকাজেই তাঁদের আবার ভারতে ফিরে আসতে হয়। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তাঁদের কাটে এই সিমলায়। এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর বাবা-মা অমৃতকে প্যারিসে নিয়ে গেলেন ছবি আঁকা শেখাবার জন্যে। অমৃত প্রথম পাঠ নিতে সুরু করলেন Academy of the Grand Chummiere-এর পিয়েরের ভেল্যান্টের কাছে। তারপর তিনি ভর্তি হন Ecole des Beaux Arts-এ। এইবার শিখতে লাগলেন বিখ্যাত অধ্যাপক লুসিয়েন সাইমনের কাছে। কুড়ি বছর বয়সে এখানে তিনি এমন একখানি ছবি আঁকেন যার ফলে Grand Salon তাঁকে Associate ক'রে নেন। এ-সম্মান এর আগে অন্য কোনো ভারতীয় লাভ করেন নি। প্যারিসে পাঁচ বছর ছবি আঁকা শেখার পর তিনি আবার তাঁর মা-বাবার সঙ্গে ফিরে আসেন সিমলায়।

ভারতকে তিনি খুব ভালো বাসতেন। তাঁর সমস্ত ছবি দেখলে মনে হয় আমাদের দেশকে নতুনভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে যে মৌলিকতা, সারল্য ও বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে তা অনন্যসাধারণ। কোনো কোনো সমালোচক তাঁর ছবিতে গোগাঁ আর অজন্তার প্রভাব দেখেছেন। কারো কারো মতে যামিনী রায়ের পরেই তাঁর চিত্রের স্থান। বর্তমান লেখক চিত্র-রসিক হ'লেও চিত্র-সমালোচক নন। তাই তাঁর ছবির সম্যক বিচার করা সম্ভব নয়। তবু এটুকু বলতে পারি যে, তাঁর ছবি আমার মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। তাঁর ছবিগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ের চিত্রগুলি পুরোপুরি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকা। প্যারিস থেকে ভারতে ফেরার পর তিনি যে-সব ছবি এঁকেছেন সেগুলির মধ্যে শিল্পী-মনের স্বপ্ন পরিস্ফুট হ'লেও এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ছবিগুলিই আমার বেশি ভালো লেগেছে। অমৃত শের-গিল আত্ম-জীবনীতে এই সম্বন্ধে বলেছেন: But, as soon as I put my foot on Indian soil (we returned in 1934), not only in subject, spirit, but also in technical expression, my painting underwent a great change, becoming more fundamentally Indian. I realised my artistic mission then: to interpret the life of Indians and particularly the poor Indians pictorially; to paint those silent images of infinite submission and patience, to depict their angular brown bodies, strangely beautiful in their ugliness: to reproduce on canvas the impression their sad eyes created on me; to interpret them with a new technique my own technique that transfers what might otherwise appeal on a plane that is emotionally cheap to the plane which transcends it and yet conveys something to this spectator who aesthetically sensitive enough to receive the sensation.

তুষারাবৃত হিমালয় পর্বত

অমৃত শের-গিলের চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল দিল্লী, এলাহাবাদ, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই ও লাহোরে। ১৯৩৮ সালে তিনি বিয়ে করেন ভিক্টর এগন্‌কে বুডাপেস্টে। নবদম্পতি ভারতে ফিরে এসে নীড় বাঁধতে না বাঁধতেই অমৃত মারা যান।

ম্যাডাম শের-গিলের কাছ থেকে আমরা যখন তাঁর মেয়ের জীবন-কাহিনী শুনছিলাম, তখন তাঁর চোখ যে কতোবার অশ্রুসজল হ'য়ে উঠছিল তা বলতে পারি না। সর্দার ও ম্যাডাম শের-গিলের সাদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের কথা সিমলার স্মৃতির মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

পাঁচ

সিমলার সামর-সৌন্দর্য শীতকালে রূপান্তরিত হয় তুষার-শুভ্রে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এক পশ্‌লা শিলাবৃষ্টি হ'য়ে যাওয়ার পর প্রচণ্ড শীত

পড়ে। এই সময় থেকেই কন্‌কনে হাওয়া বইতে সুরু করে। সাধারণত ডিসেম্বরের শেষ, নয় তো জানুয়ারির গোড়ায় প্রথম তুষারপাত হয়। সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। পেঁজা তুলোর মতো বরফের কুচি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে পড়ে। মনে হয় আকাশ থেকে কে যেন মুঠো মুঠো ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে। শিলা যেমন ভারি, এই বরফের কুচিগুলি সে-রকম নয়, খুব হাল্কা। ছাতা নিয়ে বেরুলে ছাতার ওপরটা একেবারে সাদা হ'য়ে যায় বরফে। যখন বরফ পড়তে আরম্ভ করে তখন দূরের দৃশ্য অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে যায়। দেখতে দেখতে রাস্তা, বাড়ির ছাদ সব তুষারাচ্ছাদিত হ'য়ে যায়। পাহাড়ের চূড়াগুলিও বরফে একেবারে ঢেকে যায়। সূর্য্যালোকিত দিনে এই বরফ দেখলে মনে হয়, পৃথিবী যেন আলোর প্লাবনে ডুবে গেছে। সারা শিমলা শহর তখন ঝলমল করতে থাকে। বরফের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে বেড়াতে ভারি আরাম। ঠিক নুনের গুঁড়োর মতো জুতোর চাপে বরফের গুঁড়ো সব মুড়্ মুড়্ করে ওঠে। এই বরফ চট্ ক'রে কিন্তু গলে না। রাস্তায় বরফের গোলা নিয়ে কোনো কোনো দল তামাসায় যুদ্ধ সুরু ক'রে দেয়। এখানকার প্রধান প্রধান রাস্তায় বরফ সরিয়ে পথচারিদের জন্যে পথ কেটে দেওয়া হয়। কারণ বরফের ওপর দিয়ে অনেকে চলতে চলতে পিছলে পড়ে যায়। হিন্দুস্থান টিবেট রোড ধরে সঞ্জৌলির দিকে কিছুটা অগ্রসর হ'লে তুষার-শ্রী উপভোগ করা যায় বেশি। যাঁরা খুব ভ্রমণপ্রিয়, তাঁরা ম্যাশোব্রা, কুফ্রি বা নারকোণ্ডা ঘুরে আসতে পারেন বরফের ওপর দিয়ে। মাঠের ওপর বরফ পড়লে সেগুলো দেখতে হয় ঠিক পুঞ্জীভূত সাদা ফেনার মতো। এই সময়ে রেসিডেন্সে স্কেটিং আরম্ভ হয়।

তুষারধবল পাহাড়ের ওপর দিয়ে সূর্য্যের আবির্ভাব এক অপরূপ দৃশ্য। পর্বতের বন্ধুর তুষারস্তর সূর্য্যকিরণে জ্বলে উঠতে থাকে। আলোছায়ার রঙে বর্ণচ্ছটার সে কী অপূর্ব লীলা! মনে প'ড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা :

"কোন্ জ্যোতির্ম্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে, নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে,
রোমাঞ্চিত তৃণ
ধরণী স্পন্দিয়া উঠে, প্রাণপণ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।"

রাতের শিমলার ভিন্ন রূপ। চাঁদের নরম আলো এই পার্ব্বত্য স্থানটিকে ঘিরে ইন্দ্রজাল রচনা করে। চারিদিক নিস্তব্ধ। রাত্রির প্রশান্তি ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে শীতার্ত্ত পশুর আর্ত্তনাদ। সকলেই তখন ঘুমে অচেতন। ধীরে ধীরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। অনতিদূরে অস্পষ্ট পাহাড়ের সারি; তাদের গায়ে অসংখ্য জোনাকী জ্বলছে। দূরের বাড়িগুলোর ইলেকট্রিক লাইট ঠিক এই রকম দেখায়। পাহাড়ের দেওয়ালি উৎসব দেখতে দেখতে চোখ পড়বে আকাশের বুকে। সেখানেও স্নিগ্ধজ্যোতি তারার মেলা। আকাশ-পর্ব্বতের এই দিব্যোৎসবের দিনে মনে হ'তে পারে আমাদের অসহায়ত্ব। মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান নক্ষত্রের কাছে আমরা কতো ক্ষুদ্র! আমাদের চৈতন্যও তো ঐ জোনাকিদের মতোই একবার জ্বলছে, আবার পরমুহূর্ত্তেই ম্লান হ'য়ে যাচ্ছে।

নব-বরষায়

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম্-এ

ঝর ঝর ঝর ঝরিতেছে জল
আকাশ ভাঙা ধারা,
এসেছে বরষা অশ্রু পাথার
সকল বাঁধন হারা।
দিকে দিকে আজ মেঘ-গরজন,
সজল বাতাসে কাঁপে অনুখন ;
খুঁজিছে বিজলী কাহারে নয়ন
কাজলা চলচল।
গ্রহ তারা হীন বিরহী আকাশ
ফেলিছে অশ্রু জল।

মাঠে ঘাটে স্রোত ছোটে কলকল
শুধু খুঁজিবার খেলা,
নব তৃণ-দলে কচি ধান ক্ষেতে
হারানো প্রীতির মেলা।
বহিছে বাতাস দোলে তালবন,
বিরহ-কান্না উঠে শন শন,
সকল বিশ্ব সজল নয়ন
কাঁদিছে আর্ত্ত-সুর,
গাহিছে হৃদয় মনের বাউল—
ওরে আর কতদূর ?
মেঘ-কজ্জল শ্যাম-বন-রূপ
মেঘের-ওপারে ঢাকা,
এ পারে বুকে আঁখি দুটী মোর
রহিল অশ্রু-মাখা।
মায়ালস প্রাণ মাধুরী বিহ্বল,
মনে পড়ে আজ বঁধু আঁখি জল ;
ছুটে চলে ওই যমুনার জল
নীল স্রোতে ভাঙি কূল,
এসেছে বরষা কাঁদিছে আকাশ
ঝরিছে কদম-ফুল।

হিন্দু-বিবাহ-বিধি সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ বি-এল

বিবাহ হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের অন্যতম, এবং শূদ্রদিগের মধ্যে ইহাই একমাত্র সংস্কার। শাস্ত্রবিধানে সিদ্ধ বিবাহের ফলে যে পুত্র উৎপন্ন হয় সেই পুত্রই ব্যক্তি এক বিশেষ নরক (পুন্নাম) হইতে তাহার পিতাকে উদ্ধার করে।

হিন্দুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারও নির্ণীত হয় পিণ্ড সিদ্ধান্ত অনুসারে। দায়ভাগ অনুসারে যিনি মৃতের পারলৌকিক উর্দ্ধগতির সর্ব্বোত্তম সহায়ক, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর তাঁহার অধিকার সর্ব্বাগ্রে গণ্য। পুত্রই এই দিক দিয়া অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি তথা পিণ্ডদানাদি কার্য্যে সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বোত্তম অধিকারী সুতরাং মৃতের পরিত্যক্ত ইহলৌকিক ধন সম্পত্তিতে পুত্রের দাবীই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য। বিধিমতে সম্পাদিত বিবাহের ফলে যে পুত্র উৎপাদিত হয় সেই পুত্রের কথাই বলিতেছি। সুতরাং এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে কোন বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র ও আইন অনুসারে সিদ্ধ?

এ বিষয়ে আলোচনা করিবার ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটী প্রাথমিক আলোচনা করিব।

মনুষ্য সমাজে চিরকাল বিবাহ প্রথা ছিল কি? মানুষ একদিনে সভ্যতার সুমেরু শিখরে আরোহণ করে নাই বা তাহার বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাও তাহার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অন্যান্য সমাজের কথা পরে আলোচনা করিব বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা প্রাসঙ্গিক নহে। পৌরাণিক শ্বেতকেতুর উপাখ্যান আমরা অনেকেই জানি। উক্ত মুনির মাতাকে তাঁহার পিতার সাক্ষাতে অপর একব্যক্তি অপহরণ করিতে যাওয়ায় উক্ত মুনি কোপান্বিত হইলে তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন স্ত্রীলোকরা গাভীর ন্যায় এক পুরুষের নিকট হইতে অপর পুরুষের নিকট গমন করিলে তাহাদিগকে কিছুমাত্র দোষ স্পর্শে না। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্বেতকেতু যে বিধি প্রচলন করিলেন তাহাকেই বিবাহ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে বহুপ্রকার বিবাহ বিধির প্রচলন ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সকল বিবিধ প্রকার ভেদের বিলোপ ঘটিয়াছে।

হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে সকল বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় সে সকল বিবাহের অনেক গুলিই বর্ত্তমান যুগে ঘটিলে আইনে অসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। অসবর্ণ বিবাহের কথাই ধরা যাউক। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আমরা বহু অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ পাই কিন্তু বর্ত্তমানের হিন্দু আইন অনুসারে উহা অচল। অসবর্ণ বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা ১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভারতবর্ষে মৎ লিখিত "বিশেষ বিবাহ বিধি" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে সুতরাং বর্ত্তমানে তাহার পুনরালোচনার প্রয়োজন দেখিনা।

দ্রৌপদী উপাখ্যানের কথাই ধরা যাউক। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী গ্রহণ এক অভাবনীয় ব্যাপার। সভ্য সমাজে এক পতি গ্রহণ প্রথাই প্রচলিত এবং বহু পতিত্ব হিন্দু আইন স্বীকার করে না। তিব্বতে অদ্যাপি বহু পতিগ্রহণ প্রথা বর্ত্তমান কিন্তু সভ্য সমাজ তাহাকে সুচক্ষে দেখেনা। দ্রৌপদীর পঞ্চপতি গ্রহণ ব্যাপারে ভারতীয় সমাজের উপর তিব্বতীয় প্রভাবদুষ্ট হইয়াছে কিনা বলিতে পারিনা তবে মহাভারতীয় যুগের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় সমাজে এইরূপ কোন ব্যবস্থা হয়ত ছিল যাহা মহাভারতীয় যুগে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে কিন্তু দ্রৌপদীর নজীর দেখাইয়া কোন হিন্দু স্ত্রীলোক একাধিক পতিগ্রহণ করিতে পারে না।

লিখিত শাস্ত্রে যাহাই থাকুক না কেন আইন বলে যে দেশাচার শাস্ত্র ব্যবহারও উপরে। অনেকে আমাকে পত্রের দ্বারা আমার অঞ্চলের হিন্দুদিগের বিভিন্ন বিবাহ রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন ও প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা; সেই কারণেই আলোচনার পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখিলাম যে—আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণও দেশাচারে বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমেই আলোচনা করা যাউক কাহার কাহার মধ্যে বিবাহ হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অসবর্ণ বিবাহ হিন্দু আইনে অসিদ্ধ; কিন্তু একই বর্ণের বিভিন্ন শ্রেণী বা স্তরের মধ্যে যে সিদ্ধ হিন্দু বিবাহ হইতে পারে সে বিষয়ে হাইকোর্টের নজীর রহিয়াছে। এইরূপে শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত কায়স্থ ও তন্তুবায়ের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ হিন্দু বিবাহ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে (১)। হিন্দু আইন অনুসারে বিবাহ করিতে হইলে পাত্র ও পাত্রী একই বর্ণভুক্ত হওয়া চাই।

দ্বিতীয়তঃ গোত্র ও প্রবর। পাত্র ও পাত্রী একই গোত্র ও প্রবরের অন্তর্ভুক্ত হইলে চলিবেনা। কিন্তু শূদ্রের উপরে এই নিয়ম খাটেনা। গোত্র বলিতে আদি পুরুষকে বুঝায়; সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ এই কারণে যে উক্ত বিবাহ একই বংশের মধ্যে আত্মবিবাহ হইয়া যাইবে। শূদ্রের পক্ষে গোত্র শব্দের অর্থ ভিন্ন। শূদ্রের গোত্রের দ্বারা তাহার বংশের আদি পুরুষকে না বুঝাইয়া সেই আদিপুরুষের পুরোহিতকে বা বংশের আদি পুরোহিতকে বুঝায় সুতরাং এরূপ স্থলে সমগোত্রে বিবাহ একই বংশের মধ্যে অন্তর্বিবাহ বুঝায় না এই যুক্তিতে শূদ্রদিগের সমগোত্রে বিবাহ আইনে অসিদ্ধ নহে।

পাত্র ও পাত্রী নিঃসম্পর্কীয় হইলে পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনে অপর প্রশ্ন উঠেনা কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক থাকিলে তাহাদিগের মধ্যে বিবাহ আইন অনুসারে সিদ্ধ হইবে কিনা তাহার বিচারের প্রয়োজন দেখা যায়। সম্পর্কীয়ের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে একাধিক নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে।

যথা "পঞ্চ মাতৃতঃ পরিহরেৎ সপ্ত পিতৃতঃ" (পৈঠিনসি) অর্থাৎ "পিতা হইতে সাত এবং মাতামহ হইতে পাঁচ ত্যাগ করিবে" (২) এবং

"আসপ্তমাৎ পঞ্চমাচ্চ বন্ধুভ্যঃ পিতৃমাতৃতঃ।
অবিবাহ্যা সগোত্রা চ সমান প্রবরা তথা।" (নারদ)।

অর্থাৎ "পিতা ও মাতার বন্ধু হইতে,—যথাক্রমে সপ্তম ও পঞ্চম পুরুষের মধ্যে প্রত্যেক হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত কন্যা ও পঞ্চমী পর্য্যন্ত কন্যা এবং সগোত্রা ও সমান প্রবরা কন্যা বিবাহ্য নহে।" (৩)

---

(১) বিশ্বনাথ বনাম সরসীবালা ৪৮ ক্যাল ৯২৩

(২-৩) এই শ্লোকগুলি ও ইহার অনুবাদ ও টীকা শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃত স্মৃতি চিন্তামণিঃ গ্রন্থের উদ্বাহ পরিচ্ছেদ পৃঃ ১১০-১১৫ হইতে উদ্ধৃত। ইহার টীকা তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার মূল কথা নিম্নরূপ :—

"পিতা হইতে উপরিতন সপ্তম পুরুষ পুরুষগণের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ হইতে নীচের দিকে সপ্তমী কন্যা পর্য্যন্ত বিবাহ্য নহে। অর্থাৎ পিতা হইতে সাতসংখ্যা কেবল কন্যা দ্বারা বা দুই চারিজন পুরুষ দ্বারা পূর্ণ হউক তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু সাতের মধ্যে কন্যা বিবাহ করা নিষিদ্ধ।"

"মাতামহ হইতে উপরিতন পাঁচপুরুষ পর্য্যন্ত পুরুষগণের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ হইতে নীচের দিকে পঞ্চমী কন্যা পর্য্যন্ত বিবাহ্য নহে।"

এবম্প্রকার বহুবিধ নিষেধাজ্ঞা থাকিলেও একটী যে প্রধান ব্যতিক্রমের উল্লেখ করিয়াছি তাহার ফলে বহু অবিবাহ্য কন্যা বিবাহ্য হয়। এই ব্যতিক্রমটিকে "ত্রিগোত্রাপবর্জিত" সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত করা যায়। এক কথায় ইহার অর্থ এই যে পাত্র ও পাত্রী "ত্রিগোত্রাপবর্জিত" হইলে তাহাদিগের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ বিবাহ।

সপিণ্ডত্বেঽপি কর্তব্যঃ ত্রিগোত্রাৎ পরতো যদি। বামনপুরাণ।

অর্থাৎ ত্রিগোত্রের পর হইলে নিকট (সম্পর্ক)কেও বিবাহ করা যায়। অতি সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে এক বিবাহ (মাতুল ও ভাগিনেয়ীর মধ্যে) নাকচের ব্যাপারে (৪) ত্রিগোত্রাপবর্জিত সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে গোত্র গণনা কিভাবে করা হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "পিতা ও পিতৃবন্ধু এবং মাতা ও মাতৃবন্ধুর গোত্র ধরিয়া, তিনটী গোত্র ছাড়াইয়া চতুর্থ গোত্রস্থিত যে কন্যা তাহাকে বিবাহ করিবে" (৫)। উক্ত মকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট ইহার অনুসরণ করিয়াছেন। পারিভাষিক অর্থে পিতৃবন্ধু অর্থে পিতার পিসতুত, মাসতুত এবং মামাতভাই এবং মাতৃবন্ধু অর্থে মাতার পিসতুত, মাসতুত এবং মামাত ভাই (টিকা দ্রষ্টব্য)।

কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষের ঠিকানায় একব্যক্তি আমাকে পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন—পাত্র মাতার মামাতভায়ের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে কিনা? সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

মাতার মামাতভোন অর্থে মাতার মাতুল কন্যা। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে মাতার মাতুল হইতে পঞ্চমী কন্যা পর্যন্ত বিবাহ্য নহে (৬)। আলোচ্য ক্ষেত্রে পাত্রী মাতার মাতুলের দৌহিত্রী সুতরাং নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে অতএব এ বিবাহ হইতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাউক ব্যতিক্রম অর্থাৎ ত্রিগোত্রাপবর্জিত সিদ্ধান্তের সাহায্যে এইরূপ বিবাহ চলিতে পারে কিনা! বর্তমান ক্ষেত্রে পাত্রী পাত্রের মাতামহের শ্যালকের কন্যার কন্যা। পাত্রকে বাদ দিয়া পাত্রের মাতামহ হইতে গোত্র গণনা করিতে হইবে। সুতরাং পাত্রের মাতামহ প্রথম গোত্র, উক্ত মাতামহের শ্যালক অথবা শ্যালক-পিতা দ্বিতীয় গোত্র, শ্যালকের বিবাহিতা কন্যা তৃতীয় গোত্র ও তাহার অবিবাহিতা কন্যাও এই তৃতীয় গোত্রে সুতরাং পাত্রী তৃতীয় গোত্রের মধ্যে অর্থাৎ তৃতীয় গোত্র অতিক্রম করে নাই সুতরাং এইরূপ বিবাহ হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে হিন্দুসমাজ সর্বব্যাপারে endogamy বা অন্তর্বিবাহের বিধান দিলেও গোত্র, প্রবর বা সম্পর্কের ব্যাপারে exogamy বা বহির্বিবাহই সমর্থন করিয়াছে ও উপরোক্ত ও অন্যান্য বিধিনিষেধের প্রবর্তন দ্বারা নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ বারণ করিয়াছে।

অনেকে আমাকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন মাদ্রাজে অনেক নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত কেন?

মাদ্রাজে যে হিন্দুদিগের মধ্যে আত্মীয়-বিবাহ প্রচলিত একথা অতি সত্য। নিজ ভগিনী, পিতার ভগিনী, মাতার ভগিনী, ভ্রাতার কন্যা, মাতার ভগিনীর কন্যা এবং পিতার ভ্রাতার কন্যা মাত্র ইঁহারাই নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে; কিন্তু সর্বশ্রেণী এমন কি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও ভাগিনেয়ী, মাতুল কন্যা ও পিতৃষসার কন্যার সহিত বিবাহ সুপ্রচলিত (৭)। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণও দক্ষিণদেশের এই রীতি লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন (৮)।

দক্ষিণী বা মাদ্রাজী হিন্দুগণ হিন্দু আইনের দ্বারা পরিচালিত হইলেও এতদ্দেশে বিবাহ ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে প্রচলিত হিন্দুবিধির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। মাদ্রাজী হিন্দুগণ প্রধানতঃ মরুমক্কতায়ম, আলিয়সন্তানম্ ও নম্বুদ্রি বিধি মানিয়া চলেন।

ত্রিবাঙ্কুর, কোচীন, মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়ায় অর্থাৎ প্রাচীন কেরল রাজ্যের জনগণের একটি বিশিষ্ট অংশ মরুমক্কতায়ম আইন মানিয়া চলেন। দক্ষিণ কানাড়ায় প্রচলিত বিধিকে আলিয়সন্তান বিধি নামে অভিহিত করা হয়। মরুমক্কতায়ম শব্দের আভিধানিক অর্থ ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীতে উত্তরাধিকার, কানাড়ী শব্দের অর্থও প্রায় তাই। নায়ার সম্প্রদায়ের ও মালাবার, কোচীন ও ত্রিবাঙ্কুরের অন্য কয়েকটী অব্রাহ্মণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মরুমক্কতায়ম বিধি প্রচলিত। তিয়া এবং উত্তর মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়ার বান্ট, বিল্লাওয়া ও অ-পুরোহিত জৈনদিগের উপর আলিয়সন্তানের প্রভাব। উত্তর মালাবারের অ-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পয্যান্নুর ব্রাহ্মণগণ কিন্তু মরুমক্কতায়ম বিধির অনুসরণ করেন। (৯)

বিবাহের ব্যাপারে কেবলমাত্র আত্মসম্পর্কীয় বিবাহে যে দক্ষিণীগণ হিন্দু আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন তাহা নহে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

হিন্দু আইনে পুরুষের বহু বিবাহ স্বীকৃত কিন্তু আধুনিকতম মরুমক্কতায়ম বিধিতে তাহা নিষিদ্ধ (১০)। নম্বুদ্রি আইনেও বলে নম্বুদ্রি পুরুষের এক নম্বুদ্রি স্ত্রী থাকিলে সে অপর কোন নম্বুদ্রি স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারিবে না। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছে যথা:—স্ত্রী পাঁচবৎসরের অধিককাল দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিলে বা বিবাহের পর দশ বৎসরের মধ্যে সন্তানবতী না হইলে অথবা পতিতা হইলে তাহার স্বামী তাহার জীবিতকালেই পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে (১১)।

হিন্দুর বিবাহের ফলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে বন্ধন তাহা নাকি অচ্ছেদ্য। কিন্তু দক্ষিণীদিগের মধ্যে এই মূলনীতিরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। দক্ষিণীদিগের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদপ্রথাও দৃষ্ট হয় ও অতি সহজ উপায়েই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারা যায় যথা:—বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য (একক অথবা সম্মিলিতভাবে) আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া ও দাখিলের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত হইবার পর সাত দিনের মধ্যে পুনরায় আবেদন করিয়া। মরুমক্কতায়ম আইন আবার উভয়পক্ষ-সম্পাদিত রেজেষ্টারীকৃত বিচ্ছেদপত্র দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান দিয়াছে। (১২)

পিতার—মামাতভাই, মাতুল, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ, অত্যতি বৃদ্ধ-প্রমাতামহ, পিসতুতভাই, পিসী, মাসতুত ভাই, মাসী, ইহাদের প্রত্যেক হইতে সপ্তমী পর্যন্ত কন্যা অবিবাহ্য।

মাতার—মামাত ভাই, মাতুল, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ, পিসতুত ভাই, পিসী, মাসতুতভাই, মাসী প্রত্যেক হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত কন্যা অবিবাহ্য ইত্যাদি।

(৪) বিমল বনাম রঞ্জিতলাল ৫০ ক্যালকাটা উইকলী নোটস ৭৫৩-৭৫৮

(৫) স্মৃতি চিন্তামণিঃ পৃঃ ১১৩

(৬) পাদটীকা ২-৩ দ্রষ্টব্য

৭। The Hindu Law of Marriage and Stridhan by G. D. Banerjee 4th Edition page 262 ৮। ব্যবহার ময়ূখ।

৯। Mayne's Hindu Law 10th. Edition page 967

১০। Mayne's Hindu Law 10th Edition page 975

১১। No Nambudri who has a Nambudri wife shall marry another Nambudri woman except in the following cases :—

(a) Where the wife is afflicted with an incurable disease for more than five years.

(b) Where the wife has not borne him any child within ten years of her marriage.

(c) Where the wife has become outcaste

—Section 11 : Madras Nambudri Act 1933

১২। Malabar Marriage Act—Sections 19, 20, 21 and Marumakkattayam Act—Sections 6, 8, 9.

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে 'মালাবার-বিবাহ-বিধি'-র একটি সুন্দর ব্যবস্থার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সে ব্যবস্থাটি হইতেছে ইহাই যে, স্ত্রীর অসম্মতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইলে এইরূপ বিচ্ছেদ সত্ত্বেও যতদিন ঐ স্ত্রী হিন্দু ও সতী থাকিয়া পত্যন্তর গ্রহণ না করিবে ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব স্বামীর নিকট হইতে ভরণ-পোষণ পাইবার অধিকারী (১৩)।

এইবার আমরা কিরূপে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেই প্রসঙ্গে আসিব। হিন্দু আইনে যে বিবাহপদ্ধতি, দক্ষিণীদিগের মধ্যে তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। মিঃ ও. সি. মেনন 'মালাবার ম্যারেজ কমিশন'-এর সভ্য হিসাবে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন "সম্বন্ধম" (দক্ষিণীদিগের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধম শব্দ দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়) ব্যাপারে কোনরূপ ক্রিয়াকর্ম্মের (formalities) আবশ্যক কিনা তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় না তবে উত্তর মালাবারে কয়েকটী আচার সাধারণতঃ পালন করা হয়।

তিনি বলেন উত্তর মালাবারে 'পুদামুরি' বিবাহই বিশেষ প্রশস্ত। বলা বাহুল্য 'পুদামুরি' স্বদেশীয় শব্দ। পুদামুরির পূর্ব্বে যাহা কর্ত্তব্য তাহাকে বলা হয় "পুদামুরি কুরিকল" ইহা অনেকটা এতদ্দেশীয় 'পাকা দেখার' ন্যায়। এই উপলক্ষে পাত্রপক্ষ জ্যোতিষী সঙ্গে লইয়া কন্যাপক্ষের গৃহে যায় ও কোষ্ঠী মিলাইয়া বিবাহের দিন ধার্য্য করে। দিন ধার্য্য হইলে কন্যা পক্ষ পাত্র পক্ষকে ভোজ দিয়া আপ্যায়িত করে। পুদামুরির তিন চারিদিন পূর্ব্বে পাত্র "কর্ণবান" (পোটিপতি) ও বয়োজ্যেষ্ঠগণের নিকট বিবাহের অনুমতি ভিক্ষা করিয়া পান সুপারিরূপ অর্ঘ্যদান করে। বিবাহ দিবসে পাত্র পাত্রী-গৃহে উপনীত হইলে তাহাকে 'তেক্কিনী' বা গৃহের দক্ষিণ দিকস্থ কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থানে পাত্র ব্রাহ্মণগণকে দান দেয় ও পরে বিশেষ ভোজ হয়। ইহার পর জ্যোতিষী আসিয়া শুভমুহূর্ত্ত ঘোষণা করিলে পাত্রের একটী বন্ধুর সহিত পাত্রকে বিশেষরূপে সজ্জিত ও আলোকিত প্রধান কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। এই কক্ষে অষ্টমাঙ্গল্য যথা চাউল, ধান, কচি নারিকেল পত্র, তীর, দর্পণ, ধৌতবস্ত্র, অগ্নি ও 'চিম্' নামে অভিহিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিশেষ একপ্রকার বাক্স সংরক্ষিত থাকে। পাত্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে এইগুলি তাহার সম্মুখে রক্ষিত হয়। ইহার পর পাত্রী পূর্ব্বদিকের দরজা দিয়া পরিবারের কোন বয়স্কা রমণীর সহিত এই কক্ষে প্রবেশ করিলে পাত্র পাত্রীর হস্তে বস্ত্র প্রদান করে ও পাত্রীর সঙ্গিনী পাত্র ও পাত্রীর স্কন্ধ ও মস্তকে এবং অগ্নিতে চাউল ছিটাইয়া দেয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই পাত্র তেক্কিনীতে চলিয়া গিয়া বয়োজ্যেষ্ঠগণকে দক্ষিণা দেয় এবং নিমন্ত্রিতগণ চলিয়া গেলে পাত্রপাত্রীর সহিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করে।১৪

অন্য হিন্দুদিগের ও দক্ষিণীদিগের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারে যেরূপ পার্থক্য উত্তরাধিকার ব্যাপারেও সেইরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। অবশিষ্ট হিন্দুগণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে বংশ পরিচয় দেয় কিন্তু দক্ষিণী মরুমক্কত্তায়ম্‌গণের পরিচয় মাতৃজাতি হইতে; সমাজ মাতৃ-কর্ত্তৃত্বমূলক হইলে ইহা অবশ্যম্ভাবী ("The descent according to the system of Maru-makkattayam Law is in the female line") সন্তান তাহার পিতার গোষ্ঠীভুক্ত না হইয়া মাতার গোষ্ঠীভুক্ত হয়।

আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত হিন্দুবিধি ও দক্ষিণীদিগের (পূর্ব্বকথিত অংশে) ব্যবহারে মধ্যে এত প্রভেদ কেন? একাধিক পত্র প্রেরক ও প্রেরিকা এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন ও সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বঙ্গদেশে দক্ষিণীদিগের মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থানুরূপ আত্মীয় বিবাহ চলিতে পারে কিনা?

শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর আমি প্রথমেই দিয়াছি। "দেশাচার লিখিত শাস্ত্র ব্যবস্থার উপরে।" মাদ্রাজে প্রচলিত আত্মীয়-বিবাহ আমাদিগের দেশে অচল। তাহাদিগের দেশের ব্যবস্থা হিন্দুর কোন শাস্ত্রকারের প্রদত্ত বিধি ও বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু শাস্ত্র ব্যবস্থা না থাকিলেও দেশাচারকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মাদ্রাজ অঞ্চলে ঐরূপ বিবাহ বহুকাল হইতে প্রচলিত এবং প্রাচীন প্রথাকে আইন স্বীকার করেন সুতরাং উক্তরূপ বিবাহ তাহাদিগের সমাজে সিদ্ধ বিবাহ। কিন্তু তাই বলিয়া উক্ত দেশের নজির দেখাইয়া এতদ্দেশে ঐরূপ বিবাহ করিলে তাহা অসিদ্ধ বলিয়াই ঘোষিত হইবে। কেননা ইহা মরুমক্কত্তায়ী প্রভৃতিদিগের প্রথা হইলেও এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে ঐ প্রথার প্রচলন নাই এবং নূতন করিয়া কেহ প্রথার সৃষ্টি করিতে পারেনা, করিলেও আইন তাহা গ্রাহ্য করিবে না।

আমাদিগের দেশে এইরূপ আত্মীয় বিবাহ প্রচলন করা উচিৎ কিনা ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া কয়েকজন পত্র দিয়াছেন তাঁহাদিগের অবগতির জন্য জানাইতেছি বর্ত্তমানে এ বিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমি অনিচ্ছুক।

এইবার আমরা প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কবে কোন যুগে অতীতে আর্য্যগণ ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না; তবে এ কথা ঠিক যে তাঁহারা একদিনেই বা প্রথম প্রচেষ্টাতেই সমগ্র ভারত অধিকার করিতে সক্ষম হন নাই। ক্রমে ক্রমে তাহারা প্রথমে আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিয়াছে পরে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলে সুযোগ ও সুবিধানুসারে দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রামায়ণের কাহিনীকে আর্য্যগণের দক্ষিণ অভিযানের একটী সুন্দর বর্ণনা বলিলে বোধ হয় দোষ হয় না (১৫)। অগস্ত্যের বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করার গল্প শুনিয়া তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রথম আর্য্য অভিযানকারী বলিলেই কি বিশেষ ভুল করা হইবে (১৬)?

দ্রাবিড়ী সভ্যতা আর্য্য সভ্যতা হইতে কম ছিল বলিয়া মনে হয় না—মহেঞ্জোদাড়ো হারাপ্পা তাহার প্রমাণ। আর্য্যগণ ভারতভূমিতে আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়গণকে কোণ ঠাসা করিলেও বা নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা তাহাদিগের সভ্যতাকে আচ্ছন্ন করিলেও উহার প্রভাব হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিতে পারে নাই, সেই জন্যই দেখি অগ্নি-পূজক আর্য্য-হিন্দুর 'পূজা'র অগ্নির সাহায্যে হোমাদির সহিত দ্রাবিড়ী প্রথায় পুষ্পাদির সাহায্যে 'পূজা' বা ক্রিয়া কর্ম ইত্যাদিতে ব্রাহ্মণের দ্বারা 'দান' দেওয়া ইত্যাদি।

ভারতীয়-আর্য্য-সভ্যতা ও দ্রাবিড়ী-সভ্যতা—একে অপরের প্রভাবযুক্ত। আর্য্যগণ দক্ষিণদেশে নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি লইয়া গেলেও দ্রাবিড়ী সভ্যতাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে নাই। তাই দক্ষিণের ভাষা আজিও দ্রাবিড়ী ভাষা যথা তামিল, তেলেগু, মালয়ালী, কানাড়ী। হিন্দু আইন দ্রাবিড়গণ গ্রহণ করিল বা আর্য্যগণ দ্রাবিড় দেশে হিন্দু আইন চালাইল সত্য কিন্তু উক্ত দেশ হইতে দ্রাবিড় বিধিও লোপ পাইল না। উভয়ের একত্র সংমিশ্রণে যে বিধির উদ্ভব হইল তাহাই দ্রাবিড়ী-

---

(১৩) Where a marriage has been dissolved without the consent of the wife, she shall be notwithstanding such dissolution, be entitled to claim maintenance from the husband so long as she remains a Hindu, continues to be chaste and does not form a Sambandham or contract a marriage provided that she was not guilty of adultery uncondoned before such dissolution.

—Section 22: Malabar Marriage Act.

(১৪) Report by Mr. O. Chandu Menon as a member of the malabar marriage commission as quoted by Mr. S. Krishnamurthi Aiyar in his book—"The Law and Practice relating to marriage in India and Burma"—Pages 256—257.

(১৫-১৬) ১ম বর্ষ (১২৯৮-৯৯) সাধনা পত্রিকার বিজয়া-সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখিত 'দাক্ষিণাত্যে আর্য্য অভিযান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু-আইন। দ্রাবিড়দিগের মধ্যে যে আত্মীয়-বিবাহ বা অপরাপর অঞ্চলের হিন্দু আইন ও দ্রাবিড় অঞ্চলের হিন্দু আইনের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার মূলে প্রাচীন দ্রাবিড়ী বিধি।

কথিত হয় যে মালাবারের প্রথম রাজা পরশুরাম মালাবারে ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করেন ও ভূমিদান করেন ও সেই ভূসম্পত্তিকে ভাগবিভাগের হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধান দেন যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই মাত্র সম্পত্তি পাইবার ও বিবাহ করিবার অধিকারী হইবে। অপরাপর পুত্রগণ নিম্ন বর্ণের স্ত্রীলোকের সংসর্গ করিত। এই অবৈধ সংসর্গের ফলে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইত তাহারা তাহাদিগের পিতা-মাতা বিধিমতে বিবাহিত নহে বলিয়া পিতার উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না—মাতার সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হইত। পরবর্ত্তীকালে এইরূপ সংসর্গ ও উত্তরাধিকারের বিশেষ বিধান সাধারণ নিয়মে পরিণত হইয়াছে। (১৭)

স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে মালাবারের বহু অদ্ভুত প্রথার (১৮) উল্লেখ করিয়াছেন; তবে মনে হয় সেই সব প্রথার সকলগুলির প্রচলন বর্ত্তমানে আর নাই (১৯) যাহাই হউক আমি তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

কয়েকটী জাতি একান্ত ভাবেই একাধিক পতি গ্রহণ করে। তেলেগু যোগিদাসদিগের মধ্যে বিবাহের পর বধূর স্বামীর ভ্রাতা বা তাহার অন্য নিকটাত্মীয়ের সহিত যৌন সংসর্গ করার প্রথা আছে। মাদুরার কাল্লার স্ত্রীলোকের একই কালে দশটী স্বামীও থাকে ও তাহারা সকলেই সম্মিলিতভাবে সেই স্ত্রীলোকের সন্তানের জনক (২০)। কাজির-এ ভেল্লালদিগের মধ্যে একটী অদ্ভুত প্রথা আছে—পিতা অল্পবয়স্ক পুত্রের সহিত পূর্ণবয়স্কার বিবাহ দিয়া সেই পুত্রবধূর সহিত যৌন সংসর্গ করে ও তাহার ফলে উৎপন্ন সন্তান সেই সন্তানের বাহ্যে নাবালক স্বামীর সন্তান বলিয়াই পরিগণিত হয় (২১)। মালাবারে ব্রাহ্মণ ও অপর কয়েকটী মাত্র জাতি বাদে অপরাপরের ভিতর কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হইবার পূর্ব্বে এক প্রকার বিবাহ করে পরে পূর্ণবয়স্কা হইলে তাহারা নিম্ন জাতি বা উচ্চবর্ণের যাহার সহিত ও যতগুলির সহিত ইচ্ছা সহবাস করিতে পারে। এই কারণে সন্তানের পিতৃ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে ও ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পুত্র উত্তরাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীই উত্তরাধিকারী হয় (২২)।

বস্তুতঃ বিবাহের সহিত উত্তরাধিকারের কোনরূপ সম্পর্ক দাক্ষিণী প্রথা কোনদিন স্বীকার করে নাই—মাত্র ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে—"মালাবার ম্যারেজ এ্যাক্ট" বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে উত্তরাধিকার নির্ণয়ে বিবাহের প্রভাব কিছু পরিমাণে আসিয়াছে (২৩)। বর্ত্তমান আইনে সন্তান পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির পূর্ণ অংশীদার না হইলেও কিছু পরিমাণে বটে। বর্ত্তমানে ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার "তারওয়াড"এর (গোষ্ঠীর) অপর কেহ জীবিত না থাকিলে তাহার সমস্ত স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি এবং ঐরূপ কেহ জীবিত থাকিলে ঐ সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাহার (মৃতের) পত্নী, মৃতের সন্তান না থাকিলে সম্পূর্ণ ও সন্তান থাকিলে সেই সন্তানের সহিত তুল্যভাবে পাইবে। কোন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে ঠিক এইরূপেই তাহার সন্তান, স্বামী ও তারওয়াডের লোক সেই স্ত্রীলোকের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে (২৪)।

বিবাহ সম্বন্ধে বহু বিচিত্র প্রথা আছে—যাঁহারা তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "Hindu Law of Marriage and Stridhan" নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ অথবা Mayne-এর Hindu Law-এর পুরাতন সংস্করণ পাঠ করিতে পরামর্শ দিতেছি। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দাক্ষিণীদিগের মধ্যে বহু বিচিত্র প্রথার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উল্লেখ আমি এইমাত্র করিলাম; এতদ্ব্যতীত ভারতের অপরাপর অঞ্চলের বিচিত্র প্রথার কয়েকটী মাত্র উল্লেখ (তাঁহার গ্রন্থ হইতে) করিব।

কামাখ্যা অঞ্চলে কয়েকটী কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে পান বদলে বিবাহ কার্য্য সমাধা হয় (২৫)। এই শ্রেণীর মধ্যে পান বদলে যেমন বিবাহ হয় পান ছিন্ন করিলে তেমনই বিবাহ বিচ্ছেদ হয় (২৬)।

সাঁওতালদিগের মধ্যে অদ্যাপি পাত্র কর্ত্তৃক পাত্রীর কপালে সিন্দূর দানই বিবাহের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ (২৭)।

কোলদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ সুপ্রচলিত (২৮)। ছোট নাগপুরের কয়েকটী জাতির মধ্যে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের জাটদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ করিবার রীতি আছে (২৯)। সিংহভূমের কয়েকটী অঞ্চলে কুর্মীদিগের মধ্যে বর ও কন্যার কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর রক্ত পরস্পরের অঙ্গে লেপন বিবাহের একটী অঙ্গ (৩০)।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বর্ণবৈষম্য নাই। পূর্ব্বে সে যে বর্ণেরই থাকুক, বৈষ্ণব হইলে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে বিবাহ সিদ্ধ বিবাহ (৩১) এবং মাত্র কণ্ঠিবদলেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে (৩২)।

মেদিনীপুরে যাইবার প্রয়োজন নাই। কলিকাতা ছাড়িয়া যে কোন পল্লীগ্রামে যাইয়া খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবেন যে আমাদিগের এই বাঙ্গালা দেশেই অশিক্ষিত অথবা অর্দ্ধশিক্ষিত বহু নিম্নশ্রেণীর জাতি ও পরিবারের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ গোপনীয় নহে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর এই সকল শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ স্বচ্ছন্দে পুনরায় বিবাহ করে ও সেইরূপ বিবাহকে 'সাঙা' বা 'সাঙ্গা' বলা হয়।

'সাঙ্গা' বিবাহ কোন নূতন প্রথা নয়। ষোড়শ শতাব্দীর কবি নারায়ণ দেব তাঁহার পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল কাব্যে সাঙ্গা শব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বেহুলা যখন লক্ষীন্দরের শব লইয়া ভেলায় চড়িয়া

---

(১৭) Extract from strange's manual of Hindu Law ch XIII as cited by Sir G. D. Banerjee in his Hindu Law of Marriage and Stridhan page 263 - 64.

(১৮) See lecture VI : Banerjee's Hindu Law of Marriage and Stridhan স্তর গুরুদাস যে সকল বইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ২০, ২১, ২২ পাদটীকায় মাত্র সেইগুলির উল্লেখ করিব।

(১৯) মালাবারের বহু প্রাচীন প্রথা আইনের দ্বারা অপ্রচলিত হইয়াছে Mayne's Hindu Law 10th Edition p. 969.

(২০) Nelson's view of the Hindu Law pp 141, 142.

(২১) Nelson's view of the Hindu Law &c P 244.

(২২) Strange's Manual of Hindu Law ch. XIII.

(২৩) Mayne's Hindu Law 10th Edition Pages 974—975.

২৪। Where a man following the Marumakkattayam or the Aliya Santana Law of Inheritance dies Intestate in respect of his self-acquired or separate property or any portion thereof, one half of such property or in the event of no member of his Tarward surviving him the whole of such property shall devolve on his widow if he leaves no children or on his widow and children equally if he leaves both widow and children.—Section 23 of the Malabar Marriage Act (1896) also see section 24 of the same.

২৫-৩০। Lecture VI : Banerjee's Hindu Law of Marriage and Stridhan 4th Edition.

৩১। বলিরাম বনাম ষষ্ঠী ৩৪ ক্যালকাটা উইকলি নোটস ২৭৬

৩২। ২৪ ক্যালকাটা উইকলি নোটস ৫৯৮

চলিয়াছেন সেই সময় বেহুলাকে পত্যন্তর গ্রহণের লোভ দেখান হইল (৩৩)। কিন্তু বেহুলা বলিলেন তিনি বেণের নন্দিনী সুতরাং একপতি ভিন্ন দ্বিতীয় পতি তিনি জানেন না (৩৪)। ইহাতে মনে হয় উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সাঙ্গা-এ দোষ হইলেও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহার প্রচলন ছিল।

বর্তমানেও 'সাঙ্গা' হিন্দুর যে শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান সেই শ্রেণী জল-অনাচরণীয়। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই আবার উক্ত প্রথা বর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পাঞ্জাব ও হিমালয়ের স্থানে স্থানে কিয়ৎপরিমাণে স্ত্রীলোকের বহু পতিগ্রহণ প্রথার প্রচলনের উল্লেখ স্যর হরিসিংহ গৌর তাঁহার 'হিন্দু কোড'-এ উল্লেখ করিয়াছেন।

দক্ষিণীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুপতি গ্রহণ সম্পর্কে স্যর গৌর মালাবার ম্যারেজ কমিশনের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন এতৎ সম্পর্কে তাহার কিয়দংশের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না উহা নিম্নরূপ :—

'If by polyandry we simply mean a usage which permits a female to cohabit with a plurality of lovers without loss of caste, social degradation or disgrace, then we apprehend that this usage is distinctly sanctioned by Marummakkatayam and that there are localities where, the classes among whom, this license is still in practice"

দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের স্থল বিশেষে স্ত্রীলোকের একাধিক পতিগ্রহণের প্রথা আপাতঃদৃষ্টিতে একরূপ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বস্তুতঃ তিব্বত ও উত্তর ভারতের স্থলবিশেষে বহুর পত্নীত্ব ও দক্ষিণী হিন্দু স্ত্রীলোকের একাধিক পতিগ্রহণ এক নহে। তিব্বত ও উত্তর ভারতের কথিত অঞ্চলে অনেক পুরুষ মিলিয়া একত্রে একটী স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া ভোগ করে [স্যর গৌর তাঁহার Hindu Code গ্রন্থে বলিয়াছেন কোন স্বামী স্ত্রীর নিকট যাইবার সময় কক্ষদ্বারে পাদুকা রাখিয়া যায়—যাহাতে তাহার স্ত্রীর অপর স্বামী বুঝিতে পারে যে ভিতরে এক পতি রহিয়াছে] কিন্তু দক্ষিণ দেশে স্ত্রীলোক ইচ্ছামত বহু পতি গ্রহণ করে।

উত্তর ভারতের স্থলবিশেষের যে স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ তাহা পুরুষের মর্জ্জিমত কিন্তু দক্ষিণ ভারতে উহার বিপরীত।

ত্রিপুরা অঞ্চলে বৈদ্যপাত্র ও কায়স্থ পাত্রীর মধ্যে বিবাহকে হাইকোর্ট স্থানীয় প্রথানুসারে সিদ্ধ হিন্দু-বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

আসল কথা হইতেছে ইহাই যে চিরাচরিত প্রথাকে আইন অস্বীকার করে না। কেবলমাত্র বর্তমান ইংরাজ আমলেই যে এই ব্যবস্থা তাহা নহে, আমাদিগের দেশে প্রাচীন কালের ব্যবস্থাপক ঋষিগণও সেই বিধান দিয়া গিয়াছেন যথা :—

ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্মস্তেনাবহীয়তে। (নারদ)।

অর্থাৎ চলিত প্রথা শাস্ত্র ব্যবস্থা অপেক্ষা বলবান ও উহা শাস্ত্র ব্যবস্থাকে পর্য্যুদস্ত করে।

মনু ও বৃহস্পতিও এইরূপ বিধান দিয়াছেন। বৃহস্পতি, প্রাচীন প্রথা স্থানীয় হইলেও তাহাকে আইনের মতই মান্য করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বিবিধ বিধি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে তাহার সকলগুলির আলোচনা আমি বর্তমান প্রবন্ধে করি নাই। যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহাও অতি সংক্ষেপে সুতরাং মাত্র এই প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়া কেহ পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন করিলে স্থানবিশেষে ভুল হইবার সম্ভাবনা। স্থানান্তরে সকল বিধির পূর্ণ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

৩৩। "পুনি বিপুলা সম্বোধিয়া বোলে অমধানি।
এক দুণ বর তোরে দুই দিব আনি॥
সাঙ্গা-এ দোষ নাই আমি ভাল জানি।
মত্ত আমি উঠ তুমি হও সুবদনি॥

* * * *

অমধানি বোলে পুনি বিপুলার ঠাঁই।
স্বামি মৈলে আনি ধরিতে দোষ নাই॥ ইত্যাদি

নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথি (নম্বর ২৩০৬)

৩৪। কুলে দুহিন আমি বেণের নন্দিনী।
এক স্বামি পরে আমি অন্য নাহি জানি॥

নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথি সংখ্যা ২৩০৬

জীবন ও মরণ

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য এম-এ

অতি সংগোপনে,
জীবনের মৃত্যু আসে নিখিলের শাশ্বত প্রাংগণে।
যুগে যুগে মানুষের মুক্তিকামী কোটি কোটি প্রাণ,
এক মহামৃত্যু মাঝে চিরতরে ল'ভেছে নির্বাণ।
অনাসক্ত মহাযোগী—শুদ্ধ-শান্ত-পরিপূর্ণ চিত্তে,
ল'ভিয়াছে মহামুক্তি আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ নিবৃত্তিতে;
তাহাদের শুভ-ইচ্ছা বহে পরবর্তী বংশধারা,
যে চিন্তা মৃত্যুর মাঝে যুগে যুগে হয় নাই হারা।
মৃত্যু নয় অভিশাপ—মৃত্যু আসে দেবতার বরে,
মরিয়া বেঁচেছে যারা, তারা ব্যাপ্ত বিশ্ব-চরাচরে।
আত্মা পায় অমরতা—মরণের অমৃত-শয়নে—
নিখিলের শাশ্বত-প্রাংগণে।

অতৃপ্ত কামনা বুকে চিরজীবী যযাতির প্রেত
জরাগ্রস্ত জীবনের আর্ত্তকণ্ঠে মাগি' অবসান,—
চর্ম্ম তার হয় লোল, কৃষ্ণ কেশ হয় তার শ্বেত,
অশক্ত শরীরে তার তবু ওঠে বসন্তের গান।
মৃত্যু মাঝে মুক্তি নাই, জন্মে তার নাই মহা-ত্রাণ,
ক্ষুধিত পরাণ তার কাঁদে তবু রুদ্ধ হাহাকারে—
জীবনে বঞ্চিত স্বামী, মৃত্যু সাথে তার বিসংবাদ,
আত্মা তার পীড়াগ্রস্ত—অপ্রাকৃত ব্যর্থ ব্যভিচারে।
জানে না সে ক্ষুদ্র জীব, মরণের অনন্ত মহিমা,
জীবাত্মা বৃহৎ হয় কাটাইলে জীবনের সীমা।
প্রাণী হয় প্রাণময়—মৃত্যুমাঝে আত্ম-সমর্পণে—
নিখিলের শাশ্বত প্রাংগণে।

শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবীণা দেবী

শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নায় ধোয়া ধরণীর বুকে, চাঁদের মত হেসে এসেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ; মায়ের কোলে—১২৭৪ সালের ৩রা আশ্বিন বুধবার রাত ১০-৪৫ মিনিটের সময়। ইংরাজী ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ। চাঁদের মতই শান্ত জ্যোতি ও স্নিগ্ধ হাসিতে ভরা ছিলেন তিনি।

সত্তর বৎসর পরে যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন—সেদিনও ছিল মাঘী পূর্ণিমা। ২রা ফাল্গুন ১৩৪৪ সাল। ইংরাজী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ। পূর্ণিমার চাঁদ যেন হাত বাড়িয়ে তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিলেন।

কথায় বলে—চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন নিষ্কলঙ্ক, নির্মল। প্রকৃত তাঁহার মতই যেমন নিখুঁত সুন্দর মূর্ত্তি, তেমনি মহান্ আভিজাত্যপূর্ণ মন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন তিনি। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

অবনীন্দ্রনাথ মাথার উপরে হিমালয়ের মত অগ্রজ দাদাকে পেয়েছিলেন ব'লেই আজ তাঁর ছাত্রেরা বিভিন্ন শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও অধ্যক্ষতা ক'র্ছেন। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলা এবং শিল্পী ছাত্রেরা শৈশবে গগনেন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়াতেই ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছেন।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের তিনিই ছিলেন মূল প্রতিষ্ঠাতা। দেশীয় রাজন্যবর্গ; বিদেশী শিল্পী, গুণী ও রসিক ব্যক্তিবৃন্দ এবং লর্ড কারমাইকেল, লর্ড কীচ্নার প্রভৃতি রাজপ্রতিনিধিদের সাথে তিনি যোগাযোগ রাখ্তেন এবং আলাপ আলোচনা ক'র্তেন—যা'তে তাঁদের মনে প্রাচ্য শিল্পকলার ও শিল্পীর আসন তৈরী হয়। বসন, ভূষণ, সজ্জা, সংস্থান, আচার, পদ্ধতি সবতাতেই তিনি লুপ্ত ভারতীয় ধারা ও রীতির পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন।

তিনি নিজেও বড় শিল্পী ছিলেন। কালো সাদায় চিত্রাঙ্কনে এবং "কিউবিজম্" বা কৌণালী ছবিতে, ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম ও প্রধান। রঙ্গ এবং ব্যঙ্গচিত্রেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর অঙ্কিত "নবহুল্লোড়" বিজ্ঞ সমালোচকের তীব্র মধুর কষাঘাতে ভরা। সেই সময়ের ছোটবড় কোন জিনিষই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। অথচ, আসলে দৃষ্টি ছিল তাঁর বহু ঊর্দ্ধে—বিরাট হিমাদ্রির অভ্রভেদী-চূড়া গৌরীশৃঙ্গ ও কাঞ্চনজঙ্ঘার উপাসক ছিলেন তিনি। তাঁর মত এমন ক'রে আর কেউ-ই হিমগিরিকে দেখেননি বা রূপ দিতে পারেননি। হিমালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র গগনেন্দ্রনাথের আঁকা এবং গগনেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিমালয়।

শেষের কয় বছর পক্ষাঘাতে তাঁর কথা বলার শক্তি লোপ পেয়েছিল। দেখে মনে হ'ত বিরাট হিমাচলের ধ্যান ক'র্তে ক'র্তে তিনিও যেন স্তব্ধ হিমগিরির রূপ পেয়েছেন—অনন্ত ভাব ও অব্যক্ত ভাষায় ভরা মৌন শান্ত সমাহিত রূপ!

শিল্পী মুকুল দেকে গগনেন্দ্রনাথ পুত্রবৎ স্নেহ ক'র্তেন। ১৩৪৪ সালের পৌষমাসে যখন শয্যাগত হ'ন, মুকুল দে প্রায় প্রত্যহই তাঁকে দেখ্তে যেতেন এবং শয্যাপার্শ্বে বসে নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতিতে এচিং অর্থাৎ তামার ফলকে খোদাই ক'রে মুখটী আঁক্তেন। এতৎসহ মুদ্রিত চিত্রটী গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র দুই মাস আগে অঙ্কিত হয়।

স্যার্ নীলরতনের স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সত্যবাক্, জিতেন্দ্রিয়, মিতাচারী, ধর্ম্মব্রতী,
এ মূর্ত্তি বিমল, শুভ্র হে নীলরতন;
দেশাত্মবোধের ঋষি, সর্ব্বহিত রতবর
সাধনার সাজিয়েছিলে তুমি সিংহাসন!
ধর্ম্মহারা, সত্য-ভয় করে যারা কাপুরুষ
তোমার জীবন-বৃত্তে মনীষী মহান;
মধুমাখা হাসি হেসে তুমি চির-বন্ধুর
সংসার যে কর্ম্মক্ষেত্র করেছ প্রমাণ!
সুখেতে বিগতস্পৃহ, হে দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মন
কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী, হে সবার প্রিয়
দেশের দশের তরে করিয়াছ আত্মত্যাগ
পরার্থে ভুলিয়াছিলে স্বার্থ, ধর্ম্ম-বীর!
হে নীলরতন তুমি অরূপ রতনে চিনে
চিনেছিলে জীবনেতে যাহা চিনিবার;
কর্ম্ম নিয়ে এসেছিলে, কর্ম্ম শেষে গেলে চলে
অন্তর্যামী, কর্ম্মফলে করিয়া বিদায়!
কেঁদে তুমি এসেছিলে সংসারের রঙ্গমঞ্চে
জগজন হেসেছিল তোমার আগমে;
হেসে তুমি চ'লে গেলে আপন আবাসে ফিরে
জনগণ কেঁদে সারা স্মরিয়া তোমায়!

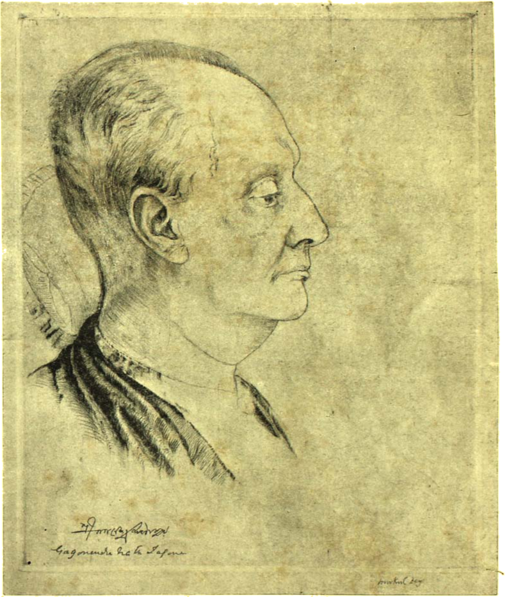

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর———এচিং—তাম্রফলকে খোদিত
শিল্পী—মুকুল দেব অঙ্কিত (ডিসেম্বর ১৯৩১)

বাহির বিশ্ব

মিহির

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তখন সাময়িকভাবে অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করিতেছে। টিউনিসিয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ায় যুরোপে "দ্বিতীয় রণাঙ্গণ"-সৃষ্টির অপরিহার্য্য শর্ত্ত পূর্ণ হইয়াছে। তখন অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে অনতি-বিলম্বে ইঙ্গ-মার্কিন অভিযান আরম্ভ হইবে কি না এবং এই প্রত্যাশিত অভিযান যদি সত্যই আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উহা কোথায় ও কিভাবে আরম্ভ হওয়া সম্ভব—তাহা এখন অনিশ্চিত অনুমানসাপেক্ষ। রুশ রণাঙ্গণে বরফ গলিয়াছে, পথঘাট শুকাইয়াছে। এখন তথায় ময়দানে দুই পক্ষের ৮০ লক্ষ সৈন্য ভীষণতম মারণাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন; যে কোন মুহূর্ত্তে তথায় বিশাল সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে। প্রাচ্য অঞ্চলে হিংস্র জাপানী সর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে; সে কোন্ সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে, কোন্ মুহূর্ত্তে কোথায় ছোবল দিবার জন্য সে তাহার বিষের দাঁতগুলি শানাইতেছে, তাহা এখনও অনিশ্চয়তার গর্ভে। এই কাল সাপের কোমর ভাঙ্গিবার জন্য সম্মিলিত পক্ষের আয়োজনের কথা শুনা গিয়াছে; কিন্তু এই জন্য তাঁহারা কিরূপ ফন্দী আঁটিয়াছেন, তাহা এখনও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

আফ্রিকা হইতে অক্ষশক্তি বিতাড়িত

সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ অক্ষশক্তির কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। গত নভেম্বর মাসে উত্তর পশ্চিম মিশরে এল-আলামীনের রণক্ষেত্রে জার্মান সেনাপতি রোমেল্ প্রথম পরাস্ত হন। তাহার পর ছয় মাস অক্ষশক্তির সৈন্য একরূপ বিনা প্রতিরোধে পশ্চিম অভিমুখে অপসরণ করিয়াছে। লিবিয়ার এল্-আঘেলিয়ায়, দক্ষিণ টিউনিসিয়ার ম্যারেথ লাইনে, মধ্য অঞ্চলে ওয়াদি আকারিতে অক্ষশক্তির সেনাবাহিনী যে সামান্য প্রতিরোধে রত হইয়াছিল, উহা যেন পশ্চাদপসরণের সুবিধা সৃষ্টির জন্য শত্রুকে কিছু কাল নিযুক্ত রাখিবার প্রয়াস মাত্র। অবশেষে উত্তর-পশ্চিম টিউনিসিয়ায় অক্ষশক্তির শেষ প্রতিরোধ-প্রয়াস অকস্মাৎ তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সম্মিলিত পক্ষের সমর-বিশেষজ্ঞগণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন—এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে জার্মাণ সেনাপতি ফন্ আর্নিম্ চরম প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবেন, বিজার্টার সুরক্ষিত ব্যূহ হয়ত দ্বিতীয় সেবাস্তোপলের রূপ পরিগ্রহ করিবে। কিন্তু সকল আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী উত্তর-পশ্চিম টিউনিসিয়া শত্রুমুক্ত করিয়াছে, ফন্ আর্নিম ও ইটালীয় সেনাপতি মেসী দুই লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া বন্দী হইয়াছেন।

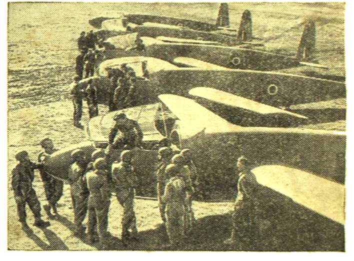

ব্রিটেনের গ্লাইডার রেজিমেন্টের শিক্ষারত নূতন পাইলটদিগকে রয়েল এয়ারফোর্সের উপদেষ্টাগণ কর্তৃক উপদেশ প্রদান

আফ্রিকার যুদ্ধে সাফল্যে প্রত্যক্ষ কৃতিত্ব বৃটিশ সৈন্যের—সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে সংগৃহীত সেনাবাহিনীর। শেষের দিকে মার্কিনী ও ফরাসী সৈন্যও এই কৃতিত্বের ভাগ লইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকায় সাম্প্রতিক যুদ্ধে সাফল্য আনিয়াছে ষ্ট্যালিনগ্রাড্ রক্ষী বীরগণ। মার্শাল্ রোমেল্ এল্ আলামীনে [illegible] সাগ্রহে দক্ষিণ রুশিয়ার দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার আশা—তথায় রুশ সেনার প্রতিরোধ চূর্ণ হইলেই তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করা হইবে এবং তিনি পুনরায় প্রবল বিক্রমে আক্রমণরত হইবেন। কিন্তু দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল—দেখিতে দেখিতে তিন মাস অতিবাহিত হইল; কিন্তু দক্ষিণ রুশিয়ার প্রতিরোধ চূর্ণ হইল না, মার্শাল্ রোমেল্ও প্রয়োজনীয় সৈন্য ও সমরোপকরণ পাইলেন না। এই সুযোগে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী নিজেদের সমাবেশ সম্পূর্ণ করিল, তাহাদের সাহায্যের জন্য নানাস্থান হইতে সেনাদল ছুটিল, আটলান্টিক ডিঙ্গাইয়া সমরোপকরণ আসিল। তাহার পর নভেম্বর মাসে একই সময়ে উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যের অবতরণ এবং মিশরে জেনারেল আলেকজাণ্ডারের প্রবল প্রতি-আক্রমণ। এই আক্রমণ আর প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। হয়ত লিবিয়ায় কোথাও প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা জার্মাণ সমর-নায়কদের ছিল। কিন্তু ফন্ পলাস্ ও তাঁহার তিন লক্ষাধিক সৈন্য ষ্ট্যালিনগ্রাডে ধ্বংস হওয়ায় উত্তর আফ্রিকায় প্রতিরোধের পরিকল্পনা জার্মানকে ত্যাগ করিতে হয়। রুশ প্রতিরোধ শক্তি অটুট রহিয়া গেল; পরবর্ত্তী গ্রীষ্মকালে তাহাকে পুনরায় আঘাত করিতে হইবে। কাজেই, জার্মাণী আর অন্যত্র নূতন করিয়া ব্যাপক যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে পারে না; ষ্ট্যালিনগ্রাডের পর তাহার আর সে শক্তিও বস্তুত ছিল না।

আফ্রিকা হইতে অক্ষশক্তি বিতাড়িত হওয়ায় ভূমধ্য সাগর অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক হইয়াছে। ভূমধ্য সাগরের সমগ্র দক্ষিণ উপকূলে এখন সম্মিলিত পক্ষের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। যে মুহূর্ত্তে অক্ষশক্তি লিবিয়া ও টিউনিসিয়ায়

পোতাশ্রয় ও বিমানক্ষেত্রগুলি যথাসাধ্য নষ্ট করিয়া গেলেও তখন উহাদের দ্রুত সংস্কার হইতেছে। ইহারমধ্যেই সিসিলির দক্ষিণে সমগ্র সমুদ্রাংশে সম্মিলিত পক্ষের বিমানবাহিনীর প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে এবং

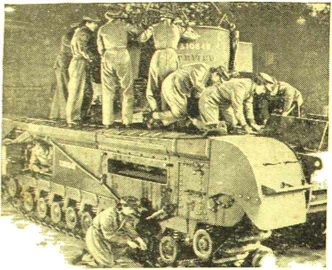

চার্চিল ট্যাঙ্কের কাজে সংযোগ-রত ব্রিটিশ-মহিলাগণ

ইটালিয়ার নিকটবর্তী প্যান্টেলেরিয়া দ্বীপটি শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। সিসিলি ও ঐ দ্বীপ সম্মিলিত পক্ষের অধিকারভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভূমধ্য

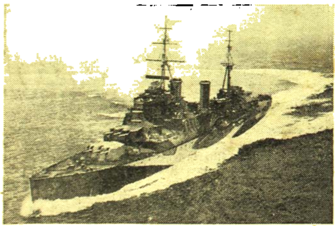

একটি ব্রিটিশ ক্রুজারের বিরাট কর্মভার লইয়া নিরাপদে গন্তব্যস্থানে গমন

সাগর সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারে না বটে, কিন্তু দক্ষিণ উপকূলের পোতাশ্রয় ও বিমানক্ষেত্রগুলি পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করিতে পারিলে বিমানবাহিনীর ও রণপোতের রক্ষণাধীনে সম্মিলিত পক্ষের জাহাজ ভূমধ্য সাগরপথে যাতায়াত করিতে পারিবে। আফ্রিকায় অক্ষশক্তির প্রতিরোধের অবসানে ইহাই আসল লাভ। ইহার ফলে রুশিয়ায় সমরোপকরণ যোগানের পথ সংক্ষেপ হইয়াছে; আক্রমণে সম্মিলিত পক্ষের শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ বাড়িয়াছে।

তাহার পর য়ুরোপে অভিযানের কথা। আফ্রিকার যুদ্ধ শেষ হইলে য়ুরোপে "দ্বিতীয় রণাঙ্গন" সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি আমরা শুনিয়াছি। দক্ষিণ ইটালী, সিসিলি ও সার্ডিনিয়ায় প্রভৃতি সম্মিলিত পক্ষের যেরূপ প্রবল বিমান আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে এই পথে য়ুরোপ অভিযান হইবে বলিয়াই মনে করা সঙ্গত। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ঠিক এই সময় আটলান্টিক পাড়ি দিয়া ওয়াশিংটনে উপস্থিত হইয়াছেন। কাজেই সম্মিলিত পক্ষের বিপুল সামরিক তৎপরতা আসন্ন মনে হইতেছে; য়ুরোপই এই তৎপরতার প্রধান ক্ষেত্র হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল ওয়াশিংটনে এক বিবৃতিতে বিমান-আক্রমণে শত্রুকে পঙ্গু করিবার আশা প্রকাশ করিয়াছেন। বিমান আক্রমণে শত্রুর ক্ষতি সাধন সম্ভব; কিন্তু ইহাতে শত্রু পঙ্গু হইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ইতিপূর্ব্বে জার্মানীতে সর্বপ্রকার বিমানের দ্বারাও আক্রমণ চালিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ব য়ুরোপে জার্মানীর "চাপ" কমে নাই। রুশিয়ার পক্ষ হইতে য়ুরোপে প্রত্যক্ষ অভিযানের দাবীই জানান হইয়াছে; পূর্ব্ব য়ুরোপে অক্ষশক্তির যে দুই শতাধিক ডিভিসন সৈন্য নিযুক্ত, জার্মানীকে তাহার কিয়দংশ পশ্চিম য়ুরোপে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য করাই সোভিয়েট রুশিয়ার দাবী। এখনও য়ুরোপে স্থলপথে অভিযানের কথা চাপা দিয়া যদি বিমান-আক্রমণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলা হয়—"এই দেখ আমরা শত্রুকে কিভাবে আঘাত করিতেছি", তাহা হইলে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে রাজনৈতিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূরীভূত হয় নাই, কারণ য়ুরোপে অভিযানে সামরিক অসুবিধার কথা এখন আর বলা চলে না।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে বিঘ্ন

বস্তুতঃ সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে রাজনৈতিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস এতদিন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির পথে অলঙ্ঘ্য বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। সামরিক অসুবিধা হয়ত তাহার তুলনায় গৌণ। জার্মানীর অধিকৃত য়ুরোপের

বিভিন্ন অঞ্চল শাসনশক্তির লোপে ও বিশৃঙ্খলে "বারুদের স্তূপে" পরিণত হইয়াছে; সামান্য স্ফুলিঙ্গের সংযোগে বিশাল বিস্ফোরণ নিশ্চিত। সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য দক্ষিণ বা পশ্চিম য়ুরোপে আঘাত করিলে সে আঘাত এই স্ফুলিঙ্গের ন্যায়ই কাজ করিবে। এই গণ-বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্মিলিত পক্ষে আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিপ্লবকে সংযত করিয়া গণ-শক্তিকে দাবাইয়া রাখিয়া য়ুরোপে প্রাগ্‌যুদ্ধের ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তনই সম্মিলিত পক্ষের অধিকাংশ রাজনীতিকের উদ্দেশ্য। কি ভাবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, সেই সমস্যার চিন্তাই য়ুরোপে শত্রুকে প্রত্যক্ষ আঘাতের প্রকৃত আয়োজনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। ফ্রান্সের যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা সম্পর্কেই জিরো ও দ্য গলের মতানৈক্য। জেনারেল দ্য গল অবিলম্বে ফ্রান্সের রাজনৈতিক সমস্যাগুলির মীমাংসা চাহেন। কিন্তু জেনারেল জিরো আপাততঃ ঐ সকল সমস্যা চাপা দিতে ইচ্ছুক; কারণ যুদ্ধোত্তর কালে বিপ্লবী বিপক্ষকে দমন করিবার জন্য ভিশির মার্শালদিগের সহযোগিতা-লাভের পথ তিনি সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিতে চাহেন না। বৃটেনে আশ্রিত পোল সরকার ইতিমধ্যে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত বিরোধ বাধাইয়াছেন; এই বিরোধের আশু কারণ যাহাই হউক, প্রকৃত কারণ রুশিয়ার প্রতি সিকোরস্কি র‍্যাক্‌সিম্‌স্কি কোম্পানীর দারুণ অবিশ্বাস। ইহারা বুঝিয়াছে যে, যুদ্ধের পর পোল্যাণ্ডে প্রাগ্‌-যুদ্ধের ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে রুশিয়া সম্মত হইবে না; বস্তুতঃ পোলিশ্‌ ইউক্রেন অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে রুশিয়া স্পষ্টতঃ অসম্মত হইয়াছে। যুগোশ্লাভ সরকার মিহাইলোভিচের সহিত সম্বন্ধ বর্জনে সম্মত নহেন; অথচ সোভিয়েট

করিয়া মিহাইলোভিচের বিরুদ্ধে অক্ষশক্তির সহিত "সহযোগ ষড়যন্ত্রের" অভিযোগ করিয়াছে।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির পথে সমস্যা বিঘ্ন-সৃষ্টি করিয়াছিল বলশেভিক রুশিয়ার প্রতি অবিশ্বাস। অক্ষশক্তি মথিত য়ুরোপের গণ-বিপ্লব রুশিয়ার নিকট উৎসাহ ও সাহায্য পাইবে; রুশিয়ার সাহায্যপুষ্ট আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল হয়ত এই বিপ্লবে নেতৃত্বই করিবে! এই অবিশ্বাসের ফলে সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে রাজনৈতিক সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যাহারা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিয়াছে, তাহারা ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল তথা সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল।

আমেরিকান সৈন্যগণ কর্তৃক জল অতিক্রম করিয়া গুয়াদের নিকটবর্ত্তী একটি দ্বীপে গমন

ব্রিটেনের ষোল বৎসর বয়স্ক বালকগণ কর্তৃক জাতীয় সেবাকার্য্যে যোগদানের জন্য আবেদন দান

এই সকল প্রতিকূল প্রচারকার্য্য দূর করিবার জন্য আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; অতঃপর বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট দলগুলি স্বতন্ত্রভাবে সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করিবে। কম্যুনিষ্ট রাজনীতিজ্ঞদিগের এই সিদ্ধান্তে কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন সমগ্র জগৎই প্রায় ফ্যাসিষ্টবিরোধী যুদ্ধে লিপ্ত; ফ্যাসিষ্টবিরোধী যুদ্ধে জয় লাভই এই সকল দেশের জাতীয় স্বার্থ। আর অন্যদিকে কেবল সোভিয়েট রাষ্ট্রই নহে, সমগ্র বিশ্বের কম্যুনিষ্ট আন্দোলন এখন ফ্যাসিজমের ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর। কাজেই সোভিয়েট রুশিয়ার ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট দলের উদ্দেশ্য এবং অধিকাংশ দেশের জাতীয় স্বার্থ এখন অভিন্ন; ঐ সকল দেশের জাতীয় নীতিই এখন তথাকার কম্যুনিষ্টদিগের অনুসরণীয়। কাজেই আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট দলের পক্ষ হইতে ইঁহাদিগকে নির্দ্দেশ দানের আর প্রয়োজন নাই। দুই চারিটি ফ্যাসিষ্ট দেশের কম্যুনিষ্টগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ; তাঁহাদিগকেও নির্দ্দেশ দান অপ্রয়োজন। এইরূপ অবস্থায় আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অথবা সোভিয়েট রুশিয়ার স্বার্থের কোনরূপ হানি ঘটিবে না; অথচ সোভিয়েট-বিরোধী প্রচার কার্য্যের উপকরণ কমিবে।

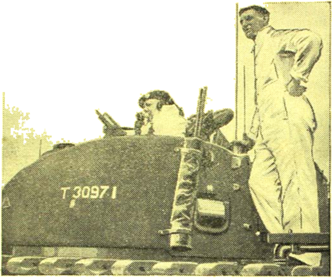

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল কর্ত্তৃক তাঁর নামীয় একটি চর্চিল ট্যাঙ্ক পরিদর্শন

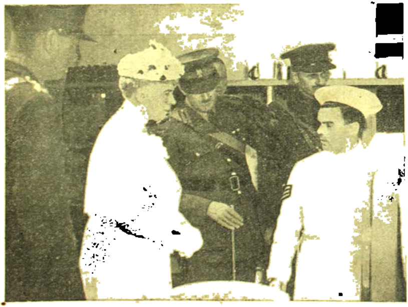

সাম্রাজ্ঞী দেবী কর্ত্তৃক সামরিক রন্ধনশালা পরিদর্শন —অমিত মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

রুশ রণাঙ্গনে আয়োজন

রুশিয়ার দুই হাজার মাইল রণাঙ্গনে ৮০ লক্ষ সৈন্য এখন মুক্তাঙ্গণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত; যে কোন মুহূর্ত্তে তথায় উভয় পক্ষের চরম সংঘর্ষ আরম্ভ হইবে। একই সময় সমগ্র দুই হাজার মাইল রণাঙ্গনে আক্রমণে প্রবৃত্ত হইবার নীতি জার্ম্মাণ সমর-নায়কগণ গত বৎসরই ত্যাগ করিয়াছে। এই বৎসরও তাহারা এই নীতি পুনরায় গ্রহণ করিবে বলিয়া মনে হয় না। এবার প্রধানতঃ দক্ষিণ রুশিয়ায় ককেসাস্ অঞ্চলের উপত্যকা এবং ওরেল্ অঞ্চল হইতে মস্কো অভিমুখে জার্ম্মানীর আক্রমণ আরম্ভ

হওয়া সম্ভব। দক্ষিণ রুশিয়ায় আক্রমণ পরিচালনের জন্যই জার্মান সেনাপতিগণ প্রাণপণ শক্তিতে কুবানের এই পরিখা অঞ্চল আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন; ওরেল অঞ্চলেও রুশিয়ার শীতকালীন আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।

গত শীতকালে সোভিয়েট সেনার প্রতি আক্রমণে জার্মানীর পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলেও তাহার আক্রমণ শক্তি আর নাই ইহা মনে করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। পূর্ব্ব-য়ুরোপে গ্রীষ্মকালীন আক্রমণের শক্তি অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যেই জার্মান সেনানায়কগণ আফ্রিকার রণাঙ্গনে রোমেলের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া দৃঢ় প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হন নাই। আমরা জানি ইতঃপূর্ব্বে জার্মানী যখন পূর্ব্ব য়ুরোপের বিশাল রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল, তখনও সম্মিলিত পক্ষের সম্ভাবিত অভিযান নিবারণের উদ্দেশ্যে পশ্চিম য়ুরোপে তাহার [illegible] ডিভিসন সৈন্য মজুত থাকিত। এখন দক্ষিণ য়ুরোপে অভিযান আশঙ্কা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিরোধকারী সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও জার্মানীর আক্রমণ ক্ষমতা ব্যাহত হইবে না। এমন কি ইটালীতে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণ প্রসারিত হইলেও রুশ প্রতিরোধ চূর্ণ করিবার আশায় জার্মানী ইটালীর কতকাংশ হয়ত সমগ্র ইটালী ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হইবে। জার্মানী জানে—রুশিয়ায় অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধ ও প্রতি আক্রমণের ফলেই যুদ্ধের গতি তাহার প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছে; এই রুশিয়ার প্রতিরোধশক্তি যদি এখনও চূর্ণ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে পুনরায় অনুকূল বায়ু বহিতেও পারে। কাজেই সিসিলি, সার্ডিনিয়া বা দক্ষিণ ইটালীতে বিমান আক্রমণ চালাইয়া, এমন কি ঐ সকল স্থানে সৈন্য অবতারণ করাইয়াও পূর্ব্ব য়ুরোপে জার্মাণীর বেগ হ্রাস করা যাইবে না। আটলান্টিকে সাবমেরিনের তৎপরতা বৃদ্ধি করিয়া এবং দক্ষিণ য়ুরোপে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়া জার্মাণী এই অভিযান-প্রচেষ্টায় বাধা দিতে প্রয়াস করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শেষ বিন্দু শক্তি পূর্ব্ব য়ুরোপে প্রয়োগ করিয়া রুশিয়ার প্রতিরোধশক্তি চূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইবে। জার্মাণ সমর নায়কগণ জানেন—পূর্ব্ব য়ুরোপে অভিযান পরিচালনের উপযোগী আগামী পাঁচটি মাসেই জার্মাণীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে; এইবারই পূর্ব্ব য়ুরোপে তাঁহাদের শেষ আক্রমণ।

সুদূর প্রাচী

জাপানের মনোভাব অত্যন্ত রহস্যবিজড়িত। অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে তাহার ব্যাপক আয়োজনের কথা শ্রুত হইয়াছে; ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে হৃত অঞ্চল পুনরধিকার করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বিমানক্ষেত্রে সে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে; মধ্য চীনেও তাহার সামরিক তৎপরতা প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ অনুমানও করেন যে, জার্মাণীকে পরোক্ষে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে জাপান হয়ত রুশিয়াকে আক্রমণ করিবে। শেষোক্ত অনুমানটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মিঃ চার্চ্চিলের ওয়াশিংটনের বিবৃতিতে জাপানের বিরুদ্ধেও বিমান আক্রমণ পরিচালনের আভাস ছিল ইহা হইতেই উর্ব্বরমস্তিষ্ক সাংবাদিকগণ ধারণা করিয়াছেন—রুশিয়ার পূর্ব্বতম সীমান্তের ঘাঁটিগুলি সম্মিলিত পক্ষকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। এই ধারণাও যুক্তিপ্রসূত নহে। রুশিয়া ও জাপানের সম্পর্কে বলা যাইতে পারে—ইহাদের মধ্যে যে নিরপেক্ষতা চুক্তি আছে, উভয়পক্ষেরই এখন তাহা মানিয়া চলা প্রয়োজন। রুশিয়ার পক্ষে ইহা নূতন শত্রু সৃষ্টির সময় নহে; সম্মিলিত পক্ষের সকল শত্রুকে পরাভূত করিবার দায়িত্ব কি সে একাকী বহন করিবে? আর জাপানের সম্বন্ধে বলা যায়, জার্মাণীর যুদ্ধই জাপানের যুদ্ধ নহে; জার্মাণীর জয় পরাজয়ের দ্বারা জাপানের জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবার সময় আর নাই। মিঃ চার্চ্চিল অবশ্য তাহাই মনে করেন; অক্ষশক্তির সম্পূর্ণ ধ্বংসের পরিকল্পনা রচনা করিতে হইলে এইভাবে চিন্তা করাই স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু জাপানের পক্ষে জার্মাণীর সহিত স্বীয় ভাগ্য গ্রথিত করিবার সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তখন নিজ সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিয়া যুদ্ধে অচল অবস্থা আনয়ন এবং দীর্ঘ কাল অচল অবস্থার ফলে সম্মিলিত পক্ষে সন্ধির আগ্রহ সৃষ্টির জন্য উদ্যোগী হওয়াই জাপানের পক্ষে স্বাভাবিক।

এই নীতি অনুসারে চলিতে হইলে প্রথমে জাপানকে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে সম্মিলিতপক্ষ তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিতে না পারেন। ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া চীনের শক্তি বৃদ্ধি এবং চীনের মধ্য দিয়া জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাত করাই সম্মিলিত পক্ষের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে জাপান ব্রহ্মদেশে ব্যাপক ও শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা করিয়াছে; ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমান্তে যে অঞ্চল সে হারাইয়াছিল, তাহা পুনরধিকার করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বিমান ঘাঁটিগুলিকে সে এখন আঘাত করিতেছে; ঐ অঞ্চলের দুই একটি ঘাঁটী অধিকার করিয়া পূর্ব্ব-ভারতের সমরায়োজনে বিঘ্ন ঘটাইতে প্রয়াসী হওয়াও জাপানের পক্ষে অসম্ভব নহে। সঙ্গে সঙ্গে জাপান চীনের প্রতিও অবহিত হইয়াছে; ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত হইলে যে চুংকিং সরকার সম্মিলিত পক্ষের সাহায্য গ্রহণ করিবেন, ব্রহ্ম-অভিযানের পূর্ব্বেই সেই চুংকিং সরকারকে ছলে ও বলে সম্মিলিত পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করাই জাপানের উদ্দেশ্য।

সম্রাজ্ঞী মেরীর ওয়াই-এম্-সি-এ পরিদর্শন উপলক্ষে চা-পান

—অজিত মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

অষ্ট্রেলিয়াই প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের শেষ ঘাঁটী। এই ঘাঁটিকে শক্তিহীন করিয়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দিক হইতে আপনাকে নিরাপদ করিবার জন্যও জাপানের আগ্রহ স্বাভাবিক। বিশেষতঃ প্রশান্ত মহাসাগর হইতে জাপানের নৌবাহিনী স্থানান্তরিত হইলে তাহার স্বদেশ রক্ষার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হইবে না।

সাময়িকী

নববর্ষ—

[illegible]

খাদ্য সমস্যা—

[illegible]

প্রধান মন্ত্রী খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন

[illegible] হইতে হইতেছে এবং লোক যে ক্রমে এক বেলা না খাইয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইতেছে, তাহা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের খবর [illegible] স্বীকার করিবেন। চাউলের দাম [illegible] ছিল, তখনই [illegible] লোক [illegible] এখন

[illegible] মন্ত্রী মি. তমিজুদ্দীন

[illegible] হইতেছে। এ বিষয়ে [illegible] সম্পূর্ণ নির্বিকার, কারণ তাঁহারা মধ্যে মধ্যে [illegible] চাউল ব্যবসায়ীদের বা চাউলের মূল্য [illegible] কোন ব্যবস্থা করেন নাই। [illegible] চাউল সম্বন্ধে যে [illegible] ঠিক হউক না কেন, বাজারে যে চাউল পাওয়া যাইতেছে না তাহা সকলেই জানেন। মধ্যে বাজারে কিছু [illegible] পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা ধনিকগণ অধিক পরিমাণে [illegible] করিয়া লওয়ায় মধ্যবিত্তগণ এখন আর বাজারে [illegible] পাইতেছেন না। এই ত গেল প্রধান খাদ্যের কথা। চিনি মধ্যে মধ্যে কন্ট্রোল দরে অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া গেলেও মধ্যবিত্তদের পক্ষে তাহা সুলভ বা সহজপ্রাপ্য নহে। কয়লার অভাবের কথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি—কিন্তু এখনও বাজারে আড়াই টাকার কম মণ দরে কয়লা পাওয়া যায় না। কেরোসিন তৈল পাইতে মফঃস্বলের লোকদিগকে কিরূপ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। বর্তমানে বস্ত্র সমস্যাও ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে; গত এক বৎসর কাল লোক অতি অল্প পরিমাণে

বস্ত্র ক্রয় করিয়া অতি কষ্টে দিন চালাইয়াছে—কিন্তু গরীবদের জন্য গভর্ণমেন্ট যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা আজও বাজারে বাহির হইল না! কাজেই সকলকে ১০ টাকা জোড়ার ধুতি ও ১৩ টাকা জোড়ার শাড়ী ক্রয় করিতে হইতেছে। ঐরূপ অধিক মূল্যে বস্ত্র ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া বহু লোক অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় দিনযাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। সে বিষয়ে গভর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন, তাহাও জনসাধারণ জানিতে পারে নাই। আরও কতদিন এইভাবে চলিবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের এইরূপ দারুণ অভাবের ফলে লোক এক বেলা খাইয়া ও অনেক স্থলে না খাইয়া থাকিতে বাধ্য হয়—তাহাতে দেশে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়াছে ও অকালে মানুষ মারা যাইতেছে। দুঃখ যে আজ দেশে কিরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা দেশের ধনী-দরিদ্র, বালক-বৃদ্ধ সকলেই সমভাবে বুঝিতে পারিতেছে। উহার প্রতীকারের কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া লোক নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রেমহরি বর্ম্মন

মন্ত্রী খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জমুদ্দীন হোসেন

গুরুদাস শতবার্ষিকী—

সার গুরুদাস শতবার্ষিকী উৎসব সম্পর্কে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন—"বঙ্গমাতার যে সকল কৃতী সন্তান স্বীয় আদর্শ চরিত্র, অগাধ বিদ্যাবত্তা, দৃঢ় সততা এবং অদম্য স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্য দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ও স্নেহ অর্জ্জন করিয়াছেন তন্মধ্যে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আমাদের বিশেষরূপে স্মরণীয়। প্রগাঢ় পণ্ডিত ও হৃদয়স্পর্শী শিক্ষাদাতা, একাধারে মহান্ আদর্শ ও বাস্তববাদী, শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক, ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, নীতি ও সমাজ গঠিত আদর্শের বিশিষ্ট সাধক ও সেবক সার গুরুদাসের নাম বঙ্গের তথা ভারতের প্রতি গৃহে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বাংলার এই সুসন্তানের জন্ম-শত-বার্ষিকীর স্মৃতিরক্ষা ও তাঁহার চিরপোষিত উক্ত আদর্শের প্রচারকল্পে এক বৎসর কালব্যাপী এই প্রচেষ্টার সর্ব্বত্র এবং

মন্ত্রী মিঃ সাহাবুদ্দীন

যথাসম্ভব ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি-কেন্দ্রে উৎসবের অনুষ্ঠান করা দেশবাসী সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। তদুদ্দেশ্যে সার গুরুদাস শতবার্ষিকী সমিতি উৎসবের একটি কার্যক্রম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বক্তৃতা, বেতারযোগে আলোচনা, সংস্কৃতিক ভাষণ, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, চিত্র প্রদর্শনী, শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই কয়েকটি কার্য্য পরিণত করার মানসে শতবার্ষিকী সমিতি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেশবাসী সকলের নিকট নিবেদন জানাইয়াছেন এবং স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সঙ্ঘ, সভা-সমিতি, পরিষদ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্ব্বপ্রকার আন্তরিক সহানুভূতি ও আনুকূল্য কামনা করিয়াছেন।" দেশবাসী মাত্রেরই এই মহামনীষীর জন্মশত বার্ষিকী উৎসবে প্রাণের পরিচয় প্রদান করা উচিত।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী

রবীন্দ্র জন্ম দিনে উৎসব—

গত ২৫শে বৈশাখ এবার রবিবারে থাকায় দেশের সর্ব্বত্র মহা আড়ম্বরের সহিত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবস উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ দিন সকালে ও সন্ধ্যায় বাঙ্গালার প্রায় প্রতি গ্রামে লোক সভা-সমিতি করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া যাহা আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন, আমরা যদি তাহার সম্যক আলোচনা করি, তাহা হইলে এই মরণোন্মুখ জাতি যে নবজীবনের সন্ধান পাইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আর দেশের এই দারুণ দুর্দিনে জাতি যে তাহাদের জাতীয় কবিকে লইয়া গৌরব করিতে পারিতেছে, তাহাতে তাহার মধ্যে প্রাণের লক্ষণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ সভা-সমিতি করিয়া রবীন্দ্র সাহিত্যের যতই প্রচার হইবে, দেশবাসী ততই শীঘ্র তাহার মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। সে জন্য সভাগুলিতে শুধু বক্তৃতার ব্যবস্থা না করিয়া যত অধিক রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠের ব্যবস্থা হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা।

কাশীধামে সংস্কৃতি সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথ জন্মদিবস উৎসবে সমবেত শিল্পীবৃন্দ

খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপায়—

অধিকতর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন কি উপায়ে করা সম্ভব তদ্বিষয়ে বহরমপুরের ভৈষজ্য বিজ্ঞানের প্রবীণতম অধ্যাপক মিঃ এস্, সিংহ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দ্বারা জানাইয়াছেন যে "খাদ্যদ্রব্য অধিকতর উৎপাদনের জন্য যে প্রচার কার্য্য চালান হইতেছে, তাহা সার্থক করিয়া তোলা কর্ম্মিগণের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক জেলায় প্রচার কার্য্যের জন্য অন্ততঃ পাঁচজন করিয়া কর্মচারী নিযুক্ত করা প্রয়োজন। উক্ত কর্মচারীগণের যতদূর সম্ভব পতিত জমিগুলিতে খাদ্য রোপণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। উন্নততর বীজ এবং সার প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষির উপর অধিকাংশ আবাদী জমিই নির্ভর করে, সুতরাং প্রত্যেক জেলায় এগ্রিকালচারাল

ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত করা প্রয়োজন; ইঁহাদের কাজ হইবে, (১) অনাবৃষ্টি হেতু ফসল যাহাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য স্থানে স্থানে টিউবওয়েল বসাইয়া পাম্প লাগাইয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করা (২) প্লাবনের কবল হইতে আবাদী জমি রক্ষা করিবার জন্য স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়া (৩) স্বাভাবিক অবস্থায় প্রয়োজন হইলে নদী হইতে জল আনাইবারও ব্যবস্থা রাখা।

আমাদের দেশের কৃষিজীবীরা অদৃষ্টবাদী, তাহারা কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং জমিদারগণও এ বিষয়ে অজ্ঞ। সাধারণ ব্যাপারী ও ব্যবসায়ীগণও এ বিষয়ে শিক্ষিত নহেন। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তিগণকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তোলা প্রয়োজন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় দুই মাস অথবা ছয় সপ্তাহ কালের সর্ট কোর্স-এ কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তোলার যে ব্যবস্থা আছে আমাদের দেশেও তাহা অনুসৃত হওয়া উচিত। কৃষি বিষয়ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্থানীয় আবহাওয়া অনুসারে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

আমরা অধ্যাপক সিংহের উপরোক্ত বিবৃতিটির প্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

পরলোকে ডাঃ গোপালচন্দ্র মিত্র—

রায়বাহাদুর ডাঃ গোপালচন্দ্র মিত্র গত ১১ই মে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজ হইতে এল-এম-এস পাশ করিয়া তিনি সরকারী চাকরী করিয়াছিলেন এবং গয়ার প্লেগের সময় তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় তথায় প্লেগ দমন হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে কাজ করার সময় রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং পরে 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইম্পিরিয়াল সেরোলজিষ্টের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হুগলী জেলার সোমরা গ্রামে তাঁহার জন্মভূমি ছিল এবং প্রতি বৎসর পূজার সময় তিনি স্বগ্রামে যাইয়া বস্ত্র বিতরণ করিতেন।

ডাক্তার গোপালচন্দ্র মিত্র

পরলোকে ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার—

খ্যাতনামা চিকিৎসক, প্রবীণ দেশকর্মী ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার গত ১৮ই মে মঙ্গলবার ছোটনাগপুরের গিরিডি সহরে ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি গিরিডিতে বাস করিতেছিলেন।

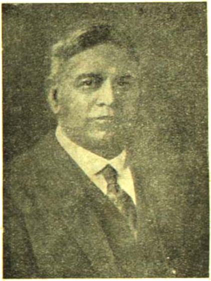

স্যার নীলরতন সরকার

শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রে নহে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি যে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই হইয়া থাকে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন—১৯১৭ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন—১৯২০ সালে তিনি শিক্ষা মিশনে যখন ইউরোপে যান তখন অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে যথাক্রমে ডি-সি-এল ও এল্-এল্-ডি সম্মান-সূচক উপাধি প্রদান করিয়াছিল। তিনি বহুদিন বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টীর ডিন ছিলেন এবং ১৯১৮ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত পোষ্ট গ্রাজুয়েট আর্টস্ বিভাগের ও ১৯২৪ হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি অন্যতম উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। স্বর্গত ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সহযোগে তিনি কলিকাতা মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও

কমিটীর সভাপতি ছিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মানের জন্য ১৯৪২ সালে উক্ত কলেজে তাঁহার নামে এক গবেষণাগার নির্ম্মিত হইয়াছে।

চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার কিরূপ খ্যাতি ছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি দেশীয় চিকিৎসকগণকে সর্ব্বদা উৎসাহ দান করিতেন এবং পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত চিকিৎসকগণ যাহাতে গ্রামে গিয়া চিকিৎসা ব্যবসা করেন, সেজন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম স্থায়ী বাঙ্গালী প্রিন্সিপাল ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমাপ্রসন্ন বসু

চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের ট্রাষ্টী। তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। বহুদিন তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের মুখপত্রের প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

১৯১৮ ও ১৯৩২ সালে তিনি নিখিল ভারত মেডিকেল কনফারেন্সের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং ১৯১৩ হইতে কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের সভাপতি ছিলেন।

জীবনের প্রথমাবধি তিনি রাজনীতিচর্চ্চা করিয়াছেন এবং ১৮৯০ সাল হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯১৯ সালে তিনি অন্যান্য মডারেটদের সহিত কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উদারনীতিক দলে যোগদান করেন নাই। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুরাগী ছিলেন এবং গান্ধীজিও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি আজীবন দেশ-সেবক ছিলেন বটে, কিন্তু কখনও নিজেকে প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। ১৯১১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯১৮ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্যর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

স্যর নীলরতন ব্রাহ্ম ছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মজীবনও অসাধারণ ছিল। সেজন্য জীবনে বহু বিপদের মধ্যেও তিনি স্থির ছিলেন এবং তাঁহার অমায়িক ব্যবহার সর্ব্বদা সকলকে মুগ্ধ করিত।

তিনি দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য নিজ সঞ্চিত বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন কিন্তু ভাগ্যদোষে তাঁহার ব্যবসা সাফল্য লাভ করে নাই। এদেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম চামড়ার ব্যবসা করেন এবং সাবানের কারখানা স্থাপন করেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক হিসাবে এদেশের বহু যুবককে শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বেঙ্গল টেকনিকাল স্কুল ও যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এ বিষয়ে দেশবাসীকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে এবং স্যর নীলরতন এই উভয় প্রতিষ্ঠানের সহিত আজীবন সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৪পরগণা ডায়মণ্ডহারবারের নিকটস্থ নেত্রা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। জয়নগর হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া তিনি ক্যাম্বেল স্কুলে পড়িয়া ডাক্তার হন। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পরে মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে এফ-এ ও বি-এ পাশ করেন। ঐ সময় কিছুকাল তিনি চাতরা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন; পরে ১৮৮৫ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৮৮ সালে এম-বি পরীক্ষা পাশ করেন। পর বৎসর তিনি এম-এ ও এম-ডি উভয় উপাধি লাভ করেন। ১৮৯০ সাল হইতে তিনি কলিকাতায় স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও ৫ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

স্যর নীলরতনের মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনও পূরণ হইবার নহে। তাঁহার মত অনাড়ম্বর, সরল জীবন-যাপন এদেশে ক্রমে দুর্লভ হইয়া আসিতেছে। তিনি নিজ জীবনে যে জনসেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন এদেশে শ্রদ্ধার সহিত অনুসৃত হইবে।

কাজী নজরুল সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৫শে মে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় প্রসিদ্ধকবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। কাজী সাহেব বৎসরাধিককাল রোগে শয্যাগত আছেন। তিনি জাতীয়তাবাদী বলিয়া সভায় বিশেষ ভাবে তাঁহার প্রশংসা করা হইয়াছিল।

বাঙ্গালার পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালার সচিব সংঘের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন—(১) খাঁ বাহাদুর মহম্মদ আলি—প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারী (২) নবাবজাদা নসরুল্লা—স্বরাষ্ট্র বিভাগ (৩) সিরাজউল ইসলাম ও (৪) আবদুল্লা-আল-মামুন—বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ (৫) শ্রীযুক্ত বীরেন রায়—অর্থ, বন ও আবগারী বিভাগ (৬) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—রাজস্ব বিভাগ (৭) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র কুমার—যান বাহন ও পূর্ত্ত বিভাগ (৮) খাঁ বাহাদুর আবদার রহমন—সমবায় ও কৃষি ঋণ বিভাগ (৯) শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মণ্ডল—প্রচার বিভাগ (১০) শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস—কৃষি বিভাগ (১১) খাঁ সাহেব হামিদুদ্দীন আমেদ—স্বায়ত্তশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ (১২) খাঁ

সাহেব আজিজুদ্দীন আমেদ—শিক্ষা বিভাগ (১০) সৈয়দ আবদুল মজিদ—বাণিজ্য, শ্রমিক, শিল্প ও বিচার বিভাগ।

মিঃ ফজলুর রহমান বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রধান হুইপ এবং (১) মোসারাফুদ্দীন আমেদ—(২) ইউসুফ আলি চৌধুরী ও (৩) রায় সাহেব অনুকূলচন্দ্র দাস হুইপ নিযুক্ত হইয়াছেন।

শিল্পী সুশীল মুখোপাধ্যায়—

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের কৃতী ছাত্র, শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর শিষ্য শ্রীমান্ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মাদ্রাজস্থ বিদ্যোদয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। মাদ্রাজে এই ভাবে বাঙ্গালীর নিয়োগ এই প্রথম—কাজেই এই গৌরবে বাঙ্গালী মাত্রেই উৎফুল্ল হইবেন।

শিল্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

শিক্ষাপ্রচারে দান—

কার্শিয়াং মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বুরিমল গোয়েঙ্কা শিক্ষাপ্রসারের জন্য কার্শিয়াংয়ে দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের এক খণ্ড জমী দান করিয়াছেন। ঐ জমীর উপর গৃহনির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল জাজোদিয়া এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। দাতা শতং জীবতু।

বস্ত্র মূল্য নিয়ন্ত্রণ—

কাপড়ের দাম দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ও এ পর্য্যন্ত বাজারে বাহির হয় নাই। কাজেই লোক এক দিকে যেমন ৩৫ টাকা মণে চাউল কিনিতে না পারিয়া অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করিতেছে, তেমনই কাপড়ের অভাবে লোক প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে। গভর্ণমেণ্ট যাহাতে বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেন সে জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত সি, বিজয় রাঘবআচারিয়া, মাধব শ্রীহরি আনে, জয়াকর, কেলকার, সার গোকুলচাঁদ নারাং প্রভৃতি এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। অবশ্য এই আবেদন যে অরণ্যে রোদন—তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এক দিকে অন্ন-বস্ত্রের এইরূপ দারুণ সমস্যার কথা চিন্তা করিয়াই লোক উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। ফল কত ভয়াবহ হইবে কে জানে?

চাউলের দর নির্দ্দেশ—

গত ১৪ই মে তারিখে বাঙ্গালার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রচার করা হইয়াছে—নিয়ন্ত্রিত দোকানসমূহ ও অনুমোদিত বাজারগুলি হইতে সর্ব্ব শ্রেণীর চাল ছয় আনা সের দরে বিক্রয় করা হইবে। চাউলের তিন প্রকার মূল্য তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কয়জন লোকের ভাগ্যে ঐ ছয় আনা দরের চাল জোটে তাহা আমরা জানি না। তবে এ কথা সত্য যে, ঐ আদেশ বলবৎ থাকা সত্বেও বাজারে ৩৫ টাকার কম মণ দরে চাউল পাওয়া যায় না। গরীবের এ কথায় কে কর্ণপাত করিবে?

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার—

মুসলিম লীগের সদস্য ও কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ এ, আর, সিদ্দিকীর সম্পাদিত 'মর্ণিং নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশ, যে "আনন্দবাজার" ও "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার অন্যতম পরিচালক, বর্ত্তমানে আটক বন্দী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রক্তের চাপবৃদ্ধি ও বহুমূত্র রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে অনিদ্রা রোগেও তিনি আক্রান্ত হইতেছেন। তাঁহার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে উক্ত পত্রিকায় যেরূপ সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে অবিলম্বে তাঁহাকে মুক্তিপ্রদান করা সরকারের কর্ত্তব্য।

ম্যাজিক উইজার্ড দেবকুমার

যাদুকর দেবকুমার ঘোষাল

শ্রীমান্ দেবকুমার ঘোষাল মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে "বালক যাদুকর"রূপে উচ্চ যাদুপ্রতিভায় মুগ্ধ করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ এ-কে-ফজলুল হক, বিচারপতি সি, সি, বিশ্বাস, রায় বাহাদুর জলধর সেন, মিঃ বি, এম, সেন প্রভৃতি মণীষীবৃন্দের নিকট হইতে উচ্চ প্রশংসা পত্র ও মূল্যবান পুরস্কারাদি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই তখন ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন "এই বালক একদিন পৃথিবী বিখ্যাত যাদুকর হইবে"। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স বিশ বৎসর। সম্প্রতি তাঁহার ক্রীড়াকৌশল অপূর্ব্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় যাদুকে মৌলিকত্ব প্রদান

১১

করিতে আধুনিক নূতন ঢংয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইনি বিশেষ গবেষণা করিতেছেন। বর্তমানে ইনি পাটবাড়ী লেন, পোঃ আলমবাজার, (২৪ পরগণা) এই ঠিকানায় অবস্থান করিতেছেন।

অপ্রকাশিত গ্রন্থপ্রকাশের উদ্যম—

সম্প্রতি এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, নিখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি পণ্ডিত মাখনলাল চতুর্বেদী মহাশয়কে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া তাঁহার সম ওজনের টাকা মৃত গ্রন্থকারগণের অপ্রকাশিত পুস্তকাবলী প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একটী ধনভাণ্ডার গঠন করিয়া তাহাতে জমা দেওয়া হইয়াছে। বাংলা দেশেও বহু মৃত কবি, সাহিত্যিক ও কথা-শিল্পীর অপ্রকাশিত গ্রন্থ অর্থাভাবে ও নানা কারণে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। অথচ সে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধশালী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। নিখিল ভারত হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলনের অনুপন্থা বাংলা দেশকে উদ্বুদ্ধ করিবে কি?

ঠাকুর প্রাইজ—

নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি রক্ষা সমিতির সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে নোবেল প্রাইজের অনুকরণে ভারতীয় যে কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখককে 'ঠাকুর প্রাইজ' দেওয়া, কবির অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রকাশ এবং কবিবরের জীবনী আলোচনা করিয়া একখানি পুস্তক রচনার সিদ্ধান্ত স্মৃতিরক্ষা সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে ব্যবস্থা করা এবং কয়েকটী বড় সহরে কবির মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপনের জন্য সমিতি কর্তৃক ২০ লক্ষ টাকা সংগ্রহের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। স্মৃতি-রক্ষা সমিতির প্রশংসনীয় উদ্যমে বাংলা তথা ভারতবাসী মাত্রেই গৌরব বোধ করিবেন সন্দেহ নাই।

প্রচারসচিবের বক্তৃতা—

গত ২৩শে মে রবিবার কলিকাতা ভাগীরথী সঙ্ঘের উদ্যোগে ও বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রচার বিভাগের সচিব শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মল্লিক মহাশয়কে একটী চায়ের আসরে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রচার-সচিব বর্তমান খাদ্যদ্রব্য সমস্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে চাউল গম ইত্যাদি আমদানী করিবার জন্য বর্তমান মন্ত্রিসভা যে চেষ্টা করিতেছেন তদ্বিষয়ে উল্লেখ করেন এবং গবর্ণরের শাসনপরিষদের সদস্য স্যার আজিজুল হক এবং জেনারেল মিঃ উডের সহিত সম্প্রতি মন্ত্রীগণের যে আলোচনা হইয়াছে তাহার বিষয়ও উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত মল্লিক বলেন—যানবাহন বিভাগের মন্ত্রী স্যার এডোয়ার্ড বেন্থল যাহাতে মালগাড়ী পাওয়া যায় ও দ্রুত মাল আমদানী করা যায় সে বিষয়ে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

সাতক্ষীরা সাহিত্য-সম্মিলন—

গত ২২শে মে শনিবার খুলনা সাতক্ষীরা জেল লাইব্রেরীর সাহিত্য শাখার উদ্যোগে তথায় একটি সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র রায় সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং সভায় বহু প্রবন্ধ প্রভৃতি পঠিত হইয়াছিল। আবৃত্তি, গান, কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারাও সভা মধুর করা হইয়াছিল। আবৃত্তি ও কবিতার জন্য রৌপ্যপদক প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র দাস প্রভৃতির চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) একটি সদস্য পদ খালি হইলে মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যকে ভোট যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা—

সম্প্রতি কমন্স সভায় সহকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লেমেন্ট এ্যাটলী যুদ্ধে হতাহতের হিসাব দাখিল করিয়া জানান যে, বৃটিশ পক্ষের মোট ৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৯৬ জন নিহত হইয়াছে, ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৭১৯ জন নিখোঁজ হইয়াছে এবং ৮৮ হাজার ২৯৪ জন আহত হইয়াছে।

সীমান্ত প্রদেশে নূতন মন্ত্রি-সভা—

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সম্প্রতি এক নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছেন—(১) সর্দ্দার মোহম্মদ আওরঙ্গজেব খাঁ—প্রধান মন্ত্রী এবং আইন, শৃঙ্খলা ও রাজস্ব বিভাগ (২) সর্দ্দার আবদার রব নিস্তার—অর্থ, চিকিৎসা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ (৩) খান সাহিব জান খাঁ—শিক্ষা, জেল ও ব্যবস্থা বিভাগ (৪) সর্দ্দার অজিত সিং—পূর্ত্ত বিভাগ (৫) রাজা আবদার রহমন—সংবাদ ও দেশোন্নতি বিভাগ। পীর সৈয়দ জালাল, নসরুল্লা খাঁ, রাজা মাসুদের ও মহম্মদ কারানী পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। পঞ্চম সেক্রেটারীর নাম ঠিক হয় নাই।

শহীদ আল্লাবক্স—

গত ১৪ই মে সকালে গুপ্তঘাতকের গুলীতে সিন্ধু প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ও নিখিল-ভারত আজাদ মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি আল্লাবক্স নিহত হইয়াছেন—দেহে গুলী বিদ্ধ হওয়ার ফলেই তাঁহার মৃত্যু হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অপমৃত্যুর পর বহু দিন এরূপ ঘটনা শুনা যায় নাই। মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং সাম্প্রদায়িকতার উপরে থাকিয়া তিনি যেরূপ নির্ভীকভাবে জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপদ্ধতিতে বিরক্ত হইয়া সরকারী খেতাব ত্যাগ করেন ও অবশেষে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যে শিক্ষালাভের সুযোগে বঞ্চিত হইয়াও তিনি এ দেশে দেশসেবার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেশবাসী চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীমাত্রকেই ব্যথিত করিয়াছে।

আশারাম চ্যারিটি ট্রাষ্ট—

দেশবাসীর একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্ত্রের মূল্য সমস্যা যে সময় ক্রমশঃ উৎকট হইয়া উঠে এবং দেশব্যাপী আর্ত্তস্বর ভারত-সচিবের দপ্তর পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলে, তখন পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ কোন সুসঙ্গত উপায় অবলম্বনে সমর্থ হন নাই। অথচ, তৎকালে কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের সম্পূর্ণ শক্তি লইয়া যেভাবে কলিকাতাবাসী দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সহায়তায় প্রবৃত্ত হন, তাহা যেমন বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে প্রশংসার্হ, তেমনই কর্ত্তৃপক্ষেরও শিক্ষণীয়। এ সম্পর্কে আমরা ৩১নং কটন ষ্ট্রীটের বিখ্যাত পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী মেসার্স লক্ষ্মীচাঁদ বৈজনাথের নাম উল্লেখ করিতে পারি। এই বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির কর্ত্তৃপক্ষগণ এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে যেভাবে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তৈয়ারী পুরী তরকারি, আটা এবং বস্ত্রাদি অকাতরে সরবরাহ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন তাহা প্রকৃতপক্ষেই বিস্ময়াবহ। ইঁহাদের সুচিন্তিত কার্য্যপ্রণালী এবং খাদ্য বস্ত্রাদির বণ্টনে সুশৃঙ্খল বিধি ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়া শুধু যে দেশের গুণগ্রাহী নেতৃবৃন্দই মুগ্ধ হইয়াছেন তাহা নহে, কলিকাতার বর্ত্তমান পুলিশ কমিশনার পর্য্যন্ত ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব মেয়র হেমচন্দ্র নস্কর প্রভৃতি কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচাঁদ বৈজনাথের সুলভে বস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির জনহিতৈষণার উৎসটির সহিত পাঠকগণকে পরিচিত করিবার সুযোগ পাইয়া আনন্দবোধ করিতেছি। পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ভিওয়ানি অঞ্চলে বিশিষ্ট মনীষী আশারাম ভিওয়ানিওয়ালা বিস্তৃত ব্যবসায়সূত্রে বহু সদনুষ্ঠানে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচাঁদ ও বৈজনাথ ভ্রাতৃগণ তাঁহারই উপযুক্ত পুত্র এবং বিখ্যাত ব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠাপন্ন। বর্ত্তমান সঙ্কটের অনেক পূর্ব্বে ১৯৩১ অব্দে স্বর্গত পিতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে 'আশারাম চ্যারিটি ট্রাষ্ট' নামে এক বৃহৎ দাতব্য প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ইঁহারা নানা ভাবে স্থানীয় দুঃস্থগণকে অন্নবস্ত্র ঔষধ পথ্যাদি দিয়া, এমন কি চরমাবস্থায় অসহায়গণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পর্য্যন্ত মুক্ত হস্তে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। সুখের বিষয় এই যে, উক্ত সদনুষ্ঠানগুলিকে স্বদেশেই আবদ্ধ না রাখিয়া তাঁহারা কলিকাতার কর্ম্মস্থলে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অসহায় দরিদ্র ও বিপন্ন মধ্যবিত্তগণের জন্য সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মুদ্রিত ছবিগুলি হইতে ইঁহাদের বিভিন্ন সদনুষ্ঠানের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আজ দেশের চরম সঙ্কটকালে দেশবাসীর জটিল অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ইঁহারা অকাতরে যে ভাবে জনসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমাদের মনে হয় পূর্ব্ব হইতে গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইতেন এবং কলিকাতার বিভিন্ন ব্যবসায়ী-সমাজ তথা কাপড়ের কলওয়ালাগণ এই আদর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বহু দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখকষ্ট ও অসুবিধার লাঘব হইতে পারিত।

স্যর আশুতোষ স্মৃতি উৎসব—

গত ২৫শে মে কলিকাতার স্বর্গত পুরুষসিংহ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে সকালে চৌরঙ্গী স্কোয়ারে তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তির নিকট বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

করা হয় ও বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদে বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এক শোক সভা হয়। সার আশুতোষের কর্ম-জীবনের কথা স্মরণ করিয়া আমরা সকলে যাহাতে অনুপ্রাণিত হই, সভায় সেইরূপ প্রার্থনা করা হয়।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচাঁদ বৈজনাথ বাজোরিয়ার পিতা
আশারাম ভিওয়ানীওয়ালা

বীর সাভারকরের সম্বর্দ্ধনা—

হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর সাভারকরের ৬১তম জন্ম দিবস উপলক্ষে গত ২৯ মে পুণায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। মিঃ সাভারকরকে একটী মানপত্র ও ১,২২,২১২৲ টাকার একটী তোড়া উপহার দেওয়া হয়। বম্বে হইতে এতদুপলক্ষে উক্ত টাকা সংগৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত ৬০,০০০৲ টাকা আরও তুলিয়া দেওয়া হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অভিনন্দনের উত্তরে মিঃ সাভারকর বলেন—"পূর্ণ স্বাধীনতাই জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত হিন্দু মহাসভা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিবে।"

নিউট্রিশন কমিটি গঠনের প্রস্তাব—

ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ কে. এস্. রায় একটী বিবৃতি প্রসঙ্গে বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণের উপযুক্ত একটী খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রী-সভাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ইতিমধ্যে সিন্ধু প্রদেশের মন্ত্রীসভা নিউট্রিশন কমিটী গঠন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্ত্তমান খাদ্য সঙ্কটের দিনে নিউট্রিশন কমিটী গঠন করিয়া উপযুক্ত খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা আশাকরি, ডাঃ রায়ের প্রস্তাব মন্ত্রীসভা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়া কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করিবেন।

বিশেষ শিল্প প্রদর্শনী—

বিগত ৯ই হইতে ১৮ই মে পর্য্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। যুদ্ধের ফলে যে সকল প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে—দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উৎসাহে ও চেষ্টায় তাহাদের অভাব এ যাবৎ কতটা পূরণ করা হইয়াছে, কোন্ কোন্ দিক দিয়া এই জাতীয় প্রচেষ্টার অধিকতর প্রসার সম্ভব ও বাঞ্ছনীয়, যুদ্ধোত্তর বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কি করিয়া এই নবজাত শিল্পগুলি আত্মরক্ষা করিতে পারে—এই সকল বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে বহু নূতন শিল্প সম্বন্ধে মূল্যবান নির্দ্দেশ ও তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছিল।

সমাজ ও স্বাস্থ্য-নীতি প্রদর্শনী—

বৎসরাধিকাল হইল বাংলাদেশের অধিবাসীরা যুদ্ধের আওতায় বাস করিতেছে এবং তাহার ফলে খাদ্য সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-নীতি ও জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি সঙ্কট দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিশেষভাবে কলিকাতা সহরের চারি পাশে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সৈন্য আমদানীর জন্য কলিকাতায় পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যানুপাতে অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় এবং গণিকা বৃত্তি লাভজনক হওয়ায় গণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে—সুতরাং গণিকাবৃত্তির অনুচররূপে সংক্রামক যৌনব্যাধিসমূহ প্রসার লাভ করে। প্রায় প্রত্যেক সভ্যদেশেই যৌনব্যাধি নিরাকরণে এবং সমাজে অত্যধিকভাবে দুর্নীতি যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, সেইজন্য

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচাঁদ

রাষ্ট্রের তরফ হইতে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য নহে। কলিকাতা করপোরেশনের প্রচার বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কমার্শিয়াল মিউজিয়মে সমাজ ও স্বাস্থ্য-নীতি প্রদর্শনীটি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছিল। এ দেশে এই ধরণের প্রদর্শনী প্রথম। প্রদর্শনীতে প্রজনন রহস্য, বিবর্তনবাদ, মনুষ্য জীবনে যৌন ধর্মের বিকাশ, যৌন সংযমের সুফল, ব্যাভিচারের বিষময় ফল, সংক্রামক যৌন ব্যাধিসমূহের প্রভাব ও নিবারণের উপায়সমূহ অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে প্রাপ্তবয়স্কগণেরই প্রবেশাধিকার ছিল। ঐ সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

করপোরেশন প্রচার বিভাগ কর্তৃক অনুষ্ঠিত এই সমাজ ও স্বাস্থ্য-নীতি প্রদর্শনী পরিচালনা করিবার জন্য অল-ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ্ হাইজিন এবং পাবলিক্ হেলথের ডাইরেক্টার ডাঃ গ্রাণ্টকে সভাপতি করিয়া একটী পরামর্শ সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই সমিতির মধ্যে বাংলাদেশের অনেক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। একটী প্রস্তাবে এই পরামর্শ সমিতিকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইয়াছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য সমিতি কাজ করিয়া যাইবেন। আমরা জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, করপোরেশনের প্রচার বিভাগের কর্তা শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর চেষ্টাতেই প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল এবং স্থায়ী সমিতির তিনি সম্পাদক।

পুরী বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন—পুরীর ঝুড়ির এক পার্শ্বে লর্ড সিংহ ও অপর পার্শ্বে শ্রীযুত বৈদ্যনাথ

ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব—

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, ডাঃ এম্, আর, জয়াকর, ডাঃ এস্, সিংহ, স্যার চুণীলাল মেটা, রাজা মহেশ্বর দয়াল শেঠ ও স্যার জগদীশ প্রসাদ সম্প্রতি এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করিয়া অবরুদ্ধ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিচারের জন্য নিরপেক্ষ ট্রাইবুন্যাল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ বিশিষ্ট নেতাগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ ট্রাইবুনাল কর্তৃক শুধু মতামত দেশবাসী অবশ্যই আশা করে। কিন্তু সরকারী মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে কি ?

পরলোকে হেমলতা সরকার—

বিশিষ্ট লেখিকা ও দার্জিলিং-এর মহারাণী গার্লস্ স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার গত ২৮শে বৈশাখ কলিকাতা বালিগঞ্জস্থিত ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সরকার স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং শিবপুরের স্বর্গত ডাঃ বিপিনবিহারী সরকারের সহধর্ম্মিণী। তাঁহার লিখিত "নেপালের বঙ্গনারী" ও "ভারতবর্ষের ইতিহাস" নামক পুস্তক দুইখানি সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। "ভারতবর্ষের ইতিহাস" এতদূর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল যে মিসেস্ নাইট কর্তৃক উহা ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল এবং ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাতেও উহার অনুবাদ হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান।

খেলা-ধুলা

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল খেলা ঃ

সেণ্টার ফরওয়ার্ড :

আক্রমণভাগে সেণ্টার ফরওয়ার্ডের দায়িত্ব সব থেকে বেশী তাই তার স্থান সর্ব্বাগ্রে। তার কর্ম্মদক্ষতার উপরই খেলার ভবিষ্যত ফলাফল নির্ভর করছে। সুতরাং তার প্রসঙ্গই প্রথম।

সেণ্টার ফরওয়ার্ডের কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেণ্টার ফরওয়ার্ড হবে দীর্ঘাঙ্গ বলিষ্ঠ নির্ভীক খেলোয়াড়। ফুটবল খেলায় তার ক্ষিপ্রতা, দু পায়ে বল সট করবার দক্ষতা এবং বল ড্রিবলে পারদর্শিতা থাকা চাই। সেণ্টার ফরওয়ার্ডের প্রধান কাজ বিপক্ষ দলের গোলে হানা দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে সে যথাসময়ে আক্রমণভাগের সহযোগীদের বল আদান প্রদান করে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের কাছে নির্ভুল বল পাঠানোর দক্ষতা এবং তাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই বোঝাপড়া রাখা অবশ্য প্রয়োজন। ইনসাইড খেলোয়াড়রা খারাপ খেললে আউট সাইড খেলোয়াড়রাই কেবল তাদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে কিন্তু দুর্ব্বল সেণ্টার ফরওয়ার্ড সমস্ত আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের বিভ্রান্ত করবে। সাধারণত দেখা যায় নিচু শ্রেণীর সেণ্টার ফরওয়ার্ড তার মধ্যিখানের স্থান (Position) ছেড়ে দিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। তার ফলে আক্রমণভাগ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এই শ্রেণীর অনভিজ্ঞ সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে আউট সাইড খেলোয়াড়দের দিকে ছুটতে দেখা যায়। এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে নিজের আক্রমণভাগের ইনসাইড খেলোয়াড়রা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, দলের আউট সাইড খেলোয়াড়দের উপর বিপক্ষ দলের আক্রমণের চাপ বেশী পড়ে। তাছাড়া গোলের মুখ লক্ষ্য করবার সহজ সুবিধা থেকে সেণ্টার ফরওয়ার্ড নিজেকে বঞ্চিত করে। কেবলমাত্র Throw-in করবার সময় বিপক্ষ দলের সেণ্টার হাফের উপর নজর রাখতে গিয়ে এবং বিপক্ষ দলের ব্যাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে Crooked through পাস সংগ্রহের জন্য সেণ্টার ফরওয়ার্ড টাচ লাইনের নিকটবর্ত্তী হতে পারে নচেৎ কোন ক্ষেত্রেই টাচ লাইনের থেকে বেশ অল্প দূরে যাওয়ার তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকে শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়রা এবং সমালোচকরা বলেন, একটা নির্দ্দিষ্ট-সীমানার মধ্যে থেকে সেণ্টার ফরওয়ার্ডের খেলা উচিত। তাঁরা সেই নির্দ্দিষ্ট সীমানার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সেণ্টার ফরওয়ার্ড খেলায় সর্ব্বক্ষণই এই ধারণায় থাকবে তার খেলার নির্দ্দিষ্ট সীমানা আট গজ প্রশস্ত একটি পথ—এই পথটি একদিকের গোলের মুখ থেকে অন্য দিকের গোলপোষ্ট পর্য্যন্ত সরল ভাবে বিস্তারিত। এই নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থেকেই ফুটবল খেলার শিক্ষকেরা সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে খেলতে উপদেশ দেন। খেলার সময় যে কোন দিক থেকেই বলটি তার কাছে আসুক না কেন, সেণ্টার ফরওয়ার্ড বলটিকে এই নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যেই রাখতে চেষ্টা করবে যে পর্য্যন্ত না বলটি পাস বা সট করে দেবার সহজ সুবিধা আসে। সামনে ছুটতে ছুটতে সেণ্টার ফরওয়ার্ড যে কোন পায়ে বলটি সংগ্রহ করবার অভ্যাস করবে। খেলার মাঠের যে কোন দিক থেকে নির্ভুলভাবে বল সংগ্রহ করে নিজের আয়ত্তে আনার দক্ষতা আক্রমণভাগের সকল খেলোয়াড়দেরই থাকা উচিত বিশেষ করে সেণ্টার ফরওয়ার্ডের। বল সংগ্রহে ক্ষিপ্রতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। মনে রাখা উচিত দীর্ঘসূত্রতায় খেলার গতি অন্যদিকে ফিরে যায়। সুযোগ সদ্ব্যবহার করার অভ্যাস খেলোয়াড়দের থাকা চাই। বল সংগ্রহ এবং আদান প্রদানের যা কিছু কৌশল তা রয়েছে ঐ অদ্ভুত পদ চালনার মধ্যেই। ব্যাপার খুবই সহজ বলে মনে হয় কিন্তু ঘটনা ক্ষেত্রে সেণ্টার ফরওয়ার্ডের অতি সাধারণ দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে যে তারা ক্ষিপ্রতা সহকারে হাফ ব্যাকদের পাস নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করতে পারে না কিম্বা বল নিয়ে সামনে দ্রুতবেগে ছুটে যেতে সক্ষম হয় না। দেখা গেছে তাদের পায়ের control না থাকায় বল অস্বাভাবিকভাবে দূরে এগিয়ে বিপক্ষ দলের পায়ে গিয়ে পড়ছে। এই দুর্ব্বলতা থেকে মুক্ত হতে গেলে পায়ের control প্রয়োজন এবং তা অর্জ্জন করা যায় অনুশীলন দ্বারা। মোটামুটি যে কয়েকটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেণ্টার ফরওয়ার্ড আক্রমণের সূচনা করতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

অনেক সময় দেখা গেছে সেণ্টার ফরওয়ার্ড মাঠের মাঝখানে বল পেয়ে সামনে বিপক্ষ দলের সেণ্টার হাফ এবং ব্যাকদ্বয়ের প্রবল প্রতিরোধের ফলে বিশেষ কোন রকমের সুবিধা করে উঠতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে সেণ্টার ফরওয়ার্ডের উচিত টাচ লাইনের দিকে অগ্রসর না হয়ে কিম্বা বল ড্রিবল করে বিপক্ষ দলের সুরক্ষিত রক্ষণব্যূহ ভেদ করবার চেষ্টা না করে বলটিকে লম্বা সট করে কর্ণার ফ্লাগের দিকে যে কোন আউট সাইড খেলোয়াড়কে দিয়ে দেওয়া। এর পরই সেণ্টার ফরওয়ার্ড বিদ্যুৎগতিতে বিপক্ষ দলের

গোল অভিমুখে অগ্রসর হয়ে নিজ দলের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বলটি পেয়েই কোন কালবিলম্ব না করে শট কিম্বা মাথা দিয়ে গোল লক্ষ্য করবে।

কিন্তু সেণ্টার ফরওয়ার্ড যখন দেখবে ব্যাক দুজন এমন ভাবের Position নিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাদের ফাঁকের দিকে Through pass দিলেই প্রতিরোধ করবার সম্ভাবনা বেশী তখন সেণ্টার ফরওয়ার্ড তার দু'জন ইনসাইড খেলোয়াড়ের যে ভাল Position নিয়ে দাঁড়িয়েছে তাকেই বলটি দিবে। ইনসাইড খেলোয়াড় বলটি দিবে আউট সাইডকে আর তৎক্ষণে সেণ্টার ফরওয়ার্ড দ্রুতগতিতে বিপক্ষ দলের গোলের নিকটতম দূরত্বে গিয়ে আউট সাইড খেলোয়াড়ের কাছ থেকে পাস পাবার জন্য অপেক্ষা করবে। কখনও কখনও ইনসাইড খেলোয়াড়রা আউট সাইড খেলোয়াড়দের বল পাস না দিয়ে বলটি দুজনের মাঝ পথ দিয়ে সামনে এগিয়ে দেয় সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে। এই ধরণের পাসের জন্য সেণ্টার ফরওয়ার্ড আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকবে অর্থাৎ অফসাইডে না থেকে নিরাপদ স্থানে এগিয়ে বলটির জন্য অপেক্ষা করবে এবং বলটি পাওয়া মাত্রই গোলের মুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হবে। এক্ষেত্রে দুজন ব্যাক যদি পরস্পর ব্যবধানে থাকে তাহলে সেণ্টার ফরওয়ার্ডের সুবিধা হবে সব থেকে বেশী। তাদের অবস্থানের এই সুযোগে সেণ্টার ফরওয়ার্ড বলটিকে আউট সাইড খেলোয়াড়দের নিরাপদে পাস দিতে পারে আর যদি ব্যাক দু'জন পরস্পর অনেকখানি ব্যবধান নিয়ে থাকে তাহলে সেণ্টার ফরওয়ার্ড নিজেই সেই ব্যবধানের মধ্যে দিয়ে ঢুকে পড়ে গোলের সন্ধান করতে পারে। অবিশ্যি, তার আগে তাকে সেণ্টার হাফকে পরাস্ত করতে হবে। কিন্তু একটা বিষয়ে সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে তাকে নির্দিষ্ট কাল্পনিক পথের উপর দিয়ে সোজা বল নিয়ে গোলের দিকে অগ্রসর হ'তে হবে। যে মুহূর্ত্তে সে টাচ লাইনের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করবে একজন ব্যাক তার দিকে অগ্রসর হবে এবং অপর ব্যাক এগিয়ে গিয়ে গোল রক্ষার যথেষ্ট সময় পাবে।

ইন্সাইড খেলোয়াড়দের Through Pass :

যে কোন একজন ইন্সাইড খেলোয়াড় খুব দ্রুতগামী হ'লে ভিন্ন রকমের Through Pass দেওয়া সম্ভবপর। সেণ্টার ফরওয়ার্ড বলটি ড্রিবল করে কিছুদূর নিয়ে যাবে ব্যাক দু'জনের দিকে; তারপর তাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য ইতস্ততঃ করবে সামনে অগ্রসর হ'তে কিন্তু পরক্ষণেই অতর্কিতে বলটি সোজা এগিয়ে দিবে মাঠের মাঝ পথে। দলের সব থেকে দ্রুতগামী ইন্সাইড পূর্ব থেকেই সেণ্টার ফরওয়ার্ডের এই অভিসন্ধি বুঝতে পেরে ব্যাক Position নেবার পূর্বেই ব্যাককে ঘুরে বলটিকে আয়ত্বে নিবে। সে সময়ে গোলরক্ষক ভিন্ন তাকে বাধা দেবার আর কেউ থাকবে না। বলটি পাস করবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ইন্সাইড দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং যদি 'on side' থাকে তাহলে গোলের সম্ভাবনা থাকবে সব থেকে বেশী। এই পদ্ধতির সঙ্গে সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং ইন্ সাইড খেলোয়াড়ের ভাল ভাবে বোঝা পড়া থাকা প্রয়োজন।

ব্যাক পাশ :

বিপক্ষদলের শক্তিশালী রক্ষণভাগের মধ্যে দিয়ে নিজেই বল নিয়ে যাওয়া কিম্বা অপর ফরওয়ার্ডকে বল পাশ করা সেণ্টার ফরওয়ার্ডের পক্ষে সত্যই অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যদি সে ভাল ড্রিবল করতে না পারে তাহলে বিপক্ষের রক্ষণভাগ ভেদ করার চেষ্টা তার উচিত মোটেই নয়। এই অবস্থায় তার উচিত বলটিকে সেণ্টার হাফকে ব্যাক পাশ করে সামনে এগিয়ে নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করা। কিছুক্ষণের জন্য সেণ্টার হাফ ফরওয়ার্ডের স্থান অধিকার করে বলটি ড্রিবল করে অগ্রসর হবে পাশ করার পূর্বে বিপক্ষের হাফকে সামনে টানবার জন্য। এই কৌশল অবলম্বনে বিপক্ষের রক্ষণভাগ ছত্রভঙ্গ হবে ফলে কোন না কোন একজন খেলোয়াড়কে অরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যাবে। সেই খেলোয়াড়কেই বল পাশ দিয়ে গোল করবার সুযোগ দিতে হবে।

আক্রমণের পদ্ধতি :

একদিকের 'উইং' থেকে অপর দিকের 'উইং'য়ে খেলার গতি দ্রুত পরিবর্ত্তন করবার পারদর্শিতাই সেণ্টার ফরওয়ার্ডের সব থেকে বড় ক্ষমতা।

অনেক সময় দেখা গেছে সেণ্টার ফরওয়ার্ড মাঠের মাঝে বলটি পেল এমন এক উইং থেকে যেখানে বিপক্ষদলের সুদৃঢ় রক্ষণব্যূহ সমবেত হয়েছে। বলটি যেখান থেকে এসেছে সেখানে পুনরায় পাঠানো খুবই সহজ কিন্তু তাতে কোন ভাল ফল পাওয়া যায় না। সেখানে থেকে যদি বলটিকে গোলের মুখে লক্ষ্য করবার কোন উপায় থাকতো তাহলে এ ভাবে বলটিকে মাঠের মাঝে পাঠাতো না। এক্ষেত্রে সেণ্টার ফরওয়ার্ডের কর্ত্তব্য হচ্ছে সময় নষ্ট না করে বলটিকে বিপরীত দিকের উইংয়ে পাঠানো, যেখানে তার দলের দু'জন অপেক্ষা করছে আর তাদের এবং গোলের মাঝপথে মাত্র একজন বিপক্ষের খেলোয়াড় আছে বাধা দিতে। ডান দিকের উইং থেকে বাঁ দিকের উইংয়ে বলটি পাঠানো একেবারেই সহজ কাজ নয়। বিপক্ষদলের সেণ্টার হাফ, বাধা দেবার জন্যে অপেক্ষা করছে তাকে পরাস্ত করবার কৌশল যদি তার জানা না থাকে তাহলে খানিকটা [illegible] করতে হবে।

প্রয়োজনীয় কৌশল :

সেণ্টার হাফকে পরাস্ত করতে কয়েকটা কৌশল রয়েছে। তার মধ্যে সব থেকে এইটি কার্য্যকরী। বলটি নিতে গিয়ে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন সেণ্টার ফরওয়ার্ড চাইছে যেখান থেকে বলটি আসছে সেইখানেই বলটি ফেরৎ দিতে। সেণ্টার হাফ এই উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে এগিয়ে যাবে বলটিকে বাধা দিতে। কিন্তু সেণ্টার ফরওয়ার্ড সেণ্টার হাফের ফিরে আসবার পূর্বেই ক্ষিপ্রগতিতে বলটিকে পাশ দিবে নিজ দলের লেফট উইংকে। এ ছাড়া আর একটি কাজ সে করতে পারে। দলের সেণ্টার হাফকে বলটি দিবে যাতে করে সে নিজ দলের অরক্ষিত উইংকে বল পাঠাতে পারে। কিন্তু এ দুটোর যেটাই করুক না কেন সে যেন বলটি যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পাশ দিবে যেন বিপক্ষ দল পুনরায় সমবেত হয়ে এই সুযোগ ব্যর্থ না করে।

পিছনে ফিরে এসে নিজ দলের রক্ষণভাগকে সাহায্য করা সেন্টার হাফব্যাকের। সেন্টার ফরওয়ার্ড হচ্ছে আক্রমণভাগের প্রধান নেতা। সেই কারণে সে বিপক্ষদলের ব্যাকদ্বয়ের নিকটতর দূরে অবস্থান করবে। এই স্থানে দাঁড়িয়ে সে নিজদলের খেলোয়াড়দের লম্বা পাসগুলি অনায়াসে নিতে পারবে, বিপক্ষদলের সেন্টার হাফের সঙ্গে সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সর্ব্বোপরি সে বিপক্ষদলের ব্যাক দুজনকে পরাস্ত করবার সহজ সুবিধা লাভ করবে। এবং এই স্থানে অবস্থান কালে দলের দু পাশের আউট খেলোয়াড়দের সেন্টারগুলি সহজভাবে নিতে পারবে। সেন্টার ফরওয়ার্ডের উপর আউট সাইড খেলোয়াড়দের আস্থা যেন পূর্ব্বাবধি থাকে নচেৎ তারা যদি এই ধারণায় আসে যে, তাদের সেন্টারগুলি কোন কাজেই লাগাতে পারা যাবে না তাহলে আউট সাইড খেলোয়াড়রা নিজেরাই বারবার গোল দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে স্বার্থপর হয়ে উঠবে; এমন কি নানা বিধ অসুবিধার মধ্যেও গোলে লক্ষ্য করবে।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা বেশ জমে উঠেছে। কোন দল কোন বিভাগে লীগ-চ্যাম্পিয়ানসীপ পাবে এখন থেকে নিশ্চয়তা করে কিছু বলা চলেনা। অনেকের ধারণা ছিল লীগ তালিকায় উঠা-নামা বন্ধ থাকায় খেলায় তেমন প্রতিযোগিতা চলবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে লীগ তালিকায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে তিন চারটি দলের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা চলেছে। লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলা প্রায় শেষ হতে চলেছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অগ্রগামী দলেরও পদস্খলন হতে যেমন দেখা গেছে তেমনি পিছিয়ে পড়া বেশ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দল মাথা তুলেছে। তবে কয়েকটি হারজিৎ দল খেলতে ক্রমশঃ অক্ষম হয়ে পড়েছে, পূর্ব্বের মত লক্ষ্যভ্রষ্ট অবস্থা লীগ তালিকায় কদাচিৎ চোখে পড়ে। আর তাছাড়া এবার ইউরোপীয় দলগুলি পূর্ব্বের চেয়েও অধিক দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, ফলে কারও সুবিধায় তাদের তেমন কিছু খেলার আশা এবার সুদূরপরাহত।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় প্রথমেই মোহনবাগান দলের নাম চোখে পড়ে। তাদের ১১টা খেলায় ১৮ পয়েন্ট হয়েছে। ৭টা খেলা জিত, ৪টে ড্র আর একটাতেও এ পর্য্যন্ত হারেনি। ৪টে গোল খেয়ে ২১টা গোল দিয়েছে। মোহনবাগানের সমর্থক যাঁরা এবছর অস্বাভাবিক হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা আশা করি অনেকখানি খুশী হয়েছেন। আমরাও খুশী হয়েছি এই কারণে যে, এবার একাধিক তরুণ খেলোয়াড় দলে যোগ দিয়েছে এবং খেলায় সাফল্যের পরিচয়ও দিয়েছেন। এই তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে প্রথম বিভাগে খেলবারও সৌভাগ্য অর্জন করেন নি। দলের রক্ষণভাগ শক্তিশালী, আক্রমণ ভাগ সেই তুলনায় আরও উন্নতি করা প্রয়োজন।

লীগের দ্বিতীয় স্থানে কালীঘাট রয়েছে। ১১টা খেলায় তাদের ১৬ পয়েন্ট। তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে এই দলটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পেরেছে। লীগে তারা লীগচ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান দলকে পরাজিত করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে। উপরের দুটি দলের থেকে একটা কম খেলে ১০টা খেলায় তাদের হয়েছে ১৫ পয়েন্ট। লীগে তারা মহমেডান স্পোর্টিং দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই দলটি তাদের নামকরা গোলন্দাজের আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য বিশেষভাবে বঞ্চিত হয়েছে। আক্রমণ এবং রক্ষণভাগ দুই বিভাগের নামকরা খেলোয়াড়রা খেলছেন। লীগ তালিকায় বিশিষ্ট স্থানে এই দলটিকে দেখতে সকলেই চায়। লীগের চতুর্থ স্থানে আছে বি এণ্ড এ রেলওয়ে। ১১টা খেলাতে এই দল কালীঘাটের সঙ্গে সমান ১৬ পয়েন্ট করেছে। মহামেডান স্পোর্টিং ১০টা খেলে ১২ পয়েন্ট করেছে। এ পর্য্যন্ত তারা হেরেছে ৩টে খেলায়—ইষ্টবেঙ্গল, ভবানীপুর ও কালীঘাটের কাছে। দলে পূর্ব্বের নামকরা খেলোয়াড়রা খেলছেন কিন্তু খেলা বেশ জমে উঠছে না। খেলায় খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট কিন্তু একমাত্র কঠোর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার জন্য সুবিধা হচ্ছে না। তবে লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার উপরই সমস্ত নির্ভর করছে। লীগের খেলায় ভবানীপুর দলের নাম মহমেডান দলের সঙ্গে করা যায়। দুই দল সমান খেলে সমান পয়েন্ট পেয়েছে। ভবানীপুর দলের খেলা ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে। লীগে তারা ভাল খেলে মহামেডান দলকে পরাজিত করেছে এটাই তাদের একমাত্র পরিচয় নয়।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকার বর্ত্তমান অবস্থা দেখে এই ধারণা হয় মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, কালীঘাট ও রেলদলের মধ্যে লীগ পাওয়া নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে। মহমেডান অনেক পয়েন্টের ব্যবধানে থাকলেও এদের মধ্যে তার যোগদান মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। কোন কোন দলের শেষ পর্য্যন্ত ভাগ্য বিপর্য্যয় হবে সে খবর জানবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষাই করা যাক। লীগের নিম্ন স্থানে এ পর্য্যন্ত কাষ্টমস কায়েমী হয়ে রয়েছে। রেঞ্জার্সের সঙ্গে তার বাঁচে মরে খণ্ডযুদ্ধ হবে। ইতিমধ্যে রেঞ্জার্স ২-১ গোলে কাষ্টমসকে হারিয়ে অনেকখানি ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। তবে তফাতও খুব বেশী নেই, দু এক পয়েন্টের ব্যবধানে তাদের মধ্যে উঠা নামা চলবেই। একমাত্র ভরসা এই যে, এই উঠা নামায় প্রথম বিভাগ থেকে হটে যেতে কাউকেই হবে না।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

আশু চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস "শেষ দিনগুলি"—৮৲ শ্রীঅর্চনা চক্রবর্তীর "কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ"—৭৲ শ্রীপ্রবোধ সরকারের উপন্যাস "জীবন সৈকত"—২৲ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষের শিশু উপন্যাস "অজকুলের বন্দী"—৸৹ শ্রীনলিনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের "কবির দেশ"—৸৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

কথা কও

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

—✱ বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাসরাজির বিশিষ্ট সমন্বয় ✱—

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত

পাপের ছাপ

জীবনের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন মুখে নূতন সমস্যা যে সংঘর্ষ উপস্থিত করে। দাম—২।০

রাজগী ৩৲
উচ্ছৃঙ্খল স্বামী ও সাধ্বী স্ত্রীর সংঘর্ষের অপূর্ব্ব চিত্র

অভয়ের বিয়ে ২।০
ছায়াচিত্রে রূপায়িত সর্ব্বজনবিদিত উপন্যাস

বিপর্য্যয় ২॥০
প্রগতিবাদিনী তরুণীর ভাগ্য ও বিতৃষ্ণা বিধবার লালসার কথা

শুভা ২৲
অবজ্ঞাতা নারীর জীবনের নূতন অধ্যায়

হারজিত ২৲
দুই বন্ধুর দ্বন্দের সমাধান

তৃপ্তি ২৲
বিপত্নীকের নূতন পত্নীর তৃপ্তি কিসে

শাস্তি ২॥০
স্বামি-স্ত্রীর জটিল ব্যাপারে শাস্তি লভিল কে?

নিষ্কণ্টক ১॥০
মানব-মনের কথা ও কাহিনী

মিলন-পূর্ণিমা ২॥০
মিলনোৎসবের অভিনব রূপ

ললিতের ওকালতী
ওকালতী ব্যাপারে রহস্য-ঘন সমস্যার বিচিত্র আখ্যান।—২।০

তরুণী ভার্য্যা ২৲ খুনের জের ২৲
শেষ পথ ২॥০ বংশধর ২৲ দুষ্টগ্রহ ২৲
অগ্নিসংস্কার ২৲ খেয়ালের খেসারত ২॥০
গ্রামের কথা ২৲ পিচ্ছলপথের শেষে ২৲
কবির মেয়ে (নাটক) ১৲ নারায়ণী (নাটক) ১৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

প্রসিদ্ধ পারিবারিক উপন্যাসরাজি

অনাহূত

গ্রন্থখানির প্রতি চরিত্রটি হুবহু পাঠকের সম্মুখে বাস্তব মানুষের মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়ায়। দাম—দুই টাকা

বধূবরণ ২৲
নারী-জীবনের বেদনার ছবি

গঙ্গা-যমুনা ১।০
সপত্নী-প্রেমের অপরূপ চিত্র

মারণ-মন্ত্র ১॥০
লেখকের শ্রেষ্ঠ কতিপয় বড় গল্পের সুনির্ব্বাচিত সমন্বয়।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সর্ব্বাধিক প্রশংসিত উপন্যাস

হাইফেন

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনপর্ব্বে 'হাইফেন' হলেন কে? দাম—২।০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

বন্ধনী

রাজনীতির পথচারী কতিপয় তরুণ-তরুণীর সময়োপযোগী জীবন পদ্ধতির বাস্তব ছবি। দাম—দেড় টাকা

হংসবলাকা ১৮০
বর্ত্তমান বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নিখুঁত আলেখ্য

পান্থনিবাস ১।০
পান্থনিবাসে যাহাদের জীবন-কাল কাটে, এ চিত্র তাহাদের

আকাশ ও মৃত্তিকা ২।০
বিচিত্র ভঙ্গিতে আকাশ ও মৃত্তিকার দ্বন্দ

গৃহ-কপোতী ২৲
গৃহকপোতীর মত গৃহ রচনার আগ্রহ সংক্রান্ত মনোজ্ঞ উপন্যাস

ক্ষণবসন্ত ১॥০ মধুচক্র ১৲ ময়ূরাক্ষী ১॥০

কেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

কৌতুক-রসাশ্রিত পুস্তকাবলী

হাসজুলী

দেশ বলেন—নামের মত সমস্ত বইখানিতে বেশ নূতনত্ব আছে। দাম—দুই টাকা

বিদ্রোহী তরুণ
নবীন যুগের জটিল সমস্যার সমাধান।
আনন্দবাজার বলেন—লেখকের মুন্সিয়ানা প্রথম কয়টি পাতা পড়িতেই মনকে মুগ্ধ করে। দাম—দেড় টাকা।

অতি বোগাস
বোগাস ব'লে যে নিজেকে ভোগা দিতে চায়। দাম—১॥০

সখের শ্রমিক
ছায়াচিত্রে রূপায়িত বেকার সমস্যার চিত্র। দাম—১॥০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সহরতলী

১ম পর্ব্ব ২।০ ; ২য় পর্ব্ব ২।০

বিংশ শতাব্দীর ধনিক সভ্যতামূলে যে বিষ ভাসিয়া আছে, তাহা নানা আকারে উপন্যাস দুইখানিতে প্রকাশমান।

জননী ২॥০ প্রাগৈতিহাসিক ২৲
সরীসৃপ ১॥০ মিহি ও মোটা কাহিনী ১॥০
অতসী মামী ২॥০ পদ্মানদীর মাঝি ২৲

প্রত্যেক গ্রন্থেই মানবমনের বেদনাময় রূপটি নানা অবয়বে প্রকাশ পাইয়াছে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রেরণার উৎস !

এলোরা অজন্তার অতুলনীয় কীর্তিগুলো [illegible] দিকে তাকিয়ে মনে [illegible] এই অনবদ্য সৃষ্টির অন্তরালে ছিলো যে কোন নারীর প্রেরণা [illegible] সত্ত্বেও আজ আমাদের অন্তরে সে-প্রেরণার স্পর্শ আমরা পাই। সংসারের কত্রী নারীর মাধুর্য জীবনকে আরো বেশি সরস ও মধুর করে তোলবার জন্যে এখনি এক প্রেরণার প্রয়োজন আছে, সে-প্রেরণা চা-ই আমাদের দিতে পারে। [illegible] চা যখন আপনারই মতো কোনো নারীর [illegible] হয়ে ওঠে। ভেবে দেখুন, সারাদিনের কাজ-কর্মের পর আপনার স্বামী খুশী হবেন চায়ের কাপ হাতে পেয়ে, তখন-কি [illegible] আপনাদের জীবন সরস হয়ে ওঠে না? [illegible] এমনি করেই চায়ের ভিতর দিয়ে মধুর করে তুলুন।

★

[illegible] নামক [illegible] নীচে [illegible] পড়ে দেখুন প্রাত্যহিক [illegible] চায়ের স্থান কতো বড়ো। বিনামূল্যে এ [illegible] এই পুস্তিকা পেতে হলে, এই বিজ্ঞাপনটি কেটে আপনার নাম ও ঠিকানা সমেত [illegible] পাঠিয়ে দিন: [illegible] ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন্ বোর্ড, পোস্ট বক্স ২১৭২, কলিকাতা।

ভারতীয় চা

একমাত্র পারিবারিক পানীয়

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

শ্রাবণ—১৩৫০

প্রথম খণ্ড | একত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

মানুষজাতি এত সহস্র বৎসরের জীবনে আজ পর্য্যন্ত তিনটি জিনিষকে মান্য করিতে শিখিয়াছে—গায়ের জোর, টাকার জোর এবং বুদ্ধির জোর। ইহার যে কোনও একটি থাকিলেই প্রাধান্য দাবী করা যায়, যুগপৎ তিনটি থাকিলে কথাই নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে যে যে জাতি সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিয়াছে, এই গুণাবলীরই প্রভাবে। ব্যক্তির ইতিহাস খুঁজিলে মানবেতিহাসে বহুকাল ব্যবধানে এক একটি নূতন রকমের মানুষেরও সন্ধান পাওয়া যায়—যাঁহার দেহে বল নাই, অর্থ নাই, বিদ্যার গৌরব নাই, অথচ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সহস্র সহস্র মানুষের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু এ মানুষের আবির্ভাব সংখ্যায় কম এবং সে অন্য রাজ্যের কথা। সে কথা পরে বলিব।

প্রত্যক্ষ স্থূল দৃষ্টিতে যে তিনটিকে সাধারণ মানুষ লোকসমাজে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি বলিয়া মানে, নারী আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণও সেইদিকেই মনোযোগ দিয়াছেন এবং বর্ত্তমান নারীসমাজে এগুলির প্রতিবন্ধক কোথায় কোথায় ও কি ভাবে তাহা অতিক্রম করা যায়, তাহাই তাঁহাদের বিবেচনার বিষয়।

জীবজগতে সর্ব্বত্রই গায়ের জোর পুরুষশ্রেণীর মধ্যে অধিক। মানুষ-সমাজে, বিশেষতঃ সভ্যসমাজে এই শক্তিপ্রাধান্যকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি পক্ষপাতদুষ্ট সামাজিক প্রথাও এমনভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—যাহা স্ত্রী পুরুষের দৈহিকবলের প্রাকৃতিক তারতম্যকে কৃত্রিমভাবে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কোথাও বা অনাদরে, কোথাও বিধিনিষেধের প্রকোপে নারীর দৈহিক শক্তির স্ফুরণ যুগাবধি খর্ব্ব হইয়া হইয়া বংশগত অভ্যাস ক্রমে দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে। প্রভেদ যতটা নয়, ততটাও মনে হয়। যদি এই সকল কৃত্রিম ব্যবস্থাদি সমাজ হইতে দূর হইয়া যায়, তবে নারীর বর্ত্তমান শক্তিহীনতা কিয়ৎপরিমাণে নিরাকৃত করা যাইতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষ পশ্চাৎপদ, কিন্তু পশ্চিম রাজ্যসমূহে অধুনা নারীর শারীর শক্তির যথোচিত বিকাশের পক্ষে মানুষের সৃষ্ট বাধা ও অন্তরায় নাই, পরন্তু তাহাকে উৎসাহিত করা হইতেছে। হয়তো নারীর শক্তির অনৈসর্গিক পঙ্গুতা ইহাতে ক্রমশঃ ঘুচিয়া যাইবে, আশা করিতে পারি। কিন্তু নৈসর্গিক যে দুর্ব্বলতা, তাহা ঘুচিবার নয়। পুরুষের তুলনায় নারী অপেক্ষাকৃত হীনবল থাকিবেই। সুতরাং প্রাধান্য লাভ করিবার পথে তাহার প্রথম যে অন্তরায়, তাহা অলঙ্ঘনীয়।

দ্বিতীয় বাধা—নারীজাতির আর্থিক দৈন্য, অর্থাৎ অর্থে অধিকারের অভাব। গায়ের জোরকে এখনও মনে মনে পরমমান্য বলিয়া মনে করিলেও সভ্যতার ক্রমাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যসমাজে ইহার রূপান্তর ঘটিয়াছে। হিটলারের কামান গর্জনে

সোৎসাহে বাহবা জানাইলেও, সৈন্যদলের কুচকাওয়াজের ধ্বনিতে বুক ফুলিয়া উঠিলেও, ভদ্র মানুষ এখন প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে, বা পরিবারে পরিবারে প্রত্যক্ষভাবে হাতাহাতি লাঠালাঠি করিতে লজ্জা পায়। কথায় অবাধ্য বা অপ্রিয়বাদিনী হইলেই স্ত্রীকে ঠেঙানোর কাহিনী বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে নাই বলিলেও হয়। স্বামী, পিতা বা ভ্রাতার হস্তে কেশাকর্ষণের বিভীষিকা আমাদের সভ্য নারীসমাজে কমিয়া গিয়াছে। তাই আজ তাহার কাছে সবচেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে আর্থিক অক্ষমতা ও পরমুখাপেক্ষিতার বেদনা। অর্থস্বাচ্ছন্দ্যে কেমন করিয়া পুরুষের সমকক্ষ হওয়া যায়, এই প্রশ্নটিই পৃথিবীর বৈশ্যযুগে আজ নারীর প্রধান প্রশ্ন। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাই একমাত্র প্রশ্ন। মার্ক্সীয় মতবাদ বর্ত্তমান জগতে ভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গীর এক নূতন বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। মানুষের যাবতীয় সমস্যা, যাবতীয় ক্রমাভিব্যক্তির ব্যাখ্যা একমাত্র অর্থনৈতিক পরিবেষ্টন ও ধনোৎপাদননীতির মধ্যে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে এবং এই দৃষ্টিতে যাঁহারা জগৎ ও সমাজকে দেখিতেছেন, তাঁহাদের কাছে নারীসমস্যাও এই সর্ব্বব্যাপক সমস্যারই একটি অঙ্গ মাত্র। তাহাই যদি হয় তবে সামাজিক ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টননীতির পরিবর্ত্তনের মধ্যে ও নারীর আর্থিক প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তাঁহারা পুরুষনারীসম্পর্কিত সকল জটিলতার সমাধান খুঁজিবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। মোটের উপর মার্কসবাদী কিংবা অ-মার্কসবাদী প্রত্যেক নারী আজ স্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছেন যে, অর্থের অক্ষমতা তাহার জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিকে চারিদিক হইতে নির্ম্মমভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং সম্মানে বাঁচিতে হইলে এ অক্ষমতা তাহাকে দূর করিতে হইবে। নিজের স্বাধীন রুচি আকাঙ্ক্ষা ও বৃত্তির পরিপূরণের কথা দূরে থাক, মানুষের একান্ত অপরিহার্য্য গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্তও তাহাকে আজীবন পুরুষের প্রসাদের ভিখারী হইয়া থাকিতে হইবে এই বোধ বংশানুক্রমে নারীর মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে কি শোচনীয় অস্বাচ্ছন্দ্য নারীকে জাতিগতভাবে দুরারোগ্য ব্যাধির মত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, অধিকাংশ লোকই তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য-সমাজ শিক্ষা ও সভ্যতায় বর্ত্তমান ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক অগ্রসর; তাই সেখানকার মহিলা-সমাজও অর্থের অধিকারে ও উপার্জ্জনের সুযোগে আমাদের মেয়েদের চেয়ে অনেক সৌভাগ্যবতী। কিন্তু তথাপি পুরুষে নারীতে অধিকার ও সুযোগের তারতম্য তাহাদের সমাজেও এখনও যথেষ্ট আছে এবং নারীসমস্যা সেখানেও প্রখর। মার্কসপন্থী রুশসমাজে তারতম্য সমূলে উৎপাটিত করিবার অপূর্ব্ব প্রয়াস পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহার প্রচেষ্টা শ্রদ্ধাসহকারে অনুধাবন করিবার বিষয়।

অর্থস্বাতন্ত্র্য নারীকে দিতে হইবে সাব্যস্ত হইল। কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাম্য কেমন করিয়া দেওয়া যায়, দেখা যাক্। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যে সব অন্তরায় নারীর উপার্জ্জনের পথ বন্ধ করিয়াছে, সেগুলিকে আইনপ্রণয়ন ও লোকমতের পরিবর্ত্তন দ্বারা সংশোধিত করা যাইতে পারে। কিন্তু নারীর পক্ষে জীবিকার্জ্জনের পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করা হইলেও সকল নারীর পক্ষে তাহা গ্রহণ করা সম্ভবপর অথবা সকলের পক্ষে উপার্জ্জন বাধ্যতামূলক করা ন্যায়সঙ্গত হইবে কিনা, ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে যে পরিবারপ্রথা প্রচলিত আছে, নর ও নারী উভয়ে মিলিয়া সংসারের কাজগুলি নির্ব্বাহ করিবার যে রীতি চলিয়া আসিতেছে তাহার সুশৃঙ্খলার জন্য একটি সুষ্ঠু শ্রমবিভাগের প্রয়োজন আছে এবং ইহারই প্রয়োজনে পুরুষ উপার্জ্জনপ্রচেষ্টায় ও নারী গৃহকর্ম্মের দায়িত্বের মধ্যে আত্মনিবেশ করিয়াছে। দুইজনের কর্ম্মক্ষেত্র অবশেষে দুই চরমদিকে ধাবিত হওয়ার ফলে বর্ত্তমানে সমাজ যতই কদাকাররূপ ধারণ করুক না কেন, এই সাংসারিক শ্রমবিভাগের পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি পরিস্ফুট আছে। সুতরাং পরিবারপ্রথা যতকাল বজায় থাকিবে, ততকাল গৃহাভ্যন্তরের একটি গুরুতর দায়িত্ব নারীর স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং পুরুষের উপার্জ্জনশ্রমের চেয়ে এ দায়িত্বভার কম শ্রমসাপেক্ষ নয়। উপার্জ্জনক্ষেত্রে সময় সময় ছুটি মেলে, কিন্তু অপরিহার্য্য গৃহকর্ম্মগুলির ছুটিও নাই। এতদুপরি যদি নারীকে আপন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অথবা স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উপার্জ্জনপ্রচেষ্টায় অন্যত্র ছুটিতে হয়, তবে ঘর ও বাহির উভয় ভার সামলাইতে যাইয়া তাহার শক্তির উপরে অন্যায়ভাবে দ্বিগুণ চাপ পড়িবে। সমাজের পক্ষে এ দাবী করা অন্যায়, ও নারীর নিজের পক্ষ হইতে এ দাবী নিজেরই লোকসান। যে সব মহিলা বিবাহ করিয়া সংসারাবদ্ধ হইবেন না, তাঁহারা পুরুষেরই মত বাহিরের ক্ষেত্রে উপার্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিবেন। কিন্তু পরিবারবদ্ধ বিবাহিতা নারীদের জন্য এ ব্যবস্থা খাটে না। অর্থের স্বাধীনতা তাঁহাদের প্রত্যেককে দিতে হইবে, কিন্তু তাহা তাঁহাকে অন্যত্র উপার্জ্জনে বাধ্য করিয়া নয়, যে শ্রম তিনি সংসারের জন্য, তথা সমাজেরই জন্য ব্যয় করিতেছেন, তাহারই ন্যায্য পারিশ্রমিক বাবদ। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাইতে পারে, যে-মহিলাকে অবলম্বন করিয়া পুরুষ সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পুত্রকন্যাদি পরিজন-প্রতিপালনের ভার যাঁহাকে অর্পণ করিলেন, তিনি স্বামীর সমস্ত উপার্জ্জন ও সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের সম্পূর্ণ অধিকার আইনতঃ লাভ করিবেন, স্বামীর মৃত্যুর পরে নহে জীবিত কালেই; বর্ত্তমান ব্যবহারে যেমন স্বামী স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাত্র দায়ী থাকেন, অর্থের স্বত্ব কপর্দ্দকমাত্রও স্ত্রীতে বর্ত্তে না, সেরূপ অধিকারের কথা নয়। যে অধিকারে স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাংশ স্বোপার্জ্জিত অর্থের মত স্বেচ্ছাক্রমে ব্যয়িত করিতে পারেন, সেইরূপ প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট অধিকার। স্বামীর করুণার দান অথবা আদরের দান নয়, সংসারের কার্য্যসম্পাদনের মূল্য হিসাবে স্ত্রীর উপার্জ্জিত পাওনা। এরূপ ব্যবস্থায় নারীর উপর অন্যায়ভাবে দ্বিগুণ পরিশ্রম দাবী করারও প্রয়োজন হয় না, অথচ নারীর আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান পুরাপুরি বজায় থাকে।

অবশ্য যদি পরিবারপ্রথা থাকে। যদি পরিবারের বন্ধন সমাজ হইতে টুটিয়া যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি শুধু আপন আপন ব্যবস্থার জন্যই দায়ী থাকে, তাহা হইলে নারীও পুরুষের সমানভাবে সমান ক্ষেত্রে উপার্জ্জনের উদ্যোগ করিতে পারিবেন এবং তাহাই সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। অলসভাবে বসিয়া বসিয়া পরগাছার জীবন যাপন করিবার অধিকার কাহারও নাই। যদি সে অধিকার পাওয়াও যায়, তাহাতে নিজেরই অসম্মান। প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা—সমাজের মধ্যে পরিবারপ্রথা থাকিলে মঙ্গল, কি না

থাকিলে মঙ্গল, সে প্রশ্ন গভীর চিন্তাসাপেক্ষ। নারী জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে ইহার কোনটি শ্রেয়ঃকর, নারী সমাজকে স্বয়ং তাহা ধীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। কিন্তু যে সিদ্ধান্তই গৃহীত হউক, নারীর আর্থিক স্বাধীনতা উভয় ব্যবস্থাতেই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। সমাজের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া অর্থের অক্ষমতাহেতু নারীজীবনের যে দ্বিতীয় গ্লানি তাহা নিরসন করা যাইতে পারে।

প্রতিপত্তির তৃতীয় সোপান—বুদ্ধির উৎকর্ষ, অর্থাৎ দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, কবিত্বে, রাষ্ট্রে, যে কোনও ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিভার পরিচয়।—জগতের ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া যাই, দেশ কাল নির্বিশেষে অতিমানব চোখে পড়ে, বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে এক একটি দীপ্তিমান জ্যোতিষ্কের মত তাহারা এক একটি দিগন্ত আলো করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা সেখানে সবই পুরুষ। কদাচিৎ এক আধটি মহিমাময়ী নারীর দীপ্তিও চোখে আসে। কিন্তু পুরুষের তুলনায় তাঁহারা বড়ই মুষ্টিমেয়। আদিকাল ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া একটি গার্গী, একটি মেরী কুরী খুঁজিয়া পাই। কিন্তু প্লেটো, আরিষ্টটল্, কাণ্ট, হেগেল, পিথাগোরস্, গ্যালীলিও, নিউটন্, আইনষ্টাইন, সেক্সপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ, মার্ক্স, লেনিন্, গান্ধী, র‍্যাফায়েল, লিওনার্দো দ ভিঞ্চি, বীটোফেন আদি পুরুষ মনীষীর নামের তালিকা যে খাতার পর খাতা ভর্ত্তি করিয়া ফেলে! সংশয় জাগিতে পারে, নারীর মানসিক শক্তি ও দীপ্তি কি গায়ের জোরের মতই পুরুষের তুলনায় এত কম? অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মেই কম? বলা শক্ত। এ অতি জটিল প্রশ্ন। যে সুযোগ ও অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা পুরুষজাতি আদিমকাল হইতে লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং নারীজাতি আবহমান কাল হইতে যাহাতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে তাহা যদি বিপরীত প্রচার হইত, তবে ফল কি হইত, সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। হয়তো জগদাকাশে সপ্তর্ষির পাশে একটিমাত্র অরুন্ধতী না থাকিয়া সপ্ত অরুন্ধতীই বিরাজমানা থাকিতেন। পরিবেষ্টন মানুষের অভিব্যক্তির একটি প্রচণ্ড নিয়ামক। পরিবেষ্টনের সুকৌশল পরিবর্ত্তনের প্রভাবে জীবজাতি নূতন জাতিতে পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হইতে পারে, একটি দুইটি মানসিক বৃত্তির অপমৃত্যু আর বিচিত্র কি? খুব সম্ভবতঃ নারীজাতির পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছে। নতুবা যে দুই চারিটি জ্যোতির্ম্ময়ী তারকা মানবসভ্যতার বুকে নারীকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মনস্বিতা পর্য্যালোচনা করিয়া একথা স্বীকার করিতে কোনমতেই সাহস হয় না যে, নারীর মানসিক শক্তি পুরুষের চেয়ে স্বভাবতঃ ন্যূন। অতএব বর্ত্তমান যুগের নারীজাতিকে যদি পুরুষের সমান মনীষার পরিচয় দিতে হয়, তবে সেই সব কৃত্রিম অন্তরায়কে সর্ব্বতোভাবে উচ্ছেদ করিতে হইবে যাহা এতকাল তাহার উন্মেষকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু বাধাগুলি সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা যায় কিনা, বিবেচনার বিষয়। কতকগুলি অন্তরায় আমাদের বর্ত্তমান পরিবারপ্রথার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে এবং একটি বাধা প্রাকৃতিক। পরিবারের কর্ত্তব্যভারগুলি যেভাবে নারী পুরুষের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে, তাহাতে পুরুষের পক্ষে একাগ্র ও একনিষ্ঠ হইয়া স্বীয় সাধনায় আত্মনিবেশ করার সুযোগ অব্যাহত, কিন্তু নারীর পক্ষে সহস্র ব্যাঘাত। 'গৃহকর্ম্ম' কথাটি শুনিতে অতি তুচ্ছ; কিন্তু এই তুচ্ছ দায়িত্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্রজাল নারীর মনোযোগকে প্রতিনিয়ত চারিদিকে ইতস্ততঃ জড়াইয়া রাখিতে প্রয়াস পায়, অনন্যমনা হইয়া দিবসরাত্রি বর্ত্তমান ধ্যানাগারে অভিনিবিষ্ট থাকিবার সুযোগ তাঁহার আদৌ নাই। যদি পরিবারপ্রথা লুপ্ত হয়, তাহা হইলে নারীর সুযোগ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী মিলিবে। কিন্তু সকল সুযোগ লাভ করিলেও মাতৃত্বসম্পর্কিত যে দায়িত্বটুকু প্রাকৃতিক নিয়মে নারীর স্কন্ধে ন্যস্ত, তাহাতেও তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার পক্ষে পুরুষের তুলনায় যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটাইবে। সুতরাং নারীর প্রতিভা সমানই থাকা সত্ত্বেও পুরুষের সমান সুযোগ সকল নারী পাইবেন না। কাজেই বুদ্ধিবিকাশের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সমকক্ষতা নারীজাতির পক্ষে ব্যাপকভাবে আশা করা যায় না।

বিশ্লেষণে দাঁড়াইল এই যে—যে-তিনটি গুণের অধিকারী হইলে বর্ত্তমান জগতে মানুষ বা জাতি প্রতিষ্ঠা পায়, তাহার মধ্যে অর্থগৌরব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বলে নারী আয়ত্ত করিতে পারে, বুদ্ধিগৌরব সুযোগের অভাবে অপেক্ষাকৃত কম দেখাইবার সম্ভাবনা এবং দেহগৌরবে পুরুষের সমকক্ষ কোনকালেই হইতে পারে না। সুতরাং সকল কৃত্রিম অন্তরায়কে ছেদন করিয়া নারীজাতি যখন তাহার ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ লাভ করিল, তখনও সে সমাজের বক্ষে পুরুষের সমান প্রতিষ্ঠা পাইবার দাবী করিতে পারিবে বলিয়া আশা কম দেখি। মানুষ তুলনায় মাপিয়া দেখিবে স্ত্রী-জাতি পুরুষজাতি হইতে সর্ব্বসাকল্যে কমতায় খাটো। মহিলাকুলের মধ্য হইতে যদি কোনও ব্যক্তিবিশেষ সুযোগের অনুকূলতায় আপন মনীষা দ্বারা, কর্ম্ম-কুশলতা দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত করিতে পারেন, তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী হইবেন সুনিশ্চিত। অতীতেও এ শ্রদ্ধা বিশেষ বিশেষ নারী পাইয়া আসিয়াছেন, ইহাকে সভ্যজগতে কেহ ঠেকাইতে পারে না। কিন্তু জাতিগতভাবে নারীজাতিকে ইহাকে সভ্যজগতে কেহ ঠেকাইতে পারে না। কিন্তু জাতিগতভাবে নারীজাতিকে পুরুষজাতির সমান সম্মানের চক্ষে দেখিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ মানুষ খুঁজিয়া পাইবে না। সৌজন্যের খাতিরে বা মহত্ত্বের বশে, পুরুষ সমাজ নারীকে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পাত্রী বলিয়া অনেকসময় নির্দ্দেশিত করিয়াছে বটে, এমন কি 'দেবী' আখ্যায় আপ্যায়িত করিতেও অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে নারীর দৈন্যবোধ ঘুচে নাই, বাস্তব আচরণে সম্মান সে পায় নাই, বড় বড় বাক্য সভার পুস্তকেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; কারণ পুরুষ ও নারী উভয়েই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছে—নারী বস্তুতঃ কোনও শক্তিতেই পুরুষের চেয়ে বড় নয়। স্তুতিবাদ তাই ফাঁকা হইয়া পড়ে।

কিন্তু উপরোক্ত বিশ্লেষণে নারীর আপেক্ষিক অক্ষমতা প্রতিপন্ন হইল বলিয়া পুরুষসমাজের পক্ষে গর্ব্বোৎফুল্ল অথবা নারীসমাজের পক্ষে নিরুৎসুক হইবার কোনও কারণ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যে বিশ্লেষণ আমরা করিয়াছি তাহা অকাট্য বটে, কিন্তু তেমনই আবার অসম্পূর্ণও বটে। মানবসমাজে শ্রদ্ধা প্রতিপত্তি লাভ করিবার যে উপকরণ তিনটি আলোচনা করিলাম, তাহাই সব নহে, অতিরিক্ত আরও একটি আছে পৃথিবীর সভ্যতার স্তর বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কতখানি উন্নীত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণ মানুষের মনে উহা ছাড়া আর কোনও মাপকাঠির কথা উদিত হয় না। যেহেতু, অর্থের ও বুদ্ধির শক্তির অতীত

আরও যে একটি প্রবলতর অমোঘ শক্তি মানুষের উপাদানে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা মানুষের চোখে এখনও তেমনভাবে পড়ে নাই। ক্ষণে ক্ষণে ব্যক্তিবিশেষের জীবনে সে শক্তির জ্যোতি যখন ঠিকরাইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহাকে কেহ অবহেলা করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহাকে মনে করিয়াছে—ব্যতিক্রম। তাই উহাকে সমাজ-সংগঠনের মধ্যে যথাযোগ্য মূল্য দেয় নাই। কিন্তু ইতিহাসের বিবর্ত্তনের গতি সেইদিকে।

তাহা মানবজনের ভালোবাসা এবং এই ভালোবাসা জাতিগতভাবে নারীর বিশেষ সম্পদ। প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন নারী দৈহিকবলে পুরুষের চেয়ে হীন, তেমনই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রেমের শক্তিতে সে পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহার দৈহিক ন্যূনতার ক্ষতিপূরণ ইহা দ্বারা যথেষ্টের বেশী হইয়া রহিয়াছে। দেহের শক্তি এখনও মানুষের মন অনেকখানি আচ্ছন্ন করিয়া আছে সত্য, কিন্তু বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তাহার আধিপত্য সূক্ষ্মতর বৃত্তিগুলির দ্বারা খর্ব্ব হইয়া চলিয়াছে। আজ আসিয়া ঠেকিয়াছে বুদ্ধিবৃত্তিতে, সর্ব্বশেষ আসিবে প্রেম—"the greatest thing on earth." প্রেমের মাধুর্য্য আদিকাল হইতে মানুষ আনন্দে অনুভব করিয়াছে, কিন্তু তাহার অভ্যুদয়ের শক্তিকে স্বীকার করে নাই। সেখানে আজও সংশয়। ভালোবাসার সর্ব্বজয়ী প্রতিভা এখনও পর্য্যন্ত একমাত্র কাব্যে ছাড়া বাস্তবে অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত হইবার দিন আসে নাই। কিন্তু আসিবে এবং সেই শুভদিনটি যত নিকটে টানিয়া আনিতে পারিব, ততই নারীজাতির প্রতিষ্ঠার দিন নিকটতর হইবে। নারী আন্দোলনকারিণী-গণের মনোযোগ ও উদ্যোগ সেদিকে নিয়োজিত হইয়াছে কিনা জানি না।

'প্রেম'—কথাটির মধ্যে অনেক গোলযোগ আছে। সনাতনীগণ উৎফুল্ল হইয়া বলিবেন, 'এই কথাই তো আমরা চিরদিন বলিয়া আসিয়াছি, নারীজীবনের একমাত্র সম্বল প্রেম। ইহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া তাহারা পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যায় কেন?' নারীগণ বলিবেন, 'ভালোবাসিয়াই তো আসিয়াছি বরাবর। তাহাতে তো প্রতিষ্ঠা পাইলাম না, বরং বন্ধন আরও শক্ত করিয়া চাপিয়াছে।'—কিন্তু এ প্রেম সে-প্রেম নয়। পুরুষের পায়ের তলায় বসিয়া তোষামোদ করা ও তাহাকে ভুলাইবার জন্য লীলায়িত কলার যে অভ্যাসটি 'নারীর প্রেম' নামে সনাতনীর কাছে বাহবা পাইয়া আসিয়াছে তাহার কথা বলিতেছি না। তাহা একদিকে প্রবলের কাছে দুর্ব্বলের তোষামোদ, অপরদিকে নরনারীর চিরন্তন দৈহক্ষুধা। ইহাতে শ্রদ্ধা পাইবার মত মহৎ কিছুই নাই, বরঞ্চ লজ্জায় মাথা নত করিতে পারে। মনের দিক্ হইতে এই দুই প্রবৃত্তিই নারীকে পুরুষের কাছে এতকাল নাগপাশের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

নারী যখন যাহাকে প্রেম মনে করিয়া নিজের সর্ব্বস্ব তাহাতে বিলাইয়া বসে, জীবনের সকল মহতী প্রেরণাকে রুদ্ধ করিয়া উহারই একাগ্র অনুশীলন করে, তাহাও বিকৃত। তাহাতে শক্তি নাই, গৌরবও নাই। পুরুষের সোহাগের কণা পাইবার জন্য ব্যাকুল প্রত্যাশায় বসিয়া থাকা, সামান্যমাত্র ব্যতিক্রমে অভিমানে অশ্রুনদে উথলিয়া উঠা, স্বামীপুত্রপরিজনের তুচ্ছতম অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাঁদিয়া কাটিয়া সারা হওয়া ও পদে পদে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাদের গতি প্রতিহত করা—ইহার নাম প্রেম নয়, অক্ষমতা ও দৈন্যের চরম লক্ষণ, একপ্রকার মানসিক উত্তেজনা।

এই যে দুই প্রকারের ভালোবাসা, ইহাই মূলতঃ পুরুষ সমাজের কাছে নারীকে ছোট করিয়াছে। পুরুষ এ ভালোবাসায় আরাম পায় সত্য, কিন্তু মনে মনে ইহাকে অবজ্ঞা করে। শ্রদ্ধা তো দূরের কথা, নারীকে সে প্রকৃত ভালোবাসিতেও পারে নাই, করুণা করিয়াছে মাত্র। কোমল অসহায় জীব, পুরুষকে না হইলে চলে না, বড় দুঃখ পায়—অতএব দাও একটু আদর, সহ কর একটু আবদার!—নারীর প্রেমের এই পরিণতি নারীজাতির পক্ষে ধিক্কারের বিষয়। কিন্তু প্রেমের যে অভিব্যক্তি সে দেখাইতেছে, তাহাতে ইহার অতিরিক্ত পুরস্কার বা প্রাপ্যও তাহার নাই।

যে প্রেম নারীজাতিকে গৌরব দান করিবে, সে প্রেম এরূপ নয়। কিন্তু তাহার বীজ নারীজাতির প্রাকৃতিক উপাদানে মিশিয়া আছে এবং তাহার দৈহিক রূপটিকে পর্য্যন্ত মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার অন্তরাত্মায় যে স্নিগ্ধজ্যোতি শুধু পুরুষের প্রতি নয়, জগতের যাবতীয় পদার্থের প্রতি মধু বিকীরণ করে, অপরের দুঃখে যাহা করুণায় নিজেকে বিতরণ করাইয়া দেয় এবং আপনি গভীরতম দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করিবার শক্তি জোগায়, তাহাই তাহার প্রেম। এই অস্ফুট বৃত্তিটিকে যথোপযুক্ত পথে না বাড়াইয়া নারী বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। জ্ঞান বর্জ্জন করিয়া, বীর্য্য বর্জ্জন করিয়া, নারী কেবল প্রেমকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে, অথচ তাহার স্বরূপ জানে নাই। জানে নাই যে সকল আত্মপ্রত্যয় ও জ্ঞানের ভিত্তিতে না দাঁড়াইলে প্রকৃত প্রেমের পরিপোষণ হওয়া অসম্ভব। অন্তরের মধ্যে যে একটি অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধতার আলো নারী অনুভব করে, অন্তর প্লাবন করিয়া যাহা নিজের বাহিরে চারিদিকে বিস্তারলাভ করিতে চায়, বুঝিতে পারে নাই যে ইহা সেই আলোক, যে আলোকের শক্তিতে মণ্ডিত হইয়া আসিয়াছেন ঈশা, বুদ্ধ, গান্ধী। নিজের অজ্ঞানতায়, পুরুষের মিথ্যা তুলনায়, পরিবেষ্টনের অবৈধ চাপে সব পঙ্কিল করিয়া ফেলিয়াছে। তাই যাহা তাহাকে শক্তিময়ী করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে পারিত, তাহাই তাহাকে শৃঙ্খলিতা ও হীনা করিয়াছে।

নারীজাতি যদি এই যথার্থ প্রেমকে নিজের অন্তর হইতে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে পারে, তবে তাহার জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টি পরিবর্তিত হইবে। যে প্রেম সত্যাগ্রহের ভিত্তি, যাহাকে পল্ বলিয়াছেন, "Though I speak with the tongues of men and of angels but have not love, I am become as a sounding brass, or a tinkling cymbal," সে প্রেমকে মানবজাতি বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় পূজাই করিতে বাধ্য হয়, অবজ্ঞায় উড়াইতে পারে নাই। অবজ্ঞা করিয়াছে শুধু অক্ষম নারীর আদুরী-পনাকে।

অবশ্য এমন অবাস্তব কল্পনা করি না যে, প্রত্যেক নারী এক একটি খৃষ্ট অথবা বুদ্ধ হইয়া উঠিবেন। পুরুষের মধ্যেও প্রত্যেক পুরুষ নিউটন, সেক্সপিয়ার অথবা নেপোলিয়ন হন না। কিন্তু ঐ শ্রেণীর মনীষিবৃন্দের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা অধিক। তেমনই যদি ভবিষ্যতের যুগে দেখা যায়, বুদ্ধসন্নিভ মহামানব নারীজাতির মধ্য হইতেই অধিক সংখ্যায় আবির্ভূতা হইতেছেন, তবে মানুষ-সমাজ নারীজাতিকে তাহার প্রাপ্য সিংহাসন স্বেচ্ছায় আপনি দিতে

বাধ্য হইবে। শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম চাটিয়া চিন্তিয়া, বিবাদ করিয়া আদায় করিতে হইবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয়, ইতিহাস খুঁজিয়া আজ পর্য্যন্ত প্রেমের রাজ্যেও বুদ্ধ চৈতন্যের সমকক্ষ বিরাট্ মহামানবী একটিও দেখি নাই।

ইহার কারণও অবশ্য আছে। যে উচ্চাঙ্গের প্রেমের কথা বলিতেছি, তাহার অধিকারী হইতে হইলে মেরুদণ্ডের প্রচণ্ড সবলতার প্রয়োজন, স্বীয় কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়া দরকার। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে স্বাধীনতা আগাগোড়া খর্ব্ব হইয়া আসিলে এই বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না। এই কারণে নারীর জীবন এরূপ প্রেমের বিকাশ দেখাইবার অনুকূল-ভূমি এযাবৎ কোথাও পায় নাই। পরন্তু পুরাকাল হইতে অসংখ্য কৃত্রিম বন্ধনে তাহার সকল স্বাধীন চিন্তা, গতি ও স্বকীয়তাকে স্তব্ধ হইতে হইয়াছে। কাজেই তাহার অন্তরের নিভৃত যে বস্তুটি এক মহৎ ঐশ্বর্য্যে পরিণত হইতে পারিত, তাহা বিপরীত দিকে মোচড় খাইয়া বিকলরূপ ধরিয়াছে।

নারী যদি আজ সত্য সত্যই স্বপ্রতিষ্ঠার আহ্বান শুনিতে পাইয়া থাকে, তবে এই শৃঙ্খলগুলিকে ভাঙিয়া ফেলা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তাহার স্বচ্ছন্দ বিকাশ যাহাতে কোথাও প্রতিহত না হইতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমান সমাজের সকল কদর্য্য প্রথাকে মৌলিকভাবে উৎপাটিত করিয়া তবে এই সর্ব্বোত্তম পদার্থ প্রেমকে লাভ করার আশা রাখিতে পারিবে এবং ইহাই অবশেষে তাহাকে সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। দুইটি সত্য পাশাপাশি তাহার মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিকূল পরিবেষ্টন তাহার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত হইতে দিতেছে না; অপর পক্ষে, নিজের প্রেমাত্মক ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিবার আন্তরিক উদ্যম না করিলে পরিবেষ্টন পরিবর্ত্তিত হইলেও সে চিরদিন খাটোই থাকিবে। কোথায় আপনার ত্রুটি, কোথায় আপনার শক্তিকেন্দ্র—উভয়দিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া নারী আন্দোলনের নেত্রীগণ সমস্যাটির প্রতি এইভাবে মনোনিবেশ করিলে যথাযোগ্য সমাধান হইবার সম্ভাবনা।

ভাংচি

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ষ্টেশন হইতে গ্রাম অনেকটা দূর, কাছাকাছি কোথাও বসতির চিহ্নমাত্র নাই, শুধু মাঠ আর ধানের ক্ষেত। দূর বনান্তরালে দুটি একটি মাত্র সাদা বাড়ী ও খড়ের চালা ষ্টেশন হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, অথচ গ্রাম বেশ বর্দ্ধিষ্ণু; অনেকখানি দূর বলিয়াই তাহার আয়তন এখান হইতে চোখে পড়ে না।

কিন্তু ষ্টেশনের কাছে একেবারেই কিছু নাই বলিলে ভুল বলা হইবে। ষ্টেশনের গোটা দুই কোয়ার্টার আছে, একটা পাকা বাঁধান ইঁদারা আছে, আর আছে একটি মাত্র চালার দুইটি দোকান। অপেক্ষাকৃত যেটি বড়—সেটিতে চা, ডাব, কেক-বিস্কুট হইতে সুরু করিয়া তেলে ভাজা ও ঘিয়ে ভাজা খাবার, কিছু কিছু মনোহারী জিনিষ, এমন কি ডিম ও আলু পটল পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। আর ছোটটিতে পান বিড়ির দোকান দেয় আশু পণ্ডিত।

আশু যে পণ্ডিত কি হিসাবে আখ্যা পাইল তাহা বোধ করি স্বয়ং অন্তর্য্যামীরও অনুমান করা শক্ত। তবে পণ্ডিত না হইলেও সময় বিশেষে পুরোহিতের কাজ সে করে এবং প্রয়োজন হইলে কুলাচার্য্যেরও। গ্রামে পুরোহিত বা কুলাচার্য্য আরও আছে সুতরাং প্রায়-নিরক্ষর আশুর পক্ষে শুধু ঐ কাজের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা-অর্জ্জন সম্ভব নয়, সেই জন্যই বাধ্য হইয়া তাহাকে বিড়ির দোকান দিতে হইয়াছে, এই তিনটি বৃত্তি জড়াইয়া কোনমতে তাহার জীবনধারণের খরচাটা ওঠে।

তাই সেদিন পাঁচটার ট্রেনের সময় শ্রীশ মুখুজ্জেকে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া তাহারই দোকানের সামনে গতি মন্থর করিতে দেখিয়া আশু উল্লসিত হইয়া উঠিল। এক লাফ দিয়া দোকান হইতে নামিয়া ভাঙা টুলটা কোঁচার খুঁট দিয়া ঝাড়িয়া দিয়া কহিল, বসুন বসুন বড়বাবু।

শ্রীশবাবুর এক হাতে ছিল প্রকাণ্ড বাজারের পুঁটুলি আর এক হাতে ছাতা, ইলিস মাছ ও কিসের একটা ঠোঙ্গা; সুতরাং তিনি বসিলেন, কহিলেন, আর বসব না পণ্ডিত, তুমিই শোন—আমার ছেলেটার কি করলে?

আশু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল, চেষ্টা ত করছি বাবু, ভালো মেয়ে যে পাই না। যা-তা ত আর আপনাকে গছিয়ে দিতে পারি না!

শ্রীশবাবু কহিলেন, না না। আমার স্বঘরের বাড়ী, পণ নষ্ট আমি করব না কিছুতেই, তাতে ছেলে চিরকাল আইবুড়ো থাকে তাও ভাল।

শ্রীশবাবু চুপ করিলেন। আশু ঠিক কী বলা উচিত ভাবিয়া পাইল না, শুধু বোকার মত হাসিতে হাসিতে কহিল, তাইত, তাইত! আপনাদের কি যে-সে বাড়ী!

শ্রীশবাবু বলিলেন, শোন এখন যা বলতে এসেছি। জোগ্রামে একটা নাকি সুন্দর মেয়ে আছে, আমাদের পাল্টি ঘর, শাণ্ডিল্য গোত্র—সব ঠিক ঠিক মিলে গেছে। সবাই বলছে মেয়ে সাক্ষাৎ পরী। একবার দেখে আসতে পারো?···জানি ত আর বরের বাপ হয়ে যেচে যেতে পারি না। তুমি যেন এমনি গেছ মেয়ের খবর পেয়ে, হাতে অনেক ছেলে আছে তাই—তারপর কথায় কথায় আমাদের কথা তুলবে। তখন একদিন গিয়ে দেখে আসব, বুঝলে না? তাতে মনে হবে যে তুমিই আমাকে জোর ক'রে ডেকে নিয়ে গেছ।

তারপর অর্থপূর্ণ ভাবে একটু হাসিয়া কহিলেন, ও পক্ষ থেকেও তাতে তোমার দু'পয়সা পাওয়া হবে, বুঝলে না?

আশু ভাল রকমই বুঝিল এবং আরও বিনীতভাবে হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

শ্রীশবাবু কহিলেন, তাহ'লে তুমি কালই দুপুরের গাড়ীতে চলে যাও, খবর নিয়ে এসো—গোপাল চক্রবর্ত্তী মেয়ের বাপের নাম, কলকাতায় বড় ডাকঘরে কাজ করে, বাড়ী খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না। কাল ছুটি আছে, চক্রবর্ত্তীকেও বাড়ীতে পাবে বোধ হয়।

আশু কহিল, যে আজ্ঞে, কালই যাবো।

শ্রীশবাবু পুঁটলিটা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া পকেট হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন; বলিলেন, তোমার যাওয়া-আসার খরচা সাত আনা, আর এক আনা চায়ের খরচা—পুরোই দিলুম।

আশু পরের দিনই কৌগ্রাম যাত্রা করিল। গোপাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীও খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইল না। কিন্তু গোলমাল বাধাইলেন চক্রবর্ত্তী নিজে। কহিলেন, ওসব ঘটক-টটকের কাজ নয় ঠাকুর। কত ঘটকই এল, আর কত ঘটকই গেল। মিছিমিছি হাঙ্গামা।

আশু ক্ষুণ্ণ হইল। একটু যেন উষ্ণভাবেই কহিল, ঘটক ঢের দেখেছেন বটে কিন্তু আশু পণ্ডিতকে দেখেন নি। হাতে পাত্তর না থাকলে সে মেয়ের বাপের কাছে আসে না।

গোপাল চক্রবর্ত্তী কহিলেন, পাত্তরের অভাব নেই বাংলা দেশে তা আমি জানি। অভাব হচ্ছে আমার টাকার, পয়সা আমি একটিও দিতে পারব না, সাফ কথা। এর পরেও আমার কাজ করতে চাও?

আশু কহিল, টাকাও খরচা করবেন না আবার মেজাজও দেখাবেন? এ বেশ নয়।

তাহার পর বিনা নিমন্ত্রণেই দাওয়ার উপর জাঁকিয়া বসিয়া কহিল, সে যাকগে, ব্রাহ্মণ সন্তানকে এখন এক ঘটি জল খাওয়াবেন, না পুকুরে যেতে হবে?

গোপাল এবার লজ্জিত হইলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে দুটি চিঁড়ের মোয়া ও এক ঘটি জল নিজেই আনিয়া দিলেন, চাকরকে বলিলেন তামাক সাজিতে।

জলপান শেষ করিয়া সহসা আশু যেন ধমক্ দিয়া উঠিল, কিন্তু পয়সা খরচই বা করবেন না কেন? বড় চাকুরী ত করেন শুনলুম।

গোপাল ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, এ খবরটি আবার কে দিলে?

যে মেয়ের খবর দিলে, সেই ওটাও দিয়েছে—

গোপাল মৃদু হাসিয়া কহিল, সেই ঠিক, একটু ভুল খবর দিয়েছে। বড় ডাকঘরে কাজ করি বটে, কিন্তু বড় চাকরী করিনে। যাই হোক্—সে আর বাজের হিসেবে দরকার নেই এখন। একেবারে বিনা পয়সায় পাবো ত বেশ—

আশু যেন বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল, মনে মনে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল, তাইত, শক্তিচরণের মুখুজ্জেদের ছেলেটা চারটে পাশও করেছে আবার সরকারী চাকরীও করে, পাত্তর হিসেবে কাষ্ট কেলাস বটে তবে একেবারে শুধু হাত ওখানে মুখে উঠবে না। গোপালপুরের শশী গাঙ্গুলীর ছেলে কোন্ কলেজে যেন মাষ্টারী করে, তারও একটু খাঁই আছে—হয়েছে। আমাদের গাঁয়েই ত রয়েছে। কাজের লোক কিনা, তাই একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। শিবির মুখুজ্জের ছেলে ত রয়েছে। হাঁ বাবু, মেয়েটা আপনার দেখতে কেমন বলুন দেখি?

গোপাল চক্রবর্ত্তী খোঁচা না দিয়া কথা বলিতে পারেন না। কহিলেন, আমার খবর যেখান থেকে পেলে সেখানে কিছু শোনোনি? না, না শুনেই দুপুর রোদে এতদূরে ছুটে এসেছ? মেয়ে আমার দেখতে ভালই—

আগেকার খোঁচাটা গায়ে না মাখিয়া আশু যেন লাফাইয়া উঠিল, ব্যাস্ তা যদি হয় তাহ'লে ত আর কথাই নেই। শিবির মুখুজ্জের ধনুক ভাঙ্গা পণ—ঘর থেকে খরচা ক'রে তা'র ছেলের বৌ আনতে হয় তাও সই, মোদ্দা কুচ্ছিৎ মেয়ে ঘরে আনবে না কিছুতেই। ওরা সুন্দরের বংশ কিনা! ছেলে, বাবু, যাকে বলে ময়ূর ছাড়া কার্ত্তিক। যেমন রূপ, তেমনি গুণ—

কি করে তোমার শিবির মুখুজ্জের ছেলে?

কী করে? বলেন কি বাবু, চারটে পাশ করেছে সে ছেলে, অনার না কি বলে তাও পেয়েছে, এখন শুধু বাপের অফিসে ঢুকতে যা দেরী।

গোপাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাপ কি করেন?

সরকারী চাকরী করে গো, কাষ্টম অফিসে, বেশ মোটা মাইনে। ওর বাপ ছিল সেকালের গ্রেহাম কোম্পানীর মুৎসুদ্দি, পয়সার অভাব নেই ওদের।

গোপাল একটুখানি যেন ভাবিয়া বলিলেন, শিবির কি তাহ'লে প্রাণধন মুখুজ্জের ছেলে?

ঠিক ধরেছেন বাবু! দেশের আদ্ধেক জমিই ত ওদের। জমিদার আছেন নামে।

গোপাল জবাব দিলেন, শিবিরের ভাই আমার সঙ্গে পড়ত, সে মারা গেছে। এখন চিনতে পারলুম। যাক্ দেখ যদি লাগাতে পারো। মোদ্দা একেবারে শুধু হাতে কি ওরা ছেলে ছাড়বে। মুখে অনেকেই বলে প্রথমে, কাজের বেলা এসে আড়াই হাজার টাকার ফর্দ দেয়—

কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া আশু কহিল, ছাড়বে বাবু, ওরা সে রকম লোক নয়। তবে মেয়ে সুন্দর হওয়া চাই, তা ব'লে রাখছি।

গোপাল কহিলেন, মেয়ে আমার পছন্দ হবে, এ গ্যারান্টি দিতে পারি।

আশু একবার মাথাটা চুলকাইয়া কহিল, সে দেখুন প্রায় সব মেয়ের বাপই বলে, কিন্তু কাজের বেলা দেখি অন্যরকম।

খোঁচাটা বুঝিয়া গোপাল কহিলেন, বেশ ত, সে সন্দেহে আর কাজ কি, মেয়েকে আমি এখনই ডাকছি—নিজে চোখে একবার দেখে যাও, যেমন আছে তেমনি আসবে, সাজ-গোজ কিছুই ত করা নেই—দেখেই যাও একবার। তুমি একে বুড়ো মানুষ তায় ঘটক—তোমার কাছে বেরোবে তাতে আর লজ্জা কি?

তাহার পরই হাঁক দিলেন, মাধু, ওমা মাধু রে!…ও মাধু—

কী বাবা? বলিয়া মাধবীলতা একেবারে বাহিরের দাওয়ায় বাহির হইয়া আসিল। কি একটা ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল, হাতে একটা ময়লা কাপড়ের টুকরা ন্যাতার মত পাকানো, আঁচলের কাপড়টা কোমরে জড়ানো, যাহাকে বলে গাছ-কোমর বাঁধা।

আর কেহ নাই মনে করিয়া সে ঐ ভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছিল; এখন বাবার সঙ্গে অপরিচিত লোককে দেখিয়া লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি ন্যাকড়াটা ফেলিয়া দিয়া আঁচলের কাপড়টা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

আশুর কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি ছিলনা। সে মুগ্ধ অপলক নেত্রে মেয়েটিকে দেখিতেছিল, চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়স তাহার, প্রথম কৈশোরের অঞ্জন লাগিয়াছে তাহার সারা দেহে। স্নিগ্ধ গৌরবর্ণ, ডাগাডাগা চোখ, তুলি দিয়া আঁকার মত ভ্রূ, পাত্‌লা ঠোঁটের মধ্যে মুক্তার মত দাঁত, সুগঠিত শ্রী দেহ। পিঠ ঢাকিয়া পড়িয়াছে একরাশ প্রতিমার মত ঢেউ খেলানো কালো চুল, তাহারই দুই একটি সুন্দর ললাটে স্বেদবিন্দুর সহিত জড়াইয়া গিয়া সে মুখকে আরও লাবণ্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।···আশু আর চোখ ফিরাইতে পারিল না।

কী বাবা?

আর একবার মাধুরী প্রশ্ন করিল। গোপাল কহিলেন, কিছু না, তুই যা।

মেয়েটি একরকম ছুটিয়াই পলাইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন, দেখলে ত ঠাকুর? চলবে এ মেয়ে?

আশুর এতক্ষণে চৈতন্য ফিরিয়াছিল। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এ মেয়ে চলবে না, বলেন কি?···সাক্ষাৎ উমা যেন মহাদেবের জন্য অপেক্ষা করছেন! আমাদের সুহাসের সঙ্গে খাসা মানাবে।

গোপাল কহিলেন, দেখ, যদি লাগাতে পারো—আমার বরাত আর তোমার হাত যশ!

আশু ছাতাটি বগলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি এখনই যাচ্ছি। যাতে রবিবার দেখতে আসে তারই বন্দোবস্ত ক'রে ফেলি—নোদা বাবু, আমার বিদেয়টা মোটা পাবো ত?

গোপাল হাসিয়া অভয় দিলেন।

ট্রেণ হইতে নামিয়া আশু সোজা শ্রীশবাবুর বাড়ী উপস্থিত হইল। পাঁচশ' বিড়ি আর কয়েক খিলি পান সুধীরের দোকানে দেওয়া আছে, তাছাড়া সেটা ছুটির দিন, ষ্টেশন অঞ্চলে খরিদ্দারের ভীড় কম। সুতরাং দোকান খোলার বিশেষ তাড়া ছিলনা।

শ্রীশবাবু তাহার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন, সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, কেমন দেখলে পণ্ডিত? চলবে?

আশু বসিয়া পড়িয়া ছাতটাতেই মুখটা মুছিয়া কহিল, এখন আমার বখশীসটার ব্যবস্থা করুন দেখি আগে, তারপর অন্য কথা। আমি কিন্তু একশ' টাকার কম ছাড়ছিনে।

শ্রীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাসিয়া কহিলেন, বখশীষ ত আমারই পাওনা দরকার হে, আমিইত সন্ধান আনলুম।···যাক্‌গে, তার জন্যে আটকাবে না, এখন মেয়ে কেমন দেখলে তাই বলো।

আশু জবাব দিল, সে মেয়ে যে কেমন দেখতে তা আপনাকে বোঝাতে পারবনা বড়বাবু, আমার ত মনে হ'ল সাক্ষাৎ দুর্গো ঠাকরুণ চালচিত্তির থেকে নেমে এলেন, ঠিক তেমনি রূপ! আমাদের সুহাসের সঙ্গে যা মানাবে, যেন হর-পার্ব্বতী মিলন।

শ্রীশ তখনই উঠিয়া অন্তঃপুরে সংবাদটা দিয়া আসিলেন, পণ্ডিতের জন্য চা ও সন্দেশের ব্যবস্থাও হইল; তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, তার পর, কথাবার্ত্তা কিছু হ'লো নাকি?

আশু সগর্ব্বে কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আশু পণ্ডিত যখন গেছে তখন পাকা ব্যবস্থা না ক'রে কি আসে?···রবিবার আপনারা দেখতে যাবেন বলে এসেছি। আপনাকে চেনে, আপনার ভায়ের সঙ্গে নাকি পড়েছিল।···মোদ্দা এক পয়সাও দেবেনা বড়বাবু, সেকথা আগেই ব'লে দিয়েছে—

এক পয়সাও দেবেনা? বলো কি?

সে কথা বারবার বলে দিয়েছে, মানুষটাও বলে চলো একরোখা গোছের।

শ্রীশ একটু যেন চিন্তিত হইয়া কহিলেন, ছেলের বিয়ের সব খরচা ঘর থেকে করতে হবে,···তাইত!···কিন্তু কিছুই কি আর দেবেনা, নিজের মেয়ে, অন্তত গায়েও দুখানা একখানা সাজিয়ে দেবে ত!···যাক্‌গে, মেয়ে যখন অত সুন্দরী বলছ—

আশু জোর করিয়া কহিল, সে মেয়ে ঘর থেকে পয়সা খরচ ক'রে আনবার মতই বাবু, ও নিয়ে আর মন খারাপ করবেন না।

আচ্ছা, তাই হবে। রবিবারেই দেখ্‌তে যাবো তা'হ'লে।

আশু সোজাসুজি দোকানে না গিয়া নিজের বাড়ীতে আসিল আগে। সারা দুপুরটা রোদে রোদে ঘোরা হইয়াছে, একটুখানি বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু বাড়ীর তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই কেমন যেন মনটা বিষাক্ত হইয়া গেল।···বাড়ী নামেই পৈত্রিক ভিটাটা আছে এই পর্য্যন্ত। সারা উঠানটা জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে ইট পাতা আছে তাই কোনমতে ঘরে পৌঁছানো যায়। ঘরের অবস্থাও তথৈবচ, ধুলায় ও জঞ্জালে যেন এক হাঁটু।

অথচ এককালে আশু খুব সৌখীনই ছিল। কোথাও এতটুকু ময়লা সে সহিতে পারিত না। সংসার তাহার চিরকালই ছোট—মা, স্ত্রী আর একটি ছেলে, সুতরাং কাজ ছিল কম। দুইজনে পরিশ্রমও করিতে পারিত খুব, চারিদিক তক্‌-তক্‌ ঝক্‌-ঝক্‌ করিত তাহাদের ঘরদরজাতে। না চার পাঁচদিন অন্তরই কাপড় জামা-বিছানা সোডা সাজিমাটী প্রভৃতি দিয়া ফুটাইয়া লইতেন, ফলে বাড়ীতে কেহ আসিলে কোন দিনই দরিদ্রের সংসার বলিয়া টের পাইত না।

শুধু কি তাই? এই উঠান আজ আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে অথচ তাহারা থাকিতে কুমড়া, লাউ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি কত ফসলই হইত এখানে, শাক-সবজীর জন্য কোন দিনই হাটে বাজারে যাইতে হয় নাই। এমন কি বাহিরে কলা গাছ পেঁপে গাছ প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু আয়ও হইত। আর এখন? বাহিরের জঙ্গলে বাঘ লুকাইয়া থাকাও বিচিত্র নয়।

আশু ছাতাটা ঘরের এক কোণে রাখিয়া কোনমতে চাদর জামা খুলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। বিছানা যেমন ময়লা, তেমনি তাহাতে ছারপোকার উপদ্রব, তবু তাহার উপরই শুইতে হয়। নেহাৎ অসহ্য হইয়া উঠিলে কুড়ি-পঁচিশ দিন অন্তর এক একদিন ঘর সাফ করিতে বসে কিন্তু অনভ্যস্ত হাতে অর্দ্ধেক ময়লা

যায়, অর্দ্ধেক যায়না। বালিশের ওয়াড় ধোপাবাড়ী দিলে খালি বালিশই মাথায় দিতে হয়, কাচিয়া আসিলেও, পরাইতে পরাইতে দশদিন কাটিয়া যায়—এমন অবস্থা।

অথচ—থাক্ সে কথা। আশুর এখন ভাবিতেও আর ভাল লাগেনা, কষ্ট হয়।

কেমন করিয়া যে কী হইল, আশ্চর্য্য! সাজানো বাড়ী, সুখের সংসার, নিমেষে যেন কাহার অভিশাপে পুড়িয়া গেল। মা গেলেন কলেরায়; স্ত্রী সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল কিন্তু সাত মাস যাইতে না যাইতে তাহাকেও দুর্দ্দান্ত নিউমোনিয়ায় ধরিল। বাকি রহিল ছেলেটা; তাহাকে তাহার দিদিমা আসিয়া লইয়া গেলেন, আশু নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু ভগবানের রোষদৃষ্টি যাহার উপর পড়িয়াছে, সামান্য সুকুমার শিশুকে কি সে বাঁচাইতে পারে? মাসতিনেক যাইতে না যাইতে চিঠি আসিল টাইফয়েড হইয়াছে তাহার। আশু স্ত্রীর শেষ চিহ্ন বালা জোড়া বিক্রয় করিয়া ছুটিল শ্বশুরবাড়ীতে, সেখানে যতটা চিকিৎসা সম্ভব সবই হইল কিন্তু তবু সে গুঁড়াটুকুকে বাঁচানো গেল না। আত্মীয় বলিতে আর কেহ রহিল না—এই বিশাল পৃথিবীতে জীবনের বোঝা বহিতে রহিল শুধু সে একা।···

আশু আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। ঘরের কোনে গিয়া তামাকের সরঞ্জাম বাহির করিয়া সাজিতে বসিল। বিড়ির দোকান আছে বটে তাহার, কিন্তু বিড়ি সে খাইতে পারে না—

তামাক সাজিতে সাজিতে মনে পড়িল এ কাজও, যতদিন স্ত্রী ছিল, তাহাকে করিতে হয় নাই। হাতে যত কাজই থাক্ না কেন, একটা হাঁক মারিলেই সে আসিয়া সাজিয়া দিয়া যাইত, কোন দিন তাহার জন্য বিরক্ত হয় নাই। আশু হয়ত জানে না, ভাত খাইতে বসিয়াছে সে, তামাকের কথা কানে যাইতে ভাত ফেলিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া তামাক সাজিয়া দিয়াছে।···

না, নিজের সংসার বাহার নাই—সেবা করিবার যত্ন করিবার জন্য কেহ আর বাঁচিয়া নাই—জীবন ধারণ তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা!

তবু ত আশু বাঁচিয়া আছে। খোকাটাও যখন মারা গেল তখন সকলেই ভাবিয়াছিল যে আশু পাগল হইয়া যাইবে। অথচ সে শুধু যে বাঁচিয়া আছে তাই নয়, নিয়মমত সে দোকানও খুলিতেছে, ব্যবসাও করিতেছে, পূর্ব্ব অভ্যাস মত মনসা পূজা, লক্ষ্মী পূজা প্রভৃতিও ঠিক চলিতেছে; এমন কি ঘটকালী করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাও বাদ যাইতেছে না। কাহারও জন্য কাহারও আটকায় না, জীবনটা কিছু বিড়ম্বিত হয়, এই মাত্র।···

তামাকও আশুর ভাল লাগিল না। কয়েক টান দিয়াই হুঁকা রাখিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ঘরে-দরজায় তালা দিয়া অভ্যাসমত দোকানের পথ ধরিল। সন্ধ্যার আর দেরী নাই, সুধীর একটু পরেই দোকান বন্ধ করিবে, তাহার নিকট হইতে পয়সা-কড়ি বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু খানিকটা দূর গিয়াই শেঠেদের ঝিলের ধারে তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিল। ভাল লাগিতেছে না, কিছুই ভাল লাগিতেছে না তাহার। আজ যেন অকস্মাৎ সমস্ত কিছুই বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে।

শেঠেদের ঝিলের বাঁধানো চত্বর তখন জন বিরল, বাগানের নিবিড় ছায়ার ফাঁক দিয়া মেঘমলিন জ্যোৎস্নার আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহারই আলোয় ঝিলের শান্ত কালো জল বড় সুন্দর দেখাইতেছে আজ।

আশু ছাতা দিয়া চত্বরের একাংশ ঝাড়িয়া ইটের বেদীতে ঠেস দিয়া বসিল। এমন ভাবে আর কতদিন চলিবে তাহার? এই ভবঘুরের মত জীবন যাত্রা?···সুধীরদের বাড়ী সে খায় তাহার জন্য মাসে পাঁচটি টাকা দিতে হয়; তাছাড়া চা, জলখাবার প্রভৃতিতেও কম যায় না, অথচ এই অসুবিধা। রাস্তার ভিখারীরাও বোধ হয় ইহার চেয়ে আরামে থাকে।···

আচ্ছা,—যে কথাটা কয়দিন ধরিয়াই মনের অবচেতন গহ্বরে উঁকি মারিতেছিল আজ তাহাই মূর্ত্তি ধরিল, আর একবার সংসার পাতিলে কি হয়? বয়স গিয়াছে? কত আর বয়স তার, ছত্রিশের ত বেশী নয়। এই বয়সে কী এমন বুড়া হইয়াছে সে, যে আর সংসার পাতা চলে না?···গোপাল চক্রবর্ত্তীর যেন ভীমরতি ধরিয়াছে তাই সে অনায়াসে আশুকে বুড়া বলিয়া দিল; কিন্তু আশু ত তাহার বয়স জানে! মাথার চুল ত কত লোকের অকালে পাকে! পয়সাও সে কম রোজগার করে না, কুড়ি, পঁচিশ এমন কি কোন কোন মাসে ত্রিশ পর্য্যন্ত হয়, ইহাতে একটা ছোটখাট সংসার চলে না? খুব চলে।

সে কল্পনানেত্রে তাহার নূতন সংসারের ছবি দেখিতে লাগিল।—নূতন বধূ মাথায় ঘোমটা টানিয়া কাজকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেছে, কাজ ফরমাশ করিলে নতমুখে আদেশ পালন করিতেছে আর রসিকতা করিলে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে শুধু। আবার ঘর-দ্বার হইয়া উঠিয়াছে শ্রী-মণ্ডিত, উজ্জ্বল। বিছানা পরিষ্কার, বাগানে আগের মতই ফুল ফল ফসলের বাহার, সময় মত পান জল ঠিক আসিতেছে—পোড়ো বাড়ীর কবর্ধাতার মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা সহসা আবার আনন্দমুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহার!···

না, বিবাহ সে করিবেই আবার, কাহারও কোন কথা শুনিবে না।···

আচ্ছা, নূতন বৌ কেমন দেখিতে হইবে কে জানে।···বয়স কমই হইবে, বেশী বয়সের মেয়েকে পোষ মানানো যায় না।··· আশু তাহার নূতন বধূকে যত রকম করিয়াই কল্পনা করে, কোথা দিয়া কী করিয়া যেন মাধুরীলতার ছবিটাই চোখের সামনে আসিয়া পড়ে।···অমন মেয়ে পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই তাহার, এ সত্য কথা; আশুর চেয়ে সে কথা বেশী করিয়া আর কেহ জানে না, তবু সেই লজ্জাবনতমুখী কিশোরীর ছবিটিই কল্পনার সহিত বার বার মিশিয়া যায়।

আশু নিজেকে মনে-মনে ধমক দিয়া উঠিল, স্পর্দ্ধা ত খুব দেখি! যে মেয়ে রাজার মুকুটে মানায় তাহাকে তুমি লোভ করো?

তা নয়। তবে অল্পবয়সী মেয়েই সে আনিবে! দক্ষিণ-পাড়ার কেনারাম ভট্‌চাযের মেয়েটা বিবাহের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে নাকি। দেখিতে তত ভাল নয়, রংও কালো, তবু অল্পবয়স তাহার, আর বেশ কাজ-কর্ম্মের। কেনারামের যা অবস্থা, আশু বলিলে হাতে স্বর্গ পাইবে সে। এখন ত মেয়েটা

দুইবেলা ভাতই পায় না, আশুর ঘরে সে হইবে একা গৃহিণী—কেনারামের পক্ষে এমন পাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা।

উত্তেজনায় আশু উঠিয়া দাঁড়াইল। আজই সুধীরের কাছে কথাটা পাড়া যাক্—কেনারাম নাকি সুধীরের কী রকম জ্ঞাতি হয়।

দশ মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে অতিক্রম করিয়া সে সুধীরের দোকানে যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন দোকানে কেহ নাই। ছয়টার গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, সাতটার গাড়ীর তখনো সময় হয় নাই, এমন সময় কেহ থাকাও সম্ভব নয়।

সুধীর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ব্যাপার কি আশুদা, তুমি যে দিন কাবার ক'রে এলে।

আশু ক্লান্তভাবে তাহার বেঞ্চিটায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, এসেছি অনেকক্ষণ, শরীরটা ভাল লাগছিল না ব'লে বাড়ীতে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। আর পারি না ভাই সুধীর!

সুধীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, অসুখ-বিসুখ কিছু—

না, না, অসুখ নয়—এমনি। একা একা এই ভাবে দিন কাটানো আর কি চলে? এখন বয়স হচ্ছে একটু যত্ন-আত্তি দরকার ত! এখন কোথায় পাঁচজনের সেবা নেব না এখনই পড়লুম যকা।

কথার স্রোতটা কোন্ দিকে যাইতেছে বুঝিতে না পারিয়া সুধীর চুপ করিয়া রহিল। আশুও ভাবিয়াছিল সুধীরই এইবার কথাটা পাড়িবে; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠেই কহিল, না, সুধীর আমি ভেবে দেখলুম, যে যাই বলুক, আমি আবার সংসার করব!

সুধীর অবাক্ হইয়া তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, হঠাৎ যে এ মতি হ'লো?

আশু তখনও বেশ ঝাঁঝের সহিতই বলিল, হঠাৎ আবার কি? …কী আমার এমন বয়স হয়েছে যে এখন থেকেই আমি বাউণ্ডুলে হয়ে থাকব? চুয়াল্লিশ বছর বয়স, এখনও কতকাল বাঁচব তার ঠিক কি! সময়ে ভাত জল নেই, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দেবার লোক নেই, এমন ক'রে মানুষ থাকতে পারে? তারপর, আজ যেন শরীর ভাল আছে, অসুখ হ'লে দেখবে কে?

সুধীর চোখ তুলিয়া যেন একটু বিস্মিত ভাবেই কহিল, তোমার মোটে চুয়াল্লিশ বছর বয়স?

না, আশীবছর! আশু তীব্রকণ্ঠে কহিল, তোদের চোখে কি হয়েছে, চাল্‌শে ধরেছে এই বয়সেই। আমাকে কি একেবারে থুথ্‌ড়ে বুড়ো দেখায়!

সুধীর কহিল, রাগ করছ কেন আশুদা, এমনি জিগ্যেস্ করছি। চুলগুলো সব পেকে গেছে কি না—

আশু কহিল, কেন তোর মাসতুতো ভাই সতুর চুল পাকেনি? কত বয়স তার, তুই-ই ত বলিস্ এখনও কুড়ি হয় নি!

তা বটে!…তবে কি জানো এ বয়সে সংসার করার বিপদ আছে, সামলাতে পারবে সব দিক? তা ছাড়া ভাল মেয়েও পাবে কি না সন্দেহ। তার চেয়ে একটা কাউকে এনে ঘরটরগুলো—

আশু মাথা নাড়িয়া বলিল, না না অন্য লোকের কাজ নয়। একটু দেখাশুনো করার লোক চাই, যত্ন আত্তি—অন্য লোকে কি করবে?

সুধীর খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, পাঁচজনে কিন্তু ঠাট্টা করবে আশুদা। তাছাড়া বয়স ত তোমার নেহাৎ কমও নয়—এ বয়সে একটা কচি মেয়ে বিয়ে করে পোষ মানাতে পারবে? আর যদি ভাল মন্দ কিছু হয়—সে মেয়েটা ত পথে বসবে। জমি জায়গা বলতে ত তোমার ঐ ভিটেটুকু।

আশু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, একটা কটূক্তি করিয়া বলিল, সব তাতে ফুট্ কাটাস্ কেন বল? পাঁচজনের আর কি, ঠাট্টা ক'রেই খালাস; খেতে দেবে আমাকে তারা—অসময়ে দেখবে?

সুধীরের এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সেও একটু চড়া মেজাজে জবাব দিল, বেশ ত বিয়ে করো, যা করো, আমার তাতে কি? করো না—তোমার ছাগল তুমি ল্যাজের দিকে কাটবে, আমার কি! তোমার ভালর জন্যেই বলা। আমি কি এর আগে চেষ্টা করিনি ভাবছ? কেনারাম কাকা খেতে পায় না, বলতে গেলে ভিক্ষে ক'রে খায়, আর ঐত মেয়ের ছিরি—তবু তোমার কথা বলতে জবাব দিয়েছিল, 'না বাবাজী, সে আমি দেবো না। ঐত ঘাটের মড়া, কদিনই বা বাঁচবে, তারপর আমার মেয়েকে আবার ত সেই ভিক্ষে করতে হবে? দাঁড়াবে কোথায়, ওর আছে কি?'

কেনারাম কাকাই যদি ঐ কথা বলে, ভাল মেয়ে তুমি পাবে কোথায়?

আশু যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, একথা কবে হ'লো তোদের?

সে অনেক দিন, তখনও খোকা বেঁচে আছে—

হুঁ।

আশু ধীরে ধীরে আবার বাড়ীর পথ ধরিল।

সুধীর কহিল, ও কি, চললে কোথায়? হিসেব বুঝে নেবে না?

আজ থাক্ সুধীর, শরীরটা ভাল নেই। কাল সকালে হবে।

তাহার পর সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তোর মা যেন আজ আর বসে না থাকে, আজ আর কিছু খাবোও না।

সুধীর কাছে গিয়া হাতটা ধরিয়া বলিল, রাগ করলে নাকি আশুদা?

আশু হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, পাগল! শরীরটাই খারাপ।…তবে এ-ও জানিস্ সুধীর, আশু পণ্ডিত যদি মনে করে, এখনও দুপায়ে মেয়ে জড়ো করতে পারে। তোর ঐ অকাল কুষ্মাণ্ড কাকাকেও বলিস্!…এই অঘ্রাণের মধ্যে যদি আমি আবার সংসার পাততে না পারি ত আশু পণ্ডিত আমার নাম নয়!

সে আর কথা না কহিয়া হন্ হন্ করিয়া গ্রামের পথ ধরিল।

আবার সেই বাড়ী। বন্ধ ঘরের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, মলিন শয্যা, ছারপোকার কামড়। আরশোলাগুলা আসবাবপত্রের মধ্যে খড় খড় করিয়া বেড়াইতেছে, ইঁদুরের উপদ্রবও কম নয়। বাড়ী ঢুকিবার সময় উঠানের মধ্য হইতে কী একটা সর্-সর্ করিয়া চলিয়া গেল, তাহার অবয়বটা দেখা না গেলেও অনুমান করা শক্ত নয়। এক-কথায় পোড়ো বাড়ী বলিতে যা বোঝায়!

আশুর চোখে জল আসিয়া পড়িল। এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি?

অথচ, মরিব বলিলেই ত মরা যায় না! কত বছর পরমায়ু

কে জানে, যদি সত্তর বছরই বাঁচে, কিংবা আরও বেশী ? আরও ত্রিশ বছর এইভাবে কাটাইতে হইবে ? সে কি সম্ভব!

আশু উঠিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া আলোটা জ্বালিল। হ্যারিকেনের চিম্‌নিও মার্জ্জনার অভাবে ধূমমলিন, তবু তাহারই আলোতে ছোট আয়নাটা ধরিয়া প্রাণপণে আশু নিজের মুখ দেখিতে লাগিল। কী এমন বুড়া হইয়াছে সে? চুলগুলা পাকিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু সে রোগে। দাঁত একটা ছাড়া আর সবই এখনো আছে, চামড়াও বুড়াদের মতো কুঞ্চিত হইয়া পড়ে নাই। বিপিন হালদার, গৌরী ভটচায্—ইহারা যে সব তৃতীয় পক্ষ বিবাহ করিল, শ্মশান ঘাটে একটা পা দিয়া—কই, তাহাতে ত কেহ কিছু বলিল না। যত দোষ তাহার বিবাহে! হ্যাঁ, তাহাদের অনেক জমিজমা আছে এটা ঠিক, কিন্তু পয়সাটাই কি সব? তাছাড়া, সে ত উপার্জ্জন করিতেছে এখনও, স্ত্রীর জন্য কিছু সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারিবে না? যত সব—হুঁ!! বিবাহ সে করিবেই, দেখিবে কে আটকায়!

কিন্তু আবারও শয্যায় শুইয়া অন্ধকারে ভাবিতে ভাবিতে তাহার উত্তাপ ক্রমশ কমিয়া আসিল। জানাশুনার মধ্যে যত মেয়ে আছে, তাহাকে কেহ দিবে বলিয়া' ত মনে হয় না। ছিল এক কেনারামের মেয়েটা, তাহারও ত ঐ চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি। তাহা ছাড়া, তাহার আত্মীয়ের মত স্নেহভাজন সুধীরেরই যদি ঐ মনোভাব হয় তাহা হইলে সহানুভূতি আর কোথায় পাইবে সে? সবাই ঠাট্টা করিবে, হয়ত বা ভ্যাংচি, এমন কি বাধাও দিবে—

নাঃ। আশু যতই ভাবিয়া দেখিল ততই বুঝিল যে আবার সংসার পাতিবার আশা তাহার সুদূরপরাহত। মা থাকিলেও কথা ছিল, কিংবা তেমন কোন আত্মীয়-আত্মীয়া! এই ভাবেই তাহাকে চিরজীবন কাটাইতে হইবে—আর কোনও উপায় কোথাও খোলা নাই। অবশ্য এভাবেও থাকা চলিবে না, সে এ ভিটা বেচিয়া দিবে, বরং সেই টাকাটা সুধীরকে দিয়া সুধীরদেরই বাড়ির ঘরটায় বাসা বাঁধিবে, কিম্বা ঐ টাকাটা সম্বল করিয়া কোন তীর্থস্থানে পাড়ি দিবে, হোটেল ত কেহ ঘুচায় নাই, বিড়ির ব্যবসাও সর্ব্বত্র চলে। যাহার ঘর নাই, সংসার নাই—দেশভুঁইয়ে তাহার কিসের টান?

একথা সেকথা ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশ ভোর হইয়া আসিল। মনে পড়িল মাধুরীর কথা। সুহাস আর মাধুরী। সুহাসের অল্প বয়স, মাধুরীরও তাই। দু'জনের চমৎকার মিল হইবে। দুজনেরই রূপের সীমা নাই, অবস্থাও ভাল। ভাবনা-চিন্তা দুঃখ কিছুই নাই—শুধু দিনরাত দুটিতে প্রণয়-লীলাস্রোতে ভাসিয়া চলিবে।

সে কল্পনা নেত্রে মাধুরীদের সংসার যাত্রা দেখিতে লাগিল। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত, কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে কষ্টি-নষ্টি চলে দুজনের। আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর ছোটখাট সেবা, সুহাসের জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে। আহা, এ. মেয়ের হাতের সেবা যে পাইল, তাহার আর ইহজীবনে কী কাম্য থাকিতে পারে? বাড়ীতে দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও, সুহাসের নিজস্ব কাজগুলি মাধুরী নিশ্চয় নিজের হাতে করিবে। তাহার জন্য সুহাস অনুযোগ করিলেও শুনিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে সে বহুদূরে চলিয়া গেল। প্রণয়-নাট্যের সম্ভব-অসম্ভব অনেক দৃশ্যই সে দেখিতে লাগিল মনে মনে। একদিন সুহাসের কলিকাতা হইতে কী কারণে ফিরিতে দেরী হইয়াছে, বাড়ীর লোকে তত ভাবিতেছে না, কিন্তু মাধুরী, মাধবীলতার মতই পুষ্পিতা সঞ্চারিণী সেই সুন্দরী মেয়েটি নিজের ঘরের জানালায় বাহিরের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা! তারপর রাত্রে ফিরিয়া সুহাস যখন তাহার উদ্বেগ দেখিয়া পরিহাস করিবে, তখন অভিমানে আসিবে তাহার চোখে জল, সুহাস আবার কত আদর করিয়া সেই মুখেই সুখের হাসি ফুটাইয়া তুলিবে। আবার চলিবে সারারাত ধরিয়া তাহাদের গল্প, প্রণয়-গুঞ্জন!

কিসের একটা অব্যক্ত বেদনায় আশু যেন অস্থির হইয়া উঠিল। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিতেই দেখিল যে পূর্ব্বাকাশে রক্তিমাভা দেখা দিয়াছে, ভোরের আর বেশী দেরী নাই। ভাবিতে ভাবিতে সারা রাতই কখন কাটিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারে নাই।

আর ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

ভাল করিয়া সকাল হইবার আগেই সে শ্রীশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তখনও আর কেহ ওঠে নাই, শ্রীশবাবু একা বাহিরের ঘরে বসিয়া গত দিনের কাগজখানায় চোখ বুলাইতেছিলেন। আশুকে দেখিয়া বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, পণ্ডিত যে এত সকালে, কি মনে ক'রে?

আশু কাছে বসিয়া একেবারে হাত দুইটি জোড় করিয়া কহিল, বাবু, কাল লোভে পড়ে বড্ড একটা অপরাধ ক'রে ফেলেছি এবারের মত মাপ করতে হবে। আরও বিস্মিত হইয়া শ্রীশ কহিলেন, ব্যাপার কি হে? খুলে বলো তবে ত বুঝি—

আজ্ঞে, ঐ গোপাল চক্রবর্ত্তীর মেয়ে—

শ্রীশ কহিলেন, হ্যাঁ গোপাল চক্রবর্ত্তীর মেয়ে কি? দেখতে ভালো নয়?

জিভ কাটিয়া আশু কহিল, আজ্ঞে না, দেখতে খুবই ভালো।

তবে?

আশু ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, আমি ওদের সব খবরই নিয়েছিলুম কাল! মেয়ের মাতামহরা পাগলের বংশ—ওর দিদিমা ছিলেন পাগল, এক মামাও পাগল, সে এখনও বেঁচে আছে—

শিহরিয়া উঠিয়া শ্রীশবাবু কহিলেন, ওরে বাপ রে! পাগলের বংশ থেকে মেয়ে আমি কিছুতেই নেব না। সাক্ষাৎ অপ্সরী হ'লেও না। আমার জ্যাঠাইমাকে পাগলের বাড়ী থেকে আনা হয়েছিল, তার জন্যে সেই ঠাকুর্দ্দা থেকে সুরু ক'রে আমরা পর্য্যন্ত কী জ্বালাই জ্বলেছি। ও কাজ আর নয়।

আশু চুপ করিয়া রহিল। শ্রীশবাবু প্রশ্ন করিলেন, এ কথা কাল বলোনি কেন?

আশু কাতরকণ্ঠে জবাব দিল, আজ্ঞে টাকার লোভে। গোপাল চক্রবর্ত্তী আমাকে একশ' টাকা কবুল করেছিল।…কী বলব বাবু, কাল আপনাকে কথাটা গোপন ক'রে পর্য্যন্ত আমার সে কি অস্বস্তি তা আর কাউকে জানাবার নয়। সারারাত ঘুম হলো না, ভাবলুম বড়বাবু আমাকে এত বিশ্বাস করেন তাঁকে ঠকালে আমার ইহকালও নেই, পরকালও নেই। তাই ভোর না হ'তে ছুটে এসেছি—এবারটি মাপ করুন বাবু!

আশুর শুষ্ক মুখ, আরক্ত চক্ষু দেখিয়া শ্রীশবাবুর কথাটা বিশ্বাস হইল। কোমল কণ্ঠে কহিলেন, টাকার লোভ মস্ত বড় লোভ আশু, সামলানো কি সহজ কথা! মুনিরও পদস্খলন হয়।···তুমি যে শেষ অবধি সে লোভ জয় করেছ, এইতেই বাহাদুরী দিচ্ছি।··· যাক্—ও কথা আর ভেবো না। তুমি অঙ্ক মেরে দেখো—

ফতুয়ার পকেট হইতে একখানা পাঁচটাকার নোট বাহির করিয়া জোর করিয়া আশুর হাতে গুঁজিয়া দিলেন। কহিলেন, একশ' টাকা লোকসান হ'লো তোমার, তার জায়গায় অবিশ্যি এ কিছু নয়—তবে ছেলের বিয়ে হ'লে আরও কিছু পাবে, তা তুমিই সমস্ত করো, আর অন্য লোকই করুক।

আশু তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দোকানের পথ ধরিল। ক্লান্ত শরীর, অবসন্ন মন। তবু যাইতেই হইবে, সাতটায় গাড়ীর সময় হইয়াছে। চলিতে চলিতে মুঠার মধ্যে পাঁচটাকার নূতন নোটখানা মচ্ মচ্ করিতে লাগিল।

সৌর্য্যপুর (প্রাচীন মথুরা)

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল্, পি-এইচ্-ডি, ডি-লিট্

জৈনদিগের মতে সৌরিপুর বা সৌর্য্যপুরের[1] অপর একটী নাম মথুরা। যুক্ত প্রদেশের আগ্রা বিভাগের অন্তর্গত মথুরা নগর যমুনাতীরে অবস্থিত। এই নগর মধুপুরি নামে পরিচিত। কথিত আছে যে ইহা শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পুরাকালে লবণের পিতা মধু মধুপুরিতে বাস করিতেন[2]। বর্ত্তমান সহরের ২½ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মহোলির প্রাচীন নাম মধুপুরি। প্রাচীন গ্রীস্‌বাসীদিগের মতে মথুরা অন্যতম সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। আরিয়ান বলেন যে মথুরা শূরসেনদিগের রাজধানী ছিল। টলেমি ইহাকে উচ্চ প্রাকারবেষ্টিত নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[3]।

মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি বলিয়া বিখ্যাত। এই স্থানেই কৃষ্ণ মথুরার অত্যাচারী রাজা কংসকে বধ করেন। এই নগরটী শান্তিপূর্ণ এবং প্রজাবহুল ছিল। ইহা পরাক্রমশালী কংসের বংশোদ্ভূত রাজা হুবাহের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে ফা-হিয়ান্ ভারত পরিভ্রমণ কালে মথুরা নগরে আসেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে এখানে বহু লোক বাস করিত। যাহারা খাস্ জমিতে চাষ করিত তাহাদিগকে তাহাদের লাভের কিঞ্চিৎ অংশ রাজাকে দিতে হইত। কাহাকেও শারীরিক শাস্তি না দিয়া রাজা দেশ শাসন করিতেন। রাজার শরীররক্ষীগণ ও অনুচরগণ বেতনভোগী ছিল। প্রজাগণ প্রাণীবধ ও উত্তেজক সুরাপান করিত না। পেঁয়াজ বা রশুন খাইত না। এখানে চণ্ডালগণ ধীবর ও শিকারী ছিল এবং মৎস্য ও মাংস বিক্রয় করিত। বাজারে মাংস বা সুরা বিক্রয়ের জন্য দোকান ছিল না[4]।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন্ সাং ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী হইতে জানা যায় যে মথুরা পরিধিতে ৫০০০ যোজন বিস্তৃত এবং ইহার রাজধানীর পরিধি ২০ যোজন ছিল। ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর। প্রজাগণ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করিত। গৃহসংলগ্ন উদ্যানে আম্রবৃক্ষ ছিল। সুন্দর সুন্দর সূতীর বস্ত্র প্রস্তুত হইত। আবহাওয়া উষ্ণ ছিল। প্রজাগণের আচার ব্যবহার ভালই ছিল এবং তাহারা কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিত। তথায় বৌদ্ধ বিহার ও দেবমন্দির ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণ বিভিন্ন স্থানে বিযুক্তভাবে বাস করিত। কা-হিয়ান্ মথুরাতে অশোক নির্ম্মিত তিনটী স্তূপ এবং সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, পূর্ণমৈত্রায়ণি পুত্র, উপালি, আনন্দ এবং রাহুলের দেহাবশেষের উপর স্তূপ দেখিয়াছিলেন। তথায় উপগুপ্তের বিহারে একটী স্তূপ ছিল। তন্মধ্যে বুদ্ধের নখ রাখা ছিল। তিনি একটী শুষ্ক পুষ্করিণী দেখিয়াছিলেন। এই পুষ্করিণীর অনতিদূরে একটি বিশাল অরণ্যে চারিটী অতীত বুদ্ধের পদাঙ্ক তিনি দেখেন।[5]

মথুরা নগরের প্রায় ৪½ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত মাট নামক গ্রামে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বস্তু পাওয়া গিয়াছিল :—

(১) রাজা কনিষ্কের প্রতিমূর্ত্তি—৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চ, মস্তক ও দুইটী বাহু বিহীন।

(২) একটী পুষ্করিণী—ইহাতে কুষাণরাজা কনিষ্ক জলদেবতা বরুণের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

(৩) কয়েকটী নাগ মূর্ত্তি।

(৪) বৃন্দাবনের পথে মথুরা হইতে ১½ ক্রোশ দূরে একটী মৃত্তিকা-স্তূপ আবিষ্কৃত হয়। ইহা জয়সিংহপুর গ্রামের নিকটবর্তী একটী বৌদ্ধ ধর্ম্ম মন্দিরের অবস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

(৫) একটী বৃহৎ পাথরের মসজিদ—বর্ত্তমানে মথুরার অন্তর্গত কাটরাতে অবস্থিত কেশবদেবের বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর এই মসজিদটী সম্রাট্ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(৬) একটী বৌদ্ধ স্তূপ।

মথুরার ভাস্কর্য্য আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে কণিষ্কের রাজত্বের পূর্ব্বেই গান্ধারের শিলাশিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মৃত্তিকা খনন করিয়া কতকগুলি ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাওয়া যায়; তন্মধ্যে একটী জৈন মূর্ত্তি ছিল। ইহা চারি খণ্ডে বিভক্ত[6]।

মথুরায় গ্রীক্‌শিল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মথুরা এবং উত্তর-পশ্চিমের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহার পরিচয় সোন সোডিকাসের শিলাস্তম্ভে পাওয়া যায়। এই শিলাস্তম্ভে খোদিত স্তূপটী এবং তক্ষশিলার শক-পার্থিয়ান্ যুগের স্তূপগুলি আকৃতিতে অভিন্ন[7]। মথুরায় একটি শক যুগের সিংহশীর্ষ আবিষ্কৃত হয়। ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত একটী

---

[1] S. B. E., XLV, p. 112.

[2] বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৪র্থ অধ্যায়।

[3] Cunningham, Ancient Geography of India, p. 374.

[4] Legge, Travels of Fa-Hien, pp. 42-43.

[5] Watters, on Yuan Shwang, vol, 1., pp. 301-313.

[6] Vogel, Explorations at Mathura: A. S. I., Annual Report, 1911-12 pp 120-133.

[7] Cambridge History of India, I, p. 633.

বৃহৎ শিরস্ত্রি এবং একটি অজের উপরিভাগ বলিয়া অনুমিত হয়; ইহার কারুকার্য্যে পারস্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়। ইহাতে খরোষ্ঠী অক্ষরে মথুরার ক্ষত্রপ শাসনকর্তাদের বংশ পরিচয় খোদিত আছে। এই শিলালিপিগুলি হইতে মনে হয় যে মথুরার ক্ষত্রপগণ বৌদ্ধ ছিলেন[৮]। মথুরার প্রাক্-কুষাণ ক্ষত্রপদিগকে তিনটী প্রধান শ্রেণীভুক্ত করা যায়। প্রথমটী খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর মধ্যবর্তী, দ্বিতীয়টী পরবর্তী শতাব্দীর এবং তৃতীয়টী স্থানীয় ক্ষত্রপগণের শাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট[৯]।

কুষাণরাজাদের সময়ে মথুরা জৈনগণের একটি ধর্মক্ষেত্র ছিল[১০]। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জৈনগণ মথুরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অনেকগুলি শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে কণিষ্ক, হুবিষ্ক এবং বাসুদেবের রাজত্বকালে জৈনগণ মথুরায় সমৃদ্ধিশালী ছিল[১১]। মহাকাত্যায়নের উদ্যম ও প্রচার কার্য্যের ফলে বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৌদ্ধধর্ম মথুরায় প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। বুদ্ধের পদরজে বহুবার এই নগর পবিত্র হয়। উত্তর মথুরার কোন একটি নারী তাঁহাকে ভিক্ষা দেন[১২]। মথুরা হইতে বেরঞ্জা যাইবার পথে বহু গৃহী তাঁহাকে সমাদর করেন[১৩]। বুদ্ধের পরিনির্বাণের কয়েকদিন পরে মহাকাত্যায়ন জাতিপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাহার ফলে মথুরার তৎকালীন রাজা অবন্তিপুত্র বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন[১৪]। ষষ্ঠ শতাব্দী যাবৎ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দৃঢ় ছিল। কুষাণযুগে সারনাথ এবং শ্রাবস্তীতে সর্ব্বাস্তিবাদের প্রাধান্য ছিল। খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে মেগাস্থেনিসের সময়েও মথুরা শ্রীকৃষ্ণ পূজার কেন্দ্র ছিল[১৫]। তথায় বৈষ্ণব ও ভাগবত সম্প্রদায় ছিল। শক কুষাণ যুগে ভাগবত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য যথেষ্ট ছিল[১৬]। খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী পর্য্যন্ত অধিকাংশ জনসাধারণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলিয়া মনে হয়। বাসুদেব প্রবর্ত্তিত ধর্মে তাঁহাদের আস্থা ছিল না[১৭]।

লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটী প্রস্তর খণ্ড হইতে মথুরার নাগপূজার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রস্তরখণ্ডে কুষাণযুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত শিলা-লিপি আছে। এই যুগে মথুরার নাগমূর্ত্তি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সহিত নাগপূজারও প্রচলন মথুরায় ছিল[১৮]। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালীয়দমনের পৌরাণিক কাহিনী বিবেচনা করিলে এই শিলালিপির যথেষ্ট মূল্য আছে বলিয়া মনে হয়।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে মথুরার প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বায়ুপুরাণ[১৯] হইতে জানা যায় যে মথুরার ২৩জন শূরসেন নৃপতি মগধের বার্হদ্রথ রাজগণের সমসাময়িক ছিলেন। বুদ্ধের সময়ে মথুরার শূরসেন নৃপতির নাম ছিল অবন্তিপুত্র। মনে হয় তিনি অবন্তীর কোন এক রাজকুমারীর পুত্র[২০]। বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ মথুরায় বাস করিতেন কিন্তু পরে তাঁহারা মথুরা ত্যাগ করেন[২১]। যুধিষ্ঠির মথুরার সিংহাসনে বজ্রনাভকে প্রতিষ্ঠিত করেন[২২]। সাধিন নামে এক নৃপতির পুত্র এবং পৌত্রগণ মথুরার রাজা ছিলেন[২৩]।

মগধে শুঙ্গ-মিত্র নৃপতিগণের রাজত্বের প্রারম্ভে স্থানীয় কিংবা সামন্ত রাজাগণ কর্ত্তৃক মথুরা শাসিত হইত বলিয়া মনে হয়। রাজা প্রথম ধনভূতি অগারজুতের পুত্র এবং রাজা বিশদেবের পৌত্র ছিলেন। খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে শুঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ভারহুতে তিনি একটী সুন্দর কারুকার্য্যখচিত তোরণ নির্মাণ করেন[২৪]। রাজা দ্বিতীয় ধনভূতি মথুরার বৌদ্ধস্তূপে তোরণ বেদিকা স্থাপন করেন[২৫]।

মথুরা ও পাঞ্চাল পরবর্তী মিত্ররাজাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল[২৬]। পরবর্তী মিত্ররাজগণের মধ্যে ইন্দ্রাগ্নিমিত্র, ব্রহ্মমিত্র এবং বৃহস্পতিমিত্র মগধ এবং অন্যান্য রাজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বৃহৎস্বাতি মিত্র, ধর্মমিত্র, বিষ্ণুমিত্র, বলমিত্র এবং গোমিত্রের নাম কৌশাম্বী ও মথুরার ইতিহাসে পাওয়া যায়[২৭]।

মগধরাজ ব্রহ্মমিত্র কলিঙ্গাধিপতি খারবেলের বশ্যতা স্বীকার করেন। যবনরাজের দ্রুত পশ্চাদপসরণের উল্লেখ খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে পাওয়া যায়। Sten Konow এবং Jayaswalএর মতে এই যবনরাজের নাম ছিল দিমিত (Demetrios)[২৮]।

কাবুল ও পাঞ্জাবের রাজা মিনান্দার মথুরা জয় করেন[২৯]। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর মুদ্রাগুলিতে মথুরার স্থানীয় শাসনকর্তাদের নামোল্লেখ আছে। হগান, হগামাস, রাজুবুল এবং অন্যান্য শক-ক্ষত্রপগণ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শক্তিশালী হয় এবং মথুরায় হিন্দু নৃপতিগণকে অপসারিত করে[৩০]।

শকক্ষত্রপগণের পরবর্তী প্রথম কণিষ্ক, বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক এবং প্রথম বাসুদেব প্রায় ১০০ বৎসর যাবৎ মথুরায় রাজত্ব করেন[৩১]। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরায় একটী সুন্দর বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়[৩২]। কুষাণ রাজত্বের পরে নাগ-রাজগণ মথুরায় এবং অন্যান্য স্থানে রাজত্ব করেন। সমুদ্রগুপ্তের নিখিল ভারত বিজয়ের সময়ে নাগরাজাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।

৮। Rapson, Ancient India, pp. 142-143.

৯। Law, Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, I, p. 93.

১০। Rapson, Ancient India, p. 174.

১১। Eliot, Hinduism and Buddhism, I. p. 113.

১২। Vimanavatthu Commentary, pp. 118-119.

১৩। Anguttara Nikaya, II, p. 57.

১৪। Majjhima Nikaya, II, pp. 83 ff.

১৫। Cambridge History of India, I, p. 167.

১৬। Ray Chaudhuri, Early History of the Vaishnava Sect, p. 99.

১৭। Ibid., p. 100.

১৮। Vogel, Naga worship in Ancient Mathura: A. S. I., Annual Report, 1908-09, pp. 159-163.

১৯। অধ্যায় ৯৯

২০। Cambridge History of India, I, p. 186.

২১। ব্রহ্মপুরাণ, অধ্যায় ১৪, শ্লোক ৫৪; হরিবংশ, অধ্যায় ৩৮।

২২। ভাগবৎ মাহাত্ম্য, অধ্যায় ১।

২৩। Oldenberg, Dipavamsa, p. 97.

২৪। Barua & Sinha, Barhut Inscriptions, Nos. 1-3; Barua, Barhut, Bk I, p. 29.

২৫। Cunningham, Stupa of Bharhut.

২৬। Cunningham, Coins, pp. 84-88; Allan, catalogue, pp. CXIXCCXX; Marshall, A. S. I., Annual report, 1907-08, p. 40; Bloch, A. S. I., Annual Report, 1908-09, p. 147.

২৭। Barua, Gaya and Buddhagaya, Bk I, p. 176; Ray Chaudhuri, Political History of Ancient India, 4th Ed., pp. 334-335.

২৮। Epigraphia Indica, vol. xx.

২৯। Smith, Early History of India, 4th Ed, p. 210

৩০। Ibid, p. 241 fn. I.

৩১। Ibid., p. 273; Ray Chaudhuri, op. cit., p. 388.

৩২। Ibid. p. 286.

গৃহ-প্রবেশ

(নাটিকা)

শ্রীকানাই বসু

পাত্র

প্রসন্ন—গৃহস্বামী
পৃথ্বীশ—প্রসন্নবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা
নিখিল—ইঁহাদের ভগ্নীপতি (ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট)
জগা—ভৃত্য
বন্ধু—দরিদ্র প্রৌঢ় ভদ্রলোক
খোকন ও ভানু—প্রসন্নবাবুর শিশুপুত্রদ্বয়
জেলে, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ ও মুটে

পাত্রী

সুকুমারী—প্রসন্নবাবুর স্ত্রী
মহালক্ষ্মী—প্রসন্নবাবুর ভগ্নী (নিখিলের স্ত্রী)

প্রথম দৃশ্য—প্রভাত

যবনিকা উঠিবার কিছু পূর্ব্বে ভিতর হইতে একটি গান শুনিতে পাওয়া যাইবে। বৈরাগী ভিখারীর গুঞ্জন গানের মতো। গানটি যখন দুই এক পদ গীত হইয়াছে তখন যবনিকা উঠিল। নেপথ্যে গান চলিতে লাগিল।

একটি সদ্যপ্রস্তুত নূতন বাটীর বৈঠকখানা। আসবাবপত্র এখনো সুবিন্যস্ত হয় নাই। একটি সোফা, একটি ছোট টেবিল, খান দুইতিন চেয়ার। টেবিলের উপর ফ্রেমে বাঁধানো একতাড়া ছবি দড়ি-বাঁধা রহিয়াছে, দেয়ালে উঠিবার অপেক্ষায়। ইহা ছাড়া ঘরের একোণে ও-কোণে আরও কিছু দ্রব্য থাকিতে পারে, যেমন ছোট টিপয়, গাছপালার মাটির টব ইত্যাদি।

গান শেষ হইবার পর নেপথ্যে গৃহস্বামী প্রসন্নবাবুর উচ্চ কণ্ঠ শুনা গেল—

"ওরে, বাবাজী চলে গেল না কি? ও জগা, দেখিস, আজকের দিনে কাকেও ফেরাস নি যেন। জগা-া-া।"

তাঁহার স্বর ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরে ভৃত্য জগা একটা বড় কার্পেট অতি কষ্টে মাথায় করিয়া আনিয়া ধপ্ করিয়া ঘরের প্রায় মাঝখানে ফেলিল। তারপর কোমরে বাঁধা গামছা খুলিয়া মুখ মুছিতেছে, এমন সময়ে পুনরায় অন্দর হইতে প্রসন্নবাবুর "জগা, জগা" চীৎকার আসিল। জগা বিরক্তভাবে বলিল—

"নাঃ, আর তো পারি না বাবা। ভোর থেকে আরম্ভ হয়েছে খালি জগা-জগা আর জগা! আর যেন চাকর নেই বাড়ীতে।"

আবার ডাক আসিল

"জগা-া-া।"

জগা সাড়া দিল

"আজ্ঞে যাই।"

ষ্টেজের পিছন দিকের দরজা দিয়া জগা ভিতরে চলিয়া গেল। পরক্ষণে একপাশ হইতে ব্যস্তভাবে প্রসন্নবাবুর প্রবেশ

প্রসন্ন। কোথায় গেল আবার। এই যে সাড়া দিলে। বেটা অমনি পালিয়েছে! নাঃ, একে নিয়ে আর চলবে না। এই হাঙ্গামটা চুকে গেলেই দেব বেটাকে—[কার্পেটে পা ঠেকিতে চমকিয়া] আরে, এ কার্পেটটা এখানে ফেলে কে? এটা যে আমি ওপোরের হলঘরে পাতবার জন্যে···ওরে জগা, তাই তো বেটা পালালো না কি?

ব্যস্তভাবে প্রস্থান

প্রসন্নবাবুর স্ত্রী সুকুমারীর ও ছোট ভাই পৃথ্বীশের প্রবেশ। পৃথ্বীশের গালে সাবানের ফেনা, ডান হাতে দাড়ি কামাইবার ব্রাশ, বাম হাতে দেশলাই ও সিগারেটের প্যাকেট। বামহাত সুকুমারীর দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা পরিস্ফুট।

পৃথ্বীশ। এখন আমি পারব না, কিছুতেই পারব না। এখনো মার্কেটে যেতে বাকী, মাংসটা সকাল সকাল না এনে ফেলতে পারলে—সে মহা মুস্কিল হবে।

সুকুমারী। লক্ষ্মীটি ভাই, তোমার দাদা শুনলে আমাকে একেবারে খেয়ে ফেলবেন—

পৃথ্বীশ। খবরদার। দাদার-নিন্দে এমন কি বৌদিদির মুখ থেকে হলেও আমি সহ্য করব না। খেয়ে ফেলবার মানুষ আমার দাদা নয়।

সুকুমারী। কিন্তু খেয়ে ফেলবার কথাই ভাই। আমি কাল একেবারে ভুলে গেছি তোমাকে বলতে। লক্ষ্মী দাদা আমার, বাসে করে যেতে আসতে তোমার আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না।

পৃথ্বীশ। আধ ঘণ্টা? বালীগঞ্জ থেকে বাগবাজার যেতেই তো এক ঘণ্টার বেশি লেগে যাবে।

সুকুমারী। কিন্তু না গেলে তো চলবে না ভাই: তবে কী হবে? লক্ষ্মী ঠাকুরপো—

বৌদিদির মুখের অসহায় ভাবটি লক্ষ্য করিয়া পৃথ্বীশের স্বর নরম হইল

পৃথ্বীশ। আর তোমার লক্ষ্মী লক্ষ্মী করতে হবে না। জানি; সকালে উঠে যখন ঐ জগা বেটার মুখ দেখেছি, তখন কী আর কোন কাজ আজ প্ল্যানমত হবে। আর তুমি মেয়েটি দেখতে ভালো মানুষটি, কিন্তু যেটি ধরবে সেটি না করে ছাড়বে না। most cadaverous—I beg your pardon, বল, কী ঠিকানা ফিকানা বল।

সুকুমারী। এই যে ভাই, পাছে আজও আবার ভুলে যাই তাই ভোর বেলাতেই কাগজে ঠিকানা লিখে আঁচলে বেঁধে রেখে তবে আর কাজ।

তাড়াতাড়ি আঁচল হইতে কাগজ খুলিতে লাগিল

পৃথ্বীশ। আজকের দিনটা ভুলে যে আমি বাঁচতুম। তা ভুলবে কেন? (কাগজ লইয়া ও পড়িয়া) কিন্তু পরেশ চাটুয্যেটি কে? আমি তো চিনতে পারছি না। দাদার বন্ধুদের তো আমি সবাইকেই চিনি।

সুকুমারী। না, না, ইনি তোমার দাদার বন্ধু নন। এঁর ছেলের সঙ্গে তোমার দাদার ছোট বেলায় খুব ভাব ছিল। আহা, সে

ছেলে এখন আর নেই। ইনি পশ্চিমে কোথায় ব্যবসা করতেন, সম্প্রতি কোলকাতায় ফিরেছেন। খুব পয়সাওলা লোক, কিন্তু শুনেছি কোন বড়মানুষি চাল নেই।

পৃথ্বীশ। বটে। তা বেশ তো, আমাকে পুষ্যিপুত্তুর নিক না বুড়ো। অত পয়সা খাবে কে?

সুকুমারী। দূর, কী যে বল। তাঁর আরও ছেলেমেয়ে আছে। তবে সেই ছেলেটি যাবার পর থেকে ইনি তোমার দাদাকে বড্ড ভালবাসেন। দেশে এসেছেন শুনে তোমার দাদার ইচ্ছে এই গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে তাঁকে আনেন। পরেশবাবুও বিদেশে থাকতে চিঠি লিখেছিলেন তোমাদের বাড়ী তৈরী হলে দেখতে আসবেন।

পৃথ্বীশ। দেখ দিকিনি! কাল ওদিক পানে সেই গিয়েছিলুন নেমন্তন্ন করতে—

সুকুমারী। বড্ড ভুল হয়ে গেছে ভাই।—আমার কী মাথার ঠিক আছে, এই সাত কথাটে···

পৃথ্বীশ। কবেই বা তোমার মাথার ঠিক ছিল? দাদাও যেমন পাগল, তেমনি তুমিও হয়েছ।

সুকুমারী। তাতো বটেই গো। আর তো ভাত খাইয়ে দিতে বৌদিদিকে দরকার হয় না, কাপড় জামা নিজেই পরতে শিখেছ, এখন আমি তো পাগল ছাগল হবই। তাই তো বলি বাপু, এবার একটি বিদুষী মহিলা-টহিলা নিয়ে এস, মডার্ণ সংসার চালাও।

পৃথ্বীশ। হুঁ।

সুকুমারী। সত্যি ঠাকুরপো, সুরেনবাবু কালও এসেছিলেন, তাঁর মেয়েটি এবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে—

পৃথ্বীশ। আবার পাগলামি সুরু হল তো? তাহলে তোমার বাগবাজারে ঐ সুরেনবাবু নরেনবাবুকেই পাঠাও, আমি চলুন নিউ মার্কেটে।

সুকুমারী। না, না ভাই। সুরেনবাবু আসেন কি, কেউ আসেন নি। তুমি বাগবাজারটা সেরে তারপর যত খুশী মার্কেটে ঘুরো ভাই। আমি চলি, ঢের কাজ পড়ে রয়েছে। জেনের জোগাড়, রান্নার জোগাড়, কিছু হয়নি।

পৃথ্বীশ। তবে ঘটকালি রেখে তাই যাও। আমি এই গাড়িটা বাগিয়ে নিয়েই বেরোচ্ছি। অত তোরে ওবাড়ীতে আর ওটা হয়ে উঠল না।

সুকুমারী। তাহলে তুমি মনে করে যেও কেমন? আমি নিশ্চিন্ত রইলুম, হ্যাঁ?

পৃথ্বীশ। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি যাও না। তোমাদের পরেশবাবুকে আমি ধরে নিয়ে আসতে হয় তাও আনব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। মনে কর পরেশবাবু এসে এই এখানে বসে আছেন, যাও।

সুকুমারীর প্রস্থান

সিগারেটটা সেই থেকে ধরাতে পারছি না। সাবানটা গেল শুকিয়ে।

পৃথ্বীশ সিগারেট ধরাইতেছে, এমন সময় জগার এক দ্বার দিয়া প্রবেশ ও অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ

পৃথ্বীশ। কী রে, কোথায় চলি? (জগা দাঁড়াইল) কার্পেটটা কি এখানে ফেলে রাখবার জন্তে আনতে বলুম?

জগা। আজ্ঞে না ছোটবাবু, এই এসেই সব করে ফেলছি। বড়বাবু ডাকছেন কেন শুনেই আসচি।

পৃথ্বীশ। আর এগুলো সব সাজিয়ে ফেলবি, যেমন বলে দিয়েছি।

জগা। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক করে ফেলচি।

উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান

প্রসন্নবাবুর পুত্র খোকন ও ডাকুর প্রবেশ

ডাকু। (কার্পেট দেখাইয়া) দাদা দাদা, এই দেখ এইটে আমাদের পাহাড় হবে, কেমন? এই দিকটা আমার। এইখান থেকে, এইখান থেকে—এ-ই খান থেকে এ-ই পর্য্যন্ত। আর তোমার ঐ দিকটা, হ্যাঁ?

খোকন। যা রে, বেশ ছেলে, নিজে ভাল দিকটা সব নেবে। আবদার! (নেপথ্যে প্রসন্নবাবু—"জগা" ও জগা—"আজ্ঞে যাই।") সেটী হচ্ছে না। আমি এই ওপরটা নোবো। এই চূড়োটা আমার, আর এই খানটা—আর এই খানটা। তোর এই নিচের দিকটা সব।

ডাকুর পছন্দ হইল না, সে মুখ ভার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল

খোকন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। আমি যেন এই পাহাড়ের ওপোর দুর্গ করেছি, আর তুই যেন নিচের থেকে যুদ্ধ করতে করতে আসছিস আমার দুর্গ কেড়ে নিতে। হ্যাঁ, কেমন?

ডাকু। (আগাইয়া আসিয়া) দুর্গ কি দাদা?

খোকন। দুর্গ কি জানিস্ না? দুর্গ রে, দুর্গ।

ডাকু। ও বুঝেছি। দুর্গ মানে কি দাদা?

খোকন। দুর্গ মানে হল—ইয়ে, মানে, দুর্গ মানে—

জগার প্রবেশ

জগু তুমি দুর্গ মানে জানো?

জগা। কোথায় গেলেন? নাঃ আর পারি না—

খোকন। কি বল তো?

জগা। এই তোমার বাবা।

খোকন। ধ্যেৎ, দুর্গ মানে বুঝি আমার বাবা। বাঃ বেশ বলেছ।

ছেলেদের হাস্য

ডাকু। আমি বলব? দুর্গ মানে দুর্গা ঠাকুরের বর, না দাদা?

খোকন। দূর, দুর্গা ঠাকুরের বর তো শিব আর মহাদেব। দুর্গ মানে হল—হল···য্যাম, দুর্গ মানে কেল্লা, কেল্লা।

ডাকু। ও বুঝেছি। তুমি বুঝতে পেরেছ জগু? কেল্লা গো, সেই যে গড়ের মাঠে সব বড় বড় কালো কালো খুঁটী আছে, চারদিকে সুতো বাঁধা? উঃ কি উঁচু খুঁটী। হ্যাঁ দাদা ঐ খুঁটিতে ঘুড়ি আটকে যায় না? যদি একটা ঘুড়ি যদি কেটে গিয়ে যদি উইখান দিয়ে যেতে যেতে যদি···

জগা ইতিমধ্যে কার্পেট পাতিতেছিল। এমন সময়ে বাহিরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। ছেলেরা কথা কহিতে কহিতে জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া মোটর দেখিয়া জানালার কাছে গেল এবং "ওরে মাসীমা এসেছে, এই পিণ্টু, এই যে আমি, এই যে, আরে খোকাটা কী

মোটা হয়েছে যে বাবা।" বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। অন্দর হইতে প্রসন্নবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিলেন।

প্রসন্ন। আরে, এই যে ভগা, কোথায় থাকিস বলতো তুই? সকাল থেকে ডেকে ডেকে—

ভগা। আজ্ঞে আমি তো সাড়া দিচ্ছি, এই তো এ ঘরে···

প্রসন্ন। মিছে কথা বল না, ভগা। আমি এই এক মিনিট হয়নি এখানে দেখে গেছি। থেকে থেকে সাড়া দিস্, আর পালিয়ে বেড়াস্। তোকে দিয়ে আর—(বলিতে বলিতে কার্পেট পাতিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন) এদিকটা যে বেঁকে গেল। আর একটু টেনে নে, আর একটু ডানদিকে। ব্যস্ ব্যস্। ওঃ কি ধুলো হয়েছে দেখ দিকি। একেবারে বাইরে থেকে পেতে আনতে পারলি না?

ভগা। আজ্ঞে বাইরে থেকে পেতে···সে কি রকম হবে?

প্রসন্ন। আহা পেতে আনবি কেন, বাইরে থেকে ঝেড়ে আনতে বলছি।

ভগা। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো ঝেড়ে আনছি বাবু।

প্রসন্ন। হুঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যত ফাঁকিবাজ জুটেছে। যাও ঝাঁটাটা নিয়ে এসো।

ভগার প্রস্থান

প্রসন্ন। আর শোন্ ভগা, ভগা—

ভগার পুনঃ প্রবেশ

তোকে যে জন্যে ডাকছিলুম তাই বলি। বলছি কি—তুই ইয়ে হয়েছে—তোকে—এই দেখ, কি বলতে এলুম ভুলে গেছি। দরকারের সময় তোদের পাওয়া যায় না···যত সব হয়েছে···

বিরক্ত ভাবে পায়চারী করিতে লাগিলেন। ভগা উৎসুক হইয়া কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া ভিতরে যাইতেছিল ঝাঁটা আনিতে। প্রসন্নবাবু দেখিয়া বলিলেন—

প্রসন্ন। কোথা চলি?

ভগা। আজ্ঞে ঝাঁটাটা আনি—

প্রসন্ন। হ্যাঁ, ঝাঁটাটা নিয়ে এসে বেশ করে কার্পেটটা—ভাল কথা, তুই এ কার্পেটটা এখানে পাতলি কেন? এটা আমি এনেছি ওপরের হলঘরের জন্য, তোর মুড়ুলি করে, সাত সকালে এটা এখানে পাতবার কী দরকার পড়েছিল?

ভগা। আমি কেন মুড়ুলি করব বাবু, ছোটবাবু বল্লেন···

প্রসন্ন। ছোটবাবু আবার কি বল্লেন? বাজে বকিস্ নি। যা এটা ওপোরে নিয়ে যা, বুঝলি?

ভগা। আবার ছোটবাবু বলবেন নিচে নিয়ে যা।

প্রসন্ন। ছোটবাবু আবার কি বলবে? বলবি আমি বলেছি যা।

ভগা। যে আজ্ঞে।

ভগা কার্পেট গুটাইতে শুরু করিল। প্রসন্নবাবুর প্রস্থান

ভগা। এরকম করলে কখনো কাজ এগোয়? একজন বলবেন, হ্যাঁ, তো আর একজন বলবেন, না। এক কাজ সাতবার করে করো। এত কাজ পড়ে রয়েছে, কখন যে সারব তার ঠিক নেই।

জেলের প্রবেশ *

জেলে। মাছ কোথায় রাখবো? ওহে শুনছ, সে মাছ কোটার জায়গাটা কোথায় হয়েছে দেখিয়ে দাও তো ভাই। একেবারে সেইখানেই সব ঢালিয়ে দি।

ভগা। কি মাছ?

জেলে। সে কি মাছ জেনে তোমার কি হবে? সে তোমাদের কি এক এক রকম মাছ কোটবার এক একটা জায়গা হয়েছে নাকি?

ভগা। না তাই বলছি। বলি ভাল মাছ এনেছো তো? না কি জেলের মাছ···

জেলে। সে সব কারবার সাগর বিশ্বেসের কাছে পাবে না। নতুন বাজারের সাগর বিশ্বেসের নাম শুনেছ তো? শালার জেলের মাছ যে পথ দিয়ে হাটে সে পথে আমি হাটি না।

ভগা। তাতো বটেই। সে কি আর জানি না।

জেলে। সেলাই আছে দাদা?

ভগা। সেলাই? কোথা?

জেলে। ম্যাচিস্ নেই? ম্যাচিস্।

পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিল

ভগা। ও দেশলাই। এই যে।

দেশলাই দিল

জেলে। (দাঁতে বিড়ি চাপিয়া) দাদা, তোমাদের বাপ দাদার আশীর্ব্বাদে টাটকা মাছ এক এই শর্মার কাছেই পাওয়া যায়। শালার দাপুরে সাতটা বিল লিস্ নেওয়া আছে। তারপর বারাসতে একটা সাড়ে তিন বিঘে, সে শালা এক সমুদ্দুর বল্লেই হয়। শালা মাছের ভাবনা। (বিড়ি ধরাইয়া) পাছে লোকে বলে জেলের মাছ তাই তিনটে লুঙ্গী রেখেছি দাদা। সেবারে নবীন সরকারের নাতনির বেতে শালার লুঙ্গী গেল মারা রাস্তায় বিগড়ে। আমি বল্লুম রও দাদা। দিলুম গরুর গাড়ীতে মাছ তুলে। শালা মাছ পৌছুলো বাসি বের দিন সন্ধ্যার সময়। নবীনবাবু রেগে লাল, বলে পয়সা দুবো না। বল্লুম দিওনি পয়সা। সে পয়সার জন্যে সাগর বিশ্বেস কিয়ার করে না। বাবু পুকুরের জিয়ানো মাছ। পরশু রাত্তিরে নিজে ধরেছি, সে মাছ আমি তা বলে জেলে পাঠিয়ে নাম খারাপ করতে পারি না। পয়সা দুবো যাক দুবো, সে পুকুরের মাছ বলে বায়না নিয়ে জেলের মাছের কারবার করতে তো পারবো না।

ভগা। তাতো বটেই। তারপর? সে মাছ কি হল?

জেলে। কি আবার হবে? বল্লুম বাবু যে বয়ে গেছে তা কি হয়েছে, কাল বৌভাত আছে, টাটকা মাছ দিন, ফুলশয্যের সঙ্গে জামাই বাড়ী পাঠিয়ে। সাগর বিশ্বেসের মাছ পাতে দিলেও নড়বে। দিলে পাঠিয়ে।

ভগা। দেখ, ভাল কথা মনে পড়েছে। তোমার তো নিজের পুকুর···

জেলে। সে পুকুর টুকুর আমার নেই দাদা, বল সমুদ্দুর সমুদ্দুর।

---

* জেলের বর্ণমালায় 'শ', 'ষ' ও 'স' নাই, আছে 'ছ' এবং 'ন'এর স্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ল' গ্রহণ করিয়াছে।

জগা। হ্যাঁ হ্যাঁ সমদ্দুর। তা দেখ সাগর ভাই, তুমি এক জায়গার কিছু—

জেলে। সে কারণ চাই বল্ না দাদা। পাঁশশো লোক বসিয়ে দাও, সাবার সব পাতে যদি গোটা গোটা রুই মাছের মুড়ো না সাজিয়ে দিতে পারি তো আধখানা গোঁফ কামিয়ে ফেলবো। কোথায় কাজ বল দিকি ভাই?

জগা। সে কাজ তেমন কিছু নয়, মানে···ব্যাপার চাই কিনা।

জেলে। কিছু বলতে হবে না দাদা, সে তুমি বেবাক করে নিও। তবে দর আমার কিছু বেশী—আগে থেকেই বলে দিচ্ছি, তোমার খুশী হয় দাও, নয়তো সোজা সড়ক আছে দিয়ে চলে যাও, কিন্তু দর কমাতে বোলো না ভাই, মারামারি হ'য়ে যাবে। বিশ্বাস না হয় এই পেয়াদা বাবুকেই জিজ্ঞেস্ করো।

জগা। দরের জন্যে ভেবো না, পয়সা যত লাগে পাবে ভাই, আমার আগেকার মনিব বাড়ী—বড় লোক।

জেলে। বলি, কবে কাজ? বিয়ে তো? ক রকম মাছ লেবে? পোনা, চিংড়ি আর ভেটকি মাছের ফ্রাই, কেমন? নেডনণ ক'রে?

জগা। না বিয়ে নয়, বাবুর শাশুড়ির—

জেলে। চতুর্থী? তাহলে এর সঙ্গে পার্শে মাছ। সে লেখে নিও দাদা, ইয়া বড় বড় পার্শে মাছ তেলে টইটুম্বুর। দাদা একেবারে জুড়ো। শাশুড়ি সগ্গে বসে হাসবে।

জগা। না না, সে সব কিছু নয়। শাশুড়ির চোকের অসুখ, কোবরেজ বলেছে রোজ জ্যান্ত শেড়ী দুটো করে—মানে জলটা—

জেলে। শেড়ী? হুম্ দাদা।

জগা। হাঁ ভাই, কিন্তু আসল শঙ্খ শেড়ী হওয়া চাই। সমুদ্দুরের হলেই ভালো হয়—

জেলে। হাড়োর সমুদ্দুরের শঙ্খ শেড়ীর নিকুচি করেছে, চলো চলো, মাছের ভাগাটা দেখিয়ে দেবে চলো।

জগা। চলো ভাই···

উভয়ের প্রস্থান

বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পৃথ্বীশের প্রবেশ ও তাহার প্রস্থানের পূর্ব মুহূর্তে সুকুমারীর প্রবেশ ও পিছন হইতে

"ভালো কথা, ঠাকুরপো"

পৃথ্বীশ। আবার কী? টালিগঞ্জে যেতে হবে, নেমন্তন্ন করতে?

সুকুমারী। না না টালিগঞ্জে তো নয় ভাই, এইখানেই।

পৃথ্বীশ। বলো কি! সত্যিই আরও নেমন্তন্ন বাকী রয়েছে? Hopeless!

সুকুমারী। লক্ষীটি ঠাকুরপো, ভাই রাগ কোরো না, লক্ষীটি।

পৃথ্বীশ। থাক্ আর তোমার নরম করতে হবে না, বলো কোথায় যেতে হবে। মাংস না হয় বাদই থাক্।

সুকুমারী। না না, এ বেশী দূরে যেতে হবে না। কিন্তু ভাবছি তুমি রাগ কর্বে না তো?

পৃথ্বীশ। কি আশ্চর্য্য! আমি রাগ কর্ব্ব কেন?

সুকুমারী। আচ্ছা তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করি। তুমি যদি পছন্দ নাও তো হবে। তবে তুমি যেন আপত্তি কোরো না ভাই।

পৃথ্বীশ। বাঃ বেশ মত, চাওয়া তোমার, আমার মত না হলে সে কাজ কোরবে না—অথচ আমার আপত্তি করাও চলবে না, মন্দ নয়। তা কী ব্যাপার বলো তো।

সুকুমারী। দেখো ভাই, আমার অনেক দিনের সাধ, বাড়ী তৈরী হবার সময় আসতুম, তখন থেকে মনে করে রেখেছি, তোমরা রাগ কোরো না—

পৃথ্বীশ। কী মুস্কিল! রাগ কোরবো কেন? কী তোমার ইচ্ছে বল না বৌদি, আমি বলছি যদি নেহাৎ অসম্ভব না হয়, তো তোমার ইচ্ছে পূর্ণ করবার ব্যবস্থা আমি কোরবো।

সুকুমারী। না না, অসম্ভব কেন হবে?

পৃথ্বীশ। আচ্ছা তবে বলে ফেলো বৌদি লক্ষীটি।

সুকুমারী। ভাই ঠাকুরপো, ঐ যে রাস্তার ওপারে বস্তীটা আছে না? ঐ বস্তীর লোকদের তুমি নেমন্তন্ন করে এসো ভাই।

পৃথ্বীশ। বস্তীর লোকদের নেমন্তন্ন! ক্ষেপেছ নাকি?

সুকুমারী। কেন হবে না? বস্তীর লোকেরা কি মানুষ নয়? আর, তুমি যা মনে করছ তা নয়—এটা ছোট লোকের বস্তী নয়, আমি খবর নিয়েছি। সব ভদ্র গেরস্ত লোক। গরীব বলে খোলার বাড়ীতে টিনের বাড়ীতে থাকে।

পৃথ্বীশ। তা না হয় থাকে, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাদের কি সম্বন্ধ?

সুকুমারী। কেন, পাড়া প্রতিবেশী সম্বন্ধ।

পৃথ্বীশ। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ! পাড়া প্রতিবেশী? এক বেলাও কাটেনি যে এখনো—(হাসিতে লাগিল)

সুকুমারী। হাসির কথা এতে কিছু নেই ঠাকুরপো। এই পাড়াতে বাড়ী করে বাস করতে এসেছ। তোমরা না মনে করতে পার, তোমাদের ছেলে পুলেদের কাছে এইটেই হবে ভিটে, তোমরা অবিশ্যি এখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত বাড়ী বলতে সেই পুরোনো বাড়ীর কথাই ভাববে। পাড়া বলে তোমাদের পুরোনো পাড়াটাই মনে পড়বে। কিন্তু তা তো আর চলবে না ভাই। আমরা সে পাড়ার লোকদের নেমন্তন্ন করে এনে আমোদ আহ্লাদ করব, আর এ পাড়ার লোক, সামনের বাড়ীর, পাশের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে, কেন ভাই? আমরা তো তিনদিনের জন্যে বাড়ী ভাড়া নিয়ে বিয়ে থা দিতে আসিনি—

পৃথ্বীশ। (চুপ করিয়া রহিল)

সুকুমারী। তুমি ভেবে দেখ ভাই ঠাকুরপো—

পৃথ্বীশ। ভেবেই দেখছি বৌদি। তোমার কথাগুলো এতো সত্যি, আর এত চমৎকার সত্যি, যে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি তোমার বুদ্ধি দেখে। সত্যি, আমরা যদি এ পাড়ার লোককে পাড়ার লোক বলে ভাবতে না চাই, তা হলে তো আমরা এদের কাছে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হয়েই থাকব।

সুকুমারী। আর দেখ ভাই, আপদে বিপদে আদ্দেক রাত্তিরে এদের ডাকব না তো কি শ্যামবাজার ভবানীপুর টেলিফোন করে—

পৃথ্বীশ। আর বলতে হবে না বৌদি, আর বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি।

সুকুমারী। (পৃথ্বীশের সমর্থন পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া) আরও দেখ ভাই ঠাকুরপো, বড়লোকের কথা ছেড়ে দাও, যারা মধ্যবিত্ত

সেইজন্ত তারা অনেক নেমন্তন্ন খায়, অনেক ভাল-মন্দ খেতে পায়। আর যারা একেবারে কাঙালী, মেথর, ভিখিরী, তারাও চেয়ে চেয়ে ভাল খাবার যথেষ্ট খায়। কিন্তু যারা গরীব অথচ ভদ্র লোক, এই রকম ক্রিয়ার বাড়ীতে থাকে, তাদের দুবেলা দুমুঠো শাক ভাত ছাড়া আর কিছু জোটে না, তাদের ছেলে মেয়েরা—

পৃথ্বীশ। লোকের বাড়ীর দোর গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতেও পারে না, আর ভেতরে নিমন্ত্রিতের জমাতে গিয়ে বসবার অধিকারও তারা পায়নি। ঠিক, ঠিক, খুব ঠিক কথা।

সুকুমারী। (খুশী হইয়া) তা হলে তুমি ওদের বাড়ী গিয়ে বলে আসবে তো ঠাকুরপো, হ্যাঁ?

পৃথ্বীশ। (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত) তা—হ—ল—তে পারি যদি তুমি একটা কাজ করতে পার।

সুকুমারী। (সাগ্রহে) কি কাজ, কি কাজ? বল। আমি ঠিক করব।

পৃথ্বীশ। উঁহু সে তুমি পারবে কি?

সুকুমারী। (ভয় পাইয়া) কেন ভাই, সে কি খুব শক্ত কাজ?

পৃথ্বীশ। হঁ—তা একটু, একটু কেন, বেশ একটু শক্ত বই কি।

সুকুমারী। কি ভাই ঠাকুরপো? বল।

পৃথ্বীশ। নেমন্তন্ন করতে পারি, যদি চট করে ছাতাটা পাঠিয়ে দাও।

সুকুমারী। (হাসি মুখে) চালাকি হচ্ছিল আমার সঙ্গে, না? এমনি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! আমি বলি কী না কী।

পৃথ্বীশ। এই তো দেরী কচ্ছ। তবে আর হল না।

সুকুমারী। না না, এই যাচ্ছি, তোমার ছাতা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দ্রুত প্রস্থান

পৃথ্বীশ সিগারেট ধরাইল। জগার প্রবেশ। জগা কার্পেটে হাত লাগাইতে পৃথ্বীশ বলিল :—

পৃথ্বীশ। কি রে, তোর সকাল থেকে একটা কার্পেট পাতা শেষ হল না? কি যে করিস্ তার ঠিক নেই। নে নে চট্পট্ সেরে নে।

যেদিক গুটানো ছিল পায়ে করিয়া খুলিতে লাগিল। জগা দেখে নাই, সে অপরদিক হইতে গুটাইতে লাগিল।

জগা। (হঠাৎ দেখিতে পাইয়া) ও কি করছেন, ছোটবাবু?

পৃথ্বীশ। (চমকিয়া) হ্যাঁ?

জগা। আপনি আবার খুলছেন কেন?

পৃথ্বীশ। (ফিরিয়া) তোর যে আঠারো মাসে বছর। নে, নে শীগ্গির-শীগ্গির পেতে নিয়ে যা। এই কার্পেট পাতা নিয়ে সারা বেলা কাটিয়ে দিলি…

আবার খুলিতে লাগিল

জগা। নাঃ আমি আর পারি না। (কাছে আসিয়া) এটা এখানে পাতা হবে না, ছোটবাবু। এটা—

পৃথ্বীশ। এখানে পাতা হবে না? কেন?

জগা। আজ্ঞে বড় বাবু বলেছেন এটা ওপোরে পাততে।

পৃথ্বীশ। বাজে বকিস্ নি। ওপোরে পাততে বলেছেন। চালাকি? নে, নে পেতে ফেল্ চট্ করে।

জগা। (হতাশ হইয়া) যে আজ্ঞে।

পৃথ্বীশ। আর দেখ, ওপোর থেকে আমার ছাতিটা নিয়ে আয়—বেলা হয়ে যাচ্ছে।

জগা প্রস্থানোদ্যত। নেপথ্যে প্রসন্নবাবুর কণ্ঠ—

"ওরে, কে আছিস্, একবার ভট্টাচার্য্যিমশাইকে ডেকে দেতো, আর কি চাই, একবার দেখে নিন।"

বলিতে বলিতে মধ্যের দরজা দিয়া পট্টবস্ত্র-পরিহিত প্রসন্নবাবুর প্রবেশ। অপর দরজা দিয়া সেই মুহূর্ত্তে জগার প্রস্থান দেখিতে পাইয়াই তিনি তাহার পশ্চাতে গিয়া ডাকিলেন—

"জগা"।

জগা। (ফিরিয়া) আজ্ঞে?

প্রসন্নবাবু পৃথ্বীশের দিকে পিছন ফিরিয়া কথা কহিতে ছিলেন। পৃথ্বীশের হাতে সিগারেট ছিল বলিয়া অন্যদিক দিয়া সে প্রস্থান করিল।

প্রসন্ন। তুই পালাচ্ছিলি যে বড়? যেই আমার সাড়া পেয়েছিস অমনি পালাচ্ছিস? তোদের কি ফাঁকি দেওয়া আর পালিয়ে বেড়ানো-ছাড়া আর কিছু কাজ নেই?

জগা। আজ্ঞে না বড়বাবু, পালাবো কেন?

প্রসন্ন। পালাবো কেন? পালাচ্ছিস চোখের সামনে দিয়ে, তবু বলবি পালাবো কেন?

জগা। আজ্ঞে বাবু, ওপোরে যাচ্ছিলুম তা—

প্রসন্ন। বাজে বকিস্নি বলছি। ওপোরেই যদি যাচ্ছিলে তো কার্পেটটা হাতে করে নিয়ে যেতে পারতে না?

জগা। কার্পেটটা যে ছোটবাবু বল্লেন নিচেই পাতা হবে।

প্রসন্ন। তবু তর্ক করে। পাঁচশো বার বলছি নিচে পাতা হবে না, হবে না, হবে না। ছোটবাবু বলেছে। বলুক ছোটবাবু। ছোটবাবুর চেয়ে আমি বয়সে বড়, তা জানিস্।

জগা। (ঘাড় নাড়িয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রসন্ন। তবে?

জগা। (নিরুত্তর)

প্রসন্ন। তবে তুই কি বলতে চাস্ বল?

জগা। আজ্ঞে না, ছোটবাবুর চেয়ে আপনি বড়, তাতে আমার কি বলবার আছে?

প্রসন্ন। নেই তো? তবে তর্ক করিস কেন? যা বলছি তাই কর।

জগা। (কার্পেটে হাত লাগাইতে গিয়া আপন মনে) আবার ছোটবাবু আমায় বকাবকি করবেন।

প্রসন্ন। (শুনিতে পাইয়া) কি? ছোটবাবু বকাবকি করবে? আমার কথার ওপোর ছোটবাবু বকাবকি করবে? ডাক ছোটবাবুকে।

জগা বাহির হইতে গিয়া ফিরিয়া আসিল

জগা। এই যে ছোটবাবু এসেছেন।

পৃথ্বীশ প্রবেশ করিল, হাতে ছাতা

পৃথ্বীশ। জগা, তোকে না বলেছিলুম ছাতাটা ওপোর থেকে আনতে ?

জগা। আজ্ঞে, আমি ত যাচ্ছিলুম বড়বাবু বল্লেন—

প্রসন্ন। আমি ! আমি তোকে ছাতা আনতে বারণ করলুম।

পৃথ্বীশ। (ছাতা উঁচাইয়া) দেব বেটার মাথা ভেঙ্গে এই ছাতার বাড়ি। দাদা তোকে ধরে রেখেছিলেন, না ?

জগা। আজ্ঞে না, উনি বলছিলেন—

প্রসন্ন। মুখের ওপোর তর্ক কোরো না জগু।

পৃথ্বীশের প্রস্থান

কাজে ফাঁকি দিয়ে কথা দিয়ে ভর্তি করতে যেয়ো না। জেনো, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয়না, বুঝেছ ? (জগা নীরবে ঘাড় নাড়িল) যাও ছাতা নিয়ে এসো।

জগা। আজ্ঞে, ছাতি ত ওঁর কাছে—

প্রসন্ন। ফের তর্ক করছো ? কোন কথা নয়, আগে ছাতি এনে তবে এখান থেকে নড়বে—যাও

ধীরে ধীরে জগার প্রস্থান

প্রসন্ন। বেটা পাজির পাকোড়া। (জানালা দিয়া পৃথ্বীশকে দেখিয়া) তুমি কি বেরোচ্ছ নাকি পিন্টু ?

পৃথ্বীশ। (নেপথ্যে) হাঁ

প্রসন্ন। তা বেশী দেরী কোরো না যেন, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, কোন্ দিক যে সামলাবো তা বুঝতে পাচ্ছি না। যেটি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে না করবে, সেটি হবেনা, বুঝলে ?

প্রসন্ন একবার বাহির হইয়া গেলেন, পরক্ষণেই প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া ডাকিলেন "জগা জগা"। জগা ছাতি হাতে প্রবেশ করিল।

জগা। এই নিন বাবু

প্রসন্ন। ছাতা ! কি হবে ?

জগা। আপনি আনতে বল্লেন।

প্রসন্ন। আমি আনতে বল্লুম ! আমি কেন বলবো ? আমার কি দরকার ? ও, পিন্টুর জন্যে বলেছিলুম বটে, তা সে যে বেরিয়ে গেলো, যা যা দৌড়ে যা, ছাতাটা দিয়ে আয় ছোট বাবুকে।

জগা। ছোটবাবু যে ছাতা নিয়ে বেরিয়েছেন বাবু।

প্রসন্ন। ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে ? তা বেশ, তাহলে ছাতাটা রেখে আয় বাবা, রেখে তুই একবার ইয়েটা করে ফেল। কি বলছিলুম—হ্যাঁ আগে কার্পেটটা ওপরে রেখে দিয়ে আয় দিকি।

জগা ছাতা রাখিয়া কার্পেট গুটাইতে লাগিল, প্রসন্নবাবু সাহায্য করিতে লাগিলেন। সুকুমারীর প্রবেশ, সদ্যস্নাতা, চওড়া লাল-পাড় গরদ শাড়ী পরণে।

সুকুমারী। (গালে হাত দিয়া এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলেন, তারপর) বেশ যাহোক, তুমি এখানে কার্পেট পাতছো ! আর কি বাড়ীতে লোক নেই ?

প্রসন্ন। না, না, কার্পেট পাতবো কেন ! গুটোচ্ছি, কিরে জগা গুটোচ্ছিস তো ?

সুকুমারী। হ্যাঁ হ্যাঁ গুটোচ্ছে, তুমি উঠে এসো দিকিনি। চারদিকের কাজ পড়ে রয়েছে। পূজোর বসবে বলে, চান করে নীচে এলে, আর এখানে তুমি কিনা কার্পেট গুটোচ্ছ ? মা গো মা, কোথায় যাবো আমি ! (গালে হাত দিলেন) তোমার ঐ কাজ ?

প্রসন্ন। (অপ্রস্তুতভাবে) না না, আমি এই ত আসছি। জগাকে বলতে এসেছিলুম—ঐ যে ছাতাটা আনতে বল্লুম কিনা তাই—

সুকুমারী। ছাতা ! ছাতা এখন কি হবে ? এখন আবার বেরোবে নাকি ?

প্রসন্ন। না আমি বেরোবো না, ঐ পিন্টু কোথায় যাচ্ছিল ; তা, বল্লে কি জগা কথা শোনে ? এক কথা হাজার বার বল না, তবু বেটার মাথায় ঢুকবে না। কোন কথা ওর মনে থাকে না—

হাত ও কাপড়ের ধুলা ঝাড়িতে লাগিলেন

সুকুমারী। আচ্ছা, তুমি এখন এসো, পুরুত ঠাকুর বসে রয়েছেন, তুমি পূজোয় বসবে এসো।

প্রসন্ন। বেটাকে বললুম ঝাঁট দিতে, তা কি দেবে ? খালি কথার ভট্‌চায্যি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—জগা একবার দৌড়ে যা তো বাবা, ভটচার্য্যি মশাইকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।

সুকুমারী। ভটচায্যি মশাইকে আবার কোথায় ডাকতে যাবে ? বল্লুম না তিনি তোমার জন্যে বসে রয়েছেন ? তুমি এসো এসো, হোমটা আরম্ভ হলে আমি একটু নিশ্চিন্ত হই।

প্রসন্ন। নিশ্চয় নিশ্চয়, ঐটেই হলো আসল, গৃহ-প্রবেশের প্রধান কাজই হল ঐটে (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) জগা, কার্পেটটা আগে ওপরে পেতে দিয়ে আয়, বুঝলি ? সব কাজ ফেলে তুই আগে ওপরে মেয়েদের বসবার জায়গাটা ঠিক করে দে।

সুকুমারী। এখন থেকে মেয়েদের বসবার জায়গা করার তাড়া কিসের ? সে তো সন্ধ্যে বেলায়—

প্রসন্ন। আহা, তুমি জানো না, মেয়েদের ব্যাপার, ও আগে থাকতে সেরে ফেলাই ভালো।

সুকুমারী। (সহাস্যে) তাই বটে, মেয়েদের ব্যাপার আমি জানি না। যত জানো তুমি।

বলিতে বলিতে উভয়ের প্রস্থান

জগা এদিক ওদিক দেখিয়া একটা বিড়ি ধরাইতে যাইতেছিল; হঠাৎ যেন কাহার পদশব্দ শুনিয়া বিড়ি লুকাইয়া ফেলিল, তারপর কার্পেট তুলিতে উদ্যত হইল, ভিতর হইতে প্রসন্নবাবুর ডাক আসিল—

"জগা, ও জগা একবার চট্ করে শুনে যা।"

জগা একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় কার্পেট তুলিতে গেল, পুনরায় ডাক আসিল—

"জগা—"

কার্পেট ছুড়িয়া ফেলিয়া জগার প্রস্থান

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের সাধনা

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' স্বদেশ মনীষী শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় "সংসার ধর্ম্ম ও গীতা" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখক মহাশয় গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি, সাধনার রসিক, বিদ্বৎ গোষ্ঠীতে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়। তার উপরে, তিনি শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যাবলম্বনে গীতার সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার। তাঁর মতন সুধীজনের মতের কোন প্রতিবাদ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র—তবু 'জিজ্ঞাসু' হিসাবেই কয়েকটি কথা নিবেদন করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা, বিশেষ করে কবিগুরুর দুএকটি লেখা উদ্ধৃত করে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তি ভারতবর্ষের সনাতন ধারার বিপরীত; তাঁর লেখায় গীতার আদর্শ, ভারতের অধ্যাত্ম আদর্শটিকে পরিস্ফুট করা হয় নাই। ঠিক কোন অবস্থায়, কি আদর্শ লইয়া রবীন্দ্রনাথ বহু নিন্দিত ও বহু প্রশংসিত "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে বহু আলোচনা, বাদানুবাদ যথেষ্ট পত্রিকা বহু জায়গায় হইয়াছে, কিন্তু সত্যই কি রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সত্য অধ্যাত্ম আদর্শটিকে নিজের লেখায় ফুটিয়ে তোলেন নি। তাঁর চিত্তে মিলিত হইয়াছে, বহু তীর্থের জল, বহু সাধকের ও ভাবুকের বিভিন্ন মনন ধারা, তাই তিনি রূপ ও অরূপ মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক অপরূপের। যা তাঁকে করে তুলেছে এক ঐন্দ্রজালিক রূপকার। অনিলবাবুর সতীর্থ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় এই ভাবপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে চারিটি ধারা তাঁর জীবনকেও কাব্য প্রচেষ্টাকে অভিষিক্ত করেছে। একটি হচ্ছে উপনিষদের ধারা (Upanishadic monism) দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ (Vaishnavic dualism) তৃতীয়টি ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য্যবোধের ধারা (Paganism) চতুর্থ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ (Scientific Rationalism)। "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" রবীন্দ্রনাথের নয়—তুমি নাই আমি নাই, তুমি আমির ওপারে আছে এক শুধু অনির্ব্বচনীয় সৎ, কিম্বা সচ্চিদানন্দের স্বরূপ শিবের মধ্যে জীব নিঃশেষে লীন হইয়া গিয়াছে—এখানে আমার এই উপলব্ধিও রবীন্দ্রনাথের নয়, তাঁহার অনুভব, তাঁহার সিদ্ধান্ত অন্তর, বহির্মুখী, ঊর্দ্ধমুখী সর্ব্বাঙ্গানুভবের......রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ এক শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদী বৈরাগ্যতন্ত্রীর বিরুদ্ধে...রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি চরম আধ্যাত্মিকতার শিখরে উঠে নাই; তবু মানুষের সাধনায় তার দাম বা সার্থকতা কিছু কম না। আমরা সাধারণ মানুষ, সাধন মার্গের পথিকও নই উচ্চতর রসিকও নই, তবু এইটুকু বুঝি, এইটুকু জানি—রবীন্দ্রনাথের বাণী অনেক সময়ে নিশীথ রাত্রে, জীবনের অনেক দুঃসহ মুহূর্ত্তে বেদনার দিনে অননুভূত শান্তির সন্ধান দিয়াছে, দিব্যভাবের দিশা দেখাইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি সেই প্রত্যন্ত দেশ অতিক্রমণেরই অন্তরঙ্গ সঙ্গীত—যে মধ্যস্তরে অন্তরাত্মায় সত্যলোকের জ্যোতি ও ধ্বনি মানবজীবনের সূক্ষ্মতর প্রকাশের মধ্য দিয়ে সব নিগূঢ় অর্থ আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়।"

কবি নিজে বলেছেন—

"শুধালো মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই—
আমি তো সাধক নই
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি
এ পারের খেয়ার ঘাটায়
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো
মন্দ ভালো

• • • •

সে তরঙ্গ নৃত্য ছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত মোর নৃত্য করে আপন সঙ্গীতে
এ বিশ্ব প্রবাহে
সে ছন্দে বন্ধন মোর মুক্তি মোর তাহে।"

তাই বিচিত্রের মর্ম্ম বাণীটি নিয়ে একের চরণে প্রণাম জানিয়েছেন।

"যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত
নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে
তারে আমি ধরেছি বাঁশিতে"

তিনি কবির দৃষ্টিতে পেয়েছিলেন এক পরম সত্য—অখিল বিশ্ব প্রাণ একটি নিঃস্পন্দ—বিশ্ব সত্তার প্রাণ, জলে স্থলে অম্বরে, অন্তরে, সর্ব্বদেহে, চোখের দৃষ্টিতে, জাগরণে, ঘোরে তন্দ্রার বিরামমন্দ্রপটে জীবনের পরম সত্যের—প্রাণে বিরাট্ প্রাণ—সমস্ত নিয়ে, যত ছায়া দুঃখ, যত সুখঃ, প্রাণে মৃত্যুঃ প্রাণ ধারা, প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদনা—প্রাণ প্রাণে সমস্ত আনন্দ ধারা, চিন্ময় কোহেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—এই আকাশে দ্যুলোকে ভূলোকে যদি আনন্দ না থাকত—তিনি আছেন বলেই সব আছে—রসো বৈসঃ—তাই জগত জুড়ে এত রূপ এত রস, এত রং এত গন্ধ এত গান এত সখ্য এত স্নেহ এত প্রেম, তাই সব পূর্ণ, মধুর—মধুবাতা ঋতায়তে—সেই রস সমুদ্রে অবগাহনেরোন কি? শুধু শুষ্ক বৈরাগ্যের বুলির দরকার কি, যদি অন্তরের রস উথলে না উঠল—রসঃ হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। যা কিছু আনন্দ সে রসকে পেয়ে। আনন্দরূপমমৃতং।

"এই শেষ কথা নিয়ে নিঃশ্বাস আমার যাবে থামি
কত ভালোবেসেছিনু আমি
অনন্ত রহস্যতার উচ্ছ্বসি আপন চারিধার
জীবন মৃত্যুরে মিল করি একাকার
বেদনার পাত্র মোর বারবার দিবসে নিশীথে
ভরি দিল অপূর্ব্ব অমৃতে"

লেখক নিজে গীতার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "বস্তুতঃ গীতা সন্ন্যাসীদের জন্য রচিত হয় নাই, সাংসারিক মানুষের জীবনে সঙ্গীন মুহূর্ত্তে যে সব গভীর প্রশ্ন ও সমস্যা উদিত হয়, অর্জ্জুনের সমস্যাকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতাতে সেই সবেরই চরম সমাধান দেওয়া হইয়াছে। অর্জ্জুনের কর্ম্মত্যাগ সংসারত্যাগের প্রবৃত্তিকে তামসিকতা ও ক্লৈব্য বলিয়া নিন্দা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গীতার শিক্ষার সূত্রপাত করিয়াছেন এবং গীতার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাহ্য সন্ন্যাস ও সংসার ত্যাগের প্রতিবাদ করা হইয়াছে—ইহার জন্য প্রয়োজন ভিতরের ত্যাগ—অন্তরের সাধনা, বাহিরের সন্ন্যাস প্রয়োজনীয়ও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে।

জ্ঞেয় স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি'—কর্ম্মকে বন্ধনের কারণ বলিয়া সন্ন্যাসীরা কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ দেন; কিন্তু গীতা বলিয়াছেন কর্ম্মফলে আসক্তি না রাখিয়া কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিলে তাহা কখনই বন্ধনের কারণ হয়না, বরং এইরূপ কর্ম্মের ভিতর দিয়াই মানুষের দিব্য-রূপায়ণ সম্পাদিত হয়। ভগবান নিজে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি কখনও কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না—বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।

এই যদি গীতার সনাতন আদর্শ হয় তবে রবীন্দ্রনাথ কোথায় তার অন্যথা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন (শান্তিনিকেতন) "যদি কর্ম্ম করতে চাই তবে মুক্ত হতে হবে—এই জন্য গীতা সেই যোগকেই কর্ম্মযোগ বলেছেন যে যোগে আমরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করি। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করলেই কর্ম্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার হয়। নইলে কর্ম্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আমরা কর্ম্মেরই অধীভূত হয়ে পড়ি আমরা কর্ত্তা হইনে। অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে যেতে হবে এবং কর্ম্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম্ম করতে হবে।"

"যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" এই মন্ত্র ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসাধনের প্রিয় মন্ত্র। "তোমার সংসারকে তোমার প্রিয়জনকে তোমার সমস্ত কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও" এই যে ত্যাগ, এ হচ্ছে সাধু কর্ম্মের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আত্ম-নিবেদন, যেখানে প্রত্যক্ষ হবে বুদ্ধির সর্ব্বজনীনতা, বুদ্ধির সর্ব্বব্যাপকতা, সর্ব্ব মানুষের পরিব্যাপ্তিকার অনুভবের উপলব্ধি। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পিছনে রহিয়াছে একটা কবির সুর—একটা রূপক ছবি—যা ভারতবর্ষের নিজস্ব চিরসত্য সুন্দরের প্রকাশ, যা 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং' রূপে তিনি দেখেছিলেন কবির দৃষ্টিতে (সাধকের দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন কিনা জানিনা।

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক্ তেনেদং পূর্ণং
পুরুষেণ সর্ব্বং একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবং"
"তিনি প্রেয় পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা"।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্তের ভাষায় বলিতে গেলে—

"অন্দর মহল বাহিরের উচ্ছল উৎসব ধারার দিকে ছাড়িয়া দিয়াও একটা দৃষ্টি একটা অনুভব তিনি রাখিয়াছেন ভিতরের অন্তঃপুরের দিকে—যেখানে সব শান্ত, স্তব্ধ, স্তিমিত এবং তিনি বলিতেছেন বটে

"রাখোরে ধ্যান থাকরে ফুলের ডালি
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধূলাবালি"

কারণ তাঁহার আসল কথাটি হচ্ছে

"বাহিরে তখন থাকবে ছুটে
থাকবি তুচ্ছ ধূলায় লুটে
সকল পীড়ন সয়ে নিয়ে
বেড়াবি মাভৈঃ
মনুষ্যের অন্তঃপুরে
থাকবে ততদিন।"

আমাদের বিশ্বাস মানবজাতির সমস্ত ভবিষ্যৎ এই সাধনার উপর, এই সাধনার গভীরতর সিদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে। এই হিসাবে কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ঋষি রবীন্দ্রনাথ হইয়া উঠিয়াছেন।"

"ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে
আলোকের অতীত আলোকে
অণু হতে অণীয়ান্ মহৎ হইতে মহীয়ান্
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্ব্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা
শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি বহুবার তুমি কেন নাম
তবু তাঁরে করেছি প্রণাম
অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্ব্বাদ
উষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ।

ঘুমভাঙানি

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

যেন 'মরণলীলার খেলা' দূর সমুদ্রের পার থেকে,
সে যে দিকবিদিকে ছুটলো তীব্র প্রলয় সমান হাঁকি';
আজ সবার পাশে বাজের প্রাণে উঠলো মরণ সুর বেজে,
তবু ঘুমন্তদেশ ঘুমায় তাদের নেই জাগরণ সম্ভাবি'।
ওগো বজ্রাঘাত গর্জ্জে ওঠো আরেক তুমি খুব রাগো,
তুমি রুদ্রহাতে এদের মাথায় ঘুমভাঙানির ছোপ দাগো।

এই ঘুমন্তদের পান্থশালায় কিসের মহাপাপ হলো,
তার পাপেতে পাপ সয়েছে রোগ শিকড়ে তার বিষভরা,
আজ অনাচারভরা দুর্নীতি তার এই জাতি কি আর চলে?
তাই এই পাপেরি নাগপাশেতে ঘিরলো মরণ-ঘুমঘোরা।
ওগো হুঙ্কারিয়া দাঁড়াও আজি আরেক তুমি খুব রাগো,
তুমি রুদ্রহাতে এদের মাথায় ঘুমভাঙানির ছোপ দাগো।

ওগো প্রলয়ের তোমার রোষের মৃত্যুনাদে গর্জ্জে ওই
এরা অকর্ম্মের রঙ্গলীলায় মত্ত এদের বক্ষতল,
ওগো তোমার ক্রোধের ঝড়-ঝড়ক বাইরে প্রলয় ডাক ছাড়ে
তবু ভাঙলোনা তার ঘুমের সকল ভাঙলো না তার সংশয়।
তুমি সর্ব্বনাশের আহ্বানেতে ডাক ডাকো আর খুব রাগো,
আর রুদ্রহাতে এদের মাথায় ঘুমভাঙানির ছোপ দাগো।

ওগো তোমার মহান সাধন আজ এরাই মনুর পুত্রদল,
আজ সবাই এদের করছে ঘৃণা সেটা পারেই সইবে কি ?
ওগো অমৃতেরি পুত্র হয়ে পাপের কাদায় মগ্নমন,
হলো বিদ্বেষেরি পদাঘাত আর তোমার লোকে সইবে কি ?
হানো বজ্র আঘাত পদাঘাতে ধাক্কা মারো খুব রাগো,
তুমি রুদ্রহাতে এদের মাথায় ঘুমভাঙানির ছোপ দাগো।

ওগো রুদ্র তুমি এবার দেশে ভৈরবেতে ডাক ছাড়ো,
এই হুঙ্কারে জাগবে না ঘুম অন্ধকার থাকাতে,
ওগো তোমার বিরাট শঙ্খ দিয়ে আজকে এদের হাত নাড়ো,
তুমি প্রলয়েরই পিতার মতন দাঁড়াও এদের সাক্ষাতে।
ওগো সর্ব্বনাশের চাপ ছেড়ে আজ আশীর্ব্বাদের রাগ রাগো,
তুমি রুদ্রহাতে এদের মাথায় ঘুমভাঙানির ছোপ দাগো।

ইকোমিটার

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

যুদ্ধের সময় অবশ্য সাবমেরিনের চাইতে জাহাজের আর কোন বড় শত্রু নেই। ডুবো জাহাজের কথা ছেড়ে দিলে, আর যে সব কারণে জাহাজ ডুবি হয় তাদের মধ্যে সব চাইতে মারাত্মক হ'ল চড়ায় আটকে যাওয়া বা ডোবা-পাহাড়ে ঘা খাওয়া। আজকাল যদিও জাহাজের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য অনেক রকম যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু তারাও এই বিপদ থেকে খুব বেশী রক্ষা করতে পারেনা। কয়েক বছর আগে পর্য্যন্তও দেখা গেছে যে, যত জাহাজ ডুবি হয় তার শতকরা পঁচাশিটিই নষ্ট হয় বালির চড়ায় আটকে গিয়ে অথবা কোনও অজ্ঞাত ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে। তাই নাবিকদের পক্ষে সব চাইতে বেশী দরকারী হ'ল যে পথ ধরে তারা চলবে তার গভীরতা জানা। এই বিপদ যে শুধু সমুদ্রগামী জাহাজের বেলাতেই ঘটে এমন নয়। আমরা দেখেছি নদীতেও অনেক সময়ে খুব বেশী কুয়াসা হলে বা ঝড় বৃষ্টির সময়ে ষ্টীমার চড়ায় আটকে যায়।

নদীতে জল অপেক্ষাকৃত কম, তাই সেখানে বড় বড় বাঁশ দিয়েই জল মাপা হয়। যাঁরা পূর্ব্ববঙ্গের দিকে গেছেন তাঁদের অনেকেই হয়ত এই বাঁশ-দিয়ে জলমাপা দেখেছেন। চাটগাঁয়ে খালাসীরা লগি ফেলে ফেলে দেখছে আর সুর করে বলছে, এক বাঁও মেলেনা—দুই বাঁও মেলেনা।' এক বাঁও হল চার হাত। এটা জল মাপবার একটা পরিমাপ ইংরাজীতে বলা হয় Fathom. যেখানে জলের গভীরতা কম সেখানে এই পদ্ধতিতে জলমাপা বেশ সহজ এবং হাঙ্গামাও কম। কিন্তু জল যেখানে গভীর, বড় বড় লগিও যেখানে ঠাঁই পায়না, সেখানে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়। বড় নদী বা সমুদ্রের জল মাপবার জন্য একটি প্রথা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। শক্ত অথচ মজবুত দড়ির সঙ্গে একটা ভারী সীসার খণ্ড বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হয়। সীসার ভারে দড়ি নীচে নামতে থাকে। সীসাটা যখন তলায় গিয়ে লাগে, তখন আর দড়ির উপরে টান পড়েনা। কতটা দড়ি জলের তলায় গেল তাই দেখে সহজেই জলের গভীরতা স্থির করা যেতে পারে। কিন্তু এর কতকগুলি অসুবিধাও আছে। প্রথমত মাপবার সময়ে জাহাজটিকে একেবারে না থামালেও খুব আস্তে আস্তে চালাতে হবে, না হলে দড়িটা কাত হয়ে থাকবে, আর তারই জন্য ঠিক গভীরতা মাপা যাবে না। আরও একটা অসুবিধা হল এই যে জল ঝড়ের সময় এই উপায়ে জলমাপা এরকম অসম্ভবই বলা চলে। আর এতে সময় যে খুব বেশী লাগে সে কথা বলাই বাহুল্য।

তাই বৈজ্ঞানিকদের লাগিতে হ'ল নতুন উপায় বার করবার কাজে। তাঁরা এই কাজে লাগিয়েছেন শব্দের প্রতিধ্বনিকে। কোনও বড় দেওয়াল বা বাধার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললে আমরা প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু কেন? শব্দ করলে বাতাসে এক রকম ঢেউ সৃষ্টি হয়, তারা যখন কানে এসে লাগে তখন আমরা শুনতে পাই। কিন্তু শব্দের ঢেউ যে সব সময়ে বাতাসেই হবে এমন কোনও কথা নেই। সে ঢেউ জলেও হতে পারে, অন্য কোন গ্যাসের ভিতরেও হতে পারে। আমরা শব্দ করবার পর সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সব দিকে। তাদের ভিতরে যারা দেওয়ালের দিকে গেল, তারা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। সেই ধাক্কা-খেয়ে-ফিরে আসা ঢেউই যখন আমাদের কানে এসে লাগে তখন আমরা আমাদের পূর্ব্বের শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। কোন জিনিসের ভিতর শব্দের ঢেউ কত জোরে এগিয়ে চলে সে কথা জানা কিছুমাত্র শক্ত নয়।

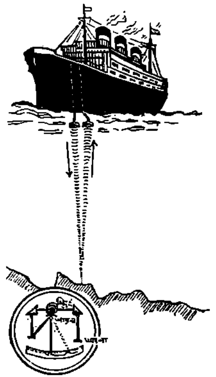

ইকোমিটার

বাতাসের ঢেউ—তারা বড়ই হোক আর ছোটই হোক—সাধারণত সেকেণ্ডে প্রায় এগারশ' ফুট বেগে পথ চলে। সাধারণত বলার কারণ হল এই যে বাতাস গরম বা ঠাণ্ডা হলে, তাতে জলীয় বাষ্প কম বেশী হলে এই গতির সামান্য তারতম্য ঘটে। কিন্তু সে কথা যাক্। তেমনি আবার জলের ভিতরে শব্দের ঢেউএর গতি হ'ল সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার ফিট। 'শব্দের,

ঢেউ কত বেগে চলে এবং আসল শব্দের কতক্ষণ পরে প্রতিধ্বনি শোনা গেল তা যদি জানতে পারি, তাহলে যে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঢেউএরা ফিরে আসছিল তার দূরত্বও জানা যাবে। শব্দ করবার ঠিক দু' সেকেণ্ড পরে যদি প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, তাহলে বুঝতে হবে যে ঢেউএর দেওয়াল পর্য্যন্ত যেতে লেগেছে এক সেকেণ্ড এবং বাকী এক সেকেণ্ড লেগেছে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে। তাই যদি বাতাসের ভিতরে শব্দ করা হয়ে থাকে, তাহলে শব্দের উৎপত্তিস্থল থেকে দেওয়ালের দূরত্ব এগারশ ফিট।

ঠিক এই তথ্য কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা জলের গভীরতা মাপবার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তার নাম হ'ল "ইকোমিটার।" মোটামুটি যন্ত্রটির গঠন বেশ সরল। এখানে শব্দ করা এবং তার প্রতিধ্বনি শোনা—দুই-ই করা হয় যন্ত্রের সাহায্যে এবং সময়ও মাপা হয় কলে। তাই ভুলের সম্ভাবনা নেই বল্লেই চলে।

বিদ্যুতের সাহায্যে একটা ষ্টীলের চাকতি মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপান হয়, আর তাতেই জলের ভিতরে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হতে থাকে। টর্চ্চের ভিতরে যেমন আলোটা ফোকাস করা হয়, এখানেও এই ঢেউগুলিকে একটা দিকে ফোকাস করা হয়, যাতে সব দিকে ছড়িয়ে না পড়ে। সমুদ্রের তলায় গিয়ে সেই ঢেউ ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। সেই ফিরে-আসা ঢেউএর আঘাতে একটা ছোট চাকতি কাঁপতে থাকে। তখন বোঝা যায় যে প্রতিধ্বনি এসেছে। সময় নির্ভুলভাবে মাপবার কৌশলটি বড় মজার।

একটা ছোট ল্যাম্প থেকে আলো পড়ে—একখানা আয়নার উপর। অবশ্য তার আগে সেই আলো আরও একটা ছোট আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে তবে গিয়ে সেই আয়নার উপর পড়ে। শেষের আয়নাটির সঙ্গে লাগান রয়েছে ঘড়ির স্প্রিংএর মতই একটা স্প্রিং, আর তারই জন্য আয়নাটি ঘুরছে। ফলে ঐ আয়না থেকে যে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে সেও ঘুরে যাচ্ছে। আলোর রেখাটা যে ঘুরে যাচ্ছে, সেটা দেখা যায় একটা স্কেলের উপরে। শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম আয়নাটি কেঁপে ওঠে। ফলে স্কেলের উপর আলোক রেখাটাও বেশ একটু দুলে ওঠে। তখন আলোক রেখাটা স্কেলের কোথায় তা' দেখে রাখা হ'ল। তার পর খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার যখন প্রতিধ্বনি এলো তখন প্রথম আয়নাটি আর একবার কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আলোক রেখাটিও কেঁপে ওঠে। এবারে আলোর রেখাটি কোথায় তাও দেখা হ'ল। এই থেকে আমরা বার করতে পারি আলোর রেখাটি অর্থাৎ স্প্রিং লাগান আয়নাটি ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনির মধ্যবর্ত্তী সময়ে কতখানি ঘুরে গেছে। স্প্রিংএর আয়নাটি কত বেগে ঘুরছে, তাও জানা। তাই ওইটুকু ঘুরতে কতটা সময় লাগলো তাও সহজে বেরিয়ে পড়ে। অবশ্য এ সবই যন্ত্রের সাহায্যে হয়ে থাকে। এই নিয়মে জলের গভীরতা মাপা এত সহজ হয়েছে যে প্রত্যেক দু মিনিট অন্তরই অনায়াসেই একবার করে জল মাপা চলতে পারে।

এখানে একটা কথা কিন্তু বলা দরকার। সব রকম আকারের শব্দের ঢেউই কিন্তু আমাদের কানে সাড়া তুলতে পারে না। খুব বড় বড় ঢেউ হলে যেমন আমরা শুনতে পাইনে, তেমনি ঢেউ যদি খুব ছোট ছোট হয় তাহলেও শোনা অসম্ভব। এই সব কাজে কিন্তু সেই সব অতি ছোট ঢেউই ব্যবহার করা হয়—যাদের আমরা শুনতে পাই না। এদের ইংরাজী নাম হ'ল super-sonics. ছোট ঢেউএর একটা সুবিধা, এরা বড়ো বড়ো ঢেউএর মত, সামনে বাধা পেলে এঁকে বেঁকে যাবার চেষ্টা করেনা, সোজা পথেই চলে।

জল মাপবার এই পদ্ধতি আবিষ্কার হবার পর থেকেই জলের তলার ম্যাপ তৈরী করা অত্যন্ত সোজা হয়েছে। আজকাল অবশ্য শব্দ তরঙ্গের বদলে বেতার তরঙ্গ দিয়েও এই কাজ করা হচ্ছে। এই সব যন্ত্রের কাজ এত উঁচুদরের যে জলের তলা দিয়ে এক ঝাঁক মাছ গেলেও তাদের অস্তিত্ব এতে ধরা পড়ে। ইয়োরোপে মাছ ধরবার জাহাজগুলিতে আজকাল এই সব যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। সমুদ্রতলের সামান্য উঁচুনীচুও এতে ধরা পড়ে। কোথাও হয়ত সমুদ্রের তলা হঠাৎ উঁচু হয়ে গেছে, তাও এর নজর এড়ায় না। এই উপায়েই নিমজ্জিত লুসিটানিয়া-জাহাজকে খুঁজে বার করা সম্ভব হয়েছে।

এতে একটা মস্ত উপকার হয়েছে যে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে জাহাজ দিক্‌ভুল করলেও তার হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ সমুদ্রতলের ম্যাপ অতি নির্ভুলভাবে করা হয়েছে—এবং যখনই কোনও অদল বদল হয়, তাও এতে জুড়ে দেওয়া হয়। তাই ঝড় বৃষ্টির সময়ে জাহাজ স্থির হয়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপতে থাকে, তার পর ম্যাপ মিলিয়ে বুঝতে পারে কোথায় সে আছে।

বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু এখানেই থামেন নি। এই যন্ত্র দিয়ে তাঁরা জলের তলায় লুকান সাবমেরিনকে পর্য্যন্ত খুঁজে বার কচ্ছেন। এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। সেটি হল সাবমেরিনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে কোন্ দিক থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে। অথবা সাবমেরিন যদি চলতে থাকে তাহলে দেখতে হবে কোন্ দিক থেকে তার ইঞ্জিনের শব্দ আসছে। শব্দের বদলে যদি বেতার ঢেউ পাঠিয়ে এই কাজ করা হয়, তাহলে কিন্তু সাবমেরিণ চলুক আর নাই চলুক তাতে কিছুই এসে যায়না।

ভ্রান্তি

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাস্তবে প্রকট তারি অমৃত আনন্দ—প্রগাঢ়তা,
অবিনাশী জীবনের যত অকল্যাণ অপগত,
বেদনার অন্তরালে শান্তিময় সুখ-বিহ্বলতা,
কল্পনা-কৃপণ প্রাণ ব্যর্থতায় কাঁদিছে সতত।

এত সুখ, শান্তি আছে, দিগন্তের মোরা দিশাহারা,
মরকত-মণি গাঁথি লুক্কিত মনের গভীরে,
অবুঝের মতো কাঁদি সন্ধানে ফিরিয়া হই সারা,
আপনার মাঝে তাই আপনারে চাই ফিরে ফিরে।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত নবগ্রহমূর্ত্তির পরিচয়

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুমাত্রেই প্রতিদিন প্রত্যূষে নবগ্রহ স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সেই সুমধুর স্তোত্র সুকণ্ঠে পঠিত হইলে চিত্ত মুগ্ধ হয়। বাঙ্গলাদেশে ও ভারতের অনেক স্থানেই নবগ্রহ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আমরা বিক্রমপুর হইতে যে নবগ্রহমূর্ত্তি খোদিত প্রস্তর ফলকখানি পাইয়াছি এখানে তাহার (Navagraha slab) পরিচয় দিতেছি তাহাতে দশটি মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছেন। তাহার প্রথম মূর্ত্তিটি হইতেছেন বিঘ্নবিনাশন গণপতির মূর্ত্তি।

প্রস্তর ফলকখানির আকার ১০″×৫″ ইঞ্চি এবং প্রত্যেকটি খোদিত মূর্ত্তির আকার ৩″×১″ ইঞ্চি—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে। মূর্ত্তির প্রথমে গণেশ, তার পর একে একে (১) সূর্য্য, (২) সোম বা চন্দ্র, (৩) মঙ্গল, (৪) বুধ, (৫) বৃহস্পতি, (৬) শুক্র, (৭) শনি, (৮) রাহু ও (৯) কেতু এই নয়টি মূর্ত্তি। সবকয়টি মূর্ত্তিই দণ্ডায়মানভাবে খোদিত।

প্রথমে গণেশের কথা বলিতেছি। প্রত্যেক দেবতার পূর্ব্বে গণদেবতার পূজা করিতে হয় বলিয়াই সম্ভবতঃ এখানে সর্ব্বাগ্রে গণেশ মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। গণেশের মূর্ত্তিটি দ্বিভুজ। পদতলে বিকশিত শতদল এবং তন্নিম্নে বাহন মূষিক। কণ্ঠে নাগোপবীত। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পদ্ম ধৃত। আর বামহস্ত দ্বারা তিনি লম্বিত হস্তী শুণ্ডকে ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শারদাতিলকতন্ত্র ও মেরুতন্ত্রে গণেশের বিভিন্নরূপ মূর্ত্তির পরিচয় আছে এবং তাঁহার বিবিধ নাম যেমন—বিঘ্নরাজ, লক্ষ্মীগণপতি, শক্তি গণেশ, ক্ষিতিপ্রসাদন গণেশ, বক্রতুণ্ড, হেরম্ব, নটরাজ গণেশ, মহাগণপতি, বিরিঞ্চি গণপতি, উচ্ছিষ্ট গণপতি ইত্যাদি। বিক্রমপুরে প্রায় এই কয় শ্রেণীর গণেশ মূর্ত্তিই পাওয়া গিয়াছে। এই সব মূর্ত্তি প্রকারভেদে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজ হইয়া থাকে।

গণেশ হইতেছেন কল্যাণ মূর্ত্তি—রাজগৌরব বর্দ্ধক। তাঁহার হস্তীমুখ। তিনি লম্বোদর। সাধারণতঃ গণেশ চতুর্ভুজই হইয়া থাকেন, কিন্তু এই প্রস্তর ফলকে তিনি দ্বিভুজ আকারে খোদিত। গণেশ লোকপালক, মহাপুরুষ এবং জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজন হিতকামী। তিনি হইতেছেন:

'ঈশ্বরঃ সর্ব্বলোকানাং গণেশ্বর বিনায়ক'।

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১৫০, ২৩।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে প্রথমে গণেশের মুখ ছিল অতি সুন্দর, শরদিন্দুতুল্য—কিন্তু শনির দৃষ্টিতে তাঁহার মাথা উড়িয়া যাওয়ার পরে উহাতে গজমুণ্ড সংযোজিত হইয়াছিল। গণেশ একদন্ত। কেন তিনি একদন্ত হইলেন—কেন তাঁহার মূষিক বাহন, সে সব কাহিনী নানা পুরাণে নানারূপ আছে। এখানে সে কথা নহে। গণদেবতা গণেশ সর্ব্বাগ্রে পূজা পাইয়া থাকেন, তিনি কৃষি ও বাণিজ্যের মঙ্গল করেন বলিয়া সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পূজা হয়। গণেশ—গণদেবতা। গণ শব্দের দুই অর্থ। এক অর্থে ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতিকে বুঝাইয়া থাকে। অপর অর্থে বুঝায় জনসাধারণ—The man, The people.

মহাভারতের লিপিকার গণেশ। বেদব্যাস কহিলেন: "হে জনগণনায়ক! আমি মুখে বলিয়া যাই, আপনি আমার মন সঙ্কল্পিত মহাভারত গ্রন্থের লেখক হউন। ইহা শ্রবণ করিয়া গণপতি কহিলেন: আমি লিখিতে আরম্ভ করিলে যদ্যপি আমার লেখনী ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করে, তাহা হইলে আমি লেখক হইতে পারি। ব্যাস কহিলেন: আপনিও কোনও স্থানের অর্থ না বুঝিয়া লিখিবেন না। গণনায়ক তথাস্তু বলিয়া লেখকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইহা দ্বারা গণেশের লিপিকুশলতাও বুঝাইতেছে।

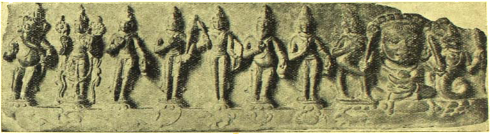

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত নবগ্রহমূর্ত্তি সমন্বিত প্রস্তর ফলক

এই প্রস্তর ফলকখানিতে একের পর এক এইভাবে দশটি মূর্ত্তির মধ্যে আমরা গণেশকেই প্রথম দেখিতে পাইলাম। গণেশের পরই রহিয়াছেন রবি বা সূর্য্য। নবগ্রহের প্রথম মূর্ত্তি। সূর্য্য মূর্ত্তিটি দ্বিভুজ, পদ্মকর এবং পদ্মপদ তাঁহার মূর্ত্তি। এখানে সপ্তাশ্বের পরিবর্ত্তে একটি মাত্র অশ্ব খোদিত রহিয়াছে—সপ্তাশ্বের প্রতীক স্বরূপ। এ মূর্ত্তিটির মাথার উপরে সুন্দর ত্রিকোণাকৃতি মুকুট। দুই হস্ত দ্বারা তিনি দুইটি সনাল পদ্ম ধারণ করিয়াছেন। ঠিক্ ধ্যানের অনুরূপ:

পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভ সমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজঃ স্যাৎ সদা রবিঃ।

মূর্ত্তিটির প্রত্যেক অংশ অতি নিপুণভাবে খোদিত এবং অভগ্ন। বিকশিত শতদলোপরি তাঁহার চরণ যুগল সুরক্ষিত এবং পাদদ্বয়ের মধ্যে উপবিষ্ট অরুণ সারথি সুস্পষ্ট ভাবে খোদিত আছেন। 'অগ্নিপুরাণে' আছে:

'সপ্তাশ্বে চৈকচক্রে রথে সূর্য্য দ্বিপদ্মধৃক্।'

এই নবগ্রহমূর্ত্তি খোদিত প্রস্তর-ফলকেও তাহাই আছে। সূর্য্যের পর তৃতীয় মূর্ত্তি বা নবগ্রহ মূর্ত্তির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে—গণেশ মূর্ত্তি বাদ দিলে দ্বিতীয় মূর্ত্তি হইতেছেন সোম বা চন্দ্রের (Moon)। চন্দ্র ধ্যানের অনুরূপ খোদিত। ইনি জটামুকুটধারী। ইনিও বিকশিতশতদলোপরি দণ্ডায়মান। কর্ণে গোলাকার কুণ্ডল। সূর্য্যের মূর্ত্তি যেমন অভগ্নভাবে খোদিত, এই মূর্ত্তিটি তদ্রূপ নহে। ইঁহার দেহ দক্ষিণ দিকে একটু

হেলানো এবং বাম পদটিও একটু বক্রভাবে খোদিত রহিয়াছে। চন্দ্রের এক হস্তে মণিসম্পুট, আর বাম হস্তে জলপূর্ণ কমণ্ডলু। ইঁহার বাহন রহিয়াছে মকর। চন্দ্র বরুণদেবতার আদর্শে খোদিত বলিয়া ইনি মকরবাহন এবং দক্ষিণ করকমলে ধৃত হইয়াছে মণি-সম্পুট। বরুণ জলাধিপতি দেবতা। চন্দ্রও সমুদ্রমন্থনে সাগর-গর্ভ হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাজেই দুর্লভ বরুণ মূর্তির কোন কোনটিতে জলদেবতার চিহ্ন স্বরূপ জাল বা দড়ি দক্ষিণ হস্তে থাকে, কোথাও মণিরত্ন সম্পুটক থাকে। আমাদের এই নবগ্রহ মূর্তির দক্ষিণ করধৃত রহিয়াছে মণি-সম্পুটক উহা স্কন্ধের নিকট ধৃত রহিয়াছে। এই নবগ্রহ ফলক খোদিত সোম মূর্তির বাহন মকর রূপে খোদিত। বরুণের কথা বলিতে গিয়া অগ্নি পুরাণকার বলিয়াছেন :—'মকরে বরুণঃ পাশী বায়ুর্ধ্বজো মৃগে।' বরুণের বাহন—মকর বা মৃগ হয়। অর্থাৎ বরুণ পাশ হস্তে মকরে আসীন রূপে নির্মিত হইবেন। কিন্তু 'মৎস্যপুরাণে' আছে :—

'বরুণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি পাশহস্তং মহাবলম্।
মৃণালিকস্ত বরদং পতাকাভয় সংযুক্তম্।'

এই মূর্তিটি অগ্নি পুরাণের মতানুযায়ী মকর বাহনরূপে খোদিত হইয়াছে। 'মৎস্য পুরাণে' আছে :

শ্বেতঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শ্বেতাশ্বঃ শ্বেতবাহনঃ।
গদাপাণি দ্বিবাহুশ্চ কর্তব্যো বরদঃ শশী।

সোম—শ্বেতবর্ণ, শ্বেত বস্ত্রধারী, গদাপাণি, দ্বিভুজ, বরদাতা এবং শ্বেতাশ্ব-যোজিত শ্বেতরথে বিরাজিত। কিন্তু এই ধ্যানানুযায়ী এই মূর্তির সাদৃশ্য সম্পূর্ণ ভাবে নাই। সোম এখানে শ্বেতাশ্ববাহন কিংবা গদাপাণি নহেন। এখানে ইনি বরুণের মূর্তির আদর্শেই খোদিত আছেন।

সোমের পর—আমরা মঙ্গলের (**MARS**) মূর্তি দেখিতে পাইতেছি। মঙ্গলের মূর্তিটি ঋজুভাবে দণ্ডায়মান। পদতলে পদ্মদল। মস্তকে কুণ্ডলীকৃত জটা ও তাহার উপর কিরীট। ইনি দ্বিভুজ। ইঁহার বাহন ময়ূর। কার্তিকেয়, স্কন্দ, কুমার বা সুব্রহ্মণ্যের প্রতীক রূপে মঙ্গলের মূর্তিটি খোদিত। কার্তিকেয় হইতেছেন মঙ্গলগ্রহের অধিপতি দেবতা। কাজেই মঙ্গলগ্রহের মূর্তিও যুবশক্তি জ্ঞাপক মহাবলের বীরত্ব মূর্তি ও রণদেবতার আদর্শে গঠিত। গ্রীক দেবতা মার্স (Mars) গ্রীকদের রণদেবতা। আমাদের মঙ্গলগ্রহটিরও দক্ষিণ হস্তে ধৃত একটি কাণ্ড। বাম হস্তে একটি শূল ধারণ করিয়া আছেন। মঙ্গল মূর্তির ধ্যান আমরা মৎস্য পুরাণে পাই :

রক্তমাল্যাম্বরধরঃ শক্তি-শূল গদাধরঃ।
চতুর্ভুজঃ মেষগমো বরদঃ স্যাদ্ধরাসুতঃ।

রক্তবসন মঙ্গল—রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্রধারী, চতুর্ভুজে শক্তি, শূল, গদা ও বর ধারণ করিয়াছেন, ইঁহার দেহ রক্তবর্ণ কিন্তু সোমমূর্তি শ্বেতবর্ণ। আবার 'মৎস্য পুরাণের' অপর স্থানে—কার্তিকেয়ের বর্ণনায় দ্বিভুজেরও উল্লেখ আছে। অতএব এখানে মঙ্গলের মূর্তিটি দ্বিভুজ স্কন্দদেবতার রূপেরই প্রতিচ্ছবি। তবে কুক্কুট বাহনের পরিবর্তে এখানে ময়ূরবাহন রূপে খোদিত রহিয়াছে। মৎস্য পুরাণেও কার্তিকেয়ের বর্ণনায় একস্থানে আছে ; 'দ্বিভুজস্য করে শক্তির্বামে স্যাৎ কুক্কুটোপরঃ।'

বুধ (**Mercury**)। মঙ্গলের পরেই আমরা বুধগ্রহের মূর্তি দেখিতে পাইতেছি। বুধের অধিপতি বিষ্ণু। ইঁহার কাণ্ড মুকুট। দ্বিভুজ। বাহন মেষ। দক্ষিণ হস্তে ধৃত তীর এবং বাম হস্তে ধনু। মৎস্য পুরাণে আছে :—

পীতমাল্যাম্বরধরঃ কর্ণিকারসমদ্যুতিঃ।
খড়্গ-চর্ম-গদাপাণিঃ সিংহস্থো বরদো বুধঃ।

কর্ণিকার কুসুমবৎ দ্যুতিশালী ও পীতবর্ণ বস্ত্রমাল্যানুলেপনধারী ; ইনি চারিহস্তে খড়্গ, চর্ম, গদা ও বর ধারণ করিয়াছেন এবং সিংহ পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। এই বর্ণনার সহিত আমাদের এই ফলকখোদিত মূর্তির সঙ্গে একেবারেই মিল নাই। 'অগ্নিপুরাণে আছে :—

বুধশ্চাপাক্ষপাণিঃ স্যাজ্জীবঃ কুণ্ডাক্ষমালিকঃ।

বুধের হস্তে ধনু ও অক্ষমালা। কিন্তু এখানে আছে বাম হস্তে ধনু আর দক্ষিণ হস্তে বাণ। বুধ বিষ্ণুতুল্য। বুধের অধিপতি হইতেছেন বিষ্ণু।

বৃহস্পতি (**Jupiter**)। বৃহস্পতির অধিপতি ব্রহ্মা। কাজেই বৃহস্পতি গ্রহ ব্রহ্মার মূর্তির আদর্শে খোদিত। মস্তকে জটামুকুট। লম্বোদর। দ্বিভুজ। স্থূলাকার। শতদলোপরি গুরুভারাবনত দেহে দণ্ডায়মান। বাহন-হংস। দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা। বাম হস্তে কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন। মৎস্যপুরাণের মতে :—দেবগুরু বৃহস্পতি—পীতবর্ণ চতুর্ভুজ। দণ্ড, বর, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারী। কিন্তু এখানে বৃহস্পতি দ্বিভুজরূপে খোদিত। বৃহস্পতির পরে রহিয়াছেন শুক্রগ্রহ (**Venus**)। ইনি দ্বিভুজ, দক্ষিণ হস্তে করধৃত অক্ষমালা—আর বামহস্তে ধারণ করিয়াছেন কমণ্ডলু। দৈত্যগুরু শুক্র, শ্বেতবর্ণ, চারিহস্তে দণ্ড, বর অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করেন। ইনি এখানে দ্বিভুজরূপে খোদিত। শুক্র বৃশ্চিক বাহন।

শুক্রের পরে রহিয়াছেন শনি (**Saturn**)। ইঁহার অধিপতি হইতেছেন যম। কাজেই শনির মূর্তিটিও যমের অনুরূপ। প্রত্যালীঢ় পদে শতদলোপরি দণ্ডায়মান—বাহন মহিষ। দক্ষিণ হস্তে বরদ মুদ্রা, আর বাম হস্তে দণ্ডধারণ করিয়া আছেন। 'মৎস্যপুরাণের' বর্ণিত—ইন্দ্রনীল সমকান্তি, গৃধ্রোপরি আরূঢ়, চারিহস্তে শূল, বর, ধনু ও বাণ ধারণ করেন এইভাবে শনি মূর্তি এখানে খোদিত হয় নাই। এখানে অধিপতি যমের অনুরূপ—শনিগ্রহ খোদিত রহিয়াছেন।

শনির পরে রাহু মূর্তি। (**Ascending Node**)

রাহুর বৃহৎমুখ। ইনি হইতেছেন—'সর্প প্রত্যধিদেবতম্'। রাহুর যেমন বৃহৎ মুখ, তেমনি তাহার চ্যাপ্টা বড় নাক। মাথার চুল কুঞ্চিত ও দুইটি সারিতে বিভক্ত, কতকটা সেকালের মহিলাদের পাতাকোটা চুল বাঁধার মত। দুইখানি। বড় হাত। দুই কর্ণে পত্র কুণ্ডল। এ মূর্তির নাকের দিক্ কতকটা ভাঙিয়া গিয়াছে। রাহু স্বাভাবিকই করালবদন, চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত ও অক্ষি গোলক দুইটি যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে। কপালের উপরেও একটি চক্ষু দেখা যায়। মৎস্যপুরাণের মতে রাহু হইবেন,—

করালবদনঃ খড়্গ চর্ম-শূলী-বরপ্রদঃ।
নীলসিংহাসনস্থশ্চ রাহুরত্র প্রশস্যতে।

অর্থাৎ রাহু—করালবদন, খড়্গ, চর্ম, শূল ও বরধারী, নীলসিংহোপরি উপবিষ্ট। এই বর্ণনার সহিত আমাদের এই নবগ্রহ ফলকের খোদিত রাহুর সাদৃশ্য নাই। রাহু এখানে 'অর্ধচন্দ্রধরো রাহুঃ।' অগ্নি পুরাণের বর্ণনানুরূপ। রাহুর মূর্তিতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—তাহা হইতেছে গোঁফ ও দাড়ি। দাড়ি একেবারে গালপাটা গোছের। কণ্ঠে রহিয়াছে মুক্তার মালা। বাহুতে অনন্ত ও ভুজবন্ধ। গলায় উপবীতও রহিয়াছে। মস্তকোপরি শিখাসংযুক্ত প্রভাবলী। রাহু নবগ্রহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট মূর্তি। হিন্দু মাত্রেই রাহুকে স্বতন্ত্র গ্রহ-দেবতারূপেও পূজা করিয়া থাকেন।

রাহুর পরে রহিয়াছেন কেতু। (**Descending Node**) কেতুর অধিপতি হইতেছেন—গণেশ। 'কেতুঃ খড়্গী চ দীপভৃৎ।'—কেতুর দক্ষিণ হস্তে খড়্গ আর বাম হস্তে দীপ। নিম্নাংশ সর্পাকৃতি। বাহন গৃধ্র। কেতু হইতেছেন গৃধ্রারূঢ়। "মৎস্যপুরাণ মতে" :—

ধূম্রা দ্বিবাহবঃ সর্বে গদিনো বিকৃতাননাঃ।
গৃধ্রাসনগতা নিত্যং কেতবঃ স্যুর্বরপ্রদাঃ।

কেতুগণ—ধূম্রবর্ণ, দ্বিবাহু, গদাহস্ত, বিকৃতাননও গৃধ্রারূঢ়। এখানে এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে গদা রহিয়াছে।

যে নবগ্রহ মূর্ত্তিটির পরিচয় এখানে দিলাম, এই মূর্ত্তিটি ইছাপুরা গ্রাম নিবাসী স্নেহভাজন শ্রীমান শচীন্দ্রলাল গোস্বামী তাঁহাদের বাটীসংলগ্ন ভগ্ন মন্দিরের ইষ্টক ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তর মূর্ত্তি ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর হইতে এই নবগ্রহ মূর্ত্তি খোদিত প্রস্তর ফলকের পূর্ব্বে আর কোনও নবগ্রহমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

আমাদের এই মূর্ত্তিগুলি যেমন একখানি প্রস্তরখণ্ডে দণ্ডায়মানভাবে খোদিত, তেমনি ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত একটি নবগ্রহমূর্ত্তি সম্বলিত প্রস্তর আছে। তবে সেই মূর্ত্তিগুলির মুখ ও অন্যান্য অবয়ব তত স্পষ্ট এবং এইরূপ কারুকার্য্য-নৈপুণ্য সম্বলিত নহে।

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মেও নবগ্রহমূর্ত্তি আছে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের চিত্রশালায়ও একখানি নবগ্রহ সংযুক্ত প্রস্তর-ফলক রহিয়াছে। প্রস্তরখানির আকার (১'৮২"×৯")। নবগ্রহের মূর্ত্তি যথাক্রমে সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু রহিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলি উপবিষ্টাকারে খোদিত। ঐ মূর্ত্তি কয়টির মধ্যে রাহুর মূর্ত্তিটি অপরূপ—উহার দুইখানি হাতের দশটি অঙ্গুলির দ্বারা তাহার উদর ভাগ আবৃত। আর মূর্ত্তির নীচে রহিয়াছেন লক্ষ্মী। এই মূর্ত্তিটির মধ্যে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মী বিকশিত শতদলোপরি উপবিষ্টা। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বরদ মুদ্রা, বাম হস্তের দ্বারা একটি পদ্মধারণ করিয়া আছেন। লক্ষ্মীর দুই দিকে দুইটি মূর্ত্তি দণ্ডায়মানভাবে খোদিত। এক দিকের মূর্ত্তি যোড়হাতে দাঁড়াইয়া আছে। অপর মূর্ত্তিটি একটু অদ্ভুত ধরণের। উহার মাথাটি হইতেছে হাতীর, এক হাতে একটি কলসী। এইরূপ মূর্ত্তি বিরল।

'Indian Images' নামক গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নবগ্রহ মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন: Separate and detached images of the planets except those of the Sun and the Moon have not unfortunately come down to us. The images are, in usual, found together in one slab (page 32)। অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্রের মূর্ত্তি ব্যতীত বিচ্ছিন্ন ভাবে নবগ্রহের বিভিন্ন গ্রহের খোদিত মূর্ত্তি বড় দেখা যায় না। অধিকাংশই একটি প্রস্তর ফলকে এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরা যাদুঘরে রাহুর একটি একক মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মিঃ ভি. এস্ আগ্রাওয়ালা এম্.এ. এই মূর্ত্তিটির সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তিনি ঐ মূর্ত্তি সম্বন্ধে "Journal of the Hindusthan Academy in Hindi" নামক পত্রে আলোচনা করিয়াছিলেন।

নবগ্রহ মূর্ত্তির প্রচার কতদিন হইতে তাহা বলা কঠিন। তবে অনেকের মতে গুপ্ত রাজাদের রাজ্যকালেই এই সব মূর্ত্তির প্রচার বেশী হয়। ভি. এস্ আগ্রাওয়ালা বলেন 'The sculpturing of these planets in Hindu Iconography took place in the Gupta period for the first time and since then slabs or stelace bearing their images have formed a common feature of decoration in the Brahmanical temples both in north and south India." Brahmanical Images in Mathura by Mr. V. S. Agrawalla Vol vii January 1917.) অতএব এই নবগ্রহ মূর্ত্তির প্রচলন ও খোদিত প্রস্তরফলকের প্রচার পঞ্চম খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজাদের রাজত্বকালেও প্রচারিত হইতে থাকে। এই ভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে—বিক্রমপুর ভাগে নবগ্রহ মূর্ত্তি পূজা প্রচলিত হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বিক্রমপুরের বহু গ্রাম হইতেই সূর্য্য মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সূর্য্যের ব্রতের বিবিধ অনুষ্ঠান আজ পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। কাজেই নবগ্রহের পূজার প্রচলন যে বিক্রমপুরে বহুল পরিমাণে ছিল এবং এখনও গ্রহশান্তি উপলক্ষে গ্রহ পূজা হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন।

'মৎস্য পুরাণে' অযুত আহুতি যুক্ত নবগ্রহ হোমের উল্লেখ আছে। এই নবগ্রহের ভাস্করের অধিদেবতা ঈশ্বর, শশীর উমা, মঙ্গলের স্কন্দ, বুধের হরি, বৃহস্পতির ব্রহ্মা, শুক্রের ইন্দ্র, শনির যম, রাহুর কাল এবং কেতুর চিত্রগুপ্ত।

আজ্‌কে তুমি আস্‌তে যদি

কবিকঙ্কন শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মাঠের ধারে চলার পথ বিছিয়ে আছে আমের কোলে,
ফুলের ভারে কোমল তরু পড়ছে নুয়ে বীথির কোলে।
কোথায় যেন নদীর পারে বেহাগ সুরে বাজছে বেণু,
তোমার স্মৃতি-হিল্লোল-ছায়া রাতের দেহে দুল্‌ছে—রেণু!
শুনিয়ে গেছে আমার কানে প্রেমের গীতিছন্দে গানে,
হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতি তার দখিন হাওয়া আন্‌ছে প্রাণে।
তারায় ভরা এমন রাতে গোপন কথা পড়ছে মনে,
আজ্‌কে তুমি আস্‌তে যদি ভালোবাসার কুঞ্জবনে!
নানা রঙের রসের ধারা ছিল আমার হৃদয় ছেয়ে,
মনের 'পরে ভাবের বোঝা রেখেছিলেম তোমায় পেয়ে।
ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলে আমার প্রাণ মনো কায়,
ফাঁকি দিয়েই পালিয়ে গেল, শুন্‌লে নাক আমার ডাক্।
একটি করে আয়ুর পাতা ঝর্‌ছে শাখা শূন্য ক'রে,
জীবনটা তো শুকিয়ে আসে তোমার স্মৃতি বক্ষে ধ'রে।
কেমন করে জীবনটাকে সজীব রাখি বসন্তেতে,
আজ্‌কে তুমি আস্‌তে যদি, যেতো দু'দিন আনন্দেতে!

বিদ্যুল্লেখা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

[illegible]।
[illegible]।

যে কথা যায় না বলা মুখের ভাষায়,
যে বাণী লুকানো থাকে বুকের বাসায়—
বিদায়ের ক্ষণে প্রিয়া তব আঁখি-পুটে,
না বলা লুকানো কথা ব্যক্ত হয়ে ফুটে।

মুগ্ধনয়নে চাহিলাম ক্ষণ চক্ষু মেলি'
বিদ্যুৎ-অক্ষর-লেখা পত্র-প্রান্তে ফেলি'
বিদায় লইনু যবে গোধূলি আকাশে
জ্বলে জ্বলে দুটি তারা মিটিমিটি হাসে।

প্রবাসে একক গৃহে সে আকুতি-ঢালা
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ মনে পড়ে বালা।
আনন বিয়োগ দুঃখে তব মুখচ্ছবি
অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমাখা মনে পড়ে সবি

নিত্য দেবালয়ে জ্বালা সব দীপধূপ,
মাঝে মাঝে মনে হয় অপূর্ব্ব স্বরূপ।

অনাহূতা

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

শহরের বুকে ছোট্ট একটা বাড়ী : ছবির মত সুন্দর। ধবধবে সাদা পাথরের দেয়াল, যেন সদ্য বিধবার মৌন রূপ! সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে গোল বারান্দা। সামনে ছোট্ট বাগান; রঙ বেরঙের ফুল বাগান ভরে ছড়িয়ে পড়েছে পাতার ফাঁকে। বাগানের বুক চিরে ছোট্ট লাল সুরকীর পথ।

একটা মেয়ে—এক কিশোরী—ভীতপদে এই বাড়ীর গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। মেয়েটার বেশভূষায় দৈন্যতা! মুখটা চমৎকার : সরল, শান্ত মুখচ্ছবি।

ফটক খুলে কম্পিত পদে মেয়েটা ভিতরে এল। সাহস করে ও এগিয়ে এসেছে—তবু বুকটা কাঁপে অজানা ভয়ে! বাইরের এই আবহাওয়া দেখে ভেতরের মানুষটিকে যতটা সে চিনতে পারছে, তাতে তার ভয় হচ্ছে বৈকি! তার মনে হচ্ছে, এ মানুষকে সে যা ভেবে এখানে এসেছে, হয়ত সে তা নয়।

একটু পরে প্রশান্ত বাইরে এল। মেয়েটা অবাক হয়ে দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রশান্ত চৌধুরী। চোখে কাল ফ্রেমের চশমা; গায়ে ধূসর রঙের চাদর। সারা মাথা ভরে কাঁচাপাকা চুল; মুখে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ।

প্রশান্ত মেয়েটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন 'তুমি আমায় ডেকেছ?'

মীনা অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে জবাব দিল 'হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'আমার কাছে! কি দরকার?'

'আপনার অনেক বই পড়েছি। আমাদের মত মানুষদের দুঃখ আপনি বোঝেন—আপনার বই পড়ে আমি বুঝেছি। তাইত' সাহস করে আপনার কাছে এলাম, আশ্রয়ের জন্যে। এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই; দুনিয়ার দুঃখীদের আমিও একজন।'

প্রশান্ত এ-কথার উত্তর দিতে পারলেন না। মেয়েটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ওর আভিজাত্য নেই, গর্ব নেই; আছে দৈন্য। দৈন্যের মাঝে কেমন সরল রূপ!

'তুমি আশ্রয় চাও?'

'হ্যাঁ'

'এ বাড়ীর সব ঘরগুলোই প্রায় খালি পড়ে রয়েছে। আমিত' একা। তুমি ইচ্ছে ক'রলে থাকতে পার।'

এর উত্তরে মিনু বলল 'আপনার সম্বন্ধে আগে আমি অনেক কিছু কল্পনাই করেছিলাম। ভেবেছিলাম আপনি সত্যিই দুঃখীর দুঃখ বোঝেন! এখন দেখছি সবই আমার ভুল হয়েছিল!'

চমকে উঠলেন প্রশান্ত! 'কেমন করে বুঝলে?'

'এইযে আপনি আমায় আশ্রয় দিচ্ছেন, ঘরে থাকতে বলছেন; কিন্তু কই আপনার অন্তর থেকে ত' সাড়া জাগছে না!'

ম্লান হাসি হাসলেন প্রশান্ত। 'বাইরে থেকে অন্তর তুমি কেমন করে দেখলে? জানো, তোমার চেয়ে আমি কম দুঃখী নই!—এসো, ভেতরে চল—প্রশান্ত ওর গায়ে হাত রাখলেন।

মীনু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে, তার অনুসরণ ক'রল।

চমৎকার সাজান একটা ঘরে এসে প্রশান্ত থামলেন। মীনুকে বললেন 'এই তোমার ঘর, এখানেই তুমি থাকবে। পাশের ঘরটাতে আমি নিজে থাকি।'

মীনু বিস্ময়ে ঘরের চারিদিকে তাকাল। ঘর ভ'রে দামী আসবাব—গদী আঁটা চেয়ার, নরম বিছানা, ড্রেসিং-টেবিল!

মীনু বলে উঠল—এই…এই ঘর আমার।

'নিশ্চয়ই। এই ঘরে থাকবে, এই খাটে শোবে, রেডিওতে গান শুনবে। আর—'

'আর কি?'

'আর আমিও একজন বন্ধু পেয়ে বাঁচলাম। আসল কথা কি জান, এ বাড়ীতে একা আমার খুব ভয় করে! একথা কাউকে খবরদার বলনা!'

মীনু অবাক হয়ে এই আশ্চর্য্য মানুষটাকে দেখতে লাগল!

প্রশান্ত বললেন 'আর কি জান? প্রথম দেখেই তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি!'

প্রশান্ত জোরে হেসে উঠলেন।

মীনু আসবার পর থেকে এ বাড়ীরই শুধু পরিবর্ত্তন হয় নি, প্রশান্তর মনেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে; তার রোজকার জীবনধারা মীনু কেমন ক'রে বদলে দিয়েছে, প্রশান্ত তা বুঝতে পারেনা।

সকালে চায়ের সময় মীনু নিজে এসে দাঁড়ায়। রান্না ক'রে ও নিজের হাতে; বলে, বামুনঠাকুরের চেয়ে আমি কোন অংশে কম নই, পরীক্ষা করে দেখুন!

খেতে বসে ভাত ফেলে রাখলে তিরস্কারের অন্ত থাকেনা। বেশী রাত অবধি আলো জেলে লেখবার হুকুম নেই!

প্রশান্ত মনে মনে হাসেন। এতদিন ছন্নছাড়াভাবে জীবন চলে গেছে, তবু আজ এই স্নেহ-বাঁধনের মাঝেএকটুও তো খারাপ লাগে না! প্রশান্ত ভাবেন, কেমন ক'রে ও মেয়েটা এ'ল, কেমন করে টেনে আনল মায়ায়! কেমন করে এ বাড়ী ঐ কোমল হাতের পরশে নতুন রূপ পেল, সজীব হয়ে উঠল!

সেদিন আলমারী থেকে কি একটা বই বার করতে গিয়ে, নীল রঙের একটা খাম প্রশান্তর হাতে ঠেকল। খামের ভেতর থেকে নীল কাগজের চিঠি বার করলেন। অনেকদিন আগের তারিখ রয়েছে! গীতা লিখেছিল : তার এই শেষ চিঠি।

প্রশান্ত চিঠিটা বার বার পড়লেন। এতদিন গীতার কথা অনেকটা ভুলে ছিলেন; আজ আবার নতুন করে মনে এসে জাগল। ওর চিঠি অনাদরে পড়ে রয়েছে, কিন্তু মনের মাঝে তাকে প্রশান্ত কোনদিন অনাদর করেনি। ওরই জন্যে ত' প্রশান্ত

এমনি একা জীবন কাটিয়ে দিলেন, এমনি ক'রে ওরই জন্যে ঘর সাজিয়ে বসে রয়েছেন !

সীতার কথা আজ প্রশান্ত আবার ভাবতে লাগলেন। মীনু আসার পর সীতার কথা তিনি অনেকটা ভুলে ছিলেন !

হঠাৎ মাথার কাছে কার কোমল হাতের স্পর্শে চমকে উঠলেন—মনে পড়ল, সীতাও এমনি করে একদিন মাথায় হাত রেখেছিল !

'কে, মীনু ?'

'হ্যাঁ, কি এত ভাবছেন চুপ করে বসে ? ও চিঠিটা কার ?

প্রশান্ত তার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। কিছু না ভেবেই চিঠিটা ওর দিকে এগিয়ে দিলেন। যদিও ভাববার কিছু ছিলনা।

চিঠিটা শেষ করে, মীনু প্রশ্ন করল 'সীতা কে ?

'তোমারই মত ছিল সে একদিন। আজ সে হয়ত অনেক বড় হয়ে গেছে, অনেক বদলে গেছে···

মীনু কিছুক্ষণ চুপ করে বলল 'আপনি তাকে ভালবেসেছিলেন, না ?'

'তাইত' সে পালিয়ে গেল। জানো, সে কতদিন এ বাড়ীতে ছিল···কতদিন সে ঐ বাগানে ছুটোছুটি করেছে !'

'তার সঙ্গে আর আপনার দেখা হয়নি ?'

'আমিই তার সঙ্গে দেখা করিনা।'

মীনু বলে উঠল 'কেন ?'

প্রশান্ত উত্তরে শুধু ম্লান হাসলেন।

'আপনি জানেন, আজ সে কোথায় ?

'জানি।'

'তবে চলুন—এক্ষুণি আমায় সেখানে নিয়ে চলুন। আমি তাকে দেখব—তাকে এ বাড়ীতে নিয়ে আসব। চলুন—'

মোটর চলেছে। রাস্তা পার হয়ে, দুপাশে ফাঁকা মাঠ। আবার এল পথের কোলাহল। তারপর জনহীন শান্ত মাটি; মৌন রূপের মুখর ভাষা !···মোটর এসে থামল।

প্রশান্তর হাতে একগাদা লাল গোলাপ। কয়েকটা গোলাপ মীনুর হাতে দিয়ে বললেন 'ও ফুল খুব ভালবাসে। তুমি তাকে ফুল দিও, আমিও দোব।'

সাদা পাথরের শুভ্র বেদী। স্তব্ধ অথচ অপরূপ !

প্রশান্ত বললেন 'এই দেখ···কেমন চুপটি করে শুয়ে রয়েছে। এত ডাকি, কিছুতেই সাড়া দেয় না ! কি দুষ্টু বলত ? দাও মীনু ফুলগুলো ওকে দাও···আমি যখনই আসি ওকে ফুল দিই। ফুল ও বড় ভালবাসে !'

মীনু কথা বলতে পারল না।

মীনুর দু'চোখের জলে পাথরের বুকের ফুলগুলোকে ভিজিয়ে দিল···

প্রশান্ত স্তব্ধ ! তার সীতার জন্যে এমন করে কেউ ত' কাঁদেনি !

রাতে বার বার ঘুম ভেঙ্গে যায়। মনে হয় কে যেন এসেছে, কে যেন মাথার পাশে বসে রয়েছে ! এযে সীতারই স্পর্শ··· অনেকদিনের ভুলে যাওয়া সেই স্পর্শ ! সীতাই কি ফিরে এল ?

উঠে দাঁড়ালেন প্রশান্ত। ডাকতে চললেন মীনুকে। সীতাকে ও দেখতে চেয়েছিল···আজ এতদিন বাদে এ-বাড়ীতে সীতা এসেছে, আর মীনু দেখবে না ?

মীনুর ঘর খোলা, বিছানা খালি। মীনু নেই ? ··তবে কি চলে গেল ? কেন গেল ? কোথায় গেল ?

বিছানায় একটা চিঠি পড়ে রয়েছে !

'চললাম—শতবার ক্ষমা চাইছি। বুঝেছি, আমার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখী আপনি ! মাটির সীতা মাটিতে চলে গেছে, কিন্তু আপনার অন্তরের সীতা বেঁচে রয়েছে ! তাকে আমি দেখেছি !'

ধীরে ধীরে প্রশান্ত আবার নিজের ঘরে এলেন।

কই, সীতা তো নেই ? এরই মধ্যে সে চলে গেল ? মীনুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেছে, তাইত' সে চলে গেল !

মীনু একদিন না ডাকতেই এসেছিল ; আজ না বলেই চলে গেল। তবু তার আজ মীনুর জন্যে দুঃখ লাগছে, সীতা চলে যেতেও সে এমন করে অনুভব করেনি।

কেন ? কেন ?

বরষার মায়া

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

আষাঢ় আকাশে উঠিয়াছে ঝড়,
চারিদিকে কালো ছায়া,—
গর্জিয়া মেঘ হাঁকে কড়্ কড়্,
হানে বিদ্যুৎ-মায়া !
মায়া-বিদ্যুৎ ক্ষণিকের তরে
মনের মানুষে টানি' ;
দূরের মানুষ নিকটেতে করে
মানস-মুকুর খানি।
কাজল মেঘ গভীর রবে
গুরু গুরু ডেকে যায়—
ভাবি এ বরষা কেটে যাবে কবে
মধুপুরের নীলিমায় !

দূর আকাশের মেঘ নামিয়াছে
মন-আকাশের দেশে,
নয়নে বরষা তাই নামিয়াছে,
বুকেতে অশ্রু মেশে !
বুকের অশ্রু সহসা যে হায়
ধরার মাটীর 'পরে—
ঝরিয়া পড়িল ম্লান সন্ধ্যায়
না জানি কাহার তরে !
তপ্ত অশ্রু জলধারা সম
ঝরিছে অঝোর ধারে—
মনের বরষা ওগো মনোরম
মম 'রামগিরি' পারে !

কা চ বার্ত্তা

ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি (কলিঃ), এম-ডি (বার্লিন)

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চমোদতে। মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব।—(মহাভারত বনপর্ব্ব)।

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে,
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে।
সাধু পুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি,
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি।—(কাশীরাম দাস)

মার্ত্তু দর্ব্বী পরিবর্ত্তনেন সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।

অস্যার্থ—ঘটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাতে পাবক সবিতা।
মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্ত্তা।
ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্ত্তা।

যক্ষরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন এই প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। যুধিষ্ঠিরের উত্তর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে আসল কথাটা এই যে—ভূতগুলিকে পাক করা হইতেছে, কাল এই পাক কার্য্য করিতেছেন এবং পাকক্রিয়ার জন্য কটাহ, কাষ্ঠ, অগ্নি এবং ঘটন কারণ হাতার প্রয়োজন হইয়াছে। মোহময় সংসারই সেই কটাহ, রাত্রি দিবা সেই কাষ্ঠ, সবিতা সেই অগ্নি, ও মাস-ঋতু সেই হাতা। কটাহ, কাষ্ঠ, অগ্নি ও হাতা সহযোগে পাক কার্য্য হয় তাহা সামান্য বালকেরও অজ্ঞাত নয় ও ইহাতে বিশেষত্বও কিছু নাই। অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে হইলে এই সকলই অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, কটাহ, কাষ্ঠ, অগ্নি ও হাতা সাধারণতঃ ব্যবহৃত দ্রব্যগুলির মত নয়। ভূতগুলিকে পাক করা হইতেছে। ভূতগুলি কি অন্নব্যঞ্জনাদি হইতে পৃথক? আমাদের দেহ ও অন্নব্যঞ্জনাদি উভয়ই পাঞ্চভৌতিক। অতএব অন্নব্যঞ্জনাদির পাক ও ভূতগণের পাক এক পর্য্যায়ভুক্ত করিলে কি হয়—তাহাই আলোচনা করা যাউক। এই আলোচনার সুবিধার জন্য এই পাককার্য্য একটী চিত্রের সাহায্যে দেখান হইয়াছে। চিত্রে—সাধারণ রকমের উপযোগী কটাহ, কাষ্ঠ অগ্নি ও হাতা দেখান হইয়াছে এবং পাকের জন্য উহাতে অন্নাদি ও জল দেওয়া হইয়াছে।

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে প্রধানতঃ দেখা যায় যে ভূতগণ পাকপ্রাপ্ত হইতেছে, তৎপরে তাহারা বিপর্য্যস্ত হইতেছে। স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ-সৃষ্টির মধ্যে মানব সৃষ্টিই প্রধান সৃষ্টি, কারণ একমাত্র মানবই প্রকৃতির বিচারে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইবার অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ—জীবমাত্রেই মোহময় সংসারে আবদ্ধ থাকে ও মানুষও যতদিন না দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয় ততদিন সংসারে আবদ্ধ থাকে। ইহার কারণ অমুক, তাহার কারণ অমুক, এইরূপ কার্য্য পরম্পরা অনুসন্ধান করিলে যে নিত্য পদার্থে গিয়া শেষ হইবে তাহাই প্রকৃতি বা কারণ ও বাকী সবই কার্য্য। প্রকৃতির প্রথম কার্য্য বুদ্ধি তাহা হইতে অহঙ্কার, এইরূপে ৫ তন্মাত্রা, ১০ ইন্দ্রিয় (৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন) ও ৫ মহাভূত এই ২৩ কার্য্য উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি ও ২৩ কার্য্য এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব (যৌগিক পদার্থ সকলেই জড় ও অচেতন। কেবলমাত্র পুরুষ বা আত্মার সংযোগে সচেতন হয়, কারণ একমাত্র আত্মাই চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা অজ্ঞানতাবশে সংসারী ও অসংসারী হন। তিনি নিজে অসংসারী, কেবলমাত্র প্রকৃতি সহযোগে সংসারী হন। সেইজন্য যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—"মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্ত্তা।" এই কর্ত্তারূপী কাল কে? পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ কর্ত্তা, প্রকৃতি কারণ, ও বাকী ২৩টী কার্য্য। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস হইতেছে যুধিষ্ঠিরের মতে ইহাই বার্ত্তা এবং এই বার্ত্তা যিনি সম্যকরূপে জানেন—সাংখ্যকারের মতে তিনি মোহময় সংসার কটাহ হইতে মুক্ত।

"পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসেত,
জটী-মুণ্ডী-শিখী-বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।"

অর্থাৎ—যিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব জানেন তিনি জটী (জটাধারী সন্ন্যাসী) মুণ্ডী (মুণ্ডিত মস্তক বানপ্রস্থ অবলম্বী) শিখী (শিখাধারী অর্থাৎ সংসারী) যে কোনও আশ্রমে থাকেন না কেন, তিনি মুক্ত পুরুষ অর্থাৎ মোহময় সংসার হইতে মুক্ত।

মনুষ্য সৃষ্টির স্তর ও উৎকর্ষ হিসাবে শাস্ত্রকারেরা মনুষ্যকে পাঁচটী কোষে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—(১) অন্নময় কোষ, (২) প্রাণময় কোষ, (৩) মনোময় কোষ, (৪) বিজ্ঞানময় কোষ, (৫) আনন্দময় কোষ। আত্মা সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ এবং এই পঞ্চকোষ হইতে ভিন্ন।

"কা চ বার্ত্তা"—এই প্রশ্নের উত্তরে এই পঞ্চ কোষময় সৃষ্টিরই বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

অন্নময় কোষ

শাস্ত্রকারেরা বলেন এই স্থূলদেহ অন্ন হইতে জাত ও অন্ন হইতেই বর্দ্ধিত এবং অন্নের অভাবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য ইহার আর একটী নাম অন্নময় কোষ। সাংখ্যকারেরা ইহাকে ষাটকৌষিক দেহ বলেন কারণ ইহা ত্বক, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এই ছয়টী কোষ দ্বারা গঠিত। এই স্থূলদেহ পাঞ্চভৌতিক। কিন্তু—সে সম্বন্ধেও মতান্তর আছে। "চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে, ঐকভৌতিকমিত্যপরে" (সাংখ্য ৩।১৮, ১৯)। কেহ কেহ বলেন স্থূলদেহ—চাতুর্ভৌতিক অর্থাৎ আকাশ ব্যতিত আর ৪ ভূতের মিলিত পরিণাম। অপরে বলেন, ইহা এক-ভৌতিক অর্থাৎ ইহা কেবল পার্থিব ভূতেরই বিকার, ইহাতে পার্থিব ভূত প্রধান, অন্য ভূত উপষ্টম্ভক। "সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদান মসাধারণ্যাৎ তদ্ব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ"। (সাংখ্য ৫।১১২) সমস্ত স্থূল শরীরের উপাদান পৃথিবী। পৃথিবী স্থূল শরীরে অসাধারণ অর্থাৎ অধিক। স্থূল শরীর পার্থিব ভূত প্রধান।

সেইজন্য চিত্রে পার্থিব ও আপ্য এই দুই ভূতেরই পাক হইতেছে; দেখান হইয়াছে ও অন্য তিন ভূত সেই পাক কার্য্যের জন্য সাহায্য করিতেছে। যে সকল পদার্থ বিশেষভাবে স্থূল, স্থির, মূর্ত্তিমান, গুরু, খর ও কঠিন তাহাই পার্থিব ও যেগুলি দ্রব, সর, মন্দ, স্নিগ্ধ, মৃদু ও পিচ্ছিল তাহাই জলীয়। চিত্রে—আমাদের খাদ্যের মধ্যে যেগুলি পার্থিব তাহাই একটা থালা হইতে ও যেগুলি জলীয় তাহা একটী কলস হইতে কটাহে ঢালা হইতেছে। পঞ্চভূতের মধ্যে পার্থিব ও জলীয় ভূতই শরীর গঠনে প্রধান। পক্ষান্তরে শরীরে যাহা উষ্মা, প্রভা, পিত্ত, বর্ণ (গৌরাদি) সন্তাপ (উষ্ণতা) আকিকৃতা (শীতভয়) পক্তি (পরিপাক) ক্রোধ, আশুক্রিয়া ও শৌর্য্য তাহাই আগ্নেয়—আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উহাকেই ভূতাগ্নি, জাঠরাগ্নি, ধাত্বাগ্নি ও কায়াগ্নি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের উত্তরে উহাকেই সবিতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার কার্য্য রাত্রি-দিবারূপ কাষ্ঠ দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। চিত্রে—ইহাই অগ্নিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শরীরের সর্ব্ব চেষ্টাসমূহ (যথা উত্থানাদি সর্ব্ব ক্রিয়াসমূহ) সর্ব্ব শরীর স্পন্দন, উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, উন্মেষ-নিমেষ, আকুঞ্চন-প্রসারণ, গমন, প্রেরণ ও ধারণাদি বায়বীয়। চিত্রে এই সকল কার্য তিনভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১। ধারণকার্য্য কটাহরূপে, ২। উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাস হাপররূপে এবং ৩। সর্ব্ব চেষ্টাসমূহ, আকুঞ্চন প্রসারণ, গমন প্রেরণাদি হাতার কার্য্যরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। চিত্রে এইগুলি বায়বীয় ভূতরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

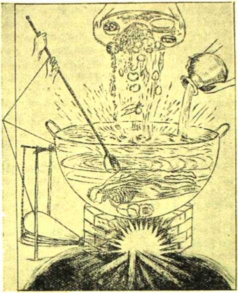
ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্ত্তা

শরীরের ছিদ্র সকল এবং মহৎ ও সূক্ষ্ম স্রোতঃ সকল আকাশীয় পদার্থ। চিত্রে এই পাককার্য দ্বারা খাদ্য দ্রব্যের পরিপাক কার্য্যে যে যান্ত্রিক (Physical) ও রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেছে তাহাই আকাশীয় ভূতের পাক কল্পনা করা হইয়াছে। চাউল, দুগ্ধ ও শর্করা একত্রে পাক করিয়া পরমান্ন প্রস্তুত কার্য্য—দুগ্ধ ও শর্করা চাউলের মধ্যবর্ত্তী আকাশে (Ether) প্রবেশ করার ফলেই পরমান্নের ঘনত্ব (ঘনভাব) ও চাউলের স্ফীতি উৎপন্ন করে। ঘনীভূত করাই আকাশ ভূতের কার্য্য)

পঞ্চভূতের পাক হইতেই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে যে উপযোক্তরূপে পাক করার ফলে কটাহের মধ্যে এক মানবদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে গর্ভাঙ্কুর বা কলল উর্দ্ধবায়ু ও জঠর তাপ দ্বারা পরিপাক হইতে থাকে। এইরূপে উহা ঘনীভূত হয়, এই ঘনতা জন্মিতে এক মাস সময় লাগে। এই পরিপাক প্রণালী দুগ্ধের পাকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দুগ্ধ পাক করিবার সময় যেমন সর পড়ে সেইরূপ গর্ভাঙ্কুরের দেহে স্তরে স্তরে সাতটা সর পড়ে। এই সাতটী সরই পরে রসরক্তাদি সপ্ত ধাতুরূপে পরিণত হইবে। ইহা সপ্তত্বক কলা নামে অভিহিত হয়। যথা—১। মাংসধরাকলা—ইহা হইতে শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও স্রোতোবহানাড়ী উৎপন্ন হয়। ২। রক্ত ধরা কলা—ইহা হইতে রক্ত উৎপন্ন হয়। ৩। মেদোধরা কলা—ইহা হইতে মেদ (সূক্ষ্মাস্থিস্থিত রক্তবর্ণ স্নেহ পদার্থ), মজ্জা (স্থূলাস্থিগত স্নেহ পদার্থ), যথা—(মাংসান্তর্গত স্নেহ পদার্থ উৎপন্ন হয়) ৪। শ্লেষ্মধরা কলা—ইহা হইতে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয়। ৫। মলধরা কলা—ইহা হইতে মল বিভাগ ও মল নিঃসারণ হয়। ৬। পিত্ত ধরা কলা—ইহা হইতে পক্কাশয়গত ভুক্ত দ্রব্যের ও তৎপরিপাক প্রভাবে রসের গ্রহণ ও ধারণ করে। ৭। শুক্রধরা কলা—ইহা চরম ধাতু উৎপাদন ও বিস্রাবণ করে। প্রশ্ন হইতে পারে এই সপ্তকলার মধ্যে প্রথমে মাংসধরা কলা ও পরে রক্তধরা কলা কেন? সুশ্রুত বলেন—ধারণ বিষয়ে এই ক্রম, পোষণ বিষয়ে প্রথমে রক্ত পরে মাংস। সু-শা-৪।৬-২১।

উক্তরূপে পাক করার ফলে পার্থিব ও আপ্যাভূত দুই অংশে বিভক্ত হয়—সারভাগ ও কিট্টভাগ। পার্থিব দ্রব্যের সারভাগ মাংস, কণ্ডরা, অস্থি ও দন্ত এবং কিট্টভাগ চর্ম্ম, নখ, কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও পুরীষ। আপ্য দ্রব্যের সারভাগ রস, রক্ত, মেদ, মজ্জা ও শুক্র এবং কিট্টভাগ—কফ পিত্ত, মূত্র ও স্বেদ। (বিচার চন্দ্রোদয় পৃঃ—৩১)

আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology) মতে গর্ভাঙ্কুরে তিনটী স্তর লক্ষিত হয়। যথা—(Epiblast, Mesoblast, ও hypoblast) Epiblast হইতে ১। চর্ম্ম ও তাহার আনুষঙ্গিক লোম, নখ, দন্ত, স্বেদ ও স্তন উৎপন্ন হয়। ২। নাড়ীতন্ত্র—যথা, মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড, ও নাড়ীমণ্ডলী উৎপন্ন হয়। চিত্রে—কটাহের তলদেশে যে মনুষ্য মূর্ত্তি অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহাতে এই তিনটী স্তরের কার্য্য বুঝিতে পারা যাইবে। Mesoblast হইতে ১। শারীর ধাতু সমূহ, যথা—অস্থি, মাংস ও মেদ। ২। রক্তসংবহনতন্ত্র (Circulatory System) যথা—হৃৎপিণ্ড, ধমনী ও শিরা, রক্ত, প্লীহা ও মূত্রযন্ত্র। ৩। সংযোজক-তন্তু, (Connective tissue) যাহা সর্ব্বশরীরে প্রতিকোষকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধারণ করে এবং ৪ জননযন্ত্রাদি (Generative system) যথা—ডিম্বকোষ ও অণ্ডকোষ উৎপন্ন হয়। Hypoblast হইতে ১। অন্নপচন যন্ত্রাদি (Digestive System) যথা—মহানাল (Alimentary canal) লালাগ্রন্থি, যকৃত ও অগ্ন্যাশয়। ২। শ্বাসযন্ত্রাদি, (Respiratory system) যথা ফুসফুস, ক্লোম, ও স্বরযন্ত্র ৩। অন্তঃস্রাবীগ্রন্থি (Ductless glands) যথা গ্রৈবেয়গ্রন্থি—(thyroid), বালগ্রৈবেয়ক গ্রন্থি (thymus), অধিবৃক্ক (suprarenal), পুংকন্দ (pineal) ইত্যাদি।

চিত্রে কটাহের তলদেশে মনুষ্যদেহ উৎপন্ন সময় কিরূপে epiblast, mesoblast ও hypoblast উৎপন্ন হয় তাহা অঙ্কিত হইয়াছে। এই তিনটী স্তর হইতে শরীরের কি কি অঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সকল অঙ্গ শরীর গঠনে কিরূপ অংশ গ্রহণ করে পণ্ডিতেরা তাহাও হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন। সমস্ত শরীরে epiblast শতকরা ৭½ ভাগ, mesoblast ৮৩½ ভাগ ও hypoblast ৯ ভাগ গঠন করে। ১নং তালিকায় তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

তালিকা নং ১—শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পরিমাণ।

* ১২গ্রাম—প্রায় ১ তোলা।

উপরি কলল	চর্ম্ম ইত্যাদি	চর্ম্ম————৩০০০
(Epiblast)	৫%	লোম, নখ, দন্ত—২০০
৭½%		ঘর্ম্ম ও স্বেদগ্রন্থি, স্তন—২০০
	নাড়ীতন্ত্র—	মস্তিষ্ক— — — —১৩০০
	২½%	সুষুম্নাকাণ্ড————৩০
		নাড়ীমণ্ডলী——— ৩০০
মধ্য কলল	ধাতু ইত্যাদি	সংযোজক তন্তু (৭%) ৪০০০
(Mesoblast)		মাংস——(১৩%) ১০৮০০
৮৩½%		মেদ——(১১%) ৭৫০০
		অস্থি——(১৩½%) ৩১০০০
	রক্ত সংবহন যন্ত্রাদি	
	৯%	রক্ত— ৭% ৫০০০

		হৃৎপিণ্ড—	(২%)	৩০০
		ধমনী, শিরা		৩০০
		প্লীহা		২০০
		রসগ্রন্থি		২৫
		বৃক্ক		৫০০
	জননযন্ত্রাদি			
		ডিম্বকোষ		৮
		অণ্ডকোষ		৫০
অধঃ স্তর (Hypoblast) ৭%	পরিপাক যন্ত্রাদি—			
		মহান্ত্র		১৩০০
		লালাগ্রন্থি		৭৫
		যকৃত		১৮০০
		অগ্ন্যাশয়		১০০
	শ্বাস যন্ত্রাদি	স্বরযন্ত্র ও ক্লোম		৫০
		ফুসফুস		১০০০০
	অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি	থাইরয়েড		৩৫
		প্যারাথাইরয়েড		২৫
		অধিবৃক্ক		৮
				৭০,০০০

সুতরাং মনে থাকে এই গুণ বার্তা। ভূত কাহাকে বলে?

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে কতকোটি বিভিন্ন দ্রব্য আছে তার স্থিরতা নাই। আর্য্য ঋষিরা এই অনন্তকোটি দ্রব্যকে ৫ ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যদিও তাহারা পৃথক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল দ্রব্যই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই ৫ প্রকার দ্রব্য কিংবা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল দ্রব্যই এই পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা গঠিত হইয়াছে। যেমন কুটীর হইতে অট্টালিকা সকল গৃহই ইঁট, চুন, সুরকী, বালী, সিমেণ্ট, কাঠ, লৌহ ইত্যাদি কয়েকটি মূল উপাদান হইতে উৎপন্ন সেই রকম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তম দ্রব্য পর্য্যন্ত সকলই এই পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা গঠিত। আর্য্য ঋষির মতে এই পঞ্চ মহাভূত প্রথম সৃষ্টিতে অতিসূক্ষ্ম ভাবে থাকে তাহাকে তন্মাত্রা বলে। তন্মাত্রাও ৫টা যথা, ক্ষিতি তন্মাত্রা ইহা হইতে ক্ষিতি ভূতের উৎপত্তি। অপতন্মাত্রা ইহা হইতে অপভূতের উৎপত্তি। এইরূপে তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা আরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, প্রথমে আকাশ তন্মাত্রার সৃষ্টি। পরে ক্রমশঃ মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতি তন্মাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে।

পুরাকালে আর্য্যঋষিরা যেমন প্রথমে তন্মাত্রা ও তাহা হইতে পঞ্চ মহাভূত ও তাহা হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি দ্রব্যের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান বিজ্ঞানও সেইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ বিরানব্বইটা (৯২) মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত এবং ইহার মধ্যে দুইটি ভিন্ন অবশিষ্ট সকলগুলিই অমিশ্রিত আকারে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। এই ৯২টার নাম যথাক্রমে ১। হাইড্রোজেন, ২। হেলিয়াম, ৩। লিথিয়াম ৪। বেরিলিয়াম, ৫। বোরন, ৬। কারবন, ৭। নাইট্রোজেন, ৮। অক্সিজেন ইত্যাদি। শেষ মৌলিক পদার্থের নাম—৯২। ইউরেনিয়াম। হাইড্রোজেনকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে এই কারণে যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা হালকা। হাইড্রোজেনের ওজন যদি ১ ধরা যায় তাহা হইলে দ্বিতীয় উপাদান হেলিয়ামের ওজন হয় ৪, ষষ্ঠ কারবন ১২, সপ্তম—নাইট্রোজেন ১৪, অষ্টম অক্সিজেন্ ১৬, ১১ সোডিয়াম—২৩, ২৬—লৌহ ৫৫, ২৯—তাম্র ৬৩, ৪৭ রৌপ্য—১০৮, ৭৯—স্বর্ণ ১৯৭, ৮০—পারদ ২০০, ৮২—সিসা—২০৭, ৯২—ইউরেনিয়াম—২৩৮। প্রত্যেকের ওজনের গুরুত্ব ভেদে এই তালিকায় পর পর স্থান পাইয়াছে সেইজন্য প্রত্যেকের স্থান অনুযায়ী পৃথক সংখ্যা আছে। একটা মৌলিক পদার্থ যদি ভগ্ন করিতে আরম্ভ করা যায়, ও তাহাকে ভগ্ন করিতে করিতে শেষ এমন অবস্থায় আসা যায় যে, তাহাকে আর ভগ্ন করা যায় না তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা যাইতে পারে পরমাণু ইংরাজীতে ইহার নাম—atom অর্থাৎ গ্রীকভাষায় ইহার অর্থ, "আর কাটা যায় না।" ইহাতেই বোঝা যায় যে পরমাণু অতিশয় ক্ষুদ্র। কত ক্ষুদ্র তার কিছু আভাষ পাওয়ার চেষ্টা করা যাউক। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, সাড়ে পঁচিশ কোটী হাইড্রোজেন পরমাণু পাশাপাশি রাখিলে মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা স্থান অধিকার করিবে। বৈজ্ঞানিকেরা এই পরমাণুও ওজন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, এক পরমাণু হাইড্রোজেনের ওজন—০, ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ৬৬৩ গ্রাম। অর্থাৎ—১০-২৮ গ্রাম। এই পরমাণু আর ভাঙ্গা যায় না, কিন্তু ইহাই কি শেষ সীমা? পরে দেখা গেল যে পরমাণুও শেষ সীমা নয় এবং ইহাও প্রকৃতপক্ষে ভগ্ন করা যায়। পরমাণু ভগ্ন করার পর দেখা গেল যে, ঐ পরমাণু কেবলমাত্র সম পরিমাণ পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎ কণার সমষ্টি। বৈজ্ঞানিক জগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। হাইড্রোজেনের পরমাণু হাইড্রোজেন, লৌহের পরমাণু লৌহ, স্বর্ণের পরমাণু স্বর্ণ। কিন্তু পরমাণু ভগ্নের পর দেখা গেল যে হাইড্রোজেন, লৌহ, স্বর্ণ ইত্যাদি প্রত্যেক মৌলিক উপাদানই কতকটা পজিটিভ ও সমপরিমাণ নেগেটিভ বিদ্যুৎকণা ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলতঃ, সকল মৌলিক উপাদানই এক। প্রভেদ এই যে বিভিন্ন উপাদানে বিদ্যুতের কণার সংখ্যা বিভিন্ন। পরমাণুমধ্যস্থ নেগেটিভ বিদ্যুৎকণার নাম দেওয়া হইয়াছে "ইলেক্‌ট্রণ" ও পজিটিভ বিদ্যুৎ কণার নাম—"প্রোটন"। ইলেকট্রণ ও প্রোটনে যদিও বিদ্যুতের পরিমাণ ঠিক সমান কিন্তু ওজনে প্রোটন ইলেকট্রণ অপেক্ষা ১৮৪০ গুণ ভারী। হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটা ইলেকট্রণ ও একটা প্রোটন আছে। হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটা ইলেকট্রনের ওজন এক হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের ১৮৪০ গুণ হালকা। ইহাতেই একটা ইলেক্‌ট্রনের ওজন কত আমরা জানিতে পারি। দ্বিতীয় মৌলিক পদার্থ হেলিয়ামে ৪টা প্রোটন ও ৪টা ইলেক্‌ট্রন আছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে হেলিয়াম একটা ইলেকট্রণ বিহীন অবস্থায় বা কোনও কোনও সময় দুইটা ইলেক্‌ট্রণ বিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ৪টা প্রোটন ও দুইটা ইলেকট্রন একসঙ্গে থাকিতে পারে না কারণ তাহাতে পজিটিভ বিদ্যুৎ বেশী হইয়া পড়ে। প্রত্যেক পরমাণুতে বিদ্যুতের পরিমাণ সমান। হেলিয়ামের এই সমস্যার উদ্ঘাটন করিতে জানা গেল যে পরমাণুতে আর এক রকম পদার্থ আছে, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে নিউট্রন। নিউট্রনেরও ওজন প্রোটনের মত কেবলমাত্র ইহাতে পজিটিভ বা নেগেটিভ কোনও রকম বিদ্যুৎ নাই। নিউট্রণ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই হেলিয়াম সমস্যা খণ্ডন হইয়া গেল। দুইটা প্রোটন্, দুইটা নিউট্রন ও দুইটা ইলেকট্রন হইলেই হেলিয়াম সৃষ্টি হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক মৌলিক উপাদানের পরমাণুর ওজন (atomic weight) জানা আছে। এখন দেখা যায় যে পরমাণুর ওজনের সহিত পরমাণুর প্রোটন্, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের সংখ্যার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যে কোনও পরমাণুর ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান। পরমাণুর ওজন হইতে ইলেকট্রন বা প্রোটনের সংখ্যা (ক্রমিক সংখ্যা (atomic number) বাদ দিলে নিউট্রনের সংখ্যা পাওয়া যাইবে। যেমন একাদশ মৌলিক পদার্থ সোডিয়াম, পরমাণুর ওজন ২৩ তাহাতে ১১ ইলেকট্রন ও ১১টা প্রোটন ও ভার ঠিক রাখিবার জন্য (২৩—১১=১২) ১২টী নিউট্রন আছে। এইরূপে শেষ মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ম্, ক্রমিক সংখ্যা—৯২ (পরমাণুর ওজন ২৩৮) ইহাতে ৯২ ইলেকট্রন, ৯২ প্রোটন ও ভার সমান রাখিবার জন্য (২৩৮—

৯২ –) ১৪৬টা নিউট্রন আছে। সকল সময়েই প্রোটন ও নিউট্রনগুলি পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থান করে ও ইলেকট্রনগুলি তাহাদের চারিদিকে বেগে ঘুরিতে থাকে।

এই পরমাণু নিজেই যেন এক মহাকাশ। মহাকাশে যেমন সূর্য্য কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং গ্রহ উপগ্রহগুলি তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, পরমাণু মধ্যে প্রোটন ও ইলেকট্রনও তেমনি কেন্দ্রে অবস্থিত নিউট্রনের চারিদিকে মহাবেগে ঘুরিতেছে। মহাকাশের সহিত পরমাণুর তুলনা করা আপাতঃ দৃষ্টিতে অসঙ্গত মনে হয়, কারণ মহাকাশে সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। পরমাণুর মধ্যে তাহা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্র হইতে বিরাট ব্যবধানে অবস্থিত। যদিও পরমাণু এত ছোট যে, ২৫ কোটী হাইড্রোজেন পরমাণু পাশাপাশি রাখিলে মাত্র ১ ইঞ্চি স্থান অধিকার করে কিন্তু তবুও এই অতি ক্ষুদ্র পরমাণু তদবস্থায় ইলেকট্রনের ও প্রোটনের আকারের তুলনায় প্রকৃতই বিরাট। পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব অনেকটা সৌরপরিবারের পরস্পরের মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্বেরই অনুরূপ। অঙ্ক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে আমাদের শরীর গঠনের উপাদানে যে অসংখ্য কোটী পরমাণু আছে প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এই মহাকাশ যদি কোনও রকমে লোপ করিয়া সমস্ত ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন একত্রে সংগ্রহ করা যায় তাহা হইলে এই মানব দেহ সূচ্যগ্র অপেক্ষা সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিবে। এখন দেখা যাইতেছে যে সকল মৌলিক পদার্থই কেবলমাত্র কয়েকটী, প্রত্যেকের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট, ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টি অর্থাৎ স্বর্ণ, লৌহ ও সীসাতে কোনও পার্থক্য নাই; কেবলমাত্র প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্য। যথা—

	ইলেকট্রন	প্রোটন	নিউট্রন
লৌহ—	২৬	২৬	২৯
স্বর্ণ—	৭৯	৭৯	১১৮
সীসা—	৮২	৮২	১২৫

৯২টা মৌলিক পদার্থসকলই যে একপ্রকারের তাহা নহে। কতকগুলি কঠিন, যেমন লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি। আবার কতকগুলি তরল, যেমন পারদ, কতকগুলি তৈজস্ যথা রেডিয়াম্, থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি ইহারা স্বভাবতই তেজবিকীরণ করে সেইজন্য ইংরাজীতে ইহাদিগকে radioactive substance বলে। কতকগুলি বায়বীয় যথা—হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি এবং পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কি কঠিন, কি তরল সকল পদার্থেরই পরমাণু মহাকাশের (ether) আধার। সেইজন্য আর্য্যঋষিগণ সকল পদার্থকে পঞ্চ মহাভূতের অন্তর্গত স্থির করিয়াছেন। যেগুলি কঠিন তাহা পার্থিব (ক্ষিতিভূত), যেগুলি তরল তাহা আপ্য (অপ্‌ভূত), কতকগুলি তৈজস্ (তেজভূত), কতকগুলি বায়বীয় (বায়ুভূত) ও কতকগুলি সর্ব্বব্যাপি অশরীরী (আকাশভূত)। এই পঞ্চমহাভূতই বিশ্বসৃষ্টির মূল।

ঋষিরা এই পঞ্চমহাভূতের পাকের ফলে যে প্রতিনিয়ত বিশ্বসৃষ্টি স্থিতি ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

বিশ্বজগতের অন্য দ্রব্যের মত এই দেহও পাঞ্চভৌতিক। আধুনিক বিজ্ঞানমতে পঞ্চভূতই ৯২ মৌলিক পদার্থ। মানবদেহে কি সকলগুলিই অর্থাৎ ৯২টিই মৌলিক পদার্থ আছে?

জীবনের রাসায়নিক উপাদান

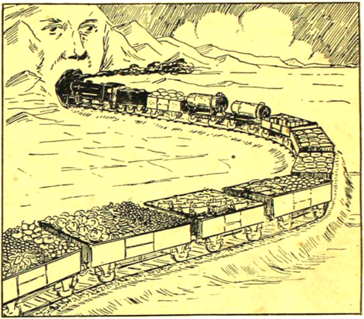

আশী বৎসরে মানব কি খায়

পণ্ডিতেরা বলেন যে সমগ্র জগতে যে ৯২টা মৌলিক পদার্থ আছে তাহার মধ্যে ২০টা মানবশরীরে বর্ত্তমান। তাহার মধ্যে প্রত্যেক জীবকোষের জীবপঙ্ক (protoplasm) গঠনে নিম্নলিখিত ১২টা একান্ত আবশ্যকীয়। যথা—কারবন (C) হাইড্রোজেন (H) অক্সিজেন (O) নাইট্রোজেন (N) সোডিয়াম (Na) পোটাসিয়াম (K) ক্যালসিয়াম (Ca) মেগ্‌নিসিয়াম (Mg) ক্লোরিন (Cl) ফস্‌ফরাস্ (P) সালফার (গন্ধক) (S) এবং লৌহ (Fe)।—এই বারটার মধ্যে প্রথমোক্ত ৪টা জীবনরক্ষার জন্য অপরিহার্য; কারণ এইগুলির দ্বারা জীবকোষের প্রোটিন, শ্বেতসার ও স্নেহপদার্থ এবং জল গঠিত হয়। শেষোক্ত ৮টার মধ্যে ৫টা ধাতব যথা Na, K, Ca, Mg, এবং তিনটা অধাতব যথা—Cl, P. এবং S. যবক্ষারজানযুক্ত পদার্থ (protein) জীবকোষের সর্ব্বপ্রধান উপাদান এবং তাহা যবক্ষারজানের (N) অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে এক বিধিবিরুদ্ধ অবস্থা দেখা যায়। যবক্ষারজান জীবকোষের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য এবং জীবদেহ যে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বাস করে যবক্ষারজানই তাহার প্রধান উপাদান; কিন্তু জীবকোষ বায়ুমণ্ডল হইতে একবিন্দুও যবক্ষারজান জীবকোষের জন্য গ্রহণ করিতে পারে না, যদিও আমরা প্রতিদিন ১০০০ litre বায়ু নিশ্বাসের সহিত ফুসফুসে গ্রহণ করি। এ যেন ঠিক জাহাজডুবির পর নাবিক যেমন চারিদিক কেবল জল জল আর জল দেখিতে দেখিতে তৃষ্ণায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিন্তু এক ফোঁটাও পানের যোগ্য নহে—এ দৃষ্টান্ত যে কেবল উপমাস্বরূপ তাহা নহে ইহা বাস্তবিকই সত্য। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ফরাসী রণাঙ্গনে পরাজয়ের পর ডানকার্ক-

(Dunkirk) হইতে যখন ইংরাজেরা ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্ত্তন করে সেই সময় একটী নৌকায় ২০জন নাবিক খোলা সমুদ্রে কয়েকদিন বাস করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের মধ্যে যে ১১জন তৃষ্ণায় সমুদ্রজল পান করিয়াছিল তাহারা সকলেই তৃষ্ণার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও বাকী ৯জন সমুদ্রজল পান না করার জন্য বাঁচিয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের অম্লজান সম্বন্ধে আরও একটা উপমা দেওয়া যায় Tantalus cup এর মত হইতে। মুখের অতি নিকটে জল থাকা সত্ত্বেও টানটেলাসকে তৃষ্ণার্ত্তই থাকিতে হইয়াছিল। অনুরূপে বায়ুর অম্লজান (O) মানব ও মৎস্য উভয়ের পক্ষেই অতি আবশ্যকীয়। কিন্তু মৎস্যকে জল হইতে উঠাইলেই বাতাসে অত্যধিক অম্লজান থাকার জন্য অম্লজান অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতক্ষণ আমরা N ও O এই দুইটারই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু অঙ্গার (C) যে আমাদের কত প্রয়োজনীয়, আমাদের কেন সমস্ত জৈবিক রসায়ন শাস্ত্র (organic chemistry) প্রয়োজনীয়, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

জৈবিকরসায়ন (organic chemistry) যেমন অঙ্গারঘটিত দ্রব্যেরই রসায়ন, জীবন রসায়ন ও (chemistry of life) তেমনি কৌষিক রসায়নের (chemistry of cell) প্রতীক। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে জীবকোষের জীবন্ত প্রধানতঃ যবক্ষারজানযুক্ত পদার্থ (প্রোটিন) অর্থাৎ C. H. N. এবং O এই চারিটী পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই জীবন্তের কার্য্যের জন্য এবং ইহার শক্তি ও তাপ উৎপাদের জন্য ইন্ধনস্বরূপ শ্বেতসার ও স্নেহপদার্থ প্রয়োজন। শেষোক্তগুলি না থাকিলে জীবকোষ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় তাহার কোন চলৎ শক্তি (dynamic energy) থাকে না। আমিষ, শ্বেতসার ও স্নেহপদার্থ কার্য্যকরী করার জন্য এবং তাহাদিগকে দ্রব করার জন্য জলের প্রয়োজন। অর্থাৎ শ্বেতসার (শর্করা ($C_6(H_2O)_6$) এবং স্নেহপদার্থ $CH_3(CH_2)_{16}COOH$—Steric acid)। C, H, এবং O এবং জল (H_2O) অর্থাৎ H এবং O প্রয়োজন। প্রথমোক্তগুলির মধ্যে অঙ্গার (C) প্রধান। ইহাতেই জীবকোষের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার ক্রম হিসাবে C.H.N. এবং O সর্ব্বপ্রধান। তারপর লবণ (NaCl) এবং calcium phosphate ($Ca_3(PO_4)_2$) অর্থাৎ Na, Ca, Cl, এবং P; সর্ব্বশেষে K, Mg, Fe এবং S এর স্থান।

এই দেহের অন্য নাম অন্নময় কোষ। কারণ ইহা অন্ন হইতে জাত, অন্ন হইতে বর্দ্ধিত ও অন্ন বিহনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অন্ন অর্থাৎ খাদ্য। আমরা যাহা ভোজন করি তাহাও পাঞ্চভৌতিক এবং তাহারও গঠন ঐ ৯২টী মৌলিক পদার্থের মধ্য হইতে। খাদ্য সম্বন্ধে শিশুপাঠ্য হইতে বিশেষজ্ঞ পাঠ্য পর্য্যন্ত অনেকগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এ স্থলে কেবল খাদ্য হিসাবে প্রকৃতি হইতে আমরা কি কি দ্রব্য গ্রহণ করি ও প্রকৃতিকে কি দিই তাহারই আলোচনার জন্য ২নং চিত্র সন্নিবেশিত করা গেল।

শরীরের সকল উপাদানই আমরা খাদ্য হইতে প্রাপ্ত হই। তাহার মধ্যে বায়ুমণ্ডলের অম্লজান নিশ্বাসে প্রাপ্ত হই। অবশিষ্ট ক্রয় করিতে হয়।

খাদ্য-দ্রব্যের উপাদান

আমাদিগের খাদ্য-দ্রব্য উপাদানভেদে নিম্নলিখিত ৬টা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—উপাদান ভিত্তিমূলক—

১। যবক্ষারজান যুক্ত পদার্থ (protein এবং nucleoprotein) ইহা আমাদের শরীরের জীবকোষের উৎপত্তি ও তাহাদের ক্ষয়পূরণ করে। ইহা দ্বারা রক্ত ও মাংস গঠিত হয়। অণ্ডের সাদা পদার্থের উপাদান albumin ($C_{72}H_{112}N_{18}O_{22}S$)

শক্তি ভিত্তিমূলক

২। যবক্ষারজান হীন পদার্থ (শ্বেতসার ও স্নেহপদার্থ)। ইহারা জীবকোষের কার্য্যের জন্য শক্তিপ্রদান করে।

৩। অম্লজান—ইহা অঙ্গারময় শ্বেতসার ও স্নেহপদার্থকে দগ্ধ করিয়া শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে।

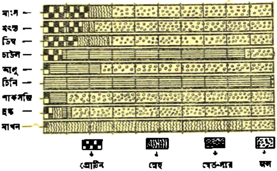

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিন (আমিষ) স্নেহ, শ্বেতসার ও জলের পরিমাণ

শরীর-রক্ষক পদার্থ

৪। লবণ জাতীয় পদার্থ—ইহারা অস্থিগঠন কার্য্য ও শরীরের রাসায়নিক সাম্যাবস্থা রক্ষা কার্য্য সাধন করে।

৫। জল—জীবকোষের পরস্পরের মধ্যে রাসায়নিক পদার্থের আদান প্রদানের বাহনরূপে কার্য্য করে।

৬। খাদ্যপ্রাণ (vitamin) ইহারা শরীরের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও রক্ষা কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করে।

এই ৬টা খাদ্যের উপাদানের বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করা হইবে। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ, শ্বেতসার ও জল কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে তাহা ৩নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

কামনা

শ্রীবীণা দে

দীপ শিখা সম পবিত্র কর
হৃদয় কর মোরে;
প্রদীপ্ত কর, অন্ধকারের মাঝে।
আমার মনের বাসনা কামনা
তোমার আরতি তরে—
উঠুক জ্বলিয়া প্রতি দিবসের সাঁঝে।

অন্তর' কোণে অথবা বাহিরে
যেখানেই থাকি আমি,
যেন সেথা স্থান না পায় তিমির কালো;
দীপশিখা সম পবিত্র কর
ওগো অন্তরযামী!
মোর অন্তর হোক আমার পথের আলো।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

শীতের গোড়া হইতেই চরের আনাচে কানাচে বুনোহাঁস পড়িতে শুরু হয়।

চরের দক্ষিণ-প্রান্তে সেই কবে একটা ছোটখাটো বিলের সৃষ্টি হইয়াছিল, আশ্বিন-কার্তিক হইতেই সেখানে শাপলা শালুকের ফুল ফুটিয়া ওঠে। এক জাতীয় স্তূপে কচুরীতে বেগুনে রঙের রাশি রাশি ফুল ফোটে, নীল শ্যাওলা আর জলজ ঘাসের মধ্যে সেগুলি সূর্যের আলোয় জল্ জল্ করে। তারপর কোনও এক রাত্রে আকাশ যখন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ধুইয়া গেছে, বাতাস আচমকা থামিয়া গিয়া পর্তুগীজদের ভাঙা গির্জাটার নীচে জোয়ারে ভাটার লক্ষণে নোনা গাঙের জল থমথম করিতেছে—তখন অনেকগুলি পাখার দ্রুত বিধূননে ঘুমন্ত রাত্রির যেন স্বপ্ন কাটিয়া যায়। তেঁতুলিয়ার জল হঠাৎ কল্কল্ করিয়া ওঠে, নানা রঙের পাখায় জ্যোৎস্নার গুঁড়া-আবীর মাখাইয়া বুনো হাঁসের দল ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বিলের জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

জিনিসটা লইয়া অবশ্য কবিতা লেখা চলে। কিন্তু প্রয়োজনের চাইতে কবিতার দাম বেশি নয়। তা ছাড়া চর-ইস্‌মাইলের এই নিঃসঙ্গ বিশেষ পরিস্থিতিটির মধ্যে কবিতার অবকাশ কম। প্রকৃতির সব রকম বিরুদ্ধতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মানুষকে অপ্রাকৃতের ভাবনা ভাবিলে চলেনা।

সুতরাং সকালের দিকেই জোহান একটা দোনা-বন্দুক লইয়া বিলে হাঁস শীকার করিতে আসিয়াছিল।

বিল নেহাৎ ছোট নয়। কল্‌মি আর বুনোঘাস এবং আল্‌গা-হোগলার বন পার হইয়া প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটুখানি দ্বীপের মতো উঁচু জায়গা। হাঁসের দলটা প্রধানত সেই দ্বীপটুকুর উপরেই বসিয়া আছে। সংখ্যায় ষাট সত্তরটির কম নয়। কোনো কোনোটা পালকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আছে, কয়েকটা এদিক ওদিক কাছাকাছি ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং দু একটা কারণে অকারণে উড়িয়া উড়িয়া এদিক হইতে ওদিকে পড়িতেছে।

লোভে জোহানের চোখ জ্বলিতে লাগিল। সবে দু তিনদিন হইল হাঁস পড়িয়াছে এখানে, এখনো 'ফায়ার' হয় নাই। নতুবা হাঁসগুলি আরো সতর্ক হইয়া যাইত।

সরু একটা বেতের সাহায্যে জোহান বারুদ এবং একরাশ চার নম্বরের ছররা বন্দুকে গাদাইয়া লইল। কিন্তু হাঁসগুলি 'রেঞ্জের' বাহিরে। জোহান এক মুহূর্ত দ্বিধা করিল, গায়ের জামা এবং গেঞ্জী খুলিয়া হোগলা বনের মধ্যে রাখিল, তারপর বিলের জলে নামিয়া পড়িল।

জল খুব বেশি নয়, কিন্তু ঠাণ্ডা নরম কাদা আর শ্যাওলায় তাহার বুক পর্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছিল। বন্দুকটাকে মাথার উপরে তুলিয়া স্তূপে কচুরীর আড়ালে আড়ালে অত্যন্ত হুঁশিয়ার ভাবে আগাইতে লাগিল জোহান। ভাগ্যে বাতাসটা বহিতেছে অন্যদিকে। নতুবা হাঁসেরা এতক্ষণে ঠিক তাহার বন্দুকের গন্ধ পাইত—শিকারীদের চাইতে আত্মরক্ষার সহজ চেতনা এবং প্রচেষ্টা তাহাদের অনেক প্রবল।

এতক্ষণে জোহান হাঁসগুলির প্রায় চল্লিশ গজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়। ইহার চাইতে ভালো সুযোগ সচরাচর দেখা যায়না। এক চোখ বুঁজিয়া ঘোড়ায় আঙুল ছোঁয়াইয়া জোহান লক্ষ্য ঠিক করিতে লাগিল।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই কাছাকাছি আর কোথাও বন্দুকের শব্দ হইল 'দুম্' করিয়া। জোহান অনুভব করিল, ঠিক তাহার মাথার এক ইঞ্চি উপর দিয়া শাঁ করিয়া একটা গুলি বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই মাথাটাকে জলের কাছাকাছি নত না করিলে আর একটা গুলি তাহার কপাল ভেদ করিয়া চলিয়া যাইত।

ভয়ে আতঙ্কে হাতের বন্দুকটা লইয়াই জোহান বিলের জলে ডুব মারিল এবং পঙ্কিল জল ও কল্‌মি দামের মধ্য দিয়া বহু কষ্টে একটা ডুব সাঁতার কাটিয়া প্রায় দশবারো হাত দূরে একরাশ হোগলার মধ্যে গিয়া মাথা তুলিল। তারপর ব্যাপারটা আরো কতদূর ঘটে, সেটা দেখিবার জন্যই ভীত চোখে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু কিছুই আর ঘটিল না। গুলি যে ছুঁড়িয়াছিল, আশে-পাশের জঙ্গলগুলির মধ্য দিয়া সে যেন মন্ত্রবলেই অদৃশ্য হইয়া গেছে। শুধু তখনো সমস্ত বিল ভরিয়া বন্দুকের গন্ধ আর একটা হালকা নীল ধোঁয়া রেখার মতো বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে। আর সমস্ত আকাশ ছাইয়া উড়ন্ত বুনো হাঁস, কাদাখোঁচা এবং বকের তীক্ষ্ণ চীৎকার ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে জোহান অতি-সাবধানে জল হইতে উঠিয়া আসিল। আশে-পাশে কোথাও কোনও মানুষের সাড়া নাই। শিকারের সময় বিলে সর্বদাই বন্দুকের শব্দ শোনা যায়, তাহাতে কাহারো কৌতূহলের উদ্রেক হয়না। তীরে উঠিয়া জোহান দেখিল, হোগলা বনের মধ্যে যেখানে সে তাহার গায়ের জামা ও গেঞ্জি রাখিয়াছিল, তাহারই অনতিদূরে মাটিতে দুইটা রয়্যাল্ এক্সপ্রেসের খালি টোটা পড়িয়া আছে। আর তাহারই পাশে নরম কাদার উপর এক জোড়া জুতার চিহ্ন।

জোহান ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, জুতার চিহ্নটা অপেক্ষাকৃত গোল ধাঁচের। সাধারণত এই ধরণের জুতা বর্মিরাই ব্যবহার করে।

বলরাম ডিক্রুজ কয়েকদিন ধরিয়াই অত্যন্ত চিন্তান্বিত বোধ করিতেছিলেন। অসুবিধা বাধিয়াছে মুকুন্দকে লইয়া। সে আর এখানে থাকিতে রাজী নয়—দেশে ফিরিতে চায়। এ ভূতের দেশ এবং মুকুন্দ নিশ্চয়ই সে ভূতের দলের একজন নয় যে এখানে মাটি আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিবে।

বলরাম সমস্যায় পড়িয়া কহিলেন, কেন, বেশ তো আছ। অসুবিধে এমন কী হয়েছে?

মুক্তো ঝাঁজিয়া বলিল, অসুবিধের কী হয়নি? মানুষ নেই, জন নেই, আছে কতকগুলো অদ্ভুত জীব, তাদের কথাই বোঝা যায়না। তুমি তো বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পড়ে থাকো, আমার দিন কাটে কী ক'রে?

বলরামের কণ্ঠে করুণতার আমেজ আসিল: কী বলছ, বন্ধু-বান্ধব নিয়েই থাকি। তুমি আসবার পরে তো একরকম সবাইকেই ছেড়ে দিয়েছি মুক্তো। কাল পোস্টমাস্টার এসেছিল, তাকেও শুধু এক ছিলিম তামাক খাইয়েই বিদায় দিয়েছি।

মুক্তো রুষ্ট হইয়া বলিল, তোমার ওই পোস্ট মাস্টার মানুষটি সুবিধের নয়, ওকে দেখলেই কেমন যেন আমার গায়ের মধ্যে শির শির ক'রে। লোকটার চেহারা যেন ভূতুড়ে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু একটা অলক্ষুণে ঘটাবার চেষ্টায় আছে ও।

বলরাম দ্বিধা করিতে লাগিলেন। পোস্ট মাস্টারের রসনা সব সময়ে প্রীতিকর নয়; তাঁহার কাহিনী এবং কল্পনাগুলি বলরামকে প্রায়ই আতঙ্কিত করিয়া তোলে। তা সত্ত্বেও তাঁহার সম্বন্ধে বলরামের যেন একটা স্নেহগত দুর্বলতাই আছে। এক কথায় বলিতে গেলে, মুক্তো ছাড়া এই চর-ইস্মাইলে মাত্র হরিদাসকেই তাঁহার যাহোক কিছু ভালো লাগে।

বলরাম বলিলেন, না, তা ঠিক নয়—হরিদাস মানুষটা খুবই ভালো। তবে মাঝে মাঝে ওর একটু পাগ্‌লামি চাপে, তা—

মুক্তো বলিল, মরুক গে! তুমি কবে আমাকে দিয়ে আসবে সেটা ঠিক করে বলো। আবার আবার সব কিছু গুছিয়ে গাছিয়ে ঠিক ক'রে নিতে হবে তো।

বলরামের স্বর প্রগাঢ় হইয়া আসিল: তুমি বুঝতে পারছনা মুক্তো। এখানে একরকম একলা দিন কাটাই। কেউ নেই যে একটু যত্ন করে, কেউ নেই যে দুটো জিনিস ভালোমন্দ রেঁধে দেয়। থাকবার মধ্যে আছে ওই রঘুনাথ, তাও তো দেখছই—ও ব্যাটা ফাঁকি দেবার যম।

মুক্তোর করুণা হইলনা। সে নির্মম ভাবেই বলিল, তার আমি কী করব? আমি তো আর তোমার সংসার নিয়ে এই ভূতের দেশে পড়ে থাকতে পারবনা।

বলরাম সাহসী হইয়া উঠিলেন, একটু একটু করিয়া মুক্তোর কাছে ঘনাইয়া বসিলেন।

—সত্যি বলছি মুক্তো, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবনা। জানি, আমি তোমাকে—বলরাম বার তিনেক ঢোক গিলিলেন, কিন্তু কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না।

বিদ্যুদ্বেগে মুক্তো বলরামের কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেল, তাহার দুই চোখের কোনে কোনে খানিকটা তীক্ষ্ণ দীপ্তি প্রকাশ পাইল। কথার ভাবে মনে হইল যেন আতঙ্কে সে শিহরিয়া উঠিয়াছে:

—ছি, ছি—কী বলছ! দেখাশুনো করবার জন্যে আমাকে নিয়ে এসেছ, আর তোমার মুখে এই কথা!

বলরামের ব্যগ্রতায় বৈলক্ষণ্য দেখা গেলনা।

—তোমাকে নইলে আমি বাঁচতে পারব না মুক্ত। তা ছাড়া এ হচ্ছে পাণ্ডববর্জিত দেশ, পৃথিবীর বাইরে। এখানে কোনো আইন-কানুনের বাঁধাবাঁধি নেই—কেউ কিছু জানবেনা। তুমি আমায় ছেড়ে যেয়োনা।

উত্তরে মুক্তো শুধু উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ফলাফল যাহাই হোক, অনির্দিষ্ট কালের জন্য দেশে ফেরাটা স্থগিত রহিল মুক্তোর। খারাপ দিনকাল আসিয়া পড়িতেছে—কিছুদিনের মধ্যেই নদীতে বোলিং শুরু হইবে। এমন সময় প্রাণ হাতে করিয়া ভাসিয়া পড়িলে যে লাভ কি—বলরাম তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

সুতরাং মুক্তো রহিয়া গেল। তারপর একদিন রাত্রে যখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে, বাতাসে চর ইস্মাইলের সুপারীর বন দুলিতেছে, আর বজ্রের আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে তেঁতুলিয়ার জল, তখন মুক্তো এই সৃষ্টিছাড়া দেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না।

(ফসল)

১

চর ইসমাইলে শরৎ আসিয়া গেল।

অবশ্য খুব সমারোহ করিয়া নয়। সোনা মাটিতে ফুল ফুটিতে চায়না। আশে পাশে গাছের জলে টান ধরিয়া যায়, নদীর ঘন গৈরিক বর্ণ স্বচ্ছ হইয়া আসিবার উপক্রম করে। নদীর ধারে নরম পলিমাটির উপর ত্রিশূলের মতো ছোট ছোট পদচিহ্ন আঁকিয়া মাইলের দল শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে বড় বড় পাখা ছড়াইয়া কুট কুটে গলা একরাশ পেঁজা তুলার মতো এক এক জোড়া চখা-চখী আসিয়া এখানে ওখানে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আবার তেমনি করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রিতে ঈথার-সমুদ্রে শব্দের ঢেউ তুলিয়া দিয়া হাঁসের দল অনির্দেশ অভিমুখে ফিরিয়া যায়—হয়তো কাশ্মীরে, হয়তো মানস সরোবরে, হয়তো বা আরো দূরে।

কড়কড়ির দিন আসিয়া পড়িতেছে। কয়দিন হইতেই অত্যন্ত গুমোট গরম। দুপুরবেলা আকাশটা যেন একটা কাঁসার পাত্রের মতো জ্বলে, সেদিকে তাকাইতেও চোখ জ্বলিয়া যায়। থাকিয়া থাকিয়া হু হু শব্দে দমকা বাতাস আসে, সুপারি নারিকেলের বন যেন পাগলের মতো মাথা কুটিতে থাকে।

পোস্টমাস্টারের মনটা খারাপ হইয়া যায়। আকাশে বাতাসে যেন একটা অসীম উদাসীনতা। দূর দিগন্ত হাত বাড়াইয়া যেন অন্তরের যাযাবরটিকে ডাক পাঠাইতে থাকে। সম্মুখে অজ্ঞাত পৃথিবী একখানা খোলা পাতার মতো মেলা রহিয়াছে। অক্ষর-গুলিকে পড়িতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হয়, চর ইসমাইলের প্রত্যন্ত ছাড়াইয়া এক একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ওই হাঁসের -দলের মতো অনন্তের সন্ধানে ভাসিয়া পড়িতে! অসমের পাহাড়, সাঁওতাল-পরগনার শালবন, জয়পুরের মরুভূমি, মাদ্রাজের সমুদ্রতীর। হুঁকা হাতে করিয়া পোস্ট মাস্টার বসিয়া থাকেন, সনাতন তাকিয়াটাকে নিঃশব্দ অভিশাপ দান দেখায়।

কেরামদী আসিয়া বলে, বাবু, আমি বাজারে চললুম। ভাতটা চাপিয়ে দিয়েছি, ধরে না যায়, নামিয়ে রাখবেন।

পোস্ট মাস্টার বলেন, হুঁ।

কেরামদী চলিয়া যায়। ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরিতে থাকে। দূ

একজন লোক আসে, কেউ একখানা পোষ্টকার্ড, কেউ একটা মণি-অর্ডার। তারপরেই আবার সব নিঝুম হইয়া পড়ে। দূর হইতে শুধু বড় নৌকার মাস্তুল দেখা যায়।

খানিক পরেই সচেতন হইয়া ওঠেন পোষ্ট মাষ্টার। স্রোতের একটানা আওয়াজটা ওধার হইতে কেমন যেন শোনা যাইতেছে। বাতাসে পোড়া ভাতের পরিষ্কার গন্ধ। কেরামদ্দী ভাতটা নামাইয়া রাখিবার কথা বলিয়া দিয়াছিল বটে।

পোষ্ট মাষ্টার পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়া আস্তে স্টোভটি নিবাইয়া দেন। ভাতগুলি পুড়িয়া একেবারে লাল হইয়া গেছে। আবার না রাঁধিলে মুখে তোলা যাইবে না। অবশ্য এক বেলা না খাইলেও এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তা ছাড়া শরীরটা কেমন কেমন করিতেছে—হয়তো আজ আবার তেমনি করিয়া হাঁপানির টান উঠিবে।

যাযাবর মনটাকে বিশ্বাস নাই। একদিন গভীর রাত্রিতে দীঘার ঘাট হইতে ছোট একখানা এক মাল্লাই নৌকা লইয়া সেখানাকে সুদূর দিগন্তে ভাসাইয়া দিলে কেমন হয় কে জানে। স্রোতের মুখে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যাইবে বঙ্গোপসাগরের মোহনায়—দৌলত-খাঁর বন্দরের আলো যেখানে চোখে দেখা যায় না—যেখানে দিগন্ত মেখলায় চর-কুকুরীর শেষ নারিকেল বীথিও ছোট একটা বিন্দুর মতো অস্পষ্ট হইতে আরো অস্পষ্ট হইয়া ধূ ধূ আকাশের নীচে মিলাইয়া গেছে।

—তারপর? তার পরের ইতিহাস কে জানে? এই সমুদ্রের কি শেষ আছে? এই পথের কি কোনোদিন সমাপ্তি ঘটিবে? এই লবণ-সমুদ্রে কোথাও যদি ফলে-পুষ্পে ঘেরা একটা প্রবালের দ্বীপ চোখে পড়িয়া যায় তো সেখানে তিনটি দিন কাটাইয়া আবার নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। অবশেষে যখন এমন দিন আসিবে যে আকাশ আর সমুদ্রের কোনো কূল-কিনারা নাই, ফল নাই, জল নাই—তখন হয়তো অসহ্য ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এই জীবনটার উপর দিয়া নামিবে শেষের যবনিকা। ছোট নৌকাখানির উপরে শরীরের মাংস গলিয়া পচিয়া ঝরিয়া গিয়া একটা শুকনো শাদা হাড়ের পঞ্জর দুপুরের খাঁ খাঁ রোদে শুকাইতে থাকিবে।···

—হুম্।

পোষ্ট-মাষ্টার চমকিয়া উঠিলেন। ঘরে ঢুকিয়াছেন বলরাম ভিষকরত্ন। একটা বিচিত্র প্রসন্নতার চোখের তারা নাচিতেছে যেন। বলরামের এমন প্রসন্ন মুখভাব অনেক কাল দেখেন নাই হরিদাস।

—বলি, ব্যাপার কি দাদা! চোখ বুঁজে কি বৌদিকে ভাবছ?

হরিদাস সাহা হাসিলেন। হাসিলে তাঁহার কালো মুখটার এক ধরনের শ্রী দেখা যায়। বলরাম তাঁহার গম্ভীর মূর্তিটা সহ্য করিতে পারেন না—হরিদাসের গাম্ভীর্যের সঙ্গে কী একটা অনিবার্য কার্য-কারণ যোগে তাঁহার মনটাও যেন খচখচ করিয়া ওঠে। কেন বলা যায় না—মাঝে মাঝে বলরামের মনে হয় হরিদাস প্রেত-সিদ্ধ, ইচ্ছা করিলেই তাঁহার চোখের সামনে গোটাকয়েক ভূত নামাইয়া যা তা কাণ্ড করিতে পারেন।

—হুঁ, বৌদিকেই বটে!—হরিদাস বড় বড় চোখ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন: বিরহ-বেদনা আর কতকাল সহ্য করা যায়, বলো?

—তা সত্যি।—বলরামের কণ্ঠে সহানুভূতির আমেজ লাগে: এমন ক'রে ক'দিন আর কাটাবে? আর শরীরের অবস্থা তোমার যা হয়েছে দাদা, তাতে সব সময়েই সেবা-শুশ্রূষা করবার একজন লোক দরকার। বুড়ো বয়সে বউ কাছে না থাকলে—

—বটে? বলরামের মনে হইল, হরিদাস যেন তাঁহার দিকে একরকম চোখ পাকাইয়াই চাহিলেন: হঠাৎ এ সব তত্ত্ব বাক্য যে! স্পষ্ট ক'রেই বল তো কবিরাজ, দ্বিতীয় পক্ষের চেষ্টায় আছ নাকি?

বলরাম অকারণে চমকিয়া উঠিলেন: যাও—যাও, দ্বিতীয় পক্ষ! বয়স গেল পঞ্চাশ ছাড়িয়ে, এই বুড়ো বয়সে আর—

—কেন উলটো কথা বলছ ভায়া? একটু আগেই না বলছিলে যে বুড়ো বয়সে বউ কাছে না থাকলে একেবারে অচল? তা ছাড়া চেহারারও তো জৌলুস ফিরেছে দেখছি। মাথায় তো দিব্যি একটি টাক পড়বার জো হয়েছে—ওদিকে গন্ধ-তেলটুকু মাখতে কসুর করো নি। যাই বলো আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে—

—সন্দেহ? কী সন্দেহ?—বলরামের আগাগোড়া চেহারাটাই যেন গেল বদলাইয়া।

বলরাম জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, যাও, যাও, সব সময়ে ঠাট্টা ভালো লাগেনা। তোমার কথাবার্তা সত্যি ভারী অভদ্র।

—অভদ্র! কেন শুনি? বলরামের মুখের দিকে চাহিয়া কী একটা অনুমান করিয়া লইয়াই হরিদাস অতিশয় সশব্দে হাসিতে সুরু করিয়া দিলেন। অদ্ভুত অস্বাভাবিক হাসি, যেন কবিরাজের দুইটা কানের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া মগজের মধ্যে করাত চালাইতে আরম্ভ করিল। বলরামের ইচ্ছা হইতে লাগিল, দাঁ করিয়া পোষ্ট মাষ্টারের মুখের উপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসাইয়া দেন।

কিন্তু সমস্ত অবস্থাটাকে বাঁচাইয়া দিল কেরামদ্দী।

বাজার লইয়া সে ঘরে ঢুকিল, তারপর প্রশ্ন করিল, ভাতটা নামিয়েছিলেন বাবু?

একবারটি হাসি থামাইয়া হরিদাস আবার হাসিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, ভাত? সে অনেকক্ষণ পুড়ে ছাই হয়ে আছে।

—পুড়ে ছাই হয়ে আছে!

বাজারটা ফেলিয়া কেরামদ্দী ঘরে ঢুকিল। তারপর ভাতের হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার দেরী হইল না:

—ছি, ছি, এ যে একেবারে লাল হয়ে গেছে। আবার রাঁধতে হবে তো। আপনার কি কোনোদিকেই খেয়াল থাকে না বাবু?

হরিদাস হাসিমুখেই বলিলেন, কী করে থাকবে! কবিরাজ এল যে। যাক, তোমার ভাতের থেকে দুটি আমাকে দিয়ো কেরামদ্দী, এ বেলা তাতেই আমার চলে যাবে!

—আমার ভাত? জাত যাবে যে বাবু!

—হুঁঃ, জাত যাবে! জাত যাওয়া মুখের কথা কিনা। আমি তো আর বামুন নই যে আমার জাত কাঁচের মতো ঠুন্ ক'রে ভেঙে পড়বে। এ ভারী শক্ত জিনিস—সাবল-গাঁইতি ছাড়া ভাঙবার নয়।

বলরাম হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন, বলিলেন, আমি এখন উঠলুম।

—উঠবে? নিতান্তই উঠবে! তা তুমিও তো একদিন নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন করলে পারতে কবিরাজ। তোমার উনি ইদানিং কেমন রাঁধছেন টাঁধছেন তা—

—যাও, যাও, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না—এবার কিন্তু বলরাম জোর করিয়াও হাসিবার চেষ্টা করিলেন না। একখানা পাথরের মতো ভারী আর কালো মুখ লইয়া অত্যন্ত দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মনে হইল, তিনি রাগ করিয়াছেন।

হরিদাস এক মুহূর্ত বিস্মিত চোখে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর সামনের টেবিলটার উপর বন্ধুকে দু' খানি পা তুলিয়া দিয়া শিস দিতে সুরু করিলেন। সত্যি সত্যিই যেন বলরামের কী হইয়াছে। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁহাকে এতখানি পরিহাস-বিমুখ কখনো দেখেন নাই হরিদাস। তাদের আড্ডাটাও কদিন ধরিয়া বন্ধ হইয়া আছে।

—ওয়ান মনি-অর্ডার বাবু!

হরিদাস তাকাইয়া দেখিলেন, জানালার বাহিরে একজন বর্মি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চোখাচোখি হইতেই সে মার্বেল-বাঁধানো কঠিন মুখের ভিতরে একটুখানি হাসিল, ওয়েল, বাবু?

—হাঁ, ওয়েল। তোমরা কবে এলে?

—কাল। তোমাকে একটু কষ্ট দেব বাবু, মনি-অর্ডার আছে একটা।

—কত টাকার?

—ফিফ্‌টি। যাবে পিনাঙে। কবে পৌঁছুবে?

পোষ্ট্ মাষ্টার চিন্তা করিয়া বলিলেন, নো ক্লিয়ার আইডিয়া। আট দশ দিন দেরী হতে পারে।

—আট দশ দিন! তা কী আর করা যাবে!

পোষ্ট্ মাষ্টার মনি-অর্ডার রাখিয়া একটা রসিদ দিতে বর্মি অভিবাদন জানাইয়া চলিয়া গেল। গত পাঁচ বছর ধরিয়া ছয় মাস পর পর ইহারা এখানে ব্যাপার করিতে আসে। কিসের ব্যবসা যে করে তাহা তিনি ভালো করিয়া জানেন না—তবে ধান-চাউলের কী একটা কারবার আছে বলিয়াই তিনি শুনিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভাবিয়াই তাঁহার বিস্ময় লাগে যে পৃথিবীর সব চাইতে বেশী ধান হয় যে দেশে, সেই দেশ ছাড়িয়া ইহারা ভারতবর্ষে মরিতে আসে কী করিতে! এখানে আসিয়া ইহাদের এমন কী লাভটা হইবে! আর আসিলই যদি, তবে গোটা ভারতবর্ষের এত জায়গা ছাড়িয়া একেবারে সমুদ্রের মুখের মধ্যে এই সৃষ্টিছাড়া দেশে ব্যবসার এমন কোন্ সুবিধাটা হইতেছে। তা ছাড়া সাম্পান দিয়াই যখন এখান হইতে ধান-সুপারী কিনিতে হয়, তখন এখানে তো গাঁটের কড়িই খরচ করিবার কথা। কিন্তু ইহাদের ব্যাপারটা ঠিক উল্টো—ইহারা এখান হইতে পিনাং, মালয়, সাংহাইতে মনি-অর্ডারের পর মনি-অর্ডার করিতেছে!

চুলোয় যাক ও সব। আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খোঁজে দরকার নাই। পোষ্ট্ মাষ্টার মস্ত একটা হাই তুলিলেন।

কেরামদ্দী নতুন করিয়া খানিকটা চাউল ধুইয়া আনিয়াছিল। বলিল, ভাত চাপিয়ে দিন বাবু!

—হয়েছে, হয়েছে—ভ্রূভঙ্গী করিয়া হরিদাস বলিলেন, এখন বসে বসে ভাত রাঁধতে আমার বয়ে গেছে। কেন ফিক্ করছিস বাবা, যা হয় চারটি তুই-ই রেঁধে দেনা।

—আমি রেঁধে দেব বাবু? কেরামদ্দী বিস্মিত হইয়া কহিল, আমার ছোঁয়া খাবেন আপনি?

—খাবনা, কেন খাবনা শুনি? আমার কালী পেত্নী বৌয়ের ছোঁয়াই যদি খেতে পেরেছি, তুমি আর কী দোষ করলে? ভয় নেই—আমি সমস্ত জাতের ওপরে—ওতে আমার কোনো ক্ষতি হবেনা।

কেরামদ্দী হাসিয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

মন্‌সা গাছ

শ্রীশীতল বর্দ্ধন

মাঠের মাঝে বনের পাশে,
জড়িয়ে শাড়ী দেহে,—
আলোছায়ায় দাঁড়িয়ে একা
নীল নাগিনী মেয়ে!

গ্রীষ্ম বাদল শীতের হিম,
মাথার 'পরে যায়;
হর্ষ দুখে চির সবুজ—
কাটে সকল দায়।

ভোরের আগে পাখীর সুরে,
নাচে পাতার ফণা;
ঝিক্‌মিকিয়ে মুক্তা মাণিক
জ্বলে শিশির কণা।

কোকিল শ্যামা দোয়েল ফিঙা,
'বৌ-কথা-কও' ডাকে;
দুপুর রোদে মৌমাছিদের
কাতার ঝাঁকে ঝাঁকে।

পাতার ফাঁকে জোনাক্ জ্বলে,
রোজ দীপালী খেলা;
নূপুর বাজে ঝিঁ ঝিঁ'র ডাকে,
নিত্য রাতের বেলা।

নাইকো দাহ ক্ষুধার জ্বর,
মনসা নাহি মরে;
সবুজ রূপের ছায়া লুটে,
মাঠের ধূলা পরে!

নাট্যসাহিত্যে 'ট্র্যাজেডী'

শ্রীভাস্কর দেব

প্রাচ্যদেশীয় অলঙ্কারশাস্ত্রানুযায়ী প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্যে 'ট্র্যাজেডী'র কোন স্থান নাই। এতদ্দেশীয় আলঙ্কারিকগণের মতে সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয় সর্বদা শুভান্ত হইবে; অশুভান্ত বর্ণনা সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু মহাকবি কালিদাস রচিত অমর সংস্কৃত মহাকাব্য 'রঘুবংশম্' কি 'ট্র্যাজেডী' নহে? যাহা হউক, সর্বকালে সর্বদেশীয় কবিদিগের মধুকরী কল্পনা-প্রতিভা আলঙ্কারিকগণ কৃত গণ্ডীর বহির্দেশে বিচরণ করিয়া থাকে, কারণ হৃদয়াবেগ কোন বন্ধন মানে না। সুতরাং সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের বিধানে সাধারণভাবে মানিয়া লইয়া আমরা আলোচনা করিব। প্রাচ্যদেশীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে 'ট্র্যাজেডী' সম্বন্ধে ইহাই লিপিবদ্ধ আছে,—

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।"*

অর্থাৎ করুণ প্রভৃতি রস হইতেও যে শ্রেষ্ঠ সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে সহৃদয়গণের বা রসিকগণের অনুভূতিই তাহার প্রমাণ। মনীষী Abercrombie বলেন—'Tragedy satisfies us even in the moment of distressing us'†। অতএব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় সাহিত্য-রসপিপাসু সুধীদিগের মতানুযায়ী 'ট্র্যাজেডী' যে মানবচিত্তে সুখানুভূতি উৎপাদন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম সেই বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। গ্রীকগণ জগৎ ও জীবনের যথাযথ পরিচয় প্রদানপূর্বক অত্যুৎকৃষ্ট রসানুভূতির সৃষ্টি করিতে সক্ষম বিবেচনা পূর্বক 'ট্র্যাজেডী'কে সাহিত্যের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এমন কি অলৌকিক প্রতিভাশালী গ্রীক মনীষী Aristotle স্বরচিত 'Poetics' নামক অলঙ্কার গ্রন্থে প্রায় সমগ্রাংশ 'ট্র্যাজেডী' সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন।

প্রাচ্য নাট্য-সাহিত্যে ট্র্যাজেডী

প্রাচ্যদেশীয় নাট্য-সাহিত্যে সৃষ্টির প্রতি বিশেষ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহা প্রতীয়মান হইয়া থাকে যে ১২৫৮ বঙ্গাব্দে 'কীর্তিবিলাস নাটক' রচনা করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত সর্বপ্রথম প্রাচ্যদেশীয় আলঙ্কারিকগণ কৃত এই অন্ধ-রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। উক্ত গ্রন্থটী [illegible] [illegible] একটী 'করুণাত্মিকা প্রবন্ধ'। অতএব কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলি, "যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত'ই সর্বপ্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।"‡ অতঃপর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবা বিবাহ নাটক' প্রকাশিত হইল। উক্ত নাটকটীও বিয়োগান্ত, এবং উহাই প্রাচ্যদেশীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের বিপক্ষে দ্বিতীয় বিদ্রোহ। কিন্তু উপরিউক্ত নাটকদ্বয় বিশেষ প্রচলিত না থাকায় অনেকেই তৎসময়ে রচিত অতি-লোক-প্রসিদ্ধ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ই বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক (Tragedy) বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। উক্ত নাটকটী মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক রচিত এবং সর্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক না হইলেও উহা যে বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট বিয়োগান্ত নাটক সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এমন কি অদ্যাবধি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'—এর ন্যায় অত্যুৎকৃষ্ট বিয়োগান্ত নাটক সৃষ্ট হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কি ভাষায়, কি রচনা-সৌকুমার্যে, কি নাটকত্বে, কি ভাব ও রস সৃষ্টিতে—'কৃষ্ণকুমারী' আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। | [illegible]

কোন কোন সমালোচক 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে Romantic নাটক আখ্যা দিয়া থাকেন। মধুসূদন স্বয়ং ও রাজনারায়ণ বসুকে ('পদ্মাবতী নাটক' রচনাকালে) লিখিয়াছিলেন,—"If I should live to write other Dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down to the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I should look to the great Dramatists of Europe for models*"

যে সকল সমালোচক উপরিউক্ত মতের পৃষ্ঠপোষক তাঁহারা তাহার কারণ দেখাইয়া বলিয়া থাকেন যে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'এর মধ্যে বিলাতি Romantic নাটকের ন্যায়, বিয়োগবিধুরা নায়িকা (Tragic Heroine), খল-চরিত্র (Villian), প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী (Rival claimants), প্রণয়ন প্রভৃতি আছে এবং সেই জন্যই নাকি তাঁহারা আলোচ্য নাটকটিকে Romantic নাটকের পর্য্যায়ে স্থান দান করিয়া থাকেন। যাহা হউক সর্বপ্রথমে বিলাতি Romantic নাটকের লক্ষণাদি পরীক্ষা করিয়া পশ্চাতে সেই সকল লক্ষণাদির সহিত কোন মিল আছে কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই আলোচ্য নাটকটী Romantic নাটক কি না তাহা প্রমাণিত হইবে। Aristotle-এর দিন হইতে সনাতনপন্থী নাট্যকারগণ সময়ের ঐক্য (Unity of Time), স্থানের ঐক্য (Unity of Place) এবং ঘটনার ঐক্য (Unity of Action) এই তিনটী ঐক্য নীতি মানিয়া লইয়া নাটক রচনা করিতেন। সেই নাটকগুলির মধ্যে মানবজীবনের কাহিনী সংহত ও সংযত রূপে প্রতিফলিত হইত। নাট্যকারক মাত্র কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয় দৃশ্যের অবতারণা করিতেন এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় বা মূল বিষয়-বস্তুর প্রতিকূল ঘটনাপুঞ্জ সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করতঃ মূল বিষয়-বস্তুর সম্যক্ পুষ্টিসাধনের প্রয়াস পাইতেন। এই সকল নাটকগুলিকে classical নাটক নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় কতিপয় নাট্যকার classical নাটকের বন্ধন ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের মুক্ত পক্ষ স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাদ্বারা জীবনের সর্বাংশ প্রকাশিত একটী পরিপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিলেন এবং কয়েকটী আপাতঃ—অপ্রয়োজনীয় উপাখ্যান বা দৃশ্যের অবতারণা করিয়া নাটকগুলিকে মানবজীবনের প্রতিচ্ছবিতে পরিণত করিলেন। এই শ্রেণীর নাটকগুলিকে তৎকালে Romantic নাটক আখ্যা দেওয়া হইত। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করিয়া মধুসূদন সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কৃত বিধানাদি প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং তাঁহার মধুকরী কল্পনা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচার বশতঃ বহু অপ্রয়োজনীয় কিন্তু আপাতঃ প্রয়োজনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়া জগৎ ও জীবনের একটি সম্পূর্ণ চিত্র চিত্রিত করিলেন। সুতরাং সেই দিক হইতে বিবেচনা করিলে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে Romantic নাটক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' যদি Romantic নাটকই হয় তবে Tragedy হইতে আপত্তি কি?

বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক (Tragedy) সৃষ্টি প্রসঙ্গে মধুসূদনের পরেই দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু-সৃষ্ট

---

* সাহিত্যদর্পণ।

† The Idea of Great Poetry

‡ বঙ্গদর্শন পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

* মধুস্মৃতি (পৃঃ ৬০১) দ্রষ্টব্য।

বিয়োগান্ত নাটকগুলির মধ্যে 'নীলদর্পণ'ই সর্বোৎকৃষ্ট। 'নীলদর্পণ' নাটকে বাস্তবতার সুর (Realism) প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত নাটকে দীনবন্ধু যে অপূর্ব্ব রচনাদক্ষতা, চরিত্রাঙ্কন-পটুতা, দৃশ্য সৃষ্টি ও অদ্ভুত ঘটনা-বিন্যাস-নিপুণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গীয় বিয়োগান্ত-নাট্য-সাহিত্যের দরবারে 'নীলদর্পণ'-এর উচ্চাসন নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দীনবন্ধু মিত্রের পর বিয়োগান্ত নাট্য সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইলেন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। (গিরিশের পূর্ব্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন বসুর আবির্ভাব ঘটিলেও তাঁহাদের রচিত বিয়োগান্ত নাটকাবলী যথার্থ ট্র্যাজেডী'র সম্মান পাইতে অসমর্থ।) বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব হইতে তিরোভাব ও তৎপরবর্ত্তী এই বিস্তৃত কাল 'গৈরিশী যুগ' নামে খ্যাত হইয়া থাকে। বিয়োগান্ত নাট্য-সাহিত্যে 'গৈরিশী যুগ'এর নাট্যাবদান সর্ব্বাধিক ও সর্বোৎকৃষ্ট। আর গিরিশচন্দ্র রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলির কয়েকখানি এবং সামাজিক নাটকাবলীর অধিকাংশই বিয়োগান্ত নাটক (Tragedy)। তন্মধ্যে আবার 'প্রফুল্ল'ই ট্র্যাজেডী'র জাজ্বল্যমান উদাহরণ। এই 'প্রফুল্ল' আত্মপ্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গিরিশের প্রতিভাসম্পন্ন লেখনী হঠাৎ Romantic হইতে Realism-এর পথে অগ্রসর হইল। বাস্তবিক পক্ষে 'প্রফুল্ল' নাটকে পারিবারিক জীবন ও নিয়তি-লীলার ঘাত প্রতিঘাতের যে নগ্ন চিত্র গিরিশচন্দ্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা বাস্তবতার একটি চরম সত্য বিয়োগান্ত নাটকাকারে রস-পিপাসুদের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। 'প্রফুল্ল' নাটকে গিরিশ অঙ্কিত এই বাস্তব ট্র্যাজেডী পাশ্চাত্য Classical Tragedy অর্থাৎ গ্রীসীয় বিয়োগান্ত নাটকের মত। পাশ্চাত্য 'ট্র্যাজেডী'তে থাকে একটা প্রচণ্ড ব্যর্থতা,—'a great frustration' এবং এই ব্যর্থতা নাট্যোল্লিখিত নায়ক বা নায়িকার জীবনে সৃষ্টি করে আকাশ পাতাল প্রসারি একটা বিরাট শূন্যতা,—জীবনের সব কিছু সেই মহাশূন্যের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেও তাহা যেন ফাঁকাই রহিয়া যায়। প্রফুল্লের জীবনেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই,—সেইজন্যই বলিলাম যে 'প্রফুল্ল' পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডী সদৃশ। নাট্য-সাহিত্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক মনীষী এরিষ্টটল্ (Aristotle) পাশ্চাত্য 'ট্র্যাজেডী'র সংজ্ঞা নিরূপণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"Tragedy is an *imitation* of an action that is *serious*, *Complete*, and of a certain magnitude; in language *embellished* with each kind of artistic ornament, the *several kinds* being found in separate parts of the play; in the form of *action*, not of *narrative*; through pity and fear effecting the proper *purgation* of these emotions."*—'প্রফুল্ল' নাটক সম্যক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক এরিষ্টটল্ কৃত উপরিউক্ত বিধির সহিত তাহার সৌসাদৃশ্যই মানস-নয়নে প্রকট হইয়া থাকে, সুতরাং প্রফুল্ল'কে পাশ্চাত্য Tragedy সদৃশ বলা কি অসঙ্গত? কিন্তু যে জন্য 'প্রফুল্ল'-এর মর্য্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা দৃশ্য নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসিক পরিবর্ত্তন চিত্র, অর্থাৎ একজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি অপর এক বা বহু বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি কর্ত্তৃক কি ভাবে সৎ বা অসৎ পথে চালিত হইয়া থাকে তাহারই চিত্র। নাটকীয় নায়ক-বা নায়িকা ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে একটা প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকা ট্র্যাজেডীর পক্ষে অবশ্য বাঞ্ছনীয়, কারণ যে নাটকে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যত দৃঢ় হইবে সেই নাটক হইবে সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট। 'To be or not to be'র অদ্ভুত দ্বন্দ্ব আনিয়াছিল Hamlet এর বিষমতা' যেমনি মরণাধিক অন্তর্দ্বন্দ্ব আনিয়াছিল প্রফুল্ল'এর বিষমতা। যাহা হউক এতদ্ব্যতীত আমাদের মূল বক্তব্য বিষয় এই যে 'গৈরিশী যুগ'ই বাংলার বিয়োগান্ত নাট্য-সাহিত্যের সবিশেষ সমৃদ্ধি ও পুষ্টি ঘটিয়াছিল।

এইরূপ উক্তির পশ্চাতে যুক্তিযুক্ত কারণও রহিয়াছে; গিরিশ নাট্য-সাহিত্যের সৌভাগ্যাকাশে উদিত হইলেন নাট্যকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। নাট্যসম্রাট সেক্সপিয়ারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইলেন। ফলতঃ তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা যে সকল মহারত্ননিচয় প্রসব করিল সেইগুলির বিচিত্র অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে বিয়োগান্ত নাট্য সাহিত্য অদ্যাপি আলোকিত রহিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র বিয়োগান্ত নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান' 'চন্দ্রগুপ্ত'এর ন্যায় ঐতিহাসিক নাটক ও 'পরপারে'র মত সামাজিক সমস্যামূলক নাটকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; উক্ত নাটকগুলিতে পাশ্চাত্য (Tragedy) ট্র্যাজেডীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ঘাত-প্রতিঘাতে দুঃখ দৈন্য-দলিত মানব জীবনের বেদনা-মুখর দ্বন্দ্ব-বহুল কাহিনী অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা অলঙ্কারবহুল ও সাধারণতঃ বক্তৃতাত্মক হইলেও তাহা অশোভন নহে অথবা তাহা রসসৃষ্টি কি রসনিষ্পাদনের কোনপ্রকার ব্যাঘাত ঘটায় না, পরন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় ভাষা রস নিষ্পাদন ক্রিয়া সম্পূর্ণ করিয়া নাটকীয় রস-স্রোতের গতি সম্পূর্ণ অব্যাহত ও বেগবান করিয়া রাখে। পাশ্চাত্য অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী 'ট্র্যাজেডী'তে থাকে বিরাট সম্পত্তির ন্যায় কোন বিপুল ঐশ্বর্য্য ও মহিমামণ্ডিত কোন ব্যক্তির অধঃপতন। আদি আলঙ্কারিক এরিষ্টটলের ভাষায় বলি,—"He (in tragic Hero) falls from a position of lofty eminence; and the disaster that wrecks his life may be traced not to deliberate wickedness but to some great error of Frailty"—*

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকসমূহে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। যেমন সাজাহান নাটকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি—কঠিন নিয়তি পরিহাসে জরাজীর্ণ পক্ককেশ নায়ক সাজাহান ভারত সম্রাটের মহিমামণ্ডিত সিংহাসন হইতে ধীরে ধীরে অবনমিত হইয়া কারাগারের অন্তরালে উপবেশন করিলেন এবং অত্যধিক মমতা স্নেহান্ধতাজনিত ভ্রান্তির নিমিত্ত তিনি অতি দীনভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। সুতরাং এতদ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে 'ট্র্যাজেডী'তে অবশ্য প্রয়োজনীয় রস-নিষ্পাদন সাজাহান করিতেছে এবং এই রস-সৃষ্টি অভিনব, উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাবে বঙ্গীয় বিয়োগান্ত নাট্য-সাহিত্যাকাশে সৌভাগ্যের সূচনা হইল। বিশেষতঃ 'পরপারে' নাটকে প্রচণ্ড ব্যর্থতায় যে করুণরস ধ্বনিত হইয়াছে তাহা classical Tragedyর প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত এবং এই সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত বিয়োগান্ত নাটকটি নাট্য-সাহিত্যে নবযুগের সূচনাপূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেণীর নাট্যরসপিপাসু জনগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক খ্যাতনামা নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বিয়োগান্ত-নাট্য সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়া 'প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকে করুণরস সৃষ্টি করিলেন। ভাষার স্বাধীনতা, রুচির শালীনতা ও ভাবের গুরুত্বই ছিল তাঁহার নাটকের বিশিষ্ট গুণ।

অতঃপর বঙ্গ-সাহিত্যের সৌভাগ্যাকাশে উদিত হইলেন সাহিত্যে যুগান্তকারী এক নব 'রবি', তাঁহার প্রতিভা-উজ্জ্বল দীপ্তিতে সমগ্র সাহিত্যাকাশ আলোকিত হইল;—গিরিশ তখন পশ্চিমাচলে ঢলিয়া,

---

* Poetics.

* Aristotle 'Poetics

‡ বিসর্জ্জন নাটক; উৎসর্গপত্র দ্রষ্টব্য।

সমাজের রসস্রোতে তখন ভাঁটার টান ধরিয়াছে। নাট্য-সাহিত্য জগতে লেখনী ধারণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে এবং অতি অল্প প্রয়াসেই 'বিসর্জন' প্রভৃতি কয়েকটী বিয়োগান্ত-নাটক সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি এবং সেই জন্যই তদ্‌রচিত অধিকাংশ নাটকে নাটকীয় গুণাদি অপেক্ষা 'লিরিকের' প্রাধান্যই অধিক অর্থাৎ যাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে,—

"• • • ড্রামাটিক্ বলা নাহি যায় ঠিক
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।" :

তথাপি পাঠ্য নাটক হিসাবে তাহাদের যথেষ্ট মূল্য আছে। রবীন্দ্র-নাট্য-কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব কোন বিশেষ 'ভাব' জনিত অনুভূতির প্রকাশ। কিন্তু নাটকের রীতি অনুযায়ী নাটকে বিষয়-বস্তুর প্রতিধ্বনি যতখানি বাঞ্ছনীয় এবং এইরূপ করিলেই কোন নাটক যথার্থ দৃশ্যকাব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু রবীন্দ্র-নাট্য-কাব্যে নাটকীয় বিষয় বস্তুর সহিত কবি চেতনার অধিক সংমিশ্রণই ইহাকে দৃশ্যকাব্য হইতে বাধা প্রদান করিয়াছে। যাহা হউক, ট্র্যাজিডীর মাপ-কাঠিতে রবীন্দ্র-নাট্যকাব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

অন্ধকূপ হত্যা

শ্রীসন্তোষকুমার দে

যে স্থানটিতে হলওয়েল মনুমেণ্ট ছিল এখন সেখানে দুইবেলা হাজার মানুষের পদধূলি পড়িতেছে। অফিস ফেরত পথে ধীর মন্থর গতিতে ক্লাইভ ষ্ট্রীট বাহিয়া সেই মোড়টিতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মাস শেষ, পকেটে পয়সা নেই। আসিবার সময় দেরী হইবার ভয়ে তিন পয়সার ট্রামে ঝুলিয়া আসিয়াছি, ফিরিবার সময় পদব্রজেই যাইব। বৈকালের বাতাসটুকু মন্দ লাগিতেছিল না। একবার ভাবিলাম, ডালহৌসী স্কোয়ারে একটু বসিয়াই যাই। পুকুরের পাড়ে মরসুমি ফুল ফুটিয়াছে, সাহেবদের ছেলে মেয়েরা ছুটাছুটি করিতেছে, অস্তমান সন্ধ্যাসূর্য্য পুকুরের জলেও লাল আভা ফেলিয়াছে। ওদিকে তাকাইয়া থাকিলে কোন কোন দিন আমার বাল্যের গ্রাম্যজীবনের কথা মনে পড়ে, সহসা যেন মনের কোন বন্ধ বাতায়ন খুলিয়া যায়, এক ঝলক বসন্তের বাতাস ছুটিয়া আসে, নিয়া আসে আনন্দের স্বপ্ন, উন্মুক্ত আকাশের হাতছানি। কিন্তু আজ মনে পড়িল, অফিসে আসিবার সময়েও শুনিয়া আসিয়াছি, ফিরিয়া যাইয়া কয়লা না আনিলে রাত্রের রান্না চড়িবে না। সে কারণ পার্কে বসা দূরে থাক, বরং একটু দ্রুতপদেই গৃহে ফিরিবার কথা। তবু শুষ্ক উদর দ্রুত পদচারণায় সায় দিল না। অগত্যা ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া বিড়িটি টানিতে লাগিলাম।

হাজার হাজার মানুষ যাইতেছে, কেহ আমার মত দাঁড়াইয়া— উহাদের দিকে তাকাইয়া আমার একটি কথা সহসা মনে হইল। মনে হইল, সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু যে অন্ধকূপ হত্যার কথা এতকাল আমরা শুনিয়া আসিতেছি, যে স্থানে সেই নারকীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া দাবী করা হইত, সেই স্থানেই আজ সহস্র সহস্র লোক ছুটাছুটি করিতেছে। যে স্থানে স্বল্প পরিসর কক্ষে একদল বন্দী মুক্তির আকাঙ্খায় নিঃশ্বাস টানিবার মত এক ঝলক বাতাসের আকাঙ্খায় ছটফট করিয়া প্রাণ দিয়াছিল বলা হইত, সেই স্থানেই আজ তড়িৎবেগে ট্রামে বাসে মানুষ চলা ফিরা করিতেছে, গতির সহস্র দিক খুলিয়া গিয়াছে।

নিজের চিন্তায় মশগুল হইয়াছিলাম, পাশ দিয়া গোবিন্দ যাইতেছিল লক্ষ্য করি নাই, আমাকে সে একটা ধাক্কা দিতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম। গোবিন্দ দাঁড়াইল না, সময় নাই। আমাকেও সে দাঁড়াইতে দিল না, টানিয়া লইয়া চলিল। আমার মনের কথাটা তাহাকে না বলিয়া পারিলাম না। বলিলাম, অন্ধকূপ হত্যার কথা শুনেছিস্ তো? আমার কিন্তু মনে হয়, সত্যিই যদি এখানে কোন বন্দীর ঘরে থাকে তবে তাদের মৃত আত্মার প্রার্থনাই স্থানটিকে মুক্তিময় করে তুলেছে। তাই এখানেই এত ছুটাছুটি, এত প্রাণ-চাঞ্চল্য।

গোবিন্দ আমার সহপাঠি বন্ধু। এ কথায় সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল, তার পর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,— কন্‌ট্রোল রেটে কিছু বেশী পরিমাণে চাল পেয়েছিস্ না কি যে একেবারে ঐতিহাসিক গবেষণায় ডুবে গেছিস?

অফিস ফেরত পথে গোবিন্দ টিউসানিতে যায়, বৌবাজারে আসিয়া সে অন্য পথ ধরিল। আমি আমার গন্তব্য পথে 'হন হন করিয়া' ছুটিলাম। ঘরে ফিরিয়া বাজারের থলেটি লইয়া আবার যখন পথে নামিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কয়লাওয়ালাকে বলিয়া কহিয়া কিছু কয়লার ব্যবস্থা করিয়া, দুই পয়সার সজিনাডাঁটা, এক পয়সার কুমড়া, দেড় পয়সার উচ্ছে, আধ পয়সার তেঁতুল এবং ইত্যাকার আরও দুই চারিটি জিনিষ কিনিয়া গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম—বারোটি পয়সাই ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু যে জিনিষটি না হইলে রাত্রের আরামটুকু হয় না সেই এক ছিলিম বালাখানার ব্যবস্থা করা হয় নাই। কাছে পয়সা থাকিলে আবার বাজারে যাইতে দ্বিধা করিতাম না, কিন্তু কাছে না থাকায় নিরস্ত হইতে হইল।

গৃহ মধ্যে যাহারা পড়িতেছিল অথবা পড়িবার জন্য বসিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধের গতি প্রগতির বিষয়ে বিচক্ষণ মতবাদ প্রচার করিতেছিল, এবার তাহাদের কথা কানে আসিল। শুনিলাম, চট্টগ্রামে বোমা আবার পড়িতেছে। এবার হয়ত আমার মাথাটিতে বোমা পড়িতে বিলম্ব হইবে না। কেন জানিনা—

সংসারের দিকে তাকাইয়া মাঝে মাঝে আমার মরিতে সাধ হয়। সংসার যেন একটি বিরাট যন্ত্র, মহানির্ঘোষে ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত চলিতেছে। আমি সেই বিরাট যন্ত্রের অংশ বিশেষ, নিষ্প্রাণ, নিরানন্দ, নীরেট। তবু চাহিদার প্রচণ্ড বেগে ছুটিতেছি খাটিতেছি। খাইতেছি, তাহাও সেই ছুটাছুটি বজায় রাখিবার জন্য। যেন তাঁতের মাকুর মত একবার অফিস, একবার ঘর এই আমার নির্দ্দিষ্ট নিয়তি। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত অহর্নিশি এইভাবে দুলিতে হইবে, একটু অন্যমনস্ক হইলেই কোথাও খাতায় লাল কালীর দাগ পড়িয়া গেল, কোথাও রাত্রের রন্ধনের কয়লা বাড়ন্ত হইয়া উঠিল।

বোমার আগমনের আগেই ভাতের আহ্বান আসিল, অগত্যা খাইতে গেলাম। মায়ের কাছে শুনিয়াছি, আমি নাকি সজিনার ডাঁটা ভালবাসি, অল্প বয়সে নাকি সজিনাকে 'সজনী' বলিতাম, সে কথা কাহারও কাহারও হয়ত মনে আছে। কিন্তু বয়স তো আমার একার বাড়ে নাই, তাঁহাদেরও বাড়িয়াছে, তাই অভ্যাস দোষে যখন 'সজনী'র সন্ধান করিয়া ফেলিলাম, তাঁহারা হেঁসেল বিভাগ হইতে স্পষ্ট করে জানাইলেন, বৈকালের বাজার কাল সকালের জন্য। তবে তৈলটুকুর কথা স্বতন্ত্র এ কথা অবশ্য আমি জানিলেও বলিলাম না। খাইয়া উঠিয়া আসিলাম, মধ্যে তৈল-নিষেক হইল, যাহাতে পরদিবস নির্ঝাটে কাজ চলে। আজ আর অনুভূতিও নাই, বলাবলাও নাই, অগত্যা আর একটি বিড়ি টানিয়া বিছানার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

সকাল সকাল উঠিতে হয়। পৈতৃক উপবীত ও গায়ত্রী নাটি এখনও ছাড়িতে পারি নাই। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া, ভিজা গামছা পরিয়া, পূর্ব্বাস্য হইয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া লই। সবিতার রূপ স্মরণ হইলেই মনে হয়—বেলা বাড়িতেছে। বৃদ্ধাঙ্গুলি সবেগে অনামিকা কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও তর্জ্জনীর উপর বুলাইতে থাকি। কোনদিন দাড়ি কামাইতে যাইয়া বেলা হইয়া যায়, কোনদিন বাজার সারিতে স্নানের সময় থাকে না। কলতলায় যাইয়া এক বালতি জল উত্তমাঙ্গে ঢালিয়া দিয়া ভাতের জন্য হাঁক দিতে থাকি। খাইয়া উঠিয়াই তিন পয়সায় ট্রাম, তারপর সারাদিন টাকা আনা পাই, হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকার হিসাব কষি। ছুটির শেষে পথে বাহির হইয়া মনে পড়ে,—মাসের শেষ, হাজার হাজার, লাখ লাখ দূরে থাক, ঘরে ফিরিবার ট্রামের পয়সাটিও পকেটে নাই। অগত্যা হণ্টনের পূর্ব্বে হলওয়েল মনুমেণ্টের মোড়ে দাঁড়াইয়া ডালহৌসি স্কোয়ারের সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি আর মরশুমি ফুলের বিছানাগুলির দিকে তাকাইতে তাকাইতে একটি বিড়ি ধরাই।

বোমার ভয় আমাদের আর নাই, মৃতের আবার মৃত্যু ভয় কি? আমরা কি বাঁচিয়া আছি? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আজ আবার হলওয়েল মনুমেণ্টের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলাম। হলওয়েল মনুমেণ্ট নাই, দুই বেলা সেখানে অজস্র যান-বাহনের ভীড়। অন্ধকূপহত্যার প্রবাদ সত্য কি না ঐতিহাসিকেরাই জানেন, কিন্তু আজ চার্চলেনের মোড়ে দাঁড়াইয়া অন্ধকূপ হত্যার স্বরূপ আমি নূতনভাবে অনুভব করিলাম। যে অপরিসর কক্ষে বন্দীরা একটু নিঃশ্বাসের বাতাসের অভাবে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, মৃত্যুকালে তাহাদের উৎসারিত অভিসম্পাতে আমাদের সমগ্র জীবন তদপেক্ষা অপরিসর ক্ষেত্রে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারা কয়েক ঘণ্টা নিঃশ্বাস লইতে না পারিয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু আমরা সমগ্র কর্ম্মজীবন ধরিয়া নিঃশ্বাসের বাতাসের মতই একটু বিরাম বিশ্রামের মুহূর্ত্তের জন্য আকুলভাবে আকাঙ্খিত থাকি, মৃত্যু যন্ত্রণার অপেক্ষাও তীব্র যন্ত্রণা তিলে তিলে দিনে দিনে আমাদের ক্ষয় করিতে থাকে। আমি একা নই, অগ্রে পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিলাম—অগণিত জনতা। বাস্তবিক তাহারা চলিতেছে বটে, কিন্তু সে শুধু সেই বদ্ধ কক্ষে ছটফট করা ছাড়া আর কিছু নয়, প্রকৃতপক্ষে আমাদেরও অন্ধকূপ হত্যা হইতেছে। এ কূপে আকাশের আলো বাতাস কেবল আসে না তাই নয়, মানুষগুলির জীবন হইতেও তাহা মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই ঘণ্টা বাঁধা যান্ত্রিক জীবনের বাহিরে যে কিছু আছে, পৃথিবীতে যে রূপ, রস, আনন্দ আছে সে কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এই নিরুদ্ধ জীবনে আমরা তিলে তিলে মরিতেছি, সহস্রে সহস্রে মরিতেছি, বংশ পরম্পরায় মরিতেছি, জাতি হিসাবে মরিতেছি। সরকারী ও সওদাগরি দপ্তরখানার কলমের গারদে আমাদের জীবন পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আছে। হয়ত উপার্জ্জন বাড়িয়াছে, সংগে সংগে অন্নের উপসর্গও বাড়িয়াছে। দার্শনিকের বংশধর, শান্তিপ্রিয়, চিন্তাশীলের স্কন্ধে সময়ের চুলচেরা হিসাবের বোঝা চাপিয়া তাহার কণ্ঠশ্বাস রোধ করিয়াছে, পরপদ-সেবাবৃত্তি তাহার চিত্তের শান্তি ও চিন্তার ব্যাপ্তি ব্যাহত করিয়াছে। সে যে নিত্য নিয়ত আপন ক্ষুদ্রবেষ্টনের প্রাচীরে মাথা কুটিয়া মরিতেছে, কোন মনুমেণ্ট অপসরণে এই অপবাদ ঘুচিতে পারিবে?

যাবার বেলায়

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

অন্তরে মোর বন্দী মনের পাখী
গান ভুলিয়াছে বেদনার কারাগারে—
মন চায় তারে বিদায় গোপনে ডাকি
ঘুম পাড়ানিয়া গান শুনি বারে বারে।

চারিদিক্ ভরা বেদনার গানে গানে
গভীর রজনী জাগরণে কেটে যায়—
অর্পিত প্রাণ বহনের ব্যথা হানে
দলিত কুসুমে ক্ষুধা কিসে মেটে হায়?

আমার পল্লী আজ মরণের বাসা
সেথা ফিরে দেখি সব দুর্ভিক্ষের দল—
নাইকো মমতা এতটুকু ভালোবাসা
দুই চোখে ভরা বাঁচিবার মতলব।

ধন ভরা যেথা ছিল ঘরে ঘরে ধান
আজিকে সেথায় হাহাকার নাই নাই—
চ'লে যেতে হবে; তবুও মাটির টান
যাবার বেলায় পিছনে টানিছে তাই।

জঙ্গম

বনফুল

১০

অন্ধকার রাত্রি, চতুর্দ্দিক নির্জ্জন। নিপু আপন ঘরে বসিয়া একমনে ডায়েরি লিখিতেছিল।

"একটা কালো কুকুরী আমার অস্থি মাংস চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতেছে। স্নায়ু-শিরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর মন আর্ত্তনাদ করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই নিস্তার নাই, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না, কিছুতেই সে আমাকে শান্তি দিবে না। অর্থ, সামর্থ্য, ভয়-প্রদর্শন, যুক্তি—সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল—কিছুতেই তাহার মন পাইতেছি না। কুকুরী, ঘৃণিতা কুকুরী, কালো, কুৎসিত, কদর্য্য—কিন্তু তবু ও—না, নিজেকে সম্বরণ করিতে হইবে, এ জালাময় অপমান আর সহ্য করিতে পারি না, আর সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু কেন? কেন আত্মসম্বরণ করিবার প্রবৃত্তি জাগিতেছে? এ দুর্ব্বলতার অর্থ কি? অর্থ সেই সনাতন সংস্কার, মনের সেই অন্ধ গোঁড়ামি—যাহা বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া নিষেধকে মানে, যাহা প্রত্যক্ষ যুক্তিকে বিদলিত করিয়া অযৌক্তিক মানস-বিলাসে আত্মহারা হয়, যাহা কাল্পনিক পরলোকের আশায় অস্থি বাস্তব ইহলোককে তুচ্ছ করে। না, এদেশে বিজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। সকলকে বায়োলজির মূলতত্ত্ব শিখাইতে হইবে, যে বায়োলজি জীব-ধর্ম্মের স্থূল-রূপটা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, যাহা জীবকে জীব হিসাবেই গণ্য করে—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিকতার কুয়াশা সৃষ্টি করিয়া যাহা জীবনের বৃহৎ সত্য আবৃত করিয়া ফেলে না। আগে জীবন, তাহার পর জীবন-দর্শন। বলশেভিক রাশিয়া সহজ স্থূল যৌন-মিলনের সমস্ত কৃত্রিম বাধা দূর করিয়া দিয়াছে। সেদেশে ভালবাসা ছাড়া আর কোন নিগড় নাই। ও মেয়েটা কি আমাকে ভালবাসে না? হয়ত বাসে—কিন্তু বাসিলেও প্রকাশ্যত তাহা স্বীকার করিতে পারে না, সমাজের নিষ্ঠুর আইন আছে। সে পারিলেও আমি পারি না, আমার একটা ঝুটা আত্মসম্মানের বুর্জোয়া মুখোস আছে, আমি কিছুতেই প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে পারি না যে আমি একটা নীচজাতীয়া অস্পৃশ্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। বলশেভিক রাশিয়ার হয় তো আমার এই অবৈজ্ঞানিক চক্ষুলজ্জা থাকিত না, হয় তো ওই মেয়েটাও ওই নাক-বসা সর্ব্বাঙ্গে-ঘা লোকটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হইত না, হয় তো······"

চিন্তা-স্রোতে সহসা বাধা পড়িল। অদূরে হাড়ি-টোলায় একটা কলরব উঠিল। মনে হইল যেন মারামারি বাধিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি কলম রাখিয়া ডায়েরি বন্ধ করিয়া ফেলিল। উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ শুনিল, তাহার পর আলোটি কমাইয়া বালিশের তলা হইতে টর্চটি লইয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল। অস্পৃশ্যতা নিবারণ, অস্পৃশ্যদের উন্নতি-সাধন তাহার কাজ, অস্পৃশ্যদের মধ্যেই তাই সে বাসা বাঁধিয়াছে। একেবারে ঠিক মধ্যে নয়, কাছাকাছি। হাড়ি পাড়ার একটু দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে তাহার পরিচ্ছন্ন ছোট বাসাটি। উৎপলই বাসাটি করাইয়া দিয়াছে। অস্পৃশ্য বালক বালিকাদের পাঠশালাটি এই বাসারই প্রশস্ত বারান্দায় রোজ বসে। নিপুই তাহাদের পড়ায়—ইহাদের কাছে সে 'গুরুজি' বলিয়া পরিচিত। টর্চ ফেলিতে ফেলিতে অন্ধকারে নিপু আগাইয়া গেল। অকুস্থলে পৌঁছিয়া তাহাকে কিন্তু গতিবেগ সম্বরণ করিতে হইল। আর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। একি কাণ্ড! সুরা-উন্মত্ত একদল হাড়ি অশ্রাব্য-ভাষায় চীৎকার করিতেছে। ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া মুস্কিল। ভীড়ের ভিতর হইতে একটা আর্ত্তনাদও উঠিতেছে—ভিতরে কে যেন কাহাকে প্রহার করিতেছে। নিকটেই ধূমান্বিত একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু তাহা না জ্বলিলেও ক্ষতি ছিল না। একটু দূরে দাঁড়াইয়া নিপু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—কি করা যায় কিছু একটা অবিলম্বেই করা উচিত, আর্ত্তনাদটা ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কি যে ঠিক হইতেছে তাহা অনুমান করা কঠিন—সকলেই অসংলগ্ন ভাষায় চীৎকার করিতেছে, কিছুই বোঝা যায় না, কেহই থামিবেও না। উহাদের ভিতর গিয়া হাতাহাতি করিতে পারিলে হবে হয় তো উহাদের থামানো যায়—কিন্তু তাহা করা নিপুর পক্ষে অসম্ভব। সে দূর হইতেই দুই একবার টর্চ ফেলিয়া "এই এই কিয়া হুয়া"—জাতীয় দুই একটা উক্তি করিল, কিন্তু কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। ভীড়ের ভিতরে আর্ত্তনাদটা প্রবলতর হইয়া উঠিল। কেহ কাহাকেও খুন করিয়া ফেলিতেছে না তো! অসম্ভব নয়। নিপুর স্মরণ হইল জারের যুগে রাশিয়ান কৃষকরা 'ভড্‌কা' পান করিয়া আপনজনকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে এ কাহিনী সে বহুবার বহু পুস্তকে পাঠ করিয়াছে। আর একটু আগাইয়া গিয়া সে আর একবার টর্চ ফেলিল। এবার সে দেখিতে পাইল এবং যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। মোটা কালো একটা হাড়িনী একটা রোগা ছোঁড়ার বুকের উপর বসিয়া তাহার চুলের ঝুঁটি মুঠি করিয়া ধরিয়া ক্রমাগত চড়াইতেছে এবং ক্রুদ্ধ কর্কশ কণ্ঠে বলিতেছে "এইসে, এইসে, এইসে—"। ছোঁড়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে—"বাপরে বাপরে বাপরে—"

মোটা হাড়িনী শুধু মোটা নয়, মোটা এবং কালো। তাহার রুক্ষ চুল আলুলায়িত, কাপড় ছিন্ন ভিন্ন, মুখে অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষা। আর একবার টর্চ ফেলিয়া নিপু ইহাকে চিনিতে পারিল। এই মাগীই তো ('মাগী' কথাটাই তাহার মনে হইল) চুপড়ি, কুলো, মোড়া বুনিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। দিনের আলোকে নিপু ইহাকে অনেকবার দেখিয়াছে। তখন তো ইহার বেশ শান্তশিষ্ট সলজ্জ মূর্ত্তি—মুখের আধখানা ঘোমটা দিয়া ঢাকা থাকে, ভদ্রলোক দেখিলে একটু জড়সড়ভাবে দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলে। সেই ব্যক্তির এখন এই মূর্ত্তি এবং প্রতাপ! ······ছোঁড়াটা নিদারুণ চীৎকার করিতেছে। নিপু আর একবার ক্ষীণ-ভাবে চেষ্টা করিল—"আরে এই, কিয়া করতা হায় তুমলোগ ছোড়ো—ছোড়ো—উঠো—"

মহিষ-মর্দ্দিনী তাহার কথায় দৃকপাত পর্য্যন্ত করিল না। কিন্তু বার বার টর্চের আলো ফেলাতে ভীড়ের মধ্য হুই একজন যে বিচলিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ মিলিল। একটা রোগা লম্বা গোছের হাড়ি আগাইয়া আসিয়া আদেশের ভঙ্গীতে বলিল—"কোওন হায় রে—"

নিপু আমতা আমতা করিয়া বলিল—"আরে, শুনো—শুনো—"

"ভা-গো শালা—"

একটা বুড়া আগাইয়া আসিল। তাহারও পা টলিতেছিল কিন্তু সে একেবারে সম্বিৎ হারায় নাই। নিপুকে সে চিনিতে পারিল। "আরে শালা চুপ র—ওস্তাদ আইলো হে। সেলাম ওস্তাদ—"

তৃতীয় আর এক ব্যক্তি ইহার প্রত্যুত্তরে খুব একটা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিয়া বলিল—"গোলি মারো ওস্তাদকো—"

চতুর্থ একজন জড়িতকণ্ঠে মন্তব্য করিল—"ওস্তাদ ফুল-পরিয়াকো পিছো যে পড়লো হে—"

ইহাতে পঞ্চম একজন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মোটা কালো হাড়িনীটা ছোঁড়াটাকে সমানে মারিয়া চলিয়াছে। কাহারও সেদিকে বিশেষ ভ্রুক্ষেপ নাই, যেন অতিশয় স্বাভাবিক এবং সঙ্গত একটা ব্যাপার ঘটিতেছে, বিচলিত হইবার কিছু নাই। কেবল সেই বুড়াটা একবার মাত্র বলিল—"হে গে আর ছোড়ি দে, ঢের ভেলো—"

নিপু নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতেছিল এখন কি করা যায়। বাইক করিয়া অবিলম্বে থানায় খবর দেওয়া উচিত, না শঙ্করের কাছে যাওয়া উচিত। এমন ভাবে চলিলে তো—

অপ্রত্যাশিতভাবে কিন্তু সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। নটবর ডাক্তার সহসা অকস্মাৎ ঘটনাস্থলে আসিয়া হাজির হইয়া গেলেন এবং ঘোড়ার লাগাম টানিয়া প্রশ্ন করিলেন—"এত্না হাল্লা কাহে রে—"

মন্ত্রবলে সমস্ত যেন ঠিক হইয়া গেল। যে যেখানে ছিল সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নটবর ডাক্তারকে সেলাম করিল। মোটা হাড়িনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিজের প্রায়-উলঙ্গ কলেবরকে লুকাইবার জন্য কুঁড়ে ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল। ছোঁড়াটা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছোঁড়া অপর কেহ নয়, উহারই তৃতীয় পক্ষের স্বামী, ন্যায়সঙ্গতভাবেই মার খাইতেছিল। ডাক্তারবাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়াটাকে বেড়ার খুঁটায় বাঁধিলেন এবং সহাস্যমুখে উহাদের মধ্যে গিয়া হাজির হইলেন।

"তাড়ি তাড়ি, খালি তাড়ি! শালা লোগ তাড়ি পিতে পিতেই জাহান্নম মে যাগা। দেখেঁ কেইসে তাড়ি লে আও—" ইতিমধ্যে একজন ঘরের ভিতর হইতে একটি মোড়া বাহির করিয়া আনিয়াছিল। নটবর ডাক্তার তাহার উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। সসম্ভ্রমে একজন মাটির খুরিতে ভরিয়া তাড়ি আগাইয়া দিল, ডাক্তারবাবু একবার শুঁকিয়া দেখিলেন, তাহার পর এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন।

"ছি ছি ছি ছি বেস্তা বদ্দি মাল পিতে হো শালে লোগ। যাও পাঁচ বোতল আচ্ছা মাল লে আও—"

পকেট হইতে পাঁচটা টাকা ঝনাৎ করিয়া বাহির করিয়া দিলেন। টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া একজন বলিল—"বাঙালি কি আদি ভূলেগো হোতে—"

"যা কবকে বোলো ডাকটারবাবু মাংতে হেঁ—"

একজন টিপ্পনি কাটিল—"ওকর বাপ দেতেই—"

যাহার বাড়িতে ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন সে ব্যক্তি ঔষধের বাক্স মাথায় লইয়া পিছু পিছু আসিতেছিল—সে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাকে নটবর ডাক্তার আদেশ করিলেন "তুম আগু বঢ়ো হাম আতে হেঁ—"

লোকটি তাড়ির আড্ডায় ডাক্তারবাবুকে সমাসীন দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে সাহস করিল না। এমনিতে ডাক্তারবাবু কোন না কোন সময়ে গিয়া ঠিক পৌঁছিবেন, কিন্তু প্রতিবাদ করিলে বাঁকিয়া বসিতে পারেন এবং একবার বাঁকিয়া বসিলে নটবর ডাক্তারকে সিধা করা শক্ত। কিছু না বলিয়া সে ব্যক্তি নীরবে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ নিপুকে লক্ষ্য করেন নাই। নিপুর সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয়ও ছিল না, মুখ চিনিতেন, কিন্তু স্বল্পালোকে তাহাও চিনিতে পারিলেন না।

"কোন হায়—"

"আমি—"

নিপু আগাইয়া আসিল।

"ও, মাষ্টার মশাই! কি বিপদ! আসুন আসুন। আর একঠো মোড়া লে আও। আসুন। চলবে না কি এক আধ পাত্তর—"

"আজ্ঞে না, আমি ওসব 'টাচ্' করি না।"

"'টাচ্' করেন না? ও! আপনিই না untouchability দূর করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছেন? বসতে তো দোষ নেই, বসুন না"

আর একটা মোড়া আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু নিপু বসিল না। হাড়িদের তাড়ির আড্ডায় বসিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না! নটবরের উপর তাহার রাগও হইল। কোথায় ইহাদের সুরাপান হইতে নিবৃত্ত করিবে, না আরও পাঁচ বোতল আনিতে দিল। শঙ্করকে বলিয়া ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে।

"বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে—"

"আমার একটু কাজ আছে, চললাম—এখন আর বসব না—"

বাসায় আসিয়া বাইক করিয়া সে শঙ্করের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। শঙ্কর কিন্তু তখন দ্বিতলে বসিয়া কবিতার ছন্দ মিলাইতেছিল। চাকরের মুখে নিপুদা'র আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া পুলকিত হইল না।

"বল গিয়ে, বাবু শুয়ে পড়েছেন, এখন দেখা হবে না—"

নিপু চাকরের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দ্বিতলের আলোকিত বাতায়নটার দিকে একবার চাহিয়া আবার বাইকে সওয়ার হইল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল এত রাত্রে ছয় মাইল রাস্তা বাইক করিয়া আসিলাম, শঙ্কর তাহার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিল না। এ কিছু নয়, টাকার গরম! ক্যাপিটালিষ্ট মনোবৃত্তির লক্ষণ। উৎপল আসিলে তাহাকে শঙ্কর এমনভাবে ফিরাইয়া দিতে পারিত কি?

নির্জ্জন মাঠের ভিতর দিয়া নিপু বাইক করিয়া চলিয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, কি একটা অজানা ফুলের গন্ধে বাতাস আমোদিত। নিপুর মনে কিন্তু এতটুকু আনন্দ নাই। মাতাল

হাড়িগুলা পর্য্যন্ত তাহাকে উপহাস করিল, অথচ তাহাদের মঙ্গলের জন্য সে কি না করিতেছে! নটবর ডাক্তারটারও স্পর্দ্ধা কম নয়, তাহাকে ওইখানে বসিয়া তাড়ি খাইতে অনুরোধ করিতেছিল! ছোটলোকগুলাকে মদ ঘুষ দিয়া তাহাদের দলপতি সাজিয়াছে! স্কাউণ্ড্রেল! আবার তাহার মনে হইল ক্যাপিটালিজম্—ক্যাপিটালিজমের এই আর এক রূপ—ইহাকে ধ্বংস করিতে না পারিলে দেশের উন্নতি নাই।

১১

ছট্ পরব লাগিয়াছে।

দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ রঙীণ কাপড় পরিয়া নদীতীরে চলিয়াছে। হলুদ এবং গোলাপী রঙের প্রাধান্যই বেশী। গরীব লোকেরা সাধারণ কাপড়ই রঙাইয়া লইয়াছে। যাহাদের অবস্থা একটু ভালো তাহাদের কেহ কেহ রেশম পরিয়াছে। বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক—শাড়ি এবং ওড়নারই আধিক্য। যাহার যেটুকু জুটিয়াছে তাহাতেই সে বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন হইয়া বাহির হইয়াছে। সকলেরই মুখে একটা শান্ত সৌম্য নিষ্ঠার ভাব। যাহারা 'ছট্' করে তাহারা সকলেই উপবাসী থাকে, প্রিয়জনের কল্যাণ-কামনায় ভগবানের নিকট মানত করিয়া আন্তরিক নিষ্ঠাভরেই সেই মানত শোধ করিতে যায়।

ছট্ পরবের নিয়ম অনেক। কালীপূজার পর হইতে ছয় দিন নিয়ম করিয়া থাকিতে হয়। কালীঠাকুরের ভাসানের পর পুরাতন হাঁড়ি ফেলিয়া দিয়া নূতন হাঁড়িতে পাক করিয়া প্রথম তিনদিন খুব শুদ্ধাচারে নিরামিষ আহারাদি করা নিয়ম—কোন দিন কদ্-ভাত, কোনদিন মটর ডাল ভাত। চতুর্থ দিনে 'খর্ণা'—অর্থাৎ সেই দিনই আসল পূজার আরম্ভ। উঠানেই পূজা হয়। কাঁচা মাটির সরায় ও হাঁড়িতে পূজার উপকরণ সজ্জিত করাই বিধি—পোড়া মাটির বাসন চলে না। কাঁচা মাটির বাসনগুলিকে সিন্দুর দিয়া অলঙ্কৃত করিয়া তাহাতে ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি প্রভৃতি রাখা থাকে। একটি বাসনে কাঁচা দুধে পাঁচ রকম ফলের রস দিয়া পঞ্চামৃত তৈয়ারি হয়, আর একটি পাত্রে দুধে আলোচাল সিদ্ধ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই 'আরোয়াইন্' প্রস্তুত করা থাকে। যে ছট করিবে সে পূজা করিয়া এক-নিশ্বাসে যতটা পারে ততটা দুধ পান করিয়া লয়। দুধ পান করিবার সময় যদি কেহ 'টোকে' অর্থাৎ নাম ধরিয়া ডাকিয়া ফেলে কিম্বা যদি কোন রকম শব্দ হইয়া বা গোলমাল হইয়া বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহা হইলে আর খাওয়া হয় না। ছটের প্রথম দিন হইতেই 'সুপে' অর্থাৎ কুলাতে নানারূপ ফল সাজাইতে হয়, যাহার যেমন সামর্থ্য সে সেইরূপ করে। বড়লোকেরা দেয় আঙুর, আপেল, কিসমিস—গরীবেরা দেয় পেয়ারা খেজুর আতা নারিকেল। ইহা ছাড়া সকলকেই দিতে হয় 'খাবুনি'—আটা এবং ঘি দিয়া প্রস্তুত পিষ্টকজাতীয় একরূপ খাবার। চতুর্থ দিন সকালে এক নিশ্বাসে দুগ্ধ-পান, রাত্রে 'আরোয়াইন'। পঞ্চম দিন উপবাস। ডালায় 'সুপ' সাজাইয়া সেটি মাথায় লইয়া একবার সকালে একবার বিকালে নদীতীরে যাইতে হয়—আকাশের দিকে হাত তুলিয়া সূর্য্যপূজা করিতে হয়। পঞ্চম দিন অহোরাত্র নিরম্বু উপবাসের পর ষষ্ঠ দিনে নদীতীরে গিয়া সূর্য্যপূজা করিয়া তবে উপবাস-ভঙ্গ করিতে হয়। ছট্ পরবে এদেশের জনসাধারণের গভীর বিশ্বাস—সকলেই জানে নিষ্ঠাভরে করিলে নিশ্চয়ই দেবতা মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। উপবাস ছাড়াও কেহ কেহ আবার কঠোরতর মানত করে। নিজের বাড়ি হইতে নদীর তীর পর্য্যন্ত হয় তো সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে যায়—এই কৃচ্ছ্রসাধনই তাহার মানত। কেহ হয় তো ভিক্ষা করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে, এই দীনতা স্বীকারই তাহার মানতের অঙ্গ। একবার মানত করিয়া ফেলিলে তাহা শোধ করিতেই হয়—মানত করিয়া যদি কেহ অসুস্থতা-বশতঃ তাহা পালন করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার হইয়া অপর কাহাকেও তাহা করিয়া দিতে হয়। করিয়া দিবার লোকাভাবও হয় না। ছট বড় জাগ্রত দেবতা, কোন অনিয়ম সহ্য করেন না। সাইয়ের স্বামীটা যে পাগল হইয়া গিয়াছে, সুলাইয়ের মাথায় সর্ব্বাঙ্গে যে ধবল হইয়াছে—সকলের বিশ্বাস ছট পূজায় অনিয়ম করাই না কি সে সবের আসল কারণ। একজন না কি উপবাসের সময় লুকাইয়া খাইয়াছিল, আর একজনের না কি 'সুপে' পা ঠেকিয়া গিয়াছিল, সেই পদস্পৃষ্ট 'সুপ' লইয়াই সে না কি দেবতার পূজা চড়াইয়াছিল তাই এই শাস্তি।

ডালা মাথায় লইয়া দলে দলে নরনারী চলিয়াছে। যে একটু অবস্থাপন্ন সে সঙ্গে বাজনাও লইয়াছে। বাজনা অবশ্য বিশেষ কিছু নয়—একটা ঢোল, একটা কাঁসি এবং একটা সানাই। কিন্তু উহাতেই উৎসব জমিয়া উঠিয়াছে।

শঙ্কর বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুইয়া শুইয়া এই জনস্রোত দেখিতেছিল এবং ভাবিতেছিল আমরা এতদিন ইহাদের ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি, ইহাদের পূজা পার্ব্বণকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিয়াছি! কিন্তু এই যে দলে দলে নরনারী উপবাস করিয়া প্রিয়জনের কল্যাণ-কামনায় দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইতে চলিয়াছে তাহা কি সত্যই উপহাস করিবার মতো জিনিস? নববৎসরে ছাপানো-হরফে ডাকযোগে 'শুভকামনা' জানানো অপেক্ষা কি ইহা বেশী হাস্যকর? ইহাদের মতো আন্তরিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাস কি আমাদের আছে? আছে বই কি! আমরা ইংরেজি-অক্ষরে লেখা অথবা বিদেশী-মুখ-নিঃসৃত যে কোন অসম্ভব কথা নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করি। নাসা কুঞ্চিত করি কেবল দেশী জিনিসের বেলায়। কেরোর বুক অব নাম্বার্স আমরা অবিচলিত শ্রদ্ধার সহিত পড়ি, আমাদের যত অবিশ্বাস দেশী গণক ঠাকুরকে। ফ্রি-মেসনের আংটি পরিতে আমাদের আপত্তি নাই, মাদুলি পরিতেই যত আপত্তি। উপবীত-গুচ্ছ গলায় ঝুলাইয়া রাখা অযৌক্তিক মনে করি, টাই ঝুলাইবার বেলায় কিন্তু যুক্তির কথা মনে পড়ে না, বারবার মনে হয় নটটা ঠিক মতো হইয়াছে কি না, রংটা ঠিক ম্যাচ করিয়াছে কি না। রাশিয়ার সাম্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্র লইয়া আমরা উন্মত্ত, কিন্তু হিন্দু সভ্যতার যে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের নীতি আছে তাহা প্রণিধান করিবার মতো ধৈর্য্য আমাদের নাই। উদ্দীপ্ত হইলেই শঙ্করের চা পান করিবার বাসনা হয়। চেয়ারে শুইয়াই হাঁকিল—'অমিয়া'

অমিয়া একটু দিবা-নিদ্রা উপভোগ করিবে বলিয়া শুইয়াছিল;—সবে বেচারীর তন্দ্রাটি আসিয়াছিল, উঠিয়া আসিতে হইল।

'কি—'

একটু চা কর না—

অমিতা চলিয়া গেল।

সহসা শঙ্করের চোখে পড়িল ডালা মাথায় করিয়া মুনিয়া যাইতেছে। তাহার পিছু পিছু ভাল মানুষের মতো মুংলাটও চলিয়াছে। মুনিয়ার মাতৃমূর্তি। মুংলাট যেন দুষ্ট অবাধ্য ছেলে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া ভালমানুষ সাজিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। মুংলাট একবার আড়চোখে শঙ্করের দিকে চাহিয়া চলিল।

শঙ্করের সমস্ত মন মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে মুগ্ধনেত্রে বসিয়া দুই পশুর শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

অমিতা চা করিয়া আনিল।

এইবার খাতা-কলম চাই নাকি?

চাই।

অমিতা গজগজ করিয়া বলিল—খালি ফরমাসের ওপর ফরমাস! ভাবলুম একটু ঘুমুব—

খুকী ঘুমিয়েছে?

তাকে মঙ্গলা হাটের মেলা দেখাতে নিয়ে গেছে—

অমিতা খাতা ও ফাউন্টেন পেন দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। শঙ্কর আবার ডাকিল।

সিগারেট দেশলাই?

বাবা, বাবা—

শঙ্কর যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, অমিতাকে ফরমাসে ফরমাসে অস্থির করিয়া তোলে। অনেক সভ্য স্বামী স্ত্রীর সহিত লৌকিকতা করেন, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহাদের নানারূপ 'কনসিডারেশন' আছে। শঙ্করের সে সব কিছুই নাই। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত সে যেমন লৌকিকতা করে না, স্ত্রীর সহিতও করে না; অমিতাকে সে সত্যই অর্দ্ধাঙ্গিনী মনে করে। অমিতাকে ঘিরিয়া কোন রকম রোমান্স তাহার মনে জাগে নাই, অমিতার সহিত কোনরকম ভদ্রামি করাও সে প্রয়োজন মনে করে না, এমন কি অমিতার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সে সর্বক্ষণ সজাগভাবে সচেতন নয়, কিন্তু অমিতা না হইলে তাহার জীবনযাত্রা অচল। অতিশয় অপ্রত্যক্ষভাবে নিশ্বাসবায়ুর মতো অমিতা সঙ্গোপনে তাহার জীবনের সহিত কখন যে মিশিয়া গিয়াছে তাহা সে জানে না।

সিগারেট দেশলাই দিয়া অমিতা বলিল—এবার যাই?

যাও

চা শেষ করিয়া শঙ্কর সিগারেট ধরাইল এবং প্রবন্ধ লিখিতে সুরু করিল। পল্লী উন্নয়নের আবর্ত্তে পড়িয়াও তাহার অন্তরবাসী কবি বিপর্য্যস্ত হয় নাই। সে সদা জাগ্রত, সদা উৎকর্ণ—কেবল দেখিতেছে, শুনিতেছে এবং মনে সুর লাগিলেই গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে। কোন ওজুহাতেই তাহাকে থামানো যায় না। শঙ্কর তন্ময় হইয়া লিখিতে লাগিল, যদিও তাহার এখন স্যানিটেশন-বিভাগ পরিদর্শন করিতে যাওয়া উচিত ছিল।

১২

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মেঠো পথ বাহিয়া শঙ্কর একা ফিরিতেছিল। গ্রামের বাহিরে কৃষকদের চাষের নিমিত্ত গত বৎসর যে ইঁদারাটি প্রস্তুত করানো হইয়াছিল সেটি ধসিয়া পড়িয়াছে—তাহাই পরিদর্শন করিতে শঙ্কর গিয়াছিল। পরিদর্শন করিয়া চিত্ত আনন্দিত হয় নাই, অনিবার্য্যভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সে বাধ্য হইয়াছিল তাহা আনন্দজনক নহে। জীবন চক্রবর্ত্তী পুরা টাকা লইয়া কাজে ফাঁকি দিয়াছে। সেই এ অঞ্চলের সমস্ত ইঁদারার কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিল। যে পরিমাণ চূণ সুরকি প্রভৃতি দিলে পাকা ইঁদারা সত্যই পাকা হয় সে পরিমাণ চূণ সুরকি দেওয়া হয় নাই, ইহাই সকলে বলিল। এ অঞ্চলের সব ইঁদারাই ভাঙিয়া পড়িতেছে। জীবন গ্রামেরই ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারি, তাহার ন্যায্য মজুরি তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তবু সে অন্যায়ভাবে চুরি করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। উৎপল বলিয়াছিল কোন সাহেব কম্পানিকে কণ্ট্রাক্ট দিতে, কিন্তু শঙ্করের কোন কথার উপর সে কথা কহিবে না প্রতিশ্রুত ছিল—তাই শঙ্কর যখন তাহাতে সায় দিল না সে চুপ করিয়া গেল। শঙ্কর ভাবিয়াছিল কি হইবে বিদেশী লোক ডাকিয়া, এই সামান্য কাজ কি আর দেশের লোকেরা করিতে পারিবে না। বিশেষত কেনারাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র জীবন যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সোৎসাহে ইঁদারাগুলির ভার লইল তখন শঙ্করের আর কোন সংশয় রহিল না। এখনও কোন সংশয় নাই, কেবল তাহার মনের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। নিতান্ত আপনজন যদি নিঃসংশয়ে চোর প্রতিপন্ন হয় তখন যেমন জ্বালা করে তেমনি জ্বালা করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল এমন কেন হয়। কোন সাহেবের আপিসে চাকরি করিতে পাইলে এই জীবন উপর-ওলার চাবুকের ভয়ে অতিশয় সততার সহিত কাজ করিত, চুরি করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু চাবুক-ভয়-মুক্ত জীবন কিছুতেই স্বাধীনভাবে স্বকর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে করিবে না! তাহার শিক্ষা দীক্ষা ভদ্রতা কোন কিছুরই উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার উপায় নাই, করিলেই ঠকিতে হইবে। চাবুক না মারিলে কাজ করিবে না, দেশের কাজের প্রতি নিষ্ঠার জন্য তো করিবেই না, মজুরি পাইলেও করিবে না। অথচ বাহিরে কি অপরূপ ছদ্মবেশ! বি-এ পাশ করিয়াছে, দেশের সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে—রাজনীতির কথায় মুখে খই ফোটে, বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রগতি ও পরিণাম বিষয়ে বিজ্ঞের মতন বচন বিস্তার করে, লেনিন-ষ্ট্যালিন-গান্ধি সকলের চরিত্র নখদর্পণে, দেশের বেকার সমস্যা লইয়া ক্ষোভের অন্ত নাই—অথচ নিজে চোর। এই ছোকরাই সেদিন সামান্য লাউ চুরির অপরাধে নিজেদের চাকরটাকে পুলিশে দিয়াছে! হঠাৎ শঙ্করের নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলিয়া মনে হইল। দেশের শিক্ষিত যুবকরাই তো দেশের আশা-ভরসা, তাহাদের উপর যদি আস্থা স্থাপন করিতে না পারা যায় তাহা হইলে উপায় কি! শঙ্কর বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাপারটাকে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কেন এমন হয়? ইহারা শিক্ষিত, ইহাদের সমস্ত শিক্ষা এমনভাবে নিষ্ফল হইয়া গেল কেন? যে শিক্ষার চাকচিক্য ইহাদের রসনাগ্রে ক্ষণে ক্ষণে ঝলমল করিয়া ওঠে তাহার সামান্যতম দীপ্তিও ইহাদের চরিত্রে প্রতিফলিত হয় না কেন? গলদটা কোথায়?

বাবু—

মৃদু নারীকণ্ঠে ডাক শুনিয়া শঙ্কর সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল।

কে?

মুনিয়া।

নামটা শুনিয়া শঙ্কর মনে মনে বিব্রত হইয়া পড়িল।

এই অস্পৃশ্য মেয়েটার সহিত নিপুণার নাম যুক্ত করিয়া যে জনরব উঠিয়াছে তাহা শঙ্করের অবিদিত ছিল না। এ বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে নিপুণাকে কিছু বলিতেও পারে নাই। উচিত হইলেও ইহা লইয়া নীতি-গর্ভ-বক্তৃতা দিবার অধিকারও যে তাহার নাই ইহা সে সসঙ্কোচে অনুভব করিয়াছিল। প্রতিষ্ঠানের হিতার্থে এ বিষয়ে নীরব থাকা উচিত নয় তাহা সে বুঝিতেছিল, কিন্তু কি করিয়া যে কথাটা পাড়িবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। এখন সহসা নির্জন গ্রামপ্রান্তে সেই মেয়েটার সহিতই মুখোমুখি হওয়াতে সে ভয় পাইয়া গেল। নিপুণার নামে নালিশ করিতে আসিয়াছে না কি। তাহা হইলে তো অতিশয় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

কি চাই ?

ফুলপরিয়া কিছু বলিল না, নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্করের মনে হইল কাঁদিতেছে।

কি চাই ? শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল।

ফুলপরিয়া মৃদুকণ্ঠে যাহা বলিল তাহাতে শঙ্কর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নিপুণার সম্বন্ধে কিছু নয়, স্বামীর অসুখের কথা বলিতে আসিয়াছে। তাহার স্বামী নাকি বহুদিন হইতে অসুস্থ, এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারবাবু তিন মাস ধরিয়া 'দাবাই পানি' করিয়াছেন, কিছুই হয় নাই। সেদিন নট্টু বাবু আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে চরণবাবুকেও একবার ডাকিয়া দেখানো উচিত, কারণ একা তিনি এ রোগ সামলাইতে পারিবেন না। নট্টুবাবু গরীবের 'মাই বাপ'—তাঁহাকে বিনা ফিসে ডাকা যায় কিন্তু চরণবাবুকে ডাকিতে তাহাদের সঙ্কোচ হইতেছে। এ গ্রামে আসিলে সাধারণত তিনি আটটাকা ফিস নেন, কিন্তু আট টাকা দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত, বাবু যদি একটা চিঠি লিখিয়া দেন তাহা হইলে হয়তো তিনি কমে আসিতে রাজি হইতে পারেন। রূপার চুড়ি বন্ধক দিয়া সে গোটা চারেক টাকা কোনক্রমে যোগাড় করিয়াছে।

সহসা ফুলপরিয়া বসিয়া পড়িল এবং শঙ্করের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"দয়া করো বাবু—"

হয়েছে কি তোর স্বামীর ?

ঘা

ঘা ?

ফুলপরিয়া যে নিপুণার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া তাহাকে বিপন্ন করে নাই ইহাতেই শঙ্কর মেয়েটার প্রতি মনে মনে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উৎসাহ যেন বাড়িয়া গেল।

চল দেখে আসি কি হয়েছে—

ফুলপরিয়ার সঙ্গে যাইতে যাইতে একটা কথা সহসা শঙ্করের মনে পড়িল। ফুলপরিয়ার আবার স্বামী কি ! সে তো পতিতা। পতিতারও একটা লোক-দেখানো স্বামী থাকা অসম্ভব নয় মনকে এই বলিয়া সে প্রবোধ দিল। কিছুক্ষণ হাঁটিয়া একটি মাটির ছোট ঝুঁড়ে ঘরে উপস্থিত হইয়া সে যাহা দেখিল তাহা অপ্রত্যাশিত। ঘরের কোণে খাটিয়ায় হরিয়া শুইয়া আছে। হরিয়া জাতিতে কুর্মি, সামাজিকভাবে সে ফুলপরিয়ার স্বামী হইতে পারে না। হরিয়া এককালে তাহাদের ভৃত্য ছিল। শুধু তাহাদের নয় অনেকের বাড়িতেই সে চাকরি করিয়াছে, কিন্তু কোথাও টিকিয়া থাকে নাই। কোথাও টিকিয়া থাকা তাহার স্বভাব নয়। কিছুদিন আসামে পলাইয়া চা-বাগানে কুলি-গিরি করিয়াছিল, একটা পাটের কলেও না কি কিছুদিন মজুর খাটিয়াছে। এই পর্যন্ত ইতিহাস শঙ্কর জানিত, তাহার পর কিছুদিন তাহার কোন পাত্তাই ছিল না। কবে সে ফিরিয়াছে এবং কিরূপে সে ফুলপরিয়ার স্বামী হইয়া পড়িয়াছে তাহা শঙ্কর জানিতে পারে নাই। হঠাৎ এতদিন পরে তাহাকে ফুলপরিয়ার ঘরে রোগ-শয্যায় শয়ান দেখিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। সর্বাঙ্গে বড় বড় ঘা, নাকটা বসিয়া গিয়াছে, বীভৎস চেহারা ! দেখিয়া মনে হয় কুষ্ঠ হইয়াছে।

হরিয়া উত্থানশক্তি-রহিত। শুইয়া শুইয়াই হাত তুলিয়া প্রাক্তন মনিব শঙ্করকে সেলাম করিল। সে-ই ফুলপরিয়াকে শঙ্করের কাছে পাঠাইয়াছিল।

তোর স্বামী ?

ফুলপরিয়া নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর ইতিপূর্বে মেয়েটাকে ভাল করিয়া দেখে নাই।

কেরোসিনের স্বল্পালোকে আজ প্রথম ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। রূপসী নয়, রং কালো। বয়সও খুব কম নয়, ত্রিশের উপর হইবে। স্বাস্থ্য কিন্তু নিটোল এবং অটুট। চোখের দৃষ্টিতে পুষ্ট অধরে গর্বিত গ্রীবাভঙ্গিমায় আকর্ষণী শক্তি আছে।

শঙ্কর পুনরায় হরিয়াকে প্রশ্ন করিল—তুই একে বিয়ে করেছিস না কি।

ফুলপরিয়া ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

খোনা স্বরে হিন্দিভাষায় হরিয়া বলিল—না বাবু, ওকে আমি 'সাদি' করি নাই। কিন্তু ওই আমার সব। আমার স্ত্রী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, ভাইরা আমাকে দেখে না, আত্মীয় স্বজন সকলেই আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে—ওই কেবল আমাকে ছাড়ে নাই। আমি পাজি, বদমাস, লুচ্চা—ও সব জানে, তবু আমাকে ছাড়ে না। আমি রোজ উহাকে কত বলি তুই কেন এ মুর্দার কাছে পড়িয়া আছিস, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি মরিয়া পচিয়া শেষ হইয়া যাই, তুইও আমার সঙ্গে কষ্ট ভোগ করিস কেন—রাস্তায় ফেলিয়া দিতে না পারিস হাসপাতালে দিয়া আয়—ও কিন্তু কিছুতে আমার কথা শোনে না বাবু, নিজের জেবর গাড়ি বেচিয়া ডাক্তার ডাকিতেছে, রোজ নিজের হাতে আমার এই পচা ঘা সাফ করে—"

হরিয়ার চোখের কোণ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ফুলপরিয়া হঠাৎ ধমকাইয়া উঠিল—চুপ্ চুপ্—ঢের হেলো—

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল এবং দেখিতেছিল। দেখিতেছিল বিছানার চাদর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ব্যাণ্ডেজের ন্যাকড়াগুলি ধপধপ করিতেছে, এই ঝুঁড়ে ঘরেও হরিয়া রাজার হালে রহিয়াছে।

হরিয়া আবার সুরু করিতেছিল—বাবু—

শঙ্কর বলিল, "আচ্ছা আমি যতদূর পারি ব্যবস্থা করব। চরণবাবুকে খবর দেব কালই।—এখন চললাম। ভাল হয়ে যাবি, ভয় কি—"

হরিয়া দুর্বল কম্পিত হস্ত তুলিয়া পুনরায় সেলাম করিল।

শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে ফুলপরিয়াও বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল—"একে হাসপাতালে দিতে এত আপত্তি কেন ?

"ওটা অন্ধ। সবাই নেই দেইছে—"

শঙ্করের কৌতূহল হইল। সর্বাঙ্গে-ঘা অসমর্থ দরিদ্র হরিয়াকে এমন ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার নিগূঢ় মনস্তত্ত্বটা কি ! প্রেম ? তাহার মন পরীক্ষা করিবার জন্য শঙ্কর বলিল, "ও যখন তোর স্বামী নয় তখন শুধু শুধু ওর জন্যে খরচ করে' মরছিস কেন ? হাসপাতালেই দে—"

ফুলশরিয়া মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। তাহার পর নিজস্ব হিন্দিতে বলিল—"ও যদি সুস্থ হইত উহাকে অনায়াসেই ত্যাগ করিতে পারিতাম। এখন কিন্তু পারি না। আমিই উহাকে এই রোগ দিয়াছি। রোগের জন্যই ওর এই দশা, আমি সময় মতো 'অকৃপন্' লইয়া ভাল হইয়া গিয়াছি, ও প্রথমে রোগটাকে গ্রাহ্যই করে নাই, নানারকম দেশী 'জড়িবুটি' করিয়াছিল, এখন একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। এই রোগের জন্যই ওর আত্মীয়-স্বজন উহাকে ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু আমি কি করিয়া ত্যাগ করি। আমার জন্যই যে ওর রোগ"

তাহার পর আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিল—"উপরে মালিক আছেন, তিনি সব দেখিতেছেন, আমি বেইমানি করিতে পারিব না, আমি 'জান' 'জি' দিয়া উহাকে ভাল করিয়া তুলিব।"

"আচ্ছা, কাল চরণ ডাক্তারকে খবর পাঠাব তাহলে—"

শঙ্কর চলিয়া গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিপু আসিয়া হাজির হইল।

"হরিয়া আজ কেইসা হায়"

"আচ্ছা"

ফুলশরিয়ার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া নিপু বলিল—"উসকা দবাইকা বাস্তে লাইকা মারফং রুপিয়া ভেজা থা, মিলা ?"

কোন উত্তর না দিয়া ফুলশরিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং দুইখানি দশ টাকার নোট আনিয়া নিপুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল "যাইয়ে"

"ইসকা মানে !"

দপাৎ করিয়া ঝাঁপটা ফেলিয়া দিয়া ফুলশরিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল।

নিপু বেকুবের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

নীচের লাইব্রেরি ঘরে একটি মৃদু আলো জ্বালিয়া উৎপল তন্ময় হইয়া ইংরেজি ভাষায় লিখিত চীন দেশের রূপ-কথা পড়িতেছিল।

শঙ্কর হনহন করিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

"শিক্ষা মানে কি বলতে পার ? আসল শিক্ষা কাকে বল তুমি ? এ কি করছি আমরা !"

"তার মানে !"

বিস্মিত উৎপল সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

আনুপূর্বিক সমস্ত বর্ণনা করিয়া শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল, "এখন বল কে শিক্ষিত ? জীবন চক্রবর্তী, নিপুদা, না ফুলশরিয়া—"

উৎপলের চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু কোন জবাব সে দিল না, কেবল গম্ভীরভাবে বাম-গুম্ফ-প্রান্ত পাকাইতে লাগিল। কিছুদিন হইতে সে গোঁফ রাখিতে সুরু করিয়াছে।

"উত্তর দিচ্ছ না যে—"

"মনের মতো উত্তর যদি শুনতে চাও, ওপরে চল, কুন্তলা দেবী এসেছেন—"

"এ সময় তিনি হঠাৎ ?

"হরিহরদা এই পাড়ায় এসেছেন কোন একটা কাজে, তাঁরই সঙ্গে এসেছেন"

"আমার সঙ্গে আলাপ নেই যে"

"তার জন্যে আটকাবে না, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি চল। চীনে পরীদের গল্প গিলে গিলে মুখটাও মেরে গেছে আমার সঙ্গে থেকে। মুখটা একটু বদলান যাক চল। তাঁকে জিগ্যেস করলেই তিনি বেশ ঝাঁঝালো গোছের একটা উত্তর দেবেন"

"তোমার উত্তরটা কি শুনি"

"আমি উত্তর দিতে পারব না। তবে যদি আপত্তি না থাকে পরামর্শ দিতে পারি"

"কি পরামর্শ"

"একজন এক্সপার্ট ইনজিনিয়ার দিয়ে তার ইঁদারাগুলো পরীক্ষা করাও, তিনি যদি বলেন যে জীবন সত্যিই জোচ্চুরি করেছে—তাহলে তার নামে কেস ঠুকে দাও। আর তোমার ওই নিপুদা যদি সত্যিই অপরিহার্য্যরকম কাজের লোক হন, তাহলে তাঁকে অপদস্থ করা ঠিক হবে না। তাঁকে বরং কিছু টাকা আর ছুটি দিয়ে কিছুদিনের জন্যে কোলকাতায় পাঠিয়ে দাও, একটু ঝরঝরে হয়ে ফিরে আসুন ভদ্রলোক। হাসছ যে ? এরকম করে' পারে নাকি মানুষ—"

"হাসছি বটে কিন্তু আমি কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ছি"

"হতাশ হবার কি আছে। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী—ধাবিত হওয়াই আমাদের কাজ, থামলে চলবে না। চল ওপরে চল—"

কুন্তলা দেবীর সহিত সহজেই আলাপ হইয়া গেল।

উৎপল পরিচয় করাইয়া দিতেই শঙ্কর বলিল, "অনেক দিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে। কিন্তু সুযোগ হয় নি এতদিন"

কুন্তলা বসিয়া পান সাজিতেছিল, এই কথায় হাসিমুখে শঙ্করের দিকে একবার চোখ তুলিয়া পানই সাজিতে লাগিল, কোন কথা কহিল না। উৎপল পরিচয় করাইয়া দিয়া গম্ভীরভাবে কোনের ক্যাম্প চেয়ারটায় গিয়া বসিল এবং একটি সিগারেট ধরাইল। কি ভাবে আলাপ চালানো যায়—শঙ্কর মনে মনে একটু বিব্রতই বোধ করিতেছিল এমন সময় সুরমা পাশের ঘর হইতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

"আপনি এসে গেছেন দেখছি ঠিক সময়ে, এক্ষুণি আপনার বিষয়েই কথা হচ্ছিল কুন্তলার সঙ্গে। ও আপনার 'কুসংস্কার' লেখাটি পড়ে চটেছে"

কুন্তলা আর একবার হাসি-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া শঙ্করের দিকে চাহিল, তাহার পর সুরমাকে বলিল, "প্রথম পরিচয়ের মুখেই একটা ঝগড়ার সূত্রপাত করিয়ে দিয়ে ভাল করলে না তুমি। উনি

লেখক মানুষ লেখার নিন্দে করলে ওঁর সমস্ত মন সজারুর মতন কণ্টকিত হয়ে উঠবে—"

"শঙ্করবাবু সে রকম পরমুখাপেক্ষী লেখক নন। তুমি সত্যিই যখন চটেছ তখন বলতে বাধা কি—"

"চটি নি। শঙ্করবাবুর মতো প্রতিভাবান লেখককেও গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসতে দেখে দুঃখ হচ্ছিল। কুসংস্কার সম্বন্ধে ওসব কথা ক্রিশ্চান আর ব্রাহ্ম মিশনরিদের মুখে অনেকবার শুনেছি আমরা। ওঁর কাছ থেকে নতুন কথা শুনব আশা করেছিলাম"

উৎপলের চক্ষু দুইটি আরও কৌতুক-দীপ্ত হইয়া উঠিল। সিগারেটে সন্তর্পণে টান দিতে দিতে সে পা দোলাইতে লাগিল।

হঠাৎ এমন কথা কুন্তলার মুখে শুনিবে শঙ্কর আশা করে নাই। 'কুসংস্কার' প্রবন্ধটা সে অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিল, যদিও সেটা সম্প্রতি 'সংস্কারক' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। 'কুসংস্কার' সম্বন্ধে তাহার নিজের মত বদলাইয়াছে। ছট পরবের পর যে প্রবন্ধটি সে লিখিয়াছে তাহাতে তাহার পরিবর্ত্তিত মনোভাবের পরিচয় আছে। কিন্তু এই নতমুখী বধূটির মুখে একথা শুনিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই এ বিষয়ে মেয়েটি কতদূর চিন্তা করিয়াছে তাহা জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না, ঠিক করিল তর্ক করিবে।

সুরমা বলিল—"কিন্তু ওঁর ভাষা আর উপমাগুলো যে চমৎকার সেটা তোমাকে মানতেই হবে—"

"মানছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলছি যে ভাষা আর উপমা চমৎকার বলেই ও প্রবন্ধ আরও ভয়ঙ্কর। যে পড়বে সেই মুগ্ধ চিত্তে ওর প্রতি কথাটি বিশ্বাস করবে"

"করলেই বা ক্ষতি কি"

গম্ভীরভাবে শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

"আপনারা তাহলে তর্ক করুন—আমি ট্যাপারির জেলিটা চড়িয়ে এসেছি দেখি যদি কুন্তলা থাকতে থাকতেই নামাতে পারি। সঙ্গেই দিয়ে দেব তাহলে—শঙ্করবাবু নেবেন না কি একটু—"

"না। ট্যাপারির গন্ধ পছন্দ নয় আমার"

"অমিয়া কিন্তু ভালবাসে। তাকেই পাঠিয়ে দেব"

সুরমা চলিয়া গেল। কুন্তলা নীরবে পানগুলি লবঙ্গ দিয়া মুড়িতে লাগিল। শঙ্করই পুনরায় কথা কহিল।

"আমার প্রবন্ধে আপত্তি আপনার কোনখানটায়"

"সবটাতেই। আপনি যা বলেছেন তা সত্যি নয়, কুসংস্কার আমাদের পঙ্গু করে নি। আপনি মুখস্থ বুলি আউড়েছেন মাত্র"

"আমি যে সব কুসংস্কারের উল্লেখ করেছি আপনি সেগুলো সমর্থন করেন এই কি আমাকে বুঝতে হবে?"

এতক্ষণ কুন্তলা ধীরকণ্ঠে কথা কহিতেছিল, শঙ্করের এই কথায় যেন আহত ফণিনীর মতো তর্জ্জন করিয়া উঠিল।

"দেখুন আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত বর্ব্বর—বিদেশী অনাত্মীয়দের মুখে এসব কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। এখন তলিয়ে বোঝবার সময় এসেছে যে কথাগুলো সত্যি কি না"

"আপনার মতে তাহলে ওগুলো কুসংস্কার নয়?"

"কোনটা কু কোনটা সু তা জানি না। এইটুকু শুধু জানি যে যাদের আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে ঘৃণা করতে শিখেছি, মানুষ হিসেবে তারা আজকালকার সংস্কারমুক্ত স্বার্থপর নাস্তিকগুলোর চেয়ে ঢের বড়। ওরাই দেশের মেরুদণ্ড—"

শঙ্করের ফুলশয্যার কথা মনে পড়িল।

বলিল, "তা বলতে পারেন। কিন্তু আমি যদি বলি কুসংস্কার বর্জ্জিত হলে ওরা আরও বড় হবে"

"যা নমুনা দেখা যাচ্ছে তার থেকে তা'তো মনে হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যাণে আমরা অনেকেই অনেক রকম কুসংস্কার ত্যাগ করতে শিখেছি কিন্তু সত্যিই বড় হয়েছি কি?"

"হইনি স্বীকার করছি। কিন্তু তার অন্য কারণও থাকতে পারে। কতকগুলো যুক্তিহীন কুসংস্কার আঁকড়ে থাকলেই যে আমাদের মহত্ব বাড়বে—"

"হ্যাঁ, বাড়বে—সমাজ জীবনের একটা স্তরে ওর প্রয়োজন আছে। আচ্ছা আগে আমার একটা কথার জবাব দিন। এ যুদ্ধের বাজারে প্রশ্নটা বেখাপ্পা শোনাবে না—মিলিটারি ট্রেনিং আপনি ভাল মনে করেন, না খারাপ মনে করেন"

"নিশ্চয়ই ভাল মনে করি"

"কেন? কতকগুলো লোক ক্যাপ্টেনের হুকুম পাওয়ামাত্র কোন একটা জিনিস লক্ষ্য করে দমাদম গুলি ছুঁড়ছে, 'মার্চ' কথাটা উচ্চারিত হতে না হতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে, কখনও এগুচ্ছে কখনও পেছুচ্ছে, একটা বিশেষ ধরণের পোষাক পরে বিশেষ রকম কায়দায় হাত পা ছুঁড়ে ড্রিল করছে এগুলো কুসংস্কার নয়? যাকে নিরীহ বলে জানে তাকে নির্ব্বিচারে হত্যা করার মধ্যে কি যুক্তি আছে? প্রত্যেক সৈনিক যদি ওপরওলার প্রত্যেক আদেশটি নিজের যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায় তাহলে কি রকম হয় সেটা?"

"মিলিটারি ট্রেনিং মিলিটারি ডিসিপ্লিন শেখায়, ওতে চরিত্র দৃঢ় হয়—এইটেই ওর স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি"

"ওপরওলা অফিসারকে দেখা মাত্র খটাং করে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে স্যালিউট করা তাহলে আপনি কুসংস্কার মনে করেন না! আপনার যত আপত্তি দিশি কুসংস্কারের বেলায়? আমি যদি বলি ওগুলোর উদ্দেশ্যও চরিত্র দৃঢ় করা? একাদশীর দিন উপবাস করা, একটা বিশেষ বারে বেগুন না খাওয়া, পূজো-পার্ব্বণে নিষ্ঠা-নিয়ম অনুসারে চলা—এসবের প্রত্যেকটির মধ্যেই এমন একটি সংযত আত্মসম্বরণের ভাব আছে যা মেনে চলতে পারলে চরিত্র সত্যিই উন্নত হয়?

"তাই যদি হয় তাহলে সেটা স্পষ্ট করে বলা নেই কেন?"

"মিলিটারি স্ট্র্যাটিজিও সব সময়ে স্পষ্ট করে বলা হয় না। মিলিটারি আইন হচ্ছে—you are not to reason why—"

"কিন্তু কুসংস্কারের সঙ্গে যে কতকগুলো জিনিস স্পষ্টভাবেই জড়ানো আছে দেখা যাচ্ছে—যথা ভগবান, পরলোক, পাপপুণ্য—"

"না জড়ালে লোকে মানত না, কোর্ট মার্শালের ভয় না থাকলে সাধারণ সৈনিক যেমন মিলিটারি আইন মানে না। ওগুলো আমাদের অদৃশ্য কোর্ট মার্শাল। সাধারণ মানুষকে সৎপথে রাখবার আর কোন উপায় নেই।"

"আমি কুসংস্কার না মেনেও সৎপথে থাকতে পারি"

"আপনি অসাধারণ মানুষ। আমি সাধারণ লোকের কথা বলছি। সাধারণ লোক যদি অনাচারণের ভাণ করে তাহলে যা কাণ্ড হয় তাতো দেখতেই পাচ্ছেন আজকাল। অঙ্কশাস্ত্রে যার কিছুমাত্র অধিকার নেই সেই অর্বাচীনটা নামতা মুখস্ত করা জ্যামিতি পড়াকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিয়ে উচ্চতরের গণিত-শাস্ত্রের বুলি কপচাচ্ছে—পত্রিকা ছাপাখানার দৌলতে, আর আপনারা তাই দেখে বাহবা বাহবা করছেন"

"আমি অমত করছি না। আমাদের কুসংস্কারগুলো যুক্তিসহ কিনা তাই ওই প্রবন্ধটায় বিচার করবার চেষ্টা করেছিলাম মাত্র। ওটা আমার অনেকদিন আগেকার লেখা। এখন আমারও মত অনেকটা বদলেছে—কিন্তু তবু আমি নির্ব্বিচারে অন্ধ কুসংস্কার মানবার পক্ষপাতী হই নি এখনও—"

"ভাল করে ভেবে দেখতে হবে—"

"দেখি—"

সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিতেই উৎপল বলিয়া উঠিল—"শঙ্কর হেরে গেছে তোমার বন্ধুর কাছে—প্রায় স্বীকার করে ফেলেছে যে কুসংস্কারগুলোর একটা সার্থকতা আছে—"

কুন্তলা হাসিল। সুরমা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি কিন্তু তোমার মতে মত দিয়ে পাঁজি দেখে চলতে পারবনা। আমার যেদিন খুসী আমি অলাবু ভক্ষণ করব—"

"তা কোরো। ছেলে কতদূর—"

"শোওয়া করতে দিয়েছি"

উৎপল বলিল—"শঙ্করের পরাজয় উপলক্ষে একটু চা পেলে কেমন হয়?"

"এত রাত্রে আবার চা কেন—" সুরমা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল।

উৎপল ক্যাম্প চেয়ারে শুইয়া পড়িল।

"কই চল এবার, রাত হয়ে গেল—"

কুন্তলার স্বামী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া কুন্তলা উঠিয়া দাঁড়াইল। সভা ভঙ্গ হইল। ক্রমশঃ

স্মারক

শ্রীমোহিতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম।

প্রভাত আলোকে সদ্য ধৌত রাজপথ ঝলমল করিতেছে। চলিতে চলিতে অকারণ পুলকে মন ভরিয়া উঠিতেছিল।

"ঈশ্বরের বাড়ী কোথায় বাবা?"

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে সহসা দার্শনিকের আবির্ভাব কেমন করিয়া হইল?

চাহিয়া দেখি এক কঙ্কালসার ভিখারিণী উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিতেছে। ভিখারিণী না হইলে এতদিন তাহার মরা উচিত ছিল। উহার কুৎসিত ঘোলাটে দৃষ্টি একমুহূর্ত্তে যেন প্রভাতের প্রশান্তিকে মলিন করিয়া তুলিল।

মহানগরীর বুকে বাস করিয়া ভিক্ষার নানা কৌশলের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছে। তবুও কৌতুকভরে প্রশ্ন করিলাম, "কে ঈশ্বর? কোথায় থাকে সে?"

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর সজল হইয়া উঠিল—"তাই তো এতদিন ধরে খুঁজছি বাবা। তিনি করুণার অবতার—দয়ার সাগর। সকলের কাছে জানতে চাইছি, কোথায় তিনি—কেমন করে তাঁর দেখা পাবো। তুমি জানো?"

"না জানিনা!"

দ্রুত আগাইয়া গেলাম। পিছন হইতে বুড়ী পাগলের মতো খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল—জানোনা! ছিঃ ছিঃ—আজকাল কেউ ঈশ্বরের কথা জানতে চায় না—ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

সুন্দর সকাল আজ আমার জীবনে বিকৃত হইয়া গেল। মনে হইল একবার গিয়া বলিয়া আসি—ঈশ্বরের খোঁজ কলিকাতা সহরে পাওয়া যায় না, কাশী বৃন্দাবনে চেষ্টা করো। কিন্তু রাগ সামলাইয়া পথ চলিতে লাগিলাম।

• • • বিশ্ববিদ্যালয় আজ অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। পুষ্পের স্তবকে শুভ্র কুন্দমালিকায় উহার বিশাল চত্বর সুমহান্ গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। মন পুনরায় শান্ত হইয়া উঠিতেছিল কিন্তু নিকটে আসিবামাত্র কে যেন আমাকে সবলে বিদ্যুতের তীব্র কশাঘাত করিল। প্রাচীরে প্রাচীরে নানারকম প্রচারপত্রে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকী ঘোষণা! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!!

পথের প্রান্তে ভিখারিণীর রূপ ধরিয়া যে স্মারক লিপি চুপে চুপে আমার জীবনে আসিয়াছিল নিজেই তাহার অসম্মান করিয়া আসিয়াছি। মাত্র বিদ্যার গৌরব লইয়া আজ কোন্ অধিকারে মহাপুরুষের মৃত্যু বার্ষিকীতে তাঁহার আত্মাকে স্মরণ করিব। গলার ভিতর দিয়া কি যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। চিত্রার্পিতের মত পিছনের পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম, যে পথের ধূলায় উদারতা খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে, মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া আসিয়াছি।

শ্রীজয়দেব কবি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা কবি শ্রীজয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্বাপেক্ষা শ্রুতি-মধুর গীতি-কবিতার কবি বলিয়া তিনি সর্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে সম্মানিত হইয়া আছেন। সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিগণের নাম উল্লেখ করিতে হইলে সহজেই তাঁহার নাম আসিয়া পড়ে—অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, ভর্তৃহরি, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব, বিহ্লণ, শ্রীহর্ষ, জয়দেব। বাস্তবিক, নিখিল ভারত ব্যাপিয়া যাঁহাদের যশ বিস্তৃত, সেই শ্রেণীর প্রধান সংস্কৃত কবিদের মধ্যে জয়দেবকে অন্তিম কবি বলিতে হয়। এক মহাকবি কালিদাসের ভারত-ব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের প্রভাব তুলিত হইতে পারে; জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যখানি বরং পরবর্তী কালের ভারতীয় সাহিত্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। জয়দেবের জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় ১২ ও ১৩-র শতকের পরেও সংস্কৃত কাব্য ও শ্লোক রচনার ধারা অব্যাহত ছিল বটে, কিন্তু উত্তর-ভারত তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার পরে এবং ভাষা-সাহিত্যের উদ্ভবের ফলে পরবর্তী শতক-সমূহে সংস্কৃতে কাব্যাদি রচনা রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইল, এবং আর পূর্বের মত জনপ্রিয় থাকিতে পারিল না; এই জন্য এই ধারা কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। মুসলমান যুগে সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি বড় বড় কবি নিজ প্রতিভার প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ইঁহাদের আবির্ভাব ইহাই প্রমাণিত করিয়াছিল যে, মুসলমান যুগে অনেকটা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও হিন্দুর কাব্য-প্রতিভা তাহার অর্ধ-সহস্র বা সহস্র বর্ষ পূর্বেকার কৃতিত্বের প্রতিস্পর্ধী হইতে সমর্থ হইয়াছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীজগন্নাথ পণ্ডিত, শ্রীনীলকণ্ঠ দীক্ষিত প্রভৃতি কবিগণ মুসলমান যুগেও সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব বর্ধন করিয়া গিয়াছেন; ইঁহাদের কাব্য নাটকাদি ও অন্য পুস্তক, প্রাচীন হিন্দু যুগের কবিদের রচনার মতই আদর করিয়া আলোচিত হইবার যোগ্য, ভারতের সংস্কৃতি-পূত চিত্তের বিগত কয়েক শতক ধরিয়া যে বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহা ইঁহাদের রচনাতেই বহুল পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়া আছে। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের ও বিজ্ঞানের সাহিত্যের নদী অবিলুপ্ত গতিতে আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিলেও, খ্রীষ্টীয় ১৩-র শতকের আরম্ভ হইতে, জয়দেব কবির পরে যে সংস্কৃতের প্রাচীন যুগের অবসান ঘটিল এবং নূতন ভাষা-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইল, সে কথা স্বীকার করিতে হয়। জয়দেব হইতেছেন যুগ-সন্ধির কবি, তাঁহার রচনায় প্রাচীনের বিদায় ও নবীনের আগমনী উভয়ই যেন যুগপৎ ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণলীলা—রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা—অবলম্বন করিয়া অতি মনোহর ও শ্রুতি-মধুর কবিতা ও গানের রচয়িতা বলিয়াই, অতি সহজে শ্রীজয়দেব—অন্ততঃ সম্প্রদায়-বিশেষের জনগণের সমক্ষে—দিব্য অনুপ্রাণনা দ্বারা প্রণোদিত রসিক ও কবিরূপে এবং ভক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। রাধা ও কৃষ্ণের ধর্মীয় ও শাশ্বত প্রেমকে মানব আকারে রূপ দান করিয়া নবীন হিন্দু সমাজের সমীপে রসের অনন্য ভাণ্ডাররূপে উপনীত করা হয়। তুর্কী বিজয়ের পরে যখন মুখ্যতঃ সূফী-মতাবলম্বী ফকীর ও প্রচারকদের চেষ্টায় ভারতের জনগণের নিকট ইসলাম ধর্ম অল্পে-অল্পে প্রসার লাভ করিতে থাকে, ভারতের ধর্ম-জীবন ও সংস্কৃতি যখন এইভাবে বিদেশী ধর্মের অভ্যুত্থানে ও প্রসারে বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে দেশের হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া রাখিবার জন্য পুনরুজ্জীবিত ভক্তিবাদকে আবাহন করা হইল; ভারতের সাধক ও ভক্তগণ দেশের মধ্যে ভক্তির ধারার প্রবাহ ফিরাইয়া আনিতে বা তাহাতে নবীনতা দান করিতে চেষ্টা করিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামচন্দ্রলীলা এই ভক্তিমার্গের প্রধান পরিপোষকরূপে দেখা দিল। ধীরে ধীরে জয়দেব কবির 'গীতগোবিন্দ' কাব্যখানি ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদা পাইল, এবং স্বয়ং জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অনুগৃহীত বৈষ্ণব ভক্ত ও মহাপুরুষের সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। আধুনিক ভারতের বৈষ্ণব ভক্তকথার সঙ্গে জয়দেব অচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত হইলেন, বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধকদের মধ্যে তাঁহার সম্মাননীয় আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। জনসাধারণের মধ্যে এইভাবে ভক্তরূপেই তাঁহার নাম সুপরিচিত; যে-সকল ভক্তিপূত ইতিবৃত্ত পাঠে মানুষের মন ভগবদ্‌ভক্তিমুখী হইয়া উন্নীত হয়, জয়দেবের নামের সঙ্গে বিজড়িত কাহিনীগুলি সেই ইতিবৃত্ত-সমূহের অন্তর্গত হইয়া এখন বিদ্যমান। এইরূপ মানুষের ধর্মজীবনে অনুপ্রাণনা আনিবার গৌরব ভারতের অতি অল্পসংখ্যক কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছিল; ব্যাস ও বাল্মীকি এবং কতকটা কালিদাস ভিন্ন আর কোনও কবি এইভাবে সাহিত্যেতিহাসের বস্তু পার্থিব ভূমি হইতে পুরাণ-সুলভ কাহিনী ও ধর্ম-যুগের ধর্মসাধনার গগনপথে উন্নীত হইতে পারেন নাই।

জয়দেব কবির জীবৎকাল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই—তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন, এবং গৌড়-বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের সভার অন্যতম কবি ছিলেন। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় ১৯০৬ সালের Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকায় ১৫৭-১৮৮ পৃষ্ঠায় Sanskrit Literature in Bengal during the Sena Rule নামে তাঁহার মূল্যবান্ প্রবন্ধ-মধ্যে জয়দেবের কথা পূর্ণভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। 'গীতগোবিন্দ' কাব্য পাঠে আমরা জয়দেবের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জানিতে পারি। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতার নাম রামা দেবী (বা বামা দেবী অথবা রাধা দেবী), তাঁহার পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী, এবং পরাশর নামে তাঁহার এক প্রিয় বন্ধু ছিলেন যিনি 'গীতগোবিন্দ'র গান গাহিতেন। জয়দেব তাঁহার সমসাময়িক কয় কবিদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—উমাপতিধর, শরণ, আচার্য গোবর্ধন ও ধোয়ী কবিরাজ। অন্যত্র ইঁহাদের কথা শুনা যায়; ইঁহাদের রচনাও পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজ গ্রাম কেন্দুবিল্বের নাম তিনি গীতগোবিন্দে করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেব নামে একাধিক কবি উদ্ভূত হন, কিন্তু গীতগোবিন্দ-কার জয়দেব ভিন্ন আর কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। জয়দেব নামে এক ছন্দঃ-সূত্র রচয়িতা ছিলেন, ইঁনি আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্ত (খ্রীষ্টাব্দ ১০০০) কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছিলেন, এবং হর্ষট (খৃঃ ৯০০) ইঁহার ছন্দঃ-সূত্রের একটি টীকা প্রণয়ন করেন; সুতরাং ইঁনি আমাদের জয়দেবের কয়েক শতক পূর্বেকার লোক। রামায়ণ-কথা অবলম্বন করিয়া রচিত 'প্রসন্ন-রাঘব' নাটকের রচয়িতা আর এক জয়দেব ছিলেন, ইঁহার পিতার নাম মহাদেব ও মাতার নাম সুমিত্রা, ইঁনি কৌণ্ডিন্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইঁহার গুরুর নাম ছিল হরিমিশ্র। ইঁনি গীতগোবিন্দ-কার জয়দেবের কাছাকাছি সময়ের হইবেন, কারণ ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত কাশ্মীরীয় কবি জহ্লণ কৃত 'সূক্তিমুক্তাবলী' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে 'প্রসন্ন-রাঘব' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; এই জয়দেবের আর কোন পরিচয় নাই, তবে কেহ-কেহ অনুমান করেন ইঁনি বিদর্ভের অর্থাৎ উত্তর-মহারাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন। 'চন্দ্রালোক' নামে অলঙ্কার-গ্রন্থও ইঁহার রচিত। বাঙ্গালা দেশে ইঁহার খ্যাতি তাদৃশ বিস্তৃত হয় নাই। "জয়দেব" বলিলে আমরা 'গীতগোবিন্দ'-কার জয়দেবকেই বুঝিয়া থাকি। আমাদের জয়দেব বাঙ্গালার কবি

ছিলেন, তাঁহার কেন্দুবিল্ব এখন কেঁদুলি নামে তাঁহার পীঠস্থানরূপে পরিচিত। বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরে এই গ্রামে পৌষ-সংক্রান্তির বার্ষিক মেলায় এখনও তাঁহার স্মৃতি রক্ষিত হয়। ষোড়শ শতকে নাভাজীদাসের ব্রজ-ভাষা বা প্রাচীন হিন্দীতে রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে ও সপ্তদশ শতকে প্রিয়াদাসের রচিত ঐ গ্রন্থের টীকাতে, হস্তকার দিনে বিশেষ প্রচারিত, জয়দেব সম্বন্ধে কতকগুলি কাহিনী পাওয়া যায়—বিশেষতঃ জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী সম্বন্ধে কাহিনীটী—এটী বিশেষ লোকপ্রিয় হয়; পদ্মাবতীর পিতার ইচ্ছা ছিল যে নিজ কন্যাকে দেবদাসীরূপে তিনি জগন্নাথ-মন্দিরে সমর্পণ করিয়া আসেন, কিন্তু নারায়ণ-কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পরে জয়দেবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। 'শেক শুভোদয়াম্' সংস্কৃত ভক্তি-মূলক আখ্যায়িকাটী বাঙ্গালা দেশে সুপ্রসিদ্ধ। 'সেকশুভোদয়া'-তে জয়দেব ও পদ্মাবতী সম্পর্কে এই কথা সংরক্ষিত আছে যে—বুদ্ধমিশ্র নামে বাঙ্গালা দেশের বাহির হইতে আগত অনৈক সঙ্গীতজ্ঞ জয়দেবকে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন, বিদেশাগত এই গায়ক কালোয়াতকে জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী পরাজিত করিয়াছিলেন। 'সেকশুভোদয়া'র এই উপাখ্যানের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য থাকা খুবই সম্ভবপর। পদ্মাবতী সঙ্গীত বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিলেন, ইহা এই কথা হইতে অনুমিত হয়, এবং ইহার দ্বারা তাঁহাকে যে দেবদাসী-রূপে মন্দিরে গান গাহিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পিতা সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, এই কাহিনীও যেন কতকটা সমর্থিত হয়; অপর, জয়দেব আপনাকে যে "পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী" বলিয়া গর্বের সঙ্গে উল্লিখিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যেন ইহাও সূচিত হইতেছে পদ্মাবতী নৃত্যকুশলা ছিলেন। এই সকল কাহিনী অনুসারে, এবং 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে একাধিক স্থলে নিজ পত্নীর নাম কবি-কর্তৃক উল্লিখিত হওয়ায়, ইহা বুঝিতে পারা যায় যে জয়দেব-পদ্মাবতীর দাম্পত্য জীবন বিশেষ সুখের ছিল।

জয়দেব মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাস্থ কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে যে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন, তাহার বহু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জয়দেবের সমকালীন পণ্ডিত ও কবি এবং সামন্ত শূলপাণি-বংশীয় বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস ১১২৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১২০৬ খৃষ্টাব্দে 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' নামে একখানি সংস্কৃত শ্লোক-সংগ্রহ সঙ্কলিত করেন, ঐ পুস্তক বাঙ্গালা দেশে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় এবং মুসলমান-পূর্ব যুগের গৌড়-বঙ্গের কবি-মানস নিরীক্ষায় অমূল্য। 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' ১৯৩৩ সালে লাহোর হইতে স্বর্গত পণ্ডিতবর রামাবতার শর্মা ও হরদত্ত শর্মার সম্পাদনায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পাঁচটী প্রবাহে বিভিন্ন ছন্দে রচিত প্রায় ২৩০০ সংস্কৃত শ্লোক আছে। এগুলির মধ্যে ৪০০টী শ্লোকের রচয়িতার নাম অজ্ঞাত বা লুপ্ত, কিন্তু অবশিষ্ট আনুমানিক ১৯০০ শ্লোকের রচক বলিয়া ৪৮৫ জন কবির নাম পাওয়া যাইতেছে। এই ৪৮৫ জন কবির মধ্যে বোধ হয় ২০০র অধিক গৌড়-বঙ্গের কবি হইবেন। যে পাঁচটী 'প্রবাহ' অর্থাৎ অধ্যায়ে এই সংস্কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থ বিভক্ত, সেগুলি যথাক্রমে হইতেছে [১] অমর- বা দেবপ্রবাহ, [২] শৃঙ্গারপ্রবাহ, [৩] চাটুপ্রবাহ, [৪] অপদেশপ্রবাহ ও [৫] উচ্চাবচপ্রবাহ। প্রত্যেক প্রবাহের অন্তর্গত কতকগুলি করিয়া 'বীচি' বা তরঙ্গ অর্থাৎ শ্রেণী আছে, এবং প্রত্যেক বীচি পাঁচটী করিয়া শ্লোকে সম্পূর্ণ। দেবপ্রবাহে আছে এইরূপ ৯৫ বীচি, শৃঙ্গারপ্রবাহে ১৭৯, চাটুপ্রবাহে ৫৪, অপদেশপ্রবাহে ৭২ ও উচ্চাবচপ্রবাহে ৭৪। এই সমস্ত সংস্কৃত কবিতার অনেকগুলিতেই খৃষ্টীয় ১২০০র অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশ তুর্কী কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্বের যুগের বাঙ্গালী কবিচিত্ত প্রতিফলিত হইয়া আছে; ভবিষ্যতের বাঙ্গালা কবিতার ভাবধারা ও তাহার বস্তুর বহুল পরিমাণে এই সকল শ্লোকেই আমরা দেখিতে পাই। সংস্কৃতে নিবদ্ধ এই সকল শ্লোকে মধ্যযুগের এমন কি আধুনিক কালের বাঙ্গালা কবিতার পূর্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা কাব্যেতিহাসের আলোচনায় 'সদুক্তি-কর্ণামৃত'কে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম সংস্কৃতময়ী প্রতিষ্ঠাভূমি স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়।

এখন, সদুক্তি-কর্ণামৃতে 'জয়দেবস্য' বলিয়া ৩১টী শ্লোক বিভিন্ন প্রবাহে ধৃত হইয়াছে; এগুলির মধ্যে ৫টী শ্লোক গীতগোবিন্দে পাওয়া যায়। স্বতঃ-সূত্রকার জয়দেবের কবি-প্রসিদ্ধি নাই; এবং 'প্রসন্ন-রাঘব'-কার জয়দেব হয় তো আমাদের জয়দেবেরই সমকালীন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম-যশ বাঙ্গালা দেশে তখন পঁহুছায় নাই; 'গীতগোবিন্দ'-কার জয়দেব হইতে পৃথক্ আর কোনও জয়দেবের কথা জানিয়া থাকিলে, শ্রীধরদাস অবশ্যই তাঁহার উল্লেখ করিতেন; তাঁহার সমকালীন জীবিত কবি, রাজসভায় যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাঁহার 'গীতগোবিন্দ' হইতে শ্লোক তিনি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সহিত অপর কোনও জয়দেবকে শ্রীধরদাস নিশ্চয়ই বিজড়িত করিয়া ফেলিতেন না। সুতরাং, 'গীতগোবিন্দ' হইতে গৃহীত পাঁচটী শ্লোকের বলে, এবং জয়দেব শ্রীধরদাসের পরিচিত কবি ছিলেন এই কথাও ধরিয়া (শ্রীধরদাসের পিতা বটুদাস লক্ষ্মণসেন দেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এ কথা সদুক্তিকর্ণামৃতের ভূমিকায় তিনি আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন), এই ৩১টী শ্লোকের সব কয়টীরই রচয়িতা গীতগোবিন্দ-কার জয়দেব ছিলেন, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। সদুক্তি-কর্ণামৃতে জয়দেবের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে, উমাপতিধরের রচিত ৯১টী শ্লোক আছে, লক্ষ্মণসেন-পুত্র যুবরাজ কেশবসেন দেবের ১০টী, আচার্য গোবর্ধনের ৬টী, ধোয়ী কবির ২০টী (তন্মধ্যে ২টী 'পবন-দূত' হইতে), শরণের ২০টী, মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের ১১টী, হলায়ুধের ৪টী। এতদ্ভিন্ন আরও বহু কবি যাঁহারা জয়দেবের আশপাশের সময়ের ছিলেন, তাঁহাদেরও রচনা আছে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে শ্রীরূপগোস্বামী 'পদ্যাবলী' নামে যে একখানি বৈষ্ণব-শ্লোক-সংগ্রহ পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে এই সমস্ত কবিদের-লেখা কতকগুলি শ্লোক মিলিতেছে।

জয়দেব-রচিত এই শ্লোকগুলির মধ্যে শৃঙ্গাররস ভিন্ন বীররসের শ্লোকও পাইতেছি, এবং আমাদের চক্ষে বৈষ্ণব-সাধক-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত জয়দেবের রচিত শিবের স্তুতিময় শ্লোকও পাইতেছি। এই শ্লোক-সমূহ হইতে দেখা যায়, জয়দেবের বাণী কেবল বাঁশীর কথাতেই মাতেন নাই, অসির ঝঞ্চনাও তাঁহাকে মাতাইয়াছিল; রণক্ষেত্র, দুন্দুভিধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই সব দেখিয়া মনে হয়, জয়দেব পঞ্চ-দেবতার উপাসক সাধারণ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ছিলেন, পরবর্তী কালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-কর্তৃক তিনি যে একজন বিশিষ্ট সাধক বৈষ্ণব বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, আসলে সম্ভবতঃ তিনি তাহা ছিলেন না। খৃষ্টীয় ১১০০-১২০০-এর দিকে, চৈতন্যোত্তর যুগের আদর্শে গঠিত বৈষ্ণব সমাজ বা ধর্ম ছিল বলিয়া মানিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'র ভূমিকায় দেখাইয়াছিলেন যে, বিদ্যাপতি, 'বৈষ্ণব মহাজন' বলিলে আমরা যে সাম্প্রদায়িক সাধক বুঝি, তাহা মোটেই ছিলেন না, সহজিয়া সাধকও ছিলেন না, তিনি পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং শিবের, উমার ও গঙ্গার উপাসক ছিলেন। 'গীতগোবিন্দ' রচনা করিলেও, জয়দেব সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে।

পরবর্তী সাম্প্রদায়িক মতবাদ জয়দেবের কবিতার ব্যাখ্যাতেও আরোপিত হইয়া স্থলে-স্থলে নানা জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রথম শ্লোকের "নন্দ-নিদেশতঃ" শব্দের ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

> "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং, বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ ;
> নক্তং ; ভীরুরয়ং—ত্বমেব তদিমং, রাধে ! গৃহং প্রাপয় ।"
> —ইত্থং নন্দ-নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
> রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা-কূলে রহঃ-কেলয়ঃ ।

এই সুপরিচিত শ্লোকের সরল অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে নন্দ-গোপের নির্দেশেই তাঁহার অজ্ঞাতসারে মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার রাত্রে পথের কুঞ্জমধ্যে রাধা ও মাধবের মিলন ঘটিয়াছিল। কিন্তু রাণা কুম্ভের সভার আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ, কুম্ভ-রাণার নামে প্রচলিত 'রসিকপ্রিয়া' নামে 'গীতগোবিন্দ'র টীকা প্রণয়নে যাঁহাদের হাত ছিল, তাঁহারা "নন্দ-নিদেশতঃ" শব্দের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং এই ব্যাখ্যা ("নন্দ" অর্থাৎ মিলন-আনন্দের উদ্দেশে, নন্দ-গোপের আদেশে নহে; শ্লোকটীর প্রথম দুই ছত্রের উক্তি এই মতে নন্দ-গোপের নহে, ইহা সখীর উক্তি রাধার প্রতি) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত 'গীত-গোবিন্দ'র ভূমিকা, এবং ১৩৩৯ সালের দোল-সংখ্যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ)। কিন্তু 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' গ্রন্থে দুইটী শ্লোক পাওয়া যাইতেছে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের মতই শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত,—একটী কেশবসেন দেবের রচিত, অন্যটী লক্ষ্মণসেন দেবের;—সে দুইটী হইতে বুঝা যায় যে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের "নন্দ" শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ-গোপকেই ধরিতে হইবে, এবং এই তিনটী শ্লোক—জয়দেবের, কেশবসেন দেবের ও লক্ষ্মণসেন দেবের—এক সঙ্গেই বিচার করিতে হইবে। 'সদুক্তি-কর্ণামৃত'র এই দুইটী শ্লোক শ্রীরূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'-তেও আছে, কিন্তু 'পদ্যাবলী'তে দুইটীই লক্ষ্মণসেন দেবের রচিত বলিয়া ধরা হইয়াছে। শ্লোক দুইটী এই—

(কেশবসেন-রচিত)—

"আহূতাদ্য মহোৎসবে, নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা ;
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ ; কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি ?
বৎস, ত্বং তদিমাং নয়ালয়ম্"—ইতি শ্রুত্বা যশোদা-গিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুর-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥

এখানে দেখা যাইতেছে যে এই শ্লোকটী যে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের প্রতিধ্বনি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে যশোদাও না জানিয়া রাধা ও কৃষ্ণের মিলনে সহায়তা করিতেছেন; ইহাতে যেন "নন্দ-নিদেশতঃ" শব্দের প্রত্যুত্তর বা পাল্টা জবাব "যশোদা-গিরঃ" পাওয়া যাইতেছে। "যশোদা-গিরঃ"-কে "নন্দ-নিদেশতঃ"-র মত অন্য ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস আশা করি কেহ করিবেন না।

(লক্ষ্মণসেন রচিত) —

"কৃষ্ণ, ত্বদ্বনমালয়া সহকৃতং," কেনাপি, "কুঞ্জোদরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম, তদিদং প্রাপ্তং ময়া ; গৃহ্যতাম্।"
—ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে, ত্রপানম্রয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিত-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥

এই শ্লোকে যেন রাজা লক্ষ্মণসেন, স্বকীয় সভাকবি জয়দেব ও রাজকুমার রচিত দুইশ্লোকের সমাধান করিয়া দিতেছেন, কি করিয়া রাধাকৃষ্ণের গোপন মিলনের রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনটী শ্লোকেরই চতুর্থ ছত্রে "রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি" এই অংশ লক্ষণীয়। তিনটী শ্লোকই যেন সমস্যাপূর্তির জন্য রচিত হইয়াছিল, যেন সভার রসিক ও বিদ্বান্ রাজা সমস্যাস্বরূপ শ্লোকাংশ দিলেন,—"রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি," ও পরে সভার কবিদের আহ্বান করিলেন, এই শ্লোকাংশকে চতুর্থ ছত্রের প্রথমে সন্নিবেশিত করিয়া শ্লোক রচনা করিতে হইবে। কিংবা হয় তো জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক পাঠ করিয়া অথবা শুনিয়া প্রীত হইয়া রাজা ও রাজকুমার উভয়েই এই ভাবের কবিতা রচনা করিয়া কবিকে সম্মানিত করিয়া থাকিবেন। মোটের উপর, আমরা শ্রীধরদাসের নিকট কৃতজ্ঞ; তিনি এই শ্লোক দুইটী তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধার করিয়া না দিলে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন ও যুবরাজ কেশবসেনের সঙ্গে জয়দেবের এই সাহিত্যিক সংযোগের কথা জানিতে পারিতাম না; এবং এই দুই শ্লোকের দ্বারা "নন্দ-নিদেশতঃ" পদের সহজ সরল অর্থই সমর্থিত হইতেছে, পরবর্ত্তী সাম্প্রদায়িক অর্থ-কল্পনা নহে।

এক্ষণে জয়দেবের রচিত শ্লোকগুলি 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এগুলির দ্বারা জয়দেবের কবি-প্রতিভার কতকগুলি অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত দিক্ প্রকাশিত হইতেছে।

[১] ১।৪।৪। মহাদেবঃ ।

ভূতিব্যাজেন ভূমীমথ পুরসরিৎকৈতবাদম্বু বিভ্রল্-
ললাটাক্ষিচ্ছলেন জ্বলনমহিপতিশ্বাসলক্ষাৎ সমীরম্ ।
বিস্তীর্ণব্যোমকক্ষো নিরবধিহৃদয়নিকেতনাম্বরঃ শক্তমূর্ত্তীর্
বিভ্রৎ শমম্ বিতন্বন্ বিতরতু ভবতঃ সম্পদং চন্দ্রমৌলিঃ ॥

[২] ১।৫০।৩। কল্কী ।

কল্কী কল্কং হরতু ভবতঃ স্ফূর্জদূর্জস্বিবিক্রো
যেনোচ্ছেদং ক্ষিতধৃতিবশাদ্যেন ধূমকেতুঃ ।
যেনোৎক্ষিপ্য ক্ষণমসিলতাং ভূরিবৎ কন্দলোভ্রান্
ম্লেচ্ছান্ হত্বা দলিতকলিনাকারি সত্যাবতারঃ ।

[৩] ১।৫৩।৪। কৃষ্ণভুজঃ ।

জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ [= গীতগোবিন্দ ১১।৩৩] ।

[৪] ১।৬০।৩। গোবর্দ্ধনোদ্ধারঃ ।

"বৃদ্ধে !" "নাথ, কিমাথ ?" "তদি, শিশবিপ্রাপ্তৃতারতুঙ্গা ভুবঃ ;"
"দাহাবাঃ, প্রিয় ! কিং ভবামি ?" "স্বচ্ছে, গোবর্দ্ধনায়াসয় ।"
—ইত্থমাশ্রিতবাহুমূলবিচলচ্চেলাঞ্চলাব্যক্তয়ো
রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়ন্তি চলিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ।

[এই শ্লোকের সহিত উমাপতিধর-রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটী তুলনীয়—এটী সদুক্তি-কর্ণামৃতের ১।৫৫।৫ সংখ্যক শ্লোক, বিষয়, "হরিক্রীড়া"; 'পদ্যাবলী'-তেও এটী উদ্ধৃত হইয়াছে, সংখ্যা ২৫৯ :—

অবনীক্ষণৈঃ কদাপি নয়নোন্মেষৈঃ কদাপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কদাপি নিভৃতঃ সম্ভাবিতৈরধ্বনি ।
গর্ব্বোদ্ভেদকৃতাবহেলবিনয়শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ।

—উভয় শ্লোকের শেষ ছত্র দুইটী তুলনীয়; "পতিতাঃ—চলিতাঃ"—এই দুইটী পদের যে কোনও একটী ধরিতে পারা যায়; সমস্যাপূর্তির শ্লোক হিসাবে শেষ ছত্রের আধারে এই দুই সভাকবি নিজ নিজ শ্লোক রচিয়া থাকিবেন।]

[৫] ১।৮৪।৫। [illegible] ।

ক্রীড়াকর্ণের বীণাস্বিমলস্বনযুপাঃ কামপাঞ্চালনারী-
শ্রোতঃকিংকরকাণ্ডপত্রঃ শ্রমশমনচলচ্চামরঃ কামিনীনাম্ ।
কম্রু শীলকসুপ্রাপ্তমদনধনুর্জ্যাগুণপ্রাপ্তবানঃ
প্রীণাং যোগাযুগান্তে স্ফুরতি সুরপুরকেলিহংসঃ সুধাংশুঃ ।

[৬] ২।৩৭।৪। বাসকসজ্জা ।

অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ [= গীতগোবিন্দ ৬।১১] ।

[৭] ২।৭২।৪। অধরঃ ।

বিভাতি বিম্বাধরবল্লিরস্যাঃ স্মরস্য বন্ধূকধনুর্লতেব ।
বিনাপি বাণেন গুণেন যেয়ং যূনাং মনাংসি প্রসভং ভিনত্তি ।

[৮] ২।৭৭।৪। রোমাবলী ।

হরতি রতিপতের্নিতম্ববিম্বতটচঃক্রমণক্রমশঃ লক্ষ্মীম্ ।
ত্রিবলিলহরতরঙ্গনিম্নাভিকুপপথরোমবিরাজমানিকাঃ ॥

[৯] ২।১৩২।৩। রতারম্ভঃ।
উন্মীলৎপুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ [= গীতগোবিন্দ ১২।১০]।

[১০] ২।১২৪।৩। বিপরীতরতম্।
মারাঙ্কে রতিকেলি ইত্যাদি [= গীতগোবিন্দ ১২।১২]।

[১১] ২।১৩৭।৫। উরসি ক্রিয়ার্পণম্।
ব্যক্তাঃ (তস্যাঃ) পাটলপাণিপল্লবহৃতো [= গীতগোবিন্দ ১২।১৪]।

[১২] ২।১৭০।৩। শরৎখঞ্জনঃ।
মধুমধুপঃ কুসুমকে পতন্ মুহুরুৎপতন্
জনিতচলৎপুচ্ছঃ বেদ্যা বিচুম্ব্য চিরং প্রিয়াম্।
উর্দ্ধ হি শরদি ক্ষীরঃ পক্ষৌ বিধুয় মিলন্ মুহুঃ
নরপতি রহঃ ক্রুরে মধুমনীষাং খঞ্জনঃ।

[১৩] ৩।৫।১। বর্ষাঃ।
দুর্গেষৎকণ্টককণ্টকৈরিব মদস্রোতঃস্রুতপ্রোদ্গমৈর্
অলকঃ কররোদ্ধৈর্বিব পথ ক্ষেত্রে চ জাতদ্রবৈঃ।
যস্মিন্ বর্ষরুক্ত প্রপাদতি তপঃক্রোধিনীং মেদিনীম্
আত্মারাদ্রবিরঃ কিলোকিত্তমপি ব্যক্তং ন নক্তং দিনঃ।

[১৪] ৩।২।৪। করঃ।
যেষামম্বরঃ স কল্পবিটপী তেষাং ন চিন্তামণিঃ
চিন্তামণ্যপ্যতি কামধুগভিষেবাং ন কামাদ্ভুতম্।
সন্তোষাদধুনাপুণ্যাতিশয়তো যেষাং প্রসন্নো মনাক্
পাণিস্তে ধরণীন্দ্র দুর্লভতমঃ সংবিদিতো দক্ষিণঃ।

[১৫] ৩।৯।৪। করঃ।
যেন স্বৎকরপল্লবে বিরচিতাম্রতাম্রবিতানন-
ক্রীড়াকল্পিতকল্পবৃক্ষবিভবঃ কীর্তিপ্রসূনোদ্গমঃ।
ব্যস্তোৎসর্গতিলাঞ্জলেন গলিতাঃ ক্ষমানাথানোদক-
স্রোতোভির্বিসৃষ্টাঃ স্বয়ংতুর্নিশিতা সৈন্যাকরশ্রেণয়ঃ।

[১৬] ৩।১০।৪। চরণঃ।
লক্ষ্মীকিঙ্করমণ্ডলমস্তকৈঃ কে নাম নোর্বীভুজো
যেন তচ্চরণঃ তরস্বি শরণং শ্রীবৎসশাকাঙ্ক্ষিণঃ।
তাত্যানমস্তুমন্ত্য সন্ত্যক্তধূলীরূপ্যাতপ-
ব্যাঘাতাপাদবীনর্তেষি বিপক্ষব্যস্তাতপত্রাঃ স্বয়ম্।

[১৭] ৩।১১।৫। প্রিয়াখ্যানম্। (মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি)।
লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ ! জঙ্গমহরে ! সংকল্পকল্পদ্রুম !
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ ! সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় ! বঙ্গপ্রিয় !
গৌড়েন্দ্র ! প্রতিরাজরাজক ! সভালংকার ! কারাপিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল ! পালক সতাং ? দৃষ্টোহসি, তুষ্টা বয়ম্।

[১৮] ৩।১৪।৫। যোগাঙ্কঃ। (মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি)।
"ত্বং ভোজোত্তমলীলাং কলয়সি, কুরুষে কর্ণং কুণ্ডলানাং ;
ত্বং কাকিজনান প্রকল্পসি, রঙ্গসাদমসং করোষি।"
—ইত্থং গৌড়েন্দ্র ! ধবিলক্ষিতিভূৎপতিতোৎকন্দরস্থাত দীর্ঘং
নারীণামন্যাভীণাং হৃদয়বৃতস্তে ত্বৎপদাব্রধনায়।

[১৯] ৩।১৯।৪। বিরহঃ।
শিষ্কস্থে চাতুর্যাদানে বিরহতি যশ্মীনীন্দ্রে কানন্তম্
প্রাসাদে ত্যাকিদাঙ্গং বিরহতি শিবিরং দুর্গতে পর্বতেষু।
অদ্যাপি প্রবাদঃ যদি চলতি চতুশ্চক্রবিক্রান্তিতাভিঃ
প্রাণত্যাগায় যেন ! বর্ধতিনৃপতাক্তক্রিয়ে কাষ্ঠানি।

[২০] ৩।২০।৩। পৌরুষম্।
ভীমঃ ক্রীবকতাং গতায়, সমিতি দ্রোণেন মুক্তং ধনুঃ,
ছিন্না ধর্মসুতেন জয়িতসত্ত্বং, দুর্যোধনস্তু দুর্মদঃ।
ছিন্নেবৈব বনজন্ম বিপত্তঃ, কর্ণঃ প্রমাদী ততঃ ;
শ্রীমত্যপি ন তাবকেহপি জনতো যঃ পৌরুষৈর্দীয়তে।

[২১] ৩।২৩।৪। ক্ষেমঃ।
একং ধাম শ্রিয়াং নীনম্নগঃ সুদ্যোৎপলজ্যোতিষাং
ব্যাকাশাত্তিস্ গূঢমনস্তপদো সংশ্রুমোর্বীয়তে।
অবৃষ্টকল্পনাঃ শুভাংক্লমস্তোশনেন চূর্ণং ততাদ্
বার্তং পার্বতীমোদকং যদি বহুম্বলাংসি কিং পার্থিবাঃ।

[২২] ৩।২৫।৪। কান্তর্যাঙ্কঃ।
শ্রীগণ্ডমূর্তিঃ সরলারবিন্দাস্য ভাস্বান্ সুমনো বশী।
শ্রীমন্ ! ভবৎপদকমলমানসী চিত্রং হবে শ্রীকণ্ঠাস্তনোতি।

[২৩] ৩।৩৮।৩। তূর্যধ্বনিঃ।
শুভ্রং ক্রৌঞ্চনিকুঞ্জকুঞ্জরঘটাবিস্তীর্ণকর্ণজ্বরাঃ
প্রাক্প্রত্যগ্রধরণীব্রজকলরবসংপারীত্রেম্যিবাত্রঃ।
লঙ্কাকম্পিকবৃৎপ্রতিষ্ঠিতনিস্বনাঃ শত্রুভ্রান্তাত্মকে
যস্য ত্রৈভুবনসমরবিজয়াশংসিনো ঘোষণাঃ।

[২৪] ৩।৩৮।৪। তূর্যধ্বনিঃ। (বসুপ্রাস লক্ষণীয়)।
যস্যাবিষ্কৃতকীর্তিপ্রতিকৃতিগুম্ফনাগহিণীভূতভার-
ভ্রংশপ্রণালিকুটৈঃ মনসমিব ভয়ানকাকোণিনীনাম্।
সংখ্যাঃ সংখ্যাত জিষ্ণুকম্বলিতো কুহূতাং বিরুদ্ধৈঃ
সংরক্ষোত্তংসায় প্রতিরণমভবৎ তূর্য কোটীনিনাদঃ।

[২৫] ৩।৩৯।৪। তূর্যধ্বনিঃ।
বিঘটিতশ্চ হঠাৎস্ফুটৈঃ স্ফুটকণ্ঠৈরবকণ্ঠগর্জনম্।
জয়করো দিক্করিণাং রণাগ্রে ভেরীরবো ভৈরবভূরঃ প্রদত্ত।

[২৬] ৩।৩০।৫। যুদ্ধম্।
গর্ভিণাঃ কালরাত্রৌ সমিতি সমুদিতে বাণবর্ষাজকারে
প্রাগ্‌ভারে শড়্গধারাং সমিতিরিব সমুদ্রীণ্য মদান্ধিকাংশান্।
অস্তোদ্যাভাতমন্ত্রবিকম্পনঘটাসবিক্রান্তটাভিঃ
গম্ভীরঃ সমস্তাপকিলরতি বৃথা সাংযুগীনঃ জড়ৈঃ।

[২৭] ৩।৩১।৪। যুদ্ধশ্রী।
নিষ্কাশ্যচাপাচাপচ্যুতচিত্ত শস্ত্রমস্তমাত্রজাতঃ
জাতঃ যত্তাত্রিসমার্গবিরহজনিবাসপ্রীপন্নাসায়।
দৃষ্টা যস্মিন্ রণান্তে সহ চ সহচরৈ নীলকাপালান-
স্বাভাষ্যে কপালে কবিরমধুরৈঃ প্রেতকান্তাঃ পিবন্তি।

[২৮] ৩।৪০।৫। বিক্রমঃ।
একঃ সংগ্রামভিন্নঃ রণপুরমবোধাজিতির্ নিপুষ্টিঃ
দিগ্‌যাত্রাকৈরসবিরমরণগমন ভূমিতরক্ষণাক্ষঃ।
বীরাঃ কে নাম তস্মাৎ ত্রিজগতি ন মুঃ কৌলতাং কাপকুক্ত-
ক্ষাণাং এতেন মুক্তাভক্ষ্যমনসকৃতাং বাসবো বাসকিন্ড।

[২৯] ৩।৪২।৫। প্রশস্তকীর্তিঃ।
মলিনয়তি বৈরিবদনং শুভ্রয়তি ত্রস্যতি বক্ষসতি ধাত্রীম্
অপি কুসুমবিশদমূর্তি এবং কীর্তিশ্চিত্রমাচরতি।

[৩০] ৪।১৩।৪। শিবঃ।
অস্ত বস্ত্যাচলাত শিব ধনপতেঃ কৈলাসশৈলাশ্রয়-
শ্রীকণ্ঠাতরণেন্দুস্মিতবর্ণনিবাসক ং প্রমথকৌমুদী।
যস্যাঃ মনকুবলয়কিসলয়রাজো রাজাস্ট্রৈ-
পাড়িতেব তদোজ্জ্বনাত্তি বিরহব্যগ্রাপি কোপাগ্রহম্।

---

* এই শ্লোকটী যে 'গীতগোবিন্দ' হইতে গৃহীত তাহা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমায় দেখাইয়া দিয়াছেন।

[৩১] ৫।১৮।২। বীরঃ।

ধাত্রীমেকাতপত্রাং সবিতি কৃতবতা চণ্ডদোর্দণ্ডদর্পাৎ
যাত্রাসে পাদপদ্মপ্রতিকটমুকুটাদর্শবিম্বোদয়েষু।
উৎক্ষিপ্তস্বস্তিচিহ্নঃ প্রতিফলিতবপি বঃ বপুর্বীক্ষ্য কিং কিং
ন্যস্তৈঃ যেন দৃষ্টাঃ ক্ষিতিতলবিগলন্ মৌলয়ো ভূমিপালাঃ।

জয়দেব যে কেবল শৃঙ্গার রসের কবি ছিলেন না, অন্য রসও তাঁহার কাব্য-সরস্বতীর দ্বারা পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা উপরের শ্লোক কয়টী হইতে সুপরিস্ফুট হয়। 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' ধৃত ৩১টী শ্লোকের মধ্যে ৫টী গীতগোবিন্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। নিম্ন বস্তুর বিচার করিলে এইরূপ অনুমান করিতে প্রবৃত্তি হয় যে, জয়দেব অন্যূন দুইখানি অন্য কাব্য লিখিয়া থাকিতেও পারেন—একখানি 'গীতগোবিন্দ'র-ই মত শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক (উপরের ২, ৭, ৮, ও ১২ সংখ্যার শ্লোকগুলির বিষয়-বস্তু বিচার্য) এবং অপরখানি সম্ভবতঃ মহারাজ শ্রীলক্ষ্মণসেন দেবের প্রশস্তি-বিষয়ক (উপরের ১৩—৩১ সংখ্যক শ্লোকগুলি এই দ্বিতীয় কাব্য হইতে গৃহীত হইয়া থাকিতে পারে)। লক্ষ্মণসেনের বীরত্বের খ্যাতি ছিল, যুদ্ধের জন্য তিনি দক্ষিণ-দেশেও গিয়াছিলেন; ধোয়ী-কবির 'পবন-দূত' কাব্যে এই দক্ষিণ অভিযানের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে; ধোয়ীর ন্যায়, কিন্তু একটু অন্য ভাবে, সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া, সভাকবিদের মধ্যে অন্যতম জয়দেব, পৃষ্ঠপোষক রাজার গুণগান করিয়া থাকিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন, অন্য কবিতাগুলি (১, ৩, ৪, এবং সম্ভবতঃ ১২ ও ১৩) জয়দেবের প্রকীর্ণ শ্লোক-রচনা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীধরদাসের জীবৎকালে জয়দেবের বিশেষ প্রতিষ্ঠা না হইয়া থাকিলে তাঁহার লেখা এতগুলি শ্লোক শ্রীধরদাস নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া দিতেন না। ধোয়ীর 'পবন-দূত' হইতেও তিনি দুইটী শ্লোক দিয়াছেন।

শ্রীজয়দেবের কবি-খ্যাতি শীঘ্রই সমগ্র ভারত-খণ্ডে বিস্তৃত হয়। অনুমান হয়, তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' ঐ যুগের সংস্কৃত-ভাষার কবি এবং উদীয়মান আধুনিক-ভাষাগুলির কবি, উভয় দলেরই প্রিয় হইয়াছিল, কারণ ইহাতে প্রাচীন সংস্কৃত রচনাশৈলীর সঙ্গে অপভ্রংশ এবং নব্যোদ্ভূত ভাষা রচনা-শৈলী, এই উভয়ের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম ঘটিয়াছিল। একান্ত মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে দেবকাহিনী ও প্রেমধারা ভক্তি-মার্গের সাধন-রূপে হিন্দু সাংস্কৃতিক জগতের সেবায় নিয়োজিত হয়। 'গীতগোবিন্দ'-রচনার শতবর্ষ-মধ্যে সুদূর গুজরাটে পাটন বা অণহিলবাড়া নগরে প্রাপ্ত সংবৎ ১৩৪৮ (অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ১২৯২) তারিখের এক সংস্কৃত লেখের মঙ্গলাচরণ শ্লোক-রূপে ইহা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছিল (মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কৃত পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বাঙ্গালাদেশে ও উড়িষ্যায় যেমন, তেমনি গুজরাট ও রাজপুতানায়, এবং উত্তর-পাঞ্জাবের গিরিদেশে ও উত্তর-ভারতের বিশাল সমতল ভূভাগে, সর্বত্র 'গীতগোবিন্দ' জনপ্রিয় কাব্য হইয়া উঠে। 'গীতগোবিন্দ' হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাংশ ও বাক্যাংশ এবং উহার ভাব ও আদর্শ প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালা উড়িয়া হিন্দী ও গুজরাতী কাব্য ও কবিতায় প্রযুক্ত হইতে থাকে। মধ্য-যুগের বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান কবি, এবং তুর্কী-বিজয়ের পরে সম্ভবতঃ বাঙ্গালা-দেশের প্রথম-বড় কবি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস (? আনুমানিক ১৪০০ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে গীতগোবিন্দের দুইটী সঙ্গীতের অনুবাদ দিয়াছেন, এবং বহুস্থানে তাঁহার রচনাতে গীতগোবিন্দের ছায়া পড়িয়াছে। অজ্ঞাতরচিত প্রাচীন গুজরাতী কাব্য 'বসন্ত-বিলাস' (এক মতে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত, অন্য মতে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে) পাঠে দেখা যায়, ইহাতেও বহুস্থলে গীতগোবিন্দের ভাব পরিস্ফুট, এবং ভাষাও অনুকৃত বা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের প্রায় ৩৭খানি বিভিন্ন টীকা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে রচিত হইয়াছিল; মেবাড়-পতি মহারাণা কুম্ভের নামে প্রচলিত 'রসিকপ্রিয়া' টীকাখানি এগুলির মধ্যে একখানি প্রাচীন টীকা (মহারাণার রাজত্বকাল, ১৪৩৩-১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ); গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য অনুকৃতিকাব্যের প্রসূ। অন্ততঃ খানবারো বিভিন্ন সংস্কৃত-কাব্য গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত হয়। ইহা ভিন্ন ভাষা-কাব্যও কতকগুলি আছে। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে খৃষ্টীয় ১৪৯৯ সনে উৎকীর্ণ একটী উড়িয়া লেখ হইতে জানা যায় যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞানুসারে ঐ সময় হইতে 'গীতগোবিন্দ' ভিন্ন অন্য কোনও রচনা হইতে শ্লোক ও গান পুরীর মন্দিরে দেবদাসী ও অন্য গায়কগণ কর্তৃক গীত হওয়া নিষিদ্ধ হয়। (দ্রষ্টব্য, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কৃত প্রবন্ধ, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, 1893, পৃঃ ১১১৭।) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের চিত্র-শিল্পে, বিষয়-বস্তুর ভাণ্ডার হিসাবে গীতগোবিন্দের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়; পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের "অপভ্রংশ" (অথবা তথা-কথিত "প্রাচীন গুজরাতী") এবং "প্রাচীন-হিন্দী" (অথবা "প্রাচীন রাজপুত") শিল্পে, এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড, বসোহলী, কাঙ্গড়া প্রভৃতি স্থানের "অর্বাচীন-হিন্দী" চিত্র-রীতিতে, ও উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা দেশ, নেপাল ও অন্য দেশের চিত্ররীতিতে, গীতগোবিন্দের অনুসারী রাধাকৃষ্ণ-লীলার ছবি পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও পরবর্তী যুগের অপভ্রংশ ও ভাষা কাব্য এই উভয়ের ধারা মিলিত হইয়াছে। এই কাব্যের ১২টী সর্গে ২৭টী পদ বা গান গ্রথিত হইয়াছে। কাব্যের আখ্যায়িকা, অর্থাৎ কাব্যের বর্ণনাত্মক অংশ, প্রাচীন ধারার সংস্কৃত কবিতায় লেখা; ভাবে, ভাষায়, শব্দাবলীতে এই অংশগুলি অতীতের রীতি বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু পদ বা গানগুলিতে যে বাতাবরণ পাই, তাহা হইতেছে অপভ্রংশ ও ভাষা সাহিত্যের। পদ-গুলির ছন্দ, সংস্কৃতের অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ নহে—অপভ্রংশ ও ভাষার মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ; এবং অপভ্রংশ ও ভাষা কবিতার মত, ছন্দের অন্ত্য ও আভ্যন্তর অক্ষরের মিল ইহার প্রাণ। একাধিক পণ্ডিত এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে গীতগোবিন্দের পদগুলি মূলতঃ সংস্কৃতে রচিত হয় নাই, এগুলি রচিত হইয়াছিল হয় অপভ্রংশে না হয় প্রাচীন ভাষায়, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালায় (Lassen সাহেব ও বিমানবিহারী মজুমদারের এই মত)। ইহা অসম্ভব নয় যে জয়দেব এই গানগুলি প্রথম অপভ্রংশে বা প্রাচীন বাঙ্গালায় রচনা করেন, পরে এগুলি বিশেষ লোকপ্রিয় হয়, ইহাতে জয়দেব স্বয়ং এগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া দেন, এবং এইভাবে এগুলিকে নিখিল ভারতের আবালবৃদ্ধের উপযোগী করিয়া ও চিরন্তন করিয়া দেন। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, এইরূপ মতবাদ কেবল অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত মাত্র, ইহা প্রমাণিত সত্য নহে। অনুমানের স্বপক্ষে এই চারিটী বস্তু বিচার্য :—

(১) পদগুলির ধরণ—এগুলির ছন্দঃশৈলী অপভ্রংশ ও ভাষাপদের অনুরূপ, সংস্কৃত কবিতার অনুরূপ নহে। এই অপভ্রংশানুকারিতা সর্বজন-স্বীকৃত।

(২) জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদের অনুরূপ সমসাময়িক বহু অপভ্রংশ ও প্রাচীন ভাষা গীত বা পদের অস্তিত্ব (যেমন 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' ও 'মানসোল্লাস' অথবা 'অভিলষিতার্থ-চিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থে)।

(৩) গীতগোবিন্দের কতকগুলি পদের দুই চারিটী কলিকে যদি সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশে রূপান্তরিত করিয়া পাঠ করা যায়, তাহা হইলে সেগুলির ছন্দের গতি আরও সাবলীল হয়। অপভ্রংশ বা পুরাতন বাঙ্গালা রূপে ভাঙ্গিয়া লইয়া এগুলিকে পাঠ করিলে, প্রাচীন বাঙ্গালার সহিত ছন্দ বিষয়ে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। (যেমন ৫ সংখ্যক পদে "স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম্" এই কলিটীকে অপভ্রংশ করিয়া "সুমরই। মণু মহ কিঅ-পরিহাসু" রূপে পড়িলেই নিখুঁত পয়ারের মত অক্ষরের সমাবেশ যুক্ত ছন্দ পাওয়া যায়, যথা : — — — — । — — — — । — — — । — — —। ; "শ্রীজয়দেবকবেরিদং। কুরুতে মুদং। মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি"—

২-এর পদের এই ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে একটী করিয়া মাত্রা বেশী আছে; যদি "ইহা" ও "দুহু"-কে অপভ্রংশ-মতে "ইহ" ও "দুহ" পড়া যায়, তাহা হইলে ছন্দো-দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। এই সমস্ত ছন্দের বাঙ্গালা-আসামী-উড়িয়া ও ভোজপুরী-মগহী-মৈথিল প্রতিরূপ আছে, কিন্তু এগুলির প্রতিরূপ বা অনুরূপ ছন্দ প্রাচীন সংস্কৃতে নাই।

(৪) শেষ বিচারে 'গীতগোবিন্দ' বইখানি কাব্য হইলেও, ইহার মধ্যে নাটকীয় অংশ বিদ্যমান। পদগুলি রাধার সখীদের অথবা স্বয়ং রাধা ও কৃষ্ণের উক্তি, যেন এগুলি নাটকে তাঁহাদেরই উক্তি-প্রত্যুক্তি। আমাদের বাঙ্গালা যাত্রা-গানের উদ্ভবে 'গীতগোবিন্দ'-জাতীয় রচনার একটা বড় স্থান ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই; এই যাত্রা-গানেরই পূর্ব রূপ হইতেছে মধ্য-বাঙ্গালার পালা-গান; ইহাতে একাধারে বর্ণনাত্মক অংশ ও পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন থাকে (পালা-গানে মূল গায়েন ও তাঁহার দোহারেরা নাটকীয় আলাপ অংশ চালাইতেন)। অন্য পক্ষে, 'গীতগোবিন্দ' মিথিলাতে প্রচলিত এক ধরণের নাটকের ধারার সহিত বিজড়িত বলিয়া মনে হয়—এইরূপ নাটকে সংস্কৃত বা প্রাকৃত গদ্যে পাত্র-পাত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে, সংস্কৃত নাটকে যেখানে বিভিন্ন ছন্দে সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহৃত হয় সেখানে দেশভাষা মৈথিলে পদ বা গান থাকে। এইরূপ কতকগুলি নাটকের উল্লেখ স্যর্ জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়র্সন্ সাহেব করিয়াছেন, এবং 'পারিজাত-হরণ' নামে উমাপতি উপাধ্যায় কর্তৃক ১৫শ শতকে রচিত একখানি নাটক তিনি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত-ও করিয়াছেন। এইরূপ নাটক-রচনার ধারা মিথিলা (এবং বঙ্গদেশ) হইতে নেপালে প্রসারিত হয়, এবং সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি এইরূপ নাটক নেপালে পাওয়া গিয়াছে—এইসব নাটকে গদ্য অংশ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাঙ্গালা বা মৈথিলে (সংস্কৃতের পরিবর্তে), এবং পদ্যশ্লোকের স্থানে মৈথিলী বা কোশলী (অথবা পূর্বী-হিন্দী)-তে পদ বা গান আছে, নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কার্য-কলাপ (প্রবেশ, নির্গমন, উপবেশন ইত্যাদি) পুর-নেপালের প্রাচীন ভাষা, তোট-ব্রহ্ম শাখার অন্যতম নেপালীয় ভাষা নেওয়ারীতে লিপিবদ্ধ আছে। এই সব নাটক দেখিয়া অনুমান হয়, হয় তো 'গীতগোবিন্দ' ভাষায় বা অপভ্রংশে (সংস্কৃতের লঘু আধারে) নিবদ্ধ কথোপকথনাত্মক পদ বা গান এবং সংস্কৃতে নিবদ্ধ বর্ণনাত্মক অংশ লইয়া গঠিত গীতিনাট্যের একটী ধারায় অন্তর্গত ছিল, যে ধারা পূর্ব-ভারতে বিশেষ করিয়া প্রচলিত ছিল। (অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে বর্ণনাত্মক অংশ আছে, আবার কথোপকথন-ও আছে, যাহাতে দুই বা তিন পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি বা কথা-কাটাকাটি পাওয়া যায়।) গীতগোবিন্দে এইরূপ ভাষা বা অপভ্রংশ পদকে সংস্কৃত ভাষায় আনিয়া ইহার আকৃতি একটু বদলাইয়া দেওয়া হয় মাত্র, কিন্তু এই পরিবর্তিত আকারে ইহার প্রচার ও প্রভাব আরও ব্যাপক হইয়া পড়ে। রামানন্দ রায় কর্তৃক এই সংস্কৃতের গীতগোবিন্দের অনুকরণে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে 'জগন্নাথ-বল্লভ' নামে "সঙ্গীত-নাটক" রচিত হইয়াছিল। ভাষা (বা অপভ্রংশে) পদের "সঙ্গীত-নাটক" বা কাব্য-নাট্যের ধারা বিচার করিলে, 'গীতগোবিন্দ'কে ঐ পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

জয়দেব-রচিত গীতরসাত্মক অন্য সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে অনুমানের অনুকূলে প্রমাণ যে আছে, 'সদুক্তি-কর্ণামৃত'-ধৃত শ্লোকাবলী হইতে তাহা দেখা যায়। সেরূপ কোনও কাব্য থাকিলে তাহা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জয়দেব ক্রম-ক্রমে বৈষ্ণব সাধক ও ভক্তগণের পর্যায়ে নীত হইলেন, তাঁহার গীতগোবিন্দের কল্যাণে। 'গীতগোবিন্দ'-কার ভক্ত জয়দেব ভাষাতেও পদ রচনা করিয়াছিলেন, এই ধারণা উত্তর-ভারতের সন্ত বা ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবে জয়দেব উত্তর-ভারতের প্রধান ভক্ত ও সাধুদের মধ্যে পরিগণিত হন। শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু শ্রীগুরু অর্জুনদেব মধ্য-যুগের উত্তর-ভারতের ভক্তগণের পদ-সংগ্রহের স্বরূপ 'শ্রীগুরু-গ্রন্থ' বা 'শ্রী-আদি-গ্রন্থ' অথবা 'শ্রীগ্রন্থ-সাহেব' খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে যখন সঙ্কলিত করেন, তখন তিনি সাধকদের পদ, তাঁহার পূর্ববর্তী চারিজন শিখ গুরু ও তাঁহার নিজ রচিত ছিল। যাহা হাতের কাছে পান তাহা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। কবীরের বহু পদ এই ভাবে গুরু-গ্রন্থে গৃহীত হয়; রবিদাস, বাবা ফরীদ, রামানন্দ, মহারাষ্ট্রের ভক্ত নামদেব, এবং বাঙ্গালার জয়দেব, অন্য কয়জন ভক্তের পদের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদেরও পদ গুরু-গ্রন্থে স্থান পায়। (জয়দেবের রচিত বলিয়া দুইটী পদ গুরু-গ্রন্থে আছে। এই দুইটীর ভণিতায় জয়দেবের নাম আছে।) পদ দুইটী যে 'গীতগোবিন্দ'-কার জয়দেবের রচিত, তৎসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ নাই; তবে সেগুলি যে জয়দেবের নহে, সে পক্ষেও প্রমাণ নাই। শিখ গুরু-পরম্পরা অনুসারে গুরু-গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে এই দুই পদের রচয়িতা রূপে 'ভক্তমাল'-গ্রন্থ-বর্ণিত গীতগোবিন্দ-কার ভক্ত কবি জয়দেবকেই স্বীকার করা হয়। গ্রন্থ-সাহেবের জয়দেব ও গীতগোবিন্দের জয়দেব এক হইলে,—এবং এক বলিয়া মানিয়া লইতে কোনও অন্তরায় নাই—তাঁহাকে ভাষা-সাহিত্যের একজন আদি কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হয় (গীতগোবিন্দের পদগুলির মূল ভাষার প্রশ্ন না ধরিলেও)।

গুরুগ্রন্থ-ধৃত পদ দুইটী "রাগ গুজরী" ও "রাগ মারু"-র অন্তর্গত। M. A. Macauliffe রচিত শিখ-ধর্ম-বিষয়ক সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত ইংরেজী গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের ১৫-১৭ পৃষ্ঠায় এই দুইটী পদের ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে এই পদ দুইটীর বিচার করা যাইতেছে।

(১) শ্রীজৈদেব-জীউ-কা পদা (রাগ গুজরী)।
পরমাদি পুরুখ মনোপিমং সতি আদি ভাব-রতং।
পরমদ্ভূতং পরক্রিতিপরং যদি চিন্তি সরব-গতং ॥১॥
রহাউ—
কেবল রাম-নাম মনোরমং বদি অম্রিত-তত-ময়ং।
ন দনোতি জসমরণেন জনম-জরাধি-মরণ-ভইঅং।
ইছসি জমাদি-পরাভয়ং জস্ স্বসতি সুক্রিতি-ক্রিতং।
ভব-ভূত-ভাব সমব্বিঅং পরমং পরসন্নমিদং ॥২॥
লোভাদি-দ্রিসটি পরগ্রিহং জদি বিধি আচরণং।
তজি সকল দুহক্রিত দুরমতী ভজু চক্রধর-সরণং ॥৩॥
হরি-ভগত নিজ নিহকেবলা রিদ করমণা বচসা।
জোগেন কিং জগেন কিং দানেন কিং তপসা ॥৪॥
গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপি নর সকল-সিধি-পদং।
জৈদেব আইউ তস সফুটং ভব ভূত-সরব-গতং ॥৫॥

এই পদটী E. Trumpp কর্তৃক ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে Munich মূনিক্ নগরের বাভারীয় রাজকীয় বিজ্ঞান-পরিষদের দর্শন-সাহিত্যেতিহাস শাখার কার্যবিবরণীতে জরমান ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহার ভাষা বিকৃত সংস্কৃত, কেবল মাঝে মাঝে (বিশেষতঃ শেষ শ্লোকে) ভাষা বা অপভ্রংশের শব্দ দুই চারিটী আছে। পদটী মূলে অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় লিখিত হইয়া থাকিতে পারে, পরে ইহার সংস্কৃতীকরণের চেষ্টা হয়; এই সংস্কৃত রূপান্তরে যে বাঙ্গালা দেশের (অথবা পূর্ব-ভারতের) উচ্চারণ অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা অনুমিত হয়। অনন্তর গুরুমুখী বর্ণমালায় নীত হওয়ার কালে আরও বিকৃতি ঘটে। এই পদের সংস্কৃত ভাষা এইরূপ হইবে—

পরমাদিপুরুষম্ অনুপমং সদ্-আদি-ভাবরতম্।
পরমাদ্ভুতম্ প্রকৃতিপরং যদ্ (=যম্) অচিন্ত্যং সর্বগতম্ ॥ ১ ॥
রহাউ (=ধ্রুব)—
কেবলং রামনাম মনোরমং বদ অমৃত-তত্ত্বময়ম্।
ন দুনোতি যৎস্মরণেন জন্ম-জরাধিমরণভয়ম্।
ইচ্ছসি যমাদিপরাভবং, যশঃ, স্বস্তি, সুকৃত কৃতং
(=সুকৃতং কুরু?)।

ভবভূত ভাব-সমব্যয়ম্ পরমম্ প্রসন্নম্ ইদম্ (অথবা
  মিদ, মিদ্ = মৃদ্ = মৃদ্ ? Trumpp-এর ব্যাখ্যা)।
লোভাদি-দৃষ্টি-পরগৃহং যদ্ অবিধি-আচরণম্।
ত্যজ সকল-দুষ্কৃতং দুর্মতিম্, ভজ চক্রধর-শরণম্।
হরিভক্তিঃ নিজা নিষ্কেবলা—হৃদা কর্মণা বচসা।
যোগেন কিং, যজ্ঞেন কিং, দানেন কিং, [কিং] তপসা।
গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপ, নর, সকল-সিদ্ধি-পদম্।
জয়দেবঃ আয়াতঃ তস্য স্ফুটম্—ভব-ভূত-সর্ব-গতম্।

পদটীর সাধারণ অর্থ গ্রহণে কোনও কঠিনতা নাই, যদিও ভাব ও ভাষা উভয়ের একটা অসামঞ্জস্য স্থলে-স্থলে বিদ্যমান। এই ভাব-সমূহের অসামঞ্জস্য এবং ভাষার আড়ষ্টতা দেখিয়া এই পদের মূল রূপকে অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত বলিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়। ভাষা এখানে ভাবের সম্পূর্ণ অনুগামী নয়।

(২) বাণী জৈদেবজীউ-কী (রাগ মারু)।

চন্দ সত ভেদিআ নাদ সত পূরিআ সূর সত খোড়সা দত্ কীআ।
অবল বল তোড়িআ অচল চল থপিআ অঘড় ঘড়িআ, তহা অপিউ পীআ।১।
মন আদি গুণ আদি বখানিআ।
তেরী দুবিধা দ্রিসটি সমানিআ। রহাউ।
অর্ধ-কৌ অরধিআ সরধ-কৌ সরধিআ, সলল-কৌ সললি সমানি আআ।
বদতি জৈদেব জৈদেব-কৌ রম্মিআ, ব্রহ্ম-নির্বাণ লিব লীণ পাআ।২।

এই পদটীর ভাষা, ঠিক অপভ্রংশ নহে, ইহাকে মিশ্র-অপভ্রংশ মিশ্র-ভাষা বলা যাইতে পারে; হয় তো ইহা মূলে প্রাচীন বাঙ্গালা ছিল। এখানেও সংস্কৃত (অর্ধ-তৎসম) শব্দগুলির বানান, প্রাচ্য-ভারতের সংস্কৃত উচ্চারণের অনুযায়ী। E. Trumpp এই পদটীর অনুবাদ করেন নাই—তাঁহার অসম্পূর্ণ গ্রন্থ-সাহেবের অনুবাদেও ইহা নাই। Macauliffe-এর অনুবাদ ও ভাই বিসন সিংহ গ্যানী রচিত পাঞ্জাবী ভাষা টীকা "ভগত-বাণী" অনুসরণ করিয়া এই পদের বঙ্গানুবাদ দিতেছি—

চন্দ্রকে (অর্থাৎ ইড়া বা বাম নাসারন্ধ্রকে) সত (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) দ্বারা ভেদ করিয়াছি [অর্থাৎ আমি প্রাণায়ামের পূরক করিয়াছি]; সত (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) দ্বারা নাদ (অর্থাৎ সুষুম্না, অর্থাৎ নাসিকার ভিতর দুই নাসারন্ধ্রের উপরিভাগের মধ্যস্থ স্থান) পূরিয়াছি [অর্থাৎ কুম্ভক-যোগ করিয়াছি]; সত বা প্রাণবায়ুকে সূর (অর্থাৎ সূর্য, বা পিঙ্গলা নামে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র) দ্বারা আমি বাহির করিয়া দিয়াছি ("দত্ কীআ" = দত্ত করিয়াছি) [অর্থাৎ আমি রেচক দ্বারা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রাণায়াম পূর্ণ করিয়াছি]—ষোল বার ("খোড়সা", অর্থাৎ প্রত্যেক পূরক, কুম্ভক ও রেচক কালে ষোড়শ বার প্রণব বা ওঁ-কার উচ্চারণ করিয়া এইভাবে প্রাণায়াম করিয়াছি)।

অবল বা বলহীন (যে এই অঙ্কুর দেহপিণ্ড), ইহার বল ভগ্ন করা হইয়াছে ("তোড়িআ" = তোড়া হইয়াছে); চল অর্থাৎ চঞ্চল (যে মন, তাহাকে) অচলে (অর্থাৎ অচল ব্রহ্মে) স্থাপিত করা হইয়াছে; অঘটিত (মন)-কে ঘটিত বা সুগঠিত করা হইয়াছে; তদনন্তর অমৃত (অপিউ = অমিউ = অমিঅউ = অমিউ = অমিঅ অ = অমিঅউ = অমিঅত = অমৃত) পীত হইয়াছে।১।

(যে ব্রহ্ম) মনেরও আদিতে এবং (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন) গুণেরও আদিতে, তাঁহার বাখান করিয়াছি। তোমার দ্বিবিধা দৃষ্টি (অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ দর্শন) অবলুপ্ত হইয়াছে (সমানিআ = সামাইয়া গিয়াছে, প্রবেশ করিয়াছে, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে)। ধ্রুব।

আরাধ্যকে আরাধিত করা হইয়াছে; শ্রদ্ধী (বা শ্রদ্ধার পাত্র)-কে শ্রদ্ধা করা হইয়াছে; সলিলকে সলিলে প্রবেশ করানো হইয়াছে (সামানো হইয়াছে)। জয়দেব বলে—জয়দেব-দেবে (অর্থাৎ পরমেশ্বরে) রমণ করা হইয়াছে; ব্রহ্মনির্বাণ লইয়া ("লিব"), আমি লীন পাইয়াছি (= লীন হইয়া গিয়াছি)।২।

জয়দেবের এই "বাণী" বা ভাষা-পদটি হইতেছে যোগমার্গের পদ—খ্রীষ্ট ১০০০-এর ওদিকে এবং এদিকে সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, এই যোগ-সাধনের কথায় ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক কথার সাহিত্য, ভরপুর। ধর্ম-সাধনার পথে, ভক্তি-মার্গ ও যোগ-মার্গ এই দুই পথ অপক্ষপাতের সহিত প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়েরই উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছিল, খ্রীষ্ট ১০০০-এর পূর্ব হইতেই। যোগ-সাধনের কথা—ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, ব্রহ্মরন্ধ্রোৎকার বা ব্রহ্মলীন হওয়ার কথা, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী ধর্মমতের কথা। যোগ-মার্গের কথা ওদিকে যেমন মহাযান বৌদ্ধমতের সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত (প্রাচীন বাঙ্গালা 'চর্যাপদ' হইতে ইহা দেখা যায়), তেমনি গোরক্ষনাথ-পন্থ প্রভৃতি শৈব সম্প্রদায়ে, কবীর প্রমুখ সন্ত বা নবীন মতের সাধুদের সম্প্রদায়ে, শিখ সম্প্রদায়ে এবং বৈষ্ণবাদি ভক্তিবাদী অন্য সম্প্রদায়েও অল্পবিস্তর প্রবল-ভাবে বিদ্যমান। জয়দেব-পরবর্তী কালের রামাওতী, গৌড়ীয়, বল্লভাচারী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক অর্থের বৈষ্ণব ছিলেন না—তিনি সম্ভবতঃ পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণই ছিলেন। তাঁহার রচিত পদে পূরক-কুম্ভক-রেচক সাধন ও ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করার কথা থাকা কিছু বিচিত্র নহে।

উত্তর-ভারতের ধর্ম-সাহিত্যের উপরে জয়দেব সাধারণ ভাবে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিশেষ ভাবে তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রষ্টা এবং প্রাণ-দাতা বলিতে পারা যায়। জয়দেব বাঙ্গালার আদি কবি চর্যাপদের রচক বৌদ্ধ কবিদের সাধনধারক ছিলেন। গীতগোবিন্দের গানগুলিকে উক্ত গ্রন্থ মধ্যে "গীত" বলা হইয়াছে, অন্যত্র এগুলি "পদ" নামে প্রচলিত। শিখদের আদি-গ্রন্থেও জয়দেবের একটী গানকে "পদা" অর্থাৎ "পদ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; জয়দেব নিজেও এগুলিকে "পদ" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন—"মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।" "গীতগোবিন্দ", ১।৩। উপনিবদ্ধ সংস্কৃত-ভাষা-গ্রথিত রূপে এই গীত বা পদগুলি মিলিলেও, বৌদ্ধ চর্যাপদের-মত গীতগোবিন্দের এই পদগুলিকেও বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের আদিতে স্থান দিতে হয়। জয়দেবোত্তর মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটী মুখ্য ধারা দেখিতে পাওয়া যায়: একটী কথাত্মক কাব্যের ধারা, ইহাতে কোনও দেবতা বা অবতার অথবা ঐতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক মহাপুরুষের কাহিনী বা জীবনী বিবৃত থাকে; এই প্রকার কথাযুক্ত কাব্যকে "মঙ্গল-কাব্য" বা "মঙ্গল" বলা হইত। মঙ্গল-কাব্যে বিশেষ ভারতীয় পৌরাণিক দেবতা বা অবতারকে লইয়া কথা রচিত হইত—যেমন শিব, চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র; অথবা কেবল গৌড়-বঙ্গে প্রসিদ্ধ দেবতা বা সাধু-সাধ্বীদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইত—যেমন ধর্মদেব ও লাউসেন, মনসা ও চাঁদ সদাগর এবং লখিন্দর-বেহুলা, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর, কালকেতু ব্যাধ ও ফুল্লরা; অথবা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ও কচিৎ অন্য সম্প্রদায়ের গুরু-ভক্তির সাধক বা প্রচারকের জীবনী লইয়া রচিত হইত। দ্বিতীয় ধারাটী গীতাত্মক; এই ধারায় পাওয়া যায় কেবল ধর্ম-সম্বন্ধীয় অধ্যাত্ম-রসাশ্রয়ী বা লীলাশ্রয়ী মধুর রসের, কিংবা পার্থিব প্রেমের গান; এই গানের ধারাকে "পদ" বলা হইত। বৌদ্ধ চর্যাপদ, বৈষ্ণব মহাজন-পদ, সহজিয়া পদ, দেহতত্ত্বের গান, রামপ্রসাদ-প্রমুখ শাক্ত সাধকদের পদ, শ্যামাসঙ্গীত, বাউলের গান, মুসলমান মারফতী গান, প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের গীতির বিভিন্ন ধারা, এই পদ-সাহিত্যেরই অন্তর্গত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ-ই পরবর্তী মধ্য-যুগের বাঙ্গালা পদ-সাহিত্যের সূত্রপাত স্বরূপ—চর্যাপদের চেয়েও জয়দেবের পদ বাঙ্গালা পদ-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী বৈষ্ণব পদ হইতে আরম্ভ করিয়া নিধুবাবু

প্রভৃতি প্রাচীন বাংলার কবিদের প্রেমের গান,—জয়দেবের পদেই এই গীতসম্ভার 'পদাবলী' মিলিয়াছে। ঈশ্বর, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য-কাব্যও বটে; সেই হিসাবে ইহা একটী "মঙ্গল-কাব্য"; একাধারে "পদ" ও "মঙ্গল"—উভয় ধারা গীতগোবিন্দে বিদ্যমান। সংস্কৃত-শ্লোক-নিবদ্ধ হইলেও ইহার স্থান একদিকে বাঙ্গালা মঙ্গল-কাব্যের পর্য্যায়ে; তেমনি ইহার গানগুলি হইতেছে "পদাবলী" বা পদ-সংগ্রহ। জয়দেব স্বয়ং ইহাকে "মঙ্গল" অর্থাৎ "মঙ্গল-কাব্য" বলিয়া বর্ণনাও করিয়াছেন—"শ্রীজয়দেব কবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলম্ উজ্জ্বল-গীতি", অর্থাৎ "শ্রীজয়দেব কবির রচিত উজ্জ্বল রসের অর্থাৎ প্রেমের গীতিময় এই মঙ্গল-কাব্য আনন্দ দান করে।" সুতরাং বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি-ভাষার সাহিত্যের দুইটী মুখ্য ধারার অগ্রণী বলিয়া জয়দেব কবির প্রতিষ্ঠার কারণ সহজেই প্রণিধান করা যাইতে পারে। যদিও গীতগোবিন্দের পদাবলীর মধ্যে অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ মিলিতেছে না, এবং যদিও আদি-গ্রন্থ-ধৃত দুইটী মিশ্র ভাষা সংস্কৃত ও ভাষার পদের সহিত আমাদের জয়দেবের সংযোগ নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি তাঁহাকে আমরা নবীনের আবাহন-কর্তা, মধ্য-যুগের বাঙ্গালা মঙ্গল ও পদের অগ্রদূত সাহিত্য হিসাবে, বাঙ্গালার আদি কবি বলিয়া সম্মানের আসন দিতে পারি; যেমন তিনি ছিলেন প্রাচীন যুগের, মুসলমান-পূর্ব যুগের সংস্কৃতের শেষ মহাকবি। সংস্কৃত ও ভাষা, উভয় প্রকার সাহিত্যে জয়দেবের বিরাট প্রভাবের কথা মনে করিয়া, এবং মধ্য-যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি যে একজন মহাজন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বিরাজমান সে কথাও স্মরণ করিয়া, নাভাজীদাস ষোড়শ শতকে তাঁহার 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে ব্রজভাষা-নিবদ্ধ পদে জয়দেবের যে প্রশস্তি গাহিয়া গিয়াছেন, তাহা সুন্দর ও সার্থক—

জয়দেব কবি নৃপচক্কৈ, খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর আনি কবি।
প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীত-গোবিন্দ উজাগর।
কোক-কাব্য-নবরস-সরস-শৃঙ্গার-কৌ আগর।
অষ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি বঢ়াবৈ।
রাধা-রমন প্রসন্ন সুনত হাঁ নিশ্চৈ আবৈ।
সন্ত-সরোরুহ-খণ্ড-কৌ পদুমাবতি-সুখ-জনক রবি।
জয়দেবকবি নৃপ-চক্কৈ, খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর আনি কবি।

কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্ত্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর (=ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের প্রভু) মাত্র। তিন লোকে 'গীতগোবিন্দ' প্রচুর ভাবে উজ্জ্বল (উজাগর) হইয়াছে। (ইহা) কোকশাস্ত্র (কামশাস্ত্র), কাব্য, নবরস ও সরস শৃঙ্গারের আগার-স্বরূপ। যে (গীতগোবিন্দের) অষ্টপদী (=গীত) অভ্যাস করে, তাহার বুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রাধারমণ প্রসন্ন হইয়া শুনেন, তিনি নিশ্চয় সেখানে আগমন করেন। সন্ত (ভক্ত)-রূপ কমল-বনের পক্ষে (তিনি) পদ্মাবতী-সুখ-জনক রবি। কবি জয়দেব চক্রবর্ত্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর মাত্র।

১ আষাঢ়, বিক্রম-সংবৎ ২০০০, বঙ্গাব্দ ১৩৫০।

সিদ্ধিলাভ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ছিলো ছবি-ঘোর, তিমির নিবিড় বিভাবরী—
সাধক মগন ধ্যানে বীরাসনে শবের উপরি।
আকাশের উদ্ভাসিত হতেছে নক্ষত্র ধীরে,
লোহিত জবার আভা ফুটিতেছে সাধকের শিরে।
প্রতি তন্ত্র কণিকায় ঢালিছে আলোর পরিবেশ,
তিমির অন্তরে যেন হইতেছে শক্তির প্রবেশ।
হবিষিক্ত অর্দ্ধদগ্ধ মন্দিরের দণ্ডাগ্নি স্থলে,
তার কোন অর্দ্ধর্দ্ধ, একি কান্তি এলো জলে স্থলে!
কি বিভা পুঞ্জ পুঞ্জ! সিদ্ধির কি সত্যই এ ক্ষণ?
কি সুন্দর চরাচর, এ স্বরূপ কোথা গেল ভুল!
এ কি সেই বসুন্ধরা, মায়ারুদ্ধ সংসারীর ভিটা?
এ যে মূর্ত্তি সুরবণী! এ যে শোভা অনির্ব্বচনীয়!
কোথা সেই কদর্য্যতা? জিজ্ঞাসার সে বিবাদী জ্বালা?
এ যে স্বর্গ পুষ্পপাত্র, দেবতার নৈবেদ্যের থালা।

ভুলেনা সাধক আজি কোন সে অমৃতলোকে আছে;
এ যেন স্বপ্নের ডাকে নরশিশু সব এলো কাছে।
ধূলিকণা বিন্দুটিকে হিরণ্ময়ী দিলো আলিঙ্গন,
শিকড়ের তুচ্ছ মধু বঁধু নিলো করিয়া চুম্বন।
ক্ষুদ্র জোনাকির ডাকে মুক্ত হলো মধুর আভায়।
কি সম্ভাষ, পরিতৃপ্তি! বাকি কিছু নাহি চাহিবার!
সব বীজ অঙ্কুরিত, সব বৃন্তে কুসুম উৎসব,
সব নব জ্ঞানপূর্ণ—একি পরিপূর্ণতার বেশ!
যেন রাজা সমারোহে করিল যে দীনের কুটীর,
পরিত্যক্ত স্বর্গক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ বহিরের ভিড়।
ছিন্ন মুণ্ডমালে এ কে স্বর্ণ চীনাংশুক দিল পাতি?
প্রতিপদ চাঁদে গোটা কোজাগর পূর্ণিমার ভাতি!
উন্মুক্ত সকল দ্বার, সব সমস্যার সমাধান,
সব ক্ষুধা নির্ব্বাপিত, সব আকাঙ্ক্ষার অবসান!

সাধক ত্রি-ধারা দেখে হেরে এক নূতন ভুবন
আনন্দের ওর নাহি, মুক্ত আজ সকল বন্ধন।
সব শুদ্ধ, সব শুচি, লেশ নাই হিংসা বিদ্বেষের।
বিম্বিত আলোকে বিশ্ব শ্যামা মা'র তৃতীয় নেত্রের।
বিশাল আকাশ ঘিরে হেরে সাধু আরতি তারার,
শিব-সীমন্তিনী কণ্ঠে জ্যোতির্ময় হীরকের হার।
শিথিল হইল তন্ত্র, পঞ্চভূত পঞ্চভূতে লয়—
নির্বন্ধে শান্তি, জেগে—রহিল যা কেবলি চিন্ময়।
কি প্রগাঢ় প্রসন্নতা! কি কল্লোল সুধা পারাবারে!
নূপুর নিক্কণ শুনি নম্র মন্দারের মকরন্দ ভারে।
এই জীব পরিবার স্নেহপুষ্ট এক জননীর,
নাহি দ্বন্দ্ব, নাহি দ্বিধা, দেখে সাধু প্রীতি কি নিবিড়!
রক্তারক্তি, বিভীষিকা, প্রেতবাস, চাণ্ডাল নর্ত্তন—
কোথাকার নবযুগ কখন করেছে প্রবর্ত্তন!

জীবন অখণ্ড পূজা—মৃত্যু সে ত পূজা শেষে স্নান,
সাধকের চক্ষে আজ দুই কথা, দুই সমমান।
সুধা তরঙ্গিণী নাচে, দেখে মুগ্ধ অস্তু অকপট—
মৃত্যু ও যে সঙ্গে পাওয়া পরাক্রেল শর্করার বট।
মৃত্যু করেনাক প্রাণ—পূর্ণিমার চন্দ্র ও গ্রহণ,
অমৃত যাহার সঙ্গে, দুঃখ তার হতে কতক্ষণ?
কিছু নাই, সব আছে, সব আলো সব অন্ধকার,
অমৃতময় মহোৎসব—প্রেমরাজ্য গোটা যে তাহার।
না চেয়ে পেয়েছে সব, পাইতে ত কিছু নাই বাকি,
স্নানে দণ্ড সুধাকর, 'বর লও' কন দেবী ডাকি।
এই ত পরমাপ্রাপ্তি—পূর্ণানন্দে সাধক তন্ময়।
উচ্চারি 'বরন আজি অক্ষিবের শুধু চেয়ে রয়

পাশাপাশি

শ্রীমমতা পাল

কলিকাতার এক বিখ্যাত অঞ্চলের কথা বলিতেছি। অনেক ধনী ও মানী পরিবারের এখানে বাস যাঁহাদের নাম সকলের মনে ঈর্ষামিশ্রিত সম্ভ্রম উদ্রেক করে, কিন্তু ঐ ধনীদের বাড়ীর আশে পাশে এখনও দু'একটি ঘর আছে যাঁহাদের দুয়ারে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আড়াআড়ি বিরোধ চলিয়াছে···সরস্বতী আসিলেও লক্ষ্মী মুখভার করিয়া চলিয়া যান।

মিত্তির পরিবার এখানকার অনেকদিনের বনিয়াদী বংশ, তিন পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা যে ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন, পরবর্ত্তী তিন পুরুষ তাহা নির্ভয়ে খরচ করিতে পারিত। সেই মিত্তির পরিবারের ভোলানাথবাবু ইন্‌কামট্যাক্সে প্র্যাক্‌টিস করিয়া যা উপার্জ্জন করিতেছেন তাহা বাড়তি হইলেও কম নহে, বাড়ীতে চাকর, আমলাগণ গিস্‌গিস্ করিতেছে, প্রত্যহই যেন সেখানে একটি রাজসূয় ব্যাপার। ভোলানাথবাবুর মাত্র একটি ছেলে—নাম সমীর। মিত্তির বাড়ীর একমাত্র বংশপ্রদীপ সমীর পাস করিয়া পড়া ছাড়িয়াছে, তাহার সুন্দর গৌরকান্তি দেখিয়া লোকে বলিত—ধনের ঘরে রূপের বাসা। ইদানিং নাকি তাহার শরীর খারাপ হইয়াছে, তাহাকে লইয়া সকলে ব্যস্ত।

রাস্তার ওপাশেই বিনয় চৌধুরীর বাড়ী। একতলা বাড়ী—বিনয় আর তাঁর বিধবা মা থাকেন। কায়ক্লেশে সংসার চলে। বিনয় একটা ফার্ম্মে কাজ করে ৬০৲ টাকা বেতনে, আর সকালে বিকালে ট্যুশানি করে—তাহাতেই তাহাদের সংসার চলিয়া যায়। বিনয় তার কর্ম্মক্লান্ত মুহূর্ত্তগুলির মাঝে এক একবার মিত্তিরদের বাড়ীর দিকে তাকায়। ঐ মস্ত উঁচু বাড়ী তার সমস্ত ডালপালা, কলরব কোলাহল নিয়ে যেন ওকে গ্রাস করতে আসে। বিনয় তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বিনয়ের কলেজে পড়তে পড়তেই শরীর খারাপ। ডাক্তার বলিয়াছেন, 'বিশ্রাম নাও—না হলে কঠিন অসুখ হতে পারে।' মা বলেন, 'ওরে শরীর যে তোর খারাপ—এত খাটুনী খাস, শরীরটা একটু দেখ, বিনয় হাসিয়া বলে—'গরীবের আবার শরীর, তার আবার খারাপ। দেখ দিকিনি ঐখানে ঐ কুলীমজুরদের—যারা দিনরাত খেটেও নিজেদের দু'মুঠো অন্নও জোটাতে পারে না। মা ছেলের সঙ্গে তর্কে কোন দিনই পারেন নাই—আজও তেমনি পরাজয় স্বীকার করেন। মনে মনে মাতৃগর্ব্বে বুকখানা ভরিয়া ওঠে—এমন না হ'লে—তবু কোথায় যেন মনটা খচ্ খচ্ করিয়া ওঠে। মাঝে মাঝে দেখেন ও বাড়ীর সমীরের জন্য দিনে দুইবার বড় বড় ডাক্তার আসিতেছে। মনে মনে ভাবেন, তাঁর যদি ওদের মতন টাকা থাকিত, বিনয়কে তাহা হইলে দুমুঠো অন্নের জন্য এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হইত না!

ওবাড়ীর সমীরের নাকি বিয়ে—বিনয়েরই এক পরিচিত মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটীর নাম স্বপ্না চৌধুরী। বিনয়ের মনে পড়িয়া যায় পুরোনো দিনের কথা। স্বপ্নাকে সে বেশ ভাল ভাবেই চিনিত। কলেজ লাইব্রেরীতে তাহাদের প্রথম আলাপ হয়—স্বপ্নাই প্রথম আলাপ করে। বিনয় চিরকালই কলেজে ভাল ছেলে ছিল। সে আলাপ, ক্রমশঃ নিবিড়তর হয়ে ওঠে। নিজেদের কথা, বিনয়ের আদর্শ, স্বপ্নার মনকেও দুলাইয়া দিত—আর স্বপ্না বিনয়ের মনে এক অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করিত। সে ভুলিয়া যাইত তাহার জীবনের দারিদ্র্য। বিনয় তাহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল—স্বপ্না অরাজী হয় নাই। কিন্তু জীবন কবিতা নয়। সে অতি বাস্তব। কঠ বাস্তবতার মধ্য দিয়া তাহার প্রকাশ, আদর্শ ভাবধারার মধ্যে নয়—সেকথা সেদিন তাহারা দুজনেই ভুলিয়াছিল। স্বপ্নার বাবা মা, আত্মীয়স্বজন সবাই ঘাড় নাড়িলেন, 'না, এ হতেই পারে না। চালচুলোহীন এক ছেলের সঙ্গে ব্যারিষ্টার এম্-সি-চৌধুরীর মেয়ের বিবাহ তাঁহার কাছে অসম্ভব ঠেকিল। মেয়েকে তাঁহারা কিছুদিনের জন্য কলিকাতার বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন। আজ সেই স্বপ্নার সঙ্গে সমীরের বিবাহ। বিনয় ম্লান হাসিয়া বলে, "জীবন-যুদ্ধে আমি পরাজিত হচ্ছি—এ পৃথিবী আমার জন্যে নয়।" তাহাকে অবসাদে আচ্ছন্ন করিয়া তুলে।

একদিন অফিস হইতে আসিতেই মা বলিলেন, 'হ্যাঁরে, শুনেছিস্ সমীরের বিয়ে যে পিছিয়ে গেল।' বিনয় একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কেন'? 'ডাক্তার সন্দেহ করছে সমীরের নাকি টি বি হয়েছে—ওর এখন কিছুদিন বিয়ে না করাই ভাল, তাই বিয়েটা এখন বন্ধ হয়ে গেল। তুই বা, একবার দেখা করে আয়। যতই হোক তোর সঙ্গে ত পড়েছে।' বিনয় একটু লজ্জিত হইল, সত্যি তাহার একদিন দেখা করা উচিত ছিল। এত কাছাকাছি থাকে। বিকেলের দিকে সে মিত্তিরদের বাড়ীর ফটকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীতে তখন সকলেই ব্যস্ত। সমীর বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বিলাসপুর যাইবে—তাহারই জন্য এই ব্যস্ততাপূর্ণ আয়োজন। বিনয় ভয়ে ভয়ে ফটকের ভেতর প্রবেশ করিল। সমীর তাহাকে চিনিতে পারিবে ত—? বিনয় ধীরে ধীরে সেই প্রাসাদোপম অট্টালিকার সম্মুখীন হইল। কাকে সে জিজ্ঞাসা করিবে সমীরের কথা। সবাই কর্ম্ম-চঞ্চল—সমীরের বিলাসপুর যাবার দিন কাল। বিনয় সমীরের ঘরের দিকে পা বাড়াইল। সিঁড়িতে উঠিতে যাইবে এমন সময়ে দেখে—স্বপ্না সিঁড়ি হইতে নামিতেছে। স্বপ্নাকে দেখিয়া বিনয় থমকিয়া দাঁড়াইল—সে এভাবে তাহাকে দেখিবে আশা করিতে পারে নাই। স্বপ্না সপ্রতিভভাবে বলিল—নমস্কার। বিনয় কোন রকমে দুইহাত তুলিয়া নমস্কার করিল। "সমীরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বুঝি, যান না ওপরে।" স্বপ্না তরতর করিয়া নীচে নামিয়া গেল। বিনয়ের নিজের অবসাদগ্রস্ত মন ও শরীর নিয়ে আর উঠিবার ইচ্ছা হইল না। সে আস্তে আস্তে নামিয়া আসিল। কি হইবে তাহার মত গরীবের সামান্য মৌখিক সামাজিক সহানুভূতিতে। সমীরকে দেখিবার অনেক লোক আছে কিন্তু তাহার······।

মা বলিলেন, "হ্যাঁরে, সমীরদের বাড়ী থেকে এসে অবধি তুই"

"অমন করে শুয়ে কেন, অসুখ বিসুখ করেনি ত?" তুই কিছুদিনের জন্যে আফিসে ছুটী নে। এরকম শরীর নিয়ে অফিস যাসনি। বিনয় তাঁহার কথার অযৌক্তিকতা বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকে। অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। জ্বর ছাড়ে না, শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। অফিসে ওপর হইতে তাগাদা আসে—কাজ ভাল হচ্ছে না। একদিন সত্যিই বিনয়কে অফিস হইতে অনেকদিনের জন্য ছুটী লইতে হয়। মা কাঁদিয়া বলেন, "ডাক্তার দেখা—।" বিনয় আর না বলিতে পারে না। ডাক্তার আসেন, পরীক্ষা করিয়া বলেন, "এত যক্ষ্মার লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।" আড়ালে পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীকে ডাকিয়া বলেন—"এ যক্ষ্মা সারবার নয়।" বিনয় ডাক্তারের মুখ দেখিয়া ব্যাপারটা অনুমান করে, তাহার চোখের দুই ফোঁটা জল বালিশের উপর পড়িল। একদিন সকালে বিনয় তাহার বাড়ীর সামনে গাড়ী থামার শব্দ শুনিয়া মাকে ডাকিয়া কহিল—"মা দেখত কে এলেন?" কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে ঘরে ঢুকিল তাহাকে বিনয় খুব বেশী করিয়াই চিনিত—সে স্বপ্না। তাহাকে আজ সকালে ফিকে বেনারসীর সঙ্গে খুব সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার হাতে ছিল কিছু আঙ্গুর আপেল। আজ সকালেই তাহাকে দেখিয়াই বিনয়ের মনটা খুশীতে ভরিয়া গেল। স্বপ্নাকে ইঙ্গিতে বিছানায় বসিতে বারণ করিয়াই ভাঙ্গা চেয়ারটা দেখাইয়া দিল। স্বপ্না বিনয়ের দিকে চাহিয়া কহিল—'ইস্! এত শরীর খারাপ হয়েছে তোমার—আমি তো জানতুম না!' স্বপ্না ওষুধগুলো দেখিতে লাগিল। বলিল, "কোন ডাক্তার দেখছেন আপনাকে এখন?" বিনয় বলিল, "এখন আর কেউ দেখেন না, মাঝে একবার ডাক্তার গুহ এসেছিলেন, তিনিই ওষুধ prescribe করে দিয়ে গেছেন।" স্বপ্না বলিল, "না, না, এতে কিছু হবেনা। এ অসুখে পথ্য আর ওষুধটাই সবচেয়ে বেশী দরকার। আপনার সেই দুটোরই সব চেয়ে বেশী অভাব দেখতে পাচ্ছি। সমীরের suspected T. B. হয়েছে—খুবই care নেওয়া হচ্ছে তার জন্যে, এখান থেকে একজন ডাক্তার নিয়ে গেছে। food আর medicine প্রত্যেক weekএ ট্রেনে করে যাচ্ছে। দিনাজপুরে ডাব পাওয়া যায়না, ডাবটা পর্য্যন্ত এখান থেকে পাঠাতে হয়। আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে এখন নাকি সে অনেকটা ভাল আছে। অত সুন্দর শরীর কি করে যে এ রোগ ওর মধ্যে প্রবেশ করল জানিনা।" সমীরের কথা বলিতে বলিতে স্বপ্না উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে স্বপ্না বিনয়ের কাছ হইতে শুভ কামনা জানাইয়া বিদায় লইল।

কয়েক মাস পরের কথা—সমীর ফিরিয়া আসিতেছে দিনাজপুর হইতে—মিত্তিরদের বাড়ী তাহারই আয়োজন চলিতেছে বিপুলভাবে। ভাল করিয়া দেখা গিয়াছে যা রোগ সন্দেহ করা হইয়াছিল সে রোগ সমীরের নয়। ৭-৩০ মিনিটে আস্তে আস্তে ট্রেনটা হাওড়া ষ্টেশনে থামিল। একটা ফার্ষ্ট ক্লাশ compartment হইতে সমীর নামিল। তাহার চেহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। সে কোন কালেই সুশ্রী ছিলনা—আজ যেন তাহাকে দীর্ঘ প্রবাসের পর অধিকতর সুশ্রী দেখাইতেছিল। স্বপ্নার ছোট বোন আগাইয়া আসিয়া তাহাকে ফুলের মালা দিয়া অভিনন্দন জানাইল। স্বপ্না আস্তে আস্তে সমীরের হাতখানি ধরিল। সমীর কানে কানে বলিল, 'আর ত আমার রোগ নেই, যার দোহাই দিয়ে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে।' স্বপ্না ধীরে ধীরে তার আরক্ত চোখ সমীরের দিকে তুলিয়া ধরিল।

বিনয় মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ওদের বাড়ী এত গোলমাল কিসের?" মা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার জীবন যাত্রার একমাত্র সম্বল, তাঁহার পরকাল ইহকালের একমাত্র পাথেয় আজ হারাইতে বসিয়াছেন। যে চিন্তা তিনি সব সময়ে মন হইতে তাড়াইতে চান সেই চিন্তাই আজ তাঁহাকে সবচেয়ে বেশী করিয়া পাইয়া বসিয়াছে। তিনি বলি বলি করিয়াও সমীরের নীরোগ হইয়া ফিরিয়া আসার খবরটা বিনয়ের কাছে বলিতে পারিলেন না। কি যেন একটা বাধা তিনি বোধ করিতেছিলেন। আজ সে খবরটা তিনি আর চাপিতে পারিলেন না। বলিলেন—"আজ সমীরের বিয়ের আশীর্ব্বাদ—তাইত জজে-ওদের বাড়ীতে আজ উৎসব। লোকজন খাওয়ান হচ্ছে।" মার চোখে অশ্রু আর্দ্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিনয় বুঝিল তাহার মায়ের আজ সব চেয়ে বেশী ব্যথা কোথায়! কিন্তু মার দুঃখ আজ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিলনা, একজনও যে এই মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচিয়া ফিরিয়াছে যাহাতে আজ তাহার আনন্দ। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—'মা ওদের বাড়ীর বধুয়াকে একবার ডাকত।' বধুয়া পাশের বাড়ীর চাকর। দায়ে দরকারে তাহাদের বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম করিয়া দেয়। মা জিজ্ঞাসাকুল দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাহিলেন। বিনয় বলিল, "দাওনা ডেকে তুমি।" বধুয়া আসিল। তাহাকে বিনয় বিছানার তলা থেকে একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "যাও মোড়ের দোকান থেকে একটা মালা আর তোড়া কিনে নিয়ে এস।" বধুয়া চলিয়া গেল। বিনয় ভাবিতে লাগিল তাহার জীবনের ইতিহাস। তাহার জীবন আজ ভবিষ্যতের শেষই হারাইয়া ফেলিয়াছে। পড়িয়া আছে শুধু অতীত—একটা হাহাকার আর মরুভূমি।

বধুয়া মালা ও তোড়া কিনিয়া আনিল। একটা ছোট কাগজে দুর্ব্বল হাতে বিনয় লিখিল "স্বপ্না ও সমীরের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিনে আন্তরিক অভিনন্দন।" আজ বিনয়ের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে আর তাহার থাকিবার দরকার নাই। আর কিছুদিন পরে হয়ত তাহার দেহের প্রতিটি কণা কোথায় মিলাইয়া যাইবে কেউ তাহার কথা মনে রাখিবার দরকার মনে করিবেনা—শুধু তাহার মায়ের ক্ষীণ ক্রন্দন হয়ত গুমরিয়া উঠিয়া সকলকে বিনয়ের কথা মনে করাইয়া দিবে······।

তাহার পরের ইতিহাস খুব বেশী নয়। বিনয়ের জীবনে সমাপ্তির রেখা পড়ল। সেদিন সন্ধ্যায় মিত্তিরদের বাড়ী উৎসবের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে—সমীর আজ স্বপ্নাকে বধূরূপে ঘরে আনিতেছে। তাহার উৎসবের বাজনা, সদ্য পুত্রহারা বিধবা মায়ের ক্রন্দনকে ছাপাইয়া উঠিল—পাড়ার লোকের কানে সে ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছাইল না।

দেশ-বিদেশের লৌহ-প্রস্তর

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

লৌহ-প্রস্তরের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব প্রবন্ধে কেবল ভারতবর্ষের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের হিসাব লইতে গেলে অপরাপর দেশের কিছু সংবাদ রাখা প্রয়োজন। গমনাগমনের সুবিধা হওয়ার ফলে এখন কোনও এক দেশের শিল্পবাণিজ্য স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না; অপর দেশের সহিত প্রতিযোগিতা থাকার ফলে এখন সকল দেশেরই শিল্প পরস্পরে বহু বিস্তর জড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহাদেরও সংবাদ না রাখিলে আর চলে না।

বিভিন্ন দেশের মাক্ষিক

পৃথিবীর সমস্ত মুখ্য বা জাত মাক্ষিকের পরিমাণ ৫,৭৮১ কোটি ২০ লক্ষ টন বলিয়া হিসাব করা হয়। ইহার মধ্যে আমেরিকা (যুক্ত রাষ্ট্র) সর্বপ্রধান; পরে ফ্রান্স, রুশ-সাম্রাজ্য, ইংলণ্ড, সুইডেন প্রভৃতির স্থান; প্রধান চারটি দেশের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।—

আমেরিকা	১,০৪৪	কোটি	২০	লক্ষ	টন
ফ্রান্স	৮১৩	কোটি	৪০	লক্ষ	"
ইংলণ্ড	৪৯৭	কোটি	০	লক্ষ	"
রুশ সাম্রাজ্য	২০৫	কোটি	৭০	লক্ষ	"

সমস্ত প্রধান দেশের হিসাব নিম্নলিখিত তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে।

বিভিন্ন দেশে মুখ্য ও গৌণ মাক্ষিকের ভাণ্ডার (১)

মিলিয়ন (দশ লক্ষ) টন

সমগ্র পৃথিবী—৫৭,৮১২

আমেরিকা	১০,৪৪২	ইটালী	১৮
জার্মাণী	৩,৩২৭	লুক্সেমবুর্গ	২৭০
রুশ সাম্রাজ্য	২,০৫৭	সুইডেন	২,২৩০
ইংলণ্ড	৪,৯৭০	ভারতবর্ষ	৩,৩২৬
ফ্রান্স	৮,১৩৪	নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	৪,০০০
জাপান ও কোরিয়া	৮৫	ব্রেজিল	৭,০০০
বেলজিয়ম	৭০	কিউবা	৩,১৫৯

অপরাপর—৮,৭২১

আমেরিকা

মাক্ষিক গৌরবে আমেরিকা জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছে অর্থাৎ ১,০৪৪ কোটি টন; তন্মধ্যে লেক সুপিরিয়র অঞ্চল (Lake Superior Region) অর্থাৎ মিনেসোটা, মিশিগান ও উইস্কন্সিন প্রধান। এই তিনটী প্রদেশের মধ্যে এক মিনেসোটা শতকরা ৮১ ভাগ (১৯৩৯) এবং মিশিগান ১৮ ভাগ সরবরাহ করিয়াছে। মিনেসোটার মধ্যে মেসাবী শ্রেণী (Mesabi Range) বিশেষ উল্লেখযোগ্য (২)। তৎপরে কুইনা (the Cuyuna) ও ভারমিলিয়ন (the Vermillion Range) স্থানলাভ করিয়াছে। মিশিগানের মধ্যে মার্কেট (the Marquette), মেনোমিনী (the Menominee) ও গোজেবিক বা গোজেবিক্ (the Gogebic) প্রধান।

লেক সুপিরিয়র অঞ্চল ছাড়িয়া দিলে আলাবামা, পেন্সিলভানিয়া ও ওয়াইয়োমিং বহু পরিমাণ "প্রস্তর" ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আলাবামার মধ্যে জেফারসন কাউণ্টিতে বারমিংহামের নিকট "লাল পাহাড়" (Red Mountain) প্রধান।

আমেরিকার প্রধান খনিগুলির নিকট হইতে কয়লা অতিশয় দূরে অবস্থিত; ইহা আমেরিকার এক বিশেষ অসুবিধা। কিন্তু বড় হ্রদের সন্নিকটে মাক্ষিক থাকায় জলপথে কয়লা লইয়া আসা বা মাক্ষিক লইয়া যাওয়ার সুবিধার জন্য শিল্পের উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

ফ্রান্স

আমেরিকার পরেই ফ্রান্সের স্থান এবং জাত মাক্ষিকের পরিমাণ ৭০০ কোটি টন ধরা হয়। ইহার সহিত অনুমিত বা গৌণ মাক্ষিক আরও ৪০০ কোটি টন যোগ দেওয়া যাইতে পারে। ফ্রান্সের পূর্বদিক লোরেন (Lorraine) অঞ্চলে, মোসেল (Moselle) নদীর অববাহিকা প্রদেশে নান্সি ও লংউই (Nancy and Longwy) অঞ্চলে প্রধান ক্ষেত্র অবস্থিত হইলেও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে (Normandy, Britanny and Anjou) এবং দক্ষিণস্থিত পর্বতমালায় (Pyrenees) বহু মাক্ষিক আছে।(৩)

লাক্সেমবুর্গ প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে জাত বা প্রকাশ্য মাক্ষিকের পরিমাণ ২৭ কোটি টন বলিয়া ধরা হয়। ভূতত্ত্ববিদেরা মনে করেন ইহা লোরেনে অবস্থিত বিশেষ গুণশালী মাক্ষিক স্তরের একাংশ মাত্র।

যুক্ত রাজ্য (U. K.)

সমগ্র যুক্ত রাজ্যের (ইংলণ্ডের) মাক্ষিকের বর্তমান পরিমাণ ৪৯৭ কোটি টন হিসাব করা হইয়াছে। বহুদিন হইতে ইংলণ্ডে লৌহ শিল্প বিস্তারলাভ করায়, মাক্ষিকের পূর্ব পরিমাণ অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। লিঙ্কন্শায়ার (Lincolnshire), ইয়র্কশায়ার (Yorkshire), লিস্টারশায়ার (Leicestershire) অক্সফোর্ডশায়ার (Oxfordshire), ক্লিভল্যাণ্ড হিল (Cleveland Hills), রাটল্যাণ্ড (Rutland) প্রভৃতি কয়েকটী স্থান হইতে মাক্ষিকের অধিকাংশ অংশ উৎখাত হইয়া থাকে। লৌহ মাক্ষিক, কয়লা এবং সমুদ্রতীর পরস্পরের সন্নিকট হওয়ায় একদিন লৌহ শিল্পে ইংলণ্ডের বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। এখন ক্রমেই অসুবিধা দাঁড়াইতেছে।(৪) ইংলণ্ডকে কালার খনির মধ্যে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত কম লৌহযুক্ত মাক্ষিক ব্যবহার করিতে হইতেছে।

---

(১) U. S. Tariff Commission Iron & Steel—Report No. 128 (1938) p. 331.

(২) ১৯৩৯ সালে আমেরিকার যে কয়টী খনির প্রত্যেকটি হইতে দশ লক্ষ টনেরও অধিক মাক্ষিক উৎখাত হইয়াছে তাহার মধ্যে সাতটী মিনেসোটা (সব কয়টি মেসাবী পর্বতমালায়) এবং আলাবামা ও পেন্সিলভানিয়া প্রত্যেকের হিসাবে একটী করিয়া পড়ে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মাক্ষিকপ্রদ খনি মিনেসোটার (Hull-Rust-Burt Sellers group; পরে আলাবামার Red Mountain group নির্দিষ্ট হইয়াছে।

উপরোক্ত তথ্য প্রধানতঃ Minerals Year Book—U. S. Dept. of the Interior, Bureau of Mines (1940) হইতে সংগৃহীত।

(৩) U. S, Tariff Commission Report (1938) op. cit. p. 218.

(৪) "The ore of Cumberland and the Furness district of Lancashire is a red hematite richer in iron, and

হয়ত আরও কয়েক বৎসর পরে ইহাই একমাত্র নির্ভরস্থল হইয়া দাঁড়াইবে।

রুশ গণতন্ত্র (U. S. S. R.)

বর্ত্তমান লৌহ খনিজের সংস্থান ও লৌহশিল্পের হিসাব দেখিতে গেলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরেই রুশ গণতন্ত্রের স্থান। ১৯২৬ সালের হিসাবে রুশ সাম্রাজ্যে ২০৮ কোটী টন সাক্ষাৎ ও ৬০০ কোটী টন পরোক্ষ বা অনুমিত লৌহ খনিজ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কৃষ্ণ সাগরের নিকটস্থ ক্রিভয় রগ (Krivoi Rog) স্থিত খনিজে শতকরা ৬৮ ভাগ এবং উরাল পর্ব্বতশ্রেণীর খনিজে শতকরা ২২ হইতে ৬৫ ভাগ লৌহ আছে।(৫) ইহা ছাড়া দক্ষিণে (ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া) এবং মধ্য প্রদেশে (মস্কো অঞ্চলে) ও সাইবিরিয়ায় প্রভৃতি খনিজের অবস্থান রহিয়াছে।

সুইডেন

খনিজের গুণ হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে সুইডেনের নাম সর্ব্বোচ্চে। ইহাতে লৌহের ভাগ শতকরা ষাট বা ততোধিক। তাহা ছাড়া সুইডেনে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফসফরাস খনিজ বা ম্যাগনেটাইটএর অবস্থান বেশী। প্রত্যক্ষ ১২০ কোটী এবং গৌণ খনিজ ভাণ্ডার ৮০ কোটী টন হিসাব ধরা হয়। উত্তর ভাগের ক্ষেত্র "ল্যাপল্যাণ্ড" নামে পরিচিত এবং তাহার মধ্যে জগৎপ্রসিদ্ধ কিরুণাভারা (Kirunavara) খনিজ অবস্থিত। সুইডেনবাসীরা ইহাকে খনিজের পাহাড় ("a mountain of ore)" বলিয়াছেন।(৬) ইহা ছাড়া লুসাভারা (Luossavara) এবং টুলুভারা (Tuolluvara) নামে আরও দুইটী খনি ইহার অন্তর্ভুক্ত। কিরুণাভারা-গেলিভারা (Kirunavara Gellivara) খনিজের লৌহের ভাগ শতকরা ৬০ হইতে ৭০। এই খনিজ পূর্ব্বে লুলিয়া (Lulea) এবং পশ্চিমে নরওয়ের নারভিক হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি লৌহ শিল্পে সমৃদ্ধ দেশগুলি সুইডেনের খনিজের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে।

সুইডেনের মধ্যভাগে অবস্থিত লৌহ খনিজ স্তর বার্গস্ল্যাগেন (Bergslagen) এর মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রাঞ্জেসবার্গ (Grangesberg) ও ড্যানেমোরা (Dannemora) খনি অবস্থিত।

নরওয়ে

নার্ভিক হইতে উৎকৃষ্ট লৌহ-খনিজ চালান যায় বলিয়া অনেকে মনে করেন নরওয়েতে খুব ভাল এবং প্রচুর খনিজ পাওয়া যায়। সে ধারণা কতক পরিমাণে ভুল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। নরওয়ের ট্রমসো (Tromso) প্রদেশে রেনন ফোর্ড (Ranon Fjord)এর নিকট ডাণ্ডারল্যাণ্ডে প্রচুর খনিজ অবস্থিত ; কিন্তু ইহাতে লৌহের ভাগ বেশী নহে। তাহা ছাড়া অন্যান্য স্থানেও যে খনিজ পাওয়া যায়—তাহা গুণ হিসাবে আরও হীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ খনিজ সমৃদ্ধ দেশের মধ্যে নরওয়েকে ধরা হয় না।

স্পেন

স্পেনের লৌহখনিজ ভাণ্ডার অতি বিরাট ("Immense quantity") ; ইহা বাস্ক (Basque) বিশেষতঃ বিস্কে (Biscay or Viscaya) প্রদেশে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সান্তান্দার (Santader), মুর্সিয়া (Murcia), আলমেরিয়া (Almeria) ওভিয়েডো (Oviedo), সেভিল্ (Seville) প্রভৃতি অংশে প্রচুর খনিজ উৎখাত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বিলবাও (Bilbao) ও কার্টেজেনা (Cartagena) দিয়া বহু অংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়।

জার্ম্মাণী

জার্ম্মাণ লৌহ শিল্পে খুব সমৃদ্ধ, খনিজ হিসাবে ঠিক তত নহে। প্রত্যক্ষ বা জ্ঞাত খনিজের পরিমাণ ১০০ কোটী ৮০ লক্ষ টন বলিয়া হিসাব করা হয়। সাইজারল্যাণ্ড (Siegerland), পিয়েন-সালজগিটার (Peine-salzgitter), ল্যাহেরিয়া ও লাম-ডিল্ (Lalm-Dill) প্রভৃতি জেলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ খনিগুলি অবস্থিত এবং এই সকল স্থান হইতেই মোটামুটি খনিজ সরবরাহ হইয়া থাকে। সম্প্রতি কবলেন্স্ (Coblenz)-এর দক্ষিণে আইডারওয়াল্ড (Iderwald) অঞ্চলে খনি হইতে প্রচুর খনিজ উৎখাত হইতেছে।

অষ্ট্রিয়া

অষ্ট্রিয়ার দুইটী প্রধান লৌহ খনিজক্ষেত্র জানা আছে। তন্মধ্যে ষ্টিরিয়া (Styria) তে এরজবার্গ (Erzberg) খুব প্রধান এবং তৎপরে কারিন্থিয়াতে (Carinthia) হুটেনবার্গ (Huttenberg) খনির স্থান। সাধারণতঃ জ্ঞাত ২০ কোটী ২০ লক্ষ টন খনিজের মধ্যে এক এরজবার্গের অংশে ২২ কোটী ৮ লক্ষ এবং হুটেনবার্গের অংশে ১ কোটী ৫০ লক্ষ টন ধরা হয়।

বেলজিয়ম ও ইটালী

ইউরোপের মধ্যে আরও দুইটী দেশের লৌহ শিল্প সম্বন্ধে আলোচনার বিষয় হইলেও বেলজিয়মের লৌহ খনিজের অবস্থান মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে। কম্পিনের (Compine) ক্ষুদ্রাকৃতির নিম্নগুণ সম্পন্ন খনিজ ছাড়া অন্য খনিজের স্তর আছে, কিন্তু তাহা মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে। (লুক্সেমবুর্গ ও লোরেন হইতে) আমদানী করা খনিজ দ্বারা বেলজিয়মের গুণবিশিষ্ট প্রচুর কয়লা সাহায্যে বেলজিয়মের সমৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

ইটালীর কথা কিছু স্বতন্ত্র। এলবা (Elba)তে উৎকৃষ্ট খনিজের স্তর আছে। তাহা ছাড়া সার্ডিনিয়ায় কিছু খনিজ পাওয়া যায়। কিন্তু ইটালীতে কয়লা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

জাপান ও কোরিয়া

জগতের বাজারে জাপান লৌহ সমৃদ্ধিতে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাপানের খনিজের পরিমাণ তাহার শিল্প প্রসারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। শিমোনোসেকি মোজকের বিশ মাইলের মধ্যে কয়লা ও লৌহ স্তরের অবস্থান রহিয়াছে। কিন্তু জাপান প্রধানতঃ মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও মালয় হইতে খনিজ আনিয়া কারখানা চালায়। কোরিয়ার

---

containing very little phosphorus and forming the only true Bessemer ores obtained in this country—Stamp, D. Commercial Geography (1937) p. 306.

(৫) Russia is particularly well provided with iron. There are extensive iron deposits in the Kuznetsk Basin, and the Kursk province has one of the richest iron areas of Europe. The rich deposits of iron ore in South Russia, in the Urals, in Central Russia, and in the Kirghis steppes render the future of iron and steel industry very promising. The high quality of the famous Krivoi Rog with a content of iron of 62 per cent, is well known.—Pitman's Commercial Atlas (1932) p. 98, Col II

(৬) Sweden Year Book (1936) p. 8

প্রকাণ্ড খনিজের পরিমাণ ৮ কোটী টন বলিয়া ধারণা; তাহাতে শতকরা ৫০ ভাগ লৌহ আছে।

মাঞ্চুরিয়া

মাঞ্চুরিয়ার খনিজ অনুমান ৭০ কোটি টন এবং তাহাতে শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ ভাগ লৌহ আছে; ইহার মধ্যে আনশান্ (Anshan deposit) অঞ্চলের ভূগর্ভে অন্ততঃ ৪০ কোটী টন খনিজ আছে।

চীন

ভারতের মত অবস্থাপ্রাপ্ত মহাচীনের কথা একবার স্মরণ করা কর্তব্য। তাহার মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া জাপানীদের করায়ত্ত, সুতরাং খনিজের দুইটী বড় প্রদেশ তাহার হস্তচ্যুত। তথাপি চীনে এখনও প্রচুর খনিজ রহিয়াছে। ১৯৩৮ সালের হিসাবে চীনের খনিজের পরিমাণ ১০০ কোটী টন ধরা হইয়াছে, তাহার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ লিয়াওনিং (Liaoning) প্রদেশে। বাকী অংশ চারহার (Charhar) প্রদেশের হুয়ানহুয়া-লুংয়েন (Hsuanhua-Lungyen) অঞ্চলে এবং ইয়াংসি (Yangtze) উপত্যকায় প্রধানতঃ হুপে (Hupeh) এবং দক্ষিণ আনহুই (Southern Anhwei) প্রদেশে। হোপেই (Hopei), শানটুং (Shangtung), কিয়াংসু (Kiangsu), কিয়াংসি (Kiangsi) প্রভৃতি স্থানেও খনিজের সন্ধান মিলিতেছে।(৭)

মালয়

মালয়ের খনিজ অন্যান্য বহু দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (শতকরা ৬০ ভাগ লৌহ); কিন্তু কয়লা না থাকায় বিশেষ অসুবিধা। জহুর রাজ্য ও ট্রেংগানু (Trengganu) অঞ্চলে প্রচুর খনিজের স্তর রহিয়াছে। তাহার মধ্যে ট্রেংগানু জহুর অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ। কেলান্টান (Kelantan) প্রদেশ একদিন লৌহ খনিজ লইয়া বিশেষ পরিচয় লাভ করিবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ফিলিপাইন

সাধারণের ধারণা নাই যে ফিলিপাইন দ্বীপে প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট খনিজ আছে। জ্ঞাত বা প্রকাশ্য খনিজ ৮০ কোটী টন এবং তাহাতে কমবেশ ৪৭ হইতে ৬৭ ভাগ লৌহ আছে। সুরিগাও (Soriago) প্রদেশ এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী। লারাপ উপদ্বীপ (Larap Peninsula) কালাম্বেইউঙ্গান (Calambayungan) দ্বীপ এবং কামারিন নর্টি (Camarines Norte) অঞ্চলে প্রচুর খনিজের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র

যতদূর হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, তাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততঃ ১০০ কোটী টন এবং অনুমিত আরও ২০০ কোটী টন খনিজ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে ট্রান্সভালের (Transvaal) স্তরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। জ্ঞাত ভাণ্ডারের মধ্যে ১০ কোটী টন পোচেফস্‌ক-এ (Potchefsbock) এবং ৪০ কোটী টন প্রিটোরিয়ায় (Pretoria) অবস্থিত।

কানাডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, মেক্সিকো ও আর্জেণ্টাইন

কানাডার অন্টারিও, কুইবেক, ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও সেণ্ট লরেন্স উপত্যকায়; নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের নানা স্থানে; মেক্সিকোর সেরোডেল মার্কেডো (Cerro del Mercado), লা ট্রুকাস (Las Truchas) ও এল ম্যামি (El Mamey) অঞ্চলে; আর্জেণ্টাইনের কর্ডোবা (Corduba), সান্টিয়াগো ডেল এষ্ট্রো (Santiago del Estro) এবং টুকুমান (Tucuman) প্রদেশে বহু খনিজ অবস্থিত। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন পৃথিবীর সমস্ত হেমাটাইট প্রস্তরের এক তৃতীয়াংশ নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে অবস্থিত।

ব্রেজিল

ব্রেজিল ইহা হইতে একটু স্বতন্ত্র; এখানে ৭০০ কোটী টন গুণ সম্পন্ন খনিজের অবস্থান অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর খনিজের ভাণ্ডারের এক অষ্টমাংশ নিহিত আছে বলিয়া মনে করা হয়। ইহার প্রধান কেন্দ্র মিনাস জেরাস্ (Minas Geraes); তৎপরেই বাহিয়া (Bahia) ও মাট্টো গ্রাসো (Matto Grasso) প্রদেশ স্থান লাভ করিয়াছে।(৮) মিনাস জেরাসের খনিজ প্রধানতঃ ম্যাগনেটাইট ও হেমাটাইট এবং ইহাতে শতকরা অন্ততঃ ৬০ ভাগ লৌহ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্ত্তমানে এই অঞ্চলে ইটাবিরা (Itabira) খনিতে কাজ চলিতেছে।

অপরাপর কয়েকটী দেশেও অনুরূপ খনিজ রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, কিন্তু কোনও না কোনও এক অসুবিধার জন্য তাহার সম্যক্ ব্যবহার হইতেছে না। যে সকল দেশের খনিজ ব্যবহারের অসুবিধা আছে, বর্ত্তমানে তাহাদের ভাণ্ডার খুব বড় হইলেও, তালিকায় তাহাদের নাম নীচে দেওয়া হয়।

পৃথিবীর মোট খনিজের হিসাব করিবার সময় সাধারণতঃ Olin R. Kuhn কর্তৃক ১৯২৬ সালে ১৭ই জুলাই তারিখে (৮৯ পৃঃ) "Engineering and Mining Journal"এ লিখিত "World's Iron Ore Reserve" প্রবন্ধের উপর নির্ভর করা হয়। তাহার পর অন্যান্য স্তরের বহু সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং আরও সম্ভাবনা রহিয়াছে; সুতরাং পৃথিবীর লৌহ ভাণ্ডার আমাদের জ্ঞানগম্য কালের পক্ষে অফুরন্ত বলিয়া মনে করা চলে।

---

(৭) China Year Book 1939, p. 471 Col. I·

(৮) U. S. Tariff Commission Report, op. cit. p. 275.

মানভূম জেলায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ

শ্রীভবতোষ মজুমদার

মানভূম জেলার অন্তর্গত পঞ্চকোট কাশীপুর থানার অধীন সোনাথলী নামক গ্রামের মহাত্মা শ্রীশ্রীমনোহর ঠাকুর ক্ষ্যাপা বাবার অতি সংক্ষিপ্ত একখানি জীবনী পাঠ করিয়া আমরা কয়েকজন তথায় যাই এবং মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিয়া আনন্দ পাই। পরদিন প্রাতে আমরা ঠাকুরের সিদ্ধপীঠ খোপমুড়ীর শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীমঠের মন্দির দর্শনে রওনা হই। এই মন্দিরে ঠাকুর বার বৎসর কাল কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভ করিয়া 'ক্ষ্যাপা' নাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

মন্দিরের পথে কয়েকখানি প্রস্তর ফলকে খোদিত ঢাল ও তরোয়ার হস্তে দণ্ডায়মান যোদ্ধা মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যে, ভারতীয় ভাস্কর এযুগে অবিকৃতভাবে মনুষ্য মূর্ত্তি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। ভারহুত, বুদ্ধগয়া এবং সাঁচীর দ্বিতীয় স্তূপবেদিকা গাত্রে, পাটনায় এবং সারনাথে প্রাপ্ত ভগ্নাবশেষে এই শিল্পের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। সাঁচীর দ্বিতীয় স্তূপের বেদিকার পদ্মছবি এবং ভারহুত স্তূপের বেদিকার গাত্রের লতা এই জাতীয় শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ, কিন্তু মনুষ্য মূর্ত্তিগুলিতে কমনীয় ভাব

নাই, যেন প্রস্তর গাত্রে কোন মনুষ্য মূর্ত্তির ছায়া মাত্র পতিত হইয়াছে। ক্রোশজুড়ীর মন্দিরের গাত্রে খোদাই মূর্ত্তিগুলি প্রত্যক্ষ মানবাকৃতির প্রতিকৃতি নহে। যে ছায়া মনশ্চক্ষুর চিত্রপটে বিদ্যমান থাকিয়া যায় (memory picture) এইরূপ মূর্ত্তি তাহারই অনুরূপ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। মনুষ্য মূর্ত্তি চিত্রণে শিল্পী সিদ্ধহস্ত না হইলেও, তাহার সৌন্দর্য্য জ্ঞানের পরিচয় বর্ত্তমান। ক্রোশজুড়ীর খোদা মূর্ত্তির হস্তে নাটকীয় ভাবে ঢাল ও তলোয়ার দিয়া তাহার গতিশীলতা সুস্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। এই যুগের শিল্পকে ভারতের স্বাধীনতার জাতীয় শিল্প বলা যাইতে পারে। মন্দির-প্রাঙ্গণে পূর্ব্বোক্ত সিংহ মূর্ত্তিও এই যুগের শিল্প নিদর্শন। শিল্পের প্রাথমিক অবস্থার আড়ষ্টভাব এবং ইহার গড়ন এমন অস্বাভাবিক হইয়াছে যেন ইহা একখানি প্রাণহীন প্রস্তর খণ্ড মাত্র।

প্রবেশ দ্বারের বামপার্শ্বের কুলুঙ্গিতে উপবিষ্ট অবলোকিতেশ্বরের ভগ্ন মূর্ত্তী সম্ভবতঃ নিকটস্থ কোন বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ হইতে আনীত। বর্ত্তমানকালে মূর্ত্তী গণেশরূপে পূজিত হন। মন্দিরের দ্বারদেশে রক্ষিত প্রস্তর নির্ম্মিত ভগ্ন দ্বার-শাখা (door-jamb) দুইখানি গুপ্ত যুগের অবসান কালের শিল্প নিদর্শন। ইহার অলঙ্কার বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহা লতা, পুষ্প ও নারীমূর্ত্তির আকারে ভূষিত; নক্সাগুলি (reliefs) অতি পরিষ্কার ভাবে খোদিত থাকায় উহাদিগের সৌন্দর্য্য অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই যুগে ভারতবাসীগণের চিন্তাশক্তি ও প্রতিভা এরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের কার্য্যকুশলতা এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে তেমন আর এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। যে সকল কারণে জাতীয় জীবনের এমন উৎকর্ষ সাধিত হয় সে কারণগুলি আমরা নিশ্চিতরূপে অবগত নহি। গ্রীস ও ইতালীতে তদনুরূপ উৎকর্ষের কারণগুলিও আমরা বিদিত নহি। অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত মিলন এবং ভাবের আদান প্রদান ইহার কারণ হইতে পারে। সেই সময়ে পারস্যের সাসানীয় (Sassanid) সাম্রাজ্য এবং চীন ও রোমক সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বৈদেশিক জাতির আক্রমণ এবং উহারা দেশের উপর যে হূণ দুর্দ্দম্য স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা পরোক্ষভাবে এই জাতীয় উৎকর্ষের কারণ হইতে পারে। এই যুগে ভারতের মনঃশক্তির যে যথার্থই উন্মেষ হইয়াছিল তাহা সে সময়ের বিদ্যা ও চিন্তার নিদর্শন মাত্রেই অনুভব করা যায়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্র শিল্পে সর্ব্বত্রই সমভাবে এই নূতন চিন্তাশীলতা প্রতিভাত। ক্রোশজুড়ীর দ্বার-শাখার অলঙ্কার গুপ্তযুগ অলঙ্করণের একটী উদাহরণ।

গর্ভগৃহে বিশাল শিবলিঙ্গ বিরাজমান। ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত সাঁচী পাহাড়ের গুপ্ত মন্দিরের ন্যায় এই ভগ্ন মন্দিরটী কাল পাথরে নির্ম্মিত। মন্দিরের উর্দ্ধভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে এই স্থান খনন করিলে মন্দিরের ভিত্তি-ভূমির নক্সা, প্রদক্ষিণ পথ, মণ্ডপের প্রাঙ্গণ এবং প্রচুর স্থাপত্য ও শিল্প নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী ছোট ঘরে দুইটী প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। বর্ত্তমানকালে এই মূর্ত্তি দুইটী মহিষমর্দ্দিনী ও কালীরূপে পূজিতা হন। একটিতে বৃষোপরি দণ্ডায়মান অষ্টভুজ সমন্বিত ত্রিনেত্র বিশিষ্ট ভগ্ন নটরাজ বিরাজমান। তনুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ বিষয়ে তাহারা এমন একটী আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন যাহা প্রাচীন শিল্পে সুপরিচিত গঠনের অনুরূপ। প্রস্তর গাত্রে খোদিত (relief) নটরাজের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ বিষয়েও শিল্পীর দক্ষতা সমভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তরখানিতে একটী শায়িত মনুষ্য মূর্ত্তির উপরে প্রত্যালীঢ়পদে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ পুরুষ মূর্ত্তি—বাম পদ মনুষ্যটীর মস্তকে স্থাপিত, আর অপরটী শরীরের শেষপ্রান্তে ন্যস্ত। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে গদা ও সম্ভবতঃ অসি বা কার্ম্মুক, বাম হস্তদ্বয়ে নাগপাশ ও নরমুণ্ড, গলায় মুণ্ডমালা শোভিত এবং স্কন্ধে সর্পাভরণ। ত্রিনেত্র বিশিষ্ট, মস্তকে মুকুট। এটী কালভৈরবের মূর্ত্তি। গুপ্ত যুগের অবসানে বৌদ্ধ ও হিন্দুমূর্ত্তি শিল্পে কেমন একটী নূতন ভাবের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্রোশজুড়ীর কালভৈরবের মূর্ত্তিতে যে রোষাদি ভাবনিচয় প্রকাশের অধিকতর চেষ্টা হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়। আশা ও শঙ্কা, জীবন ও মরণ, ভালবাসা ও ঘৃণা এই সব ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে মধ্যযুগের হিন্দু-মূর্ত্তিগুলি উদ্ভাসিত। মধ্যযুগের শিল্পী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রেখাপাত দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই; পরন্তু মূর্ত্তির অস্বাভাবিক আকার অন্ধকার গুহার ক্ষীণ আলো ও গভীর ছায়ায় স্থাপিত করিয়া ভৈরব পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তির সহযোগিতায় ভাবব্যঞ্জনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহাদের শিল্পে কামক্রোধাদি ভাবসম্পদের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। মধ্যযুগের মূর্ত্তিতে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন মধ্যযুগের শিল্পে আমাদিগের জাতীয় শিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই যুগের শিল্পে গুপ্ত শিল্পের জ্ঞানালোক নির্ব্বাণোন্মুখ। ইহা জাতীয় জীবনের অবনতির চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। জ্ঞানের অভাবে সম্যক্ দৃষ্টির অভাব ঘটে, এই সম্যক্ দৃষ্টির অভাবে মূর্ত্তিগুলি প্রাণহীন হইয়াছে। ক্রোশজুড়ীর কালভৈরবের মূর্ত্তি যেন কেবল মন্দিরের শোভাবর্দ্ধনের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

লোক পরম্পরায় শুনিলাম মন্দিরটী মানরাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত—যাঁহার নাম হইতে মানভূম জেলার নাম হইয়াছে। উক্ত রাজবংশের বংশধরগণ বর্ত্তমানে মানবাজারে বসবাস করিতেছেন। কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই মন্দির এবং ইহার পারিপার্শ্বিক স্থান পরিদর্শন করিলে বুঝিতে পারিবেন ক্রোশজুড়ী (ক্রোশজুড়িয়া) এক সময়ে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, কারণ মন্দিরের পূর্ব্বদিকের অনতিদূরে পরিখা বেষ্টিত মহল-ডাঙ্গা নামে বিস্তীর্ণ স্তূপেও বিক্ষিপ্ত ভগ্ন ইষ্টকগুলি দেখিয়া মনে হয় এই স্থানে প্রাচীনকালে রাজপ্রাসাদ ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ এই স্থানে খননকার্য্য আরম্ভ করিলে মধ্যযুগের স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রচুর নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া এই যুগের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। ক্রোশজুড়ী হইতে ২০ মাইল দূরে পুঞ্চা থানার নিকটে কাঁসাই নদীর তীরে বুধপুর গ্রাম। এই গ্রাম হইতে কয়েকটী প্রস্তরমূর্ত্তি পাটনা মিউজিয়মে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সোনাথলী গ্রামটী বি-এন-আর লাইনে ইন্দ্রবিল ষ্টেশন হইতে হাটাপথে পাঁচ মাইল দূরে সাতকেশর নদীর তীরে অবস্থিত। গরুর গাড়ীর পথ—সাত মাইল। গৌরাঙ্গডিহি পোষ্ট আফিস। সোনাথলী একটী ক্ষুদ্র জনপদ, এখানে হাট বাজার নাই, তবে গ্রামের মধ্যে একটী এম্-ই স্কুল আছে এবং এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার, একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এখানে আসিলে তিনি যথাসাধ্য কায়িক সাহায্য করিবেন।

যে মহাপুরুষকে দর্শন করিতে গিয়া আমি এই প্রাচীন স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছি তাঁহার শ্রীচরণে আমার শত শত প্রণাম।

শরৎচন্দ্রের "গৃহদাহ"

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কিন্তু এই পুস্তকখানির সমালোচনার রচনায় একটি সমস্যা আছে, যে সমস্যার সমাধান না হলে পুস্তকখানির সমালোচনা, বিশেষ করে সুরেশের চরিত্রের সমালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গৃহদাহ হল, কিন্তু কে দাহ করলো শরৎচন্দ্র তা বলেননি এবং শরৎ-সাহিত্যের সমালোচকগণও বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। বইখানি সিনেমায় তোলা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো, কিন্তু কে আগুন দিল দেখা গেল না। অথচ ঘটনাটির একটা নিরাকরণ দরকার। খুনী খুন করে জজসাহেব তা দেখতে পান না। দু'পক্ষের কথা শুনেই তাঁকে একজনের উপর চূড়ান্ত রায় দিতে হয়। সাহিত্যের যাঁরা বিচারক তাঁরাও আশাকরি সকল পক্ষের কথা শুনে বিষয়টির সম্বন্ধে একটি চূড়ান্ত রায় দিবেন।

আমার মতে, সুরেশই মহিমের ঘরে আগুন দিয়েছিল। হয়ত আমার এ ধারণা ভুলও হতে পারে, কিন্তু খোলাখুলি মন্তব্য যখন করছি তখন এর যুক্তি প্রদর্শন করতে আমি বাধ্য। অচলার সঙ্গে সুরেশের পরিচয় হবার পর থেকে যত দুঃখ যত বিড়ম্বনা মহিমের ভাগ্যে ঘটেছে তার প্রত্যেকটির কারণ হচ্ছে সুরেশ। কেবল গৃহদাহের ব্যাপারেই শরৎচন্দ্র বাইরে থেকে একজনকে ধরে নিয়ে এসেছেন মনে হয় না। সুরেশই মহিমের ঘরে আগুন দিয়েছিল এবং সেইজন্যেই বইখানার নাম হয়েছে—"গৃহদাহ"।

অচলা একবার সুরেশের উপর দোষারোপ করেছিল—"আমাদের ঘরে আগুন দিয়ে তুমি তাঁকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে, তুমি সব পার।" এই দোষারোপ সত্য কিনা বিচার করে দেখতে হবে। কারণ এ জগতে মহিম ও সুরেশ দুজনকেই যে সব চাইতে বেশী জানতো, শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে সর্বাংশ, সে হচ্ছে এই অচলা। কাজেই তার মতামতকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না এবং এই দু'জন কি প্রকৃতির মানুষ, কি করতে পারে না পারে, তা এই অচলার কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে। দুই বন্ধুই যখন বিবাহপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালো এবং একজনকে বিদায় দিতেই হবে অচলা বুঝতে পারলো, তখন সে .মহিমের সম্বন্ধে বললে, "কোনদিন সে কোন অপরাধ করে নাই, অথচ, যাও বলিতেই সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে। এ জীবনে, কোন সূত্রে, কোন ছলেই আর তাহাদের পথে আসিবে না।...সেই অত্যাবশ্যকীয় চিরবিদায়ের ক্ষণেও তাহার অটল গাম্ভীর্য এক তিল বিচলিত হইবে না, কাহাকেও দোষ দিবে না, হয়ত কারণ পর্যন্ত জানিতে চাহিবে না। নিগূঢ় বিস্ময় ও তীব্র বেদনার একটা অস্পষ্ট রেখা হয়ত বা মুখের উপর দেখা দিবে, কিন্তু সে ছাড়া আর কাহারও তাহা চোখেও পড়িবে না। তাহার পরে একদিন সুরেশের সঙ্গে বিবাহের কথা তাহার কানে উঠিবে, সেই মুহূর্তের অসতর্ক অবসরে হয়ত বা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িবে, না হয়, একটু মুচকিয়া হাসিয়া নিজের কাজে মন দিবে।" বইখানি আদ্যোপান্ত যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন মহিমের সম্বন্ধে এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সেই অচলাই সুরেশের সম্বন্ধে একটি কথায় বলেছে, "হৃদয় তাহার যত মহৎই হোক—সেই হৃদয়ের ঝোঁকের উপর তাহার আদৌ আস্থা নেই, এমন কি ভয় করে।" এই উক্তি কতখানি সত্য তাও পাঠকবর্গ জানেন। তবু দু'একটা উদাহরণ দেওয়া গেল।

অচলার পিতা বৃদ্ধ কেদারবাবুকে সুরেশ যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করতো, কিন্তু মহিমের সঙ্গে অচলার বিবাহের সম্ভাবনা দেখে একদিন ঝোঁকের মাথায় তাঁকেই বললে, "আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, আমিই কি আপনাদের প্রথম শিকার, না এমন আরও অনেকে এই ফাঁদে পড়ে নিজেদের মাথা মুড়িয়ে গেছে? বাপে মায়েতে ষড়যন্ত্র করে শিকার ধরার ব্যবসা বিলেতে নতুন নয় শুনতে পাই; কিন্তু এও বলছি আপনাকে কেদারবাবু, একদিন আপনাকে জেলে যেতে হবে।

—এ সব তুমি কি বলছ সুরেশ!

সুরেশ অবিচলিত স্বরে জবাব দিল, "চুপ করুন কেদারবাবু, সিকিউরিটির অছিলায় অনেকদিন ধরে চলছে। পুরাণো হয়ে গেছে—আর এতে আমি ভুলব না। টাকা আমার যা গেছে তা যাক্—তার বদলে শিক্ষাও কম পেলুম না; কিন্তু এই যেন শেষ হয়।" জবাব দেবার জন্য কেদারবাবু দুই ঠোঁট ঘন ঘন নাড়িতে লাগিলেন, কিন্তু গলা দিয়া একটাও কথা ফুটিল না। অচলার দিকে ফিরিয়া সুরেশ পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সহিত বলিয়া উঠিল—কি তোমার গর্ব করবার আছে, অচলা, এই ত মুখের শ্রী, ঐ ত কাঠের মত দেহ, ঐত গায়ের রঙ,। তবু যে আমি ভুলেছিলাম—সে কি তোমার রূপে? মনেও করো না।

পিতার সমক্ষে এই নির্লজ্জ অপমানে অচলা দুঃখে ঘৃণায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কৌচের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

এর পরে কিন্তু সুরেশের অনুশোচনার অন্ত ছিল না। লজ্জায় সে কলিকাতা ত্যাগ করেছিল।

রুগ্ন বন্ধুর স্ত্রী এই অচলাকে নিয়ে যে সুরেশ জব্বলপুরে সরে পড়েছিল, সেও ঝোঁকের বশে। হঠাৎ হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়ে যখন সে অচলাদের সহযাত্রী হল তখন এ সংকল্প তার ছিল না। পরে অচলার মুখের দু'চারটি কথায় তার চিত্তের আবেগ এত প্রবল হয়ে উঠলো যে এতবড় একটা দুষ্কর্ম সে অনায়াসে করে বসলো। তারপর ঝোঁকটা যখন কেটে গেল ভুলটাও তখন বুঝতে পারলো। গৃহদাহের ব্যাপারেও সুরেশের এমনি একটা উত্তেজনার কারণ ঘটেছিল।

বিয়ের পর অচলা শ্বশুর বাড়ী গেলে সুরেশও তার পিছনে পিছনে গেল এবং সেই পল্লীগ্রামে অচলাকে নিয়ে এক নাটকীয় অভিনয় শুরু করে দিল। মহিম সবই দেখতো, বুঝতো, অশান্তির তীব্র বেদনাও অনুভব করতো কিন্তু কিছু বলতো না। অবশেষে যে দিন রাত্রে ঘরে আগুন লাগে সেইদিন সন্ধ্যার একটু পরে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। সুরেশ লণ্ঠনের কাছে মাথা গুঁজে একটা বই পড়ছিল, আর মহিম পায়চারী করছিল বাইরের অন্ধকারে। এমন সময় অচলা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। এক বাটি সুরেশ ও এক বাটি মহিমের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, মহিম ডাকলো, দাঁড়াও অচলা। শরৎচন্দ্রের কথাতেই বলা যাক।—

"নিঃশব্দে অন্ধকারে দু বাটি চা প্রস্তুত করিয়া, এক বাটি সুরেশকে দিয়া, অন্যটা স্বামীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া নীরবেই উঠিয়া যাইতেছিল, মহিমের আহ্বানে সে চমকিয়া দাঁড়াইল, মহিম কহিল একটু অপেক্ষা কর, বলিয়া নিজেই চট্ করিয়া উঠিয়া গিয়া খিল্ লাগাইয়া দিল; চক্ষের নিমেষে তার ছয় নলা পিস্তলটার কথাই সুরেশের স্মরণ হইল এবং হাতের পেয়ালা কাঁপিয়া উঠিয়া খানিক চা চলকিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সে মুখখানি মড়ার মত বিবর্ণ করিয়া বলিল, দোর বন্ধ করলে যে? তাহার কণ্ঠস্বর, মুখের চেহারা এবং ভঙ্গীতে অচলারও ঠিক সেই

কথাই মনে পড়িল মাথার চুল পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়া উঠিল। বোধকরি বা একবার যেন সে চীৎকার করিবারও প্রয়াস করিল, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না। মহিম ক্ষণকালমাত্র অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত বুঝিল, তারপর সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া বলিল চাকরটি এখন পড়ে এইখানেই; নইলে পিস্তলটা আমার চিরকাল যেমন বাক্সে বন্ধ থাকে এখনও তেমনি আছে।...সুরেশ কি একটা জবাব দিতে চাহিল কিন্তু এবার তার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না—ঘাড়টাও সোজা করিতে পারিল না, সেটা যেন তার অজ্ঞাতসারেই ঝুঁকিয়া পড়িল। তুমি ভেতরে যাও—অচলা, বলিয়া মহিম খিল খুলিয়া পরক্ষণেই অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া গেল।"

সেই রাত্রেই ঘরে আগুন লাগে। অন্যায় জেনেও যে নেশার ঝোঁকে সে মহিমের বাড়ী গিয়ে হাজির হল এবং অচলাকে নিয়ে লজ্জাকর অভিনয় সুরু করলো—গুলির ভয় পাবার পর যে সে অধিকতর উত্তেজিত হয়ে উঠবে এবং যার জন্যে সে পাগল সে তার কাছে নেই, আর একজন তাকে নিয়ে সুখনিদ্রায় মগ্ন, এই কল্পনায় একটা অঘটন কিছু ঘটাবে, এটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।

অনেকে বলেন, সুরেশ এত হীন ছিল না। ছিল না সত্য, যখন সে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতো। সে ছিল এক মুহূর্তে দেবতা এবং পরমুহূর্তে পিশাচের মত। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" নামক গ্রন্থে গৃহদাহের দায়িত্ব কাহার সে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু না বললেও এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সুরেশের সম্বন্ধে বলেছেন "কোন বাধায় প্রতিহত হইলেই সে একটা তিক্ত তীব্রতা ও অসংযত ইতরতার নিম্নতম সোপানে নামিয়া যায়।" তা ছাড়া, যে তার হৃদ্য বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে সরে পড়তে পারে সে তার ঘরে আগুন দিতে পারে না? ঘরে আগুন দেওয়া কি কোন ভদ্রলোকের স্ত্রীকে নিয়ে সরে পড়া অপেক্ষা বেশী হীন কাজ? কেহ কেহ বলেন, সুরেশ ছিল নাস্তিক। সে ভগবান মানতো না, পাপপুণ্য মানতো না, প্রচলিত অনেক সামাজিক নীতিও মানতো না। না মানলেও, সে আইন মানতো এবং তাকে সে ভয়ও করতো। অচলাকে নিয়ে যাওয়ার পর সেই ভয়ের কথা সে অচলাকে জানিয়েওছিল। তবু যখন সে কাজ সে করেছিল, তখন অন্যটাই বা পারবে না কেন, যখন দু'কাজেরই মূল লক্ষ্য ছিল একই, অর্থাৎ—অচলা?

পাল রাজধানী রামাবতী

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি-টি

বাংলা নদীমাতৃক দেশ। নদীসমূহের গতিপথ এত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হয় যে দেশের প্রাকৃতিক রূপ নিয়াই নূতন আকার ধারণ করে। ইহার ফলে অতীত গৌরবের বহু নিদর্শন আজ লোক চক্ষুর অন্তরালে ভূগর্ভে অথবা বনাকীর্ণ জংগলাবৃত ভূভাগের অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়াছে। এ কারণেই বাংলার পালরাজগণের শেষ রাজধানী রামাবতীর অবস্থান এযাবৎ অজ্ঞাত। কিন্তু অতীতের কিছু চিহ্ন শত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও থাকিয়া যায়। তাহা অনুসরণ করিয়াই রামাবতীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রামপালদেব বিদ্রোহী নায়ক ভীমকে পরাস্ত করিয়া বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিলে গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গম স্থানে এক নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই নাম রামাবতী। সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' গ্রন্থে বর্ণনা দিয়াছেন—

মধ্যস্থিতে: গঙ্গাকরতোয়ানর্ঘ প্রবাহ পুণ্যতমাম্
অপুনর্ভবাহ্বয় মহাতীর্থ [illegible]।

মদনপালদেবও এই "রামাবতীনগর পরিসরাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ" তাঁহার অষ্টম রাজ্যাঙ্কে ভূমিদান করেন। রামপাল, কুমার পাল, তৃতীয় গোপাল এবং এই বংশের সর্বশেষ রাজা মদন পাল এখান হইতেই রাজ্য শাসন করিতেন। পালরাজগণের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ফলে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। রামাবতী ক্রমশঃ গৌরবহীনা হইয়া পড়ে। কিন্তু খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও আবুল ফজল ইহার উল্লেখ করেন। তখন রামাবতী পরিবর্ত্তিত হইয়া রমোতি হইয়াছে। পরবর্তী এই চারিশত বৎসরে নাম ও অবস্থা দুইয়েরই স্বাভাবিক পরিবর্তন হইয়াছে। দিনাজপুর জেলার ইটাহার গ্রামের অনতিদূরে আমাটির ধ্বংসাবশেষ সেই সমৃদ্ধিশালী রাজধানীর স্মৃতিবহন করিতেছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া আমি অনুমান করি যে রামাবতী এই স্থানের আশে-পাশেই হইবে এবং একটি শুষ্ক প্রায় নদীকেই করতোয়ার প্রাচীন খাত বলিয়া মনে হইল। ডাঃ ভট্টশালী মহাশয়কে একথা জানাইলে তিনিও লিখেন—'রামাবতীর অবস্থান ইটাহারের নিকটেই হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।' অনুসন্ধানের ফলে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ পত্রিকার গত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ নাথ মহাশয় ইটাহার প্রসঙ্গে আমাটির শুধু নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই নাম সাদৃশ্য ছাড়াও বহু প্রমাণ আছে। মানচিত্রসহ সে সব আলোচনা করা প্রয়োজন।

শ্রাবণে

শ্রীরামেন্দু দত্ত

গগনে কালো মেঘে কাঁদিছে অবিরল—
বারণ-হারা বারি তা'রি ত আঁখিজল!
তা'রি ত ভিজা চুলে
চামেলী চাঁপা দুলে!
কাজল—কালো মেঘে বিজলী ঝলমল্!
গগনে কালো মেঘে কি দুখে কাঁদে বল্?

শ্রাবণ বরিষায় পবন হু-হু করে
বক্ষ জুড়ে তা'রি বেদন সুরে ঝরে
চামেলী চম্পাতে
কী অশ্রু-কম্পাতে
সে কান্না কেঁদেছিলে ভিতরে পরিমল!
কাতর তবু বালা, কাঁদে যে অবিরল!

দিল্লীতে কয়েকদিন

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

দিল্লী নগরীকে প্রথম দেখলে কলিকাতা নগরী বলে ভ্রম হয়। ট্রাম, বাস, গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি যান-বাহন মুখরিত পথ, দোকান, বাজার, অগণিত লোক অগুণতি বাড়ীঘর—ঠিক ধর্মতলা চৌরঙ্গী চক্—চিৎপুর ইত্যাদির মত দেখতে লাগে। আজমীর গেট পার হয়ে নয়া দিল্লীতে প্রবেশ করলুম—প্রকৃতি আর সৌন্দর্য্যের দিক থেকে নয়া দিল্লী রূপসী—কথাটা মিথ্যে নয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাজপথ, গো-যান ও লরীর প্রবেশ নিষেধ, এক রঙের এক মাপের এবং এক ডিজাইনের সরকারী বাড়ীগুলি রাস্তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করছে, একদিকে কুইন্‌স্ ওয়ে, মধ্য দিয়ে কিংস ওয়ে চলে গিয়েছে। এই কিংস্ ওয়ের একপ্রান্তে গভর্ণমেন্ট হাউস, তারই দুই দিকে সুসজ্জিত সেক্রেটেরিয়েট, খানিকটা দূরে কাউন্সিল হাউস। কাল্পনিক ঝর্ণা ও পার্ক রাস্তার শোভা বৃদ্ধি করছে। কিংস্ ওয়ের অপর প্রান্তে ইণ্ডিয়া গেট—বিগত মহাযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন অর্থাৎ—'কত রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে—।" এক কথায় বীরের স্মৃতি স্তম্ভ। জয়পুর, নিজাম, বরদা, কাশ্মীর প্রভৃতি নেটিভ্ স্টেটের প্রাসাদগুলি দেখতে সুন্দর—বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্যে সেগুলি সৈনিক ভবন হয়েছে। শহরের অপর প্রান্তে কনাট প্লেস—কতকটা চৌরঙ্গীর মত, মধ্যে একটি পার্ক, তার চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হয়ে উচ্চাঙ্গ স্তরের সৌখীন রুচি সম্পন্ন নানা জাতীয় দোকান পসার—দামে কোলকাতার মতই। তবে কলিকাতার তুলনায় অন্যান্য জিনিষের দর প্রায় একরকম হলেও শাক-সব্জীর দর অত্যন্ত বেশী। লাউ, আতা পর্য্যন্ত সের দরে বিক্রী হয়। বিড়লা মন্দির বা বিড়লা প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির দিল্লী নগরীর একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সেক্রেটেরিয়েট

তিনটি থাক বিশিষ্ট মন্দির সৌধটির বহিঃপ্রাঙ্গণ চতুর্দ্দিকে অলিন্দ পরিবেষ্টিত এবং তারই শেষ প্রান্তে পাশাপাশি তিনটি গম্বুজ রয়েছে। জয়পুরী স্থপতি-শিল্পের বিচিত্রের কারু কার্য্যই মন্দিরের বহিরাবরণ। মন্দিরের অভ্যন্তরে উন্নত রুচির সৌখিন পরিচয় বহন করছে। প্রধান দেবালয়ে মর্ম্মর খচিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান নারায়ণের অপূর্ব মূর্ত্তি, রেশমের সুন্দর বেশ, প্রত্যহ নব সাজে এই মূর্ত্তিকে সজ্জিত করা হয়। অন্যান্য প্রকোষ্ঠে দুর্গা, শিব, লক্ষ্মী প্রমুখ দেবদেবীর মূর্ত্তি ধূপ পুষ্প চন্দনের গন্ধে দেবালয় আমোদিত, পূজার্চ্চনা স্তব পাঠ, বাজনার সঙ্গে ধর্ম্ম সংকীর্তনে দেব-প্রাঙ্গণের আদর্শ ও সম্মান রক্ষা করছে। প্রাচীর মেঝে প্রায় সর্ব্বত্রই শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। ছাদ এবং প্রাচীর জয়পুরী শিল্পকলার মধ্যে বাঙলা দেশের শিল্পী প্রধান উকীল ও সুধাংশু চৌধুরীর তুলিকায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, সম্রাট অশোক-চন্দ্রগুপ্তের ঐতিহাসিক যুগের কীর্ত্তি, রামায়ণ মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী wall painting ও glass painting এর মধ্যে চিত্রিত হয়ে অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করেছে। বেদ উপনিষদ গীতা ও বৌদ্ধ বাণী বিভিন্ন ভাষায় প্রাচীর পত্রে কতকাংশে লিপিত রয়েছে। মুসলমানের হিন্দুর গৌরব কাহিনী আজ প্রায় অবলুপ্ত, স্মৃতি সমাধির মধ্যে হিন্দুর কীর্ত্তি অমরত্ব লাভ করতে পারেনি—ক্রমশ: বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে—এই শিল্প নৈপুণ্যের মধ্যে তাকে যেন পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। ঝাড় লণ্ঠনগুলি দেবালয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করছে। মন্দির সংলগ্ন বৌদ্ধ মন্দির, মর্ম্মর খচিত বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং ওয়াল পেন্টিং-এ বৌদ্ধযুগের কাহিনী চিত্রিত রয়েছে। মন্দিরের বাহির প্রাঙ্গণে মৌনতা অবলম্বন করতে হয়। পাশেই অতিথিশালা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে এখানে অতিথিকে পরিতুষ্ট করা হয়। মন্দিরের কয়েক হাত দূরে ভ্রমণ উদ্যান এই ভ্রমণ উদ্যানও আপন বৈশিষ্ট্যে অপূর্ব। কাল্পনিক পাহাড়, পাহাড়ের মধ্যে গুহা, গুহার মধ্যে ওয়াল পেন্টিং-এর অপূর্ব সমারোহ। একদিকে ছেলেরা ব্যায়াম করছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শিশুরা নানাপ্রকার ক্রীড়ায় মশগুল।

মনে বেশ একটা তৃপ্তি ও আনন্দ নিয়ে বিড়লা মন্দির থেকে বের হয়ে এলুম। আধুনিক রুচি-সুন্দর দেবালয়, হিন্দুর বৈশিষ্ট্য হিন্দুর জাতীয়তা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, অথচ রক্ষণশীলতা এবং কু-সংস্কারগুলো বর্জ্জিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক কীর্ত্তির লীলাভূমি এই দিল্লী নগরী—কত জয় পরাজয়ের কাহিনী এই নগরীর স্মৃতিপটে জড়িয়ে রয়েছে, ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও স্মৃতির ক্ষীণ রশ্মিশিখা উজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান।

কৌরব ও পাণ্ডব যুগের স্মৃতি-তীর্থ ইন্দ্রপ্রস্থ অথবা পাণ্ডু কেল্লায় কয়েকদিন আগেও জাপানীরা বন্দী ছিল। ওদের তাঁবু ইত্যাদি রয়েছে বলে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। টিকিট করতে হয়না, আমরা দরোয়ানকে কিছু বকশিস্ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলুম। যুগ যুগান্তের কাহিনী ; ধ্বংস স্তূপের মধ্যে স্মৃতি চিহ্ন আজ প্রায় অবলুপ্ত, ভগ্নপ্রায় প্রাচীরে দুর্গ পরিবেষ্টিত। হিন্দুর গৌরবের পূণ্যভূমি—হিন্দুর কীর্ত্তির পবিত্রধাম—আজিও স্তিমিত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে—কালের নিয়মে হিন্দুর বৈশিষ্ট্য বিলীয়মান হলেও প্রাচীর গাত্রে পত্র, মন্দির, কলসী, [illegible], ঘণ্টা ইত্যাদি স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে হিন্দুর সত্তা সাক্ষ্য প্রদান করছে। প্রায় পঁয়ত্রিশ ফিট নিচে

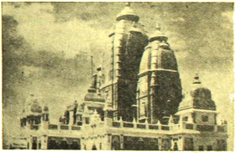

বিড়লা মন্দির

সৌন্দর্য্যও বর্ত্তমান, দুর্গ প্রাকারের যমুনা যাবার সুরঙ্গটি সূর্য্য কুণ্ড নামে আজও প্রত্যক্ষ হয়ে রয়েছে। পাণ্ডব যুগ গত, আজ মুসলমানের পর্দা কক্ষে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এইখানেই সোপান চ্যুত হয়ে হুমায়ুনের মৃত্যু ঘটেছিল।

ফেরবার পথে ভগ্ন স্তূপের মধ্যে প্রায় অসংস্কৃত অশোকস্তম্ভ দেখে ফিরে এলুম। এই স্তম্ভ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলেন, "ইহা আগ্রা থেকে আনা হয়েছে"; কেউ বলেন, "এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" সত্য সন্ধান নিশ্চয়ই ঐতিহাসিকগণই দিতে পারবেন।

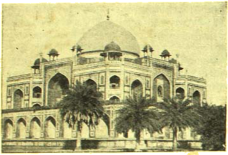

হুমায়ুন টুম্ব

এগারো মাইল দূরে অবস্থিত কুতুবমিনার দেখতে একদিন বের হয়ে পড়লুম। দিল্লীতে টাঙ্গা ভাড়া অত্যন্ত বেশী, মধ্য পথের সাবদারজং, নিজামুদ্দিন এবং হুমায়ুন সমাধি দেখাবে, দশ টাকা চেয়ে বসলো। আমরা দরদামে সাত টাকায় রফা করলুম।

সুসজ্জিত উদ্যান পরিবেষ্টিত কুতুব-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলুম। একদিকে কুতুবমিনার, চন্দ্রগুপ্তের লৌহ স্তম্ভ, অপর দিকে পৃথ্বিরাজের মন্দির, আলাউদ্দিন খিলজির ইলাহি গেট, মহল, সমাধি প্রভৃতি ঐতিহাসিক কীর্ত্তির উত্থান পতনের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান। আজিও—চতুর্দ্দিকে ধ্বংসাবশেষ স্তূপের মধ্যে কত স্মৃতি চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

চৌষট্টি থাম পরিবেষ্টিত পৃথ্বিরাজের মন্দিরে মহম্মদঘোরীর অত্যাচার চিহ্ন বিদ্যমান, শুধু থামগুলির গাত্রে হিন্দুর স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ফেরবার আগে কুতুবে উঠে একবার দিল্লী নগরীকে দেখে নিলুম।

দিল্লী নগরীতে মুঘল যুগের হুমায়ুন, সাবদারজং, নিজামুদ্দিন প্রভৃতির অনেক সমাধি গৃহ রয়েছে—এর মধ্যে দর্শনীয়ের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নেই,—মৃতের সম্মান, আত্মার গৌরব, স্মৃতির সৌধ এইটুকুই এইগুলির বৈশিষ্ট্য। তবে নিজামুদ্দিনের সমাধি গৃহের অভ্যন্তরে সম্রাট সাজাহান দুহিতা জাহানারার সমাধি আমার কাছে বেশ ভালো লাগলো। সমাধির উপরে ঘটা করে প্রাসাদ গড়ে ওঠেনি—বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ হয়নি—ছায়া নির্জ্জন প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে সৌধ-বেষ্টিত সামান্য ভূমিখণ্ডে তৃণ আচ্ছাদিত জাহানারার সমাধি, সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণ বর্ষণে বাতাসের স্পর্শে পবিত্র হয়ে রয়েছে।

দিল্লীর মোগল দুর্গ অর্থাৎ রেডফোর্ট দেখবার মত জায়গা। মুসলমান কীর্ত্তির যুগ-যুগান্তের কাহিনী, গৌরবের সত্তা ওরই মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে রয়েছে। গাইড বললো—দশটি টাকা পারিশ্রমিক পেলে পরিষ্কার করে সব বুঝিয়ে দেবে। শেষে আমরা এক টাকায় রফা করলুম। পাথরের প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলুম। সম্রাট সাজাহানের গেট, আওরঙ্গজেব গেট, বাজার, নহবতখানা ইত্যাদি পার হয়ে অন্দর মহলে এসে পৌঁছুলুম। দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস—মতিমসজিদ, খাসমহল, বেগম মহল, স্নানকক্ষ প্রভৃতিতে কত অশ্রুজল কত গৌরব ও আনন্দপূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে। দেওয়ানি খাস সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ, এইখানেই সম্রাট সাজাহানের সকীয় বৈঠকের অনুষ্ঠানাদি হোত, বিচিত্র শিল্প কার্য্যে চিত্রিত বত্রিশ স্তম্ভে পরিবেষ্টিত এই দরবার কক্ষটি, মধ্যে বিখ্যাত স্বর্ণ নির্ম্মিত ও হীরা জহরৎ খচিত ময়ূর সিংহাসন ছিল, আজ শুধু সেখানে মর্ম্মরমণ্ডিত শূন্য আসন পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে। সাধারণ জনসভা রূপে দেওয়ানি আম পরিচিত। মতি মসজিদ আওরঙ্গজেবের উপাসনা কক্ষ। খাসমহল সাজাহানের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মহল। এখানে মমতাজের কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলনা, ইমতাজ ও ইলাহি বেগমের এবং চল্লিশ বাঁদীর স্থান রয়েছে বেগম মহলে। বিচিত্র আয়োজনে স্নান মহলটি সুন্দর। ঠাণ্ডা ও গরম, গোলাপজল, আতর প্রভৃতির বিভিন্ন ফোয়ারা রয়েছে। একদিন যে দুর্গ শিল্প নৈপুণ্যের দিক থেকে উন্নত শ্রেণীর ছিল কালের গতিতে আজ সে ঐশ্বর্য্য প্রায় অবলুপ্ত। হীরা মাণিক জহরতের কোথাও চিহ্নমাত্র নেই, কত উচ্চাঙ্গের শিল্পকার্য্য নিশ্চিহ্ন হয়েছে। মাত্র কোথাও কোথাও প্রাচীর গাত্রে স্বর্ণখচিত ওয়ালপেন্টিং, পাথরের বিচিত্র কারু-কার্য্যের ঝালরী, চন্দনকাঠের দরজা প্রভৃতি দুর্গটি দিয়ে সুন্দর হয়ে রয়েছে।

দুধারে ঘাস বাগান, মাঠের পর মাঠ পার হয়ে "আবশ-তাজ" অর্থাৎ বাথ হৌজ বক্স-এ এসে দাঁড়ালুম। যমুনার সঙ্গে সংযোগ রেখে এখানে চিরকালের জন্য কাল্পনিক বন্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ফেরবার পথে মিউজিয়মে গেলুম। বাদশা-আমলের নানা জাতীয় অস্ত্র, আসন, পোষাক পরিচ্ছদ এবং গোলাপ পাশ, আতরদান ইত্যাদি রয়েছে। সকাল আটটা থেকে দশটা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ণে তিনটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত এই দুর্গ খোলা থাকে, দুআনা করে প্রত্যেকের টিকিট। দিল্লীর জল হাওয়া বেশ ভাল, ওখানকার অধিবাসীদের উন্নত স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে তা বুঝতে পারা যায়। তখন ছিল বৈশাখ মাস তবু উত্তাপ অসহ্য হয়ে ওঠেনি, ঠাণ্ডা এবং গরম মিশ্রিত আবহাওয়া ভ্রমণের পক্ষে অনুকূল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণের পক্ষে দিল্লী ভ্রমণ বড়ই অসুবিধাজনক, কারণ সাধারণের জন্য কোনও হোটেলের ব্যবস্থা নেই এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য উচ্চাঙ্গের হোটেলগুলিও প্রায় ভর্ত্তি থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে দিল্লী নগরী একটি জাতীয় সম্পদ—এই জাতীয় সম্পদের সঙ্গে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ইন্দ্রপ্রস্থ

দানিশাব্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা

শ্রীহৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী এম-এ

গত বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষে শ্রদ্ধেয় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ দানিশাব্দ সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসার অবতারণা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমি এই স্থানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

মুর্শিদাবাদ জেলায় সোনারুন্দী-বনোয়ারীবাদ নামক এক গ্রাম আছে। উহা ই-আই-আরের ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লাইনের গঙ্গাটিকুরী ষ্টেশনের প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে এবং আমোদপুর কাটোয়া লাইনের পাচুন্দী ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে অবস্থিত।

১৭৪১ খৃঃ অব্দের ১৮ই আষাঢ় (ইংরাজী ১লা জুলাই) সোনারুন্দী (সোনারুদ্ ডিহি) গ্রামে তন্তুবায় কুলে নিত্যানন্দ দাসের জন্ম হয়। যৌবনের প্রারম্ভে নিত্যানন্দ দিল্লী পলাইয়া যান এবং তথায় কালক্রমে সম্রাট শাহ আলমের অন্যতম সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। সম্রাট তাঁহাকে "দানেশ মন্দ" উপাধি প্রদান করেন। অন্যান্য উপাধিসহ তাঁহার পুরা নাম হয়—মহারাজা কর্মসিদ্ধ বনওয়ারী নিত্যানন্দ দাস নন্দী খানান দানেশমন্দ কেফায়েৎ জং হপ্ত-হাজারী বাহাদুর।

নিত্যানন্দ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি সোনারুন্দির সংলগ্ন পূর্ব্বভাগে কুলদেবতা শ্রীশ্রীবনোয়ারী জিউর নামে বনওয়ারীবাদ গ্রাম স্থাপন করেন। তথায় তিনি রাজপ্রাসাদ ও বৃন্দাবনের অনুকরণে নানা সরোবর ও কুঞ্জ যথা—নিধুবন, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। সম্রাট তাঁহাকে পাল্কী কামান দিয়াছিলেন—তন্মধ্যে ২টী আজও তাঁহার প্রাসাদে আছে।

দানেশমন্দের জন্মদিন হইতে দানিশাব্দ বা দানেশাব্দের গণনা।

দানেশমন্দের পুত্র বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট হইতে মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর পরে উহা হাই স্কুলে পরিণত হয়।

মহারাজা বাহাদুরের পৌত্র ৺বনওয়ারী মুকুন্দ দেব। বিগত ১৩৪৭ সালে ইঁহার ও ইঁহার দুই পুত্রের মৃত্যু হয়। দুই পুত্র এখনও জীবিত আছেন। ইঁহাদের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় প্রায় আশি হাজার টাকা।

বনওয়ারীবাদ রাজবাড়ীতে ঐ দানিশাব্দের অদ্যাপি প্রচলন আছে। দানিশমন্দের জন্ম এবং ঐ সন প্রবর্ত্তন উপলক্ষে রাজ-কাছারী ও উক্ত হাই স্কুল প্রতি বৎসর ১৮ই আষাঢ় বন্ধ থাকে।

সন ১৩৪৪ (ইং ১৯৩৭) অব্দে আমি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলাম। ১লা জুলাই (১৮ই আষাঢ়) ঐ উপলক্ষে ছুটী হওয়ার কথা আমার মনে আছে।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় পূর্ব্বে দানিশাব্দের উল্লেখ করা হইত; ১৩১৩। ১৩।১৮ প্রভৃতি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় ইহা পাওয়া যাইবে। ঐ জন্য ঐ পঞ্জিকাকে বার্ষিক কিছু সাহায্যও প্রদত্ত হইত। ঐ সাহায্য বন্ধ করায় উহার উল্লেখ আর ঐ পঞ্জিকায় করা হয় না।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় দানিশাব্দের উল্লেখ আছে। ১৩৪৪ সাল পর্য্যন্ত কিন্তু উহা ভুলভাবেই উল্লিখিত হইত। ঐ বৎসর আমি ঐ পঞ্জিকার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম, এ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ ভ্রম সংশোধন করিয়া দিই।

১৩৪৮ সালে আমি আচার্য্য বিষ্ণুদাস কৃত (ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত) সীতাগুণকদম্ব নামক গ্রন্থ ভূমিকা সহ প্রকাশিত করি। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় দানিশাব্দের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

"বহরা" নামে কোনও গ্রাম বনওয়ারীবাদের সন্নিকটে আছে কিনা ঠিক স্মরণ হইতেছে না, তবে দুই মাইল ব্যবধানে বহরান নামক এক সমৃদ্ধ গ্রাম আছে।

নিম্নে বনওয়ারীবাদের সন্নিকটস্থ কয়েকটি গ্রামের নাম তাহাদের গুরুত্ব সহ উল্লিখিত হইল :—

(১) পাচুন্দী—এখানে একটী প্রাচীন বিষ্ণু মূর্ত্তি আছে। কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত বৃহৎ বিগ্রহ।

(২) নিরোল বা নিড়োল—আমার অনুমান ইহাই "রামচরিতের" টীকায় উল্লিখিত নিদ্রাবল—যেখানে "বিজয়রাজের" রাজধানী ছিল। ঐ বিজয়রাজ বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন বলিয়াই ঐতিহাসিকগণের অনুমান।

(৩) সীতাহাটী—এখানে বল্লাল সেনের তাম্রশাসন ১৩১৭ বঙ্গাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৪) বাল্গুটিয়া—ইহাই ঐ তাম্রশাসনে উল্লিখিত "বালহিট্ট"

(৫) নৈহাটী—এখানে এক রাজার রাজধানী ছিল। শ্রীশ্রী রূপ-সনাতনের পিতামহ এই গ্রামেই বাস করিতেন।

(৬) উদ্ধারণপুর—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের সমাধি স্থান। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহ এখন বনওয়ারীবাদের প্রাসাদে রহিয়াছে।

(৭) ঝামটপুর—চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাসস্থান।

(৮) কেতু গ্রাম—পীঠস্থান }
(৯) বহুলা—পীঠস্থান } গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় দ্রষ্টব্য।

(১০) বড় কাঁদরা—বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের বাসস্থান।

(১১) মলিহাটী-কাঁদরা—শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের বাসস্থান।

(১২) বেড়ুন্দকোণা—দুইজন বৈষ্ণব লেখকের বাসস্থান। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রণীত বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(১৩) টেঞা—ইহা পদকল্পতরু সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) এবং পদকর্ত্তা উদ্ধব দাস (গোকুলানন্দ সেন) মহাশয়দ্বয়ের বাসস্থান।

(১৪) দাবনই—যুদ্ধক্ষেত্র।

(১৫) কাটোয়া—প্রসিদ্ধ স্থান।

তদ্ব্যতীত কিছুদূর ব্যবধানে বৈরাগীতলা, অট্টহাস, নানুর, কেন্দুলী, মাড়গ্রাম, বাইহাট প্রভৃতি অবস্থিত। আর গঙ্গার পূর্ব্বপারে নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ স্থানগুলি রহিয়াছে—

(১) পলাশী—প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র।

(২) দেবগ্রাম—ঐতিহাসিকগণের মতে এখানে কল্যাণবর্ম্মা প্রভৃতি বর্ম্মবংশীয় নৃপতিবর্গের রাজধানী। এখানেই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন।

(৩) মাণিক্যডিহি—এখানে বৈষ্ণবাচার্য্য বিষ্ণুদাস ও পদাবলী রচয়িতা তৎপুত্র রামকৃষ্ণ দাস বাস করিতেন। ১৩৪৩ অথবা ৪৪ সালে এখানে খনন কার্য্যের ফলে এক বৃহৎ মূর্ত্তি পাওয়া যায়। আমি কিন্তু উহা হস্তগত করিতে পারি নাই—শুনিয়াছি উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তবে ঐ সংবাদ আমি সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে প্রদান করিয়াছি।

কাগ্রাম এবং যৌগ্রাম নামক পল্লীদ্বয় গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। ঐ দুই স্থানে পূর্ব্বে ওলন্দাজদের কুঠী ছিল। যৌগ্রামের অনতিদূরে অমৃতাক্ষ চণ্ডী নামক উপপীঠ আছে। আবার গঙ্গার পূর্ব্ব পারেও ভুড়নপুর গ্রামে একটী পীঠস্থান রহিয়াছে। (গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা দ্রষ্টব্য)

এতদ্ব্যতীত পুনবাগিচা নামক গ্রামের শ্রীশ্রীগৌরনিতাই-এর আখড়া, এবং শিওরাখা, কল্পেশ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিবমন্দির এই অঞ্চলেই রহিয়াছে। সুতরাং অবশ্যই এই অঞ্চল ঐতিহাসিক, সাহিত্য রসিক, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণের কৌতূহল উদ্রেকে সমর্থ।

মারোয়াড়ীদের দেশে

যাদুকর পি, সি, সরকার

মারোয়াড়ীদের দেশ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা খুবই কম—কাজেই সে সম্বন্ধে কিছু বলিলে পাঠকবর্গ অনেকটা আনন্দ পাইবেন আশা করি। এবার যখন কলিকাতায় জাপানীদের বিমানাক্রমণ হয়, তখন মাড়োয়ারী ধনকুবেরগণ প্রায় সকলেই ব্যবসা (সাময়িক ভাবে) বন্ধ করিয়া 'আপন মুলুক' চলিয়া যায়। এইভাবে যখন অধিকাংশ মারোয়াড়ীই পূর্ব্ব পরিকল্পনানুযায়ী স্ব স্ব গৃহে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে, আমি ঠিক সেই সময়েই উহাদের দেশে যাইবার সৌভাগ্য লাভ করি। যোধপুর সহরে বহু দেশীয় নরপতি যথা (জয়পুর, বনশীর, জামনগর, বুঁন্দী, ধারা, ডুঙ্গরপুর, ইদর, রেওয়া, বান্ সওয়া—কাথি-ওয়াড়), শাহপুর প্রতাপগড়, রাজকোট প্রভৃতি) সমাগত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের সম্মুখে আমার 'ম্যাজিক' দেখাইতে হইবে, এই উপলক্ষে রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আমি সেখানে যাই এবং যোধপুরের মাননীয় মহারাজা বাহাদুরের অতিথিরূপে দুই সপ্তাহকাল অবস্থান করি।

মারোয়াড়ীদের বাস রাজপুতনায় এবং যে অঞ্চলে উহারা থাকে তাহার নাম মারোয়াড়। এই মারোয়াড় রাজ্যে যাহাদের বাস তাহারাই মারোয়াড়ী। মারোয়াড় রাজ্য সম্বন্ধে সুন্দর ইতিহাস আছে। রাবণ সীতাকে লইয়া যখন লঙ্কায় প্রস্থান করেন তখন সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে রামচন্দ্র সমুদ্রোপকূল রামেশ্বরম্ নামক স্থানে সমুপস্থিত হন। সম্মুখে দুস্তর সমুদ্র কর্ত্তৃক ব্যাহত হইয়া রামচন্দ্র স্বীয় ধনুতে একটি অগ্নিবাণ যোজিত করিয়া সমুদ্রকে (শুখাইয়া ফেলিয়া) শাসন করিতে উদ্যত হন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সমুদ্রের দেবতা আবির্ভূত হইয়া রামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং ঐ অগ্নিবাণটি প্রতিনিবৃত্ত করিতে বলেন। কিন্তু শরাসনে শর সংযোজিত হইলে আর উহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা চলে না, কাজেই রামচন্দ্র উহাকে উত্তর-পশ্চিম দিকে নিক্ষিপ্ত করেন। উহা বর্ত্তমান যোধপুর ও বিকানীর রাজ্যের মধ্যস্থলে পতিত হয় এবং উক্ত স্থানে 'মরু কান্তার' সৃষ্ট হয়। এই 'মরু' বা 'জলহীন স্থান' হইতেই 'মরুয়ারী' বা 'মারোয়াড়ী' কথার উদ্ভব হইয়াছে। মারোয়াড় (যোধপুর) রাজ্যের রাজ-সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে মারোয়াড় সম্পর্কে অনুরূপই বর্ণিত আছে।

মারোয়াড় রাজ্যের রাজধানীর নাম যোধপুর এবং বর্ত্তমানে সমগ্র রাজ্যই এই রাজধানীর নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। যোধপুর রাজ্য দেশে হিন্দুদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই রাজ্যের 'মটো' (motto) 'রণবংকা রাঠোর' অর্থাৎ "রাঠোর-যুদ্ধে প্রখর"। মারোয়াড় বা যোধপুর রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতির নাম—কর্ণেল রাজ-রাজেশ্বর সরমদ রাজ-ই-হিন্দ, মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রী উমেদ সিংহজী সাহেব বাহাদুর, জি. সি. এস, আই; জি, সি, আই, ই; কে, সি, ভি, ও; এ, ডি, সি ইত্যাদি। এই মহারাজা রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা জয়চন্দ্র, রাও মালদেব, মহারাজা যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি সকলেই এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ। জয়চন্দ্র মহা-ভারতের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহার রাজধানী ছিল 'কনোজে' বা 'কান্যকুব্জ' সহরে। তাঁহার পৌত্র রাও সিংহ পশ্চিম রাজপুতনায় আসেন এবং মারোয়াড়ে 'রাঠোর' রাজ্যের স্থাপনা করেন। ইঁহারই বংশের পরবর্ত্তী রাজা রাও যোধাজী তাঁহার পুরাতন রাজধানী 'মাণ্ডোর'-এর পরিবর্ত্তে নূতন স্থানে ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার নাম হইতেই যোধপুর সহরের নামকরণ হয়। রাও যোধাজী যোধপুরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার বিকা (Bika) অনেক বৎসর পর 'বিকানীর' রাজ্য স্থাপন করেন। এইভাবে এই বংশের রাজা কেশোদাস কর্ত্তৃক ঝাবুয়া (Jhabua), আনন্দসিংহ কর্ত্তৃক ইদর ও আহমেদনগর (Idar, Ahmednagar), রত্নসিংহ কর্ত্তৃক রাটলাম (Rutlam), কিষেণসিংহ কর্ত্তৃক কিষেণগড় (Kishengarh) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে যোধপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাও যোধাজীর প্রপৌত্র রাও মালদেব খুবই পরাক্রমশালী ছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর ভূমিকায় মীর হাসি মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—

..."He was so powerful that he kept up an army of 60,000 horses. He was even superior to Rana Sanga in the number of soldiers and extent of territory, and in consequence was always victorious...."

মাণ্ডোরে দেবীমূর্ত্তি—তেত্রিশকোটী দেবতার স্থান

সেরশাহ আশী হাজার সৈন্য লইয়া রাও মালদেবকে আক্রমণ করেন কিন্তু এমন ভীষণভাবে প্রতিহত হন যে তিনি বলিতে বাধ্য হন "I nearly lost the empire of Hindustan for a handful of bajra অর্থাৎ এক মুঠা বাজ্‌রা (চাউল)র জন্য আমি প্রায় সমগ্র হিন্দুস্থান হারাইতে বসিয়াছিলাম"।

যাহা হউক রাজপুতদের বীরত্বের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহাদের দেশের উপর দিয়া কত জোয়ার ভাঁটা গিয়াছে, কিন্তু ঐ বীরের দল অসমসাহসিকতা ও অপূর্ব্ব শৌর্য্যের সহিত নিজেদের গৌরব রক্ষা করিতে ভুলে নাই। রাজপুতদের অসাধারণ রাজভক্তি চিরস্মরণীয়। স্বপুত্রের বেশে সাজিয়া ঝুড়ির মধ্যে প্রভুর একমাত্র বংশধরকে রক্ষা করা, স্বীয় পুত্রের বিনিময়ে প্রভুপুত্রের প্রাণরক্ষা করার কাহিনী কে না জানে? এই অপূর্ব্ব রাজভক্তি ও দেশভক্তির কথা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। রাজপুতনার মধ্যে যোধপুর রাজ্যই আয়তনে সর্ব্ববৃহৎ অর্থাৎ প্রায় ৩৬,০২১ বর্গমাইল। ইহার চারিদিকে অন্যান্য দেশীয় রাজ্য যথা জয়পুর, বিকানীর, উদয়পুর, সিরোহি, কিষেণগড় প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিবাহসূত্রে এই যোধপুর রাজপরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উদয়পুর, জয়পুর, বিকানীর, রেওয়া, বুঁদি, সিরোহি, নরসিংহগড়, ভাবনগর, ধ্রাংগধ্রা (কাথিওয়াড়) প্রভৃতি রাজ্য বিবাহসূত্রে এই রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং বিকানীর, কিষেণগড়, ইদর, রাটলাম, সীতামৌ, শৈলানা, ঝাবুয়া প্রভৃতি রাজ্য এই বংশের লোক দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। এই যোধপুর রাজ্যে শতকরা ৮৩ জন লোক হিন্দু, ৮ জন মুসলমান ও ৩জন জৈন।

মরুময় স্থান বলিয়া এ অঞ্চল খুবই গরম এবং এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত খুবই কম (গড়ে ১৩ ইঞ্চি)। এ রাজ্যের বার্ষিক আয় দেড় কোটি টাকা এবং এখানে অনেকপ্রকার ট্যাক্স দিতে হয় না। উদাহরণস্বরূপ ইনকাম ট্যাক্স, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। উপযুক্ত বাড়ীঘর তৈয়ার করার জন্য ষ্টেট অফিসারদিগকে ষ্টেট হইতে আর্থিক সাহায্য করা হয় এবং ক্রমে ক্রমে ঐ টাকা কাটিয়া লওয়া হয়। যোধপুরে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান উহার দুর্গ। রাওযোধাজী যে পুরাতন রাজধানী মাণ্ডোরএর পরিবর্ত্তে উহা যোধপুরে স্থানান্তরিত করেন তাহার প্রধান কারণই এই যোধপুর দুর্গ (Fort)। উহা ৪০০ ফুট উঁচু এবং ৫০০ গজ দীর্ঘ ও ২৫০ গজ প্রস্থ স্থান প্রাচীর বেষ্টিত। ঐ প্রাচীরের কোন কোন স্থান ১২ হইতে ৭০ ফুট প্রস্থ এবং ২০ হইতে ১২০ ফুট উচ্চ। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রস্তুত আরম্ভ হয় এবং রাজ-দরবার কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'যোধপুর' গ্রন্থে প্রকাশ যে ঐ দুর্গের ভিত্তিতে রাজিয়া নামক একজন লোককে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। ইহাতে দুর্গ রক্ষকদের সৌভাগ্য আনয়ন করে এবং দুর্গের দুর্ভেদ্যতা বৃদ্ধি করে।..."Its building was commenced in 1459 when a Dhambi named Rajia was buried alive in the founds to invoke good fortune on its defenders and to ensure its impregnability"...যোধপুর দুর্গের নির্ম্মাণ কৌশল ও বিরাটত্ব দেখিলে অবাক হইতে হয়। মানুষ যে নিজেদের বুদ্ধি ও বিক্রমবলে এত বিশাল ও বিরাট কিছু তৈয়ার করিতে পারে, তাহা লোকে না দেখিলে সহজে বিশ্বাসই করিবে না।

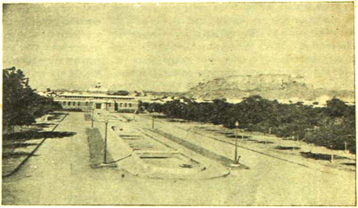

সাধারণের প্রমোদোদ্যান ও মিউজিয়াম

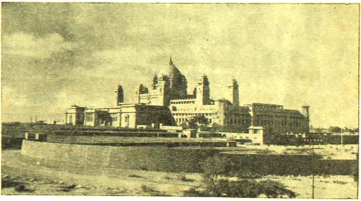

চিত্তর পর্ব্বতের উপর নূতন প্যালেস

এই বিশালত্ব লক্ষ্য করিয়াই যোধপুর, উদয়পুর ও বুঁদির দুর্গ সমূহ সম্বন্ধে কিপ্‌লিং (Kipling) সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে উহা দৈত্য, দানব ও পরীদের দ্বারা তৈয়ার হইয়াছে, নিশ্চয়ই মানুষের হাতে উহা তৈয়ারী নহে। এই দুর্গটি নিম্নভূমিতে ৫ মাইল স্থান বেষ্টিত করিয়া আরও একটি প্রকাণ্ড প্রাচীর তৈয়ার করা হইয়াছিল এবং উহারই মধ্যে যোধপুর সহর অবস্থিত। উহাও বিরাট এবং দুর্ভেদ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাও মালদেব এই প্রাচীর তৈয়ারী করেন এবং আজ পর্য্যন্ত কেহ উহাকে অধিকার করিতে পারেন নাই। ইতিহাস পর্য্যালোচনা

কথিত একবার মাত্র পতনের সংবাদ পাওয়া যায় এবং তাহাও শক্তির অভাব হেতু নহে—অবরুদ্ধ হইয়া খাদ্যের অভাব হেতু ঘটিয়াছিল। শহরের এই প্রাচীরের চারিটি সিংহদ্বার আছে যথা (১) নাগোরিয়া (উত্তরে) (২) মেড়তিয়া (পূর্বে) (৩) সোজাটিয়া (দক্ষিণে) (৪) জালোরিয়া এবং (৫) সিওয়ানচিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং চাঁদপোল (পশ্চিমে)। সিংহদ্বারগুলি খুবই দুর্ভেদ্য লৌহ দ্বারা সুরক্ষিত এবং ঐ সমস্ত দরজার উপর খুব বড় বড় 'স্পাইক' বর্শার ন্যায় ফলক লাগান করা আছে যাহাতে যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের হাতী কোনরূপ অনিষ্ট না করিতে সক্ষম হয়। এরূপ দুর্ভেদ্য দ্বার আমরা সাধারণতঃ কল্পনাতেই আনিতে পারি না। বর্তমানে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়াতে শহরের প্রাচীরের বাহিরে বহু মাইল ব্যাপিয়া নূতন যোধপুর শহরের সৃষ্টি হইয়াছে। ঢাকাতে যেমন রমনা, কলিকাতায় যেমন বালীগঞ্জ অঞ্চল, দিল্লীতে যেমন নূতন দিল্লী আছে, এখানেও সেইরূপ যোধপুর পুরাতন

Earth, Wolfram, Selenite) প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার মকর দুর্গের পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না, এখানকার মাকরানা খনি হইতে মার্বেল পাথর দিয়াই আগ্রার তাজমহল ও কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈয়ারী হইয়াছে। বাংলাদেশের ন্যায় এখানে শস্য শ্যামল ত নহেই, এখানে গাছপালাও খুবই কম দৃষ্ট হয়। শহরের মধ্যে যতগুলি গাছ দেখিতে পাওয়া যায় উহার অধিকাংশই নিম এবং বাকীগুলির মধ্যে কড়ি গাছ ও বাবলা গাছই প্রসিদ্ধ। বাংলা দেশের ন্যায় এখানে আম কাঁঠাল প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল গাছ নাই—ফলের মধ্যে পেয়ারা গাছ ও বেদানা গাছ মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়। বাবলা গাছ এ দেশের অনেক উপকারে আসে, ইহার পাতা ও বীজ পশুর আহারে লাগে এবং দুর্ভিক্ষের সময় মানুষেও খাইয়া থাকে। ইহার কাঠ দ্বারা আসবাবীর কাজ করা হয়, ইহার ছাল চামড়া কষা ও রং করা হয় এবং ইহার আঠা (gum Acacia) ঔষধের জন্য বিদেশে চালান যায়।

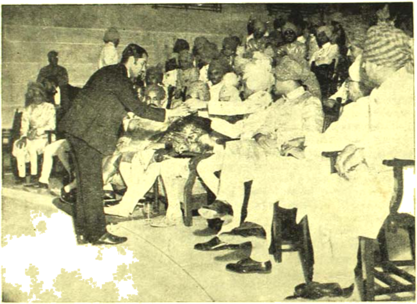
যাদুকর পি-সি-সরকার যোধপুর রাজ-দরবারে পনর ষোলজন দেশীয় নরপতির সম্মুখে যাদুবিদ্যা দেখাইতেছেন

টাউন ও নূতন টাউন আছে। নূতন এবং পুরাতনের এই অদ্ভুত মিশ্রণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার এই অভিনব মিলন ক্ষেত্র দেখিলে বেশ আনন্দ লাগে। একদিকে যেমন দক্ষ-শিল্পিনির্মিত বিচিত্র কারু-কার্যখচিত বিশাল অট্টালিকাগুলি অপরদিকে তেমনই আধুনিক বাগান শোভিত অতি আধুনিক বসতবাটী ইত্যাদি। যোধপুরের দৃশ্যাবলী অতিশয় সুন্দর। পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, আধুনিক পরিকল্পনানুযায়ী তৈয়ারী রাজবাটী ও ঠাকুর (রাজবংশীয়)দের বাটী, ইংরেজদের কোয়ার্টার, বিমান ঘাঁটি, সর্দারপুরা প্রভৃতি আধুনিকতার পূর্ণ পরিচয়। এখানকার সবই পাথরের তৈয়ারী, কলিকাতায় কচিৎ কখন মাঝে মাঝে দুই একটি পাথরের বাড়ী দৃষ্ট হয় কিন্তু এখানে ইঁটের তৈয়ারী বাড়ী কোনটিই দৃষ্ট হয় না। সবগুলিই লাল কাল পাথর অথবা শ্বেত পাথরের তৈয়ারী। যোধপুর মরুময় স্থান হইলেও এখানে খনিজ শিল্প ও পাথর যথেষ্ট পাওয়া যায়। এ স্থান লবণ, মার্বেল, চূর্ণ, (Sandstone, Gypsum, Fuller's

দুর্ভিক্ষের দিনে এ দেশের বড়ই দুরবস্থা হয়। যোধপুরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে। রাও যোধাজী যোধপুরের প্রতিষ্ঠাকল্পে পূর্বে মাণ্ডোরের নিকটস্থ সমস্ত পর্বত ও উচ্চভূমি পর্যবেক্ষণ করেন এবং শহর সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করেন। মাণ্ডোরে তখন চিড়িয়ানাথজী নামক একজন সন্ন্যাসী 'চিড়িয়াটোক' নামক গিরিগুহাতে বাস করিতেন। (উক্ত স্থান এখনও বর্তমান আছে এবং উহা 'চিড়িয়ানাথজী-কা-পাথ্‌লিয়া' নামে প্রসিদ্ধ)। রাও যোধাজী 'বাকুরিয়া কা ভাকরা' নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে উক্ত সন্ন্যাসী তাহাতে বাধা দেন এবং বর্তমানে যেখানে দুর্গ ও শহর বর্তমান আছে ঐ স্থানেই করিতে নির্দেশ দেন। উক্ত সন্ন্যাসী জানান যে দুর্গ স্থাপনের উহাই উপযুক্ত স্থান এবং উহা দুর্ভেদ্য হইবে। রাও যোধাজী সন্ন্যাসীর কথানুযায়ী উক্তস্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন কিন্তু সন্ন্যাসীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন বোধ করিয়া কয়েকজন লোক

পাঠাইয়া দেন। ইহাতে সন্ন্যাসীপ্রবর ক্রুদ্ধ হইয়া 'ধুনী' হইতে নিজের দেহে কাপড়ে অগ্নিপ্রয়োগ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাতে সন্ন্যাসীর দেহ বা পরিধান দগ্ধ হইল না এবং তিনি অভিশাপ দিয়া গেলেন যে 'এই রাজ্যে জল পাওয়া যাইবে না।' রাও যোধাজী সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা ও অভিশাপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ১৮ মাইল দূরে পলাশনী পর্য্যন্ত যান এবং তাঁহার নিকট হইতে অভিশাপের মাত্রা কমাইয়া লন যে 'প্রতি তিন বৎসর অন্তর এ রাজ্যে জলের অভাব হইবে।' যোধপুর রাজ্যের লোকেরা এখনও তাহাদের দেশের অনাবৃষ্টির কারণ উক্ত সন্ন্যাসীর অভিশাপ বলিয়াই জানে। মান্দোরে গেলে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতীয় ভাস্কর্য্য শিল্প কিরূপ উন্নত হইয়াছিল তাহা ব্রহ্মা, দুর্গা, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝা যায়। এখানে জল সরবরাহের জন্য কয়েকটি সুন্দর সুন্দর হ্রদ তৈয়ারী করা হইয়াছে—তন্মধ্যে পদ্ম সাগর, গোলাপ সাগর, ফতেহ সাগর, বাইজী-কা-তালাও, বালসমন্দ (বা সমুদ্রের শিশু) প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। দর্শকগণ ঐ হ্রদগুলি, বিমান ঘাঁটি, 'তেত্রিশ কোটি দেবতাকা স্থান' বা Hall of Heroes, কোর্ট রাইকাবাগ, রতনাডা ও ছিত্তর প্যালেস, জুবিলি কোর্ট, চিড়িয়াখানা, সিলভার জুবিলি ক্লব, মিউজিয়াম প্রভৃতি দেখিলে সন্তুষ্ট হইবেন। এখানকার চিড়িয়াখানায় হিংস্র পশু রাখিবার ব্যবস্থা কলিকাতা অপেক্ষাও অনেক ভাল। পরিচ্ছন্নতা ও আধুনিকতায় ইহা অনেক বড় বড় চিড়িয়াখানা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ দেশের রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে অসংখ্য ময়ূর দেখা যায়। দিনে দুই তিন শত ময়ূর দেখা এখানে মোটেই বিচিত্র নয়। এ দেশে ময়ূর, কাঠবিড়ালী ও কবুতর হত্যা করা আইনে কঠোর দণ্ডনীয় এইজন্যই বোধহয় উহারা স্বচ্ছন্দে মানুষের সম্মুখে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। এখানকার রাইকাবাগ প্যালেস খুবই প্রসিদ্ধ, কিন্তু বর্ত্তমানে ছিত্তর পর্ব্বতের উপর কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অনুকরণে এক কোটি পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি নূতন প্যালেস প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকের মতে ইহা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল অপেক্ষাও সুন্দর ও অধিকতর মূল্যবান। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈয়ার করিবার নিমিত্ত এ দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে পাথর লইয়া যাইতে হইয়াছিল এবং এখানে ঐ পাথরের অভাব নাই। এইরূপ নানা কারণে ইহা অল্প খরচে অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। এই বিচিত্র ও বহুমূল্য প্যালেস নির্ম্মাণে বাঙ্গালীরও আনন্দের কারণ আছে। বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার ডি-এন-গুপ্ত মহাশয়ের সুদক্ষ পরিচালনায় গত ১৩ বৎসর হইল উহা প্রস্তুত হইতেছে। গ্রেট হোটেল প্রমুখ আরও কয়েকটি বড় বড় বাড়ীও ঐ গুপ্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এইচ্‌. গুপ্ত মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র। অপরাপর বাঙ্গালীদের মধ্যে অধিকাংশই খ্যাতনামা ডাক্তার। উদাহরণ স্বরূপ ডাক্তার বিজয়কিরণবাবু, ডাক্তার ডি. এন. চ্যাটার্জ্জী, ডাক্তার কালীমোহন গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহারা প্রত্যেকেই মাসিক সহস্রাধিক টাকা উপার্জ্জন করেন এবং এই সুদূর দেশে বাঙ্গালীর নাম, খ্যাতি, যশ বৃদ্ধি করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সম্প্রতি যোধপুরের মহারাজা সাহেব বাহাদুর, তাঁহার নিজস্ব চিকিৎসক বিজয়কিরণবাবু (ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার) কে বিশেষ কার্য্যে প্রীত হইয়া প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে 'সোনা একবাড়ী তাজিম ও হাতী সিরোপা' সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। একমাত্র রাজা বংশীয় ছাড়া এই সম্মান খুব কম লোকেই পাইয়াছেন। যোধপুরের মহারাজা বিজয়কৃষ্ণবাবুর পিতা পরলোকগত ডাক্তার এন্‌-সি-মজুমদার মহাশয় প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আসেন এবং মহারাজা যশোবন্ত সিংহের নিজস্ব চিকিৎসক মনোনীত হন, বর্ত্তমানে তাঁহারই সুযোগ্যপুত্র সে স্থানে অধিকার করিয়া আছেন। ডাক্তার ডি, এন, চ্যাটার্জ্জীর নিবাস বরিশালে এবং তিনি এখানকার হাসপাতালের বড় ডাক্তার। টিউবারকুলোসিস রোগে তিনি বিশেষ পারদর্শী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ডাক্তার কালীমোহন গুপ্ত মহাশয়ও এখানে স্বনামখ্যাত। বিগত যাট বৎসর তাঁহারা বংশ পরম্পরানুযায়ী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে ইঁহারা সকলেই প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও সম্মানের অধিকারী হইয়াও কেহই বাংলাদেশকে ভুলেন নাই। 'বঙ্গশ্রী' ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা, নবাগত বাঙ্গালীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্যকরা সকলই প্রশংসনীয়। মেদিনীপুরের দুর্দ্দশাগ্রস্তদিগকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করিয়া ইহারা বহু সহস্র টাকা তুলিয়াছেন। বাংলার বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীগণ বাংলাকে যে ভুলেন নাই তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেই গর্ব্ব ও আনন্দ বোধ করিবেন। যখন ষ্টেট হইতে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের জন্য আমার ডাক আসিল তখন বাঙ্গালীমাত্রেই আন্তরিকভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। ভাষার উপর যাদুকরী আমার আয়ত্বের বাহিরে। তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে যোধপুর রাজ্য খুব সুন্দর, এখানকার রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন, বাড়ীঘর আধুনিক ধরণে তৈয়ারী বলিয়া খুবই মনোরম। এখানকার জমি উর্ব্বরা নহে সকলই মরুময়, এখানকার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য খুবই ভাল। লোকজন যুদ্ধ করিতে ভালবাসে বলিয়াই বোধহয় অধিকাংশ লোকই যোদ্ধা বা সৈনিক। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়া ইহাদের প্রথার পরিচয়। এখানকার রাজা হিন্দু এবং সূর্য্যবংশীয় বলিয়া এখনও ব্রাহ্মণগণ রাজদরবারে অনেক সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে।

শরৎ-বন্দনা

শ্রীসুবোধ রায়

শরতের বাণী দুকূল ছাপিয়া
ভাসিল মনের বাঁধ,
ভাবের আকাশে চির-উজ্জ্বল
শুভ্র শারদ-চাঁদ।
সে আলোকে হেরি ধরণীর মায়া
নয়ন-ভোলানো লভিল যে কায়া
অবহেলিতও দিয়ে যায় প্রাণে ,
অমৃতের পরসাদ।

সে-আলোকে হেরি বেদনার রাঙা
তোমার প্রাণের ঝারি
মুক্ত করিয়া বাণী-মন্দিরে
ঢালিল তীর্থ-বারি।
সে-বারি পরশে শুচি হ'ল মন
খসিল মিথ্যা-মোহ-আবরণ,
ধরার ধূলায় দেখি ফুটে আছে
নন্দন-পারিজাত।

বাহির বিশ্ব

মিহির

বিমান-আক্রমণ ও আসন্ন দ্বিতীয় রণাঙ্গন

দক্ষিণ ও পশ্চিম য়ুরোপে সম্মিলিত পক্ষের বিমানবাহিনী প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে। দক্ষিণ য়ুরোপে প্রধান লক্ষ্য দুর্গ বন্দর, পোতাশ্রয় ও বিমানক্ষেত্র; পশ্চিম য়ুরোপে বিমান আক্রমণ চলিতেছে প্রধানতঃ শিল্পকেন্দ্র ও রেলপথের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ দক্ষিণ য়ুরোপে সম্মিলিত পক্ষ শত্রুর নৌ ও বিমানশক্তি ক্ষয় করিয়া সমুদ্রপথে ও আকাশে নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন; আর পশ্চিম য়ুরোপে তাঁহারা চাহেন শত্রুর রণশিল্পকেন্দ্র ও রসদসরবরাহ-ব্যবস্থা পঙ্গু করিতে। সম্মিলিত পক্ষের বিমান-তৎপরতার গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে মনে হইবে দক্ষিণ য়ুরোপই ইঙ্গ-মার্কিন-বাহিনী সৈন্য অবতারণের নির্বাচিত ক্ষেত্র; আর সাধারণভাবে শত্রুর সমর-প্রচেষ্টা ছিন্ন করিবার জন্য পশ্চিম য়ুরোপে তাঁহাদের প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চলিতেছে।

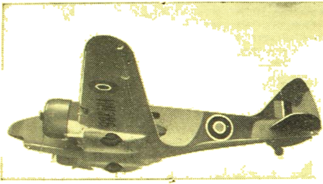

আকাশ-পথে বিমানপোত এ্যারস্পিড্, অক্সফোর্ড এম্-কে ২নং

ইঙ্গ-মার্কিন সমর-নায়কদিগের অভিসন্ধি সম্বন্ধে এই অনুমান সঙ্গত হইলেও অনুমানের গতি এইখানেই সংযত করা উচিত নহে। সম্মিলিত পক্ষ এখন যেভাবে য়ুরোপকে পরিবেষ্টন করিয়াছেন এবং বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের আয়োজন যেরূপ ব্যাপক, তাহাতে নরওয়ের অন্তর্গত নার্ভিক্ হইতে ফ্রান্সের ব্রেষ্ট পর্যন্ত এবং ভূমধ্য সাগরের তীরে ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূল হইতে স্যালোনিকা পর্যন্ত যে কোন স্থানে অথবা একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের অভিযান আরম্ভ হওয়া অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ সম্মিলিত পক্ষ এখন বিভিন্ন স্থান হইতে অভিযানে উদ্যত হইয়া শত্রুকে সন্ত্রস্ত রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; আপনাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া শত্রুকে সর্বত্র প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য করিতেছেন। স্নায়ু-যুদ্ধ নামক যে বিশিষ্ট অস্ত্রের ব্যবহারে পূর্বে অক্ষশক্তিরই একচেটিয়া ছিল, সম্মিলিত পক্ষ এখন সেই অস্ত্রই তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেছেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম য়ুরোপে বর্তমানে বিমান-তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, ইঙ্গ-মার্কিন বিমান-শক্তি এখন অন্তরীক্ষে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। প্রবল শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলে সৈন্য অবতরণ করাইতে হইলে প্রথমে আকাশে আধিপত্য বিস্তার একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন এখন পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আর সম্মিলিত পক্ষের রাজনৈতিকদিগের উক্তি শ্রবণ করিয়া মনে হয়, কেবল বিমান আক্রমণ দ্বারা শত্রুকে পঙ্গু করিবার দুরাশা তাঁহারা এখন ত্যাগ করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন—তাঁহার য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির আগ্রহ মঃ ষ্ট্যালিনের আগ্রহ অপেক্ষা কম নহে। বলা বাহুল্য—মঃ ষ্ট্যালিন্ ও তাঁহার সহকর্মিগণ অক্ষশক্তির অধিকৃত অঞ্চলে সৈন্য অবতারণ করাইয়া প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে আঘাত করিবার দাবীই পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন।

প্যান্টেলেরিয়া ও ল্যাম্পেডুসা

জুন মাসে ভূমধ্য সাগরের ইটালীর ঘাঁটী প্যান্টেলেরিয়া ও ল্যাম্পেডুসা এবং আরও দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপ সম্মিলিত পক্ষের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। প্যান্টেলেরিয়া ও ল্যাম্পেডুসা ইটালীর রক্ষা-প্রাচীরের দুইটী শক্তিশালী দুর্গ; এই দুইটি দ্বীপ দুর্গের আত্মসমর্পণে অক্ষশক্তির ও সমুদ্রবক্ষে ইটালীর প্রতিরোধ-বেষ্টনী সঙ্কুচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পশ্চিম ভূমধ্য সাগরে সম্মিলিত পক্ষের জাহাজ চলাচলের সর্বাধিক বিঘ্নসঙ্কুল অঞ্চল এখন একরূপ নিরাপদ। পূর্বে সিসিলি ও টিউনিসিয়ার মধ্যবর্তী সমুদ্রাংশেই সম্মিলিত পক্ষের জাহাজগুলি নিয়মিতভাবে আক্রান্ত হইত; দক্ষিণ সিসিলি, প্যান্টেলেরিয়া ও ল্যাম্পেডুসাই ছিল এই সকল আক্রমণ পরিচালনের প্রধান ঘাঁটি। প্যান্টে-

প্রথম নিগ্রো পাইলট্ অফিসার পিটার থমাস্

লেরিয়া ও ল্যাম্পেডুসাও সম্মিলিত পক্ষের অধিকারভুক্ত হইয়াছেই; এখন সিসিলি, সার্ডিনিয়া ও দক্ষিণ ইটালী সম্মিলিত পক্ষের বিমান-আক্রমণে যেভাবে বিধ্বস্ত হইতেছে তাহাতে তাহাদের আত্মরক্ষাশক্তি ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, এই সকল অঞ্চলে বিমানঘাঁটী ও পোতাশ্রয়ই সম্মিলিত পক্ষের প্রধান লক্ষ্যস্থল।

সিসিলি ও টিউনিসিয়ার মধ্যবর্তী সমুদ্রাংশে ইঙ্গ-মার্কিন বিমানে ও নৌবাহিনীর প্রভুত্ব বিস্তৃত হওয়ায় ইটালীর উপকূলবর্তী জাহাজ চলাচলের পথ একরূপ অচল। সিসিলি ও ইটালীর মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ মেসিনা প্রণালী পথে টিরীনীয়ান্ সাগরের সহিত আড্রিয়াটিক ও ঈজিয়ানের সাগরের সংযোগ রাখা সম্ভব ছিল। কিন্তু মেসিনা বন্দরে ও রেজিও ডি ক্যালাব্রিয়ায় সম্মিলিত পক্ষের বিমান যেভাবে আঘাত হানিতেছে, তাহাতে মেসিনা প্রণালী একরূপ অবরুদ্ধই হইয়াছে। এই অঞ্চলে বিমান আক্রমণ চালাইয়া জেনারল এইসেন্‌হাওয়ার এক দিকে টিরীনীয়ান্-আড্রিয়াটিকের শেষ সংযোগ ছিন্ন করিতেছেন, তেমনই সিসিলিকে ইটালীর সহিত বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিতেছেন।

ব্রিটিশ সৈন্যের বিমানপোতে আরোহণ

রুশ রণাঙ্গন

রুশিয়ায় এখনও জার্মানীর আক্রমণ আরম্ভ হয় নাই। অথচ গত বৎসর মে মাসের মধ্যভাগেই জার্মানী রুশিয়ার বিরুদ্ধে গ্রীষ্মকালীন অভিযান আরম্ভ করিয়াছিল; গত পূর্ব্ব বৎসর ২২শে জুন জার্মানীর অভিযান আরম্ভ হয়। এই বৎসর বহু পূর্ব্বেই রুশিয়ার প্রাকৃতিক অবস্থা ব্যাপক যুদ্ধ পরিচালনার উপযোগী হইয়াছে।

পূর্ব্ব য়ুরোপে জার্মানীর তৎপরতার এই বিলম্বের কারণ সম্বন্ধে স্বভাবতই মনে হয়, টিউনিসিয়ায় জার্মানীর প্রতিরোধের অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত অবসানে এবং তাহার ফলে য়ুরোপে সম্মিলিত পক্ষের প্রত্যক্ষ অভিযানের আশঙ্কা অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত বৃদ্ধি হওয়ায় জার্মানী পূর্ব্ব য়ুরোপে ব্যাপক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইতস্ততঃ করিতেছে। সম্প্রতি এইরূপ জনরবও রটিয়াছে যে, পশ্চিম ও দক্ষিণ য়ুরোপের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য জার্মানী পূর্ব্ব য়ুরোপ হইতে সৈন্য অপসারণ করিতেছে।

বলা বাহুল্য, জার্মানীর অভিযান আরম্ভ হইতে যতই বিলম্ব ঘটিবে, অভিযানের পথে ততই প্রকৃতিদেবীর বিঘ্ন সৃষ্ট হইবে। ভূমধ্য সাগরের পোতাশ্রয় ও বিমানক্ষেত্র এখন প্রতিদিন সম্মিলিত পক্ষের বিমান-আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছে, তাহাদের সৈন্য ও সমরোপকরণবাহী জাহাজগুলির পক্ষে ভূমধ্য সাগর এখন একরূপ নিষিদ্ধ। ইহার ফলে রুশিয়ায় দ্রুত বৈদেশিক সমরোপকরণ পৌঁছিবার পথ সংক্ষেপ হইয়াছে, ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ পারে সম্মিলিত পক্ষের প্রত্যেকটি আক্রমণ ঘাঁটীর শক্তি বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য হইয়াছে। পশ্চিম য়ুরোপের সম্মিলিত পক্ষের বিমান-আক্রমণে সমরশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে বিধ্বস্ত হইতেছে, তাহাতে জার্মানীর আক্রমণ ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা। সমুদ্রপথে জার্মানী আর সাফল্যজনক সাবমেরিণ আক্রমণ চালাইতে পারিতেছে না; গত মে মাসে আটলাণ্টিক মহাসাগরে তাহার ৩০ খানি সাবমেরিণ ধ্বংস হইয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল্ সম্প্রতি তাহার গিল্ডহলের বক্তৃতায় বলিয়াছেন—জুন মাসে সাবমেরিণ-তৎপরতা যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর গত ৪৬ মাসের মধ্যে সেরূপ কখনও ঘটে নাই। সমুদ্রবক্ষে সমস্যার সমাধানের সহিত রুশিয়ার বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি, বৃটেন, উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। জার্মানী এতদিন এই একটি ক্ষেত্রে সম্মিলিত পক্ষকে বিশেষভাবে বিব্রত করিতেছেন। এখন এই সমুদ্রবক্ষের অবস্থাও তাহার প্রতিকূল।

কেহ কেহ অনুমান করেন—জার্মানী পূর্ব্ব য়ুরোপে আর আক্রমণাত্মক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না; সে এখন তাহার অধিকৃত য়ুরোপখণ্ডের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম—সর্ব্বত্র প্রতিরোধাত্মক সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিবে। পূর্ব্ব-বর্ণিত অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে—সামরিক দৃষ্টিতে এখন জার্মানীর পক্ষে কখনই প্রতিরোধাত্মক সংগ্রাম বাঞ্ছনীয় নহে, এমন কি শত্রুকে উপযুক্তরূপে প্রতিরোধের জন্যও তাহার আক্রমণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সামরিক প্রবাদবাক্য আছে—আক্রমণই শত্রুকে প্রতিরোধের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে—ইঙ্গমার্কিন সৈন্য অতি সত্বর য়ুরোপে অবতরণ প্রয়াসী হইবে। মিঃ চার্চ্চিল ভবিষ্যবাণী শুনাইয়াছেন—গাছের শরৎকালীন পাতা ঝরিবার পূর্ব্বেই ভূমধ্য সাগরে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ তৎপরতা দেখা দিবে। ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য যদি কেবল য়ুরোপখণ্ডে অবতরণ করিতে পারে এবং তাহার পর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যদি তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, তাহা হইলেও সেই সুযোগে দুর্দ্ধর্ষ রুশ বাহিনী পূর্ব্ব য়ুরোপ হইতে প্রবল আঘাত হানিতে আরম্ভ করিবে; জার্ম্মান ব্যূহ যদি গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সে আঘাত সহ্য করিতেও পারে, তাহা হইলেও শীতকালে উহা ধূলিসাৎ হইবে নিশ্চয়ই; ফলত তখন রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তের বাহিরেই যুদ্ধ হইবে।

সামরিক দৃষ্টিতে এইরূপ নৈরাশ্যজনক ভবিষ্যৎ লইয়া জার্মানী যদি প্রতিরোধাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাহা করিবে। সে যদি এখনও পূর্ব্ব য়ুরোপে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া এই বৎসর রুশিয়ার সমর-শক্তি চূর্ণ করিতে পারে, তাহা হইলে যুদ্ধের গতি তাহার অনুকূলে হইবার ক্ষীণ আশা এখনও আছে। এই আশা সে নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিবে না। নিতান্ত বাধ্য হইয়া জার্মানী যদি

প্রতিরোধমূলক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে মার্কিন রাজনীতিকগণ দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়া যুদ্ধে অচল অবস্থা আনাইয়া সম্মিলিত পক্ষকে মীমাংসায় আগ্রহান্বিত করাইতে প্রয়াসী হইবেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিবেন—"সর্বাত্মক বর্বরতা" ও "ইঙ্গ-মার্কিন বলদর্পের" উচ্ছেদ ঘটাইয়া নূতন বিশ্ব-ব্যবস্থা কায়েম করার পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হইয়াছে। এখন কৌশলে সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে বিভেদ ঘটাইয়া সেই বিভেদের সুযোগে বাঁচিবার চেষ্টা করাই অক্ষশক্তির একমাত্র উপায়। এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য যুদ্ধকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করা প্রয়োজন, রণক্ষেত্রে অচল অবস্থা আনয়ন অত্যাবশ্যক।

আমেরিকার ধর্মঘট

আমেরিকায় কয়লার খনিতে গত কিছু কাল গোলযোগ চলিতেছে। মজুরী বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়াছিল। এই সম্পর্কে খনির মালিকদিগের সহিত শ্রমিকদিগের কোনরূপ মীমাংসা না হওয়ায় মার্কিন গভর্ণমেন্ট সাময়িকভাবে খনিগুলির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে কিছু শ্রমিক কাজে যোগ দিয়াছে; এখনও বহু শ্রমিক কাজে যায় নাই। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া আমেরিকার দুইটি আইন পরিষদ ধর্মঘট-বিরোধী আইন পাশ করিয়াছেন; এই আইনের বলে ধর্মঘটে প্ররোচনাকারীদিগকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা আছে। এই আইন পাশ হওয়ায় সমগ্র দেশে শ্রমিকদিগের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি নিবারণের জন্য যে বিধান প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, আইন পরিষদ দুইটি সেই বিধানও বাতিল করিয়াছে, অতঃপর তিনি খাদ্য-সামগ্রীর মূল্য-বৃদ্ধি নিবারণের জন্য গভর্ণমেন্টের আর সাহায্য করিতে পারিবেন না।

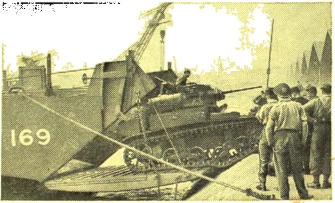

ডিঙ্গি জাহাজ হইতে একটি ট্যাঙ্ক উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধের জন্য ওরানে অবতরণ করিতেছে

যুদ্ধের এই সন্ধিক্ষণে কয়লার খনির ন্যায় মূল শিল্পে (key industry) ধর্মঘট যে অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রমিকদিগের প্রকৃত কল্যাণকামী কোন ব্যক্তি ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধের এই সন্ধিক্ষণে সম্মিলিত পক্ষের তথাকথিত অস্ত্রাগার (arsenal) আমেরিকায় ধর্মঘটে উৎসাহ দিতে পারেন না। কাজেই, এই ধর্মঘট সম্পর্কে যে শ্রমিক নেতার নাম পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, সেই মিঃ লুইসের অকপটতায় সঙ্গতভাবেই সন্দেহ করা যাইতে পারে।

এই ধর্মঘট সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে মনে হইবে—আমেরিকার ধনিকদিগের একটি শক্তিশালী শ্রেণী ইহাতে গোপনে প্ররোচনা দিয়াছেন। পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি নিবারণের জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে বিধান প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে ধনিকদিগের মোটা লাভ পাইতে অসুবিধা হইতেছিল। বর্তমান ধর্মঘট সেই বিধান বাতিল করিবার কৌশল মাত্র। শ্রমিকরা যদি মজুরী বৃদ্ধি দাবী করে, তাহা হইলেই ধনিকরা বলিবার সুযোগ পান—পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইলেই মজুরী বৃদ্ধি করা হইবে। বস্তুতঃ কয়লার খনির মালিকরা ধর্মঘটের প্রথম অবস্থায় এইরূপ উক্তিই করিয়াছিলেন।

মিঃ লুইস এই সকল ধনিকের ক্রীড়নক বলিয়াই মনে হয়। মার্কিণ আইন পরিষদে যেন এই সকল অসাধু ধনিকের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। আইন পরিষদ ধর্মঘট-বিরোধী আইন পাশ করিয়া শ্রমিকদিগের ক্রোধ বৃদ্ধি করিয়াছেন; আবার খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া শ্রমিকদিগকে মজুরী বৃদ্ধির দাবী করিতে সুযোগ দিয়াছেন। এখন যদি সমগ্র দেশময় শ্রমিক-বিক্ষোভ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি নিবারণ আইন হয়ত সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিবার চেষ্টা হইবে। শ্রমিকদিগের মজুরীও কিছু বাড়িবে।

বলা বাহুল্য—সর্বপ্রকার পণ্যের মূল্য যদি অবাধ গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে শ্রমিকদিগের বর্ধিত মজুরী তাহার নাগাল পায় না—পণ্যের মূল্যের হার ও শ্রমিকের মজুরীর হার কখনই সমান তালে চলে না। শেষ পর্যন্ত ইহাতে গরিবেরই দুঃখ বাড়ে; ধনীর গায়ে আঁচ লাগে না; বরং তাহার লাভের অঙ্ক ক্রমেই মোটা হইতে থাকে।

সুদূর প্রাচী

জাপানের মনোভাব এখনও রহস্যাবৃত। হয়ত তাহার প্রতীক্ষা দ্বিধাই তাহাকে বিভ্রান্ত করিল। ককেশাস্ ভেদ করিয়া জার্মান সেনা পশ্চিম এশিয়ায় আসিবে, আর পূর্বদিক হইতে জলপথে ও স্থলপথে জাপান অগ্রসর হইয়া তাহার সহিত হাত মিলাইবে—ইহাই হয়ত অক্ষশক্তির পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু হিমালয়ের মত অটুট সোভিয়েট বাহিনী সে পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়াছে। জাপান এখন বুঝিয়াছে—সে একাকী, একাকীই তাহাকে চলিতে হইবে।

জাপানের তৎপরতা বর্তমানে চীনে বিশেষভাবে নিবদ্ধ। চীনের প্রতিরোধ চূর্ণ করিবার জন্য অস্ত্র ও কূটনৈতিক কৌশল—দুই-ই সে সমানভাবে প্রয়োগ করিতেছে। বরং অস্ত্র অপেক্ষা কৌশলের প্রয়োগই সে অধিক। দীর্ঘ ৭ বৎসরের যুদ্ধে চুংকিং চীন আজ নিঃস্ব ও ক্লান্ত; সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ অবস্থায় সে এখন বৈদেশিক সাহায্যও বিশেষ পাইতেছে না। আর তাহারই পার্শ্বে নান্‌কিং চীন জাপানের অনুগ্রহে পুষ্ট হইতেছে, তথাকার অধিবাসীরা খাইতে পায়, পরিতে পায়; সেখানকার ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ক্রমে জমিয়া উঠিতেছে। নান্‌কিংকে এইভাবে পুষ্ট করিয়া জাপান চুংকিংয়ের অধিবাসীদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া বলিতেছে—"এই দেখ, আমরা চীনাদের কতদূর হিতাকাঙ্ক্ষী!" সম্প্রতি মাদাম চিয়াং-কাই সেক্ অটোয়ায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—জাপানীদিগের প্রচার যে অত্যন্ত জোরাল, সমরাস্ত্র অপেক্ষাও হয়ত ইহা অধিক শক্তিশালী। যে জাপানের পাশবিক অত্যাচারের সহিত কেবল নাৎসী জার্মানীর অত্যাচারের তুলনা চলিতে পারে, সেই

জাপান নাকি এখন চীনাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেছে এবং বলিতেছে, "আমরা তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ; তোমাদের উৎপীড়কদিগকে দমন করিতে চাহি মাত্র।" মাদাম চিয়াং বলেন—হংকং-এ ধৃত শ্বেতাঙ্গদিগের প্রতি জাপান দুর্ব্যবহার করিয়াছিল বটে ; কিন্তু ধৃত চীনাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহারই করিয়াছে।

অবশ্য, চীনে জাপানের সমর-যন্ত্র তত প্রবল আঘাত হানিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি মধ্য চীনে জাপানের একটি বড় আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থই হইয়াছে। অন্যান্য রণক্ষেত্রেও প্রাধান্য দখলে জাপান বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

সম্মিলিত পক্ষের রাজনীতিকগণ এখন স্পষ্টভাবে দাবী করিতেছেন যে, সুদূর প্রাচীতে তাঁহাদের অবস্থা উন্নত। ইহার কারণ বোধ হয়—প্রথমতঃ অষ্ট্রেলিয়ায় সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা দৃঢ় হইয়াছে ; সম্প্রতি ঐ অঞ্চলে দুই একটি বিমান-যুদ্ধে সম্মিলিত পক্ষের শক্তি প্রকাশও পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে আলিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া মার্কিনী সেনা আটু দ্বীপ হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে ; এখন কিস্কার বিরুদ্ধে তাহাদের আক্রমণ আসন্ন। এই অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তাহারা প্রশান্ত মহাসাগরে আক্রমণ পরিচালনের উত্তম ঘাঁটী লাভ করিবেন। তৃতীয়তঃ এবং সর্বোপরি, সম্মিলিত পক্ষের উৎসাহের কারণ হয়ত ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে তাঁহাদের সাফল্য। ভূমধ্যসাগরপথ নিরাপদ হইলে এ অঞ্চলের নৌবহরের কিয়দংশ ভারত মহাসাগরে স্থানান্তরিত হইতে পারিবে এবং তাহার সাহায্যে ব্রহ্মদেশে অভিযান আরম্ভ করা সম্ভব হইবে। এই অভিযানের দ্বারা ব্রহ্মচীন পথ উন্মুক্ত করিয়া চীনের সামরিক শক্তির বৃদ্ধিসাধন এবং চীন হইতে জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাত করাই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনের প্রশস্ত পন্থা। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের অবস্থা উন্নত হওয়ায় এইভাবে যুদ্ধ-পরিচালন-সম্ভাবনা নিকটবর্তী হইয়াছে বলিয়াই হয়ত সম্মিলিত পক্ষ এখন সুদূর প্রাচী সম্পর্কে আশান্বিত হইয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্র প্রসঙ্গ

প্রিন্সিপাল শ্রীধীরেন্দ্রলাল দাস এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি

চৈত্রের ভারতবর্ষে দ্বিজেন্দ্রপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ এবং পরসংখ্যায় ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের উত্তর পাঠ করিলাম। আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। যদিও বাংলা সাহিত্য সরকারীভাবে আমাকে অধ্যয়ন করিতে হয় নাই, তথাপি স্বর্গীয় চারুবাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, চারুবাবুর সান্নিধ্য সেদিন ইউনিভার্সিটিবাসী মাত্রেই সর্বাধিক আনন্দ পাইতেন। শ্রীযুক্ত কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলেজ জীবন তখনও সুরু হয় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে চারুবাবুর সহিত আমার আলোচনা হয়, সে কথা আজ মনে পড়িতেছে ; "দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের কথা যদি বল আমি প্রশংসা করতে অপারগ, তাঁর একটি বই আমি ভাল ক'রে পড়েছি, ভাল লেগেছে, সে তাঁর মন্দ্র।" চারুবাবু সেদিন এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তৎপর দ্বিজেন্দ্রলালকেও যে তিনি একথা বলিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। কনকবাবু দ্বিজেন্দ্র সাক্ষাৎকারের যে বিবরণটি দিয়াছেন চারুবাবুর মুখে আমিও সেদিন তাহা শুনিয়াছিলাম।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও একথা বলিব ডাঃ মজুমদার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি চারুবাবুর যে attitude-এর কথা বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কাল্পনিক নয়। চারুবাবু ছিলেন রবীন্দ্র কাব্যরসে বিভোর। আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ দ্বারা তিনি সমসাময়িক কবির বিচার করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যে গীতি কাব্য-রস তাহাই তিনি কবিশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করিতেন। মন্দ্র ছাড়া অন্য কোন লেখায় এই কাব্যরস চারুবাবু পান নাই বলিয়াই বোধহয় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নিকট সাড়া পেত নাই কোনদিন, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বাদ দিয়া শুধু মন্দ্রকে কাব্য হিসাবে স্বীকার করাকে দ্বিজেন্দ্রানুরাগ বলা চলে কি ?

কনকবাবু ঢাকা হলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাভিনয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হলের নাটক নির্বাচন অনেকাংশে ছাত্রদের অভিরুচির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। এই ব্যাপারে কোন অধ্যাপক বা House tutor বিশেষের ব্যক্তিগত রুচি বড় একটা প্রয়োগ করেন না। চারুবাবুর House tutor থাকা কালে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ঢাকা হলে অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া ডাক্তার মজুমদার উল্লিখিত চারুবাবুর দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক-অপ্রীতির কথা খণ্ডিত হয়না।

মোট কথা, শ্রীযুক্ত কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ডাক্তার মজুমদারের উক্তি কোথাও অপ্রমাণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিনা। চারুবাবুর হয়ত দ্বিজেন্দ্রলালের জন্য (বন্ধুত্বের কারণে) একটা soft corner ছিল, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক তথা রচনার অধিকাংশের প্রতি চারুবাবু বিমুখ ছিলেন এ কথা কনকবাবু খণ্ডন করিতে পারেন নাই। আর তাহা হইলেই বা কি ? ইহা দোষের মোটেই নয়—সকলের সব লেখক ভাল লাগিবে এরূপ নিশ্চয়তা কি আছে ? কবি সত্যেন্দ্র দত্ত নাকি Wordsworth কে দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। (এ বিষয়ে আর কোন প্রতিবাদ প্রকাশিত হইবে না। ভাঃ সঃ)

হে নটরাজ নৃত্য কর—

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেন গুপ্ত এম্‌-এ

বাজাও তোমার ডমরুধ্বনি—
  হে নটরাজ, নৃত্য কর,
তোমার প্রলয় নৃত্য মাঝে
  নতুন করে পৃথ্বী গড় !
রক্ত লোলুপ মানুষ যত,
  পিশাচ সম অট্টহাসে ;
পাপের বোঝা বাড়ছে শুধু—
  ধাত্রী বুঝি ধসিয়ে আসে !

রক্ত-স্রোতে আত্মঘাতী
  পশুর মতো চলছে ছুটে —
সভ্য নামের আড়াল হ'তে
  বর্বরতা উঠছে ফুটে।
কোথায় শান্তি, সত্য কোথায় ?
  প্রবঞ্চনা—বুকের বাণ :
ধ্বংস ক'রে গড়াও আবার—
  নতুন ক'রে জগৎ-খানি।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। বিগত ৬ই আষাঢ় রবিবার তিনি বাংলার রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরবিদায় লইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৫১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রজগতের যে ক্ষতি হইল তাহা পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। নাট্যাভিনয় ও ছায়াচিত্রে তাঁহার অপূর্ব্ব দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার বিয়োগ ব্যথায় বাংলার নাট্যামোদী ও চিত্রামোদী জনসাধারণ বেদনা কাতর।

চব্বিশ পরগণার কালিকাপুরের বিখ্যাত জমিদার বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতেই অভিনয়ের প্রতি তাঁহার প্রবল ঝোঁক ছিল। ধনী জমিদার গৃহের আরাম বিলাস অপেক্ষা অভিনয়ই ছিল তাঁহার কাছে প্রিয়। অভিনয়ের প্রতি তিনি এত অনুরাগী ছিলেন যে সংসারের কোনও বাধা বিঘ্নই তাঁহাকে তাহা হইতে বিরত করিতে পারে নাই। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের কোনও নিষেধই তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি ছিলেন সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। শৈশব হইতেই তাঁহার অভিনয় নৈপুণ্যে গ্রামের লোক বিস্মিত হইত।

তাঁহার পিতা ৺তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেখিলেন গ্রামে থাকিলে পুত্রের লেখাপড়া কিছুই হইবে না। সেজন্য তিনি পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইলেন স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য। পুত্রের কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি মোটেই মনোযোগ ছিল না। তাঁহার শিল্পী মন তাঁহাকে শিল্পের প্রতিই আকৃষ্ট করিল, এবং তিনি ভর্ত্তি হইলেন আর্ট স্কুলে। আর্ট স্কুলে তিনি দুই বৎসর শিল্প চর্চ্চা করেন। তাহার পর তাঁহার

পরলোকে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সহজাত অভিনয় প্রবৃত্তি হইতে অভিনয়ের প্রতি টানিল। এই সময় "তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী" নামে একটি নূতন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছিল। তিনি এই নবগঠিত ফিল্ম প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিলেন। কিন্তু অভিনেতা রূপে নয়, চিত্রকর রূপে। তখন এই প্রতিষ্ঠানের প্রচারপত্র অঙ্কন করিবার লোকের প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহাকে গ্রহণ করা হয়। তিনি তাহাতেই রাজী হইলেন এই আশায়—একটি ফিল্ম কোম্পানীর সংস্রবে থাকিলে ভবিষ্যতে হয়ত অভিনয়েরও সুযোগ পাওয়া যাইতে পারে। হইলও তাহাই। ঐ কোম্পানীর "মানভঞ্জন" চিত্রে একটি অবতার দৃশ্যে তিনি সর্বপ্রথম ক্যামেরার সম্মুখীন হইলেন। ইহার পরই মিলিয়া গেল স্বর্ণ সুযোগ। তাঁহাকে শরৎচন্দ্রের "চন্দ্রনাথ" চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অবতরণ করিতে দেওয়া হইল। "চন্দ্রনাথ" যখন চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হইল, তখন মুগ্ধ দর্শকবৃন্দ এই নবাগত অভিনেতাকে বিপুল অভিনন্দন জানাইলেন। ইহার পরই তিনি চিত্রজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তখন তাঁহার ন্যায় সুপুরুষ অভিনেতা বাঙ্লায় এমন কি সারা ভারতে ছিল কিনা সন্দেহ।

এইবার তাঁহার মন মঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি আর্ট থিয়েটারে যোগদান করিলেন। 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে বিকর্ণের ক্ষুদ্র ভূমিকায় তিনি সর্বপ্রথম পাদপ্রদীপের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার অভিনয়গুণে এই ক্ষুদ্র ভূমিকাটি প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। ইহার পর তিনি রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা"র পূর্ণর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া অসাধারণ খ্যাতি এবং বাঙ্লায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ নটের সম্মান লাভ করেন।

অতঃপর তিনি পুনরায় ছায়াচিত্রে যোগদান করেন। নির্বাক চিত্রের যুগে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা। "কৃষ্ণকান্তের উইলে" তাঁহার অভিনয় বাঙালী কখনও ভুলিবে না। "দুর্গেশনন্দিনী"তে ওসমানের ভূমিকায় এবং "কপালকুণ্ডলা"র নবকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া তিনি সমগ্র প্রদেশের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন।

সবাক চিত্রের যুগে নিউ থিয়েটার্সের "চণ্ডীদাসে" তিনি যে অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন সকলেই তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি যুগপৎ মঞ্চে ও পর্দায় অভিনয় করিয়া অসাধারণ সাফল্য অর্জন করিয়া আসিয়াছেন।

নাটক পরিচালনায় তাঁহার দক্ষতা বড় কম নয়। তিনি বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য-পরিচালকের খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। "স্বামী-স্ত্রী", "পি-ডবলিউ-ডি" "রক্তের ডাক" প্রভৃতি নাটকে তাঁহার অভিনয় ও পরিচালনা কলিকাতাবাসীর অন্তরে চিরদিন জাগরূক থাকিবে। রূপসজ্জাতেও তিনি অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। "[illegible]"-এ ও "চিরকুমারী" নাটকে অতুলনীয় রূপসজ্জায় তিনি দর্শকদিগকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে পালা অভিনয়ে ও বেতারে নাটকাভিনয়েও তাঁহার পারদর্শিতা লক্ষিত হইয়াছে।

ছায়াচিত্রের বর্তমান যুগে "পরশমণি" কথাচিত্রে অপূর্ব ও অনবদ্য অভিনয়ের দ্বারা তিনি নূতন করিয়া দর্শকবৃন্দের সুধী প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। প্রবোধকুমার সান্যালের "প্রিয়-বান্ধবী"তে তিনি যে প্রাণস্পর্শী অভিনয় করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছে। ইহাই তাঁহার শেষ চিত্রাভিনয়। ইহার পর দুই-মাস কাল রোগ যন্ত্রণা ভোগের পর তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি ছিলেন অতি উদারচেতা ব্যক্তি। যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত ছিলেন তাঁহারা তাঁহার এই উদার ও শিশু মনের পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহার সকলকেই আকৃষ্ট করিত। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গের নিকট তিনি ছিলেন অতি প্রিয়।

অভিনয়ের জন্য আজীবন তিনি যে সাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। অভিনয় ছিল তাঁহার প্রাণ। বাঙ্লার দর্শকদিগকে অভিনয়ের ভিতর দিয়া যে আনন্দরস তিনি পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের হৃদয়ে চির উজ্জ্বল থাকিবে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার অভিনয়ে একদিনের জন্যও অবনতির পরিচয় পাওয়া যায় নাই; বরং উত্তরোত্তর তাঁহার গৌরবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। অকালে বাঙ্লার সর্বজনপ্রিয় অভিনেতারূপেই তিনি চির-বিদায় লইয়াছেন।

শ্রাবণ

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

উতলা শ্রাবণ আজি কাঁদে অহরহ
জানিনা কাহার তরে বেদনা অসহ
বনশ্রীর দ্বারে দ্বারে অশ্রুজল তার
প্লাবন বহায়ে দিল করি হাহাকার।
বিরহে দেখেনি যেথা তাহার তপন
অসিত বসনে ঢাকি' রেখেছে বদন,
দিনান্তে পায়নি যথা গোধূলির আলো,
চন্দ্র তারাহীন রাত্রি অন্ধকার কালো।
ক্ষণে ক্ষণে চমকিত কর্ণপ্রান্তপাশে,
বিদ্যুতের করতালি শুনি তার সাথে,
সে কি তবে তার তরে সংকেত-আহ্বান?
হে শ্রাবণ, বুঝি তার অন্তর পাষাণ!
আর কেন মোরে বৃথা অশ্রুবিন্দু দাও,
ধরণী অঞ্চলে যে গো ঠাঁই নাহি আর।

সর্বহারা

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস-সি

আমার কাননে ফুটেছিল ফুল—না জানি কখন হায়!
দেখিলাম যবে—দলগুলি তার ভূমে গড়াগড়ি যায়।

মুকুলিত যবে দেখিবার আশে আগ্রহে ছিনু বসি',
জানি না কখন বিকশি' উঠিয়া পড়িয়া গিয়াছে খসি'।

বুঝিতে পারি না কেমন করিয়া হল গো এমন ভুল—
জানিতে নারিনু, কখন ফুটিল—কখন ঝরিল ফুল।

জানিতাম আমি আমার কুটীরে হবে তার আগমন,
দ্বার খুলে রেখে তাহারি আশায় গণিতেছিলাম ক্ষণ।

না জানি কখন ক্ষণিকের তরে তন্দ্রা এসেছে ঘিরে,—
তন্দ্রা ভাঙিতে দেখিনু বিষাদে অতিথি গেছে ফিরে!

শুধু রেখে গেছে আসার চিহ্ন—স্মৃতি আকুল-করা,—
ক্ষণিকের ভুলে তাহারে হারায়ে হলাম সর্বহারা।

সাময়িকী

মন্বন্তরের সূচনা—

বাংলা দেশে যে মন্বন্তরের সূচনা দেখা দিয়াছে, এখন আর তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। গভর্ণমেণ্টের বিধি-ব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণার ব্যবস্থা আছে। দেশের অবস্থা কিরূপ হইলে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিতে হইবে, কেবল ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তাহা জানেন। কোথাও, এখনও ঘোষণার প্রয়োজন হয় নাই। গত কয় মাস ধরিয়া আমরা অসহায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছি। চাউলের দর প্রতি মণ ৫ টাকা হইতে ক্রমে ৩০ টাকা গিয়া পৌঁছিয়াছে। লোক প্রায় সবাই এক বেলা খাইতেছে, অনেকের তাহাও জুটিতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে কলেরাও দেখা দিয়াছে। কলিকাতার মত শহরে কলেরা রোগ ভীতিপ্রদরূপে দেখা দিয়াছে। সকলেই দায়দায়িত্ব অস্বীকারের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহা এখন আর সম্ভব নহে। যতদিন চাউলের দাম কম ছিল, ততদিন লোক ধার করিয়া বাজার হইতে কিনিয়া খাইত। এখন যাহা সম্মুখে পায়, তাহাই ভক্ষণ করে এবং তাহা দ্বারা নিজের ও পরিবারবর্গের উদর পূরণের ব্যবস্থা করে। ইহা ছাড়া অন্য পথও নাই।

কেন দেশে এমন অভাবের সৃষ্টি হইল তাহাই আজ চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। বাংলা দেশে প্রচুর ধান উৎপন্ন হইত। কিন্তু সেই উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ দিন দিন কি ভাবে কমিয়া যাইতেছিল, সেদিকে আমরা তাহা লক্ষ্য করি নাই। তিন বৎসরে ব্রহ্মদেশ হইতে বাংলা দেশে কত চাউল আমদানী করিতে হইয়াছিল তাহার হিসাব দেখিলে আমরা বিস্মিত হই—

সাল	চাউল আমদানী
১৯৩৭-৩৮	১৫৪২৩৩ টন
১৯৩৮-৩৯	২৭২১২৫ টন
১৯৩৯-৪০	৫২৭৮৩৭ টন

বাংলা দেশ হইতে অবশ্য বিদেশেও চাউল রপ্তানী করা হইয়া থাকে। তাহার হিসাব এইরূপ :—

সাল	চাউল রপ্তানী
১৯৩৭-৩৮	১০১৪৬৫ টন
১৯৩৮-৩৯	১৩৯১০৮ টন
১৯৩৯-৪০	১১৮২৬৭ টন

উপরের হিসাব দুইটি দেখিলে বুঝা যায় যে বাংলায় যে চাউল উৎপন্ন হইত তাহা দ্বারা বাংলার লোকের পেট ভরিত না। চাউল সম্বন্ধে বাংলার পর নির্ভরতা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। উক্ত তিন বৎসরে আমাদের পরনির্ভরতার পরিমাণ কিরূপ ছিল, তাহা নিম্নের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে—

বৎসর	রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর আধিক্য
১৯৩৭-৩৮	৫২৭৬৮ টন
১৯৩৮-৩৯	১৩৩০১৭ টন
১৯৩৯-৪০	৪০৯৫৭০ টন

ব্রহ্মদেশের উপর চাউলের জন্য বাংলাকে দিন দিন অধিকতর পরিমাণেই নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এমন সময়ে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে ও জাপান ব্রহ্মদেশ দখল করায় ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউল আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাজেই বাংলায় যে চাউলের অভাব ঘটিবে তাহা আর বিচিত্র কি? ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আসিয়া বাংলা দেশ তাহা জমাইয়া রাখিত না। তাহা দ্বারা বাংলার চাহিদা মিটান হইত।

ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হওয়ার পরও বাংলা হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানী বন্ধ হয় নাই। বরং রপ্তানীর পরিমাণ যুদ্ধের জন্য বাড়িয়াই গিয়াছে। কাজেই আমাদের অভাবের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। ফলে আমাদের যে এক বেলা খাইয়া থাকিতে হইবে বা না খাইয়া মরিতে হইবে, তাহা স্বাভাবিক

অনেকের ধারণা বাংলায় যে চাউল উৎপন্ন হয়, আমাদের অভাব মিটাইবার জন্য তাহাই পর্যাপ্ত। এ ধারণা যে ভুল, তাহা নিচের হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে। ১৯৩৬-৩৭ হইতে ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত বাংলায় চাউল উৎপাদনের হিসাব হইতে দেখা যায় যে গড়ে প্রতি বৎসর বাংলায় ৮১৮১০০০ টন চাউল জন্মিয়া থাকে। ১৯৪১ সালের আদম সুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে বাংলার লোকসংখ্যা ৬ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৭ হাজার। গড়ে প্রতি লোকের বৎসরে ৩৪৪ পাউণ্ড করিয়া চালের প্রয়োজন হয় (সরকারী বিশেষজ্ঞের মতে)। অর্থাৎ বৎসরে বাংলা দেশের খোরাকীর জন্য চাউল প্রয়োজন হয়— ৯৫৯১৩৪৮ টন। (ইহার মধ্যে মুড়ি, চিড়া, খই প্রভৃতির জন্য বৎসরে ৬৭৬০০০ টন ধানের হিসাব ধরা হইয়াছে)। কাজেই দেখা যায়, যে চাউল এ দেশে উৎপন্ন হয়, তাহা ছাড়া বৎসরে আরও ১৪ লক্ষ ১০ হাজার টন চাউল আমদানী না করিলে দেশের লোকের চাউলের চাহিদা মিটান সম্ভব নহে।

কিন্তু হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩৯-৪০ সালে বাংলা দেশে মাত্র রপ্তানী অপেক্ষা ৫ লক্ষ টন অধিক চাউল আমদানী করা হইয়াছে। যেখানে প্রয়োজন ১৪ লক্ষ টন, সেখানে ৫ লক্ষ টন চাউলে কি করিয়া অভাব মিটান হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিবার বিষয়। সুতরাং বাংলা দেশের চালের ঘাটতি যে প্রকৃত পক্ষে ১৪ লক্ষ টন নাও হইতে পারে, তাহার কয়েকটি কারণ আছে।

গভর্ণমেন্টের হিসাবে উৎপন্ন চাউলের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে হয় ত কিছু গলদ আছে। যে পরিমাণ দেখান হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে হয় ত দেশে অধিক চাউল উৎপন্ন হয়। গত আদম সুমারীর সময় বাঙ্গালা দেশে লোক সংখ্যা বেশী করিয়াই হিসাব দেখানো হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গণনাকারীরাই যে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা অধিক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে কথা কাহারও অজ্ঞাত নহে। অবশ্য গণনার পর ২ বৎসর চলিয়া গিয়াছে ; কাজেই দেশের লোক সংখ্যা বাড়িয়া এখন হয় ত আদম সুমারীর হিসাব ঠিকই দাঁড়াইয়াছে। যদি কিছু তফাৎ থাকে, তবে চাউলের হিসাবেও সে পার্থক্য আসিতে পারে। তৃতীয়তঃ—ঢেঁকীতে চাল ছাঁটাই করা হইলে বেশী চাউল পাওয়া যায়। ১০০ মণ ধান ঢেঁকীতে চাউলে পরিণত করা হইলে ৭২ মণ চাল পাওয়া যায়। কিন্তু কলে ১০০ মণ ধানে মাত্র ৬৮ মণ চাল পাওয়া যায়। এ দিক দিয়াও হিসাবে কিছু তফাৎ হইয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে এখনও অধিকাংশ স্থানে ঢেঁকী ছাঁটা চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আর এক দিক দিয়া বাঙ্গালায় চাউলের চাহিদা হিসাব করিয়া দেখান যাইতে পারে। বাঙ্গালার মোট লোক সংখ্যা ৬২৪৫৬০০০ জন। এর মধ্যে বিধবা (তাঁরা একবেলা খান), বিদেশী (অনেকে এক বেলা মাত্র ভাত খায়), শিশু, কিশোর প্রভৃতির হিসাব বাদ দিয়া জনপ্রতি বৎসরে সাড়ে ৫ মণ হিসাবে চাউলের খরচ দেখিলে পাওয়া যায়—বৎসরে বাঙ্গালায় ৯৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন চালের প্রয়োজন। গভর্ণমেন্টের হিসাব ৯৫ লক্ষ টন ইহার কাছাকাছি যায়। সব কথার উপরে ভাবিতে হইবে বাঙ্গালার বৎসরে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৮১ লক্ষ ৮১ হাজার টন। গত ১৯৪২ সালে নানাস্থানে অজন্মার ফলে বাঙ্গালা দেশে মাত্র ৬৯ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই ১৯৪৩ সালের অবস্থা যে সঙ্গীণ হইয়াছে, তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। এই অভাব মিটাইবার একমাত্র উপায় অর্দ্ধাহার ও অনাহার। তাহাই এখন দেশবাসীর একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। কাজেই দেশে যে মড়ক ও মহামারি দেখা দিবে, সে আশঙ্কা আমরা সর্ব্বদাই করিতেছি।

গভর্ণমেন্ট এই অভাব মিটাইবার জন্য অধিকতর শস্য উৎপাদন করিতে সকলকে উপদেশ দিতেছেন। সে উপদেশও এখন নিরর্থক। পৃথিবীর অন্যান্য সকল সভ্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে ফসল কত কম উৎপন্ন হয়, তার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেশের নাম	প্রতি একরে উৎপন্ন ধান
ইটালী (১৯৩৯)	৪৫৯২ পাউণ্ড
মিশর (১৯৪০)	৩৪৫০ পাউণ্ড
আমেরিকা (১৯৪০)	২২৯১ পাউণ্ড
আয়র্ল্যাণ্ড (১৯৩৯)	১২৭৭ পাউণ্ড
জাপান (১৯৩৯)	৩৫৫৮ পাউণ্ড
ফরমোসা (১৯৪০)	২৪১৯ পাউণ্ড
বুলগেরিয়া (১৯৩৯)	২২৪০ পাউণ্ড
কোরিয়া (১৯৩৯)	১৯৪৯ পাউণ্ড
ইন্দোচীন (১৯৩৮)	১১৪০ পাউণ্ড
ভারতবর্ষ (১৯৪০-৪১)	১০২০ পাউণ্ড

ভারতবর্ষে যে শুধু উৎপাদন শক্তি কম তাহা নহে। প্রতি বৎসরই ভারতবর্ষের উৎপাদন শক্তি কমিয়া যাইতেছে। তাহার হিসাব দেখিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়—ভারতবর্ষে শস্য উৎপাদনের পরিমাণ দিন দিন কিরূপ কমিতেছে দেখুন—

বৎসর	প্রতি একরে উৎপাদন
১৯৩৬-৩৭	১২৯০ পাউণ্ড
১৯৩৭-৩৮	১২৪৯ „
১৯৩৮-৩৯	১০২৯ „
১৯৪০-৪১	১০২০ „

আজ গভর্ণমেন্ট দেশে যে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা কত দিন পূর্ব্বে করা উচিত ছিল, তাহা উপরের হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে। দেশে কৃষির উন্নতির দিকে কেহ কোন দিন লক্ষ্য করেন নাই। কাজেই চাষী যেমন ম্যালেরিয়ায় ও অনাহারে মরিয়াছে, পতিত জমীর পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়িয়া গিয়াছে। আজ মহাযুদ্ধের সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া আমরা বুঝিয়াছি—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং
সর্ব্বং আত্মবশং সুখং

কিন্তু এতদিন ইহার বিপরীত ভাবে ভাবিত হইয়া চলিয়াছি। দেশী কলাকে অবহেলা করিয়া সিঙ্গাপুরের কলা খাইয়াছি, দেশী আনারস ফেলিয়া দিয়া বিদেশী আনারসকে ভালবাসিয়াছি, দেশী শাকসব্জীকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিয়াছি। টিনে ভরা জ্যামজেলী খাইয়াছি, বিলাতী বিস্কুটের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি নাই। তাই আজ দুর্দশা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। দেশে যে শুধু চাউলের অভাব তাহা নহে। ফল নাই, তরিতরকারী নাই, দুধ নাই, মাছ নাই—লোক খাইবে কি ? নদীনালা সংস্কারের ব্যবস্থা নাই, কৃষির জন্য সেচের বন্দোবস্ত নাই, গ্রামে বাসের সুবিধা নাই—সব লোক সহরের দিকে ছুটিয়াছে ও কৃষির জমী পড়িয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় অধিক শস্য উৎপাদনের সুযোগও মিলিতেছে না—গোলদিঘীর ধারে বা বাড়ীর ছাদে ফসল উৎপন্ন করিয়া যে দেশের লোকের চাহিদা মিটানো যায় না, সে কথা আমরা ভাবিতেও ভুলিয়া গিয়াছি। তিলে তিলে বাঙ্গালী জাতির জীবনী শক্তি হ্রাস পাইতেছে। সে জন্য বাঙ্গালীর দেহের গঠন এমন হইয়াছে যে অন্য দেশবাসী কেন, ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর পাশেও আজ সে আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না।

আজিকার এই অর্দ্ধাহার ও অনাহারকে যদি দুর্ভিক্ষ বলিয়া ঘোষণা করা না হয়, তবে কবে দুর্ভিক্ষের অবস্থা আসিবে জানি না।

সিরাজদ্দৌলা স্মৃতি—

গত ৩রা জুলাই বাঙ্গালার নানা স্থানে নবাব সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি দিবস পালন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কলিকাতা টাউন হলে ঐ দিন মৌলবী এ-কে ফজলল হকের সভাপতিত্বে এক জনসভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—একটি প্রস্তাবে নূতন হাওড়া পুলের নাম সিরাজের নামে নামকরণ করিতে বলা হইয়াছে। ৩রা জুলাই যাহাতে সকলে সিরাজ দিবস পালন করে, সে জন্য ঐ দিন ছুটী দিতে বলা হইয়াছে এবং পলাশীর মাঠে সিরাজের একটি উপযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণেরও

প্রস্তাব করা হইয়াছে। সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নৃপতি ছিলেন—তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হইলে জাতি দেশাত্মবোধেই জাগ্রত হইবে।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদের বিবৃতি—

গত ৫ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বর্ষাকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম দিনেই ৪জন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ব মন্ত্রিসভার পদত্যাগের কারণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মৌলবী এ-কে ফজলল হক একাই প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অপর তিনজন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌলবী সামসুদ্দীন আহম্মদও বিবৃতি দিয়াছেন এবং সেদিন ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন দীর্ঘ সাড়ে ৫ ঘণ্টা চালাইতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদের বিবৃতি দানে বাধা দিয়াছিলেন কিন্তু স্পীকার মিঃ নৌসেরআলি সে বাধার কথা গ্রাহ্য করেন নাই। নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের পর এই প্রথম দিনের অধিবেশনে উভয় পক্ষের সদস্যগণকেই বিশেষ ব্যস্ত দেখা গিয়াছিল। খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনাই এই অধিবেশনের প্রধান কার্য্য হইবে।

ভারতের নূতন বড়লাট—

ভারতের বর্ত্তমান বড়লাট মার্কুইস অব লিনলিথগোর স্থলে ইংলণ্ডেশ্বর ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেলের পদে ফিল্ড মার্শাল স্যার আর্চিবল্ড পার্সিভাল ওয়াভেলের নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন। লর্ড লিনলিথগো আগামী অক্টোবর মাসে অবসর গ্রহণ করিবেন। বর্ত্তমানে ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল বৃটেনে অবস্থান করিতেছেন। তিনি বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণের জন্য আগামী শরৎকালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলের স্থলে ভারতের পরবর্ত্তী প্রধান সেনাপতি ও বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য হইবেন জেনারেল স্যার ক্লড জন আয়ার অকিনলেক। জেনারেল অকিনলেক শীঘ্রই ভারতের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিবেন।

আই-এ ও আই-এস্‌-সি পরীক্ষায় কৃতিত্ব—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত আই-এ ও আই-এস্‌-সি পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রগণ গুণানুসারে প্রথম ১০টি স্থান অধিকার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আই-এ পরীক্ষায় :—(১ম) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ রায় (রিপণ কলেজ) (২য়) শ্রীতপনকুমার রায় চৌধুরী (স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) (৩য়) এস্‌-এম্‌-আমীন আহাম্মদ (রংপুর কারমাইকেল কলেজ) (৪র্থ) শ্রীতরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (রংপুর কারমাইকেল কলেজ) (৫ম) শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত (মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ) (৬ষ্ঠ) শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় (নন কলেজিয়েট ছাত্র, মেদিনীপুর কলেজ) (৭ম) হাবিজুর রহমান চৌধুরী (মুরারীচাঁদ কলেজ শ্রীহট্ট) (৮ম) শ্রীঅশোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রেসিডেন্সী কলেজ) (৯ম) আবু ইউসুফ জামাল আমেদ (প্রেসিডেন্সী কলেজ) (১০ম) শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস (রামকৃষ্ণ মিশন) গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ ছাত্রীগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আই-এস্‌-সি পরীক্ষায় :—(১ম) শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় (নন কলেজিয়েট, সেন্ট জেভিয়ার্স) (২য়) শ্রীঅজিতকুমার চৌধুরী (শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজ) (৩য়) শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য্য (নন-কলেজিয়েট, শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজ) (৪র্থ) শ্রীতারকনাথ রায় (প্রেসিডেন্সী কলেজ) (৫ম) শ্রীঅমলকুমার দত্ত (প্রেসিডেন্সী কলেজ) (৬ষ্ঠ) জমশেরুদ্দিন আমেদ (শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজ) (৭ম) শ্রীশম্ভুকালী মুখোপাধ্যায় (আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা) (৮ম) শ্রীপবিত্রকুমার সেনগুপ্ত (বঙ্গবাসী কলেজ) (৯ম) শ্রীআনন্দমোহন ঘোষ (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ) (১০ম) শ্রীমন্মথ পুরকায়স্থ (শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজ)

নূতন বড়লাটের সদ্‌ ইচ্ছা—

ভারতের বড়লাট মনোনীত হওয়ার পর সম্প্রতি ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “এ কথা কেহ যেন মনে না করেন যে আমি সৈনিকরূপে ভারতে যাইতেছি। আমি বেশ পরিত্যাগ করিয়া আমার সৈনিকের কার্য্য শেষ করিব এবং আশাকরি, বে-সামরিক কর্মী হিসাবে ভারতের উন্নততর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব। সামরিকভাবে শাসনকার্য্য চালাইবার আমার আদৌ ইচ্ছা নাই।”

ফিল্ড মার্শাল স্যার ওয়াভেল

সরকারী দোকান—

সম্প্রতি রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব জানাইয়াছেন যে, কন্ট্রোল দোকানগুলির পরিবর্ত্তে শীঘ্রই কলিকাতায় ৪০০ শত ও সহরতলীতে ৪০০ শত সরকারী দোকান খোলা হইবে। ঐ সকল দোকানে চাউল ব্যতীত, চিনি,

ডাল, কেরোসিন তৈল, সরিষার তৈল এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় পাওয়া যাইবে। হাওড়া মিল অঞ্চলে এবং মফঃস্বল সহরেও অনুরূপ দোকান খোলা হইবে। এই সাধু প্রচেষ্টা সর্ব্বাংশে কার্য্যকরী হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অথবা চাকুরেকে যাহাতে অফিসে যাইবার ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া সারিবদ্ধভাবে না দাঁড়াইতে হয় তাহারও দিকে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি রাখিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছি। এমন কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে সহজেই সাধারণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারেন।

দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগ—

আমাদের দেশে একটী প্রচলিত কথা আছে যে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। এ কথার সত্যতা পুলিশের খাতায় যাঁহাদের নাম একবার উঠিয়াছে তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া থাকেন। সম্প্রতি যশোহর ও ঘাটালের দুইজন উকিলের ভাগ্যে উক্ত প্রবাদ বাক্যটি সত্যে পরিণত হইয়াছে। উক্ত স্থানের দুইজন উকিলই দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতরক্ষা বিধানবলে ধৃত হন। যশোহরের উকিল ভদ্রলোক, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি না লইয়া একটি মিছিল পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা অপরাধে এবং ঘাটালের উকিল ভদ্রলোক বিচারালয় সম্বন্ধীয় ইস্তাহার বিলি করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। উভয়েই ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু যশোহর ও মেদিনীপুর দূরবর্ত্তী হইলেও উভয় জেলার জেলাজজের বিচারে উভয়েরই দণ্ড হ্রাস করা হয়। কিন্তু এখানেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিল না। উকিলদ্বয়কে আইন ব্যবসায়ীগণের ১২ ধারা অনুযায়ী কলিকাতা হাইকোর্টের নিকট কারণ দর্শাইতে আদেশ করা হয়। সুখের বিষয় বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি আক্রাম এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহাদের চরিত্রের এমন কোন দোষ ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় নাই যাহাতে উকিলদ্বয় আইন ব্যবসায় লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না। জানি না, উকিলদ্বয়ের দুর্ভাগ্যের এইখানেই পরিসমাপ্তি হইল কি না!

ভারত সরকারের খাদ্য সাহায্য—

জানা গিয়াছে, ভারত সরকার বাংলা সরকারকে যে খাদ্য সামগ্রী দান করিবেন তাহার মূল্য প্রায় ৫।০ কোটী টাকা। উক্ত খাদ্য সামগ্রী বর্ত্তমান পরিস্থিতি লাঘবের জন্য ঋণ হিসাবে বাংলা সরকারকে দেওয়া হইবে।

পরলোকে বি-সি-চ্যাটার্জ্জি—

গত ৫ই আষাঢ় রবিবার অপরাহ্নে খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ী বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কলিকাতার বাস ভবনে সামান্য কয়েকদিন রোগ ভোগের পর ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯০৫ সালে ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ঐ সময় দেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলিতেছিল। তিনি উক্ত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কিছুদিন স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদিত "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকা পরিচালনা করেন ও শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সহসম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। সুরাট কংগ্রেসে তিনি নরম পন্থী ও চরম পন্থীদের মধ্যে আপোষের চেষ্টা করিয়াছিলেন। উভয় দলের মধ্যে এই বিচ্ছেদের পর তিনি রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন তিনি বহু রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন। হিজলী বন্দী নিবাসে গুলি চালনা সম্পর্কে যে তদন্ত কমিটী গঠিত হয় তিনি জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রধান কৌঁসুলী রূপে উহাতে উপস্থিত থাকেন। তিনি হিন্দু মহাসভার আন্দোলনে যোগদান করেন। বিজয়চন্দ্র বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে দেওয়ানী মামলা পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ জামাতা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পত্নী, দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন নিষ্ঠাবান দেশকর্ম্মী ও প্রতিভাশালী ব্যবহারাজীবের তিরোধান ঘটিল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিল—

কলিকাতা হাউস্ রেণ্ট কণ্ট্রোল অর্ডিনান্স নামে বাংলা সরকার কলিকাতা ও সহরতলীতে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। প্রস্তাবিত অর্ডিন্যান্স-এ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে যাঁহারা বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি করেন নাই তাঁহারা ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে যে ভাড়া পাইতেন সেই পরিমাণ ভাড়া বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং যাঁহারা ইতিমধ্যে ভাড়া বৃদ্ধি করিয়াছেন তাঁহারা শতকরা ১০ ভাগ পরিমাণ বৃদ্ধি ভাড়া রাখিতে পারিবেন অথবা তদপেক্ষা ভাড়া কমাইয়া যাহা ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে ছিল তাহাই রাখিতে হইবে।

শাক্ত পদাবলী—

'শ্মশান ভাল বাসি বলে শ্মশান করেছি হৃদি, শ্মশান বাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি' ইত্যাদি গানটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত শাক্তপদাবলী গ্রন্থে রামলাল দত্ত মহাশয়ের নামে ছাপা হইয়াছে—কিন্তু গানটির লেখক 'রামপদাবলী' রচয়িতা ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। আশাকরি, শাক্তপদাবলীর পরবর্ত্তী সংস্করণে এই ভ্রম সংশোধনের ব্যবস্থা হইবে।

খাদ্য সমস্যায় গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য—

১২ই আষাঢ় শনিবার হইতে দুই দিন কলিকাতা সহরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে নিখিলবঙ্গ খাদ্য সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাব বাঙ্গালার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছে। একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—'খাদ্য সঙ্কটের সুযোগ লইয়া যাহারা প্রচুর লাভ করিতেছে এবং যাহারা প্রচুর খাদ্য শস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে বা মজুত করিয়াছে, তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য সম্মেলন গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছে। মফঃস্বলের মজুতকারীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করিয়াছে, কলিকাতা ও হাওড়ার মত দুইটি মহানগরীকে সেই ব্যবস্থার আওতার বহির্ভূত রাখায় এবং বাঙ্গালার যে কোন অঞ্চল হইতে যে কোন মূল্যে চাউল ক্রয় করিতে এজেণ্টদিগকে ও বড় বড় ব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহিত করায় সম্মেলন গভর্ণমেণ্টের নীতির তীব্র নিন্দা করিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছে যে চাউল সরবরাহ সম্বন্ধে মফঃস্বলের প্রত্যেক অঞ্চলকে আত্ম-প্রতিষ্ঠ করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ব্যবস্থা উক্ত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

চাষী ও সাধারণ গৃহস্থের সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্যের দিকে অনাবশ্যক দৃষ্টি দেওয়া ও উহা সরাইলেই খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে এই ভাব ব্যক্ত করায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে—খাদ্য-সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছে। গভর্ণমেণ্টের এই নীতির জন্য সম্মেলন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য আসল জায়গায় আঘাত না করিয়া এখানে ওখানে হস্তক্ষেপ করিয়া অন্ধকারে হাতড়ানের মত যে সকল ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিতে সম্মেলন গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে সহর ও মফঃস্বলের জনসাধারণকে সমানভাবে খাদ্যদ্রব্য বিতরণের সুষ্ঠু পরিকল্পনাসহ খাদ্য সরবরাহ ও উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যাপক নীতি গ্রহণ করিতে সম্মেলন গভর্ণমেণ্টকে আহ্বান করিয়াছে। উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে সকল শ্রেণীর নরনারীকে খাদ্য জোগাইবার এমন ব্যবস্থা থাকিবে, যাহাতে তাহারা সর্ব্বদাই সঙ্গতভাবে স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে পারে। সম্মেলন এই দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে—নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কিত ব্যাপক পরিকল্পনা কোন দলীয় মন্ত্রীমণ্ডল কর্ত্তৃক সুচারুভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে না। যে গভর্ণমেণ্টের উপর জনসাধারণের সকল অংশের আস্থা আছে, তাঁহারাই কেবল উহা কার্য্যকরী করিতে পারেন। সম্মেলন দাবী করিতেছে যে গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করুন (১) খাদ্যশস্য রপ্তানী সম্পূর্ণ বন্ধ (২) যে পর্য্যন্ত আমন ফসল না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত ঘাটতি অঞ্চলে অন্য প্রদেশ হইতে যথেষ্ট খাদ্য-শস্যের আমদানী (৩) দুষ্ট ব্যবস্থার দরুণ বর্ত্তমান খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্য ও স্বাভাবিক অবস্থার সময় আবশ্যক ঘাটতি পূরণের জন্য বাহির হইতে গম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আমদানী (৪) অধিক শস্য উৎপাদন আন্দোলনের সাফল্যকল্পে (ক) ভাল বীজ সরবরাহ (খ) সেচ কার্য্যের জন্য সুবিধা দান (গ) চাষীদিগকে অগ্রিম দাদন (ঘ) পতিত জমীর আবাদ (ঙ) সার, কৃত্রিম সার প্রভৃতি সরবরাহ ও (চ) শিশু এবং প্রসূতিকে দুগ্ধ সরবরাহ।

ব্রজমোহন দত্ত পুরস্কার—

'সোভিয়েট রুশিয়ায় নারীর স্থান' বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় মিসেস্ অমিয়া বসু বি-এ, বি-টি ও মিস্ প্রতিমা রায় চৌধুরী উভয়ে বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার কর্ত্তৃক প্রদত্ত 'ব্রজমোহন দত্ত পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন। এই পুরস্কারের আগামী বর্ষের প্রবন্ধের বিষয়—'অশ্বিনী কুমার দত্ত চরিত্র আলোচনা।'

অমিয়া বসু

মাইকেল স্মৃতিপূজা—

অমরকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা পূর্ব্বে শুধু কলিকাতাতেই অনুষ্ঠিত হইত। গত কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার পিতৃভূমি যশোহরেও স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। গত ২৯শে জুন যশোহর গোপালগঞ্জে অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীও এবার মহাকবির উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। যশোহরবাসী প্রায় সকল খ্যাতনামা ব্যক্তিই

এবারের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং কুমারবাবু মাইকেলের জীবনের বিপ্লবের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছিলেন। শুধু কলিকাতা বা যশোহরে নহে, বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই মাইকেলের স্মৃতিপূজার সহিত প্রতি বৎসর তাঁহার কাব্যাবলী আলোচিত হওয়া উচিত।

পুরীর মন্দিরে অনাচার—

কিছুদিন হইতে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে অনাচার সম্পর্কে নানারূপ অভিযোগ শুনা যাইতেছিল। সম্প্রতি পুরী হইতে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নারায়ণ নন্দ মহাশয় এখানে আসিয়া গত ২৫শে জুন ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘের এক সভায় অভিযোগের বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যে কোন দেবস্থানে যদি অনাচার অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা দেশবাসী সকল হিন্দুরই স্বার্থের ক্ষতিকারক। যাহাতে সেই অনাচার শীঘ্র দূর হয়, সে জন্য চেষ্টা করাও প্রত্যেক হিন্দুরই একান্ত কর্তব্য। অভিযোগ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তদন্ত করিয়া কেহ যদি এ বিষয়ে কায করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তিনি সমগ্র ভারতের হিন্দু অধিবাসীদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। পুরীতে শ্রীযুক্ত নন্দ মহাশয়ের নিকট পত্রাদি লিখিলে তিনি এ বিষয়ে সকলকে বিস্তৃত বিবরণ জানাইয়া দিবেন।

পরলোকে লীলা দেবী—

কলিকাতার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একমাত্র কন্যা ও শিল্পী আর্য্যকুমার চৌধুরীর পত্নী লীলা দেবী সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ধনীর সন্তান ও ধনী ঘরের বধূ হইয়াও বিদ্যা চর্চ্চায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং বহু উপন্যাস, গল্প ও নাটকাদি লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ঊনবিংশ অধিবেশনের সময় তিনি তাহার কার্য্যে বিশেষ সহায়ক ছিলেন।

লীলা দেবী

পরলোকে রমণীমোহন দত্ত—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব রেভিনিউ অফিসার ও কণ্ট্রোলার অফ্ মার্কেটস্ রমণীমোহন দত্ত গত ৪ঠা আষাঢ় ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পাশ করিয়া কয়েক বৎসর সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে হেড মাষ্টারের পদে কাজ করিবার পর ১৯০৪ সালে তিনি কর্পোরেশনে যোগ দেন। তিনি কর্পোরেশনের বাজারগুলির প্রভূত উন্নতিসাধন করেন।

রমণীমোহন দত্ত

কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম উৎসব—

গত ৪ঠা জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় ২৪পরগণা জেলার নৈহাটী কাঁঠালপাড়া গ্রামে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক বাসভবনে পাইকপাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্কিম উৎসব হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে ঘরে বসিয়া তাঁহার অধিকাংশ রচনা লিখিয়াছিলেন, সেই ঘরটি এখন জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং তথায় স্থানীয় সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সেই শাখা পরিষদের উদ্যোগেই এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ শেঠ, কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি কুমার বিমলচন্দ্রের অভিভাষণটি সময়োপযোগী হইয়াছিল। শাখা পরিষদের সভাপতি পণ্ডিত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের চেষ্টা ও যত্নে এই দারুণ দুর্দ্দিনেও এই উৎসব সম্পন্ন হওয়ায় তাঁহারা দেশবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

চন্দননগর পুস্তকাগার—

গত ২০শে জুন রবিবার সন্ধ্যায় চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে চন্দননগর পুস্তকাগারের ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ঐ সঙ্গে চন্দননগর নিবাসী প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ৭৫ তম জন্মদিবসে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। উভয় সভাতেই শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর প্রাণস্বরূপ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র সভায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভায় বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। যোগেন্দ্রবাবুর মত ব্যক্তিকে সম্মানিত করিয়া চন্দননগর বাসীরা যোগ্যেরই সমাদর করিয়াছেন।

পরলোকে দীনেন্দ্রকুমার রায়—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় গত ২৭শে জুন ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পিতৃভূমি নদীয়া জেলার মেহেরপুরে বাস করিতেছিলেন—তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার রচিত ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠ করেন নাই, এমন বাঙ্গালী পাঠক অতি অল্পই আছেন। এক সময়ে তিনি ভারতবর্ষেরও নিয়মিত লেখক ছিলেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স—

কলিকাতার হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেডের ১৯৪২ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নানারূপ ও ভয়ানক বিশৃঙ্খলার দরুণ বাধা সত্ত্বেও কোম্পানীর কাজ বিশেষ কমে নাই। পূর্ব্ব বৎসরে নূতন কাজ হইয়াছিল ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকার—আলোচ্য বর্ষে নূতন কাজ হইয়াছে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার। জীবন বীমা তহবিলের টাকা ১৯৪২ সালে ৫১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া বর্ষ শেষে হইয়াছে মোট ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার। কোম্পানীর অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্র যেমন নানাবিধ, তেমনই ইহার অর্থ বিনিয়োগের নীতিও একাধারে বিচারবিবেচনাপ্রসূত ও নিরাপদ। কোম্পানীর তহবিল কোন এক শ্রেণীর সিকিউরিটিতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া নানাভাবে নানাদিকে নিয়োজিত আছে। দেশী বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে আজ হিন্দুস্থান সমবায় বীমা কোম্পানীর স্থান কোথায় তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। আমরা এই কোম্পানীর দিন দিন অধিকতর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

বিদুষী মহিলার অকালবিয়োগ—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা জগদ্ধাত্রী দেবী গত রথযাত্রার দিন অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন এবং বিবাহের অল্পদিন পরে বিধবা হইয়া তিনি শাস্ত্র চর্চ্চায় দিন কাটাইতেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পিতা ও একমাত্র শিশু-পুত্র দিলীপকুমারের এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

লালমোহন বিদ্যানিধি—

সম্প্রতি শান্তিপুরে স্থানীয় শাখা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে পণ্ডিত ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের জন্মের শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধ নির্ণয় প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য চিরদিন এ দেশের লোক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিবে। কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগেও বিদ্যানিধি মহাশয়ের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

লালমোহন বিদ্যানিধি

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার—

"আনন্দবাজার" ও "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দীর্ঘ দশমাসকাল কারাবাস করিয়া সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মজুমদার বর্ত্তমানে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি হৃত-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া সংবাদ পত্রের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করুন—ইহাই প্রার্থনা।

পরলোকে জগদীশচন্দ্র চট্টরাজ—

বিগত ১২ই আষাঢ় রবিবার বৈকালে মুর্শিদাবাদ জেলার কাগ্রাম গ্রামে ৪৪ বৎসর বয়সে জগদীশচন্দ্র চট্টরাজ পরলোকগমন করিয়াছেন। ছাত্র জীবনে ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সংস্পর্শে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। ব্রহ্মচারী জগদীশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ধর্ম্মজীবন যাপনে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

খেলা ধুলা

• সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল খেলা ঃ

ইনসাইড খেলোয়াড়দের খেলা ঃ

খেলার ক্ষিপ্রগতি যে কোন খেলোয়াড়ের সব থেকে বড় কৃতিত্ব। কিন্তু এই ক্ষিপ্রগতি ইনসাইড খেলোয়াড়দের যতখানি প্রয়োজন তার থেকে বেশী প্রয়োজন বল আদান প্রদানের দক্ষতা। তাদের গতি মন্থর হলে দলের যা ক্ষতি হয় তার থেকে বেশী হয় যদি নির্ভুল বল পাশ দেবার দক্ষতা না থাকে। এ অক্ষমতা দলের পক্ষে মারাত্মক।

ইনসাইড খেলোয়াড়রা সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং আউট সাইড খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলার একটা যোগসূত্র সর্বদাই বহন করে চলবে। সুতরাং যদি তারা নির্ভুলভাবে অপরকে নির্দিষ্ট স্থানে বল দিতে না পারে তাহলে খেলার অনেক সুবর্ণ সুযোগগুলি বিফলে যাবে। তাদের পরস্পরের যোগসূত্র ছিন্ন ভিন্ন হবে, বিপক্ষদল খেলায় নিজেদের প্রাধান্য লাভ করবে।

ফুটবল খেলার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বিপক্ষদলের রক্ষণব্যূহ ভেদ করতে গিয়ে ইনসাইড খেলোয়াড়রা বিভিন্ন রকমের ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দেবার সুযোগ পাবে। এই কৌশল ব্যবহারের লোভ দুর্দমনীয়। কিন্তু যেখানে কৌশল ব্যতিরেকে লক্ষ্যবস্তু সহজলভ্য সেখানে কোনরূপ কৌশল অবলম্বন না করাই উচিত। কৌশল প্রয়োগে সময়ের যেমন অপব্যবহার হয় তেমনি বার বার তার প্রয়োগ বিপক্ষদলের কাছে সহজবোধ্য হয়ে পড়ে।

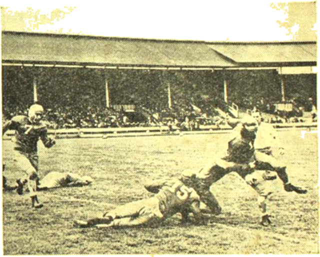

আমেরিকার আর্মি ফিল্ড আর্টিলারীর ক্যাপ্টেন কেম্ব্রেলকে আর্মি-ইঞ্জিনিয়ার্সদলের জনৈক খেলোয়াড় ভূতলশায়ী করেছে। গত মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের ময়দানে আমেরিকা এসেই প্রথম ফুটবল খেলে। আর্টিলারী দল ১৮-৬ গোলে বিজয়ী হয়েছে। দর্শক সংখ্যা হয়েছিল ২০,০০০

মাঠের মাঝে খেলা :

ইনসাইড খেলোয়াড়দের সময়ে সময়ে মাঠের মাঝে বল পেতে দেখা যায়। এই অবস্থায় তার কি করা উচিত ! প্রথমে বলটি নিজের আয়ত্বে এনে তার ক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষিপ্রগতিতে বল ড্রিবল করে অগ্রসর হবে। বিপক্ষদলের কোন খেলোয়াড় বাধা দিতে নিকটবর্তী হলেই বলটি নিজ দলের কোন খেলোয়াড়কে পাশ দিবে এবং কোনরূপ সময় নষ্ট না করে দ্রুত এগিয়ে বলটি পুনরায় ফিরে পাবার জন্য অপেক্ষা করবে। মাঠের মধ্যিখানে বলটি তার পাশ করা উচিত উইং-ম্যানকে। কিন্তু বলটি পাশ করবার পূর্বে লক্ষ্য করবে বলটি গোলে সেণ্টার হলে সেখান থেকে কতখানি ব্যবধান থাকে দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ডের। কারণ উইং-ম্যানের সেণ্টারথেকেই দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড বিপক্ষদলের গোল সন্ধান করবে। সেণ্টার ফরওয়ার্ড যদি অনেকখানি দূরত্বে থাকে এবং যথাসময়ে গোলের মুখে উপস্থিত না হ'তে পারে তাহলে বল সেণ্টারে ফল ভাল হবে না। বিপরীত উইংকে (Opposite wing) বল পাশ দেবার সুযোগ সর্বদা পাওয়া যায় না ; এরূপ সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার করতে ইতস্তত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইনসাইড রাইটের পায়ে যখন বলটি থাকবে সে সময়ে সেই দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং রাইট আউটের উপর বিপক্ষদলের রক্ষণভাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ইনসাইড রাইট বলটি ড্রিবল করে বিপক্ষদলের একজন খেলোয়াড়কে সম্মুখীন হতে বাধ্য করলেই বিপক্ষদলের রাইট ব্যাক তার সহযোগীকে

cover করবার জন্ত এগিয়ে আসবে। ফলে বিপক্ষদলের রাইট হাফের উপর একাধারে লেফট আউট এবং লেফট ইনকে বাধা দেবার দায়িত্ব পড়বে। এই অবস্থায় লেফট উইংয়ের কাছে বল পাশ করে বল দিলে যথার্থ গোল না হলেও গোলমুখে অনেকখানি অগ্রগামী হবার সুযোগ পাওয়া যাবে। এই সুযোগ একেবারে তুচ্ছ নয়।

গোলের মুখে পাশ ঃ

ইনসাইড খেলোয়াড়রা গোলের মুখে বল সট করতে একান্ত অক্ষম হয়ে পড়লে বলটি সট করবার পরবর্ত্তী সুযোগ দিবে সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে। সেণ্টার ফরওয়ার্ডই দুজন আউট সাইড খেলোয়াড়ের থেকে তুলনায় ভাল স্থানে (position) অবস্থান করে। তবে একান্তই সেণ্টার ফরওয়ার্ড বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে ইনসাইড খেলোয়াড় বলটি পেনাল্টি সীমার (Penalty area) ধারে অথবা গোল এরিয়ার ধারে 'থ্রু' পাশ দিয়ে আউট সাইড খেলোয়াড়দের cross shot-এ গোল দেবার সুযোগ দিতে পারে।

অন্য খেলোয়াড়দের গোল দেবার সুযোগ সৃষ্টি করাই ইনসাইড খেলোয়াড়দের একমাত্র কাজ নয়। তারাও নিজেদের কৃতিত্বে গোল দিয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। গোলের মুখে তাদের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। এই উপস্থিতি বেশী প্রয়োজন যে সময়ে বিপরীত দিকের উইংম্যান বল নিয়ে ছুটে এসে গোলের মুখে বল সেণ্টার করবে। ইনসাইড খেলোয়াড় ভাল স্থান (position) নিয়ে দাঁড়াতে পারলে তার দ্বারাই গোল করবার বেশী সুবিধা হবে। সেণ্টার ফরওয়ার্ডের মতই সে গোলের মুখে দাঁড়িয়ে গোল সন্ধান করবার সমান সুবিধা পাবে। এছাড়া যে সময়ে অপর দিকে ইনসাইড খেলোয়াড়ের নিজের দিকের (own out side) আউট সাইড খেলোয়াড় বলটি নিয়ে গোলের মুখে অগ্রসর হবে তখন ইনসাইড খেলোয়াড়কে অরক্ষিত অবস্থায় গোল সীমার (goal area) বাইরে পাওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে গোলের মুখে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আউট সাইড খেলোয়াড় বলটি সট না করে দলের অপেক্ষমান অরক্ষিত ইনসাইড খেলোয়াড়কেই পাশ করবে। ইনসাইড খেলোয়াড় কালবিলম্ব না করে 'First-time shot' করবে।

রক্ষণভাগে ইনসাইড খেলোয়াড় ঃ

প্রধানতঃ আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের সহযোগিতা করাই ইনসাইড খেলোয়াড়দের কাজ। কিন্তু রক্ষণভাগেও তাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। বিপক্ষদল একযোগে আক্রমণ আরম্ভ করলেই প্রথম শ্রেণীর ইনসাইড খেলোয়াড় পিছিয়ে আসবে। এখন সে নিজ দলের রক্ষণভাগের সঙ্গে সহযোগী আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের যোগসূত্র রক্ষা করে খেলবে। বল আয়ত্বে আনবার সুযোগ পেলেই ইনসাইড খেলোয়াড় বলটিকে নিজ দলের এমন খেলোয়াড়দের পাশ করবে যারা unmarked অবস্থায় থাকবে। নিজ দলেরই গোল লাইনের কাছে 'থ্রো-ইনে'র সময় ইনসাইড খেলোয়াড়ের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন। নিজ নিজ দলের 'গোল কিকে'র (goal kick) সময় আক্রমণভাগের প্রত্যেক খেলোয়াড় বলটির সম্মুখীন হবে এবং বলের পাল্লার মধ্যে অবস্থান করবে। কিন্তু গোল কিক'টি নিতে সম্মুখীন হ'তে গিয়ে ইনসাইড খেলোয়াড় বিপক্ষদলের ইনসাইড ফরওয়ার্ডের নিকটবর্ত্তী হলেই তার কাজ হবে তার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা। কারণ অনেক সময় আস্তে মারা বলগুলি থেকে 'snap goal' হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তৎপর হয়ে পিছনে ফিরে এসে বিপক্ষদলের সেণ্টার হাফের কাছ থেকে বল নেবার অথবা প্রতিরোধের ক্ষমতা ইনসাইড খেলোয়াড়ের থাকলে নিজ দলের সেণ্টার হাফ তার কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ করবে। ইনসাইড খেলোয়াড় কিছুক্ষণের জন্ত বিপক্ষদলের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলেই খেলার মোড় অনেকটা ঘুরে যাবে। একবার পিছনে চলে এলে প্রথম শ্রেণীর ইনসাইড খেলোয়াড় দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের যথেষ্ট সহযোগিতা করতে পারবে। প্রথমতঃ নিজেকে এমন অবস্থায় পাবে যেখান থেকে নিজ দলের হাফ ব্যাক খেলোয়াড়দের 'সর্ট পাশ' আয়ত্বে এনে নিজ দলের ফরওয়ার্ডদের দিতে পারবে।

ইনসাইড খেলোয়াড়দের আর একটি অন্যতম কাজ বিপক্ষদলের উইংহাফের উপর লক্ষ্য রাখা যাতে তারা তাদের দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের বল অগ্রে দিয়ে পাশ করতে না পারে। বিপক্ষ দলের উইংহাফ বল পাশ দেবার চেষ্টা করছে দেখলেই ইনসাইড খেলোয়াড় এই চেষ্টা করবে যেন বলটি যথাস্থানে না পৌঁছায়। নিজেদের উইং-ফরওয়ার্ড এবং পিছনের উইংহাফের সঙ্গে ইনসাইড খেলোয়াড়ের বিশেষ বোঝাপড়া থাকা উচিত। ইনসাইড খেলোয়াড় ড্রিবল করতে পারলে খুবই ভাল হয়। যদি তা ভাল জানা না থাকে তাহলে নিজ দলের কোন খেলোয়াড়কে বল পাশ দেবার পূর্ব্বে বিপক্ষদলের কোন একজন খেলোয়াড়কে তাকে বাধা দেবার জন্ত সম্মুখীন হ'তে বাধ্য করার কৌশল জানা প্রয়োজন। ফুটবল খেলার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, আক্রমণভাগের সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং দু'জন উইং-ফরওয়ার্ড প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলোয়াড় না হলে আক্রমণভাগের দু'জন ইনসাইড খেলোয়াড়ের পিছিয়ে এসে একত্রযোগে দলের রক্ষণভাগকে সহযোগিতা করতে পারে না। তবে তারা পিছিয়ে এসে খেলতে পারে কিম্বা একজন ইনসাইড বরাবরই পিছনে থেকেই খেলতে পারে কিন্তু প্রত্যেক দলেরই আক্রমণভাগে গোল দেওয়ার উপযোগী চারজন শ্রেষ্ঠ ফরওয়ার্ড খেলবে। ফুটবল খেলায় 'positional play' এই কথাটির সঙ্গে ইনসাইড খেলোয়াড়দের কোনই সংস্রব নেই। কারণ ইনসাইড খেলোয়াড়রা নিজেদের ইচ্ছামত মাঠের যে কোন স্থান ঘুরে খেলতে পারে।

নিজ দলের রক্ষণভাগ আক্রমণ করবার অবস্থায় যখনই ফিরে আসবে ইনসাইড খেলোয়াড় অবিলম্বে আক্রমণভাগে নিজের স্থানে পুনরায় উপস্থিত হবে। এখন তার কাজ হল বিপক্ষদলের গোলে হানা দিয়ে তাদের বিপর্য্যস্ত করা। বিরত কর্ত্তব্যপরায়ণ ইনসাইড খেলোয়াড় মাত্রেই দ্রুতগামী ফুটবল খেলায় দ্রুতবেগে খেলতে বাধ্য হবে। সুতরাং এই স্থানে খেলতে হ'লে খেলোয়াড়ের ফুসফুসের শক্তি যেমন থাকা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন দ্রুতবেগে বল নিয়ে অগ্রসর হবার ক্ষমতা।

অনুশীলন খেলা ঃ

ফুটবল খেলায় উৎকর্ষতা লাভের জন্য অনুশীলন খেলা একান্ত প্রয়োজন। অনুশীলন খেলা হবে সাধারণ ফুটবল খেলার মতই, সেখানে ফুটবল খেলার যাবতীয় নিয়মই পালন করা হবে। তবে একমাত্র দৌড়ের পরিবর্তে খেলোয়াড়রা পায়ে হেঁটে বল নিয়ে অগ্রসর হবে। উদ্দেশ্য খেলোয়াড়রা যাতে করে বলের গতি, খেলোয়াড়দের অবস্থান এবং বল আদানপ্রদানের ধারাগুলি সহজেই অনুধাবন করতে পারে। খেলোয়াড়রা খেলার ধারাগুলি ভালভাবে অভ্যাসে আনতে পারলেই ভুল করার সম্ভাবনা থাকবে না। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়দের গতি বাড়িয়ে দিলেও খেলার ধারা অনুসরণ করতে অসুবিধার সৃষ্টি কোন হবে না। বর্তমানে আমরা আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের খেলার পদ্ধতি নিয়েই আলোচনা করছি। দেখা গেছে একাধিক ধারা অবলম্বন করে আক্রমণভাগ বিপক্ষদলের গোলে অগ্রসর হয়ে গোল দেওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে। সেই বিভিন্ন ধারাগুলি চিত্র সহযোগে এখানে বর্ণিত হ'ল। অনুশীলন খেলায় এই ধারাগুলি অভ্যাস না ক'রে একেবারে খেলায় প্রয়োগ করলে অনভ্যাসের অবস্থায় পড়তে হয়। সে শোচনীয় ব্যর্থতা থেকে দলকে রক্ষার জন্য পূর্ব্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে আসাই যুক্তিযুক্ত। পাঠকের সুবিধার জন্য এখানের চিত্রে দুটি দলের নামকরণ হয়েছে X এবং O. দুটী দলে কে কোন স্থানে (Position) খেলছে তারও সংক্ষেপে উল্লেখ করা আছে। O-R B অর্থাৎ একদিকের রাইট ব্যাক, X-I L আর একদিকের ইনসাইড লেফট খেলোয়াড়। চিত্রে বলের গতির চিহ্ন - - - - এবং খেলোয়াড়দের গতির চিহ্ন ········ ।

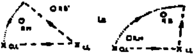

১নং চিত্র

(১) উইং খেলোয়াড়দের সাধারণ আক্রমণ : ১নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে X-OL (একদলের আউট সাইড লেফট) বলটি পাস করছে X-ILকে (ঐ দলেরই ইনসাইড লেফটকে)। ইনসাইড লেফট বিপক্ষদলের রক্ষণভাগের দুজন খেলোয়াড়দের মধ্যে দিয়ে বলটি পাস করেছে X-OLকে। X-OL বলটি নেবার জন্যে ছুটে যাচ্ছে। এই পন্থাটি দ্রুত এবং প্রত্যক্ষ আক্রমণ হবে যদি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অবলম্বন করা যায়। খেলায় এই পদ্ধতিতে রক্ষণ ভাগের দুজন খেলোয়াড়কে পরাস্ত করা যাবে এবং রক্ষণভাগের সংঘবদ্ধভাবে গোলমুখ রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ করবে।

Ia চিত্রে অবলম্বিত পন্থাটি খুবই ভাল হবে যদি O-RB (অর্থাৎ রাইট ব্যাক) তার সহযোগী O-RHকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়ে আসে।

এখানে X-OL নিজদলের X-ILকে বল পাস করাতে সহযোগী O-RHকে cover করতে আসা O-RBর পক্ষে স্বাভাবিক। এবং তাহলেই X-IL বলটি সোজা পাস দিবে আর X-OL কিভাবে ঘুরে গিয়ে X-ILএর পাসটি নিচ্ছে লক্ষ্য করুন। বল পাস করতে একটু দেরী হলেই X-ol কিন্তু off-side positionএ আসতে পারে কিম্বা O-RH এসে খেলার এই মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। সুতরাং বল পাসের বিলম্বে খেলার ধারা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে।

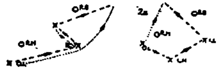

২নং চিত্র

২নং চিত্রে OL একেবারে গোলের মুখে IL-এর পাস নিচ্ছে। এই পন্থাটি সাধারণ প্রচলিত ধারা থেকে অভিনব বলেই বিপক্ষ দল অনায়াসে পরাস্ত হবে। তবে OL এবং ILএর সঙ্গে পূর্ব্ব থেকেই বোঝাপড়া থাকা উচিত। 2A চিত্রে বর্ণিত পন্থাটি খুবই প্রয়োজনীয় হবে যখন RH (রাইট হাফ) OLএর পাস প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয়ে আসবে। OL বলটি পেয়ে ILকে পাস দিবে (সাধারণত যা হয়) এই কথা ভেবে RH ঐ পাসটি প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হলেই OL সহযোগীকে বল পাস না করে দলের LH (লেফট হাফ)কে দিয়েছে। এর পর LH দিয়েছে ILকে। IL কোন কালবিলম্ব না করে বলটি 'খ' পাস দিয়েছে OLএর উদ্দেশ্যে।

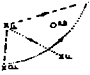

৩নং চিত্র

(৩) OL বলটি পাবার পর সোজা পাস দিয়েছে সামনে। IL ছুটে গিয়ে নিয়েছে। এর পর OL ছুটে গেছে ILএর পাস থেকে গোল করতে। এই পন্থাটিতে OL এবং IL উভয়ে সংকেতের দ্বারা পাস দিতে নির্দ্দেশ করবে ঠিক কোথায় তারা বল চায়।

ফুটবল লীগ ঃ

ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের খেলায় চ্যাম্পিয়ানসীপ পাওয়া নিয়ে বেশ প্রতিযোগিতা চলেছে। প্রথম বিভাগের লীগে মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব উভয়েই ২২টা খেলে সমান ৩১ পয়েন্ট করেছে। তবে মোহনবাগানের গোল এভারেজ ভাল বলেই তার নাম তালিকায় প্রথম। মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রথম খেলায় প্রথম পরাজিত হয়। একাধিক গোলের সুযোগ লাভ করে এবং বিপক্ষদল অপেক্ষা খেলায় অধিকক্ষণ প্রাধান্য লাভ করেও লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলায় তারা মাত্র এক গোলের জন্য পরাজিত হয়। এই ফলাফলের জন্য মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের উপর যেমন দোষ দেওয়া যায় তেমনি তাদের ভাগ্য বিড়ম্বনার কথাও স্বীকার করতে হয়। অবিচ্ছিন্ন পরাজয়ের এই গ্লানিমা তারা খানিকটা মোচন করেছে লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় ইষ্টবেঙ্গলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। সেদিনের খেলায় অনুপাতে আরও অধিক গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করলেও আশ্চর্য্য হবার কিছু ছিলো না। ইষ্টবেঙ্গলের মত দ্রুতগামী দলের সঙ্গে যে এভাবে পাল্লা দিয়ে খেলতে পারবে এ ধারণা

খেলায়। মোহনবাগানের [illegible] সম্বন্ধে কিছু বলার কেউ ভাবতে পারেনি। তবে খেলায় খেলোয়াড়দের [illegible], একাগ্রতা এবং খেলোয়াড়দের অদম্য ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে অতি শক্তিশালী দলকেও পরাজিত হতে হবে তা দেখা গেল। এ ক্ষেত্রেও তা হয়েছিল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দল হিসাবে বেশ শক্তিশালী। লীগের দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের খেলাটি চ্যারিটি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। খেলার প্রথমার্ধেই মোহনবাগান ২-০ গোলে অগ্রগামী থাকে। [illegible] চৌধুরী ও [illegible] দলের পক্ষে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল একটি গোলমাত্র [illegible] গোল করতে সক্ষম হয়। মোহনবাগানের আক্রমণ ভাগে অমল মজুমদার ও রাম চৌধুরী বার কয়েক [illegible] গোলের সুযোগ পেয়েও নষ্ট করেছেন। তবে সেদিনের খেলায় চৌধুরীর নিজের দিনের ক্রীড়াচাতুর্য যেন পুনরায় ফিরে এসেছিল। মোহনবাগানের রক্ষণভাগে [illegible] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের পা থেকে বল তুলে নেওয়া, দলের খেলোয়াড়দের বল যোগান দেওয়া এবং বিপক্ষ দলের প্রবল আক্রমণের বেগ প্রতিরোধ করার দক্ষতা তাঁর খেলার বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি [illegible] সহজে মনে হয় তাঁর আবির্ভাব যেমন নির্ভরযোগ্য তেমনি সকলের একান্ত কাম্য। [illegible] লাইনে অনিল দের খেলোয়াড়দের খেলাও উল্লেখযোগ্য। অপর পক্ষে রাখাল মজুমদার ভাল খেলেছেন। মোহনবাগানের আক্রমণ লাইন পূর্বের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। উভয় দলের গোলরক্ষকই এই দিনের খেলায় কয়েকটি অব্যর্থ গোল থেকে দলকে রক্ষা করেছে। খেলাটি এবং তাদের দলের গোল প্রতিরোধ করার চেষ্টা প্রশংসনীয়। এবারের লীগ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দ্বিতীয় পরাজয়। মোহনবাগানের থেকে একটি খেলা বেশী খেলে সমান পয়েন্ট পেয়েও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নাম দ্বিতীয় স্থানে। উভয় দলের আর চারটে করে খেলা বাকি। ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে হবে পুলিশ ও কালীঘাটের সঙ্গে। মোহনবাগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে মহামেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে। দলের শক্তি বিচার করলে বাকি খেলাগুলিতে উভয় দলেরই জয়লাভ করা উচিত। শেষ পর্যায় খেলায় যদি এই ফলাফলই হয় তাহলে উভয় দলকেই আবার খেলতে হবে। এই খেলার ফলাফল পূর্ব থেকেই অনুমান না করাই শ্রেয়। লীগের তালিকায় ভবানীপুর ক্লাব তৃতীয় স্থানে আছে। ২২টা খেলায় তাদের ৩০ পয়েন্ট। দ্বিতীয়ার্ধের খেলাতেও তারা মহামেডান দলকে পরাজিত করেছে ২-১ গোলে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রথম খেলা গোল শূন্য 'ড্র' করে। দ্বিতীয় খেলার প্রথমার্ধে ২ গোলে অগ্রগামী থেকেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়নি। খেলাটি 'ড্র' হয়ে শেষ হয়েছে। কে দত্ত অদ্ভুত খেলেছিলেন। তাঁকে এ বছরের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক নিঃসন্দেহে বলা যায়। কালীঘাট চতুর্থ স্থানে রয়েছে, ২১টা খেলায় ২৭ পয়েন্ট পেয়ে। মহামেডান স্পোর্টিং পঞ্চম স্থানে আছে। ২১টা খেলায় তাদের পয়েন্ট হয়েছে ২৬। এ পর্যন্ত ৮টা খেলায় হেরেছে। ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুর দু'দলই তাদের প্রত্যেক খেলাতে হারিয়েছে। কালীঘাট এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন তারা প্রত্যেকে একটি খেলায় জিতেছে। লীগ তালিকার নিম্নভাগে মহাবিপর্যয় হয়ে গেছে। ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি সর্বক্ষণই উপরি ভাগেই ছিলো। নিচের এ অঘটনের খবর নেবার উৎসাহই বা কোথায়? কাষ্টমসকে আর ডুবতে হবে না। ডালহৌসীর কাঁধে চড়েই কাষ্টমস এ বছরের লীগের বাঁধ পার হবে। ডালহৌসীর এ ডুবে (?) থাকার থেকে ভেসে থাকাই ভাল ছিলো নাকি? লীগের উঁচু নীচুর [illegible] ব্যবস্থা মন কিছুতেই স্বীকার করছে না।

[illegible]

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত চিত্র-নাট্য "কালিন্দী"

শ্রী[illegible] মজুমদার কবিভূষণ প্রণীত নাটক "[illegible]"—১৷০

শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আকাশ বনানী জাগে"—২,

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত [illegible] "[illegible] বেগোনিয়া"—১

শ্রী[illegible] দত্ত প্রণীত রোমাঞ্চ-উপন্যাস "মোহন ও মদন"—২,
"মোহন-মদনে রণ"—২,

শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পথের পরিচয়"—২৷০

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত শিশু উপন্যাস "রক্তমুখী নীলা"—৮০,
শিশু-নাট্য "রাখী-বন্ধন"—১৷০

অধ্যাপক শ্রী[illegible] রায়চৌধুরী প্রণীত "নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা"—২,

শ্রীমতী বীণা দেবী প্রণীত সচিত্র শিশু-পাঠ্য "সাত বছরে"—৷৷০

শ্রী[illegible] প্রণীত "পল্লী-সংগঠন পরিকল্পনা"—৬০

সুবোধ ঘোষ প্রণীত "কালপুরুষের [illegible]"—২,

পূজার ভারতবর্ষ—শারদীয়া পূজা উপলক্ষে আগামী ভাদ্র সংখ্যা শ্রাবণের ৩য় সপ্তাহে, আশ্বিন সংখ্যা ভাদ্রের ২য় সপ্তাহে এবং কার্ত্তিক সংখ্যা আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ১০ই শ্রাবণের মধ্যে ভাদ্রের, ৫ই ভাদ্রের মধ্যে আশ্বিনের এবং ২৫ ভাদ্রের মধ্যে কার্ত্তিকের বিজ্ঞাপনের কাপি পাঠাইবেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাণ্ডুলিপি না পাইলে বিজ্ঞাপন ছাপা না হইবার সম্ভাবনা। কর্ম্মকর্ত্তা—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

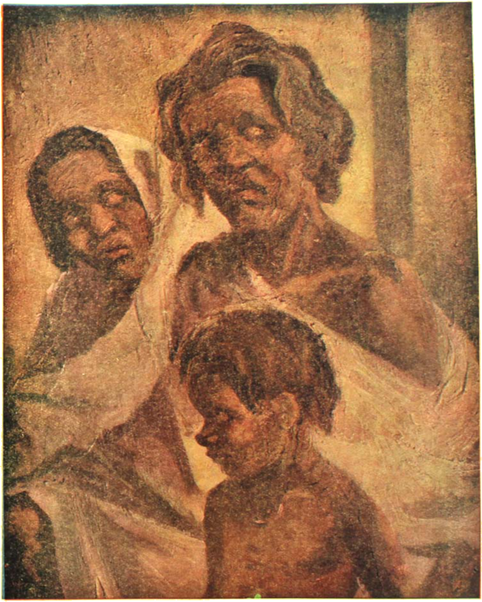

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী　　অন্ধ দম্পতী　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

ভাদ্র—১৩৫০

প্রথম খণ্ড | একত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

বঙ্কিমচন্দ্র

কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ

আজ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন। এ রকম দিন জাতির ইতিহাসে বেশী আসে না। জাতির ইতিহাসে নানা সময় নানা মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তাঁদের স্মৃতি আমাদের মনে জাগরূক রাখা আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্য। যেদিন এমন কোনও সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন যাঁর প্রতিভার সংস্পর্শে জাতির চোখ উন্মীলিত হয়, মনের কথা ভাষা পায়, দেশের অন্তর্নিহিত ব্যাকুলতা বাণীমূর্তি লাভ করে সে দিন জাতির পক্ষে নিশ্চয়ই স্মরণীয় দিন। এই সমস্ত মহাপুরুষের স্মৃতি স্মরণ করায় তাঁদের গৌরবের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু আমরা নিজেরা ধন্য হই, তাঁদের পাবন প্রভাবে পুনরায় প্রভাবিত হই। এতে আমাদের নিজেদেরই উপকার—আমাদের জাতীয় লাভ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে শুধু এই কথা প্রযোজ্য নয়। কেননা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার মহাপুরুষদের মধ্যেও এক হিসাবে অসাধারণ, এক হিসাবে অনন্য। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে এমন এক এক সময় আসে যে সময় দেখা যায় জাতি বিভ্রান্ত, সমাজ নানাদিকে বিভ্রান্ত। দেখা যায়, একটী যুগের অবসান ঘটেছে, কিন্তু আর একটী যুগ তখনও ফুটে ওঠে নি। এইরকম যুগান্তের সময় সমাজ অনেক সময় পথভ্রান্ত হয়ে পড়ে, রাত্রিদিনের প্রভাবে নতুন পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হয় না। এইরকম যুগান্তের সময় জাতির সৌভাগ্যে এক এক জন যুগপুরুষের আবির্ভাব ঘটে, যাঁদের মধ্য দিয়ে শুধু যে জাতির অন্তর্নিহিত আকুলতা প্রকাশ পায় তাই নয়, তাঁরা নিজেরাই জাতির প্রাণস্পন্দনের সাক্ষী মূর্তি।—তাঁরাই জাতির হৃদবেদনা, আঘাত অভিযোগ, আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই যুগপুরুষ কোনও সময়ে রাজনীতিকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, যাঁরা জননেতা তাঁদের মধ্যে এই যুগ-প্রতিভূর সন্ধান সময়ে সময়ে মেলে। কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে এই প্রকৃত যুগপুরুষ শুধু যে রাজনীতিকদের মধ্যেই মিলবে এমন কোনও স্থির নিশ্চয় থাকে না। বাংলা দেশে বহুঃ দেখা গেছে, যতদিন বিস্তৃত পল্লীসমাজ জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল ততদিন রাজনীতির কলকোলাহলে আমাদের জীবন এ রকম মুখরিত হয়ে ওঠে নি, ফলে যুগপুরুষদের সন্ধান রাজনীতিকদের বাইরেও মিলতো। আসলে তিনিই যুগপুরুষ যাঁর মধ্যে সমসাময়িক কাল গভীর ছায়া ফেলেছে, যাঁর মধ্যে আমাদের মনের কথা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, যিনি আমাদের সজীব স্বরূপ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ খুঁজে পেতে সহায়তা করেন। সেই কারণে সমাজের এরকম অনন্য-সাধারণ পুরুষেরা সবসময়েই একাধারে তাঁদের যুগের প্রতিভূ ও স্রষ্টা। একদিকে যেমন তাঁদের মধ্যে সমসাময়িক কালের প্রকৃত স্বরূপটী ধরা পড়ে, অন্যদিকে তেমনি সেইসঙ্গে নতুন ভবিষ্যৎ রচনার চেষ্টাও চলতে থাকে, কেননা তাঁদের চোখেই সমসাময়িক কালের স্বরূপটী ধরা পড়েছে। দেশে দেশে এই রকম স্রষ্টা ও প্রতিভূর দায়িত্ব নানাশ্রেণীর লোকের উপর পড়েছে, কিন্তু আমরা যে যুগের কথা আলোচনা করছি সে যুগে এ রকম যুগপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রই। বাংলাদেশের একটী বিশেষত্বই এই যে, দুটী বড় যুগের নায়ক হ'লেন সাহিত্যিকদ্বয় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যুগের নায়ক আর কে হতে পারে? তাঁদের রচনায় আমাদের জীবনের আনন্দ বেদনা ফুটে উঠেছে, তাঁদের রচনায় আমাদের অনুভূতির ধারা সংস্কৃত হয়ে উঠেছে, তাঁদের লেখনীর মুখে আমাদের অন্তরের কথা রূপ পেয়েছে। সেইকারণে তাঁরা যে নতুন প্রতিভা সৃষ্টি করেছেন তা

আত্মপ্রচারের চেষ্টায় দূষণ না। তাঁদের কাজ জনসাধারণের হৃদয়ে হৃদয়ে গোপন সঞ্চারে হয়ে চলেছে। এই যে সহিত কাজ এরকম নির্বিবাদে অথচ এত ব্যাপকভাবে ঘটতে পেরেছে, এ একটী বিস্ময়কর যোগাযোগের ফল—এটা সম্ভব হতে পেরেছে তার কারণ এর নায়কেরা সাহিত্যিক। সাহিত্যের উপকরণ কাব্যের উপকরণের মত আমাদের প্রাণরস। সেইজন্যে এই যুগপুরুষদের রচনায় আমরা আমাদের জাতীয় বিচ্যুতির যে সমালোচনা পাই, তার মধ্যে আমাদের পরিত্রাণের যে নিদান এবং যে নতুন পথের নির্দেশ পেলে সেগুলিকে অস্বীকার করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। সেইজন্য এঁদের প্রত্যক্ষতঃ সমাজসংস্কারকের আসন গ্রহণ করবার প্রয়োজন হয় না, কেন না দেশের জাতির বা সমাজের দুঃখদুর্দশার স্পন্দনও যাঁর অনুভূতির জালে ধরা পড়ে তাঁর পক্ষে কোনো সময়ই সমাজের প্রাণকেন্দ্র হতে বিচ্যুত হবার উপায় নেই, তাঁদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে সমাজসংস্কার ও জাতির বেদনাতুর নিরাময়কের আসন গ্রহণ করতেই হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময় বাঙালী সমাজে ঠিক এমনই একটী সংকট উপস্থিত হয়েছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়—

"মাঠে মাঠে শস্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন, লোকে আর খাইতে পাইল না।…লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পর কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোতজমা বেচিল!…খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। আগাছা খাইতে লাগিল…অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল, যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।" কিন্তু শুধু অন্নকষ্ট বা খাদ্যাভাবই সে সময়ের বড় কথা তাই নয়, সে সময়ে অভাব সর্বদিকেই। সে অভাব দৈনন্দিন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব শুধু নয়, শুধু যে প্রাণধারণের ন্যূনতম সম্বলের অভাব তা-ও নয়, এ অভাব আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাণের সম্পদেরও অভাব। সেইকারণে একদিকে যেমন শাসকদের দুর্নীত্র শোষণের ফলে দেশে হাহাকার জেগেছিল অন্যদিকে আমরা তেমনই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম—কোনও দিগ্দর্শন সম্ভব হয় নি। পশ্চিমী সভ্যতার প্রথম মোহ তখনও নিঃশেষিত নয়, পরানুকরণই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা এ ধারণা তখনও লুপ্ত হয় নি। সেই সময় আমাদের সমাজে বন্ধন ক্রমশঃই ক্ষীয়মান। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রকে পরানুকরণ-স্পৃহার উপর তীব্র কশাঘাত করতে হয়েছিল, স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছিল সমাজের ভবিষ্যৎ সমাজের অতীতকে অস্বীকার করে সম্ভব নয়—কেননা বিবর্তনের অর্থই হচ্ছে একটী নিরবচ্ছিন্ন সূত্র। সেইকারণেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন "যে জাতির পূর্ব্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে তাহারা মাহাত্ম্য-রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে…বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমানকে অস্বীকার করে শুধুই প্রাচীনে ফিরে যেতেও ইচ্ছুক ছিলেন না, তাঁর বক্তব্য ছিল let us revere the past, but we must, in justice to our new life, adopt new methods of interpretation, and adopt the old and undying truths to the necessities of that new life.

আর আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানাই শুধু এই কারণে নয় যে তাঁর লেখনীস্পর্শে বাংলা সাহিত্যের এক নতুন পথে যাত্রারম্ভ সম্ভব হয়েছিল, তাঁকে আমাদের প্রণাম জানাই শুধু এই জন্য নয় যে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি এখনও আমাদের নানা দুঃখবেদনা দুর্দিনে সান্ত্বনা দিতে পেরেছে। এ কথা সর্ববাদিসম্মত যে, যে আলোকধারায় আজ রবিরশ্মিতে উদ্ভাসিত সে আলোকধারার প্রথম অরুণ আলোর সন্ধান বঙ্কিমচন্দ্রেরই। এই চন্দ্রের পর এই রবির উদয় বাংলা সাহিত্যের অদ্ভুত সৌভাগ্য। কিন্তু এ ছাড়া আর বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাবার অন্য কারণ এই ঘটেছে যে বাংলায় এরকম যুগপুরুষের আবির্ভাব বেশী ঘটে নি। বর্তমান কালে আমরা আবার যে যুগান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি তাতে বর্তমান যুগ কতটা স্থায়ী থাকবে জানি না, কিন্তু এই যুগান্তে আমরা যুগবিবর্তিত হইব এ আশা দুরাশা। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে আমাদের জাতীয় সমস্যার যে সমাধান হয়েছিল বর্তমানের ভাঙন স্রোতে সেই সমাধান সম্বন্ধে আবার একটী বড় প্রশ্নচিহ্ন উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন একটী যুগের অবসান অনুভব করেছিলেন আমরা তেমনি আবার আর একটী যুগান্ত অনুভব করছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখি আবার সেই নৈরাশ্য, অত্যাচার ও উৎপীড়নের পুনরাবৃত্তি। ছিয়াত্তরের মহামন্বন্তরের পর শাসকশ্রেণীর চৈতন্য হয়েছিল যে "রাজাশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না।" আমাদের চারপাশে দৈনন্দিন আহার্য্যেরও এ নিদারুণ অভাব আমাদের চঞ্চল করে তুলেছে, আমাদের চারিদিকে অভাব অনটনের যে করাল ছায়া প্রসারিত হচ্ছে তাতে আমাদের রাজ্যশাসনের জন্য প্রকৃত দায়ী কেউ আছেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা বিচিত্র নয়। আর একদিকে যেমন অভাব অনটনের পীড়ন তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠছে অন্যদিকে তেমনি আমাদের মধ্যে আত্মকলহ ও স্বার্থবিরোধও বেড়ে চলেছে—ফলে আমরা বিস্মৃত হতে বসেছি যে পরস্পরকে উপেক্ষা করে সমাজ সংস্থিতি সম্ভব নয়। এই দুঃসময়ে মমত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডী কাটিয়ে উঠে একটী বৃহৎ ও উদার ক্ষেত্রে সার্বজনীন মিলনের ভিত্তি রচনা যে ক্রমেই কঠিনতর হয়ে উঠবে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এ কথাও সেই সঙ্গে অবশ্য স্বীকার্য্য যে আমরা স্বকীয় স্বার্থের গণ্ডী ছাড়িয়ে নিজেদের একটী বৃহৎ ক্ষেত্রে বৃহৎ অর্থে সার্থক করে তুলতে না পারলে সামাজিক অগ্রগতি দূরে থাক ব্যক্তিগত প্রাণরক্ষাও কালে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের চিন্তাধারায় যে নাস্তিকতা প্রবল হয়ে উঠেছে, আমাদের ভাবধারায় যে নৈরাশ্যবাদ প্রসার লাভ করছে তা হতে এই কথাটিই সূচিত হয়। আমাদের কাব্যে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে—প্রত্যেকদিকেই এই বৈষম্যবাদের প্রতিফলন। এই কারণেই আমাদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিক্ততা, নিষ্ফলতা ও অবসাদ বোধ আবার মূর্ত্তি ধারণ করেছে—আমরা অতীতকে ভুলতে বসেছি কিন্তু কোনও নবীন ভবিষ্যতের আশ্বাসেও আমরা সক্রিয়ভাবে সঞ্জীবিত নই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে যখন স্বেচ্ছাচার প্রবল হয়ে ওঠে তখন সমাজের অবনতি অনিবার্য্য।

কিন্তু আশঙ্কার কথা এই যে, আমাদের ইতিহাসে এরকম যুগান্ত অভূতপূর্ব না হলেও এবার সেরকম কোনও শক্তিমান পুরুষের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি যার মধ্যে নতুন কাল আপনাকে সফল করতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে সেকালের লোকপতি এবং কর্মনিয়ন্তা ছিলেন, তিনি যে উপায়ে এবং যে ভাবে জাতিকে আত্মস্থ হবার পথে সহায়তা করেছিলেন, বর্তমান সংকটে সমাজকে রাশিকৃত আবর্জনার মধ্য হতে উচিত পথ নির্দ্দেশ করতে পারেন, ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে আমাদের কোন দিকে অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক সে সম্বন্ধে নির্ভুল নির্দ্দেশ করতে পারেন এরকম ক্রান্তদর্শীর আবির্ভাব সম্ভবতঃ এখনও হয় নি, এরকম যুগপুরুষের আবির্ভাব এই সংকটে ঘটে কি এটি সম্পূর্ণই আকস্মিক ঘটনা নয়। দেখা গেছে, যুগপুরুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তার ভাবমণ্ডল গড়ে ওঠে। আমাদের এই সংকট আমাদের উৎপীড়িত করেছে, কিন্তু কোনও নতুন সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় নি। ফলে আমাদের বেদনা অনেকাংশে মৃত্যুর বেদনা কিন্তু নবজন্মের বেদনা নয়। আর আমাদের এই কথা দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে, আমাদের সামাজিক মৃত্যু

হতে উদ্ধার পেতে হলে নাস্তিকতার হাত হতে মুক্তিলাভ করতে হবে, তা না হলে কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব নয়। এই নাস্তিকতার হাত হতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় ইতিহাসবোধ। পরস্পরকে স্বীকার করার পরে আমাদের আসে—আমরা পরস্পরে একটী নবপ্রত্যয়ে মিলিত এবং সে হিসেবে আমাদের বর্তমান আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত—এই ইতিহাসবোধ ছাড়া এই গ্লানি ও আত্মকলহ নিবারণ সম্ভব নয়। আজ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে আবার শ্রদ্ধা চিত্তে স্মরণ করি কেননা তিনিই বাঙালীকে প্রথম স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন "বাঙালির ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী মানুষ হইবে না।" আজ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আলোচনা করি কেননা তিনি আমাদের অতীত ইতিহাসের একটী যুগের সর্বাঙ্গীন প্রতীক; আজ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের জয় উদ্‌ঘোষণ করি কেননা বাঙালী আজ যে গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, ভারতবর্ষ আজ যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে—একশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেও সেকালের নানা মতিবিভ্রম ও দলভ্রান্তি হতে দেশকে উদ্ধার করে দেশের মনে সেই গৌরবময় স্বপ্নের বীজ বপনের কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রেরই। আজ সেইজন্য আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন সফল করার চেষ্টা করি, তবে তাহাতেই দেশের বন্দনা করি—বন্দে মাতরম্।*

---

* গত ৪।৭।৪৩ তারিখে কাঁটালপাড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্কিম-জন্মদিন-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

মেঘদূত

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ়ের মেঘে মেঘে যে বিরহ ওঠে জেগে যুগ হতে কত যুগান্তরে
তারি অনুভূতি নিয়া, প্রাণের বেদনা দিয়া ছন্দে ছন্দে তুলিয়াছ স্বরে।
শ্যামল মেঘের ছায়া নবদূর্বার মায়া ঘনাইয়া ওঠে ধীরে ধীরে,
সে মায়ায় সংগোপনে চমকিত ক্ষণে ক্ষণে আনমনা করে বিরহীরে।

আকাশ বাতাস ব্যাপি' নবমেঘে অবগাহি এখন আষাঢ় এল দ্বারে
প্রোষিত ভর্তৃকাদল দূর প্রেমে উজ্জ্বল পথে বাহিরিয়া বারে বারে।
এ উহার পানে চায় যারে চায় সে কোথায় কোন দূর পথে ও প্রান্তরে
প্রাণ-পাখী দেহ ফেলি' খাঁচার আগল ঠেলি' উড়ে যায় লঘু পক্ষ ভরে'।

ভারাক্রান্ত মন যবে মন্দাক্রান্তা গতি তার দূর পথ দীর্ঘ দূরান্তর
বিদ্যুৎ সম্মুখে জলে মেঘদূত ভেসে চলে বিরহের যন্ত্রণা-কাতর
যক্ষের বিনয়-বাণী জানি জানি ভাল জানি বিরহী জনের মর্মকথা
বিদীর্ণ মেঘের গায় প্রেম বুঝি মুরছায় গুমরায় অন্তর্গূঢ় ব্যথা।

চির-বিরহের প্রেম অনলবিশুদ্ধ হেম, যুগ-যুগান্তের যে বিরহ—
তাহারি ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিতেছে রণরণি বন্ধনের বাধ অহরহ।
অশ্রুজলে ছল ছল আরক্তিম-পরিমল বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
মেদুর মেঘের 'পরে লেখে লিপি স্তরে স্তরে, অবিশ্রান্ত তাহারি বর্ষণ।

চলে রামগিরি শিরে কভু শিপ্রানদী নীরে উজ্জয়িনী প্রাসাদ শিখরে
কামনার মোক্ষধাম অলকা তাহার নাম বিরহিণী যেথায় বিহরে।
যক্ষের বিরহ-জ্বালা বুঝিতে কি পারে বালা রুদ্ধ গৃহ বাতায়নে বসি'
হয়ে আছে অন্যমনা, বিবশ বিবশ প্রাণ মর্ম ব্যথা উঠিছে উচ্ছ্বসি'

যক্ষের বিরহানলে প্রিয়ার বিরহ জ্বলে সে জ্বালায় জ্বলে নরনারী
নবমেঘে মেঘদূত অলকায় বিদ্যুৎ নিখিল বিরহী-মন তারি।
সে বিরহ-কুঙ্কুমম্লান অশ্রুজলে পরিম্লান ভেসে আসে সজল বাতাসে
বিরহিণী প্রিয়া পানে ইঙ্গিতে প্রণয়ভারে আপনার করুণ উচ্ছ্বাসে।

আজো বিরহীর ব্যথা কবিতা কল্পনালতা মেলে দেয় নবীন মঞ্জরী
কোমল কোরকে তার মধুগন্ধে মধুভারে মত্ত অলি বেড়ায় গুঞ্জরি।
রতি-অভিলাষী জন নব-মেঘে অনুক্ষণ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
ললিত-বলিত স্বরে প্রেম-অভিসার করে কামস্বর্গে আনন্দে নিরসে।

হস্তে লীলাপদ্ম শোভা কেশে কুন্দ মনোলোভা পাণ্ডুর আননে লোধ্রধূলি
নব কুরুবক ফুল বেণীবন্ধে সমাকুল শিরীষ উঠিছে কানে দুলি।
সীমন্তে কদম্বদাম বিরহীর মনস্কাম মনে মনে মঞ্জরিয়া উঠে।
জলদ-শিখীর কণ্ঠ কেকাস্বরে সমুৎকণ্ঠ হংসবুকে যে বেদনা ফুটে

মেঘদূতে আহ্বানিয়া মর্মব্যথা বাখানিয়া যে বেদনা বহিলে অন্তরে
মুক্তগতি সে মেঘের বাহিত সে আবেগের স্রোত বহে যুগ-যুগান্তরে।
তুমি বিরহের কবি আঁকিলে যক্ষের ছবি দেবস্থান রামগিরি শিরে
নবমেঘ সমাগমে স্মরিয়া সে প্রিয়তমে মেঘদূতে আহ্বানিয়া ধীরে—

পাঠাল বারতা তার আজো প্রতিধ্বনি তার গুরু গুরু মেঘ গরজনে
শুনি' বিরহিণী বালা অনুভবে সেই জ্বালা, সেই জ্বালা বিরহীরও মনে।
আজো বুঝি সেই মত বিরহ-বেদনাহত প্রিয়া পানে পাঠায় বারতা
বরষার ধারাজলে পাষাণেও অশ্রু গলে প্রতি ক্ষণে তারি কাতরতা

মর্মে মর্মে অনুভবি, আমরা যেথায় কবি, মেঘদূত-উৎসবের দিনে
নিখিল বিরহী জনে টেনে নিই আকর্ষণে প্রেম নিই তুলে করে' চিনে।
বিরহের ব্যথা আছে মিলন প্রত্যাশী কাছে কে না বুঝে বিরহের জ্বালা
প্রেমেরে সুন্দর করি' বিরহ রেখেছে ধরি' তারি কণ্ঠে দিই বরমালা

আকাশে বিরহ-ব্যথা তাহারি মর্মের কথা দিকচক্রে নিত্য উচ্ছল
বন মর্মরের ধ্বনি শুনি তারি প্রতিধ্বনি মরুভূতে বালুকা-সজল।
নক্ষত্র-সভার মাঝে শুকতারা মরে লাজে আপনার একান্ত দীপ্তিতে
যোজন সভারও মন প্রকম্পিত গুঞ্জরণে দুলে' উঠে শূন্য অন্তরিতে।

তটপ্রান্তে ঢেউ আসি স্পর্শ করে ভালবাসি' খরবেগে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
বহুদূর হ'তে তাই কল্লোল শুনিতে পাই বিরহের বেদনা উচ্ছল।
হৃদয় বেদন-গানে মেঘদূত যার পানে নিয়ে যায় বিরহীর মন
মিলন প্রত্যাশা করি' রাখে সে জীবন ধরি' কবি লেখা করে সকরুণ।

বিশ্বের বিরহ-ভার মর্মভেদী-হাহাকার ধ্বনি হ'তে প্রতিধ্বনি দোলে
তোমার সে মেঘদূত ঝলকিয়ে বিদ্যুৎ-শিখা তারি উঠে কেঁপে কেঁপে।
যুগ হতে যুগান্তর ভারাক্রান্ত অন্তর নব মেঘে চঞ্চল উন্মনা
দীর্ঘপথ অভিসারে খুঁজিয়া বেড়ায় যারে, বিরহে যে সেও অন্যমনা:

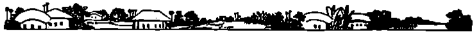

অন্নকূট

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

সকাল হইতে কাঙালীচরণ আসিয়া ক্ষুধার্ত জনশ্রেণীতে দাঁড়াইয়াছে বহু বেলে, কম্পিতপদে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে—কিন্তু নিয়তি নিতান্তই অপ্রসন্ন—প্রার্থিত চাল মিলিল না। একদিন, দুদিন, পর পর তিনদিনই তাহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল।

রাতের তারা থাকিতে সে বাহির হইয়াছে—ট্রেন কর্তৃপক্ষের চোখে ধূলা দিয়া নগরীর রাজপথে আসিতেও সমর্থ হইয়াছে—সারিবদ্ধ জনতার মাঝে এক কোণে বহু লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করিয়াছে কিন্তু শেষ কালে সেই ব্যর্থতা-পরাজয় চরম হতাশার গ্লানি বহন করিতে হইল।

পূর্বের লোকটি পর্যন্ত দু'সের চাল পাইল—কিন্তু তাহার বেলায় বিধিবাম!. দোকান বন্ধ হইয়া গেল—নির্দিষ্ট পরিমাণের চাল বিক্রয় হইয়া গেছে—সিভিক্‌গার্ড আসিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল।

অপর সকলে গালিগালাজ আর কলরব করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। ব্যর্থতার অপমান কণ্ঠের ভাষায় পরিস্ফুট করিয়া তাহারা মনের জ্বালা জুড়াইতে চায়! কিন্তু কাঙালীচরণের সে অবস্থাও আর নাই। হতাশার গভীর বেদনা ক্ষুধার তীব্র জ্বালা তাহার কণ্ঠের বিদ্রোহ-বাণীকেও রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

বাড়ি হইতে নিশুতি রাতে বাহির হইবার সময় সে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল চাল না লইয়া কিছুতেই সে আর গৃহে ফিরিবে না। ক্ষুধার্ত পরিবারের বুভুক্ষিত দৃষ্টির সামনে সে আর দাঁড়াইতে পারে না।

কিন্তু আজিও সেই ব্যর্থতা চরম ব্যর্থতার জ্বালা তাহাকে বহন করিতে হইল! এখন সে কী করিবে?

না, এমনি করিয়া রিক্ত হস্তে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি আর অবসাদের বোঝা লইয়া বাড়ি যাইতে কিছুতেই সে পারিবে না। যেমন করিয়াই হোক না কেন দিনের আহার আজ তাহাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে!

নগরীর রাজপথে জনস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সারিসারি জনতার শ্রেণী ট্রাম, বাস, মোটর, ফিটন, রিক্সা শহরের বুকে বিরাট স্পন্দনের সৃষ্টি করিয়াছে।

দোকান-পসার, হাট-বাজার এ এক বিপুল পৃথিবী। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার অন্ন থরে থরে সাজানো রহিয়াছে। কাঙালীচরণ তাহার মাঝে শুধু নিঃসহায়ের মত ক্লান্ত পদবিক্ষেপে চলিয়াছে।

তাহার পাশ দিয়া একটি তরুণ যুবক চলিয়া গেল—দামী সিগারেটের গন্ধ উড়াইয়া। আর একটি মেয়ে, বয়স বিশের হয় নাই—খট্ খট্ শব্দ করিয়া রাজপথভূমি কাঁপাইয়া মিষ্টি গন্ধের আমেজে ভরপুর হইয়া কাঙালীচরণকে অতিক্রম করিয়া গেল। ক্ষুধার্ত কাঙালীচরণ একবার বোকা হইয়া দাঁড়াইল। এই বিপুল ধনশ্রীর মধ্যে তাহার কী কিছুই করিবার নাই? এত বড় এই শহর, দৃশ্যমান এই বিপুল সুখ-সম্ভার—ইহার এতটুকু অংশের প্রতিও কী তাহার কোন অধিকার নাই? আজ তিনদিন তাহার কিছুই প্রায় খাওয়া হয় নাই। আর তাহার বুভুক্ষিত পরিবার—শিশু নাতনীটি পিতৃহীনা অনাথা বালিকা একমুঠি অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে! নিজের কষ্ট কোন রকমে সে সহ্য করিতে পারে—কিন্তু অসহায় তাহার পরিবারবর্গের মাঝে ওই শিশুটির ক্ষুধা-কাতর দৃষ্টি তাহার বুকে শেলের মতন গিয়া বিঁধিয়া থাকে!

কাঙালীচরণের মানসপটে ভাসিয়া ওঠে সেই ছবি—উপবাস-ক্লিষ্ট তাহার সংসার তাহার প্রত্যাগমনের আশা পথের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া আছে!

অনির্দিষ্ট পথ চলিতে চলিতে একটি প্রাসাদসম অট্টালিকার প্রতি কাঙালীচরণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। ফুলে ফুলে লতায় পাতায় বাড়িখানি সুসজ্জিত।

তোরণ পথে মালিকী সারি সারি অপেক্ষমান মোটরের শ্রেণী। সামনের প্রকাণ্ড উদ্যানটির সুসজ্জিত আচ্ছাদনের নীচে রঙিন বাল্ব ঝুলিতেছে। বাড়ি হইতে নানা সুখাদ্যের মধুর গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে!

ক্ষুধার্ত কাঙালীচরণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ধূ ধূ মরু প্রান্তরের মাঝে সে যেন সুশীতল পানীয়ের সন্ধান পাইয়াছে। নিরন্ন বুভুক্ষার মাঝে অন্নকূটের রাশি রাশি অন্ন তাহার শুষ্ক দৃষ্টিতারাকে সজল করিয়া তুলিল।

কাঙালীচরণ তোরণদ্বারে অতিক্রম করিতে গিয়া প্রথমেই বাধা পাইল। তকমা আঁটা উর্দি গায়ে বলিষ্ঠ দ্বাররক্ষীর প্রচণ্ড ধমকে তাহার ক্ষুদ্রদেহ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

কাঙালীচরণ অনুনয় জানাইল—করুণা ভিক্ষা মাগিল—বাবা, তিনদিন ভাত খাওয়া হয় নি—দে বাবা একটু ঢুকতে দে—আমারে কিছু না দিস্ না দিবি—আমার বাচ্চা নাতনীটা আজ তিন দিন উপবাসী—তোদের এখানে তো খাবারের অভাব নেই—কতই তো ফেলা যাবে—রাস্তার কুকুর বেড়ালেও কত খাবে। দ্বাররক্ষী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল ভাগ্-গো হিঁয়া সে—

লজ্জায় অপমানে কাঙালীচরণ রাস্তার একপাশে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রকাণ্ড একখানি মোটর আসিয়া তোরণ পথে থামিল। দ্বাররক্ষী সসম্ভ্রমে গিয়া মোটরের দরজা খুলিয়া দিল। গৃহকর্তা আসিয়া বিনীত প্রীতি আহ্বান জানাইলেন। সুসজ্জিত নিমন্ত্রিতের দল হাসিমুখে গৃহমণ্ডপে প্রবেশ করিল।

কাঙালীচরণের চোখ ঝলসাইয়া গেল। চালের দোকানের সামনে ক্ষুধার্ত জনতার শ্রেণী—বুভুক্ষিত তাহার পরিবারবর্গ—অনশনক্লিষ্ট তাহার দেহ মন—এই পর্যাপ্ততার পাশে এই সভ্য পৃথিবীর মাঝে কেমন করিয়া নগ্ন কঙ্কালের স্তূপ বহন করিয়া বাঁচিয়া আছে?

কাঙালীচরণ ভাবিল একবার কী সে গৃহকর্তার নিকট তাহার করুণ আবেদন জানাইবে? হয়ত তাহাতে সুফল ফলিতে পারে। গৃহকর্তা হয়ত অনুগ্রহ ভরে অনুকম্পার সহিত তাহাকে প্রচুর আহার্য দান করিতে পারেন—যাহা হইতে তাহার অনশনক্লিষ্ট পরিবারের অশ্রুমলিন মুখে স্বস্তির হাসি ফুটিয়া উঠিবে।

কাঙালীচরণকে দেখিয়া দ্বাররক্ষী আর একবার রুখিয়া উঠিল—কিয়া শালা ভেগা কিয়া ফিকির হ্যায়?

কাঙালীচরণ করুণকণ্ঠে কহিল—থোরা খানা পিনা আইন বহুত দেহি!

খানা পিনা—শালা নবাব্‌কো বেটা আ-পিয়া। যেন্তা লিয়ে ইধার খানা মজুত হ্যায়? ভাগ্‌, শালা ভাগ্‌, চোট্টা কাঁহাকা—

দ্বাররক্ষী সতর্ক হইয়া উঠিল—আহারাদি সারিয়া একদল বাহির হইয়া আসিতেছে। সম্ভ্রমের অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া সে অতিথিদের আভিজাত্য সম্মান রক্ষা করিল।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া নিমন্ত্রিতের দল মোটরে উঠিবার কালে গৃহস্বামী আসিয়া বিনয় প্রকাশ করিলেন—দুপুরের রোদে আসা যাওয়া অনেক কষ্ট হল আপনাদের। দুঃখের কথা বাজারে (তো) কোন আয়োজন করবার উপায় নেই, মনের বাঁশি কখন যে সেরে ওঠে—

মার্জিত হাসির তরঙ্গে সকলেই এই রসিকতার রস-মাধুর্য উপভোগ করিল। একজন কহিল—কিন্তু আপনি যা আয়োজন করেছেন এই দুর্দিনের বাজারে—পঞ্চাশ টাকা মণের দর, পঁচিশ টাকার চাল তা যোগাবারও উপায় নেই। সত্যি, একেবারে কার্ট্রাণ চমৎকার নীট একেবারে—

বিনয়ের মৃদু হাসি হাসিয়া গৃহস্বামী কহিলেন—তেমন আর কী করতে পারলুম? প্রথম নাতিটির অন্নপ্রাশন, আপনাদের পাঁচজনের পায়ের ধুলো পড়লো—আপনাদের আশীর্বাদ এই আমার সৌভাগ্য।

মোটর ছাড়িয়া দিল।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপকে সুশীতল করিবার জন্য গাড়ির পাখা চালাইয়া দেওয়া হইল, খস্‌খসের পর্দায় পিচকারি করিয়া জল ছিটানো হইল।

কাঙালীচরণ দাঁড়াইয়া দেখিল তাহার চোখের সামনে দিয়া পথধূলি উড়াইয়া মোটরখানি বেগে ছুটিয়া গেল।

রাস্তার ডাষ্টবিনটার কাছে একরাশ এঁটো অভুক্ত এবং অর্দ্ধভুক্ত দুর্মূল্য আহার্য বাড়ীর দাস দাসীরা আসিয়া ফেলিয়া গেল।

তৃষ্ণায়, ক্ষুধায়, কাতরতায় কাঙালীচরণের কণ্ঠতট—উদর জ্বালাময় দেহ—অবসন্ন—সেই উচ্ছিষ্ট আহার্য দেখিয়া সর্বশরীর তাহার টলিয়া উঠিল। এক মুঠি অন্ন এবং এক গ্লাস পানীয় সে তবু যদি পাইত এখন।

টলিতে টলিতে সে গৃহস্বামীর নিকট আগাইয়া যাইবার প্রচেষ্টা করিল। গৃহস্বামী তখন তোরণদ্বার পার হইয়া অন্দরে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বাররক্ষী আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার কঠিন কর্কশ কণ্ঠস্বর এবং নির্মম তিরস্কার বাণী কাঙালীচরণের মর্মে তীব্র আঘাত করিল।

ক্রোধে, দুঃখে, অপমানের চরম জ্বালায় সে ফিরিয়া চলিল—এত বড় উৎসব প্রাঙ্গণে অন্নশালায় তাহার মত হীন দরিদ্রজনের কোন স্থান নাই।

সর্বশরীর তাহার টলিতেছে! রৌদ্র দগ্ধ রাজপথের প্রচণ্ড উত্তাপ তাহার নগ্ন পদতল পুড়াইয়া দিতেছে—ক্লান্তি অবসাদে তাহার চলিবার শক্তিও হ্রাস পাইয়া আসিতেছে—তবুও কাঙালীচরণ থামিল না—রাজপথ বহিয়া সে চলিতে লাগিল। আর এক মুহূর্তও এখানে সে দাঁড়াইতে পারিল না। ক্ষুধার জ্বালা মর্মান্তিক অবসাদ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ অপেক্ষা ধনিকের এই অবজ্ঞা, অমানুষিকতা এবং অপমান তাহাকে আঘাত করিয়াছে অনেক বেশি।

অবস্থার বিপর্যয়ে দেহ তাহার ক্লিষ্ট, কিন্তু তাই বলিয়া মন এখনও বিকৃত হইয়া ওঠে নাই।

উচ্ছিষ্ট আহার্য লইয়া ডাষ্টবিনের কাছে নগ্ন কঙ্কালসার বীভৎস একটি ভিখারী বালকের সহিত কয়েকটি দেশী কুকুরের মারামারি এবং কুৎসিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে—কাঙালীচরণ আজিও সে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই—তাহার মন এ দৃশ্যে সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে!—

*

কিছুক্ষণ পথ চলিবার পর পরিশ্রান্ত কাঙালীচরণ দেখিল—রাস্তার ফুটপথ বহিয়া জনতার শ্রেণী আবার সার দিয়া দাঁড়াইতেছে।

কাঙালীচরণ শুনিল—বিকালে এখানে পুরুষদের কন্ট্রোলের চাল দেওয়া হইবে।

কাঙালীচরণের মনে আবার নূতন আশার সঞ্চার হইল।

সামনের খাবারের দোকানের আলমারিতে থরে থরে খাদ্য দ্রব্য সুসজ্জিত। ক্ষুধিত দৃষ্টি কাঙালীচরণের—সে যদি ওইগুলি এখন পাইত!—লুব্ধ দৃষ্টিতে সে খাবারগুলি দেখিতে লাগিল।

অন্ততঃ কিছু খাবারও যদি সে খাইতে পায়—কিন্তু হিসাব করা পয়সা—দু'সের চাল উহার বিনিময়ে ক্ষুধার্ত জনসঙ্ঘের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অর্জন করিলে মিলিতে পারে মাত্র! অতি কষ্টে সে নিরুপায় হইয়া লোভ দমন করিল।

ওপাশে জলসত্র হইতে খানিকটা বড় একপেটা জল পান করিয়া কাঙালীচরণ আসিয়া আবার দাঁড়াইল সেই অন্নলোভী জনতার মাঝে।

দ্বিপ্রহরের জলন্ত রৌদ্রের উত্তাপ মাথার উপর দিয়া তাহার বহিয়া গেল। সমস্ত দিনের ক্লান্তি আসিয়া তাহার বৃদ্ধ শরীরকে অবসন্ন করিয়া দিতেছে—কিন্তু এবারে কাঙালীচরণ চরম যুদ্ধ করিবে।

আবার সেই উত্তেজনা—ক্ষুধার্ত জনতার মাঝে কাড়াকাড়ি, মারামারি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইল!—

বৃদ্ধ কাঙালীচরণ একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে—এবারে আর সে কিছুতেই হটিয়া যাইবে না।

পিছন দিক হইতে প্রবল ধাক্কা আর কঠিন নিষ্পেষণ আসিতেছে—দুর্বল শিরাতন্ত্রীগুলি তাহার অবশ এবং শিথিল হইয়া আসিতেছে—সমস্ত দিনের ক্লান্তি অবসাদে আর ক্ষুধার জ্বালায় সর্বশরীর আনচান করিতেছে—তবুও সে দমিবে না!—কঠিন চাপে কম্পিত পদ যুগলকে সে ভীড়ের মাঝে রাস্তার মাটিতে ধারণ করিয়া আছে। এইবার তাহার পালা নিকটবর্তী। কাঙালীচরণের কোটরাগত পাণ্ডুর বিশীর্ণ চোখ দুটি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আলো অবসান গোধূলির মাঝে সে যেন কল্পিত নবালোকের কিরণ স্পর্শলাভ করিতেছে! অন্ততঃ একটি বেলার

[illegible] কাঙালীচরণ তাহার ক্ষুধার্ত পরিবারবর্গের মাঝে মুক্তহাসির সহিত আহার করিতেছে !—

কিন্তু কেমন করিয়া জানি না কী হইয়া গেল !

চাল বিক্রেতার কাছে আসিয়া স্তূপীকৃত চাল দেখিয়া কাঙালীচরণের মাথা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ যে আলোর ঝলকানি তাহাকে দিশেহারা করিয়া দিয়াছিল তাহার সকল দীপ্তিই কোথায় অন্তরিক্ষে অন্তর্হিত হইল। তাহার চোখের সম্মুখ হইতে সকল আলোর কিরণ মুছিয়া দিয়া নিবিড় অন্ধকারের ঘন যবনিকা নামিয়া আসিল !—

বিহ্বল কাঙালীচরণ সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া পথের মাঝে পড়িয়া গেল।

যখন জ্ঞান ফিরিল কাঙালীচরণ দেখিল তাহাকে ঘিরিয়া বহু জনতার কোলাহল। স্বেচ্ছাসেবকের দল তাহার চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতেছে—পাখার বাতাস করিতেছে।

ওধারে লাল নিশানধারী একটা স্বেচ্ছাবাহিনীর মিছিল—কাঙালীচরণের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতে তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—গরম দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাকে খাইতে দিল।

ডাক্তার আসিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া একটি ইন্‌জেক্‌সন দিয়া গেল—মস্তিষ্কের শিরায় আঘাত লাগিয়াছে—হাসপাতালে পাঠানোই যুক্তি সঙ্গত।—

কাঙালীচরণকে ঘিরিয়া আবার বিপুল কলরব সুরু হইল। ধনতন্ত্রকে বহু গালিগালাজ দিয়া সকলেই তাহার প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে !—

কাঙালীচরণ বিহ্বল হইয়া গেছে—পূর্ব্বের কোন কথাই যেন সে আর স্মরণ করিতে পারিতেছে না !

স্বেচ্ছাসেবকের দল তাহাকে প্রশ্ন করিল—তোমার বাড়ি কোথায় ?—

অতিকষ্টে কাঙালীচরণ তাহার ঠিকানা বলিল।

কিন্তু সে উঠিতে পারিতেছে না কেন ? মাথায় তাহার কিসের প্রচণ্ড বেদনা ? কথা বলিতে গেলেও ভয়ানক কষ্ট বোধ হইতেছে !—

স্বেচ্ছাসেবকের দল তাহাকে জানাইয়া দিল তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতেছে—তাহারা তাহার গৃহে এখুনি এ সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবে।

রুদ্ধ অশ্রুর আবেগে কাঙালীচরণ কাঁদিয়া ফেলিল—অভুক্ত পরিবারবর্গ তাহার—আজও সে চাল পায় নাই।

দোকানদার আসিয়া সহানুভূতিবশে তাহাকে জানাইয়া দিল—তাহার গৃহে তাহারা অনেক চাল পাঠাইয়া দিয়েছে—তাহার কোন চিন্তার কারণ নাই।

এ্যাম্বুলেন্স কার আসিয়া যখন পৌঁছাইল তখন আবার উত্তেজিত জনতামহলে বিপুল কোলাহল সুরু হইল। ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ কামনা করিয়া সাম্যবাদের জয়ধ্বজা তুলিয়া স্বেচ্ছাসেবকের দল সমাজতন্ত্রের মহিমা প্রচার করিতেছে।

লাল নিশানের যে মিছিল তাহাকে এতক্ষণ ঘিরিয়া ছিল তাহাদের কণ্ঠে উত্তেজনার ধ্বনি আকাশ বাতাসকে মুখরিত করিয়া তুলিল—অন্ন মোদের পেতেই হবে—জনগণ জয়ী হোক্ !—

রুগ্ন কাঙালীচরণকে লইয়া এ্যাম্বুলেন্স কার ছুটিয়া চলিল।

দূরের পথ বেয়ে জনতার মিছিল মিলাইয়া গেল।—

বিভ্রান্ত কাঙালীচরণ তখন শুধু অনুভব করিতেছে—পর্যাপ্ত অন্নের থালি লইয়া তাহার অভুক্ত পরিবারবর্গ ক্ষুধার জ্বালা জুড়াইতেছে—মুখে চোখে তাহাদের সুকৃপ্তির হাসি। লক্ষ্মীরূপী অন্নপূর্ণা আসিয়া তাহার পর্ণ-কুটিরে অধিষ্ঠান করিয়াছেন—অন্নকূটের অন্ন-উৎসবে কুটিরে তাহার আর বুভুক্ষার জ্বালা নাই।—

কাঙালীচরণের স্তিমিত চক্ষু দুটি হইতে দু'ফোঁটা অশ্রু বিন্দু অলক্ষে ঝরিয়া পড়িল !

রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস

৬০১ পৃ:

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য এম-এ

"তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখা বলিতে। ইহা অতি আধুনিক সমাজকে বিদ্রূপ করে লেখা। wit ও humour বইখানির মধ্যে সমভাবে আছে।" রবীন্দ্র সাহিত্যের হাস্যরসের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক লেখক এই মন্তব্য করিয়াছেন। উক্ত লেখক রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের লেখা যার কবিতার প্রশংসা করিতে গিয়া যে কবিতাটির উল্লেখ করিয়াছেন "সেটি হচ্ছে তাঁর 'পাকালের সাধ'।

এবার মরে সায়েব হব না,
এবার মরে লায়েব হব।
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে না,
পোড়া নেটিভ নাম ঘুচাব।
সাদা হাতে হাত দিয়ে না,
বাগানে বেড়াতে যাব,
আর কালো মুখ দেখলে পরে
'ড্যাম' বলে মুখ ফিরাব।" (১)

লেখক যে পুস্তক হইতে গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিলাম তাহার ১১০ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিলাম, স্থানে স্থানে পাঠ মিলিতেছে না। (২) অবশ্য তাহাতে গুরুতর ক্ষতি হয় নাই, কেন না এই ব্যঙ্গ-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ লিখেন নাই। প্রমাণ :

"আমার বিলাতের চিঠিতে 'এবার মলে সাহেব হব' গানটি উদ্ধৃত করেছিলেম। আমার স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যরসের দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ গানটি আমার রচনা ব'লে প্রচার করেছেন। তাতে অন্যান্য রচয়িতার মান বেঁচে গেছে, কিন্তু আমার বাঁচে নি। আমার বিনাস যথোচিত গবেষণা করলে আমার লেখা থেকে ওর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতেও পারে।" ৩

আমাদের বিনাস গবেষণা কিছু কম করিলেও দৃষ্টান্তের অভাব ঘটিবে না। কিন্তু সে কথা অবান্তর। সাহিত্যে হাস্যরস বলিতে কি বুঝায়

---

(১) শ্রীঅজিতলাল দাস, 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' উদয়াচল, শ্রাবণ, ১৩৫৮

(২) চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, দুটির উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস

(৩) পাশ্চাত্য ভ্রমণ, প্রথম সংস্করণ, পৃ: ৮/০

তাহার সংখ্যা নির্দেশ না করিয়া সমালোচকের মন্তব্য তুলিবার কারণ এই যে—সূত্র অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বুঝিবার পক্ষে সহজ।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যাহা সহজ বলিয়া মনে করা যায় একটু তলাইয়া দেখিতে গেলে তাহাই আবার সর্বাপেক্ষা কঠিন বোধ হয়। সূত্রের পথ সুগম। দৃষ্টান্তের পথ অদৃষ্টের মতই অনির্দিষ্ট। সমালোচকের ব্যক্তিগত রুচি ও বুদ্ধির উপরই তাহা নির্ভর করে। আর সেই রুচি ও বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন সমালোচকদলের মধ্যে ঐক্য কদাচিৎ দেখা যায়।

ব্যঙ্গাত্মক রচনার নিদর্শনস্বরূপ একজন নাম করিলেন 'শেষের কবিতা'র। আবার আর একজন বলিতেছেন :

"তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) রচনায় হাস্যরস প্রায় কোনো স্থানেই উচ্চাঙ্গের হয় নাই।" (১) হাস্যরসের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের "প্রতিভার সঙ্কীর্ণতা" প্রমাণ করিতে গিয়া লেখক 'চিরকুমার সভা'র বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সেই বিশ্লেষণের ফল এইরূপ :

"তাহাকে (পূর্ণকে) লইয়া বিপিন, শ্রীশ ও রসিক দাদা অনেক মজা করিয়াছে; কিন্তু এই রসিকতায় কোনো বৈশিষ্ট্য নাই।"

"যে চিরকুমারদের ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য রমণীর দরকার হয় না, শুধু স্ত্রীলোকের গানের খাতা বা রুমাল হইলেই চলে, তাহাদের পরাজয়ে যে হাস্যরসের সঞ্চার হয় তাহা উচ্চাঙ্গের নহে।"

"শ্রীশ ও বিপিন বিবাহ করিতে রাজী হইলেও রসিকদাদা তাহাদের মনের কথা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। ইহাতে যে হাস্যরস আছে তাহা খুবই অপকৃষ্ট।"

"নাটকের অন্যান্য যে সব পাত্র-পাত্রী আছে তাহাদের কথাবার্তা ও ব্যবহারে কোন উচ্চাঙ্গের রসিকতা নাই।"

"অক্ষয়, পুরবালা, শৈলবালা, নৃপবালা ও নীরবালা ইহাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি আছে প্রচুর, কিন্তু কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নাই।"

"বিবাহপ্রার্থীদের (দারুকেশ্বর ও মৃত্যুঞ্জয়) মূর্খতার কোন মাধুর্য নাই।"

"তাঁহার (চন্দ্রবাবুর) চরিত্রও শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্রের সঙ্গে এক আসন পাইতে পারে না।"

এই তো গেল চিরকুমারসভার বিশ্লেষণের ফল। অন্যান্য ব্যঙ্গ-রচনা সম্বন্ধেও সমালোচকের মতামত কয়েকটি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করি :

"'বৈকুণ্ঠের উইল' প্রহসনের (উইল শব্দটা স্পষ্টতঃ মুদ্রাকর প্রমাদ) বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশের চরিত্রেও এই ব্যাপকতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠের বাতিক লেখা, অবিনাশের বাতিক বাগান করা, দ্বিতীয় বাতিক মনোরমার জন্য প্রেম। এই সকল বাতিকের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। শুধু অবিনাশের স্ত্রী-বাতিকের প্রতিক্রিয়া একটু সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল; তাহার ফলে বৈকুণ্ঠ ও তাহার মেয়েকে প্রায় ঘরছাড়া হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহারও কোন সত্যকার মূল ছিল না এবং ইহার মধ্যে হাস্যরসও নাই।"

'গোড়ায় গলদ' সম্বন্ধে :

"এই প্রহসনের মূল উপজীব্য চরিত্র সৃষ্টি নহে, ঘটনার সমাবেশ। গোড়াতেই বলিয়া রাখা উচিত যে এই শ্রেণীর গল্প বা নাটক কখনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আসন পাইতে পারে না।"

"প্রহসনের মধ্যে ঘটনায় যে সন্নিবেশ হইয়াছে তাহাতেও আর্টের মহিমা কিছুই নাই।"

'ব্যঙ্গ-কৌতুক' ও 'হাস্য-কৌতুক' সম্বন্ধে :

"ইহার কোনটার মধ্যেই উচ্চাঙ্গের কমেডি নাই।"

মোট কথা :

তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যেন শুধু কথার মারপ্যাঁচ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। ইহাতে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু তাহা অপকৃষ্ট হাস্যরস।

তাহা হইলে দেখা গেল 'শেষের কবিতা'ও ব্যঙ্গাত্মক রচনায় বিশিষ্ট উদাহরণ, আবার 'চিরকুমার সভা', 'গোড়ায় গলদ' 'ব্যঙ্গ-কৌতুক' প্রভৃতিও উৎকৃষ্ট হাস্যরসবর্জিত। দ্বিতীয় সমালোচকের মতে উৎকৃষ্ট হাস্যরস কথার মারপ্যাঁচের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে না। এ কথা সর্বাংশে সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষীরসমুদ্রে যে অজস্র রসনির্ঝরিণীর সম্মিলন ঘটিয়াছে কথার কল্লোলে তাহাদের মাধুর্য বৃদ্ধি পায় নাই একথা কেমন করিয়া বলি? কথা ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যে আর কিছু আছে কিনা সে কথা পরে হইবে, কিন্তু শুধু কথাই যদি ধরি সেও তো কথার কথা হইবে না। কবিওয়ালারা কথার খেলা খেলিয়াছেন, দাশু রায় কথার খেলা খেলিয়াছেন আর সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও কথার খেলা খেলিয়াছেন বলিয়া বাতিল করিয়া দিলে চলিবে কেন? সমালোচক বলিয়াছেন : "সাধারণতঃ গীতিকাব্য রচয়িতাদের রচনায় হাস্যরসের অবতারণা করা হয় না। গীতিকাব্যের সৃষ্টি হয় ভাবের গভীরতা হইতে। যখন কোন কবি কোন ভাবে বিভোর হইয়া অন্য সকলপ্রকার বিষয় হইতে দূরে স্বর্গলোকে গমন করেন, তখনই তিনি গীতিকাব্য লিখিতে পারেন। তাঁহার অনুভূতি যত গভীর ও তীব্র হইবে, তাঁহার কবিতাও তত উৎকৃষ্ট হইবে। হাস্যরসিকের মাপকাঠি সাধারণ বুদ্ধি; তিনি সাধারণ বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া দেখেন কোন্ জিনিস ঔচিত্যের সীমায় আসিয়া পৌঁছিল বা সীমা ছাড়াইয়া গেল। তাঁহার কারবার অসামঞ্জস্য পরস্পর-বিরোধিতা বা কোন কিছুর আতিশয্য লইয়া।...কবি থাকেন স্বপ্নের রাজ্যে যেখানে সাধারণ জীবনের নিয়ম খাটে না, রসিক থাকেন সর্বদা সজাগ কোথায় সাধারণ আইনের লঙ্ঘন করিয়া অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইল। কাজেই গীতিকবিতার সঙ্গে রসিকতার বিরোধিতা আছে।"

রবীন্দ্রনাথের "রচনায় হাস্যরস প্রায় কোন স্থানেই" যে "উচ্চাঙ্গের হয় নাই" সমালোচক মহাশয়ের মতে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিত্ব তাহার কারণ হইতে পারে।

ভাষার শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার দেখিয়া বৈয়াকরণ ব্যাকরণ রচনা করেন। কালক্রমে সে ব্যবহার পরিবর্তিত হইলে নূতন বৈয়াকরণকে নবতর সূত্র সংযোজন করিতে হয়। প্রচলিত ছন্দের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া যে ছন্দঃশাস্ত্র এক যুগে রচনা করা হয় কালান্তরে নূতন কবি জন্মগ্রহণ করিয়া তাহা অসম্পূর্ণ প্রমাণ করেন। শক্তি যাঁহাদের অধিক তাঁহারা বিধানের শাসন মানেন না, বিধান তাঁহাদের অনুগমন করে। অসামান্য প্রতিভা সাধারণের পথ অতিক্রম করে বলিয়াই তাহা অসামান্য। এমন একদিন ছিল যখন মিল না দিলে কবিতা হইত না। যেদিন অমিল কবিতা দেখা দিল লোকে তাহাকে কবিতা বলিবে কি না ভাবিয়া পাইল না। এখন আবার গদ্যকবিতা কবিতা কি না তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়াছে, যেহেতু কাব্যশাস্ত্রে গদ্য কবিতার বিধান নাই।

সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা যাহার আছে সে সৃষ্টি করে—সেই ক্ষমতা যাহার অসাধারণ তাহার সৃষ্টির মধ্যে অসাধারণত্ব থাকিলে বিস্ময় উদ্রিক্ত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু পূর্বে এরূপ ঘটে নাই বলিয়া তাহার সৃষ্টি যে সৃষ্টি নয় এরূপ প্রমাণ করিতে যাওয়ায় বিপদ আছে। "সাধারণতঃ গীতিকাব্য রচয়িতাদের রচনায় হাস্যরসের অবতারণা করা হয় না।" রবীন্দ্রনাথকে "সাধারণতঃ"র দলে ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হইলে স্পষ্টরূপে দেখা যাইত তাঁহার রচনায় হাস্যরস প্রচুরপরিমাণে বিদ্যমান। লিরিক কবি যদি শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তি রাখেন, জমিদারি তদারকে অপটু না হন, স্বজাতির উন্নতিবিধানে মনোযোগ দেন, সর্বোপরি ইস্কুল মাস্টারিও করিতে পারেন তবে হাস্যরসিক হইতে বাধা কোথায়? দেশী বিলাতী এমন কোনো শাস্ত্র আছে কি যেখানে গীতিকবিতা রচনা এবং ইস্কুল মাস্টারির মধ্যে [illegible] সম্পর্কের কল্পনা আছে?

'চিরকুমার সভা'র বিপিনের মুখে কবির এই উক্তিটি স্মরণযোগ্য :

---

(১) শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ

"সংসারের শ্রেষ্ঠ জিনিসমাত্রেই নিজের নিয়ম নিজে সৃষ্টি করে; ক্ষমতাশালী লেখক নিজের নিয়মে চলে, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকের নিয়ম মানে না।"

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস শুধু শব্দাশ্রয়ী ইহা যদি স্বীকার করিলাও নাই, তথাপি বলিতে হইবে তাঁহার শব্দসম্ভার ভাবলক্ষ্মীর অঙ্গে এমন পরিপাটি রূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহার অলংকৃতিটাকে পৃথক করিয়া দেখা যায় না। অঙ্গ ও অলঙ্কারে মিলিয়া যে একটি অখণ্ড সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে খণ্ডভাবে দেখিবার উপায় নাই। শব্দ কোথাও রসকে স্বীয় সত্তা প্রচার করে না।

"শৈল। মুখুজ্যেমশায়, এইবার তোমার ছোট দুটি শালীকে রক্ষা কর।

অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয় হয়ে থাকেন তো আমি আছি।"

… … … …

নৃপ। আঃ কি যা তা বকছিস। দেখ তো ভাই মেজদিদি।

অক্ষয়। ওকে ওই জন্যেই তো বর্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্বরে, ভগবান তোমাদের কটি সহোদরাকে এই একটি অক্ষর কম দিয়ে রেখেছেন, তবু তৃপ্তি নেই?"

… … … …

বনমালী। কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরীমশায়ের দুটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে। তাঁদের বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে।

শ্রীশ। হয়েছে তো হয়েছে, আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কী?

বনমালী। সম্বন্ধ তো আপনারা একটু মনোযোগ করলেই হতে পারে। সে আর শক্ত কী? আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

বিপিন। আপনার এত দয়া অপাত্রে অপব্যয় করছেন।

বনমালী। অপাত্র! বিলক্ষণ! আপনাদের মতো সৎপাত্র পাব কোথায়! আপনাদের বিনয়গুণে আরো মুগ্ধ হলেম।

শ্রীশ। এই মুগ্ধভাব যদি রাখতে চান তাহলে এই বেলা সরে পড়ুন। বিনয়গুণ অধিক টান সয় না।

… … … …

শৈল। আমরা তোমার সব শালীরা মিলে তোমাকে শালীবাহন রাজা খেতাব দেব।

… … … …

পুরবালা। তুমি আর তোমার মুখুজ্যেমশায়ে মিলে কদিন ধরে যে রকম পরামর্শ চলছে একটা কী কাণ্ড হবেই।

অক্ষয়। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড তো আজ হয়ে গেল।

রসিক। লঙ্কাকাণ্ডেরও আয়োজন হচ্ছে। চিরকুমার সভার স্বর্ণলঙ্কায় আগুন লাগাতে চলেছি।

… … …

শৈল। আমি যে সভ্য হব।

পুরবালা। কী বলিস তার ঠিক নেই। মেয়েমানুষ আবার সভ্য হবে কী?

শৈল। আজকাল মেয়েরাও যে সভ্য হয়ে উঠেছে!

… … … …

রসিক। কোনো বা অস্ফুট শব্দ···।

শৈল। রসিকদাদা তুমি তো দিব্যি শ্লোক আউড়ে চলেছ—কোন জিনিসটা কী, তা মুখুজ্যেমশায় টের পাবেন।

রসিক। আমি তাই বরং করতে রাজি আছি। মুখুজ্যেমশায় যদি শ্লোক আওড়াতেন আর আমার উপরেই যদি কোপ পড়ত তাহলে এই পোড়া কপালকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতুম।

… … … …

অক্ষয়। আরে দিদির হয় তো জোগাড় করেছিলি, নইলে পাণিগ্রহণ কী হত?

অক্ষয়। মশায় ভয় পাবেন না এবং অমন ভ্রূকুটি করে আমাকেও ভয় দেখাবেন না—আমি অভূতপূর্ব নই, এমন কী আমি আপনাদেরই ভূতপূর্ব···।

পূর্ণ। মশায়, অভূতপূর্বর চেয়ে ভূতপূর্বকেই বেশি ভয় হয়।

অক্ষয়। ···সংসারে ভূতের ভয়টাই প্রচলিত। নিজে যে ব্যক্তি ভূত অন্য লোকের জীবনযোগটা তার কাছে বাঞ্ছনীয় হতে পারেই না। এই মনে করে মানুষ ভূতকে ভয়ংকর কল্পনা করে। অতএব সভাপতি মশায় চিরকুমার সভার ভূতটিকে সভা থেকে তাড়াবেন না···!

… … … …

পুরবালা। অবাক করলি। লজ্জা করছে না।

শৈল। দিদি লজ্জা যে স্ত্রীলোকের ভূষণ—পুরুষের বেশ ধরতে গেলেই সেটা পরিত্যাগ করতে হয়।

… … … …

পুরবালা। এই বেশে তুই কুমার সভার সভ্য হতে যাচ্ছিস?

শৈল। অন্য বেশে হতে গেলে যে ব্যাকরণের দোষ হয় দিদি। কী বল রসিক দাদা!

রসিক। তা তো বটেই ব্যাকরণ বাঁচিয়ে তো চলতেই হবে ভগবান পাণিনি বোপদেব এঁরা কী জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন? কিন্তু ভাই ধিঙ্গি শৈলবালার উপর চাপকান প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষে হয়?

অক্ষয়। নতুন মুগ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখে পড়ে দিতে পারি, চিরকুমার সভার পুরুষের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কি না।

… … … …

শ্রীশ। এই দেখো না (কোণের একটা টিপাই হইতে গোটা দুয়েক চুলের কাঁটা তুলিয়া দেখাইল)।

বিপিন। তবে ভাই, এ স্থানটা তো কুমারদের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়।

… … … …

অক্ষয়। একেই বলে তপোপস্থিতা পালা। পৃঃ ১১০

… … …

রসিক। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শ্রীশ। কিন্তু সমাপনটা তো মধুর নয়।

… … … …

বিপিন। যেটা পাতে পড়ে আছে, ওটা তৃতীয় কিস্তি।

শ্রীশ। ওটা না পড়ে থাকলে আমাদেরই পড়ে থাকতে হত।

… … … …

হাস্যরসের মধ্যে যাহা একান্ত ভাবে শব্দাশ্রয়ী, শুধু সেইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্তই উপরে উদ্ধৃত করা গেল। শীকোর কবি 'বেগনী রুমাল' অথবা 'হিল্লাহাজেরা' যে সম্প্রদায়ের পাঠক ও দর্শকদের মনে আনন্দ সঞ্চার করে 'চিরকুমার সভা'র শব্দালঙ্কার তাঁহাদের মনে রেখাপাত করিতে পারিবে না। 'চিরকুমার সভা' সর্বসাধারণের প্রহসন নহে। সাধারণ থিয়েটার দর্শকের পক্ষে ইহার রসোপলব্ধি দুষ্কর। 'আলিবাবা ফতেমা' শুনিয়া যাহারা উচ্চহাস্য করে চিরকুমার সভা তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না। আলিবাবা নাটকে মর্জিনাকে 'আলি বাবা' (বাবা শব্দের উপর জোর দিয়া) এবং আলিবাবাকে 'ফতে মা' (মা শব্দের উপর জোর দিয়া) ডাকিতে শুনিয়াছি। সম্ভবত প্রয়োগশিল্পী দর্শকগণের মনে এই ভাবে হাস্যরস সঞ্চারের চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের শব্দাশ্রয়ী হাস্যরসের যদি কোনো দোষ থাকে তো তাহা এই যে—মার্জিতরুচি শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন সে-রস উপভোগ করিতে পারে না। সাধারণ রঙ্গালয়ে এ ধরণের হাস্যরস অকেজো হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কখনো নাট্যশালার '[illegible]'দের জন্য এ রস সৃষ্টি করেন নাই। তাহাদের 'ধাতু' তিনি বিশেষ রূপেই জানিতেন। তবে হীরার ধার নষ্ট হইল বলিয়া আক্ষেপ করিব কেন? [illegible] তো হীরার ধার পরীক্ষা করিবার ক্ষেত্র নহে।

ক্রমশঃ

স্বপ্ন-বর্তিকা

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায় এম-এ

অশ্রু-সিক্ত নয়নে সীমা এসে বাইরের বারান্দায় দাঁড়াল। রাত্রি বারোটা তখন। আকাশের রূপ গম্ভীর, এখনই বুঝি আকুল হয়ে ভেঙে পড়বে ধরণীর বুকে। শ্রাবণ তখনও শেষ হয় নি।

প্রিয়ব্রত যতক্ষণ জেগে ছিল, ততক্ষণ সীমা কাঁদতে পারে নি, অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করে ছিল। কিন্তু প্রিয়ব্রতের শিয়রে বসে তাকে বাতাস করতে করতে সে যখন এক সময় লক্ষ্য করলে যে প্রিয়ব্রত ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তার চোখে জল এসে পড়ল। পাখা রেখে সে বাইরে এসে দাঁড়াল।

আশৈশব অভিমানিনী সীমা। তার ছ' বছর বয়সের সময় মা মারা যায়, কিন্তু বাবার কাছ থেকে সে স্নেহ পেয়েছিল প্রচুর, মার অভাব একদিনও বুঝতে পারে নি। কিন্তু হলে কি হবে, লেখাপড়া শেখার সুযোগ তার জীবনে ঘটে ওঠে নি। বাবা ছিলেন খামখেয়ালী। নিজেও এক জায়গায় বেশীদিন থাকেন নি, সীমাকেও রাখেন নি। এমনি করেই সীমার জীবনের বারোটি বছর কেটে গেল। তারপর সীমাকে নিয়ে তার বাবা এসে উঠলেন সীমার মামার বাড়ী। মামা সীমাকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসতেন। কিন্তু মামার বাড়ীতে পদার্পণ করার দিন থেকেই সে স্বেচ্ছায় রান্নাঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে। বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা মাতৃহারা মেয়েদের বোধ হয় অল্প বয়সেই বুদ্ধিমতী করে তোলে। তাই সে ভেবেছিল, 'মামা-মামী আমায় যতই ভালবাসুন, তাঁদের ছায়ায় এসে যখন দাঁড়ালুম তখন অন্তত দাসীর কাজটাও যদি না করি, তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে।' তাছাড়া, রান্নার কাজে আরও কয়েক বৎসর আগে থেকেই তার হাত পেকে উঠেছিল। মামার আশ্রয়ে আসার দু' বৎসর পরেই বাবাও তার মায়া ত্যাগ করে ওপারে চলে গেলেন। কিশোরী সীমা গোপনে অশ্রু মুছে ভাবলে, 'ভাগ্যিস্, দু' বছর আগে রান্নাঘরে এসে ঢুকেছিলুম।' যাই হোক, রন্ধনশালার তার অধিষ্ঠান আরও কায়েমি হয়ে উঠল এবং সেখানেই সে তার সরস্বতীকে বিসর্জন দিলে।

মাকে সীমার আবছা আবছা মনে পড়ে। বড় হয়ে সে শুনেছিল, মা তার লেখাপড়া জানতেন। তার স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে সুদূর অতীতের একটি ম্লান ছবি, ছোট্ট সীমাকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে, তার স্নেহময়ী মা আদরের-সুরে অ-আ-ক-খ এ-বি-সি-ডি আবৃত্তি করছেন। সেই সীমা আজ যদি নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে মূর্খ হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্যে ত সে দোষী নয়, দোষী নিয়তিই। তাই, আজ যখন রুগ্ন প্রিয়ব্রত থার্মোমিটার দেখতে দেখতে তিক্ত হয়ে বললে, 'ঘড়ি দেখতে জানো না, ইংরিজির অক্ষর চেনো না, জানো না থার্মোমিটার দেখতে—জীবনের এই আঠারোটা বছর কি করে কাটিয়ে এলে তাই ভাবি', তখন অভিমানে লজ্জায় ও অপমানে তার বুক ফুলে ফুলে উঠছিল। এখন বাইরে এসে দাঁড়াতে তার অশ্রু আর বাধা মানল না, অঝোরে ঝরে পড়ল।

বিগত জীবনের ছবি মনের চলচ্চিত্রে একটি করে দেখতে দেখতে কতক্ষণ যে অতিবাহিত হয়েছিল, তা সীমার খেয়াল ছিল না। এক সময় একটু ঠাণ্ডা বোধ হতে চম্‌কে উঠে সে দেখলে, কখন্ বৃষ্টি বর্ষণ সুরু হয়ে গেছে ও তার সর্বশরীর অর্ধ-সিক্ত করে ফেলেছে। সে এসে তাড়াতাড়ি প্রিয়ব্রতের পাশে শুয়ে পড়ল।

• • • •

শারদীয়া পূজোর দিন পনেরো আগে সীমার মামা লোক পাঠিয়ে সীমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। কথা রইল, মাস দুই পরে সীমাকে আবার পাঠিয়ে দেবেন তিনি।

সেখানে গিয়ে একদিন কথায় কথায় সীমা সলজ্জভাবে তার মামাত বোনকে বললে, শাখা, আমায় একটু একটু করে ইংরিজিটা পড়াবি ভাই, বড় ইচ্ছে করে।

বিশাখা সীমার সমবয়স্কা, তার বহুদিনের সহচরী, সে-বার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

বললে, বেশ ত দিদি, আজ থেকেই লেগে যা।

সেদিন থেকে সীমা বিশাখার ছাত্রী হল। কাজ-কর্মের অবসরে যেটুকু সময় সে পেত, তা সে একনিষ্ঠভাবে লেখাপড়ায় কাটিয়ে দিতে লাগল। দিন পনেরোর মধ্যেই তার অক্ষর-পরিচয় হয়ে গেল, বড় 'এ-বি' ছোট 'এ-বি' সুন্দরভাবে লিখতেও শিখলে সে।

এর পর বিশাখা যখন প্রথম পদ-পাঠ আরম্ভ করতে যাবে, তখন সীমা বললে, দূর, আর ভাল লাগে না। তার চেয়ে—

সীমা থেমে গেল।

—তার চেয়ে, কি ?—জিজ্ঞেস করলে বিশাখা।

মৃদু হেসে সীমা বলে ফেলল, হ্যাঁরে, 'প্রিয়তমে'র ইংরিজি কি ?

—ও-বাব্বা, তাই !—বিশাখা খিলখিল্ করে হেসে উঠল। জিজ্ঞেস করলে, কেন, হঠাৎ এ কথা ?

সীমা দেখলে, বিশাখাকে ব্যাপারটা খুলে না বললে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, তখন সে সব প্রকাশ করলে।

শুনে বিশাখা বললে, 'প্রিয়তম'র ইংরিজি বলতে পারি, কিন্তু কি খাওয়াবি বল আগে ?

—দু' পয়সার ডাঁশা পেয়ারা।

ব্যাস্, বিশাখা ত আহ্লাদে আটখানা, তখনই রাজী। ডাঁশা পেয়ারা তার অতি প্রিয় বস্তু।

কয়েকদিনের মধ্যেই সীমা Dearest, yours sheema আর ইংরিজিতে প্রিয়ব্রতর নাম-ঠিকানা লিখতে শিখল। থার্মোমিটার দেখা, ঘড়ি দেখা, ঘড়িতে দম দেওয়া—কিছুই আর তার শিখতে বাকি রইল না।

ইতিমধ্যে এক মাস কেটে গেছে। এসে পর্যন্ত সীমা প্রিয়ব্রতর কাছে একখানাও চিঠি লেখে নি। অথচ, প্রিয়ব্রত পর পর তিনখানা চিঠি লিখেছে।

এবার সীমা লিখলে,

Dearest,

এখানে এসে সকলের অসুখ-বিসুখ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলুম যে এতদিন একটুও অবসর পাই নি। তুমি পরপর তিনখানা চিঠি লিখে উত্তর না পেয়ে হয়ত আমার ওপর খুব রাগ করেছ। কিন্তু কি করব বলো। এবার থেকে নিয়মিত উত্তর দোব, ঠিক, দেখো। এখানে পূজোর সময় খুব ধুমধাম আর আনন্দ গেছে, জলপাইগুড়ি বেশ ভাল শহর কিনা, তাই। অবশ্য, তোমাদের কলকাতার মত নয়। পূজোর সময় আসবে বলেছিলে, এলে না। আচ্ছা বেশ, দেখে নিলুম। এই যে আড়ি করলুম—হুঁ-হুঁ বাবা। শরীরের দিকে নজর রেখো কিন্তু। আমি শীগ্‌গিরই যাব। বাবা-মাকে প্রণাম দিও, তুমিও নাও। ছোটদের স্নেহাশীষ জানাচ্ছি।

yours sheema

কয়েকদিন পরে সীমা কলকাতায় আসতেই প্রিয়ব্রত তাকে বললে, চিঠি-পত্র অপরকে দিয়ে লিখিয়ে নাও কেন? নিজে লিখতে পারো না।

—কৈ, না ত!—সীমা মনে মনে কৌতুক অনুভব করলে।

—কেন মিথ্যে বলছ। ইংরিজি অক্ষরই চেনো না, আর ইংরিজি কথা অতগুলো লিখলে কি করে?

—কে বললে তোমায়, আমি ইংরিজি লিখতে পারি না!—মৃদু হাসল সীমা।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রিয়ব্রতের কেমন একটু সন্দেহ হতে লাগল। পরীক্ষা করবার জন্যে চিঠির ইংরিজি কথাগুলো সে সীমাকে আবার লিখতে বললে। সীমা সুন্দরভাবে লিখে দিলে।

প্রিয়ব্রতর চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বললে, বেশ, বেশ, এই ত চাই।

পরদিন সকালবেলা রান্নার এক ফাঁকে প্রিয়ব্রতর ঘড়িটায় দম দিতে দিতে সীমা বললে, ঘড়িটায় ক'দিন দম দাও নি? বন্ধ হয়ে আছে।

প্রিয়ব্রত মুখ তুলে বিস্ময়ে চেয়ে রইল সীমার দিকে।

সীমা বললে, ও ঘরে বাবার ঘড়িতে দেখে এলুম, সাড়ে আটটা বাজে। ওঠো শীগ্‌গির। এখনো কবিতা? অফিস যেতে হবে না?

বলেই সে ঘড়িটা রেখে চলে গেল।

কয়েকদিন পর। প্রিয়ব্রত অফিস থেকে আসতেই সীমা থার্মোমিটার নিয়ে এসে বললে, আবার বুঝি ম্যালেরিয়া ধরল গো। দ্যাখো ত, নিরানব্বই পয়েন্ট ফোর, নয়?

প্রিয়ব্রত থার্মোমিটারটা নিয়ে দেখলে, তাই। সীমার কপালে হাত রেখে বললে, সত্যিই ত জ্বর। শীগ্‌গির শুয়ে পড়ো।

সীমার জ্বর তবুও প্রিয়ব্রতের আজ একটা অদম্য লোভ হচ্ছিল। সীমার দিকে মুখ এগিয়ে নিয়ে গেল সে।

• • • •

স্বপ্ন ভেঙে গেল সীমার। জেগে উঠে দেখলে, সূর্য-কিরণে ঘর ভরে গেছে। প্রিয়ব্রত তখনো নিদ্রিত। স্বপ্নের কথা ভাবতেই তার মনে পড়ল, সত্যিই ত, মামা ত গতকালই চিঠি দিয়েছেন পূজোয় তাকে নিয়ে যাবেন বলে। তার সুন্দর মুখখানি প্রভাতের আলোয় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল।

স্ত্রীশিক্ষার একটী কার্য্যকরী নব-আদর্শ

ডাঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষার একান্ত আবশ্যকতা

সরকার হইতে এ দেশে শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে-সকল রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা এই কথাই বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানকালে অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর-কালে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে স্ত্রীশিক্ষা; এবং শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে স্ত্রীশিক্ষার দাবীকেই সর্ব্বাগ্রে মানা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের কথা যথাযথ উদ্ধৃত করিয়াই দিতেছি:

"In the interest of the advance of Indian Education as a whole, *priority* should now be given to the *claims of girls' education* in every scheme of expansion."—(*Report of the Hertog Committee of the Indian Statutory Commission*)

"The education of women is *by far the most important need* in India to-day."—(*The VIII Quinquennial Review by the Government on the Progress of Education in Bengal*)

'সর্ব্বাপেক্ষা' বা 'সর্ব্বাগ্রে' কথাটির সম্বন্ধে হয়তো কাহারো কাহারো অমত থাকিতে পারে; কিন্তু, আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও সংস্কার যে অনতিবিলম্বে ও একান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে বোধহয় আর দ্বিমত হইবার অবকাশ নাই।

ইহার অত্যন্ত সোজা ও স্পষ্ট কারণ এই যে, মায়েরই সেই আলো যাহা অন্ধকার হইতে বাহির হইবার পথ প্রদর্শন ক'রে, এবং মায়েরই সেই শক্তি যাহা সেই মুক্তি ও উন্নতির পথে চলিবার ক্ষমতা ও সামর্থ্য দান করে। যে-শিশু মানব সমাজের ভিত্তি ("Child is the father of man" বা "Nation marches on the feet of little children") তাহার প্রকৃত জন্মসূত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কালেই নয়; সে-জন্মের বহুপূর্ব্বে পিতামাতা ও বংশের জ্ঞানে ও চরিত্র প্রভাবে, পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির উচ্চাদর্শের আবহাওয়ায়, এবং গর্ভাধানকালে মাতার উপযুক্ত খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আনন্দস্ফূর্ত্তির মধ্যে অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান। ভূমিষ্ঠকাল অবধি চার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত মায়ের কোলেই শিশু সন্তানের সর্ব্বপ্রাথমিক শিক্ষালয়; এবং অন্ততঃ দশ বারো বৎসর পর্য্যন্ত,—তাহার আসলে গড়িয়া উঠিবার সময়,—সাধারণতঃ মায়ের সান্নিধ্য ও স্নেহবশতঃ পিতা অপেক্ষা সন্তানের উপর মাতার প্রভাব অনেক বেশী। তাহা হইলে মাতাই হইলেন, জাতির ভিত্তি বা মেরুদণ্ডস্বরূপ যে-শিশু, তাহার প্রথম ও প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। সুতরাং ভবিষ্যৎ জাতিকে এক উন্নততর, বলিষ্ঠতর কর্ম্মিষ্ঠতর ও চরিত্রবলসম্পন্ন জাতিরূপে গঠন করিতে হইলে এই সর্ব্বপ্রধানা শিক্ষয়িত্রী-মাতাকে যথোপযুক্তরূপে শিক্ষিতা করিতে আর একদিনের বিলম্ব অন্যায়। ইহা মানি ও স্বীকার করি যে, শিক্ষা অর্থে সর্ব্বদা লিখন-পঠন ক্ষমতা বা পুঁথিগত বিদ্যাই নহে; চরিত্র ও স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি বলে বহু পুরুষ ও নারী তথাকথিত বহু শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা সম্মান

সাফল্যে বা সংসার সংগ্রামে উপযুক্ততর ; কিন্তু উহার উপরে শিক্ষা পাইলে তাঁহারা আরো উপযুক্ততর হইতে পারিতেন ; এবং ইঁহাদের সংখ্যাও খুবই কম। আর, তা না হইলেও, দীর্ঘজীবনে দেহ ও মনের একটা সুগঠন জ্ঞানবোধ ও আত্মশক্তি লাভ এবং সংসারের বিচিত্র পরীক্ষা, সমস্যা ও সংগ্রামে উত্তীর্ণ হইবার জন্যও সম্যক শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা যে কতো, তাহা আর বেশী করিয়া ব্যক্ত করিবার আবশ্যকতা আছে কি ?

আদর্শ স্ত্রীশিক্ষা

সে-শিক্ষা কী শিক্ষা ? সে কোন্ নব-আদর্শ, যাহা হইবে কার্য্যকরী ?

এ-শিক্ষা সেই-শিক্ষা যাহা (১) নারীর দেহকে সুস্থ, সুন্দর, সুগঠিত ও বলিষ্ঠ করিবে ; এবং তাহার মনকে করিবে বিবিধ ও বিচিত্র জ্ঞানের আনন্দে ও ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ, সচেতন, সজীব ও সক্রিয়। শুধু তাহাই নহে ; নব-আদর্শের নব-শিক্ষা প্রণালীতে, শরীরের মোটামুটি মূল ও প্রধান তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করিয়া, দেহের সাধারণ ও সুলভ ব্যাধি বিপত্তির মোটামুটি গৃহ-চিকিৎসা করিতে নারী সমর্থ হইবে, যাহাতে তেমন ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকিবে না ; বরং দেহজনিত অনেক কষ্ট বহু পরিমাণে এই 'ঘরোয়া' চিকিৎসায় নিবারিত বা উপশমিত হইবে এবং ইহাতে আর্থিক লাভও সামান্য হইবে না। জানি, অনেকে হয়তো ইহা পড়িয়া আঁৎকাইয়া উঠিবেন, বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না ; কিন্তু ইহা আমার দীর্ঘ জীবনে, চিকিৎসাক্ষেত্রে, বহুল অভিজ্ঞতাপ্রসূত কথা এবং পরীক্ষিত। অনেক নূতন কথা প্রথমে এইরূপই বিস্ময়কর লাগিতে পারে।

(২) এই নব-শিক্ষা প্রণালীতে তাহার ভিতরকার সুপ্ত বা অবদমিত যে-ব্যক্তিত্ব তাহা জাগাইয়া তুলিবে এবং সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সাহায্য ও সমর্থ করিবে। একটী মানুষের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটী শক্তির প্রভাব, যাহার উপর তাহার মহত্ব বা নীচতা নির্ভর করে ; বংশ প্রভাব, আবেষ্টনের প্রভাব এবং এই উভয়কেই অতিক্রম করিবার স্বীয় ব্যক্তিত্ব বা প্রতিক্রিয়া শক্তির প্রভাব। আমরা সাধারণতঃ এই তৃতীয় শক্তির উদ্বোধ-সাধন করিনা ! তাই দিই অদৃষ্ট বা কপালের দোষ বা "পূর্ব্বজন্মের" দোহাই ; অপরের পক্ষে বলি "luck".

(৩) এই নব-শিক্ষা জাগাইবে দেশাত্ম-বোধ ও স্বদেশপ্রীতি এবং জন্মভূমির সেবায় ও উন্নতি কল্পে দেহ মনকে করিবে উদ্বোধিত ও সক্রিয়।

(৪) নারীর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য কোথায় ? তাহার মাতৃত্বে। তাহাকে "পতি মর্য্যাদা"—পতির জ্ঞান বিদ্যা ও কর্ম ক্ষেত্র—সম্বন্ধে সম্যক "জ্ঞাত", তাহার আদর্শ "গৃহিণী সচিব সখী" এবং "বীর প্রসবিনী" সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইতে প্রবুদ্ধ করিবে। শুধু স্ত্রী হওয়াই নহে ; আদর্শ মাতা হইয়া, উচ্চ আদর্শ ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধক সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার ভিতর দিয়া "বীর" সন্তানকে ফুটাইয়া তুলিবেন, এই নব-শিক্ষার সাহায্যে। মানুষ তো প্রাণীমাত্র নহে ; তাহার সহজাত সহজবুদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহার জ্ঞানমূলক বুদ্ধি ও বিবেচনা। সুতরাং সকল পুরুষ ও নারীই যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন এমন কোনও কথা নাই। মানুষ স্বাধীন। য়ুরোপ-আমেরিকা-রাশিয়া প্রভৃতি সব উন্নত ও প্রগতিশীল দেশে সকল মহিলাই বিবাহ করেন না। তাঁহাদের অনেকেই আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া, বিবিধ ক্ষেত্রে, দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করিয়া জীবনকে করেন কৃতার্থ, সার্থক। আমাদের দেশেও বিধবারা আমরণ "অবিবাহিতা"ই থাকেন অর্থাৎ পুনর্বিবাহ করেন না। কিন্তু তাদৃশ কোনো শিক্ষা বা সুযোগ সুবিধার অভাবে, বাধ্য হইয়া পরিবার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, সাধারণ গৃহস্থালীর কার্য্য ব্যতীত সাধারণতঃ দেশের কোনও কাজে লাগিতে পারেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাতৃত্বই নারীর শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য ও কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতে আগামী যুগে যে মহত্তর জাতির দিকে আমরা চাহিয়া আছি, যাহারা আমার দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহাদের প্রসূতির দল বা প্রস্তুত হইতেছেন কোথায় ! বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডিগ্রী" লাভ করিয়া যাঁহারা জীবনে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহারা সে-শিক্ষা আদৌ পাইতেছেন কি ? এম, এ পাশ করিলেও তাঁহাদের শিক্ষয়িত্রী পদের উপযুক্ত বলিয়া ধরা হয় না, বি. টি. ও য়ুরোপে যাইয়া টি. ডি. বা তদ্রূপ ডিগ্রী আনিতে হয় ; কিন্তু সন্তানকে এক বৎসর কেন, তৎপূর্ব্ব কাল হইতেই, গড়িয়া তুলিবার জন্য, পশু পক্ষীর ন্যায় কেবলমাত্র সহজাতবৃত্তিসম্পন্না না হইলেই কি হয় ? প্রায় তাহা হয়না। তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষা অতীব প্রয়োজন।

(৫) এই শিক্ষার একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ হইবে, গৃহ-পরিচর্য্যা ও গৃহস্থালীর যাবতীয় বিষয়ে প্রত্যেক নারীকে সম্যক শিক্ষিতা করা। নারীই হইবেন গৃহের কর্ত্রী ও দেবী। যথা : ১। পরিধেয় সামগ্রী, তাহাদের প্রস্তুত ও সেলাই-মেরামত, ধোলাই দাগ, বিভিন্ন বস্ত্রে বিভিন্ন রং ধরানো, তাহাদের পরিষ্কার করা, ইস্ত্রি করা, ইত্যাদি ; ২। আহার্য্য খাদ্যের দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়া, বৈজ্ঞানিক মতে, অল্প ব্যয়ে, তাহাদের গুণ নষ্ট না করিয়া, সুপাচ্য সুস্বাদু আহার প্রস্তুত প্রণালী ; য়ুরোপ আমেরিকায় বহু স্কুল আছে যেখানে কেবল ইহাই শিক্ষা দেওয়া হয়, জাপানেও ; ৩। বাজার : গৃহস্থালীর যাবতীয় দ্রব্যাদি কোথায় ঠিক মত পাওয়া যায় তাহার জ্ঞান ও ক্রয় নৈপুণ্য ; ৪। গৃহস্থালী দ্রব্যের পরিষ্কার, সুরক্ষা ও মেরামতি ; ৫। শিশু পরিচর্য্যা, তাহাদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও মনস্তত্ত্ব জ্ঞান ; ৬। ফুল ও শাকসব্জী ফলের বাগান করার পটুতা ; ৭। গৃহকে সুসজ্জিত—কুসজ্জিত নয়—ও পরিষ্কার রাখা ; ৮। ডাকঘর ও পথ-ঘাটে যাইবার নিয়মাবলী প্রভৃতি বহু সাধারণ জ্ঞান ; ৯। মিতব্যয়িতা অথচ কৃপণতা বা নীচতা নহে ; ১০। সমাজে নারীর স্থান ও অধিকার সম্বন্ধে মোটামুটি আইন জ্ঞান ইত্যাদি। বহু কার্য্যের ও মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যেও, গৃহকে আনন্দোজ্জ্বল রাখিবার জন্য, চিত্তবিনোদক মনোমুগ্ধকর খেলাধূলা গল্পবলার শিক্ষা, যাহা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মনকে সর্ব্বদা ম্লান, বিমর্ষ বিষণ্ণ রাখিবে না।

(৬) এই শিক্ষা আমাদের দেশের অতীত গৌরব সম্পদের কথা ভুলিতে দিবে না ; কেবলমাত্র পশ্চিমকেও মাথায় তুলিয়া তাহারই অনুকরণ করিতে প্রবুদ্ধ করিবে না। ইহা দেশের শ্রেষ্ঠতম সংস্কৃতিকে, বিদেশ যাহা কিছু প্রগতিমূলক জ্ঞান ও শিক্ষা, তাহার সহিত সমন্বিত করিবে। দেশের বিভিন্ন প্রদেশের ও বিদেশ হইতে সমাহৃত জ্ঞানের সামঞ্জস্য আবশ্যক। বিভিন্ন প্রকৃতির খাদ্যের ন্যায়। বৃক্ষ যেমন শিকড় দ্বারা নিজ ভূমিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপর শুধু দাঁড়ায় না, সেই মাটী হইতে রস আকর্ষণ করে তাহার পুষ্টির জন্য ; আবার শুধু তাহাতেও গাছের সম্যক পুষ্টি হয় না, যদি-না সেই বৃক্ষ তাহার ডাল পাতা বিবর আকাশে বিস্তৃত করিয়া তাহা হইতে আলোক ও প্রাণ (বায়ু) সংগ্রহ করে।

(৭) এই নবশিক্ষা প্রত্যেক নারীকে নিজের দেশ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে শিক্ষিত করিয়া দেশব্রতী-কর্মী প্রস্তুত করিবে। অন্য যে কোনো সমাজ-কল্যাণমূলক কর্ম্মবিভাগের ন্যায়—যথা, ডাক্তারী, শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, ব্যবসা প্রভৃতি—[illegible] উপার্জ্জনমূলক হইবে, ইহার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৮) প্রত্যেক নারীর উপার্জ্জনমূলক কোনো-না-কোনো শিক্ষালাভ আবশ্যক। শ্রম ও কার্য্যের গৌরব ও মাহাত্ম্য আছে। বর্ত্তমান যুগে অন্যের প্রদত্ত উপার্জ্জন অপেক্ষা স্বোপার্জ্জিত অর্থের মূল্য অনেক বেশী বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে। সহচরী সহকর্ম্মিণী নারী কিম্বা অবিবাহিতা নারী সক্ষম হইলে কেন উপার্জ্জন করিবেন না ? ইহাতে কিছুমাত্র মান-মর্য্যাদার হানি তো নাই-ই, গৌরব আছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে পরিবারের সকলের উন্নতি। অসংখ্য পরিবারের দারিদ্র্যের ও সংগ্রামের কাহিনী হৃদয় বিদারক। সত্যের সম্যকরূপ দেখিতে হইলে সকল দিক হইতে দেখিতে হয়। অন্যান্য দেশের নারী উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া, এবং

উপার্জ্জন করিলেও, যদি সম্যকভাবে ও অতি নৈপুণ্যের সহিত গৃহস্থালীর সকল কাজ সুসম্পন্ন করিতে এবং স্বামী সন্তানদের সুখ-সুবিধা শিক্ষার দিকে দেখিতে সমর্থ হয়েন, আমার দেশের নারীরাও, সেইরূপ শিক্ষা লাভ করিলে, দুইদিক বজায় রাখিতে সমর্থ হইবেন না কেন? পুরুষকে তাহার আধিপত্য কিছু পরিমাণে ত্যাগ করিতেই হইবে। "ঘর জ্বালানে পর ভোলানো" সকল দেশেই আছে; আবার 'যে রাঁধে সে চুল বাঁধে' এমন নিপুণা নারীও সকল দেশেই আছে। কথা দুইটার আবার এ দেশেই উদ্ভব, এ দেশেই উহা চলিত। এ দেশে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা বহু নারীর, সংসারের বহু কাজের সহিত লিপ্ত থাকিয়াও সুনিপুণ গৃহচালনার কৃতিত্ব দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এই শক্তি আসে সেইরূপ নব-আদর্শের শিক্ষা হইতে। কেবল শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী বা নার্সের কাজ ব্যতীত বহু উপার্জ্জনের পথ রহিয়াছে যেখানে নারী নিজ আত্মমর্য্যাদা ও চরিত্র গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, অল্পাধিক স্বাধীন-ভাবে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারেন। আমাদের আদর্শ নব-শিক্ষা সেই সব পথ খুলিয়া দিবে।

(২) আর এক শিক্ষা আছে; যাহা কেবল কোন রকমে পরীক্ষার "[illegible]" খেলা রাখিবার জন্য নহে, কেবল মোটা ভাত কাপড়ের জন্যও নহে। নারীর মন, বুদ্ধি ও বৃত্তিকে উন্নত, গভীর ও উদার এবং সরল ও সুশ্রী করিবার জন্য বিবিধ বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞানে একান্ত আবশ্যক যথা—বিজ্ঞান ও দর্শন; সাহিত্য ও ইতিহাস; চারুচিত্র শিল্পকলা; বিবিধ সঙ্গীত; জীব বিদ্যা; দেশ-বিদেশের কথা; সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি। এই সকল জ্ঞান শিক্ষাকে করিবে পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন।

নব আদর্শে নব-শিক্ষার এই দুটী শাখার কথা উল্লেখ করিলাম।

চলিত স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি

শিক্ষার এই যে এক আদর্শ, চলিত স্ত্রীশিক্ষার পদ্ধতিতে তাহার কতটুকু অংশই বা উপলব্ধ হইতেছে? পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট [illegible] যে শিক্ষা পদ্ধতি এ দেশে চলিয়া আসিতেছে তাহার সমালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সন্দেহ বা মতান্তর না থাকায়, আমাদের তরুণ যুবক ছেলেরা, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই ১৫ হইতে ২২ বৎসর পর্য্যন্ত—সাধারণতঃ, প্রকৃত শিক্ষালাভ অপেক্ষা পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাইবার জন্য, কয়েকটীমাত্র অনধিক পাঁচ বিষয় বাছিয়া লয়েন। তাহার অনাবশ্যক প্রায় বারোআনা অংশ 'বিদ্যে' "গাইড," "হেল্প" সাহায্যে কোনোও রকমে মাথায় গুঁজিয়া মুখস্থ করার পরীক্ষান্তে সেই বিদ্যেই সন্ধ্যাবেলায় তাহার অধিকাংশ একেবারে, স্বাভাবিক নিয়মে, বিস্মৃত হইয়া যান—কেননা জীবনধারার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ও যোগ অতি অল্প ও যে-ভাবে তাহা মনঃস্থ করিয়াছেন তাহাতে তাহা হজম হইতে পারে নাই। এই শিক্ষার মূল্য কতোটা—এক ডিগ্রীলাভ ব্যতীত? শুধু তাহাই নহে, পরীক্ষার কঠোর চাপে ও প্রতিযোগিতায়, সাধারণতঃ, তাহাদের যৌবনশ্রী ম্লান হইয়া দেহও কি রুগ্ন, শীর্ণ হইতেছে না? অথচ যে সকল বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞানলাভ একান্ত আবশ্যক সে-সকল বিষয়েই তাঁহারা একেবারে অজ্ঞ রহিয়া যাইতেছেন! অন্য দেশে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সহিত, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, শক্তিবিধি মুক্ত রাখিয়া, কর্ত্তব্যনিক হইতে-করতে শিখিতেছে, যাহা সৌন্দর্য্যকেও অবহেলা করিতেছে না। আমাদের ছাত্রীরা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন অতি দুঃখের সহিত—যে, তাঁহারা কিছুই তেমন শেখেন নাই!' কারণ কোনো রকমে এক ডিগ্রী লাভ; তাহার পরেই চাকরী! উহা বিলাতও না, সুপথও না, এক রকম অপথ; কেননা কোথায় বিবাহ, কোথায় সংসার ধর্ম্ম পালনের দিকে মন, কোথায় উন্নততর ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য আগ্রহ? বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত একজন যুবক, যেরূপ মনে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে বর্দ্ধিতা, শিক্ষিতা, সকল কার্য্যোপযোগী যেরূপ আদর্শ জীবনসঙ্গিনী আকাঙ্ক্ষা করেন, এই "ডিগ্রীর" শিক্ষা কি তাহা দেয়! ফলে, মোটা যৌতুক দিয়া, বরের দিক হইতে নারীর [illegible] যে অর্থের প্রয়োজন তাহার সংস্থান সম্ভব না হওয়ায়, অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে; তদুপরি, সামাজিক বাধা আছে, আর্থিক কারণও রহিয়াছে; পথ ও আদর্শের পরিবর্ত্তনও কিছু পরিমাণে আরও এক কারণ। যাহা হউক, "ডিগ্রীর" মোহ আজও দেশের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে; তবে ভরসা এই যে, একজন ডিগ্রীপ্রাপ্তা মহিলার সাধারণ ও গৃহস্থালী শিক্ষার দৌড় কতটুকু এবং দেহের যৌবন শ্রী কতটা ক্ষুণ্ণ, তাহা দেখিয়া সে মোহ অনেক পরিমাণে কাটিতেছে। সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন—এ পদ্ধতি [illegible] স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ বা উপযুক্ত পদ্ধতি নহে। ইহার আশু সংস্কার [illegible]

এখন কর্ত্তব্য [illegible]

এখন সকলেই বুঝিতেছি যে, বর্ত্তমান [illegible] স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি আদর্শ ও সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় পদ্ধতি [illegible] উল্লিখিত কারণ সমূহের জন্য একটী উপযুক্ত সময়োপযোগী অথচ দেশীয় উচ্চতম সংস্কৃতির আদর্শের সহিত সমন্বিত এক নব-শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন আবশ্যক। শুধু ইহা মুখে বলিলে চলিবে না; দেশহিতব্রত শিক্ষিত শিক্ষিতা পুরুষ ও মহিলা মিলিয়া ইহার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইবে। আমাদের এক মহাদুর্ভাগ্য যে, আমরা বুঝি, বলি, কিন্তু করি না। এই কথাটাই হইতেছে কর্ত্তব্য।

একটি আদর্শ ও কার্য্যকরী পরিকল্পনা

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী (Bengal Social Service League) ১৯১৫ সালে জানুয়ারী মাসে এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার বিবিধ ও বিস্তৃত কার্য্য তালিকার মধ্যে প্রধান একটী হচ্ছে—শিক্ষা। নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে শিক্ষার নানা আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, উল্লিখিত অভাব মোচনের জন্য সম্প্রতি একটী পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। দেশের ও বিদেশের, সরকারী ও বে-সরকারী, বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি, সংখ্যায় প্রায় একশত হইবেন—ইহা বিশদভাবে বিচার করিয়া, সর্ব্বতোভাবে ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি সংক্ষেপে এই,—আপাততঃ কলিকাতা সহরেই, একটি খেলিবার মাঠ (lawn) ও সব্জী বাগান সমন্বিত ময়দানের সন্নিকটেই, একটি চারিদিকে খোলা বাড়ীতে, এই নব আদর্শে মহিলা বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইবে। অন্যূন মোটামুটি ম্যাট্রিক শিক্ষাপ্রাপ্তা ১৫।১৬ বয়স্ক বালিকাদের—আই-এ, বি-এ, এম-এ পাশ মহিলারাও আসিতে পারেন, তাঁহাদের শিক্ষাকে পূর্ণতর করিবার জন্য—দুই বৎসর কাল মধ্যে উল্লিখিত সব আদর্শের নানাবিধ জ্ঞান, অধুনাতন সহজ সরল চিত্তাকর্ষক ও চিত্তগ্রাহী প্রণালীতে মুখে-মুখে, হাতে-কলমে, গল্পের ছলে শিখাইতে হইবে। সঙ্গে সহিত দেহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যলাভের দিকে এবং উপযুক্ত উপার্জ্জন-মূলক শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে; দুই বৎসরকাল শিক্ষালাভের, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া, ইঁহারা, ডিগ্রীর বদলে ডিপ্লোমা পাইবেন। তাহা গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও আদৃত হইবে। আপাততঃ অন্ততঃ পঁচিশ মহিলা লইয়া আগামী বৎসরে মার্চ্চ মাসে ইহা সম্পূর্ণভাবে খোলা হইবে, আশা করা যাইতেছে। ইহার ব্যয় কলিকাতার কোনো ভালো হোষ্টেলে মেয়েকে রাখিয়া কলেজে পড়াইতে যে-খরচ তাহা অপেক্ষা বেশী হইবে না এবং সঙ্গতিহীন অথচ উপযুক্ত মেয়েদের বৃত্তি দিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হইবে। শিক্ষা, আনন্দ ও চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। এইরূপ একটি সকল দিক দিয়া উপযুক্ত গৃহের মালিক গৃহটি ঐ কলেজের ব্যবহারের জন্য কমিটীর হাতে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; তবে আপাততঃ উহা সম্পূর্ণ খালি না পাওয়াতে, এই ছয় মাস, সংক্ষিপ্তভাবে, এই পরিকল্পনাকেই রূপ দিবার জন্য, উহা আবাসিক না করিয়া, অনাবাসিক প্রাতঃকালীন কলেজে কার্য্যকরী করিতে হইবে। আপাততঃ অভিপ্রায় এই [illegible] এই ছয় মাস কালে প্রায় ৬০০ শত "পিরিয়ড," উল্লিখিত প্রায় সকল বিষয়েই অবহিতভাবে শিক্ষা দিয়া, এই ছয় মাস কোর্সের এক বিশেষ ডিপ্লোমা দেওয়া যাইবে। এই ডিপ্লোমার দ্বারা সকল দিকে কাজের ও উপার্জ্জনের সুবিধা হইবে।

জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট ঠিকানায় এই প্রবন্ধ লেখকের নিকট অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ ও সাহায্য দানে এই পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলুন।

মায়ার নববর্ষ

শ্রীপাঁচকড়ি চৌধুরী

...মাগো, ভিক্ষা দাও।

...ভিক্ষা হবে না বাছা।

...অভাগিনী আর সহ্য ক'রতে না পেরে কেঁদে ফেললো। সদর দরজার সামনে হাত পা এলিয়ে ব'সে প'ড়লো। তার কোলের ছেলেটা খাবার জন্য বায়না ধ'রেছে। না খেয়ে সমস্ত শরীরটা শুকিয়ে গিয়েছে। তার বুকে এক ফোঁটাও দুধ নেই, যা দিয়ে এই কচি বাছাটাকে এক দণ্ড ভুলিয়ে রাখবে।

অদৃষ্টের ওপর গালি দিয়ে ব'লে উঠলো...মাগো, সবাই যদি ঐ এক কথা ব'লবে আমি যাই কোথায়।

'ভিক্ষা হবে না'—বলার পর বাড়ীর সদর দরজায় ব'সে কাঁদতে দেখে মায়া সংসারের কাজ ফেলে দরজায় এসে দাঁড়ালে।

অভাগিনী না খেতে পেয়ে ধুঁকছে। চৈত্র মাসের কাঠ ফাটা দুপুরে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়েছে। তার ওপর শুকনো বুকটায় দেড় বছরের ছেলেটা চ'ষে বেড়াচ্ছে।

মায়া দেখেই বুঝতে পারলো...মেয়েটার বয়স কাঁচা। সম্ভ্রম রক্ষা করবারও উপায় নেই। পরণে একখানা শতছিন্ন কাপড়ের টুকরা। গা ঢাকার মত কাপড় সঙ্কুলান হয় নি! কোন রকমে বুকের একটা দিকে আঁচলটা ছড়িয়ে দিয়েছে।

এ দৃশ্য দেখে মায়া স্থির থাকতে পারলো না। তার মনে হ'ল সেও যেন এ লাঞ্ছনার ভাগিনী। মায়া তাকে বাড়ীর মধ্যে এসে ব'সতে ব'ললে।

অভাগিনী এতক্ষণে একটু আরাম পেয়েছে, এই অবসরে ছেলেটাকে বুকে নিয়ে কোন রকমে উঠানে এসে ব'সলো। মায়া সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে তাড়াতাড়ি রান্না ঘরের দিকে ছুটে গেল। উনানে হাঁড়ী চড়িয়ে এসেছে। ভাতের হাঁড়িতে জল দিতে গিয়ে ভাবলে...ঘরে চাল বাড়ন্ত। এই ভাতেই সব পেট কটা চালিয়ে নিতে হবে। কাজেই ঐ ভাত কটা ফেনে ভাতে ক'রলে, সকলেরই একটা বেলা যা হয় ক'রে চ'লে যাবে।

ভাতের হাঁড়ী নামাতে কতটুকু দেরী আছে বুঝে মায়া এক ঘটি জল আর একটু গুড় অতিথিকে দিল।

অভাগিনী চোখে মুখে জল দিয়ে গুড়টুকু গালে দিয়ে এক নিঃশ্বাসে জলটুকু ঢকঢক ক'রে গিলে নিয়ে ছেলেটাকে বুকের মধ্যে নিলে।

মায়া ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে নিজের ছেলের দুধ জল দিয়ে পাতলা ক'রে নিয়ে তা থেকে দু হাত দুধ শটীর সঙ্গে মিশিয়ে তার ছেলেকে খাওয়াতে দিলে।

অভাগিনীর মুখে কথা নেই। নীরবে অশ্রুধারা দর দর ক'রে তার শুষ্ক বুক ব'য়ে বন্যার মত ছুটেছে। ছেলেটাকে কোলে শুইয়ে দুধ খাওয়াতে সুরু ক'রলো।

শিশুদের দুধ খাওয়ানর সময় মায়ের সঙ্গে ছেলের একটা বড় রকমের লড়াই হয়। এ লড়ায়ে গোলা-গুলি বা প্রচার কার্য্যের কিছুই দরকার হয় না। মা, তার স্নেহ-বেষ্টনীতে দুষ্টু ছেলের ছোট্ট সুকোমল কচি পা দুটো চেপে ধ'রে খুব সাবধানে দুধের ঝিনুক মুখে ধরেন। দুধটুকু শিশুর পেটে না গিয়ে পাছে প'ড়ে যায় সেদিকেও যেমন নজর রাখেন, আবার 'বিষম' না খায় সেদিকেও তেমনি নজর রাখেন। আর শিশু চীৎকার ক'রে কাঁদতে সুরু ক'রে দেয়। এ লড়ায়ে কান্নাই তার একমাত্র অস্ত্র।

এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটলো। অভাগিনীর ছেলের কান্না শুনে তার মিত্রপক্ষ মায়ার ছেলেরও ঘুম ভেঙে গেল। বিপক্ষের কান্না শুনে নিজের কান্না ভুলে গিয়ে ঘটনার তদন্ত ক'রতে ঘরের দরজায় হামাগুড়ি দিয়ে সে এসে উঁকি মারল।

ইতিমধ্যে 'দুধ খাওয়া' পর্ব্ব শেষ হ'ল। ছেলেটা তার মার শুকনো বুকটা একটু চুষে বিরক্ত হ'য়ে মেঝের ওপর ব'সলো। মায়ার ছেলে এইবার চৌকাঠ ডিঙিয়ে এই ছেলেটার কাছে এসে মুখোমুখি হয়ে বসলো। দুজনেই দুজনের গায়ে মুখে হাত দিয়ে নির্ব্বাক অভিনয় সুরু করলে।

এই অবসরে মায়া অভাগিনীকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার বাড়ী কোথায়?

...নতুন গাঁয়ে।

...তোমার স্বামী কি করেন?

...এতদিন চাষ-বাস ক'রে পেট চা'লতো। এবার ফসল জন্মায় নি। তাই বীজ ধান পর্য্যন্ত খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে। কারও কাছে খোরাকী ধান কর্জ্জ মিলছে না। না খেয়ে আর কষ্ট সহ্য ক'রতে পারছি না। পুরুষ মানুষ নিষ্ঠুর হ'তে পারে। ঠিক ক'রেছে না খেয়ে মরবে সেও ভাল, ভিক্ষে ক'রতে পারবে না।

...তোমার স্বামী কি বাড়ী আছেন?

...হ্যা, না খেয়ে শ'য়েছে। আমি আর চুপ করে না থাকতে পেরে ছুটে বেরিয়েছি। তাও একখানা কাপড় নেই যা প'রে পথে বার হই। বাড়ী ফিরে কখন যে দুটো ভাত রেঁধে খাওয়াব তার ঠিক নেই।

...তুমি এক মুঠো ভাত খেয়ে যাও।...এ কথা ব'লতে মায়ারও মনে ধাক্কা দিলে তবুও সে ব'ললে।

...আমি খাব!...অভাগিনী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

মায়ার চোখে জল ভরে উঠলো।

...রোদে ঘুরে বড় কষ্ট হ'য়েছিল তাই ঐ গুড় জলটুকু খেয়েছি। নিজে বাঁচবার জন্যে নয়। এই চারক্রোশ পথ ছুটে গিয়ে তাকে যদি এক মুঠো ভাত রেঁধে খাইয়ে বাঁচাতে পারি! তারই জন্যে না খেয়ে শয্যাশায়ী হ'য়ে প'ড়েছে!

...তোমাদের গাঁয়ের সকলেরই কি ঐ অবস্থা?

...সবারই। সব না খেয়ে মরছে। কারও ঘরে বীজ ধান নেই। গরুর বিচালী নেই। খোরাকী ধান নেই।

মায়ার মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হ'য়ে গেল। কি সর্ব্বনাশ!

গ্রামে গ্রামে কৃষকরা যদি না খেয়ে মরে। বীজ ধানের অভাবে যদি চাষ আবাদ না হয়। গরু না খেতে পেয়ে যদি মরে

যায়, তবে চাল হবে কি দিয়ে ?···দেশ জোড়া হাহাকার যে আরও বাড়বে।

যারা নিজে ম'রবে সে কথা ভাবছে না। যারা দুনিয়ার খোরাক জোগায় যারা সবার মুখে অন্ন তুলে দেয়, যারা মাটির বুক চিরে ফসল তৈরী ক'রে মানুষজাতটাকে বাঁচায় তারাই যখন না খেয়ে মরতে ব'সেছে তখন আর বাঁচবার আশা কার কতটুকু ?— সোনা, রূপা, টাকা চিবিয়ে পেট ভ'রবে না। ঘুঁটে কামড়ে ত' আর খিদে মিটবে না।

চোখে জল গড়িয়ে আসছে দেখে, মায়া, আঁচল দিয়ে মুছে উদাসভাবে বলে···'ভিক্ষের চালে একটা জাত বাঁচতে পারে না।

মায়া, মনটাকে শক্ত ক'রে নিয়ে বলে···'আমার ত' আর কিছু নেই। তোমাদের এই ফেনে ভাতে কটা দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি খাও। তোমার স্বামীকে খাওয়াও গে। নিজে খেয়ো।

মায়া ভাবে···তার স্বামীর জন্য সে তো এটুকুও ক'রতে পারবে না। তবুও ত' ভবিষ্যতের নববর্ষ এমনি করেই ঘনিয়ে আসছে।

নদীতীরে প্রভাত

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ওরে বেদনার মৌন আকাশ, ওরে রবিহারা প্রাতঃকাল,
তোর তলে আজ ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্ষে হেরি যে মায়াজাল।
কোথাও হেরি কাজল মায়া, কি এক আবেশ জড়ায়ে ধরে ;
একি রে নিশা ? একি মহাস্বপ্ন ? আলস বিলাসে মগ্ন করে।
সম্মুখে হেরি পড়াই তটিনী, ঘোলা জল তার দুলিয়া ওঠে ;
ঢেউ-শিশুগুলি ছোট হাত তুলি' মৃদু হেসে মা'র অঙ্কে লোটে।
জলের ওপারে নিবিড় সবুজ ক্ষেতের ধানের বিছানা রাজে ;
তারে দোলাইয়া অতি ধীর বায়ু দোলা দিয়ে যায় মাঝে ও মাঝে।
মাঠের ওপারে ও কি দেখা যায় ?— যেন ক্ষীণ এক মসীর রেখা !
হাতি 'পরে তুলে লাল-বড় পাল চলিয়াছে যেন নৌকা একা !
জলরেখা নয়, বিপুল বারতা ও যে রে পদ্মা দুলিয়া চলে !
বাঙ্‌লা মায়ের দুষ্টা তনয় যেন রে শিশু কিলকলে।
কেবল চপল, কেবল অধীর, ভেঙে দেওয়া-তার নিত্য খেলা ;
পাগ্‌লা তোমার দিয়া ও ছেড়ে, আসিয়া হাসিতে করে না হেলা।
দূরে যেন আছে শান্ত সুধীরা ; কাছে গেলে পায় মৃত্যুদশা :
কাছে গেলে পায় রাক্ষসী যেন খাবি খেতে আসে জীবন-হরা।
দুইটি তটের বেড়ায় যেন সে রয়েছে আটক—এমনি দেখি,
এমনি রীতি কি সত্য তাহার ? কীর্তি তাহার এমনি দেখি !
কীর্তি নাশিতে কীর্তি তাহার, দুষ্ট মানবে বলবে বড় ;
সাক্ষ্য তাহার জীবন-তারণ, কৃষ্ণ-প্রকৃতি-প্রতীক বড়।

• • • •

দু'টি আঁখি মোর পাখী হ'য়ে যায়, তার সাথে যায় মনের পাখী ;
তিন পাখী নাচে পড়াইয়ের ঢেউ-এ ঢেউর দোলনে তালটি রাখি'।
তারপরে যায় নবীন সবুজ অপার নিবিড় চরের মাঝে ;
ঘাসের অতলে তিন পাখী ডোবে ডুবে উঠে যায় পদ্মা পানে।
পদ্মার রেখা যেন আল্পনা জাগিয়া বইছে বাঁকেতে বাঁকা :—
পদ্মাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তিন পাখী ধরিল ছলে যে নৌকা একা ;
একা নৌকাতে লাল পাল তোলে, সে পালে লাগিয়া উড়িয়া চলে ;
কোথা যাও ওরে কোথা যায় এরা দেহ মোর ফেলে যে উচ্ছলে !
অপার সবুজ, অবাধ উদার মাঠে আর দুই জলের স্রোতে
হারায়ে যাব কি আঁখি মন লয়ে, শূন্যে যাব কি এ গৃহ হ'তে ?
ঐ চলে যেন শাদা পদ্মায় একখানি ডিঙি, একটি মাঝি
দুলে দুলে যায়, ওপারে যায়, ঢেকে দেয় তারে কাননরাজি।
দূর পদ্মার শাদা রেখাখানি আবার দেখিয়ে, আবার দেখি—
শ্যামলা ধরার কোমর জড়ায়ে রূপার মেখলা শোভিছে এ কি !
শুধু আছে ধরা সবুজ-বিতানে উদার আকাশে মাথাটি রাখি' ;
মৃদু নিঃশ্বাসে কেঁপে ওঠে বুক—ঘাসে ও পাতায় কাঁপিছে নাকি ?
এ কাঁপন আর আমার পরাণে বায়ুর কাঁপন লেগেছে মনে ;
এ যে সুষমতা নিদ্রা-বিনতা ধরণীর প্রাণ—চিত্তে বহে।
আজি মোর চোখে পড়াই, পদ্মা, ধরণী, আকাশ, ধান ও পাতা
সকলে মিলিয়া রচেছে বিরাট মহা অপরূপ বিধাতা।
ধরণী তাহার কোমল আসন, নদী দু'টি বাহু, আকাশ শ্মশ্রু
বৃক্ষ-গুল্ম বেশ তার কেশ, জড়িত হেরে সে সৌম্য গাত্র।
পড়াইয়ের তীরে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে আজি যে হেরিনু স্নিগ্ধছবি,
তাঁরি মহিমায় ভরি' গেল বুক, প্রণাম জানাল তাহারে কবি।

সুখ

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ

প্রেমের অনল অতি নিরমল
যাহাতে করিল ছাই,
বাসনা ত্যজিয়া শান্তি লভিয়া
চির-সুখে তার ঠাঁই।

বাংলার চাষী ও ধর্ম্মবুদ্ধি

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

ভগবদ্‌ বিশ্বাসীরা শান্ত, সংযত ও সুখী। তাই মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে ভগবদ্‌বিশ্বাসীকে কেন্দ্র ক'রে। অবিশ্বাসীর অস্থিরতার অবধি নেই। তার অশান্ত মন ও অসংযত আচরণ বিরোধের পর বিরোধ সৃষ্টি করে, দশের ও দেশের অশান্তির কারণ হ'য়ে ওঠে, তাই তারা সভ্যতার শত্রু।

অবিশ্বাসীদের সংখ্যা হ্রাস করবার চেষ্টা 'ধর্ম্মাবতারগণ' চিরদিনই ক'রে আসছেন, কিন্তু সফলকাম হতে পারছেন না। জগতে যতগুলি ধর্ম্মমতের 'পতাকা উত্তোলন' হয়েছে, তার কোনো না কোনো পতাকাতলে সবাই এসে যোগদান করেছে সত্যি কিন্তু তারা সবাই যে বিশ্বাসী একথাটা সত্যি নয়। ভগবদ্‌বিশ্বাসের মহীরুহটিকে ডালপালায় যতটা জমকালো দেখা যায়, ততটা আগ্রহ নিয়ে পৃথিবীর মাটীকে আঁকড়ে ধরতে পারে না, তার শিকড়গুলি।

অবিশ্বাসীরা চিরদিনই ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে। বিভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসের গণ্ডীতে আত্মগোপন ক'রে আর তলে তলে অবিশ্বাসের ছুরি শানিয়ে। সভ্যতার মুখোস খুলে কখনো তারা দল বাঁধ্‌তে পারেনি। হঠাৎ সে চেষ্টা একটু হয়ে উঠ্‌লো রাশিয়াতে—জারের অত্যাচারের অবসানে। মৃত্যুভয় আছে ব'লেই ভগবান আছেন। 'মরীয়া'দের পক্ষে ভগবানের অস্তিত্ব বিষম অনাবশ্যক।

কথাটা খুব নূতন নয়। পূর্ব্বেও কেউ কেউ এ মত প্রকাশ করেছেন কিন্তু প্রচার করতে সাহসী হননি। কখনো কখনো প্রচারের চেষ্টা হলেও, সে চেষ্টা দানা বাঁধেনি। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সোভিয়েটের দুঃসাহসিকতা তা'তে মোটেই ছিল না। নির্ব্বাণের আকাঙ্খা শুধু বস্তু বিজ্ঞানের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। জীবন মৃত্যুর রহস্য আর বিধিনিষেধের গণ্ডী বৌদ্ধধর্ম্মকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে রেখেছিল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া ব'লে বসলো—বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্কের মধ্যে যতটুকু পাচ্ছি, তার বাইরের কোনো-কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই আমাদের।

ভয়ানক কথা। বিজ্ঞান বুদ্ধি মানুষকে যতটুকু যা দিয়েছে, তার মূল্য খুবই সামান্য। জীবনের উদ্দেশ্য আর জন্ম-মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনো শিশু। সুতরাং শিশু রাশিয়ার এই ঔদ্ধত্য বা বাস্তবিকতার পরিচয় প্রাচীন জগতের বিস্ময়ের কারণ হ'য়ে উঠ্‌লো। সভ্য-জগতের ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছে দর্শনের মাথায় মণি নিয়ে। শুধু তার বিবর্ত্তের চর্চ্চা কখনই কল্যাণকর হতে পারে না। রাশিয়া হয়ে উঠ্‌লো সভ্য জগতের আতঙ্ক।

নিছক বস্তুতান্ত্রিকতাকে ভিত্তি করেই রাশিয়াতে সুরু হলো চাষী-আন্দোলন (Peasant movement)। অন্ধকার রাশিয়ার বুকে এসে পড়লো একটা নূতন আলো, বুভুক্ষুর চোখের সাম্‌নে দুলে উঠ্‌লো অফুরন্ত খাদ্য শস্যের ঢেউ। চার্চ্চের লোহালক্কর ভেঙে গড়া হ'লো কোদাল আর কুড়ুল। ক্রুশকাঠ ভেঙে বেড়া দেওয়া হলো শস্যক্ষেত্রের। খৃষ্টান জগতের ক্রোধের সীমা রইল না।

রাশিয়ার বিখ্যাত চাষী-আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ছিল, চাষীদের ভগবদ্‌মুখী মনটাকে চার্চ্চের বাঁধন থেকে মুক্ত ক'রে শস্যক্ষেত্রে এনে বসান করা, বা প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত করা। ঠিক এমনি একটা উল্‌টো আন্দোলন সুরু হয়েছিল বাঙ্‌লাদেশে চৈতন্যদেবের আমলে। হরিনামে মাতোয়ারা চাষীরা কাস্তে-কোদাল ভেঙে খোল আর করতাল তৈরী করেছিল। সেদিন হরিধ্বনির উচ্চনিনাদে বাংলার আকাশ বাতাস কেঁপে উঠেছিল। ইহাও ঐতিহাসিক সত্য।

রাশিয়ার আন্দোলন ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি ভেঙে চাষীকে টেনে নামিয়েছিল, চাষ-আবাদের ক্ষেতে। আর বাংলার আন্দোলন চাষীর কর্ম্মশক্তিকে খর্ব্ব ক'রে তাকে তুলে দিয়েছিল ধর্ম্মোন্মত্ততার উচ্চ বেদীতে। আপামর সাধারণ বিশ্বাস করেছিল—"পাপীতাপী উদ্ধারিতে নাম এসেছে বাজারে।" আর, "কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" আজিও লক্ষ লক্ষ বাঙ্‌লার চাষী, একটা ভিক্ষুকের জাতি গঠন ক'রে বসে আছে। আজিও তাদের নধর দেহ পুষ্ট হচ্ছে, শ্রমজীবীদের নিত্যদের মুষ্টি-ভিক্ষায়। জমিজমার আশকুৎ বা চাষ-আবাদের ধার তারা কখনই ধারে না। অথচ এই ৮/দশ টাকা মণ চাউলের বাজারে খায় দায় বেশ।

এ কথাটা খুব সত্যি যে চৈতন্যদেব না এলে বাংলার হিন্দু চাষীরা এতদিন মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করতো। বাঙ্‌লার পণ্ডিত সমাজ তখন ছিলেন শুধু স্বার্থ নিয়ে। চাষীরা ছিল তাদের অত্যন্ত অবজ্ঞার পাত্র—'চাষা' কথাটাই ছিল একটা গালাগালি। অসাধারণ-পণ্ডিত চৈতন্যদেবের 'প্রেমধর্ম্ম' মুসলমান মোল্লাবাদের আক্রমণ থেকে শুধু হিন্দুসমাজকে রক্ষা করেনি—তার উন্মাদনা—মুসলমান-সমাজেও সংক্রমিত হয়েছিল। বাঙ্‌লার মুসলমান চাষীরাও, হিন্দুচাষীদের সঙ্গে সমতা রক্ষা ক'রে প্রেমধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল—এখনো তাদের মুখে 'কানু-কথা' গানের ভাষায় শুন্‌তে পাওয়া যায়। হিন্দুর বন্যার মাথায় মস্ত এককূল বাঁধা হল বটে, কিন্তু ভাঙন্‌ লাগলো অন্যকূলে।

রাশিয়া যে এখনো জার্ম্মাণীর মত প্রবল শত্রুর সঙ্গে লড়ছে, তার মূলে রাশিয়ার চাষীশক্তি। পেটে দানা থাক্‌লে মানুষ মার খেলেও মরে না। বার বার পায়ের ধূলো ঝেড়ে বেঁচে ওঠে। এ সত্যটা রাশিয়া প্রমাণ করছে। চার্চ্চের সত্তা অবনমিত ক'রে, যীশুখৃষ্টকে বিদায় দিয়েও, রাশিয়া আজ হঠাৎ হ'য়ে উঠ্‌লো খৃষ্ট-জগতের অকৃত্রিম বন্ধু। চার্চ্চিল-রুজভেল্টের সঙ্গে ষ্টালীনের মিতালী কি জগতের নবম আশ্চর্য্য নয়?

অন্যদিকে পূর্ব্বগোলার্দ্ধের যুদ্ধ আরম্ভ হ'তে না হতেই বাংলার খাদ্য-সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেউ বলেন, এটা Inflation of currency অর্থাৎ টাকার মূল্যহ্রাস। কেউ বলেন, এটা যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকার বাহাদুরের অপরিমাণ খাদ্য খরিদের জন্য। যেটাই সত্যি হোক্‌—চাষী যদি তার উৎপন্ন ফসলের মোটা খরিদদার পায়—তাতে কি তার সম্পদ বৃদ্ধির সূচনা করে না? Inflation of currency একটা জটিল রাজনৈতিক ব্যাপার। রাজা যতদিন রাজা থাকেন, তা'তে প্রজার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিছুদিন না সরকার বাহাদুর বাঙ্‌লায় খান, বাঙ্‌লা কি তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য উৎপন্ন ক'রে, যুদ্ধের চাহিদা মিটাতে পারে না? যদি পারে, তাহলেই তো হবে বাঙ্‌লার চাষের উন্নতি, চাষীর উন্নতি—খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির মূলে যে রয়েছে, সেই ইঙ্গিত। রাজা প্রজাকে শোষণ করেন সেইদিন, যেদিন রাজ্যে শান্তি থাকে। রাজায় রাজায় যখন যুদ্ধ বাধে, তখন টেবিল উল্টে যায়, প্রজাই রাজাকে শোষণ করে সুদে-আসলে।

বাঙ্‌লার চাষী-প্রজারা ভীষণ দুর্দ্দিনের সম্মুখীন হচ্ছে, কারণ বাঙ্‌লা রাশিয়া নয়। বাঙ্‌লার চাষীর কর্ম্মবিমুখতার মূলে বহু কারণ আছে, তার মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি যে একটি একথা নিঃসংকোচে বলা যায়। কৃষিক্ষেত্রে জল পাচ্ছে না, হিন্দু চাষীরা চেয়ে আছে আকাশের দিকে, 'কুলো নাবিয়ে' বরুণদেবের আরাধনা করছে। মুসলমান চাষীরা দরগায় 'সিন্নি' মানত করছে। অথচ মাঠের মাটির দু'হাত নীচেই জল রয়েছে একটু খুঁড়লেই পাওয়া যায়। চোখে দেখে এদেশের আউশধান্য পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে, চাষী-মেয়ে পুরুষ কলস কলস জল ঢাল্‌ছে—কোনো এক বট-বৃক্ষের গোড়ায়—দেবতার উদ্দেশ্যে। দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলেই যেন সব দুর্দ্দৈব দূর হবে।

বস্তুতান্ত্রিক রাশিয়া আজ ভগবানকে অস্বীকার করে, তারা তো যতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ভগবানকে আঁকড়ে ধরেও বস্তুজগতে আজ বাংলার ক্ষতি সে তুলনায় বেশী ছাড়া কম নয়। ভগবানকে অস্বীকার করলেও ভগবান তাকে স্বীকার করেন, যে আত্মস্থ বা আত্মনির্ভর। God helps those who help themselves—শুধু এই কথাটা বলবার জন্যেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

বাতাসী

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী

আজ সকালে আমার মেয়ে বাতাসী জামাইয়ের সঙ্গে চলে গেল। বাবাজীর কর্মস্থল পেশোয়ারে; কবে যে বাতাসী আবার আসবে কিছু ঠিক নেই। আগে ভাবতাম, মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই। কত চেষ্টাই করেছি সেজন্যে! অবশেষে বিয়ে ঠিক হল এবং বিয়ে হয়েও গেল। এ'কদিন বিয়ের হাঙ্গামে যে কবে কেটেছে, নিজের সাথে দুটো কথা বলবার সময়ও পাইনি। বাতাসী আমাকে ছুটী দিয়ে গেছে। এত সময় কাটাই কি করে! দুনিয়ায় আমার আর কেউ নেই।

বিয়ের সময়ে গহনা কাপড়ে সজ্জিতা বাতাসীর জলভরা [illegible]টো মনে পড়ছে, আর মনে পড়ছে অনেক দিন আগে এক [illegible] রাতে একটী ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা অনাথিনী বালিকার সজল চক্ষু। আমি আর বাতাসী ছাড়া আর কেউ সেকথা জানে না। জানতো কেবল আমার বুড়ো গাড়োয়ান রহিম। সে মরেছে আজ প্রায় চার বছর। কথাটা একেবারে চোখের ওপর ভাসছে।

প্রায় পনেরো বছর আগের কথা। তখন আমি ঘটা ক'রে ডাক্তারী করি। নিজের ওপর অধিকার ছিল কম; দিন নেই রাত নেই, ডাক এলেই ছুট্‌তে হোত। ছোট সহর, 'পাসকরা ডাক্তার' মেলে না; তাই আমি ছাড়া গতি ছিল না লোকের। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ভাবতাম, অসময়ের ডাকে সাড়া দেব না। আবার ভাবতাম, কেনই বা দেব না; পৃথিবীতে আমি তো একা; সবল দেহও পেয়েছি; জীবন মরণের টানাটানিতে মানুষ যখন অস্থির হয়ে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা ক'রে, তখন সামান্য ব্যক্তিগত সুখ স্বচ্ছন্দের জন্যে প্রত্যাখ্যান করলে ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হব; অবশ্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া যেত, কিন্তু আমার কাছে সেটা সবচেয়ে বড় কথা ছিল না।

এমনি একটা অসময়ের ডাকে সেদিন চলেছিলাম। দুর্যোগময় রাত; ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির তাণ্ডব চলেছে। আমি গাড়ীর একটা জানলার ফাঁক দিয়ে ওদের রকম দেখছিলাম, আর ঘোড়া ছুটে চলেছিল ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। যেতে হবে কিছু দূরে; তাই [illegible] অদ্ভুত অবসরে কত কথাই মনে হচ্ছিলো।

[illegible]র নিবিষ্ট রইলো না। বাইরে ঝোড়ো বাতাসের [illegible]ার মত একটা আওয়াজ বার বার তার অস্তিত্ব [illegible] প্রথমে ভাবলাম ও কিছু নয়, বাতাসেরই শব্দ। কিন্তু [illegible] করে শুনে মনে হল তা নয়। বেশ মনে হল, খুব করুণ কান্নার একটা একটানা সুর ক্রমাগত আমার গাড়ীর পেছনে পেছনে ছুটে আসছে। গাড়ীটা অত ছুটেও তাকে অতিক্রম করতে পারছে না। নিশ্চিন্ত থাকতে পারলাম না। চেঁচিয়ে গাড়ী রুখতে বললাম। গাড়োয়ান রহিম নেমে বল্লে, "কি হুজুর!"

তাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, "রহিম, একটা একটানা কান্নার সুর শুনেছ, আমাদের পেছনে ছুটে আসছে তখন থেকে?"

বিস্মিত হয়ে রহিম বল্লে, "না হুজুর, তবে ওটা ঝড়ের গর্জ্জানি হতে পারে।"

গাড়ী থাম্‌বার সঙ্গে সঙ্গে আর সে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। কেবল সেই ঝড় বৃষ্টির শব্দ। আবার গাড়ী ছুটলো।

দু'চার মিনিট বেশ কাটলো। তারপর আবার সেই কান্নার সুর, ঠিক আমার পেছনে। দস্তুর মতো রেগে উঠে আবার গাড়ী থামালাম। হতবুদ্ধি রহিম আবার নেমে এলো। তাকে বললাম, "আলোটা নামাও, গাড়ীর পেছনটা একবার দেখব।"

বৃষ্টিটা একটু কম; কিন্তু দুর্দান্ত বাতাস তখনও মাঠের বুকে গর্জ্জন করে ফিরছে। ওয়াটারপ্রুফ গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, আলোটা নিজে হাতে করে গাড়ীর পিছন দিকে গিয়ে চম্‌কে উঠলাম। সহিসের দাঁড়াবার জায়গায় ও কে বসে!

মুখের কাছে আলো ধরে দেখি, একটা ছোট্ট মেয়ে! কাঠির মত রোগা, জলে ভিজে কাঁপছে। কোমরে এক টুকরো কাপড় মাত্র। আলোয় তার চোখ দুটো চক্ চক করে উঠলো, দেখলাম সে চোখ জলভরা।

কঠিন গলায় বললাম, "কে তুই!" উত্তরে ভাঙ্গা এক অদ্ভুত গলায় শুধু বল্লে, "আমার বাবা!" বিশ্বের ভয় ও বেদনা সেই স্বরে। তারপর আবার সেই বুকফাটা কান্না। তখন নরম সুরে প্রশ্ন করলাম, "কী হয়েছে তোমার খুকী?" অজস্র ফোঁপানির মধ্যে দিয়ে সে যা বললে তা থেকে এই বুঝলাম যে, তার বাবা সেদিন সন্ধ্যায় মরে গেছে; তার আর কেউ নেই, তাই একলা ঘরে মরা বাবাকে নিয়ে থাক্‌তে ভয় হচ্ছিলো বলে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই রকম সময় আমার গাড়ী দেখে তার পেছনে উঠে পড়ে। তখন সহজে গাড়ী চলছিল আস্তে; পরে গাড়ী জোরে চলায় ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারে অপরিচিত নির্জ্জন মাঠের রাস্তায় নাম্‌তে পারে নি। জানলাম সে কাঁদছিল কেন, তবু প্রশ্ন করলাম, "কাঁদছিলে কেন?" গাড়ীর চাকার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে বল্লে, "আমার চাদর!" দেখি চাকার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে শতছিন্ন একটুকরো কাপড়। সেটিকে উদ্ধার করে বললাম, "এর জন্যে কাঁদছিলে?" ঘাড় নেড়ে সে বললে, "হ্যাঁ"।

দুর্ব্বলতা এবং পরাজয়ে মানুষের চিরন্তন স্বভাবগত লজ্জা এই একরত্তি মেয়েটাকেও ছাড়ে নি, দেখে বিস্মিত হলাম। তারপর থেকে সে আমার কাছেই রয়ে গেল। নাম দিলাম "বাতাসী"। কিন্তু সে রাত্রে কেন যে বাতাসী আমারই গাড়ীর পেছনে উঠে বসেছিল, তা কখনও ভেবে উঠতে পারিনি। সংসারে দুজনেই একা ছিলাম বলে কি ঈশ্বরের এই যোগসাধন?

উত্তর বাংলায় মহারাজগুপ্তের অধিকার

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি

মহাকবি কালিদাস প্রমুখ অনেক ঐতিহাসিক চরিত্রকে বাঙালী প্রতিপন্ন করিতে গিয়া বাঙালীরা এ পর্য্যন্ত অযথা বিফল মনোরথ হইয়াছেন; কারণ, সেই সকল সিদ্ধান্ত পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হয় নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী উত্তর বাংলাকে গুপ্তবংশের আদি বাসস্থান প্রমাণ করিতে অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। চৈত্রের ভারতবর্ষে আমি শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলীর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছি, যে বাংলায় গুপ্ত রাজগণের আদিবাসের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, বরং ইহার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ আছে। আষাঢ়ের ভারতবর্ষে তিনি আমার সমালোচনার উত্তর দিয়া এমন ভাব দেখাইয়াছেন যেন তাহার কথার উপর আমার কথা বলাই উচিত ছিল না। আমি ডক্টর গাঙ্গুলীকে তাঁহার সিদ্ধান্তের অসারতা বুঝাইতে পারি নাই, সেটা আমার অক্ষমতা হইতে পারে। কিন্তু আমার পক্ষে আনন্দের কথা এই, আমি উহার সমালোচনায় যে কথা বলিয়াছি সম্প্রতি প্রখ্যাত বাঙালী ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও অনুরূপ যুক্তি বলে ঐ সিদ্ধান্তটিকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্যঃপ্রকাশিত History of Bengal গ্রন্থে (পৃঃ ৭০) ডক্টর মজুমদার বলিয়াছেন, "Although therefore we may not accept Dr. D. C. Ganguly's view that the early home of the Imperial Guptas is to be located in Murshidabad, Bengal, and not in Magadha, it is a valid presumption that parts of Bengal were included in the territory ruled over by the founder of the Gupta family. This presumption however cannot be regarded as established historical fact unless further corroborative evidence is forthcoming. For it is solely based on a tradition recorded by a chinese pilgrim four centuries later and is opposed to the Puranic testimony which includes Prayaga, Saketa and Magadha, but not any region in Bengal, among the early dominions of the Guptas." তাৎপর্য্য—"গুপ্ত বংশের আদিবাসস্থান বাংলার মুর্শিদাবাদে অবস্থিত ছিল, আমরা ডক্টর গাঙ্গুলীর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি না। তবে এ কথা ঠিকই অনুমান করা যায়, যে বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চল গুপ্ত বংশ প্রতিষ্ঠাতার রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই অনুমানকে প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, চারিশত বৎসর পরবর্ত্তীকালের জনৈক চীনদেশীয় পরিব্রাজকের উল্লিখিত একটী কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া এই অনুমান করা হইয়াছে এবং পুরাণে ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। উহাতে কেবল প্রয়াগ, সাকেত ও মগধকে আদিম গুপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত বলা হইয়াছে, বাংলা দেশের কোন অঞ্চলই তন্মধ্যে গণনা করা হয় নাই।" ভারতবর্ষের পাঠকেরা অবগত আছেন, আমার সমালোচনাতেও আমি মূলতঃ ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলাম। এদেশের সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত সিদ্ধান্ত মাত্রকেই অভ্রান্ত মনে করেন। এই শ্রেণীর পাঠককে সতর্ক করিবার জন্যই আমার প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে এবং এ বিষয়ে আর বাদানুবাদ না করিলেও চলে। কারণ, প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকেরা আমার সমালোচনাকে অবজ্ঞা করিলেও, ডক্টর মজুমদারের মতামত নিতান্ত তুচ্ছ করিবেন বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ ডক্টর গাঙ্গুলীকে প্রত্যুত্তর দিতে হইলে আমার সমুদয় যুক্তি পুনরুক্ত করিতে হয়। কারণ, তিনি সুকৌশলে সেগুলির পাশ কাটাইয়া খানিকটা ভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। অব ভারতবর্ষের পাঠকগণের কাছে এই ভ্রান্তির স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে।

আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে তিনটী বক্তব্য বিষয় ছিল। আমি প্রথমে দেখাইয়াছি, যাহার উপর নির্ভর করিয়া গুপ্তগণের আদিবাস উত্তর বাংলায় নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই ইৎসিংএর বিবরণ হইতে উহা মোটেই প্রমাণিত হয় না। কারণ—প্রথমতঃ, ইৎসিংএর উল্লিখিত কিংবদন্তী অনুসারে মৃগস্থাপন স্তূপের নিকটে বিহারনির্ম্মাণকারী রাজার নাম শ্রীগুপ্ত; কিন্তু গুপ্তবংশ প্রতিষ্ঠাতার নাম গুপ্ত, শ্রীগুপ্ত নহে। ফ্লীট প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই দুই ব্যক্তিকে পৃথক্ মনে করেন; কিন্তু অ্যালান ইঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের অভিন্নত্ব সন্দেহাতীত নহে। দ্বিতীয়তঃ, ইৎসিংএর শ্রীগুপ্ত সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পাঁচশত বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন; কিন্তু গুপ্তবংশ প্রতিষ্ঠাতা গুপ্ত ইহার শতাধিক বৎসর পরে রাজত্ব করেন। সুতরাং ইৎসিংএর কাহিনী হইতে ঐ দুই ব্যক্তির অভিন্নত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় না। তৃতীয়তঃ, একজন বিদেশীয় পরিব্রাজক পাঁচ শত বৎসরেরও অধিককাল পরে যে কিংবদন্তী শুনিয়াছিলেন, অন্য প্রমাণের বিরোধিতা থাকিলে তাহা ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণীয় নহে। এই ক্ষীণ সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া অ্যালান সাহেব একটী অনুমান খাড়িলেন; আবার অ্যালানের সেই ক্ষীণভিত্তি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ডক্টর গাঙ্গুলী একটী নূতন অনুমান খাড়া করাইয়াছেন। এইরূপ অনুমানজীবী অনুমানকে প্রকৃত সত্য মনে করা অসঙ্গত। বিশেষতঃ, অন্য বিরুদ্ধপ্রমাণ থাকিলে ইহাকে অগ্রাহ্য করাই সমীচীন। চতুর্থতঃ, ইৎসিংএর শ্রীগুপ্ত এবং গুপ্তবংশ প্রতিষ্ঠাতা গুপ্তকে অভিন্ন স্বীকার করিলেও ডক্টর গাঙ্গুলীর সিদ্ধান্ত কিছুমাত্র প্রমাণিত হয় না। তাহাতে শুধু এইটুকু প্রমাণ হয়, যে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত মৃগস্থাপন স্তূপের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গুপ্তবংশের আদিরাজা একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী বা বাসস্থান ঐ স্তূপ বা বিহারের নিকটে অবস্থিত ছিল অথবা উহা হইতে খানিকটা দূরে বিহারপ্রদেশে বা অন্য কোথাও অবস্থিত ছিল, তাহা কিছুই বলা যায় না। এমন কি মৃগস্থাপন স্তূপ যে তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাও জোর করিয়া বলা চলে না। "নিকটবর্ত্তী স্থানে" কথাটিতে মৃগস্থাপন হইতে শ্রীগুপ্ত স্থাপিত বিহারের দূরত্ব নিশ্চিত জানা যায় না বলিয়াই রমেশবাবু লিখিয়াছেন, শ্রীগুপ্তের বিহারটী "Must have been situated either in Varendra or not far from its boundary on the bank of the Bhagirathi or the Padma. The statement of Itsing would thus justify us in holding that one Maharaja Sri Gupta was ruling in Varendra or near it." আরও একটা কথা আছে। ইৎসিং স্তূপটীর নাম লিখিয়াছেন মিলিকিয়সিকিয়পোনো। ইহার ভারতীয় আকার কেহ বলেন মৃগশিখাবন, কেহ বলেন মৃগস্থাপন। মৃগশিখাবন নাম সত্য হইলে বরেন্দ্রীর দাবীতে আর বিশেষ জোর থাকিবে না; কারণ উহা যে বরেন্দ্রে অবস্থিত ছিল, তাহার প্রমাণ নাই। আমার প্রথম প্রবন্ধে এই যুক্তিগুলির অধিকাংশই ছিল। যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে বোঝা যায়, যে আদিগুপ্ত রাজগণ বাংলা দেশের অধিবাসী ছিলেন, এ অনুমান নিতান্তই কাল্পনিক। কিন্তু উহার উত্তরে ডক্টর গাঙ্গুলী কি লিখিয়াছেন, তাহা শুনুন। ডাঃ গাঙ্গুলী—"ইৎসিংএর বিবরণ কেন গ্রহণ যোগ্য নয়, এই সম্বন্ধে ডক্টর সরকার কোন কারণ দেখাইতে সমর্থ হন নাই।" উত্তর—সত্যই কোন কারণ দেখান হইয়াছে কিনা, পাঠকেরা তাহার

বিচার করুন। তবে আমাদের বিরোধ ইৎসিঙের সহিত নহে, চীনা বিবরণের নিঃসংশয়ে ভাষ্যকারগণের সহিত। অ্যালান সাহেবের অনুমানের উপর ডক্টর গাঙ্গুলী আর একটী অনুমান খাড়া করাইলে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু তাহাকে অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রচার করাতেই আমাদের আপত্তি। ডাঃ গাঙ্গুলী—"সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে মহারাজ শ্রীগুপ্ত (গুপ্ত) ক্ষুদ্র জনপদের শাসক ছিলেন।" উত্তর—ক্ষুদ্র, অর্থাৎ তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের বিশাল সাম্রাজ্যের তুলনায় ক্ষুদ্র। এখন, যদি পূর্ব্ববিহারের কয়েকটী জেলা মহারাজ গুপ্তের রাজ্যভুক্ত থাকে অথবা উহার সহিত মালদহ জেলার পশ্চিমাংশ সংযুক্ত থাকে, তবে উহা অবশ্যই চন্দ্রগুপ্ত বা সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের তুলনায় নিরতিশয় ক্ষুদ্র ছিল। ডাঃ গাঙ্গুলী—"বরেন্দ্রী ভিন্ন অন্য কোন জনপদ শ্রীগুপ্তের (গুপ্তের) রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।" উত্তর—বরেন্দ্রী মহারাজগুপ্তের রাজ্যভুক্ত ছিল, ইহারও কোন প্রমাণ নাই। তবে ইৎসিঙের শ্রীগুপ্তকে মহারাজ গুপ্তের সহিত অভিন্ন ধরিলে স্বীকার করিতে হয়, যে বরেন্দ্রীর মৃগস্থাপন অঞ্চলের কাছাকাছি কোন স্থান তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। মৃগস্থাপন অঞ্চল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। মৃগস্থাপন রাজ্যভুক্ত থাকিলেও তাঁহার রাজধানী বা বাসস্থান অন্যত্র থাকিতে পারে। এখন, যদি কেবল জানা যাইত, আকবর ঢাকাতে একটী মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে কি প্রমাণ হইত যে তাঁহার রাজ্য ঢাকা জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল? ইৎসিঙ শ্রীগুপ্তের রাজ্যের ভূগোল দেখেন নাই; তিনি শুধু প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছেন, মৃগস্থাপন স্তূপের কাছাকাছি একস্থানে ঐ রাজা একটী বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে শ্রীগুপ্তের রাজ্যের বিস্তৃতি অনুমান করিতে যাওয়া নিতান্ত অযৌক্তিক। ডাঃ গাঙ্গুলী—"যেহেতু শ্রীগুপ্তের পৌত্রাদি মগধে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সুতরাং মগধ গুপ্তের শাসনাধীন ছিল এইরূপ যুক্তি অর্থহীন।" উত্তর—আমি কোথায় এই যুক্তি দেখাইয়াছি? আমি শুধু বলি, যে ইৎসিঙবর্ণিত শ্রীগুপ্তের রাজ্যের বিস্তৃতি জানা যায় না। সুতরাং এ সম্পর্কে ডক্টর গাঙ্গুলীর অনুমানের যে মূল্য, অপরের অনুমানের মূল্য তদপেক্ষা কম নহে। ডাঃ গাঙ্গুলী—"এই সব কারণে শ্রীগুপ্তের রাজ্য বরেন্দ্রীতে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছি।" উত্তর—মোটেই ভাল করেন নাই। কারণ, এখানে সীমাবদ্ধতার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই কথাগুলি আমি পূর্ব্বের প্রবন্ধটীতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় তিনি কিছুই তলাইয়া দেখেন নাই।

আমার প্রবন্ধের দ্বিতীয় বক্তব্যটি ছিল এই—ইৎসিঙের বিবরণ হইতে গুপ্তবংশ প্রতিষ্ঠাতা যে উত্তর বাংলার অধিবাসী ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয় না; বরং পুরাণ হইতে দেখা যায়, আদিম গুপ্ত রাজ্য মগধ, প্রয়াগ ও সাকেত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং বাংলা দেশের কোন অঞ্চল উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই পৌরাণিক উক্তির বিরুদ্ধে যদি অপর কোন প্রমাণ পাওয়া যাইত অথবা যদি ইহা স্বভাবতঃ অসম্ভব মনে হইত, তবে ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইৎসিঙের অসমর্থিত বিবরণের উপর নির্ভরশীল অ্যালানের অনুমান এবং তাহার উপর নির্ভরশীল ডক্টর গাঙ্গুলীর অনুমানের উপর দাঁড়াইয়া পৌরাণিক বিবরণটী উড়াইয়া দেওয়া কেবল গায়ের জোরেই সম্ভব। কারণ, ঐ সকল অনুমান প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য নহে। যাহা হউক, ডক্টর গাঙ্গুলী আগে মনে করিতেন যে ঐ বিবরণটী বিষ্ণু পুরাণে আছে। আমি বলিলাম, ঐ মর্ম্মের বিবরণ বায়ু, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে পাওয়া যায়। এবার তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে "বায়ুপুরাণের মতে গুপ্তেরা সাকেত, প্রয়াগ ও মগধ শাসন করিবে; বিষ্ণু পুরাণের মতে তাহারা শুধু প্রয়াগ ও মগধ শাসন করিবে; ভাগবত পুরাণের মতে তাহারা হরিদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিবে।" ["হরিদ্বার হইতে প্রয়াগ" ব্যতীত অন্য অর্থও সম্ভব। বিষ্ণু পুরাণোক্তির অনুরূপ অর্থ করা চলে।] পার্জ্জিটার নানাপুরাণের পাঠ আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, বায়ুপুরাণের পাঠই মৌলিক বিশুদ্ধ পাঠ। তর্কের খাতিরে সে সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিলেও আসল কথাটা চাপা পড়ে না। এই পুরাণকারেরা কেহ ভুলিয়াও আদিম গুপ্তরাজ্য মধ্যে বাংলা দেশের কোন অঞ্চলকে স্থান দেন নাই; আদিম গুপ্ত রাজ্যের ক্রমিক বিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তি ঐ বিবরণসমূহ রচনা করিয়াছিলেন এ কথাও অনুমান করা চলে। সেদিক হইতে দেখিলে, পৌরাণিক বর্ণনার পার্থক্যে কোনই বিরোধের সৃষ্টি হয় না। ঐ বিবরণগুলি যে আদিম গুপ্ত যুগেই রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ পরবর্ত্তী কালে গুপ্তরাজ্য ঐ বর্ণনার অতিরিক্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ডক্টর গাঙ্গুলী বায়ুপুরাণ হইতে অপর কয়েকটী শ্লোক তুলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে ঐ বর্ণনাটী এলাহাবাদ লিপিতে বর্ণিত আদিম গুপ্তগণের সমসাময়িক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন। এ ক্ষেত্রে পুরাণ ও শিলালিপির বর্ণনায় কতটা বিরোধ আছে বা নাই তাহা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, কোন পুরাণের সর্ব্বাংশ এক সময়ের বা এক ব্যক্তির রচনা বলা চলে না। অথবা, ধরা যাক, এলাহাবাদ লিপির প্রমাণ বলে ঐ বর্ণনাটী অনৈতিহাসিক প্রমাণিত হইল। কিন্তু আদিম গুপ্তরাজ্যের বিস্তৃতি মূলক বর্ণনাটী কোন্ প্রমাণের বলে অগ্রাহ্য করা যাইবে? কোন গ্রন্থের একটী উক্তি ভুল প্রমাণ হইলে কি বিনা প্রমাণেই বলিতে হইবে তাহার অন্য কোন উক্তিও ভুল?

আমার প্রবন্ধের শেষ কথাটি ছিল এলাহাবাদ লিপির প্রমাণ সম্পর্কে। ডক্টর গাঙ্গুলী বলেন, এই লিপিতে সমুদ্রগুপ্তের উত্তর বাংলা জয়ের উল্লেখ নাই, অথচ ঐ অঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া বোঝা যায়; সুতরাং উহা মহারাজ গুপ্তের সময় হইতেই গুপ্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি দেখাইয়াছি, এলাহাবাদ লিপিতে সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্ম্মা এবং আরও অনেক আর্য্যাবর্ত্ত রাজ্যের উৎপাটিত হইবার কথা আছে। এই নির্দ্দিষ্ট এবং উহ্য আর্য্যাবর্ত্ত রাজগণের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি উত্তর বাংলায় শাসক থাকিতে পারেন। তিনি এবার বলিতেছেন, "ডক্টর সরকার যদি তালিকাভুক্ত নরপতিবৃন্দের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি বরেন্দ্রীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাহা উল্লেখ করিতেন, তবে এ বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব হইত।" ইহা বিকৃত দৃষ্টির প্রমাণ মাত্র। ইচ্ছা করিলে তিনি সকল ব্যক্তি সম্পর্কেই আলোচনা করিতে পারিতেন। অবশ্য তিনি অনুধাবন করিতে পারেন নাই, যে "বলবর্ম্মাদ্যনেকার্য্যাবর্ত্তরাজ" অংশের "আদি" শব্দটীতে কতিপয় রাজার নাম উহ্য আছে; তাঁহাদের কেহ উত্তর বাংলার শাসক ছিলেন না, এরূপ অনুমান করা নিতান্তই হাস্যকর হইবে। তাহা ছাড়াও, যদি কেহ বলে রুদ্রদেব, মতিল, অচ্যুত বা নন্দী উত্তর বাংলার শাসক ছিলেন, অথবা যদি কল্পনা করে এই নাগদত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির পরবর্ত্তীকালের শাসক ব্রহ্মদত্ত, চিরাতদত্ত প্রভৃতির পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন, তবে ডক্টর গাঙ্গুলী কি বলিতে পারেন? এই রাজগণের অনেকের সম্পর্কেই পণ্ডিতেরা স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই; অনেক ক্ষেত্রে কেবল কয়েকটী অনুমানমাত্র করা হইয়াছে। এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করার মূল্য কি, তাহার আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিলাম।

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণ সম্পর্কে আমার আনুমানিক সিদ্ধান্তের সমালোচনা না করিয়া ডক্টর গাঙ্গুলী অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইয়া দিয়াছেন, আমার বক্তব্য তাঁহার নিতান্তই মূল্যহীন মনে হইয়াছে। তিনি যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়া আমাকে বর্ত্তমান প্রবন্ধটী দীর্ঘ করিতে বাধ্য করেন নাই, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইলাম।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

কাণ্ডপাড়ায় আসিয়া মণিমোহনের বোট যখন ভিড়িল, তখন দিক্‌দিগন্ত ঘিরিয়া কালো সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। যেখানে আসিয়া নৌকাটা প্রথম লাগিল সে জায়গা হইতে গ্রাম ঠিক কাছে নয়। সম্মুখে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া বিস্তীর্ণ পঙ্কতট—জোয়ার আসিলে ঘোলা জলে ডুবিয়া যায়। তারপর যখন কোনো সময় নদীর জলে বাতাসের দোলা লাগে তখন ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে পা-ওয়ালা ছোট ছোট মিহু মাছ কাদার উপরে লাফাইতে থাকে।

এখান হইতে সামনে চাহিলে দেখা যায়: দূরের রিক্ত মাঠের উপর দিয়া যেন অন্ধকারের একটা বেড়াজাল কে ঘিরিয়া দিয়াছে। সারি সারি নারিকেল সুপারির মাঝখান দিয়া এক একটা আলোর রশ্মি আলেয়ার মতো দেখা যাইতেছে। ওইটাই গ্রাম।

বর্ষার সময় অবশ্য নৌকা লইয়া বড় নদীতেই বসিয়া থাকিতে হয় না। বাঁ দিকে একটু দূরে যে ছোট খালটি শুকাইয়া একটা খাদের মতো পড়িয়া আছে, ওইটা তখন অজস্র জলে টই টম্বুর হইয়া যায়। শুধু ডিঙি নৌকা কেন—সরকারের এত বড় বোটখানাকেও তখন একেবারে গ্রামের বুক পর্যন্ত লইয়া যাওয়া চলে।

সন্ধ্যায় আর কোনো কাজ হইবে না, অতএব চুপ চাপ বোটে বসিয়াই কাটাইতে হইবে রাতটা। মাঝিরা ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত চাপাইয়া দিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে দশটার উপরে বাজিয়া গেল এবং সমস্ত দিনের কর্মক্লান্ত মাঝির দল যে-যেখানে পারিল পড়িয়া রহিল লম্বা হইয়া। কেবল সারাটা নির্জন রাত্রি ধরিয়া ঢেউগুলির জল অশ্রান্তভাবে বোটটার চারিপাশে খেলা করিতে লাগিল—সম্মুখে পশ্চাতে অপর্যাপ্ত সোনার উপর ফস্‌ফরাস্‌ চিক্‌ চিক্‌ করিতে লাগিল এবং হুহু করা বাতাসে দ্বিপ্রহর অবধি মণিমোহনের ঘুম আসিল না। নিম্ন বাংলার রাক্ষসী নদীটা এই রাত্রে কেমন করিয়া যেন মায়াময়ী হইয়া উঠিয়াছে।

সকাল বেলা পঙ্কতীর পার হইয়া সামনের মাঠের মধ্যে মণিমোহন ছোট খাটো একটি কাছারী করিয়া বসিল। দেশটা আগাগোড়া মুসলমানের—তবে মগও কিছু কিছু আছে। তাহারা এখানে ব্যবসা করে। বর্মা চুরুটের জন্য সুপারির জোগাড় কী একটা গুরুতর দরকার আছে, সেগুলি এখান হইতে সংগ্রহ করে তাহারা।

পেয়াদা গিয়া প্রজাদের খবর দিয়া ডাকিয়া আনিল। পূর্ববৎসরে গভর্ণমেণ্ট হইতে ইহাদের টাকা দেওয়া হইয়াছে। এখন সেই টাকাটা আদায়ের সময়।

এই দূর দুর্গম দেশে প্রজারা, অফিস-আদালত এবং সহরের আরো দশটা উপসর্গের চৌহদ্দি হইতে পুরাপুরি বাহিরেই আছে। এক ফৌজদারী জাতীয় আইন-ঘটিত বিশৃঙ্খলাই ইহাদের মধ্যে যা কিছু ঘটে এবং তাহার মীমাংসা এরা নিজেরাই করিয়া লয়। সুতরাং সরকার-সম্পর্কিত একটা ক্ষুদ্র পেয়াদাও এখানে আসিয়া দর্শন দিলে ইহারা তাহাকে অতিরিক্ত সমীহ করিয়া থাকে। সেই কারণে সরকারী তহশীলদারের আবির্ভাব ইহাদের একটা বিরাট ও স্মরণীয় ঘটনা।

প্রথমে যে লোকটা আসিল, তাহার বয়স হইয়াছে। অস্বাভাবিক বলিষ্ঠ চেহারা, বয়সের স্পর্শে বাঁধুনি ঢিলা হইয়া পড়ে নাই। একমুখ পাকা দাড়ী মেহেদী দিয়া রাঙানো হইয়াছে, কিন্তু সাদা কালোর পাশাপাশি এই অসঙ্গতিটুকু যেন মানায় নাই। পরণের লুঙ্গিটার রঙ সাদাই ছিল—কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ময়লার একটা পুরু আবরণ পড়ায় তাহার জাতিগোত্র নির্ণয় করিবার জো নাই।

একহাতে এক জোড়া মুরগী ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। আসিয়াই সে একটা লম্বা সেলাম জানাইল, বলিল হুজুরের শরীর ভালো আছে তো!

যেন কতকালের চেনা। মণিমোহন হাসিয়া বলিল, হাঁ ভালোই আছি। কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলুম না।

—চিনতে পারবেন কেমন করে? আপ কখনো এ তল্লাটে আসেননি তো। আগে যিনি এই 'সার্কেলে' ছিলেন তিনি আমায় ভালো করে চিনতেন। বান্দার নাম মজাঃফর মিঞা।

—ও, মজাঃফর মিঞা। কত টাকার লোন তোমার?

—আজ্ঞে সে সামান্যই—হুজুরের চোখে পড়বার মতো নয়। মজাঃফর মিঞা বিনয়ে জিভ কাটিল। তারপর মুরগী জোড়া মণিমোহনের পায়ের কাছে রাখিয়া বিনয়-গলিত স্বরে বলিল, হুজুর যদি কিছু মনে না করেন—

কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মণিমোহন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

···গোপীনাথ!

গোপীনাথ খাতা খুলিয়া বসিয়াই ছিল, আজ্ঞে?

—দেখতো মজাঃফর মিঞার কাছে কত টাকা পাওয়া যাবে?

মজাঃফর বিব্রত হইয়া উঠিল। আর একবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আজ্ঞে সে কটা সামান্য টাকার জন্যে সরকার বাহাদুরের আর—

কর্তব্য পালনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল গোপীনাথ। ধমক দিয়া কহিল, বেশি কথা কোয়ো না বড় মিঞা। দেখেছ তো স্বয়ং হুজুর সামনে বসে আছেন। বলো, তোমার বাপের নাম কী?

—বাপের নাম, বাপের নাম?

অধৈর্য স্বরে গোপীনাথ বলিল, হাঁ হাঁ বাপের নাম। ওকি মাথা চুলকোচ্ছ যে—বলি নামটা মনে পড়ছে না নাকি তোমার?

মজাঃফর মিঞা মেহেদী রাঙানো দাড়ির ভিতর দিয়া বিনীত মৃদু হাস্য করিল। লজ্জিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, আজ্ঞে মনে না পড়াটা তো আশ্চর্য নয়। আমার বয়েস যদি এই তিন কুড়ি সাত বছর হয়, তবে তিনি কতকাল আগে বেহেস্তে গেছেন ভেবে দেখুন দেখি?

মণিমোহন সকৌতুকে অট্টহাসি করিয়া উঠিল।

গোপীনাথ তখন আঙুলে থুথু লাগাইয়া খস্ খস্ করিয়া একখানা মোটা খাতার পাতা উল্টাইতেছিল। মৌজে রঘুনাথপুর, মৌজে ডাংলাহাট, মৌজে কালুপাড়া, কালুপাড়া—

—চালাকি পেয়েছ নাকি? এ জমিদারী সেরেস্তার তহশীলদার নয়—একেবারে সাক্ষাৎ হাকিম। বেশি ওস্তাদি করো তো সদরে যেতে হবে, খেয়াল থাকে যেন। বলো শিগগির, বাপের নাম কী?

মজঃফর মিঞা যেন কুঁকড়াইয়া গেল। সদর নামটা এমন প্রবীণ জোয়ান লোকটার মনের উপরেও অদ্ভুতভাবে ক্রিয়া করিয়াছে। কাতর কণ্ঠের উত্তর আসিল, আশ্রফ মিঞা।

—হুঁ। এই তো কথা ফুটেছে দেখছি। মফিজদ্দিন মিঞা, কসম গাজী—হাঁ এই যে মজঃফর মিঞা। সাং গোবালিয়া, মৌজে কালুপাড়া—পিং মৃত আশ্রাফ আলী হাওলাদার—ওরে বাপ রে, ৪২৷৵০ পয়সা।

গোপীনাথ মণিমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবু মুরগী দেওয়ার ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝলেন তো?

মণিমোহন হাসিয়া কহিল, সেটা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলুম।

দুটী একটি করিয়া চারিপাশে তখন অনেক কয়টি প্রজা আসিয়া ভিড় করিয়াছে। খাসমহাল কাছারীর তহশীলদারের এই আকস্মিক আবির্ভাবে তাহাদের মন যে আনন্দে উচ্ছলাইয়া ওঠে নাই, সেটা তাহাদের প্রসন্ন গম্ভীর মুখের দিকে চাহিলেই অনুমান করিয়া লওয়া চলে। তবু একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল—মজঃফর মিঞার দুর্গতিতে তাহারা অনেকেই খুশী হইয়া উঠিয়াছে।

গোপীনাথ মুখের উপর একটা নৈতিমূলক গাম্ভীর্য টানিয়া আনিয়া বলিল, হুঁ, ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। হাসি বেরিয়ে যাচ্ছে সব—দাঁড়াও। তারপর বড় মিঞা, টাকার কী হবে?

বড় মিঞা ম্লান হইয়া বলিল, কী হবে তা তো আমি ভাবছি। সব সুপুরী বাদুড়ে নষ্ট করে দিলে, ধানও এমন পাইনি যে—

মণিমোহন গম্ভীর হইয়া উঠিল: কেন মিথ্যে কথা বলে এই বুড়ো বয়সে পাপের বোঝা বাড়াচ্ছ বল তো? বাদুড়ে আর কটা সুপুরী খেয়ে নষ্ট করতে পারে। তা ছাড়া সবাই-ই তো বলছে, এবারের মতো ধান গত পাঁচ বছরেও হয়নি।

মজঃফর কহিল, নসীব হুজুর, নসীব। যার বরাত ভালো সে পেয়েছে। কিন্তু আমি—ক্ষোভে বড় মিঞার মেহেদী রঙীন দাড়িটি গালের দুই পাশ দিয়া যেন ঝুলিয়া পড়িল।

মণিমোহন কহিল, আচ্ছা বেশ, সব না পারো, অর্ধেক দাও। তোমরা টাকা না দিলে আমার চাকরী কী করে থাকবে। তিরিশটা টাকা ফেলে দাও, তা হলেই—

—তিরিশ টাকা! বড় মিঞার চোখ দুইটা প্রায় কপালে উঠিবার উপক্রম করিয়াছে।

গোপীনাথ মুখ বিকৃত করিয়া কী একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই ভীড়ের মধ্য হইতে আর একজন কথা কহিয়া উঠিল।

—তা এমন শক্তটা কী! এই পরশুই তো একজোড়া মোষ আশী টাকায় বিক্রী করেছ চাচা, তা থেকেই টাকা কটা ফেলে দাও না!

বিনা মেঘে কোথা হইতে একটা বজ্রাঘাত হইয়া গেল যেন।

হাকিমের সামনে এতক্ষণ বিনয়াবনত হইয়া থাকিলেও এইবারে মজঃফর মিঞার আর ধৈর্য রহিল না।—কে, কাসেম খাঁর ব্যাটা বুঝি? বেশ করেছি, বিক্রী করেছি আশী টাকায়, তোকে এখানে মোড়লী করতে কে ডেকেছে?

—কেউ ডাকে নি—হুজুরকে কেবল খবরটা দিয়ে দিলুম। অত্যন্ত নিরীহ স্বরে কাসেম খাঁর ব্যাটা জবাব দিল। তিনদিন আগেও গায়ের জোরে গোরু নামাইয়া মজঃফর মিঞা তাহার ক্ষেতের ধান খাওয়াইয়াছে, সে কথা সে ইহারই মধ্যে ভুলিয়া যায় নাই।

—ইঃ, মস্ত খবর দেনে-ওয়ালা এসেছে রে! মজঃফর মিঞা বারুদের মতো জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, ও ব্যাটাচ্ছেলের কথা বিশ্বাস করবেন না। শত্রুতা আছে বলে আমার নামে যা নয় তাই লাগাচ্ছে।

—আচ্ছা সে আমি দেখছি। ও মিথ্যে বলছে কিনা তার বিচার পরে করব। কিন্তু অন্তত তিরিশটা টাকা না দিলে তো—

কথাটার মাঝখানেই বড় মিঞা সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত জোড় করিল। গোপীনাথ চোখ পাকাইয়া কিছু একটা বলিবার উপক্রম করিতেই একটা বিশৃঙ্খল উগ্র কোলাহল আসিয়া সমস্তটারই সুর কাটিয়া দিল।

সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা বিক্ষুব্ধ জনতা। সর্বাগ্রে আধাবয়সী একজন মগ, তাহার কপালে প্রকাণ্ড একটা ক্ষত হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত নামিয়া আসিতেছে। গালের দুইটি পাশ দিয়া, গলার ধার বাহিয়া ময়লা ফতুয়াটার উপর ফোঁটায় ফোঁটায় থকথকে গাঢ় রক্ত টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছে।

গোপীনাথ বলিল, কী সর্বনাশ!

মণিমোহন চমকিয়া বলিল, কী হয়েছে? এমন ক'রে কে মারলে!

লোকটা স্পষ্ট কোনো জবাব দিল না, দুর্বোধ্য-ভাষায় কেবল বিড় বিড় করিয়া কী বলিল। সঙ্গে যে সমস্ত মুসলমান আসিয়াছিল, সমবেত চীৎকারে তাহারাই জানাইয়া দিল, মেরেছে হুজুর, মেরেছে।

—মেরেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কে মারলে?

অপরাধী দূরে ছিল না—জনতার সঙ্গেই সে আসিয়াছিল। অথবা জোর করিয়াই আনা হইয়াছিল তাহাকে। মণিমোহন প্রশ্ন করিবামাত্র তিন চারজন লোক তাহাকে হিড় হিড় করিয়া সামনে টানিয়া আনিল। সে তো প্রাণপণে গালাগালি করিতে লাগিলই, তা ছাড়া যাহাকে সুবিধা পাইল, সাধ্যমত খাঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিতেও ত্রুটি করিল না।

সেদিকে চাহিতেই মণিমোহন স্তব্ধ হইয়া গেল।

যেন চারিদিকের এই অমার্জিত, অন্ধকারের রাজ্যে এক খণ্ড অঙ্গার কোথা হইতে ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সতেরো আঠারো বছর বয়সের একটি মগের মেয়ে। সুশ্রী, ছিপ্‌ছিপে দেহ, গায়ের প্রখর রঙটি এই লোনার দেশে আসিয়াও মলিন হইয়া যায় নাই। যৌবনশ্রী যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—সেদিকে তাকাইলেও নেশা ধরিয়া যায়। তাহার দুইটি নীল চোখ প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলিতেছে—যেন দুই খণ্ড হীরার মধ্য হইতে বিষের একটা নীলাভ দ্যুতি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল।

বোকার মতো সে শুধু প্রশ্ন করিতে পারিল : এ কে ?

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন আহত লোকটিকে দেখাইয়া বলিল, এর স্ত্রী।

—এর স্ত্রী ! কিন্তু স্বামীকে এমন ক'রে মারল কেন ?

মগের মেয়েটি এতক্ষণ পরে মণিমোহনের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ, কিন্তু সরল। মেয়েদের চোখের দৃষ্টিতে কেবল যে বাঁকা বিদ্যুৎই ঝলকিয়া যায়না—এই দৃষ্টিটা দেখিয়া সেকথাই মণিমোহনের মনে পড়িল। এ তরবারির মতো সোজা এবং শাণিত, কেবল দেখিতে চায়না, বিঁধিয়া ফেলিতে চায়।

সহজ কণ্ঠে, স্পষ্ট প্রাদেশিক বাংলায় মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সদরের সরকারী লোক ?

—হাঁ।

—তা হ'লে তোমার কাছেই বিচার চাই।

—বিচার !—মণিমোহন বিস্মিত হইয়া বলিল, বেশ তো, বলো।

মেয়েটি কথা না বলিয়া চারিদিকের জনতার দিকে একবার তাকাইল। মণিমোহন তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল। মজঃফর মিঞাকে ডাকিয়া সে বলিল, বড়মিঞা, এখান থেকে সব ভিড় সরাও—পরে তোমাদের ব্যাপার বুঝবো।

কৌতূহলী জনতার মধ্যে অসন্তোষের একটা গুঞ্জন উঠিল। অনেক আশা করিয়া তাহারা আসিয়াছে, এত সহজেই তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে ! তা ছাড়া মেয়েটা যখন গোপনে আরজী করিতে চাহিতেছে, তখন গুরুতর ব্যাপার একটা না একটা কিছু আছেই।

গোপীনাথ চোখ পাকাইয়া বলিল, যাও—এখান থেকে যাও সব।

অতএব যাইতেই হইল। সরকারী কর্মচারী তো নয়, সাক্ষাৎ হাকিম। ইচ্ছা করিলে যখন তখন সদর ঘুরাইয়া আনিতে পারে। তাহারা দূরে দূরে সরিয়া গেল, কিন্তু একেবারে চলিয়া গেলনা।

মণিমোহন গম্ভীর হইয়া কহিল, কী তোমার নালিশ ?

আহত মগটা কথার মাঝখানে একবার হাউমাউ করিয়া উঠিল—যেন কী একটা কথা তাহার বলিবার আছে। কিন্তু একটা বড় ধমকেই মেয়েটি তাহাকে দিল থামাইয়া।

—নালিশ ? নালিশ অনেক আছে। ও আমার স্বামী বটে, কিন্তু দিনরাত মদ খায়। আমাকে যখন তখন মারে। কী একটা মেয়ে-মানুষ আছে, তার ওখানে রাত কাটিয়ে আসে। তুমি সরকারী লোক এসেছ বাবু, তুমিই এর বিচার করো। আমি তো কেবল ইঁট মেরেছি, এতে যদি শায়েস্তা না হয় তো একদিন দা দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলব—এই ব'লে রাখছি।

মেয়েটির কথার তোড়ে যেন ঝড় বহিয়া গেল।

গোপীনাথ শিহরিয়া বলিল, বাপ্‌স্, সাক্ষাৎ জাত-গোখরোর বাচ্চা !

রসিকতাটা মেয়েটি বুঝিতে পারিল কিনা কে জানে, কিন্তু তাহার নীল চোখ দুইটি হঠাৎ যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

—করবে তো বাবু বিচার ?

—করব বই কি।—মণিমোহন একবার কাশিয়া ফরিয়াদী এবং আসামী স্বামীটির দিকে চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, এ যা বলছে, তা কি সত্যি ?

ধমক খাইয়া লোকটা সেই যে চুপটি মারিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার মুখ খুলিল। আউ আউ করিয়া ভাঙা বাংলায় সে বলিল, না—না হুজুর, এ যা বলছে সব—

মেয়েটি আকস্মিকভাবে আবার গর্জিয়া উঠিল। বেচারী স্বামী যে ধমক খাইয়া শুধু থামিয়াই গেল তা নয়, ধপ করিয়া একেবারে মাটির উপরেই বসিয়া পড়িল। করুণা হয় লোকটার অবস্থা দেখিলে।

—আবার মিথ্যে কথা বলছ ! চুপ ক'রে থাকো একেবারে চুপ।

একেবারে চুপ করিয়াই সে রহিল। কপালের ক্ষতটা তাহার এমন বেশি নয়, সাধারণভাবে একটু চামড়া কাটিয়া গেছে মাত্র। হয়তো পাঁচ সাত দিন পরে আপনিই শুকাইয়া ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু আপাতত এই মুহূর্তে সে যে স্ত্রীর ভয়েই বেশি কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মুখ দেখিয়া সেটা বুঝিয়া নেওয়া কঠিন ছিলনা।

তাহার হইয়া জবাব মেয়েটিই দিল। বলিল, ও আর কী বলবে বাবু, ওর বলবার কী আছে। আমি ওকে ইঁট মেরেছি, বাড়াবাড়ি করলে দা বসাব, সেইটেই বুঝিয়ে দিব।

মণিমোহন হাসিল।

—দা বসাবে ? দা বসালে ফাঁসি হবে, জানো ?

—হঁ:, ফাঁসি। মেয়েটি ভঙ্গী যেন অদ্ভুত একটা রূপের ছটা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিল। দেখিয়া মনে হইল, বাস্তবিকই উহাকে ফাঁসি দিবার মতো দড়ি আজো সৃষ্টি হয় নাই।

মণিমোহন স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, যাও, কখনো আর এমন কোরোনা। স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে মার খেতে হবে, এতো জানাই আছে।

স্বামীটি গম্ভীর চিন্তিত মুখে মাথা নাড়িল।

মেয়েটি এতক্ষণ পরে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। আরক্ত ক্ষুদ্র দুইটি ঠোঁটের ভিতর হইতে উজ্জ্বল কয়েকটি তীক্ষ্ণদাঁত বাহির হইয়া আসিল। দেখিতে মনোরম, কিন্তু তাহার সহিত সাপের দাঁতের কোথাও একটা সামঞ্জস্য আছে হয়তো।

—আর তুমিও কখনো এমন করে মেরোনা। হাজার হোক, স্বামী তো।

—নিজের দোষে মার খেলে আমি কী করব ? মেয়েটির মুখে হাসিটুকু আলগাভাবে লাগিয়াই রহিল : তুমি বড় ভালোমানুষ সরকারী বাবু, ঠিক ঠিক বিচার করতে জানো। কিন্তু গাঁয়ের লোকেই কেবল বুঝতে চায়না।

তাহার নীল চোখ দুটি এতক্ষণে স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। বিষাক্ত হীরা নয়—যেন দুই খণ্ড নীলকান্ত মণি। সেই চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সে মণিমোহনের দিকে তাকাইল।

গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের দেশ কোথায় ?

—বর্মা দেশ, মৌলমিন।

—এখানে কী করো ?

মেয়েটির ভঙ্গিতে বিরক্তি প্রকাশ পাইল।

—এখানে থাকি, আর কী করব। জমি আছে, খামার আছে।—তারপর মণিমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,

গাঁয়ের ভেতর যদি যাও, তবে আমার ওখানে একবার যেয়ো বাবু। আমার নাম মামুন্।

আহত লোকটার রক্তাক্ত মুখখানা মণিমোহনকে পীড়িত করিতেছিল। সে বলিল, আচ্ছা যাব। কিন্তু তার আগে তোমার স্বামীর মাথাটা ভালো করে ধুইয়ে দাও। যে চোট লেগেছে, বেচারা যে প্রাণে বেঁচে আছে এ ওর জোর কপাল।

—ইস্, দরদে! ওর মরা এত সস্তা কিনা! মরলে আমাকে এমন ক'রে কে জ্বালাবে? আচ্ছা, চললুম বাবু।

অভিনন্দন জানাইয়া আর একবার সহাস্য কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় স্বামীকে টানিয়াই লইয়া গেল একরকম।

গোপীনাথ জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল: দেখলেন প্রভু, কী চীজ্ একখানা! সাক্ষাৎ মগের মেয়ে তো, বাঘিনীর চাইতে কম নয়।

অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ সামনে নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর শব্দ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হুঁ, ডাকো হবে। বসে থাকলে তো চলবেনা, আমাদের বন্দোবস্ত যাহোক একটা করতে হবেই।

চর ইস্মাইলে বসন্ত আসিয়াছিল।

কিন্তু বিলের বুকে দু'টি চারটি বুনো-করবির ফুল ছাড়া সে বসন্তকে চিনিবার জো নাই। অবশ্য মানুষের মনের কথা আলাদা। প্রাকৃতিক নিয়মে সমস্ত জীব-জগতেই যখন বসন্তের চেতনা প্রসারিত হইয়া পড়ে—তখন এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কথা নয়। স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে তাহার রূপ ও রং বদলায় মাত্র।

বসন্তের বাতাসে যে চিরন্তন ক্ষুধাটা ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার কোনো আকার নাই। ক্ষুধা হিসাবে সে সর্বজনীন, কিন্তু কোন্ পটভূমিতে সে যে কী রূপান্তর লইবে সেটা কেউই বলিতে পারে না। মঞ্জরিত বনস্থলীতে কস্তুরী-মৃগের গন্ধে তাহার যে ছায়াছবি রূপ পাইয়া ওঠে, অথবা নাগরিক জগতের আলো-ঝলকিত রাজপথে চকিত-কটাক্ষের মধ্য দিয়া যে ভাবে সে ধরা দেয়—এখানে সে ভাবে তাকে খুঁজিয়া পাইবার জো নাই।

এখানকার বসন্ত আসে রক্তের সঙ্কেত লইয়া। ফাল্গুনের বৈকাল এখানে ভাটফুলের গন্ধে মদির হইয়া ওঠে না, কাল-বৈশাখীর তীক্ষ্ণ সঙ্কেতে দিগন্তে দিগন্তে কালো মেঘ ফেনার মতো ফাঁপিয়া ওঠে। চপল-কটাক্ষের মধ্য দিয়া এখানে যে প্রেমের সূচনা হয়, প্রখর কামনার বিপ্লবের আঘাতে তাহার নিশ্চিত পরিণতি ঘটে।

পৃথিবীর সমস্ত রীতি-নীতি, সমাজ-সংস্কার-শৃঙ্খলার শৃঙ্খলের বাহিরে এই চর-ইস্মাইল।

তাই এখানকার মাটিতে কখনো সোনার ফসল দেখা যায় না; সৃষ্টির বীজ এখানকার গর্ভকোষের সংস্রবে আসিয়া অনাসৃষ্টিতে পল্লবিত হইয়া ওঠে।

জোহান ভয় পাইয়াছিল যেমন, উত্তেজিত হইয়াছিল তেমনই। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলি যে কে ছুঁড়িয়াছে, সে-সম্বন্ধে সে একটা মোটামুটি আন্দাজ যে না করিয়াছিল তা নয়। রাগটা তাহার নানা কারণে বেশি হইয়াছিল ডি-সুজার উপরেই। ডি-সুজা যা ভাবিয়াছে তাহার চাইতে সে-যে অনেক বেশি বিপজ্জনক, সে-কথাটা বুঝাইয়া দিবার সময় হইয়াছে।

সুযোগ করিয়া একদিন লিসিকে লইয়া সে ভাসিয়া পড়িবে চিদাম্বরমে। তাহার এক খুড়া সেখানে মাদ্রাজ সাউথ মারাঠা রেলওয়েতে ড্রাইভারী করে, সে সেখানে যা হোক একটা কিছু চাকুরী-বাকুরী জুটাইয়া দিবেই।

জোহান আসিয়া যখন লিসির দেখা পাইল, লিসি তখন একরাশ পেঁয়াজ লইয়া ছাড়াইতে বসিয়াছে। ডি-সুজা বাড়ীতে নাই, সম্ভবত সহরে গিয়াছে। অথবা কোথায় গিয়াছে জোহানের পক্ষে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।

জোহানের মুখের দিকে বাঁকা কটাক্ষ করিয়া লিসি বলিল, আবার এলে যে!

লিসির পাশে একটা ভাঙা টুলের উপরে জোহান বসিয়া পড়িল ধপ্ করিয়া। কাতরোক্তি করিয়া কহিল, নাঃ, আর পারা যায় না!

বিরল ভ্রু-রেখাটাকে লিসি বাঁকাইবার চেষ্টা করিল, বলিল, কেন, কী হয়েছে?

—হয়েছে অনেক কিছুই। চলো, এখানে আর নয়। আমরা পালাই।

লিসি সত্যি সত্যিই চমকিয়া উঠিল, পালাব! কী বলছ জোহান! কোথায় পালাব?

জোহানের কণ্ঠস্বরে মরিয়া ভাব প্রকাশ পাইল: চিদাম্বরম্—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি। আমার এক কাকা আছে এম্-এস্-এম্-এর ড্রাইভার। সেই চাকরী জুটিয়ে দেবে।

—খেপেছ তুমি?

মুহূর্তের জন্য লিসিকে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মনে হইল। সে জোহানের মুখের অত্যন্ত কাছে মুখটা আনিয়া কী একটা ঘ্রাণ লইবার চেষ্টা করিল। ভোঁতা ছোট নাকটিকে বার কয়েক সুন্দর ভাবে কুঁচকাইয়া স্পষ্ট ভাবে প্রশ্ন করিল, কী ব্যাপার? আজ বুঝি আবার খানিকটা তাড়ি গিলে এসেছ?

—না লিসি, তাড়ি খাইনি। সত্যি বলছি—

একটা ঝট্কা মারিয়া লিসি তিন পা সরিয়া গেল। আস্তখানা কাঁচা পেঁয়াজ কচমচ করিয়া চিবাইতে চিবাইতে কুঞ্চিত-মুখে মন্তব্য করিল, সত্যি তো, তুমি চিরকালই ব'লে আসছ! তাড়ি খেলেই তোমার মুখ দিয়ে সেন্ট ম্যাথ্যুর গস্পেল বেরোতে থাকে। যাও যাও বেশী বোকোনা এখন। আমার বিস্তর কাজ রয়েছে।

জোহান বিরক্ত হইয়া বলিল, তাড়ি একটু খেয়েছি বটে, কিন্তু মেরীর নাম ক'রে বলছি লিসি, আমার এতটুকু নেশা হয়নি। বড্ড দরকারী একটা কথার জন্যে তোমার কাছে এসেছি, রাগ কোরোনা।

লিসির অবিশ্বাস গেলনা, তবু একটু কাছে আগাইয়া আসিল সে। বলিল, হুঁ! তা দরকারী কথাটা কী, শুনি?

জোহান গলাটা নামাইয়া আনিল, বলিল, কাল বিকেলে হাস

মারতে গিয়েছিলুম। জলে নেমেছি, এমন সময় দূরের থেকে দুম্ দুম্ ক'রে কে দুটো গুলি ছুঁড়লে। একটা তো কানের ওপর দিয়ে গেছে। বেঁচে গেছি কেবল ভাগ্যের জোরে।

লিসির মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল।

—কে গুলি ছুঁড়লে দেখতে পাওনি?

—কী করে পাবো! প্রাণের ভয়ে আধ ঘণ্টা তো বিলের কাদায় ভিতরেই ডুবে ছিলুম। উঠে আর কারো পাত্তা পাইনি।

শঙ্কিত মুখে ত্রস্ত গলায় লিসি বলিল, এ নিশ্চয় ও বাটার কাজ। ও তোমাকে সন্দেহ করেছে। ভালো চাও তো আজই এখান থেকে পালাও জোহান।

—পালাবই তো। আর সে জন্যে তোমাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে চাই।

—কিন্তু আমি! আমি কী ক'রে যাব!

জোহান মিনতি করিয়া কহিল, তুমি না গেলে কী ক'রে চলবে লিসি! তোমার আশাতেই কোনো রকমে বেঁচে আছি। চলো, আজ রাত্রেই নৌকো ক'রে—

—জোহান!

দুই জনেই চমকিয়া উঠিল। চোখ পড়িতেই দেখিল দরজার কাছে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে ডি-সুজা। রাগে তাহার চোখ দুটি বাঘের মতো দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

ডি-সুজা বলিল, নিষেধ করে দিয়েছি, তবু আমার বাড়ীতে তুমি কেন এসেছ! বেল্লিক, উল্লুক, ভল্লুক, শয়তান কোথাকার!

জোহান গরম হইয়া কহিল, গালাগালি কোরোনা ঠাকুর্দা!

ডি-সুজা চ্যাঁচাইয়া কহিল, না গালাগালি করবেনা, আদর করে চুমু খাবে! যাও, বেরোও আমার বাড়ী থেকে, হতভাগা, পাজী, শূয়োর, গাধা—

জোহানের মাথার মধ্যে পর্তুগীজ রক্ত টগ্ বগ্ করিয়া উঠিল। দুই পা সামনে আগাইয়া সে বলিল, আবার গালাগালি করছ ঠাকুর্দা!

—গালাগালি! খুন করে ফেলব তোকে। ব্যাটা—বাপ-মা সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়া ডি-সুজা অত্যন্ত কদর্যভাবে একটা গালি বর্ষণ করিল।

জোহানের চোখের তারায় একটা হিংসার আলো চিকমিক্ করিতে লাগিল।

—বেশি কথা কোয়োনা ঠাকুর্দা। ভালো তুমি, ইচ্ছে করলে তোমাকে এখুনি দশ বছরের মতো ঘানি টানিয়ে আনতে পারি?

—কী, কী বললি! ভয় এবং ক্রোধে ডি-সুজার সর্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল: কী বললি তুই!

—যা বলছি তা সোজা কথা। হাঁ, পুরো দশ বছর। এর কমে যদি ফেরার হয় তো আমার নাম বদলে রেখো।

লিসি চমকিয়া বলিল, জোহান!

কিন্তু জোহানকে শয়তানে পাইয়াছিল। ডি-সুজার সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া যে একটা ভয়ংকর সংকেত ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা দেখিয়াও সে এতটুকু ভয় পাইলনা। কহিল, বলব না, বলবই তো। চোরাই আফিঙের ব্যবসা করে লাল হয়ে উঠেছ ঠাকুর্দা—

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিল ডি-সুজা। আবাকালী রক্ত-মিশ্রিত তাহার তামাটে মুখ যেন একখণ্ড সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। এতক্ষণ ধরিয়া যেটা ছায়ার মতো চোখের সামনে ভাসিতেছিল, সেটা আর ছায়া নাই; সন্দেহের পাতলা স্বচ্ছ আবরণটা সরিয়া গিয়া সব আশঙ্কার সেই নিদারুণ সত্যটাই প্রকাশ পাইয়া বসিয়াছে।

লিসি আবার বলিতে চাহিল, জোহান! কিন্তু ভয় আসিয়া তাহার গলায় এমনি আঁটিয়া বসিয়াছে যে অস্ফুট একটা আর্তনাদ ছাড়া আর কথা বাহির হইল না।

ডি-সুজার চোখের সামনে দপ্ করিয়া সর্বপ্রথম বনিটার মুখখানা আসিয়াই দেখা দিল। অন্ধকার পর্দার উপরে যেমন ভাবে ছবি ফুটিয়া ওঠে—তেমনি করিয়াই তাহার সেই বিকারহীন সাধুত্বের মুখখানি তাহার মনের সম্মুখে উঁকি মারিতে লাগিল। তাহার ক্ষুদে চোখ দুইটা দিয়া একটি মাত্র ইঙ্গিতই ফুটিয়া বাহির হইতেছিল এবং সে ইঙ্গিত—

খপ্ করিয়া ডি-সুজা পা-জামার মধ্যে হাত পুরিয়া দিল এবং পরক্ষণেই হাতে করিয়া যা বাহির করিয়া আনিল, সে দিকে চাহিয়া জোহানের চোখ টোমাটোর মতো বড় বড় হইয়া উঠিল।

ডি-সুজার হাতের মধ্যে রিভলভারটা তখন অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কাঁপিতেছে।

জোহান রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, পিস্তল!

—হাঁ, পিস্তল। তোকে খুন করব আমি! ডি-সুজার কম্পিত তর্জনীটা কাঁপিতে কাঁপিতে ট্রিগারটাকে খুঁজিতে লাগিল।

চট্ করিয়া যেন চমক ভাঙিয়া গেল লিসির। বাঘের মতো একটা থাবা দিয়া সে ডি-সুজার হাত হইতে অস্ত্রটা ছিনাইয়া লইল। বলিল, ঠাকুর্দা—করছ কী! সত্যিই কি তুমি খুন করতে যাচ্ছ নাকি!

অস্ত্রটা লিসির হাতে নিরাপদ জায়গায় গিয়া পৌঁছিয়াছে দেখিয়া বীরদর্পে সামনে অগ্রসর হইয়া আসিল জোহান। তারপর চোখের পলক না ফেলিতেই সে ধাঁ করিয়া প্রকাণ্ড একটা ঘুষি বসাইয়া দিল ডি-সুজার মুখে।

—খুন করবে! খুন করা এতই সস্তা!

ঘুষি খাইয়া তিন পা পিছাইয়া গেল ডি-সুজা। তারপর আঘাতটাকে সহ্য করিয়া যখন সে চোখ মেলিয়া চাহিল, তখন জোহান অদৃশ্য হইয়া গেছে।

কিন্তু ডি-সুজার দিকে চাহিয়া লিসির আর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না।

—ঠাকুর্দা! ঠাকুর্দা!

ঠাকুর্দার নাক দিয়া তখন ঝর্ ঝর্ করিয়া তাজা রক্ত ঝরিতেছিল। তাহার সাদা গোঁফ জোড়াকে ভিজাইয়া সে রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে পড়িতেছিল।

লিসি কহিল, তোমাকে মারলে ও! এতবড় সাহস ওর! তাহার মঙ্গোলীয়ান মুখখানা ঘিরিয়া বন্য ব্যাঘ্রীর হিংস্রতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

ডি-সুজা কী একটা বলার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিলনা। দুই হাতে রক্তাক্ত নাকটা চাপিয়া ধরিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

সপ্তাহে একটি দিন চর ইস্মাইলে খুব বড় করিয়া হাট বসে। চরের উত্তরে যেখানে তিনটি সরু খাল আঁকাবাঁকা বিসর্পিল

যেথায় তিনদিক হইতে ঢুকিয়া এক জায়গায় আসিয়া একত্রে মিলিয়াছে এবং প্রচুর পলিমাটি ও বালি জমিয়া একটা উঁচু ডাঙার সৃষ্টি করিয়াছে, সেইখানেই গ্রামের হাট।

সব জায়গাতেই গ্রামের হাটখোলায় একটি না একটি বারোয়ারী দেবতার স্থান দেখা যায়, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। হাটের মাঝখানে বড় গাজী কায়েমী হইয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে শুক্রবার দিন তাঁহার 'সিন্নি' হয়। গাজী, দক্ষিণরায়, কালুরায় ও বন-বিবি, এই চারটি দেবতা বা অর্ধ দেবতা মিলিয়া আজও অপ্রতিহত প্রতাপে নিম্ন-বঙ্গ শাসন করিতেছেন, শিব, কালী, পীর, সকলকে ছাড়াইয়াই ইঁহাদের সম্মান।

গাজীতলার চারপাশে ঘিরিয়া হাট বসিয়াছে। ছোট ছোট খালগুলি ডিঙি নৌকায় বোঝাই। যে সমস্ত বড় নৌকা খাল দিয়া আসিতে পারে না, ছোট ডিঙি নামাইয়া দিয়া তাহারা হাট করিতে আসিতেছে।

রাধানাথকে সঙ্গে করিয়া বলরাম হাটে আসিলেন।

কাজটা বলরামের নয়। তিনি সৌখীন মানুষ, এ সব ঝক্কি পোহানো তাঁহার স্বভাবের বাহিরে। তবু আজ তিনি নিজেই আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রাধানাথ ইহাতে খুশি হয় নাই। লাভের মধ্যে তাহার সাপ্তাহিক বখরাটা মারা পড়িল।

কাছাকাছি কোথাও তাঁতিদের গ্রাম আছে একটা। প্রত্যেক হাটবারে তারা নানারকমের শাড়ী-গামছা এই সব বিক্রী করিতে আসে। বলরাম সেগুলি দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন।

রাধানাথ বলিল, বাবু, মাছটা আগে না কিনলে—

—হবে এখন, দাঁড়া, দাঁড়া—

তাঁতিদের দোকানের সামনে আসিয়া তাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন। দড়ির উপর আট দশখানা শাড়ী ঝুলিতেছিল। একখানা বলরামের ভারী পছন্দ হইয়া গেল। ময়ূর-কণ্ঠী রঙ—চিকচিকে রোদ লাগিয়া তাহার জেল্লা যেন ছুটিয়া বাহির হইতেছে। গৌরাঙ্গী মেয়ের গায়ে তাহা কী রকম মানাইবে ভাবিয়া বলরাম মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁতের কাপড় বলিয়াই ঠাস্ বুনানী নয়, সেই জন্য অতিরিক্ত সূক্ষ্ম বলিয়া মনে হয়। তনুদেহের লাবণ্য তাহাতে ঢাকা পড়েনা—বরং মাঝে মাঝে অঙ্গের অস্ফুট আভাস দিয়া আরো মাতাল করিয়া তোলে।

আচ্ছা, মুক্তোকে কেমন মানাইবে? অবশ্য মুক্তোকে খুব ফর্সা বলা চলেনা, তা ছাড়া নোনার দেশে আসিয়া তাহার রঙ যেন ময়লা হইয়াছে আর একটু। তবু ভালোই দেখাইবে তাহাকে। মুক্তোর সুগঠিত দেহটা বলরামের মনশ্চক্ষুর উপর দিয়া ভাসিয়া গেল।

বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, শাড়ীর দাম কত হে?

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই যে সন্ধ্যা হইবে, ইহা তো জানা কথা। সেটা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন কোথা হইতে হরিদাস আসিয়া জুটিলেন।

—কি হে, শাড়ী কেনা হচ্ছে নাকি?

কবিরাজ চমকিয়া তাকাইলেন। তারপর হরিদাসের বাঁকা হাসি বিস্ফুরিত মুখখানার দিকে চাহিয়া ঠোঁটটাকে একবার চাটিয়া লইলেন। জড়িতস্বরে কহিলেন, কে, কে বলছে আমি শাড়ী কিনছি? একখানা গামছা কেনবার জন্যে—

ময়ূরকণ্ঠী-রঙা শাড়ী-খানার ওপরে আঙুল রাখিয়া হরিদাস বলিলেন, গামছা? কিন্তু এখানাকে ঠিক গামছা ব'লে তো মনে হচ্ছেনা ভায়া। কি হে জোলার পো, এ তোমাদের কোন্ নতুন ফ্যাশানের গামছা আমদানি করেছ?

রসিকতাটা উপভোগ করিয়া জোলার পো মৃদু হাসিল। এক জোড়া কাঁচাপাকা গোঁফের ফাঁক হইতে তিনটি দাঁত বাহির করিয়া বলিল, এঁজ্ঞে না, ওখানা গামছা নয়—শাড়ীই।

—বটে, বটে? কবিরাজের চোখে তা হলে চাল্‌সে ধরেছে আজকাল? গামছা আর শাড়ীর তফাৎ বুঝতে পারোনা?

মনে মনে দাঁত খিঁচাইয়া প্রকাশ্যে কবিরাজ অসহায় স্বরে কহিলেন, যাও—যাও।

—যাব মানে? ঐ গাজীতলায় দাঁড়িয়ে এমনি মিথ্যে বলছ ভায়া, কাজটা কি ভালো হচ্ছে? একটু সাজগোজ করানোর ইচ্ছে মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে—সেটাকে গোপন করে আর কী লাভ?

বলরামের নির্বিরোধ শান্ত মূর্তিটির তলা হইতে যেন একটা আগ্নেয়-গিরি ফুটিয়া বাহির হইল। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা থাকিতে আছে।

—থামো, থামো ঢের হয়েছে। তোমার মতো অসভ্য ছোটলোক আমি আর দুটো দেখিনি।

—ওরে বাপরে! থুঁৎনির নীচে হাত রাখিয়া হাঁ করিয়া হরিদাস বলরামের দিকে চাহিলেন।

—হাঁ—হাঁ। যেন ইয়ে একটা—

বলরাম কথাটা শেষ করিলেন না—বোধ হয় শেষ করিবার মতো কিছু একটা পাইলেন না বলিয়াই। শুধু রাধানাথের হাতটা ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পোষ্ট্‌মাষ্টার বাঁ হাতে একটা তুড়ি বাজাইয়া সজোরে কহিলেন, দুর্গা-দুর্গা।

রাধানাথকে টানিতে টানিতে বলরাম প্রায় খালের কাছে আনিয়া ফেলিলেন।

রাধানাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল, ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন বাবু! মাছ কিনতে হবেনা? আর দেরী হ'লে তো—

—মাছ—মাছ! ব্যাটার আছেই তো কেবল খাই খাই। হরিদাসের বেলায় যে দাঁতখিঁচুনিটা মনে মনে আত্মগোপন করিয়াছিল, রাধানাথের ক্ষেত্রে সেটা আর অপ্রকাশ্য রহিলনা।

রাধানাথ সংকুচিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে আমার নিজের জন্যে নয়, দিদিমণি বলছিলেন বোয়াল মাছের কথা—তা তিনটে অ্যাই মাকুলে বোয়াল উঠেছে দেখলুম—তাই—

—দিদিমণি! রাধানাথকে কথাটাও আর শেষ করিতে হইলনা: তবে এতক্ষণ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলি, শুনি? কাজে ফাঁকি দিতে পারলে আর কথা নেই। যা, যা, এক্ষুণি যা, দৌড়ো—

হরিদাস ততক্ষণে জোলার পোর সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিয়াছেন।

—ঢাকায় গেছ কখনো, ঢাকায়?

বিনীত হাসির সঙ্গে বিনীততর প্রত্যুত্তর আসিল, আজ্ঞে না।

—তবে বুঝতে পারবেনা। ঢাকাই মসলিন সে যে-সে ব্যাপার নয়। আমি তখন মানিকগঞ্জে থাকি। সেখানকার এক্জিবিশনে এক তাঁতি একবার একটা আমের আঁটির ভেতর পুরো বিশ গজী এক থান মসলিন পুরে নিয়ে এসেছিল! সে কী সূক্ষ্ম কারবার! তাই দেখে লাট সাহেব নিজে তিন মিনিট ধরে তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন—হুঁ হুঁ! এক্জিবিশন বোঝো তো?

—হেঁ—হেঁ—তা আজ্ঞে বসুন না, একছিলিম তামাক সেজে দিই।

• • •

(ক্রমশঃ)

ফাউস্ট

কাজী আবদুল ওদুদ

[ফাউস্ট-নাটকের মহামনস্ক রচয়িতা য়োহান ভোল্‌ফ্‌গাঙ্‌ ফন্ গোটে ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ষোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি পিতার তত্ত্বাবধানে গৃহে বিদ্যালাভ করেন ও বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করেন। তারপর তিনি লাইপজিগ ও স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন ও আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ভাইমারের ডিউকের আমন্ত্রণে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত রাজ্যে গমন করেন ও সেখানে রাজমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি আমৃত্যু অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দ থেকে প্রায় দুই বৎসরকাল তিনি ইতালিতে কাটান ও প্রধানতঃ প্রাচীন শিল্প ও সাহিত্যের চর্চা করেন।

তরুণ বয়সে তিনি "গোয়েট্‌স"-নাটক ও "ভের্টের"-পত্রোপন্যাস লিখে ইয়োরোপে প্রসিদ্ধ হন। তাঁর পরিণত বয়সের রচনার মধ্যে এফিজেনিয়া, টাস্সো, ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্টার, হেরমান ও ডোরোথিয়া, ফাউস্ট, "প্রাচ্য-প্রতীচ্য দিবান," "পারস্পরিক আকর্ষণ", আর "আত্মচরিত" বিশ্বসাহিত্যে বিখ্যাত। তিনি বিজ্ঞানের অনুশীলনেও দীর্ঘকাল ব্যয় করেন, আর ডারউইনের বহু পূর্বে অভিব্যক্তি-বাদ সম্পর্কে মূল্যবান আবিষ্কার করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন ইয়োরোপের কবিকুলগুরু। আর জনৈক ইংরেজ সাহিত্যিক তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—"আমরা সবাই গোটের শিষ্য তা আমরা জানি আর না-ই জানি; যে কোনো উদারচিত্ত ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এলেই সেই অবশ্যম্ভাবী শিষ্যত্বের কথা বুঝবেন। যাঁরা নৈতিক পদ্ধতির চাইতে কাম্য জ্ঞান করেন নৈতিক শক্তি, আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে চান আন্তর্জাতিক সহযোগ, সাহিত্যে জীবনে রাজনীতিতে ও চিন্তায় স্বেচ্ছাচারিতার চাইতে বেশি মর্যাদা দেন প্রজ্ঞাবানকে, তাঁরা এই একটি লোকের জীবন দৃষ্টান্ত ও রচনা থেকে—তাঁর দৈবাৎ-রচিত চিঠিপত্র ও কথন-কণিকাও এই সব রচনার অন্তর্ভুক্ত—অফুরন্ত প্রেরণা উদ্দীপনা ও আলোক লাভ করবেন।"]

অতীতকাল থেকে ইয়োরোপে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করলে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়, কিন্তু সেই ক্ষমতা ভোগ করা যায় একটি পরিমিত কাল ধরে, তারপর সেই ক্ষমতাধারীকে হতে হয় একান্তভাবে শয়তানের অধীন অর্থাৎ চির-অভিশপ্ত নারকী। মধ্যযুগে এই ধারণা আরো প্রবল হয় কোনো কোনো খ্যাতনামা ব্যক্তির এমন অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি লোকের ঝোঁকে—তাঁরা অবশ্য পরে অনুতপ্ত হন ও দেবী-মাতার প্রসাদে অভিশাপ থেকে করুণার রাজ্যে ফিরে আসেন। ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মান দেশে ফাউস্ট নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়; ভিটেনবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিদ্যালাভ করেন, কিন্তু পরে ধর্মের পথ পরিত্যাগ করে হন যাদুকর; যাদু-বিদ্যার সাহায্যে তিনি নাকি সম্রাটের বাহিনীকে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করান, প্রাচীনকালের হেলেনাকে লোকের চক্ষুগোচর করান ও তাঁকে বিবাহ করেন—তাঁদের এক পুত্র লাভ হয়; শয়তান নাকি এঁর সঙ্গে থাকতো একটি কালো কুকুরের রূপ ধরে'।—এই ফাউস্টকে ঘিরে বিচিত্র কাহিনীর উদ্ভব হয়, সে-সবে অজ্ঞাতসারে রূপ পায় মধ্যযুগের রেনেসাঁস-এর নব যুক্তি ও নব বিজ্ঞানের বিস্ময়।

এই ফাউস্ট-কাহিনী ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে লোক-নাটকের রূপ পায়—সেকালের থিয়েটারের দল এই নাটক দেখিয়ে বেড়াতো। তারই উপর নির্ভর করে এলিজাবেথীয় নাট্যকার মার্লো তাঁর বিখ্যাত "ডক্টর ফস্টাস" নাটক রচনা করেন—তাতে ফাউস্ট সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাই রূপ লাভ করে। মার্লোর এই নাটক গোটে পড়েছিলেন।

গোটে যখন তরুণযুবক তখন জার্মানীতে ফাউস্ট-এর কাহিনী নিয়ে নাটক লিখবার যেন হিড়িক পড়ে যায়। সে-সবের মধ্যে স্বনামধন্য জার্মানসাহিত্যরথী লেসিং-এর প্রচেষ্টাই উল্লেখযোগ্য। ফাউস্ট-উপাখ্যান নিয়ে যে অতি শক্তিশালী নাটক রচনা করা যায় এই অভিমত তিনি ব্যক্ত করেন, তাঁর মতে ফাউস্ট তাঁর অসীম জ্ঞানতৃষ্ণার জন্যে অভিশাপ নয় মুক্তিরই অধিকারী। কিন্তু লেসিং-এর নাটকের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। ফাউস্ট সম্বন্ধে এই নব ধারণার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সবল মনুষ্যত্বের এই শ্রেষ্ঠ পূজারী গোটের অগ্রণী। তবে মেফিস্টোফিলিসের সঙ্গে ফাউস্টের যে ধরনের চুক্তি হয় সেটি, বিখ্যাত মার্গারেটের বা গ্রেটশেন-এর উপাখ্যান, সর্বোপরি ফাউস্ট-উপাখ্যানে গোটে যে-ভাবে প্রতিবিম্বিত করান মানুষের আত্মিক ও ঐতিহাসিক জীবনের ব্যাপক ছবি, সে সবই তাঁর নিজস্ব।

ফাউস্ট-কাহিনী নিয়ে একটি রচনা খাড়া করবার কথা গোটে অল্প বয়সেই ভাবেন—উনিশ কুড়ি বছর বয়সে যখন তিনি দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করেন সেই সময়ে। কিন্তু এই চিন্তা তাঁর মনেই থেকে যায়। এর পর স্ট্রাসবুর্গে তাঁর অন্তরঙ্গ গুরু হার্ডারকেও এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন না। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

"ফাউস্ট-কাহিনী আমার অন্তরে বহু তানতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। আমিও অল্প বয়সে জ্ঞানের সব ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছিলাম, আর বুঝেছিলাম বিজ্ঞানের অসারতা। জীবন আমার চালিত হয়েছিল বিচিত্র পথে—কিন্তু বারবারই লাভ হয়েছিল দুঃখ আর অতৃপ্তি।"

স্ট্রাসবুর্গ থেকে ফ্রাঙ্কফোর্টে ফিরে ফ্রেডেরিকাকে (অনেকের মতে ইনিই অঙ্কিত হয়েছিলেন ফাউস্ট নাটকের মার্গারেট বা গ্রেটশেন রূপে) ত্যাগ করে আসার জন্য গোটে তীব্রভাবে অনুতাপ করেছিলেন; সেই কালেই এটি রচনায় তিনি হাত দেন; আর ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ভাইমার-যাত্রার পূর্বেই এর অনেকগুলি দৃশ্য লিখে ফেলেন। তারপর এটিতে তিনি হাত দেন ইতালিতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু সেখানে ডাকিনীদের দৃশ্যটি (ষষ্ঠ দৃশ্য) তিনি লিখতে পারেন, আর সম্ভবত বনের দৃশ্যটিও (চতুর্দশ দৃশ্য) লিখেছিলেন। ইতালি থেকে ভাইমার-এ প্রত্যাবর্তনের পরে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁর রচনাবলীর সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হয়, তাতে Urfaust বা আদি-ফাউস্ট অসম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ ফাউস্ট কারো মনোযোগ তেমন আকর্ষণ করে না, এমন কি শিলারেরও নয়। কিন্তু ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এক পত্রে শিলার গোটেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন তাঁর ফাউস্ট নাটক শেষ করতে কেননা অসম্পূর্ণ ফাউস্ট-এ তিনি সন্ধান পেয়েছেন যেন মস্তকহীন হারকিউলিস-মূর্তি (Torso of Hercules)। গোটে জানান, আপাততঃ ফাউস্ট-এ হাত দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়, তবে বন্ধু শিলারের আগ্রহের ফলেই ভবিষ্যতে এতে হাত দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে গোটে ও শিলারের সাহিত্যিক যোগ নিবিড় হয়; সেই সময়ে তাঁদের বিখ্যাত গাথা-সমূহ রচিত হয়। বিস্মৃতপ্রায় ফাউস্টও গোটের মনোরাজ্যে পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে—শিলারের সাহিত্য-তত্ত্ব এই সজীবতার সহায় হয়। এই কালেই উৎসর্গ (Dedication) নান্দী (Prelude on the stage), স্বর্গে প্রস্তাবনা (Prologue in Heaven) ইত্যাদি অংশ রচিত হয় ও সমগ্র পরিকল্পনাটি নতুন রূপ গ্রহণ করে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এটি প্রায় এর বর্তমান রূপ পায়। তারপর গ্যেটে ও শিলারের অসুস্থতা, শিলারের মৃত্যু ও গ্যেটের শোকের কাল। অবশেষে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ইস্টারে এটি প্রকাশিত হয়।

এই জগদ্বিখ্যাত নাট্যকাব্যের টীকা ভাষ্য এত বিস্তৃতভাবে হয়েছে, এত ভাবুক ও পণ্ডিত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন যে এর পরিচয় দানের চেষ্টায় স্বতঃই কুণ্ঠিত হতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিত-সমাজ গ্যেটের অন্ততঃ এই কাব্যের সঙ্গে কিছু পরিচিত। সেই পরিচয় আরো গভীর ও ব্যাপক হবে আশা করি, কেননা সমগ্র ফাউস্ট যোগ্যভাবে বুঝতে পারা আর গ্যেটের মতো মহাকবির সৃজনী-প্রতিভা ও জীবন-সাধনা বুঝতে পারা প্রায় তুল্য মর্যাদার।—প্রধানতঃ বেয়ার্ড টেইলর ও মিস আনা সোয়ানউইকের ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে আমরা এই পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি।

প্রথমে উৎসর্গ। উৎসর্গে কবি স্মরণ করেছেন তাঁর অতীত আনন্দ ও বেদনা-মুহূর্তসমূহের কথা, তাঁর অতীতের বন্ধুদের কথা—যে সবের সঙ্গে জড়িত তাঁর এই কাব্য। সেই সব স্মৃতি আর তাঁর নব সৌন্দর্যবোধ যুগপৎ তাঁর চিত্তে আঘাত হানছে।

নান্দীতে সূত্রধার কবি ও বিদূষকের মধ্যে বাদানুবাদ হচ্ছে কি ধরণের নাটক দেখানো যাবে তাই নিয়ে। সূত্রধার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বাস্তববাদী; জনসাধারণকে কি ভাবে আকৃষ্ট করা যায়, আয় যথেষ্ট হয়, এই তাঁর প্রধান ভাবনা; কবিকে তিনি বলছেন—

…জনসাধারণকে খুশী করা যায় কি দিয়ে তা আমি জানি ;
…কিন্তু এরা আবার পড়াশুনা করেছে ঢের ;
কেমন করে' এমন জিনিস এদের সামনে ধরা যায় যা খুব চটুল ও নতুন ?
আর সেই সঙ্গে অর্থপূর্ণও বটে রসালও বটে ?
…দেখে খুশী লাগে কেমন দলে দলে এরা আসছে,
…দুর্ভিক্ষের দিনে রুটি নিয়ে যেমন কাড়াকাড়ি পড়ে যায়
তেমনি মারামারি এরা লাগিয়েছে টিকিট কেনা নিয়ে।

কবি সৌন্দর্য-ধ্যানী, জনগণের আচরণে তাঁর সেই সৌন্দর্য-বোধ আহত ; তিনি বলছেন—

ঐ বহু-বর্ণের জনতার কথা আর আমাকে বলো না,
ওদের দেখেই আমার গানের আগুন যায় নিভে !
এই বিরাট জনস্রোত থেকে আবৃত করো আমার দৃষ্টি,
এদের স্রোতোবেগ আমাদেরও নিয়ে যায় ভাসিয়ে !
স্থান দাও বরং আমাকে স্বর্গীয় নিস্তব্ধতায়
যেখানে কবির চার পাশে ফোটে বিমল আনন্দ—
যেখানে প্রেম ও বন্ধুর আলো
সম্পর্ক ও স্নেহভাবে দান করে দিব্য প্রভা !
সেই পরিবেশে গভীরতম অনুভূতি থেকে উদ্গত হয় অর্ধস্ফুট বাণী,
ভীরু ওষ্ঠে হয় প্রকম্পিত—
বার বার হয় ব্যর্থ, কখনো লাভ করে প্রকাশ—
উদ্দাম মুহূর্ত আবার যায় তলিয়ে ;
অথবা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে
অবশেষে লাভ করে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ ;
যা চোখ-ঝলসানো তা নিমেষেতেই যায় মিলিয়ে,
যা নিখুঁত তা রয়ে যায় অনাগত কালের জন্য।

বিদূষকও বাস্তববাদী, কিন্তু মানুষের মহত্তর সম্ভাবনায় বিশ্বাসহীন নন ; কবির সুদূরনিবদ্ধ দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করছেন নিকটের বস্তুর দিকে—

অনাগত কাল ! ও কথা শুনতে রাজি নই আমি।
যদি অনাগত কালের কথাই বলে চলি, তবে
আজকার আনন্দ পাবে কোথা থেকে ?
আর যে ওদের চাই-ই কোনো ভুল নেই তাতে।
…যে নিজের স্বভাব আনন্দে ঢেলে দিতে পারে
জনসাধারণের খেয়ালিপনায় সে বিরক্ত হয় না ;
যত বেশী লোকের সংস্পর্শে সে আসে
তত বলপ্রদ হয় তার প্রেরণা।
অতএব সাহসে বাঁধো বুক, দাও খাঁটী কিছু,
কল্পনা আসুক তার সব সঙ্গী নিয়ে—
অর্থ চিন্তা অনুভূতি আবেগ সব হোক একত্র—
কিন্তু ভুলোনা সেই সঙ্গে নির্বুদ্ধিতারও কথা !

বিদূষকের কথায় সূত্রধার নিজের কথার সমর্থন পাচ্ছেন, তিনি বলছেন—

বেশী করে চাই কিন্তু ঘটনা ;
ওরা আসে দেখতে, কিন্তু চায় বিস্মিত হতে।
সব কিছু ছুঁড়ে দাও ওদের সামনে,
হাঁ করে থাকুক ওরা চোখ মেলে ;
বহুবিস্তারের দ্বারাই তাহলে যাবে জিতে
আর হবে সব চাইতে জনপ্রিয়।
জনতার মন পেতে পারো শুধু বহু কিছু দিয়ে ; কেননা
যার যেটুকুতে দরকার অবশেষে সে তাই নেয় বেছে ;
যে দেয় বহু কিছু সে যোগায় বহুর প্রয়োজন,
প্রত্যেকে বাড়ী যায় খুশী হয়ে সেই দৃশ্য দেখে।
যদি টুকরা-টাকরা কিছু থাকে, তাই দাও,
তাতেই হবে সিদ্ধি……
পূর্ণাঙ্গ কিছু দেবার কি প্রয়োজন ?
তোমার শ্রোতারা ত তা পেলে টুকরো টুকরোই করে ফেলবে ?

কবি নিজের এমন অপব্যবহারের আশঙ্কায় ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন, তিনি বলছেন—

…এমন জোড়াতাড়ার কাজ করে নকল শিল্পী,
দেখছি তাতেই তোমার অভিরুচি।

সূত্রধার এইবার মানুষের কদর্য রুচির দিকে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন—

এ তিরস্কারের ধার নেই আদৌ ;
যে কিছু করতে চায়
তাকে ব্যবহার করতে হয় যোগ্য উপকরণ।
…ভেবে দেখো লিখছো কাদের জন্য !
তাদের কেউ এসেছে তিক্ত বিরক্ত হয়ে, কেউ পরিতৃপ্ত হয়ে,
আর কেউ এসেছে, হায় ভাগ্য,
দৈনিক কাগজ পড়া শেষ করে'……
…মহিলারা এসেছেন দেহ-সৌষ্ঠব আর সজ্জা নিয়ে
বিনি পয়সায় দেখিয়ে যাচ্ছেন তাদের অভিনয়।
বড় বড় কবিদের স্বপ্ন কত দেখবে ?
ঘর বার যা ভর্তি হচ্ছে দেখে কি খুশী নও ?
যারা তোমাদের অনুগ্রাহক তাকিয়ে দেখ একবার
তাদের মুখের পানে !
তাদের অর্দ্ধেক বর্বর বাকি অর্দ্ধেক উদ্দীপনাহীন।
অভিনয়ের শেষে তাদের কেউ যাচ্ছে তাস খেলতে ;
কেউ যাচ্ছে প্রিয়াকে নিয়ে উদ্দাম রজনী যাপন করতে।
হায় নির্বোধ কবিগণ, কেন এই জন্য
উত্ত্যক্ত করো করুণাময়ী সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীদের ?
আমি বরং বলি বেশী দাও যত পারো বেশী দাও—
তাতেই লাভ হবে অর্থ আর প্রতিপত্তি।

বিতরণ করে দাও তোমার দর্শকদের !
তাদের খুশী করাই হচ্ছে কাজ।—
অথচ বোধ করছ বড় ? দুঃখে, না সুখে ?

কবি বুঝে নিলেন সূত্রধারের পথ তাঁর পথ নয় ; তিনি অবলম্বন করলেন কবিদের ধ্যান—

খুঁজে নাও বরং অনুগততর দাস !
কবি প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছে
শ্রেষ্ঠ মানবতা, পরম অধিকার—
সেই অধিকার এমনভাবে নিয়োজিত হবে তোমার ধনবৃদ্ধিতে ?
কোন্ শক্তি বলে পেয়েছে সে মানুষের অন্তরের উপরে তার প্রভাব ?
কেমন করে জয় করলে সে জীবনের (দুরন্ত) শক্তি-নিচয় ?
তার অন্তর চায় জগতে দূরে দূরান্তে ও নিকটে যা-কিছু আছে
সব একসূত্রে বাঁধতে—শুধু সেই আকাঙ্ক্ষায় যায় না কি ?
...জগৎ ও জীবন-যন্ত্র নিত্যকাল যে বেসুর বাজে
কে সেই বেসুরে এনে দেয় সুর-সুষমা ?
প্রতি খণ্ড সুরকে তুলে ধরে সমগ্রতার বিরাট গৌরবে ?
ঝড়ে কে দেখে হৃদয়াবেগের উদ্দামতা ?
সন্ধ্যার ঔজ্জ্বল্যে কে দেখে একাগ্র চিন্তার দীপ্তি ?
বসন্তে কে সব চাইতে সুন্দর ফুল
ছড়ায় প্রিয়ার পদচারণার পথে ?
পথের পাশের সবুজ পাতা দিয়ে কে তৈরি করে
প্রতি কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের শিরে গৌরব-মুকুট ?
স্বর্গকে করে ধ্রুব, বিভিন্ন দেবশক্তিকে করে ঐক্যবদ্ধ ?
মানুষের মহিমা যেন মূর্ত কবিজনে !

বিদূষক কবির এই সৌন্দর্য-বোধ প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজে—

তাহলে এই সব মনোরম ক্ষমতার সম্মেলন হোক
মহৎ কাব্য-চেষ্টার,
যেমন ঘটে প্রেমের ব্যাপারে !
দুজনে দেখা হলো দৈবক্রমে, লাগলো ভাল, এক সঙ্গে কাটলো কিছুক্ষণ,
অজ্ঞাতসারে মন পড়লো বাঁধা, এলো জটিলতা,
এই স্বর্গসুখ, এই যন্ত্রণা—
প্রেম হলো পূর্ণাঙ্গ কেমন করে' হলো তা জানবার পূর্বেই।
অভিনয় করা যাক তেমনি একটি নাটক !—
সাহসে ঝাঁপ দাও জীবন-সমুদ্রে—সন্ধান কর এর তলকূল ;
জীবন অতিবাহিত করে সবাই, কিন্তু বোঝে একে কম লোকেই ;
এর যেখানেই স্পর্শ করবে বোধ করবে অসীম কৌতূহল।
ছবিগুলো বিচিত্রবর্ণ, অর্থ অস্পষ্ট,
ভুলের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সত্যের রশ্মি,
—এই ভাবেই তৈরি হয় শ্রেষ্ঠ রস-মদিরা,
তাতেই উল্লসিত হয় উদ্দীপ্ত হয় জগতের লোক।
তোমার নাটক দেখতে আসবে সুদর্শন তরুণ তরুণী,
ধ্যান করবে একে যেন দৈববাণী।
তাদের কচি কোমল মন,
তোমার রসচক্রে তারা পান করবে বেদনা-মধু ;
এই এখন একজন তখন আর একজন দর্শনই হবে তোমার দ্বারা,
প্রত্যেকেই তোমার লেখায় দেখবে তার অন্তরের ছবি।
হাসাবে কাঁদাবে তুমি তাদের অবলীলাক্রমে,
যা মহৎ তা জাগাবে তাদের বিস্ময়, যা রহস্যময় বাসবে তাকে তারা ভাল ;
যারা পরিপক্ক ভদ্রলোক তাদের পারবে না তুমি খুশী করতে ;
যারা বিকাশোন্মুখ তারা হবে তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

কবি এতে উৎসাহিত হলেন, তিনি বললেন—

তাহলে ফিরিয়ে দাও আমাকে সেই সুখের দিন,
যে দিনে বিকাশের আনন্দে আমি গেয়েছি গান ;—
যে দিনে ছন্দ আমার অন্তর থেকে উৎসারিত হতো
নৃত্যপরা ঝরণা-ধারার মতো !
জগৎ সেদিন আমার চোখে ছিল বাষ্প-বাদল ঘেরা,
প্রতি কুঁড়ির কুঁড়ি ছিল বিস্ময়পূরিত,
উপত্যকায় উপত্যকায় চয়ন করে ফিরেছি কুসুম !
ছিল না আমার কিছুই কিন্তু ছিলাম সমৃদ্ধ তখন—
ছিল মোহে আনন্দ, ছিল সত্যের দুর্জয় তৃষ্ণা।
দাও ফিরিয়ে দাও আমার সেই দিনের অনুভূতি,
সেই দিনের ব্যথা-ছোঁওয়া আনন্দ,
ঘৃণার তীব্রতা আর প্রেমের তন্ময়তা,—
দাও, ফিরিয়ে দাও আমার সেই যৌবন !

বিগতযৌবন কবির এই যৌবন ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় বিদূষক প্রসঙ্গে রসিকতা করলেন—

বন্ধু, যৌবনে তোমার নিশ্চয়ই প্রয়োজন
যখন যুদ্ধে পড়েছ শত্রুর হাতে,
কিংবা যখন তরুণী তোমাকে নিবেদন করছেন প্রেম...

কিন্তু পরে কাজের কথা তুললেন—

কিন্তু তোমার পরিচিত বাঁশী যদি বাজাতে চাও
সমস্ত প্রাণ দিয়ে—নৈপুণ্য দিয়ে উৎসাহ দিয়ে,
সেই সঙ্গে ছন্দ চলেছে সাবলীল ভঙ্গিতে বহু দূরে ফিরে
নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে—
তবে, বৃদ্ধ কবিগণ, তোমাদেরই তা সাজে ভাল ;
তোমাদের মর্যাদা তাতে কমে না কারো ;
কথায় বলে বুড়ো হলে লোকে হয় শিশু, কিন্তু তা সত্য নয় ;
খাঁটি শিশুই আমরা থেকে যাই বুড়ো কালেও।

সূত্রধার এইবার আরম্ভ করতে চাচ্ছেন তাঁর অভিনয়—

...কথায় তোমরা দুজনেই বড়, চেষ্টা কর বরং কাজে নামতে।
প্রেরণার কথা কি বলবো ? প্রেরণা দ্বিধার সহচরী নয় কখনো।
যদি কাব্যই হয়ে থাকে তোমার পেশা,
তবে মানুক কাব্য তোমার হুকুম !......
...আজ যা করা হলো না, কাল আর তা হবে না।
এগোও সামনের দিকে শ্রান্ত না হয়ে,—
...যা সম্ভবপর তাকে অকম্পিত প্রভাতে
দৃঢ় মুষ্টিতে ধরুক সংকল্প, তাহলে আর শিথিল হবে না সেই মুষ্টি ;
কাজ তখন চলবে কেন না চালানো চাই-ই।
আমাদের এই জার্মান রঙ্গমঞ্চে, জানো তুমি,
করে যার যার যা খুশী ; চিত্রপট, কারিকুরি, যত খুশী খাটাও,
দেখিয়ে যাও যা হাতের কাছে পাও !
সূর্য চন্দ্র তারা, গাছ পাখী পাহাড়,
আগুন জল অন্ধকার, দিন আর রাত !
আমাদের এই পরিমিত রঙ্গমঞ্চে আসুক সব,
দেখানো হোক সৃষ্টির চক্র, উৎসুক কল্পনার বলে, বেগে,
স্বর্গ থেকে, মর্ত্যের ভিতর দিয়ে, রসাতলে !
এই শেষ ছত্র বলেছে যে নাটক দেখানো হচ্ছে তার পূর্বাভাস।

আত্তের ও ফ্রোতে বলেছেন সম্ভবতঃ কালিদাসের শকুন্তলার নান্দীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে গেটের নান্দী।

কবি, কাব্য, কাব্যের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক, ইত্যাদি বিষয়ে অনেক গভীর কথা, অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব, এই নান্দীতে প্রকাশ পেয়েছে।

(ক্রমশঃ)

জঙ্গম

বনফুল

১৩

পাড়ায় 'রাস-লীলা' হইতেছে। বুকীকে লইয়া অমিয়া শুনিতে গিয়াছে। শঙ্কর নিজে যদিও এই 'রাস-লীলা'র একজন উৎসাহী পৃষ্ঠ-পোষক কিন্তু শরীরটা তেমন ভাল নাই বলিয়া যায় নাই—বারান্দায় আরাম কেদারায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। তাহার অভাবে 'রাসলীলা' উৎসবের এতটুকু অঙ্গ-হানি যে হইবে না তাহা সে জানে। ক্রমশই এই কথাটা সে উপলব্ধি করিতেছে যে যাহাদের আমরা 'মাস' অর্থাৎ জনসাধারণ বলি তাহাদের সহিত অন্তরের যোগ-রক্ষা করা কত কঠিন। আমাদের অন্তরে উহাদের স্থান নাই, উহাদের অন্তরেও আমাদের স্থান নাই। আমরা উহাদের অনুগ্রহ করি উহারা আমাদের সেলাম করে—সম্পর্ক শুধু এইটুকু। উহাদের উৎসব আমাদের অনুপস্থিতিতে অঙ্গহীন হয় না, আমাদের উৎসব উহাদের যোগদানের অপেক্ষা রাখে না। আমরা ভিন্ন জাতের লোক—আমরা পর। আমরা যে উহাদের হিতার্থে এত করি তাহা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া, আন্তরিক আবেগ-বশত নহে।

সহসা কৃষ্ণলার কথা শঙ্করের মনে পড়িল। সেদিন যদিও তাহার সহিত মতের কিছুমাত্র অমিল হয় নাই তবু কেমন যেন খটকা লাগিয়াছিল। কেমন অদ্ভুত যেন মেয়েটি। ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়া উলটা কথা বলিবার ঝোঁকটা যেন বড় বেশী রকম উগ্র। কথাবার্ত্তা যেন তীক্ষ্ণ তীরের মতো। তীরন্দাজের লক্ষ্য-ভেদ-শক্তি দেখিয়া চিত্ত কিন্তু আনন্দিত হয় না, তীরের ফলাটা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া বক্ষস্থল বিদ্ধ করে। উহার যুক্তি মানিলেও—উহার কথাবার্ত্তার ধরণ—উহার দলিতা-ফণিনী মূর্ত্তি দেখিয়া উহাকে আপন লোক বলিয়া মানিতে মন ইতস্তত করে। কৃষ্ণলার মনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গোল আছে—ইংরেজি ভাষায় যাহাকে 'কমপ্লেক্স' বলে। বেলা মল্লিকের কথাও মনে পড়িল। মেয়েটা পুরুষ-বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিলাতে কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে কে জানে! নারী-বেশে সমাজে থাকিতে পারিল না? কেন পারিল না? পাছে পুরুষের সংস্পর্শে আত্মসম্মান আহত হয়? পুরুষের বাহুপাশে কিছুতেই ধরা দিব না এ অসম্ভব প্রতিজ্ঞার দুর্গে অস্বাভাবিক একটা আত্মসম্মানকে বাঁচাইয়া রাখার অর্থ কি! কোন একজন পুরুষের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিলেই তো হইত! এত অহঙ্কার কিসের? মনোমত পুরুষ জুটিল না! মনোমত আহার না জুটিলে কি অনাহারে থাক, মনোমত শয্যা না জুটিলে কি অনিদ্রায় কাটাও—বিবাহের বেলাতেই বা এত বিচার কেন? শঙ্করের মনে হইল আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে সকলেই একটা অস্বাভাবিক আদর্শের পিছনে ছুটিয়াছে। কৃষ্ণলা পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিরোধী। কিন্তু তাহার বিরোধিতাটাই কেমন যেন প্রতিক্রিয়া-ক্লিষ্ট হিংস্র মূর্ত্তি ধরিয়াছে। ইহার অন্তরালে ক্ষোভের একটা গ্লানি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে যেন। একজন মাতালের কথা মনে পড়িল। সে হুইস্কি পান করিয়া যতক্ষণ নেশা থাকিত ততক্ষণ কুৎসিত ভাষায় হুইস্কিকেই গালাগালি দিত। উপরন্তু বিলাতী সুরাকে সম্বোধন করিয়া বলিত—ওরে শালা হুইস্কি, তুই কি ভেবেছিস তুই মস্ত বড় একটা কিছু? তুই তো ছেলেমানুষ রে ব্যাটা! সোমরসের নাম শুনেছিস্? মাধ্বী, গৌড়ী পৈষ্টীর কথা জানিস? এদের কাছে তুই তো একটা অপোগণ্ড নাবালক রে—! কৃষ্ণলারও বোধহয় সেই দশা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সে সর্ব্বান্তঃকরণে সেই শিক্ষারই বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। কেন? পাশ্চাত্য শিক্ষায় কি আমাদের কোন লাভই হয় নাই? আমাদের এই জাতীয়তা-বোধ আমরা কোথা হইতে পাইলাম? সহসা শঙ্করের মনে হইল এই জাতীয়তা-বোধ জিনিসটা যে ভাবে আমরা চর্চ্চা করিতে শিখিয়াছি তাহা সত্যই কি ভাল? এই জিনিসটাকে কেন্দ্র করিয়াই তো আধুনিক মানবের নীচতা হীনতা ক্ষুদ্রতা সমস্ত বীভৎসরূপে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। একটা বড় নামের আড়ালে ইহা কি স্বার্থপরতারই জঘন্যতম রূপ নয়? ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য তাহার ব্রাহ্মণত্বে। সে ব্রাহ্মণত্ব এখন অবলুপ্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারই আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাই কি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? বর্ব্বরসুলভ এই হানাহানির আদর্শে ভারতীয় প্রতিভা কি স্বচ্ছন্দে স্ফূর্ত্তি পাইবে? ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কি শঙ্কর চিন্তা করিতে লাগিল। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—ইহাই কি ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণের শেষ কথা? কিছুই কিছু নয়—সবই মায়া—জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো এই সংসার ত্যাগ কর—এষণা মুক্ত হও—ইহাই যদি ভারতীয় ঋষির নির্দ্দেশ হয় জাতীয়-পতাকা আস্ফালন করিয়া তাহা হইলে এ সব পণ্ড-শ্রম কেন। সমাজ-সংস্কারেরই বা প্রয়োজন কি! যাহা মন্দ তাহা কালক্রমে আপনিই ভাল হইবে—সত্য-শিব-সুন্দর যথাস্থানে যথাসময়ে নিজেকে প্রস্ফুটিত করিবেন—অলীক অবিদ্যা মিথ্যা মরীচিকাবৎ আপনি বিলুপ্ত হইবে। আমি ছটফট করিয়া মরিতেছি কেন! আমি কে? কি ক্ষমতা আছে আমার! পরক্ষণেই শঙ্করের মনে হইল সংসারটা যে মায়া-মরীচিকা ইহা আমাদের জীবনের মূল-মন্ত্র সন্দেহ নাই কিন্তু এই মন্ত্রে বিহ্বল হইয়া হিন্দু সভ্যতা জড়ত্বকে কখনও প্রশ্রয় দেয় নাই। সত্যসত্যই যে ব্যক্তি তপস্যা-দ্বারা সংসারের নশ্বরত্বকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে সেই তপস্বী মহাপুরুষ হিন্দুসমাজের শিরোমণি—কিন্তু সকলেই শিরোমণি হইবার যোগ্যতা-লাভ করিতে পারে না। সকলের সে অধিকারও নাই। সমাজের অধিকাংশ লোকই সাধারণ লোক। তাহারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে বাস করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও ব্রাহ্মণেরাই করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ-সমন্বিত হিন্দুসমাজে গুণানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য সুনির্দ্দিষ্ট আছে। দ্রোণাচার্য্য ও পরশুরামের কথাও শঙ্করের মনে পড়িল। উঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তপস্যাও করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনের সময় অস্ত্রচালনা করিয়া শত্রু হনন করিতেও

পশ্চাৎপদ হন নাই। শঙ্কর যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভারতীয় আদর্শ তাহা হইলে নিছক মায়াসর্বস্ব নির্বেদ নয়! উহাতে বশিষ্ঠ পুরুষকারেরও স্থান আছে। উহাতে স্থান নাই কেবল মূঢ় আসক্তির—যে আসক্তি মানুষের হিতাহিত জ্ঞান অবলুপ্ত করে। সংসারকে মায়াময় জানিয়াও নিঃস্বার্থ নিরাসক্ত চিত্তে সমাজের হিতার্থে প্রত্যেককে স্বকর্তব্য করিতে হইবে—ইহাই আমাদের জাতীয়তা। বর্ত্তমান যুগের স্বার্থপঙ্কিল পরস্বলোলুপ ন্যাশানালিজ্‌ম্ আমাদের ন্যাশানালিজম্ নহে। আমাদের সঙ্কীর্ণতা নাই, কারণ আমরা জানি সংসার মায়াময়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রত্যেকেই জানে সংসার মায়াময়—অথচ প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে স্বকর্ত্তব্য সাধন না করিলে এই মায়াপাশ ছিন্ন করা যাইবে না। নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে—গত্যন্তর নাই। ইহাই আমাদের সনাতন আদর্শ—ইহাই আমাদের কর্তব্য। অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ও বিশ্বাস করিবে সংসার অনিত্য—তবু সে যুদ্ধ করিবে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মান-রক্ষার জন্য, আদর্শ ও কর্ত্তব্যের জন্য—নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নহে।

স্বার্থ-সংকীর্ণতা-মুক্ত নিরাসক্তচিত্ত নিষ্কাম কর্তব্যপরায়ণ সমাজ এ যুগে স্থাপন করা কি সম্ভব? কেন সম্ভব নয়! শিক্ষা দ্বারা সবই সম্ভব। শিক্ষাই গোড়ার কথা। সমস্ত দেশের চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা"—রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল। অন্ধকারে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া রহিল। ভারতের সনাতন আদর্শকে নূতন করিয়া প্রাণের মধ্যে পাইয়া তাহার সমস্ত সত্তা যেন চরিতার্থ হইয়া গেল। শান্ত শুভ্র উদার বিরাট একটা অনুভূতি তাহার দেহমনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল এমন সময় বাইসিক্লের ঘণ্টার শব্দে সচকিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল।

"কে!"

কুণ্ঠিত কণ্ঠে উত্তর আসিল—"আমি নিমাই"

"ও, নিমাই—এস। এত রাত্রে হঠাৎ কি মনে করে"

"কোন খবর না দিয়ে মোটরে করে' স্কুল ইনস্পেক্টর এসেছেন একটু আগে। কাল আমাদের স্কুল দেখবেন। আপনাদের অ্যালুমিনিয়মের ডেক্‌চিটা একবার চাই—"

"কেন, কি হবে?"

"মুরগি রাঁধতে হবে তাঁর জন্যে—"

একটু ইতস্তত করিয়া নিম্নকণ্ঠে নিমাই বলিল, "মদও চাইছেন। এত রাত্রে মদ কি পাওয়া যাবে?"

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল। শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া প্রথমেই মুরগি ও মদের ফরমাস করিয়াছেন! দেশের শিক্ষার আদর্শ-নিয়ন্ত্রণের ভার ইহার উপর! আদর্শ চুলায় যাক—লোকটার চক্ষুলজ্জাও কি নাই—! টুর করিবার জন্য উচ্চহারে ভাতা পান অথচ গরীব শিক্ষকের বাড়িতে আসিয়া চড়াও হইয়াছেন।

"কোথা উঠেছেন?"

"হেডমাষ্টারবাবুর বাসায়"

শঙ্করের ইচ্ছা হইল এখনি গিয়া লোকটাকে কড়া কড়া দুই চারি কথা শুনাইয়া দেয়। কিন্তু এ আবেগ তাহাকে সম্বরণ করিতে হইল। এই লোকটাকেই তোয়াজ করা হয় নাই বলিয়া কাঁটা-পোখর স্কুলটা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এবারেও যদি ইহাকে তোয়াজ না করা হয় হীরাপুর স্কুলটার হয়তো সর্ব্বনাশ করিয়া দিবে। তাছাড়া নিমাই ঘটকের মুখ চাহিয়াই তাঁহাকে খুশি করা প্রয়োজন। সে আই-এ ফেল, অথচ হেড পণ্ডিতি করিতেছে। শঙ্করই তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে। হেড পণ্ডিতি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে, কিন্তু ব্যাপারটা আইন-সঙ্গত নয়। ইনস্পেকটার রুষ্ট হইলে কলমের এক খোঁচায় তাহার চাকরি চলিয়া যাইতে পারে!

"এ তো এক আচ্ছা মুশকিল দেখছি—"

"এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করবার ইচ্ছে ছিল না। আমি প্রথমে কেনারামবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানেও আজ মাংস রান্না হচ্ছে। হৃদয়বল্লভবাবু এসেছেন কিনা কোলকাতা থেকে—"

যদিও অন্ধকারে শঙ্কর নিমাই ঘটকের মুখ দেখিতে পাইতেছিল না তবু তাহার কণ্ঠস্বরে মনে হইতেছিল নিজের চাকরির জন্য সকলকে বিরক্ত করিতে হইতেছে বলিয়া বেচারা যেন সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছে। ইনস্পেকটার আসিয়া রাত দুপুরে মদ মাংস দাবী করিয়াছে—ইহা যেন তাহারই অপরাধ। ভারতীয় আদর্শে প্রত্যেক নরনারীর মন শিক্ষাসমৃদ্ধ করিতে পারিলে দেশের যে জাগরণ হইবে এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নে শঙ্কর তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিল। সহসা সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। আদর্শের তুঙ্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া নিমাইকে আশ্বাস দিতে হইল—"তার জন্যে কি হয়েছে, তুমি যাও আমি সব ব্যবস্থা করছি—"

নিমাই তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

"তুমি যাও, মুশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি—"

নিমাই চলিয়া গেল।

"মুশাই—"

মুশাই পাশেই কোথাও ছিল—ছায়ামূর্তির মতো আসিয়া দাঁড়াইল।

"দুটো মুরগি বেঁধে হীরাপুরে এখুনি দিয়ে আসতে হবে। আর এক বোতল মদ। জোগাড় করতে পারবি?"

"হাঁ হুজুর"

শঙ্কর টাকা বাহির করিয়া দিল।

"হীরাপুরে হেডমাষ্টারবাবুর বাসায় দিয়ে আসতে হবে—"

মুশাই চলিয়া গেল। শঙ্কর নিস্তব্ধ হইয়া ইজিচেয়ারে পড়িয়া রহিল।

১৪

অলক্ষ্যে আর একটা মেঘও ঘনাইতেছিল।

কেনারাম চক্রবর্ত্তী, ভূতপূর্ব্ব জমিদার অরুণবল্লভের একমাত্র পুত্র হৃদয়বল্লভ এবং বিখ্যাত মহাজন রাজীব দত্ত কেনারাম চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া নিম্নকণ্ঠে আলাপ করিতেছিলেন।

জমিদারি বিক্রয় হইয়া যাইবার পর হৃদয়বল্লভ কলিকাতা হইতে অদ্য প্রথম আসিয়া গ্রামে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহাও

গোপনে, গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানে না। রাত্রিবাস মাত্র করিয়া কাল পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। প্রাক্তন নায়েব বন্ধুপ্রতিম কেনারাম চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছেন। এতদিন কেনারাম চক্রবর্ত্তী এবং কেনারাম চক্রবর্ত্তীর মারফত রাজীব দত্তের সহিত পত্রযোগে তাঁহার যে সব নিগূঢ় মন্ত্রণা চলিতেছিল সাক্ষাতে সেগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করিবার জন্যই তিনি আসিয়াছেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে রামবল্লভ মারা গিয়াছেন। কলিকাতার নানা ঘাটের নানা জল আস্বাদন করিয়া, শেয়ার-মার্কেটে লোকসান দিয়া এবং চিকিৎসা ব্যাপারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কৃষ্ণবল্লভ অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে কলিকাতায় থাকা তাঁহার পোষাইবে না। তাঁহাকে গ্রামেই পুনরায় ফিরিতে হইবে। কিন্তু যে গ্রামে এতদিন তিনি জমিদার ছিলেন সে গ্রামে প্রজারূপে—বিশেষ করিয়া সেদিনকার ছোঁড়া উৎপল এবং শ্বশুরের আধিপত্যে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। গ্রামে ফিরিতে হইলে জমিদার-রূপেই ফিরিতে হইবে। কিন্তু তাহাও প্রায় অসম্ভব। কি করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে তাহারই জল্পনা-কল্পনা পত্রযোগে এতকাল চলিতেছিল, কিন্তু এমন ঢিমা চালে চলিতেছিল যে কৃষ্ণবল্লভ আর ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারেন নাই অবিলম্বে ইহার একটা 'ফয়সলা' করিয়া ফেলিবার জন্য সশরীরে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষেই কেনারাম রাজীব দত্ত এবং প্রমথ ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রমথ ডাক্তার এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই।

রাজীব দত্তই প্রধান ভরসা। কৃষ্ণবল্লভ নিজে প্রায় কপর্দ্দক-হীন। কেনারামের প্ররোচনায় রাজীব দত্ত সম্পূর্ণ জমিদারিটি মর্টগেজ রাখিয়া শতকরা পাঁচ টাকা সুদে আড়াই লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিতে রাজি হইয়াছেন। তিনজনেই পাকা লোক, তিনজনেরই উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কৃষ্ণবল্লভ অপুত্রক এবং বিপত্নীক। পত্নী পুত্র উভয়েই কিছুকাল পূর্ব্বে যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছেন। তিনি নিজেও যক্ষ্মাগ্রস্ত, আর বেশী দিন বাঁচিবার আশা নাই। যে কয়দিন বাঁচিবেন পরের টাকায় জমিদারিটি ক্রয় করিয়া ভোগ করিতে চান। যদি ঋণশোধ করিতে না পারেন জমিদারি না হয় রাজীবলোচনের হস্তগত হইবে—তাহাতে তাঁহার কি আসে যায়—উত্তরাধিকারী তো কেহ নাই। নিজের জীবনটা ভদ্রভাবে কাটিলেই যথেষ্ট।

কেনারামের উদ্দেশ্য—কমিশন। চার বৎসর পূর্ব্বে রামবল্লভ যখন দেনার দায়ে জমিদারিটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তখন রামবল্লভ এবং উৎপল উভয়েরই হিতৈষী সাজিয়া তিনি উভয় পক্ষের নিকট হইতে একুনে প্রায় হাজার দশেক টাকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এসব বিষয়ে সত্যই তিনি ক্ষমতাবান পুরুষ। হিতৈষী সাজিতে অদ্বিতীয়। হিতাকাঙ্ক্ষায় কখনও কড়া কথা বলিয়া কখনও স্পষ্টভাষণ করিয়া কখনও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া কখনও সান্ত্বনা দিয়া তিনি এমন একটা অভিনয় করিতে পারেন যে তাঁহার ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি মনোভাব সব সময়ে সকলে বুঝিতেও পারে না। পারিলেও রাগ করিতে পারে না, রাগ করিলেও তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার উপায় থাকে না—এমন পরিচ্ছন্ন তাঁহার কার্য্যবিধি। কোন কিছুতেই কখনও নিজেকে এমনভাবে জড়াইয়া ফেলেন না যাহাতে আইনত তাঁহাকে দোষী প্রতিপন্ন করা যায়। জমিদারি পুনঃক্রয়ের বাসনাটি আভাসে ইঙ্গিতে তিনিই একদা কৃষ্ণবল্লভের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। কথাটি ছিল এইরূপ—"তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল হয় জমিদারিটা তুমি যদি আবার ফিরে পাও—ফিরে পাওয়া শক্ত অবশ্য—কিন্তু চেষ্টা করলে হয় তো"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি থামিয়া গিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে স্ফুলিঙ্গটি যখন কৃষ্ণবল্লভের অন্তরে শিখারূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল—যখন কৃষ্ণবল্লভ জমিদারি ফিরিয়া পাইবার জন্য কেনারামকে ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিলেন তখন অনেকটা যেন বিপন্ন হইয়াই প্রাক্তন সম্বন্ধের খাতিরে তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে রাজি হইলেন। কিন্তু চেষ্টাটা এমন মন্দ গতিতে করিতে লাগিলেন যে কৃষ্ণবল্লভ অবশেষে স্পষ্ট করিয়া লেখা সমীচীন মনে করিলেন—"তুমি চেষ্টা করিয়া জমিদারিটি যদি উৎপলের কবল হইতে নির্ব্বিরোধে পুনরুদ্ধার করিতে পার তোমার ন্যায্য পারিশ্রমিক তোমাকে আমি দিব। জমিদারির মূল্য এবং তোমার পারিশ্রমিক—এই সমস্ত টাকাটাই তুমি রাজীব দত্তের নিকট হইতে কর্জ্জ কর—"। কেনারাম উত্তরে লিখিলেন—"পারিশ্রমিকের জন্য কিছু আসিয়া যায় না—পরিশ্রম করিলে অবশ্য কিছু পারিশ্রমিক লইতেই হয়—তবে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা। তোমার ক্ষেত্রে টাকাটাই বড় নয়। দেখি কত দূর কি করিতে পারি—"

বলা বাহুল্য কেনারাম আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং সত্য সত্যই চেষ্টা করিয়া খানিকটা সফল-কামও হইয়াছিলেন। আর কিছু না হোক—রাজীবলোচন তো রাজি হইয়াছে।

কুসীদজীবী রাজীবলোচনের উদ্দেশ্য কুসীদ। কুসীদের লোভেই তিনি এই রাত্রে অসুস্থ শরীর লইয়াও কেনারামের নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে আসিয়াছেন এবং ইহাদের আগড়ম-বাগড়ম আলোচনা শুনিতেছেন। রাজীবলোচন প্রিয়-দর্শন ব্যক্তি নহেন। কালো, বেঁটে, শীর্ণকায় লোক তিনি! যখন চলেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া থাকেন; যখন বসেন উবু হইয়া বসেন। তাঁহার চোয়াল সর্ব্বদাই নড়ে, মনে হয় সুপারি-জাতীয় কি যেন একটা চিবাইতেছেন। মুখে এক আধ টুকরা সুপারি, লবঙ্গ বা হরিতকী কখনও হয়তো বা থাকে কিন্তু তাহার জন্য অত ঘন ঘন মুখ নাড়ার প্রয়োজন হয় না। ওটা তাঁহার মুদ্রাদোষ। মাথার সামনের দিকে সামান্য টাক, সামান্য একটু কাঁচা-পাকা গোঁফ—মুখভাবে বিশেষ কিছুই অসামান্যতা নাই। মুখের মধ্যে চক্ষু দুইটিই ছোট ছোট হইলেও বেশ জীবন্ত। কিন্তু প্রায় তাহা অর্দ্ধ-মুদিত থাকে—কচিৎ কখনও কাহারও দিকে যদি চোখ খুলিয়া তাকান সে চোখের মর্ম্মভেদী দৃষ্টি তাহার মনে ভীতি সঞ্চার করে। পারতপক্ষে কেহ সে দৃষ্টির সম্মুখবর্ত্তী হইতে চায় না, এমন কি তাঁহার একমাত্র পুত্রও নয়। সুদের লোভেই তিনি কেনারামের প্রস্তাবে রাজি হইয়াছেন। বিশ্বাসযোগ্য ব্যাঙ্কে আজকাল সুদের হার অতিশয় কম। টাকাগুলো কেবল পচিতেছে। কেনারামটাকে কিছু উপুড়-হস্ত করিলে কিছু টাকার যদি সদ্গতি হয় মন্দ কি। টাকা অবশ্য ও ছোকরা শোধ করিতে পারিবে না—জমিদারিটাই শেষ পর্য্যন্ত লইতে হইবে—তাহাই বা মন্দ কি। আড়াই লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি লাভ করা এ বাজারে নিন্দনীয় নয়। আজকাল

ওই আড়াই লক্ষ টাকার সুদ বছরে চার হাজারও হয় না। জমিদারিতে অবশ্য টাকা শুকা আছে—নানা হাঙ্গামা—কিন্তু নির্ঝাটে মা লক্ষ্মী ঘরেই বা কাহার গৃহে আসিয়াছেন! তাহা ছাড়া আর একটা কথা, উৎপল এবং শঙ্কর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে। যদিও এখনও পর্য্যন্ত তাহারা তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, তাঁহার খাতক-সংখ্যা আগে যেমন ছিল এখনও যদিও প্রায় সেইরূপই আছে—কিন্তু উহাদের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা যেরূপ বাড়িতেছে—(জনসাধারণ দূরের কথা তাঁহার নিজেরই শ্রদ্ধা বাড়িতেছে!)—ভবিষ্যতে হয়তো তাঁহার ব্যবসায় ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে পারে। এই উপলক্ষে ওই দুইজনকেও যদি গ্রাম হইতে উৎখাত করা যায় মন্দ কি। শত্রুকে অঙ্কুরে বিনাশ করাই তো ভাল। কিন্তু এই বিনাশ করা ব্যাপারে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ খট্‌কা আছে। অসঙ্কোচে কাহাকেও বিনাশ করিতে চিরকালই তিনি কুণ্ঠা-বোধ করেন—বিশেষত সে ব্যক্তি যদি নিরীহ হয়। দীর্ঘনিশ্বাসকে তাঁহার বড় ভয়। কুসীদজীবী হইলেও তিনি ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি—পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক, আশীর্ব্বাদ-অভিশাপ প্রভৃতিতে আস্থাবান। বিনা দোষে শঙ্কর এবং উৎপলকে বিপন্ন করাটা কি ঠিক হইবে? বহু অনুসন্ধান করিয়াও তো তিনি উৎপল অথবা শঙ্করের চরিত্রে এমন কোন দোষ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই যাহার ওজুহাতে তাহাদের উচ্ছেদসাধন সমর্থন করা যায়। অধিকন্তু বাপের ব্যাটা শঙ্করটাকে তো ভালবাসিতেই ইচ্ছা করে। নিজের অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র গদাধরের সহিত তুলনা করিয়া এ কল্পনাও তিনি মাঝে মাঝে করিয়াছেন শঙ্কর আমারই ছেলে হইলে মন্দ কি হইত! কেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলে—কোনরূপ নষ্টামি নাই—লোকের বিপদে-আপদে বুক দিয়া করে—কথায়-বার্ত্তায় কেমন বিনয়ী অথচ চালাক চতুর—সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত কেমন গড়গড় করিয়া আলাপ করিল! অথচ গদাধরটা কি যেন! ঠিক যেন একটা কালা কুলি-বেগুন—বেঁটে কুৎকুতে—পেঁচার মতন স্বভাব—ভদ্রসমাজে মুখ দেখায় না—বদমাইসের ধাড়ি—যত আড্ডা ছোটলোকের সঙ্গে—এই বয়সেই গাঁজা ধরিয়াছে নাকি—দুলে টোলার ছুঁড়িগুলো তো তাহার পয়সায় বসিয়া গেল—শাড়ি চুড়ির কি বাহার হারামজাদিদের···

সহসা রাজীবলোচনের চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িল।

কেনারাম মূল সমস্যাটা লইয়া আলোচনা করিতেছেন।

"আমাদের যতই না কেন শত্রু থাক উৎপল শুধু শুধু জমিজমি বিক্রি করতে রাজি হবে কেন? তার তো কোন অভাব নেই—"

রাজীব দত্তের চোয়াল নড়িয়া উঠিল।

হৃদয়বল্লভ বলিলেন—"তা নেই স্বীকার করছি। কিন্তু ওদের অতিষ্ঠ করে' তোল। তাহলেই পালাবে—"

কেনারাম বাহিরে সভ্য ভব্য মিতভাষী মার্জ্জিতরুচি ব্যক্তি, চট্ করিয়া এমন কিছু বলেন না যাহার জন্য ভবিষ্যতে তাঁহাকে দায়ী করা যাইতে পারে। অতিষ্ঠ করিবার আয়োজন তিনি করিয়াছেন, হৃদয়বল্লভের আগ্রহাতিশয্য ছাড়া ব্যক্তিগত একটা কারণও সম্প্রতি ঘটিয়াছে। উৎপলের পরামর্শ-অনুযায়ী শঙ্কর তাঁহার পুত্র জীবনকে সত্যই উকিলের চিঠি দিয়াছে। কিন্তু এত কথা হৃদয়বল্লভকে বলার প্রয়োজন কি! সংক্ষেপে শুধু বলিলেন—"দেখি—"

"না, না, উঠে পড়ে লাগ ভাই—দেখি—দেখি তুমি অনেকদিন থেকে করছ। তুমি চুপ করে' থাকবার লোক নও—নিশ্চয় কোন আয়োজন করেছ একটা চুপি চুপি—বলই না ভেঙে শুনি—!"

দীর্ঘকান্তি হৃদয়বল্লভের, সমস্ত প্রাণশক্তি তাঁহার ড্যাবডেবে চক্ষু দুইটিতে জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টি সে চক্ষুর।

"আয়োজন? না, তেমন কিছু করিনি এখনও। তবে মণি বাঁড়ুয্যের লক্ষ্মীবাগের ব্যাপারটা যদি বেশী দূর গড়ায় তাহলে হয় তো কিছু হতে পারবে। হয়তো—"

'হয়তো' কথাটার উপর জোর দিয়া তিনি থামিয়া গেলেন।

হৃদয়বল্লভ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

"সমস্ত ব্যাপারটা খুলেই বল না ভাই—মণি বাঁড়ুয্যে কে—"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর কেনারাম অবশেষে ব্যাপারটা খুলিয়া বলাই মনস্থ করিলেন।

"আমাদের জমিদার বাঁড়ুয্যেদের খুড়তুতো ভাই মণি লক্ষ্মীবাগে প্রায় হাজার বিঘে জমি নিয়ে মহাধুমধাম করে' চাষ করছে। আশপাশের কয়েকজন বেহারীদের—বিশেষ করে' শিক্ষিত বেহারীদের—চোখ টাটাচ্ছে তাই দেখে। জনকয়েক বেহারী জমিদার—(গুলাব সিং তার মধ্যে প্রধান) জনকয়েক বেহারী উকীলও এই নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। শঙ্করের দক্ষিণ হস্ত নিপু বাবুও ইন্ধন যোগাচ্ছেন তাতে। মণি যে সব চাষীর কাছ থেকে টাকা দিয়ে জমি কিনে নিয়েছিল নিপুবাবু সেই সব চাষীদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছেন এই বলে যে মণি ক্যাপিটালিষ্ট—ঠকিয়ে তাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে নিয়েছে—যে চাষ করে জমি তারই—সমবায় কৃষিসমিতি করেই রুশদেশে না কি চাষীরা সুখে আছে—মণির ন্যায়তঃ কোন অধিকার নেই একা অতখানি জমি ভোগ করবার। মোট কথা এই নিয়ে একটা হাঙ্গামা বাধবার সম্ভাবনা—"

কেনারাম চুপ করিলেন।

"তার সঙ্গে উৎপল আর শঙ্করের সম্বন্ধ কি—"

"হাঙ্গামা যদি বাধে আর ওরা যদি যোগ দেয় তাতে—দেওয়াই সম্ভব—ওরা আদর্শবাদী লোক, মণির পক্ষ নিশ্চয়ই নেবে—তাহলে ও অঞ্চলের বর্দ্ধিষ্ণু বেহারীদের সঙ্গে আর চাষীদের সঙ্গে শত্রুতা হবে ওদের—আর তাহলেই মানে—"

মৃদু হাসিয়া কেনারাম পুনরায় চুপ করিলেন।

"মানে?"

"মানে একখানা টিকে একবার একটু ধরলে বাকীগুলোও ধরে উঠতে দেরি লাগবে না—"

উপমাটা রাজীব দত্তের ভালই লাগিল।

তিনি একবার চোয়াল নাড়িলেন।

"কিন্তু ফুঁ দেওয়া চাই—ফুঁটা তোমাকে দিয়ে যেতে হবে—"

হৃদয়বল্লভ বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না। প্রমথ ডাক্তার আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গুলাব সিংহের উপর প্রমথ ডাক্তারের অসীম প্রভাব আছে বলিয়া কেনারাম প্রমথ ডাক্তারকে দলে টানিয়াছেন। প্রমথ ডাক্তার আসিয়াছেন শঙ্করের উপর মনে মনে রাগ আছে বলিয়া। বিশেষত সেদিনকার প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করিয়া দিবার কথাটা তাঁহার মোটেই ভাল লাগে নাই।

লোকটা যেন হাতে মাথা কাটিয়া বেড়াইতেছে! উৎপলবাবু ভালমানুষ লোক কিছু বলেন না—যা তা করিয়া বেড়াইতেছে একেবারে। ভদ্রলোককে একটু কড়কাইয়া দেওয়া উচিত বই কি। নাসটেনেস!

প্রমথ ডাক্তারের অভ্যাগমে পরামর্শ সভা আরও জাঁকিয়া উঠিল।

১৫

সমরের দিনগুলি কাটিতেছিল।

পল্লীজীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ-খচিত দিনগুলি। পৃথিবীর ইতিহাসে এই অতি তুচ্ছ দিনগুলির হয়তো কোন চিহ্ন থাকে না, পল্লীজীবনের দৈনন্দিন ইতিহাসে কিন্তু ইহাদের মূল্য কম নয়। ডানকার্কে কে পরাজিত হইল, কোন পক্ষ যুদ্ধ-নৈপুণ্যের কি পরিচয় দিল, চীনবাসীদের প্রতি বলশেভিক রুশিয়ার আসল মনোভাব কি, জার্মানীর নূতনতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা বর্বরতার কোন কাহিনী কাগজে বিজ্ঞাপিত হইতেছে, কোন পক্ষের কোন সেনা-নায়কের যুদ্ধ কৌশল কিরূপ, বিমানবহর কে কত বেগে দাবড়াইয়া চলিয়াছে—এসব খবর শিক্ষিত শহরবাসীকে যতটা চঞ্চল করিয়া তোলে অশিক্ষিত পল্লীবাসীকে ততটা তোলে না। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের অত্যাশ্চর্য কাহিনী তাহারা শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মুখে অত্যাশ্চর্য কাহিনীর মতোই শোনে—যেন রূপকথা শুনিতেছে! ঘর্ঘর শব্দ করিয়া আকাশ পথে যখন বিমান-পোত উড়িয়া যায় বিস্ফারিত নয়নে নিস্তব্ধ হইয়া তাহারা সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে—যুদ্ধের সঙ্গে ওইটুকুই তাহাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। মহাযুদ্ধের খবর তাহাদিগকে বিস্মিত করে কিন্তু তাহাদের জীবনের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে না, অন্তত তখনও পর্যন্ত করে নাই। যুদ্ধের খবর তাহাদের নিকট খবরই নয়।

তাহাদের নিকট আসল খবর নিমাই পণ্ডিতের গাই একটি চমৎকার 'বকনা' প্রসব করিয়াছে। কুচকুচে কালো রং, কপালের মাঝখানে চন্দনের ফোঁটার মতো সাদা একটি টিপ। চমৎকার দেখিতে! হরু গোয়ালা গাইটি সস্তায় কিনিয়া দিয়াছিল বলিয়া একটা ব্যক্তিগত গর্ব অনুভব করিতেছে। বানারসি গাড়োয়ান, নৈমুদ্দিন দফাজি, ইস্কুলের চাকর পরমেশ্বর, সকলেই ইহাতে উল্লসিত। সকলেই নিমাইকে নানারূপ পরামর্শ অযাচিতভাবেই দিয়া যাইতেছে। এই সময় গাইকে কোন কোন জিনিস খাওয়ানো উচিত তাহা লইয়া রামু ও বিষ্ণুর কলহই হইয়া গেল। রামু সরিষার খোলের পক্ষপাতী, বিষ্ণুর মতে তিসির খোলই সর্বশ্রেষ্ঠ। খড়, ভূষি কোথায় সস্তায় পাওয়া যাইবে সে পরামর্শ অনেকেই দিয়া গেল, খোড়ো চালাটা আগামী বর্ষায় চলিবে কি না তাহা লইয়াও অনেকে মাথা ঘামাইল। মুকুন্দ পোদ্দার কি একটা কাজে হীরাপুরে আসিয়াছিলেন বকনাটি দেখিয়া তাঁহার ভারী পছন্দ হইয়া গেল। তিনি যাচিয়া নিমাইয়ের সহিত দেখা করিয়া বলিয়া গেলেন যে নিমাই ভবিষ্যতে কখনও যদি বকনাটি বিক্রয় করে তিনিই কিনিবেন, এমন কি এখনই তিনি ইহার জন্য নগদ পাঁচ টাকা বায়না দিতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, নিমাই সম্মত হইল না।

কমলার সদ্যোজাত শিশুটা না কি শৃগালের কবলে গিয়াছে। কমলার বউ তাহাকে আঙনায় শোয়াইয়া রাখিয়া ঘরের ভিতর রান্না করিতেছিল। দিন দুপুরে এই কাণ্ড। খুকীর দল অমিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ মাঘে একদিন শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল। আমের মুকুল যদিও এখনও তেমন হয় নাই তবু যা হইয়াছিল নষ্ট হইল। ইউরোপীয় যুদ্ধের শোচনীয় পরিস্থিতি অপেক্ষা এই পরিস্থিতি সকলকে বেশী আকুল করিয়া তুলিল। অতীতে কে কত ভীষণ শিলাবৃষ্টি দেখিয়াছে তাহা লইয়া পাল্লা দিয়া গল্পও চলিল দুই চারিজন বৃদ্ধের মধ্যে।

আর একটা বিস্ময়কর ঘটনায় সব চাপা পড়িয়া গেল। গ্রামপ্রান্তে শিবমন্দিরের পাশে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক-দম্পতী বাস করিত। বেচারারা সত্যই অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এ অঞ্চলের বৃদ্ধতম লোকও নাকি তাহাদের ওই একই রকম দেখিতেছে। যম যেন তাহাদের ভুলিয়া আছে। কত বন্যাবাত মহামারী দুর্ভিক্ষে কত শত সমর্থ লোক অকালে মরিল—কিন্তু উহাদের মৃত্যু নাই। কুব্জপৃষ্ঠে থুরথুরে লাঠি ধরিয়া ধরিয়া উহারা দুজন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং চিরকাল হয় তো বেড়াইত যদি না রাজীব দত্ত দয়া করিতেন। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব ঠেকিলেও কুসীদজীবী রাজীব দত্তই দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বেচারাদের আর ভিক্ষা করিতে হইত না। বেশ ছিল। অকস্মাৎ একদিন রাত্রে ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ষণ্ডা ষণ্ডা দুইজন কালো লোক তাহাদের কুঁড়ে ঘরে ঢুকিয়া বুড়া অন্ধ ভিখারীটাকে কাঁধে তুলিয়া লইল এবং নিমেষ মধ্যে অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল। বুড়ীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশীরা সমবেত হইল। লণ্ঠন লইয়া, মশাল জ্বালিয়া, অনুসন্ধানের ত্রুটি হইল না। কিন্তু জীবন্ত বা মৃত বুড়ার কোন সন্ধানই মিলিল না। থানায় খবর দেওয়া হইল, কোন ফল ফলিল না। সম্ভব অসম্ভব নানারূপ গবেষণার পর যে ধারণাটা ক্রমশঃ অধিকাংশ লোকের মনে বদ্ধমূল হইল তাহা এই যে যমরাজকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। বুড়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল কিছুতেই মরিবে না। যমরাজ তাহা শুনিবেন কেন? দূত পাঠাইয়া জীবন্তই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কয়েকদিন পরে বুড়িও মরিয়া গেল।

রহিমের ভেড়া মটরা সকলকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। ফসল খাইয়া বেড়াইতেছে কিন্তু কিছু বলিতে গেলেই ছুটিয়া আসিয়া চুঁ মারিয়া ফেলিয়া দেয়! এ অঞ্চলের ছেলেরা তো ওটাকে যমের মতো ভয় করে। সর্বাঙ্গে কোঁকড়ানো কালো লোম, প্রকাণ্ড পাকানো শিং দুইটা বিশাল '২'এর মতো বলিষ্ঠ গর্দানার উপর যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। মটরার জ্বালায় সকলে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু মটরার প্রতি সকলের স্নেহেরও অন্ত নাই। হইবে না? সেবার রসুলপুরে যখন ভেড়ার লড়াই হয় তখন এই মটরাই সমাগত সমস্ত ভেড়াকে পরাস্ত করিয়া গ্রামের মুখ-রক্ষা করিয়াছিল। সেই হইতে মটরা গ্রামবাসী সকলেরই আদরের পাত্র। ইহার বাড়ি ফ্যান খাইয়া, উহার বাড়ি ভূষি খাইয়া, কাহারও বাগান ভাঙিয়া, কাহারও ফসল চরিয়া

মটরা দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছে। সম্প্রতি কিছু বাড়াবাড়ি শুরু করিয়াছে। ভাগিয়ার ছেলে নন্‌কুকে এমন মারিয়াছে যে সে হাতের হাড় ভাঙিয়া হাসপাতালে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। ভাগিয়া শঙ্করের নিকট আসিয়া মটরার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইল।

শঙ্কর বলিল—"আমি কি করব তার। রহিমকেই বল গিয়ে—"

"আপ থোড়া বোল দিজিয়ে হুজুর—"

"আচ্ছা ডেকে নিয়ে আয়—"

রহিম আসিয়া বলিল যে মটরার জ্বালায় নিজেই সে নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছে। "কত দড়ি আর কিনি হুজুর, রোজ রোজ দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। নারিকেলের শক্ত মোটা দড়িও এক ঝট্‌কায় পট্‌ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। আমি আর উহাকে লইয়া পারি না; নাচার হইয়া পড়িয়াছি, আপনারা বরং ওটাকে কাটিয়া খাইয়া ফেলুন আপদ চুকিয়া যাক্‌—"

এই কথায় ভাগিয়াই জিব কাটিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে ছি ছি ছি—ই কৈসন বাত—"

শঙ্কর বলিল—"একটা মোটা লোহার শেকল কিনে গলায় বকলস্‌ দিয়ে বেঁধে রাখ ব্যাটাকে—"

ইহার উত্তরে রহিম যাহা ব্যক্ত করিল তাহাও সঙ্গত। এই যুদ্ধের সময় বকলস্‌ এবং লোহার শিকলের যা দাম তাহা জুটাইবার সঙ্গতি তাহার নাই। অবশেষে শঙ্করকে বলিতে হইল যে দামটা সেই দিবে!

ভাগিয়া রহিম উভয়েই খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

নেকি মাড়োয়ারি শীঘ্রই নাকি একটি মাখন তোলা কল বসাইবে।

নটবর এবং চরণ ডাক্তারের চিকিৎসায় হরিয়া ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতেছে।

নিপু মাঝে একদিন হীরাপুর হাটে দাঁড়াইয়া ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলশেভিজম্‌ সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিয়া নাকি হাস্যাস্পদ হইয়াছে।

কর্পূরা গোয়ালার মেয়ে 'শুকরি' মাঝে একদিন হৈ চৈ বাধাইয়া বসিল। এদেশের সব মেয়েরই যেমন হয় তাহারও অতি বাল্যকালেই—দুই বৎসর বয়সেই—বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে বাপের বাড়িতেই ছিল। মাসখানেক পূর্ব্বে তাহার 'গওনা' হইয়াছে। 'গওনা' (দ্বিরাগমন) উপলক্ষে গরীব কর্পূরা বেচারা এই দুর্দ্দিনেও যথাসাধ্য সমারোহ করিয়া মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়াছিল। দশ ক্রোশ দূরে 'রূপটি' গ্রামে তাহার শ্বশুর বাড়ি। মেয়েটা হঠাৎ সেখান হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। রাতারাতি হাঁটিয়া চলিয়া আসিয়াছে! শ্বশুর বাড়ির লোকেরাও দুই একদিন পরে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া উপস্থিত। পলাতকা বধূকে যেমন করিয়া হোক তাহারা লইয়া যাইবেই।

শুকরি আসিয়া অমিয়ার শরণাপন্ন হইল। বলিল তাহার স্বামীর শেতী (ধবল) হইয়াছে, কিছুতেই ও স্বামীর ঘর সে করিবে না। 'রূপটি' গ্রামের কাছেই শঙ্করদের স্থাপিত একটি ডিস্পেন্সারি আছে—তাহার স্বামীর যাহাতে সুচিকিৎসা হয় সে ব্যবস্থা শঙ্কর করিয়া দিবে আশ্বাস দিল। প্রমথ ডাক্তার বলিলেন—ধবল আর কুষ্ঠ এক জিনিস নয়—সংক্রামকও না—সুচিকিৎসায় সারিয়া যাইতে পারে। তবু 'শুকরি' যাইতে চায় না। অবশেষে শঙ্করকে গ্রামের দোহাই দিতে হইল। সে যদি না যায় গ্রামেরই একটা বদনাম হইয়া যাইবে যে! এ গ্রামের মেয়েকে কেহ বিবাহই করিতে চাহিবে না হয়তো। তাছাড়া এমন ভাবে পলাইয়া আসিলে লোকে অন্যরকম বদনামও দিতে পারে। শুকরির মতো ভালো মেয়ের নামে এ রকম কুৎসা রটা কি ঠিক?

পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নতমুখী শুকরি বলিল—এখন গেলে আমাকে উহারা মারিবে। বাড়িয়ের [illegible] শ্বশুর বাড়ির লোকেরা বলিয়াছিল—তাহারা প্রতিশ্রুতি দিল যে বধূর উপর কোন রকম অত্যাচার করা হইবে না। তখন শুকরি আর এক বাহানা তুলিল। দশ ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার পায়ে ভয়ানক ব্যথা হইয়াছে সে আবার অতটা পথ হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না। কর্পূরা গোয়ালা নিকটে বসিয়া সব শুনিতেছিল—তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। মহিষের শিংয়ের মতো উর্দ্ধাগ্র বাঁকা গোঁফ চুমরাইয়া সে সগর্জ্জনে বৈবাহিককে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ঝোঁটি পকড়কে খিঁচিয়াকে লে যা—"। বৈবাহিকটি বলিষ্ঠ-গঠন ব্যক্তি—শালপ্রাংশু মহাভুজ যাহাকে বলে। পুত্রবধূর চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার মতো শারীরিক ক্ষমতা তাহার আছে। লোকটি কিন্তু ধীর প্রকৃতির। কর্পূরার কথায় তাহার মুখ প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পুত্রবধূর আপত্তির যৌক্তিকতাও সে বোধহয় উপলব্ধি করিল। 'বটুয়া' হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া সেটির প্রতি সে একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল, তাহার পর ইতস্তত করিয়া বলিল "আট আনা মে বয়েল গাড়ি কি ডোলি হোতেই?"

অসম্ভব। আজকালকার দিনে মাত্র আট আনায় কোন গরুর গাড়ি বা ডুলি দশ ক্রোশ পথ যাইতে রাজি হইবে না। অন্তত চার টাকা লাগিবে। কর্পূরা 'গওনা'তে সম্প্রতি ঋণগ্রস্ত হইয়াছে—আবার এই চার টাকাও তাহাকে দিতে হইবে না কি? তাহার ভয়ানক রাগ হইল। আর একবার গোঁফে চাড়া দিয়া সে বোধহয় পুনর্ব্বার ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাবটাই করিতেছিল কিন্তু শঙ্কর বাধা দিল।

শঙ্কর বলিল—"আচ্ছা আমার গাড়িটাই পৌঁছে দিয়ে আসুক ওকে—মুনাইকে বলে দিচ্ছি—"

মুনাই মনে মনে খুব চটিল—ছুঁড়িটার দেমাক তো কম নয়—কিন্তু তাহাকে যাইতে হইল। শঙ্করের বিরুদ্ধাচরণ করা তাহার সাধ্যাতীত। শুকরির আর আপত্তি করিবার উপায় রহিল না, বরং তাহার মুখে হাসি ফুটিল।

শঙ্করের 'শিশা' লাগানো 'টপ্পর' দেওয়া গাড়িতে চড়িবার সুযোগ পাইয়া সত্যই সে উল্লসিত হইয়া উঠিল। অমিয়া তাহাকে একটি রঙীন্‌ শাড়ী কিনিয়া দিল। সে কিন্তু আরও বেশী খুশি হইল অমিয়ার অর্দ্ধেক খালি তরল আলতার শিশিটা পাইয়া, হাতে যেন স্বর্গ পাইল। আর কোন আপত্তি করিল না—শ্বশুর বাড়ি চলিয়া গেল।

পল্লীজীবনের এই সব অতি তুচ্ছ ঘটনার ভিতর দিয়া শঙ্করের দিনগুলি কাটিতেছিল। ঠিক নিরুদ্বিগ্ন না হইলেও শান্তিপূর্ণ।

ক্রমশঃ

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-টি

গত শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে সব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, স্যার গুরুদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাংলার তৎকালীন শিক্ষিত সমাজকে বেশ গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। বাংলার যুবচেতনা পাশ্চাত্যের জ্ঞান আলোকে উদ্দীপ্ত হৃদয়ের মধ্যে জাগ্রত হ'য়ে উঠে এমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে তা'র সে জাগরণ তা'র স্বস্তির পথই দেশের পক্ষে অমঙ্গলের হোল। আচার, ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি ভারতীয় বিষয়ে বাঙালী তার নিজস্ব কি ও কতটুকু তা' জানতে চাইল না। যখন দেশের মনীষীবৃন্দ নব আলোকে নব জাগরণের মধ্যে এমনভাবে আত্মহারা হয়েছেন, সেই সময়েও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এমন কয়েকজন নির্ভীক, প্রজ্ঞাদীপ্ত ও আচারনিষ্ঠ মহাপুরুষ এদেশে জন্মেছেন, যাঁরা দেশের নবজাগ্রত চেতনার উদ্দামগতির বেগকে কেন্দ্রস্থ করে রাখতে পারলেন তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিরাট আদর্শ দিয়ে। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এমনি একজন মহাপুরুষ।

প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের পাঠশালায় তিনি এমন কয়েকটী গুণ শিক্ষা করেছিলেন, যা' উত্তরকালে শতবিধ সম্মান ও সম্পত্তির মধ্যেও তাঁকে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মত স্বচ্ছ জ্যোতিতে দীপ্যমান রেখেছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন্ বা গারফিল্ডের জীবনী পড়তে হয়, কারণ তাঁরা স্বীয় শক্তি ও চরিত্র বলে দীন অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে তাঁদের দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মান ও পদ লাভ করেছিলেন। তাঁদের জীবনীর পরিচয় হ'চ্ছে- from log-cabin to white house. ইংরাজীতে কথা আছে—Plain living and high thinking সেই আদর্শ আমাদের প্রাচীনকালে ত' ছিলই আধুনিক যুগেও তা' আছে, মধ্য যুগেও তা'র উদাহরণ রয়েছে। প্রাচীন ভারতের আশ্রম জীবনেই আরণ্যক উপনিষদের সৃষ্টি হয়েছিল, বুনো রামনাথ বাংলার পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হয়েছিলেন কিন্তু 'বুনো' কথাটা অন্যের পক্ষে অপবাদ হলেও তাঁর পক্ষে ছিল ভূষণ। যুগ প্রভাবে বহু পরিবর্তন সত্বেও স্যার গুরুদাসের জীবনে সেই সনাতন আদর্শ-ই দেখা যায়। যদিও তিনি নানা উপাধিতে ভূষিত ও কার্য্য ব্যপদেশে নানা সজ্জায় সজ্জিত হয়ে থাকতেন, তথাপি সেই সমস্ত বাহ্য আবরণ ও আড়ম্বরের মধ্যে, তাঁর সেই তেজঃপুঞ্জ রূপ তনুর অভ্যন্তরে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় সেই ত্যাগের আদর্শ, সেই জ্ঞানপিপাসা, সেই মুমুক্ষু হৃদয় বিরাজমান ছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের জ্ঞানধারা তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়েছিল; দেশের মধ্যে দেশবাসীর পক্ষে প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ সম্মানপদগুলিও তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু মোহ বা মাৎসর্য্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। যে সকল গুণ থাকাতে ব্রাহ্মণ একদিন এই ভারতভূমিতে সকলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি সেই সমস্ত গুণের তিনি ছিলেন মূর্ত্তিমান প্রতীক। নির্লোভতা গুণ বর্তমানে যেন বিরল, অথচ গুরুদাসের মধ্যে এই নির্লোভতা যে কত সহজ ও প্রবল ছিল তা' দেখা যায় যখন তিনি হাইকোর্টের বিচারকের পদত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক বন্ধুকে তিনি লিখেছেন—"I have tendered my resignation because having served a Judge for fifteen years, I think it is time that I should leave and some one else should take my place." এ দৃষ্টান্ত আর কয়জনের আছে! বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদও তিনি এইভাবে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর জীবনের পথে অনেক সম্মান তাঁর সম্মুখবর্তী হয়েছিল, অনেক বরমাল্য তাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়েছিল কিন্তু বাল্যকালে যে ত্যাগ, যে সংযম, যে নির্লোভতা, তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র স্বরূপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা'র কোনটীকেও তিনি ক্ষণিকের জন্যও বিস্মৃত হ'ন নি। অন্তরে তিনি ছিলেন সর্ব্বত্যাগী যোগী, বাহিরে তিনি ছিলেন সমাজবদ্ধ জীবের আদর্শ পুরুষ, নিষ্ঠাবান, আচারতৎপর, সদালাপী, নম্র। জীবনের বহুধা বিভক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা নিযুক্ত ছিল। বহুবিধ লোকের সংস্রবে তিনি এসেছিলেন—দেশের শাসক সম্প্রদায়, শিক্ষিতমণ্ডলী, যুবজন, ছাত্রবৃন্দ, নিজ চরিত্র বলে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। অধ্যাপক, বিচারক, আইনজীবী, লেখক প্রভৃতি বিভিন্নতর জাতীয় কাজ তাঁকে করতে হয়েছে কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার স্পর্শমণির প্রভাবে দেশের কল্যাণ সাধিত হয়েছে। তৎকালীন বাংলার প্রায় সকল মনীষী ব্যক্তির সহিত তাঁর যোগ ছিল, অনেকের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাঁর মতের মিলও ছিল না, কিন্তু মতের মিল না হ'লেও—মনের মিল বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। স্বধর্ম্মে তাঁর নিষ্ঠা ছিল আদর্শ স্থানীয়। বোধ হয় সেই কারণেই ধর্ম্মমতে তাঁর সঙ্গে যাঁরা পৃথক ছিলেন তাঁরাও তাঁকে শ্রদ্ধা দিয়েছেন। লর্ড সিংহ তাঁ'র এক পত্রে লিখেছেন,—• • • I can not but feel the most respectful admiration for Goroo Dass Banerjee's adherence to the age-old practices which inculcated reverence for our glorious past. বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার আশুতোষ প্রমুখ তেজস্বী পুরুষসিংহগণের শ্রদ্ধা যিনি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র নিজ তপস্যালব্ধ গুণাবলী সাহায্যে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপন করা ত নিজেকে ধন্য করা। অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরের উচ্চতা মাপ করে মানুষ পর্ব্বতের মহিমা বাড়িয়ে দিতে পারে না, পারে নিজের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে। স্যার গুরুদাসের জীবন ছিল সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ। পর্ব্বত শিখর নিঃসৃত বিমল জলধারা জনসমাজে তার তৃষ্ণা নিবারণ করে, তাদের মলিনতা দূর করে—গুরুদাসের জ্ঞান উপদেশের বিমল ধারায় সকলেরই তৃষ্ণা দূর হোত, চরিত্র নির্ম্মলতা লাভ করত; অথচ গুরুদাস নিজে অত্যুচ্চ গিরি শিখরের মত ত্যাগে নিস্পৃহতায় ও সংযমে স্বমহিমায় অচল অটলভাবে উন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। হিমাদ্রি যেমন কালিদাসের কাব্যে 'পৃথিব্যাঃ মানদণ্ড ইব' বলে বর্ণিত হয়েছে, গুরুদাসও ছিলেন বাঙ্গালীর সমাজের মানদণ্ডস্বরূপ; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্বদেশী সমাজের' কথা কল্পনা করেছিলেন তখন তিনি সেই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান করেছিলেন স্যার গুরুদাসকে। স্যার গুরুদাস সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"যিনি একদিকে আচার ও নিষ্ঠা দ্বারা হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, অপরদিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যিনি মহৎ গৌরবের অধিকারী, একদিকে কঠোর দারিদ্র্য যাঁহার অপরিচিত নহে, অন্যদিকে আত্মশক্তির দ্বারা যিনি সমৃদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ; যাঁহাকে দেশের লোক যেমন সম্মান করে, বিদেশী রাজপুরুষেরা তেমনি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে; যিনি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন, অথচ যিনি আত্মমতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই; নিরপেক্ষতা ন্যায়-বিচার যাঁহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত; নানা বিরোধী পক্ষের বিরোধ সমন্বয় যাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক, যিনি সুযোগ্যতার সহিত রাজার ও প্রজাসাধারণের সম্মাননীয় কর্মভার সমাধা করিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐশ্বর্য্যবান অক্ষুব্ধ অবসর লাভ করিয়াছেন; সেই স্বদেশবিদেশের

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেই মনস্বিদলের মধ্যেও অবিচলিত তপোনিষ্ঠ ভগবৎ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি এইখানে আমি উচ্চারণ করি, তবে অনেক সবিস্তর বর্ণনার অপেক্ষাও সহজে আপনারা বুঝিতে পারিবেন কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিতেছি। • • • • • • —আমি আমার সমস্ত দেশের অভাব দেশের প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া নম্রভাবে নমস্কারের সহিত সমাজের এই শূন্য রাজাসনে এই দ্বিজোত্তমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি। (স্বদেশী সমাজ ; বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১১)।

গুরুদাস প্রসঙ্গে যখনই যত কিছু আলোচনা হো'ক না কেন, তা' সমস্তই অপূর্ণ থেকে যায় যদি তাঁর জননীর কথা না উল্লেখ করা হয়। সর্বাপেক্ষা গরীয়সী মাতার প্রতি ভক্তি শুধু বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর সর্বত্রই মহাপুরুষদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়ন বিদ্যাসাগর বা স্যার আশুতোষ সকলেই এর দৃষ্টান্ত স্থল। গুরুদাস ও ছিলেন জননীর ভক্ত সন্তান। তাঁর মাতার আদেশ তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন নি। লর্ড সিংহ সে কথা উল্লেখ করে লিখেছেন—"I can not think of that frail little body without also recalling the fact that his mothers lightest wish was to him "law divine" • • • • • •" গুরুদাসের জননী ছিলেন আদর্শ হিন্দু মহিলা। কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ অধ্যাপকবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গুরুদাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনি পুত্রের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। উত্তরকালে গুরুদাসের মধ্যে যে সব গুণ সমগ্র দেশবাসীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, সে সকলের বীজ তাঁর চরিত্রে নিহিত হয়েছিল বাল্যকালে তাঁর জননীর কাছে শিক্ষালাভ কালে। সংযম, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, নির্লোভ হওয়া ও পরমেশ্বরে ভক্তি স্থাপন এ সকল মহদ্‌গুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁকে শিখিয়ে ছিলেন তাঁর জননী। The hand that rocks the cradle, rules the nation—এ কথার তাৎপর্য গুরুদাসের জীবনে চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করেছিল। গুরুদাসের জননী শুধু জীবনে নয়, জীবনান্তকালেও গুরুদাসকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা' ব্যর্থ হয় নি। জননীর অন্তিমকালে পুত্র যখন বল্লেন, "গঙ্গা আপনাকে আমাদের কোল শূন্য করিয়া লইতে পারিতেছেন না" তখন গুরুদাসজননী উত্তরে বলেন, "আর অমন কথা বলিও না। আমার এখন আর কাহারও প্রতি মায়া নাই।" যিনি জীবনে ত্যাগ মন্ত্রের সাধনা করেছেন মরণেও তিনি সমস্ত মায়া মমতা বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিতা ন'ন। আর পুত্র গুরুদাসও সে ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করতে ভুল করেন নি। আজীবন তিনি সেই আদর্শে নিজেকে চালিত করেছেন; জীবনের শেষ কয়েক দিন গঙ্গাতীরে অবস্থান কালেও তিনি বলেছেন—"আমি এখানে ভাল বোধ করিতেছি; শয্যায় শুইয়া ঐ দেখুন গঙ্গার দিগন্তপ্রসারিণী মূর্তি দেখিতে পাইতেছি। ভাবিতেছি এই দিকে যাইব কি আপনাদের দিকে ফিরিব। বোধ হয় ঐ দিকে যাওয়াই ভাল, কিন্তু এখনও আমি আপনাদের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিতে পারি নাই, পারিলে ত জীবন্মুক্ত হইতে পারিতাম।" এই উক্তি দেখে মনে হয় যে তাঁর মত নিস্পৃহ, সর্বত্যাগী, যোগী পুরুষও যদি এমন বলেন তবে ত্যাগের পথ যে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং" তা' কত কঠোর সত্য! এ যেন Newton এর উক্তি—Only collecting pebbles !

গুরুদাসের বহুমুখী প্রতিভার সকল আলোচনায় আজ বিশেষ প্রয়োজন। সমগ্র জগৎ যখন নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, যখন সেই স্বার্থের নিদারুণ ও অনিবার্য সংঘাতে প্রলয়বহ্নি দিকে দিকে প্রজ্বলিত, লালসার স্রোত ও তৎসঙ্গে ক্ষতির স্রোত যখন সমস্ত মানব-সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছে—ঠিক সেই সময়ে, সেই যুগসন্ধিক্ষণে চাই গুরুদাসের মত লোকোত্তর চরিত্রের আদর্শের আলোচনা। আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে চাই পথ নির্দেশক আলো, চাই সেই মহান্ আদর্শ—যা' যুগে যুগে বিভ্রান্ত উদ্ধারপ্রার্থী মানব মনকে সুপথে চালিত করে এসেছে কল্যাণের মধ্যে, সৌন্দর্যের মধ্যে, শান্তির মধ্যে। যে বাণী দেশে দেশে কালে কালে যুগপ্রবর্তকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সেই বাণী আজ ধ্বনিত হউক দেশের প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দরে। গুরুদাসের জীবনাদর্শ আমাদের সেই কর্মফলত্যাগী কর্মবীরের সাধনায় উদ্‌বুদ্ধ করুক—তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞানের দীপশিখা আজ দিকে দিকে শত শত দীপ প্রজ্বালিত করুক।

গৃহ-প্রবেশ

(নাটিকা)

শ্রীকানাইলাল বসু

দ্বিতীয় দৃশ্য—মধ্যাহ্ন

পর্দা উঠিল। সেই কক্ষ। প্রমথবাবুর ভগ্নী মহালক্ষ্মী ও স্ত্রী সুকুমারী কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন। পরে মহালক্ষ্মী সোফায় বসিলেন।

মহালক্ষ্মী। আমাকে দোষ দিলে কি হবে বৌ? দুপুর গড়িয়ে কি আর সাধে এসেছি? তোর নন্দাইটিকে তো জানিস। কাল রাত্তির থেকে বলে রেখেছি, ওগো সকাল বেলা আমার গাড়ী চাইই, কোনও রকমে যেন দেরী করো না। কে কাকে বলছে! ওঁর ভ্রূক্ষেপও নেই। আমি তোর এখেনে সাজগোজ করে বসে আছি, সেই যে বেড়াতে গেছেন, গাড়ী আর ফেরে না।

সুকুমারী। তা, তুমি তো তাই—

মহালক্ষ্মী। তাও মনে করেছিলুম একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে আসি। কিন্তু উনি না ফিরলে আসতে ভরসা হল না ভাই। আজকাল যা চুরী হচ্ছে চারদিকে। পরশুদিন আমাদের পাশের বাড়ীতে কি কাণ্ড হলো ভাই!

সুকুমারী। কি হলো ঠাকুরঝি?

মহালক্ষ্মী। ওমা, শুনিসনি? সে একটা বুড়ো, কাশীর পাণ্ডা সেজে এসে, বাড়ীতে উঠেছে। বাড়ীর লোকদের কি আর মনে আছে পাণ্ডার চেহারা। কবে গিন্নী গিছলো কাশীতে অনেক কাল আগে। সেই বুড়োকে ওরা আদরে খাতির করে খাইয়ে দাইয়ে ওপরের ঘরে শুতে দিয়েছে, আর সকালে উঠে দেখে সে পাণ্ডাও নেই আর গিন্নীর ক্যাসবাক্সও নেই, আলমারি ভাঙা—

সুকুমারী। হ্যাঁ, বল কি! তা সে বুড়ো জানলে কি করে ঐ আলমারিতে ক্যাশবাক্স আছে?

মহালক্ষ্মী। বাড়ীর মেয়েদের আদিখ্যেতা। লোকটাকে বসিয়ে তার সামনেই আলমারি খুলে টাকা বার করেছে, কুষ্ঠী বার করেছে তাকে দেখাবার জন্যে। বাপো বাড়ীর মধ্যে একটা উটকো মিন্সে, আমার তো মনে করলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সুকুমারী। ওমা, তা আর ওঠে না।

মহালক্ষ্মী। তাই একা আরও আসতে ভরসা হলো না, মনে করলুম উনি এলেই চলে আসব। তা উনি আবার আজ ফিরলেন অন্য দিনের চেয়েও দেরী করে। ঐ যে আমার দরকার কি না; আমার সঙ্গে যেন ওঁর শত্রুতা আছে।

সুকুমারী। ঠাকুর জামাই বোধ হয় কোন কাজে আটকে পড়েছিলেন।

মহালক্ষ্মী। কাজ না ছাই! রোজ সকাল বেলায় খড়ের মাঠের ধুলো একবার না খেলে ওঁদের আর ভাত হজম হয় না। কাজ! যাস না একবার দেখবি যত বুড়ো, আধবুড়ো জজ ম্যাজিষ্ট্রেট উকীল ব্যারিষ্টার সব বসে বসে ইয়ারকি মারছে, আর সারি সারি মটর গাড়ীগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ঐ যে বলুম, দাদা যদি গাড়ী কেনে কক্ষণো একখানা গাড়ী কিনতে দিবিনি, দুখানা কেনাবি, একটা নিজের জন্যে রাখবি একটা দাদাকে দিবি। তা নইলে একবার গঙ্গা নাইতে যেতে চাইলে অমনি গাড়ীর সময় হবে না। আমি আর ওঁকে শেষ কথা বলে দিইছি—আসছে মাসে যদি আর একটা গাড়ী না কেনো তো তোমার গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দোব।

সুকুমারী। ঠাকুর জামাই হাকিম মানুষ, তাঁর কাছে কি আমরা?

মহালক্ষ্মী। (খুশী হইয়া) তা ভাই হাকিম বলে তেমনি খরচাও বড্ড বেশী করতে হয়। মানসম্ভ্রম বজায় রাখতে এত যাকে খরচা হয় ভাই তা কি বলব।'

সুকুমারী। তাতো হবেই, তা আর হবে না?

মহালক্ষ্মী। কেন, আমার দাদারও তো কারবার খুব ভাল চলছে। তুই বলবি শুধু গাড়ী হলেই হয় না। গাড়ী দু-খানা এখন যদি নাই হয় নিদেন একখানাও এখন কেনাবি।

সুকুমারী। হাঁ, তোমার দাদা আবার গাড়ী কিনবেন! সহঃ, বলে বসবেন যে পয়সা দিয়ে দেশে আর একটা পুকুর কাটিয়ে দিলে দেশের লোকগুলোর উপকার হবে। এই ত কত বলে' বলে' তবে এই বাড়ীটা শেষ করতে পেরেছি ভাই। কি করে যে পুরোণো বাড়ীতে দিন কাটিয়েছি তাই ঠাকুরঝি, সে আমিই জানি। একখানি পায়রার খোপ নিয়ে সকালসন্ধে থাকা আর কি চলে? ছেলেপুলেরা বড় হচ্ছে, একটু নড়বার চড়বার যো নেই।

মহালক্ষ্মী। বাবা, সে বাড়ীর কথা আর বলো না ভাই। আমার তো ঢুকলেই মনে হত যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঐ জন্যে তো এখানে আর যেতেই চাইতুম না। বড় খোকা বলে, মামার বাড়ী নয়তো চিঁড়িয়াখানা, খাঁচাখানা দিয়ে যাও আর এক এক ঘরে এক এক মূর্ত্তি দেখ। (হাসিতে হাসিতে) বলি খুব হতভাগা ছেলে, বলতে আছে।

সুকুমারী। (হাস্য) তা মিথ্যে বলেনি ভাই।

ক্ষ্যাপার প্রবেশ

ক্ষ্যাপা। মা, বামুন ঠাকুর বলছেন—এই যে পিসিমা এসেছেন। (প্রণাম করিল) ভালো আছেন পিসিমা? কই খোকাবাবুদের দেখছি না?

মহালক্ষ্মী। না বাবা, ওদের তো আজ ছুটী নেই, ওরা বিকেলে তোমার পিসে মশায়ের সঙ্গে আসবে। তুমি ভাল আছ তো বল?

ক্ষ্যাপা। আপনার চরণ আশীর্বাদে ভালই আছি। হাঁ মা, বামুন ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন এঁচোড় কি সবগুলো এখন রাঁধবে?

সুকুমারী। না না, এখন সব রাঁধবে কেন? এ বেলা তো খালি গুটিকতক বামুন আর এই বাড়ীর লোকজন খাবে। রাত্তিরেই তো সব নেমন্তন্নর লোক আসবে; তুই বলগে যা, যা কোটা আছে তার আদ্দেকেরও কম এখনকার মতন করুক। কি বল ঠাকুরঝি?

মহালক্ষ্মী। তাতো বটেই। অতো এঁচোড় এখন কি হবে?

ক্ষ্যাপা। আচ্ছা আমি তাই বলি। (প্রস্থানোদ্যত)

সুকুমারী। আর দেখ, একখানা দই আর কিছু মিষ্টি জোগানের বামুনদের দিয়ে রাখ, ওদের যখন ফুরসৎ হবে ওরা জল খাবে। এই হাঙ্গামে আমার মনে থাকে কি না থাকে। তোর মাসিমাকে বল ভাঁড়ার থেকে বার করে দিক। (ক্ষ্যাপা ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল)

মহালক্ষ্মী। কে বিনু এসেছে নাকি?

সুকুমারী। হাঁ, ওতো কাল থেকেই এসে রয়েছে। আজ সকালে কমলাও এসেছে। পিসিমা বুড়ো মানুষ, কি করবেন। আর আমি ভাই এত হাঙ্গামে যেন থৈ পাচ্ছিনুম না। ওরাই তো সব ব্যবস্থা করছে।

মহালক্ষ্মী। (গম্ভীর হইয়া) হুঁ।

সুকুমারী। এখন তুমি এলে ভাই, আমি বাঁচলুম। যা করবার সব তুমিই—

মহালক্ষ্মী। (খুশী হইয়া) কিছু ভাবতে হবে না তোকে বৌ, আমি যখন এসেছি তখন তোকে আর—

ক্ষ্যাপার প্রবেশ

মহালক্ষ্মী। কি রে ক্ষ্যাপ্ত, কি চাই?

ক্ষ্যাপা। মাসীমা ভাঁড়ারের চাবি চাইলেন, মা।

সুকুমারী। দেখলে ভাই, চাবিটা দিতেই ভুলে গেছি। এই নে (আঁচল হইতে চাবি দিতে গিয়া চাবি পাইলেন না) হ্যাঁ, চাবিটা কোথায় ফেললুম? চাবি?

মহালক্ষ্মী। সে কিরে? কাজের বাড়ীতে তুই চাবি হারালি নাকি? কত উটকো লোক ঘোরাফেরা করছে, নেমন্তন্ন বাড়ী দেখলে, ভদ্দরলোক সেজে কত জোচ্চোর এসে ঢুকে পড়ে। তারপর খেয়ে দেয়ে যাবার সময় এটা সেটা যা পায় হাতিয়ে নিয়ে যায়। আর তুই কিনা চাবি হারিয়ে বসলি!

সুকুমারী। তাইতো, কোথায় যে রাখলুম?

মহালক্ষ্মী। না:, তুই এখনো সেই খুকিটি আছিস বৌ। চিরকাল তুই চাবি হারাবি?

সুকুমারী। সত্যি ভাই, চাবি হারানো আমার যেন একটা রোগ।

মহালক্ষ্মী। হারালি হারালি ভাঁড়ারের চাবিটা হারালি কি বলে'? কি হবে এখন?

সুকুমারী। ভাঁড়ারের আর একটা চাবি দড়ি বাঁধা আছে, তার জন্যে নয়। কিন্তু চাবির রিংটাতে যে আমার আলমারি দেরাজের সব চাবি আছে।

মহালক্ষ্মী। তবেই হয়েছে, তাহলে আর সে চাবি তুমি পেয়েছ।

সুকুমারী। (উৎকণ্ঠিত স্বরে) ক্ষ্যাপা, দেখ বাবা, খুঁজে দেখ, একটাকা বকশিস দেবো। (ক্ষ্যাপার প্রস্থান)
ঐ ক্ষ্যাপা, দিনের মধ্যে সাতবার আমার চাবি কুড়িয়ে পায়। অন্য চাকর হলে যে কী হতো, তা জানি না। এসো ভাই ঠাকুর-ঝি, ওপরে এসো।

মহালক্ষ্মী। চল্—

উভয়ের ভিতরে প্রস্থান, ক্ষণপরে অন্যদ্বার দিয়া ক্ষ্যাপার প্রবেশ

ক্ষ্যাপা। একটা টাকা আমার বরাতেই নাচছে। যেমন বাবু আমার আশুতোষ, তেমনি মা হয়েছেন আমাদের ভোলানাথ। দিনে রাত্তির ভুলেই আছেন। এমন মনিব আর হয় না।

টেবিল চেয়ার সোফার তলায় চাবি খুঁজিতে সুরু করিয়াছে
এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে এক ব্রাহ্মণের প্রবেশ

ব্রাহ্মণ। ওহে বাপু, শোনো, শোনো। (ক্ষ্যাপা দাঁড়াইল) বলি রান্নার আর দেরী কত বল দিকি?

ক্ষ্যাপা। রান্না? আজ্ঞে না, রান্নার তো আর দেরি নেই। সবই হয়ে গেছে। এইবার লুচি ভাজবে আর দেবে।

ব্রাহ্মণ। নাকি? দেরি নেই?

ক্ষ্যাপা। আজ্ঞে না।

ব্রাহ্মণ। তবু?

ভগা। আজ্ঞে, তর্ আবার কিসের ?

ব্রাহ্মণ। বলি দশ মিনিটও দেরি আছে তো ?

ভগা। আজ্ঞে না ঠাকুরমশাই, এই পাঠা করলেই হয়। আবার দেরি কিসের ?

ব্রাহ্মণ। তাইতো। আমি মনে কচ্ছিলুম একবার বাড়ী থেকে হয়ে আসব। পেন্সিটা বড্ড কাঁদছিল আসবে বলে। তাই জন্যে মনটা কেমন করছে। ভাবছিলুম তাকে নয় নিয়েই আসি।

ভগা। আজ্ঞে, তা আসুন না।

ব্রাহ্মণ। তুমি যে বলছ, এক্ষুনি পাঠা করবে—

ভগা। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই এঁচোড়টা নামলেই পাঠাটা করে ফেলব।

ব্রাহ্মণ। তাহলে আর বাড়ী থেকে হয়ে আসবার সময় হবে কি ? এঁচোড়ের কালিয়া ফুটতে তো ?

ভগা। খুব সময় হবে। ফুটতে আর কতক্ষণ ? যে আঁচ দিয়েছি, তরকারিতে জল দিতে তর সইবে না, টগ্‌বগ্ করে ফুটে উঠবে।

ব্রাহ্মণ। ও। তাহলে এখনো জল দেও নি। তবে—

ভগা। আজ্ঞে, আগে কষে নিতে হবে তো। কষে নিয়েই জল দেবে। জল দিতে আর কী বলুন না।

ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এঁচোড় খুব কষে নেওয়া দরকার। যত কষবে তত তার হবে। তাহলে এখনো কষা হয়নি, হ্যাঁ ?

ভগা। মানে, চাটনির কড়াতে তো আর এঁচোড় চড়াতে পারে না। কড়াটা ধুয়ে নিচ্ছেন, দেখে এলুম, এতক্ষণে চড়াবার যোগাড় করছেন। চড়ালে আর কতক্ষণ লাগবে ?

ব্রাহ্মণ। (আশান্বিত) তাহলে বাড়ীতে একবার যাব নাকি ? পেন্সিটাকে নিয়ে—আবার পেন্সিটাকে আসতে দেখলে ছোট খোকাটা না আবার বায়না ধরে। সেই হয়েছে আমার ভাবনা। বড্ড ওর ন্যাওটো কিনা।

ভগা। আজ্ঞে, ছোট খোকা-ঠাকুরকেও নিয়ে আসবেন বইকি। সে কি কথা।

ব্রাহ্মণ। সেটাকে মিথ্যে আনা বাবা, তুমি এত করে বলছ বটে কিন্তু কিছুই খেতে পারে না। খালি ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করবে। তাকে এক তার গর্ভধারিণী পাশে বসে না খাওয়ালে, কেউ খাওয়াতে পারে না।

ভগা। সে তো ভালোই হয়, ঠাকুর মশাই। মাঠাকরুণের যদি পা'র ধুলো পড়ে, বাবু কত খুশি হবেন।

ব্রাহ্মণ। না, না, সেটা কি ভালো দেখাবে ? তাঁর আসাটা—সে থাক। বরং বড় খোকা একটু গুছিয়ে খেতে শিখেছে, সেই যাহোক করে খাইয়ে দেবে। তা তার আবার আজ পরীক্ষা।

ভগা। হলই বা পরীক্ষে, ঠাকুরমশাই। পরীক্ষে বলে কি লোকে নেমন্তন্ন খাওয়া ত্যাগ করবে না কি ?

ব্রাহ্মণ। তা, তুমি যখন বলছ, তখন যাই একবার। তার ইস্কুলও বেশী দূরে নয়। না হয় মাষ্টারকে বলে ছুটি করে—

ভগা। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ভালো। পরীক্ষে তখন হবে'খন এর পরে।

ব্রাহ্মণ। তাহলে যাত্রায় এখনো একটু দেরী আছে। মানে কিঞ্চিৎ বিলম্ব, হ্যাঁ ?

ভগা। আজ্ঞে, সে ভয় করবেন না। দেরি কিছুই নেই। বিলম্ব একটু হতে পারে, কিন্তু দেরীর তো কোনো কথাই নেই। ঐ যে বলুম এঁচোড়টা চড়িয়ে, ঐটে নামিয়ে নিয়েই অমনি ঐ কড়াতেই ছ্যাঁক করে মুগের ডালটা বসিয়ে দেবে। কড়া ধোবারও দরকার নেই। বুঝলেন না ?

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, তাহলে চট করে একবার ঘুরেই আসি। তুমি এত করে অনুরোধ করছ। (কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া) হ্যাঁ, দেখ বাবা, তুমি দুঃখু করো না। তোমার মাঠাকরুণের আসাটা বোধ হয় তেমন ঠিক হবে কি ? অবশ্য তোমার গিন্নীমা খুবই খুশী হবেন, সে আমি জানি।

ভগা। আজ্ঞে হ্যাঁ, সকলেই খুশী হবেন। আর তাছাড়া তিনি না এলে যে ছোট খোকাঠাকুরের বড্ড কষ্ট হবে।

ব্রাহ্মণ। না-না, সে ভালো দেখায় না—আচ্ছা, (চুপে চুপে) তোমার কাছে আনা দুয়েক পয়সা হবে বাবা ? আবার একটা রিক্সা ভাড়া লেগে যাবে—

ভগা। তাতে আর কী হয়েছে ? এই যে আসুন না।

ট্যাঁক হইতে পয়সা বাহির করিতে করিতে ভগা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান

একটু পরে একটি ভদ্রলোকের প্রবেশ, নাম বঙ্কুবাবু। প্রায় বৃদ্ধ। ডবল-ব্রেষ্ট সার্ট, প্যাকানো চাদর, কোঁচা উলটানো ধুতি এবং বার্ণিসকরা জুতা পরণে। জামা কাপড় অর্দ্ধ মলিন, সাজ-সজ্জায় শ্রী দেওয়াবার যত্ন চিহ্ন। সবশুদ্ধ মিলিয়া দারিদ্র্য ও তাহাকে চাপ দিয়া ভদ্রতা রক্ষার প্রচেষ্টা অতি পরিস্ফুট।

বঙ্কু। এ কী রকম হল ? সইওলাটা বললে শ্রাদ্ধ বাড়ী, অনেক লোকজন খাচ্ছে, দুপুর থেকেই খাওয়া-দাওয়া, কিন্তু কই ? লোকের ভিড় তো দেখছি না। সব কি চলে গেছে নাকি। না কি বাড়ী ভুল করলুম। (পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া) ঐ তো ও-ঘরে ক'টি বামুন বসেছে। ঐ কটি বামুন—হুঁহ, বোধহয় ঠিকানায় ভুলই হয়েছে। (আঘ্রাণ লইয়া) হুঁ, মাছ ভাজার গন্ধ আসছে। তবে তো শ্রাদ্ধ বাড়ী নয়। ও—তাই বটে (বাহিরের দিকে চাহিয়া) দরজায় কলাগাছ আম্রপাতা রয়েছে না ? (চারিদিকে চাহিয়া) নতুন বাড়ী। নিশ্চয় গৃহ-প্রবেশ। তা হলে এমন সময় তো ভিড় হবে না। আর ভিড় না হলে আমারও সুবিধে হবে না। তাই তো ফিরে যাব ? যাই, রাত্তিরে বরং চেষ্টা দেখা যাবে। এ বেলা আর ভগবান মাপেন নি।

প্রস্থানোদ্যত। প্রসন্নবাবুর বাহির হইতে প্রবেশ। মুখোমুখী হইয়া বঙ্কু অপ্রস্তুত। পরক্ষণে সপ্রতিভ হইবার চেষ্টা করিয়া

বঙ্কু। আপনি আমাকে বোধহয় চিনতে পারছেন না ? আমি—আমি—

প্রসন্ন। বিলক্ষণ। আস্তাজ্ঞে হোক, আস্তাজ্ঞে হোক। নমস্কার, বসুন, বসুন।

বঙ্কু। না, না, থাক থাক, এখন আর—

প্রসন্ন। সে কি কথা। ওরে ভগা, তামাক দিয়ে যা।

বঙ্কু। না, না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

প্রসন্ন। কিছু না, কিছু না। কিছু ব্যস্ত হইনি। এই চাকরগুলো হয়েছে এমনি, সকাল থেকে একটা কাজে পাবার জো নেই। (উচ্চৈঃস্বরে।) ওরে ভগা—নাঃ, এদের জ্বালায় দেখছি আর লোকের কাছে মানসম্ভ্রম থাকে না। দেবো সব বিদেয় করে—

ভগার প্রবেশ

ভগা। বড়বাবু ডাকছিলেন ?

প্রসন্ন। এই যে ভগু, একটা নতুন হুঁকো করে তামাক সেজে আনোতো। বাড়ীতে ভদ্রলোক এলে এক কল্কে তামাক দিতে হয়, এ তোমরা দেখনি।

ভগার প্রস্থান

বঙ্কু। তাহলে ইনিই বড়বাবু। (প্রকাশ্যে) আপনি স্থির হয়ে বসুন বড়বাবু।

প্রসন্ন। না না, আমি আর এখন বসব না। আপনি বসুন, আপনি বসুন। (বলিতে বলিতে উভয়েই সোফায় বসিলেন) আমার কী আর বসবার সময় আছে।

বঙ্কু। তা তো বটেই, এ একটা বিরাট কার্য্য, একটা যজ্ঞের ব্যাপার।

প্রসন্ন। আজ্ঞে হ্যাঁ, যা বলেছেন। গৃহ-প্রবেশ তো নয়, যেন দুর্গোৎসব কাণ্ড। আমার কি আর একদণ্ড স্থির হবার জো আছে।

এই অজগরের পাহাড় করে বসিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। অনেক বেলা হয়ে গেল।

বঙ্কু। তা হোক, তা হোক। বৃহৎ কর্মে বেলা একটু অমন হয়েই থাকে। একে বেলা বলে না—

প্রমথ। তাইতো, আপনাকে তামাক টামাক—ওরে ভজা, (উঠিয়া) কিছু মনে করবেন না, আমি একবার ওদিকে দেখি—

বলিতে বলিতে প্রমথবাবু কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় সোফার উপরেই বঙ্কুবাবুর হাত ঠেকিল সোফার কোণে এক গুচ্ছ চাবির উপর। তিনি চাবির রিংটা তুলিয়া ধরিলেন। রিং হইতে একটি নাতিদীর্ঘ চেন ঝুলিতেছে।

বঙ্কু। এই যে, আপনার চাবিটা ফেলে যাচ্ছেন, বড়বাবু।

প্রমথ। (একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়াই হাত বাড়াইলেন) আমার চাবি? ও হাঁ, দিন। (চাবি লইয়াই পকেট ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিলেন) আচ্ছা, আপনি তাহলে বসুন, আমি একটু— প্রস্থানোদ্যত

বঙ্কু। এইবার সরে পড়া যাক।

দ্বারের নিকট সুকুমারীকে দেখিয়া প্রমথবাবু দাঁড়াইলেন

প্রমথ। এই যে, ওগো, বাটীতে গোটাকতক পান আর তামাক—এই ভজা ব্যাটা কোথায় গেল বলতো। উনি সেই থেকে এসে বসে আছেন, এক কণা তামাক এখনো পর্যন্ত—

বঙ্কু। আহা, আমার জন্যে কিছু ব্যস্ত হবার দরকার নেই, আর মালক্ষ্মীকেও মিথ্যে ব্যস্ত করা। আমাকে এত খাতির করবার আবশ্যক নেই।

প্রমথ। বিলক্ষণ। খাতির আর কোথায় বলুন। দয়া করে এসে দাঁড়িয়েছেন, এই আমাদের সৌভাগ্য।

বঙ্কু। সে কি কথা, আমার তো আর কি বলে—নেমন্তন্ন খেতে আসা নয়।

প্রমথ। তাতো বটেই, আপনি তো আর পর নন। আচ্ছা, তুমি তাহলে ওঁকে দেখো— ব্যস্তভাবে প্রস্থান

বঙ্কু। আবার কেন ব্যস্ত করা ওঁকে।

সুকুমারী। (স্বগতঃ) ইনিই বঙ্কুবাবু বুঝি। (নিকটে আসিয়া) এ আর ব্যস্ত করা কি কাকাবাবু।

প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন

বঙ্কু। (একটুই বিব্রত হইল) আহাহা, থাক থাক, আমাকে আবার প্রণাম করা কেন মালক্ষ্মী।

সুকুমারী শুনিল না, পায়ের ধূলি লইয়া প্রণাম করিল

সুকুমারী। আপনার খুব কষ্ট হয়েছে, এই রদ্দুরে, এক দেশ থেকে এক দেশে। আমি ঠাকুরপোকে সেই ভোর থেকে বলছি। তা শুনেও একলা সব জায়গায় যেতে হচ্ছে। উনি তো এদিকেই ব্যস্ত আছেন।

বঙ্কু। তাতো বটেই, তাতো বটেই।

সুকুমারী। আপনি যে এ বেলাই আসতে পারবেন, তা আশা করতে পারি নি।

বঙ্কু। হাঁ, এই মনে করলুম—যাবো একুনি চলে, ভাবলুম যাই বেড়াতে বেড়াতে, এই আর কি।

সুকুমারী। আপনি একটু বসুন কাকাবাবু, আমি চট করে এক গেলাস সরবৎ করে নিয়ে আসছি।

বঙ্কু। না মা, কিছু দরকার নেই মা।

সুকুমারী। সে কি কথা কাকাবাবু, এই রদ্দুরে আসছেন, মুখ শুকিয়ে গেছে। আপনি একটু বসুন।

দ্বারের কাছে খোকনের আবির্ভাব। সে ধীরে ধীরে আসিয়া
মায়ের পা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

সুকুমারী। প্রণাম কর। কী অসভ্য ছেলেরে, দাদুকে প্রণাম কর।

খোকন প্রণাম করিল

বঙ্কু। (সস্নেহে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া) তোমার নামটি কি ভাই?

খোকন। পরিমল, না না, আমার নাম শ্রীপরিমলকুমার মিত্র।

বঙ্কু। বাঃ, আচ্ছা, তোমার বাবার নাম কি বলতো দেখি।

খোকন। বাবার নাম? বাবার নাম—শ্রীযুক্তবাবু প্রমথকুমার মিত্র। মার নাম বলব?

বঙ্কু। (সহাস্যে) মার নাম বলতে হবেনা ভাই। মার নাম আমি জানি।

খোকন। জানেন? কী করে জানলেন?

বঙ্কু। আমারও যে মা হয় ভাই। তাই জানলুম।

খোকন। আর জানেন দাদু, মা কিন্তু বাবার নাম জানে না। এতবার করে বলে দিয়েছি তবু বলতে পারে না, বলে ভুলে গিয়েছি। কী আশ্চর্যি, আর সকলের নাম মনে থাকে আর এই নামটা মার মনে থাকে না। আচ্ছা এই বারও তো বলে দিলুম। মা বলো তো দেখি।

বঙ্কু। (সহাস্যে) তোমার মতন কি আর মার অত বুদ্ধি আছে দাদু?

সুকুমারী হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতেছিলেন, দ্বারের
কাছ হইতে ফিরিয়া বলিলেন—

খোকন্, দাদুকে যেন জ্বালাতন করো না। পাখা দিয়ে হাওয়া কর।

সুকুমারীর প্রস্থান

খোকন পাখা লইয়া হাওয়া করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বঙ্কু। না দাদু, তোমাকে হাওয়া করতে হবে না। তুমি যাও খেলা করগে।

খোকন। না, মা যে বলে গেল হাওয়া করতে।

বঙ্কু। (স্বগত) আহা, কী লক্ষ্মীর সংসার। (প্রকাশ্যে) হাঁ খোকন, তোমার বাবা তো হাইকোর্টের উকীল, না?

খোকন। না, বাবা তো আপিসে যান, আমি জানিনা বুঝি। বাবার কিসের আপিস। বাবা আপিসে যান, কাকু আপিসে যায়, আমিও আপিসে যাব; আর একটু বড় হয়ে নি, দাঁড়াও না।

এমন সময় ডাকু একটি 'জগ' হাতে করিয়া জল পরিবেশন করিবার ভান করিয়া প্রবেশ করিল। মাথা নীচু করিয়া 'জল চাই, আপনাকে জল দোব' ইত্যাদি বলিতে বলিতে কয়েক পা আসিয়া অপরিচিত লোক দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ও বঙ্কুবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল

খোকন। এর নাম কী জানেন দাদু? এর নাম ডাকু। উঃ, ও যা দুষ্টুমি করতে পারে। তাই জন্যে ঠাকুমা বলে ও আর জন্মে ডাকাত ছিল। এই ডাকু, দাদুকে প্রণাম করলি না? রসো, আমি বাবাকে বলে দিচ্ছি।

ডাকু তাড়াতাড়ি এক পায়ের উপর স্পর্শ করিয়া প্রণাম সারিল

ডাকু। তুমি দাদু হও?

খোকন। (কঠিন স্বরে) ডাকু—উ। তুমি দাদুকে তুমি বলে? দাঁড়াও বাবাকে বলছি। মা না বলে দিয়েছে বড়দের আপনি বলতে।

ডাকু। তবে দাদুকে তুমি আপনি বল না কেন? (বঙ্কুবাবুর হাস্য)

খোকন। তুমি তর্ক করছ আমার সঙ্গে? দাঁড়াও, আমি বাবাকে বলছি।

ডাবু। কই ভয় করছি। আমি তো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। না রে।

খোকন। কেন ভয় করছ? দাদুমণির দাদুকে আপনি বল।

ডাবু। যাও, বলব না যাও। (ঠোঁট ফুলাইয়া মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল)

বঙ্কুবাবু এই মধুর কলহ দেখিতেছিলেন। এ দৃশ্য অনেকদিন তাঁহার অদেখা। এখন অভিমান-ক্ষুব্ধ ডাবুকে সাদরে কাছে টানিয়া লইলেন।

বঙ্কু। না দাদু, তোমাকে আপনি বলতে হবে না। তুমি এসো আমার কাছে এসো। তোমার নাম বুঝি ডাবু?

ডাবু। নাঃ। ওটা তো খারাপ নাম, বিচ্ছিরি নাম। আমার ভালো নাম আছে। সেটা হল—শ্রী শতদলকুমার মিত্র।

বঙ্কু। খাসা নাম।

ডাবু। বাবার নাম বলব? বাবার নাম পেসন্ন। (তর্জনী উঁচাইয়া) কিন্তু পেসন্ন বলতে নেই। খালি ঠাকুমা বলবে পেসন্ন। (বঙ্কুর পাকা গোঁফ হাত বুলাইয়া দেখিতে দেখিতে) তোমার—আপনার বেশ গোঁফ। হ্যাঁ দাদু, তোমার দাড়ি নেই কেন?

বলিতে বলিতে জানুর ওপর উঠিয়া বসিল

বঙ্কু। দাড়ি? দাড়ি—

ডাবু। দাড়ি কেন হয় দাদু? কী করে দাড়ি করে?

খোকন ক্ষুব্ধ হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল

বঙ্কু। দাদু, কোথা যাচ্ছ?

ডাবু। ও থাকগে। তুমি বল না দাড়ি কী করে' করে?

বঙ্কু। দাড়ি করতে হয় না ভাই। বড় হলে আপনিই হয়।

ডাবু। তবে তোমার হয় নি কেন?

বঙ্কু। হয়েছিল, কেটে ফেলেছি।

ডাবু। কেন? সকলে খালি কেটে ফেলে। বাবাও কেটে ফেলে, কাকুও কেটে ফেলে। আমার যখন দাড়ি হবে, আমি সব রেখে দোবো, (হাত প্রসারিত করিয়া) এ্যাত্তো বড় দাড়ি হবে (আরও প্রসারিত করিয়া] এ্যা-া-তো বড় হবে।

সরবৎ ও খাবার লইয়া সুকুমারীর প্রবেশ, সঙ্গে খোকন

খোকন। ঐ দেখ মা, ডাবুটা দাদুর কোলে উঠেছে, আর—আর কী রকম জ্বালাতন করছে, দেখছ?

সুকুমারী। ডাবু, তুমি দাদুকে বিরক্ত করছ বুঝি? কোল থেকে নেমে বসো।

বঙ্কু। না না না, বিরক্ত তো করে নি, থাকুক না।

ডাবু মা'য়ের কথায় নামিয়া সোফায় বসিল

সুকুমারী। নিন, কাকাবাবু, এইটুকু খেয়ে নিন।

সুকুমারী রেকাবি, গ্লাস টেবিলে রাখিয়া পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিল। বঙ্কু এই অপ্রত্যাশিত যত্নে অভিভূত হইল

বঙ্কু। এ তুমি কী করেছ মা। এত খাবার, সরবৎ—

সুকুমারী। কোথায় এত? কী বেলাটা হয়েছে দেখুন দিকি। নিন খেয়ে নিন।　　বঙ্কু আহারে প্রবৃত্ত হইল

ডাবু। দাদু, তুমি নেমন্তন্ন খাবে? ও, তোমাকে বুঝি বাবা নেমন্তন্ন করেছে, না?

বঙ্কু। নেমন্তন্ন? হ্যাঁ, নেমন্তন্ন—হ্যাঁ—না তাই আমাকে নেমন্তন্ন করে নি।

ডাবু। তবে তুমি আমাদের বাড়ী এসেছ কেন?

সুকুমারী। মার খাবি? ঐ কথা বলতে আছে দাদুকে?

বঙ্কু। আহা, বকুক না মা, ঠিকই বলেছে। (একটু থেমে) আমি এমনিই এসেছি দাদু, আমায় আর নেমন্তন্ন করে না কেউ ভাই, আমি লুচি ভাজার গন্ধ পেলেই আসি।

ইহার সত্যতা না জানিয়া পরিহাস মনে করিয়া সুকুমারী হাসিল

খোকন। ডাবুটা কী বোকা দেখেছ মা, দাদু বল যে। দাদুকে কি নেমন্তন্ন করতে হয়।

সুকুমারী। বাড়ীর সবাইকে আনলেন না কেন কাকাবাবু?

বঙ্কু। হ্যাঁ, বাড়ীর সবাই? বাড়ীর সবাই—মানে, বাড়ীই নেই তা বাড়ীর সবাই　　ম্লান হাসি হাসিল

সুকুমারী। (স্বগতঃ) আহা, গিন্নী বুঝি নেই, তাই এই অবস্থা। (প্রকাশ্যে) কাকাবাবু, আপনি ওপোরে বসবেন চলুন। যাও খোকন, ডাবু, দাদুকে নিয়ে ওপরের ঘরে বসাও গে, আমি ভজুকে দিয়ে তামাক পাঠিয়ে দিচ্ছি।　　প্রস্থান

ইতিমধ্যে বঙ্কুবাবুর জলযোগ হইয়া গেল। ডাবু একাই গ্লাস, রেকাবি, কাপ লইয়া বাড়ীর মধ্যে যাইতেছিল। খোকন বলিল—তুই পারবি না, ডাবু, দে আমাকে দে ইয়াসি। ডাবু শুনিল না। সে চলিয়া গেল, পিছনে পিছনে খোকন যাইতেছিল, দরজার নিকটে পৃথীশকে দেখিয়া—

খোকন। কাকু, তোমার কাছে পান আছে? দাও তো।

পৃথীশ। পান? কি করবি? না না, এখন পান খেতে নেই, যাঃ।

খোকন। না গো আমি খাব কেন, দাদুকে দেবো, দাও না।

পৃথীশ। দাদু? দাদু আবার কে?

খোকন। ঐ যে আমাদের দাদু। মা বলে কাকাবাবু, আমরা বলি দাদু। দাও না পান।

পৃথীশ। ও। তা মা বাড়ীর ভেতর থেকে নিয়ে আয়, যা।

পৃথীশ যেখানে ছিল সেখান হইতে সোফার আড়াল হওয়াতে বঙ্কুর মাথার পিছন মাত্র দেখা যাইতেছিল, সে বাহিরে চলিয়া গেল। খোকন ভিতরে গেল।

বঙ্কু। এরা আমাকে ভদ্র লোক বলে ভুলই করেছে। কিন্তু বৌটি যেন লক্ষ্মী, আমি যেন ঠিক এর নিজেরই কাকাবাবু। উঞ্ছবৃত্তি করে, এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে এতকাল কাটালুম। এমন করে যত্ন করে আমাকে আর কেউ খাওয়ায় না, এমন মিষ্টি কথাও কতকাল শুনি নি। ভুলেই গেছি। সংসারের আদর যত্ন, ছেলেমেয়েদের খেলা ঝগড়া, এসব আর যেন মনেই পড়ে না। (দীর্ঘশ্বাস) বুড়ো বয়সে বাকী কটা দিন এমনি একটি লক্ষ্মীর সংসারে আশ্রয় পেতুম! আর ঘুরে বেড়াতে পারি না। না গো! যাই এই বেলা পালাই।

উঠিল, কিন্তু পরমুহূর্তে খোকনের প্রবেশ।

খোকন। দাদু, আপনি ওপোরে চলুন। মা বল্লে।

বঙ্কু। না না, আমি আবার ওপোরে যাব কেন। আমি এইখানেই বেশ আছি। তুমি ওপোরে যাও দাদু, খেলা কর গে।

খোকন। না, মা বল্লে যে। আপনি চলুন।

হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল

ডাবুর প্রবেশ

ডাবু, ধর্ তো দাদুকে, ধরে নিয়ে চল্।

বঙ্কুর অপর হাত ডাবু ধরিয়া টানিল

চলুন না। ওপোরে দেখবেন আমার খরগোস আছে।

ডাবু। আর আমার বিলিতি ইঁদুর আছে, কী ফর্সা, সাহেবের বাচ্চা কিনা।

খোকন। দেখবেন খরগোস কেমন টুপ টুপ করে আলু ভাজা খায়, কি চালাক দেখবেন।

চাবু। ইঁদুর ওর চেয়ে চালাক, সাহেব কিনা।

বটু একবার ইহার মুখে একবার উহার মুখে দেখিতে দেখিতে উভয়ের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে গেল।

প্রসন্নবাবু ও কয়েকটি ব্রাহ্মণের প্রবেশ

প্রসন্ন। বড্ড দেরী হয়ে গেল খুড়ো মশাই। নতুন জায়গায় সব যে বন্দোবস্ত।

১ম ব্রাহ্মণ। কিছু না কিছু না। এরকম হয়েই থাকে ভাই। ওর জন্যে কিছু ভেবো না, বেলা তিনটের আগে আর ব্রাহ্মণ ভোজন কোথায় হয় বল। তা নইলে আর মধ্যাহ্ন ভোজন বলেছে কেন, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রসন্ন। আপনাদের বড্ড কষ্ট দেওয়া হল। কই পঞ্চাননদাকে দেখছি না যে, তিনি এলেন না বুঝি?

২য় ব্রাহ্মণ। না না, পচু এসেছে বইকি। এই যে একটু আগে উঠে গেল।

১ম ব্রাহ্মণ। তা হলে নিশ্চয় ওপারেই গেছে। ছেলেদের খাবার বন্দোবস্ত করতে। হাঃ হাঃ।

প্রসন্ন। তা হলে এসেছেন তো?

৩য় ব্রাহ্মণ। হাঁ মিত্তির মশাই, সে জন্যে চিন্তা করবেন না। পচু এসেছে এবং এতক্ষণে বোধহয় কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে পাড়া করে বসেই গেছে। ছেলেদের খাবার বন্দোবস্ত করার মানেই তাই, বুঝলেন না।

সকলের হাস্য

৪র্থ ব্রাহ্মণ। খাসা বাড়ী করেছ, দেখন্ ভাই। বাড়ীতো না একেবারে অট্টালিকা। ইন্দ্রপুরী কোথায় লাগে।

৫ম ব্রাহ্মণ। বাবা আমাদের ইন্দ্রপুরী ঘুরে এসেছ নাকি?

প্রসন্ন। সবই আপনাদের আশীর্ব্বাদ, দাদা, সবই আপনাদের আশীর্ব্বাদ। চলুন দাদা—

"হাঁ, হাঁ চল চল," বলিতে বলিতে সকলের প্রস্থান

বাহির হইতে পৃথ্বীশের প্রবেশ, পশ্চাতে মুটের মাথায় হার্মোনিয়াম ও বাঁয়াতবলা

পৃথ্বীশ। ভজা, ভজা। আচ্ছা তুম ইধার রাখ্দো।

পয়সা বাহির করিয়া ও মুটেকে পয়সা দিয়া বিদায় করিল

ভিতর হইতে প্রসন্নবাবুর কণ্ঠ শোনা গেল—"ভজা, কার্পেটটা ওপারে আনলি?" ভজার কণ্ঠ—"আজ্ঞে, এই যে নিয়ে যাচ্ছি বড়বাবু।"

ভজার প্রবেশ

পৃথ্বীশ। হ্যাঁরে, তোর আক্কেলটা কী বল্ তো?

ভজা। সকাল থেকে পাঁচ কাজে ছুটে মরছি ছোটবাবু, এখুনি সেরে ফেলছি।

ভজা কার্পেট তুলিতে আসিয়া ছোটবাবুর কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হইল।

পৃথ্বীশ হার্মোনিয়াম, তবলা গুছাইয়া রাখিতেছিল, প্রথমে দেখে নাই ভজা কী করিতেছে। পরে দেখিতে পাইয়া—

পৃথ্বীশ। এ কী করছিস?

ভজা। এই যে, কতক্ষণ লাগবে বাবু।

পৃথ্বীশ। কতক্ষণ লাগবে কীসের? তুই এখানে পাঠালি যে বড়?

ভজা। আজ্ঞে হাঁ, আপনি তো সকাল থেকে তাই বলছেন।

পৃথ্বীশ। হুঁ, কিন্তু বড়বাবু এইমাত্র কী বললেন? কোথায় নিয়ে যেতে বললেন?

ভজা। আজ্ঞে, তাঁর ইচ্ছে এটা ওপারের বড় ঘরে পাতা। ছেলেদের খাবার তরে—

পৃথ্বীশ। তবে ওপারে না নিয়ে গিয়ে মুড়্‌লী করে এখানে পাতবার মানে? আবার কে ওপারে নিয়ে যাবে, না? বড়বাবুর কথা তোমার শোনাই হলনা? মাথে বড়বাবুর বকুনি খেয়ে মরিস।

ভজা। না—তা—আমি তো বলুন—তা আপনি যে রাগ করলেন।

পৃথ্বীশ। রাগ করলুম কী রে? ছি ছি ছি, তোর যদি একটু আক্কেল থাকে। বুড়ো হয়ে গেলি, একটা বিবেচনা করে কাজ করতে পারিস না। আরে বড়বাবু আমার চেয়ে কতো বড়, শুধু বড় না অনেক বড়, তা জানিস?

ভজা। আজ্ঞে হাঁ, বড়বাবুও তাই বলছিলেন—

পৃথ্বীশ। এও তোমাকে বলে দিতে হবে? যা, শীগ্‌গির এটাকে গুটিয়ে ওপারে নিয়ে যা। এখানে সেই বড় সতরঞ্চিখানা আর চাদর পেতে দিবি বুঝলি?

ভজা এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া, পরে ঘাড় নাড়িয়া কার্পেট গুটাইতে শুরু করিল।

প্রসন্নবাবুর প্রবেশ

প্রসন্ন। এই যে পিতু, ব্রাহ্মণদের বসিয়ে দিয়ে এলুম, বাপ্। হাঁ, দেখ তোমার মাষ্টার মশাইকেও এই সঙ্গেই বসিয়ে দিলে না কেন?

পৃথ্বীশ। আমার মাষ্টার মশাই? কই, তাঁকে তো আমি নেমন্তন্ন করিনি।

প্রসন্ন। করনি? ভুলে গেছ? ছি ছি, তোমার কিছু মনে থাকে না। তাঁর ক্রটী হয়ে গিয়েছে তো? কিন্তু কী মহৎ লোক দেখ, নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখেন নি। নিজেই এসেছেন।

পৃথ্বীশ। (বিস্মিত) কিন্তু আমার মাষ্টার মশাই তো এখানে নেই দাদা, তুমি কার কথা বলছ? কে এসেছেন?

প্রসন্ন। বাঃ, নেই কী রকম? এই যে একটু আগে এখানে বসেছিলেন। পাকা গোঁফ।

ভজা কার্পেট গুটাইয়া বাধাইয়া তুলিবার উপক্রম করিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল—

ভজা। তিনি তো আমাদের মা'র কাকা হন, বাবু।

প্রসন্ন। কার? বড়বৌয়ের? কাকা? ও, তা কোথায় তিনি? চলে গেলেন নাকি?

ভজার প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিয়া দেখিলেন তাহার কার্পেট তুলিতে অসুবিধা হইতেছে। দেখিয়া অভ্যাসমত তাহাকে সাহায্য করিলেন। কথাও চলিতে ছিল

ভজা। আজ্ঞে না, সে বুড়োবাবু তো ওপারে আছেন। মা তাঁকে বলেছেন তাঁড়ার আগলাতে, তিনি ভাঁড়ার ঘরের দোরে বসে আছেন।

কার্পেট তখন মাথায় উঠিয়াছে

প্রসন্ন। তা হলে পিতু, তুমি ভাই একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করে এসো, তিনি এখন বসবেন কিনা। ততক্ষণ তুমিই বরং ভাঁড়ারটা আগলাও। (ভজার প্রতি দৃষ্টি পড়িল) তুই বেটা আবার এটাকে নামিয়ে এনেছিস?

ভজা। আজ্ঞে না, আবার তো নয়, সেই সকালেই এনেছিলাম।

প্রসন্ন। সকালেই বা এনেছিলি কেন? বা খুশী তাই তোরা করছিস। ভালো জিনিষটা নীচে একবার আনলে আর কী আস্ত থাকবে?

পৃথ্বীশ প্রায় বাহির হইয়াছিল। শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া বলিল

পৃথ্বীশ। না দাদা, ওটা ওর দোষ নেই। আমিই ওটা নিচে আনতে বলেছিলুম। যা, ওপারে নিয়ে যা।

পৃথ্বীশ বাহির হইয়া গেল

প্রসন্ন। (প্রত্যাগত জগাকে) জগ, শোনো। (জগা ফিরিল) ছোটবাবু নিচে আসতে বলেছিলেন, কেন রে?

জগা। এই ঘরে পাঠাবার জন্যে।

প্রসন্ন। তবে আবার ওপোরে নিয়ে যাচ্ছিস কেন রে?

জগা। আজ্ঞে, আপনি ওপোরের বড় ঘরে পাঠাতে বলছিলেন কি না তাই।

প্রসন্ন। বলেই না আমি বলেছিনু। ছোটবাবু আমার চেয়ে বয়সে ছোট, তা তো জানিস?

জগা। আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি বইকি বাবু।

প্রসন্ন। তবে? ছোটবাবুর কথাটা থাকবে না, আর আমার কথাটাই থাকবে? ছোটবাবুর বন্ধুবান্ধব আসবে, গান বাজনা হবে। নামা বেটা, পাত্ এখানে।

জগা। ছোটবাবু যদি রাগ করেন।

প্রসন্ন। করুক রাগ। আমি ছোটবাবুর চেয়ে কত বড় সেটা খেয়াল আছে? আমার কথার ওপর ছোটবাবুর রাগ? আমি বলছি তুই এটা এঘরে পেতে দে। ওপোরে একটা সতরঞ্চি আর চাদর পেতে দিলেই হবে। কিরে, সংয়ের মতন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে?

জগা। আজ্ঞে না।

প্রসন্ন। আজ্ঞে না আবার কী? যা বলুম চটপট কর, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

জগা। আজ্ঞে হাঁ। তাই ভাবছি, এক কাজ করলে হয় না বাবু?

প্রসন্ন। কি?

জগা। সিঁড়িতে কি কার্পেট পাতা—মানে, নীচেও হল ওপোরেও হল, দুজনের কথাই রক্ষে হয়—

প্রসন্ন। বেটা চাষা কোথাকার। সিঁড়িতে কার্পেট পাতবি কী রে? পাগল না মাথা খারাপ?

জগা। (স্বগত:) দুইই হয়েছি বোধ হয়।

ব্যস্তভাবে পৃথ্বীশের প্রবেশ

পৃথ্বীশ। দাদা—

প্রসন্ন। হ্যাঁ।

জগা। ছোটবাবু, এই কার্পেটটা—

পৃথ্বীশ। তুই থাম্। দাদা—

প্রসন্ন। হ্যাঁ, বল।

জগা। বলছিলাম কার্পেটটা কি—

পৃথ্বীশ। দাদা—

প্রসন্ন। হ্যাঁ, ভাই, ওটা আমিই—

জগা। আপনারা দুজনে একরকম হয়েছেন, এটা ওপোরে পাঠাবো না নিচে—

পৃথ্বীশ। চুলোয় যাক তোর কার্পেট। (ধাক্কা দিয়া কার্পেটটি মাথা হইতে ফেলিয়া দিল) দাদা, অনেক কাণ্ড হয়েছে।

প্রসন্ন। কি, কি, কি হয়েছে?

পৃথ্বীশ। বড় বড় জোচ্চোরের পাল্লায় পড়া গেছে।

প্রসন্ন। সে কি? কোথায়?

পৃথ্বীশ। ঐ যে বুড়ো এসেছে—জগা বলে—বৌদির কাকা, বৌদিকে বলুম, বৌদি বলছেন ও মোটেই তাঁর কাকা নয়। ও নাকি সেই চাটুজ্যে।

প্রসন্ন। চাটুজ্যে? কে চাটুজ্যে?

পৃথ্বীশ। ঐ যে তোমার কোন বন্ধু মারা গেছেন, তাঁর বাবা, বাগবাজারে থাকেন।

প্রসন্ন। হাঁ, হাঁ, পরেশবাবু এসেছেন? চল, চল, একবার দেখা করে আসি।

পৃথ্বীশ। না না, ও নাম করেও পরেশ চাটুজ্যে নয়। আমি নিজে পরেশবাবুকে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিনু। তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। তিনি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আজ এক সপ্তাহ শয্যাগত, কোমরের ব্যথায় নড়তে পারছেন না।

প্রসন্ন। বটে? তাহলে তো বড় ভাবনার কথা হল পিন্টু!

পৃথ্বীশ। ভাবনার কথা নয় কি? এখুনি জামাইবাবুকে খবর দিয়ে দি। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, একটা না হয়—

প্রসন্ন। তাঁকে খবর দিয়ে কী হবে? ভাল ডাক্তার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বললে তো আর কোমরের ব্যথা শুনবে না।

পৃথ্বীশ। আহা, সে পরেশবাবুর জন্যে এখন ভাবছি না, তাঁর অসুখ তেমন মারাত্মক নয়।

প্রসন্ন। নয়? যাক্, তাহলে ভয় নেই কিছু? তবে কালেই না হয় যাব'খন। কি বল?

পৃথ্বীশ। তা না হয় যেও। কিন্তু ভয়ের কথা এদিকে যথেষ্ট রয়েছে। এই যে লোকটা তোমার কাছে সেজেছে আমার মাষ্টার মশাই, বৌদিকে বলেছে ও পরেশ চাটুজ্যে, আবার লোকজনের কাছে পরিচয় দিয়েছে বৌদির কাকা বলে। তারপর একেবারে ঠেলে ভাঁড়ারে গিয়ে উঠেছে। এ তো সহজ লোক নয়।

জগা। আজ্ঞে, মায়ের চাবির রিংটা দুপুর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে সব আলমারী সিন্দুকের চাবি আছে।

প্রসন্ন। চাবির রিং?

জগা ঘাড় নাড়িল

পৃথ্বীশ। পাওয়া যাচ্ছে না?

জগা পুনরায় ঘাড় নাড়িল

প্রসন্ন। সে কি?

জগা। আজ্ঞে হাঁ।

পৃথ্বীশ। বলিস কি রে?

জগা। আজ্ঞে হাঁ।

প্রসন্ন ও পৃথ্বীশ হাঁ করিয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল

(ক্রমশ:)

আগামী

শ্রীসুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দিক্ দিগন্তে চঞ্চল ক্রন্দন তোমার উধাও উদ্দাম হাহাকার
কেন ফেলে দিলে চম্পক কঙ্কণ তুমি কি আমায় করেছ অস্বীকার।
বন-অরণ্যে শকুনির কোলাহল
উদ্দাম ঝড়ে ফুল ঝরে গেছে জানি
শ্বাপদের ত্রাসে কোথায় হরিণীদল
প্রতি রাতে তবু কোকিল ডেকেছে বাণী!

মনের নিভৃতে আগামী তৃপ্তি জাগে
মৃদু মর্মরে বনে বনে কম্পন
মেঘের আড়ালে বসন্তী দিন আসে
তুলে নাও তুমি চম্পক কঙ্কণ!
আসে কল্যাণী কাঁপে সমারোহ ভার
আমি ফাল্গুনী করো না অস্বীকার।

সাহিত্যে জলধর

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮শে চৈত্র ১৩৪৫ সালে সুলেখক রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয় পরলোকগমন করেছেন। সারল্য ও পবিত্রতার প্রতীক, নিরভিমানী 'জলধর দাদা' বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁর গুণাবলীর ছাপ রেখে গিয়েছেন। তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন হয়ে, বাল্য ও কৈশোর দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়ে তাঁর অগ্রজের কুমারখালি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে ১০৲ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের সাহায্য সত্ত্বেও, পারিবারিক অশান্তি ও অর্থাভাবের জন্য কলেজের পড়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। দুই বৎসর বিবাহিত জীবনের পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পত্নী কন্যা ও মাতার বিয়োগে এই সংসার-যন্ত্রণায় অসহায় যুবকের অন্তরে বৈরাগ্য উদয় হয়। তাঁর ভাষায় বলি—"জীবনে কখনও কবিতায় লেখা করি নাই, প্রভাত বায়ু মধুময়, নক্ষত্রখচিত প্রস্ফুটিত কুসুমের স্নিগ্ধশোভা কখনও আমাকে ব্যাকুল করে নাই। মহাকঠোর কর্তব্য লইয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে জীবনপথে অগ্রসর হইতেছিলাম, হঠাৎ একদিন কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়ায় যে দিকে চক্ষু গেল, সেই দিকে চলিলাম। ইহাই আমার ভ্রমণের ইতিহাস।—কেহ পর্যটনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণে বাহির হয়, কেহ বা জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে; কিন্তু পৃথিবীর সকলে সমান নয়; এমনও দেখা গিয়াছে, কেহ কেহ তাড়িত-উৎপাত সহিয়া, কেহ বা নরশোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে; কিন্তু এ সকল ভিন্ন এমনও দুই একজন হতভাগ্য লোকের অভাব নাই, যাহারা শ্মশানক্ষেত্রে জীবনের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়া, উদাস হৃদয়ে, ব্যাকুল অন্তরে, লক্ষ্যহারা ধূমকেতুর ন্যায় এক অনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়াছে। সেই মহতীর লেখনী তরুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন কুসুম-সুরভি পরিব্যাপ্ত, মধুর সমীরণ হিল্লোলিত এবং বিহঙ্গকাকলীমুখরিত বহিঃপ্রকৃতির নিত্যসৌন্দর্যে মণ্ডিত থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার মধ্যে যে সৌন্দর্য গ্রহণের অধিকারী নহে…সেই মহাশূন্য হৃদ, প্রকৃতির সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ মহৎ সৌন্দর্য প্রাণ দিয়া উপভোগ করিতে পাই নাই বটে, তথাপি দেশে দেশে ঘুরিয়াছি।"

১৮৯০ জুন মাসে তিনি পশ্চিম যাত্রা শুরু করে দেরাদুনে এলেন। সেখানে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী অধিবাসীগণ অল্প দিনেই তাঁকে আপনার করে নিল—কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতাকার্যে ব্যাপৃত থেকেও মনকে সুস্থির করতে পারলেন না। তাঁহার ভাষায় বলি—"মনের মধ্যে স্থায়ী একটা দুর্দমনীয় বাসনা হোত, একেবারে পাহাড়ের মধ্যে ডুবে যাই—খুব একটা লম্বা পথে যাত্রা করি; নিতান্ত পথের সন্ধান না হয়, নিরুদ্দেশ-যাত্রাই করা যাক্! তাতে কার কি ক্ষতি?" এখন জীবনে তাঁর বন্ধুবৎসল কাপ্তান হরিদাস'র প্রভাব ও তাঁর স্বাভাবিক বিদেশ-ভ্রমণের ইচ্ছা তাঁর শোক-ক্লিষ্ট মনকে চালিত করেছিল। ৮ই মে ১৮৯০ তিনি দেরাদুন হতে হিমালয়ের উদ্দেশে পদব্রজে যাত্রা করে দুই তিন মাস পরে দেরাদুন ফিরে ছিলেন। বহুবার জীবন বিপন্ন করে, নানা অভিজ্ঞতা, বুদ্ধির উৎকর্ষ ও চিত্তের সম্পূর্ণ প্রসার লাভ করেছিলেন। এই কঠোর তপস্যার ফলে আমরা দেখতে পাই—সহজ সুন্দর বর্ণনায় তাঁর শক্তির বিচিত্র বিকাশ, প্রকৃত সৌন্দর্যবোধ, কল্পনার অনাড়ম্বরত্ব, মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি। এই সাধনার ফলে তিনি বাংলা সাহিত্যকে দিতে পেরেছেন Art without artifice. তাঁর রচনাকে সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—

(১) ভ্রমণ-কাহিনী (২) জীবন-কথা ও সমালোচনা (৩) ছোট গল্প (৪) উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ-কাহিনীর তিনিই প্রথম প্রবর্তক। ১২৯৯ সালের মাঘ মাসে (January 1893) "ভারতী ও বালকে" তিনি প্রথম লেখেন 'টপ্কেশর ও গুচ্ছপানি' ভ্রমণের কথা। ঐ সময় হতে প্রায় প্রতি মাসে 'ভারতী'তে ১৩০১ সালের ফাল্গুন পর্যন্ত, 'সাহিত্য' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩০১ হইতে ১৩০৮ পর্যন্ত, 'দাসী' পত্রিকায় ১৩০২।৩ সালের কয়েক সংখ্যায় ও প্রদীপের ১৩০৪।৫।৬।৭।৮ সালের সংখ্যায় তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হয়। তারপরে 'প্রভা', 'বাঁশরী', 'জাহ্নবী', ও 'ভারতবর্ষে' তাঁর ভারতের নানাস্থানের নূতন নূতন ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হয়ে বঙ্গভাষায় ভ্রমণ-সাহিত্যের সিংহাসন স্থাপন করেছে। (বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের 'জলধর কথা' ও স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের 'লেখনী' দ্রষ্টব্য)

রামমোহন রায় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বিলাতগমন করলেও বিলাতভ্রমণ সম্বন্ধে কোন রচনা প্রকাশ করেন বলে জানান নি।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "দ্বারকানাথের স্বর্গ ভ্রমণ" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের ষোল সতের বৎসর বয়সের রচিত উপন্যাস—ভ্রমণ-কাহিনী নহে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে I. C. Bose & Co কর্তৃক প্রকাশিত "Three years in Europe" নামক ইংরাজী পুস্তিকার সমালোচনায়, 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন "এ দেশীয় কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি, ১৮৬৮ সালে ইংলণ্ড গমন করেন। তথায় তিন বৎসর অবস্থিতি করেন। ইংলণ্ড হইতে সুহৃদগণকে পত্র লিখিতেন। তিন বৎসরে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তার কিয়দংশ সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। পুস্তকে লেখকের নাম প্রকাশিত হয় নাই।" রবীন্দ্রনাথ ১২৮৮-৮৯ সনের (ইং ১৮৮১) 'ভারতী'তে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইহা পরে পরিবর্তিত আকারে 'পাশ্চাত্য-ভ্রমণ' পুস্তকের গোড়ায় মুদ্রিত হইয়াছে। "য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী" ভূমিকা (১ম খণ্ড) ব্যতীত ১৫ই বৈশাখ ১২৯৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাতে ভ্রমণ বৃত্তান্ত নাই; "য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী" (২য় খণ্ড) ৮ই আশ্বিন ১৩০০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় "—ইহা ভ্রমণের ডায়েরী" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়' দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ১২৯৯ সনে মাঘ মাসের "ভারতী ও বালকে" প্রকাশিত জলধরবাবুর 'টপ্কেশর ও গুচ্ছপানি' ভারত ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে প্রথম। মনে রাখিতে হইবে সে যুগের ভারতের অবস্থা—যান-বাহনের দৈন্য, দস্যুর উপদ্রব, ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপ্তির অভাব, পান্থশালা ও বিশ্রামস্থানের বিশেষ অসুবিধা, চিকিৎসা ব্যবস্থায় একান্ত দুর্লভতা এবং বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর বুদ্ধিমত্তা ও প্রভাবের অপ্রসার। Elizabeth-এর যুগে Forbisher, Drake এবং Hakluyt যেমন ইংরাজী-ভাষায় Literature of Travel-এর প্রথম সূত্রপাত করেন, তেমনি Victoria-র যুগে এই দুই মহারথী (রবীন্দ্রনাথ ও জলধর) বাংলাভাষায় ভ্রমণ-সাহিত্যের অবতারণা করিয়াছিলেন।

জলধরের ভাষা ও ভাব ভ্রমণ-কাহিনীতে তাঁহার স্বাভাবিক সারল্য, শুচিতা আন্তরিকতা ও সংযমের সম্মান রক্ষা করেছে। নিজেকে কোথাও তিনি প্রকট করেন নি বা প্রকট করিবার ইচ্ছা দিয়ে লোক দেখান আস্ফালন করেন নি। অলৌকিক ঘটনা ('অতি-প্রাকৃত কথা' দ্রষ্টব্য) এমন বিজ্ঞানসাপেক্ষ করে বর্ণনা করেছেন, যে তাঁর বলবার ভঙ্গীতে মুগ্ধ হতে হয়। হাস্যরসে, কারুণ্যে, সহানুভূতিতে,

সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধা, অশিবের প্রতি ঘৃণায়, বিষাদের গাম্ভীর্য্যে, পাঠকের মনকে তিনি পরিপূর্ণ করেছেন। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে উপদেশের বালাই নেই, কুসংস্কারের প্রতি আসক্তি নেই, শাস্ত্রানুশাসিতের জড়তা নাই; শুধু মানুষ ছুটাছুটি, হৃদয়বান পথিক পাওয়ার আন্তরিকতা তিনি মনোজ্ঞ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। মন উদাস হলেই পথ পেয়ে তিনি শান্ত হতেন, শারীরিক কষ্টকে জয় করে অন্তরের প্রেরণায় তিনি পথের পর পথ চলতেন। যে গভীর শোক বহন করে তিনি দীর্ঘ চার বৎসর এইভাবে দারুণ কঠোরতার মধ্যে নব নব প্রভাত নব নব গোধূলি ও হিমশীতল রজনীর মধ্য দিয়ে বহু পথ অতিক্রম করেছিলেন, সে শোক তাঁকে যথার্থ সুস্থতার সার্থকতায় মজিতে দেয় নি। এই নিষ্ফল নিরুদ্দেশ যাত্রা তাঁর আর ভাল লাগল না—তিনি লিখেছেন "বাঙালীর ছেলে ক্রমাগত এই রকম লোটা কম্বল কাঁধে ক'রে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে আর কিছুতেই ভাল লাগ্‌ছে না। এ পাহাড় প্রকৃতির সঙ্গে আমার প্রকৃতির কোন রকম মিল থাকছে না; সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল অতএব এখন মনে কর্‌ছি একবার বাড়ী ফিরে যাব; এই সন্ন্যাস অথবা তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু আমার আর পুষিয়ে উঠ্‌ছে না, ভাবছি

এখন ঘরের ছেলে বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে
দু'দণ্ড সময় পেলে খা'বার না'বার"

এই সময় তাঁকে বেশ্ মনে হয়েছিল এরই মধ্যে দেশে ফিরে গেলে লোকে বল্‌বে কি। এইখানে তাঁর সান্ত্বনা লাভ করবার বিষয়; তিনি লিখেছেন—

"যাঁরা আমার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়েছিলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে একটা দিগ্‌গজ সাধুরূপে পরিণত হওয়া দেখবার আশায় ধৈর্য্যাবলম্বন ক'রেছিলেন, তাঁরা হয়ত এতদিনের পরে আমার এই লোটা কম্বল এবং বক্তৃতার মধ্য থেকে আমার স্বরূপ নিরীক্ষণ ক'রে ভারী বিরক্ত হয়ে পড়লেন, কারো মুখ দিয়ে দু'চারটি কটু কাটব্যও বের হতে পারে; আমার তাতে আপত্তি নাই; এ ছদ্মবেশ চেয়ে সে বরং ভাল।"

আর একস্থানে লিখেছেন—"এই সময় আমার প্রাণের মধ্য হতে একটা ব্যাকুল স্বর নিতান্ত কাতরভাবে যেন গাইতে লাগল—কি করিলি মোহের ছলনে। গৃহ তেয়াগিলি প্রবাসে ভ্রমিলি, পথ হারাইলি গহনে। সময় চলে গেল, আঁধার হয়ে এল, মেঘ ছাইল গগনে। শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না—বিঁধিছে কণ্টক চরণে'

তাঁর মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। শোকের সান্ত্বনা কোথায়? প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এক অন্ধকার পর্ব্বত কোণে দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে তাঁর কত কথাই মনে হতে লাগল—শুধুই বোধ হ'তে লাগল—

'সংসার-স্রোত জাহ্নবী-সম বহুদূরে গেছে সরিয়া,
এ শুধু উষর বালুকা ধূসর মরুরূপে আছে মরিয়া
নাহি কোন গতি, নাহি কোন গান
নাহি কোন কাজ, নাহি কোন প্রাণ
ব'সে আছে এক মহানির্ব্বাণ আঁধার মুকুট পরিয়া'

লোকালয়ের দিকে নেমে আসতে আসতে তাঁর যেন "কেমন ক'রে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল—মনের অবস্থা কেমন খারাপ হচ্ছিল"। সেই জন্য আর ডাইরী লেখা চল্‌ল না (৮ই জুনের পর থেকে)।

গৃহে ফিরবার প্রায় দু বছর পরে তিনি ১৮৯০ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। সেই হতে তাঁর সাংসারিক জীবন পুনরায় আরম্ভ হল। তাঁর সর্ব্বপ্রথম রচনা ১৩।১৭ বৎসর বয়সে; সর্ব্বশেষ ৭৮ বৎসর বয়সে। এই দীর্ঘ ষাট বৎসরব্যাপী সাহিত্য-সাধনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ বাণীর বরপুত্র হয়ে জন্মেছিলেন, জলধর সাহিত্যের সঙ্গে সংগ্রামে প্রায় আজীবন কাটিয়েছেন। অবশ্য দুঃখী হতেন, কঠোর শ্রমে কাতর হতেন না এবং সম্পাদক হয়ে বহু নূতন লেখককে যথাসাধ্য উৎসাহ দিতেন; কত নূতন লেখকের রচনা 'চলন সই' (এটি তাঁর নিজের কথা) করে দিতেন; সমালোচনায় বিষবাণ প্রয়োগ করতেন না এবং সাংবাদিকের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব লোক-শিক্ষা ও সমাজ-সেবা—শান্তভাবে সুসম্পন্ন করতেন। সহজ জীবনযাত্রায় অনাড়ম্বর-প্রিয় ছিলেন বলে অনেকে তাঁর মর্য্যাদার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নি। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁর একজন গুণগ্রাহী ছিলেন এবং বাংলা ভাষার চর্চ্চায় তাঁরই প্রেরণায় অগ্রসর হয়ে "হিমালয়" সম্বন্ধে একটি চমৎকার কবিতা ও সমাজ-তত্ত্ববিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জলধর ও দীনেশচন্দ্র 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তখন জলধর দাদা সুবিখ্যাত মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ'র সম্পাদক।

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা "মন্দির" (কুন্তলীন পুরস্কারের প্রতিযোগিতার জন্য লিখিত) জলধর দাদার নির্ব্বাচনে প্রথম পুরস্কার লাভ করে। তখন উভয়েই পরস্পরের অপরিচিত। পরে সাহিত্যজগতে দুইজনের আলাপ কিরূপ মধুর হয়েছিল তা সকলেই জানেন। জলধরের প্রথম ছোট গল্প 'পোষ্ট মাষ্টার' ১৮৯০ অক্টোবর-এর 'দাসী'তে ও ৩২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত 'দুঃখিনী' ১৯০৮ এপ্রিলের 'জাহ্নবী'তে প্রকাশিত হয়। তাঁর ১৩।১৭ বয়সের রচনা '[illegible] মেলা দর্শন' তাঁর গ্রামবাসী 'কাঙ্গাল হরিনাথের' সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত্তা'য় প্রকাশিত হয় এবং ৺নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় লিখেছেন যে 'গ্রামবার্ত্তা'য় তাঁহার আরও ২০।২৫টি রচনা বাহির হয়। 'সোমপ্রকাশে'ও তিনি লিখতেন। 'বঙ্গবাসী' 'বসুমতী' 'হিতবাদী' ও 'ভারতবর্ষ'র সম্পাদক হিসাবে তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছিলেন। 'ভারতবর্ষ'র নিকট তিনি স্নেহের ঋণে বদ্ধ ছিলেন। এই আজীবন সাহিত্যসেবী বাংলা ভাষাকে সৎসাহিত্যে সমৃদ্ধ করেছেন। কথাভাষায় ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে 'হিমালয়' প্রথম রচনা—ইহা সাহিত্যরথী চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন। ৺রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বলেছিলেন 'জলধর নামেও জলধর, কাজেও জলধর। জলপান করিলে যেমন তৃষ্ণা মিটে কিন্তু কোনরূপ নেশা হয় না, জলধর সেনের লেখা পড়িলে তেমনই তৃষ্ণা মিটে, মাতামাতি উপস্থিত হয় না; মাতামাতি অনেক সময় বিপজ্জনক; তাঁহার লেখা পড়িয়া তরুণ অতরুণ কাহারও কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।"

অনেকে বলেন প্রাচীনপন্থী ছিলেন বলে তাঁর রচনা পূর্ণ-বিকাশ লাভ করতে পারে নি। এ বিষয়ে মতান্তর দেখা যায়।

যাঁরা বলেন "সমাজের উপকার অপকারের মানদণ্ড লইয়া সাহিত্যের গুণ বিচার করিলে প্রকৃত সাহিত্যরসের অবমাননা করা হয়" তাঁহাদের নিকট দাদা একবারে Back number; যাঁহারা বলেন সমাজ রক্ষার খাতিরে সত্যকে ক্ষুণ্ণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কোনও সাহিত্যিক কোনও সত্যকে উলঙ্গ করিয়া সমাজের সামনে উপস্থিত করিলে যদি ভয় পাইতে হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে আমাদের সমাজের ভিতর কোথাও এমন একটা অসত্য আছে যাহা সত্যের ভয়ে কুণ্ঠিত"—তাঁদের কাছে দাদা একটা Old Fool।

তিনি অনেকটা Tolstoy-পন্থী ছিলেন। Tolstoy-এর মতে "Art is a human activity and consequently does not exist for its own sake, but is valuable or objectionable as it is serviceable or harmful to mankind (অর্থাৎ মানবসমাজের উপকার বা অপকার Art-এর দ্বারা যে পরিমাণ সাধিত হয়, আর্ট সেই পরিমাণে ভাল অথবা মন্দ)।

'অভাগী'র ১ম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর একজন দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "হরিদাসীর সঙ্গে আশানন্দের বা নিরেন তিনকড়ির বিবাহ দিলেন না কেন"—দাদা বলেন "পারলুম না"। এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটি

তাঁর সংলাপ ও তাঁর বাক্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তদানীন্তন 'Art for Art's sake'এর দুষ্প্রবাহে ছোট বড় সাহিত্যরথীরা প্রবাহের অনুকূলে সন্তরণ ক'রে যথেষ্ট উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু দাদা সেদিকে মন দেন নাই। তিনি কিন্তু নিরেট 'সেকেলে' পন্থী ছিলেন না। তাঁর ভাষাতেই বলি—'কেহ যেন মনে না করেন যেহেতু আমি প্রচলিত হিসাবে সেকেলে মানুষ, তাই আমি সেকালের পক্ষপাতী; আমি হয়ত সেই সেকালের গড্ডালিকায়, সকলকে একেবারে ভাসিয়ে দেওয়ার দলে। মোটেই তা নই। সেকালের অন্ধ স্তাবক আমি নই; সেকালের যা মন্দ, তাকে আমি একালের মানুষের মতই সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করার দলে; সেকালের যে সকল কুসংস্কার সমাজকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে একেবারে ঠুঁটো ক'রে রেখেছিল, যার কিছু কিছু এখনও আছে, আমি সে সকল আবর্জ্জনা সমাজপ্রাঙ্গণ থেকে দূর করবার দলে। কিন্তু তাই ব'লে, যা কিছু সেকালের, তার সবই মন্দ, সবই ফেলে দিতে হবে একথা আমি মানিনে।—ভাল আর মন্দ নিয়ে জগতের খেলা'।

তাঁর ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে সহজেই দেখা যায় বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, ছোট ভাইয়ের প্রতি অবজ্ঞাহীনতা, পুরাণো চাকর-বাকরের প্রতি স্নেহ, প্রতিবেশীর সহিত সৌজন্য, পতিতের উপর সহানুভূতি, দুর্ব্বলের মনোবৃত্তির অনুশীলন, ত্যাগের সুখ, ভোগে সংযমের ব্যবহার আনন্দ-পূর্ণ পরিণতি। বাঙ্গালীর প্রাণেই যে তার জীবনের বীজ নিহিত আছে, এ কথা তিনি বহুপ্রকারে প্রচার করেছেন। ভাবাবেগের আধিক্যে স্থানে স্থানে তাঁর রচনা উচ্ছল হলে উচ্ছৃঙ্খল বিপথগামী হয় নি। কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে তাঁর অত্যধিক ঔৎসুক্য স্থানে স্থানে তাঁর রচনাকে আঘাত করেছে। তাঁর রচনায় চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশ নেই, অঘটন ঘটাবার কষ্ট কল্পনা নেই, জটিল মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা নেই। দীপ্তি আছে, জ্বালা নেই। প্রাচীন বাঙ্গালী চরিত্রে যে সারল্য, সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা ছিল, তাঁর রচনায় তার পূর্ণ অভিব্যক্তি রয়েছে। অতি আধুনিক চিন্তাধারা ও পরিকল্পনার বহুপ্রকাশ তাঁর রচনায় দেখতে পাই না।

কিন্তু তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা, মমতা ও দরদ দিয়ে বঙ্গসাহিত্যের কুঞ্জকাননে যে 'মাধবী' রচিয়া গেলেন, তার নিকুঞ্জতলে প্রবীণ বন্ধু বা বন্ধুর পত্নীকে লইয়া মনোমালিন্য অবকাশ হলেও, বহু প্রবাসী ও অপ্রবাসী বাঙ্গালী নারী ও অবিবাহিত পুত্রকন্যা লইয়া নিঃসঙ্কোচে আনন্দরস পান করবে। আর যাঁদের সহিত তাঁর পরিচয় নিবিড় ছিল, তারা তাঁকে স্মরণ করে গাইবেন –

"প্রেমিক কে সে মধুরভাষী, বধিয়া গেল গোকুলবাসী
ওরে কি আর, বাঁশরী তার, গাবে না শ্রীব্রজজীবন"

ইয়োরোপীয়গণের হিন্দুধর্ম্মানুরাগ

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

নীতি ও সাধনাই হিন্দুধর্ম্মের মহিমাকে বড় করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুদর্শনের গভীরতা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনই হিন্দুধর্ম্মকে শত সহস্র বিপর্য্যয়ের মধ্যেও এত সহস্র বৎসরাধিক কাল বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। হিন্দু কখনও অ-হিন্দুকে তাহার পথে বা মতে আনিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করে নাই। তথাপি অনেক অ-হিন্দু হিন্দু দর্শন ও সাধনায় আকৃষ্ট হইয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছেন।

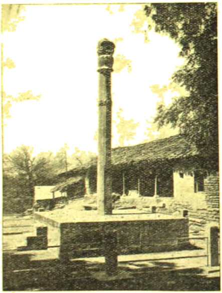

গোয়ালিয়র রাজ্যে—হিলিওডোরাস্ গরুড়স্তম্ভ

যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বৌদ্ধধর্ম্ম—প্রচারের নিমিত্ত মধ্য ও পূর্ব্ব-এসিয়াতে গমন করেন; তখন চীন, তিব্বত, জাপান, কম্বোডিয়া, জাভা, সুমাত্রা, বলি, সিংহলের নর-নারী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। আজও অর্দ্ধ জগতবাসী সেই ভগবান বুদ্ধের চরণে ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন।

হিন্দুধর্ম্মমত প্রচার করিবার প্রথা না থাকিলেও, বহু প্রাচীনকাল হইতে ইয়োরোপের অনেক জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি হিন্দুর ধর্ম্মমত ও আচার পরম নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। দু-হাজার বৎসর পূর্ব্বে এক গ্রীক্ হিলিওডোরাস্ হিন্দুধর্ম্ম ও দেব-দেবী মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া পরম বৈষ্ণব (ভাগবত) হইয়াছিলেন। সে কাহিনী এখনও ভীলসার, বেসনগরের এক প্রস্তর স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

১৪০ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে তক্ষশীলায় এন্টীলকিডস্ নামে এক ব্যাক্‌ট্রিয়ান রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজসভাসদ ডিয়নের পুত্র হিলিওডোরাস বিদিশার মালোয়ার সাম্রাজ্যের অধিপতি ভগভদ্রের রাজসভায় গ্রীক রাজার দূত হইয়া আগমন করেন। তিনি বেসনগরে অবস্থানকালে হিন্দুধর্ম্মানুরাগী হন এবং পরম বৈষ্ণব (ভাগবত) বলিয়া নিজেকে পরিচয় প্রদান করিতেন। এমন কি কিংবদন্তী আছে যে তিনি মালোয়ার রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই হিলিওডোরাস্ মালোয়ার সম্রাটের কুলদেবতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি উচ্চ গরুড় স্তম্ভ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই স্তম্ভটি এখনও দৃপ্ত বক্ষে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন চিহ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্তম্ভটির গাত্রে, প্রাকৃতিক ভাষায় যে দুই ছত্র লিখিত আছে তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এই স্তম্ভটি ১৪০ খৃষ্টাব্দে পরম ভাগবত হিলিওডোরাস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গোয়ালিয়ারের রাজসরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই স্তম্ভটি সংরক্ষণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্তম্ভের পাদদেশে শ্বেত পাথরের ফলকে উক্ত স্তম্ভের পাঠ উদ্ধার করিয়া তাহার ইংরাজী অনুবাদ উৎকীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে।

It bears two inscription in Brami character and of Prakritic Langauge. One of this inscription records that this column was set up as a Garuda Piller in honour of God Vasudeva (Vishnu) by Heliodorous, a Greek inhabitants of Taxila who came to the court of Bhagabhadra, King of Malwa, Central India, as an ambessador from Ancilidious an Indo Bactrian King of Panjub.

Heliodorous has eventually adopted Hinduisim as he has styled himself a 'Bhagvata' ie. followers of Vishnu Sect. The approximate date of this pillar is 150 B.C.

হিন্দুবেশে "কৃষ্ণপ্রেম" অধ্যাপক নিক্সন্

এমনই দুই শত বৎসর হইতে অনেক পাশ্চাত্য দেশবাসী সাধক হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছেন। ইংরাজের ভারত অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পাশ্চাত্য সুধীজন হিন্দুর দর্শন, শাস্ত্র ও কাব্য বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইয়োরোপ ও আমেরিকার সুধীজনের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তত্ত্ববিদ্যা সমিতি (থিওজফিক্যাল্ সোসাইটী) এইরূপ কার্য্যে অগ্রণী। রুশ মহিলা ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কী এই সাধনার একজন প্রধান সাধিকা।

মিসেস্ এ্যানি বেশান্তের হিন্দুধর্ম্মপ্রীতি, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের আচার পরম নিষ্ঠার সহিত পালন, জন্মান্তরবাদের প্রতি গভীর অনুরাগ, হিন্দুধর্ম্মের গুহ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যায় অসাধারণ বাগ্মীতার কথা স্মরণ হইলে শ্রদ্ধাবনত হইতে হয়। তিনি যে কেবল স্বয়ং হিন্দুধর্ম্ম ও আচার পালন করিতেন তাহা নহে, বহু পাশ্চাত্য নর-নারীকে থিওসোফিক্যাল্ সোসাইটীর মধ্য দিয়া হিন্দুভাবাপন্ন ও হিন্দু সাধক করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ আজ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মত ও পথ প্রচার করিবার জন্য আমেরিকা ও ইয়োরোপে গমন করেন তখন হইতে অনেক পাশ্চাত্য নর-নারী হিন্দুধর্ম্মানুরাগী হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সিষ্টার নিবেদিতার নাম সকলের বিদিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মিশনের যে দুইজন জার্ম্মান সাধক ছিলেন তাঁহাদের বৈষ্ণবোচিত বিনম্র আচার ও ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

এখানে আর একজন ইংরাজ সুপণ্ডিতের হিন্দু ধর্ম্মানুরাগের কথা বলিব। অধ্যাপক আর নিক্সন্ এম্-এ, কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। তিনি ভারতে আসিয়া লক্ষ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলার জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং লক্ষ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যে প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি বারানসীধামে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। বারানসীর দেব মন্দির, তীর্থ, সাধু ও পণ্ডিতের নিষ্ঠা ও সাধনা, পুণ্যসলিলা গঙ্গার ও তৎতীরের সৌধাবলীর মনোরম দৃশ্য তাঁহার চিত্তে এক অপূর্ব্ব প্রীতি ও শান্তি আনয়ন করে। তিনি বারানসী বাসের সঙ্কল্প করেন। লক্ষ্নৌয়ের অধ্যাপক পদ ত্যাগ করিয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প পারিশ্রমিক লইয়া ইংরাজীর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার অধ্যাপনার গুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তাঁহার ধর্ম্মসাধনার আকাঙ্ক্ষা দিন দিন এমনই তীব্র হইয়া উঠিল যে তিনি সংসারের সংস্পর্শ ত্যাগ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইলেন।

মিসেস্ এ্যানি বেশান্তের মূর্ত্তি

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

যখন অধ্যাপক মহাশয় হিন্দু সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন, তখন কাশীর প্রধান শিক্ষাব্রতী চিরকুমার চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়

মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার স্বধর্ম ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। চিন্তামণি বাবু অধ্যাপক নিক্সনকে স্বধর্ম ত্যাগে বিরত করিবার জন্য বলেন—যখন খৃষ্টান ধর্ম-শাস্ত্রে সৎ ও সাধু জীবনযাপন করিবার বহু মত ও পথ আছে তখন তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পর ধর্ম গ্রহণ করিবেন কেন? তিনি আরো বলেন, যে খৃষ্টধর্মের মধ্যে প্রেমের যে সব মধুর বাণী কথিত আছে তাহা হিন্দুর প্রেম ধর্মেরই অনুরূপ। হিন্দুরা নিজের ধর্মমত অন্য ধর্মাবলম্বীর উপর যেমন প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে না, তেমনই তাহারা স্বধর্ম পরিত্যাগে কাহাকে উৎসাহ প্রদান করেন না।

ইহার উত্তরে অধ্যাপক নিক্সন্ বলেন খৃষ্টধর্মে মানবের পরিত্রাণের প্রশস্ত পথ বহু থাকিলেও হিন্দুর প্রেমধর্মবাদই তাঁহার চিত্তকে বিশেষ ভাবে অভিভূত করিয়াছে। তাহার পরই তিনি সংস্কারের সকল বাধা সমস্ত ত্যাগ করিয়া হিন্দু ঋষি ও সন্ন্যাসীর ন্যায় আলমোড়ায় এক আশ্রমে বাস করিতেছেন। তিনি সময় সময় এমনই কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত হইতেন যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে গদ গদ চিত্ত হইয়া সংকীর্তন করিয়া প্রায় অজ্ঞান ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন। এখন তিনি "কৃষ্ণপ্রেম" নামে পরিচিত।

অধ্যাপক নিক্সনের পাণ্ডিত্য, তাঁহার হিন্দুপ্রীতি, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয়, গীতায় জ্ঞান, প্রেমধর্মের অনুরাগ তাঁহার লিখিত বহু পুস্তকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি নিজে চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন। তাঁহার অঙ্কিত 'বুদ্ধ' দেবের ছবিখানি দর্শকমাত্রের চিত্তে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

সম্প্রতি এক বিদুষী পি-এইচ, ডি ডিগ্রীধারী গ্রীক মহিলা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী হিন্দুদর্শন ও ধর্মের পরম অনুরাগিনী হইয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও বাঙ্গালী হিন্দুর পত্নী হইয়াছেন।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

'ভারতবর্ষ' চৈত্র সংখ্যায় 'আধুনিক বাংলা গানে সুর ও কথা' নাম দিয়ে আমার যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আমি এক শ্রেণীর প্রতিভাশালী আধুনিক সুরশিল্পীর কথা বলেছি, যাঁদের গানে কথা ও সুর, অর্থাৎ কাব্য ও সঙ্গীত একটি সুসমঞ্জস সমন্বয়ের মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে। বাংলার এই সকল আধুনিক সুর-শিল্পীদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে আমাদের মনে জাগে, তিনি হচ্ছেন কুমার শচীন্দ্র দেব বর্মন।

সুর ও কথার এই মিলন-চেষ্টা বহুকাল থেকে চলেছে। আমাদের থিয়েটারের গানে দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয় এককালে এই মিলন-সাধনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন এবং এ-দিক থেকে কতকটা সফলকামও হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে এই মিলন-চেষ্টা আরও অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

কিন্তু একটা কথা এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার। সে কথাটা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুর ও কথা মিলনপথে আবদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু এ মিলন কতকটা যেন এক তরফা। কথা ও সুরের মিলন-সাধন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সুরকে এনেছেন নামিয়ে অর্থাৎ সুরলোকের অধিবাসী সঙ্গীত-দেবতাটি মর্ত্যবাসিনী কথা সুন্দরীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য নিজের স্বর্গীয় আভিজাত্য বর্জন করে যাতে মাটির উপরে নেমে আসেন, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তারই ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে করে দুজনের মিলন হয়েছে বটে, কিন্তু সে মিলনের মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেছে।

কথার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সুরকে যে কতকটা নেমে আসতে হবেই সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই; কিন্তু সে নেমে আসবে নিজের সুরলৌকিক আভিজাত্য সম্পূর্ণ বর্জন করে নয়, তাকে রূপান্তরিত করে। যে জিনিসটা ঠুংরীর মধ্যে ঘটেছে।

ঠুংরীর মধ্যে কথার সঙ্গে সুরের মিলন-সাধনের চেষ্টা যে ভাল করেই হয়েছে, এবং তার ফলে সুরকে যে খাঁটি সুরলোক থেকে কতকটা মাটির স্থল-ভূমে, মানবিকতার পার্থিব-অনুভূতির জগতে নেমে আসতে হয়েছে সে কথা সকলেই জানেন। কিন্তু তাই বলে সুর তার সুরলোকের আভিজাত্য বর্জন করেনি; তাকে পরিবর্তিত করেছে মাত্র। তার সর্বাঙ্গ থেকে সে তার অমূল্য স্বর্গীয় অলঙ্কারগুলি খুলে ফেলে দিয়ে ধুতি-চাদর পরে মর্ত্যবাসিনী কথা-সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেনি। সে কেবল তার স্বর্গীয় অমূল্য অলঙ্কারগুলি থেকে উজ্জ্বল হীরকখণ্ডগুলি খুলে নিয়ে, তার জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে স্নিগ্ধোজ্জ্বল পান্নার টুকরোগুলি, মাটির ধরণীর শ্যামলতার সঙ্গে যার বর্ণসাদৃশ্য রয়েছে।

তাতে করে ফল হয়েছে এই যে, তার আভিজাত্য আর একদিক থেকে ফুটে উঠেছে।—অথচ চারি চক্ষুর মিলনের সময় কাঙ্গালিনী মর্ত্যবাসিনী কথা-সুন্দরীর করুণ সজল চোখ দুটি যাতে ধেঁধে না যায়, তারও ব্যবস্থা হয়েছে!

কথা উঠতে পারে, ঠুংরী ত আর দেশী-সঙ্গীত নয়, ও ত মার্গসঙ্গীতেরই একটা রকম-ফের। ইংরাজীতে যাকে বলে Classical music ও হচ্ছে সেই জাতীয়। একথা আমরাও স্বীকার করি এবং এ কথাও স্বীকার করি যে দেশী-সঙ্গীত বা Local music আর মার্গ-সঙ্গীত বা Classical music এক জাতীয় নয়।

অনেকে হয়ত বলবেন, রবীন্দ্র-সঙ্গীত ত আর মার্গসঙ্গীতের সমজাতীয় নয়, সুতরাং ওর মধ্যে সুরের আভিজাত্য খুঁজতে গেলে চলবে কেন? কিন্তু এখানেও কথা আছে। কথাটা হচ্ছে এই যে, দেশীসঙ্গীতের মধ্যেও ত শ্রেণীবিভাগ আছে। রামপ্রসাদী, জারি, সারি, বাউল প্রভৃতিও দেশী-সঙ্গীত, আবার রবীন্দ্র-সঙ্গীতও দেশীসঙ্গীত; কিন্তু এরা সকলেই কি এক পর্যায়ের? রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যেও কি পর্যায়-ভেদ দেখা যায় না? রবীন্দ্রনাথের 'আবার এসেছে আষাঢ়', আর 'যে দিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'—এরা কি এক পর্যায়ের দেশীসঙ্গীত?

তেমনি দেশীসঙ্গীতের মধ্যেও পর্যায়-ভেদ আছে এবং এইদিক থেকে বিচার করেই আমরা বলতে পারি যে, শচীন দেববর্মণ প্রভৃতি কয়েকজন কৃতী গায়ক আজকাল বাংলা গানকে দেশীসঙ্গীতের যে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন, রবীন্দ্র-সঙ্গীত সে পর্যায়ের দেশী সঙ্গীত নয়।

আমরা তাঁদের কথা বলছি না, যাঁরা বাংলা গানকে আভিজাত্য-মণ্ডিত করতে গিয়ে তাকে classical করে তুলেছেন। আমি বলছি সেই সকল আধুনিক সুর-শিল্পীর কথা, যাঁরা বাংলা-গানকে তার স্বক্ষেত্রে, অর্থাৎ দেশীসঙ্গীতের এলাকার মধ্যে রেখেই তাকে আভিজাত্য দান করেছেন।

এইখানেই ও কৃতিত্ব।—বাংলা গানে classical musicএর ঢং

চং, চাল-চলন বেমালুম চাপিয়ে দিয়ে তাকে classical করে তোলা সহজ নয়।—যা আজও অনেক বাঙালী ওস্তাদ-গায়ক করছেন। সেও হিন্দী ওস্তাদী গানের স্বর-তর্জমা। সে বাংলা ভাষাতেই গাওয়া হোক, আর হিন্দীভাষাতেই গাওয়া হোক, ঐ একই কথা। আসলে তার classical ভাব-ভঙ্গি, চাল-চলন সবই অব্যাহত থেকে যাচ্ছে;—সে কোনদিন দেশীসঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারে না।

তাই বলে classical music থেকে কিছু নিলেই যে দেশীসঙ্গীতের জাত যাবে, এ কথাও সত্য নয়। নিতে হবে বৈকি!—কিন্তু নেওয়ার মধ্যেও রকম-ফের আছে।

এক রকম নেওয়া আছে, যাকে বলা যেতে পারে—ভিক্ষা-নেওয়া। এ নেওয়া আগাগোড়াই passive বা এক-তরফা। এর মধ্যে গ্রহীতার ব্যক্তিত্বের পরিচয় কিছুই নেই। সে নেওয়া অক্ষমের একটা বিকার মাত্র। আর এক শ্রেণীর নেওয়া আছে, যার মধ্যে নেওয়ার সঙ্গে দেওয়ারও একটা দিক্ আছে। ডিস্‌পেপ্‌টিক্ খাদ্যকে ঠিক আত্মসাৎ করতে পারে না—সে করে তাকে উদরসাৎ মাত্র। তার কারণ, তার নিজের দিক্ থেকে কিছুই দেবার নেই। যে জারক-রস ওর দিক থেকে সে দিতে পারতো, তার অভাবেই ত খাদ্যকে সে ঠিক নিতে পারে না, তাকে কেবল পেটের মধ্যে জমা করতে থাকে। তাই বলছিলুম, যে দিতে পারে, সেই পারে গ্রহণ করতে, আত্মসাৎ করতে। দেশীসঙ্গীতের জারক-রস যার মধ্যে প্রচুর আছে এবং সেই সঙ্গে মার্গসঙ্গীতের ঘি-দুধের প্রতিও যার লোভের অন্ত নেই, সেই পারে তাকে আত্মসাৎ করতে। তা যাঁদের নেই, তাঁরা বাংলা-গানে classical ঢং-চাং যতই চালাতে চেষ্টা করুন না কেন, তার ফল কোনদিন শুভ হতে পারে না। কেন না, তার ফলে বাংলা-গানের কণ্ঠনালী দিয়ে বেরিয়ে আসবে মার্গসঙ্গীতের চোঁয়া-ঢেঁকুর; যা কারুর পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নয়, না গায়কের দিক থেকে, না শ্রোতার দিক থেকে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেশীসঙ্গীতের জারক-রস ছিল প্রচুর, কিন্তু মার্গসঙ্গীতের ঘি-দুধের প্রতি তাঁর কোনদিন লোভ ছিল না। এর জন্য দায়ী তাঁর গানের অপূর্ব্ব ভাষা এবং শব্দ-সম্পদ। সত্যই রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা এতই সুন্দর, তাঁর গানের প্রত্যেক শব্দটি এত শাণিত, এত রসসিক্ত, এত জীবন্ত যে সুরের কারুকার্য্য দিয়ে তাদের ঢাকা দিতে মায়া হয়।

তাছাড়া আর একটা কারণও বোধ হয় আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন সুগায়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর যুগে আমাদের বাংলা দেশে অভিজাত সমাজে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা চর্চ্চা থাকলেও, ঠুংরীর চর্চ্চা একেবারেই প্রায় ছিল না। অথচ অনুভূতি-প্রধান, গীতি-ধর্মী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক রবীন্দ্র সঙ্গীত যদি classical music-এর কাছ থেকে কিছু নিতে চায়, তাহলে তাকে ধ্রুপদ-খেয়াল অপেক্ষা ঠুংরীর কাছেই হাত পাততে হয় বেশি করে—কেন না, ঠুংরী classical হলেও ব্যক্তিগত-ভাবপ্রকাশের দিক থেকে কতকটা দেশীসঙ্গীতের সমজাতীয়। ধ্রুপদ-খেয়ালের মত ওর ধাতটা অতটা impersonal নয়। তাই ঠুংরী থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত যদি কিছু নিতে চাইতো, তাহলে সে নেওয়াটা তার পক্ষে সহজ হয়ে উঠতো। যেমন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ব্যাস-বাল্মীকি অপেক্ষা কালিদাসের কাছ থেকে দান গ্রহণ করাটা সহজ হয়ে উঠেছিল।

অনেকে হয়ত বলবেন—রবীন্দ্রনাথ কি ঠুংরী কখনো শোনেন নি? ঠুংরীর সঙ্গে তাঁর কি কোনদিন পরিচয় হয় নি? তা হবে না কেন? কিন্তু ঠুংরী শোনা এক জিনিষ আর ঠুংরীর আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হওয়া আর এক জিনিষ। তিনি মানুষ হয়েছিলেন—ধ্রুপদ-খেয়ালের আবহাওয়ার মধ্যে। অথচ ধ্রুপদ-খেয়ালের ব্যক্তিনিরপেক্ষ, impersonal চালচলনের সঙ্গে তাঁর lyric-ধর্মী, ব্যক্তিগত-অনুভূতিপ্রধান গানগুলি ঠিক খাপ খেতে পারে না। কাজেই তাঁকে অন্য পথ ধরতে হয়েছে এবং সে পথ হচ্ছে এড়িয়ে চলার পথ। অর্থাৎ ধ্রুপদ-খেয়ালের ভারি চালকে যথাসম্ভব মোলায়েম এবং ছিমছাম করে নিয়ে তাই দিয়ে তাঁকে নিজের কাজ চালিয়ে নিতে হয়েছে এবং এই কাজটি করতে গিয়ে তাঁকে মার্গসঙ্গীতের অলঙ্কারগুলিকে বেমালুম বাদ দিতে হয়েছে। তার কারণ উক্ত অলঙ্কারগুলি একেবারে নিছক সুরের অলঙ্কার;—কথার অঙ্গে তাদের চাপাতে গেলে তারা হয়ে উঠবে ভার-বোঝা। ঠুংরীর অলঙ্কারগুলি কিন্তু শুধু সুরের জৌলুস বাড়ায় না, সেই সঙ্গে কথার ভাব-মণ্ডলটিকেও উজ্জ্বল করে তোলে।

ঠুংরী থেকে ছোটখাটো টুকরো অলঙ্কার গ্রহণ করে বাংলা গানের ভাবরূপটিকে সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা আজকাল অনেকেই করছেন, কিন্তু বাংলা দেশীসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বা ঢং বজায় রেখে এ কাজটি করতে অতি অল্প ব্যক্তিই পেরেছেন।

এঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা গানে ঠুংরীর অলঙ্কার চাপাতে গিয়ে বাংলা গানকে ঠুংরী করে ফেলেছেন। বাংলা গানকে ঠুংরীতে পরিণত করা অর্থাৎ তাকে classical করে তোলা সহজ। ঠুংরীর সঙ্গে যার পরিচয় আছে, এ কাজটা তাঁর দ্বারা সহজেই হতে পারে। ওর মধ্যে খুব বেশি বাহাদুরী নেই। বাহাদুরী হচ্ছে তাঁর, যিনি ঠুংরীর ছোট-খাটো টুকরো তানগুলি বাংলা গানে এমন ভাবে বেমালুম জুড়ে দিতে পারেন, যাতে করে বাংলা গান তার দেশীসঙ্গীতোচিত সারল্য বজায় রেখেও বিচিত্র হয়ে ওঠে; অর্থাৎ ঠুংরীর অলঙ্কার গায়ে পরেও classical হয়ে না ওঠে।

এ কাজ তাঁদের দ্বারাই সম্ভব, যাঁরা শুধু ঠুংরীর সঙ্গেই পরিচিত নন, সেই সঙ্গে দেশীসঙ্গীতের বিশেষ রসটুকুর সঙ্গেও যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।

মৃত্যুদূত

শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণ কালো মেঘের ছায়া নামবে যবে তোমার পথের পরে,
দীর্ঘদেহ সেদিন শুধু বাড়িয়ে দেব তোমার মিলন তরে।
আকুল বাহু বাড়িয়ে বুকে ডাক্‌বোনাকো যৌবনেরি দাহ,
যৌন আলিঙ্গনে সেদিন তোমায় মিলিয়ে দেব তোমা'
শুভ লগন মাঝ।
তখন তন্ত্রী মিলন রাগে তুলবেনাকো তান,
ছিঁড়বে যেদিন শব্দ লাগি, গাইব না আর গান।
তুমিই শুধু হবে আমার আজীবনের ধন;
আনন্দ দান করবো তোমায় নিখিল তনু মন।
আমার তরি এই পৃথ্বীতেই রইল রচা আশ,
তোমায় শুধু বাঁধিয়ে রাখি, ওগো মরণ-পাশ;
কল্পনারি মায়া হাতে,
বইতে নারি দিবস রাতে,
এসো তুমি গভীর রাতে,
অধীর অভিসার;
সেদিন যেন থাক্ না সেদিন, আশার ছলনার।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পারস্যের শিল্প ও সংস্কৃতি

শ্রীগুরুদাস সরকার

আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪৫০০ হইতে খৃঃ পূঃ ২৭০০ অব্দ

প্রভু যিশুখৃষ্টের জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এলামাইট (Elamite) নামে এক জাতি টাইগ্রীস্ (Tigris) নদীর তীরবর্ত্তী সমতল ভূভাগের পূর্ব্বাংশে যে পার্ব্বত্য প্রদেশ বিদ্যমান তথায় বাস করিত। তাহাদিগকে 'এলামাইট' এই আখ্যাটি দিয়াছিল তাহাদেরই প্রতিবেশী, আসিরীয় ও বাবিলোনীয়গণ। 'এলামাইট' শব্দের অর্থ উচ্চদেশবাসী। ইহারা ছিল সেমিটিক্ বংশোদ্ভব। এলামাইটদিগের শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে কয়েকখানি 'ষ্টেলি' (Stele) অর্থাৎ চিত্রসম্বলিত ফলকে এবং কতকগুলি চিত্র-বিচিত্র করা মৃৎপাত্রাদিতে। এই সকল মৃৎপাত্রের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বপ্রাচীন সেগুলি পাওয়া গিয়াছিল সুসা (Susa) নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। এ পাত্রগুলিতে জল রাখিলে জল দাঁড়ায় না, চুঁয়াইয়া বাহির হইয়া যায়। নিতান্ত পাতলা বলিয়া ইহা ডিমের খোলার সহিত তুলনা করিয়া "এগ্ শেল্ পটারি" (egg-shell pottery) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এগুলি যে কত প্রাচীন তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, তবে কেহ কেহ ইহার নির্ম্মাণকাল খৃঃ পূঃ ৪২০০ হইতে ৩০০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহার পাত্রে কালো রংয়ের অথবা বাদামী রংয়ের জ্যামিতিক অলঙ্করণ এবং কোথাও বা নিতান্ত সরলরি ভাবে আঁকা মানব, বিহঙ্গম ও বৃক্ষাদির নক্সা আছে। অপর এক শ্রেণীর মৃৎপাত্রগুলির গড়ন-পিটন বেশ শক্ত রকমের, কোনও কোনওটি বা নলসংযুক্ত। কতকগুলি পাত্রে মৃগ বা ঐরূপ জাতীয় পশুর আর কতকগুলিতে কুক্কুটের চিত্র। ইহার মধ্যে একটি কৌতুকজনক নক্সা ইউরোপীয় শিল্পরসজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই নক্সায় একসারি কুক্কুট বেশ "জামবাটি" চালে সদর্পে বুক ফুলাইয়া চলিয়াছে, তাহাদিগের চলিবার ভঙ্গী দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। অন্য অলঙ্করণের মধ্যে জ্যামিতিক নক্সা ব্যতীত, অনেকটা স্বাভাবিকভাবে পরিকল্পিত ছাগ প্রভৃতির চিত্রও দেখা যায়। এই প্রকার মৃৎপাত্র হামাদানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, নিহাবন্দে পাওয়া গিয়াছে, আর কতকগুলি মিলিয়াছে সামারায়। হামাদানে প্রাপ্ত তাম্রাদির মধ্যে আধুনিক "ভাস" (vase), "জার" (jar) প্রভৃতির ন্যায় পাত্রও পাওয়া গিয়াছে। এগুলি আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ২৭০০ অব্দের মধ্যে নির্মিত (১)

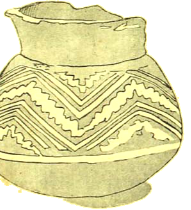

১নং চিত্র

এলামীয় ও মিদীয় যুগ—আনুমানিক ২৭৫০ খৃঃ পূঃ হইতে ৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দ

এলামবাসীদিগের নিজেদের একটা সভ্যতা ছিল। ইহারা গৃহ-শিল্পে অভ্যস্ত ছিল এবং ইহাদের বসন-ভূষণাদিও যে সভ্যজনোচিত ছিল তাহা একখানি মৃত্তিকা ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রের এই প্রতিলিপি হইতেই বুঝা যাইবে। গৃহ-স্বামিনী পায়াসংযুক্ত চৌকির ন্যায় একটি আসনে বসিয়া সূতা কাটিতেছেন। ইনি যে ধনীর ঘরণী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহার বীজনরতা পরিচারিকা। মৃৎফলক-নির্ম্মিত এ চিত্রখানি সম্ভবতঃ এলামাইট যুগেরই হইবে।

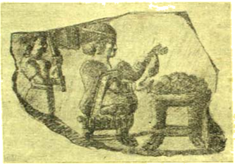

২নং চিত্র

পাহাড়ে খোদাই করা চিত্র, আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২১০০ অব্দ

অধ্যাপক হার্টস্ ফেল্ড, (Hertzfeld) দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা যে একটি সুবৃহৎ চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা তাঁহার অনুমান মতে খৃঃ পূঃ ২১০০ অব্দের কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব। এ চিত্রে, অনেকটা নারীর আকারে পরিকল্পিত পক্ষ-ধারিণী বিজয় শ্রী (Victory) শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যদলসহ নরপতিকে আহ্বান করিয়া লইতেছেন। স্মারক আদর্শ পদ্ধতি (monumental style এর) এই আদর্শ খৃঃ ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে পারসীক শিল্পে প্রচলিত ছিল, একজন অভিজ্ঞ ইংরাজ সমালোচক তাহা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই (২)।

এলামাইটদিগের পরাজয় ও ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা

আর্য্যবংশীয়েরা ও এলামাইট সভ্যতা

খৃষ্টের জন্মের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে সার্গন নামক এক নরপতি এলামাইটদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের দেশ ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের

১। A. U. Pope, Introduction to Persian Art, p. 3

২। A. U. Pope, op. cit. p. 3., chap. I.

অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। তখন হইতে প্রায় দুই সহস্র বৎসর কাল ব্যাবিলোনীয় সভ্যতাই এই পরাজিত জাতি কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কোনও অজ্ঞাত কারণে পারস্যবাসী জনসমূহের মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। আনুমানিক ১৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে আর্য্যবংশীয় প্রাচীন পারসীকেরা যখন ইরাণের অধিত্যকা আক্রমণ করে তখন এলামাইট সভ্যতা পতনোন্মুখ। তাহা হইলেও আর্য্য পারসীকগণের সেমিটিক্ (Semitic) বংশজাত এলামাইটদের কৃষ্টি উপেক্ষণীয় ছিল না। সমাগতেরা ইহাদের শিল্পধারা পুরাপুরি না হউক, অনেকাংশে যে গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত কোনও সুপণ্ডিত আধুনিক পারসীক অনুমান করিয়াছেন যে তৎকালে ইরাণের আর্য্য পারসীকেরা প্রাচীন জার্ম্মাণ ও স্ক্যাণ্ডিনেভীয়দিগের ন্যায় বর্ব্বর সদৃশ ছিলেন (৩)।

লুরিস্তানের আবিষ্কার

কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে, পারস্যের পশ্চিম সীমান্তে লুরিস্তান (Luristan) প্রদেশে যে সকল ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত তৈজস, অলঙ্কার, অস্ত্র শস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও ঘোড়ার সাজ আবিষ্কৃত হয় তাহা সংখ্যায় নিতান্ত কম ছিল না। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করিয়াছেন যে ইহার মধ্যে যেগুলি প্রাচীনতম সেগুলি খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের কম হইবে না আর অর্ব্বাচীনগুলি খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসরের বা তৎপরবর্ত্তী সবগুলি একই জাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই বটে, কিন্তু অতি প্রাচীন কালে, যখন বলিতে গেলে ইতিহাসের অরুণোদয় ঘটে নাই, তখন হইতেই ধাতব শিল্প পারস্যে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা এই সকল নমুনা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় (৪)।

মিদীয় ও পারসীকগণ

পারস্য রাজ্য বলিলে এখন আমরা যাহা বুঝি তাহারই ঠিক পশ্চিমাংশে, খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে ইরাণীয় জাতির দুইটি বিভিন্ন শাখা বাস করিত। তাহারা আসিয়াছিল বক্ষু (Oxus) নদী পরিবেষ্টিত অঞ্চল হইতে। ইহাদের উত্তরাংশে ছিল মিদীয় রাজ্য। মিদীয় (Medes) ও ইরাণীয় (পারসীক) গণ একই বংশ হইতে সমুদ্ভূত হইলেও মিদীয়দিগের সভ্যতা ছিল উচ্চস্তরের। তাহারা লিখিতে পড়িতে জানিত, বর্ণের ব্যবহার জানিত এবং তাহাদের বণিকার শ্রেণীর কারু-শিল্পীরা অট্টালিকার নির্ম্মাণে সুদক্ষ ছিল। এ রাজ্যের রাজধানী একবাতনা (Ecbatana) আধুনিক হামদান নগরের সমস্থানেই অবস্থিত ছিল। তৎকালীন ইরাণ ছিল মিদীয়দিগের করদরাজ্য। মিদীয়গণ ইরাণীদিগের নিকট হইতে রীতিমত রাজস্ব আদায় করিত। বোধ হয় বিলাসিতার ফলেই মিদীয়েরা গৌরব হারাইয়াছিল। মিদীয়রাজ কায়াক্সারেস (Cyaxares), সম্ভবতঃ ইনিই পারসীক ইতিকথার কাই-কাউস হইবেন, হালিস হইতে বক্ষু নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পণ্ডিত হিরোডোটাস্ (Herodotus) ও পলিবিয়াস্ (Polybius) কর্ত্তৃক একবাতানার রাজপ্রাসাদের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত ঐতিহাসিক বহুস্তম্ভ সমন্বিত এই প্রাসাদের বর্ণনা কালে বলিয়াছেন যে, ইহার কড়ি বরগাগুলি ছিল সবগুলিই সুগন্ধি সিডার (cedar) ও সাইপ্রেস্ (Cypress) কাঠের, আগাগোড়া সোনার ও রূপার পাতে মোড়া, আর টালিগুলি ছিল সবই রূপার তৈয়ারী। কেহ কেহ মনে করেন এই প্রাসাদটিকেই পরবর্ত্তী ইরাণীয় স্থাপত্য শিল্পের প্রধান আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

চিরদিন কেহই বশ্যতা স্বীকার করে না। ইরাণীয়েরাও তাহাদিগের একিমিনীয় নরপতিগণের অধীনে ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিয়া মিদীয়দিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অখণ্ড পারস্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

একিমিনীয় নৃপতি দ্বিতীয় সাইরাস (Cyrus) ক্যাম্বাইসেসের পুত্র, মিদীয় রাজ আস্তিয়াজেস (Astyages)কে পরাজিত করিয়া দুইটি ইরাণীয় রাজ্যকে এক শাসনাধীনে আনয়ন করেন এবং এক অখণ্ড ও অবিভক্ত পারস্য জাতির প্রতিষ্ঠা করেন।

৩। Mohsen Moghadam in Messages d' Orient,e Cahier persan, p. 101.

৪। কাহারও কাহারও মতে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের মধ্যে সুমেরীয় (Sumerian) শিল্পই প্রাচীনতম। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ উলি (woolley) বলিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ ৩৫০০ অব্দে সুমেরীয় শিল্প যে সমুচ্চ পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিল বহু শতাব্দীর ক্রমোন্নতি ও অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবপর হইত না।

অজয়ের বন্যা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

অজয় ও জানো দুর্দ্দমনীয় অতি,
যত ভালবাসা, তত বেশী তার রাগ,
বরষ বরষ করে সে আমার ক্ষতি,
তবু ভালবাসি তাহার এই সোহাগ।

২

বরষ ধরিয়া আমি যে প্রাচীন সাথি,
চোখোচোখী হওয়া যেমনি বন্ধ হয়,
বড় আব্দার—রাগিয়া উঠে সে মাতি',
দেখিতে না পেয়ে ঘটায় এই প্রলয়।

৩

তার গৈরিকে রাঙায় আমার বাস,
মোরে দেখে জল উজ্জল হয় হেসে,
বুকে পাই তার নির্ম্মল নিঃশ্বাস,
আমারে না দেখে থাকিতে পারে না সে।

৪

না দেখে আমারে থাকিতে পারে না সে,
দুজনের বুকে প্রায় একই উচ্ছ্বাস,
ঘটাই না ক্ষতি—তা'তে কি যায় আসে
কত লাভ তার খবর কি কেউ পাস্ ?

৫

বান এলো গেল—হাপ্‌সে পড়িল ধান,
ভাসাইল গ্রাম—ডুবে গেল হাট ঘাট।
হৈ চৈ করে দেখে না অসাড় প্রাণ
রাঙা পথ দিয়ে চলে গেল সম্রাট।

৬

দেখি সমারোহ, দেখি বিজয়োৎসব,
অজয়দেবের রঙ্গের কারবার
তোরা খুঁজে মর ভুলি আনন্দ সব
যারা লাভিল, পুঁটুলি হারালো কার।

অপরাধ-বিজ্ঞান

(৩)

শ্রীআনন ঘোষাল

অপরাধ-বিভাগ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে (আষাঢ় সংখ্যা দেখুন) অপরাধীদের তিনটি প্রধান ও সাধারণ বিভাগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। যথা :—অভ্যাস, স্বভাব ও দৈব-অপরাধী। দৈব অপরাধীদের যদি আমরা প্রকৃত অপরাধী না বলি ত অপরাধীরা সাধারণতঃ দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত হয়। যথা :—স্বভাব ও অভ্যাস অপরাধী। আমার মতে, এই দুই প্রকার অপরাধীর মাঝামাঝি আরও এক প্রকার অপরাধী আছে। এদের আমি মধ্যম-অপরাধী বলব। মধ্যম-অপরাধীদের সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। পূর্ব্বেই বলেছি পোরোসুক্রম বা Atavism দ্বারা বীজ-কোষস্থিত ½ অংশ অপরাধ-স্পৃহার দেহ-কোষস্থিত ½ অংশ অপরাধ-স্পৃহার সহিত সংযোগ ঘটলে স্বভাব-অপরাধীর জন্ম হয়। বীজ-কোষস্থিত অপরাধ-স্পৃহার কতখানি দেহ-কোষস্থিত অপরাধ-স্পৃহার সহিত সংযুক্ত হবে, তা অনেক দৈবের উপর নির্ভর করে। এই সংযোগ পুরাপুরি ঘটলে, উৎকৃষ্ট স্বভাব অপরাধীর জন্ম হয়। কিন্তু সব সময় বীজ-কোষস্থিত অপরাধ-স্পৃহার সবটাই দেহ-কোষস্থিত অপরাধ-স্পৃহার সহিত সংযুক্ত হয় না। এইরূপ সংযোগের পরিমাণ বা পরিমাণ অপরাধীর ভাগ্য-বিপর্য্যের উপর নির্ভর করে। কখনও কখনও এইরূপ সংযোগ মাত্র সামান্য পরিমাণে হয়ে থাকে। এইরূপ ঘটলে অপরাধী বিশেষ মধ্যম-অপরাধীর পর্য্যায়ে পড়ে।

এই অপরাধীদের মধ্যে যা কিছু প্রভেদ তা স্তরের বা Degrees মাত্র। কমবেশী একই প্রকার অপরাধ-প্রবণতা সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান।

এই অপরাধ প্রবণতার সাক্ষীরূপে আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণাগুণও এই সব অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বিভিন্নপ্রকার অপরাধীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গুণাগুণ দেখা যায়। এই সকল গুণাগুণ সম্বন্ধে তাদের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য থাকে, তেমনি বিভেদও দেখা যায়। কতকগুলি গুণাগুণ অপরাধী মাত্রেরই মধ্যে দেখা যায়। কতকগুলি গুণাগুণ, আবার একদল অপরাধীদের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু অপরাপর দলের মধ্যে দেখা যায় না। এই সকল গুণাগুণ তাহাদের বাহিরের আবরণ মাত্র। ভিতরে কিন্তু তাহারা থাকে সেই একই প্রকার অপরাধ-প্রবণতা। এক কথায় বাহিরের গুণাগুণের সঙ্গে ভিতরের অপরাধ-স্পৃহার কোনও বিশেষ সম্পর্ক নেই। কমবেশী অপরাধ-স্পৃহাই মানুষকে অপরাধী করে। বাহিরের গুণাগুণগুলি অপরাধীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে মাত্র। অপরাধীদের মতিগতি ও ব্যবহারও এই সব গুণাগুণগুলি নির্দ্ধারিত করে। এইসব গুণাগুণগুলি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। প্রথমে অপরাধ-স্পৃহা সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করা যাক।

যদি উৎকৃষ্ট অপরাধীরা অভ্যাস-অপরাধী হয়, তবে উৎকৃষ্টতর অপরাধীরা হবে মধ্যম অপরাধী, এবং উৎকৃষ্টতম অপরাধীরা হবে স্বভাব-অপরাধী।

এই অপরাধ-স্পৃহা ছাড়া মানুষের মনের মধ্যে আরও দুই প্রকার স্পৃহা আছে। উহাদের যথাক্রমে বলা হয় যৌন স্পৃহা ও শোণিত-স্পৃহা। এই যৌন ও শোণিত-স্পৃহা মানুষের অপরাধ-স্পৃহার প্রধান সহায়ক। এই বিশেষ স্পৃহা দুইটিকে অবলম্বন করে ও অপরাধীরা আবার বহু উপ-বিভাগে বিভক্ত হয়।

এইবার উপবিভাগগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। অভ্যাস, মধ্যম ও স্বভাব অপরাধী প্রকৃত অপরাধীদের তিনটী প্রধান বিভাগ। এই অপরাধী-ত্রয়ের প্রত্যেক অপরাধী গোষ্ঠীই কিন্তু একই প্রকার উপবিভাগে বিভক্ত। যেমন অভ্যাস-সক্রিয়-অপরাধী, মধ্যম-সক্রিয়-অপরাধী, স্বভাব-সক্রিয়-অপরাধী বা অভ্যাস-নিষ্ক্রিয়-অপরাধী, মধ্যম-নিষ্ক্রিয়-অপরাধী, স্বভাব-নিষ্ক্রিয়-অপরাধী, ইত্যাদি। অর্থাৎ অভ্যাস অপরাধীরা যেমন দুই ভাগে বিভক্ত, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, তেমনি স্বভাব ও মধ্যম অপরাধীরাও দুই ভাগে বিভক্ত, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। নিম্নের তালিকাটি থেকে বিষয়টি ভালরূপে প্রতীয়মান হবে।

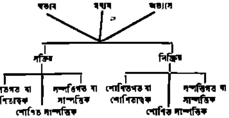

উপরের তালিকাটি থেকে প্রতীয়মান হবে অপরাধী মাত্রই, স্বভাব-অপরাধী, মধ্যম অপরাধী বা অভ্যাস-অপরাধী, যে-কোনও অপরাধীই হউক, তারা প্রধান দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত। যথা :—সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়। যে সকল অপরাধ বল-প্রয়োগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল অপরাধ সক্রিয় অপরাধ। যেমন মারামারি, খুন, জখম, বলাৎকার, ডাকাতি প্রভৃতি। যে সকল অপরাধ দরজা ভেঙে, সিঁধ কেটে বা বল-প্রয়োগের দ্বারা সমাধিত হয়, সেই সকল অপরাধও সক্রিয় অপরাধের পর্য্যায়ভুক্ত। এই কারণে সকল চৌর্য্য বা Burglary অপরাধও সক্রিয় অপরাধ। এক কথায় যে সকল অপরাধের জন্য কম বেশী দৈহিক বলের প্রয়োজন হয়, সেই সকল অপরাধ সক্রিয় অপরাধ। অপর দিকে সহজ-চৌর্য্য বা House theft, শঠতা, 'পিক্ পকেট' প্রভৃতি সরল-চৌর্য্য, বিষপ্রয়োগ, অগ্নিপ্রদান, ব্যভিচার প্রভৃতি দুষ্কার্য্য যাহা গোপনে এবং বিনা বল প্রয়োগে সমাধিত হয়, সেই সকল অপরাধকে আমরা নিষ্ক্রিয়-অপরাধ বলি।

এই সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয়বিধ অপরাধীরাও আবার তিনটী করিয়া উপ-বিভাগে বিভক্ত। যথা :—সক্রিয়-শোণিতাত্মক, সক্রিয়-শোণিত-সাম্পত্তিক, সক্রিয় সাম্পত্তিক এবং নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্মক, নিষ্ক্রিয়-শোণিত-সাম্পত্তিক-, নিষ্ক্রিয়-সাম্পত্তিক। খুন জখম বলাৎকার প্রভৃতি অপরাধ যাহা নিছক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমাধিত হয়, তাকে বলা হয় সক্রিয় শোণিতাত্মক অপরাধ। ডাকাতি রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধ অর্থাৎ যে সকল অপরাধ একাধারে ব্যক্তি এবং সম্পত্তির বিরুদ্ধে সমাধিত হয়, সেই সকল অপরাধকে বলা হয় সক্রিয়-শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধ। অপর দিকে সকল-চৌর্য্য বা Burglary প্রভৃতি অপরাধ যাহা নিছক সম্পত্তির বিরুদ্ধে সমাধিত হয়, এবং যে সকল অপরাধ অনুষ্ঠান কালে বাধা না পেলে অপরাধীরা অপরের শোণিত পাত করে না, সেই সকল অপরাধকে বলা হয় সক্রিয়-সাম্পত্তিক অপরাধ।

এইবার এই "শোণিতাত্মক" শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে বলা যাক। মানুষের স্বভাবগত শোণিতপাতেচ্ছা থেকেই, খুন জখম প্রভৃতি সক্রিয় অপরাধের স্পৃহা মানুষের মধ্যে আসে। মনস্তত্বের দিক

থেকে, শোণিত দর্শন শোণিত পানের প্রকার ভেদ মাত্র। এই শোণিত পান জীব জগতের আদিম স্পৃহা। অধুনাকালে শোণিত পায়েচ্ছা, শোণিত দর্শন ইচ্ছায় পরিণত হয়েছে। নিষ্ক্রিয়-অপরাধীদের মধ্যে বিষ-প্রয়োগ বা গৃহদাহ শোণিতাত্মক অপরাধ। বিষ-প্রয়োগের দ্বারা হত্যা করলে সব সময় রক্তপাত হয় না। এক্ষেত্রে অপরাধী-কল্পনায় শোণিত দর্শন বা পান করে। এই সব কল্পনা, দর্শন বা পান অবচেতন মনের সাথী। খুন করার পর অনেক সময় খুনি-দিগের চিত্ত-বিভ্রম ঘটে। তখন সেই খুনি, খুনের সময়, ঘটনা স্থলে বিশদ রক্ত দেখে কখনও কখনও উন্মত্ত হয়। হৃত-শোণিত পান-ইচ্ছাই তাদের এইরূপ ব্যবহারের কারণ। বলাৎকারও শোণিতাত্মক অপরাধ। এই জন্য এই সকল অপরাধের সঙ্গে দংশন, আঘাত প্রভৃতি অপরাধও সংশ্লিষ্ট হয়। প্রায় দেখা যায় ডাকাতি ও খুনের ন্যায় বলাৎকার ও খুনও এক সঙ্গে সমাধিত হয়। গৃহদাহ দ্বারা সকল সময় ব্যক্তির প্রাণনাশ হয় না। সম্পত্তিই অগ্নিদাহে স্থলে বিনষ্ট হয়। কিন্তু তথাচ গৃহদাহকে শোণিতাত্মক অপরাধ বলি কেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলা উচিৎ। সম্পত্তি লাভের জন্য যে সকল অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় সেই সকল অপরাধকেই সাম্পত্তিক-অপরাধ বলা হয়। অগ্নি-সংযোগের দ্বারা কেহ সম্পত্তি লাভ করে না। ইহা দ্বারা সে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি সাধন বা সম্পত্তি নাশ করে। এইরূপ ক্ষতি সাধনের মধ্যেও থাকে সুপ্ত শোণিত-পায়েচ্ছা। ব্যভিচার সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। এইরূপ গোপনে গৃহদাহ, বিষপ্রয়োগ ব্যভিচার প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় অপরাধকেও শোণিতাত্মক অপরাধ বলা হয়। সুপ্ত শোণিত পান বা দর্শন ইচ্ছার জন্যই মানুষ এই সব দুষ্কার্য্য করে থাকে এই জন্য অপরাধ-বিশেষের মধ্যে কোনও যুক্তি পরিলক্ষিত হয় না। এ বিষয়ে কয়েকটী বাস্তবীয় উদাহরণ দিতেছি।—"আলিগড়ে এক সৎ-মা তার সতীন-পুত্রকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। কারণ সে তার বিরক্তি উৎপাদন করেছিল। ঝাঁসীর এক ব্যক্তি তার এক কন্যাকে হত্যা করে। কারণ মেয়েটী সম্বন্ধে পড়শীরা অ-কথা কু-কথা বলত। তার বিশ্বাস ছিল এতদ্বারা কন্যার রক্ত পড়শীদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হবে (১৮৮০)। য়ুরোপের এক অপরাধী তার স্ত্রীকে হত্যা করার পর চাটু চেড়ে স্ত্রীর কানে কথা বিক্রী করে। একজন ধাত্রী দুইটী পালিত শিশুকে কেবলই রক্তের আস্বাদ্ পাইতে হত্যা করে। উক্ত ডাক্তারের কাছে খুঁটিনাটি বর্ণনা করায় আনন্দ লাভ।" ইহা একটী নিষ্ক্রিয় ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাই, মানুষের শোণিত-স্পৃহা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয় অপরাধীদের মধ্যেই অল্পবেশী বর্তমান। সক্রিয় অপরাধীদের মধ্যে উহা বেশী মাত্রায় এবং জাগ্রত অবস্থায় থাকে এবং নিষ্ক্রিয় অপরাধীদের মধ্যে উহা কম মাত্রায় এবং সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ইতিপূর্বে সক্রিয় অপরাধীদের উপবিভাগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এখন নিষ্ক্রিয় অপরাধীদের উপবিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। নিষ্ক্রিয় অপরাধীরাও যে অনুরূপভাবে তিন ভাগে বিভক্ত তা পূর্বেই বলেছি :—যথা নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্মক অপরাধ, নিষ্ক্রিয়-শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধ এবং নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক অপরাধ। বিষপ্রয়োগ, গৃহদাহ প্রভৃতি অপরাধকে আমরা উপরিউক্ত কারণে নিষ্ক্রিয়-শোণিতাত্মক অপরাধ বলি। নিষ্ক্রিয়-রাহাজানি বা Drugging Case প্রভৃতি যাতে অপরাধীরা মানুষকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা হত্যা বা অবচেতন করে, সম্পত্তি অপহরণ করে, সেই সকল অপরাধকে বলা হয় নিষ্ক্রিয়-শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধ। সহজ চৌর্য্য বা Pick-pocket এবং সহজ চৌর্য্য বা House theft প্রভৃতিকে বলা হয় নিষ্ক্রিয়-সাম্পত্তিক অপরাধ। ইহারা কখনও বল প্রকাশ করে না, বাধা পেলেও না। শোণিত পায়েচ্ছা ইহাদের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে সুপ্ত থাকে। এইবার পরবর্তী তালিকাটি দেখলে, অপরাধীদের উপবিভাগ সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা হবে।

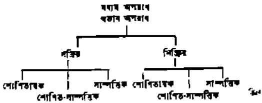

এই শেষোক্ত উপবিভাগগুলিও অর্থাৎ সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্মক, শোণিত-সাম্পত্তিক এবং সাম্পত্তিক অপরাধীরাও আবার দুইটী করিয়া উপবিভাগে বিভক্ত হলে মনে হয়। যেমন সক্রিয় শোণিতাত্মক অপরাধীদের দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—যৌনজ ও অযৌনজ। যারা খুন খারাপ করে তাদের সক্রিয় অযৌনজ শোণিতাত্মক অপরাধী এবং যারা বলাৎকার (Rape) প্রভৃতি করে থাকে তাদের সক্রিয় যৌনজ শোণিতাত্মক অপরাধী বলা যেতে পারে। ডাকাতি প্রভৃতি যে সকল শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধ পাঁচ ততোধিক ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে দেখা যায়, কোনও কোনও অপরাধী কেবলমাত্র আঘাত হানে, কেহ কেহ একই সঙ্গে আঘাত হানে ও সম্পত্তি অপহরণ করে; কেহ কেবলমাত্র সম্পত্তি অপহরণ করে, কেহ আবার নারীর উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। যারা নারীর উপর অত্যাচার করে, তাদের প্রায় সম্পত্তির দিকে ঝোঁক থাকে না। হিংসা-বৃত্তি, চৌর্য্যবৃত্তি ও কামবৃত্তি প্রায়ই এক সঙ্গে আসে না। চার পাঁচ প্রকার অপরাধী ডাকাতদের দলের মধ্যে দেখা যায় অনুরূপভাবে নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্মক অপরাধীদেরও আবার দুইটী ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :—যৌনজ ও অযৌনজ। যারা বিষপ্রয়োগ, গৃহদাহ প্রভৃতি করে, তাদের বলা যেতে পারে, নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্মক অযৌনজ অপরাধী, এবং যারা ব্যভিচার প্রভৃতিতে লিপ্ত হয়, তাদের বলা যেতে পারে যৌনজ নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্মক অপরাধী।

সক্রিয় শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধীদেরও দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—সবলা এবং অবলা। যে সকল অপরাধীরা রাহাজানি (Robbery) ডাকাতি প্রভৃতির সময় বিনা প্রয়োজনে বলপ্রকাশ করে; তাদের সক্রিয় শোণিতাত্মক সবলা অপরাধী এবং যারা মাত্র প্রয়োজনে উক্ত কার্য্যের জন্য বলপ্রয়োগ করে, তাদের সক্রিয় শোণিতাত্মক অবলা অপরাধী বলা যেতে পারে। অনুরূপভাবে নিষ্ক্রিয় শোণিত সাম্পত্তিক অপরাধীদেরও দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা সবলা এবং অবলা। যে সকল অপরাধীরা সম্পত্তি অপহরণের সময়, বিনা প্রয়োজনে বিষপ্রয়োগ করে, তাদের নিষ্ক্রিয় শোণিতাত্মক সবলা অপরাধী এবং যারা উক্ত কার্য্যের জন্য মাত্র প্রয়োজনে বিষ-প্রয়োগ করে, তাদের নিষ্ক্রিয় শোণিত-সাম্পত্তিক অবলা অপরাধী বলা যেতে পারে।

সক্রিয়-সাম্পত্তিক-অপরাধীদেরও দুইটী উপবিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা :—বিদ্ধা এবং অবিদ্ধা। যে সকল সবল চৌর্য্যের সময় সবল চোরেরা (Burglar) মাত্র দেওয়াল ও তালা প্রভৃতি ভাঙে, কিন্তু মানুষের উপর কখনও আঘাত হানে না, তাদের বলা যেতে পারে সক্রিয় "অবিদ্ধা" অপরাধী এবং যে সকল সবল চোরেরা প্রয়োজন হলে, তবে আঘাত হানে তাদের বলা যেতে পারে সক্রিয় "বিদ্ধা" অপরাধী। অনুরূপ নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক অপরাধীরাও দুইটী ভাগে বিভক্ত হতে পারে। যথা :—বিদ্ধা এবং অবিদ্ধা। যে সকল সহজ ও (House Thief) ও সহজ (Pick Pocket) চোরেরা কোনরূপ বিবাদ সৃষ্টি করে না, এমন কি, ধরা পড়লেও যারা আঘাত হানে না, তাদের বলা যেতে পারে নিষ্ক্রিয়-সাম্পত্তিক-অবিদ্ধা অপরাধী। এবং যে সকল চোরেরা আঘাত হানে না বটে, কিন্তু দুয়ারের শিকল টেনে বা দোরের

কড়া দড়ি দিয়ে বেঁধে, ধরা না পড়ার জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাদের বলা যেতে পারে, নিষ্ক্রিয় সাম্পত্তিক-বিরুদ্ধ-অপরাধী। আমি একজন Pick-Pocketকে জানতাম যে পালাবার সময় পশ্চাৎ ধাবিত লোকেদের প্রতিরোধ করবার জন্য ডাষ্টবিন্ প্রভৃতি উল্টে দিয়ে পথরোধ করত। অবশ্য এই সকল উপবিভাগ এবং সেই উপবিভাগীয় অপরাধীদের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি এখনও অনুসন্ধান করছি। এবং সত্য-নিরূপণার্থে আরও সাক্ষ্য প্রমাণ ও তথ্যাদির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এইবার নিম্নের তালিকাটী অনুধাবন করলে বিষয়টী সম্যক রূপে উপলব্ধি হবে।

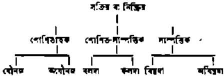

প্রকৃতি ও আকৃতি

এইবার অপরাধীদের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এই সব গুণাগুণ অপরাধীদের আকৃতি ও প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। বিভিন্ন বিভাগীয় ও উপবিভাগীয় অপরাধীদের আকৃতি ও প্রকৃতিও বিভিন্ন রূপ হয়। বিশেষ রূপে অনুধাবন করলে, অপরাধী বিশেষ কোন বিভাগীয় বা উপবিভাগীয় তা তাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য থেকে ধরা পড়ে। সাধারণতঃ অপরাধী মাত্রই কর্ম্মালস হয়। তাদের যত কিছু অলসতা আছে, কাজকর্ম্মে। তারা সৎভাবে কাজ করতে অক্ষম। পরগাছা জীবনই তারা ভালবাসে। এই স্বভাব অলসতা দূর করবার জন্য তারা প্রায়ই মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। এই ভাবে তারা কর্ম্মতৎপর হয়। এবং তাদের এই কর্ম্মতৎপরতা তারা সৎ কাজে নিয়োজিত করে। তবে মদ্যপানাদি তারা করে অবসর সময়ে মনকে সচল করবার জন্য। অপরাধ করার সময় কিন্তু তারা কখনও মদ্য পান করে না। এই জন্য মাদক দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীর সংখ্যাও কমে যায়। স্বভাব-অলসতা দূর করে নিজেদের কর্ম্মক্ষম করবার জন্য মাদক দ্রব্য তাদের নিকট এক অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। অন্য দিকে অভ্যাস অপরাধীদের মধ্যে স্বভাব অপরাধী ও প্রধান অপরাধীদের তফাৎ অনেক কমে যায়। সেইজন্য অপরাধীমাত্রেই জেল-জীবনকে তাদের স্বাভাবিক জীবন বলে মনে করে। জেলের বাইরের দিন কয়টিকে তারা তাদের ছুটীর দিন বলে মনে করে। ছুটীর দিন কয়টিতে যেমন মানুষ আনন্দ উপভোগ করে, জেল বাইরের দিন কয়টিও প্রকৃত অপরাধীরা তেমনি উপভোগ্য করে তুলে। তারা চুরি করে এবং সেই চুরির টাকা না জমিয়ে তা দিয়ে তারা খায় দায় ফুর্ত্তি করে। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দিলেও যদি কোনও প্রকৃত অপরাধীকে জেলে পাঠান যায় ত সেজন্য সে কখনও ক্রুদ্ধ বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় না। তারা উহা তাদের এক স্বাভাবিক পরিণতই বলে মনে করে। এই কারণে জেল থেকে খালাস পেয়ে কোনও কয়েদী কোনও পুলিশ অফিসারকে আঘাত করেছে, এমন কোনও কাহিনী শোনা যায় না। বরং প্রথম দর্শনে তাদের পুলিশ অফিসারদের সামনে সেলাম করতেই দেখা যায়। কিন্তু কোনও প্রহরী যদি তাদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে এবং সেই উৎকোচের মর্য্যাদা না রেখে তাদের কোনও অপকার সাধন করে ত তখন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে সক্রিয় অপরাধীরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রহরীদিগকে নিহত বা অন্য কোনও প্রকারে তাদের ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট হয়। ভীরুপ্রকৃতির নিষ্ক্রিয় অপরাধীরা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিশোধ গ্রহণে অপারক হয়ে প্রহরীদিগকে গালিগালাজ করে, এবং অভিসম্পাত দেয়।

উপরি উক্ত গুণাবলী অপরাধীমাত্রেরই সাধারণ গুণাগুণ। এই সকল গুণাগুণ ছাড়া আরও অনেক গুণাগুণ আছে যা সকল প্রকার অপরাধীদের মধ্যেই সমান ভাবে দেখা যায় না। যন্ত্রণা বা বেদনাবোধক অচেতনতা অপরাধীমাত্রের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই অচেতনতা স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যেই অধিক পরিমাণে বর্ত্তায় এবং অভ্যাস অপরাধীদের মধ্যে এই অচেতনতা তুলনায় কম দৃষ্ট হয়। এমনও দেখা গেছে, অপরাধী বিশেষের পা অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে, অথচ সে তা জানতে পারেনি। অস্ত্রবিদ্ধের আঘাত তাদের কাছে আঘাতই নয়। এই জন্য দৈহিক পীড়ন অপরাধীদের বিশেষ করে স্বভাব অপরাধীদের কখনও ভীতি উৎপাদন করে না। দৈব অপরাধীরাই বরং দৈহিক পীড়নকে ভয় করে। অপরদিকে স্বভাব-অপরাধীরা স্বল্পবুদ্ধি বিধায় খাদ্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু অভ্যাস-অপরাধীরা খাদ্যে ভুলে না, তারা ভুলে লোভে। দৈব অপরাধীরা আবার ইজ্জতের ভয় বেশী করে। অভ্যাস অপরাধীরা বিশেষ করে দৈব অপরাধীরা তাদের স্ত্রীপুত্রাদির মঙ্গলামঙ্গলের জন্য চিন্তিত থাকে। কিন্তু স্বভাব অপরাধীদের নিকট এই সব চিন্তার স্থান নেই। স্বভাব-অপরাধীরা প্রায় বিবাহিত হয় না; কিন্তু অভ্যাস ও দৈব অপরাধীরা প্রায়ই বিবাহিত হয়। তদন্তকারী অফিসাররা যদি উক্তরূপ প্রকৃতিগত বিভেদ থেকে অপরাধী-বিশেষ একজন স্বভাব, অভ্যাস বা দৈব অপরাধী তা চিনে নিতে পারেন [illegible] তাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে উঠে। তারা তখন অপরাধীদের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। অপরাধীদের চোখ বেঁধে দিয়ে ব্যাটারীর হাল্কা বিদ্যুৎপ্রবাহ তাদের দেহে সঞ্চারণ করে, অপরাধী বিশেষ একজন স্বভাব, অভ্যাস বা দৈব অপরাধী তা জানা যায়। সূচীযন্ত্রের মৃদু আঘাত দ্বারাও এইরূপ পরীক্ষা সম্ভব।

দুধারা

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

শুনিতে পাওয়া কলকোলাহলে কারা ডাকে বারবার,
পথের দুধারে বিরামবিহীন কাহাদের পথচলা,
জীর্ণ কুটীরে রোদে আর ঝড়ে করুণ ব্যর্থতার
বিচিত্র লেখা কালো করে দেয় বিবিধ চিত্রকলা।
তোমার আমার শিয়রে বন্ধু বলভিচ্ছায়ার পরে
আদিম প্রকৃতি পুরুষের সনে খেলা করে নির্ভয়

বাতায়নতলে দূরবাহারের শুনি মধুনিক্কণে
সুদূর প্রান্তের উর্ব্বশী যেন পুরাতন কথা কয়।
বন্ধু তাইতো ভাল লাগে এই ধূসর সন্ধ্যাবেলা
জানালার ফাঁকে চুরি করে দেখা বীণা হাতে বীণাপাণি,
আমার জগতে সারাদিন ছিল রাজার কাজের খেলা,
আমারে যে মোর ঘুম ভেঙ্গে যাবে, সে কথা কি আমি জানি ?

মাতাল বাতাস করে দিল খোলা, আকাশ দোলানো চাঁদ,
রাতে ভাল লাগে রজনীগন্ধা, ক্ষমা করো অপরাধ।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও তৎকালের নাট্যশালা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় ৩২ বৎসর পূর্ব্বের কথা—সময়টা বঙ্গাব্দ ১৩১৭, ইংরাজী ১৯১০। তরুণ নাট্যকার ও সাংবাদিকরূপে সাহিত্য-সাধক দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই; আর, সে পরিচয়টি শ্রদ্ধাভাজনের প্রচুর স্নেহরসে অভিষিক্ত হয়ে আমাকে অভিভূত করে। তরুণ বয়সটি উদ্ভাসিত হয় তারই প্রভাবে। এর উপলক্ষ হয় তখনকার জনপ্রিয় মাসিক—'নাট্য-মন্দির।'

দ্বিজেন্দ্রলালের কীর্ত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে বাঙ্গালার নাট্যশালা, আর তাঁর স্মৃতিভরা তখনকার 'নাট্য-মন্দির' নামে নাট্য পত্রিকাখানির পুরাতন পৃষ্ঠাগুলি। বাঙ্গালা নাট্যশালার অন্যতম যুগপ্রবর্ত্তক, সে-যুগের সুপ্রসিদ্ধ প্রতিভাশালী অধ্যক্ষ-অভিনেতা স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩১৭ বঙ্গাব্দে উক্ত পত্রিকাখানি প্রকাশিত ক'রে তখনকার নাট্যবিদদের মধ্যে একটা যোগসূত্র রচনার সুযোগ দিয়েছিলেন। তার ফলে, উক্ত পত্রিকার পৃষ্ঠায় আমরা গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, মনোমোহন বসু প্রমুখ নাট্যকারগণের জীবন-কথার এমন অনেক পরিচয় পাই—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পক্ষে যাদের উপযোগিতা প্রচুর। তরুণ বয়সে এই পত্রিকাখানির সংস্রবেই বাঙ্গালা রস-সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা, নাট্যশিল্পে নবধারার প্রবর্ত্তক, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ঘরের অন্তরঙ্গটির মত পরিচিত হবার সৌভাগ্য ঘটে; তারই প্রভাবে তাঁর নাট্য-জীবনের প্রাথমিক অবস্থা, তথা—নাট্য-প্রতিভা বিকাশের আভাসটুকু পাওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-জীবন সম্পর্কে আমরা জানিবার সুযোগ পাই যে, শৈশব থেকেই কবিতা আর গানের প্রতি তাঁর বিশেষ আসক্তি ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁকে বলতে শুনেছি: খুব নীচু ক্লাসেই তখন পড়ি, কত আর বয়স হবে—বড় জোর নয় কি দশ, সেই বয়সেই বায়রণের কবিতা, মেঘদূত এবং উত্তররাম চরিতের শ্লোকগুলো বক্তৃতার ভঙ্গিতে আবৃত্তি করতাম। শ্রোতা ছিল, বাড়ীর ও পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, আর চাকর বাকরের দল। একদিন হয়েছে কি, আকাশে দারুণ দুর্য্যোগ, মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হয়েছে, আর আমি সেই দুর্য্যোগ মাথায় করে একটা প্রাচীরের উপর উঠে মেঘদূতের শ্লোক আউড়ে চলেছি, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ঠিক সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাড়ীতে এলেন। প্রথমেই তাঁর চোখে পড়ল—দুর্য্যোগের মধ্যে বালক বক্তার দুঃসাহসিক কাণ্ড। যাই হোক, তাঁকে দেখে নেমে আসতে হল। যাবার সময় তিনি বড়দাকে বলে গেলেন—ছেলেটি কালে একজন বড় লোক হবে।···এর পর থেকেই দাদা গুণধর ভাইটিকে একটু সুনজরে দেখতে লাগলেন। একদিন হঠাৎ তাঁর কানে গেল যে, আমি নাকি সেই বয়সেই কবিতা লিখতে পারি। তখনি তাঁর বৈঠকে আমার ডাক পড়ল, হুকুম হ'ল সেখানে বসে বসেই একটি কবিতা লিখতে হবে। হুকুম শুনে ঘাবড়ালুম না, মিনিট পাঁচেক চুপচাপ বসে থেকে আকাশের 'তারা' সম্বন্ধে একটা কবিতা রচে দিলাম। দাদা ত অবাক! পীঠ চাপড়ে বাহোবা দিলেন কত।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরচিত আত্মকথা থেকেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের বিকাশ এবং ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের আভাস পাওয়া যায়। যথা:

"বারো বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। ১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি 'আর্য্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল 'মেবারে সন্ধ্যা' নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা 'নব্য ভারতে' প্রকাশিত হয়। বিলাতে গিয়া ইংরাজীতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং এই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্যর এডুইন আরনল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি। তৎসঙ্গে কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপিও প্রেরিত হয়। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লিখেন এবং কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে 'লিরিক্‌স অব, ইণ্ড.' আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।"

নাটক রচনার স্পৃহা কি ভাবে তাঁহার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সেই স্পৃহাটিকে দৃঢ় করে তোলে, তার আত্মকথা থেকে আমরা সে-পরিচয়ও সুস্পষ্ট ভাবে পাই। ফলে, জানা যায় যে, শুধু স্পৃহার বশবর্ত্তী হয়েই তিনি নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নি—নানাসূত্রে এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাপটুতা তিনি যে অভিনিবেশ সহকারে সঞ্চয় করে তবে এ ব্যাপারে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁর আত্মকথা থেকেই উপলব্ধি হয়। যথা:

"বিলাত যাইবার পূর্ব্বে আমি হেমলতা এবং 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র। আর, কৃষ্ণনগরের এক সৌখিন অভিনেতৃদল কর্ত্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক প্রহসনের অভিনয় দেখি। ইহার পর Addisonএর Cato এবং Shakespeareএর 'জুলিয়াস সিজারের' আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে বিভিন্ন নাটকগুলির অভিনয় দেখিতে আরম্ভ করি। সেই সময়েই বঙ্গ ভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়। • • • এই সময়েই বাঙ্গলা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Legendsএর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া 'আষাঢ়ে' নামে প্রকাশ করি। সেই সময় আমি ইংরাজী গান খুব গাহিতাম। কিন্তু বাঙ্গালী শ্রোতাদের সে-গান ভাল লাগিত না। তখন ইংরাজী গান গাওয়া ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালায় গান রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করি। বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া 'আর্য্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ' নাম দিয়া ছাপাই, এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি মজলিসে অনেকের প্রিয় হয় এবং আমি কর্ম্মোপলক্ষে কোন সহরে যাইলেই ঐ সকল গান আমাকে স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগুলি একত্র গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়। • • • উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যাপারই আমার নাটক লিখিবার প্রবৃত্তির সহায়তা করিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই আত্মকথা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, সাফল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বরচিত রচনার প্রকাশ ব্যাপারে তিনি ছিলেন কিরূপ ধৈর্য্যশীল এবং নাটক লিখিবার স্পৃহা বা প্রবৃত্তির রাশটি কিভাবে টেনে রেখেছিলেন তিনি। নাট্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সেক্সপীয়রের অনুকরণে প্রথমে ব্ল্যাঙ্ক-ভার্সেই নাটক রচনা আরম্ভ করেন। তারই নিদর্শন-স্বরূপ—তারাবাঈ। রচনা শেষ হলেই এই নাটকখানি তিনি ছেপে বার করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল যে, নাটকখানি খুবই জনপ্রিয় হবে।

তার পর, এই ছন্দেই পরের নাটকগুলি রচনা করবেন। কিন্তু নাটকখানির সম্বন্ধে এমন একটি লোকের মতামত তাঁর এই সংকল্প ঘুরিয়ে দিল—যাঁর মতামত তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেন। তিনি হচ্ছেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। 'তারাবাঈ' নাটক ছাপা হতেই দ্বিজেন্দ্রলাল এক কপি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র নাটকখানি পড়ে নবীন নাট্যকারকে জানালেন—'এ অমিত্রাক্ষর চলবে না।' অন্য কোন লেখক হলে—প্রতিভার এ রকম অসম্মান দেখে হয়ত চটে উঠতেন কিংবা অনুরূপ ছন্দেই আর একখানি নাটক লিখে তার পাল্টা জবাব দিতেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ধীরভাবে বিজ্ঞ কবি-বন্ধুর কথাটা উপলব্ধি করলেন। বুঝলেন—ঠিক কথাই তিনি বলেছেন। অমনি সেই সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের কথাটাও বিদ্যুতের মত তাঁকে সচকিত করল। মাইকেলও একবার কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'অমিত্রাক্ষরে নাটক চলতে পারে না। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের ভাষণ বস্তুত' (অর্থাৎ [illegible])। অমিত্রাক্ষরে সবল বটে, কিন্তু তাদের সংলাপ যেখানে সংক্ষিপ্ত অথচ গতি দ্রুত—সেখানে অমিত্রাক্ষর সার্থক হয় না,—কথোপকথন গদ্যে হলেই মর্মস্পর্শী হয়।' দ্বিজেন্দ্রলাল তখন মহা ভাবনায় পড়লেন—তাঁর অনুশীলিত ভাবধারা ছন্দোবদ্ধ অমিত্রাক্ষরকে ত্যাগ করে মিশ্র গদ্যের মধ্য দিয়ে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে? চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চলল পড়াশোনা। সেক্সপীয়রের নাটকগুলোর সঙ্গে সঙ্গে—বাঙলা নাট্যশালায় যে-সব নাটকের অভিনয় তখন চলছিল—আগাগোড়া তাদের অভিনয় দেখলেন, তাছাড়া বাংলা ভাষায় যে সব নাটক ছেপে বেরিয়েছিল সে গুলিও সংগ্রহ করে মনোযোগ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন।

এর পরে একটা নূতন পথ তাঁর চোখের সামনে খুলে গেল। তিনি দেখলেন—সেক্সপীয়রের নাটকের সংলাপ কখনো খানিক পদ্য, খানিক গদ্য, তথাপি দুটিতে মিলে খাপ খেয়েছে ত! সঙ্গে সঙ্গে নিজেই চিন্তা করে এর কারণটিও উপলব্ধি করলেন যে, ইংরেজি ভাষার [illegible] সে সময় এসেছিল। Carlyleএর মতবাদও তাঁর অন্তর স্পর্শ করল; কার্লাইলও গদ্যকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন—'সাধারণ থেকে [illegible] এমন কোন ভাব নেই—গদ্যের জোরে যা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা না যায়। পদ্যের কথায় ছন্দের দোলা আছে, কিন্তু গদ্যের গাম্ভীর্য্য ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যেও নেই।' এই সঙ্গে—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাও যেন কার্লাইলের কথাগুলির প্রতিধ্বনি করল। তাঁর ভাষা অনেক স্থলেই ত পদ্য। সেইজন্যই নাটকে রূপান্তরিত হয়ে বঙ্কিমের উপন্যাস নাট্যজগতকে আলোকিত করেছে। ওদেশের মিল্টন, শেলি, ইমর্সন, ফ্লেচার—এঁদের গদ্যের ভাষাও যে পদ্যের চেয়ে পুষ্ট!—আর কি, পথের সন্ধান পেতেই স্থির করলেন—গদ্যের কথায় গান দিয়েই তিনি লিখবেন নূতন ছন্দে পরবর্তী নূতন নাটক।

এবার দ্বিজেন্দ্রলালের কথাতেই বলি—"এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম। সেই জন্য আমি আমার তারাবাঈ-এর পরবর্তী নাটকগুলি—রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবার পতন, সাজাহান প্রভৃতি যথাক্রমে গদ্যেই রচনা করি। কিন্তু কবিতার প্রতি আমার স্বাভাবিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্য তাহাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ, যেখানে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা প্রচলিত শব্দ বেশী জোরের সহিত ভাব প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেখানে প্রচলিত শব্দই ব্যবহার করিয়াছি।"

নাটকের মত প্রহসন রচনা সম্পর্কেও এই রকম একটা বৃত্তান্ত আছে। বাঙালা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রহসনগুলির অভিনয় দেখে তাদের মৌলিকতা ও সৌন্দর্য্যে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন মুগ্ধ হন, পক্ষান্তরে সেগুলির রুচিগত কদর্য্যতা ও অশ্লীলতায় তিনি তদ্রূপ ক্ষোভ পান। এরই ফলে তাঁর 'কল্কি অবতার' নামে বিখ্যাত প্রহসনখানি রচিত হয়। কিন্তু নাট্যশালার পাদ-প্রদীপের আলোকে প্রথম রূপায়িত হয় তাঁর বিখ্যাত গীতি বহুল নাটিকা 'বিরহ'। ১৮৯৯ সালের ৭ই অক্টোবর 'ষ্টার' থিয়েটারে তাঁর এই নাটিকাখানি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। সেকালের সুকণ্ঠ গায়ক অভিনেতা কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় এই নাটিকার গোবিন্দের পীঠমর্দ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সঙ্গীত-রসিক-সমাজকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছিলেন। বিরহের পরবর্তী প্রহসন হচ্ছে 'প্রায়শ্চিত্ত'।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের অভিনীত নাটকগুলির প্রসঙ্গে এখানে কলকাতার তৎকালীন নাট্যশালা-সম্পর্কে সংক্ষেপে দুচার কথা বলতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রথম নাটিকা 'বিরহ' নিয়ে যখন নাট্যশালার সংস্রবে আসেন, তৎকালের স্বদেশী থিয়েটার রূপে 'ষ্টারে'র বিশেষ খ্যাতি থাকলেও, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিচালিত 'ক্লাসিক' থিয়েটার আধুনিকতার দিক দিয়ে তখন সমধিক প্রসিদ্ধ ও প্রভাবান্বিত। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র সেখানে ছিলেন নাট্যকার এবং নাট্য পরিচালক। তাছাড়া, সমকালীন বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রী, গায়ক গায়িকা, নর্তক নর্তকী, চিত্রকর, যন্ত্রশিল্পী প্রায় সকলেই ক্লাসিকের সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং প্রিয়দর্শন অভিজাত-বংশীয় রূপশ্রী নট অমরেন্দ্রনাথ তার অধ্যক্ষ। সুতরাং জনমত যে স্বভাবতঃ প্রগতিশীল আধুনিকতার দিকে আকৃষ্ট হবে, সেটা স্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ক্লাসিকে' তাঁর একখানি প্রহসনের অভিনয় সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় গুণগ্রাহী অমরেন্দ্রনাথ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। এর ফলে, তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনখানি 'বহুৎ আচ্ছা' নামে ক্লাসিক থিয়েটারে ১৯০২ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 'বিরহে'র মত এখানিও কয়েকখানি হাসির গানের বিচিত্র উপাদানে রচিত। এর প্রধান চরিত্র চ্যাটার্জি সাহেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অমরেন্দ্রনাথ অপূর্ব অভিনয় করেন। যাঁরা সে ছবি দেখেছেন, আমার মতই বোধ হয় মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করবেন। এই ক্ষুদ্র প্রহসনখানিকে অবলম্বন করেই নট-কেশরী অমরেন্দ্রনাথ তখনকার 'নাট্য-জগতে' রীতিমত একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন বলা চলে।

এই সাফল্যে দ্বিজেন্দ্রলালও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন এবং রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটক রচনায় তিনি আগ্রহান্বিত হন। এর আগেই তাঁর 'তারাবাঈ' নাটক ছাপা হয়েছিল এ কথা বলা হয়েছে। এই সময় স্বনামধন্য ধনী গোপাললাল শীলের [illegible] গিরীন্দ্রনাথ মল্লিক—এখন যেখানে বিডন ষ্ট্রীট পোষ্ট আফিস, সেখানে 'ইউনিক থিয়েটার' নাম দিয়ে—এক নাট্যশালা খুলে অভিনয়োপযোগী ভাল নাটক খুঁজছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) এই সময় অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক ছেড়ে 'ইউনিকে' যোগ দেন, বিখ্যাত নট চুনীলাল দেব এখানে নাট্য-পরিচালক, তারকচন্দ্র পালিত, ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রভৃতি প্রধান অভিনেতা। চুনীবাবুই সাগ্রহে দ্বিজেন্দ্রলালের ছাপা নাটক 'তারাবাঈ' তাঁদের নূতন নাট্যশালার জন্য নির্বাচিত করেন। ১৯০৩ অব্দের মার্চ মাসে ইউনিক থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের 'তারাবাঈ' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। পৃথ্বীরাজের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এবং চুনীলাল দেব, তারক পালিত ও ক্ষেত্রমোহন মিত্র যথাক্রমে সূর্য্যমল, রায়মল ও জয়মলের ভূমিকা গ্রহণ করে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

'তারাবাঈ' নাটকের পরেই আত্মপ্রকাশ করে 'রাণা প্রতাপ।' এই নাটকখানির অভিনয়-ব্যাপারে তৎকালে সহরে রীতিমত একটা-চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সে সময়টা হচ্ছে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ—১৯০৫ অব্দ চলছে, দেশাত্মবোধের উদ্দীপনার আবর্তে সমগ্র বাঙালা দেশ উন্মত্ত হয়েছে। সেই সময়—বড় বড় হরফে ছাপা লাল রঙের প্রাচীর-পত্র সহরবাসীকে জানিয়ে দিল—ডি. এল. রায়ের যুগান্তকারী ঐতিহাসিক নাটক 'ষ্টার' থিয়েটারে মহলায় পড়েছে। ২২শে জুলাই তারিখে 'রাণা প্রতাপ' ষ্টারের পাদ-প্রদীপের আলোকে প্রথম

হন রূপায়িত। সে অভিনয়ে রসরাজ অমৃতলাল বসু শক্তসিংহ এবং অমৃতলাল মিত্র রাণা প্রতাপের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ষ্টারের কর্তৃপক্ষগণ রাণা প্রতাপ নাটকের অংশ বিশেষ পরিবর্তন করায় দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং ষ্টারে রাণা প্রতাপ নাটকাভিনয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'মিনার্ভা' থিয়েটারে অপরিবর্তিতভাবে তাহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। সুশিক্ষিত ব্যবহারাজীবি মহেন্দ্রকুমার মিত্র তখন মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাহার অধ্যক্ষ। গিরিশচন্দ্রও এই সময় 'রাণা প্রতাপ' নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে মহেন্দ্রবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের রাণা প্রতাপ ষ্টারে অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও মিনার্ভায় পুনরভিনয় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি রাণা প্রতাপ রচনায় নিরস্ত ত হলেনই, উপরন্তু মিনার্ভায় দ্বিজেন্দ্রলালের রাণা প্রতাপ মহলা দিবার ভার সানন্দে গ্রহণ করলেন। এখানে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং শক্তসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রায় একই সময় দুইটি প্রসিদ্ধ নাট্যশালায় যুগপৎ একই নাটকের অভিনয় যেমন আন্দোলনের বিষয়বস্তু হয়, তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভাও এই ঘটনা এবং নাটকখানিকে অবলম্বন করে অপ্রত্যাশিতভাবে বিকাশ পায়।

রাণা প্রতাপের পর দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তী নাটকাবলী—দুর্গাদাস, নূরজাহান, সোরাব রোস্তম, মেবার পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি বিপুল সমারোহে যখন অভিনীত হতে থাকে—তিনি তখন সুবিখ্যাত হয়েছেন, তাঁর প্রতিভা তৎকালে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের মতই সমুজ্জ্বল।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের অভিনয় কালেই—১৯১০ অব্দের জুন মাসে—কম্পিত পদে নাট্যশালায় যাত্রারম্ভ করা সম্ভব হয়েছিল আমার পক্ষে। যে রাত্রিতে মহেন্দ্রকুমার মিত্র পরিচালিত 'মিনার্ভা' থিয়েটারে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের উদ্বোধন হয়, তারই পরবর্তী সপ্তাহে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিচালিত নাট্যশালায় মৎপ্রণীত 'বাজীরাও' আত্মপ্রকাশ করে।

চন্দ্রগুপ্তের পর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন 'পুনর্জন্ম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিনার্ভার কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রহসনখানি কয়েক সপ্তাহ পরে ১৯১১ অব্দের ২২শে জুলাই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গেই অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। এর কিছুকাল পরে অমরেন্দ্রনাথ 'ষ্টার' থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত কাহিনী-কবিতা 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা' প্রহসনে পরিণত করে অভিনয় করেন। এখানিও সুনির্মল হাস্যরসোজ্জ্বল প্রহসনরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। অতঃপর এই 'ষ্টার' থিয়েটারেই তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটক 'পরপারে' এবং রঙ্গ-নাট্য 'আনন্দ বিদায়' অভিনীত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভার প্রকাশ ও বিকাশের মোটামুটি আভাসটুকু দিয়েই আমি 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা' সারলুম। প্রকাশ করবার অক্ষমতা মনেই থাক, মান ও মান-মাহাত্ম্যের কথাগুলি তাঁর ভক্তমণ্ডলী তথা সাহিত্য-রসিক-সমাজ উপভোগ করবেন—এই ভরসাটুকুই সম্বল।

দ্বিজেন্দ্রলাল সুকবি ছিলেন, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন, চিন্তাশীল লেখক ও সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। তাঁর নাটকের ভাষা এমনি প্রাণময়ী এবং আবেগময়ী যে শুধু শুদ্ধভাবে উচ্চারণ-ভঙ্গির প্রভাবেই সে ভাষার ঝঙ্কার দর্শকপূর্ণ নাট্যশালায় ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। নাটকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে রস, তিনি ছিলেন তার উৎস স্বরূপ। হাস্যে ও রসে তিনি অদ্বিতীয় এবং অপরাজেয় ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। রস ও ভাবসমৃদ্ধ অপূর্ব সঙ্গীত এবং জাতীয় গানাবলি দ্বিজেন্দ্রলালের অক্ষয় কীর্তি ও অমূল্য সম্পদ। তাঁর নাটকাবলীর একটা দিক এই সব জনচিত্তরঞ্জনকারী গানের জন্য সর্বজন সমাদৃত ও চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে এবং কালজয়ী হবার দাবী রাখে। 'আমার দেশ' 'আমার জন্মভূমি' 'বঙ্গ আমার' 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি গানগুলি তাঁর গ্রন্থাবলীর সঙ্গে চিরকাল বঙ্গবাসীর হৃদয় অধিকার করে থাকবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রালোচনার প্রসঙ্গে জোর করে বলা চলে—মধুর চরিত্রে ও সহজ সরল ব্যবহারে তিনি বন্ধুবান্ধবগণের প্রিয়তম ছিলেন। শিক্ষায় দীক্ষায় সমসাময়িক বাংলা সমাজে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাঁর সেই শান্ত সৌম্য ধীর স্থির গম্ভীর সুন্দর চিরহাস্যময় মনোহর মূর্তি বন্ধু-সমাজে যেন সদানন্দ মূর্তি পরিগ্রহ করে বিরাজ করত। উজ্জ্বল মধুর তাঁর ভাবের বিকাশ—গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাধুর্যের মিলনে দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র-স্ফূর্তি প্রকাশ করতে হলে মহাকবি কালিদাসের ভাষায় বলতে হয়—

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ
স বভূবোপজীবিনাম্।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ
যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।

নানাবিদ্যাবিভূষিত, ক্ষমতাশালী, সদয়, গুণজ্ঞ এবং অভিজাত গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েও দ্বিজেন্দ্রলাল নিরহঙ্কার ছিলেন, যে-কেহ তাঁর সংস্পর্শে যেতেন—বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করতেন; মিশতেন, মিলতেন, আলাপ পরিচয় করতেন। এই আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খাঁটি মজলিসি মানুষ। * * * দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন, তাঁরা জানেন যে দ্বিজেন্দ্র-নাটকের বহু চরিত্র এবং সঙ্গীতের উপাদান বাস্তবতার ভিত্তির উপর গড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। * * *

আজ ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের দিক্‌পাল দ্বিজেন্দ্রলালের তিরোধানে যে প্রশ্ন করেছিলুম, আজ তাঁরই স্মৃতি-সৌরভিত জন্মভূমিতে অনুষ্ঠিত এই সভায় পৌরহিত্য করতে এসে সেই প্রশ্ন পুনরায় উঠছে—যে-রত্ন আমরা হারিয়েছি, তার স্থান কি পূরণ হয়েছে? বাংলা ও বাঙালীর ভাগ্যে তেমনি আর একটি রত্নের সংযোগ হয়েছে কি?—উত্তর দেবার ভাষা এখানে মূক। এখন আমাদের সান্ত্বনা শুধু—দ্বিজেন্দ্রলালের অক্ষয় কীর্তি-সম্ভার—তাঁর অবদানও যেগুলি তাঁকে বাঙালী অন্তরে স্মরণীয় করে রেখেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নশ্বর জীবন-প্রদীপ অকালে মহাকালের ফুৎকারে নির্বাপিত হলেও তাঁর সাধনালব্ধ প্রতিভা প্রদীপটি সকল অন্তরায় উপেক্ষা করেও অমর মহিমায় প্রজ্বলিত থেকে বাঙালীর মনের মণিকোঠায় তথা বাংলার জাতীয় নাট্যশালায় চিরদিন উজ্জ্বল দিব্যরশ্মি বিতরণ করবে। এইটুকুই আমাদের শান্তি ও সান্ত্বনা।*

---

* কৃষ্ণনগরে সাহিত্য-সঙ্গীতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি-সভায় সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ।

বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিষ্টার-এট্-ল

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারদের একটি ক্লাব আছে, তাহার নাম বার লাইব্রেরী ক্লাব। উক্ত ক্লাবের সভ্য না হইলে কলিকাতা আদিম বিভাগে ব্যারিষ্টারী করা অসুবিধাজনক, একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে।

বার লাইব্রেরী ক্লাবের বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারদের মধ্যে প্রথম দশজনের নাম ও ভর্ত্তি সন নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৮৬৬ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর
১৮৬৮ মনোমোহন ঘোষ
১৮৬৯ উমেশচন্দ্র সি ব্যানার্জি
১৮৭২ তারকনাথ পালিত
১৮৭৩ সৈয়দ আমির আলি
১৮৭০ লালমোহন ঘোষ
১৮৭৪ সি সি দত্ত
১৮৭৪ কে কে ব্যানার্জী ?
১৮৭৪ আর কে সেন
১৮৭৪ এ এম বোস

মাইকেল বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তৃতীয় (?) ব্যারিষ্টার। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন তারিখে পরলোকগমন করেন।

বার লাইব্রেরীর ব্যারিষ্টারদের ভর্ত্তির খাতায় কবির নাম খুঁজিয়া পাইলাম না। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও মনোমোহনের বার লাইব্রেরীতে ভর্ত্তির বিবরণ এইরূপ :

মার্চ ১৮৬৬

১০ই মার্চ বৃহস্পতিবার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ব্যারিষ্টার-এট্-ল ক্লাবের সভ্য হইবার জন্য সেক্রেটারী কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়া যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হন, এবং তাহার প্রবেশ-ফি ২০০্ টাকা দিয়া ক্লাবের সভ্যরূপে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

চার্লস্ জন উইলকিন্সন,
সেক্রেটারী

মে ১৮৬৮

মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার-এট্-ল (লিন্‌কন্‌স্ ইন্) ২০শে মে বুধবার এড্‌ভোকেট জেনারেল কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়া ও মিঃ ওভিন্ কর্তৃক সমর্থিত হইয়া বার লাইব্রেরী ক্লাবের সভ্য হিসাবে যথারীতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি তাঁহার ভর্ত্তি-ফি ২০০্ দিয়াছেন বলিয়া ক্লাবের সভ্যরূপে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

আই এ ওভিন্,
সেক্রেটারী

মধুসূদনের নাম বার লাইব্রেরী ক্লাবের সভ্যের খাতায় নাই। তখনকার দিনে ভর্ত্তি-ফি ২০০্ টাকা ছিল, তিনি কেন সভ্য হন নাই বা হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ জানি না।

কবির শেষ জীবনের ঘটনা পঞ্জী এইরূপ :

১৮৬৭ ব্যারিষ্টার
১৮৭০ প্রিভি কাউন্সিলের রেকর্ডপরীক্ষক
১৮৭২ পঞ্চকোটের ম্যানেজার
১৮৭৩ তিরোধান

মাত্র কয়েক বৎসর (পুরা ৩ বৎসরও নহে, তন্মধ্যে চাকুরী আছে) ব্যারিষ্টারী করিয়া তিনি আইনজ্ঞ হিসাবে কি নাম করিবেন, অথবা অর্থ উপার্জ্জন করিবেন? প্রথম কয়েক বৎসর প্রত্যেক আইনজীবীকেই শিক্ষানবিশি হিসাবে কাটাইতে হয়। বার লাইব্রেরী ক্লাবে তাঁহার নাম খুঁজিয়া না পাইয়া দুঃখিত চিত্তে ল রিপোর্ট খুঁজিতে লাগিলাম, যদি তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ল-রিপোর্টে তাঁহার নাম পাইয়াছি, যথা :

রিপোর্ট অব সিলেক্ট কেসেস্ ভলুম্ ১১
১৮৭২
এ. এ. মেকেন্‌জি হাইকোর্টের রিডার
যে সব ব্যারিষ্টার আপীল বিভাগে প্র্যাক্‌টিস্ করেন :
বাবু মনোমোহন ঘোষ (লিন্‌কন্‌স্ ইন্)
বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ্রেস ইন্)

(Baboo Michael Modhoosodan Datta sworn Examiner Privy Council Appeal)

মেকেন্‌জির রিপোর্টে প্রথম দিকেই মাইকেলের নাম খুঁজিয়া পাইয়া আনন্দ হইল। বাঙ্গালীকে বাবু বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে— তাহারা ব্যারিষ্টার কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালী বলিয়া।

সিন্ধুর-প্রতি

কাদের নওয়াজ

ম্লান মাধুরীতে ভরা গোধূলি-বেলা,
হে সিন্ধু! তোমার কূলে, বসি' একেলা—
চেয়ে আছি ক্লান্ত-ক্লান্ত আঁখি, অদূরে বলাকা ডাকে থাকি থাকি
উড়ে যায় পাখী, আমি শুধু ভাবি,
কোথায় সুদূর-দেশে কারো প'রে মোর দাবী।
তাই ভাবিবারে—
স্মরণে এসেছি আমি তব কূলে হে সিন্ধু! আমার
কপিলের অভিশাপ জানি'
পুড়াইল জীবন ধরা'পরে মরুভূমি আনি।
মোর অভিশাপ ঘুচাইতে,
কেহ নাই, পারাবার দিবা-নিশি জ্বলে শুধু চিতে।
সে আগুন নিবাইতে চাও!
পারবে কি তুমি বন্ধু! জানি যদি এ মোর হিয়ায়?
তক্তি আছে, মুক্তা আছে তব, আছে ঢেউ, আছে জল সব,
নীলায়িত, জ্যোতিত তুমি, আকাশ অধর ঠোঁট চুমি'—
আনন্দের কেন অপ্রকাশ,
দাস্-সম সঁপি আমি, হবে তব পাপ নিরসন!
আমার যে কিছু নাই আশা নাই, ভাষা নাই মুখে,
'বিনতা'র মত আমা বাঁধে শুধু নিদারুণ দুখে
তবু নাই গরুড়ের দেখা,
সুধা-ভাণ্ড কোথা পাব, বিষভাণ্ড পান করি একা।
তোমার সলিলে,
তোমায় জাগিয়া উঠে, চাঁদ যবে হাসে মন্দানিলে,
মোর ছবি-সনে,
মৃণাল-কাঁটাই জাগে, কমল যে শুকাইয়া মরে।
ব্যথা-দাগ-ধারা তুমি কণা,
থাকি থাকি মনে মোরে সে যাতনা কভু ভুলিব না।
হে সিন্ধু বারী! তাই ভাবি আমার ব্যথায় ব্যথী—হও তুমি যদি,
কাঁদিয়া তোমার কাছে এইটুকু সান্ত্বনা চাই।
নিঠুর নীরব জলে যায় করি দিও মোরে ঠাঁই।

বাদশাহের বাঁদী

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী এম-এ

বাদশাজাদীদের হারেমে দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে নানা কাব্যময় কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁদের রঙীন সাজ ও আভরণের ঝলকানি, নিত্য নতুন সুখ ও বিলাসের উপকরণ ও "গুলবাগিচায়" কাব্য ও সুরা—কবি ও ঐতিহাসিকদের সুনিপুণ হাতের শিল্প চাতুর্য্যে আকার পেয়ে এসেছে। কিন্তু এইখানেই বাদশা-পুরীর আভ্যন্তরীণ কাহিনীর পূর্ণচ্ছেদ নয়। কখন কখন শাহজাদা ও বেগমদের দাস দাসীর উপর অন্যায় অত্যাচারগুলি এই কাব্যিক ও রোমাঞ্চকর জীবনের মাধুর্য্য মলিন করে দেয়। ইম্পিরিয়েল রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে সংগৃহীত কয়েকখানি চিঠি পত্রে এইরূপ একটি নির্য্যাতিত বেদনাময় বাঁদী চরিত্রের আলেখ্য পরিস্ফুট হয়েছে।

বেগমদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দিল্লীর হারেমে বহু ক্রীতদাসদাসীদের ভীড় বহুদিন থেকেই হ'য়ে আসছিল। এই সমস্ত দাসদাসীদের অধিকাংশই আনা হোতো পশ্চিম পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি থেকে। শুধু দিল্লীতে কেন অন্যান্য স্থানের বেগমমহলে এইরূপ দাসদাসীর প্রচলন বহু পরিমাণে দেখা যায়। শিখ পার্ব্বত্য প্রদেশের অ্যাসিষ্ট্যান্ট ডেপুটী সুপারিনটেনডেন্ট কাপ্তেন কেনেডি সাহেব (Captain C. P. Kennedy) তাঁহার রিপোর্টে (১) লিখেছেন—"The women of the hills until the British influence took place, were always in great request for the *Zenana* or harem of the plains and as slaves brought great price; the demand was probably greater than the country would supply" কিন্তু ইংরেজ শাসনের আরম্ভে যখন ভারতে নতুন যুগের সূত্রপাত হয়, তখনই এই দাসত্ব প্রথা সমাজের পক্ষে অহিতকর বলে বিবেচিত হয়েছিল। ১৮১১ সালের ১০ ধারা আইন অনুযায়ী (Regulation 10 of 1811) ইংরেজ গভর্ণমেন্ট দাস ব্যবসা বে-আইনী ব'লে প্রচার করেছিল। সত্য সত্য এই নিষেধ আজ্ঞা জারি হ'বার সঙ্গে সঙ্গে জোরেই হোক বা মানবতার দিক দিয়েই হোক ভারতের সর্ব্বত্রই ক্রীত দাসদাসীর সংখ্যা বহু পরিমাণে কমে যায়। কেনেডি সাহেব ১৮২০ সালে লিখেছেন যে, দাসদাসী বিক্রয় প্রথা একেবারেই বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ যে সময়কে উপলক্ষ করে এই কাহিনীর সৃষ্টি সেই সময় হচ্ছে ১৮২৮ সাল। দিল্লীর বাদশাহ তখন দ্বিতীয় শাহ আলমের পুত্র দ্বিতীয় আকবর শাহ। ১৮১১ সালে নিষেধ আজ্ঞা জারি হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহ আকবর সাহের সময় যুবরাজ সেলিমের (২) হারেমে আশ্রিতা একটি বাঁদীর মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর বিবরণ আমরা সরকারী কাগজে পাই। সুতরাং ক্রীতদাসদাসীদের তখন পর্য্যন্তও হারেমে রাখা হোতো এবং যথাসম্ভব তাঁদের কাছ থেকে বেগমরা সেবা ও পরিচর্য্যা আদায় করতেন। যুবরাজ সেলিমের হারেমে আশ্রিতা বাঁদীর নাম চামেলী। কি করে সে দিল্লীর হারেমে আসে ও তা'র বংশ পরিচয় কি—তাহারও বিবরণ আছে। মথুরার কোন পল্লী ঘরে সম্ভবতঃ ১৮০৯ সালে চামেলীর জন্ম হয়। তার বাপের নাম বলদেব, মথুরার ছোট একটি মুদির দোকানের মালিক। চামেলীর ১৬ বৎসর বয়সের সময় সে কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি বিয়ে উপলক্ষে যায়। ফিরবার পথে তা'র ভীষণ জ্বর হয় এবং পথে কয়েকজন ব্যাপারীর সাথে তার দেখা হয়। ব্যাপারীরা ব'লে তারা বলদেবকে চেনে এবং চামেলীকে তাদের সাথে আসতে ব'লে। সরল বিশ্বাসে চামেলী ধূর্ত্ত ব্যাপারীদের সঙ্গ নেয়। তারা প্রথমে চামেলীকে বৃন্দাবনের একটি কুঞ্জে নিয়ে আসে। চামেলী তখন সঙ্গীদের শঠতা বুঝতে পারে। অনন্যোপায় হ'য়ে সে কত অনুরোধ উপরোধ করলে বাপের কাছে যাবার জন্য। কিছুতেই কিছু হ'ল না, অসহায়া চামেলীর চোখের জলে নিষ্ঠুর ব্যাপারীদের মন ভিজলো না। তারপর তারা তাকে দিল্লী নিয়ে আসে এবং রৌশনাপুরে মজনু নামে এক ব্যক্তির বাড়ীতে আটক রাখে। কয়েকদিন পরে ব্যাপারীরা বাদশাহের লোকজনের নিকট চামেলীকে বিক্রী করে। কত টাকায় চামেলীকে বিক্রী করা হয় তা' জানা যায়নি। যুবরাজ সেলিমের পাইক এসে একটি রথে চড়িয়ে চামেলীকে হারেমে নিয়ে আসে এবং বেগম মমতাজমহলের বাঁদী হিসাবে সে নিযুক্ত হয়।

হারেমের মধ্যে বাঁদীদের স্থান—কল্পনা করা খুব কঠিন নয়। বেগমদের যথাসম্ভব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা এবং পরিচর্য্যা করাই তাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। পরিচর্য্যায় কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটলে বেগমরা বাঁদীদের চাবুক মারতেও কুণ্ঠা বোধ করতেন না। চামেলী এইসব লাঞ্ছনার হাত থেকে অব্যাহতি পায় নি। অবোধ বালিকার পক্ষে সব সময় বেগমদের মন যুগিয়ে চলা খুবই কষ্টকর। তাই তা'কেও সময় সময় অন্যান্য বাঁদীদের মত অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হোতো। চামেলী এই সব অত্যাচারের কথা (৩) দিল্লীর প্রাসাদ রক্ষী কাপ্তেন গ্রান্টের নিকট বলেছে। এই লাঞ্ছিত জীবন সে দীর্ঘ ৩ বৎসর পর্য্যন্ত বহন করেছে। শক্তিটা যত বড় হয় প্রতিক্রিয়াটা হয় তার দ্বিগুণ। অত্যাচারের যখন সীমা ছেড়ে যায়, তখনই মানুষ হয় বিদ্রোহী। চামেলী তার বন্দী জীবনের সমস্ত বন্ধনগুলি ভেঙে ফেলে দেবার জন্য মরিয়া হ'য়ে উঠে। ১৮২৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর গভীর রাত্রিতে তার নির্য্যাতিত জীবনের পরিসমাপ্তি করার মানসে বাদশাপুরীর সোনার মিনার থেকে ঝাঁপ দেয়। চামেলীর চিবুক, হাত, পায়ে আঘাত লাগে এবং আহত হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকা অসীম সাহসিকতা সত্ত্বেও মরতে পারে নি। প্রাসাদ রক্ষী এবং প্রহরীদের হাতে সে ধরা পড়ে। এই ঘটনার কয়েকদিন আগে আর একটি বাঁদী যুবরাজ সেলিমের হারেম থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল। দিল্লীর রেসিডেন্ট কোলব্রুক (E. Colebrooke) সাহেব চামেলীর এই দুঃসাহসিকতার কারণ সম্বন্ধে সঠিক কিছু অনুমান করতে পারেন নি। তিনি বড়লাটের নিকট যে চিঠি লিখেছিলেন (৪) তা'তে বলেছেন—"It is not easy to determine from the second attempt at escape of a slave girl from the same family whether the female domestics of this prince are really maltreated or whether the success which attended the former attempt has operated as an inducement for others to follow the example under more dissatisfactoins at the restraint..." চামেলী পালাবার চেষ্টা করেছিল, না আত্মহত্যা করবার প্রয়াস পেয়েছিল সেই সম্বন্ধে কোলব্রুক্ সাহেব কোন স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন নি। কিন্তু চামেলীর জবানবন্দী থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সে আত্মহত্যার জন্যই প্রাসাদের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল। প্রাসাদ রক্ষী কাপ্তেন গ্রান্ট ও ৪ঠা ডিসেম্বরের চিঠিতে (৫)

১। Records of the Delhi Residency and Agency—Published by the Punjab Govt—page 269.

২। দ্বিতীয় শাহ আলমের পৌত্র এবং সোলেমান সিকোর পুত্র।

৩। Political Consultatoin 31 Dec. 1828 No 4.

৪। " " " " " " "

৫। " " " " " " 4.

কোলব্রুককে লিখেছিলেন—"She threw herself from the wall with an intention of sacrificing her life on account of ill usage, she was daily subject to." সুতরাং আত্মহত্যার কাহিনী বেশী নির্ভরযোগ্য ব'লেই মনে হয়।

চামেলী ধরা পড়ার পর কোলব্রুক্ সাহেব চামেলীকে একটা নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করবার জন্ত আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বড়লাটের নিকট আদেশ প্রার্থনার জন্ত সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ লিখে জানালেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বাদশাহের লোকজন চামেলীকে পুনরায় বেগমের হেপাজতে পাঠাবার জন্ত কোলব্রুক্ সাহেবকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলো। কোলব্রুক্ সাহেব বড়লাটের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত চামেলীকে অন্দরমহলে পাঠাতে স্বীকৃত হ'লেন না। এদিকে দাসীর অনুপস্থিতিতে বাদশাজাদীর পরিচর্য্যার ব্যাঘাত ও দাসীদের মুক্তি দিলে বাদশাহের মর্য্যাদাহানি হ'বে—ইত্যাদি নানা অভিযোগ (৬) বাদশাহের পক্ষ থেকে রেসিডেন্টের নিকট আসতে লাগলো। "If the slave girls of the Mahals are thus emancipated, which is in opposition to the rules of respect due to the royalty, the whole of them will go away and the drudgery of business will fall on the Begums themselves. উত্তরে রেসিডেন্ট সাহেব লিখেছেন (৭)—"...if your Majesty will be pleased to issue orders...to treat their slaves in such a manner as to induce them to hazard their lives in the attempt to escape, no distress will be experienced."

এদিকে বড়লাট সাহেব চামেলীর সমস্ত বিবরণ পড়ে রেসিডেন্ট সাহেবকে জানালেন যে দাসীর জবানবন্দী থেকে মনে হয় যে চামেলীকে বলপূর্ব্বক দিল্লীতে ধ'রে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং ১৮১১ সালের ১০ ধারা আইন জারি হবার পর তাকে বিক্রয় করা হয়েছিল। "If the deposition of the female is to be credited...she was actually kidnapped and carried of from the bosom of the family into bondage, scarcely 3 years ago." (৮) সুতরাং রেসিডেন্ট যদি প্রমাণ করতে পারেন যে চামেলী ১৮১১ সালের পূর্ব্বে হারেমে এসেছিল, তবে তিনি তাকে ফিরে পেতে পারেন। নচেৎ তাকে মুক্তি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বড়লাটের চিঠি পড়ে মনে হয় তিনি চামেলীর জবানবন্দীই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছেন। সুতরাং তার মুক্তি পাওয়া খুব সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় চামেলীর শেষ পরিণতিটুকু শত চেষ্টা সত্ত্বেও রেকর্ড অফিসের চিঠিপত্রের মধ্যে খুঁজে বার করতে সক্ষম হই নি।

৬। Political Consultation—31 Dec. 1828. No 5.

৭। „ „ „ 5.

৮। Political consultation—31 Dec. 1828 No 6,

শিশু খেলে কেন

শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

জন্মের কয়েক মাস পর থেকেই প্রত্যেক শিশু নানাভাবে খেলা করে। তাদের খেলা দেখে আমরা কত হাসি, কত আনন্দ করি। মাঝে মাঝে আমাদের অনেকের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে—শিশু খেলে কেন? এর উত্তর যত সহজ আমরা ভাবি, তত সহজ নয়। কারণ অনেক মনস্তত্ত্ববিদ্ অনেক গবেষণা করেও আজ পর্য্যন্ত এর একটা সঠিক সর্ব্ববাদিসম্মত কারণ দেখাতে পারেন নি। শিশু খেলে কেন, এই সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মতবাদের আলোচনার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শিলার (schiller) ও স্পেন্সার (spencer) বললেন যে শিশুর নিয়মিত কাজের মধ্য দিয়ে তার স্বাভাবিক শক্তির সবটুকু ব্যয়িত হয় না। কিছু শক্তি উদ্‌বৃত্ত থেকে যায়। এই উদ্‌বৃত্ত শক্তির (surplus energy) ক্ষয়ের জন্যই সে খেলা করে। এই থিওরি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ, এই মতবাদ অনুসারে দুর্ব্বল শিশুদের খেলা করা উচিত নয়, কারণ তাদের মধ্যে উদ্‌বৃত্ত শক্তির অত্যন্ত অভাব। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা তাদের খেলা করতে দেখি। দ্বিতীয়তঃ, উদ্‌বৃত্ত শক্তিই যদি খেলার কারণ হয়, তাহলে শিশুরা হাঁপিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত খেলে কেন? তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন ধরণের খেলার উৎপত্তি কেমন করে হলো, তার উত্তর এই থিওরির মধ্যে পাওয়া যায় না। গ্রুস্ (Groos) বললেন, শিশু খেলার মধ্য দিয়ে তাকে তার পরিণত জীবনের জন্য তৈরী করে নেয় (Preparatory Theory)। অর্থাৎ পরিণত জীবনে যে সব শক্তির প্রকাশ প্রয়োজন, তাদের পরিপুষ্টি হতে থাকে শৈশবের এই সব খেলার মধ্য দিয়ে। এই মতবাদকে অনেকে মেনে নেয়। কিন্তু এমন সব খেলাও আছে যাদের মধ্যে এই উৎপাদিকা শক্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দৌড়ঝাঁপ, মেয়েদের পুতুল নিয়ে খেলা—এ সবের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের কোন শক্তির পরিস্ফুটনের উদ্যোগ আয়োজন খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু লাট্টু খেলা, মার্বেল খেলা—এ সবের মধ্যে এমন কোন কিছুর সন্ধান পাওয়া দুষ্কর।

হল্ (Stanley Hall) বললেন, শিশুর খেলা তার পূর্ব্বপুরুষদের অভিব্যক্তির পুনরাবর্ত্তন মাত্র (Recapitulation Theory)। শিশু তার বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন খেলার মধ্য দিয়ে তার পূর্ব্বপুরুষদের অভ্যাসগত উপযোগী কার্য্যাবলীর পুনরাবৃত্তি করে। এই মতবাদ অনুসারে মানুষের অভ্যাস বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। কিন্তু জীববিজ্ঞানের মতে অভ্যাস কখনও বংশানুক্রমে পাওয়া যায় না। অতএব এই মতবাদ কতকটা ভিত্তিহীন।

প্যাট্রিক (Patrick) ও ল্যাজারাস (Lazzarus) বললেন, শিশু খেলা করে তার মনের ও দেহের শ্রম-অপনোদনের জন্য (Relaxation Theory)। তা' হলে প্রশ্ন আসে, শিশু খেলা না করে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারত। কারণ বিশ্রামের মধ্যে শ্রম-অপনোদনের সম্ভাবনা বেশী, দ্বিতীয়তঃ, শিশু বেশী খেলা করে তখন যখন ক্লান্তি অপনয়নের কোন প্রয়োজন নেই। এই মতবাদ মানতে হলে, এ কেমন করে সম্ভব!

রবিন্‌সন্ (Robinson) বললেন, খেলার মধ্যে দিয়ে শিশু তার পরস্পরবিরোধী দুইটি বৃত্তির সমতা করে (compensation Theory)। যেমন, শিশু মারামারি করতে চায়; আবার সমাজের নিয়ম-কানুনও মানতে চায়। এই দুই পরস্পর-বিরোধী বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়ে পূর্ণ হয়েছে তীর-ধনুক খেলার মধ্যে। এই রকম ভাবে প্রত্যেক খেলার মধ্যে আমরা পরস্পর বিরোধী দুই বৃত্তির সন্ধান পেতে পারি। রবিন্‌সনের প্রশংসা করতে হয়, কারণ জীববিজ্ঞান বা শারীর বিজ্ঞানের উপর নির্ভর না করে তিনি একটা স্বতন্ত্র এবং নিছক মনস্তত্ত্বমূলক মতবাদ দিতে পেরেছেন। উপরন্তু এই মতবাদ অনুসারে খেলার একটা মনস্তত্ত্বমূলক সার্থকতা আছে। কারণ খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার রুদ্ধ মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পায়। তবে এমন দু'একটা খেলা আছে যার মধ্য দিয়ে বিপরীত কি দুটো বৃত্তি চরিতার্থ হল, তা বোঝা কঠিন।

মনের যে সব কার্য্যাবলীকে আমরা উদ্দেশ্যবিহীন বলে মনে করি, তার পেছনেও কারণ আছে, সঙ্গত আছে (deterministic)। আমাদের প্রতি কাজের পেছনে রয়েছে মনের স্বাভাবিক প্রেরণা। আধুনিক মনস্তত্ত্ব আমাদের সেই বিষয়েই সচেতন করে দেয়।

বাহির বিশ্ব

মিহির

গত ২৮শে জুলাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে; এই দিন ফ্যাসিজমের জন্মদাতা ও ইটালীর একনায়ক শাসক মুসোলিনী ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন, ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট শাসনের অবসান ঘটিয়াছে, হিট্লারের দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সম্মিলিত পক্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ এই সুযোগ ত্যাগ করেন নাই; তাঁহারা ইতিমধ্যে ইটালীর জনসাধারণকে জার্মানীর প্রভাবমুক্ত হইয়া সম্মিলিত পক্ষের মৈত্রী প্রার্থী হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

উত্তর আফ্রিকায় বন্দী জার্মাণ নাবিকগণ

ইহার পরই বৈদেশিক সাংবাদিকদিগের অনুমান ও গবেষণার বন্যায় বান ডাকিয়াছে; গত এক সপ্তাহকাল উহা দৈনিক সংবাদপত্রের দুই কূল ছাপাইয়া বইতেছে। এই বন্যার জল সেঁচিয়া কোন রত্নের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নহে; পরস্পর বিরোধী সংবাদের শৈবালই কেবল ভাগ্যে জুটে।

মুসোলিনীর পতনের পর রাজা তৃতীয় ইমানুয়েল্ স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন; প্রবীণ সেনাপতি মার্শাল বাদোগ্লিও প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়াছেন। সম্মিলিত পক্ষের শর্ত্ত দাবির প্রভাব সম্বন্ধে এই দুই ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ তাহা এখনও অস্পষ্ট। ইটালীতে এই রাজনীতিক বিপর্য্যয় জার্মানীর ক্ষতিসাধন করিয়াছে, কি ইটালীকে রক্ষার জন্য জার্মানীর প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য দানে অস্বীকৃতিই এই

জনৈক মার্কিন 'শেরম্যান' নামক ট্যাঙ্কের চালক বেপরোয়া আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়া ট্যাঙ্ক চালাইতেছে

বিলম্বের কারণ, তাহা এখনও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। উত্তর ইটালীতে জার্মান সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি বাদোগ্লিও মন্ত্রিসভা সম্পর্কে সতর্কতামূলক

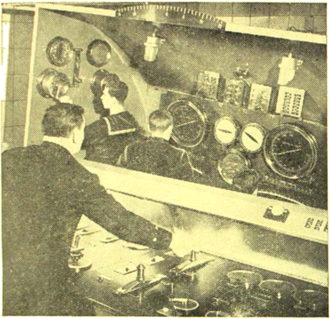

ব্রিটিশ নাবিকদিগের শিক্ষাবিধি সংগঠন

ব্যবস্থা কি না, জার্মানদিগের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে ভেনিস পিডমন্টের দিকে ইটালীর সৈন্য প্রেরণের কথা সত্য কি না, তাহা এখনও বলা যায় না।

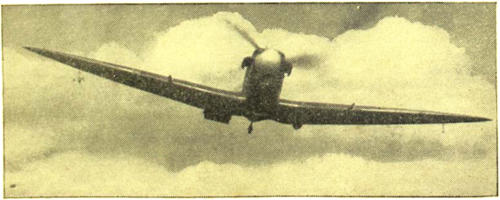

আমেরিকায় একটী নিম্নগামী জঙ্গী বিমান

তবে, একটি কথা সত্য—ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতিকগণ বাদোগ্লিও ইমানুয়েল সরকারকে জার্মানীর সহিত সম্বন্ধচ্যুত করাইয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আবদ্ধ করাইবার জন্য সচেষ্ট থাকুন। তবে তাঁহারা ইতিপূর্বে বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, অক্ষশক্তি বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ না করিলে তাঁহারা অস্ত্র সম্বরণ করিবেন না। এইজন্য বাদোগ্লিও ইমানুয়েল কোম্পানীকে তাঁহারা সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধ-বিরতির সর্ত শুনাইতে পারিতেছেন না।

ইটালীর বর্তমান কর্ণধারদের সহিত হাত মিলাইবার জন্য ইঙ্গমার্কিন ধুরন্ধরদিগের এই আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাদের বিঘোষিত ফ্যাসিষ্টবিরোধী নীতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হইয়াছে। রাজা ইমানুয়েল ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট প্রাধান্য বিস্তৃতির পরোক্ষ সহায়ক; তাঁহার দৌর্বল্যের সুযোগে ফ্যাসিষ্ট দল সহজে ইটালীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল। তাহার পর আজ ২১ বৎসর তিনি ফ্যাসিষ্টদিগের "পোষা নৃপতি" ছিলেন। আর মার্শাল বাদোগ্লিও সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সেনাপতি। তাঁহার সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রথমে ফ্যাসিজমকে সায় দেয় নাই; তাই তিনি ফ্যাসিষ্টদলের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু তিনি ষোল বৎসর ফ্যাসিষ্ট সরকারের চাকরি করিয়াছেন; মার্শাল দোবোনোর পরিবর্তে আবিসিনিয়ার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া তিনি অসহায় হাবসী নারী ও শিশুদিগের উদ্দেশে তীব্র সর্ষপ বাষ্প ব্যবহারের আদেশ দিয়াছিলেন। আদিস-আবাবার ডিউক উপাধি গ্রহণে ইনি লজ্জানুভব করেন নাই। ফ্যাসিষ্ট সরকারের চাকুরিয়ারূপে ইনি কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পরে ফ্যাসিষ্টদলের সদস্যও হইয়াছিলেন। কোন ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ব্যক্তির পক্ষে বাদোগ্লিওর সহিত মীমাংসার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুন, হাবসীদিগের প্রতি ব্যবহার জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে তাঁহার যথোচিত বিচার দাবী করাই প্রত্যেক ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ব্যক্তির কর্তব্য।

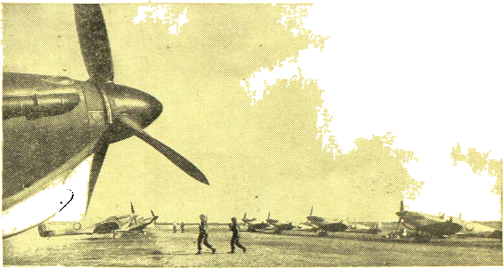

আলজেরিয়ায় ব্রিটীশ জঙ্গী বিমান

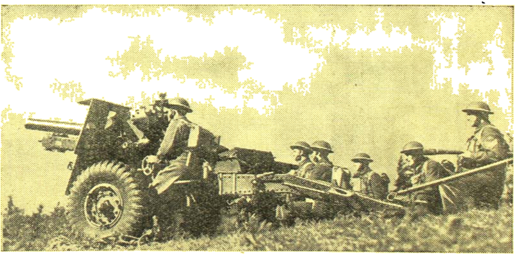

মিত্রশক্তির জন্য ক্যানেডিয়ানগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত ২৫ পাউণ্ড ওজনের কামানের গোলা

অবশ্য ইটালীকে জার্ম্মানীর সহিত সম্বন্ধচ্যুত করাইবার সামরিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। ইটালী যদি দলত্যাগ করে, তাহা হইলে ভূমধ্য সাগরের সমগ্র উত্তর উপকূলে জার্ম্মানীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে; ইটালীর নৌবহরে বঞ্চিত হইয়া জার্ম্মানী সমুদ্রপথেও শক্তিহীন হইবে। আর সম্মিলিত পক্ষ যদি দ্রুতবেগে যুদ্ধ প্রসারিত করিবার জন্য ইটালীকে ঘাঁটীরূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ফ্রান্সে ও বলকানে প্রত্যক্ষ আঘাতের পথ উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু এই সামরিক সুবিধার জন্য ইটালীর বর্ণচোরা ফ্যাসিষ্টদিগের সহিত আজ যদি মিত্রতা স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করা দুষ্কর হইবে। এই সামরিক সুবিধার অজুহাতে উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় দার্লাঁর সহিত সহযোগিতার কুফল, আজ দার্লাঁর মৃত্যুর পরও দূরীভূত হয় নাই।

সম্মিলিত পক্ষের প্রস্তাব সম্বন্ধে বাদোগ্লিও-ইমানুয়েল কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিবেন, তাহা এখনও নিশ্চিত বলা দুষ্কর। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মার্শাল বাদোগ্লিও বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ

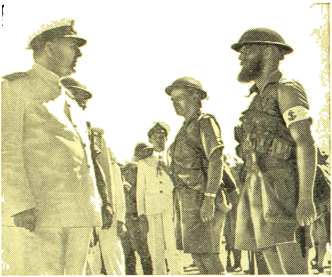

ভূমধ্যসাগরের ব্রিটিশ কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্, এড্মিরাল স্যর হেন্‌রী হারউড্ কে. সি. বি—ও. বি. ই কর্তৃক আলেকজান্দ্রায় তীরবর্তী নৌকর্মিবৃন্দ পরিদর্শন

করিবার লোক নহেন। জার্মানীর সহিত ইটালীর মিত্রতায় যদি সত্যই ভাঙ্গন ধরিয়া থাকে, হিটলারের আওতারে ও তাঁহার ইচ্ছায় যদি মুসোলিনীর স্থানে সৈন্যদিগের প্রিয় বাদোগ্‌লিও প্রতিষ্ঠিত হইয়া না থাকেন, তাহা হইলে এই চতুর সেনাপতি ইটালীকে ধীরে ধীরে জার্মানীর প্রভাবমুক্ত করাইয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বনে সচেষ্ট হইবেন। তিনি একদিকে যেমন জার্মানীকে ইটালী হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিবেন, অন্যদিকে তেমনই সম্মিলিত পক্ষের সহিত যুদ্ধরত থাকিলেও তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন যে, জার্মানী ইটালী হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে; সুতরাং এখন উপযুক্ত সর্ত্ত পাইলেই তিনি যুদ্ধ বিরত হইতে পারেন। ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকগণ প্রকাশ্যে যুদ্ধবিরতির সর্ত্ত ঘোষণা করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিলেও তখন ভ্যাটিক্যানের প্রতিনিধিদিগের দ্বারা অথবা কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মারফৎ যুদ্ধবিরতির সর্ত্ত গোপনে জানাইয়া দিতে পারেন।

সিসিলি অভিযান

গত ১০ই জুলাই সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী সিসিলিতে অবতরণ করিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকায় শত্রুবন্দীগণ

তাহার পর, মার্কিনী সেনা এই দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে, বৃটিশ সেনা পূর্ব্ব উপকূলে এবং ক্যানাডীয় সেনা দ্বীপটির মধ্যস্থলে অগ্রসর হইতে থাকে। মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে ক্যানাডীয় সৈন্যের আক্রমণে ইটালীয়দিগের প্রতিরোধ আশাতীত অল্পকালের মধ্যে চূর্ণ হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম উপকূলের শত্রু সেনায় পরিবেষ্টিত হইবার উপক্রম ঘটে। তখন তাহারা আত্মরক্ষার জন্য দ্রুত পূর্ব্বদিকে অপসরণ করিতে থাকে; ফলে মার্কিনী সেনা সহজেই সিসিলির রাজধানী পেলারমো, গুরুত্বপূর্ণ বন্দর মার্সালা প্রভৃতি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। পূর্ব্ব উপকূলে ক্যাটানিয়ার নিকট অক্ষশক্তির সেনা বৃটিশ বাহিনীকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতেছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সহযোদ্ধৃগণকে পশ্চাদপসরণের সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে এবং উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পার্ব্বত্য অঞ্চলে শেষ প্রতিরোধের আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য ক্যাটানিয়ার উপকণ্ঠে অক্ষশক্তির এই মনোযোগ। ইতিমধ্যে মেসিনা প্রণালীপথে অক্ষশক্তির নূতন সৈন্য সিসিলিতে আসিয়াছে। ক্যাটানিয়ার পতনের পরও উত্তর-পূর্ব্ব সিসিলির পার্ব্বত্য অঞ্চলে অক্ষশক্তি শেষ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এই শেষ চেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে শত্রুর অধিক আশান্বিত হইবার কারণ নাই; সিসিলির তিন চতুর্থাংশ এখন সম্মিলিত পক্ষের অধিকারভুক্ত; ২৪টি বিমানঘাঁটিও তাহারা অধিকার করিয়াছে। কাজেই উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলে চারি দিক হইতে পরিবেষ্টিত হইয়া অক্ষশক্তির সেনাবাহিনী অধিককাল যুদ্ধরত থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ইটালীতে রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলে সিসিলিতে অক্ষশক্তির প্রতিরোধের প্রাবল্য হ্রাস পায় নাই। ইহাতে ইটালীর রাজ-নৈতিক অবস্থা আরও অনিশ্চিত বলিয়া মনে হইবে। হিটলারই হয়ত ইটালীর প্রতিরোধ-শক্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে বিগতপ্রভাব মুসোলিনীকে অপসারণ করিয়া বাদোগ্লিওকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। অথবা মার্শাল বাদোগ্লিও যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত না জানা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিসিলিতে প্রতিরোধ যথাশক্তি দৃঢ় করিয়াছেন।

সিসিলি অভিযান য়ুরোপ অভিযানেরই সূচনা। য়ুরোপে প্রত্যক্ষ আক্রমণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগর নিষ্কণ্টক হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে পশ্চিম ভূমধ্যসাগর একরূপ নিষ্কণ্টক হইয়াছে; পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে ক্রীটে অক্ষশক্তির ঘাঁটী এখনও কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেও উত্তর আফ্রিকার বিমানবাহিনী এই অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের জাহাজসমূহকে রক্ষা করিতে পারে। য়ুরোপের অন্যত্র আক্রমণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সম্মিলিত পক্ষ ইটালী ও জার্মানীকে পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন করাইতে চাহিয়াছিলেন। সিসিলিতে তাহাদিগের সাফল্যে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে মুসোলিনীর পতনে সম্মিলিত পক্ষ উৎসাহিত হইয়াছেন। এখন তাঁহারা ইটালীর যুদ্ধবিরতির জন্য কিছুকাল প্রতীক্ষা করিবেন, না সিসিলি জয়ের পর একই সময়ে ইটালী ও অন্যান্য স্থানে আক্রমণ প্রসারিত করিবেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে অবিলম্বে য়ুরোপ খণ্ডে তাঁহাদিগের আক্রমণ যদি আরম্ভ নাও হয় তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য দ্বীপে আক্রমণ প্রসারিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

মাল্টা ডকে টেলিফোন রক্ষীর কার্য্যে নিযুক্ত স্কাউট পিটার পার্কার। গত চার বৎসর মাল্টায় আছে। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের পোর্টস্মাউথ-এ বাস করিত। তাহার পিতাও ব্রিটিশ সৈন্যদলে নিযুক্ত

রুশ রণাঙ্গন

গত ১৫ জুলাই জার্মান সেনাপতি ফন্ ক্লুগ ওরেল্ কুরস্ক ও বিয়েল্গোরোড কুরস্ক অঞ্চলে ১৮০ মাইল রণাঙ্গনে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ আরম্ভ করেন। এই গ্রীষ্মকালীন অভিযানে জার্মানীর ১৭টি ট্যাঙ্ক-বাহিনী (division), ২টি মোটর-সেনাবাহিনী এবং ১৮টি পদাতিক বাহিনী প্রযুক্ত হয়। স্বল্প পরিসর রণাঙ্গনে এই বিপুল সেনাদল নিয়োগ করিয়া ফন্ ক্লুগ উত্তর ও দক্ষিণ হইতে কুরস্কের সোভিয়েট ব্যূহে চাপ দিতে চাহিয়াছিলেন। এই ব্যূহ চূর্ণ করিয়া কুরস্কের সোভিয়েট সেনা-

বাহিনীকে পরিবেষ্টন ও নিষ্পেষণই ফন্ ক্লুজের অভিসন্ধি ছিল। এই অঞ্চলের প্রধান সোভিয়েট ঘাঁটী চূর্ণ করিতে পারিলে দক্ষিণ অঞ্চলের রুশ সেনা মধ্য অঞ্চলের সহযোদ্ধগণের সহিত বিচ্ছিন্ন সংযোগ হইয়া পড়িত। নাৎসী বাহিনী এখন উত্তরে মস্কোর উদ্দেশে এবং দক্ষিণে ককেসাসের দিকে আক্রমণ প্রসারিত করিবার সুযোগ পাইত।

ফন্ ক্লুজের এই আশা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। প্রথমে অত্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করিয়া তিনি ওরেল্ কুর্স্ক অভিমুখে ৫ মাইল এবং বিয়েলগোরোড্ কুর্স্ক অভিমুখে ৮ হইতে ২০ মাইল পর্যন্ত নাৎসী সেনা অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু এই সময় রুশ সেনার প্রবল প্রতি আক্রমণ আরম্ভ হয়; ২০শে জুলাইয়ের মধ্যে তাহারা সমগ্র হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে এবং ওরেলে জার্মানীর সর্বপ্রধান ঘাঁটী অভিমুখে ৮ হইতে ১২ মাইল অগ্রসর হয়। ইহার পর এখন সোভিয়েটের সেনাবাহিনী তিন দিক হইতে প্রবল বেগে ওরেল অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে; এই অঞ্চলে ২।০ লক্ষ জার্মান সেনাকে পরিবেষ্টিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। মঃ ষ্টালিন্ স্বয়ং ওরেল অঞ্চলে আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। গত শীতকালে ষ্টালিনগ্রাডে জার্মানীর ৩ লক্ষ সৈন্য যে ভাবে পরিবেষ্টিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল, ওরেলেও ঠিক সেই ভাবে ২।০ লক্ষ নাৎসী সেনাকে পরিবেষ্টিত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

অবশ্য লক্ষ্য করিলে মনে হইবে জার্মানী এখন আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়াছে। দীর্ঘ কাল প্রতিরোধমূলক সংগ্রামে রত থাকিয়া যুদ্ধে অচল অবস্থার (stalemate) সৃষ্টিই তাহার উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ফন্ ক্লুজের আক্রমণকে জার্মানীর পক্ষ হইতে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। জার্মানী হয়ত ওরেল্ অঞ্চলে রুশ সেনার প্রবল প্রতি-আক্রমণের সম্ভাবনা অনুমান করিয়া প্রতিরোধাত্মক উদ্দেশ্যে এই আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল। যদি এই অভিযান সাফল্যের সহিত চলিত, তাহা হইলে তখন সে ব্যাপক আক্রমণে প্রবৃত্ত হইত। সে যাহা হউক, বর্তমানে জার্মানী দুই দিক হইতে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণের সম্মুখীন। জার্মানীর সমর শক্তি এখনও বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই; নূতন নূতন ক্ষেত্রে আক্রমণ পরিচালনা তাহার পক্ষে আর সম্ভব না হইলেও এই শক্তি লইয়া দীর্ঘকাল প্রতিরোধাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব। জার্মান সমরনায়কগণ তাহাদিগের শক্তি এখন এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত রাখিয়া সম্মিলিত পক্ষে সন্ধির আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রয়াসী হইল বলিয়া মনে হইতেছে।

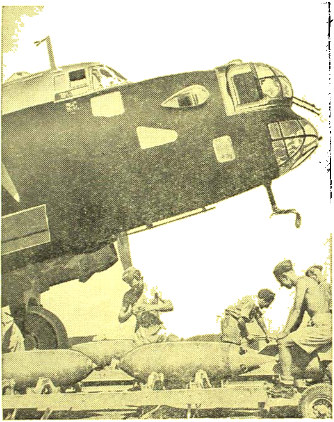

রয়াল এয়ার ফোর্স-এর ৪ ইঞ্জিনযুক্ত বোমারু হালিফ্যাক্স ইউরোপের শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে অভিযান উদ্দেশ্যে বোমা বোঝাই করিতেছে

জুলাই মাসের প্রথম হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণাত্মক তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। নিউ-গিনিতে নেসো উপসাগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারা মুবো অধিকার করিয়াছেন; এখন স্যালামুয়ার উদ্দেশে তাঁহাদের আক্রমণ চালিত হইতেছে। সলোমন-এ নিউ জর্জিয়া দ্বীপে জাপানের প্রধান ঘাঁটী মুণ্ডার পতন আসন্ন। সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণ প্রধানতঃ প্রতিরোধাত্মক উদ্দেশ্যেই চালিত; জেনারেল ম্যাক্-আর্থার অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী ঘাঁটীগুলি হইতে শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া অষ্ট্রেলিয়াকে নিরাপদ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তবে, সম্মিলিত পক্ষের সাফল্যের গতি অত্যন্ত মন্থর; এক একটি ঘাঁটী হইতে জাপানকে বিতাড়িত করিতে যদি এতকাল অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরের সকল দ্বীপ পুনরধিকারে শতাব্দীকাল কাটিয়া যাইতে পারে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট প্রশান্ত মহাসাগরের এই যুদ্ধকে শক্তির পরিক্ষয়কারী যুদ্ধ (war of attrition) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের এই সমরে শত্রুর নৌ ও বিমানবাহিনী যদি সত্যই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষের ভবিষ্যৎ আক্রমণকারী যুদ্ধ সহজে পরিচালিত হইতে পারিবে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রাম পরিচালনের ক্ষেত্র ব্রহ্মদেশ। ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া ব্রহ্ম-চীন পথের উন্মুক্তি এবং চীনের শক্তি বৃদ্ধিই জাপানকে পরাভূত করিবার প্রকৃত পন্থা।

২।৮।৪৩

সাময়িকী

শিক্ষকগণের দুরবস্থা—

গত ১২ই শ্রাবণ রবিবার নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র শিক্ষক দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে এবং কলিকাতায় একটি বিরাট সভায় শিক্ষকগণের দাবী জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সভায় মিঃ ডবলিউ. সি. ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়—গত দুই বৎসর যাবৎ বে-সরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য দারুণ অভাব ভোগ করিয়াছেন, তাহার প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে উহাদের বেতনদানের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে বলা হইয়াছে। শিক্ষকগণকে অত্যাবশ্যক কার্য্যে নিযুক্ত সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করিয়া তাঁহাদের সরকারী কর্ম্মচারীদের মত মাগ্‌গী ভাতা ও কম দামে খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বিমান আক্রমণ বা জলপ্লাবন প্রভৃতির ফলে যে সকল বিদ্যালয় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের অধিক পরিমাণে সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য।

কয়লার অভাব—

কয়লা অভাব এবার কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে যেভাবে দেখা দিয়াছে, সেরূপ আর কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। কয়লার অভাবে বাঙ্গালার পাটকলসমূহ গত ২৮শে জুলাই হইতে ১৫ দিন বন্ধ হইয়াছিল। তাহার ফলে শ্রমিকগণ সামান্য ভাতা পাইলেও তাহাদের দুঃখকষ্টের সীমা নাই। বাঙ্গালার কাপড়ের কলসমূহও কয়লার অভাবে শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে—এমনই কাপড়ের অভাব ও তজ্জনিত দুর্ম্মূল্যতা—তাহার উপর যদি কল বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে কাপড় আর বাজারে পাওয়া যাইবে না। কলিকাতা সহরে জ্বালানি কয়লার অভাবে গৃহস্থদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। বহু গৃহে কয়লার অভাবে রন্ধন প্রায় বন্ধ হইয়াছে। কয়লার মণ দেড় টাকার স্থলে (যুদ্ধের প্রথমে ৮ আনা দর ছিল) ৬ টাকা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। এ অবস্থায় মানুষ কি করিবে, তাহা জানি না। কাঠ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, তাহাও আর পাওয়া যায় না। আমাদের বিপদ যে কত দিক দিয়া আমাদের আক্রমণ করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই।

নিরন্নকে অন্নদান—

বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে দুঃস্থদের সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতার মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি নিম্নলিখিত ৩টি ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছেন—(১) যাহারা অনাহারে মৃতপ্রায়, তাহাদিগকে বিনামূল্যে অন্নদান করিবেন (২) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য সুলভ দোকানসমূহ খুলিবেন (৩) অর্থকষ্টে পতিত ব্যক্তিদের নিকট সস্তায় চাউল ও ডাল বিক্রয় করিবেন। এই কার্য্যের জন্য সমিতি ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮ শত ১৮ টাকা (১২ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত) সংগ্রহ করিয়াছেন। আরও অর্থ ও কর্ম্মীর প্রয়োজন। সেজন্য সোসাইটীর একটি সাহায্য বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত [illegible] কানোড়িয়া (২২১ আপার চিৎপুর রোড) সাধারণের নিকট অর্থ ও কর্ম্মী চাহিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের এই সৎ কার্য্যের জন্য কিছুরই অভাব হইবে না।

মুসোলিনী ও বর্ত্তমান ইতালী—

ইতালীর রাজনীতিক্ষেত্রে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ও আকস্মিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে সকল জাতি বর্ত্তমান যুদ্ধে মাতিয়াছে ইতালীও তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই ইতালীকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছিলেন ফ্যাসি নেতা ও প্রধান মন্ত্রী সিনর মুসোলিনী। রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ কেহই আশা করিতে পারেন নাই যে মুসোলিনীর একনায়কত্ব এত শীঘ্র বিলুপ্ত হইবে। রাজনীতিক মতবিরোধের ফলে সিনর মুসোলিনী গত ২৫শে জুলাই ইতালীর রাজসমীপে তাঁহার পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন এবং উক্ত পদত্যাগ পত্র ইতালীরাজ কর্ত্তৃক যথারীতি গৃহীত হইয়াছে। মুসোলিনীর পদে মার্শাল বাদোগ্লিওকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে কেবলমাত্র মুসোলিনীর পদত্যাগ পত্রই গৃহীত হয় নাই, রাজনীতিক কারণে মুসোলিনীকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। ইতালীর বর্ত্তমান রাজনৈতিক রূপ কি হইবে তাহা লইয়া সমগ্র পৃথিবীব্যাপীই জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। বিশ্ব-সমরের বর্ত্তমান ইতিহাসে ইতালী তথা মুসোলিনী একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে সন্দেহ নাই।

সয়াবিন চাষে সরকারী উৎসাহ—

কলিকাতা অঞ্চলে সয়াবিন চাষে উৎসাহ দিবার জন্য এবং খাদ্য হিসাবে সয়াবিনের উপযোগিতা প্রচারের উদ্দেশ্যে অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে সয়াবিনের বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আধ তোলা ওজনের প্রতি প্যাকেটের মূল্য এক আনা। সহরের এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের পোষ্টে ঐ সকল বীজ পাওয়া যাইবে। সয়াবিন চাষের পদ্ধতি এবং উক্ত চাষ সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় সংবাদাদি প্রত্যেক ক্রেতাকে বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। সয়াবিন পুষ্টিকর খাদ্য এবং উহার বহুল চাষের প্রয়োজন আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সরকারী প্রচার ব্যবস্থা আরও কিছুকাল পূর্ব্বে হইলে বোধ হয় ফলপ্রসূ হইত।

যখন ক্ষুধায় কাতর জনসাধারণ ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য হাহাকার করিতেছে তখন গৃহাঙ্গনে বীজ ছড়াইয়া তাহার পুষ্টিসাধন ও তৎপরে শারীরিক প্রয়োজনে তাহাকে কার্য্যকরী করা সম্ভব কি?

তত্ত্ব কিম্ ?—

গত মার্চ্চ মাসে বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নিরাপত্তা বন্দী শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। তিনি জেলে আবদ্ধ থাকায় মে মাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে ছুটী দেওয়া হয়। তাহার পর পুনরায় জুন হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তিনি ছুটীর আবেদন করায় মে মাসে মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণের এক সাধারণ সভায় তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করা হয়। শ্যামাপদবাবু জেল হইতে যাহাতে শপথ গ্রহণ করিতে পারেন তজ্জন্য তিনি কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন করেন। মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে তিন মাসের মধ্যে শপথ গ্রহণ করিতে না পারায় তাঁহার কমিশনার পদ নাকচ হয় এবং এই কারণে গত ১২ই জুন তারিখে পুনরায় চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করা হয়। উক্ত নির্ব্বাচনে মৌলবী আবদুল গণি চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। বাংলার গবর্ণর বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে বাংলা গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী মিঃ এন্‌-ব্যানার্জ্জি গত ১৫ই জুলাই তারিখের পত্রে শ্যামাপদবাবুকে শপথ গ্রহণের জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী বহরমপুর জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টকেও বিহিত ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিয়াছেন। ব্যাপারটীতে একটু নূতনত্ব আছে। আইনেরও মারপ্যাঁচ যথেষ্ট রহিয়াছে। এখন শ্যাম অথবা কুল কোনটী থাকিবে আমরা কেবল তাহাই ভাবিতেছি।

দশ দশা—

মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশন কালে বড়লাটের শাসন পরিষদের যে তিনজন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে তাঁহাদের অন্যতম এবং এই পদত্যাগে দেশবাসী তাঁহাদের সৎসাহসের কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু আনে চাকুরীর মোহ সে সময়ে দলে পড়িয়া ছাড়িলেও মনে প্রাণে ছাড়িতে পারেন নাই। তাই সম্প্রতি তিনি সিংহলে ভারত সরকারের প্রতিনিধির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই পদ এককালে তিনি যে ভারত সরকারের সদস্য ছিলেন তাহারই অধীন। আনের অবস্থা দেখিয়া আমরা কেবল বিস্মিত হই নাই এই মতপরিবর্ত্তনের ফলে 'মানুষের দশ দশা' নামক প্রবাদ বাক্যটিও আমাদের নিকট প্রকট হইয়া উঠিয়াছে!

পরলোকে লর্ড ওয়েজউড—

বহুদিন রোগ ভোগের পর সম্প্রতি লর্ড ওয়েজউডের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি শ্রমিকদলের সদস্যরূপে রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৯২৪ সালে প্রথম শ্রমিক মন্ত্রী সভায় তাঁহাকে ল্যাঙ্কাষ্টারের রাজকীয় জমিদারীর চ্যান্সেলারের পদ দেওয়া হইয়াছিল। গত বৎসর তিনি ব্যারণ হন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্রান্সিস্ চার্লস্ বোয়েন ওয়েজউড এক্ষণে ব্যারণ হইলেন। লর্ড ওয়েজউড ভারতবর্ষ ও মৃৎশিল্প সম্পর্কে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পার্লামেন্টের ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

মিঃ ডি-এন্-গাঙ্গুলী—

কলম্বো মিউনিসিপ্যালিটী কলম্বো ট্রামওয়ে কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ট্রাম কোম্পানী ও কলম্বো মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে মধ্যস্থতা করিয়া মূল্য নিরূপণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের এসেসর মিঃ ডি-এন্‌-গাঙ্গুলী শীঘ্রই কলম্বো যাত্রা করিবেন। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কলম্বো মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসারের নিকট মূল্য নিরূপণের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা জানান। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ্ অফিসার মিঃ গাঙ্গুলীর নাম মনোনীত করিয়া কলম্বো মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেন। সম্প্রতি কলম্বো মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ মিঃ গাঙ্গুলীকে উক্ত কার্য্যের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য কলম্বো মিউনিসিপ্যালিটী মিঃ গাঙ্গুলীকে পাথেয়, হোটেল ও আনুষঙ্গিক খরচা বাদে দশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিবেন। ইতিপূর্ব্বে মিঃ গাঙ্গুলী ই, বি, রেলওয়ের (বর্ত্তমান বি, এণ্ড এ রেলওয়ে) অনুরূপ কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি মিঃ গাঙ্গুলী পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও বিদেশ হইতে অধিকতর সুনাম অর্জ্জন করিয়া দেশবাসীর গৌরববর্দ্ধন করিবেন।

মিঃ ডি-এন্-গাঙ্গুলী

দামোদরের বন্যা—

দামোদরের বাঁধ ভঙ্গের ফলে বর্দ্ধমান জেলায় ভীষণ বন্যা হইয়াছে। এই বন্যার ফলে শস্যক্ষেত্রেরই যে কেবলমাত্র ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে, বহু নরনারী গৃহহীন ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। ৭০টী গ্রাম অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

চারিদিকে শুধু জলের তাণ্ডব নর্ত্তন! এই বন্যার ফলে ট্রেণ চলাচলেরও অসুবিধা হইয়াছে। ফলে দেশবাসীকে নানারূপ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। এই বন্যায় একাধারে বর্দ্ধমানবাসীগণ যেমন নিঃস্ব হইলেন অপরদিকে তেমনি চাউল-প্রধান দেশে বন্যার ফলে জনসাধারণকে অধিকতর অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।

বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন—

হুগলী জেলার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় প্রমুখ সুধীবৃন্দের আমন্ত্রণে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বিগত ২৮শে আষাঢ় চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলা হইতে আগত সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে সমগ্র সভাটি সাময়িকভাবে প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠে। বিরাট সভাগৃহে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিকৃতির সহিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করা হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন স্থির হইয়াছিল, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তিনি উপস্থিত হইতে না

চন্দননগরে নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন

চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে সভাপতিবৃন্দ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ

পাওয়ায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র আঢ্য কর্তৃক 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গীত হইবার পর সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মূল সম্মেলনের সভাপতি এবং বিভিন্ন শাখার সভাপতিবৃন্দকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া বাঙ্গলা ভাষার প্রতিভাবান লেখকগণের এবং চন্দননগরের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার বিস্তৃত বিবরণ দেন। সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতীন্দ্রকুমার মিত্র তাঁহার বিবরণে বঙ্গভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে সম্মেলনের কর্মপ্রচেষ্টা বিশদভাবে বিবৃত করেন। জনস্বাস্থ্য বিভাগের সভাপতি ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত হইতে না পারায় ডাঃ বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র উক্ত বিভাগে সভাপতিত্ব করেন; এবং ডাঃ ঘোষের মুদ্রিত অভিভাষণ শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য-বিভাগ) শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মিত্র (কাব্য-বিভাগ), শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (অর্থনীতি বিভাগ) শ্রীমতী বিভা মজুমদার (বিজ্ঞান বিভাগ) এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (জন শিক্ষা বিভাগ) বিভিন্ন শাখায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীমতী কুমারী শ্যামলী চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্মেলনে কয়েকটী জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। খুলনা জেলার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের আমন্ত্রণে আগামী সম্মেলন খুলনায় হইবে স্থির হয়। বঙ্গভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দামোদরের গতি পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর এস-পি-চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি দামোদরের বন্যাপ্লাবিত স্থানগুলি দেখিয়া আসিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন—দামোদরের পূর্ব্বমুখী প্রবাহ দেখিয়া মনে হয়, নদের স্বাভাবিক গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদি নদের জল কমিয়া না যায়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে অবহিত হইয়া কর্তব্য পালন করা উচিত। দামোদর বন্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর জে-পি-রায় ও বাঙ্গালার সরকারী সেচ বিভাগের প্রধান এঞ্জিনিয়ার মিঃ বি-এল-ফুরারওয়ালাকে লইয়া এক কমিটী গঠন করিয়াছেন। আশা করি, এই তদন্তের ফলে বন্যার প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইবে এবং দেশবাসী তদ্দ্বারা উপকৃত হইবে।

নিম্নমূল্যে অন্ন বিতরণ—

কলিকাতার দুঃস্থ নিরাশ্রয় এবং বুভুক্ষিত জনগণের জন্য কয়েকটী লঙ্গরখানা খুলিয়া তথা হইতে অন্ন বিতরণের-ব্যবস্থার জন্য যাঁহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন সরকার এরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করিবার জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ব্যাপারে কয়েকটী সুযোগ সুবিধা দিয়াছেন। অন্ন কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহারও নির্দ্দেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল লঙ্গরখানায় নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চাউল, ডাল ইত্যাদি দেওয়া হইবে। ক্ষুধার তুলনায় সরকার কর্তৃক নির্দ্দেশিত ব্যবস্থা সামান্য হইলেও—অভুক্ত জনগণের সকাতর আর্ত্তনাদ কতকটা দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই।

সিকিউরিটী বন্দীদের মুক্তিলাভ—

বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণের পর গত ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত ১৪১টি সিকিউরিটী বন্দীকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা মন্দের ভাল।

টাকা বাজেয়াপ্ত—

পুরীর এক সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস, পণ্ডিত গোপবন্ধু চৌধুরী এবং মিঃ জগন্নাথ মিশ্রের নামে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে যে নয় হাজার টাকা গচ্ছিত ছিল সম্প্রতি সরকার তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। ১৯৩২ সালে পুরীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইবার কথা ছিল, তাহার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি কর্তৃক উক্ত টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

পাঞ্জাবে উদ্বৃত্ত চাউল—

ঘাট্‌তি অঞ্চলে চাউল প্রেরণের জন্য যে ২২ লক্ষ মণ বিভিন্ন প্রকারের চাউল পাঞ্জাবে উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা সরবরাহের নিমিত্ত পাঞ্জাবের চাউল ব্যবসায়ী সঙ্ঘ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উক্ত চাউল ব্যবসায়ী সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ পাঞ্জাবের ডেভেলপমেণ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট হইতে চাউল সম্পর্কে বর্ত্তমান পাঞ্জাবের অবস্থা বিষয়ে এক বিবৃতি আশা করিতেছেন।

মিঃ বি-আর-সেন—

বাংলা সরকারের সেক্রেটারী মিঃ বি-আর-সেন সম্প্রতি ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা মিঃ সেনের নিয়োগে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

পরলোকে অমরেশ কাঞ্জিলাল—

গত ২৫শে জুলাই রবিবার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্মী অমরেশচন্দ্র কাঞ্জিলাল মহাশয় ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন নিষ্ঠাবান দেশসেবকের তিরোধান হইল।

বন্যা ও বিপন্ন অধিবাসী—

কেবলমাত্র যে বর্দ্ধমান ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলেই এ বৎসর প্রবল বন্যা হইয়াছে তাহা নহে—বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও বন্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ময়ূরাক্ষী নদীতেও বন্যা হওয়ার ফলে কান্দিতে বন্যা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বাংলার গভর্ণর তথায় গমন করিয়া টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বন্যার ফলে কান্দী অধিকতর বিপন্ন হইল। বীরভূম হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, প্রায় ৬০ ঘণ্টাকাল অবিরাম বর্ষণের ফলে বহু মাটীর ঘর ধসিয়া পড়িয়া অনেক লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং নদীর জল বর্দ্ধিত হওয়ায় ধান্য ক্ষেত্রেরও নাকি ক্ষতি হইয়াছে। অজয় নদীর বন্যার ফলে ভাগীরথীর জল বাড়িয়া বর্দ্ধমান জেলার কাল্না

মহকুমার পূর্ব্বস্থলী, মস্জিদা ও পাটুলী ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। গত বৎসরে ঐ সকল অঞ্চলে ধান না হওয়ায় জেলা বোর্ড সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তাহাও বন্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ঐ সকল অঞ্চলে ফসল ভাল হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছিল কিন্তু ধান কাটিবার সময় তাহা নষ্ট হইয়া গেল। কাটোয়া থানার এলাকার কেতুগ্রাম প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামও জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নানা দিক হইতে দেশে যে দুর্দ্দিনের সূচনা দেখা দিয়াছে অদূর ভবিষ্যতে তাহার কি পরিণতি হইবে কে জানে?

পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ—

গত ৩০শে জুলাই ঢাকার কার্জ্জন হলে বাঙ্গলার গভর্ণর বাহাদুরের সভাপতিত্বে পূর্ব্ব বঙ্গ সারস্বত সমাজের ১৮তম বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়া গিয়াছে। গভর্ণর পণ্ডিতগণকে নগদ ৪ হাজার টাকা পুরস্কারস্বরূপে দান করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার দে'কে বিদ্যারত্ন এবং অবসরপ্রাপ্ত এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার বিধুভূষণ পালকে ভিষগ্রত্ন উপাধি প্রদান করা হইয়াছে।

পরলোকে কবি প্রফুল্ল রায়—

গত ২২শে জুন ১৯৪৩ কবি প্রফুল্ল রায় তাঁহার মাতৃভূমি টাকীতে (২৪ পরগণা) পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বত্রিশ বছর মাত্র বয়স হইয়াছিল। বাঙ্‌লার নানা সাময়িক পত্রে প্রফুল্ল রায়ের কবিতা প্রকাশিত হইত।

প্রফুল্ল রায়

জাপানের হাতে ভারতীয় বন্দী—

দিল্লীতে ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে ১২৭০ জন ভারতীয় জাপানের হাতে বন্দী হইয়া আছে। ৬৮৫৯৯ জন ভারতীয়কে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না—তাঁহাদের অধিকাংশই খুব সম্ভব জাপানের হাতে বন্দী হইয়া আছে। ভারতে কতজন জাপানীকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা সঙ্গত নহে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে না।

নমিতা সেন—

'আর্ট সেণ্টার অব দি ওরিয়েণ্টের' ছাত্রী কুমারী নমিতা সেন সম্প্রতি অভিসারিকা নৃত্যে তাঁহার অপূর্ব্ব নৃত্য কৌশল প্রদর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

কুমারী নমিতা সেন

বীর সাভারকর—

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর শ্রীযুক্ত ভি. ডি. সাভারকার গত ৩১শে জুলাই এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি গত ৬ বৎসর কাল মহাসভার সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। তিনি আর ঐ কার্য্য করিতে অসমর্থ কাজেই তিনি পদত্যাগ করিবেন। হিন্দু সংগঠন কার্য্যে সাভারকারের দান ভারতবাসী চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

চটকল ও কৃষক-সম্প্রদায়—

চটকলের মালিকগণ আমেরিকাকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দরে (প্রতি ১০০ গজ চট ২৫ টাকা) মাল সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা নিজের লাভের অংশ ঠিক রাখিয়া ক্ষতির ভার গরীব কৃষকদের উপর চাপাইয়া দেওয়াই স্থির করিয়াছেন। পাটের দর অন্ততঃ এমন হওয়া উচিত যে, এক মণ পাট বিক্রয় করিয়া কৃষক অন্ততঃ দুই মণ চাউল কিনিতে পারে। স্বাভাবিক সময়ে পাটের দাম কোন দিনই তাহার নীচে নামে নাই। আমেরিকাকে যদি সস্তায় বাঙ্গলার পাট কিনিতে হয়, তাহা হইলে যে জাহাজ চটের চালান লইতে আসিবে সেই সকল জাহাজ ভরিয়া তাহারা বাঙ্গালার কৃষকদের জন্য আমেরিকা হইতে

দর আনিতে পারে। এ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের অবহিত হওয়া উচিত। চাষীরা যাহাতে পাটের উপযুক্ত দাম পায়, সে জন্ত এখনই ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। সকল দিক দিয়া এখন দেশকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা না করিলে অচিরে সমগ্র দেশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

ভারতরক্ষা আইনে বন্দী—

দিল্লীতে ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরের ফলে জানা গিয়াছে, গত ১লা জুন ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা মতে ভারতে বন্দীর সংখ্যা ছিল—১১ হাজার ৭ শত ১১ জন। তাহা ছাড়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কতজনকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই।

পাটের রপ্তানী হ্রাস—

গত ৫ বৎসরে পাট বিদেশে রপ্তানী কি ভাবে কমিয়া গিয়াছে, তাহা নিয়ের হিসাব হইতে দেখা যাইবে—

সাল	পরিমাণ
১৯৩৮-৩৯	৫৮ লক্ষ ৭২ হাজার বেল
১৯৩৯-৪০	১৯ লক্ষ ২৭ হাজার বেল
১৯৪০-৪১	১৭ লক্ষ ৫৪ হাজার বেল
১৯৪১-৪২	১৫ লক্ষ ৫১ হাজার বেল
১৯৪২-৪৩	১২ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল

ইহার পরেও পাটের চাষ না কমায় পাটের দাম যে কমিয়া যাইবে তাহা আর বিচিত্র কি? যাহাতে পাটচাষীরা পাটের চাষ কমাইয়া দেয় সে জন্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে আরও প্রবল আন্দোলন পরিচালন করা প্রয়োজন।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

আগামী ২১শে নভেম্বর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন সভায় বক্তৃতা করিবার জন্ত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় আহূত হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার। তাঁহার এই সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরব অনুভব করিবে।

সরকারী দান—

বর্দ্ধমানের বন্যাপ্লাবিত স্থানসমূহে দুর্দ্দশাগ্রস্তদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তিন লক্ষ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ দানের কাজ চালাইবার জন্ত ২০ জন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

পরলোকে দেশসেবক গিরীন্দ্রনাথ—

খ্যাতনামা দেশসেবক গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৩ই শ্রাবণ শুক্রবার ৫৮ বৎসর বয়সে কলিকাতা ১৭০ বৌবাজার ষ্ট্রীটে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯১২ সালে বি-এ পাশ করিয়া তিনি দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন ও ১৯১৩ সালে দামোদরের বন্যায় সাহায্য করিতে যান। পর বৎসর হইতে বহু দিন তাঁহাকে আটক থাকিতে হয় ও ১৯১৯ সালে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি কিছুদিন স্বর্গত পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত সার্ভেণ্ট কাগজে কাজ করেন। তৎপরে কিছুদিন শিক্ষকতার পর পুনরায় তাঁহাকে রাজরোষে আটক থাকিতে হয়। ১৯২৮ সালে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি বৌবাজার হাই স্কুলের ভার গ্রহণ করেন ও তদবধি এই ১৫ বৎসর শিক্ষার উন্নতিকল্পে বহু কার্য্যে রত ছিলেন। বৌবাজারে বালক বিদ্যালয়ের সহিত তিনি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং অতি অল্প বেতনে 'প্রেসিডেন্সি গার্লস্ কলেজে' বালিকাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং সমাজের উন্নতির কথা ছাড়া তাঁহার আর কোন চিন্তার বিষয় ছিল না। তাঁহার মত কর্ম্মীর অভাব সহজে পূরণ হইবার নহে।

বাঙ্গালার বন্যা—

গত ১৭ই আগষ্ট প্রথম দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান জেলার একাংশ ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পর সেই বন্যার প্রকোপ ক্রমে বাড়িয়াছে—তাহার ফলে শুধু বর্দ্ধমান জেলার অধিকাংশ নহে, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার স্থান বিশেষ ও বিপন্ন হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশও বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন, অন্নহীন ও সর্ব্বস্বহীন হইয়াছে। ঐ সকল জেলার বহু স্থানের ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এমনই দেশের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে বহু লোককে অনাহারে ও অনেককে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে হইতেছিল, তাহার উপর বর্ত্তমান দৈবদুর্বিপাক আমাদের কষ্টের পরিমাণ কত বাড়াইবে, তাহা চিন্তা করাও কঠিন। যাহাদের এ বৎসরের খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল না, তাহারা আগামী বৎসরের কথা ভাবিবে কি? লোক ভাবিয়াছিল, ভাদ্রমাসে আউশ ধান পাইলে এখন ২ মাস লোক তাহা খাইয়া বাঁচিবে। সেজন্ত লোক বেশী করিয়া আউশ ধানের চাষ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাও সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। ভগবানের প্রদত্ত এই দুর্ভাগ্য, সহ্য করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নাই।

বিরলা ব্রাদার্সের বদান্যতা—

দক্ষিণ কলিকাতায় প্রতিদিন ২০ হাজার পরিবারকে আগামী ৪ মাসের জন্ত ১৬ টাকা মণ দরে চাউল সরবরাহের জন্ত মেসার্স বিরলা ব্রাদার্স একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। চাউলের খরিদ মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য দাঁড়াইবে বিরলা ব্রাদার্স সেই ব্যয় বহন করিবেন। যে সকল দরিদ্র ভদ্রপরিবার কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে চাউল, আটা পান না অথচ কণ্ট্রোলের দোকান হইতে চাউল সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়, মেসার্স বিরলা ব্রাদার্সের পরিকল্পনা প্রধানত তাঁহাদের অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে।

ডাক্তার গুহের প্রস্তাব—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ডাঃ বি-সি গুহ বর্ত্তমান খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে জানাইয়াছেন —বাঙ্গালাকে রক্ষা করিবার দুইটি মাত্র উপায় আছে—(১) অষ্ট্রেলিয়ার উদ্বৃত্ত গম আনয়নের জন্ত আধ ডজন খাদ্য যোগানদারী জাহাজের অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং (২) বঙ্গোপসাগরে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরিবার জন্ত সামরিক ট্রলার তলব করিতে

হইবে। ডাঃ ঘোষের এই প্রস্তাব সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা জানিবার জন্য সাধারণতঃ সকলেরই কৌতূহল হয়। ইংলণ্ডে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য টাকা প্রতি মাত্র ৫ আনা বাড়িয়াছে—আর ভারতবর্ষে এক টাকা মূল্যের খাদ্যের মূল্য হইয়াছে ৮ টাকা। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যাহা করিবার ছিল তাহাই যখন করেন নাই, তখন কি আর জাহাজ বা ট্রলারের ব্যবস্থা হইবে?

ছাত্রের কৃতিত্ব—

বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ অধীরকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস, সি পরীক্ষায় মনস্তত্ত্ব অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট জুবিলী বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীমান্ অধীরকুমার একজন সুবক্তা ও সুলেখক। এই বৎসর আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের পক্ষ হইতে বক্তৃতা করেন।

শ্রীমান্ অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

বস্ত্রমূল্য সম্বন্ধে আলোচনা—

গত ৩রা আগষ্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকেশ্বরী মিলের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় তাঁহার ১৫ চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থ বাসভবনে উক্ত মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত এস-কে-বসুকে এক সভায় সম্বর্ধনা করিলে বসু মহাশয় জানাইয়াছেন—কলিকাতার খুচরা বস্ত্র ব্যবসায়ীরা অনেক সময় জোড়া পিছু কাপড়ে ৪।৫ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করেন। সরকারী বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে ইহা কিছু দূর হইবে। যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধি, মজুরদের রোজ বৃদ্ধি, কয়লার অভাব, রং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবের জন্য কাপড়ের দাম বাড়িয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় কাপড় যাহাতে সুলভ ও সহজলভ্য হয়, মিলসমূহের পক্ষ হইতে সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে।

ক্ষুধিতকে অন্নদান—

বর্ত্তমান দুরবস্থায় পতিত ও দৈবদুর্ব্বিপাকে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিবার জন্য স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে যে বঙ্গীয় রিলিফ্ কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহার জন্য অর্থ, জিনিষপত্র প্রভৃতি সাহায্য সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সাহায্য কলিকাতা ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীটে স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কার নিকট, ৭৭ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোডে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বা ৮নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেসে শ্রীযুক্ত ভগীরথ কানোড়িয়ার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—

প্রসিদ্ধ শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এক বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তাঁহার মত গুণী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত লোকেরই সম্মান করিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দান—

মানবজাতির দুঃখ নিবারণ করে সাইক্লোট্রোণ নামক যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের কর্মীরা এ বিষয়ে গবেষণা করিবেন ও বৃত্তি পাইবেন। দাতার উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত হউক।

বিজয়নগরে বন্যা—

৪ দিন অতিবৃষ্টির ফলে আজমীরের নিকটস্থ বিজয়নগরে আধঘণ্টার মধ্যে ১০।১২ ফিট জল বাড়িয়া সমগ্র সহর ও ৯ খানি গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে। ফলে ১৫ মাইল দীর্ঘ রেলপথ নষ্ট হইয়াছে ও এক হাজারের বেশী লোক মারা গিয়াছে। বহু স্থানে গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্র দৈবদুর্ব্বিপাক—কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে?

কলিকাতার পথে ময়লা—

কলিকাতার পথসমূহ প্রায়ই আজকাল নানাস্থানে অপরিষ্কৃত দেখা যাইতেছে। সকল স্থানের স্তূপীকৃত ময়লা যথাসময়ে সরান হয় না—কোথাও বা আংশিক ভাবে কাজ করা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, পেট্রোলের অভাবে ময়লা ফেলা লরী সব চালান যায় না; অথচ কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগের লরী বা গাড়ীগুলি বিনা প্রয়োজনে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকে—তাহাদের বেলায় পেট্রোলের অভাব হয় না। ইহাই বিচিত্র ব্যবস্থা।

মহৎ দান—

রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভীর জনৈক কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার পিতা যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে এক হাজার টাকা দান করিয়া জানাইয়াছেন—বিবাহের আড়ম্বর বাদ দিয়া তিনি ঐ অর্থ মানবের হিতের জন্য দান করিয়াছেন। এরূপ মহৎ দান সর্ব্বত্র অনুকৃত হওয়া উচিত।

মিঃ গোয়েঙ্কার দান—

গত ১৮ই শ্রাবণ মাড়োয়ারী বণিকদের এক সভায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এক আবেদনের ফলে গোবিন্দ ভবনের শ্রীযুক্ত জয়দয়াল জি গোয়েঙ্কা জানাইয়াছেন—তিনি আগামী ৪ মাস ২০০০ মধ্যবিত্ত লোককে কম মূল্যে ও ৩০০০ দরিদ্র লোককে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ৫ হাজার মণ চাউল (দাম প্রায় ১ লক্ষ টাকা) দিবেন। নবদ্বীপ, বাঁকুড়া ও কলিকাতা এই কেন্দ্র হইতে চাউল বিতরণ করা হইবে।

যাদুকরের সম্মান লাভ—

সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর শ্রীযুক্ত পি. সি. সরকার সম্প্রতি বাংলার গভর্ণর স্যার জন আর্থার হার্বার্টের নিকট হইতে একটি 'বিশেষ পদক' (medallion) পুরস্কার পাইয়াছেন। অন্য কোন ভারতীয় যাদুকর এই পর্য্যন্ত এই 'বিশেষ পদক' লাভ করেন নাই।

যাদুকর পি সি সরকার

দানবীর বরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী—

গত ১লা আগষ্ট বাগবাজার পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী গৃহে বাগবাজারের জমিদার দানবীর স্বর্গত বরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় বরেন্দ্রবাবুর স্থায়ী স্মৃতি রক্ষাকল্পে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। বরেন্দ্রবাবু আজীবন জনহিতকর কার্য্যে নীরবে অজস্র অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিসভার আয়োজন করিয়া বাগবাজারবাসীগণ অনুকরণীয় ও আদর্শ চরিত্রের প্রতি সম্মান দেখাইলেন সন্দেহ নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি উৎসব—

গত ৭ই শ্রাবণ রবিবার কৃষ্ণনগরে সাহিত্যসঙ্গীতির উদ্যোগে দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের নেতৃত্বে কবিবরের ভিটায় পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হয়। অপরাহ্নে স্থানীয় সি. এম্. এস্ স্কুল গৃহে এক বিরাট জনসভা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রবীণ নাট্যকার ও কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতাদি এবং কবিতা ও প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠের আয়োজন করা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্যিক সভায় যোগদান করেন। পরিশেষে জেলা জজ শ্রীযুক্ত শৈবাল গুপ্ত সভাপতি, উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

পেগিং আইনের প্রতিবাদ—

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের বহু ন্যায়সঙ্গত অধিকার সঙ্কোচ করতঃ ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট যে পেগিং আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদকল্পে সম্প্রতি কলিকাতায় কয়েকটি বণিকসঙ্ঘের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পেগিং আইনের বিশদ আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে—'জাতিগত বৈষম্যের উপর জোর দিয়া যে আইন রচিত হইয়াছে প্রত্যেক ভারতবাসীই তাহার নিন্দা করিবে। ভারতবাসীগণের চেষ্টা ও কর্ম্মশক্তি দ্বারাই দক্ষিণ আফ্রিকার আর্থিক উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ভারতবাসী হীন নহে। ভারতবাসী অতীতে বহু লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়াছে কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহারা শৌর্য্য বীর্য্যে যে আসন লাভ করিয়াছে তাহাতে তাহাদের নৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। পেগিং আইন মিত্রশক্তি প্রচারিত আদর্শের অনুকূল নহে। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া কোন ফল না হইলে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতের হাই-কমিশনারকে ফিরাইয়া আনিয়া ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ জানাইতে হইবে।

আমেরিকার লাইব্রেরী—

সাধারণ পুস্তকাগার বা লাইব্রেরী দ্বারা সমাজের কত উপকার হয়, তাহা আমরা সম্পূর্ণ জানি না; যাহারা জানে তাহারা ইহার যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতে পারে। আমেরিকার সাধারণের পাঠের জন্য "ফ্রি" লাইব্রেরী প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক পরিপালিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। এই রকম সমস্ত লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ১০ কোটি ৮০ লক্ষ, তন্মধ্যে প্রতি বৎসর পাঠকের হাতে ফেরে অন্ততঃ ৪০ কোটি সংখ্যক বই

এবং পাঠক সংখ্যা ২ কোটি ৩০ লক্ষ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে এবং তাহাতেও ৮ কোটী ৩০ লক্ষ পুস্তক সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহা ছাড়া প্রতিষ্ঠানগত আরও ১৮,২৬৩টী লাইব্রেরী আছে। ভারতের কথা ছাড়িয়া দিলে যে বাঙ্গালা দেশের আমরা শিক্ষা, কৃষ্টি, ভাষা এবং অক্ষর পরিচিতের সংখ্যা লইয়া বড়াই করি সেখানে এরূপ কতগুলি লাইব্রেরী আছে! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা পুস্তকাগার সমিতি এই জাতীয় এক অনুসন্ধান চালাইয়াছিলেন ; তাহার ফলাফল কি হইল ?

প্রবাসে বাঙ্গালী সমিতি—

গত ৩রা জুলাই বোম্বাই প্রদেশের মোহান সহরে প্রবাসী বাঙ্গালী সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় বাঙ্গালীগণ কর্ত্তৃক 'পথের শেষে' নাটক অভিনয় হইয়াছিল। তথায় ৫ শতেরও অধিক বাঙ্গালী নরনারী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার পরিচালনা করেন এবং শ্রীযুক্ত জগদীশ বক্সী, তাঁহার ছাত্রী শর্ব্বরী সমাদ্দার, গৌরী সমাদ্দার ও শুভা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচ্য নৃত্যকলা দেখাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন। কর্মব্যবস্থাপনায় শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীযুক্ত সলিলকুমার বিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই মোহানে বাঙ্গালী সমিতি

রাজবন্দীর সংখ্যা—

গত ৭ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বাঙ্গলায় নিম্নলিখিতরূপ রাজবন্দীর সংখ্যা ছিল—ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারায় বন্দী ২৩৮৬ জন ও অন্যান্য বন্দী ১৫৭৯ জন। ১২৯ ধারায় বন্দী ১৩৭ জন। ভারতরক্ষা আইনে দণ্ডিত ১৩৩৩ জন। ঐ আইনে বিচারাধীন বন্দী ৭০৮ জন। গত ৩১শে জানুয়ারী ২৬ ধারায় বন্দী ছিল ১৪৮৪ জন ও অন্যান্য বন্দী ছিল ১৬৯৮ জন।

বিদেশে বস্ত্র প্রেরণ—

প্রকাশ, ভারতসচিব ভারত সরকারকে ১৫ কোটি গজ সস্তা কাপড় মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহে চালান দিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কলওয়ালারা নাকি সস্তায় বিদেশে চালান দিবার জন্য কাপড় যোগাইতে রাজী হন নাই। সংবাদের প্রথম অংশ যেমন ভয়াবহ, শেষের অংশ তেমনই আশাজনক। যে সময় এদেশের লোক বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ প্রায় হইয়া দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে, সে সময়ে শঙ্কাতীত ব্যবস্থা বাস্তবিকই হাস্যের উদ্রেক করে।

বাজেটের পুনর্ব্যবস্থা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন সমাপ্তির পূর্ব্বেই মৌলবী এ-কে ফজলল হক পরিচালিত মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় বাজেটের সকল অংশ পরিষদে আলোচিত ও গৃহীত হইতে পারে নাই, সে জন্য পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইতেই গত ২১শে আষাঢ় নূতন মন্ত্রীসভার সদস্য অর্থসচিব শ্রীযুত তুলসী চন্দ্র গোস্বামী বাজেটের সেই অংশ আলোচনার জন্য উপস্থিত করেন। কিন্তু বাজেট ঐ ভাবে পরিষদের দুইটি পৃথক অধিবেশনে আলোচনা হইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়া সে বিষয়ে সভাপতির নির্দ্দেশ চাহেন। ২২শে আষাঢ় সভাপতি এ বিষয়ে নির্দ্দেশ দিয়াছেন ; ফলে বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্টকে এখন নূতন করিয়া ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট প্রস্তুত করিয়া তাহা ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করিতে হইবে। আগামী নভেম্বরের পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব হইবে না। এই ব্যাপারে সভাপতি মিঃ নৌশেরআলি যে নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার বিষয়।

পরলোকে ধীরেন্দ্রনাথ মান্না—

গত ২৯শে জুন "গ্লোব নার্সারী"র ধীরেন্দ্রনাথ মান্না (গোপালবাবু) মাত্র আটান্ন বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি পরোপকারী, অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। মান্না মহাশয় (গোপালবাবু) বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতির সহকারী সভাপতি ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং রাজনৈতিক কারণে বহুবার নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত কর্মীর এই অকাল-মৃত্যুতে দেশ প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ধীরেন্দ্রনাথ মান্না

ঢাকায় আবার অশান্তি—

ঢাকা হইতে আবার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সংবাদ আসিয়াছিল। প্রত্যহই ২৪ জন করিয়া লোক হতাহত হইয়াছে। ঢাকার দুর্ভাগ্যের কিছুতেই আর অবসান ঘটিতেছে না। ঢাকার মত এত বড় একটা সহরে যদি এই সাম্প্রদায়িক অশান্তি চিরস্থায়ী হইয়া পড়ায়, তাহার ফল কিরূপ বিষময়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অথচ এ বিষয়ে কাহারও কিছু করিবার নাই।

সোভিয়েট জার্ম্মাণ যুদ্ধ—

গত ২২শে জুন সোভিয়েট জার্ম্মাণ যুদ্ধের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। গত দুই বৎসরের যুদ্ধে জার্ম্মাণদের ৬৪ লক্ষ সৈন্য নিহত ও বন্দী হইয়াছে এবং সোভিয়েটের ৪২ লক্ষ সৈন্য নিহত ও নিখোঁজ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে জার্ম্মানী ৫৬৫০০ কামান, ৪২৪০০ ট্যাঙ্ক ও ৪৩০০০ বিমান হারাইয়াছে। সোভিয়েটের খোয়া গিয়াছে—৩৫০০০ কামান, ৩২০০০ ট্যাঙ্ক ও ২৩০০০ বিমান।

পাট চাষীর সুদিন—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় চটকল সমিতিকে ১০ কোটি গজ চট সরবরাহের আদেশ দেওয়ায় এদেশে পাট চাষীর সুদিনের আশা হইয়াছে। গত ১০ মাস আমেরিকা ভারত হইতে খুব কম চট লইয়াছিল। নূতন আদেশ অনুসারে চট প্রস্তুত করিতে প্রায় ৫৫ লক্ষ মণ পাট দরকার হইবে। ঠিক এই সময়ে চট কল সমিতি পাটের দর বাঁধিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাহা যাহাতে না হয়, সে জন্য গভর্ণমেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। পাট চাষী বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য সকল চাষীই যেন এখন হইতে সাবধানতা অবলম্বন করে।

সাতক্ষীরায় বৈতালিক—

সাতক্ষীরার উকীল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র দাস মহাশয়ের গৃহে সম্প্রতি স্থানীয় এস-ডি-ও মিঃ এ-সি-রায়ের সভাপতিত্বে বৈতালিক নামক স্থানীয় সাহিত্য সভার এক অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত কালীপদ রায় চৌধুরী, জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সভাপতি, গৃহস্বামী প্রভৃতি আলোচনায় যোগদান করেন। বৈতালিকের সভায় সঙ্গীতাদির আয়োজন হইয়া থাকে।

দেশবন্ধু স্মৃতি তর্পণ—

গত ১৬ই জুন বুধবার অপরাহ্ণে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে এক বিরাট জনসভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। স্বর্গত দেশবন্ধুর গুণমুগ্ধ ভক্তগণ তাঁহার দেশ-সেবা, ত্যাগ ও অপূর্ব্ব মনীষার কথা আলোচনা করিয়া পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

বিলাতে ছাত্রের কৃতিত্ব—

হিন্দু মহাসভার সম্পাদক ও খ্যাতনামা সলিসিটার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত শঙ্করপ্রসাদ সম্প্রতি বিলাতে ব্যারিষ্টারীর শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গত কয় বৎসর তিনি বিলাতে বিদ্যাশিক্ষার সহিত নিয়মিতভাবে রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালন করিতেছিলেন। তিনি ভারতীয় ছাত্র সমিতির সম্পাদক ও কেম্‌ব্রিজ মজলিসের সভাপতি ছিলেন। দেশে ফিরিয়াও তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিলে দেশ তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইবে।

মিঃ ডি, ভ্যালেরা—

মিঃ ডি, ভ্যালেরা পুনরায় আয়র্ল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৬৭-৩৭ ভোটে পরাজিত করিয়াছেন। তিনি ১৯৩২ সালে সর্ব্বপ্রথম প্রধান মন্ত্রীর পদে নির্ব্বাচিত হন এবং তদবধিই তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে সমাসীন আছেন।

সংবাদপত্রের মামলায় আপীল—

মহাত্মা গান্ধীর পুত্র শ্রীযুক্ত দেবীদাস গান্ধী দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমস' নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রের সম্পাদক। আদালত অবমাননার অভিযোগে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারে তাঁহার এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করা হইলে ঐ আপীল গ্রাহ্য করা হইয়াছে। সম্পাদকের অর্থদণ্ডের টাকা ফেরত দিবার আদেশ হইয়াছে। একটা কথা আছে—'সব ভাল, যার শেষ ভাল।' শেষ পর্য্যন্ত সম্পাদকের এই অব্যাহতি লাভে দেশবাসী সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মিলন—

গত ৩১শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট কলিকাতা সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রমেশ ভবনে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। 'দেশ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলে কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু রায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ও স্যার যদুনাথ সরকার মূল সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অধ্যাপক সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় দর্শন শাখায়, কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ সাহিত্য শাখায় ও অধ্যাপক বিশপতি চৌধুরী কাব্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়। সভায় বহু প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হয়—তন্মধ্যে পণ্ডিত হরিদাস দাস মহাশয়ের প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর ভগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস প্রভৃতির চেষ্টায় সম্মেলন সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে সমবেত সাহিত্যিক-বৃন্দ

আসাম ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন লাহিড়ীকে এক ভোটে পরাজিত করিয়া মিসেস্ জুবেদা আতাউর রহমান সম্প্রতি দ্বিতীয়বার আসাম ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আফিং আমদানী—

চালের অপেক্ষাও আফিং যাঁহাদের নিকট অপরিহার্য্য তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, বাংলা সরকার ভারত সরকারের নিকট হইতে ২০ মণ আফিং সংগ্রহ করিয়াছেন। উহার ১৫ মণ কলিকাতায় থাকিবে আর বাকী ১০ মণ যাইবে বাংলার অন্যান্য জেলায়। দুঃখের মধ্যে সুখ—ভাত কাপড়ের সমস্যার মধ্যে যাঁহাদের ছাট ওঠা সমস্যাও প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহারা হৃতশক্তি লাভ করিয়া পুনরায় চাল কাপড়ের লাইনে দাঁড়াইতে সমর্থ হইবেন।

রাশিয়ায় মহাভারত—

সোভিয়েটের এক সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ জানাইয়াছেন যে, হিন্দুর প্রাচীনতম পবিত্র গ্রন্থ মহাভারতের প্রথম খণ্ড রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। অন্যান্য খণ্ডগুলিও অনুবাদ আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। সোভিয়েটে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক কালিয়ানভ প্রেস প্রতিনিধিদের নিকট বলিয়াছেন, "মহাভারত রাশিয়ার নিকট বিশেষ আকর্ষণীয়। যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিকটও ইহার ক্রমশঃ সমাদর হইতেছে। হিন্দুর এই প্রাচীন গ্রন্থ দেশ ও প্রেমধর্ম্মের আদর্শই জনসমাজে প্রচার করিয়াছে।" প্রথম খণ্ড ছাপার কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

'ভারতকে জানাও' আন্দোলন —

সম্প্রতি বহু বিদেশী লোক যুদ্ধের নানা কার্য্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা আমেরিকা, চীন, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি আছেন। ভারতের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন জ্ঞান নাই—অনেকের বহু ভ্রান্ত ধারণাও আছে। সেই সকল ধারণা পরিবর্ত্তনের জন্য এখন ভারতে সকলেরই বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। কলিকাতার কয়েকটি কেন্দ্রে তাঁহাদের জন্য 'ভারতকে জানাও' সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সকল শিক্ষিত ভারতবাসী যদি এ বিষয়ে উৎসাহী হন, তাহা হইলে বিদেশী বন্ধুরা ভারত

সম্বন্ধে ভারতের জ্ঞানলাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন। কলিকাতা ৪১ হ্যারিসন রোডের 'শ্রীহর্ষ' ছাত্র-সম্প্রদায় এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। ধনী ব্যক্তিগণের এ সময়ে ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পুস্তিকা ছাপাইয়া সে গুলি বিদেশীদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত। নচেৎ ভবিষ্যতেও ভারতবাসীরা সাধারণ জগৎবাসীর নিকট অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়াই থাকিবে।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার—

লেফট্‌ন্যাণ্ট কর্ণেল ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ ডি-লিট্‌, বার-এট্‌-ল, এম, এল, এ সম্প্রতি ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য পুনরায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন।

বন্দীদের ভাতা বৃদ্ধি—

সম্প্রতি একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে বাংলা সরকার সিকিউরিটি বন্দীদের পরিবারবর্গের ভাতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসের পূর্ব্বে যে ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছিল এবং তৎপরে বৃদ্ধি করা হয় নাই এরূপ স্থলে ভাতার পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হইবে। ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৫ই এপ্রিল-এর মধ্যে যে ভাতা মঞ্জুর হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে ভাতার চার টাকা প্রতি আট আনা করিয়া বৃদ্ধি করা হইবে।

পরলোকে সুধীর কুমার বসু—

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা টাটানগরের ওয়েল-ফেয়ার অফিসার সুধীরকুমার বসু গত ৮ই জুন রাত্রে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি টাটানগরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকরূপে তাঁহার প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি নিজের অধ্যবসায় ও চেষ্টায় যশস্বী ও কৃতী হইয়াছেন সুধীরবাবু তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি।

সুধীরকুমার বসু

মাদ্রাজে ঝড় ও প্লাবন—

একটী সরকারী সংবাদে প্রকাশ গত মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঝড় ও প্লাবনের ফলে মাদ্রাজের দক্ষিণ আরকট, চেংলিপুট, চিত্তুর ও উত্তর আরকট জেলায় সহস্রাধিক পুষ্করিণী, ছয় সহস্রাধিক গৃহ ও কৃষির ক্ষতি হইয়াছে। ফসলের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। দক্ষিণ আরকটে বার জন লোকের প্লাবনের ফলে মৃত্যু হইয়াছে এবং কতক লোক আহত হইয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত পুষ্করিণীগুলির সংস্কার এবং অন্যান্য কৃষি কর্ম্মের যে সকল ক্ষতি হইয়াছে তাহার সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায় শরৎকালের পূর্ব্বেই সংস্কার কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে।

মজুদ খাদ্য সন্ধানের উদ্দেশ্য—

সম্প্রতি অসামরিক সরবরাহ সচিবের দপ্তরখানা হইতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, গত ৭ই জুন হইতে মজুদ খাদ্য উদ্ধারের জন্য প্রদেশব্যাপী অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। যে পল্লীতে আনুমানিক ১ লক্ষ ১০ হাজার লোকের বাস এই প্রদেশের ঐ সকল পল্লীতে একটী করিয়া খাদ্য কমিটী গঠন করাই কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায়। ইতিমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ পল্লী-খাদ্য কমিটী গঠিত হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে খাদ্য বিতরণ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু কোন অঞ্চলে খাদ্য-দ্রব্য উদ্বৃত্ত হইলে ঘাট্‌তি অঞ্চলে তাহা স্থানান্তরিত করিবার জন্য কেবলমাত্র সেই সকল ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন। পল্লীর খাদ্য কমিটী মজুদ খাদ্যের সন্ধান করিয়া কেবলমাত্র বণ্টন করিবেন তাহাই নহে—তাঁহাদের কার্য্যকলাপ আরও উন্নততর হইবে। বিভিন্ন জেলা হইতে ইতিমধ্যে যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে যাঁহাদের নিকট মজুদ মাল ছিল তাঁহারা স্বেচ্ছায় দরিদ্র প্রতিবেশীগণের জন্য বিতরণ করিয়াছেন।

মহিলা চিত্রশিল্পীর সাফল্য—

সম্প্রতি দক্ষিণ বারাসত গ্রামে ২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মিলনের সহিত যে শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে আড়িয়াদহ নিবাসী মহিলা চিত্র-শিল্পী শ্রীমতী দুর্গারাণী দেবীর অঙ্কিত দুইখানি চিত্র বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছে—একখানি মহাত্মা গান্ধীর ও অপর খানি ষ্ট্যালিনের চিত্র (পেন্সিল স্কেচ)। শ্রীমতী দুর্গারাণীর অঙ্কিত বহু চিত্র নানা স্থানে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

শিল্পী হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

শিল্পীচক্রের বিশিষ্ট সদস্য এবং সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত গত ৭ই শ্রাবণ সত্তর বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। হুগলী জেলার কনাই বেগমপুর নামক গ্রামে ১২৮০ সালে তাঁহার জন্ম হয়। শিল্পের প্রতি স্বাভাবিক অনুপ্রেরণাবশে নিজের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং যথাসময়ে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সুপ্রসিদ্ধ "দি ল্যাজারাস এণ্ড কোম্পানী"র ফার্ণিচার ডিজাইনারের পদ গ্রহণ করেন।

কর্ম্মজীবনে অবসর পাইলেই তিনি ছবি আঁকিতেন। পুরাতন ভারতবর্ষ ও মানসী মর্ম্মবাণীর পাতা উল্টাইলে তাঁহার আঁকা অনেক ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ম্মস্থলে তিনি অপূর্ব্ব কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

পথ্যাপথ্য বিচার

শ্রীজীবনময় রায়

ক্ষয় রোগের (Wasting disease) পথ্য (ক)

আজকাল ত যক্ষ্মা বা যক্ষ্মা ব'লে সন্দেহ হয় এমন রোগী প্রায় অনেক পরিবারেই দেখা যায়। তা ছাড়া জানা বা অজানা নানা কারণে মানুষ ক্ষয় হ'য়ে দুর্ব্বল হয়ে পড়তে থাকে। এই সব রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা (যাঁরা তাদের সেবা করেন) তাদের পথ্য নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েন। তাদের রুচি আর হজমশক্তি দুইই বজায় রেখে তাদের কি যে খেতে দেবেন এই নিয়েই হয় সব চেয়ে মুস্কিল।

যক্ষ্মা বা যে কোনো রকম ক্ষয় রোগে মানুষের রক্ত মাংস মজ্জা অস্থি শুক্র ও রসক্ষয় হ'য়ে থাকে, আর মানুষ ক্রমে একটু একটু ক'রে রোগা আর দুর্ব্বল হ'য়ে যায়। "ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ" সমস্ত ধাতুর ক্ষয় হ'য়ে মানুষ শুকিয়ে যায়। তবেই দেখা যাচ্ছে যে এই শুকিয়ে দুর্ব্বল হ'য়ে যাওয়া যাতে বন্ধ করা যায় এমন সব খাবার রোগীর জন্যে আমাদের বেছে নিতে হবে। কিন্তু মুস্কিল এই যে পোষ্টাই খাবার যা কিছু আছে তা প্রায়ই হজম করা শক্ত। যেমন ঘি দুধ মাছ মাংস ডিম ডাল এই সব। আর একথা ত সহজেই বুঝিতে পারি যে যতটুকু আমরা পুরোপুরি হজম করতে পারি সেইটুকুই কেবল আমাদের গায়ে লাগে; আর খাবার খেয়ে যেটুকু আমাদের হজম হয় না, (তা সে যত ভাল আর যত দামী খাবারই হোক না কেন) সেই বদহজম-হওয়া-খাবার আমাদের শরীরের ক্ষয় করে। আয়ুর্ব্বেদে হজম-না হওয়া (অজীর্ণ)কে সব রোগের মূল বলেছেন। তাই—

> সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনং।
> তস্মাৎ যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেশ্চ প্রতিপালনং।

মোটামুটি মানে হোলো যে, হজমের শক্তি ঠিক রাখাই চিকিৎসার আসল জিনিষ। তাই যিনি বুদ্ধিমান আর পাকা চিকিৎসক তিনি কতকগুলো পুঁথিপড়া ওষুধ গেলানোর চেয়েও সকলের আগে রুচি আর হজম শক্তিটাকে বাঁচিয়ে রাখার দিকে মন দিয়ে থাকেন। আর তার মানেই হোলো খুব সাবধানে বিবেচনা ক'রে সুপথ্য ঠিক ক'রে দেওয়া। "যা হজম হয় তাই খেতে দেবেন" বলে চিকিৎসকের সব চেয়ে বড় দায়িত্বটা সেবা-যাঁরা-করেন তাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে শুধু কতকগুলো ওষুধ দিয়ে চলে যাওয়া সুচিকিৎসকের পক্ষে অধর্ম্ম। কারণ রোগীর পক্ষে কোন্‌টা ভাল বা কোন্‌টা মন্দ তা সাধারণ লোকের জানা থাকে না। সুস্থ শরীরে কোন্‌টা হজম হয় আর কোন্‌টা হয় না, সেটা খেয়ে খেয়ে দেখে নেওয়া সোজা; কিন্তু শরীর যখন খুব খারাপ আর হজমের একটু ওদিক ওদিক হ'লেই যেখানে ক্ষয় আর ক্ষতি নিশ্চয় হবে, সেখানে সেই সব পরখ ক'রে দেখবার চেষ্টা খুব বিপদের হ'তে পারে। তাই পাকা চিকিৎসক যাঁরা তাঁরা রোগী আর সেবা যাঁরা করেন তাঁদের সঙ্গে ব'সে পরামর্শ ক'রে রোগীর রুচির দিকে চোখ রেখে, সাবধানে তাঁর পথ্য বেছে দেন। আর এই জন্যে অনেকখানি সময় আর ভাবনাও তাঁরা দিয়ে থাকেন। এ না করলে চিকিৎসায় একশোর মধ্যে অন্তত পঁচাত্তর ভাগ যে ফাঁকি দেওয়া হয় তা তাঁরা জানেন। কারণ চিকিৎসায় একশোর মধ্যে অন্তত পঁচাত্তর ভাগ হল সুপথ্য; যার অভাব হলে হজম নষ্ট হয়। আর "তস্মাৎ যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেশ্চ প্রতিপালনং" কেন না "সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনং"। তাই পেটের আগুন খুব যত্ন ক'রে বাঁচিয়ে রাখতে হয়—'মন্দাগ্নি' হ'তে দিতে নেই। আর তার সব চেয়ে বড় উপায় ওষুধের বাছাই নয়—পথ্যের বাছাই।

এই পথ্য বলতে কি বোঝায় তা জানা উচিৎ। পথ্য বলতে রোগীর যা খাওয়া উচিৎ শুধু তাকেই বোঝায় না। শরীরের রোগ দূর ক'রে শরীরকে সুস্থ ক'রে তুলতে যা যা করা দরকার সব বোঝায়; যেমন ঠিক দরকার মত আর খুব সাবধান হ'য়ে, খাওয়া দাওয়া স্নান, বিশ্রাম ঘুম, পরিশ্রম, আগুন জল রোদ না লাগানো এই সমস্ত এমন কি মনের ভাবকেও ঠাণ্ডা রাখা মানে রাগ, দুঃখ, ভয়, হিংসা এই সব রোগীর যাতে না হ'তে পারে তা দেখা এই রকম সব ব্যবস্থাও রোগীর পথ্যের মধ্যে পড়ে; তাই কঠিন রোগীর সেবা যাঁরা করেন তাঁদের নিজেদেরও ঠাণ্ডা, হাসিখুসী দরদী অথচ শক্ত হবে বিবেচনা ক'রে নিজেদের দিকে চোখ রেখে রোগীকে সুপথ্য করানো আর কুপথ্য থেকে বাঁচানো আগে দরকার। রোগীর আবদার মেটাবার জন্যে অনেকে রোগীকে কুপথ্য দিয়ে কাজ সোজা ক'রে নেন আর জ্বালাতনের হাত থেকে নিজেদের বাঁচান। তাতে রোগীকে মরবার পথে ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় না। আর রোগে যে অসহায় হয়েছে বা বিবেচনা হারিয়েছে জ্বালায় বাঁচানোর জন্যে বা তার প্রিয় হবার জন্যে তাকে কুপথ্য করানোর মত পাপ আর নেই। তাই বলছিলাম যিনি সেবা করবেন তিনি যেমন নিজে বিরক্ত হবেন না, রোগীকে অসহায় শিশুর মত জেনে তাকে স্নেহ করবেন, মিষ্টি কথা বলবেন তেমনি তাকে শিশু আর অসহায় জেনেই খুব বুদ্ধি আর বিবেচনা খাটিয়ে তার আবদার পার করবেন, তাকে কুপথ্য থেকে বাঁচাবেন। এটা অনেকটা সহজ হ'য়ে আসে রোগী যদি তাঁকে প্রথম থেকেই পছন্দ করে এবং তাঁর মিষ্টি ব্যবহারে তাঁকে আস্তে আস্তে ভালবাসে। যক্ষ্মা রোগী সম্বন্ধে এই কথাটা খুব বেশী ক'রে খাটে কেন না যক্ষ্মায় প্রায়ই অনেকদিন ধরে ভুগতে হয় আর চুপ ক'রে শুয়ে পড়ে থাকতে হয়। এতে তার বিরক্তি খুব একটুতেই আসে, আর রাগ বিরক্তি বা উত্তেজনা এ রোগের সব চেয়ে বড় কুপথ্য। তাছাড়া রোগের সময় সব মানুষই একটু আবদার করতে চায়; তার কারণ সে ভুগছে জেনে লোকেরা তাকে একটু দয়া করে আর সে সেই সুবিধেটুকু কাজে লাগিয়ে নিতে ছাড়ে না। বিশেষ ক'রে, যক্ষ্মায় যে ভুগছে তার উপর মানুষের একটু বেশী মায়া হয়, "সে হয়ত বাঁচবে না" এই জেনে; তাই যক্ষ্মা রোগীরা মানুষের উপর একটু বেশী আবদার খাটায়। তাছাড়া অন্য রোগীর চেয়ে তাদেরটা মানুষও মায়া ক'রেই অনেক বেশী সহ্য ক'রে থাকে। তাই যক্ষ্মা রোগীর সেবায় অনেক বেশী বুদ্ধি আর কায়দা দরকার।

দুধ

এখন পথ্যের কথা বলি। প্রথমে যখন রোগ যাদের বাড়াবাড়ি হয়নি তাদের জন্যে মোটামুটি যে পথ্য ক্ষয় রোগের গোড়ার দিকে দরকার হবে—মানে যাদের শুধু যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়েছে আর জ্বরটর আছে, যাঁদের হজম খুব নষ্ট হয়নি, খিদে হয়, পায়খানা ভাল হয়, রুচি আছে, আর দুধ মোটামুটি হজম হয়। এর মধ্যে আবার নিরামিষ খান এমন রোগী; মাছ মাংস বা নিরামিষ আর মাছ মাংস দুইই পছন্দ করেন এমন নানা রকমের রোগী পাওয়া যায়। তা ছাড়া নিরামিষের মধ্যেও দুধ পছন্দ করেন না বা সহ্য হয় না, এমন রোগীও কম না। এদের জন্যে একে একে ব্যবস্থা দেওয়া যাক।

১। নিরামিষ—যাঁরা দুধ ভাল বাসেন আর দুধ যাঁদের সহ্য হয়। এঁদের খুব তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলা যায় অবিশ্যি যদি ভাত বন্ধ করে দুধটাকে আসল পথ্য ক'রে নেওয়া যায়। এতে ঘড়ি ধরে ৩ ঘণ্টা

পর পর দুধ দিতে হয়—যেমন ৩টা, ৫টা, ১১টা, ২টে, ৩টা, ৫টা। এই দুধের সঙ্গে চিনি ; সাবু ; (ফেটে), খইয়ের গুঁড়ো, আটা বা সুজি সিদ্ধ ; একখানা রুটি ঢেঁকি-ছাঁটা চালের অল্প ফেনভাত, একটু আলু বা রাঙা আলু সিদ্ধ, পেঁপের মোরোব্বা, শতমূলীর মোরোব্বা, চাল-কুমড়ার মোরোব্বা, দু একখানা বিস্কুট, একটু খেজুর, পাকা পেঁপে বা অন্য খুব মিষ্টি ফল (যেমন মিষ্টি কমলা লেবু, সরবতী লেবু, আঙুর, আম, মনক্কা ও মিষ্টি আপেল সিদ্ধ বা পোড়া) বদল বদল ক'রে ক'রে আর এইগুলির মধ্যে রোগীর যেগুলিতে বেশী রুচি তাই দিয়ে দিতে হয়। দুধের পরিমাণ খুব অল্প থেকে শুরু করতে হয়—যেমন, এক ছটাক ক'রে এক এক বারে। তারপর ক্রমে বাড়িয়ে প্রতি বারে আড়াই পোয়া তিন পোয়া করে দিনে চার সের দুধও হজম করানো যায়। দুধের মাত্রা বাড়ানোর সব চেয়ে নিরাপদ উপায় হচ্ছে উপযুক্ত চিকিৎসক বা যিনি দেখে দেখে শিখে নিয়েছেন এমন লোক যদি রোজ পায়খানার রং আর চেহারা দেখে দুধ হজম হচ্ছে কি না তাই দেখে দেখে একটু একটু করে দুধ বাড়াবার ব্যবস্থা করেন। দুধ পথ্য করতে হ'লে নুন খাওয়া একেবারে ছেড়ে দেওয়াই নিয়ম। তাতেই সবচেয়ে বেশী আর তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। কারণ নুন দুধের বিরুদ্ধ জিনিস। আর ক্ষয় রোগের পক্ষে দুধের মত পথ্য আর নাই। যে কোনো রকম ক্ষয় রোগে দুধ অমৃতের মত—যদি দুধ হজম করানো যায়। তাই ক্ষয় রোগে সবচেয়ে আগে দুধ-পথ্য দেওয়ার কথা ভাবতে হবে। আর দুধের মধ্যে গরু ছাগলের দুধই সবচেয়ে ভাল—তবে সহরে তা পাওয়া শক্ত।

যাদের হজম বেশ ভাল আছে অথচ যারা দুধ ভালবাসলেও নোন্তা খাবার একেবারে বাদ দিয়ে শুধু দুধ খেতে চান না তাঁদের জন্যে মোটামুটি পথ্যের একটা ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে এই ব্যবস্থা প্রত্যেক রোগীর অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে অদল বদল করে নিতে হবে। তবেও চিকিৎসক বা যাঁরা জানেন, তাঁদের দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থা করিয়ে নেওয়া উচিত, কারণ পথ্য ঠিক করাই চিকিৎসার সবচেয়ে বড় জিনিস। পথ্যের একটু গোলমাল হলেই রুচি আর হজমের ক্ষতি হয়—আর সেইটেই হ'ল আসল মরণের পথ ; কারণ ক্ষয় পোষাতে হজমই হ'ল আসল জিনিস। হজমের পরেই রুচির কথাটা ভাবতে হবে রুচি চলে গেলে ক্ষয় রোগীকে বাঁচানো মুস্কিল হয়। অরুচি আর খাবার উপর বিরক্ত, রোগী [illegible] যেন না হয়, হজমের পর সেই দিকেই নজর দিতে হবে। নীচে যে তরকারী আর মশলাগুলি দিলাম, তাই দিয়ে রোগীর পছন্দমই নানা জিনিস তৈরী করা যাবে।

১। ভাত ও ঘি ভাত—চাল, আতপ আর দুবছরের পুরনো হ'লেই ভাল। অভাবে এক বছরের পুরনো সরু আতপ, আর তারও অভাবে সরু সিদ্ধ চালও চলতে পারে। বাদশাভোগ চালই সব চেয়ে ভাল—তবু না পাওয়া গেলে যে কোনো সরু পুরনো চাল হলেই হয়। ভাল গাওয়া ঘি-ই সবচেয়ে ভাল। অভাবে খাঁটী ভয়সা ঘি। একটু চিনি, অল্প কিসমিস, তেজপাতা, আস্ত গোলমরিচ, আর সামান্য আর গরম মসলা। একটু আদা বাটা ছাড়া অন্য কোনো বাটা মসলা না। ঘিয়ের মধ্যে আস্ত মশলা কিসমিস আর চাল দিয়ে সামান্য নাড়া চাড়া করে নিয়ে আদা বাটা দিতে হবে—আদার রসই ভাল। তারপর পরিমাণ মত জল আর সৈন্ধব নুন চিনি দিয়ে ঢাকা দিতে হবে। নুন সৈন্ধব হওয়া চাই, আর যতটা কম দিয়ে চলে। এই ঘি ভাত খুব ভাল খেতে অথচ খুব সহজেই হজম হয় আর খুব পোষ্টাই। ঢেঁকী ছাঁটা চাল সবচেয়ে ভাল। ঘিটা ভাল না হলে অম্বল হতে পারে ; বদ হজমও হয়।

ঘি ভাত ছাড়াও (রোগীর রুচির দিকে নজর রেখে শুধু-ভাত বা ফেন ভাত, আর তরকারী দেওয়া যায়। কোনো কারণেই ভাতের ফেন যেন না ফেলে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে টাটকা মাখন কিম্বা সর তুলে অল্প গাওয়া ঘি ; একটু গোলমরিচের গুঁড়ো আর সৈন্ধব নুন।

২। রুটি ও লুচি, নিমকি, গজা—আটা দু তোলা, ময়দা বা যবের আটা এক তোলা, এরারুট আধ তোলা আর কাঁচকলা শুকিয়ে গুঁড়ো করে দেড় তোলা। সব মিশে ১ ছটাক। রুচির জল দিয়ে মেখে খাবার ; মত খাবার তৈরি করতে হবে। রুটি, লুচি, নিমকি কোনো মতেই যেন কড়া ভাজা না হয় অথচ বেশ সুসিদ্ধ হয়—এই জন্যে হাফ সিদ্ধ রুটী বা পরোটাও বেশ ভাল জিনিস। সুজিটা একটু সিদ্ধ করে নিলে সহজে হজম হয়। রুটী লুচি যেন বেশ ফোলে। রুটি ফুললে একটা কাঁসিতে রেখেই একটা রেকাবি চাপা দিলে রুটি বেশ নরম হয়। লুচি বা নিমকি কড়া ভাজা হ'লে হজম করতে কষ্ট হয়। আসলে কড়া ক'রে ভাজা যে কোনো জিনিস হজম করাই কষ্ট। তাই কড়া ভাজা জিনিস বাদ দেওয়াই ভাল।

৩। তরকারী—তরকারীর কয়েকটা ভাগ ক'রে দিচ্ছি : এরা পরে পরে ক্রমে অল্প গুণের। আলুটা অল্প আর বেশী দরকার মত সব সময়েই তরকারীতে ব্যবহার করা চলে। তরকারী যেন তাজা হয় আর যতটা সম্ভব কচি হয়।

(ক) কাঁচা পেঁপে, কাঁচকলা, তাজা কচি পটোল, ডুমুর, পুরাণ চালকুমড়া, মানকচু, সজিনার ডাঁটা, আমলকী, কচি পানফল, কচি তালশাঁস, পলতা, গাঁধাল পাতা, কচি বেল পোড়া, কেশুঁই, পাতি লেবু, পুরানো (অন্তত চার বছরের) তেঁতুল। (খ) সোনামুগ ডাল, কচি চালকুমড়া, কচি বেগুন, বিলাতী বেগুন (টোমাটো) কচি থোড়, ঝিঙে, ডেঙ্গোর ডাঁটা, মানকচু, গর্ভ মোচা, কচি ইচড়, চিচিঙ্গে (গ) সুসিদ্ধ আমসত্ব (১ বছরের পুরানো), মেটে আলু, ছোট কচু, দুধী কচু, কাঁঠাল বীচি, নতুন ফুলকপি, (না ভেজে বা না সাঁৎলে শুধু সিদ্ধ করে বা তরকারীর মধ্যে দিয়ে), উচ্ছে, ব্রাহ্মীশাক, রাঙা আলু।

৪। ফলের মধ্যে—খেজুর, বেদানা, আঙুর, মিষ্টি ডালিম, মনক্কা, আমলকীর মোরোব্বা, আম, কচি পানফল, কচি তালশাঁস, সব রকম লেবু। লেবু ছাড়া অন্য ফল কোনোটা যেন টক একটুও না হয়।

৫। মশলা—সরষে আর লঙ্কা ছাড়া প্রায় সব মশলাই ব্যবহার করা যায় যদি (১) বেটে গুলে ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে নেওয়া যায় (২) যদি আস্ত এমনভাবে ব্যবহার করা যায় যে খাওয়ার সময় বাদ দেওয়া চলে (৩) মশলা পোঁটলা ক'রে বেঁধে সিদ্ধ ক'রে যেমন 'আখনির' জল করে তেমনি করে নেওয়া যায় তারপর সেই জল দিয়ে রান্না করা যায় গাওয়া বা ছাগলের ঘিই সবচেয়ে ভাল অভাবে খাঁটি ভয়সা ঘি। সামান্য পেঁয়াজ বা আদা।

৬। রান্না সবসময়ই মেটে হাঁড়ি ও কড়াতে করতে হবে। তা নইলে পেটের নানা রকম গোলমাল হবে যার কারণ হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এবার কোন কোন জিনিস একেবারে চলবে না সেইটে বলি। মনে রাখতে হবে যে যারা দুধ পথ্য করছে, মাছ মাংস খায় না আর মোটামুটি হজমশক্তি যার নষ্ট হয়ে যায় নি তাদের জন্যেই এই ব্যবস্থাটা। অন্যদের কথা পরে পরে ক্রমে আসবে। অবিশ্যি এরই মধ্যে ধারবিচার ক'রে অনেক রোগীরই সুন্দর পথ্য করা যাবে। রোগীর সবচেয়ে বড় দরকার প্রত্যেকটি গ্রাস যথেষ্ট পরিমাণে চিবিয়ে খাওয়া ; আর রাঁধুনীর চাই কুপথ্য না দিয়েও রোগীর জিভকে খুশী করা। মাখন তোলা ঘোল জিরে ভাজার গুঁড়ো দিয়ে খেলে খুব রুচি খোলে আর হজমও ভাল হয়।

অপথ্য—সন্ধ্যের পর কোনো বড় খাওয়া ; আধকাঁচা বাটা মশলা ; বাসী ভাত তরকারী ; কোনো প্রকার ভাজা পোড়া জিনিস ; দুধ, তরকারী ; একাধিকবার জাল দেওয়া দুধ (দুধ গরম জলে বসিয়ে আবার গরম ক'রে নিতে হয়)। এলুমিনিয়মের বা তামা এনামেলের বাসনে খাওয়া ; প্রস্রাব বাহ্যি পেলে চেপে রাখা, রাগ, আগুনের বা রোদের আঁচ, কোন রকম

পরিশ্রম ; তামাক টামাক ; হিম, বৃষ্টির ছাঁট, পুবে বাতাস ; বদ্ধ ঘর ; চেঁচামেচি ; ঠাণ্ডা জলে স্নান ; না-ফোটানো জল খাওয়া (গরম ফোটানো জল ঠাণ্ডা করে খেতে হয়)। ডাল বা ডালের তৈরী খাবার ; লঙ্কা, তেল, শিম, শাকপাতা, টক (লেবু আর পুরনো তেঁতুল খাওয়া যায়), বেশী নুন, কাঁকরোল, শালগম, কাঁকুড়, বাঁধাকপি, বড়ি, কড়া ভাজা জিনিস ; দই, ঘি, বেশী পেঁয়াজ।

এবার কাঁচ কলা আর কাঁচা পেঁপের কথা আর একটু ব'লে এবারকার মত শেষ করব। গাছ থেকে পাড়া পেঁপে তখনি কেটে তার আঠা মানে সাদা দুধের মত জিনিসটা রোজ খালি পেটে পাঁচ ছ ফোঁটা খাওয়ালে হজমের খুব উপকার হয়। কাঁচা পেঁপে কুরিয়ে ঘিয়ে অল্প ভেজে চিনি দিয়ে মোহন ভোগ করে দেওয়া যায়। খেতে বেশ ভাল আর সহজে হজম হয়। পেঁপে কোরা দুধে চিনি দিয়ে জল দিয়ে সেদ্ধ ক'রে বেশ পেঁপের সন্দেশ হয়। তাও বেশ ভাল খেতে।

কাঁচকলা একটা খুব পোষ্টাই খাবার যা খুব সহজে হজম হয়, আর এতে রক্তের লাল জিনিসটা বাড়ায়। সবরকম রোগীকেই কাঁচকলা কিছু কিছু দেওয়া দরকার। কেননা আমাদের শরীরের ক্যালসিয়ম ঘাটতি ঘোচাতে কাঁচকলার জুড়ি আর তরকারী নেই, আর ক্যালসিয়ম ঘটিত অপচয়ে অনেক রকমের শক্ত রোগই হ'য়ে থাকে।

কাঁচকলার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের একটা ধারণা আছে যে কাঁচকলা খেলে কোষ্ঠ এঁটে যায়। কাঁচকলা লোহার কড়াইয়ে রাঁধলে তা কতকটা হয় বটে কিন্তু মাটির হাঁড়ি পাতিলে কাঠের হাতা দিয়ে রাঁধলে তা হয় না। নিয়ম ক'রে কাঁচকলার গুঁড়ো, রোজ বেশ খানিকটা ক'রে খেলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, পায়খানা পরিষ্কার হয়, হজম শক্তি বাড়ে, অম্বলের অসুখ ভাল হয়। আলো চাল, দুধ আর কলা এই যে বিধবার পথ্য এইই হোলো সেরা পথ্য।

টাটকা কাঁচকলার খোসা ছাড়িয়ে, কুচি কুচি ক'রে, রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করতে হয়। তারপর পরিষ্কার বোতলে ছিপি এঁটে রেখে দিলে গোনের দিন বেশ ভাল থাকে।

আটার, ময়দার, সুজির সঙ্গে মিশিয়ে এই কাঁচকলার গুঁড়ো দিয়ে রুটি লুচি মোহন ভোগ বেশ ভাল হয়। তরকারীতে ঐ গুঁড়ো দিলে ঝোল খুব ভাল খেতে হয় আর ঘন হয়। এতে ভিটামিন 'এ' ও 'সি' বেশ অনেকখানি আছে।

দুপুরে আর সন্ধে বেলা মোটামুটি এই দুবার খাওয়াটা আমাদের একটু বেশি হয়। তাই খাবার পর বেশ খানিকটা দুধ চুমুক দিয়ে খেলে খুব উপকার হয়। এতে খাবার পর পেটের মধ্যে যে গরম বা জ্বালাপোড়া হয় তা ঠাণ্ডা হয়, আর রোগা শরীর মোটা হয়। মধুরেণ সমাপয়েৎ। মধুর (মানে মিষ্টি) আহারের জিনিসের মধ্যে দুধই সব চেয়ে উপকারী আর স্নিগ্ধ। সূর্য্য ডোবার আগেই বড় খাওয়া খেয়ে নেওয়া উচিৎ। তাতে হজম ভাল হয়। রাত্রে একটু দুধ মিষ্টি খেলেই চলে।

আবার বলছি রোগী যেন বেশ তৃপ্তি ক'রে আর খুব চিবিয়ে খায় সে দিকে মন দেওয়া চাই।

(২) ক্ষয় রোগে পথ্য

ক্ষয় রোগে দুধ-পথ্যই সব চেয়ে ভাল, যদি দুধ সহজে হজম হয়। কেউ কেউ আছে যারা মাছ মাংস ডিম খায় না অথচ—আবার যাদের দুধও সহজে হজম হয় না। দুধ যাদের হজম হয় না আর অম্ল ক'রে হজম করানো যায় তাদের পথ্যের কথা বলেছি। দুধ যাদের সহজে হজম হয় না তাদেরও কয়েকটি উপায়ে দুধ হজম করানো যায় ; কিন্তু তার সব উপায় খুব ভাল না। যে যে উপায়ে দুধ হজম করানো হয় তার মধ্যে খুব চলতি দু'একটা বলছি, যা ভাল না ; আর খুব দায়ে না পড়লে যা করা উচিৎ না। যেমন (এক) সাইট্রেট অব সোডা মিশিয়ে (দুই) চুনের জল মিশিয়ে (৩) বাইকার্বনেট অব সোডা দিয়ে, এই রকম সব। এরা সব ক্ষার ; শরীরের কিছু ক্ষয় না ক'রে দিয়ে নিজে নিজেই এরা হজম হ'তে যায় না। এই জন্যে যক্ষ্মা রোগীকে সোডা মেশানো হজমী-ওষুধ হজমের জন্যে ক্রমাগত দেওয়া খারাপ।

অনেকে দুধটাকে অনেকক্ষণ ফুটিয়ে দেন, অনেকে আবার দুধটা যতবার খান ফুটিয়ে দেন। এই দুটোতেই দুধ হজম করতে কষ্ট হয়, পেটে বাতাস হয়, পায়খানা ছাকড়া ছাকড়া হ'তে পারে। খাঁটি দুধের আট ভাগের এক ভাগ জল মিশিয়ে (যেমন এক সের দুধে আধ পোয়া জল) এক বলক ফুটিয়ে খেতে দেওয়া উচিৎ। দুধ উৎলালেই নামিয়ে ফেলতে হয়। বার বার বা অনেকক্ষণ রোগীর দুধ ফোটালে হজম করার অসুবিধে হয়। রোগী গরম দুধ বা অন্য কিছু খেতে চাইলে ফুটন্ত জলের মধ্যে বসিয়ে দুধ বা অন্য কিছু গরম ক'রে দেওয়া উচিৎ। নইলে ঠাণ্ডা দুধ বা পথ্যও ভাল। এক বলক দুধও যাদের হজম করতে কষ্ট হয়—এমনকি খুব অল্প মাত্রাতেও হজম হয় না তাদের দুধের সঙ্গে, বার্লি, সাগু, এরারুট, খইয়ের গুঁড়ো বা ন্যাকড়া ছাঁকা ভাত মিশিয়ে চিনি দিয়ে দিতে হয়। তারপরও যদি অসোয়াস্তি লাগে তবে খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেলে হজম হবে। বেশ পুরনো চাল কুমড়ার ঘরে তৈরী করা বা খুব ভাল জানা দোকানের মোরাই বা মোরব্বা বেশ ভাল জিনিস। পুরনো চালকুমড়া পথ্য আর ওষুধ দুইই। কাঁচা পেঁপের আর আমলকীর মোরব্বাও ভাল। শতমূলীর মোরব্বা বেশ ভাল জিনিস। চাল কুমড়া আর শতমূলী খুব পোষ্টাই। দুধের সঙ্গে এই সব অল্প অল্প দিলে দুধ হজম করবার সুবিধে হয়।

এতেও দুধ যাদের হজম হ'তে চায় না অথচ মাছ মাংস ডিম খায় না বা তা আরো কম হজম হয় তাদের কি ব্যবস্থা হ'তে পারে? তাদের দুধে অন্য কোনো কিছু ক'রে দিলে হজম হয় কি না দেখতে হয়। যেমন—

(এক) ঘোল। এই ঘোল নানা রকমের হয়। পরপর যে ঘোলের নাম দিচ্ছি তাদের একটার চেয়ে আর একটা ক্রমে ক্রমে সহজে হজম হবার মত ক'রে তৈরী। এদের নাম আয়ুর্বেদ থেকে তুলে দিচ্ছি—ঘোলস্তু মথিতঃ তক্রমুদশ্বিচ্ছচ্ছিকাপি চ—মানে, (ক) ঘোল (খ) মথিত (গ) তক্র (ঘ) উদশ্বিৎ ও (ঙ) ছচ্ছিকা এই পাঁচ রকমের ঘোল। ঠিক মত 'সাজা' দিয়ে অন্তত বারো ঘণ্টা দই বেশ জমাট করে বসিয়ে—জল কেটে যাবার আগে সেই দই ঘোলের জন্যে নিতে হয়। তাড়াতাড়ি (আগুনের উপর বসিয়ে বা অন্য কোনো রকমে) পেতে সেই দই বা তার ঘোল খাওয়া খারাপ। ঘোল মেড়ে মাখন আলাদা ক'রে নিলে তবে রোগীর পথ্য হয়।

(ক) দইয়ের সরশুদ্ধ নির্জলা দই ঘেঁটে নিলে তাকে 'ঘোল' বলে। চিনি দিয়ে এই ঘোল খাওয়া খুব পোষ্টাই। তবে রোগীর পক্ষে হজম করা একটু শক্ত। যে হজম করতে পারে তার পক্ষে ত খুবই ভাল। এই ঘোল বায়ু আর পিত্ত কমায় কিন্তু একটু কফ বাড়ায়।

(খ) দইয়ের সরটুকু তুলে নিয়ে নির্জলা দই ঘেঁটে নিলে তাকে বলে মথিত। এতে কফ আর পিত্ত কমে কিন্তু একটু বায়ু বাড়ে।

(গ) দইয়ের চারভাগের এক ভাগ জল (যেমন একপোয়া দই আর এক ছটাক জল) দিয়ে ঘাঁটালে হয় তক্র। ঘোলের মধ্যে তক্র রোগীর পক্ষে সব চেয়ে উপকারী। এতে খিদে বাড়ায় ; পেটের অসুখ নষ্ট করে ; সহজে হজম হয় ; বায়ু নষ্ট করে অথচ পিত্ত বাড়ায় না ; খুব বল করে ; মুখের অরুচি নষ্ট করে (অরুচিতে সাদা জিরে ভাজার গুঁড়ো দিয়ে খাওয়াতে হয়)। এতে কফেরও উপকার হয়। কফ নষ্ট করা আর আরো সহজে হজম করানোর জন্যে, 'তক্রে'র মাখন তুলে নেবার পর, একটু লোহা ছেঁকা দিয়ে নিতে হয়—মানে, একটা খুন্তির কোণা কিম্বা

বড় পেরেক কি ঐরকম লোহার একটা কিছু আগুনে লাল ক'রে 'তক্র'র মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হয়। এই 'তক্র'র অনেক গুণ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে—

ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণাং অমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ।

মানে, 'তক্র' পান যে করে তার কোনো কষ্ট হয় না ; কোনো রোগ হয় না। দেবতারা অমৃত পান করে যেমন সুখী হন, মানুষ তক্র পান ক'রে সেই রকম সুখী হয়।

(ঘ) উদশ্বিৎ তৈরী হয় অর্দ্ধেক দই আর অর্দ্ধেক জলে ঘুঁটে। এতে কফ বাড়ায়। তাই মাখন তুলে নিয়ে, লোহা ছেঁকা দিয়ে ত্রিকূট চূর্ণ (গোলমরিচ, শুঁঠ, পিপুল সমান ভাগে চূর্ণ) দিয়ে খেতে হয়। এতে গ্লানি দূর করে।

(ঙ) ছচ্ছিকা—এতেও কফ বাড়ায়। পিত্ত বায়ু নাশ ক'রে। শ্রম দূর করে। শরীর ঠাণ্ডা রাখে। ছচ্ছিকা তৈরী করা হয় অনেক জল দিয়ে। গায়ে জ্বালা থাকলে ছচ্ছিকায় খুব উপকার হয় ; পিপাসা বেশী থাকলেও বেশ উপকার হয়।

দইয়ের মাখন তুলে নিয়ে ঘোল করলে খুব সহজে হজম হয়। তাই পথ্যেও লাগে। যে ঘোলের মাখন তোলা হয় নি, তা সহজে হজম করা ক্ষয় রোগের ক্ষেত্রে শক্ত। কিন্তু যে হজম করতে পারে তার শরীরে বেশ পুষ্টি হয়। ঘোলের মাখন পুরোপুরি তুলে নিয়ে ঘোল আলাদা আর মাখন আলাদা ক'রে খেলে খুব ভাল হয়। তাতে হজম করা কিছু সহজ হয়।

আমরা যে ঘোল তৈরী ক'রে খাই তাকে ঠিক ঘোল বলা চলে না। খানিকটা জলে দই গুলে খাওয়াকে ঘোল বলে না। দই এমন ক'রে নাড়া চাই যাতে মাখনটা সবটা আলাদা হ'য়ে আসে। এই ঘোল দই থেকে একেবারে অন্য গুণের জিনিস হ'য়ে পড়ে। দই ভাল ক'রে নাড়াই না করলে রোগী পেটে হজম করা শক্ত হয়। অম্বল হয়, পেটে বাতাস হয়, পেট ভার হ'য়ে থাকে, এই সব হয়। অথচ ঘোল ঠিক মত তৈরী ক'রে রোগ হিসেবে অনুপান বা গুঁড়ো ছড়িয়ে খেলে (কবিরাজিতে বলে প্রক্ষেপ) কোনো অসুখ বা অসোয়াস্তি হবার কথা নয়। মাখন তোলা লোহা ছেঁকা ঘোল খুব হালকা। এতে বায়ু পিত্ত কফ তিনটের উপকার হয় ; পেট পাৎলা থাকলে বা আম থাকলে রোগের কম বা বেশী বেগে একটু ন্যাকড়া ছাঁকা ভাত, বার্লি বা এরারুট দিয়ে খাওয়াতে হয়।

বায়ু দমনের জন্যে শুঁঠের গুঁড়ো আর সৈন্ধব নুন দিয়ে টক-ঘোল খেতে হয়।

পিত্ত দমনের জন্যে চিনি দিয়ে মিষ্টি ক'রে ঘোল খাবে।

কফ নষ্ট করার জন্যে সমান সমান গোলমরিচ, পিপুল, শুঁঠের গুঁড়ো (ত্রিকটু) মিশিয়ে খেতে হয়।

হিং, জিরে ভাজার গুঁড়ো, আর সৈন্ধব নুন দিয়ে ঘোলে বায়ু নষ্ট করে, রুচি আনে, পুষ্টি যোগায়, বল করে। অর্শ আর আমাশয়ে ঘোল অমৃত। প্রস্রাব কম হ'লে পুরাতন (অন্ততঃ ১ বছরের) গুড় দিয়ে আর রক্তশূন্য চেহারা হ'লে চিতা মূলের গুঁড়ো দিয়ে ঘোল দিলে উপকার হয়।

ক্ষয় রোগে কিন্তু বেশী হিং খাওয়া অপকারী—পথ্য করার মত সামান্য হিং দেওয়া যায়। চিতামূল ও ক্ষয় রোগে খারাপ।

এই গেল ঘোল পথ্য করার কথা।

(দুই) চতুর্থাংশ জলে সিদ্ধ দুধ। এর মানে দুধ যতটা তার চার গুণ জলে আগে মিশিয়ে তার পর কড়াইতে চড়াতে হবে। তারপর জলটা যখন মরে গিয়ে শুধু দুধটা থাকবে তখন নামিয়ে নিতে হবে। যেমন দুধ যদি হয় এক সের, জল মেশাতে হবে চার সের। জ্বাল দিতে দিতে যখন আবার এক সেরে এসে দাঁড়াবে তখন নামিয়ে নিতে হবে। দুধটা ঐ রকম করে জ্বাল দিয়ে খেতে লাগতে হবে।

এই দুধ পাকা কবিরাজ মশায়রা আমরক্ত রোগীর শেষ দশাতেও দিয়ে থাকেন। কেননা, দুধটাই আমাদের শরীরের পক্ষে অমৃতের মত অথচ ঐ রকম দুধ হজম করাতে কষ্ট হয় না। এই দুধ জ্বাল দিতে অনেক সময় লাগে। লোকের ধৈর্য্য থাকে না। তাই অনেক চাকর বাকর নানা রকম ফাঁকি দেয়। তাতে খুব ক্ষতি হ'তে পারে।

সদ্য দোয়া অবস্থায় দুধটা গরম থাকে ; তাকে বলে ধারোষ্ণ দুধ। এই দুধ আর জল কি মিছরির জল কিম্বা চিনির জল মিশিয়ে খেলেও খুব সহজে হজম হয়। তবে চারগুণ জল দিয়ে জ্বাল দেওয়া দুধের মত এই দুধ হালকা হয় না।

ছানা। নরম ছানা আর ছানার জল দুটোই ভাল। চিনি দিয়ে খেতে হয়, টাটকা। খাতা দিয়ে বা সাত বাসটে ছানার জল দিয়ে ছানা কাটালে তা রোগীর অপথ্য হয়। পাতি বা কাগজী লেবুর রস একটা পাথর বাটিতে (কাঁচের চীনে মাটীর বা এনামেলও চলে) রাখুন। দুধটা ফুটে উঠলে নামিয়েই ঐ রস দিন তারপর ঠাণ্ডা হ'তে দিন।

ক্ষয় রোগ খুব ভয়ানক রোগ। তার পথ্য নিয়ে কোনো রকম অসাবধান হওয়া চলে না। অনেক টাকা খরচ ক'রে ডাক্তার ডেকে ওষুধ খাইয়েও কখনো জানিত-ভাবে কখনো অজানতে এই পথ্যের গোলমালে আমরা রোগীদের মরণের কারণ হই। কখনো কখনো রোগীর ভিতরের যন্ত্র সব এত দুর্ব্বল থাকে যে একবারের সামান্য অত্যাচারের ফলেই আমাদের অজানতেই কখন খারাপ হয়ে যায়। তারপর ক্রমে খারাপ হ'য়ে ওঠে ; আর সামলানো যায় না। কত সময় আত্মীয়স্বজনকে বলতে শোনা যায় "কত খরচ করা গেল, বড় বড় ডাক্তার, হাওয়া বদল, ওষুধ, পথ্য সেবা যত্ন কিছুতেই কিছু করা গেল না। বেশ চলছিল ; হঠাৎ কি যে হোলো! পেটটা গেল খারাপ হ'য়ে, ভয়ানক অরুচি, কিছু মুখে দিতে পারে না—" এই সব নানা হা হুতাশ। এর বেশীর ভাগই পথ্যের গোলমালে হয়। কতক হয় না-জানার দরুণ, আর কতক অসাবধান হওয়ার জন্যে। এই রোগের সঙ্গে চালাকি চলে না। কোনো জিনিস রোগীর উপর পরখ ক'রে দেখতে গেলে খুব বেশী সাবধান হওয়া চাই।

নুনটা দুধের বিরুদ্ধে। দুধ পথ্য করতে হ'লে নুন খাওয়া বন্ধ করাই সব চেয়ে ভাল। নিতান্ত না পারলে, বিটনুন, সৈন্ধব নুন (যত অল্প দিয়ে চলে) এর রান্না। মাছ বা মাংসের সঙ্গে দুধ খুব বিরুদ্ধ—হজম করা খুবই শক্ত। যে বেলা মাছ মাংস দেওয়া হবে সে বেলা দুধ দেওয়া হবে না। মাছ মাংস পুরোপুরি হজম হ'লে দুধ দেওয়া চলবে, কিম্বা দুধ একেবারে হজম হ'য়ে গেলে মাছ মাংস খাওয়া চলবে। যদিও মাছ মাংস খাওয়া যায় না তাদের কথাই উপরে বলেছি, তবু সাবধান করবার জন্যে দুধের পেটে মাছ মাংস না-খাওয়ার কথা এটুকু বললাম।

হজমের শক্তি ঠিক না থাকলে ক্ষয় রোগের চিকিৎসা করা এক রকম অসম্ভব। তাছাড়া বদহজম বা অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপসিয়া যাঁদের আছে তাঁরাও সহজেই উপরে লেখা পথ্যের মধ্যে থেকে নিজের দরকার মত পথ্য বেছে নিতে পারবেন।

খেলা ধুলা

[illegible] চট্টোপাধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

আউট সাইড খেলোয়াড় ঃ

গতিবেগই আউট সাইড খেলোয়াড়দের প্রধানতম যোগ্যতা। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য আউট সাইড খেলোয়াড়দের নিয়মিত অনুশীলন আবশ্যক।

নির্ভুল 'কিক' ঃ

পরবর্তী যোগ্যতা নির্ভুল ভাবে বল সট করা। প্রকৃতপক্ষে যে কোন অবস্থা (Position) থেকে নির্ভুল বল সট করবার দক্ষতা আউট সাইড খেলোয়াড়ের থাকা উচিত। ইনসাইড খেলোয়াড়ের একটা সুবিধা সে বাম কিম্বা ডান দিকের যে কোন দিকে বল পাশ করতে পারে কিন্তু আউট সাইড খেলোয়াড় মাত্র এক দিকেই বল পাশ করতে বাধ্য একদিকে টাচ লাইন (Touch Line) তাকে প্রতিরোধ করছে বলে। বিপক্ষদলের গোলের দিকে বল পেয়ে আউট সাইড খেলোয়াড় সাধারণতঃ দুটো পন্থা অবলম্বন করতে পারে। হয় বল 'ড্রিবল' ক'রে ব্যাককে অতিক্রম ক'রে গোলে সেণ্টার কিম্বা বল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোলের মুখে সেণ্টার করতে পারে। ব্যাক যদি এগিয়ে আসতে পারে তাহলে আউট সাইড খেলোয়াড়কে বাধা দেওয়ার কাজে খানিকটা সুবিধা সে লাভ করবে। ব্যাক সাধারণতঃ গোল এবং আউট সাইড খেলোয়াড়ের মধ্যিখানে নিজের স্থান (Position) বেছে নিবে। এবং এই স্থান থেকেই আউট সাইড 'ড্রিবল' করতে চেষ্টা করলে তাকে কেবল বাধাই (tackle) দিবে না সঙ্গে সঙ্গে তার সেণ্টার করবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা প্রতিরোধ করতে পারে। সুতরাং ব্যাকের বলটি প্রতিরোধের চেষ্টা করার পূর্ব্বেই আউট সাইড খেলোয়াড় বলটি সেণ্টার করবে। এই পন্থাটি খুবই সহজ, আউট সাইড খেলোয়াড় Position নিয়ে বলটি সেণ্টার করবার সময়ও পাবে।

'ফাষ্ট টাইম সেণ্টার' ঃ

কিন্তু আউট সাইড খেলোয়াড়কে বল পেতে দেখে ব্যাক বাধা দিতে ছুটে এলেই আর এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করা চলবে না, এক সেকেণ্ডের বিলম্বে খেলার সমস্তখানি মোড় ঘুরে যেতে পারে। যে ভাবেই সে থাকুক না কেন সেই মুহূর্ত্তেই বলটিকে সেণ্টার করা তার উচিত। প্রচুর অভ্যাস না থাকলে নির্ভুল বল সেণ্টার তার পক্ষে অসম্ভব। তবে অভ্যাসের ফলে 'টাচ লাইনে'র সঙ্গে সমকোণ রেখেও (right angle) দৌড়ান অবস্থায় নির্ভুল সেণ্টার করবার দক্ষতা সে একদিন অর্জন করতে পারবে।

আউট সাইড খেলোয়াড় যে ভাবের কোণ (angle) নিয়েই অগ্রসর হউক না কেন তাতে কোন যায় আসে না। কিন্তু এমন ভাবে বলটি কিক্ করবে যাতে করে বলটি আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সরল ভাবে গিয়ে লক্ষ্য স্থানে পৌঁছায়।

প্রচণ্ড 'কিক্'-এর সঙ্গে নির্ভুল কিক্-এর তফাৎ অনেকখানি। অনেক খেলোয়াড় দেখা যায়, যারা সমস্ত শারীরিক শক্তির সাহায্য না নিয়ে বল সেণ্টার করতেই সক্ষম হয় না। মাঠের একদিক থেকে অন্য দিকের দূরত্বে বল পাঠাবার সময় প্রচণ্ড 'কিক্'-এর প্রয়োজন। কিন্তু ইনসাইড খেলোয়াড় কিম্বা সেণ্টার ফরওয়ার্ড দশ পনের গজের দূরত্ব থেকে আউট সাইডের প্রচণ্ড কিক্ থেকে কোন কিছু আশা করতে পারে না। এক্ষেত্রে শক্তির অপব্যয় হয়; নির্ভুল সটই একমাত্র উপযোগী। কোন কোন সময়ে গোলের মুখে এত বেশী রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ভিড় হয় যে, আউট সাইড খেলোয়াড় গোল লক্ষ্য করতে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করে। এরূপ অবস্থায় বলটি পাশ করাই উচিত। কিন্তু পূর্ণ গতিবেগে ছুটে এসে বলটি পাঁচ গজ দূরের সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে পাশ করতে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়না, মাত্র একটু স্পর্শেই সেণ্টার ফরওয়ার্ডের

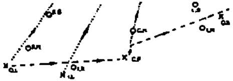

১নং চিত্র

'ক্রস ফিল্ড পাশ' (Cross field pass) : একদিকের উইংয়ে রক্ষণভাগের অনেক খেলোয়াড় সমবেত হলে বিপরীত দিকের ফাঁকা উইংয়ে বল পাঠানো অনেক কার্য্যকরী। ১নং চিত্রে XOL অর্থাৎ একদলের লেফট আউট তার দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে বল পাশ দিয়েছে। সেণ্টার ফরওয়ার্ড বলটি আউট সাইডকে দিয়েছে। অনুশীলন খেলায় ইনসাইড খেলোয়াড়রা এই শ্রেণীর পাশ' অভ্যাস করবে। 'X' এবং 'O' দুইটি বিভিন্ন দলের নাম। বলের গতির চিহ্ন - - - - - - এবং খেলোয়াড়দের গতির চিহ্ন.......... ।

কাছে বলটি পাঠানো যায়। কিন্তু পূর্ণোদ্যমে ছুটে এসে কি ভাবে আস্তে বলটি ঠিক্ করবে সেটাই হ'ল সমস্যা।

সেণ্টার হাফকে আকর্ষণ :

হাফকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে আউট সাইড খেলোয়াড় বলটি পাশ করার পূর্ব্বে কিছুদূর 'ড্রিবল' ক'রে নিয়ে যাবে। Full-backকে আকর্ষণ করাই 'ড্রিবল' করার উদ্দেশ্য। Full-back আউট সাইডকে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হলেই যে ব্যবধান হবে তার মধ্যে বলটি নিজ দলের খেলোয়াড়কে পাশ দিবে। বলটি পাশ করার পূর্ব্বে আউট সাইড খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বলটি কেড়ে নেবার উদ্দেশ্যে বিপক্ষদলের সেণ্টার হাফ এগিয়ে আসতে পারে। সেণ্টার হাফের এই মনোভাব প্রকাশ পেলেই আউট সাইড খেলোয়াড় দলের unmarked ইনসাইড খেলোয়াড়কে বলটি পাশ দিবে এবং এই সময় তাদের unmarked অবস্থায় থাকাই বেশী সম্ভব। এ ছাড়া আরও এক সময়ে আউট সাইড খেলোয়াড়কে বিপক্ষদলের হাফ-ব্যাকদের সম্মুখীন হ'তে হয় যখন সে ব্যাককে পরাস্ত করে বল সেণ্টার করতে উদ্যত হয়।

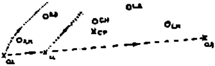

২নং চিত্র

একদলের লেফট আউট (XOL) বলটি দিয়েছে তারই দলের ইনসাইড লেফটকে। ইনসাইড লেফট দলের রাইট আউটকে বলটি দিয়েছে। কারণ XIL বলটি পেয়ে XOL কে পাশ দিতে পারে না। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা ঠিক position নিয়েছে। এক্ষেত্রে XORকে বল পাঠানোই তার ঠিক হয়েছে। ইনসাইড রাইটও ঠিক এই ভাবে দলের লেফট আউটকে বল পাশ করতে অভ্যাস করবে।

প্রথম সুযোগ :

প্রথম সুযোগেই আউট সাইড খেলোয়াড়দের বল সেণ্টার করা উচিত। বল সেণ্টার করার পূর্ব্বে গোল-লাইন (goal-line) পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ার কোনরূপ কৃতিত্ব নেই। আউট সাইড খেলোয়াড়ের পায়ে বেশী সময় বল থাকলেই বিপক্ষদলের রক্ষণ ভাগ সেই সময়ে নিজেদের ঠিক ঠিক স্থানে রেখে বলের গতি রোধ করবার সুবিধা লাভ করবে। এ ছাড়া আউট সাইড খেলোয়াড় কর্ণার ফ্ল্যাগের যত বেশী নিকটবর্ত্তী হবে বিপক্ষদল তার বল সটের গতি বুঝতে তত সহজ সুবিধা পেয়ে যাবে। 'Goal-line'-এর নিকটবর্ত্তী হয়েও যদি সে বল সেণ্টার করতে আরও সময় নেয় তাহলে বলটি তুলে সট করতে হবে নতুবা বলটি নিশ্চয় সামনে বাধা পাবে। উঁচু ভাবের সেণ্টার কোন কাজেই আসবে না যদি দলের ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়রা দীর্ঘাঙ্গী না হয় এবং বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের charge করবার শক্তি ও বল 'Head' করবার দক্ষতা না থাকে। এটা পুরোপুরি অনিশ্চিতার ব্যাপার। আরও এই যে, বিপক্ষদলের ব্যাক 'হেড' দিয়ে আউট সাইড খেলোয়াড়ের সেণ্টার ব্যর্থ করে দিতে পারে। Goal-line-এর কিছু দূরের থেকেই আউট সাইড খেলোয়াড়ের বলটি সেণ্টার করা উচিত। সেণ্টার ফরওয়ার্ড এই অবস্থায় বলটি পেলে সুবিধা এই হবে যে, বলটি সট করার পূর্ব্বে একমাত্র ব্যাককেই তাকে পরাস্ত করতে হবে। আউট সাইড খেলোয়াড় সেণ্টার করতে বেশী সময় নিলেই বিপক্ষদলের খেলোয়াড়রা পিছিয়ে আসতে পারবে। গোলের মুখ তখন সুরক্ষিত হয়ে পড়বে।

'লো' থ্রু পাশ : সেণ্টার ফরওয়ার্ড যে সময়ে ব্যাক দু'জনের মধ্যে অবস্থান করবে সে সময়ে আউট সাইড খেলোয়াড়ের কাছ থেকে 'থ্রু' পাশ খুবই কার্য্যকরী হবে। এবং সেণ্টার ফরওয়ার্ডেরও ব্যাক দু'জনের মাঝে ঠিক position নিয়ে থাকা উচিত। এই ধরণের পাশ মাঠের মধ্যিখানে (Mid-field) খুবই কাজে লাগে যখন বিপক্ষদলের রক্ষণভাগ আউট সাইডের দিকে ঝুঁকে পড়বে বলের গতি ঐদিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা ভেবে।

আর এক সময়ে ব্যাকের মধ্যে দিয়ে ফরওয়ার্ডকে দ্রুত পাশ দিলে খুবই কাজের হবে। সেই সময়ের কথাই উল্লেখ করছি। আউট সাইড খেলোয়াড় বিপক্ষদলের হাফ-ব্যাককে অতিক্রম করতে না পেরে অনেক সময় বলটি ড্রিবল করতে বাধ্য হয়ে ক্রমশঃ মাঠের মাঝখানে এসে পড়ে। খেলার এই অবস্থায় বিপক্ষ দল তার দিকে পূর্ব্বে যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলো এবার বিপরীত দিকে আক্রমণের সম্ভাবনার কথা ভেবে সে দিকেও মনোযোগ দিবে। কারণ আউট সাইড খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপরীত দিকে বলটি লম্বা সট ক'রে পাশ দেওয়া স্বাভাবিক। আউট সাইড খেলোয়াড় এমন ভাব দেখাবে যেন সে সত্যিই বিপরীত দিকে নিজ দলের আউট সাইডকে বলটি পাশ দিচ্ছে। এবং বিপক্ষদল এই ভ্রান্ত ধারণায় বিপরীত দিকের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে দু'ভাগ হলেই আউট সাইড খেলোয়াড় দুজন ব্যাকের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান দেখতে পাবে। এই ব্যবধানের মধ্যে দিয়েই বলটি 'থ্রু' পাশ দিবে সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে। বিপরীত দিকের আউট সাইড খেলোয়াড়কে পাশ দেওয়ার থেকে এই পাশই হবে বেশী কার্য্যকরী।

ইনসাইডকে ব্যাক পাশ :

আউট সাইড খেলোয়াড় কর্ণার ফ্ল্যাগের কাছে বল নিয়ে এগিয়ে গেছে; বলটি এখুনি সে সেণ্টার করবে এ কথা ভেবেও বিপক্ষদলের রক্ষণভাগ তাকে প্রতিরোধ করবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ 'ড্রিবল' করবার সময় দিতে পারে। ঠিক এই অবস্থায় গোলের মুখে বল সেণ্টার করলে কোন বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় না। কারণ ইতিমধ্যে সেখানে বিপক্ষদলের রক্ষণভাগের বহু খেলোয়াড় গোলরক্ষার জন্য সমবেত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা হচ্ছে, ইনসাইড খেলোয়াড়কে সমকোণে বলটি ব্যাক পাশ করা। কারণ তারই গোল করবার সহজ সুবিধা থাকে বেশী। এদিকে গোলের সামনে খুব ভিড় থাকায় গোলরক্ষকেরও বলের গতির উপর সঠিক ধারণা না থাকায় সে যথাসময়ে position নিতে পারে না।

সময়ের অপব্যয় :

গোললাইনের কাছে আউট সাইড খেলোয়াড়কে প্রতিরোধের জন্য ব্যাক এগিয়ে এলে সে সময় অনেক আউট সাইড খেলোয়াড়

অপ্রত্যাশিতভাবে 'হুক' করে বলটিকে পিছিয়ে এনে অপর পা দিয়ে গোলের মুখে সেন্টার ক'রে দেয়। এই কৌশলের জন্য সম্ভবত এক সেকেণ্ডের বেশী সময় নেয় না। এবং দু' গজ এগিয়ে যেতেও সময়ের প্রয়োজন মাত্র এক সেকেণ্ড। কিন্তু এই অল্প সময়ের বিলম্বতেই বিপক্ষদলের রক্ষণভাগ গোলের সামনে আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের গার্ড দেবার সুযোগ পেয়ে যায়।

এর পর বলটি যখন গোলের মুখে আসে সে সময়ে বিশেষ কিছু আশা করা বৃথা। আউট সাইড খেলোয়াড়কে ব্যাকের বাধা দিতে যাবার পূর্ব্বেই বলটি সেন্টার করা উচিত। এক সেকেণ্ডের বিলম্বে বিপক্ষদলের হাফ ব্যাক আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে উপস্থিত হয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

'লো' সেন্টার :

নিখুঁত সেন্টার সম্পূর্ণ নির্ভর করছে বলের গতিবেগের উপর এবং যে খেলোয়াড়কে বল পাশ করা হবে তারও গতিবেগের উপর। সেই সময়ের বিপক্ষদলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের অবস্থানের (position) উপর সেন্টার করার উচ্চতা নির্ভর করে। ফুটবল খেলার বিশেষজ্ঞরা বলেন, যদি নিচু ভাবে বল সেন্টার করে দলের খেলোয়াড়কে বল দিতে পারা যায় তাহলে কখনও উঁচু ভাবে বল সেন্টার করা উচিত নয়। নিচু অবস্থায় বল পেলে সহযোগী বলটিকে ড্রাইভ মেরে গোলে লক্ষ্য করতে পারবে। হেডের বল প্রতিরোধের থেকে ড্রাইভ বল প্রতিরোধ করা গোলরক্ষকের পক্ষে শক্ত হবে। একমাত্র বিপক্ষদলের রক্ষণভাগকে অতিক্রম করবার সময় ছাড়া কখনও বলটিকে lift করবে না এবং দৌড়ান অবস্থায় বল সেন্টার করার অভ্যাস সকলেরই থাকা উচিত।

সেন্টার করার উদ্দেশ্য :

অনেক আউট সাইড খেলোয়াড় মনে ক'রে গোলের মুখে বল সেন্টার করাই তাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ; সেখানে নিজদলের খেলোয়াড় থাকুক বা না থাকুক এ তাদের যেন বিবেচ্য নয়। এতে কিন্তু সব সময় ভাল ফল পাওয়া যায় না।

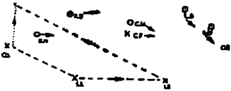

৩নং চিত্র

ইনসাইড খেলোয়াড়রা পিছিয়ে পড়লে এই ধরণের পাশ খুবই উপযোগী। XOL দলের XILকে বল পাশ করেছে। XIL বলটি দিয়েছে দলের XIRকে। ফলে খেলাটা ক্রমশঃ বাম দিক থেকে ডান দিকে চলে এসেছে। XIR বল পাবার পর ORH এবং ORB এ দুজন ব্যাক ডানদিকে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তারা এগিয়ে আসাতে XOL ফাঁকা পড়েছে। XIR এই ফাঁকা অবস্থায় দলের XOLকে বল দিচ্ছে।

আউট সাইড খেলোয়াড়ের সেন্টার থেকে যে সব গোল হয় তার বেশীর ভাগই গোলরক্ষকের ভুল বোঝার (misjudgement) দরুণ এবং খানিকটা নিজেদের সৌভাগ্যের দরুণও বলা চলে। এই ভাবের সেন্টারের উপর খুব বেশী নির্ভর করা চলে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আউট সাইড খেলোয়াড়দের এই ভাবেই বার বার সেন্টার ক'রে গোল দেবার চেষ্টা করতে দেখা গেছে। কিন্তু বিপক্ষদলের গোলরক্ষক যদি শক্তিশালী হয় তাহলে আউট সাইডের গোল করার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। উইং থেকে গোলরক্ষকের কাছে সোজাসুজি বল সট করা সময় অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। দীর্ঘাকৃ সেন্টার ফরওয়ার্ডকেও পরাস্ত করতে গোলরক্ষক হাত ব্যবহার করার সুবিধা পাবে। আউট সাইড খেলোয়াড় বলটি এমন জায়গাতে পাঠাবার চেষ্টা করবে যেখানে গোলরক্ষক নাগাল না পায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আউট সাইড বিপক্ষদলের গোলের সম্মুখীন হলে বল সট করার মোটামুটি লক্ষ্য বস্তু হবে বিপরীত দিকের কর্ণার ফ্ল্যাগ। এবং কর্ণার ফ্ল্যাগকেই লক্ষ্য ক'রে বলটি সট করলে বল সেন্টার করার উদ্দেশ্য সফল হবে।

সংলগ্ন নক্সাটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে লেফট সাইড খেলোয়াড় বিপরীত দিকের কর্ণার ফ্ল্যাগ লক্ষ্য করে বল সেন্টার করেছে। বলটি 'গোল এরিয়া' থেকে এমন দূরের স্থান দিয়ে যাচ্ছে যেখান থেকে আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের first-time সট করা যেমন অনেক সুবিধা তেমনি গোলরক্ষকের পক্ষে বেরিয়ে এসে বলটি প্রতিরোধ করা অসম্ভব।

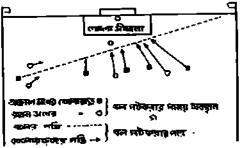

বলের গতি এবং খেলোয়াড়ের অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রাইট-সাইড-ইন গোলে সট করার সুবিধা বেশী পাচ্ছে। কিন্তু পূর্ব্ব নির্দেশ অনুযায়ী আউট সাইড রাইট যদি দ্রুতবেগে অগ্রসর হয় তাহলে তার আবির্ভাব গোলরক্ষকের কাছে যেমন অপ্রত্যাশিত হবে তেমনি তার সট থেকে গোল রক্ষা করা গোলরক্ষকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে গোলরক্ষক সহজ মস্তিষ্কে গোলে position নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। নিশ্চিত গোলের সম্ভাবনাই এতে বেশী তবে হঠাৎ ঘটনার পরিবর্ত্তনের কথা স্বতন্ত্র।

আউট সাইড খেলোয়াড় যে বলটি সেন্টার করেছে সেটিকে যদি কোন কারণে গোলে সট করা কারও পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে কিম্বা তুলে দিয়ে সেন্টার ফরওয়ার্ডকে পাশ দিতে হবে। সেন্টার ফরওয়ার্ড এই ধরণের বলের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকবে।

সেণ্টার ফরওয়ার্ড কিক্ মেরে, হেড দিয়ে কিম্বা বুক দিয়েও বলটিকে গোলে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করবে। আউট সাইড খেলোয়াড়রা কখনও ফরওয়ার্ডদের সামনে বলটি খুব দূর পাঠায় দিবে না।

অনেক সময় দেখা গেছে আউট সাইড খেলোয়াড় বল নিয়ে এত দ্রুত বেগে অগ্রসর হয়েছে যে, তার সহযোগীরা তাকে অনুসরণ করতে না পেরে পিছনে পড়ে আছে। বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে এ ক্ষেত্রে বলটি গোলে সেণ্টার করার কোন যুক্তি নেই। এ অবস্থায় আউট সাইড খেলোয়াড় বিপরীত দিকের নিজ দলের আউট সাইডকে বলটি সোজাসুজি পাঠিয়ে দিবে কিম্বা পিছনে বলটি পাশ দিবে দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে।

টাচ লাইন কখন ছাড়বে :

(১) খেলার সর্ব্বক্ষণের মধ্যে আউট সাইড খেলোয়াড় হাফ-ওয়ে লাইনের কাছে অন্ততঃ একবারও ভিতরের দিকে বল পেতে পারে। এই অবস্থায় গোলের মুখে অগ্রসর হওয়ার রাস্তা তার পরিষ্কার হয়ে যায়। কর্ণার ফ্ল্যাগের দিকে টাচ লাইন ধরে বল নিয়ে যাওয়া এ ক্ষেত্রে সময়ের এবং সুযোগের অপব্যয়। গোলের জন্য মাঠের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হ'তে তার ইতস্তত করা আর কোন মতেই উচিত হবে না।

(২) উইংম্যান আইনতঃ মাঠের মধ্যিখানে টাচলাইনের অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করবে। কিন্তু গোলের নিকটে সর্ব্বদাই ভিতরের দিকের খেলায় যোগ দিবে এবং গোলের সুযোগ লাভের জন্য ভিতরে প্রবেশ করবে। আউট সাইড খেলোয়াড় বলটিকে কাটিয়ে গোলে সট করবে। ব্যাককে কাটিয়ে বল নিয়ে আসার সহজ উপায় ভিতরের দিকে বল টেনে আনা। বাইরের দিকে অর্থাৎ টাচ লাইন কিম্বা গোল লাইনের দিকে অগ্রসর হ'লে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হ'বে। আউট সাইড খেলোয়াড় 'outward dodge'এ এতই অভ্যস্ত যে তার অভিপ্রায় পূর্ব্ব থেকেই বুঝতে পেরে বিপক্ষদল সতর্ক হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া আউট সাইডের এখানে উদ্দেশ্য বলটি সেণ্টার না ক'রে গোলের নিকটবর্ত্তী হয়ে সট করা। এবং এই উদ্দেশ্যে সে 'inner foot' ব্যবহার করতে পারবে। আউট সাইড নিকটবর্ত্তী গোলপোষ্টের ধারে ভিতরের দিকে বল লক্ষ্য করলে গোলরক্ষককে এক মস্ত সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। গোলরক্ষক বাধ্য হয়ে আউট সাইডের নিকটবর্ত্তী গোলপোষ্টের ধারে position নিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হবে কারণ ঐখান দিয়েই গোলের মধ্যে বল প্রবেশের নিশ্চিত সম্ভাবনা। এই অবস্থায় আউট সাইড খেলোয়াড়কে বিশেষ দক্ষতার সহিত দূরবর্ত্তী গোল পোষ্টের দিকে বলটিকে 'Cross Shot করে গোল করতে হবে।

(৩) বিপক্ষদল কর্ণার কিক পেলে আউট সাইড খেলোয়াড়রা কখনও টাচ লাইনের ধারে থাকবে না। তারা টাচলাইন ছেড়ে এসে বিপক্ষদলের ব্যাকের পাশে এমন স্থান নিবে যাতে ক'রে ব্যাক দু'জন কর্ণার কিকের কেবল বলের উপর সট করে নিজেদের সুবিধা করতে না পারে।

(৪) কিক্-অফের (Kick-off) সময় ছাড়া এই দুই ক্ষেত্রে আউট সাইড খেলোয়াড় মাঠের মধ্যিখানে টাচ লাইন ছেড়ে আসতে পারে। আউট সাইডের সহযোগী ইনসাইড খেলোয়াড় বল রিসিভ ক'রে টাচ লাইনের দিকে চলে আসলে হয় সে ছুটে এগিয়ে যাবে ইনসাইডের পাশ নেবার জন্যে কিম্বা সে কিছু সময়ের মত ইনসাইডের শূন্য স্থান পূরণ করবে যে পর্য্যন্ত না স্থান পরিবর্ত্তনের সুবিধা মিলছে। স্থানের এই পরিবর্ত্তন বিপক্ষদলকে বিভ্রান্ত করতে পারে কিন্তু এই ধরণের পরিবর্ত্তন কদাচিৎ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(৫) আর এক সময়ে আউট সাইড টাচ লাইন ছেড়ে আসবে যখন তার দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে বিপক্ষ দলের সেণ্টার হাফের বাধা দেওয়ার ফলে বলটি (আউটসাইডের) গোলের দিকে তখনও অগ্রসর হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আউট সাইডের নিরাপদ পন্থা হচ্ছে বলটি নিজ দলের full-back-এর কাছে এগিয়ে দেওয়া। ব্যাক বলটি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সেন্টার ফরওয়ার্ড তার কাছ থেকে বল পাবার জন্য ফাঁকা জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করবে। সেণ্টার ফরওয়ার্ড ব্যাকের কাছ থেকে বল পেয়েই এগিয়ে দিবে আউট সাইডকে। আউট সাইড খেলোয়াড়ের পক্ষে এই ধরণের পাশ পাবার প্রত্যাশা করা কখনও কখনও সম্ভব। আউট সাইড দ্রুত গতিতে লাইন থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাককে ঘুরে বল কাটিয়ে ভিতর দিয়ে গিয়ে গোল সন্ধান করবে।

ব্যাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড় :

খেলার প্রথম ভাগেই আউট সাইড খেলোয়াড় বিপক্ষদলের ব্যাকের গতিবেগ পরীক্ষার জন্য বলটিকে সামনে সট ক'রে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়বে। উদ্দেশ্য দু'জনের মধ্যে কে বেশী দৌড়তে পারে। আউট সাইড খেলোয়াড় যদি দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই বল ধরতে পারে তাহলে পুনরায় এরূপ ভাবে বল নিয়ে ব্যাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড় দিতে কোন বাধা নেই; কিন্তু যদি ব্যাক আউট সাইডের থেকে বেশী দ্রুতগামী হয় তাহলে কর্ণার ফ্ল্যাগ পর্য্যন্ত ছুটে বল নিয়ে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। এই পন্থায় থেকে বল পেয়ে 'পাশ' করাই আউট সাইডের উচিত। নচেৎ তার দোষে খেলার অবস্থা অন্য রকম হবে, দলের সে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হবে।

কিন্তু 'Long through Pass'-এর সময়ে বলের জন্য ছুটে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পন্থা খাটবে না। আউট সাইড খেলোয়াড় যখন ব্যাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটবে তখন ভয়ের কিছু নেই। আউট সাইড নিজের গতি মন্থর ক'রে ব্যাকেরও গতি মন্থর করতে পারে। কারণ ব্যাক যতখানি দ্রুত ছুটতে প্রয়োজন মনে করে তার বেশী দৌড়তে চায় না। আউট সাইডের হঠাৎ মন্থর গতির জন্য তাকে পরিশ্রান্ত ভাবা ব্যাকের পক্ষে স্বাভাবিক। আউট সাইড কিন্তু বলের নিকটবর্ত্তী হলেই নিজের গতিবেগ হঠাৎ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিবে। ফলে ব্যাককে অতিক্রম ক'রে বলটি সেণ্টার করা তার পক্ষে সম্ভব হবে।

পিছনের 'পাশ' :

পিছন থেকে বলগুলি সংগ্রহ করা এবং সেগুলিকে আদান প্রদানে সরবরাহ করার দক্ষতা আউট সাইড খেলোয়াড়ের

পক্ষে খুবই মূল্যবান। পিছনের পাশগুলি সংগ্রহ করার সব থেকে ভাল পন্থা সেগুলিকে 'hook' করে এনে সুবিধাজনক রাস্তায় এগিয়ে যাওয়া। 'হুক' করা ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে গেলেই বলটি পাশে লাফিয়ে পড়ে আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তাতে সময়ের অপব্যয় হয়, খেলার গতিও ভিন্নমুখী হয়।

'পাশ নেবার জন্য দৌড় :

বিপক্ষদলের হাফ যখন বলটি বাধা দিতে এগিয়ে যাবে সে সময় 'পাশ'-এর জন্য অপেক্ষা করার কোন কারণ নেই। আউট সাইডের তখন একমাত্র কর্তব্য কাজ বলটি প্রথমে পাবার জন্য নিশ্চিন্ত ভাবে দৌড়ে যাওয়া। বলটি পেয়ে কি করতে হবে সেটা নির্ভর করছে পরবর্ত্তীকালের খেলোয়াড়দের অবস্থানের উপর। তবে বলটি থামানোর থেকে হাফকে অতিক্রম ক'রে বলটি ইনসাইড খেলোয়াড়কে পাঠানো অনেকখানি নিরাপদ। হাফকে পরাস্ত করার জন্য ঘুরে কৌশল অবলম্বন করাই তার তখন প্রধান কাজ। ইনসাইড খেলোয়াড় যদি বিশেষভাবে বিপক্ষদলের মধ্যে আটকে পড়ে তাহলে বলটি 'হুক কিক্' মেরে বিপরীত দিকে নিজ দলের ইনসাইডকে পাঠাবে।

এমন দিন ছিলো যে সময়ে আউট সাইড খেলোয়াড়দের প্রধান কাজ ছিলো টাচলাইন ধরে বল নিয়ে কর্ণার ফ্ল্যাগের দিকে ছুটে গিয়ে কেবল সেণ্টার করা। বর্ত্তমানে খেলার পরিবর্ত্তন হয়েছে। পূর্ব্বোলিখিত পদ্ধতিতে বিপক্ষদলের রক্ষণভাগ খেলায় যা কিছু প্রাধান্য হারাত তা পুনরুদ্ধার করবার সময় পেত। বর্ত্তমানকালের আউট সাইড খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য গোল করা, কর্ণার ফ্ল্যাগ নয়। এবং বর্ত্তমানে দুই দিকের আউট সাইড খেলোয়াড়দের মধ্যে যেরূপ খেলায় বোঝাপড়া এবং আদান প্রদানের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তা ফুটবল খেলায় দলের প্রাধান্য লাভের পক্ষে যথেষ্ট সহযোগিতা করে; এ ছাড়া ইনসাইড এবং আউটসাইড খেলোয়াড়দের স্থান পরিবর্ত্তনের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দলের হাফব্যাকের সঙ্গে আউট সাইড খেলোয়াড়ের বোঝাপড়ারও উল্লেখ আছে। যেমন, উইং হাফ বলটি পেয়ে দলের আউট সাইড খেলোয়াড়কে দিতে গিয়ে দেখতে পেল বিপক্ষ দলের ব্যাক তাকে 'কভার' করে রেখেছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়া থাকলে এ সমস্যার সমাধান হ'তে বেশী সময় নেয় না। হাফব্যাক বলটি ব্যাকের মধ্যে দিয়ে পাশ দিলে আউটসাইড খেলোয়াড় ঘুরে গিয়ে সে পাশ থেকে গোল সন্ধান করতে পারে। খেলাধূলার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, ফুটবল খেলায় কতকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করা হলেও সেগুলিই একমাত্র বাধ্যতামূলক পদ্ধতি বলে যেন ভুল না করা হয়। ফুটবল খেলায় যদি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পন্থাকে কঠোর ভাবে অনুসরণ করে খেলা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহ'লে ফুটবল খেলায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব গিয়ে পড়বে দলের ভারপ্রাপ্ত কয়েকজনের উপর। আর খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের অবস্থাটা হ'বে 'chess man'এর সামিল। খেলার মাঠের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যে, পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া এবং নির্ভুল আদানপ্রদানের প্রাধান্যে খেলার বিভিন্ন ধারায় বা পদ্ধতির জন্ম হয়েছে আর সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে 'Sterotyped' খেলার অনুকরণ স্পৃহা বিলুপ্ত হয়েছে। তা বলে প্রচলিত পদ্ধতি অবজ্ঞা ক'রে ক্ষণজন্মা ফুটবল খেলোয়াড়ের অপেক্ষায় বসে থাকা অর্থহীন। প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করার অপরাধ কিম্বা ক্ষতি নেই। বরং খেলোয়াড়ের প্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট সহযোগিতা করে। উপযুক্ত খেলোয়াড়ের নিজস্ব প্রতিভা, ক্রীড়াচাতুর্য্য এবং বৈশিষ্ট্য খেলায় তাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন ত করবেই।

ফুটবল লীগ ঃ

১৯৪৩ সালের ফুটবল লীগ খেলা শেষ হয়ে গেল। প্রথম বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মোহনবাগান ক্লাব। এই নিয়ে তাদের দ্বিতীয়বার লীগ পাওয়া হ'ল। প্রথম বিভাগের লীগ পাওয়া নিয়ে মোহনবাগানের সঙ্গে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েছিল ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ২০ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম এবং মোহনবাগান ১৮ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। সে সময়ে উভয়েরই একটা ক'রে খেলায় হার হয়। প্রথমার্দ্ধের এই ২ পয়েন্টের ব্যবধান ৩ পয়েন্টে গিয়ে পৌঁছায় যখন সমান ১৯টা ম্যাচ খেলে ইষ্টবেঙ্গলের ৩৩ পয়েন্ট হয়েছে। মোহনবাগান লীগের প্রথমার্দ্ধে একমাত্র ইষ্টবেঙ্গলের কাছেই ১—০ গোলে পরাজিত হয়। তাদের সঙ্গে লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় ২—০ গোলে মোহনবাগান বিজয়ী হয়ে পূর্ব্ব পরাজয়ের গ্লানি ত দূর করলেই এদিকে উভয়ের ৩ পয়েন্টের ব্যবধান কমিয়ে ১ পয়েন্টে নামালে। এরপর দেখা যায় ২১টা খেলে ইষ্টবেঙ্গলের ৩৫ পয়েন্ট হয়েছে আর মোহনবাগান পেয়েছে ৩৪ পয়েন্ট। ইষ্টবেঙ্গল ভবানীপুরের সঙ্গে খেলায় ২—২ গোলে 'ড্র' করায় ১ পয়েন্টের ব্যবধানও আর রইলো না। উভয়েই ২২টা খেলে ৩৬ পয়েন্ট পেল। এরপর ২৩টা ম্যাচ খেলেও দু'জনের কেউ কারওকে অতিক্রম করতে পারলো না। ইষ্টবেঙ্গল পুলিশের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা 'ড্র' করে এবং মোহনবাগান মহামেডানের সঙ্গে গোলশূন্য 'ড্র' করে। এর ফলে ২৩টা খেলাতে উভয়েরই সমান ৩৭ পয়েন্ট দাঁড়াল। দু'দলেরই আর মাত্র একটা ক'রে খেলা বাকি। ফুটবল মহলে উত্তেজনা এবং জল্পনা কল্পনার আর অন্ত নেই। ইষ্টবেঙ্গলের শেষ খেলা কাষ্টমসের সঙ্গে এবং মোহনবাগানের এরিয়ান্সের সঙ্গে। কাষ্টমস এবারের লীগ তালিকায় নিম্নস্থান অধিকারী দলের এক স্থান উপরে আর এরিয়ান্স নীচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। এ অবস্থায় ক্রীড়ামোদীদের উত্তেজনার কারণ লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের জন্য ইষ্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের যে খেলা হবে তার ফলাফলের কথা ভেবে। উভয় দলই যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে নিশ্চয় পরাস্ত করবে এ সম্বন্ধে কারও সন্দেহ করবার কারণ ছিল না। কিন্তু নিশ্চিত লভ্য বস্তুকেও যে অনেক সময় হারাতে হয় তার উদাহরণ পাওয়া গেল ইষ্টবেঙ্গল ও কাষ্টমসের খেলাতে। কেউ যা ভাবেনি কাষ্টমস ক্লাব তাই করলে ভাল খেলে ইষ্টবেঙ্গলকে ৩—২ গোলে পরাজিত ক'রে। কাষ্টমসের কিগুলে একাই ২টো গোল করেন। কাষ্টমস ক্লাবের এটাই চতুর্থ জয়। ইষ্টবেঙ্গল

২টি মূল্যবান পয়েন্ট হারায়। এ ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখে সকলেই মোহনবাগানের খেলার ফলাফলের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলো। মোহনবাগান অন্ততঃ খেলায় 'ড্র' করলেও লীগ বিজয়ের সম্মান অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। সৌভাগ্যের কথা মোহনবাগান তার শেষ খেলায় ১—০ গোলে এরিয়ান্সকে হারিয়ে এ বছরের লীগ বিজয়ের সম্মান লাভ করলো।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এ বছর শক্তিশালী নামকরা খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হয়েছিল। লীগে ভাল খেলে প্রথমার্দ্ধে প্রথম ছিল। এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১২টা খেলা পর্য্যন্ত মোহনবাগানের থেকে ৩ পয়েন্টের ব্যবধানে অগ্রগামী ছিল। ইষ্টবেঙ্গলের মত শক্তিশালী দলের পক্ষে তিন পয়েন্টের ব্যবধানে অগ্রগামী থাকা কম সুবিধার কথা নয়। কিন্তু অগ্রগামী থেকেও শেষ রক্ষা করতে পারলো না। এর কারণ কেবল ভাগ্যের উপর দোষারোপ করলে চলবে না। খেলোয়াড়দের খেলার মধ্যেও যথেষ্ট অবনতি দেখা দিয়েছিলো। ১৮টা খেলায় তাদের পয়েন্ট ৩৩। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ২৪টা খেলায় ৩৭ পয়েন্টে দাঁড়াল। ৬টা খেলাতে তারা মাত্র ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাব তাদের বাকি ৬টা খেলাতে ৯ পয়েন্ট পেয়েছে। মহমেডান দলের সঙ্গে খেলা 'ড্র' করে মাত্র ১টা পয়েন্ট নষ্ট করেছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলার পদ্ধতির মধ্যে এবং খেলোয়াড়দের খেলার অবনতি না ঘটলে এ অবস্থা দেখা যেত না। ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণ ভাগকে নিঃসন্দেহে এ বছরের যে কোন দলের থেকে শক্তিশালী বলা চলে। সেই তুলনায় কিন্তু রক্ষণভাগ ততখানি শক্তিশালী নয়।

লীগের প্রথম দিকে যে পর্য্যন্ত আক্রমণ ভাগ ভাল খেলেছে সে পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল গোলও কম খেয়েছে। কিন্তু আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়তেই অর্থাৎ যখনই তারা পূর্ব্বের মত গোলের সুযোগ পেয়েও সদ্ব্যবহার করতে পারলো না এবং পরস্পরের সহযোগিতা হারাল তখনই রক্ষণ-ভাগের উপর খেলার চাপ পড়তে লাগলো এবং তাদের দুর্ব্বলতা ধরা পড়ল। পূর্ব্বেই বলেছি তাদের আক্রমণ ভাগ খুবই শক্তিশালী থাকায় আমরা রক্ষণভাগের প্রকৃত শক্তির পরিচয় পাইনি। প্রথমার্দ্ধের খেলায় তারা বিপক্ষদের ২০টা গোল দিয়ে মাত্র ২টা গোল খেয়েছিল। কিন্তু লীগের শেষে দেখা যাচ্ছে তারা মোট ১৭টা গোল খেয়েছে আর মোট ৪১টা দিয়েছে। এ কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠতম পন্থা বিপক্ষদলকে আক্রমণের দ্বারা বিপর্য্যস্ত করা। আক্রমণ যত প্রচণ্ড হবে আক্রমণকারীদের রক্ষণভাগের উপর চাপ তত কম পড়বে।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম থেকে অগ্রগামী থেকেও শেষ পর্য্যন্ত ২ পয়েন্টের ব্যবধানে লীগ বিজয় করতে পারলো না। একটি শক্তিশালী দলের এ বিপর্য্যয় সত্যিই তাদের দলের শুভানুধ্যায়ী এবং সমর্থকদের দুঃখের কারণ। মাত্র কয়েক পয়েন্টের ব্যবধানের জন্য আকস্মিক ভাবে লীগ হারাতে ইতিপূর্ব্বে তাদের কয়েকবার হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে গত বছর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ খেলায় চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছিল। দ্বিতীয় স্থানে ছিল মোহনবাগান ক্লাব। এ বছর তার বিপরীত হ'ল।

এ বছরের মোহনবাগান দল ইষ্টবেঙ্গলের মত নামকরা খেলোয়াড় দিয়ে গঠিত হয় নি। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা ইষ্টবেঙ্গলের তুলনায় দুর্ব্বল তবে রক্ষণ ভাগ খুবই শক্তিশালী ছিল। দলে নামকরা খেলোয়াড় যে ক'জন আছেন তাঁদের সকলকেই প্রবীণের পর্য্যায়ে ফেলা চলে। যে ক'জন তরুণ খেলোয়াড় যোগ দিয়েছেন তাঁরা নিজেদের খেলা সম্বন্ধে সচেতন বলেই পরস্পরকে খেলায় সহযোগিতা করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। নামকরা খেলোয়াড়ের যে দোষ সেটা না লাগাতেই শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান দল নিজেদের পূর্ব্ব সম্মান বজায় রাখতে পারলো। ইষ্টবেঙ্গলের তুলনায় গোল এভারেজ ভাল। মোহনবাগান ৩৪টা গোল দিয়ে মাত্র ৬টা খেয়েছে। তার মধ্যে দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় মাত্র ১টা গোল। লীগের খেলায় গোল-রক্ষক রাম ভট্টাচার্য্য মাত্র ২টা গোল খেয়েছেন। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমান ভাবেই খেলেছেন। গোলে রাম ভট্টাচার্য্য, ব্যাকে মান্না এবং শরৎ দাসের কথা উল্লেখযোগ্য। হাফ ব্যাকে অনিলের পূর্ব্বের খেলা না থাকলেও Team works-এর পক্ষে তার খেলাও প্রশংসনীয়। আওয়ের খেলায় ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও তিনি দলের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রে খেলেছেন। আক্রমণ ভাগের খেলায় নির্ম্মল, নন্দ রায় চৌধুরী, ভূপালদাস এবং নিমু বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

এ বছর মোহনবাগান ক্লাবের আর একটি বিশেষত্ব যে, লীগের খেলায় যোগদানকারী এ দলের নিয়মিত সকল খেলোয়াড়ই বাঙ্গালী ছিলেন। মোহনবাগানের লীগবিজয়ে বাঙ্গালীর গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠা হ'ল।

ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের পরস্পরের সহযোগিতা এবং বল আদান প্রদানে বুঝা পড়া সত্যই প্রশংসনীয়। আক্রমণভাগের খেলাকে শক্তিশালী ক'রেছিলেন সোমানা, আপ্পারাও, এস চ্যাটার্জ্জি। অশোক রায় আক্রমণ ভাগ থেকে সেণ্টার হাফে স্থান পরিবর্ত্তন ক'রেও ভাল খেলেছিলেন। ব্যাকে পি দাশগুপ্তের খেলা শ্রেষ্ঠ ছিলো।

ভবানীপুর ক্লাব ৩২ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থানে আছে। লীগে তারা শক্তিশালী দলের সঙ্গেও সমানে খেলে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এই দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড বিমল কর ২২টি গোল দিয়ে এ বছরের লীগ খেলায় সর্ব্বাধিক গোলদাতার সম্মান পেয়েছেন। কাষ্টমস ক্লাব সম্বন্ধে গত মাসে যা বলা হয়েছিল তার আর নড়চড় হয় নি।

মহমেডান স্পোর্টিং সম্বন্ধে গত মাসে বলেছি। দ্বিতীয়ার্দ্ধের লীগেও তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। একমাত্র মোহনবাগানের সঙ্গেই সমানে ভাল খেলেছিলো।

লীগের প্রথমার্দ্ধে

	খেলা	জয়	'ড্র'	পরাজয়	বিপক্ষে	সপক্ষে	পয়েন্ট
ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব	১২	৯	২	১	২০	২	২০
মোহনবাগান ক্লাব	১২	৭	৪	১	২১	৫	১৮

প্রথম বিভাগ লীগের পূর্ণ তালিকা

	খেলা	জয়	'ড্র'	পরাজয়	বিপক্ষে	সপক্ষে	পয়েন্ট
মোহনবাগান	২৪	১৬	৭	১	৩৫	৬	৩৯
ইষ্টবেঙ্গল	২৪	১৬	৫	৩	৪৩	১৭	৩৭
ভবানীপুর	২৪	১৪	৬	৪	৪৬	১৭	৩৪

বি এণ্ড এ আর	২৪	১০	৯	৫	২৯	২৮	২৯
মহঃ স্পোর্টিং	২৪	১০	৮	৬	৩১	১৯	২৮
কালীঘাট	২৪	৮	৯	৭	২৪	২৭	২৫
ক্যালকাটা	২৪	৯	৬	৯	৩৪	৩৭	২৪
স্পোর্টিং ইউঃ	২৪	৮	৬	১০	৩১	২৬	২২
পুলিশ	২৪	৬	৯	৯	৩১	৩৪	২১
এরিয়ান্স	২৪	৬	৩	১৫	২৬	৩৯	১৫
রেঞ্জার্স	২৪	৫	৪	১৫	২৬	৫৬	১৪
কাষ্টমস	২৪	৫	৩	১৬	২০	৫৫	১৩
ডালহৌসী	২৪	২	৭	১৫	১৬	৫১	১১

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিবাদ ঃ

লীগের নিম্নদিকের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কাষ্টমস ক্লাব ৩-২ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলকে তাদের লীগের শেষ খেলায় পরাজিত করেছিল।

খেলার শেষে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষ ফিণ্ডলের কাষ্টমস-দলে খেলবার যোগ্যতা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে আই এফ এ-র লীগ সাবকমিটির কাছে কাষ্টমস দলের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদে ফিণ্ডলের অবৈধ খেলার উল্লেখ জানিয়ে বলা হয়, 'যেহেতু ফিণ্ডলে ১৯৪০ সালে রেঞ্জার্স ক্লাবে খেলেছিলেন এবং সেখান থেকে কোন ছাড়পত্র না নেওয়ায় কিম্বা আই এফ এ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত ছাড়পত্র দাখিল না করায় কাষ্টমস ক্লাবে ফিণ্ডলে আইনতঃ খেলতে পারেন না।'

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ সাব-কমিটির সভায় ইষ্টবেঙ্গলের এই প্রতিবাদ বাতিল হয়।

এই বিচারের পর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষ আই এফ এ-র পরিচালক মণ্ডলীর কাছে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য আবেদন জানান।

আই এফ এ-র সভার সভাপতি মিঃ বি সি ঘোষের বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করলাম। তাঁর বক্তৃতায় ঘটনাটি এমনভাবে পরিস্ফুট হয়েছে যে, এ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

"At the very outset of Friday's meeting Mr. B. C. Ghosh, President of the I. F. A., pointed out before the house that as he was the General Secretary of the Mohun Bagan Club and as his club was, in some way, involved in the decision of this protest and as there was also some agitation, which he did not consider fair, in and outside the press he thought that he should not conduct the day's proceedings. But the house having its complete confidence in the President and in absence of any single objection in the meeting against his occupying the chair he, at last, consented to preside. Thereafter the President related before the house the case as it came up before the League Sub-Committee. He said that East Bengal lodged their protest under Rule 53 (e) which runs thus. "A player who has once played for a local affiliated club in a local tournament during the last three years is not eligible to play for any other affiliated club without a transfer certificate which must be applied for in accordance with the rules :" but as Findlay was an army man he does not come under the purview of the said rule and on that ground alone the League Sub-committee might have rejected the protest but they did not do that and considered the Rule 65 which really applies in this case. The Rule 65 has two parts. The first part compels an Army player, if he wishes to play for a civilian club, to take "a certificate signed by the Commanding Officer". The second part, further, directs that such certificate "must, be deposited with the Joint Honorary Secretary at least twenty-four hours before he is eligible to play". Now, in Findlay's case, he pointed out, Findlay had the permission of the Commanding Officer but this permission was not submitted to the Joint Honorary Secretary before twenty-four hours and thus, although he complied with the first part of the rule, he made a breach in respect of the second part. The League-Sub-committee, however, thought that the breach was too technical to allow a replay and as such the protest was not granted. In this connection he referred to Arockraj's case where, also, a technical breach occurred but was ignored and the protest was not upheld.

The President, however, ultimately said that he did not like to press such points considered by the League Sub-Committee and would allow the house to consider the protest in a dispassionate manner and with an independent outlook." H.S.

আই এফ এর সভার কয়েকজন বক্তা সেদিনের আলোচনায় যোগদান করে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলে দীর্ঘ দিনের তর্ক বিতর্কের অবসান হয়।

"On a proper interpretaion of the rules East Bengal's appeal is justified but in view of the attitude taken by them namely that they do not press for the two points nor do they want a replay and having regard to the nature of the breach of the rules involved the game should stand and the protest fee be refunded."

'True sporting spirit' নিয়ে খেলায় যোগদানের প্রতিষ্ঠা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলকাতার ফুটবল মহলে 'sporting spirit' নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশদ বর্ণনার উল্লেখ না করাই শ্রেয়ঃ। এ বছরও প্রতিষ্ঠাবান ক্লাবের খেলোয়াড়দের আই এফ এর আইন লঙ্ঘন করে খেলায় যোগ দিতে দেখা গেছে। এর জন্য প্রতিবাদ হয়েছে এবং খেলোয়াড় কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তিও পেয়েছেন। এবার শীল্ডের খেলায় কোন মাঠে প্রতিষ্ঠাবান ক্লাবের খেলোয়াড় বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে অন্যায়ভাবে মেরেছেন এবং তার জন্য রেফারী কর্তৃক সতর্কিত হয়েছেন। এইখানেই শেষ হয়নি, পুলিসের পাহারায় খেলা শেষ করতে হয়েছে। 'sporting spirit'এর অবমাননা এর থেকে আর কি হতে পারে। এ ব্যাপার নিয়ে খেলার আসরের ক্লাবেরও যেমন কলঙ্ক তেমনি লাঞ্ছনা। জয়লাভই বড় নয়। আমরা সকলেই চাই খেলায় আমাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব করে খেলার অন্যায় উত্তেজনা ও আনন্দ যেন কোনদিন প্রাধান্য লাভ না করতে পারে।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলার আর বেশী দেরী নেই। এক দিকের সেমিফাইনালে মোহনবাগান ক্লাবকে পুলিশ ক্লাবের সঙ্গে খেলতে হবে। অপর দিকের সেমিফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল খেলবে বি এন্ড এ রেলওয়ের সঙ্গে। আগামী সংখ্যায় শীল্ডের খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

পরলোকে টি গ্যারেট ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় টি ডব্লিউ গ্যারেট ৮৫ বছর বয়সে মারা গেছেন। ১৮৭৭ সালে অষ্ট্রেলিয়ার যে প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট টিম গঠিত হয়েছিল টি গ্যারেটই উক্ত দলের শেষ খেলোয়াড় হিসাবে এতদিন জীবিত ছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম টেষ্ট খেলায় গ্যারেট উইকেটে প্রথম বল দিয়েছিলেন। খেলাতে অষ্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে বিজয়ী হয়েছিল। গ্যারেট সর্বসমেত ১৯টি টেষ্ট ম্যাচ খেলে ৩৬টি উইকেট পেয়েছিলেন।

এতদিনে ১৮৭৭ সালের অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম টেষ্ট টিম সত্য সত্যই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। গ্যারেট বিদায় নিয়ে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে চির শান্তিপূর্ণ প্যাভিলিয়নে মিলিত হয়েছেন। সেখানে দর্শকদের জয়ধ্বনি এবং করতালি বিজয়ী বীরদের আত্মার শান্তিকামনায় মুখরিত হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্নদাশঙ্কর, নরেন্দ্রদেব, প্রবোধকুমার, প্রেমেন্দ্র, বনফুল, সুবোধ, শরদিন্দু প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "চাবি"—২৷০

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "লৌহ-মুখোস"—১৷

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "[illegible] সংসার"—১৷০

এস-ওয়াজেদ আলি বি-এ (ক্যান্টাব) বার-এট্-ল প্রণীত "ভবিষ্যতের বাঙালী" (প্রবন্ধ গ্রন্থ)—১৷০

হেমেন্দ্র গুপ্ত প্রণীত গীতি-নাট্য "মেঘদূত"—৸০

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "প্রতিভা"—১৷০

শ্রীদীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত "ত্রিসন্ধ্যা"—।০

পূজার ভারতবর্ষ—শারদীয়া পূজা উপলক্ষে আগামী আশ্বিন সংখ্যা ভাদ্রের ৩য় সপ্তাহে এবং কার্ত্তিক সংখ্যা আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ৫ই ভাদ্রের মধ্যে আশ্বিনের এবং ২৫ ভাদ্রের মধ্যে কার্ত্তিকের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইবেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাণ্ডুলিপি না পাইলে বিজ্ঞাপন ছাপা না হইবার সম্ভাবনা।

কর্ম্মকর্তা—ভারতবর্ষ

CALCUTTA UNIVERSITY

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

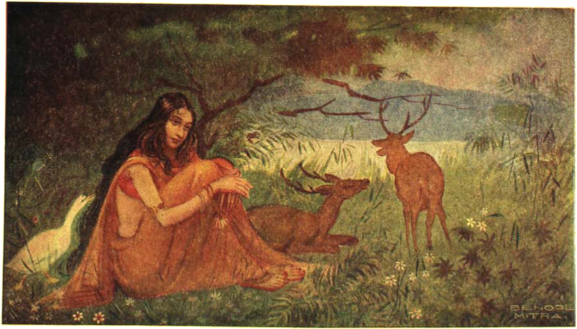

BENODE MITRA.

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মিত্র

শকুন্তলা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

আশ্বিন—১৩৫০

প্রথম খণ্ড | একত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

বাংলার সংস্কৃতি ও ভারতের রাষ্ট্রভাষা

রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের এই বাংলাভাষা কতদিনের সে ঐতিহাসিক আলোচনার গহনে প্রবেশ না করেও একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, অল্পকয়েক শতাব্দীর মধ্যে এভাষা এমন এক অসাধারণ পরিণতি লাভ করেছে যা স্বদেশী বিদেশী সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিরই বিস্ময় উদ্রেক করে। এই ভাষার দুইটি ধারা—পদ্য ও গদ্য—যমুনা ও গঙ্গার মত বাঙালীর কল্পনার মানস সরোবর থেকে জন্মলাভ করে' সিদ্ধির সমুদ্র পানে বয়ে চলেছে। বাংলা পদ্যের যুগ অবশ্য প্রাচীনতর; সেই প্রাচীন যুগে বাংলা পদ্যসাহিত্য অভাবনীয় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছিল। তারপর কত পদাবলী, কত গান, কত পাঁচালী রচিত হয়েছে। বাংলাভাষার ভাব-প্রকাশিকা-শক্তি ক্রমেই বেড়ে গেছে। তারপর একদিন যখন এই পদ্য-রচনার যমুনাধারা গদ্যরচনার ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হলো, তখন বঙ্গসরস্বতীর সেই ত্রিবেণী ধারায় অবগাহন করে' বাঙালীর সংস্কৃতি পূর্ণ গৌরবে মণ্ডিত হয়ে উঠ্‌লো। বাংলার গদ্যসাহিত্য অল্পকালের মধ্যে যে অসাধারণ প্রসার লাভ করেছে, তা অন্য কোনও প্রাদেশিক সাহিত্যের ভাগ্যে ঘটে নি। তার কারণ বাংলার পদ্যসাহিত্য বহু পূর্ব থেকে বাঙালীর মানসকে এই সুচারু পরিণতির জন্যে প্রস্তুত করছিল। হিমালয় থেকে বহু ঝর্ণাধারা নেমে আসে, তার সঙ্গীতে আকাশ বাতাস মুখর করে', তখনও নদীর জন্ম সূচিত হয় নি। তারপরে যখন সমতলে এসে সেই ঝর্ণাধারাগুলি একত্র মিলিত হয়, তখন বিশাল নদীপ্রবাহ দুকূল প্লাবিত করে' কলতানে ছুটে যায় অনন্তের সন্ধানে। বাংলা গদ্যসাহিত্য সেইরূপ যে আজ সভ্যজগতের দরবারে একটি সম্মানিত আসন অধিকার করবার স্পর্ধা করছে, তার কারণ এর পিছনে আছে পদ্যসাহিত্যের বিরাট্ ঐতিহ্য। এখনও আমাদের বাংলা কাব্য-সাহিত্য বিশ্বের বিস্ময়ের সামগ্রী। সুতরাং আমরা একথা গৌরব করেই বলতে পারি যে কি পদ্যে, কি গদ্যে বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবার যোগ্যতা রাখে।

আমরা বাংলা ভাষার গৌরব করি এবং গৌরব করি ব'লেই আমরা বাঙালী ব'লে পরিচয় দেবার দাবী রাখি। বাঙালী শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের—ভারতের কেন সমস্ত পৃথিবীর—নানা স্থানে যে সব বাঙালী কর্মব্যপদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে মিলনের সেতু কি? সমস্ত পৃথিবীর বাঙালী মায়ের ডাকে সাড়া দেয়। এই আমাদের ঐক্যবন্ধন। গ্রীক্‌রা যখন জগতের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন তাদের মধ্যে ঐক্যের সূত্র হয়েছিল তাদের জাতীয় উৎসব। সমস্ত গ্রীস্ অলিম্পিক ক্রীড়াকৌতুকে মেতে উঠ্‌তো এবং যারা সেই উৎসব করতো তারা একজাতীয়তার অনুভূতি উৎসবের মধ্য দিয়ে জাগিয়ে তুল্‌তো। আমার বোধ হয়, উৎসবের চেয়ে ভাষার ডাক ঢের মর্মস্পর্শী ও কার্যকরী। আমাদের মধ্যে বঙ্গভাষাজননীর আহ্বান শাশ্বত হয়ে উঠুক এবং সমস্ত ভেদ বৈষম্য দ্বন্দ্ব কলহ ভুলিয়ে দিক্, এই আমি কামনা করি।

বাঙালী আজও মাকে চেনে নি। আমি বেশ প্রণিধান করেই একথা বল্‌ছি যে বাঙালী আজও মাকে চেনে নি। কারণ যদি আমরা মাকে চিন্‌তাম, তাহলে 'বন্দে মাতরম্' বল্‌তে সকল বাঙালীর মাথা নত হয় না কেন? আমাদের দেশকে মাতৃভূমি, জন্মদাত্রী জন্মভূমি বলে' যারা

পরিচয় দি, তবে মায়ের নামে কেন গর্ব অনুভব করি না? কেউ হয়ত মাকে ধূপদীপে আরতি করে, পুষ্পগন্ধ দিয়ে পূজা করে' কেউ বা শুধু অশ্রুসিক্ত হয়ে প্রণাম করে—কিন্তু এই ভাবপ্রয়োগ নিয়ে খুনোখুনি হবার কি প্রয়োজন? আমরা মাকে চিনি নাই। বঙ্গভাষাকে আমরা 'মাতৃভাষা' বলে থাকি। যারা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে বঙ্গভাষার সুধা পান করেছে, তারা মা বলুনই ত—বল্‌তে বাধ্য। কিন্তু বাংলার হিন্দুমুসলমানে ত এই মায়ের কোলে মিলিত হলো না! বাঙালী মা চেনে না। বাস্তবিক বড় সুযোগ আমরা হেলায় হারালাম। জননী বঙ্গভাষার স্নেহকোমলস্পর্শে দুইটি বড় জাতিকে বাঁধতে পারতো—কিন্তু বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য, তা হোলো না। একদিন হয়ত হবে। হয়ত কেন? —নিশ্চয় হবে। একদিন হয়েছিল, যখন হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অবদানে বঙ্গভাষা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। উভয় সম্প্রদায়ের কণ্ঠে কণ্ঠে ভারতীর সঙ্গীত মূর্ত হয়ে উঠেছিল, ভারতীর চারুশিল্প, ভাবৈশ্বর্য মহিমামণ্ডিত হয়েছিল।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে সর্বাধিকার প্রবেশ না করেও একথা আমি জোর করে' বলতে পারি যে বঙ্গভাষা-জননীর প্রসাদে আমাদের উভয় শাখার মধ্যে যে সংস্কৃতিগত ঐক্য গড়ে উঠেছে, তা সাময়িক স্বার্থান্ধতায় ক্ষুণ্ণ হলেও চিরদিন সে ঐক্যকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এই আমাদের রাজপুরুষদের কথা ভাবুন না কেন—তাঁদের সঙ্গে প্রায় দুইশত বৎসর আমরা একত্র ঘরকন্না কাটালাম, কিন্তু এতদিনেও ত কোনও সংস্কৃতিগত বন্ধন তাঁদের সঙ্গে বাঁধতে পারা যায় নি। পাঁচ শ' বছর একত্র থাক্‌লেও তৈল ও শর্করার মত মিলনটা বাহ্যই থাকবে। হয়ত তাতে ব্যবসায়ে কিছু লাভ হতে পারে, কিন্তু অন্তরের মিলন হবে না। যতদিন বাংলা মায়ের সন্তান ব'লে তাঁরা দাবী না করবেন, বঙ্গভাষা তাঁদের ভাষাজননী না হবেন, ততদিন আমাদের সঙ্গে তাঁদের অন্তরের সৌহার্দ্য কখনও গড়ে উঠতে পারবে না।

হিন্দু মুসলমানের স্বপ্রতিষ্ঠিত মিলনের কথা ছেড়ে দিলেও, বঙ্গভাষার দাবী আমরা নিজেরাই মনে প্রাণে এখনও ঠিক মেনে নিতে পারি নি। লোকে যে শক্তিশালী মিলন আমাদের দেশের পক্ষে পরম কল্যাণকর, সে মিলন আমাদের মধ্যেই সব সময় সম্ভব হয়ে উঠছে না। বহুদিন পর্যন্ত একদিকে পণ্ডিতসম্প্রদায়ের তাচ্ছিল্য, অপরদিকে ইংরেজির বিকারগ্রস্ত তথাকথিত শিক্ষিতদের উপেক্ষা—এই দুইয়ের চাপে পড়ে আমাদের ভাষা-জননীর গতি রুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতেও আমরা দেখি যে মুরারি গুপ্ত চৈতন্যচরিত লিখবার জন্য সংস্কৃতের দ্বারে প্রার্থী, রূপগোস্বামী নাটক লিখছেন সংস্কৃতে, বাঙালী কবিকর্ণপূর তাঁর নাটক ও চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য রচনা করছেন সংস্কৃতে, রাধামোহন ঠাকুর বাংলা পদাবলীর টীকা করছেন সংস্কৃতে, তখন আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে বাংলার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষাকে কি চক্ষে দেখতেন! তার পর ইংরাজ আমলের প্রথমে শিক্ষিত বাঙালী বাংলা ভাষাকে যেরূপ অবজ্ঞা করতে লাগলেন, তাতে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির যুগপৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আসন্ন হয়ে উঠেছিল। মাইকেল মধুসূদন তাঁর প্রতিভার প্রথম অর্ঘ্য নিবেদন করলেন ক্যাপ্টিভ লেডীর চরণে। বঙ্কিমচন্দ্রও রাজমোহনস্ ওয়াইফ দিয়ে সাহিত্যের বুকিং অফিসে প্রথম দেখা দিতে কুণ্ঠিত হলেন না। কিন্তু তার পরই দিন ফিরে গেল। বাঙালী বুঝতে পারলো যে পরস্তুতিকার বৃত্তিতে কখনও তুষ্ট হয় না। সেই থেকে বঙ্গভাষার পঞ্চপ্রদীপে আরতি শুরু হলো। অবশ্য ইংরেজির অনুশীলন নির্বাসিত হলো না। কিন্তু তার মোহ কেটে গেল। ইংরেজি হয়ে উঠেছিল আমাদের সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী; এখন সে হয়েছে ধনবতী কুটুম্বকন্যা; ঘরে এলে আদর করেই রাখতে হয়, খরচপত্র কিছু বেশি হয়, কিন্তু উপায় নেই; না রাখলে পাঁচজনে মন্দ বলে; ধনীর মেয়ে কিছু বলবারও যো নেই। আবার তার দৌলতে চাকরীটা বাকরীটাও কদাচিৎ কখনও মেলে। কিন্তু একবার আমরা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে ইংরেজি আমাদের দেওয়ালেবিবি হবে, এ আশাও বৃথা নয়।

সেরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয় কিনা, ইংরেজির ভক্তদের মনে সে সম্বন্ধে সকল সংশয়ের নিরসন হয় ত এখন হবে না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে ভাষাজননী সন্তানের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন একনিষ্ঠ সেবা। আমরা পুত্রকন্যাদের সঙ্গে প্রয়োজনমত দুচারটি বাংলা কথা বলব, হিন্দীতে দরোয়ানকে চাকরকে গালাগালি, আর মনে মনে ইংরেজির সস্তা বুকনিতে মশ্‌গুল হয়ে উঠবো—এমনতর ত্র্যহস্পর্শ কখনও শুভ হতে পারে না। আমি দেখেছি যে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন যিনি ইংরেজি হরফে বাংলা লেখা দেখতে চান। কারণ রোমান অক্ষরে নাকি বানান সমস্যার সকল সমাধান হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষারও যে সমাধি হবে, সে কথাটি তাঁরা ভাবেন না। আবার এক-শ্রেণীর লেখকের অভ্যুদয় হচ্ছে যাঁরা পাশ্চাত্য ভাষার অনাবিল ভাবরাশি গদ্যে বা পদ্যে প্রকাশ করে নূতনত্ব-সৃষ্টির পক্ষপাতী। তাতে ফল হচ্ছে এই যে তাঁদের ভাষা যেন রীতিমত জটিলত্ব লাভ ক'রে অপাঠ্য হয়ে উঠছে। এই শ্রেণীর লেখকেরা ইংরাজি বা কোনও পাশ্চাত্য ভাষা যে ভাল ক'রে আয়ত্ত করেছেন, ইতিহাস সে কথা বলে না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? পাঠকেরা যে আরও ভাবেন কম। কাজেই তাঁদের আধ্যাত্মিক পিপাসা মিটাবার জন্যে এরূপ অস্পষ্টতা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ছে। আমি তাই সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে এই সকল খেলার প্রহসন থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্ত করতে না পারলে মঙ্গল নাই।

এর চেয়েও মর্মান্তিক কথা,—যখন রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন উঠেছিল, তখন আমাদেরই এই বঙ্গদেশের কোনও কোনও মহাপণ্ডিত ফতোয়া দিয়েছিলেন যে হিন্দীই রাষ্ট্রভাষা হবার উপযুক্ত। বঙ্গজননীর সেই সকল মাতৃভক্ত সন্তানের বিচারশক্তির দুর্বলতা সম্বন্ধে আমরা যতই কেন সচেতন হই না, কানে বড় বিসদৃশ লাগে এই মাতৃদ্রোহিতা। কারণ আমি হিন্দীভাষীদের এক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে যে দৃশ্যটি দেখেছি, তাতে আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বিরাট সম্মেলনের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হিন্দী ভাষার গুণগানে মুখর। সেখানে এমন একটিও প্রাণী ছিল না যে দৃপ্ত বিচারের দোহাই দিয়ে বলতে সাহসী হয় যে হিন্দীভাষার চেয়ে অন্য কোনও ভারতীয় ভাষা ঐশ্বর্য-বিভবে কম নয়। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে কোনও সভায় পাঁচজন উপস্থিত থাকলে অন্ততঃপক্ষে সেখানে পাঁচটি মত ব্যক্ত হবে। এরই নাম বাঙালী।

রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গটি যখন উঠেছে, তখন এ সম্বন্ধে আমার যা বলবার আছে, তা আমি সংক্ষেপে নিবেদন করি। প্রথম কথা সমগ্র ভারতে রাষ্ট্রভাষা-প্রবর্তনের অর্থ সম্বন্ধে সকলের ধারণা একরূপ নয়। কেউ কেউ মনে করেন যে ইংরাজি যেমন এখন আমাদের রাষ্ট্রভাষা, তেমনই কোনও প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালাতে হবে। কিন্তু ইংরাজি ভাষা ভারতের অনেক স্থলে চল্‌লেও, ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা বলা ভুল হবে। কারণ ইংরেজি ভাষা শিখবার কোনও বাধ্যতা নেই। এমন কোনও আইন নেই যে সমস্ত ভারতের লোককে ইংরেজি শিখতেই হবে! ইংরেজির চাহিদা নানা অবান্তর কারণে সৃষ্ট হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক প্রদেশ সেই সকল চাহিদা মিটাবার জন্যে ইংরেজির মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছে। শিক্ষায়তনেও সেই জন্য ইংরেজি না শিখালে চলে না। এই সেদিনও কতকগুলি ছাত্রবৃত্তি বা মধ্যবাংলা স্কুল এই দেশের নানা স্থানে ছিল, তাতে সরকারী সাহায্যেরও অভাব ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলি উঠে গেছে বা উঠে যাবার মত হয়েছে শুধু চাহিদার অভাবে। চাহিদা মিটাতে হয় প্রাথমিক মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে; যদি এই চাহিদার কখনও অভাব ঘটে, তাহলে

ইংরাজি শিক্ষার স্রোতে অচিরে ভাঁটা পড়ে যাবে। এখন সে অবস্থাটি ও আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কাজেই ইংরাজির বদলে অন্য কোনও ভাষার দ্বারা আমাদের আন্তঃপ্রাদেশিক প্রয়োজন মিটানো যায় কি না, সেইটি হলো অনুসন্ধানের বিষয়। আমাদের মাদ্রাজের, বোম্বাইয়ের, পাঞ্জাবের বন্ধুগণের বোধগম্য বক্তৃতা করবার জন্য ইংরাজির সাহায্য না নিয়ে পারা যায় কিনা এই হলো বিবেচ্য। কংগ্রেস যখন ভারতের জনমতের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে ইংরাজির বদলে অপর একটি ভাষার চাহিদা জেগে দেখা দিয়েছিল। এখন এই আন্দোলনের যাঁরা কর্ণধার, বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য যে কোনও প্রভাবশালী বাঙালী সেই গোষ্ঠির মধ্যে ছিলেন না। কাজেই তাঁরা হিন্দীকে হাতের কাছে পেয়ে হিন্দীরই জয়গান করে উঠলেন। কিন্তু জনমতের সেই সাগরের মধ্য থেকে বেতালের মত মাথা খাড়া করে উঠলো উর্দু। তখন কর্ণধারগণ বললেন খুড়ি! হিন্দী নয়, হিন্দুস্থানী। অবশ্য পাকিস্তানের মৌলানারা ছিলেন তখন মৌন। এখনকার দিন হলে কি নামকরণ হতো বলা যায় না। সুতরাং 'রাষ্ট্রভাষা' 'রাষ্ট্রভাষা' বলে আমরা যতই চীৎকার করি না কেন, ব্যাপারটি মোটেই সহজ মনে করবার হেতু নেই। অথচ এই নিয়ে আমাদের প্রতিবেশীদের মনে বেশ একটু কলহপ্রিয়তার ভাব এরিমধ্যে জেগে উঠেছে। এটা একদিকে যেমন অনভিপ্রেত, অপরদিকে তেমনই নিষ্ফল। হিন্দীভাষীরা রাষ্ট্রভাষার দাবী বড় করে তোলবার পরিবর্তে তাঁদের বর্তমান ভাষাকে বড় করবার চেষ্টা করলে বোধ হয় ভাল করতেন। যে ভাষায় সুরদাস, তুলসীদাস কাব্য লিখে গেছেন, যে ভাষায় কবীর দাদু প্রমুখ তাঁদের ধর্ম প্রচার করে অমর হ'য়ে গেছেন, সে ভাষার দাবী অগ্রাহ্য করবে এমন শক্তি কারও নেই। কিন্তু তার মানে এ নয় যে আধুনিক হিন্দী সাহিত্য এমন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে যে এমন হয় নি আর হবে না। অবশ্য কোনও সাহিত্যের সম্বন্ধেই সে কথা বলা চলে না। প্রত্যেক ভাষারই ঐশ্বর্য আছে, মাধুর্য আছে, যা সেই সকল ভাষাভাষীর মনে আনন্দের উল্লাস জাগিয়ে দেয়। কিন্তু এই পক্ষপাতিত্ব এক জিনিস, আর বস্তুগত শ্রেষ্ঠত্ব অন্য জিনিস। কে না জানে যে বাংলা ভাষার কাব্য উপন্যাস ও প্রবন্ধ নিবন্ধের তুলনা ভারতীয় অন্য কোনও প্রাদেশিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না? কাজেই সমৃদ্ধি ও পুষ্টির দিক দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই বলবো যে ভারতে আমার ভাষাজননী সর্বাপেক্ষা গরীয়সী। যদি সাহিত্যের প্রাচীনতা ও অন্তর্নিহিত ভাবগাম্ভীর্য বিচারের মানদণ্ড হয়, তবে আমি একথা বলবো যে প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য বঙ্গভাষা শিক্ষা করা। যদি ধর্মশাস্ত্রের রসাস্বাদন করতে চাও, তবে বাংলা ভাষায় রামায়ণ মহাভারত পাঠ কর, যদি মহাপুরুষের মুখে সহজ সরল ভাষায় পরমার্থতত্ত্বের সার কথা শুনতে চাও, তবে রামকৃষ্ণকথামৃত পড়, যদি বিশ্বকবির কবিতা কাব্যরস উপভোগ করবার ইচ্ছা হয় তবে বাংলা শিখতে হবে, যদি উপন্যাসের বিশ্ববন্দিত রূপ দেখতে চাও বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের বই পড়—একথা আমরা গর্বের সঙ্গে বলবো এবং বলতেও হবে,—সেখানে আমাদের বিনা সংকোচ সংশয় করলে চলবে না। সেখানে আমরা সমস্ত বঙ্গসন্তানকে ডেকে বলবো যে তোমাদের বিচার বিতর্ক কলরব শান্ত হোক, মায়ের পূজায় কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ে। পিছিয়ে পড়লে মায়ের সেবা হবে না।

এখানে একটু প্রাসঙ্গিক কথা বলি। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের মনে জেগেছে একরাষ্ট্রের কল্পনা। প্রাচীনকালে যেমন ধর্মের আওতাতলে সমগ্র ভারত এক মহাভারতে পরিণত হয়েছিল, তেমনিতর একটি স্বপ্ন দেখতে আমরা সুরু করেছিলাম। এক দেশ এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম—এইরূপ একটি রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনা অনেকের মনে এখনও ধ্যানের বস্তু হয়ে রয়েছে। এই পরিকল্পনা থেকে রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন বিশেষ করে' দেখা দিচ্ছে। এটা অবশ্য নিছক রাজনীতিক প্রয়োজনের দাবী। কিন্তু কথা এই, যদি সারা ভারতে একটি ভাষা হয়, তবে সে কোন ভাষা হবে? কংগ্রেস বললেন একটি আধা-নতুন ভাষার সৃষ্টি হবে। হিন্দুস্থানী ভায়ারা বললেন আলবৎ হিন্দী, মুসলমান ভাইয়েরা বললেন জরুর উর্দু। বাঙালীরা সেই সময় তাদের আরজি পেশ করতে অগ্রসর হলেন: লোকসংখ্যা দেখ, বাংলার মহিমা বোঝো, বড় বড় লোকের কথা ভাবো? হিন্দুস্থানীরা বললেন ওসব বাজে কথা, হিন্দী সব চেয়ে সোজা। সুতরাং হিন্দী না হয়ে যায় কোথায়? কিন্তু বাস্তবিক কথা এই, কি যে আমরা চাই তাই ঠিক বোঝা হয়নি। জনতার মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী সকলেই হাত বাড়িয়ে বসে আছি, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তলিয়ে বোঝবার সুযোগ খুব কম লোকেরই হয়েছে। যদি এমন একটা কল্পনা থাকে যে কোনও একটি প্রাদেশিক ভাষাকে বাধ্যতামূলক ভাবে সারা ভারতে চালিয়ে দেওয়া হবে, তা হলে প্রথমত ভাবতে হবে, সে শক্তি কোথায়? কার সে শক্তি বা সামর্থ্য আছে যে একদিন সারা দেশটিতে একটি ভাষার আকস্মিক প্রচলন ঘটাতে পারে? যদি বলা যায় যে, জনমতই সে কাজ করবে, তা হলে দেখতে হবে যে জনমত কোন ভাষার অনুকূল। কংগ্রেস বা অন্য কোনও সভাকে বলে' ফতোয়া দিলে দেশের মধ্যে শুধু মারামারির সূত্রপাত হবে—যেমন মাদ্রাজে হয়েছিল। জনমত অর্থে হিন্দীভাষীদের মতে হিন্দী, মুসলমানের মতে উর্দু এবং আমরা বলবো বাংলা। কিন্তু জনমত বলতে যা বুঝায়, এ ত ঠিক তা হলো না।

তারপর বাধ্যতামূলকভাবে যদি কোনও একটি ভাষা অবলম্বন করা হয়, তা হলে সুগঠিত প্রাদেশিক ভাষাগুলির কি গতি হবে? তারা যেমন আছে, তেমনই থাকবে? কিন্তু তা কি কখনও হয়? যদি প্রত্যেক পাঠশালায়, মক্তবে, স্কুল কলেজে হিন্দী অবশ্য পঠনীয় হয়, তবে বাংলার শিক্ষা হবে কি নৈশ বিদ্যালয়ে? সুতরাং আমি একদিকে যেমন হিন্দী, হিন্দুস্থানী, মারাঠি বা অন্য কোনও ভাষা বাংলাদেশে জোর করে' চালানো অসঙ্গত মনে করি, অন্য কোনও ভাষা বাংলাদেশে জোর করে' চালানো যেমন অসঙ্গত, অন্যায় এবং অস্বাভাবিক বলে' মনে করি, তেমনি অন্য দেশের উপর বাংলা-ভাষা আরোপ করাকেও আমি গর্হিত বলে' গণ্য করি। আমি চাই যে যে স্বাভাবিক নিয়মে প্রত্যেক প্রদেশে যে মাতৃভাষা গড়ে উঠেছে, তার প্রসার সাধন করা হয়, যা তাদের উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ কোনও কাজ করা হয়।

তবে যদি রাষ্ট্রভাষার কথা ছেড়ে দিয়ে একটি চলতিভাষার কথা বলা হয়, তা হলে সে হিসাবে বাংলার দাবী নিশ্চয়ই বিবেচনা করতে হবে। ভারতীয় কোনও একটি ভাষাকে বেছে নিয়ে তাকে জনমতের সাহায্যে সারা ভারতে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এরূপ ভাবে যে ভাষাকে গ্রহণ করা হবে, তার নাম যা-ই হোক, আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যাপারে তার সুবিধা অনেক। সে-ই হবে সমগ্র ভারতের ভাষা। ভারতের সমস্ত লোক সে ভাষার সাহায্যে ভাবের আদান প্রদান করতে পারবেন। সেরূপ একটি ভাষা বরণ করে নিতে হলে' সে ভাষায় অনেক গুণ থাকা দরকার। স্বেচ্ছামূলক গ্রহণের কথা উঠলেই গুণাগুণ বিচারের প্রয়োজন হয়, একথা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার আবশ্যকতা নেই। ক্রেতা যখন বাজারে জিনিষ কিনতে যায়, তখন সে দেখে জিনিষের কোয়ালিটি। ভাষার কোয়ালিটি বা উৎকর্ষ-নির্ণয়েও অবশ্য বহু বাধা ঘটতে পারে। স্বেচ্ছাসহকারে অ-বাঙালীরা বাংলা ভাষার কাব্য উপন্যাস আদি যে ভাবে স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ করছেন, বাঙালীরা তার শতাংশও করে নি। যে ভাষার যত সমৃদ্ধি হবে, সে ভাষার তত অনুবাদ অনুকরণ আদৃত হবে—এ স্বতঃসিদ্ধ। আমরা একথা জোর করে' বলতে পারি যে ভারতের সকল প্রদেশে কেন, ভারতের বাহিরেও বাংলা পুস্তকের চাহিদা যেরূপ, অন্য কোনও ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে যেখানে চাও, বাংলার মনীষীদের কারও কারও নাম নিশ্চয়ই শুনতে পাওয়া যাবে, তাঁদের ভাবোপস্থাপনের দরুন

বাহিরের লোকের পরিচয়ের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও যদি বাংলাকে দেশের কর্ণধারগণ বর্জন করেন, তা হলে আমি বলবো যে সে পক্ষপাতিত্ব বাঙালী অন্ততঃ কখনও স্বীকার করবে না। তারপর আর একটি বিষয় চিন্তা করতে অনুরোধ করি—আমাদের বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব ইতিহাস, বিজ্ঞান বা দর্শনের অনুশীলন হচ্ছে, তা যদি বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তবে এ আশা করা অন্যায় হবে না যে সমস্ত প্রদেশের লোক বাংলা শিখতে বাধ্য হবে।

তারপর আরও একটি বিষয় প্রণিধান করা আবশ্যক। বাংলা সাহিত্য, বাংলা কাব্যের প্রাধান্যের কথা বাদ দিলেও বাংলার যে সংস্কৃতি বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে, তার তুলনা ভারতবর্ষে অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। সংস্কৃতির উৎকর্ষ বলতে আমি বুঝি তার নীতির উদারতা। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটি উদার নীতির যে প্রয়োজন এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না। যে সংস্কৃতি সংকীর্ণ, ক্ষুদ্রতা দোষের আশ্রয়স্থল, সে সংস্কৃতি জাতির পক্ষে কখনও শুভ হতে পারে না। আমরা বাঙালী গুজরাটি মারাঠি প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ স্বার্থের কথা ভাবি, যদি অপরের সম্বন্ধে উদাসীন থাকি, তা হলে ভারতের রাষ্ট্রনীতি ব্যর্থ হবে এখন যেমন হচ্ছে। হিন্দুর ভারত এক, মুসলমানের ভারত এক—এমন ধারণা যতদিন মনে থাকবে, ততদিন ভারত অখণ্ড একটি রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারবে না। সেইজন্য আমি সেই উদার নীতির দিক দিয়ে সংস্কৃতি ও ভাষার বিচার করতে বলি এবং সে বিচার করলে একমাত্র বাংলা ভাষাকেই সারা ভারতের ভাষা বলে' গ্রহণ করতে একটুও বাধা হবে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে একবার তাকান, ওখানে শুধু বঙ্গভাষার সহিত ঐতিহ্য দেখবেন না, দেখবেন ঐ ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের সংস্কৃতি কেমনভাবে গড়ে উঠেছে। সে সংস্কৃতির মধ্যে কোথাও এতটুকু অনুদারতা নেই। বঙ্গভাষা নিজের গৌরবে গৌরবান্বিত, তার মধ্যে এমন শিক্ষা নেই যে অন্য কোনও ভাষা, অন্য কোনও সংস্কৃতি বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে তুচ্ছ করতে হবে, ঘৃণা করতে হবে। উপরন্তু আমরা হিন্দী, উর্দু, আসামী, মৈথিলী, তিব্বতী, সাঁওতালী, নেপালী, সিংহলী-সব রকমের ভাষার পঠন বা পরীক্ষাগ্রহণ অঙ্গীকার করে নিয়েছি। সকল ভাষাকেই অল্পাধিক স্থান দিয়েছি। অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরূপ ব্যবস্থা নেই। উদার নীতিই হলো প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। আমরা সকলকেই স্থান দিয়েছি, সকল ধর্মকে সম্মান দেখিয়েছি, সকল জাতকে বুকে টেনে নিয়েছি—বহুযুগের এই সংস্কৃতি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে বাঙালীর আদর্শ সকলকে মেনে নিতেই হবে। যে সংস্কৃতি ভেদ-বুদ্ধি শিক্ষা দেয়, যে ভাষা অপরকে হিংসা করতে শেখায়—সে ভাষা কখনও সর্বজনীন হতে পারে না।

কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির প্রকৃত মর্যাদা দিতে হলে চাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা যে শুধু ধর্ম সাধনার পক্ষে অপরিহার্য তা নয়। শ্রদ্ধা সর্বপ্রকার অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। বাংলাদেশের প্রতি, বাঙালীর ভাষার প্রতি, বাঙালীর সংস্কৃতির প্রতি—এক কথায় বাঙালীর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত সাধনা ব্যর্থতায় পরিণত হবে। আমার জন্মভূমির মত দেশ কোথায় আছে? আমার বঙ্গভাষার মত ভাষা কার আছে? আমাদের দেশের সঙ্গীতের মত মাধুর্য আর কোনও সঙ্গীতে আছে? এমন প্রাণ মাতানো বাউল, কীর্তন কোনও দেশে আছে কি? এমনি শ্রদ্ধা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য গানের অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন, তাঁর অমর কাব্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সমস্ত সাধনার মূল মন্ত্র ছিল শ্রদ্ধা। বঙ্কিম বিবেকানন্দ যে শ্রদ্ধার পারিজাত বাঙালীর সংস্কৃতির নন্দনকাননে রোপণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তারই প্রস্ফুটিত কুসুম চয়ন করে দিয়েছেন। যে যুগে জমে উঠেছিল শুধু অবজ্ঞা ও উদাসীনতার আবর্জনা, তাঁরা সে যুগকে সম্মার্জনী দিয়ে বিদায় করতে পেরেছিলেন বলেই আজ আমরা বাংলাভাষার গর্ব করতে পারছি। আমাদের এই গর্ব যেন কখনও ক্ষুণ্ণ না হয়।

শুধু রাষ্ট্রভাষার সমস্যা নয়—আমার মনে হয় এ একটা বড় সমস্যা হলেও আশু কোনও বিপদ্ ঘটবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু আমাদের নিশ্চেষ্টতার ফলে বঙ্গভাষার হানি হবার আশঙ্কা আছে অন্য অনেক দিক্ থেকে। আসামের ভাষা যতই আধুনিক হোক্, প্রথম থেকেই এর স্বভাবতঃ সুরু হয়েছিল অব্যাহতভাবে। মিথিলার লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করতেন, সেটা বাংলার বড়ই কাছাকাছি। তারপর তাঁরা যে লিপি ব্যবহার করতেন, সে লিপি বাংলা। আসামের সম্বন্ধেও ঐরূপ। তাঁদের লিপি এখনও বঙ্গলিপির সহোদর। সুদূর মণিপুর এতদিন বাংলার মাধ্যমেই শিক্ষা নিচ্ছিলেন, এখন তাঁদের মনে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি জেগে উঠেছে—তাঁরা পুরাণো অক্ষর খুঁজে একটি মণিপুরী ভাষা আবিষ্কার করে' তারই উন্নতির জন্যে উঠে' পড়ে' লেগে গিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাঁদের এই নবাবিষ্কৃত ভাষার দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। মণিপুরের ভাষা শুধু নয়, তার সংস্কৃতিও বঙ্গদেশের নিকট ঋণী। এখনও শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম জীবন্তভাবে মণিপুরে দেখা যায়। সেই গুরুদেব, সেই বাংলাপদাবলী, সেই কীর্তন, সেই খোলকরতাল। কিন্তু তাঁরা এখন যে পথ ধরেছেন, তাতে বেশিদিন তাঁদের এই সংস্কৃতি বঙ্গদেশের সঙ্গে যোগ রাখতে পারবে বলে বোধ হয় না। আমার মনে হয় এখনও যদি একটি সাংস্কৃতিক অভিযান বাংলাদেশ থেকে পাঠানো যায়, তা হলে হয়ত তাঁরা এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবেন না। উড়িষ্যায় কিছুদিন পূর্বেও বাংলা পদাবলী গাওয়া হতো; সীমান্তে এখনও বাঙালীর ভাবসম্পদের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারে নি। কিন্তু আমরা যদি এমনি ভাবে নিশ্চেষ্ট থাকি, তা হলে অচিরে বাংলার অধিবাসীদের দশা প্রাপ্ত হতে হবে—অর্থাৎ এই সকল দেশের মনের উপর যে অধিকার বাঙালী অর্জন করেছিল, তার থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে।

এ ছাড়া আর একটি চিন্তার বিষয় এই যে সাঁওতাল, নাগা প্রভৃতি যে সকল জাতির ভাষা নেই, সংস্কৃতি নেই, তাদের মধ্যে খৃষ্টান্ পাদরীরা বেশ ইংরাজিভাষার প্রসার করে' নিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সাঁওতালী ভাষা পঠনীয় ব'লে গ্রহণ করেছি—কিন্তু সে ভাষার আছে কি? আছে বাইবেলের অনুবাদ আর ক্ষুদ্রতর গল্প। নাগাদেরও ভাষার বালাই নেই। যারা আগে যদি একটু আধটু শিক্ষার আলোক-সন্ধানে ছুটতো, তারা অসমীয় অথবা বাংলা ভাষার সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। পাদরী-পুরুষেরা এখানেও বেশ ফসল ফলাতে সুরু করেছেন। আমার প্রশ্ন এই—এ সম্পর্কে বাংলা দেশের কি কোনই কর্তব্য নেই?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন সকল প্রাদেশিক ভাষাকে আসন দিয়ে সম্মানিত করেছেন, অন্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে কি আমরা সেই সৌজন্য প্রত্যাশা করিতে পারি নে? আমি কিছুদিন পূর্বে যখন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছি সেখানকার সুবিস্তৃত গ্রন্থাগারে একখানিও বাংলা বই নেই। অথচ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী ছাত্র এবং বাঙালী অধ্যাপকের অসদ্ভাব নেই। এ সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে আমাদের সংস্কৃতির পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করতে হলে' এমন একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে প্রত্যেক প্রদেশ অন্য প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সহজে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করতে পারে। এইজন্য কোনও আন্তঃপ্রাদেশিক সংস্কৃতিমণ্ডল গঠন করা কর্তব্য। এ সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্ন আলোচনা অনেক দিন থেকে আরম্ভ হয়েছে। দেশ বিদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। ১৯২৩ সালে প্রথমে ডক্টর কাজিন্‌স্‌ একটি নিখিল ভারত

সংস্কৃতিমণ্ডলের পরিকল্পনা করে' ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তার অনুলিপি পাঠিয়েছিলেন। পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক চ্যাপম্যান সাহেবও ষ্টেট্‌সম্যান কাগজে এ সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশ করেছিলেন। অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর টমসনও এ বিষয়ে আমাদের প্রবৃত্ত হতে' বলেছিলেন। বাস্তবিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কাব্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির মধ্যে যে ঐক্য আছে, তা বিস্ময়কর। বাংলার বৈষ্ণব কবি ও দাক্ষিণাত্যের আলওয়ারদের মধ্যে যে ভাবসাম্য, বাংলার শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে পাঞ্জাবের গুরু নানকের যে মতসাম্য আছে, তারও সেটা প্রমাণ। এই সংস্কৃতি সাম্য আবিষ্কৃত হলেই ভারতের সংস্কৃতি সভ্য জগতের কাছে সম্মান দাবী করতে পারবে। এর আরও ফল হবে এই যে সমগ্র ভারতের সার সৌষ্ঠব গ্রহণ করে' এমন একটি জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠবে—যা সত্যই জগতের শ্রদ্ধার বস্তু হবে। এই সংস্কৃতি-মণ্ডল গঠিত হলেই আন্তঃপ্রাদেশিক ঈর্ষা যেন বিদূরিত হয়ে যাবে। জাতীয়তা-গঠনের যদি কোনও অন্তরায় থাকে, তবে আমি মনে করি যে এই বিদ্বেষই সর্ব্বনাশ করছে।

গজু আর পবন

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

"পবনে, তুই এ পাড়াটা ঘুরে আয়—আমি বেণে পাড়ায় যাচ্ছি।"
"হিঃ—তুই বড় চালাক,—আমিই বেণে পাড়া যাব, তুই বরঞ্চ এ পাড়ায় দেখ—," পবনে উত্তর দেয়।

দাদা গজু চটে ওঠে, হাত উঁচিয়ে ভাই-এর অবাধ্যতার শাস্তি দিতে যায়—। ভাইও লক্ষ্মণ নয় পবন—, ঝুলিটা পথের ধুলোর উপর নামিয়ে ছেঁড়া কাপড়টাকে সেঁটে তাল ঠুকতে থাকে, চলে আয়।

প্রায়ই তাদের এমনি হয়, দুটো ভাই হতভাগা। মা বাপ কবে এদের ছেড়ে পালিয়েছে, নিজেরাই চালাটার এককোণে রাতে পড়ে থাকে, আর দিনের বেলা এ-গাঁ, সে-গাঁ ভিক্ষে করে বেড়ায়। ছোট ছোট বাপ-মা-মরা ছেলে দুটিকে অনেকেই ভালবাসে, দেখে মায়াও হয়। সকাল বেলায় বেরোয়, ফেরে সেই সন্ধ্যায়। টুর প্রোগ্রাম নিয়ে তাদের এই ঝগড়া, শেষে মীমাংসা হয়, আচ্ছা চল দুজনেই যাই। ঝুলিটা তুলে নিয়ে পথ ধরে বামুন পাড়ায়।

নতুন পুকুরের ঘাটে—সকাল বেলায় মজলিস্ পুরো মাত্রায় চলেছে। শীতের সকাল, সোনালী মিষ্টি রোদে চারিদিক ভরে গ্যাছে—পানফলের লতাগুলোর উপরে তরুণ সূর্য্যের আভা চিক্ চিক্ করছে, হাঁসগুলো পুরো দমে ছুটে চলেছে মসৃণ ঠাণ্ডা জলরাশি ভেদ করে দল বেঁধে, মনের আনন্দে চীৎকার করে—ডুব দিয়ে শান্ত জলরাশির বুকে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে। সার্ব্বজনীন সরি পিসির কাংস-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর হঠাৎ সপ্তমে উঠে, সকালের নীরবতা ভেঙে খান্ খান্ করে দিলে—

"ওরে ও মুখপোড়া—বলি যমের মুখে কি নিমপাতা গুঁজে দিয়ে এসেছিস? ভরা-সাত সকালে উঠে কে বাবা ডুব দেয় বল দেখি? বামুনের গাঁ? এ সব বালাই কোথা থেকে আসে গা? আঃ মর—মরণ নেই" ইত্যাদি। আশীর্ব্বাদটা পবনকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। দোষ তার এই যে সে ভট্টাচার্য্যদের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে—আর সরি পিসি ঢুকতে যাবে ভিতরে। এ হেন সময় পিসি আবিষ্কার করেছেন যে কয়েকটা খড়ের কুটোর সঙ্গে তিনি নাকি পবনকে ছুঁয়ে ফেলেছেন, আর যায় কোথা—আরম্ভ করেছেন আশীর্ব্বাদ, কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে আশীর্ব্বাদটা, সে নির্ব্বিকার চিত্তে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে, হঠাৎ বলে উঠল "না মাঠান্—আমি ছুঁইনি গো, ছোঁয়াছ পড়েনি;"

পিসি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, "থাম্-থাম্। বড় আব্দার যে—ফের্ যদি কোনদিন তোমাকে এই পাড়াতে দেখি—ঝেঁটিয়ে বিষ নামিয়ে দোব, পষ্ট ছুঁয়ে আবার বলে ছোঁয়া পড়েনি। ছোটলোক কি আর সাধে বলে।" মুখুজ্জেদের টুনি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল—, সে বলে উঠল—"তোমাকে ত ও ছোঁয়নি, তুমিই ত ওকে ছুঁয়েছ—ও ত দাঁড়িয়েছিল আর তুমি যাচ্ছিলে—"

আর যাত কোথা! সরি পিসির কথার উপর কথা! চোট পবনের উপর থেকে গিয়ে পড়ল টুনির উপর—"বিয়ে হয়ে তোর যে বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে লা—গর্ব্ব যে আর ধরে না, বলি কোন্ তালুক মুলুক পেলি?" মুখের উপর থেকে চুলগুলোকে সরাতে সরাতে টুনি বললে—"সে আমি যাই-ই-পাই, ওকে তুমি অযথা গাল দেবে কেন?" সরি পিসি হাত দুটোকে যাত্রাদলের সখীদের মত ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—"মরে যাই রে আহা—" টুনিও পাশকরা ঝগড়াটে, বাধ্য হয়ে সরি পিসি পথ দেখলেন। ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে পা ফেলে যাবার সময় গজ গজ করতে করতে চললেন—"মেয়েগুলো যত নষ্টের গোড়া, বিশেষতঃ আজকালকার মেয়েরা তাদের সময় এ রীতি ছিল না, বুড়ো বয়সে বিয়ে দিলে পাকা হয়ে যায়, তাঁর নাকি সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল—বিধবা হয়েছিলেন আট বছরে—ইত্যাদি ইত্যাদি।" ব্যাপারটা আর গড়ালনা, সেইখানেই চাপা পড়ে গেল।

পবন ভট্টাচার্য্যবাড়ীর চাল নিয়ে দু একটা চাল ভক্ষণ করে, ঝোলার ভিতর ফেলে বাকীগুলো চিবুতে চিবুতে চলে—আর এক বাড়ীর উদ্দেশ্যে। গজু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, "শালা—রাক্কোস!"

খর মধ্যাহ্ন। সারা গ্রামখানা দুপুরের রৌদ্রে ঝিমুচ্ছে। দূরে ছাতিম গাছের উপর কতকগুলো কাক কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠল। কলমি হেলেঞ্চাদলের উপর বক-ডাহুক একমনে বসে চুপ করে কি ভাবছে—জল-কাকগুলো দামের মধ্যে থেকে মাথা তুলে তাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে আবার ডুব দিচ্ছে দলদামের মধ্যে। একটা শুকনো অশথ গাছ থেকে কাঠঠোক্‌রার ঠক্ ঠক্ শব্দ ভেসে আসছে, বাঁশবন বাতাসে দুলে কট্ কট্ শব্দে নীরবতাকে ভেঙে দিচ্ছে।

"মা ঠান—মা ঠান গো"—মা ঘরের ভিতর থেকে রমাকে ডেকে বললেন—"বৌমা তোমার বাহন এসেছে গো—" বলা

বাহুলা বাগদীর গজু আর পবন, দুপুরে অনেক অতিথি খায়—ও বেচারা দুটোও দুমুঠো পায়। এনিয়ে রমা অনেক দরবার করে শাশুড়ীর মত পেয়েছে, সেই থেকে রোজকার অতিথি ওরা। হেঁসেল থেকে বেরিয়ে এসে রমা বলে—"এত দেরী কেন রে তোদের ?"

ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে গজু বলে, "এজ্ঞে মাঠান সোনাদিঘী গিইছিলাম বেনের তামাক আন্‌তে," মরাই-এর আড়াল থেকে পবন বলে উঠে—"না মাঠান-উ মিছে কথা বলছে—বাউরী পাড়ায় কড়ি খেলাতে গিইছিল"—হাসিয়া রমা বলে "নে তেল মেখে শীগ্‌গির চান করে আয়"

দুটো হাতকে যতদূর সম্ভব কুঁচকিয়ে খাল করে খানিকটা তেল মাথায় দিয়ে এখানে সেখানে লাগিয়ে খুশি দুটো ঢেঁকিশালের কোণে ফেলে রেখে ছুটল তালবনের দিকে।

খেতে বসে দু'ভায়ে লাগে ঝগড়া, এ বলে আমি শান্‌কিতে খাব। ও বলে গামলার চেয়ে শান্‌কি ঢের ভাল আমি শান্‌কিতে খাব ; ওদের ঝগড়া দেখে নাক সিঁট্‌কান—শেষে গোলমাল মিটুতে হয় রমাকে। যা পায় তাই দিয়ে খেয়ে যায়, যেন জগতের বুভুক্ষা এদের পেটে এসে রূপ নিয়েছে। সামান্য ভাত পেলেই সন্তুষ্ট, রমা এদের খাওয়ার দিকে চেয়ে থাকে—মুখে তার তৃপ্তির হাসি।

এঁটো জায়গায় গোবর দিতে দিতে গজু বিজ্ঞের মত বলে, "পবনে ভাল করে গোবর দে—বামুন ঘরে ভাত খাবে আড়াই হাত গোবর দেবে বুঝলি !" পবন চালাক ছেলে গোবর দেবার ভয়ে চাড় দূরে কোলা কাঁধে করে সরে পড়ে আগেই। গজু মুখ তুলে দেখে পবন নেই।

শীতের শেষে পাকা মাঠের জমিন সকল সোনালী ধানে ভরে উঠেছে। খামারে ধান তোলা শেষ হয়ে গিয়েছে। এইবার মরাই-এ তোলবার পালা। সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল। দু'চোখ ভরে ধানের গাদার দিকে চাই আর অপরের গাদার সঙ্গে তুলনা করি—কম কি বেশী—ভাল কি মন্দ।

একদিন বৈকালে খামারে গিয়ে দেখি, একদিক্‌কার বেড়া ভাঙা—বোধহয় কারও গরু ঢুকে গাদার পাশ থেকে ধান খেয়েছে, দেখে খুব রাগ হল। রাগবারই কথা—শুনলাম যে কতকগুলো ছেলে নাকি ধান চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, গজু পবনও তাদের সঙ্গে ছিল।

মনটা খিঁচড়ে গেল। হতভাগারা কোথাকার—! বেণে পাড়াতে গিয়ে দেখি, কমল বেণের দোকানের বাইরে কতকগুলো ছোটলোক বসে তামাক খাচ্ছে, কলকেটা তখন গজুর হাতে—মুখটাকে বাঁদরের মত সরু করে চোখ বুঁজে প্রাণপণে সোঁ-টান টানছে, একটা দীর্ঘ টানের পর একরাশ ধোঁয়া বার করে খক্‌ খক্‌ করে কাস্‌তে কাস্‌তে তামাকের উদ্দেশ্যে একটা অকথ্য ভাষায় গাল দিয়ে কলকেটা পাচু গোপার হাতে দিল। কোন কথা না বলে দু'জনের দুটো কান ধরে হিড় হিড়্‌ করে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চল্‌লাম বাড়ীর দিকে—তারা কোন প্রতিবাদ করল না—আস্তে আস্তে চলে এল। টেনে নিয়ে একেবারে বাড়ীর ভিতর ঢুকে রমাকে লক্ষ্য করে বল্‌লাম "দেখ দুধকলা দিয়ে সাপ পুষছ। হতভাগাদের আজ চাব্‌কে ছাল চামড়া তুলে দেব। আমারই ধান চুরি করা !" দু'চারটে চড়-চাপড় মারলেও তারা কিছু বল্‌লে না—চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেলে—

রমা নেমে এসে বললে, "হ্যাঁরে—সত্যি চুরি করেছিস্ ?" তার কণ্ঠস্বরে কি যেন অন্য রকম একটা ভাব মাখান।

পবন বলে উঠল—"না মাঠান—আমরা নই—লোহারদের বন্টুরা বল্লে যে—যদি ওদের বাড়ীতে বলে দিস্ তবে পুকুরের বনে গেলে মার দোব, ওরাই চুরি করেছে আমরা ওদিকে দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা কিছু করিনি মাঠান্" চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছিল—রমা বল্লে, "যা তোরা যা" পরে আমার উদ্দেশে বলা হ'ল—"আচ্ছা বীর যা হোক—কে করলে চুরি, আর কাকে করলেন শাসন।"

গম্ভীরভাবে বল্‌লাম "হুঁ," সকালবেলা মহুয়া বনের ভিতর থেকে কাদের গান সারা মাঠটাকে ভরিয়ে তুলেছে—বিরস তামাটে রংএর ডাঙ্গাটা তাদের গানের সুরে মুখরিত। তারা পালা করে কেষ্ট যাত্রার গান গাইতে গাইতে আসছে—

"না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাও জলে
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরই ডালে—"

রাধবেশী দাদার মুখের সামনে পবন তখন হাত নেড়েনেড়ে ওঠে—

"আমি তমাল বড় ভালবাসি—কেষ্ট কালো তমাল কালো
তাইত আমি ভালবাসি"

দুজনের আঁচলে আর কোঁচড়ে অনেক কুড়কি ছাতু—আর কতকগুলো কৈথ ফল, বাড়ী এসে দেখি দাওয়ার উপর রমা দাঁড়িয়ে আছে—আর গজু পবন দুজনে একগাল হেসে কোঁচড় থেকে সেগুলো ঢালছে।

"মাঠান—কাল আরো আনব—কৈথ এখনও পাকেনি কি না"

বল্‌লাম—"এগুলো কি হবে রে ? যত সব চোর চামারের কাণ্ড বা উঠিয়ে নিয়ে যা, ফের্ যদি বাড়ী ঢুকিস্ মেরে পা ভেঙ্গে দেব—যা"

তাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল—রমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে—ধীরে ধীরে সেগুলো কুড়িয়ে নিতে লাগল। রমা রুদ্ধকণ্ঠে কি যেন প্রতিবাদ করছিল—তাকে পুরুষ কণ্ঠে থামিয়ে দিলাম, "জাননা, কুকুরকে আদর দিলে মাথায় ওঠে, ওদের এ বাড়ীতে আর ঢুকতে যেন না দেখি—"

আস্তে আস্তে তারা বেরিয়ে গেল, মাও চুপ করে থাকে নি, উপদেশ দিতে লাগলেন—"তোমারও বড় বাড়াবাড়ী চলছিল বৌমা ছোটলোকের ছেলে—এত আদর কি বাছা—"

আর এক বিপদ—! সকলের খাওয়া দাওয়া চুকে যাবার পর রমার মাথা ধরে—উপরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। খাওয়া দাওয়া তার ভাল ভাবে হয় না। দুই একদিন এই ভাবে চল্‌ল—কাজ-কর্ম ঠিক হয়, খাবার সময় হলেই মাথা ধরে—গা পাক দেয়—নয় ত আর কিছু একটা উপসর্গ জোটে, মা অনেক কিছুই ভাবেন। গজু পবনও আর দোর মাড়াতে সাহস পায় না—দূরে দূরে ভিক্ষে করেই চলে যায়।

দিন কয়েক পরে একদিন দেখি গজু ও পবন দুপুর বেলায় ঠিক আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছে ; মূক-আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে এক একবার চাইছে, আবার আস্তে আস্তে চলছে। ডাক্‌লাম "শোন্‌", দু'জনেই থামল—"আসিস না কেন আর ?" আমার মুখের দিকে করুণ সর্বহারা দৃষ্টিতে চেয়ে আবার মাথা নামিয়ে নিলে।

"যা খেয়ে নি গে যা" আস্তে আস্তে তারা বাড়ী ঢুকল। পূজার সময়। আনন্দময়ীর আগমনে বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দপ্রবাহ আসে। পল্লীতে পল্লীতে ঘর নিকোবার, দেওয়ালে পদ্ম আঁকবার ধুম পড়েছে, তারপর আছে মুড়ি মুড়কি নাড়ু করার পালা ইত্যাদি অনেক কিছু, শ্যামল পল্লী মায়ের অঞ্চল শস্যের সবুজ ধানে ভরে উঠেছে—বিল জলাতে পদ্ম কহ্লারের রাজত্ব। কাশবনে বলাকার আনন্দ মেলা, সবুজ বিলের মধ্য দিয়ে মাঝি ভাটিয়ালী সুরে আগমনী গাইতে গাইতে চলো ঘাসের বন ভেদ করে চলেছে। মনটা কেমন যেন হয়ে ওঠে।

গজু পবন আর ফিরে করে না। রমার কথাতে তাদের রাখতে হয়—একজন বাড়ীর চাকরের কাজ করে; এই এটা আনা—সেটা আনা ফরমাস খাটা, আর একজন রাখাল। তাদের চাকরি নিয়ে আবার দুইভায়ে ঝগড়া লাগে। এ বলে আমি বাড়ীতে থাকব—ও বলে আমি। কারণ তাদের মতে রাখালি করা অর্থাৎ গরু চরান নাকি, নেহাৎ ছোট লোকের কাজ।

পূজোর সময় কাপড়-চোপড় আনবার ফর্দ হবে, মা খুঁটিতে হেলান দিয়ে কম্বলের আসনে বসে চোখবুঁজে হরিনামের মালাটা ঘোরান একবার করে মনে মনে বিড় বিড় করেন আর বলেন "বৌমার একখানা ঢাকাই বা কিছু ওই রকম শাড়ী, বামুনদিদির নরুণ পাড় ধুতি—পশুপতির ১ জোড়া লালপাড় ধুতি—" ইত্যাদি ফর্দ হল, রাত্রিবেলা হঠাৎ রমা বল্লে—"একটা কথা রাখবে? "কি বলই না।" চোখে মুখে দুষ্টামির ছায়া—ঘাড় নেড়ে ব'লে—"উঁহু—আগে সত্যবদ্ধ হও—কাউকে বলবে না"

অজানা আশায় বুকটা ভরে উঠল, মরিয়া হয়ে বল্লাম—"আচ্ছা সত্যবদ্ধ হলাম,—বল"

"গজু ও পবনের জন্য দুটো ভাল জামা আনতে হবে।" ধুর ছাই, মাটি করেছে এই গজু আর পবন—জ্যোৎস্না রাত্রি শরতের নির্মল আকাশ তার কথা শুনে বেশ একটা রোমান্স মনে এসেছিলো—প্রাণটা এক নূতন পুলকে ভরে উঠেছিল শেষে কিনা গজু আর পবন। নিকুচি করেছি এই গজু পবনের। "কই বল্লে না।" বিরক্তিভরা কণ্ঠে উত্তর দিলাম—"আচ্ছা তাই হবে।"

নূতন জামা কাপড় দেখে তাদের আনন্দ আর ধরে না। কখনও কিছু পায় নি—সামান্যতেই আনন্দিত হয় খুব বেশী মাত্রায়। দুইভায়ে জামা কাপড় পরে বারে বারে উভয়ে তারিফ করতে করতে ছুটল বারোয়ারীতলার দিকে। উপরের বারান্দা থেকে রমা একদৃষ্টে তাদের দেখছে—আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একটু হেসে মুখটা নামিয়ে নিলে, চঞ্চল কালো আঁখি তারাতে কিরকম যেন তৃপ্তির ছায়া, মুখে চোখে নেমে এসেছে লজ্জার লালিমা—যেন কি একটা অন্যায় কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে তার হাতটা ধরলাম—বুঝলাম, একদিক দিয়ে সে সত্যই বড় নিঃস্ব। সে মা আজও হয়নি—এ দুঃখটা তার অজ্ঞাতসারেই মুখ চোখ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মৃদুকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল "হাত ছাড়, মা নীচে আছেন—দেখতে পাবেন যে"—

দিন যায়। প্রচণ্ড শীত পেরিয়ে এসেছে বর্ষশেষের মাসে। বসন্তের আগমনে চারিদিক সেজে উঠেছে নূতন সাজে। বট-অশথ-পিটুলি-আমড়া প্রভৃতি গাছে এসেছে নব বসন্তের আহ্বান—শ্যামল সাজে সেজে উঠেছে তারা বসন্ত উৎসবে যোগ দিতে। সজনে গাছে ফুল ক'রে—সজনে ডাঁটা দেখা দিয়েছে—অগুনতি ডাঁটায় গাছ ভরে গ্যাছে। এই সময় শিবের গাজন—রত্নেশ্বর শিবের বিরাট মেলা—শত শত লোকজন নরনারী দোকান-পসারে শিব মন্দিরের চারিপাশ ভরে গিয়েছে। কামারপাড়া থেকে সুরু করে জেলেপাড়া পর্যন্ত দোকান বসেছে, ডাক্তারখানার সামনেই বসেছে ভালুক সাপের খেলা, আগুনের খেলা—টিয়া পাখীর খেলা—অদ্ভুত মানব, ঘোড়ার খেলা দেখিয়ে লোককে তাক্‌লাগিয়ে দিচ্ছে। একটা মেয়ে নাকি লড়াই ক'রে একটা ভালুককে হারিয়ে দেয়। তেঁতুলতলার ঠিক ন পুকুরের পাড়ের উপর বসেছে জুয়ার আড্ডা।

গজুর নাকি এই খেলাটা সব চেয়ে ভাল লেগেছে। কেমন চামড়ার জায়গায় গুটিগুলো পুরে নাড়া দিচ্ছে, তারপর কেউ পাচ্ছে ২ পয়সা, কেউবা ৪ পয়সা। এই রকমে খেলোয়াড়ের কালো ৬ পয়সা এনে সাড়ে ৭ আনা জিতেছে। জিতবেই ত এত পয়সা! অবাক হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকে। "ভিড় করো না—ভিড় করো না" বলে ঠেলে সরিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এক পয়সার বেলুন একেবারে ফুলে কুমড়োর মত ছেড়ে দিলে আবার বাঁশীর মত পোঁ করে বাজে—পবন অবাক হয়ে যায়! ওদিকে তালপাতার ছাউনি করে একটা লোক প্রাণপণে চীৎকার করে চলেছে—"যা লেবে তাই ২ আনা, দিলাম বারো গো আনা—যা খুসি লাও গো আনা" ইত্যাদি। হোগ্‌লা পাতার ছাউনী 'বিন্দুবাসিনী রেষ্টুরেন্ট' থেকে একটা ডেঁপো ছোকরা চীৎকার করছে—"কেরাসিন জেলে ভাজা লুচি বাবু, জোর গরম।" পাশের বেণুপদ সাহার দোকান থেকে চীৎকার উঠছে "পেট ঠিকে দু আনা—চলে আসুন বাবু ঝট্‌পট্‌—ঝট্‌পট্‌।"

নানা চীৎকারে—গোলমালে মেলা মুখরিত। ভরতপুরের নকো বাগ্দী কোমরে চাদরটা বেঁধে আসরে নেচে নেচে কবির তান ধরেছে—

"এস ভাই সভার মাঝে বোল কাটিব দু'জনে" পদের শেষে ঢোলটা চুচুন্‌ শব্দে পূর্ণচ্ছেদ স্থাপন করছে। কাঁসিদার ছেলেটা ঢোল কোম্পানীর আমদানী, একটা পা পর্য্যন্ত লম্বা পুরোনো কোটপরে ট্যাং ট্যাং করে কাঁসিটায় তাল দিচ্ছে—চোখে ঘুম ছেয়ে আসছে, হাই উঠছে, তবুও তাল দেবার কামাই নাই।

বেশ খানিকটা রাত্রি হয়েছে, শরীরটা ভাল ছিল না শুয়ে আছি। রাস্তা দিয়ে দু'চারজন মেলা ফেরৎ লোক যাচ্ছে, তাদের কথা বা পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার চারদিক নীরব। পাড়াগাঁ একটু রাত্রি হলেই নিশুতি। হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন কাঁদছে আর একটা কণ্ঠস্বর তাকে চুপ করতে অনুরোধ করছে, কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম যে এ আমাদের রমার পবননন্দনের কণ্ঠস্বর, বললাম "যাও তোমার পবন-নন্দন গন্ধমাদন এনেছেন তাই বোধহয়, আনন্দাশ্রু বইছে—দেখো গে"

ব্যাপার এই যে—আজ মেলা দেখতে যাবার সময় দু'জনে দু'আনা করে চার আনা পয়সা পেয়েছিল। মেলায় গিয়ে গজু ভুলিয়ে কোনরকমে পবনের পয়সা ক'আনা নিয়ে লাভের চেষ্টায় জুয়ার আড্ডায় গিয়েছিলো তারপর যা হয়। সব কিছু হেরে শুধু হাতে ফিরছে। তাই পবনের এত রাগ। পান ফিরতে

ফিরতে গম্ভীরভাবে বসাকে হুকুম করলাম—"দূর করে দাও—আপদ যত সব চোর-জুয়াড়ির আড্ডা—রাতে পর্য্যন্ত শান্তি নাই ?"

বসা কোন রকমে পবনকে থামিয়ে, গজুকে সাবধান করে ফিরে এলো।

* * * *

অনেকদিন গত হয়ে গিয়েছে, গজু পবন এখন আর ছেলে মানুষ নাই—অনেকখানি বয়স হয়েছে, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অনেক পরিবর্ত্তনই এসেছে চারিদিকে। বাড়ীর পাশের ছোট পুকুরটা অনেকখানি বেড়ে উঠেছে, রাস্তাটাতে বর্ষাকালে জল ওঠে, বাড়ীর বাইরে তাল খেজুরের গাছগুলো অনেকখানি ছাড়িয়ে উঠেছে, পাশেই বড় বড় তালগাছদু'টোর একটা বাজপড়ার আঘাতে পোকা লেগে তিলে তিলে মরে পড়ছে।

পাঁচ বৎসর পরের কথা বলছি। বসা কয়েক বছর হল আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। প্রসব হতে গিয়ে সে মারা গেল, শত শত চেষ্টা-সব বিফল করে নিয়তির নির্দ্দিষ্ট পথে সে যাত্রা করল চিরতরে! তার পর থেকে গজু আর পবন আবার ভিক্ষে সুরু করেছে, ভিখিরীর ছেলেকে চাকরী দেবে কে? আমার বাড়ীতেও আর চাকরী করতে চায়না—। অনেকদিন তাদের দেখতে পাইনি, আর তারা আমাদের বাড়ী আসে না। আমাদের সঙ্গে দেখাও করে না কিন্তু কেন? তা বলতে পারলাম না—

বিশ্ব পরিচয়

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ

গোলোক ধাম

পরব্রহ্ম তেজোময়। তাঁহাই যোগীগণ ধ্যান-ধারণাতে চিন্তা করেন। ঐ তেজ মণ্ডলাকার ও কোটি সূর্য্যের সম দীপ্ত। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গোলোক নামক এক নিত্যধাম আছে। তাহা অতি শুভ্র ও গোলাকার। অতএব দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়তঃ ত্রিকোটি যোজন পরিমাণ এবং অতি তেজস্কর মহারত্ন যেখানের ভূমি। এই গোলোক ধাম বৈকুণ্ঠের উপরি ৫০ কোটি যোজন উচ্চ। অপর সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সেবক অনেক গোপ-গোপীগণ আছেন। তথায় কল্পবৃক্ষের যে বন আছে তাহাতে যূথে যূথে কামধেনু চরিয়া থাকে এবং তাহা রাসমণ্ডলে শোভিত ও বৃন্দাবন নামক বনে সমাচ্ছন্ন। আবার বিরজা-নাম্নী মহানদী দ্বারা তাহা চতুর্দ্দিকে বলয়াকারে বেষ্টিত। তদ্রূপ শতশৃঙ্গ নামক পর্ব্বতের শ্রেণীমধ্য রত্নময় শতশৃঙ্গগণেতে প্রকাশিত। ঐ স্থান যোগীগণের অদৃশ্য, কিন্তু বিষ্ণুভক্তগণ দৃশ্য ও গম্য, আর তাহা শূন্যে স্থিত ও ঈশ্বর কর্তৃক যোগ দ্বারা ধৃত রহিয়াছে। (১)

প্রলয়াবসান হইলে পর দেব দেব ভগবান জনার্দ্দন পরমাদ্ভুত স্বীয় গোলোক ধামে গমন করিলেন। ঐ গোলোকধাম মণ্ডলাকৃতি, তিন কোটি যোজন আয়ত, নিরালম্ব, শূন্যে ঈশ্বরেচ্ছায় বায়ু দ্বারা ধার্য্যমাণ হয়। সেই মনোহর ধাম উজ্জ্বল শ্রীযুক্ত আর কামগম, অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বাভিলষিত, সর্ব্ব রত্নে খচিত, অত্যুত্তম প্রাসাদ মণ্ডিত, পরিখা ও রত্নময় প্রাচীর পরিবেষ্টিত। (২)

বৈকুণ্ঠ-ধাম

কথিত আছে যে পৃথিবীর ৮ কোটি যোজন উপরে সত্যলোক, ঐ সত্যলোকের উপরে বহু যোজন পরিমিত বৈকুণ্ঠ-ধাম আছে অর্থাৎ পৃথিবী হইতে ১৮ কোটি যোজন উপরে বৈকুণ্ঠ, যে স্থানে সকলের অন্তর্যামী সাক্ষাৎ শ্রীপতি বিরাজমান আছেন। বৈকুণ্ঠের ১০ কোটি যোজন উত্তরে তির্য্যগ্‌ভাবে শিবলোক অর্থাৎ কৈলাস নামক পর্ব্বত আছে। (৩)

মেঘ-প্রভাময় প্রাচীর বেষ্টিত ও রত্নময় বিমান অর্থাৎ সার্ব্বভৌম গৃহ-বিশিষ্ট যে উক্ত স্থান, তাহার মধ্যে অযোধ্যা নামে দিব্য নগরী। ঐ নগরীর ৪ দ্বার এবং স্বর্ণ গোপুর অর্থাৎ কটক আছে। তাহা চণ্ডাদি দ্বারপাল এবং কুমুদাদি দিক্‌পাল দ্বারা সুরক্ষিত। পূর্ব্বদ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড দ্বারপাল এবং দক্ষিণ দ্বারে ভদ্র ও সুভদ্র এবং পশ্চিম দ্বারে জয় ও বিজয় আর উত্তর দ্বারে ধাতা ও বিধাতা দৌবারিকরূপে অবস্থিত আছেন

---

(১) তেজোরূপঞ্চ পরব্রহ্ম, ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সদা।
তত্তেজো মণ্ডলাকারং, সূর্য্য কোটিসম প্রভং।
নিত্যং স্থানঞ্চ প্রবরং গোলোকাভিধমেব চ।
ত্রিকোটি যোজনায়াম বিস্তীর্ণং বর্ত্তুলাকৃতং।
তেজঃ স্বরূপং সুমহদ্রত্নভূমিময়ং পরং।
ঊর্দ্ধং স্থিতঞ্চ বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎ কোটি যোজনৈঃ।
গো-গোপ-গোপী সংযুক্তং কল্পবৃক্ষসমন্বিতং।
কামধেনুভিরাকীর্ণং রাসমণ্ডল মণ্ডিতং।
বৃন্দাবন বনাচ্ছন্নং বিরজা বেষ্টিতং শুভে।
শতশৃঙ্গ শতশৃঙ্গৈঃ [illegible]।
অদৃশ্যং যোগিভিঃ স্বপ্নে, দৃশ্যং গম্যঞ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
যোগেনাধৃতমীশেন চান্তরীক্ষস্থিতং বরং।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

(২) অন্তেতু প্রলয়ে তস্মিন্ দেব দেব জনার্দ্দনঃ।
জগাম পরমং ধামঃ স্বকীয়ং পরমাদ্ভুতঃ।
শূন্যস্থিতং নিরাধারং ত্রিকোটি যোজনায়তং।
বায়ুনা ধার্য্যমানং হি একমেবেশ্বরেচ্ছয়া।
রম্যং কামগমং দিব্যং সর্ব্বরত্ন সমাচিতং।
প্রাসাদৈঃ পরিখাভিশ্চ প্রাচীরৈঃ সুসমাবৃতং।
—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, উত্তর খণ্ড (৫ম অধ্যায়)

(৩) উপরিষ্টাৎ স্থিতেহষ্টৌ কোটীঃ সত্যমীরিতঃ।
সত্যাদুপরি বৈকুণ্ঠো যোজনানাং প্রমাণতঃ।
ভূর্লোকাৎ পরিসংখ্যাত কোটিরষ্টাদশ প্রভো।
যস্মিন্ শ্রীপতিঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বাত্মক প্রভুঃ।
বৈকুণ্ঠাদুত্তরে শৈবলোকো যোজনং কোটিঃ।
তির্য্যগেব মহারাজ কৈলাসাখ্য পর্ব্বতঃ।
—পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড (৬ষ্ঠ অধ্যায়)

এবং কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্বনেত্র, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত রক্ষিগণ অষ্টদিকে আছে। (৪)

এই সকল গজের মতান্তরে নাম, যথা:—উত্তরে সার্বভৌম, ঈশানে সুপ্রতীক, পূর্বে ঐরাবত, অগ্নিকোণে পুণ্ডরীক, দক্ষিণে বামন, নৈর্ঋতে কুমুদ, পশ্চিমে অঞ্জন, বায়ুকোণে পুষ্পদন্ত।

বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথিবীর বৃন্দাবন পর্য্যন্ত দেবতাদিগের বাস। (৫)

ব্রহ্মাণ্ড

সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকাদি গ্রহ, দিবা, রাত্রি প্রভৃতি কোন কিছুই ছিল না। সর্ব্ব-দীপ্তির অভাবে সবই অন্ধকারাচ্ছাদিত ছিল। সে-সময় কেবল নিত্য-সত্য-অদ্বিতীয় পর-ব্রহ্মমাত্র ছিলেন। তিনি অনাদি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ লীলা করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্বয়ং ঐশ্বর্য্যরূপ ধারণ কৃষ্ণরূপে আবির্ভাব হইলেন। (৬)

স্বীয় শরীর হইতে নানাবিধ প্রজার সৃষ্টি করণেচ্ছু হইয়া সেই ভগবান প্রথমতঃ জল সৃজন করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলেন। সেই বীজে হেমবর্ণ সূর্য্যের দীপ্তি বিশিষ্ট একটি অণ্ড উৎপন্ন হইলে পর তাহাতে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। সেই ভগবান্ ব্রহ্মা আত্ম-পরিমাণে এক বৎসর কাল পূর্বোক্ত অণ্ডে স্থিতি করিয়া অণ্ড বিভক্ত হউক, এই আত্মগত চিন্তামাত্রে দ্বারা ঐ অণ্ডকে দুই ভাগ করিলেন। ঐ দ্বিখণ্ডিত অণ্ড দ্বারা তিনি স্বর্গ ও ভূর্লোক অর্থাৎ ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ ও অধঃ খণ্ডে ভূর্লোক, আর উভয়ের মধ্যভাগে আকাশ ও অষ্টদিক ও স্থিরতর জলস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। (৭)

এতাদৃশ কোটি কোটি অণ্ড সৃষ্ট হয়। তাহার প্রত্যেক অণ্ডে চতুর্দশ ভুবন, এক ব্রহ্মা, এক বিষ্ণু ও এক রুদ্র আছেন। (৮)

ক্রমে প্রতি বিশ্বে সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত-সাগর, আর সপ্ত-দ্বীপ সংযুক্ত পৃথিবী এবং কাঞ্চনীভূমি ও তৎপর অন্ধকারময় স্থল ও সপ্ত পাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে। (৯)

ভগবান বলিয়াছেন,—"আমার আজ্ঞায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড স্ব স্ব মধ্যবর্ত্তী বস্তু সকলের সহিত গত হইয়াছে, ও বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে।" অর্থাৎ প্রলয়কালে নাশ পাইয়া পুনঃ সৃষ্টিকালে সৃষ্ট হইবে। (১০)

চতুর্দ্দশ ভুবন

ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, উপর্য্যুপরি ক্রমে এই সপ্ত লোক আছে। (১১)

অগ্নিপুরাণেও ভূ, ভুব, স্বর্গ, মহ, জন, তপ, সত্য প্রভৃতি এই সপ্তলোকের বিষয় উল্লিখিত আছে। (১২)

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে ভূর্লোক অবস্থান। স্বর্গ এবং ভূমির যে অন্তর তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল। সূর্য্য ও অণ্ডগোলক এই দুইয়ের মধ্যস্থলের পরিমাণ সর্বতোভাবে ২৫ কোটি যোজন। (১৩)

সমুদ্র, পর্ব্বত ও কানন সহিত যে পরিমাণ ভূভাগ চন্দ্রসূর্য্যের কিরণে প্রতিভাত হয়, উপরে আকাশমণ্ডল তাবৎ পরিমাণ বিস্তার অর্থাৎ ২৫ কোটি যোজন। (১৪)

ভূ-আদি উপরি স্থিত সপ্তলোক ও অতলাদি সপ্ত পাতাললোক, এই চতুর্দ্দশ লোকে অর্থাৎ ভুবনে এক ব্রহ্মাণ্ড হয়। (১৫)

---

(৪) প্রাকারৈশ্চ বিমানৈশ্চ, সৌধৈরত্নময়ৈর্বৃতঃ।
তন্মধ্যে নগরী দিব্যা সাযোধ্যেতি প্রকীর্ত্তিতা।
চতুর্দ্বারসমাযুক্তা হেমগোপুরসংযুতা।
চণ্ডাদি দ্বারপালৈশ্চ, কুমুদাদ্যৈঃ সুরক্ষিতা।
চণ্ড-প্রচণ্ডৌ-প্রাক্দ্বারে, যাম্যে ভদ্রসুভদ্রকৌ।
বারুণ্যাং জয়বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃবিধাতকৌ।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথবামনঃ।
শঙ্কুকর্ণঃ সর্বনেত্রঃ সুমুখ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
—পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড (২১শ অধ্যায়)

(৫) বৈকুণ্ঠাদিতো দেবানাং বাসঃ বৃন্দাবনং ভুবি।
—বরাহ-সংহিতা (প্রথমাধ্যায়)

(৬) আসীত্তমোময়ং সর্বমনন্ত অপ্রজ্ঞাতকং।
অচন্দ্রমনহোরাত্রমনগ্ন্যনীল ভূতলং।
অপ্রধানং বিয়চ্ছূন্যং সর্বতত্ত্ববিবর্জ্জিতং।
সদঃ ব্রহ্মেতি যচ্ছ্রুত্যা সদেকং প্রতিপাদ্যতে।
অবৈকল্প চাত্তো দিব্যৌজ্জা ভবৎ বিভু।
অমূর্ত্তেন স্বমূর্ত্তিশ্চ তেনাকরি বলীলয়া। —স্কন্দ-পুরাণ।

(৭) সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসুবীজমবাসৃজৎ।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভং।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোক পিতামহঃ।
তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরং।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা।
তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোমদিশশ্চাষ্টৌ, অপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতং।
—মনু-সংহিতা।

(৮) অণ্ডানামীদৃশানান্তু কোট্যোজ্ঞেয়াঃ সহস্রশঃ,
অণ্ডেষ্বেতেষু সর্ব্বেষু, ভুবনানি চতুর্দ্দশঃ।
তত্র তত্র চতুর্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ।—লিঙ্গ-পুরাণ।

(৯) বিশ্বে বিশ্বে বিনির্ম্মাণং স্বর্গাঃ সপ্তক্রমেণবৈ।
সপ্ত সাগর সংযুক্তা, সপ্তদ্বীপাবসুন্ধরা।
কাঞ্চনী ভূমিসংযুক্তা তমোভূদেশঃ ততঃ।
পাতালাশ্চতথা সপ্ত, ব্রহ্মাণ্ডমেতদেব চ।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (৮০ অধ্যায়)।

(১০) অতীতান্যপ্যসংখ্যানি ব্রহ্মাণ্ডানি মমাজ্ঞয়া,
প্রবৃত্তানি পদার্থৈস্তু সহিতানি সমন্ততঃ।
ব্রহ্মাণ্ডানি ভবিষ্যন্তি সহবস্তুভিরাত্মগৈঃ। —ঈশ্বর-গীতা।

(১১) ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহর্জনস্তপশ্চৈব সত্যলোকশ্চ সপ্তমঃ। —শিব-পুরাণ।

(১২) ভূর্ভুবঃস্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপ এব চ।
সত্য লোকশ্চ সপ্তৈব লোকাস্তু পরিকীর্ত্তিতাঃ।
—অগ্নি-পুরাণ।

(১৩) অণ্ড মধ্যগতঃ সূর্য্যো দ্যাবা ভূম্যোর্যদন্তরং।
সূর্য্যাণ্ডগোলয়োর্মধ্যে কোট্যঃস্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
—শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২০শ অধ্যায়)

(১৪) যাবতীভূঃ সমুদ্রৈস্তৈঃ সশৈলবনকাননা।
প্রতিভাতা মহারাজ, কিরণৈশ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
বিয়চ্চতাবদুপরি বিস্তার পরিমণ্ডলঃ।
পঞ্চবিংশতি কোট্যস্তু যোজনানান্ত তৎস্মৃতঃ।
পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড (৬ষ্ঠ অধ্যায়)

(১৫) সপ্তভূরাদয়োলোকাঃ পাতালাদিচ সপ্তবৈ।
প্রতিব্রহ্মাণ্ডমেতানি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।—শিবরহস্য-তন্ত্র।

ভূর্লোক—যে যে স্থল পাদচারণের যোগ্য ভূমিষ্ঠ, তাহার নাম ভূর্লোক। (১৬)

পৃথিবী বিস্তারে ৫০ কোটি যোজন এবং তাহার উচ্চতা ৭০ সহস্র যোজন। (১৭)

লিঙ্গপুরাণেও কথিত হইয়াছে যে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রযুক্তা এবং লোকালোক পর্ব্বতে আবৃত পৃথিবী বিস্তারে ৫০ কোটি যোজন। (১৮)

ভুবর্লোক—ভূ-আদি সপ্তলোক মধ্যে দ্বিতীয় ভুবনের নাম ভুবর্লোক। ভূমি এবং সূর্য্য এই উভয়ের মধ্যে সিদ্ধাদি মুনি সেবিত যে বিস্তৃতাংশ তাহাই ভুবর্লোক বলিয়া কথিত আছে। ভুবর্লোক ৯৯৯০০ যোজন ঊর্দ্ধ। (১৯)

পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত ভুবর্লোক, দিবাকর হইতে ধ্রুব পর্য্যন্ত স্বর্লোক, ক্ষিতির ঊর্দ্ধে মহর্লোক এক কোটি যোজন পরিমিত এবং জনলোক ২ কোটি যোজন। (২০)

কেহ কেহ বলেন, সূর্য্যের অধোভাগে দশ সহস্র যোজন অন্তরে রাহুগ্রহ নক্ষত্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে। ঐ রাহুর অধোভাগে থাকিয়া সূর্য্যদেব উত্তাপ দেন। সূর্য্য-মণ্ডল ১০ সহস্র, চন্দ্র মণ্ডল ১২ সহস্র ও রাহু গ্রহের মণ্ডল ১৩ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। রাহু গ্রহের ১০ সহস্র যোজন নীচে সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধরদের বাসস্থান। তাহার অধোভাগে যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, ভূত, প্রেতগণের বিহারাঙ্গন। ঐ স্থান শূন্য, তাহাতে গ্রহাদি নাই। যতদূর পর্য্যন্ত মেঘ সকল দৃষ্ট হয় এবং বায়ু প্রকৃষ্টরূপে প্রবাহিত হয়, ঐ স্থান অর্থাৎ যক্ষাদির বাসভূমি ততদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। তাহার নিম্নভাগে শতযোজনান্তরে এই পৃথিবী। যে পর্য্যন্ত হংস, ভাস, শ্যেন, সুপর্ণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পক্ষী উড্ডীয়মান হয়, সেই পর্য্যন্ত ভূর্লোকের সীমানা। (২১)

ভূমির ঊর্দ্ধে ১০ সহস্র যোজন পর্য্যন্ত সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ভূতপ্রেত, পিশাচদিগের আবাসস্থান, তাহার উপরে ১৩ সহস্র যোজন বিস্তার রাহুর মণ্ডল কথিত আছে। (২২)

স্বর্লোক—ভুবর্লোকের পর ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত স্বর্লোক। (২৩)

পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত ১ লক্ষ যোজন যে বিয়ৎ অর্থাৎ আকাশ-ভাগ তাহাকে ভুবর্লোক কহে। তাহার ঊর্দ্ধে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত ১৪ লক্ষ যোজন পরিমিত স্বর্লোক। (২৪)

পৃথিবীর ঊর্দ্ধে ১ লক্ষ যোজনান্তরে সূর্য্য, তাহার উপরে ১ লক্ষ যোজন দূরে চন্দ্র, তাহার ঊর্দ্ধে ২ লক্ষ যোজনান্তে অভিজিৎ সহিত ২৮ নক্ষত্র, তাহার ২ লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে শুক্র, শুক্র হইতে ২ লক্ষ যোজন উপরে বুধ। বুধের ২ লক্ষ যোজন উপরে মঙ্গল, মঙ্গলের উপরিভাগে ২ লক্ষ যোজনান্তে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির ২ লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে শনি, শনির ঊর্দ্ধে ১১ লক্ষ যোজন পর দেবর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণের ১৩ যোজনান্তরে ধ্রুবলোক অবস্থিত। (২৫)

মহর্লোক—ভূর্লোক হইতে চতুর্থ যে মহর্লোক তাহাতে কল্পবাসিগণ বাস করেন। (২৬)

পৃথিবীর ঊর্দ্ধে মহর্লোক এক কোটি যোজন পরিমিত বলিয়া জানিতে পারা যায়। (২৭)

স্কন্দ-পুরাণ হইতেও জানা যায় যে পৃথিবীর ঊর্দ্ধে এক কোটি যোজন পরিমিত মহর্লোক এবং দুই কোটি যোজন জনলোক। (২৮)

তপোলোক—ইহার উপরে তপোলোক। তাহা তেজোময় এবং তথায় বিদ্যমান যে দেবতাগণ তাঁহারা ব্রহ্ম দেব কর্ত্তৃক পূজিত হন। তপোলোক ৪ কোটি যোজন বিস্তৃত। (২৯)

---

(১৬) পাদগম্যন্তু যৎকিঞ্চিদ্বস্ত্বস্তি পৃথিবীময়ং। — বিষ্ণু-পুরাণ।

(১৭) পঞ্চাশৎ কোটি বিস্তারা সেয়মুর্ব্বী মহামুনে।
সপ্ততিস্তু সহস্রাণি দ্বিজোচ্ছ্রায়োপি কথ্যতে ॥
—বিষ্ণু-পুরাণ।

(১৮) পঞ্চাশৎ কোটি বিস্তীর্ণা সসমুদ্রা ধরা স্মৃতা।
দ্বীপৈশ্চ সপ্তভির্যুক্তা লোকালোকাবৃতা শুভা ॥
—লিঙ্গ-পুরাণ।

(১৯) ভূম্যাদিসপ্তলোকান্তর্গতো দ্বিতীয় লোকঃ। যথা—ভূমি-সূর্য্যান্তরং যচ্চ, সিদ্ধাদি মুনি সেবিতং। ভুবর্লোকস্তু সোপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম। স্যাৎ শতহীন লক্ষ যোজনমূর্দ্ধে।—বিষ্ণু-পুরাণ।

(২০) ভূর্লোকোহথ ভুবর্লোকঃ সূর্য্যাবধি সমীরিতঃ।
আদিত্যাদাধ্রুবং রাজন্, স্বর্লোকঃ কথ্যতে বুধৈঃ।
মহর্লোকঃ ক্ষিতেরূর্দ্ধমেক কোটি প্রমাণতঃ।
কোটিদ্বয়ে বর্ত্তমানো জনোলোকস্ততো নৃপ ॥
—পদ্ম-পুরাণ, স্বর্গ খণ্ড (৬ষ্ঠ অধ্যায়)

(২১) অধস্তাৎ সবিতুর্যোজনাযুতে স্বর্ভানুর্নক্ষত্রবচ্চরতি ইত্যেকে।
যদদস্তরণেমণ্ডলং প্রতপতস্তদ্বিস্তরতো যোজনাযুত মাচক্ষতে।
দ্বাদশ সহস্র সোমস্য, ত্রয়োদশ সহস্রং রাহোঃ।
ততোঽধস্তাৎ সিদ্ধচারণবিদ্যাধরাণাং সদনানি তাবন্মাত্র এব।
ততোঽধস্তাদ্ যক্ষরক্ষঃপিশাচ ভূতপ্রেতগণানাং বিহারাজির
মন্তরীক্ষং যাবদ্ বায়ুঃ প্রবাতি, যাবন্মেঘা উপলভ্যন্তে।
ততোঽধস্তাচ্ছতযোজনান্তর ইয়ং পৃথিবী, যাবদ্ধংস ভাসশ্যেন
সুপর্ণাদয়ঃ পতত্রি প্রবরা উৎপতন্তি।
—শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২৪শ অধ্যায়)

(২২) নবতীনাং সহস্রাণি যোজনানি মহীপতে।
ভূমেরূর্দ্ধঞ্চ লোকানাং সিদ্ধচারণ রক্ষসাং।
যেচ বিদ্যাধরা যক্ষকোগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ, ভূত, প্রেত,
পিশাচাশ্চ তেষাং তৎস্থানমীরিতং।
ততো রাহোর্মহাবাহো, ত্রয়োদশ সহস্রকং,
যোজনানাং প্রবিস্তারং মণ্ডলং তস্য কথ্যতে।
—পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড (৬ষ্ঠ অধ্যায়)

(২৩) স্বর্লোকস্তু ভুবর্লোকোৎপরো ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃতঃ।
—পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড (৬ষ্ঠ অধ্যায়)

(২৪) ভূর্লোকাৎ সূর্য্যপর্য্যন্তং লক্ষযোজনসম্মিতঃ।
বিয়তে যোবিয়দ্ভাগঃ ভুবর্লোকস্ততঃ বিদুঃ।
স্বর্লোকস্তদূর্দ্ধেষু, ধ্রুবলোকান্ত বিস্তৃতঃ।
যোজনানিচ লক্ষাণি চতুর্দ্দশ মেতানিবৈ।—
(ব্রহ্মাণ্ডবিবরণে—আত্মারাম ভট্টাচার্য্যেণোক্তং)

(২৫) ভুবর্ঊর্দ্ধস্থিতোভানুর্যোজনানামেক লক্ষকং। তদূর্দ্ধং লক্ষমেকঞ্চ, নিশানাথো বিরাজতে। সাভিজিৎ তারকাঃ শুক্রঃসোম সূনুশ্চ মঙ্গলঃ। বৃহস্পতিশ্চসৌরিশ্চ অন্তর্জ্যোতির্গণাঃ শুভাঃ। লক্ষদ্বয়ং সর্ব্বে, ঊর্দ্ধা উত্তরোত্তরং। তত একাদশং লক্ষং দেবর্ষিগণ ঊর্দ্ধতঃ। ত্রয়োদশ-লক্ষাণাং ধ্রুবস্থানং সমূর্দ্ধতঃ। —শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২২।২৩ অধ্যায়)।

(২৬) চতুর্থেতু মহর্লোকে তিষ্ঠন্তি কল্পবাসিনঃ।—দেবী-পুরাণ।

(২৭) মহর্লোকঃ ক্ষিতেরূর্দ্ধমেক কোটি প্রমাণতঃ।
—পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড (৬ষ্ঠ অধ্যায়)

(২৮) মহর্লোকঃ ক্ষিতেরূর্দ্ধমেক কোটি প্রমাণতঃ।
কোটিদ্বয়েস্থিতঃখ্যাতো জনো ভূর্লোকতো জনৈঃ।
—স্কন্দ-পুরাণ, কাশীখণ্ড।

(২৯) অতোপরিস্থিতস্তপোলোকস্তেজোময় উদাহৃতঃ।
বৈরাজাখ্যাস্তত্রদেবা, ব্রহ্মদেবৈঃপ্রপূজিতাঃ।

* * * *

তপস্ত কোটিচতুষ্টয়ং বিস্তৃতঃ। পদ্মপুরাণ

সত্য বা ব্রহ্মলোক—তপোলোকের পর সত্যলোক। তথায় মৃত্যু নাই। তাহাকে ব্রহ্মলোকও বলা হয়।

তপোলোকের পর জনলোকের ছয়গুণ অর্থাৎ ১২ কোটি যোজন সত্যলোক। তপোলোকের ষড়্‌গুণ নহে। তাহা হইলে ৪৮ কোটি যোজন উচ্চ যে ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে তাহার স্থানের অভাব হয়। যেহেতু সূর্য্য ও অণ্ডগোলের মধ্যে ২৫ কোটি যোজন ব্যবধান ইহা শুকদেব বলিয়াছেন। কক্ষ অর্থাৎ প্রকোষ্ঠ ও ব্রহ্মের অধিষ্ঠান ভেদে সত্যলোকই বৈকুণ্ঠ আদি বলিয়া কথিত হয়। তাহা ধ্রুব হইতে ২৩ কোটি ১৭ লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে। সত্যলোকের ১৫ লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে অণ্ডকটাহ, ২ কোটি যোজন নহে। (৩০)

পাতাল

অবনির অধোভাগে সাতটী বিবর আছে। তাহার এক একটি ১০ সহস্র যোজন করিয়া অন্তরে থাকাতে পর পর হইতে প্রথম প্রথমটি উচ্ছ্রিত এবং ভূমির যে বিস্তার তাবৎ পরিমিত প্রত্যেকের বিস্তার। পাতালের নাম, যথা:—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল। অধোভুবনে ভবন, উদ্যান, ক্রীড়াস্থান, বিহারস্থান সকল স্বর্গাপেক্ষাও অধিক রম্য এবং কামভোগ, ঐশ্বর্য্য, আনন্দ, সন্ততি ও সম্পত্তি দ্বারা অতিশয় সমৃদ্ধ। ঐ সকল স্থানে দৈত্য-দানব ও কদ্রুনন্দনগণ গৃহপতি হইয়া পরমসুখে বসতি করিতেছে। তাহাদের পুত্র কলত্র, সুহৃৎ-মিত্র ও অনুচরগণ নিত্য অনুরক্ত ও সতত প্রমোদিত। অধিকন্তু ঈশ্বর হইতেও তাহাদের অভিলাষ কখনও প্রতিহত হয় না। তাহারা সর্ব্বদা মায়াযোগে আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকে। ঐ সকল বিবরে মায়াবীপ্রধান ময়দানবের কৃত্রিম কৃত্রিম পুরী দীপ্তি পাইতেছে। উত্তম ভবন, প্রাচীর, ফটক, সভা, চৈত্য, চত্বর, আয়তন ইত্যাদি সব প্রধান প্রধান মণিসমূহে বিরচিত। বিবরবাসিদিগের বৃহৎ বৃহৎ গৃহসকলের ভূভাগ, নাগ, অসুর, কপোত মিথুন ও শুক-সারিকায় আকীর্ণ। অতএব ঐ সকল বিবর ঐ সমুদয় দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। (৩১)

আত্মারাম ভট্টাচার্য্য বলেন যে অনেক দানব পাতালে বাস করিয়াও নিজ নিজ বিক্রমে স্বর্গ ও পৃথিবীকে অধিকার করিয়া রাজ্য ভোগ করে। যথা:—তারক, তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী, ময়, ত্রিপুর, অন্ধক, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বলি, বৃত্র, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, মধু, কৈটভ, মহীষ, দুর্গ প্রভৃতি দৈত্যগণ। (৩২)

বিষ্ণু পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে এই সপ্ত পাতালের প্রত্যেক লোক ১০ সহস্র যোজন পরিমিত পৃথিবীর নিম্নভাগে অবস্থিত। তাহাতে বহুসংখ্যক দানব-দৈত্য, সর্প ও নাগজাতি বাস করে। (৩৩)

অতল—এই স্থানে ময়দানবের পুত্র বলাসুর বাস করে। তাহা হইতে ৯৬ প্রকার মায়ার সৃষ্টি হয়। (৩৪)

বিতল—অতলের নীচে বিতল। তাহাতে সপার্ষদ ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া হাটকেশ্বর শিব আছেন। (৩৫)

সুতল—তাহার অধোভাগে সুতল, সেখানে উদারশ্রবা পুণ্যশ্লোক বিরোচন পুত্র বলি আছেন। (৩৬)

তলাতল—তাহার নীচে তলাতলে দানবেন্দ্র ময়দানব বাস করেন। (৩৭)

মহাতল—তাহার নিম্নে মহাতল। এই স্থানে কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেণ প্রভৃতি বহু শত ফণাধারী, ক্রোধপরায়ণ সর্প বাস করিতেছে। তাহারা ভগবৎ বাহন গরুড়ের ভয়ে নিরন্তর উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। (৩৮)

রসাতল—তাহার নীচে রসাতলে দিতিপুত্র দানবগণ ও নিবাত, কবচ প্রভৃতি কালকেয় অসুরকুল হিরণ্যপুরে বাস করে। (৩৯)

পাতাল—রসাতলের অধোভাগে বাসুকি প্রভৃতি নাগলোকাধিপতিগণ অর্থাৎ শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর, দেবদত্ত প্রভৃতি মহাফণাধারী মহাক্রোধীসর্প সকল বাস করিতেছে। (৪০)

---

(৩০) ষড়্‌গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে।
অপুনর্মারকা যত্র, ব্রহ্মলোকোহিসস্মৃতঃ।

জনলোকাপেক্ষয়ৈব ষড়্‌গুণেন দ্বাদশকোট্যাত্মকেন তপোলোকাদূর্দ্ধ্বং সত্যলোকঃ। নতু তপোলোকাৎ ষড়্‌গুণেনেতি মন্তব্যং।

তথা সত্যাষ্টচত্বারিংশৎ কোট্যাত্মকেন ব্রহ্মাণ্ডে তস্যাবকাশাভাবাৎ। সূর্য্যাণ্ডগোলয়োরন্তরে কোট্যঃ পঞ্চবিংশতিরিতিশুকোক্তেঃ। সত্যলোকে এবকক্ষাভেদেন, ব্রহ্মধিষ্ণ্যং পরং বৈকুণ্ঠ লোকাদিভেদাঃ। এবং ধ্রুবাদূর্দ্ধ্বং সপ্তদশলক্ষোত্তরা ত্রয়োবিংশতি কোট্যোঽবধি সত্যলোকাদূর্দ্ধ্বং পঞ্চদশলক্ষো নকোটিদ্বয়ো হণ্ডকটাহঃ।—

—বিষ্ণু-পুরাণ (২য় অংশের ৭ম অধ্যায়)

(৩১) অবনেরধস্তাৎসপ্ত ভূবি-বরাঃ। একৈকশোযোজনাযুতান্তরেণায়াম্‌ বিস্তারেণোপক্লৃপ্তাঃ যথা। অতলং বিতলং সুতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পাতালং। এতানি সপ্তপাতালানি ক্রমাদধোধঃ সংস্থিতানি। এতেষু বিলস্বর্গেষু স্বর্গাদপ্যধিক কামভোগৈশ্বর্য্যানন্দভূতি বিভূতিভিঃ সুসমৃদ্ধভবনোদ্যানা ক্রীড় বিহারেষু দৈত্যদানব কাদ্রবেয়া নিত্য প্রমোদিতানুরক্ত কলত্রাপত্য বন্ধু সুহৃদনুচরা। গৃহপতয় ঈশ্বরাদপ্য প্রতিহতকামা মায়াবিনোদা নিবসন্তিষেষু মহারাজময়েন মায়াবিনা-বিনির্ম্মিতাঃ পুরো নানামণি প্রবর প্রবেক বিরচিত বিচিত্রভবন প্রাকার গোপুর সভাচৈত্য চত্বরায়তনাদিভির্নাগাসুর মিথুনপারাবত শুকসারিকাকীর্ণ কৃত্রিমভূমিভির্বিবরেশ্বর গৃহোত্তমৈঃ সমলঙ্কৃতাশ্চ কাসতে।

শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২৪ অধ্যায়)।

(৩২) পাতালস্থিতা অপিবহবো দানবাঃ স্ব স্ব বিক্রমেণ স্বর্গং পৃথিবীঞ্চাধিকৃত্যভুঞ্জতে। যথা তারক, তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী, ময়, ত্রিপুর, অন্ধক, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বলি, বৃত্র, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, মধু, কৈটভ, মহীষ, দুর্গ, প্রভৃতয়োদৈত্যাঃ। —আত্মারাম ভট্টাচার্য্য।

(৩৩) দশ সহস্র মেকৈকং পাতালং পরিকীর্ত্তিতং।
তেষু দানবদৈত্যেয় জাতয়ঃ শত সংঘশঃ ইত্যাদয়ঃ।

—বিষ্ণু পুরাণ।

(৩৪) অতলময়পুত্রোঽসুরোবলো নিবসতি, যেনহবা ষণ্ণবতির্মায়াঃ। —শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২৪ অধ্যায়)।

(৩৫) ততোঽবিতলে হরোভগবান্‌ হাটকেশ্বরঃ সপার্ষদ ভূতগণাবি বেষ্টিতো বিরাজতে। —শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২৪ অধ্যায়)।

(৩৬) ততোঽধস্তাৎ সুতলেউদারশ্রবা পুণ্যশ্লোকো বিরোচনাত্মজো বলিরাস্তে। —শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২৪ অধ্যায়)।

(৩৭) ততোঽধস্তাত্তলাতলে ময়ো নাম দানবেন্দ্রো মহীয়তে।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২৪ অধ্যায়)।

(৩৮) ততোঽধস্তান্মহাতলে কাদ্রবেয়াণাং সর্পাণাং নৈকশিরসাং ক্রোধবশো-নামগণাঃ কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেণাদি প্রধানা মহাভোগবন্তঃ পতত্রিরাজাধিপতেঃ পুরুষবাহাদনবরত উদ্বিজমানা বিহরন্তি।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২৪ অধ্যায়)।

(৩৯) ততোঽধস্তাদ্রসাতলে দৈত্যাদানবাপনয়ো নাম নিবাতকবচাঃ কালেয়া হিরণ্যপুরবাসিনো বসন্তি।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২৪ অধ্যায়)।

(৪০) ততোঽধস্তাৎ পাতালে নাগ লোকপতয়ো বাসুকি প্রমুখো যথা—শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বলাশ্বতর, দেবদত্তাদয়ো মহাভোগিনো মহামর্ষা নিবসন্তি।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২৪ অধ্যায়)।

অনন্ত

পাতালের মূলদেশে ৩০ সহস্র যোজন অন্তরে ভগবানের তামসী নামে যে এক কলা অর্থাৎ অংশ আছে, তাহার নাম অনন্ত। (৩১)

এইখানেই অনন্তদেবের অবস্থিতি। বিষ্ণু পুরাণকার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, পাতালের অধোভাগে বিষ্ণুর যে তমোময়ী মূর্তি আছে, তাহার নাম অনন্ত।

তাঁহার মস্তকে সহস্র ফণা ও ফণার উপরে সহস্র মণি ও মণির জ্যোতিঃশিখাতে অরুণবর্ণা হইয়া পৃথিবী পুষ্পমালার সদৃশ ধৃতা আছেন। তাহার বীর্য ব্যাখ্যা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যৎকালে অনন্ত হাই তুলেন, তৎকালে পর্বত, সমুদ্র, কানন সহিত এই পৃথিবী কম্পিতা হন। তাহার পর অণ্ডকটাহে সর্বতোভাবে অবনী বেষ্টিতা। (৩২)

সপ্ত সাগরে যে পরিমাণ জল আছে, অণ্ডকটাহের গর্ভে তৎ পরিমিত জল রহিয়াছে। ঐ কটাহ ১ কোটি যোজন দূর।

সেই জল মধ্যে কূর্ম ও তদুপরি অনন্তদেব আছেন। (৩৩)

নরক

ত্রিলোকমধ্যে দক্ষিণদিকে ভূমির নীচে ও জলের উপরে যেখানে অগ্নিষাত্তাদি পিতৃগণ বাস করিয়া পরম সমাধি অবলম্বনপূর্বক স্ব স্ব বর্গ ব্যক্তিদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, অথবা যে স্থানে ভগবান পিতৃপতি যম স্বগণ সহিত বসিয়া স্বীয় পুরুষের কর্তৃক আনীত মৃতগণের কর্মানুসারে দোষাদোষের বিচারপূর্বক দণ্ড বিধান করণে কোন অংশে ভগবানের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতেছেন না, সেই স্থানে এক বিংশতি নরক আছে। ঐ সমুদায় নরকের নাম, যথা :—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তসূর্মি, বজ্রকণ্টক, শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান। এতদ্ব্যতীত আরও সাতটি নরক আছে। যথা :—ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণ, ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধ, পর্যাবর্তন, সূচীমুখ। এই সমুদায়ে অষ্টাবিংশতি নরক বিবিধ যাতনাস্থল, নানা পাপের শাসনস্থান। এই সমস্ত নরকে সংসারীর দুর্বৃত্ত, কলুষকারী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পাপানুসারে পতিত হইয়া শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। (৩৪)

---

(৩১) তস্য মূলদেশে ত্রিংশৎ যোজন সহস্রান্তর আস্তে যা বৈকলা ভগবতস্তামসী. সমাখ্যাতানন্তঃ।—শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২৫ অধ্যায়)

(৩২) পাতালানামধশ্চাস্তে. বিষ্ণোর্যা তামসী তনুঃ। শেষাখ্যা তদ্‌গুণান্ বক্তুং ন শক্তা দৈত্য দানবাঃ।

যেনেয়ং সকলা পৃথ্বী, ফণামণিশিখারুণা আস্তে কুসুমমালেব কস্তদ্বীর্যং বদিষ্যতি। যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তো মদাঘূর্ণিত লোচনঃ। তদা চলতি ভূরেষা, সাদ্রিতোয়াব্ধিকাননা। ততশ্চাণ্ড কটাহেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতঃ।—

—বিষ্ণু পুরাণ।

(৩৩) সপ্তসাগর মানন্তু, সর্বোৎপ্লবসমন্বয়ঃ কোটিযোজন মানস্তু কটাহঃ সংব্যবস্থিতঃ। [illegible]।
তন্মধ্যে সংস্থিতঃ কূর্মঃ শেষস্তদুপরিস্থিতঃ। —[illegible]।

(৩৪) অন্তরাল এব ত্রিজগত্যাস্তু দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ্ভূমে, রূপরিষ্টাচ্চ জলাৎ। যস্যামগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ সমাধিনা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি। যত্রহবাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্বপুরুষৈর্জন্তুষু যথা কর্মাবদ্যং দোষমেবানুল্লঙ্ঘিত ভগবচ্ছাসনঃ সগণো দমং ধারয়তি। তত্রহৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি।

তে যথা. তামিস্রোঽন্ধতামিস্রো, রৌরবো, মহারৌরবঃ, কুম্ভীপাকঃ কালসূত্র, মসিপত্র বনং সূকরমুখমন্ধকূপঃ কৃমিভোজনঃ সন্দংশ, তপ্ত-সূর্মির্বজ্রকণ্টকঃ, শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদঃ প্রাণরোধো, বিশসনং লালাভক্ষঃ, সারমেয়াদনো অবীচি, রয়ঃপানমিতি কিঞ্চ ক্ষার কর্দমো রক্ষোগণ ভোজনঃ শূলপ্রোতো, দন্দশূকোঽবটনিরোধনঃ। পর্যাবর্তনঃ সূচীমুখমিত্যষ্টাবিংশতি নরকা বিবিধ যাতনাভূময়ঃ। বিবিধ কল্মষ বিহিতেষ্বেতেষু নরকেষু সংসারস্থা পাপকারিণো জনাঃ স্ব স্ব কর্মানুসারতো নিপত্যাবশ্যং ভুঞ্জতে।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ (২৬ অধ্যায়)

নিঃসঙ্গ যাত্রী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

জীবনের পথে যতই আগাই ততই হয় বোঝা ভারী,
সঙ্গীরা সব একে একে যায় ছাড়ি'।
হঠাৎ ঘটেছে কাহারো সঙ্গে জীবনার্পণে ভবে,
যতদিন যায় কাহারো সঙ্গে মিলেনাক আর মতে।
কেহ দ্রুতগতি আগাইয়া চলে পিছুতে ফিরে না চায়
কেহ মন্থর বহু অন্তর তার পাছে পড়ে যায়।
বহু আশা ক'রে ছিল যারা সাথে নিরাশায় তারা ছাড়ে
পথ পাশে কেহ বটচ্ছায়ার মায়া না এড়াতে পারে।
সুদিনে যাহারা সঙ্গ লইল সুখের অংশী হ'য়ে,
দুর্দিনে দিল ভঙ্গ তাহারা নানা ছল কথা ক'য়ে।
জীবনের পথে যতই আগাই ততই ফুরায় অবসর,
বিচার করিতে ভুলে যাই পথে কেবা আত্মীয় পর।
ক্লান্ত চরণে যতই আগাই ততই হই উদাসীন,
উদাসীনে ছেড়ে সবে চ'লে যায় ক্রমে তাই সাথীহীন।

জীবনের পথে একলা এখন চলি।
আশে পাশে পিছে চেয়ে দেখি কেহ সাথী নাই সাথে বলি
দিন ত ফুরায় আঁধার ঘনায় পশ্চিমে ডুবে চাকী,
গোধূলি-ধূলায় বুঝিতে পারিনা পথ কতটুকু বাকী।
দেখি সাথে সাথে কেউ চলেনাক হাতে নিয়ে আর আলো।
সাঁঝের আঁধারে একলা চলার অভ্যাস করা ভালো।
জীবন মরণ সন্ধির পরপারে
অন্ধকারের সুদীর্ঘ পথে সঙ্গী পাইব কারে?
জানিনা সে পথে কোথা সীমা তাহা আঁধারে যায় কি চিনা!
জানিনা সে পথে তারা জ্বলে কিনা খদ্যোতও জ্বলে কিনা।
জানি শুধু তাহা অনাবিষ্কৃত চিররহস্যময়,
রাজা বাদশারো দিগ্বিজয়ীরো একলা চলিতে হয়।
সাথীহারা হয়ে চলিতেছি পথে বলি',
ক্ষোভ নাই তাই গোধূলি ধূলায় একলাই পথ চলি।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মণিমোহনের ডায়েরী হইতে

৮

বাড়ীর পত্র পাইলাম। পোষ্ট মাষ্টার মশাই ভদ্রতা করিয়া নিজের লোক দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। বেশ সৌজন্য আছে। তা ছাড়া ওঁর চরিত্রে কতকগুলি বিচিত্র অভিনবত্বের সমাবেশ দেখিতে পাই। সাধারণত্বের মধ্যে সেটাকে অসাধারণ বলা যাইতে পারে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় লোকটি যেন সুশ্রী চেহারার একটা অশোভন মলাট দিয়া ভিতরের অনেকখানি গভীর রহস্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। এক একদিন সেই রহস্যটাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিবার জন্য কৌতূহল জাগে।···

······কিন্তু আর কতদিন কালু পাড়ায় থাকিতে হইবে জানি না। আমাদের দিক দিয়া কতটা সুবিধা হইবে তা-ও বুঝিতেছি না। সবাই মজঃফর মিঞার দলে গিয়া ভিড়িয়াছে। দুর্বলতা কিনা জানি না, কিন্তু দুর্বুদ্ধির পরিচয় পাইতেছি।···

বাড়ীর চিঠিতে রাণী অনেক করিয়া মিনতি করিয়াছে। এমন ভাবে বিদেশে পড়িয়া থাকার কী সার্থকতা আছে? দেশে যে জমিজমা আছে তাহার দেখাশুনা করিলেও তো মোটা ভাত-কাপড়টা একরকম চলিয়া যায়। তবে এই সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য এমন একটা অনাত্মীয় সুদূর জগতে সীমাবদ্ধ থাকিয়া কী লাভ?

একথা আমিও অনেকবার ভাবিয়াছি। এখনও যে না ভাবি তা-ও নয়। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে আর একটা যেন দার্শনিক দৃষ্টি খুলিতেছে। অনেকদিন পরে মনের মধ্যে এই সংশয়টাই মাথা চাড়া দিয়াছে যে, যেটাকে আমরা এতদিন পরিণতি বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি, সেটাই ঠিক পরিণতি কি-না। জীবনের যে সত্য, মার্জিত পরি-প্রেক্ষিতের মধ্যে আমরা বাস করি, তাহার উল্টা পিঠে দেখিবার মতো কি কিছুই নাই?

আছে। জীবন যে কতখানি নগ্ন ও অসংকোচ হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে, এখানে তো তাহাই দেখিতেছি। এতদিন নগ্নতাটাকে অবিমিশ্র মন্দ বলিয়াই স্বীকার করিয়া আসিতেছি, আজ কিন্তু তর্ক করিতে ইচ্ছা হয়।

আমাদের গ্রামের বাড়ীটিতে—যেখানে সন্ধ্যা আসিতে না আসিতে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে—শঙ্খের শব্দে আকাশ মুখর হয়, ভাঁট ফুলের গন্ধে গ্রামের বাঁশ-ঝাড়ঢাকা নির্জন মেটে পথখানি মদির হইয়া যায়, সেখানে জীবনের পরিধি কতটুকু! ওই মেটে পথটা ধরিয়া হাঁটিতে সুরু করিলে গ্রামের ছোট বাজারটি—তারপর আরো একটু অগ্রসর হইলে কালো কাঁকর-পাতা প্ল্যাটফর্ম—টিনের শেড্ দেওয়া ছোট্ট ষ্টেশন—তারপর ডেলি-প্যাসেঞ্জারী। সন্ধ্যায় এই পথটি দিয়া যে ফিরিয়া আসে, ধূপের গন্ধ ভরা ছোট্ট একখানি ঘরে স্ত্রীর মুখখানা ছাড়া সে আর কী কল্পনা করিতে পারে!

কিন্তু এখানকার প্রকৃতি অমার্জিত—এখানে মানুষ নদী আর সমুদ্রের সমস্ত রূঢ়তার সহিত মুখোমুখি সংগ্রাম করিয়াই টিঁকিয়া আছে। ছোট ঘরের সীমানার মোট এতটুকু প্রেম কী এখানে মানাইত? সমস্ত রীতি, সমস্ত শৃঙ্খলাকে ভাঙিয়া যে বর্বর যৌবন এখানে মুক্তি পাইয়াছে, স্বামীর মাথা ইঁটের ঘায়ে ভাঙিয়া দিয়াই তাহা পটভূমির মর্যাদা রাখে।

জীবনের কোন্ রূপটা যে ভালো, আজ যেন সেটা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

• • •

বন্দিনী হাসিতেছিল।

হাসিটা অবশ্য তাহার স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই। তাই মুখটাকে পাথরের মতো কঠিন দেখাইলেও তাহার মধ্য হইতে যে হাসিটা বাহির হইতেছিল, তাহা কৌতুকে কঠিন এবং অনেকটা নৃশংস বলিয়া মনে হইতেছিল।

অবশ্য তাহার হাসির স্বরূপ বুঝিবার জন্য ডি-সুজার কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। সে গঞ্জালেসের গুণ-গান করিতেছিল। লিসির জন্য এমন সুপাত্র সত্যই দুর্লভ। তাহাদের পূর্ব পুরুষের গৌরব-কীর্তি কে-না জানে! বাহুবলে তারা সমগ্র দেশ জয় করিয়াছে, আগুন লাগাইয়াছে, লুঠ-তরাজের সাহায্যে পৌরুষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। জোর করিয়া "জেন্টুর"-দের রূপসী মেয়ে বউ ছিনাইয়া আনিয়া অঙ্কশায়িনী করিয়াছে। তাহারা যদি বীর না হয় তো, বীর কে? বন্দিনীর হাসিটা হঠাৎ থামিয়া গেল।

—তোমাদের ভেতর এটাই কি মস্ত বীরত্বের কথা নাকি?

—কোন্‌টা? বন্দির প্রশ্নটা ডি-সুজার কানে কেমন বিচিত্র রকমে অপরিচিত বলিয়া বোধ হইল যেন। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে কিছু একটা আবিষ্কার করিতে চাহিল।

—এই মেয়েমানুষ চুরি ক'রে নিয়ে যাওয়াটা?—পাথর বাঁধানো মুখের ভিতর হইতে সামান্য একটু ফাঁক দিয়া আবার এক ঝলক কৌতুকের হাসি পিছলাইয়া পড়িল।

ডি-সুজা অপ্রতিভ বোধ করিল যেন। মনে হইল কথাটা না কহিলেই বোধ হয় ভালো হইত। ঠিক এই মুহূর্তেই কলাই করা দুইটা এনামেলের কাপে লিসি চা লইয়া আসিল।

ডি-সুজার বাড়ীর ভিতরের আঙিনাটিকে বেশ ভালোই বলিতে হইবে। সুপারী আর নারিকেলের ছায়া নত হইয়া পড়িয়া সেখানে একটা কুঞ্জ রচনা করিয়াছে। এলোমেলো পাতার ফাঁকে খানিকটা রোদ আসিয়া লিসির মঙ্গোলীয়ান মুখের উপর পড়িল।

বন্দিনী সেইদিকে চাহিল। চাহিল স্থির বিকারহীন দৃষ্টিতেই। কিন্তু আজ যেন কী এক মন্ত্রবলে নতুন করিয়া চোখ খুলিয়া গেছে ডি-সুজার। তাহার মনে হইল বন্দির নীরব গাম্ভীর্যের তলা হইতে সাপের মতো প্রলোভনের একটা গুপ্ত-ফণা মাথা তুলিতেছে।

লিসি চায়ের বাটিটা রাখিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সে যেদিকে যে চাহিয়া রহিল, রহিলই। ডি-সুজার অত্যন্ত অস্বস্তি লাগিতে লাগিল।

—তোমরা এখান থেকে কবে যাচ্ছ?

—বর্দ্দি মুখ ফিরাইল। তাহার সমস্ত অবয়বে আবার সেই অবিচল কাঠিন্য: তোমার কাছ থেকে হিসাবটা পেলেই চলে যাব। সব চালান হয়ে গেছে?

—না, তিন সেট বাকী আছে এখনো। পুলিশের বড় কড়া-কড়ি এবার। তা ছাড়া তোমাদের জন্যে বড্ড ভাবনায় পড়েছি। সন্দেহ এখনো করেনি বটে, কিন্তু যখন-তখন খবর দিয়ে দিতে পারে! তা হলে তো সব শুদ্ধ—

—আচ্ছা সে ভাবনা ভাবতে হবে না। যা বলেছি তা মনে আছে তো?

—তা আছে। কিন্তু—ডি-সুজা অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্তভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল, একটু বেশি হয়ে যাবে নাকি? একেবারে—

বর্দ্দির মুখ হইতে সোনা-বাঁধানো দাঁত দুইটা যেন ছিট্‌কাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল।

—বেশি? বেশি কিছুতেই হয় না। সেদিনের টোটা দুটো নিতান্তই বাজে খরচ হয়েছে; নইলে আজ্‌কে আবার এই নতুন খাট্‌নির দরকার হতনা।

—তা বটে!—ডি-সুজাকে অত্যন্ত ম্লান দেখাইল।

—তোমার নাতনী রাজী হয়েছে তো?

এই লোকটার মুখে লিসির কথা শুনিয়া মনটা যেন প্রসন্ন হইয়া ওঠে না। তবু ডি-সুজা কহিল, হুঁ। রাজী না হয়ে কী করবে? তবে সবটা বলা হয়নি—এতখানি শুনলে হয়তো বা—

—যাই বলো, তোমার নাতনীটি কিন্তু দেখতে ভালো। ওসব গঞ্জালেস্-টঞ্জালেসের চেয়ে—কথাটার মাঝখানেই কী ভাবিয়া সে থামিয়া গেল।

ডি-সুজার মুখ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল: গঞ্জালেসের চেয়ে কী?

—না কিছু নয়। কিন্তু তোমাদের পর্তুগীজদের বীরত্বটা কিন্তু ভারী চমৎকার। যে যত মেরে চুরি করে আনতে পারে সে তত বড় বীর—হাঃ!

ডি-সুজা গম্ভীর হইয়া রহিল।

—আচ্ছা, আমি চললুম। পরশু দিনের কথা মনে থাকবে তো?

—থাকবে।

অভিবাদন জানাইয়া সে বাহির হইবার উপক্রম করিল। কিন্তু দরজার মুখে একবারটি থামিয়া দাঁড়াইল। একরাশ পেঁয়াজ কলি লইয়া লিসি ভিতরে আসিল।

লিসির দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া সে মৃদুভাবে একটা শিস্ দিল, তারপর চুরুট ধরাইয়া বড় বড় পা ফেলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

রোজকার মতো সকালের ডাক আসিয়াছিল।

কেরামদ্দী মেল ব্যাগগুলি কাটিতে প্রথমেই একখানা লম্বা খাম টক্ করিয়া একেবারে পোষ্ট মাষ্টারের কোলের কাছে আসিয়া পড়িল। অফিসের খাম। পোষ্ট মাষ্টার ব্যগ্র হাতে খুলিয়া দেখিলেন, যা ভাবিয়াছেন—ঠিক তাই। পোষ্ট্যাল্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মানুষটা তা হইলে নিতান্তই খারাপ নয়। বরিশাল হইয়া যাওয়ার পথে লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইতে হইবে।

—ছুটির অর্ডার এসেছে রে কেরামদ্দী। পোষ্টমাষ্টারের মুখ চোখ হইতে আনন্দ উছলাইয়া পড়িতেছিল, কণ্ঠস্বরে সেটা আর চাপা রহিল না।

—ছুটি! দরখাস্ত করেছিলেন বাবু?

কেরামদ্দী যেমন বিস্মিত, তেমনই ব্যথা অনুভব করিল। এই কুশ্রী দর্শন, বিগত যৌবন ছন্নছাড়া লোকটার উপর তাহার যে কেন এতটাই মায়া বসিয়া গেছে কে জানে!

—হাঁ, হাঁ—দরখাস্ত করেছিলুম বই কি। নইলে আমার কোন্ সম্বন্ধীটা আছে যে আগ বাড়িয়ে ছুটি দিতে আসবে? হুঁ হুঁ—তিনমাসের—সোজা ব্যাপারটি তো নয়।

—তিনমাসের! বেদনায় অত্যন্ত ম্লান হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত কেরামদ্দী চুপ করিয়া রহিল। এই চর-ইস্মাইল তাহারও নিজের দেশ নয়। এখানকার কাহারো সঙ্গে সে যে নিজের ভাষা বা মনের ছন্দটাকে সমানভাবে মিলাইতে পারে তাহাও নয়। পোষ্ট মাষ্টারের সাহচর্য্যেই এখানে একরকম তাহার দিন কাটিয়া যায়। সেই জন্য এই মুহূর্ত্তে সে এত আহত বোধ করিল যে কিছুক্ষণ কোনো কথাই খুঁজিয়া পাইলনা। বরং ক্ষণিকের জন্য মনে হইল, তাহার প্রতি মাষ্টার বাবুর কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই, নতুবা তাহাকে আদৌ না জানাইয়া তিনি এমন একটা ছুটির দরখাস্ত করিয়া বসিলেন কী বলিয়া?

নত মস্তকে চিঠি সর্ট করিতে করিতে হঠাৎ সে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে—তা হলে—অফিসের কাজ কী করে চলবে বাবু?

বন্যার মতো অজস্র ধারায় পোষ্ট মাষ্টার হাসিয়া উঠিলেন: শোনো কথা, কাজ কী করে চলবে? আরে, আমি ছুটি নিলুম বলেই কি সরকারী কাজ বন্ধ থাকবে? রিলিফ আসবে—রিলিফ্। কাল পরশুর মধ্যেই এসে পড়বে।

—ওঃ। কেরামদ্দী আবার চিঠি পত্রের মধ্যে তলাইয়া গেল।

পোষ্ট মাষ্টার একান্ত প্রসন্ন স্বরে কহিলেন, সত্যি ব্যাটারা এবারে ছুটি না দিলে রিজাইন্ দিতুম ঠিক। কাঁহাতক আর পারা যায়? কিছুদিন থেকেই মন চঞ্চল হয়ে উঠছে—কেবল ভাবছি ছুটে বেরিয়ে পড়ি। যাক্—।

—তা হলে এখন বাড়ীই যাবেন তো বাবু?

—বাড়ি! হরিদাস এমন ভাবে কথাটা কহিলেন যেন এতবড় একটা অসম্ভব কথা কাহারো কল্পনায় আসাটাই অসঙ্গত ব্যাপার! বাড়ি! বাড়ি কোথায় যে যাব?

—সে কি বাবু! তিন বছর বাদে একবার ছুটি নিলেন,—ছেলেমেয়ে রয়েছে—

—ব্যাস্ ব্যাস্! ছেলেমেয়ে রয়েছে তো সাতপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল আর কি! আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, ওই কাকের বাচ্ছাগুলো পিণ্ডি দেবে, এই আশঙ্কায় আমার বাপ ঠাকুরদা গয়ার প্রেত-শিলা থেকে মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটে পালাচ্ছেন।

কথাটার অর্থ না বুঝিলেও ভাব গ্রহণ করিতে কেরামদ্দীর

অসুবিধা হইল না। সে বিস্ফারিত চোখে কহিল, আপনার মনটা কি পাথর দিয়ে তৈরী বাবু? গোরু ছাগলেও নিজের বাচ্চা-কাচ্চাকে ভালোবাসে, আর আপনি—

অসমাপ্ত কথাটাকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, আর আমি গোরু-ছাগল নই ব'লেই ওদের চাইতে আমার বুদ্ধি একটু বেশী! পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—অ্যাঁ! যে রাস্কেলটা লিখেছিল, তাকে একবার হাতের কাছে পেলে দেখে নিতুম।

—তা হলে কোথায় যাবেন, বাবু?

—কোথায়? হরিদাসকে চিন্তিত দেখাইল: এখনো ঠিক করিনি। হয়তো কাশ্মীরে যেতে পারি—ভূ-স্বর্গ বলে তাকে। হাউস্ বোটে ক'রে ডাল্ হ্রদে ঘুরে বেড়াব। উলার হ্রদ থেকে পদ্ম তুলে আনব। শ্রীনগর—the Venice of the East! আর নয়তো বা তিব্বতেও একবার ঘুরে আসা যায়। লাসার দেশ—হাজার হাজার বছর ধ'রে এভারেষ্টের ঠাণ্ডা ছায়ার নীচে মানুষ যেখানে মরার মতো ঘুমিয়ে আছে।…

পোষ্টমাষ্টারের আবিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া কেরানীটি চুপ করিয়া গেল।

পূর্ণিমার দিনে জোয়ারের জল একটু বেশি করিয়াই আসিয়াছে। অন্যান্য দিন ওই কাদা মাখা তীরটাকে ডুবাইয়া দিয়াই সে খুশি থাকে, আজ কিন্তু পৌঁছিয়াছে সামনের মাঠটার একেবারে উঁচু ডাঙাটা পর্যন্ত। বাঁ-পাশের খালটা অনেকখানি ভরিয়া উঠিয়াছে, চেষ্টা চরিত্র করিলে বজরাটাকে একেবারে গ্রামের মধ্য পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন নয়।

বজরাটা জলের সঙ্গে অনেকখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে—নোঙরের পাকানো মস্ত নারিকেলের দড়িটাতে টান পড়িয়াছে। একটা কাঠের সিঁড়ি নামাইয়া দিতে সেইটা বাহিয়া মণিমোহন একেবারে তীরে আসিয়া পৌঁছিল। গ্রামের দিক হইতে একটু বেড়াইয়া আসিলে মন্দ হয়না।—আসবে নাকি গোপীনাথ?

গোপীনাথ ততক্ষণে বজরার সামনে একটা কাঠের চৌপাই টানিয়া লইয়া বসিয়াছিল। মাঝিরা মধ্যাহ্নের [illegible] উপলক্ষে মুরগী দুইটার পালক ছাড়াইতেছে। অমসৃণ লাল্‌চে চামড়ায় ঢাকা শস্য-পুষ্টির পরিপুষ্ট নধর-শরীরের দিকে গোপীনাথের লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ। একটুখানি ভালো ঘৃত কিংবা দই জোগাড় করিতে পারিলে ইহাদের একটাকে দিয়া কী চমৎকার ডিশ্ তৈরী করা যাইবে—মনে মনে সে তাহারই গবেষণা করিতেছিল।

মণিমোহনের প্রশ্নের উত্তরে ব্যস্ত চোখ ফিরাইয়া একবার সে তাকাইল মাত্র। তারপর বড় মুরগীটার ঠ্যাঙ্ দিয়া বিশেষ কোন একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে নিবিড় ভাবে চিন্তা করিতে করিতে উত্তর দিল, আপনি ঘুরে আসুন বাবু। আমি একটু এখানে দেখছি—মুরগীটা ভালো করে বানাতে হবে তো?

—ও, এখন থেকেই জিভে জল পড়ছে বুঝি? ছেড়ে উঠতে পারছো না? আচ্ছা থাকো—মণিমোহন হাসিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

মাঠ—কিন্তু তৃণ রোমাঞ্চিত নয়। অগোছালো জঙ্গল, মাটিতে কোথাও কোথাও কাদার আভাস। এখানে ওখানে দুই চারিটা ঝোপ ঝি-ঝি করে। পশ্চিম বঙ্গের শ্যামল প্রান্তর এই পলি মাটি আর নোনা-ধরা বালির দেশে আসিয়া রিক্ততায় নগ্ন শ্রী ধরিয়াছে।

চলিতে চলিতে সে গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িল। যেমন হইয়া থাকে, পূর্ব বঙ্গের গ্রামের কোনো ঘন-বিন্যস্ত রূপ নাই। বাড়ী বাগান গোটা দুই তিন শুষ্ক ও অর্ধশুষ্ক পুকুর—সেগুলিতে প্রচুর পাতি হাঁস চরিতেছে। আশে পাশে দুটো একটা ছাড়া ভিটা এবং সবটা মিলিয়া এক ধরণের ছায়াচ্ছন্ন স্বতন্ত্রতা অনেকটা জুড়িয়া বিরাজ করে। এ বাড়ীর সঙ্গে ও বাড়ীর যোগসূত্রটা অনেকখানি গৌণ বলিয়াই বোধ হয়, যাতায়াতের পথটা তেমন অনুকূল নয়। আধভাঙা কাঠের বা বাঁশের 'চার' পার হইয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া নালা ডিঙাইয়া চলিতে হয়। পরিচ্ছন্ন অঙ্গনে স্তূপাকারে ধান ও খড়ের পালা, দুটি একটি গোরু-মহিষ এবং চরিয়া বেড়ানো ছোটবড় অসংখ্য মুরগীই এ সমস্ত গ্রামের সব চাইতে উল্লেখ যোগ্য বিশেষত্ব।

গ্রামের মধ্য দিয়া মণিমোহন চলিতে লাগিল। দেখিবার কিছুই নাই। ধান কাটিবার সময়, পুরুষেরা বেশির ভাগই সকাল বেলা নৌকা লইয়া "চরে" ধান কাটিতে গিয়াছে। গ্রাম জুড়িয়া এখন মেয়েদেরই আধিপত্য। সন্ধ্যার সময় পুরুষগুলি ফিরিবে, তাই সারাটা দিন তাহাদের ঢেঁকি চালানো, ধান বছানো, আরো দশটি খুঁটিনাটি কাজ এবং অভ্যস্ত গাল-গল্পের মধ্য দিয়াই কাটিয়া যায়। কেহ ছেলেকে স্নান করায়—অপরিচিত লোক দেখিয়া হঠাৎ গায়ে-বুকে কাপড় টানিয়া সংযত হইতে চায়। কেহ বা কালো শাড়ীর লম্বা ঘোমটার ভিতরে রূপার নথটার মধ্যে আঙুল পুরিয়া দিয়া কৌতূহলী চোখে চাহিয়া থাকে।

দু' একজন পুরুষের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হইয়া গেলে তাহারা সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইল। কেউ কেউ বা একান্ত বিনীত হইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: বেড়াতে এসেছেন নাকি?

মণিমোহন মাথা নাড়িয়া তাহাদের প্রশ্নের জবাব দিল। তাহার মন তখন লক্ষ্যহারা হইয়া কোথা হইতে কোথায় যেন ভাসিয়া চলিতেছিল। নদীর বুক হইতে জাগিয়া ওঠা নতুন মাটি—নতুন উপনিবেশ। ঠিক পুরানো পৃথিবীর মতো করিয়াই মানুষ এখানে ঘর বাঁধিয়াছে। কিন্তু দেখিয়া যা মনে হয়, সত্যি সত্যিই তার সঙ্গে কত ব্যবধান রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রথম যুগের মতো গলিত ধাতু স্রোতের উপর শীতল একটা আস্তরণ পড়িয়াছে মাত্র, কিন্তু বুকের মাঝখানে অসংযমের তরল উত্তপ্ত বস্তুটা টগবগ করিয়া ক্রমাগতই ফুটিতেছে। যখন একটা বিশেষ উপলক্ষ বা ছিদ্র ধরিয়া তাহা বাহির হইয়া আসে তখনি বোঝা যায়—যা দেখা যাইতেছে সেইটাই সত্য নয়।

—এই যে সরকারীবাবু!

সরকারীবাবুটিকে চকিত হইয়া থামিয়া পড়িতে হইল। কোথা হইতে সেই বর্মী মেয়েটি সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা ছোট গামছায় বাঁধা একরাশ মুরগীর ডিম। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝকে মুক্তার মতো দাঁতগুলিকে বিকশিত করিয়া সে কহিল, আমাকে চিনতে পারছনা? সেই যে সেদিন তোমার দরবারে আসামী হয়েছিলুম—আমার নাম মা-ফুন।

চোখ দুটি বড়ো বড়ো করিয়া মণিমোহন সকৌতুকে বলিল, চিনতে আবার পারব না? যে ইট মেরেছিলে সেদিন—আর একটু হলেই—

—সত্যিই ? ঝর্ণার মতো কলচ্ছন্দে মেয়েটা হাসিয়া উঠিল : আস্তে মেরেছিলুম বলেই বেঁচে গেছে। ইচ্ছে করলে একবারেই দিতে পারতুম সিধে করে।

—তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তোমার স্বামীর মাথার ঘা লেগেছে তো ?

—লাগবে না ?—মা কুন ভঙ্গি করিয়া বলিল, মাসের মধ্যে তিনবারই ও একরকম মার খায় যে। পড়ে থাকবার জো আছে নাকি ? তা হলে আর খেতে হবেনা।

—মাসের মধ্যে তিনবার ! লোকটির জায়গায় নিজেকে একবার কল্পনা করিয়াই আতঙ্কে মণিমোহন শিহরিয়া উঠিল।

—এদিকে কোথায় এসেছিলে বাবু ?

জাতে মগ্‌ বা যাহাই হউক এবং স্বামীকে নির্মমভাবে প্রহার করিতে যতই অভ্যস্ত হউক, ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের এই নিরিবিলি পটভূমিতে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব সুন্দরী বিদেশিনী যুবতীটির সঙ্গে গল্প করিতে মণিমোহনের নেহাৎ মন্দ লাগিতেছিল না। চাঁপার কুঁড়ির মতো সুঠাম কয়েকটি আঙুল গালে রাখিয়া আয়ত জিজ্ঞাসু চোখে সে চাহিয়া আছে, ওই চোখ, ওই আঙুল দেখিলে কে বিশ্বাস করিবে যে কথায় কথায় একখানা থান ইঁট তুলিয়া সে যখন-তখন ধাঁই করিয়া মারিয়া দিতে পারে !

মণিমোহন বলিল, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম।

—সত্যি ! মেয়েটা দুষ্টু হাসিল, কিন্তু অবিশ্বাস করিল না। বরং তাহার চমৎকার নীল চোখ দুটি হইতে রূপের গর্ব যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সে জানে তাহার রূপ আছে এবং সেই রূপ-সম্পর্কে একেবারে অচেতন থাকিবে এতটা নিষ্প্রাণ সে তাহাকে আশা করেনা।

মণিমোহনের বয়স বেশি নয়। দেখিতে সে-ও সুশ্রী। হঠাৎ তাহার কাঠ খোট্টা স্বামীটির সঙ্গে একটা অদ্ভুত তুলনা-বোধ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া যেন তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

—আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে ! তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? চলনা আমার বাড়ীতে।

—তোমার বাড়ী ! কোথায় সে ?

হাত দিয়া মেয়েটি অল্প দূরে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে একখানা টিনের ঘর দেখাইয়া দিল, বলিল, ওই যে। এলেই যখন, তখন একবার না হয় দেখেই যাও।

—আচ্ছা চলো। কিন্তু তোমার সঙ্গে যেতে ভয় করে।

—ভয় করে ? কেন ? মেয়েটা হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইল, তাহার স্নিগ্ধ চোখ দুইটি যেন নীলার মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহনের মুখের দিকে তাকাইয়া যেন কিছু একটার প্রত্যাশা করিতেছে সে।

কিন্তু মণিমোহন সেটা বুঝিতে পারিল না।

সে সকৌতুকে বলিল, ভয় করবে না ? তোমার হাত দু'খানা যা চলে তার থেকে যতটা দূরে সরে থাকা যায় ততই ভালো।

—ওঃ, বলিয়া মা-কুন চুপ করিল।

এই নিরিবিলি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এই বাড়ীটা যেন আরো বেশি নিরিবিলি। প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায় ইহাদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলে। ইহারা বৌদ্ধ—আচারে-বিচারে মুসলমানদের সঙ্গে খুব যে বেশি তফাৎ আছে তা নয়—তবু হিন্দু নিজেদের বলিয়াই মনে করে। তা ছাড়া বর্মা-দেশ-সুলভ ইহাদের বিচিত্র ভাষা এবং বিচিত্রতর রীতি-নীতি প্রতিবেশীদের কাছে অনেকটা অপরিচিত বলিয়াই তাহাদের সংস্রব কম।

—এসো বাবু—মেয়েটি ডাকিয়া একেবারে ঘরের ভিতরেই তাহাকে লইয়া গেল।

সামনেই একটা বাঁশের মাচা। এক পাশে কতকগুলো কাপড় চোপড় জড়ো করা। রংচঙে একটা মশারি ঝুলিতেছে। বেড়ার গায়ে প্যাগোডার একখানা বড় ছবি, দুর্বোধ্য বর্মী হরফে তাহার নীচে কিছু একটা লেখা রহিয়াছে।

মাচার উপর বসিয়া মণিমোহন বলিল, তোমার স্বামী কোথায় ?

—স্বামী ! সে তো এখানে নেই। সহরে গেছে—তিন চার দিন পরে আসবে।

—তাই নাকি ! তা তো জানতাম না। মণিমোহন অস্বস্তি বোধ করিল, তাহার মনে হইল এই নির্জন ঘরে সুন্দরী তরুণীটির সঙ্গে বেশীক্ষণ না থাকিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

—আমার ঘরটা কেমন দেখছ সরকারীবাবু ?

—মন্দ কী, বেশ তো !

মেয়েটা হাসিল : উঁহু, বেশ নয়। গরীবের ঘর যে। তোমাকে মৌলমিনে নিয়ে যেতে পারতুম তো দেখতে। আমার বাবার সেখানে কাঠের কারবার আছে—অনেক টাকা।

—তা হবে। এখন চলি তা হলে—মণিমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল।

—চলে যাবে মানে ? এসেই চলে যাবে তাই কি হয় ? মেয়েটির কণ্ঠস্বরে যেন বিস্ময় প্রকাশ পাইল : একটু চা করে দিতে পারি। তোমরা বাঙালীরা যা খাও তা-ও করে দেওয়া অসম্ভব নয়—আমি লুচি বানাতে জানি। ভয় নেই, তার সঙ্গে "ঙাপি" মিশিয়ে দেবনা।

মেয়েটির কথার ভঙ্গি হইতে এটা বেশ অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে হিন্দু-সমাজের সহিত তাহার নিছক অপরিচয় নাই। নিশ্চয়ই কখনো না কখনো ভদ্রলোকদের সঙ্গে সে মিশিয়াছে এবং তাহাদের নিয়ম কানুন তাহার একেবারেই অজানা নয়।

মণিমোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, আমরা যে লুচি খাই তা তুমি কেমন করে জানলে ?

—এমন-চমৎকার বাংলা বলতে শিখলুম কোথায় তাতো জিজ্ঞাসা করলে না। আমরা অনেকদিন ঢাকায় ছিলুম যে। তোমাদের বাঙালীদের সঙ্গে ঢের মিশেছি। আমার এক বোনেরই তো বিয়ে হয়েছে বাঙালীর সঙ্গে।

—তা তুমি এখানে এসে পড়লে কী করে ?

—কপাল, সব কপালের ফের। আমার স্বামীটিকে কি সোজা লোক দেখছ ? দুনিয়ার আর কোথাও জায়গা হয়না বলে এখানে এসে ঘর বেঁধেছে। হতভাগা না মরলে আমার আর শান্তি নেই।

পতিভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু আর দেরী করা চলে না। উঠিয়া পড়িয়া সে বলিল, কিন্তু আমার কাজ রয়েছে। এখন আর বসতে পারব না।

—কাজ থাকলে কি হবে ? তোমাকে চা খেয়ে যেতে হবে যে। এখানে এই সৃষ্টিছাড়া দেশে পড়ে আছি বটে, কিন্তু চায়ের সব বন্দোবস্তই আছে আমাদের। বাঙালীদের চাইতে আমরা নেহাৎ খারাপ চা করতে জানি না।

মণিমোহন হাতের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, কিন্তু সময়টা যাচ্ছে। সত্যিই আর বসতে পারব না। আচ্ছা, আর একদিন এসে তোমার চা খেয়ে যাব।

—সত্যিই খেয়ে যাবে তো! কবে আসবে?

মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া মণিমোহন চমকিয়া উঠিল। তাহার চোখের দৃষ্টিতে যে প্রশ্নটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেটা যেমন আন্তরিক, তেমনই বিচিত্র। নিতান্ত পরিচয়ের সূত্রে হইতে যতটুকু আশা করা চলে, তাহার চাইতে অনেক বেশি গভীর।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, প্রশ্নটাকে একেবারে এড়াইয়া যাওয়া চলে না। তাই নিতান্ত সাধারণভাবে হইলেও তাহার গলায় একটা প্রতিশ্রুতির সুর আসিয়া গেল।

—পরশু, বিকেল বেলা!

—ঠিক আসবে, ঠিক তো?—মা-ফুলের জিজ্ঞাসা এবার অনেকটা দাবীর মতোই শুনাইল।

—ঠিক আসব।

—না এলে—মেয়েটা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল: আমাকে তো জানোই। বোট থেকে তোমাকে সোজা টেনে নিয়ে আসব। আর নইলে আমার হাতের থান ইট যেমন চলে তার তো প্রমাণ পেয়েছই।

কথাটা ঠাট্টা বটে, কিন্তু একেবারে ঠাট্টা বলিয়াও মনে হইল না। বুকের ভিতরটা যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল মণিমোহনের। বর্মী-মেয়েটির নীল চোখ দুইটিকে বিশ্বাস নাই—যখন-তখন নীলকান্তমণির মতো তাহার দ্যুতি বদলায়।

হাসিয়া সে-ও উত্তর দিল: আচ্ছা, মনে থাকবে।

ঘর হইতে সে দুই পা বাহির হইতে না হইতেই মা-ফুল চট্ করিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল: হাঁ, আর একটা কথা। তুমি কিন্তু একাই আসবে সরকারী বাবু, তোমার সঙ্গের ওই খাতা-লেখা বাবুটিকে আবার জুটিয়ে এনো না।

সন্দিগ্ধ ও বিস্মিত কণ্ঠে মণিমোহন কহিল, কেন?

—এমনি। আমার স্বামী বেশি লোক-জনের গোলমাল সইতে পারে না। ওর আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা?—মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিল।

—মাথার ব্যারাম! তা হলে সেটা তোমার জন্যেই হয়েছে, বলো?

মেয়েটির মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই রহিল, তা হবে। কিন্তু পরশু বিকেলে তুমি সত্যিই আসবে তো?

—আসব।—আর একবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মণিমোহন বাহির হইয়া গেল।

রিলিফ্ আসিয়া গেল।

যে ভদ্রলোক আসিলেন, তিনি মুসলমান—বরিশাল জেলাতেই বাড়ি। এই চর্-ইসমাইল হইতে একখানা ডিঙি করিলে তিন ঘণ্টায় তাঁহার বাড়ি গিয়া পৌঁছানো যায়। সুতরাং এমন সময়ে এ হেন নির্জন চরের দেশে বদ্লি হইয়া আসিতে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল না। বরং এখানে স্থায়ী হইয়া থাকার জন্য পোষ্ট্যাল্ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে একটা দরখাস্ত করিবেন বলিয়াই তিনি স্থির করিয়াছিলেন।

খুব খুশি হইয়াই অভ্যর্থনা করিলেন হরিদাস সাহা।

—এসো দাদা এসো, তোমাদেরই দেশঘর, দেখে শুনে নাও। আমাদের আর কি, যাওয়ার জন্যে তো পা বাড়িয়েই আছি।

নতুন পোষ্টমাষ্টার আপ্যায়িত হইয়া কৌতুক ও কৌতূহল বোধ করিলেন।

—যান—বাড়ীর থেকে ঘুরে-টুরে আসুন। এ যা দেশ মশাই—এখানে এলে তো দুনিয়ার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই থাকে না। কিছুদিনের জন্যে বাড়ীর থেকে মুখ বদলে আসুন।

—বাড়ী!—হরিদাস হাসিয়া উঠিলেন; আমাদের তো 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভায়া—কোন্টা যে বাড়ী আর কোন্টা নয়, তাই এ পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারলুম না। আরে কবিরাজ যে! কী মনে ক'রে—শুনি?

সে কথার জবাব না দিয়াই কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সব কী ব্যাপার?

—কী সব?

—তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

—অগত্যা। থাকতে যখন পারছি না তখন তো যেতেই হবে। ভায়া হে, পৃথিবীটা অনেক বড়ো, আয়ুও তো প্রায় ফুরিয়ে এল। কাজেই সুযোগ থাকতে বেরিয়ে পড়া যাক্—যতটা দেখে নেওয়া যায়, ততটুকুই লাভ।

—হুঁ:!—বলরাম যেমন ক্লিষ্ট, তেমনই বিষণ্ণ হইয়া গেলেন।

কিন্তু তাঁহার বিষণ্ণতা হরিদাসকে স্পর্শ করিল না। স্পর্শ করিবার মতো মনই তাঁহার নয়। পরিবারের বন্ধন যাকে আঁকড়াইতে পারে নাই, পৃথিবীর ঘাট হইতে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ানোই যাহার স্বভাব, তাহার মনের স্পর্শাতুরতা বেশি না হওয়াই স্বাভাবিক।

—হুঁ: মানে? ভাবছ কি এত খালি খালি? এই চর্-ইসমাইলের ছোট্ট ডাঙাটুকুতে প্রতিবেশিনীটিকে নিয়ে ব'সে থাকলেই কি চলবে? জানো না রামপ্রসাদ বলেছেন—

> 'এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
> আবাদ করলে ফলতো সোনা—'

—তা হবে। সংক্ষেপে কথাটা বলিয়াই অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বলরাম চলিয়া গেলেন। কেন সে জানে; হঠাৎ তাঁহার সম্বন্ধে কেমন একটা সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল হরিদাসের মনে।

কেরামদী আসিয়া উপস্থিত হইল।

—নৌকো ঠিক হয়ে গেছে বাবু। জোয়ারটা পেলেই রওনা হতে পারবে।

—পারবে তো? যাক্ বাঁচলুম। তা হলে চট্ ক'রে মোট ঘাট গুলো বেঁধে ফেলো কেরামদী, আর রান্না বাড়ানোটা কাজের কথা নয়।

এক মুহূর্তের জন্য একটুখানি ইতস্তত করিল কেরামদী।

—আজকেই যাবেন বাবু? তা ছাড়া এই অবেলায় নৌকো ছাড়াটা কি সুবিধে হবে? দিনকাল তো ভালো নয়, যখন—তখন—

কী হবে? বাতাস উঠবে, রোলিং হবে, নৌকো ডুববে? তা যা হবার হবে, শুভদিনটা ছাড়তে পারি না। একে বেস্পতির বারবেলা, তার ওপর অশ্লেষা, নৌকো যাত্রার পক্ষে এর চেয়ে প্রশস্ত দিন আর কী হতে পারে?

মৃদু হাসির সঙ্গে একটা তুড়ী দিয়া হরিদাস চলিয়া গেলেন।

বেলা দুইটার সময় হরিদাসের নৌকা তেঁতুলিয়ায় পাল তুলিয়া দিল।

(ক্রমশ:)

ডক্টর দে

একাঙ্কিকা

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

চরিত্র পরিচিতি

ডা: প্রভাত দে—	পি এইচ-ডি,
বিকাশ—	প্রভাতের বন্ধু
নিশীথ—	চিকিৎসক বন্ধু
অটল— রায় বাহাদুর	ধনী ব্যবসায়ী
অনুকূল—অটলের শ্যালক	উকিল ও সাহিত্যিক
অশ্বিনী—	প্রভাতের মধুপুরের বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক
অভয় সিংহ—	অটলের দূরসম্পর্কীয় নাতজামাই
উড়িয়া মালীদ্বয়, কনষ্টেবল	ও কয়েক যুবক
ইভা কারমেকার এম-এ—	প্রভাতের সহপাঠিনী
পুষ্পহার—	অটলের পৌত্রী
মোহিনী—	অটলের দূরসম্পর্কীয়া নাতিনী ও অভয়ের স্ত্রী

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কলিকাতা—প্রভাতের বাটীর সম্মুখস্থ লন (Lawn)

সময়—সকাল বেলা

তিনখানি চেয়ার রহিয়াছে। দুইটি চেয়ারে প্রভাত ও বিকাশ উপবিষ্ট। অপরটিতে একখানি ই. আই. রেলওয়ে টাইম টেবল্ পড়িয়া আছে

বিকাশ। দ্যাখো প্রভাত, চিরকাল শুধু লেখাপড়া করেই তুমি কাটালে, আর কোনও জিনিষকে মনের নাগাল পেতে ত দিলে না! কিন্তু দু'একটা বিষয় এমন আছে যার তথ্য যথাকালে সংগ্রহ করাতে সংসারে লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

প্রভাত। যথা?

বিকাশ। যথা—এই নারীর হৃদয়।

প্রভাত। আর "যথাকাল"—মানে?

বিকাশ। যথাকাল—অর্থাৎ জীবনের সকাল বেলাটা একেবারে উতরে যাবার আগে—মধ্যাহ্নের উত্তাপে রসকস্ সব শুকিয়ে নিঃশেষ হবার পূর্ব্বে।

প্রভাত। ও সমস্ত গান আর কবিতায় থাকে সেই ভাল। সত্যিকারের পৃথিবীতে ওর কিছু দরকার বা বিশেষত্ব আছে না কি? শুনেছি নারীর হৃদয়ও ত ঠিক পুরুষেরই মত মিনিটে প্রায় বাহাত্তর বার টিপ্ টিপ্ করে। আমাদের নিশীথ ডাক্তার এখানে থাকলে বোল্‌তো—দাপ্ ডাপ্ করে।

বিকাশ। উঁহুঁ, (হাসিয়া) এখন সে বলবে লাভ্‌টাভ্ করে। বিবাহ ক'রে সে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে কি না!

নিশীথের প্রবেশ

এই যে নিশীথ এসে পড়েছে, তুমি ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারো।

নিশীথ। কি—কি বিষয়?

বিকাশ। বিষয়টা হ'চ্চে নারীর হৃদয়।

প্রভাত। আমার পক্ষে ও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

বিকাশ। অনাবশ্যক? আচ্ছা শোনো তাহ'লে ও সম্বন্ধে কবি কি বলেছেন।

বিকাশের গীত

(বাউল)

ওরে মন-ডুবুরি! ডুব দিয়ে তুই কোথায় পাবি
নারীর হৃদয়-তল।
হাবু-ডুবু ঢেউ লেগে তোর চোখে মুখে জল।
পূর্ণশশী উঠলে হাসি
হৃদয় ওঠে দুলে,
কূলে কূলে উথলে বারি
ওরে কূলে কূলে;
আছড়ে পড়ে তীরে এসে আনন্দে উছল।
বর্ষা যখন ঘনিয়ে সে যায়
সর্বখানি তার
কাজল কালো বর্ণ তখন সুনীল পারাবার,
(তবু) শুক্তিবুকে জড় রাখে মুক্তা উজল।

নিশীথ। বাঃ বাঃ চমৎকার! ওহে বিকাশ! প্রভাতের জন্যে ঐ রকম একটি হৃদয় খুঁজে বার করো দেখি!

প্রভাত। যাক্, ওসব বাজে কথা রেখে দাও। জানো ত' মহিলাদের কাছে কেমন আমার একটা ইয়ে—মানে Shyness আসে—আমি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকি। (হঠাৎ) ওকে আসে হে নিশীথ? দ্যাখো দ্যাখো—একটু এগিয়ে যাও ভাই! (পিছু হটিয়া) এই মাটি করেছে—এ যে সেই ইভা কারমেকার! ঐ এলো যে!

বিকাশ। তাই ত বটে! (নিশীথের প্রতি) আমাদের সঙ্গে ইনি বি-এ পড়তেন।

সহাস্যে সুসজ্জিতা একটি যুবতীর প্রবেশ

প্রভাত বিকাশকে সম্মুখে চাপিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইল

ইভা। (একেবারে প্রভাতের নিকটে গিয়া) নমস্কার Dr! Dr!

প্রভাত। নমস্কার! মানে—ভাল আছেন? (মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে)

ইভা। হ্যাঁ, ভাল আছি—thanks. আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে এলাম।

প্রভাত। তা—মানে, বেশ করেছেন। (নিশীথকে ধরিয়া) নিশীথ! ইনি মিস্ ইভা কারমেকার, (ইভার প্রতি) আমার বিশিষ্ট বন্ধু—ডাক্তার মিত্র।

উভয়কে উভয়ে নমস্কার করিলেন

প্রভাত। তারপর আপনি হঠাৎ এখানে—মানে—মানে হচ্ছে—

ইভা। আমায় আমার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করচেন?

প্রভাত। হ্যাঁ—মানে, কিছু দরকার টরকার যদি—(তাড়াতাড়ি) দেখুন, এই আমাদের সেই বিকাশ—যিনি আমাদেরই সঙ্গে তখন বি-এ পড়তেন। বিকাশ! তোমার মনে আছে নিশ্চয়। কথাটথা কও। মানে—মনে আছে ত তোমার?

বিকাশ। নিশ্চয় মনে আছে। (ইভার প্রতি) আপনি সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতেন। আপনার কবিতার খাতা আমরা সবাই প'ড়ে-খুব উপভোগ করতাম।

ইভা। সে রোগ এখনও ছাড়ে নি আমাকে। এই যে, সম্প্রতি এই একটা—যদিও এটা বাজে (ব্লাউজের ভিতর হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিলেন)

প্রভাত। (তাড়াতাড়ি) আপনারা তা হলে একটু কথাবার্তা—মানে, একটু excuse me—জানো না যে-বিকাশ ওঁর কবিতাটা—আমি এখনই

ইভা। আপনি একটু দেখুন না ডাক্তার দে! (প্রভাতের হাতে কাগজপ্রদান) কবিতার নাম হচ্ছে—"হৃদয়ের পরিচয়"।

বিকাশ। বিশেষ করে বোধ হয় নারীহৃদয়ের পরিচয়টাই এতে

ইভা। (একটু হাসিয়া) তা ছাড়া অন্য হৃদয়ের সঙ্গে পরিচয় ত আমার নেই বিকাশবাবু!

প্রভাত। তা বেশ ত! আমি একটু—মানে স্থিরচিত্তে—ওঘর থেকে না হয় ভাল ক'রে এটা প'ড়ে আবার আসচি। বিকাশ তুমি ততক্ষণ এঁদের সঙ্গে

ইভা। আপনি ওটা আপনার কাছেই রেখে দিন না। সময় মত—বাড়িতে টাড়িতে পড়বেন। আমি একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

প্রভাত। তা বলুন না! কি বলো নিশীথ, এঁ্যা? কথাটা সেরে ফেলাই ত ভালো। নইলে আবার দেরী হ'য়ে যাবে ওঁদের।

ইভা। কথাটা এমন কিছুই না।

প্রভাত। (সোল্লাসে) তবে আর কি! তা হ'লে এইখানেই বলুন না—কি বলো বিকাশ?

বিকাশ। তবে উনি যদি—

প্রভাত। (একটু রুষ্টভাবে) কি? উনি যদি কি আবার?

ইভা। (ঈষৎ হাসিয়া) আপনার বোধ হয় মনে আছে আমাদের girl studentদের একটা club ছিল।

প্রভাত। ও! সেটা উঠে গেছে বুঝি? তা naturally সে যাবেই ত! মানে—I am very sorry though!

ইভা। না—না। সেটা এখনও ঠিক আছে।

প্রভাত। আছে? Oh, so glad! মানে ওটা খুব (জোর গলায়) চমৎকার ছিল।

ইভা। আমিই তার Secretary

প্রভাত। তা বেশ! Right man wo—person হ্যাঁ, person—in the right place! (পিছু ফিরিয়া গায়ের জামাটা নাড়িয়া একবার বাতাস খাইয়া লইল)

ইভা। আপনি সম্প্রতি Ph. D পাওয়াতে আমরা একটি সভায় আপনাকে অভিনন্দিত করতে চাই। আসচে সপ্তাহে যদি আপনার—

প্রভাত। না—না—অবশ্য thank you কিন্তু মানে—সে দরকার নেই।

ইভা। দরকার নেই? বলেন কি? যিনি একদিন আমাদের সহপাঠী ছিলেন—যিনি আমাদেরই—

প্রভাত। এঁ্যা! বলেন কি? না, না—আমি ত কখনও (ঢোক গিলিয়া, তারপর যেন একটু চিন্তা করিয়া) মানে—thanks very much কিন্তু আমার যে আসচে সপ্তাহে মোটেই সময় হবে না—আমি, মানে, অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবো।

ইভা। বেশ, না হয় আরও এক সপ্তাহ পরে হবে।

প্রভাত। এক সপ্তাহ পরে? (আবার একটু চিন্তা করিয়া) ও, তখন যে আমি আরও ব্যস্ত থাকবো।

ইভা। তবে না হয় দু' একদিনের ভিতরেই বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। এমন কি কালও হতে পারে, যদি আপনি স্বীকৃত হন।

প্রভাত। (বিপন্নভাবে) সে কি বেশ সুবিধে হবে? (হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে) ও! আমি যে আজই দিল্লী এক্সপ্রেসে মধুপুর যাচ্ছি। দেখুন দেখি ভুলে যাচ্ছিলাম। তাই ত! আজ যে মধুপুর যাচ্ছি।

ইভা। আচ্ছা, তবে আপনি ফিরে এলেই হবে। আমি আবার খবর নেবো। ছাড়চি নে আপনাকে। আচ্ছা, নমস্কার!

প্রভাত। (সাগ্রহে) হাঁ, নমস্কার! আচ্ছা তা হ'লে—

নিশীথ ও বিকাশ। নমস্কার!

ইভা। (একটু হাসিয়া) নমস্কার!

প্রস্থান

প্রভাত। উঃ! বাপ্সঃ! (পুনরায় জামা নাড়িয়া বাতাস খাইতে লাগিল)

প্রভাতের অবস্থা দেখিয়া বিকাশ ও নিশীথের হাস্য

প্রভাত। তোমরা হাসচো, আর আমার প্রাণ—

নিশীথ। তোমার বলে—কি?

বিকাশ। ওকে বলে stage-fight. একবার কোনও রকমে ওটাকে জয় করে stageএ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেই তখন বেশ act ক'রে যেতে পারবে।

নিশীথ। কিন্তু তুমি তাহ মিথ্যে কথাটা ব'লে হে প্রভাত!

প্রভাত। কোনটা মিথ্যে কথা?

নিশীথ। এই মধুপুর যাওয়া আজ দিল্লী এক্সপ্রেসে?

প্রভাত। মিথ্যে কখনই হবে না। যখন বলেছি তখন যাবো নিশ্চয়!

বিকাশ। তোমার সেখানে একটা বাড়ী আছে না?

প্রভাত। একখানা মাঝারি গোছের furnished bungalow আছে। সেখানে যাওয়ার কথা আজ একবার মনে উদয় হয়েছিল, তাই ত জবাবটা ফস্ করে মুখে এসে গেল। সকালে ঐ টাইম-টেবলটায় ট্রেণের সময় দেখে রেখেছিলাম। মধুপুর যাব ব'লে।

নিশীথ। মধুপুর যাবে? বেশ ত, চলো—আমিও যাবো।

বিকাশ। ওহে, আমিও তোমাদের সঙ্গ নিচ্ছি তাহ'লে।

নিশীথ। তুমি দিল্লী এক্সপ্রেসে গেলে আজ রাত্তিরেই ত পৌঁছে যাবে?

প্রভাত। হাঁ। খবর দেওয়া আর হোলো না বাড়ীর care-takerকে। তবে আমি ত আর বাড়ী ভাড়া দিইনে কাউকে! আর সব সেখানে আছে, কেবল একটা সুটকেশ ভর্ত্তি করে নিয়ে রওনা হ'লেই হোলো।

নিশীথ। আমি তা হলে কাল সকালের দিকেই গিয়ে হাজির হ'চ্ছি।

বিকাশ। আর আমি হপ্তাখানেক পরে।

প্রভাত। বেশ, বেশ! কিন্তু বিকাশ তুমি সেখানে গিয়ে এবারে গান শেখানো সুরু করবে—বুঝেচ। তুমি হবে আমার গানের গুরু।

বিকাশ। চলো ত একবার। তার পরে গুরু হয়ে তোমাকে কত রকমের পাঠ শেখাবো।

বিকাশের গীত

(কীর্ত্তন)

পীরিতির রীতি শিখাইতে যদি
শুধাইব কানে কানে।
গুরু হবো তব প্রেম পাঠ দেবো
প্রাণ মোর যত জানে।
(আমি তোমার গুরু হবো)
নয়নের কথা পড়িতে শিখাবো
কহিতে শিখাবো গানে।
মনখানি জানা হলে, বলিব সে কিসে গলে
বাঁধা পড়ে কিসে কোন্‌খানে,
আনে যদি মান, মনে ব্যবধান
শিখাবো ভাঙাতে মানে।
(শিখায়ে দেবো)
(মান ভাঙাতে শিখায়ে দেবো)
(ও সে মানিনীর মান ভাঙাতে
আমি তোমায় শিখায়ে দেবো)
শিখাবো ভাঙাতে মানে।

প্রভাত। আচ্ছা! আচ্ছা! বহুত আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে!

বিকাশ ও নিশীথের প্রস্থান। অল্পপরেই টাইম টেবলখানা তুলিয়া লইয়া প্রভাতের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মধুপুর—প্রভাতের বাটীর কক্ষ। সময়—মধ্যরাত্রি

বাড়ীখানি একতলা এবং বাংলো ধরণের। তাহার একটি কক্ষ দেখা যাইতেছে। দুইটি জানালা চোখে পড়ে, তাহার মধ্যে একটি খোলা আছে। জানালায় গরাদ নাই। উহা একটিমাত্র কবাট দ্বারা খোলা ও বন্ধ করা যায়। ঘরের মাঝখানে ছোট টেবিলের উপর একটি ছোট কেরোসিনের আলো মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। খোলা জানালাটির পিছন দিকে বাগান, ও জানালার দুই পাশে ভিতর দিকে দুইখানি ক্যাম্প্‌খাট। টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে একজন যুবতী বসিয়া এবং একখানি ক্যাম্প্‌খাটের ধারে একটি যুবক বসিয়া আছে।

রোহিণী। ভাখো, মানুষ না পাখী? কাল ছিলাম পাটনায় আর আজ মধুপুরে। দাদামশাই আসতে লিখলেন, একবার তাঁর কাছটা ঘুরে যাওয়া ভালই হোলো।

অভয়। (কথা কহিতে তোতলামি আসিয়া পড়ে) কিন্তু ওঁর নিজের বা—বাড়ীতে এখন জায়গা নেই। এখন আসতে না বল্লেই ভাল হোতো।

রোহিণী। দাদামশাই বলেছিলেন "সাহেবের বাড়ীখানা খালি পড়েই থাকে। চাইলে এক আধ দিনের জন্যে ওরা থাকতে দেয়।" তা এ বাড়ীটা বেশ ভালো। নয়? আর ফাগুন মাস প'ড়েচে, মধুপুরে এখন থাকতে বেশ।

অভয়। হাঁ, জায়—জায়গাটা বেশ ভালই লাগচে।

রোহিণী। এ জানলাটা খোলা থাক্—কি বলো?

অভয়। একটু যেন মেঘ মেঘ করচে না?

রোহিণী। যদি জল আসে তখন বন্ধ ক'রে দেবো।

অভয়। তা—আই, ভালো। আমি অভয়—আমার ভূ—ভূতের ও ভয় নেই, আর চো—ওরকেও ভয় করি নে। থাকলোই বা জানলা খোলা—তুমি শু-উয়ে পড়ো।

নেপথ্যে—"মালী! মালী!"

রোহিণী। ওগো, কে যেন ফটকের দিকে "মালী, মালী" বলে ডাক্‌চে।

অভয়। রাত দুপুরে এই পোড়ো বাড়ীতে কে আবার মা—মা—আলী বলে ডাক্‌তে আসবে?

রোহিণী। তাই হবে।

নেপথ্যে পুনরায় উচ্চস্বরে—"মালী, মালী!"

ঐ আবার ডাকচে।

অভয়। নিশ্চয় ও-বাড়ীতে। নইলে এ বাড়ীর মালীরা সাড়া দিতনা?

রোহিণী। এখানকার উড়ে মালী দুটো কোথায় যাত্রা হ'চ্চে, তাই শুনতে গেছে। আমি আসতেই ব'ল্লে—তাদের সেই মধুর ভাষায়—"আমরা যাত্রা শুনতে যাচ্ছি, বাইরের ফটক অমনি বন্ধ রইল, একটু বেশী রাত্তিরে ফিরে এসে তখন আমরা তালা বন্ধ ক'রে দেবো। কোনও ভয় নেই।"

অভয়। হ্যাঃ! ভয় আবার কি-সের? কৈ, আর কেউ ডাকেচে না ত?

রোহিণী। না। ও দাদামশায়ের বাড়ীতেই কেউ ডাক্‌চে।

অভয়। উঃ! বড় ঘুম ধ'রেচে। (শুইয়া পড়িয়া) তুমি আস্তে একটা গা—আন্ ধরো না! আমি শু—উন্‌তে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

রোহিণী। তোমার ঐ এক বাই!

রোহিণীর গীত

যেওনা, কথাটি রাখো।
এমন বাদল রাতে তুমি কাছে থাকো।
বায়ু বহিছে উতল, বারি ঝরে অবিরল,
পথ হয়েছে পিছল—তুমি যেও নাকো।
গুরু গুরু ঘন ডাকে, হিয়া দুরু দুরু কাঁপে,
একেলা ফেলে আমারে—তুমি যেও নাকো।

রোহিণী। (গান শেষ করিয়া) জেগে আছ না ঘুমিয়েছ? ওগো!

অভয় সিংয়ের নাসিকাগর্জ্জন শোনা গেল

রোহিণী উত্তর না পাইয়া "র‍্যাপ"খানা ভাল করিয়া গায়ে ঢাকা দিয়া আপন শয্যায় শয়ন করিতে যাইবে এমন সময় হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটি "টর্চের" আলো পড়িল। রোহিণী আলো দেখিয়া শয্যা হইতে ত্রস্তভাবে গাত্রবস্ত্রাদি গুটাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং মাথাটা নীচু করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে অপর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া স্বামীকে অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল ও গা ঠেলিতে লাগিল।

রোহিণী। ওগো, শুনচো? ওঠো ওঠো শীগ্‌গির! ওগো। আঃ—কি ঘুম বাপু! এই ত দু'মিনিট আগেও জেগেছিলে! (জোরে গায়ে ধাক্কা দিয়া) ওগো, ওঠো না!

অভয়। (হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া) এঁ্যা! কি—কি হয়েচে?

রোহিণী। চোর! ঐ দ্যাখো আলো!

অভয় উঠিয়া আস্তে আস্তে দেয়াল ঘেঁষিয়া আলোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া রোহিণীও অগ্রসর হইতেছে। হঠাৎ একটা স্যুটকেশ্ সশব্দে ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িতেই অভয় সভয়ে ধরাশায়ী হইল। রোহিণী তাহাকে ধরিয়া তুলিল।

রোহিণী। একটা স্যুটকেশ কোত্থেকে এসে পো—ওড়্‌ল।

অভয়। আরে ব্বাপ্‌রে—ব্বা—আবা! এ ভূতের বাড়ী না কিরে ব্বাবা! কার স্যুটকেশ উড়ি—উড়িয়ে এনে ফেল্লে!

রোহিণী। ও কি গো? তুমি অত কাঁপচ কেন? তবে নাকি তুমি ভূতকে ভয় করো না? তা চোরও ত হ'তে পারে?

অভয়। খু-উব পারে।

এমন সময় দেখা গেল কে যেন জানালা বাহিয়া উঠিতেছে। তাহার মাথা ও মুখ অস্পষ্ট দেখা গেল। অভয় দেখিতেছে কিন্তু নড়িবার সাধ্য তাহার নাই। short ও shirt পরা একজন লাফাইয়া ঘরের মধ্যে পড়িল। অমনি অভয় তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল। তাহার পতনশব্দে চকিত হইয়া আগন্তুক অভয়ের উপর টর্চের আলো ফেলিল। রোহিণী তখন অন্ধকারের দিকে একটি শয্যার পার্শ্বে লুকাইবার জন্য বসিয়া পড়িল। আগন্তুক আর কেহ নহে—প্রভাত।

প্রভাত। (অভয়ের প্রতি) কে তুমি?

অভয়। আঁ—আঁ—আঁ—

প্রভাত। কে তুমি? এখানে কি কোরচো?

অভয়। তু—তু—আপ্‌—আপ্‌—আপনি

প্রভাত। আপ্‌—আপ্‌ কি? তুমি ওঠো you get up!

অভয়। আমাকে ছে'—এড়ে

প্রভাত। ছেড়ে দেবো? বটে। আচ্ছা, আগে কে তুমি বলো!

অভয়। আমার নাম—অ—অভয় সিংহ।

প্রভাত। (হাসিয়া ফেলিল) ঠিক নাম হ'য়েচে। ভয় ত নেই-ই, আর বিক্রমটাও সিংহেরই মত বটে। এখানে কেন এসেছিলে?

অভয়। শু-উতে এসেছিলাম।

প্রভাত। শুতে—এখানে কেন এসেছিলে?

অভয়। ওই ওরা ব'ল্লে—বি-ইছানা করে দিয়ে গেল—তাই।

প্রভাত। কা'রা ব'ল্লে?

অভয়। ওই অট—অট—

প্রভাত। (স্বগত) ভারী বিপদে পড়া গেল ত! এর মাথামুণ্ডু ব্যাপারটা ত কিছুই বুঝতে পারচিনে। আর এটা খালি অট অট করতে থাকলো।

অভয়। (সানুনয়ে) চো-ওর সায়েব! আমি সব দি-ইয়ে দিচ্ছি—তোমার ঐ স্যুটকেশ ভ-অর্ত্তি করে। আমাকে ছে-এড়ে দাও। আমি কিচ্ছু বলবো না—চ্যা-এঁ্যাচাবোও না। তুমি নিয়ে (তুড়ি দিয়া) চ-অম্পট দাও।

প্রভাত। (একটু হাসিয়া) চোর সায়েব! চোর তুমি না আমি?

অভয়। মা-আইরি! আমি চোর নই।

প্রভাত। তবে কা'রা তোমাকে এখানে শুতে বলেছিল? অট—অট—করে কি বলতে যাচ্ছিলে বলত! রাস্তার ওপারের বাড়ীর ঐ অটলবাবুর তুমি কেউ আত্মীয়?

অভয়। হ্যাঁ। না—না—না—

প্রভাত। (বিরক্তভাবে) হ্যাঁ, আবার না?

অভয়। ও-উনুন না। না-না-আতজামাই অটলবাবুর। আর তাঁর এই—(প্রভাতের হাত ধরিয়া টানিয়া রোহিণীর কাছে আনিয়া তাহাকে দেখাইয়া) তাঁর না-আত্‌নিটি আমার বো—ঔ।

রোহিণী তখন ধীরে ধীরে প্রভাতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঠিল। প্রভাত তাহার দিকে একবার মাত্র টর্চের আলো ফেলিয়াই পরমুহূর্ত্তে আপন স্যুটকেশ লইয়া পুনরায় জানালা টপ্‌কাইয়া দৌড় দিল

অভয়। তবে সত্যি চোর নাকি? তোমাকে দেখেই পালালো কেন বলো ত?

রোহিণী। না পালালে তুমি ধরতে নাকি?

অভয়। ওকে বাবা-বাবা-বাবাকেশুদ্ধ ধরিয়ে দেবো বলেই ত সব দি-ইয়ে দিতে চাচ্ছিলাম।

রোহিণী। ওঃ তোমার এত বুদ্ধি ছিল এর মধ্যে?

অভয়। ন-অইলে তুমি কি মনে করেছিলে যে এই অভয় ভ-অয় পেয়েচে? যাক্‌, তুমি একটু আমার আগে আগে চ-অলো ত, আমি দেখি মালী বেটারা এসেচে কি না?

হঠাৎ বাহিরে চীৎকারের শব্দ

অভয়। (সহসা শিহরাইয়া) ওরে ব্বাবা। পা-আলায় নি! ডা-আকাতের দল ডাকতে গিয়েছিল।

বাহির হইতে ঘরের দরজা ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে ডাক আসিল—"বাবু! দরওয়াজা খোল্‌ দি জিয়ে, চোট্টা পাকড়া লিয়া"। রোহিণী দরজা খুলিয়া দিল। দুইজন উড়িয়া মালী ও একজন পাহারাওয়ালা প্রভাতকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল

বিন্দামালী। বাবু! এ শুট্টে চোর জনলা লম্ফাই কিরি, এ বাকস শুট্টে নেই কিরি ভগিথিলা। মু ধাইকি ধরিলি।

কৃষ্ণমালী। অঃ! বড্ড জোয়ান আছ তুম্বে। চোর তু ধরিথিলু? তোকো মুখরে এমতি মিথ্যা কথা অসিলা কিমতি? শুন বাবু! বিন্দা না ধরিথিলা—মু ধাই কিরি ধরিথিলি। মু আগে ধরিলি ত পহারাওলা অসি সলানি।

পাহারাওয়ালা। যাও যাও, বক্‌ বক্‌ মত্‌ করো। দোনো উড়িয়া শালা এক সমান হায়। শুনিয়ে বাবু! হাম ইধার সেঁধিসে আয়া থা। কোঠিকা বগলসে যাতে যাতে দেখা—এহি

শালা একঠো "বেগ" লে'কে ভাগ্‌তা। বস্—বাতলা দেখা—ওদাড়ি ঘুনকে উসকা পিছু পিছু দৌড়ায়া। শালা তিন চার গলি বাদকে তব পাকড়া গিয়া।

প্রভাত। এই মালী! যা, বলচি! শীগ্‌গির অশ্বিনী-বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।

পাহারাওয়ালা। শুন লে, লাট সাহাবকা হুকুম শুনো।

বিন্দা। অশ্বিনীবাবু কৌন?

পাহারাওয়ালা। (প্রভাতের প্রতি) আরে খুব ত দেখনেমে একদম বড়াসাহাব বন্ গিয়া, আউর রাতকো "বেগ" হাতমে লে'কে নয়া রকম চোরিকা মতলব কিয়া। পহেলে থানামে চলো তব পিছু অশ্‌নিকো বোলাইও।

গোলমাল শুনিয়া অপর বাড়ী হইতে অটল, অনুকূল ও পুষ্পর প্রবেশ

অটল। কি হয়েচে? এ সব কি?

পাহারাওয়ালা। আরে বাবু, চোর পাকড়া গিয়া। দেখিয়ে ক্যায়সে সৌখীন চোর (প্রভাতকে একটা গুঁতা দিল)।

অভয়। বুদ্ধি খাটিয়ে ওকে ঘ-ঘরে আটক করে ফেলেছিলাম। ধো-অসুখ কিনা বোকে বাই ডিস্‌গেস করতে এসেছি, আর সেই ফাঁকে ও চ-অম্পট দিচ্ছিল।

প্রভাত। (পাহারাওয়ালার প্রতি) দেখো, তোমকো হাম বিল্‌কুল বোলতা ই কোঠি হামরা আপনা হায়, তব্‌ভি তোম মানতা নেহি। আউর হামরা হাত পাকড়কে রাখতা। ইস্‌কা সাজা তোমকো পিছে মালুম হো যায় গা।

পাহারাওয়ালা। আরে হাঁ! বাকি তোমরা মালুম হোগা পহেলে। তোমরা আপনা কোঠি, ত দৌড়কে হিঁয়াসে ভাগতা থা কাহে?

পুষ্প একটি Petromax Hurricane ল্যাম্প প্রভাতের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। প্রভাত একবার পুষ্পর মুখের দিকে চাহিয়াই আবার পলাইবার উদ্যোগ করিল। পাহারাওয়ালার হাত খুলিয়া যাইতেই পুষ্প প্রভাতের হাত ধরিয়া ফেলিল।

পুষ্প। কেন আপনি অমন করে পালাতে যাচ্ছেন বলুন ত? তাই ত আপনাকে ওরা দোষী মনে করচে। আপনি এইখানে আমার কাছে থাকুন। (হাত ছাড়িয়া দিল। প্রভাত জড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল)

পাহারাওয়ালা। যা কি ও ভাগে নেহি, আপ দেখিয়ে।

পুষ্প। তার জন্যে আমি দায়ী রইলাম।

পাহারাওয়ালা। (সনিঃশ্বাসে) বহুত আচ্ছা!

প্রভাত। কিন্তু আপনি আমার জন্যে—আমি—মানে, কি বলবো যে—বুঝতে পারচিনে।

পুষ্প। (মৃদুহাস্যে) আর আপনার বলতে হবে না। (অটলের প্রতি) দাদু! একটা গোলমাল কিছু এর ভেতর আছে নিশ্চয়! এঁকে দেখে কখনও চোর ব'লে মনে হতে পারে? সব গোলযোগ আর চেঁচামেচি করে আসল ব্যাপার কেউ বুঝতে চাইচে না। অশ্বিনীবাবুকে উনি ডাকতে বলচেন, তা কেউ কানেই তুলচে না সে কথাটা।

অটল। তাই ত! ব্যাপারটা ভাল করে অনুসন্ধান করা দরকার। চুরি করতে আসার কথাটা আমারও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

অনুকূল। ও সুটকেসটা একবার দেখলে ত হয়। (অগ্রসর হইয়া আলোয় পরীক্ষা করিতে গিয়া) এই ত একটা নাম লেখা রয়েচে দেখচি—পি, দে।

অটল। (প্রভাতকে) আপনার নামটি কি?

প্রভাত। প্রভাত দে।

অটল। ওঃহো! আমি ঐ রাস্তার ওপারের বাড়ীতে থাকি। আমার নাম অটল দত্ত। এই বাড়ীখানা তবে আপনারই?

প্রভাত। আজ্ঞে হাঁ।

অটল। আপনার অশ্বিনীবাবু আমাকে বলছিলেন বটে সে দিন—"বাড়ীটা ভাড়া দেবার জন্যে প্রভাতবাবুকে লিখেছিলাম, তা তিনি ত নিজে কালে-ভদ্রে আসেন, তবু ভাড়া দিতে রাজী নন।"

অনুকূল। তোমরা শীগ্‌গির অশ্বিনীবাবুকে ডেকে পাঠাও। পাহারাওয়ালা সাহেব একটুখানি দাঁড়াও তুমি।

অভয়। আমার এখন মনে হচ্ছে এ বাড়ীখানা সত্যিই এই ভ-অদ্র লোকের। আমরা এখানে ঢ-উকে এসেই এঁর মু-উশ্‌কিল হয়ে পড়েচে।

অশ্বিনীর ব্যস্তভাবে প্রবেশ

অশ্বিনী। ব্যাপার কি? এদিকে গোলমাল শুনে আমি তাড়াতাড়ি আসচি।

অনুকূল। আপনার বাবু—প্রভাতবাবু এসেছেন। এই যে তিনি।

অশ্বিনী। এঁ্যা! (অটলের প্রতি) এই ভয়েই আমি কাউকে এ বাড়ীতে থাকতে দিতে চাইনে। আর আজ ঠিক যাই একটা রাত্তিরের জন্যে আপনাদের—দেখুন দেখি মুস্কিল!

পুষ্প। (রুষ্টভাবে) আর আপনি দেখুন দেখি এঁর মুস্কিল অবস্থাটা! আর এই হতভাগাগুলো চেহারা দেখে মানুষ চিনতে পারে না!

প্রভাত একবার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল

জ্যোতিষী। দাদামশাই! তুমি প্রভাতবাবুকে এখন তোমার ওখানে নিয়ে যাও। আর সবাই এখন ও বাড়ীতেই যাই চলো।

পুষ্প। কিন্তু দাদু! যাদের অপরাধে এঁর এই শাস্তিভোগ তাঁদের ত মাপ চাওয়া উচিত এঁর কাছে?

অটল। অপরাধ ত সব চেয়ে বেশী আমার, মাপ যদি—

প্রভাত। না-না মাপ চাওয়া—মানে সে সব করলে আমি—

অনুকূল। আচ্ছা, আচ্ছা—আসুন তবে।

প্রভাত। দেখুন, আমি এখানে—মানে—ফাঁকায় বেশ থাকবো। আপনারা বরং rest নিন গে।

অশ্বিনী। বাবু! আমারে আপনি মাপ করেন। (হঠাৎ বসিয়া) নইলে ছাড়ুম্‌ না।

বিন্দা ও কুম্ভ। মতে মাপ করো রক্ষা বাবু! (পায়ের কাছে পড়িল)

প্রভাত। (ব্যস্ত হইয়া অশ্বিনীকে উঠাইল) আহা করো কি অশ্বিনীবাবু! তোমার কোনও অপরাধ হয় নি। তোমার এই মালী দুটোও কি নতুন না কি? আচ্ছা, আমি যখন আসি, তখন এরা ছিল কোথা?

বিন্দা। স্বতন্ত্রাচরণ যাত্রা শুনিবাকু যাইথিলি। আউ কৌটি মুন্ নিবি। (পা ছাড়িয়া উঠিয়া আপনকান মলিতে লাগিল। কৃষ্ণও তদ্রূপ করিতে থাকিল)

অশ্বিনী। এখানে কেউ উড়ে ম্যাড়া ত বাচে না। আমিও আপনারে মা করছিলাম। তা আপনি শোনেলেন কই? বেটারা একদম বে-আক্কেল!

পাহারাওয়ালা। (অশ্বিনীকে) আপ্ ইনকো পহ্চা?

অশ্বিনী। হ্যাঁ, আমি ত ঠিকই চিনছি—এই আমাদের বাবু প্রভাতবাবুই ত! কিন্তু এসব কি?

পুষ্প। পাহারাওয়ালা ওঁর বাড়ীতেই ওঁকে চোর বলে ধরেচে!

অশ্বিনী। (অবাক হইয়া সকলের প্রতি একবার দেখিয়া লইল) এঁ্যা—তুমি একি করেচ? তুমি পাহারাওলা, আমার বাবুরে চোর কও!

বিন্দা। মু কইথিলি, হাসিনি বাবু! "এ মোর বাবু নিশ্চয় অসিছন্তি। এমন্তি বড্ডাকু চেহারা নেই কিরি আউ কৌড় অসিব?" ব্যাস-ছুস, পন্ধা বুঝু নোর কথা ন শুনিলা। ই পহারাওলাকু মু কেত্তে কহিনি "এ মোর বড্ডা বাবু—চোর ন অছি—তাকু ছাড়ি দিয়"। উ আউ তেমন্তি অছি—যেমন্তি গুটে লাট সাহেব।

কৃষ্ণ। শড়া! মোর মোর হলা, শড়া? তু চোর বলি কিরি বাবুকো ঘরারে তিন চারিটা ঘুষি লকাইথিলু না? শড়া তহ্ মু জুতি মরিবি, হঁ—জুতি মারিবি, শড়া! (অশ্বিনীর পায়ের জুতা খুলিতে গেল)

অশ্বিনী। এই চুপ্ কর বেটারা! কাইটে ক্যালাবো শালাদের! পাহারাওলা—তুমি যাও—নিজের কাজে যাও। এ আমার মনিব—চোর কও কারে?

পাহারাওয়ালা। আরে বাবু, হামরা কেয়া কসুর হায়? ব্যাগ লে'কে রাতকো ঘরসে ভাগনা কুছকে আদমি ভাগতা ত হাম কেয়া সমঝেঙ্গে। আরে রাম! সীতারাম!

প্রস্থান

অভয়। তবে শুনুন, একটা কথা বলি প্রভাতবাবু! আপনি হয় ত তখন মনে করেছিলেন আমি খুব ভয় পেয়েছি কিন্তু না—আসল কথা তা নয়—ওটা আমার চোর ধরবার একটা কল্—ফন্দি!

সকলের উচ্চহাস্য

আমি অভয় সিংহ—চোরের তো—ওয়াক্কা ত রাখিই নে। আর ভূত? বা—বাপো! বা—বাপো!

পুষ্প। সত্যিই প্রভাতবাবু তাহ'লে আমাদের ওখানে যাবেন না?

প্রভাত। দেখুন, আমি, মানে—মানে, আমি

অনুকূল। (প্রভাতের হাত ধরিয়া) মানে আর বুঝতে হবে না, আপনি আসুন।

অনুকূল ও প্রভাত এবং তাহাদের পশ্চাতে সকলের প্রস্থান

ষ্টেজ একেবারে অন্ধকার। পরে ধীরে ধীরে আলোর
বিকাশ ও দৃশ্যান্তরের প্রকাশ

ক্রমশঃ

দুর্দ্দিনে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আহা ছোট ছেলে জীর্ণ শীর্ণ
দেখিলেই তারে দুঃখ লাগে,
ভিক্ষার লাজ জাগেনি এখনো
জড় সড় হয়ে ভিক্ষা মাগে।

দুটী দিন তার জোটেনি আহার
কেঁদে কেঁদে বসে গিয়াছে আঁখি,
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর
মূর্ত্তি ধরিয়া আসিল না কি?

অনেক গিয়াছে দুখ দুর্দ্দিন
ইতিহাস তার খবর জানে,
সবই সহা যায়, শিশুর উপোস—
আঁখির সমুখে—সহেনা প্রাণে।

খাওয়াইয়া তারে ডাকিলাম কাছে
আসিয়া বসিল আমার ঘরে,
পটে শ্রীহরির মূর্ত্তি দেখিয়া
ভূমেতে লুটায়ে প্রণাম করে।

প্রণাম করে সে আমি কেঁদে মরি
কৃতজ্ঞ হলে মানুষে তবু,
তুমি ভুলিয়াছ অনাথ বালকে
সে কই তোমারে ভোলেনি প্রভু?

কখন পাতিলে কমল আসন
শিশু শুদ্ধ কোমল মনে,
বুঝিনে তাহার কি আত্মীয়তা
কি যে পরিচয় তোমার সনে।

তোমারে দেখেই চিনেছে সে আগে
অন্নদাতার অন্নদাতা,
দুঃখ দেখেছে—তবু জানে তুমি
দুঃখ হরণ বিপদত্রাতা।

অন্তর্যামী তুমি ত মহান
সব ব্যথা তব হৃদয়ে বাজে,
মানুষ সাজিয়া কাছে এসো তাই
দূরে বসে থাকা কি সাজে?

শুধু একটি দিন

শ্রীসোমা

বিয়ের সুদীর্ঘ তিন বছর পরে অলক যখন স্ত্রী অনিতাকে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে গেল, তখন পরিচিত অপরিচিত এবং অল্প পরিচিত সকলেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। অবশ্য তার কারণও যথেষ্ট ছিল। অলক ও অনিতা দুজনেই সুন্দর। সাধারণ দৃষ্টিতে অলক কিছু অসাধারণ, অনিতাও প্রায় তাই। অলক ছেলেটি সত্যই ভালো, অন্ততঃ লোকে তাই বলে। স্বভাবতই গম্ভীর প্রকৃতি, কিন্তু প্রয়োজনে বেশ দু কথা বলতেও পারে। চাকরি করে ভাল, ভাল মাইনে পায়। মোট কথা জামাই হিসেবে নাটকীয়, স্বামী হিসেবে ঔপন্যাসিক, প্রেমিক হিসেবে ছোট গল্পের উপযুক্ত নায়ক। এ হেন অলক যে স্ত্রীকে বিয়ের রাত্রি থেকেই বিসর্জন দেবে, কেউ তা কল্পনাও করতে পারেনি। কল্পনাতীতও অনেক কিছুই যে থাকে, তা আমরা কল্পনাও করিনি!

বিয়ের ধুমধাম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অলক বুঝল, কোথায় একটা প্রকাণ্ড ভুল হ'য়ে গেছে। অনিতাকে বাসরে দেখেও ওর বলতে ইচ্ছে হ'ল না 'আমি তোমায় ভালবাসি'। কারণ এ কথা অনেকবার অনেকরকম ভাবে ও বন্যাকে বলেছে।

বন্যা ছিল অলকের ছাত্রাবস্থার বান্ধবী, কৈশোরে সখী ও যৌবনে প্রেয়সী। অর্থাৎ বন্যাকে ও ভালবাসত'। ভালবাসত' বলেই বন্যাকে বিয়ে করতে চায়নি। বন্যা ছিল বড়লোকের মেয়ে, অলক ছিল সেই হিসেবে মধ্যবিত্ত। বড়লোকের বড় ঘরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে মধ্যবিত্ত জীবন-যাত্রায় বন্যা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না, এই ছিল অলকের আশঙ্কা। তাছাড়া মা কি ভাববেন, বাবা কি ভাববেন, এই সব নানান কারণে বন্যাকে বিয়ে করার কথা ওর মনেও হয়নি।

ইতিমধ্যে চাকরির জন্যে ওদের দুজনের হল ছাড়াছাড়ি। ব্যবধানে অলক বুঝতে পারল' বন্যাকে না হলে ওর চলবে না। তারপর কোথা দিয়ে কি হল, মার অনুরোধে, নিয়তির বিধানে আর সাময়িক উত্তেজনায় অনিতার সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেল।

বন্যার অভাব অলক প্রথম অনুভব করল বিয়ের আসরে। মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ করে তার ছোট ছোট কথা ছোট ছোট হাসি ওকে অন্যমনস্ক করে তুলল। বন্ধু বান্ধব ঠাট্টা করল, অনিতার বান্ধবীরা মুখ বেঁকিয়ে বিদ্রূপের কটাক্ষ করল, কেউ কেউ বলল এখন থেকেই এত!

অলক কিন্তু অবিরাম বন্যার কথাই ভাবছে!

বাসরে বন্যার অভাব ব্যথা হ'য়ে দেখা দিল, ফুলশয্যার রাত্রে অনিতা অলকের কাছে রীতিমত বিরক্তিকর হ'য়ে উঠল।

অনিতা বুঝল' না, সে ব্যথা ও অপমান অনুভব করল, প্রতিশোধ চাইল।

মিলনের আরম্ভতেই সমাপ্তি। বিয়ের পর্ব শেষ হবার আগেই ব্যবধান। তারপর তিন বছর কেটে গেল।

বন্যার সঙ্গে অলকের আর দেখা হয়নি, শুধু একখানা চিঠি বন্যার কাছ থেকে ও পেয়েছিল।

দিন থেকে দিনে অলকের ছুটে চলা, তবু দিন কাটে না। বন্যার অভাব, অনিতার অশান্তি সব মিলিয়ে জীবনের গতি যেন রুদ্ধ হ'য়ে আসে! অনিতার জীবন যে ও নিজেই বিষময় করেছে এই একটা ধারণা ওকে আরও অশান্ত করে তুলল। জীবনে ওর অবলম্বন চাই।

অনিতাকে ও নিয়ে এল।

তারপর আরও ছ'মাস কেটে গেল। বৈচিত্র্যহীন কটা মাস। কলের চাকার মতন জীবন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। নির্লজ্জের মতন শুধু অভিনয়! প্রাকৃতিক নিয়মে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ বজায় রাখা···

তবু, এই অভিনয়ের পেছনে ছিল সত্যের আভাস। অলকের অবলম্বন চাই—অনিতা সেই অবলম্বনের নিমিত্ত। ওর অনাগত সন্তানের জননী অনিতা। এই কথাটি অলককে জানিয়ে অনিতা আবার ফিরে গেল।

পরিবর্ত্তন আরম্ভ হল অলকের জীবনে। জীবনটা মনে হ'ল না অবাস্তব। অন্তরের সাড়া পেল, পরিপূর্ণতার আভাস পেল। যে অনন্ত হাহাকার বিরাট আকার ধারণ করেছিল, কোথায় অন্তর্হিত হল। বসন্তের দখিন্ হাওয়ায় উদ্দাম মরু-ঝড়ের যে উত্তাপ ছিল, তা যেন মিলিয়ে গেল। শুকনো গাছ পাতায় ভ'রে উঠল, পাতার রঙ্ বদল, রঙে লাগল নেশা। ফুলের সুরভিতে মধুকর আকৃষ্ট হ'ল—আর মনে হলনা, তা মিথ্যা তা অলীক।

চারিদিকে পরিপূর্ণতা। চারিপাশে আলো। চারি ধারে বসন্তের সৌন্দর্য্য। 'সে আসছে!' প্রত্যেক কাজে, ওর চিন্তায়, স্বপনে, এই একটি কথাই সত্য হ'য়ে উঠল।

কে আসছে?—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অলক নিজেই নিজেকে এই প্রশ্ন করে। কেউ নেই, তবু লজ্জা পায়। হেসে ফেলে, কিন্তু পাশেই একটি ছোট্ট মেয়ের মুখ দেখতে কোনদিনও ওর ভুল হয় না। পেছন ফিরে দেখে, সত্যি নাকি?···

অবসর ওর কোথা দিয়ে কেটে যায়। কল্পনাবিকল্পনায় ওর জীবন ভরে ওঠে।

মেয়ে?—হাঁ, ছোট্ট একটি মেয়ে, ফুটফুটে, একরত্তি, সাদা নরম তুলোর মতন—ধবধবে সাদা। কাল' বড় বড় চোখ, গোল গোল হাত পা, ছোট্ট নরম তুলতুলে গাল, কটা কটা চুল,—মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে হাসি,······

কি নাম রাখবে? বিনিতা? 'অঞ্জনা? অলকা? কৃষ্ণা? পূর্ণিমা? রতি? উহুঁ—কোনটাই ওর পছন্দ হয় না—কোনটাতেই যেন মাধুর্য্য নেই, মিষ্টতা নেই, মেয়েটির আসল পরিচয় নেই!···তবে? থাক্‌গে পরে ঠিক করলেই চলবে—এখনও কম করে চার মাস সময়।

কিন্তু কার মতন দেখতে হবে?

সুন্দরী, ধবধবে ফর্সা, টানা নাক, কাল চোখ—সরল চাউনি, সুন্দর হাসি, ছোট্ট ঠোঁট—কার চেহারার সঙ্গে যেন মিলে যাচ্ছে। কার চেহারা?—ও, ঠিক ও!

অলকের মনে পড়ে যায় লাইব্রেরীঘর, ক্লাসরুম, নোটবই, খেলাধুলো, সবার সঙ্গে যেখানে একটি সুন্দর মুখ—যে নেই, নেই, নেই—ঠিক হ'য়েছে—মেয়ের নাম রাখবে—অনন্যা, বন্যার সঙ্গে বেশ ভাল' মিল হবে।

কিন্তু অনিতা যদি কিছু মনে করে, যদি রাগ করে—যদি অভিমান করে ?

অনন্যা! সত্যিই ত' সে অনন্যা। অনন্যার দুকূল প্লাবনে ভাসিয়ে বন্যা আবার ওর জীবনে আসবে। অনন্যাই বন্যা হ'য়ে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

অনন্যা। ছোট এক বছরের মেয়ে। সবে হাঁটতে শিখেছে, কত রঙ বেরঙের খেলনা। না টিনের খেলনা কিছুতেই নয়, যদি ফুটে যায়, কেটে যায় ? ফিকে নীল রঙের ফ্রক, সাদা সিল্কের ফ্রক—মানাবে ভাল।

পার্কের মধ্যে দিয়ে প্যারাম্বুলেটার নিয়ে ও বেড়াতে যাবে। সকলে ভাববে সাহেবদের ছেলে বুঝি। ঠিক সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটির মতন। সন্ধ্যা হবার আগেই বাড়ী ফিরবে, নইলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

আচ্ছা যদি অসুখ করে ? হুপিং-কফ ! কোন্ ডাক্তার ডাকবে ? ডাঃ মুখার্জী ! না, কাজের নয় কিছু, তবে ? ডাঃ মিত্র ! সে তবু ভাল—কিন্তু না, বিলেতী ডিগ্রি নেই, তার চেয়ে ডাঃ মুখার্জীই ভাল—একটু অনুরোধ করলেই হবে !

কত জ্বর ? একশো দুই ! তাহ'লে বাপু ডাঃ মুখার্জীতে দরকার নেই সিভিল সার্জেনই ভাল, টেলিফোন করলেই হবে।

আচ্ছা তাহ'লে ত' টেলিফোনটা ঐ ছোট্ট টেবিলে রাখলে চলবে না, দুষ্টু মেয়ে, যদি ফেলে দেয় ?

সত্যিই ত' যদি কেউ কেড়ে নেয়, তাহ'লে ত' ওকে ইস্কুলে দেওয়া চলবে না। কনভেন্টই ভাল !

সন্ধ্যে সাতটায় অলক অফিস থেকে ফিরবে, অনন্যা তখন হয়ত পড়ছে। অঙ্ক ? ইতিহাস ? ইংরেজি ?

ওকে দেখে অনন্যা পড়া ভুলে যাবে। "জান বাপী" অনন্যা বলবে, "সিষ্টার ওয়াক বলেছেন কাল নতুন খাতা চাই—আর পেনসিল—রবার, আর, বই—

তাই নাকি ?

আচ্ছা বাপী মোটর চলে কেন ? ওড়ে না কেন ? পেনসিল কি করে হয়, বেলুন উড়ে না কেন—আকাশে ? চিলেরা ওড়ে কি করে ? পাখী কথা বলে ? কি কথা বলে ?

ছোট ছোট রং বেরঙের প্রশ্ন। অলক উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে—

তাই ত' অনন্যাকে ত' গল্প বলতে হবে। কি গল্প বলবে ?

এক ছিল রাজা—

তার পর ?

তারপর সে গেল বনে শীকার করতে—

কি শীকার ?—বাঘ—

হ্যাঁ বাঘ—এই ইয়া বড় বড় বাঘ—হালুম—

অনন্যা ভয় পেয়ে অলকের হাঁটু চেপে ধরবে, অলক হাসবে—

দ্যোৎ ভীতু !—তারপর—

অনন্যা ঘুমিয়ে পড়েছে। সযত্নে ওকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে অলক মশারীটা ফেলে দেবে। কিন্তু খাওয়া হয়নি ত'—জাগাবে ? না থাক—কিন্তু মহা বিপদ, কি করবে তাহ'লে ?

অনন্যা আরও বড় হবে। শাড়ী পরবে। কি রঙের ? নীল ? ফিকে নীল ? হ্যাঁ, সেই ভাল। সেতার শিখবে ! ম্যাট্রিকে কি কি সাবজেক্ট নেবে ? সায়েন্স ?—কি দরকার, যদি অ্যাসিডে হাত পোড়ায় ? ইতিহাস, বরঞ্চ পড়ুক হয়···

কার্ড হবে, কাগজের পাতায় পাতায় খবরটা বিশ্বময় রাষ্ট্র হবে, ছবি বেরুবে। বন্ধু-বান্ধবেরা খেতে চাইবে—কাকে কাকে খাওয়াবে ? রজনীবাবু, শ্যামলবাবু, অনন্তবাবু···

তারপর আই. এ। গরমের ছুটিতে শিলং পাহাড়ে বেড়াতে যাবে। তার চেয়ে সিমলার জলবায়ু ভাল। **Prospect Hill**এ পিকনিক, কয়েকটা ভাল ভাল বই সঙ্গে নিয়ে যাবে। শেলী, ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ, কীটস্।

পাইন বনের আড়ালে, ঝর্ণার ধারে ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনন্যা পড়বে টু দি স্কাইলার্ক। অলক আকাশের বুকের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া চিলের দিকে চেয়ে ভাববে—মেয়ের বিয়ের কথা। কি রকম জামাই চাই ? ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, সিভিলিয়ান ? আড়-চোখে চেয়ে দেখবে অনন্যা তখনও পড়ছে। ঠিক ও' অনন্যাই ত ? না ভুল দেখছে—ওই ত' বন্যা !

মনে পড়বে বন্যার কথা। মনে পড়বে বন্যাকে নিয়ে একদিন পিকনিকে গিয়েছিল, বন্যাও ঠিক এমনি ভাবে টু দি স্কাইলার্ক পড়েছিল। যৌবন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, অনন্যার মধ্যে বন্যা এসেছে—

বন্যা কোথায় কে জানে ? কার স্ত্রী, স্বামী কে, কি করে স্বামী ? অনন্যার মতন মেয়ে আছে ? আচ্ছা ওর স্বামী ওকে ভালবাসে ? কি কথা বলে ? অলকের মতন বলতে পারে "বন্যা, ভাল লাগা আর ভালবাসার মধ্যে যা তফাৎ, তোমার আর আমার মধ্যে ঠিক তাই—আমি ভাল লাগা, বাদ দিলেও ক্ষতি নেই ; তুমি ভালবাসা, বাদ দিয়ে জীবন চলে না। আচ্ছা বন্যা আজও তেমনি সুন্দর হাসে ?

অলক ভুল ক'রে ডাকে 'বন্যা'—

অনন্যা ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাগ্যিস। আচ্ছা স্বপ্ন দেখছে নিশ্চয়, কি স্বপ্ন ? মুখের কোণে হাসি কেন ? কাউকেও নিশ্চয় ও ভালবাসে ? কাকে ?

পাইন বনের পাতায় হঠাৎ হাওয়ার মতন জাগে। আকাশে মেঘ করে আসে, বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে, গাছগুলো দুলতে থাকে—একি পাগলা বাতাস ! ঝড় ! বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা। ছুট্, ছুট্, ছুট্,···

অন্ধকারে পথ চিনে যাওয়া যায় না। অনন্যার ছুটতে কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়—

অনন্যা, কষ্ট হচ্ছে ?—দেখিস্ সাবধানে, হাতটা বরং ধর্।

অনন্যা হাসতে থাকে। বিষ্টিতে ভিজলে ওকে কিন্তু ভারী ভাল দেখতে লাগে, এলো চুলে ঠিক যেন বন্যা।

বিষ্টিতে ভেজা ত' ঠিক নয়। ঐ তো রাস্তার ধারে বাড়ী। অচেনা, কিছু মনে করবে—তা করুক, অনন্যার ঠাণ্ডা ত' লাগবে না ! দরজার কড়া নাড়বে। বাঃ ভারী সুন্দর মেয়েটি ত' যে

দরজা খুলে দিল—ঠিক বন্যার মতন দেখতে। কি নাম? অনন্যা?

অনন্যা আর অলকা—ঠিক যেন দুই বোন। ভারী ভাব হয়েছে দুজনে।

"আপনি বসুন. তোমার নাম কি ভাই—অনন্যা, বেশ নাম, আমার নাম অলকা— ওমা তাই নাকি? অলকবাবু—কি সুন্দর দিন—আমি আপনার মেয়ের মতন—বাবা? বাবা কোর্টে গেছেন—মার···"মাই!" মা ডাকছেন, মার ভয়ানক অসুখ, অনেকদিন থেকে!

অলক বাইরের ঘরে বসে থাকবে। স্বামি-স্ত্রীর ফটো: ঠিক বন্যার মতন দেখতে। হবেও বা।

বিষ্টি থেমেছে। বাড়ী ফিরতে হবে। বা: অনন্যাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে, ফিকে নীল শাড়িটা···বন্যাকে জন্মদিনে অলক এই রকম একটা শাড়ী দিয়েছিল। মার শাড়ী?—তাই নাকি?

—আর অনন্যা থাকবে আমাদের বাড়ী—মা কিছুতেই ছাড়বেন না। কাল যাবে!

—মা বলেছেন?—আচ্ছা···

• • • •

কল্পনার জাল ছিন্ন করে অকস্মাৎ আঘাত পড়ে। মার ছোট চিঠি এসেছে। ঝুলন পূর্ণিমার দিন রাত্রে একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে······

অলক কি করবে? কি করবে?

ফুৎকারে কে যেন ওর আনন্দ দীপ নিভিয়ে দিল।···পরদিন ভোরে মেয়েটি মারা গেছে।···অনিতাও।···

গৃহপ্রবেশ

নাটিকা

শ্রীকানাই বসু

তৃতীয় দৃশ্য—অপরাহ্ণ

পর্দা উঠিল। সেই কক্ষ। প্রণয়বাবু, পৃথ্বীশ, সুকুমারী, মহালক্ষ্মী ও রূপা। সকলেই গম্ভীর, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

মহালক্ষ্মী। আমি এসে অবধি সাই সাই করে বৌকে বলছি, 'খুব সাবধান, খুব সাবধান,' কাজকর্ম্মের বাড়ীতে কত জোচ্চোর এসে ঢুকে পড়ে, দেখিস্। তা বৌয়ের আমাদের কিছু খেয়াল থাকে না।

সুকুমারী। (অপরাধীর ন্যায়) তা চোর যদি ঢুকেই পড়ে, তো আমি কী করব বল। বাড়ীতে লোকজন রয়েছে, বাবুরা রয়েছেন, আমি মেয়েমানুষ—

মহালক্ষ্মী। তাই বলে তুমি চাবিটা হারিয়ে বসবে?

পৃথ্বীশ। যাক্, এখন কী করা যায় বল।

মহালক্ষ্মী। কী আবার করা যায়। পাবার কথা ছেড়ে দে। অত ভালোমানুষির কাল নয়। আমি শুনেই তোর জামাইবাবুকে কোর্টে টেলিফোন করে দিইচি। বাপো টেলিফোনটা আর অনেকক্ষণ দিয়ে গেছে।

প্রণয়। এরি মধ্যেই নিখিলকে টেলিফোন করে দিলি?

মহালক্ষ্মী। এর মধ্যেই আবার কী? পালিয়ে গেলে তারপর করে লাভ?

প্রণয়। না, তাই বলছি। তাকে আবার মিথ্যে ব্যস্ত করা।

মহালক্ষ্মী। মিথ্যে সত্যি বুঝি না বাপু, তবে ব্যস্ত হওয়া দরকার। এখুনি লোকজন নিয়ে এসে ধরে নিয়ে যাক।

প্রণয়। তা ধরে নিয়ে যাবার দরকার কী? ওঁকে বললেই তো হয় চলে যেত। তাহলে পিন্টু, ওঁকে এই সঙ্গে বসিয়ে দাও, ওঁর খাওয়া হয়নি এখনো।

মহালক্ষ্মী। হ্যাঁ, আর চাবিটা দক্ষিণে নিয়ে যাক। এর পর একদিন তোমরা যখন বাড়ী থাকবে না, তখন এসে সব আলমারী দেরাজ খুলে যথাসর্ব্বস্ব বার করে নিয়ে যাবে। আর সে কি কিছু বাকী আছে এখন। বৌ আবার ওঁকে ওপোরে নিয়ে গিয়ে ভাঁড়ারে পিঁড়িটে ফেলেছেন! আদিখ্যেতা!

সুকুমারী। ও মাই, তখন তো তোমরাও কিছু বল নি।

মহালক্ষ্মী। তোমার হলেন কাকা, আমি আবার কী বলব? এমনতর কাকা, ও কি জানি?

সুকুমারী। তাহলে, আবার চাবিটা কী করে উদ্ধার হবে বল ঠাকুরপো।

প্রণয়। চাবি যদি উনি নিয়েই থাকেন তো চাইলেই তো হয়।

মহালক্ষ্মী। হাঁ, দেবার জন্যে বসে আছে তার। সে কি ফিরিয়ে দেবার জন্যেই নিয়েছে কিনা।

পৃথ্বীশ। ওকে সার্চ করা হোক। পকেট, ট্যাঁক সব দেখো। রূপা—

রূপা বীরদর্পে আগাইয়া আসিল

মহালক্ষ্মী। কিন্তু খুব সাবধান পিন্টু, ওদের কাছে ছুরি ছোরা সব লুকোনো থাকে। দেখিস্।

রূপা পিছাইয়া গেল

সুকুমারী। না না। কী যে বল ঠাকুরঝি। বুড়ো মানুষ—

মহালক্ষ্মী। তুই থাম বৌ। বুড়ো আবার কিসের? ওরকম সেজে না এলে কখনো ঢুকতে পায়? সেই যে কাশীর পাণ্ডা সেজে এসেছিল মনুদ—

প্রণয়। না না, আমি দেখেছি, পাকা গোঁফ।

মহালক্ষ্মী। তুমি বোকো না দাদা। পাকা গোঁফ অমন সবার থাকে। তুমি টেনে দেখেছ, ওটার নিজের গোঁফ কি না?

প্রণয়। (ঘাড় নাড়িয়া) না।

মহালক্ষ্মী। তবে?

সুকুমারী। তাহলে চাবি কি পাওয়া যাবে না, হ্যাঁ গা?

রূপা। হ্যাঁ পিসীমা, নলচালা আনলে হয় না?

মহালক্ষ্মী। নলচালা কী করবে?

রূপা। সে নলচেলে ঠিক বলে দেবে চাবি কার কাছে আছে, কি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।

পৃথ্বীশ। হুঁঃ, যত সব বোগাস।

রূপা। না ছোটবাবু, আপনি অবিশ্বাস করছেন, কিন্তু এ আমাদের

[illegible] দেখা। আমার পিসেম'শায়ের সম্বন্ধীকে একবার কুকুরে কামড়েছিল—

পৃথ্বীশ। পিসেম'শায়ের সম্বন্ধী?

বগা। হ্যাঁ, বাবু, তাঁর সাধের [illegible] সম্বন্ধী, ঐ একটিমাত্র সম্বন্ধী তখন—

পৃথ্বীশ। তোর পিসেম'শায়ের সম্বন্ধী যে তোর বাপ রে মুখ্যু।

বগা। আজ্ঞে না, তেনার দুই পক্ষ ছেলেন কিনা। পিসেম'শায়ের এ পক্ষের যে পিসীমা, তাঁরই মার পেটের ভাই। সেই ভাইকে একদিন কুকুরে কামড়ালো। দিন দুপুরে সকলের চোখের সামনে কোত্থেকে এসে কথা নেই বার্তা নেই খ্যাঁক করে কামড়ালো আর ছুটে পালিয়ে গেল। সে এক মহা কাণ্ড। শেষে নলচালা এলো।

প্রমথ। কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ কি নলচালাতে দেয়, হাঁ বগু?

বগা। মানে, ডাক্তারে বলে সেই কুকুরটাকে পরীক্ষে করতে হবে। তাও কথা বাবু। রুগী পড়ে রইল, তাকে পরীক্ষে করা চুলোয় গেল, কুকুরকে পরীক্ষে! কি জানি বাবু। তা সে হতভাগা কুকুরকে কোথাও পাওয়া যায় না। শেষে ডাকা হল নলচালাকে।

মহালক্ষ্মী। তারপর?

বগা। তারপর সেই না নল মন্তর পড়ে ছেড়ে দেওয়া আর অমনি নল চলে সন্ সন্ সন্ সন্ করে এগিয়ে। ইদিক উদিক ইদিক উদিক করে শেষে নল গিয়ে আটকালো এক বুড়ীর বাড়ীর উঠোনে গোবর গাদার মধ্যে।

সুকুমারী। কী সব বাজে গল্প আরম্ভ করলি বগা!

মহালক্ষ্মী। আহা, ওকে বলতেই দাও না! তারপর?

বগা। (উৎসাহিত হইয়া) বলে না মা, শুনুন। তখন নলচালা বলে বুড়ীর বাড়ীতে এসে যখন থেমেছে, তখন এইখানেই সেই কুকুরের আড্ডা। বুড়ী বলে কুকুর-টুকুর তার সাত জন্মেও নেই, সে একলাটি থাকে। নলচালা বলে তাহলে ঐ বুড়ীই নিশ্চই কামড়েছে। বলে, আমার নল কখনো মিথ্যে বলে না।

মহালক্ষ্মী। ওমা! তারপর?

বগা। ছাড়লে না, পুলিশ ডেকে নিয়ে এলো। নলচালার কাছে চালাকি নয় বাবা।

প্রমথ। সে কি রে? পুলিশ আনলে?

সুকুমারী। আহা, বুড়ো মানুষকে কিনা দোষে পুলিশে ধরলে না!

বগা। না মা, পুলিশ আর ধরলে না। দারোগাবাবুর খুব বুদ্ধি, তা নইলে আর ভগবান তাঁকে দারোগা করেছেন। তিনি দেখলেন বুড়ীর মুখে একটাও দাঁত নেই, একদম ফোকলা। তাই ছেড়ে দিলেন।

প্রমথ উচ্চ হাস্য করিলেন

বগা। (অপ্রতিভ হইয়া) একটা দাঁতও থাকলে দেখতেন, পিসেমশাই খুব কড়া লোক ছিলেন, হ্যাঁ।

পৃথ্বীশ। ননসেন্স, গাঁজাখুরি!

মহালক্ষ্মী। গাঁজাখুরি নয় পিন্টু। কত রকম কী আছে কিছু বলতে পারা যায়। ওসব একরকম বিদ্যে আছে। দিনের বেলায় দেখ দিব্যি ভালো মানুষটি বসে আছে, আর রাত্তিরে এক মূর্তি ধরে চরে খেয়ে এল। ওদের কাছে কুকুর মূর্তি করতেই বা কতক্ষণ, আর বুড়ী মূর্তি ধরতেই বা কতক্ষণ!

সুকুমারী। দেখ, আমার কিন্তু ওঁকে মোটেই চোর ডাকাত বলে মনে হচ্ছে না বাপু। ভুল করে হয়তো এসে থাকবেন।

পৃথ্বীশ। হ্যাঁ, ভুল করে এসে তিন ঘণ্টা লোকের বাড়ীর মধ্যে বসে আছেন, ভুল করে ওপরে গিয়ে উঠেছেন, ভুল করে চাবিটা আলগা সরিয়েছেন। ভুল, বার বার বলছি ভুল! ও নলচালা পুলিশ কিছু করতে হবে না, বলে দাদার কোটে ভূত পালায় তা চোর!

প্রমথবাবুর ভগ্নীপতি নিখিলের প্রবেশ অঙ্গে বিলাতি বেশ, পদমর্যাদার

নিখিল। বজ্র পড়েছে?

পৃথ্বীশ। আজ্ঞে। (মাথা নাড়িয়া) বজ্র আর পড়বে কী…

নিখিল। পালিয়েছে? হা-া-া! কখন ছিল? কি কি নিয়েছে, তা বুঝতে পারা গেছে? বৌদির গয়না গাঁটি কিছু গেছে না কি?

মহালক্ষ্মী। কী যে বল তুমি। গয়না কোথায়—

নিখিল। আহা হা হা। কত টাকার হবে? হাজার দশেক, হ্যাঁ?—

মহালক্ষ্মী। না গো…

নিখিল। যাক, যাই হোক বৌদিরই বা এই ডামাডোলের দিনে গয়না সব আনবার দরকার কী ছিল? এই বাজারে—সোনার দাম ৭৩৫০—

পৃথ্বীশ। না না, আপনি ভুল করছেন জামাইবাবু—

নিখিল। আরে ঐ হল। ৭৩ না হয় ৭২, it matters little—সে কি আর উদ্ধার হবে? গয়না উদ্ধার—সে একদম অসম্ভব।

মহালক্ষ্মী। কী যাচ্ছে তাই বকছ তুমি? কে বলে তোমাকে গয়না চুরি গেছে?

নিখিল। তবে? নগদ? সবই নগদে নিয়েছে? God Gracious! তবে তো hopeless! তবু গয়না টয়না হলেও বা একটা কথা ছিল, বিক্রি করতে, গলাতে—

প্রমথ। নিখিল, তুমি ভাই ব্যস্ত হয়ো না। টাকাকড়ি গয়না গাঁটি কিছু চুরি বা ডাকাতি হয় নি। তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বোসো।

নিখিল। কিছু চুরি হয় নি? তার মানে? what's the idea? Making fun of me? Pulling my legs? (মহালক্ষ্মীর প্রতি) আজ তো ১লা এপ্রিল নয়, তবে টেলিফোন করে এ-চালাকির মানে?

মহালক্ষ্মী। মানে আবার কী? আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই তোমার সঙ্গে গেলুম ঠাট্টা করতে।

নিখিল। তুমি তো ফোনে বললে—

মহালক্ষ্মী। বলেইছি তো।

নিখিল। চোর না ডাকাত কী এসেছে—

মহালক্ষ্মী। এসেছেই তো।

নিখিল। অথচ দাদা বলছেন কিছু চুরি যায় নি—

মহালক্ষ্মী। যায় নিই তো। হ্যাঁ—যায় নি তো কি?

নিখিল। Hopeless! আরে কী নিয়েছে সেটা বল। (টেবিল চাপড়াইল)

মহালক্ষ্মী। (উচ্চ কণ্ঠে) বৌয়ের চাবি।

নিখিল। (বসিয়া পড়িল) God Almighty! চাবি! দূঃ।

পৃথ্বীশ। আপনি কি বলতে চান চাবি জিনিষটা তুচ্ছ? চাবিই যদি চুরি গেল তো বাকি রইলো কী?

বগা। আজ্ঞে, কথায় বলে সকল তোমার চাবি কাঠিটি আমার।

নিখিল। হুঁ, Something is better than nothing. চাবিই বা চুরি যাবে কেন? সত্যি। কার চাবি? বৌদির? (সুকুমারীর প্রতি চাহিল)

সুকুমারী। হ্যাঁ ভাই, আমারি চাবি।

নিখিল। চুরি গেছে?

সুকুমারী। হ্যাঁ। না, ঠিক চুরি গেছে বলতে পারি না—

নিখিল। তবে?

সুকুমারী। হারিয়ে গেছে। মানে আমিই কোথায় রেখেছি, কী কোথায় পড়ে গেছে।

মহালক্ষ্মী। কোথায় আবার পড়ে যাবে? নিশ্চয় চুরি করেছে ঐ বুড়োটা।

নিখিল। এর মধ্যে আবার বুড়োও আছে একটা। আর তুমি এ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানো বলে বোধ হচ্ছে। আচ্ছা, তোমার statement পরে নেওয়া হবে। Let me proceed with I mean আগে বৌদির কথাটা শোনা যাক। হাঁ বৌদি, আপনি বলছেন চুরি যায় নি?

সুকুমারী। (মাথা নাড়িয়া) না।

নিখিল। হারিয়ে গেছে?

সুকুমারী। হাঁ।

নিখিল। না কি পাওয়া যাচ্ছে না?

সুকুমারী। হাঁ (মাথা নাড়িল)।

প্রমথ। হাঁ নিখিল, হারিয়ে গেছে, আর পাওয়া যাচ্ছে না, দুটোতে তফাৎ কী ভাই?

নিখিল। আছে দাদা তফাৎ আছে। There's a world of difference between the two. সে আপনাকে পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। (সুকুমারীকে) আপনি চাবিটা last কোথায় দেখেছিলেন?

সুকুমারী। আমার আঁচলে। উঁহু, দেরাজে লাগালো। না, না, তোরঙ্গার পাড়ে—

নিখিল। বুঝেছি। আচ্ছা সে যাক। এ বাড়ীতে, না পুরোনো বাড়ীতে সেটা মনে আছে?

সুকুমারী। এ বাড়ীতে বই কী। চাবি আমি এনেছি।

প্রমথ। হাঁ, আমারও যেন মনে হচ্ছে—

নিখিল। Excuse me দাদা, আপনি (চুপ করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিল।)

প্রমথ। ও হাঁ হাঁ।

নিখিল। হাঁ তারপর বৌদি, আপনি বলছিলেন চাবি আপনি এ বাড়ীতে এনেছেন?

সুকুমারী। হাঁ ভাই, নিশ্চয় এনেছি।

নিখিল। ঠিক মনে আছে কি? ভুলও তো হতে পারে।

সুকুমারী। না না, সে কি কথা, আমার বেশ মনে পড়ছে।

নিখিল। হুঁ। আপনি আজ ভোরে এ বাড়ীতে এসেছেন, কেমন?

পৃথ্বীশ। হাঁ, আমাদের তো কাল আসতে দিল না কিনা। কাল শিশিরা-টিনিরা সব—

নিখিল। Will you stop talking please? আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করছি, তোমাকে নয়। Dont try to help the witness. (সুকুমারীকে) আপনি বলুন তো, আপনি আজ ভোরেই এসেছেন, না?

সুকুমারী। হাঁ।

নিখিল। বেশ। আসবার সময় ছেলেপুলে নিয়ে বেশ একটু গোলমাল হয়েছিল, নয় কী?

সুকুমারী। ও বাবা, তা আর হয়নি? রাত্তির চারটের সময় উঠেছি ভাই, তবু রান্না করবার সময় হয়ে যায় আর কি। উনি তো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, সে যা কাণ্ড।

নিখিল। (সহাস্যে) হুঁ, দাদা আপনিও খুবই হয়েছিলেন। তাড়াতাড়িতে—

সুকুমারী। তাড়াতাড়ির কথা আর বোলো না ভাই, এই লোকটিকে তো চেন ভাই, যা তাড়া লাগালেন—

নিখিল। আমিও তো তাই বলছি। আচ্ছা, বেশ করে ভেবে বলুন তো এ বাড়ীতে এসে আপনি কোনো আলমারি কি দেরাজ খুলেছেন সেই রিং-এর চাবি দিয়ে?

সুকুমারী। হাঁ, ওঁর আলমারিটা একবার খুলেছিলুম, তা সে বোধ হয় ওঁরই কাছ থেকে চাবি নিয়ে, না গো?

প্রমথবাবু উত্তর দিতে মুখ তুলিবাই নিখিলের নিষেধ
স্মরণ করিয়া মুখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িলেন

নিখিল। বেশী কথা বলবার দরকার নেই বৌদি, please শুধু হাঁ কি না বলবেন বুঝলেন? আপনার রিং-এর চাবি ব্যবহার করেছিলেন, কি না?

সুকুমারী। কই মনে পড়ছে না ঠিক।

নিখিল। I thought as well. বেশ। আপনারা, তোমরা, কেউ কি আজ, এ বাড়ীতে, বৌদির চাবির রিং দেখেছ?

নিখিল একে একে সকলের মুখের প্রতি চাহিল, সকলেই ঘাড়
নাড়িয়া বা মুখস্বরে জানাইল, না, দেখে নাই। নিখিল
হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল ও বলিল—"হুঁম্"

প্রমথ। নিখিল, এবারে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

নিখিল। (অতি উদারতার সহিত) By all means, বলুন।

প্রমথ। তুমি কী বুঝতে চেষ্টা করছ?

নিখিল। মানে, What am I driving at? এখুনি দেখতে পাবেন। I'am coming to that. তাহলে কেউই সেই missing ring দেখনি? আজ? এ বাড়ীতে? (সকলে পুনরায় ঘাড় নাড়িল) Just so. Very well! Now, বৌদি, I put it to you, I mean আমি আপনাকে বলছি আপনার চাবির রিং একেবারেই হারান নি।

সুকুমারী। হারাই নি?

নিখিল। না বৌদি, হারান নি। কারণ সে রিং আজ আপনার এ বাড়ীতে মোটে আনাই হয়নি।

সুকুমারী। আনাই হয়নি? সে কি, আমি যে—

নিখিল। তাড়াতাড়ি করবেন না, বেশ করে ভেবে তবে কথা বলবেন।

সুকুমারী। আনি নি?

নিখিল। না, আনেন নি।

সুকুমারী। আনি নি?

নিখিল। না-া-া, আনেন নি।

সুকুমারী। তা-া-া হবে, কিন্তু—

নিখিল। আর কোনো কিন্তু নেই বৌদি, আপনি বলতে তো পারলেন না—

মহালক্ষ্মী। (ঝাঁকিয়া) আবার কী করে বলবে? সকাল থেকে বলছে চাবি পাচ্ছি না, চাবি পাচ্ছি না। বাড়ী শুদ্ধ লোক জানে—

নিখিল। বাড়ী শুদ্ধ লোকের কথা বাড়ী শুদ্ধ লোক বলবে। তুমি কী জানো তাই বলো। এদিকে এসে দাঁড়াও। বৌদি নেমে যান।

মহালক্ষ্মী। আমার বয়ে গেছে দাঁড়াতে।

নিখিল। আচ্ছা, ঐখান থেকেই বলো। বলো কী জানো?

মহালক্ষ্মী। আমি জানি বৌদির চাবি হারিয়েছে। হারিয়েছে কেন, চুরি গেছে।

নিখিল। তুমি দেখেছ হারিয়ে যেতে?

মহালক্ষ্মী। হারিয়ে যেতে আবার কেউ দেখে নাকি?

নিখিল। (অপ্রতিভ) থাক, থাক, আচ্ছা, বৌদি চাবি এনেছিল তা তুমি দেখেছ?

মহালক্ষ্মী। (জোরের সহিত) হাঁ দেখেছি।

নিখিল। কখন দেখলে?

মহালক্ষ্মী। আমি এসে বসেছি আজ—বৌ তো রাগ করতে লাগল, অত বেলায় এলেছি বলে। রাগ করবার কথাই তো, তা তোমার আমার তো সকাল গাড়ী পাবার জো নেই—

নিখিল। সময় নষ্ট কোরো না, সময় নষ্ট কোরো না। চাবির কথা হচ্ছে।

মহালক্ষ্মী। সেই কথাই তো বলছি গো। এসে বসিচি, ক্ষমা এসে জিজ্ঞেস করলে এঁচোড় কতগুলো রাঁধবে। তা বৌ নেই যত এঁচোড় কী হবে এ-বেলা, আমি বলুম—

নিখিল। তোমার যদি চাবির কথা কিছু বলবার না থাকে, তাহলে তুমি এখন যেতে পার। এঁচোড় দিয়ে যখন ডালনা রাঁধবে তখন তোমাকে ডেকে পাঠানো যাবে।

মহালক্ষ্মী। (চটিয়া) কে এঁচোড়ের কথা বলছে?

নিখিল। কেউ বলেনি, আমি বলছি।

প্রসন্ন। (এতক্ষণ স্মিতমুখে ইঁহাদের কলহ উপভোগ করিতেছিলেন) আঃ নিখিল, কেন ওকে জ্বালাচ্ছ ভাই? আর লক্ষ্মী, তুই-ই বা খিটিমিটি ক্ষেপছিস কেন বলতো।

মহালক্ষ্মী। আমার বয়ে গ্যাছে ক্ষেপতে। হাকিমি ফলাতে এসেছেন আমার কাছে। অমন ঢের হাকিম আমি ঠিক করে দিইচি।

নিখিল। (হাসিয়া) শুনুন বৌদি শুনুন। আমি তো জানতুম এই একটি হাকিম দিয়েই ওঁর কারবার। আরও যে অনেক আছে তা তো জানতুম না। (মহালক্ষ্মীকে) তা থাকে থাকুক। এখন চাবি যে বৌদি এনেছেন তুমি বলছ, কী করে? সেইটে বল।

মহালক্ষ্মী। আমার সামনে বৌ ক্ষমাকে বলে, এই নে চাবি নিয়ে যা। বলে আঁচল থেকে খুলে দিতে গিয়ে দেখে চাবি নেই!

নিখিল। তাহলে তুমি চাবি দেখলে কোথায়?

মহালক্ষ্মী। আমি আর দেখব কী করে। আমাকে দেখতে দিলে কই। তার আগেই তো উনি হারিয়ে বসে আছেন! এতো করে বললুম সাবধান-সাবধান।

নিখিল। যাক, তুমি যা দেখেছ বোঝা গেছে।

পৃথ্বীশ। তাহলে আপনি কি বলতে চান জামাইবাবু যে চাবি বৌদি—

নিখিল। হাঁ, আমি বলতে চাই চাবি বৌদি আজ আনতেই ভুলে গেছেন। শুনলে তো কী বাস্তবতার মধ্যে আমরা রয়েছি। চাবি আনবেন বলে এতো ঠিক ছিল যে ওঁর ধারণাই হয়ে আছে যে উনি এনেছেন until she missed it. এ রকম ভুল মানুষের হয়েই থাকে। আনতে ভুলেছেন এ একরকম ভুল, কিন্তু তার চেয়ে বড় ভুল 'এনেছি' এই illusionটা। যাক সে অনেক কথা। সাইকোলজিতে একে বলে—

মহালক্ষ্মী। চুলোয় যাক তোমার সাইকোলজি। এত বড় এক থোলো চাবি, তার সঙ্গে বেড়হাত লম্বা এক চেন, সব উনি সাইকোলজি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চান।

প্রসন্ন। রোসো, রোসো। লম্বা চেন। রূপোর, না? আমি যেন কোথায় দেখলুম। হাঁ, দেখেছি।

মহালক্ষ্মী। (নিখিলকে) এইবার। কী হয়?

নিখিল। আজ দেখেছেন?

প্রসন্ন। হাঁ, আজই দেখেছি—

নিখিল। ঠিক মনে আছে দাদা, আজই দেখেছেন?

প্রসন্ন। হাঁ তাই, আজ দেখেছি বলেই তো মনে হচ্ছে।

নিখিল। There you are! মনে হচ্ছে! আপনি বৌদির ঐ লম্বা চেনওয়ালা চাবির রিং এত অসংখ্যবার দেখেছেন যে আপনার মনে হচ্ছে—mark my words মনে হচ্ছে—আজও দেখেছেন। এও আর এক রকমের ভুল। আপনাদের চক্ষেরই memoryর plateএ ঐ লম্বা চেন আর এক থোলো চাবি এমনি স্পষ্টভাবে ফোটোগ্রাফ্‌ড হয়ে আছে যে রাতদিন মনে করলেই মনে হবে এই যেন কোথায় দেখলেন।

প্রসন্ন। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) তা হবে। বোধ হয় আজ দেখিনি কালই দেখে থাকব।

নিখিল। (বিজয় গর্বে মহালক্ষ্মীকে) শুনলে?

মহালক্ষ্মী উত্তর দিলেন না, মুখ ঘুরাইয়া লইলেন

সুকুমারী। আচ্ছা আমি একটা কথা বলি ভাই ঠাকুরজামাই। তুমি তো বলছ আমি চাবি আনিইনি এ বাড়ীতে, কেমন?

নিখিল। হাঁ, আমি তাই বলছি।

সুকুমারী। আচ্ছা, তাই যদি না আনব, তাহলে এ বাড়ীতে চাবি হারালুম কী করে? তা বল?

নিখিল। এ বাড়ীতে চাবি হারান নি।

সুকুমারী। (এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া, তারপর যেন এক অকাট্য যুক্তি মনে পড়িল) এ বাড়ীতে হারাই নি? বাঃ, তা না হারালে চাবি আমার গেল কোথায়, বল? চাবি যে আমি আনলুম, সেটা পাচ্ছি না কেন? এবার বলো।

নিখিল। (প্রথমটা এই অতি সরল যুক্তিহীন যুক্তির কী উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। তারপর বলিল) যাবে আবার কোথায়? চাবি দেখুন গে আপনাদের পুরোনো বাড়ীতে পড়ে আছে। এ বাড়ীতে চাবি আসে নি, that's proved & finally proved. And necessarily এ বাড়ীতে আপনার চাবি হারায় নি বা চুরিও যায় নি। Don't you worry.

মহালক্ষ্মী। (জোরের সহিত) আমি বলছি এই বাড়ীতেই হারিয়েছে।

নিখিল। আমি বলছি হারায় নি। যদি এ বাড়ীর ভেতর থেকে চাবি কেউ বার করতে পারে তবে বলব হাঁ।

মহালক্ষ্মী। ও ওঃ। যদি বেরোয় তখন উনি বলবেন হাঁ-া। তখন তুমি হাঁ বললে কি না বললে তাতে ভারি বয়ে গেল। চাবি ঐ বুড়োই চুরি করেছে।

নিখিল। (উত্তেজিত হইল) কক্‌খনো বুড়ো চুরি করে নি।

মহালক্ষ্মী। হাঁ করেছে।

নিখিল। না করে নি। (টেবিল চাপড়াইল)।

মহালক্ষ্মী। হাঁ—

নিখিল। না-া করে—আচ্ছা, বুড়ো বুড়ো যে করছ বুড়োটা কে বলো তো?

মহালক্ষ্মী। তাই জানেন না আবার তার হয়ে লড়তে এসেছেন। কে তা আমি কী করে জানব।

নিখিল। তার মানে?

পৃথ্বীশ। তার মানে আমি বলছি। একটা লোক, আমাদের সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা, দুপুর থেকে এসে বাড়ীর মধ্যে বসে আছে—

নিখিল। লুকিয়ে?

পৃথ্বীশ। লুকিয়ে কেন? ঐ তো ওপোরে মিষ্টির ভাঁড়ার আগলাচ্ছে।

নিখিল। রোসো, রোসো। অচেনা অজানা লোক ভাঁড়ার আগলাচ্ছে। সেটা কি রকম হল?

মহালক্ষ্মী। তবে আর বলছি কি! তুমি তো তার হয়ে খুব ওকালতি করছিলে।

নিখিল। দেখ সে আমি করবই। আমাদের আইনে বলে "বরং একশোটা নির্দোষ লোককে ছেড়ে দেবে তবু একটা দোষী লোককে শাস্তি দেবে না"

(উত্তেজিত নিখিলের এই ভুল লক্ষ্য করিয়া প্রসন্নর ভ্রূযুগ বারেক কপালে উঠিল, ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া উঠিল)

আর তা ছাড়া বাড়ীর মধ্যে ঢোকা যত অন্যায়ই হোক, ঢুকেছে বলেই যে সে চোর হয়ে যাবে তার কোনো মানে নেই। বাড়ীতে ঢোকার জন্যে যে চার্জ সেটা Trespass, Section 437 and 438 I. P. C. আর

চুরির জন্যে হল Theft 379, 380 and 381 Section...I. P. C.। তার জন্যেও তোমাদের চাবি তো চুরিই যায় নি।

মহালক্ষ্মী। যায় নি তো কি আমি লুকিয়ে রেখেছি, না দাদা নিয়ে বসে আছেন, দিচ্ছেন না?

নিখিল। সে তুমিই জানো আর তোমার দাদাই জানেন। কিন্তু সে কথা থাক। তোমাদের অতোবড় ভাঁড়ারী বুড়োটির কথা তো ঠিক বুঝলুম না, দাদা?

পৃথ্বীশ। লোকটা যে আস্ত জোচ্চোর, আর খুবই ধড়ীবাজ তাতে আর সন্দেহ নেই। চালাকিটা দেখুন, দাদাকে বলেছে সে আবার পুরোনো মাষ্টার মশাই—

প্রসন্ন। না, না, তিনি বলেন নি, আমিই—

পৃথ্বীশ। যাই হোক, বৌদিকে বলেছে তার নাম পরেশ চাটুয্যে—

সুকুমারী। সে আমিই মনে করেছিলুম বুঝি—তিনি তাঁর নাম টাম কিছু বলেন নি।

পৃথ্বীশ। তাই বা নাম বলেন নি কেন?

মহালক্ষ্মী। তার পর বৌয়ের কাকা সেজে এসে দিব্যি ওপরে উঠেছেন।

সুকুমারী। সেটা আমারই দোষ ভাই। আমিই—

মহালক্ষ্মী। তুই আর কথা কোস্ নি বৌ। এত করে বলুম—একটু সাবধান নেই!

নিখিল। ব্যাপারটা ঘোরালো বটে। পরন্তু আমাদের পাড়ায় এক জোটা কাটির পাণ্ডা যোগ এসে একেবারে—

মহালক্ষ্মী। সে আমি সব বলিচি, সব বলিচি, এসেই বৌকে বলিচি। হয়েছেও এই কাণ্ড!

নিখিল। হুঁ, তুমি যখন এসেছ তখন রোমহর্ষণ কাহিনী না, তা বলতে কিছু বাকি রাখোনি নিশ্চয়। (কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া।) কিন্তু এখানে আমরা তার বিচার করলে তো চলবে না। He must put in appearance and stand the trial। তবে তার যদি কিছু defence দেবার থাকে। হাঁ, ডাকো তাকে। রূপা—

রূপা। আজ্ঞে? ডেকে আনব?

নিখিল। নিশ্চয়। আমার সামনে এসে পাঁচ মিনিট cross করলেই তার ধড়ীবাজী বার করে দেব। যা, ডেকে আন।

রূপা। হাঁ পিসিমা, যাব? তেনার কাছে যদি—

পৃথ্বীশ। কিছু করতে হবে না। কিছু করতে হবে না। বলে নাকের ডগাতে ভূত পালায় তা চোর। আমি হাতটার দিয়ে ঘাড় ধরে টেনে আনছি, দেখ না।

(প্রস্থানোদ্যত)

নিখিল। উঁহু—হুঁ,—হুঁ, ওরকম গোঁয়ার্তুমি কোরো না আমার। তাহলে আর cross করে বাগাতে পারা যাবে না। আচ্ছা চলো, আমি যাচ্ছি, আগে লোকটাকে unawares দেখে নি। চলো।

নিখিল, পৃথ্বীশ ও সর্বশেষে রূপার প্রস্থান

প্রসন্ন। দেখ, পিন্টুটা আবার কী কাণ্ড করে বুঝি।

সুকুমারী। শুভক্ষণে কী যেন বাদ সেধেনি।

প্রসন্ন। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না তোমরা এইটুকু ব্যাপার নিয়ে এত হৈ চৈ কাণ্ড করছ কেন?

ভিতরে একটা গোলমাল শোনা গেল

প্রসন্ন। আবার কী হল। পিসিমার গলা পাচ্ছি যেন।

রূপার প্রবেশ

কী হয়েছে রে? পিসিমা চেঁচাচ্ছেন না?

রূপা। আজ্ঞে হাঁ, ঠাকুমা মিত্তিরের বকাবকি করছেন। আর গাড়ী ডাকতে বললেন, তিনি চলে যাবেন।

প্রসন্ন। কোথায় চলে যাবেন?

রূপা। বললেন তিনি পুরোনো বাড়ীতেই থাকবেন। নয় তো কাশী চলে যাবেন। এখানে আর একদণ্ডও থাকবেন না।

প্রসন্ন। কেন, তাঁর আবার কী হল?

রূপা। ঠাকুমা বললেন বাড়ীতে ডাকাত এসেছে, তাঁর যথাসর্বস্ব চুরি গেছে।

প্রসন্ন। তাই তো তাঁর আবার কী যথাসর্বস্ব গেল। নাঃ, আমি আর পারি না। এদিকে দেখব না ওদিকে—লক্ষ্মী, দেখতো দিদি।

মহালক্ষ্মী ও রূপার প্রস্থান

যত সব হয়েছে হুঁঃ, কোথায় কী তার ঠিক নেই, মিথ্যে হাঙ্গামা সব।

সুকুমারী। আমারও তাই মনে হচ্ছে। দেখ, তোমার কাছে বলি, ঠাকুরজামাইকে যেন বোলো না, সত্যি বলছি চাবি আমি এ বাড়ীতে এনেছি, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। তোমার কাছে তো মিথ্যে বলি না—

প্রসন্ন। আহা হা, গা ছুঁতে হবে কেন, তোমাকে কী আর আমি চিনি না। মিথ্যে—কী আশ্চর্য, মিথ্যে তো তুমি কারও কাছেই বলতে পারো না। মানে, ওটা তোমার ধাতের জিনিষই নয় বড় বৌ, হাঃ হাঃ হাঃ।

সুকুমারী। ঠাকুরঝি শুনলে রাগ করবে, কিন্তু চাবি আমিই কোথাও ফেলেছি। জানো তো আমার ঐ দোষ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এখুনি হয় তো পাওয়া যাবে।

প্রসন্ন। নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আমি বলছি পাওয়া যাবে। তুমি দেখে নিও। তোমরা খালি মিছে ব্যস্ত হও বই তো না। তুমি ভেবো না বড়বৌ, কেউ না পারে, আমি তোমার চাবি বার করে দেবো, যেখান থেকে পারি।

সুকুমারী। তুমি যখন বলছ তখন পাওয়া যাবেই। কিন্তু তুমি দেখো বাপু, ঠাকুরপো যেন মারধর না করে। আহা, বুড়ো মানুষ।

প্রসন্ন। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, সব ঠিক করে দিচ্ছি। আরে, পিন্টুটা একেবারে ছেলেমানুষ, খালি ঐ বায়োস্কোপ দেখে দেখে ওদের মাথায় আর কিছু নেই। আর লক্ষ্মীটা তো পাগল। নিখিলের কোর্টের গল্প শুনে আর দিনরাত ঐ ডিটেকটিভ উপন্যাসগুলো পড়ে পড়ে, ওর ধারণা জগৎটা খালি চোর আর ডাকাতে ভর্তি, বুঝলে?

মহালক্ষ্মীর প্রবেশ

প্রসন্ন। কী রে, পিসিমার কী যথাসর্বস্ব চুরি গেছে, লক্ষ্মী?

মহালক্ষ্মী। (সহাস্যে) আফিংএর কৌটোটা। খুঁজে পাচ্ছিলেন না, খুঁজে দিইছি।

প্রসন্ন হাসিতে লাগিলেন

মহালক্ষ্মী। (গম্ভীর হইয়া) কিন্তু তোমরা আগে ঐ বুড়োকে বিদেয় কর দাদা। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আমার যেন কেমন গা ছম্‌ছম্ করছে। লোকজন এসে পড়লে ভিড়ের ভেতর ও যে কী করবে আর কী না করবে তা কে জানে। ও গেলে বাঁচি। এখুনি ওকে বিদেয় করা চাই-ই চাই।

নিখিলের প্রবেশ

নিখিল। বিদেয় আর করতে হবে না, সে আগেই ভেগেছে।

প্রসন্ন। সে কী? চলে গেছেন?

মহালক্ষ্মী। পালিয়েছে? তোমরা ধরতে পারলে না?

নিখিল। ধরব কাকে? সে কী আমাদের সামনে দিয়ে পালিয়েছে। তোমাদের যেমন! এখানে গুলতুনি করছ, আর ওদিকে খিড়কির দরজা দিয়ে সে সরে পড়েছে। লোকটার মাথা আছে।

মহালক্ষ্মী। (সক্রোধে) ধরতেই যদি পারো নি, তবে তোমরা এতক্ষণ করছিলে কী?

নিখিল। বাড়ীটা সমস্ত সার্চ করে এলুম, যদি কোথাও লুকিয়ে টুকিয়ে থাকে।

সুকুমারী। ঠাকুরপো কোথায় গেলেন?

নিখিল। আমাদের এখন বুদ্ধি জেগেছে, খিড়কির দোরে তালা লাগাচ্ছেন।

সুকুমারী। তাহলে এখন কী হবে?

নিখিল। কী কী সরিয়েছে তা তো এখন বোঝা যাচ্ছে না। দাদা, আপনার Stock-taking করুন। সেই কার্টের পাওয়াটা ফলেই বোধ হচ্ছে। Exactly the same tactics-সেই বেটাই হবে। or they may be working in a gang, for all we know.

সুকুমারী। সেই লোকটার কি গোঁফ ছিল? হাঁ ভাই ঠাকুরজামাই?

নিখিল। গোঁফ? কার?

সুকুমারী। সেই কার্টের পাওয়ার?

নিখিল। তা তো বলতে পারি না।

সুকুমারী। (আশান্বিত হয়ে) এঁর কিন্তু গোঁফ আছে। দিব্যি পাকা গোঁফ।

নিখিল। আহা হা, গোঁফের ভাবনা কি? গোঁফের জন্যে কি কার আটকায়? যাকগে, আমি আর সময় নষ্ট করব না। গাড়ীটা যখন সঙ্গে রয়েছে একবার বেরিয়ে দেখি। এর মধ্যে আর কতদূর যাবে? এখনো হয়তো পথে তাকে overtake করতে পারি। At any rate I must try. (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) Goodness! আমি এ লোকটাকে চিনব কী করে? I don't think I have seen the man. কে দেখেছ তাকে?

রমা। আমি দেখেছি পিসেমশাই। বুড়োগোছের, পাকা গোঁফ—

নিখিল। Hang your পাকা গোঁফ! সবাই দেখছি অমনি গোঁফ দেখেই মজে গেছে। তুই চলে আয় গাড়ীতে আমার সঙ্গে। Not a moment to lose. রমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান

হান্টার হাতে ভিতর হইতে পৃথ্বীশের প্রবেশ

পৃথ্বীশ। উঃ, ধরতে গেলে চোখের ওপর দিয়ে পালালো। আমার এখনি আফসোস হচ্ছে।

অমর। তোমরাই হট্টগোল করে ভদ্রলোককে তাড়ালে। তাঁর বোধ হয় খাওয়া হয়নি।

পৃথ্বীশ। একবার চেহারাখানাই দেখা হল না।

মহালক্ষ্মী। কিচ্ছু ভাবিসনি পিন্টু। পালাবে কোথায়? তোর জামাইবাবু নিজে গেছে মোটর নিয়ে, এর পর continuation "দরকার হলে ইত্যাদি।

দরকার হলে পুলিশ কমিশনারকে লাগিয়ে দেবে খুঁজতে। ধরা পড়বেই জোচ্চোর বুড়ো।

পৃথ্বীশ। হাতে পেলে একবার তার বুজ্‌রুকি ঘুচিয়ে দি।

বলিতে বলিতে দরজার দিকে অগ্রসর হইল ও হান্টার আস্ফালন করিল।

হান্টারের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এবং পৃথ্বীশের উদ্যত হান্টারের ঠিক সামনেই হাসিমুখ বঙ্কুবাবুর প্রবেশ। তাঁহার পাকানো চাদর ডাকুর গলায়, ছড়ি খোকনের হাতে। খোকনের অপর হাতে একটি রঙীন ঘুড়ি। ডাকু একহাতে বঙ্কুবাবুর হাত ধরিয়া আছে। তাহারও অন্য হাতে একটি ঘুড়ি। হান্টার নামাইয়া পৃথ্বীশ পিছাইয়া আসিল। ছেলেরা তাহাদের ঘুড়ি উঁচু করিয়া দেখাইয়া বলিল—

মা এই দেখো, কেমন ঘুড়ি। দাদু কিনে দিয়েছেন।

অমরবাবু স্বাভাবিক সৌজন্যে সাদর সম্ভাষণ করিলেন

অমর। এই যে, আসুন আসুন। আমি বলি বুঝি চলে গেলেন।

বঙ্কু। না না, চলে যাইনি। এই একটু ঘুরে এলুম এদের নিয়ে।

সুকুমারী। আপনি আমার এমন খরচা করতে গেলেন কেন কাকাবাবু?

বঙ্কু। (কুণ্ঠার সহিত) এ আর খরচা কী মা। সামান্য দুটো পয়সা বই তো নয়। অবশ্য আমার মতন গরীবের কাছে দুটো পয়সা সামান্য নয়।---কিন্তু অনেক দিন কেউ আমার কাছে আবদার করে কিছু চায় নি মা।

পৃথ্বীশ। (জনান্তিকে) দিদি, এই নাকি?

মহালক্ষ্মী। আমি তো দেখিনি, এই বোধ হচ্ছে।

পৃথ্বীশ। হুঁ, এখানে আর দেখতে হচ্ছে না বুড়োকে।

খোকন। মা, আমরা কেমন একটা দু-উ-ব ভালো গান শিখেছি, দাদুর কাছে।

তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না

পৃথ্বীশ। (স্বগতঃ) নিশ্চয় এই। (উদ্ধতভাবে আগাইয়া গিয়া) আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

বঙ্কু। আমার সঙ্গে? বলুন (তাহার দিকে ফিরিলেন)

অমর। (বাধা দিয়া) তুমি থামো পিন্টু, আমি বলছি।

বঙ্কু। (তাঁহার দিকে ফিরিয়া) বলুন।

ডাকু। না দাদু, তুমি---আপনি সেই গানটা আর একবার কর।

অমর। দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটি কী জিজ্ঞাসা করতে পারি?

বঙ্কু। আমার নাম—

খোকন। দাদুর নাম জানো না? আমি জানি, দাদুর নাম বঙ্কুবাবু।

পৃথ্বীশ। (অমরবাবুকে জনান্তিকে) দাদা, ও-রকম করে অত কিন্তু হয়ে কথা কইলে কী চলে?

অমর। ব্যস্ত হও কেন ভাই? দেখো না কী রকম কথা কই। ব্যবসাদার লোক, এতদিন কারবার করে কি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতেও শিখিনি?

পৃথ্বীশ। (অপ্রতিভ হইয়া) না না, আমি তা বলছি না—

ইহাদের কী পরামর্শ হইতেছে মনে করিয়া মহালক্ষ্মী, ও পরে সুকুমারী, ইহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরস্পর নিম্নস্বরে কথা হইতেছে। সেই অবসরে ওদিকে ডাকু ও খোকন বঙ্কুবাবুকে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। দর্শকের কানে ছেলেদের কথাই প্রবেশ করিল। পরে তাহাদের কণ্ঠসংযোগে বঙ্কুবাবুর গান সুরু হইল। প্রথম দিকে ছেলেরা "তারপর কী? দাদু, জোরে জোরে গাওনা।" ইত্যাদি বলিতে থাকিবে। ক্রমে বঙ্কুবাবুর সুর উচ্চ ও স্পষ্ট হইল।

গান *

খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা
চারদিকে সব খেলার মেলা, খেলা কেবল আনাগোনা।
খেলতে খেলা জমবে ভালো
কোত্থেকে সব মানুষ আসে,
খানিক খেলে খেলনা ফেলে, কোথায় যে যায়
যায় না জানা।

গান শুনিয়া প্রথমে সকলেই বিস্মিত হইল। পৃথ্বীশ প্রথমটা ইতস্ততঃ করিয়া কখন এক সময়ে তবলা বাজাইতে লাগিয়া গেল। তখন মনে

---

* গানটি বহু পুরাতন। কাহার রচনা জানা নাই। সেই অজ্ঞাত রচয়িতার ঋণ স্বীকার করিলাম। লেখক

হইল বঙ্কুবাবু ও পৃথ্বীশের মধ্যে অন্ততঃ সুরে তালে কোনো অমিল নাই। গান শেষ হইলে দেখা গেল বঙ্কুবাবু চোখ মুছিতেছেন।

প্রসন্ন। (উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সহিত) থামবেন না, থামবেন না। আহা। আর একবার গান। পিন্টু বাজাও বাজাও। বাঃ! চমৎকার বাজাতে শিখেছ তো।

গান পুনরাবৃত্তি হইল

প্রসন্ন। আ-হা, চমৎকার গান। সত্যি, শেখার মতনই বটে।

বঙ্কুবাবু। কে এই খেলা করতে বলেছিল প্রসন্নবাবু, কী দরকার ছিল ওঁর এই আনাগোনা করবার। (বলিতে বলিতে বিধাতার প্রতি অভিমানে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল)

সুকুমারী। ঠাকুরঝি, ওঁর বোধ হয় অনেক ছেলেপুলে নষ্ট হয়ে গেছে। আহা!

প্রসন্ন। চমৎকার গান, আর চমৎকার গলা আপনার।

বঙ্কু। সান্ত্বনার এই একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। (দীর্ঘশ্বাসের সহিত) আর সবই গেছে।

প্রসন্ন। আ-হা!

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল

বঙ্কু। এবার তাহলে উঠি আমি।

প্রসন্ন। সে কী কথা। আপনি উঠবেন কী রকম?

বঙ্কু। আজ্ঞে হাঁ, আজ আমি আসি।

মহালক্ষ্মী। পিন্টু, মরে পড়বার মতলব বুঝি?

পৃথ্বীশ। সে আমি সব বুঝি দিদি। খালি দেখছি কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

বঙ্কু। আচ্ছা, নমস্কার প্রসন্নবাবু। আমি যাই ভাই।

করযোড়ে সকলকে নমস্কারাদি করিয়া, পাছে আবার অনুরোধ আসে, এই ভয়ে বঙ্কু তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মহালক্ষ্মী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি চুপে চুপে সকলের শ্রুতি-গোচর ভাবে বলিলেন—

মহালক্ষ্মী। হাঁ দাদা, চাবিটা তাহলে কি—

প্রসন্ন। আচ্ছা আচ্ছা, সে হচ্ছে।

বঙ্কু। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) হাঁ, ভালো কথা। (সুকুমারীকে) মা, তোমার চাবিটা যে আমার কাছে রয়েছে, বড্ড ভুলে যাচ্ছিলুম। ক্রমশঃ

চির-বাঞ্ছিতা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

একটি নারীর হৃদয়-পাত্র ভরি'
একটি সাঁঝের একটি নীরব ক্ষণে,
এত সুধারস উঠিল যে সঞ্চরি
বিস্ময়ে আজ ভাবি তাই মনে মনে।
যে পারে এমনি আপনারে বিলাইতে
বিলাইতে পারে আপনার যাহা কিছু,
তারি হাতে চাই নিজের যা কিছু দিতে,
উতলা মন যে ঘোরে তারি পিছু পিছু।
ক্ষণিকের দেখা, ক্ষণিকের পরিচয়
উল্লাসে নাচে অবনত দু'টি আঁখি,
আমারে দেখিয়া লাগিল কি বিস্ময়
তোমার স্বপন সত্য হইল নাকি?
হাতে হাত রাখি বসিয়া রহিলে পাশে,
কি যেন বলিবে—কথা যোগায় না মুখে:
এত কাছে এলে বল ত কিসের আশে
মনের কথাটি গোপন রাখিয়া বুকে?
বুকে টেনে নিতে লতাইয়া প'লে সদা
বাহুর বাঁধনে ধরা দিতে বুঝি এলে,
নয়নে তোমার আকাশের ব্যাকুলতা
অন্তত আমার নয়নে তুমি কি পেলে?
পেলে কি তোমার হৃদয়-ভুলান আলো
গহন মনের দুঃখ-দহন জ্বালা?
তুমি ভালো তাই তোমারে লাগিল ভালো
আমারে কি ভালো লেগেছে তোমার বালা!
ভালো যদি লাগে বল আরো কিছু'খন
শ্রান্তি আসিলে মাথা রেখো এই বুকে:
কাণ পেতে শোন কিসের গুঞ্জণ
উঠিতেছে সেথা অধীর মিলন-সুখে।
সন্ধ্যার মায়া ঘনায় নদীর তীরে
তোমার মাধুরী জোৎস্নায় পড়ে গ'লে,
আকাশের তারা উঠিল চাঁদেরে ঘিরে
একেলা আমারে ফেলে তুমি যাবে চলে?
চলে যদি যাবে কেন তবে তুমি এলে?
সবখানি দিলে কিছু রাখিলে না বাকী,
মনেরে শুধাও মোর কাছে কিবা পেলে
কথা কও?—কেন নীরবে নামালে আঁখি?

জঙ্গম

বনফুল

১৮

কুন্তলা গৃহকর্ম্মে নিমগ্ন ছিল।

উঠানে বসিয়া নিজের হাতেই গরুর জাব কাটিতেছিল। বাঙলা দেশ হইতে জাব কাটিবার একটা বঁটি সে আনাইয়া লইয়াছে। এদেশের 'গড়াসা' তাহার পছন্দ নয়। বর্ত্তমানে তাহার দৈনন্দিন জীবন সে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে যে ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাহার কোন অবসর নাই। ইচ্ছা করিয়াই কোন অবসর সে রাখে নাই। ভোর পাঁচটায় সে ওঠে। উঠিয়াই প্রথমে ঘর বারান্দা উঠান স্বহস্তে ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করে। প্রতি ঘরের চৌকাঠে জল ছিটায়, গোবর দিয়া রান্নাঘরটা নিকাইয়া ফেলে। তাহার পর গোয়াল পরিষ্কার করিয়া, গরুকে খাইতে দিয়া, বাসনগুলি মাজে। এতদিন একটা বুড়ি ঝি ছিল—কিন্তু সে এখন নিতান্তই বুড়ি হইয়া পড়িয়াছে—চোখে দেখিতে পর্য্যন্ত পায় না। ইচ্ছা করিয়াই কুন্তলা নূতন কোন ঝি রাখে নাই। সে নিজেই সব করিবে। বাসন মাজা হইয়া গেলে সে স্নান করে, স্নানান্তে পূজার ঘরে ঢোকে। পূজা সারিয়া রান্না সুরু করে। বেলা বারোটার পূর্ব্বে হরিহরের খাইবার অবসর হয় না। স্নান, আহ্নিক, পৌরহিত্য, সাধারণ বৈষয়িক কাজ-কর্ম্ম প্রভৃতি দৈনিক কর্ত্তব্যগুলি করিতে বারোটাই বাজিয়া যায়। সুতরাং রান্না খাওয়া শেষ করিতে কুন্তলার প্রায় একটা বাজে। ইহার পর ঘণ্টাখানেক সে বিশ্রাম করে। বিশ্রামের পর খানিকক্ষণ পড়াশোনা—খানিকক্ষণ চরকা। পাঁচটার সময় গরুর জাব কাটে। গরু চরিয়া ফিরিয়া আসিলে স্বহস্তে তাহার জাব পর্য্যন্ত সে মাখিয়া দেয়। গ্যাংড়া নামক যে বালকটি গরু চরায় সে অবশ্য খানিকটা সাহায্য করে—না করিলেও কিছু ক্ষতি হইত না। কুন্তলা কিছুতেই দমিত না। গরুর সেবা করিয়া আবার ঠাকুর ঘর—আবার রান্নার আয়োজন। বৈকালের দিকে রান্নাটাকে সে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছে। সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই সব শেষ করিয়া ফেলে। আটটার পর বাহিরের বারান্দায় পাড়ার অনেকে সমবেত হন—হরিহর ভাগবত পাঠ করেন। কুন্তলাও কিছুদিন হইতে রোজ সেখানে বসিতেছে। পিসিমা যতদিন ছিলেন ততদিন অবশ্য এসব কিছু ছিল না। তখন হরিহর পাড়ার মুন্সিজির সহিত দাবা খেলিতেন। কুন্তলা পিসিমার খুঁটিনাটি কাজ করিয়া দিত এবং পিসিমার সঙ্গেই গল্প-গুজব করিত। পিসিমার গল্পের প্রধান বিষয় ছিল হরিহরের পিতা ত্রিপুরেশ্বর এবং হরিহর। হরিহরের বাল্য জীবনের কথা, ত্রিপুরেশ্বরের জীবনের অলৌকিক নানা কাহিনী পিসিমা সবিস্তারে বলিয়া যাইতেন—বারবার বলিয়াও যেন শেষ করিতে পারিতেন না—শেষ করিয়াও যেন তৃপ্তি হইত না। কুন্তলা ময়দা মাখিতে মাখিতে বা ক্ষীরের ছাঁচ তুলিতে তুলিতে স্মিতমুখে সে সব গল্প শুনিত। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত বটে কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করিত যাহাতে অন্যমনস্ক না হয়। পিসিমা সম্প্রতি কাশীবাস করিয়াছেন। তাঁহার এক বোন-পো কাশীতে বাড়ি করিয়া তাঁহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছে। সেখানেই পিসিমা এখন কিছুকাল থাকিবেন। যে হরিহরকে বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ করিয়াছেন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার একটু কষ্ট হইয়াছিল বই কি। কিন্তু সমস্ত হিন্দু নারীর মনে যে ভাব শেষ পর্য্যন্ত প্রবল হয় তাহা তাঁহার মনেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মায়া তো একদিন কাটাইতেই হইবে, পরকালের কাজটাও তো করা দরকার—কতদিন আর সংসারের ঝঞ্ঝাটে জড়াইয়া থাকিবেন তিনি! বাবা বিশ্বেশ্বর এমন একটা সুযোগ যখন ঘটাইয়া দিয়াছেন তখন তাহা ত্যাগ করা কি উচিত! তবু তাঁহার মনে কিছু খুঁতখুঁতানি ছিল—বউমা একলা সব চালাইতে পারিবে কি—হাজার এম-এ পাশ করুক—ছেলেমানুষ তো—সংসারের কতটুকু বোঝে। কুন্তলা চুপ করিয়া থাকিত। কাশী যাওয়ার বিপক্ষে কিছু বলিলে পাছে পিসিমা ভাবেন বউ তাহাকে কাশীতে বিদায় করিয়া দিয়া নিজেই সংসারের কর্ত্রী হইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল দোটানার মধ্যে থাকিয়া পিসিমা নিজেই অবশেষে মন-স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। হিন্দু-বিধবার পক্ষে কাশীবাসের প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন। পিসিমা কাশী চলিয়া গেলে সন্ধ্যার পর কুন্তলার বড় একা একা বোধ হইত। পাড়া-বেড়ানো স্বভাব তাহার নয়। পড়িতেও ইচ্ছা করে না একা একা। তাই সে হরিহরকে বলিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠের আয়োজন করিয়াছে। এ প্রস্তাবে মুন্সিজিও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করাতে হরিহর রাজি হইয়াছেন। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ভাগবত পাঠ হয়। তাহার পর আহারাদি করিয়া কুন্তলা শুইয়া পড়ে। এই তাহার বর্ত্তমান দৈনন্দিন জীবন। একেবারে নিশ্ছিদ্র। ইচ্ছা করিয়াই সে কোন ছিদ্র রাখে নাই। ছিদ্র থাকিলেই নানা ভাবনা আসিয়া জোটে। অসংখ্য আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনা মনের নিভৃত হইতে উঠিয়া আসিয়া অদ্ভুত দিবা-স্বপ্ন রচনা করে। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। যে জীবনকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে সে জীবনের মহিমায় যেন সন্দেহের ছায়া-পাত হয়। না, কোনরূপ অশান্তিজনক স্বপ্ন-বিলাসের সুযোগ নিজেকে সে কিছুতেই দিবে না। যে জীবন সে গ্রহণ করিয়াছে তাহাই হিন্দু নারীর আদর্শ জীবন। সর্ব্বতোভাবে সে আদর্শের উপযুক্ত তাহাকে হইতে হইবে—কায়মনোবাক্যে সে আদর্শ জীবনের মহত্ত্বকে স্বীকার করিতে হইবে—কোনরূপ অনুশোচনার অবসর সে দিবে না—কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিবে। আচরণ দ্বারা তো নহেই, মনে মনেও সে স্বীকার করিবে না যে ভুল করিয়াছে। ভুল সে করে নাই। ইহাই ভারতবর্ষীয় নারীর আদর্শ। এই আদর্শের উপযুক্ত হইতে হইবে—কষ্ট হয় হোক। যে কোন মহৎ সাধনা করিতে হইলেই কষ্ট করিতে হয়।

তবু মাঝে মাঝে সুধাংশুকে মনে পড়ে। কলেজ-জীবনে সুধাংশুকে সত্যই তাহার ভাল লাগিয়াছিল। যেমন তাহার সৌম্য মূর্ত্তি, তেমনি আচরণ, তেমনি বিদ্যাবত্তা। দূর হইতেই সে

তাহাকে রক্ষা নিবেদন করিয়াছিল—উপযাচিকা হইয়া অন্য মেয়েদের মতো ছলে ছুতায় তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহার সহিত একটা কথা পর্য্যন্ত বলে নাই। তাহার সহপাঠিনীদের মর্য্যাদাবোধের অভাব চিরকাল তাহাকে পীড়া দিয়াছে। কাপড়, গহনা, সিনেমা, পুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি অতি তুচ্ছ ব্যাপারই যেন তাহাদের নিকট বড়। আত্মসম্মানের যেন কোন মূল্য নাই। অতি তুচ্ছ মূল্যেই নিজেকে বিকাইয়া দিতে সকলে প্রস্তুত। পাশ্চাত্য শিক্ষাটাই আমাদের কেমন যেন আত্মগৌরবশূন্য করিয়া তুলিয়াছে—এই কথাই কলেজে পড়িবার সময় বারবার তাহার মনে হইত। আমাদের যেন কিছু নাই। আমাদের ধর্ম্ম পৌত্তলিকতাময়, আমাদের সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন; আমাদের সমস্ত সামাজিক নীতি সুবিধাবাদী ব্রাহ্মণদের কারসাজি-মাত্র! বিদেশী ধর্ম্মকে, বিদেশী সমাজকে, বিদেশী নীতিকে, বিদেশী বুলিকে নকল করিতে না পারিলে আমাদের যেন আর মুক্তি নাই—নোবেল প্রাইজ না পাইলে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করিব না, বিলাত ফেরত না হইলে কৌলীন্য মর্য্যাদা দিব না, বিলাতী নজির না থাকিলে দেশী কোন কিছু বিশ্বাস করিব না—এই হেয় মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সে চিরকাল উদ্যত-প্রহরণ। এই জন্যই সে সুধাংশুর নামোল্লেখ পর্য্যন্ত কাহারও কাছে করে নাই। সুধাংশু জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাদের পালটি ঘরও, চেষ্টা করিলে অনায়াসেই তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারিত। কিন্তু 'চেষ্টা' করিয়া বিবাহ করা ব্যাপারটায় একটা বিদেশী গন্ধ আছে বলিয়া সে চেষ্টাই সে করে নাই। সত্য বটে এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবার নিয়ম ছিল। সীতা, সাবিত্রী, উমা, দময়ন্তী সকলে পছন্দ করিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের আচরণে এমন শিকারী মনোবৃত্তি ছিল না। আজকালকার মেয়েরা যাহা করে তাহা ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরার মতো মর্য্যাদাহীন ব্যাপার। ধৃত মৎস্যটি যদি রুই কাৎলা না হয়, তাহা হইলে সেটিকে ছাড়িয়া দিয়া অতিমাত্র মহত্তর উদ্দেশ্যে আবার নূতন টোপ ফেলা হয়। বর্ত্তমান যুগের অর্থশাসিত বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রেমের সে মহিমা আর নাই। কেবলমাত্র প্রেমের জন্যই আজকাল কেহ প্রেমাস্পদকে বিবাহ করিতে রাজি হয় না যদি না তাহার সহিত একটি সুরক্ষিত 'ফিউচার' জড়িত থাকে। সুধাংশুর সহিতও একটি সুরক্ষিত 'ফিউচার' জড়িত ছিল। বিশেষ করিয়া এই জন্যই কুন্তলা তাহাকে এড়াইয়া চলিত। পাছে কেহ মনে করে যে ধনী-সন্তান সুধাংশুকে সে রূপের টোপ ফেলিয়া গাঁথিবার চেষ্টা করিতেছে! সুধাংশু যদি দরিদ্র হইত, যদি সে বিলাতী ডিগ্রি অর্জ্জন করিয়া বড় চাকুরি করিবার স্বপ্ন না দেখিত, যদি সে ব্রাহ্মণোচিত নিরাসক্তিতে দারিদ্র্যকেই বরণ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যকেই জীবনে প্রাধান্য দিত—তাহা হইলে কুন্তলা হয় তো তাহাকে স্বামীত্বে বরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিত। ব্রাহ্মণ কন্যা সে—পছন্দ করিয়া যদি বিবাহ করিতে হয় সত্যকার ব্রাহ্মণকেই সে পছন্দ করিবে। কিন্তু সে রকম ব্রাহ্মণ একজনও তো তাহার চোখে পড়িল না। সকলেই অর্থ-গৃধ্নু। কেহ কেহ ব্রাহ্মণের মুখোশ পরিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের আদর্শে কেহই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। প্রেমের অঞ্জলি, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কাহার চরণে দিবে সে। ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়া টাকার লোভে একটা বৈশ্যকে ভুলাইতে যাইবে? ইহা করা অপেক্ষা বর্ত্তমান যুগের সম্প্রদান-প্রথায় আত্মসমর্পণ করিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ঢের বেশী আত্ম-সম্মানজনক। সম্প্রদান-প্রথার অন্তর্নিহিত ভাব সত্যই মহত্বপূর্ণ। যে কন্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নের সঙ্গে উপমিত সেই কন্যাকে লালনপালন করিয়া স-দক্ষিণা সৎপাত্রে দান করার মধ্যে যে আভিজাত্য আছে তাহা কি তুচ্ছ করিবার মতো? বর্ত্তমান যুগের বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় (যে আবহাওয়ায় অর্থ-ই পরমার্থ) পণ-প্রথা-দুষ্ট হইয়া সে উদারতা-চর্চ্চা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু তবু তাহা যে মহত্বপূর্ণ এ কথা কে অস্বীকার করিবে। এখনও আমাদের দেশের ভদ্রসমাজ এত কষ্টে পড়িয়াও এই উদার প্রথাকেই অবলম্বন করিয়া আছে, কন্যা বিক্রয়ের হীনতা স্বীকার করে নাই। তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজেই কন্যারা আজকাল নিতান্ত দেহের তাগিদে এবং বিলাস-লালসায় মত্ত হইয়া বৈশ্যের কাম-বহ্নিতে নিজেদের ইন্ধন দিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে পাশ্চাত্য সমাজের নকল করিয়া। কুন্তলা এ হীনতা স্বীকার করে নাই। পিতার হস্তেই বিবাহের সম্পূর্ণ ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল।...তবু সুধাংশুর মুখখানা মাঝে মাঝে তাহার মনে পড়ে। পড়ুক। সুধাংশু তাহার কেহ নয়। হরিহরের সহিত তাহার তুলনা পর্য্যন্ত সে করিবে না। হরিহর তাহার স্বামী—আরাধ্য দেবতা—শুধু ইহকালের নয়, পরকালেরও সম্বল।

কুন্তলার সহিত হরিহরের বিবাহের ইতিহাসটিও ঈষৎ অদ্ভুত। কুন্তলার উগ্র আত্মমর্য্যাদাবোধের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। হরিহরের পিতা স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এ অঞ্চলে 'ঠাকুর বাবা' নামে প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। হীরাপুরের জগদ্ধাত্রী মন্দিরের পুরোহিত অপুত্রক অবস্থায় মারা যাইবার পর প্রাক্তন জমিদার রাজবল্লভ রায় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বর্দ্ধমান জিলার এক গ্রাম হইতে সন্ধান করিয়া লইয়া আসেন এবং হীরাপুরের জগদ্ধাত্রী মন্দিরে পুরোহিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুর বাবা একমাত্র মাতৃহীন পুত্র হরিহর এবং বিধবা ভগ্নীটিকে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং জমিদার-প্রদত্ত নিষ্কর জমিজমার সাহায্যে হীরাপুরে বসবাস করিয়াছিলেন।

ঠাকুর বাবার বিষয়ে অনেক অলৌকিক গল্প এদেশে প্রচলিত আছে। তিনি না কি ভূতপ্রেতের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, শীতকালে পাকা আম কাঁটাল আনাইয়া দিতে পারিতেন। অনেক পক্ষী না কি তাঁহার বাধ্য ছিল। অনেকে স্বচক্ষেই না কি দেখিয়াছে স্বচ্ছ-বসনা জ্যোৎস্না-বরণা পরী মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে। লোহাকে সোনা করার ক্ষমতাও না কি তাঁহার ছিল। কিন্তু এ বিদ্যা একটিবার ছাড়া কখনও তিনি কাজে লাগান নাই। তিনি সত্যই সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বর্ণ এবং লৌহ তাঁহার নিকট তুল্যমূল্য ছিল। একবার কেবল একটি দরিদ্র বৃদ্ধার লোহার খন্তিটিকে তিনি সোনার করিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধা অর্থাভাবে তাহার একমাত্র পুত্রের চিকিৎসা করাইতে পারিতেছিল না এবং ঠাকুর বাবাকে আসিয়া ধরিয়াছিল তাহাকে নিরাময় করিয়া দিবার জন্য। ঠাকুর বাবা বলিয়াছিলেন—নিয়তি কাহারও বাধ্য নয়, যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা ঘটিবেই—

তুমি কর্ত্তব্য কর, পুত্রের চিকিৎসা করাও, তাহার পর ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। বৃদ্ধা অর্থাভাবের কথা জানাইলে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—তোর যদি কোন লোহার বাসন থাকে পরিষ্কার করিয়া মায়ের পায়ের তলায় রাখিয়া যা, মায়ের যদি দয়া হয় লোহাকে সোনা করিয়া দিবেন। বুড়ির প্রকাণ্ড একটা লোহার কড়া ছিল—সেইটা পরিষ্কার করিয়া দিলেই হইত, কিন্তু বোকা বুড়ি তাহা না করিয়া খন্তিটা দিয়া আসিয়াছিল। বুড়ি বোধহয় ঠাকুর বাবার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নাই। পরদিন কিন্তু বুড়ির বিস্ময়ের অবধি রহিল না—মায়ের পদস্পর্শে লোহা সত্যই সোনা হইয়া গিয়াছে! ঠাকুর বাবা বুড়িকে একথা প্রকাশ করিতে মানা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুড়ি কি এত বড় একটা সংবাদ চাপিয়া রাখিতে পারে? বেশী লোককে সে অবশ্য বলে নাই। কেবল নিজের 'ভোলাই'কে, 'পিতিয়া'কে এবং তেতরিকে বলিয়াছিল। তাহার এই অবাধ্যতার ফলও অবশ্য ফলিয়াছিল, ছেলেটি বাঁচে নাই। এই সংবাদে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে ঠাকুর বাবার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুর বাবা কাহাকেও আর আমোল দেন নাই। সকলেই চলিয়া গিয়াছিল—যায় নাই কেবল 'বকুয়'। বলিষ্ঠ দুর্দান্ত 'বকুয়' জাতিতে লোহার। স্বচক্ষে সে স্বর্ণময় খন্তিটি দেখিয়াছিল। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও যখন ঠাকুর বাবার নিকট হইতে সে সোনা করিবার মন্ত্রটি আদায় করিতে পারিল না, তখন কি যে তাহার মনে হইল ঠাকুর বাবার আশ্রয় সে আর ত্যাগ করিল না। আজীবন তাঁহার আশ্রয়েই থাকিয়া গেল। দুর্দান্ত মাতাল দুর্দান্ত কর্মীতে পরিণত হইল। বকুয় তাহার মোটা বুদ্ধি দিয়া এইটুকুই বোধহয় বুঝিয়াছিল যে ফাঁকি-দিয়া অর্থোপার্জন করা পাপ। তাহা না হইলে ঠাকুর বাবা নিজেই ঐশ্বর্য্যবান হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা হন নাই। তিনি নিজের কয় বিঘা জমি হইতে উৎপন্ন শস্য এবং শিষ্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সামান্য দক্ষিণা লইয়াই তো সন্তুষ্টচিত্তে মায়ের সেবা করিতেছেন!

এই ঠাকুরবাবার পুত্র হরিহর স্থানীয় স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন অবধি পড়িয়াছিলেন। কাজ-চলা-গোছ ইংরেজি বিদ্যালাভ করিয়া পিতার নির্দ্দেশে তাঁহাকে সংস্কৃত অধ্যয়নে মনোযোগ করিতে হইয়াছিল। খাঁটি স্বদেশী ছাঁচে ঠাকুর বাবা পুত্রটিকে মানুষ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, টানা চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি, ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে শুচিতা যেন মূর্ত্ত হইয়া আছে। নগ্ন গাত্রে এক গোছা শুভ্র উপবীত, মস্তকে গোক্ষুর পরিমাণ শিখা বিদেশাগত আধুনিকতার বিরুদ্ধে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের মতো বিরাজ করিতেছে। অথচ লোকটি রবীন্দ্রনাথের গোরার মতো উগ্র নয়, কথায় কথায় বক্তৃতা দিবার আবেগ তাঁহার জাগে না। অতিশয় স্বল্পভাষী মৃদু প্রকৃতির লোক। নিজেকে লোকচক্ষু হইতে যথাসম্ভব অবলুপ্ত করিয়া রাখাই যেন তাঁহার সাধনা। অধিকাংশ সময়ই মন্দিরে থাকেন, পূজা এবং পড়াশোনা করা ছাড়া অন্য কোন কাজ নাই। শিষ্য বাড়ির আহ্বানে অথবা কোথাও কথকতা করিবার জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ হইলে নিতান্ত অনিচ্ছা ও সঙ্কোচ-সহকারে কাঁধে চাদরটি ফেলিয়া কচিৎ কখনও তিনি বাহির হন। ফসল উঠিবার সময়ও মাঝে মাঝে তাঁহাকে বাহির হইতে হইত, কিন্তু কুন্তলা আসিবার পর হইতে বৈষয়িক সমস্ত ব্যাপারের ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এই নিরীহ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সহিত এম-এ পাশ কুন্তলার বিবাহ সম্ভবপর হইয়াছিল ত্রিপুরেশ্বরের সহিত কুন্তলার পিতার আলাপ ছিল বলিয়া। শুধু আলাপ নয়—কুন্তলার পিতা ইংরেজি-শিক্ষিত অধ্যাপক হইলেও ত্রিপুরেশ্বরের একজন ভক্ত ছিলেন। কুন্তলার মা-ও ত্রিপুরেশ্বরকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করিতেন। ত্রিপুরেশ্বরই নাকি একবার বালিকা কুন্তলাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"মেয়েটি খুব সুলক্ষণা, আমার হরুর সঙ্গে এর বিয়ে দাও তো বড় খুশি হই—"। কুন্তলার পিতা মাতা উভয়েই তখন এ প্রস্তাবে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, কুন্তলাও কথাটা শুনিয়া মনে মনে একটা স্বপ্ন-রচনা করিয়াছিল। কিন্তু কথাটা তখন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পরে ত্রিপুরেশ্বর পত্রযোগে আবার এ প্রস্তাব করেন। কুন্তলার পিতা পত্রের উত্তরে লেখেন—কুন্তলা হরিহর উভয়েই এখন পড়িতেছে, উহাদের পড়াশোনা শেষ হইলে শুভকর্ম্ম সমাধা করা যাইবে। বিবাহ ঠিক করাই রহিল। কিন্তু কুন্তলা এমন ভাল-ভাবে পড়াশোনা এবং পাশ করিতে লাগিল যে তাহার বাবা পড়া বন্ধ করিতে পারিলেন না। কুন্তলা যখন আই-এ. পড়িতেছে তখন তাহাকে একদিন বলিলেন—হরিহরের সঙ্গে কিন্তু তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করা আছে—বিয়ে করবি ত? কুন্তলার মন তখনও পাশ্চাত্য-শিক্ষার মোহে মুগ্ধ। সবাই যেমন বলে তেমনি বলিল, "পড়াশোনা শেষ হোক তারপর বিয়ের কথা।"—ইতিমধ্যে ত্রিপুরেশ্বর মারা গেলেন। হরিহরকে ত্রিপুরেশ্বর বিবাহের কোন কথাই বলিয়া যান নাই, বিবাহ সম্বন্ধে হরিহরেরও বিশেষ তেমন কোন আগ্রহ ছিল না, পিসিমাই মাঝে মাঝে কেবল ব্যগ্র হইতেন। এদিকে কুন্তলা যখন এম-এ, পাশ করিয়া ফেলিল তখন তাহাকে একটা গ্রাম্য পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করিতে কুন্তলার বাবা একটু যেন ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কুন্তলার মায়েরও কেমন যেন অনিচ্ছা দেখা যাইতে লাগিল। কুন্তলার আত্মমর্য্যাদা-বোধ তখন উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, "ওঁদের সঙ্গে যখন কথা হয়ে আছে সে কথার নড়চড় করা অভদ্রতা হবে। ওঁদের একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত, ওঁরা যদি আপত্তি করেন আমাদের তাহলে আর কোন দায়িত্ব থাকবে না—"

কুন্তলার মা বলিলেন—"ছেলেটি তো মোটে ম্যাট্রিক পাশ শুনছি। ওর সঙ্গে তোকে মানাবে কেন?"

কুন্তলা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল—"বাবা এম-এ, পি. এইচ. ডি. আর তুমি তো একেবারে নিরক্ষর, তোমাদের কি মানায় নি? আমি এম. এ. পাশ করেছি বলে কি তোমাকে 'মা বলে' সম্মান করব না? পাশ করাতে কি এসে যায়!"

কুন্তলার বাবা বলিলেন, "ইংরেজি তেমন না জানলেও ছেলেটি সংস্কৃতে বেশ পণ্ডিত। ঘরে খেতে পরতেও আছে। একশ' বিঘের ওপর ভাল জমি—দেশেও বেনো জমি আছে। সেদিকে কিছু খারাপ নয়—অত বড় বংশ—ছেলেটিও বেশ সুস্থ সচ্চরিত্র। আমি কেবল তোর কথা ভেবেই একটু দোনো মোনো করছিলাম"

"আমার কোন আপত্তি নেই—"

পত্র পাইয়া হরিহর অবাক হইয়া গেলেন। তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। মেয়ে এম-এ পাশ শুনিয়া পিসিমা নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"ও মা, তাহলে সে তো

মেয়ে নয়—মেম সাহেব! চশমা গাউন পরে' রুজ পাউডার মেখে বাজারে গিয়ে জুতো খটখটিয়ে বেড়াবে খালি। একবার কোলকাতায় দেখেছিলাম এক এম-এ পাশ মেয়েকে—বাবারে বাবা, সে কি ছিরি তার! হাতে ব্যাগ, পায়ে জুতো, চোখে চশমা ঘাগরা করে' কাপড় পরা। মুখখানি কিন্তু শুকনো আমসির মতো—তার ওপর আবার রুজ পাউডার।"

ভীত হরিহর অসহায়ভাবে বলিলেন—"বাবা কিন্তু এরই সঙ্গে কথা দিয়ে গেছেন যে—"

"কথা দিয়ে গেছেন? কি করে' জানলি তুই"

"বাবার চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরা"

এ যুক্তি অকাট্য। উভয়েই চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হইলে পিসিমা অবশেষে বলিলেন, "এক কাজ কর না হয় তুই, গুরুঠাকুরকে চিঠি লেখ। তিনি জ্যোতিষীও বটেন, তোর কুষ্ঠি-বিচার করে' সৎপরামর্শ দেবেন। এ তো এক মহা মুশকিলে পড়া গেল বাপু—"

হরিহর তাহাই করিলেন। কয়েক দিন পরে কুলগুরু শিবকিঙ্কর শর্মার উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, "তোমার পিতা যদি যথার্থ ই বাগদান করিয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে সত্যই অধর্ম হইবে জানিও। তোমার কোষ্ঠী-বিচার করিয়া তোমার বধূর যে বর্ণনা উদ্ধার করিলাম তাহা জানাইতেছি। বাগদত্তা কন্যাটির সহিত যদি মিলিয়া যায় তুমি নির্ভয়ে বিবাহ করিতে পার—বুঝিও ইনিই তোমার বিধি-নির্দিষ্টা সহধর্মিণী। কন্যাটি গৌরবর্ণা, নাতি-দীর্ঘাঙ্গী, বিদুষী ও অচপলা হইবে। চরিত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রখরতা থাকিতে পারে, কিন্তু স্থির-প্রজ্ঞাশালিনী ও চারিত্রিক শক্তিসম্পন্না হওয়াতে তাহা দুঃখের হেতু না হইয়া আনন্দেরই কারণ হইবে। কন্যার নামের আদ্যক্ষর 'ক' হওয়া উচিত; কন্যার পিতা সম্ভবত অধ্যাপক। তোমার একটা অপমৃত্যু যোগ আছে দেখিতেছি, কন্যার কোষ্ঠীতে ইহার কোন কাটান আছে কি না জানি না। যাই হোক, বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়, অদৃষ্টও দুরতিক্রম্য। আমার মতে পিতৃ-আদেশ পালন করাই তোমার কর্তব্য।"

বর্ণনার সহিত অনেকটা যখন মিলিয়া গেল—তখন হরিহর এবং হরিহরের পিসিমা বুঝিলেন গত্যন্তর নাই। ভবিতব্যকে মানিতেই হইবে।

বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ করিয়া হরিহর যেদিন গ্রামে আসেন সেদিন হরিহরের পিসিমা কম্পিতবক্ষে আশঙ্কা করিয়াছিলেন পাল্‌কির ভিতর হইতে সেমিজ-জামিজ-জুতা-পরা কি অদ্ভুত জীবই না জানি বাহির হইবে—হয় তো প্রণাম না করিয়া 'সেক হ্যাণ্ড' করিতে যাইবে—হয় তো বাড়িতে পা দিতে না দিতেই হরিহরের হাত ধরিয়া বলিবে—চল ফাঁকা মাঠে হাওয়া খাইয়া আসি, বিকালে বেড়ানো আমার অভ্যাস। কিন্তু পালকির ভিতর হইতে যখন চেলী-পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী নতমুখী সিঁথি-মউর-শোভিতা অলক্তকচরণা কুন্তলা সসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল তখন আনন্দে বিস্ময়ে তিনি কাঁদিয়াই ফেলিলেন। যতদিন সংসারে ছিলেন তাঁহার সে বিস্ময় এবং আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কুন্তলার প্রশংসায় তিনি শতমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বউ শুধু এম. এ. পাশই নয়—শাক চচ্চড়ি সুক্তো হইতে আরম্ভ করিয়া সব-রকম রান্না করিতে জানে, বড়ি দিতে পারে, চমৎকার আলপনা দেয়, চরকা কাটে—এমন কি ইতু পূজা পর্যন্ত জানে! হরিহরের মনেও যে ভয়টা হইয়াছিল তাহা অল্প পরিচয়েই কাটিয়া গেল। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিলেন যে ব্রাহ্মণ-গৃহিণী হইবার যোগ্যতা কুন্তলার আছে। ইহা লইয়া বেশী উচ্ছ্বসিত অবশ্য তিনি হন নাই, বিবাহরূপ কর্তব্য কর্ম সমাপন করিয়া নিজের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সহজভাবেই চলিতেছিলেন। ইহাই কুন্তলার বিবাহের ইতিহাস।

কুন্তলা জাব কাটিতেছিল।

বঙ্কুর পুত্র রামলাল একটি খাতা ও বই লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল বেশ কায়দা-দুরস্ত করিয়া ছাঁটা। গায়ে হাফশার্ট এবং হাফশার্টের হাতা হইতে আধুনিক রীতিতে ছোট একটা ত্রিভুজাকৃতি অংশ বাদ দেওয়া। পায়ে বক্‌লস-শোভিত জুতা। সে যে বঙ্কুর পুত্র তাহা না জানিলে বোঝা শক্ত। এবারে সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। 'বড় মাইজি'র নিকট পড়া বলিয়া লইতে আসিয়াছে। রোজ আসে। সে বারান্দায় উঠিয়া বসিল এবং গতকল্য কুন্তলা যে যে অংশগুলি অনুবাদ করিতে দিয়াছিল তাহা পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে বিরক্তিতে কুন্তলার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। অজস্র ভুল! রামলালকে লইয়া আর পারা গেল না। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষণেরও যে লিঙ্গ আছে এই সামান্য কথাটা কিছুতেই ইহার মাথায় ঢুকিবে না! জাব কাটিতে কাটিতেই কুন্তলা সংশোধন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ

বহ্নি পবন্‌

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কনক্‌কান্তি পূর্ব দিগন্ত থেকে ছুটে এল
অনলধারা হাওয়ার একটি শিখা
ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার অন্তরাত্মার উপর
দেবদূতের মত দুরন্ত গতি, দুরন্ত অশ্বের মত দুর্বার তেজ
দিল ডাক্‌ রুদ্র বৈশাখ
মন ও দেহ অগ্নিময় হয়ে উঠল্‌ কিন্তু হৃদয় শুধু আচ্ছন্ন।
হে অগ্নিশিখা, তুমি এনেছ মত্ত মধ্যাহ্নের বহ্নি বলিষ্ঠা বাণী
কিন্তু কোথায় তরুণ ঊষার করুণ-কাকলী, কোথায় সন্ধ্যারতির
উদার নীরব প্রশান্তি
কোথায় পাণ্ডুর চাঁদের কারুজ্যোৎস্নায় মদির বিহ্বল আবেশ
জীবনের সব কিছু ত পুলকিত হোল কিন্তু হৃদয়ের কান্না যে থামে না।
সারা আকাশ বাতাস, দ্যুলোক্‌ ভূলোক্‌ মনে হয় অপরূপ বহ্নিময়
কিন্তু সে তাপে শুকিয়ে গেছে হৃদয়ের শুভ্র গোলাপটি
বহ্নি পবন্‌ চলে যাও—আমি নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে রব
আসবে যবে আমার অন্তরতম পুরী হতে ধীরে হেসে যিনি প্রিয়তম।*

---

* (শ্রীঅরবিন্দের Collective Poems & Plays Volume II পৃঃ ৩৩৬ "Flame wind"এর ভাব অবলম্বনে)

প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন *

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এইচ্-ডি

দিল্লীতে ভারত সরকারের একটি রেকর্ড অফিস বা মহাফেজখানা আছে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের গোড়াপত্তন হইতে সরকারী দলিল চিঠিপত্র ইত্যাদি যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা এইখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রাচীন কালে যে সব দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের পত্র বিনিময় হইত তাহার অনেকগুলি এখনও এখানে পাওয়া যায়। এগুলির অধিকাংশই ইংরেজী ও পারস্য ভাষায় লিখিত। অন্যান্য দেশীয় ভাষায় লিখিত পত্রও আছে—তাহার মধ্যে ১৭৫ খানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। ইহার মধ্যে ১৬৯ খানি চিঠি আলোচ্য গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর আর কোন গ্রন্থ নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ডাক্তার সেন বঙ্গসাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কারণ এই মুদ্রিত পত্রগুলিতে ইংরেজী আমলের প্রথম ভাগের বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব-সীমান্তের ইতিহাস ও ঐ যুগের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার অনেক মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়।

এই পত্রগুলি বাংলা সন ১১৮৫ ও ১২২৫ অর্থাৎ ১৭৭৯ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রধানতঃ কুচবিহার, মণিপুর, কাছাড় ও আসাম রাজ্যের রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বাংলার গভর্ণর জেনারেলকে লিখিত। এই সময়ে কুচবিহার সবেমাত্র ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে কিন্তু অপর তিনটি রাজ্য ও ভূটান সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই সমুদয় রাজ্যের অবস্থা তখন শোচনীয়। অরাজকতা, অন্তর্বিদ্রোহ ও পরস্পর কলহের ফলে এই সকল রাজ্য ক্রমশই হীনবল হইয়া পড়িতেছিল এবং আত্মরক্ষার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিত। এই উপলক্ষেই এই পত্রগুলি লিখিত হয়। সুতরাং সমসাময়িক দলিল হিসাবে ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। বিশেষতঃ এই সমুদয় পত্রে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায় যাহা এ পর্য্যন্ত জানিবার কোন উপায় ছিল না। ডাক্তার সেন এই সমুদয় পত্রের সাহায্যে গ্রন্থের ভূমিকায় "বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের মাৎস্য ন্যায়" শীর্ষক যে ঐতিহাসিক চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অভিনব, মনোজ্ঞ ও বহুল প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ।

বাঙ্গালাসাহিত্যের দিক দিয়াও আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান। যে যুগে এই পত্রগুলি লিখিত তখনও বাংলা গদ্যসাহিত্যের অতি শৈশব অবস্থা। রামমোহনের পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা ভাষার নিদর্শন হিসাবে এই চিঠিগুলির ভাষা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। ডাক্তার সেন গ্রন্থের ভূমিকায় এই বিষয়ে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু আমরা আশাকরি ঐতিহাসিক ডাক্তার সেন এই পত্রগুলির ঐতিহাসিক উপকরণ যেরূপ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কোন সাধক ভাষার দিক হইতে সেইরূপ বিস্তৃত আলোচনা করিলে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এই সময়কার বাংলা ভাষায় একদিকে সংস্কৃত আর একদিকে পারসীর কিরূপ উৎকট প্রভাব ছিল তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। গত এক শত বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এই দুই নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে তাহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের এক অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায়। এই অধ্যায় লিখিবার অনেক মালমসলা আলোচ্য গ্রন্থের মুদ্রিত চিঠিগুলিতে পাওয়া যাইবে।

এই পত্রগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যদিও তখন বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের নিতান্ত অপরিণত অবস্থা, তথাপি বাঙ্গালা ভাষা সমগ্র পূর্ব্বভারতে অর্থাৎ কুচবিহার, মণিপুর, আসামে, কাছাড় ও ভূটানের রাষ্ট্রভাষা ছিল। ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও তখন দেশের লোকের সহিত বাংলা ভাষায় পত্র লিখিতেন। আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি শতগুণে বাড়িয়াছে কিন্তু সে গৌরব ও প্রতিপত্তি নাই।

গ্রন্থে কয়েকখানি পত্রাংশের আলোকচিত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে তখনকার বাংলা অক্ষরের নমুনা পাওয়া যায়। ইহার কোন কোন অক্ষর বর্ত্তমান বাংলা অক্ষর হইতে বিভিন্ন। তখনকার বানান প্রণালী ও বর্ত্তমান বানানের মধ্যেও আকাশ পাতাল প্রভেদ। ডাক্তার সেন এই গ্রন্থ সংকলনে বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও সুলেখক। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বৃদ্ধি করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ গ্রন্থ সম্পাদনা করিতে হইলে যে সব দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার, ডাক্তার সেন সে সমুদয় বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। চিঠিগুলি যাহাতে সর্ব্ববিষয়ে মূলের নকল হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক ভূমিকা ও পত্রাংশের আলোক চিত্রের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত "শব্দকোষে" চিঠিগুলিতে ব্যবহৃত বিদেশীয় ও অপ্রচলিত শব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা ও অর্থ দেওয়া হইয়াছে। 'ব্যক্তি ও স্থান' নামক অধ্যায়ে পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তি ও স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক পত্রের জন্য স্বতন্ত্র টীকায় যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ঐ পত্রের মর্ম্ম বুঝিবার বিশেষ সাহায্য হয়। গ্রন্থশেষে ইংরেজী ভাষায় প্রতি চিঠির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এবং প্রথম অংশে বাংলায় লিখিত ঐতিহাসিক ভূমিকা ও 'ব্যক্তি ও স্থান' নামক মন্তব্যের ইংরাজী অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ডাক্তার সেন সরকারী দপ্তরখানার উপকরণ লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যে সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাতে তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদ অর্জ্জন করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহাদের প্রশংসনীয় উদ্যমের নূতন পরিচয় দিয়াছেন।

---

* প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন—ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন এম., এ., বি. লিট., পি-এইচ. ডি. সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৯৪২।

রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য এম-এ

(২)

রবীন্দ্রসাহিত্যের হাস্যরসে wit-এর বাহুল্য এবং humour-এর অভাব—এরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে। যে সমালোচক গীতিকবিতার সহিত হাস্যরসের স্বাভাবিক বিরোধিতার উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যে উৎকৃষ্ট হাস্যরসের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন তিনিও wit-এর প্রাচুর্য সম্বন্ধে সন্দেহ করেন নাই। উৎকৃষ্ট হাস্যরস বলিতে তিনি humour বুঝেন। সকলেই তাহা স্বীকার করে।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে হাস্যরসকে এভাবে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হয় নাই। সাহিত্যদর্পণকার হাস্যরসের সংজ্ঞা দিয়াছেন :

বিকৃতাকারবাগ্বেশচেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ ভবেৎ।
হাসঃ……।

ইওরোপীয় আলংকারিকগণ এই রসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু মূলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে অমিল নাই।

হাস্যরসের প্রধান অবলম্বন হইল অসংগতি। যাহার মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা বৈচিত্র্য নাই, যাহা যেটা উচিত বলিয়া নিত্য ঘটে, যাহার সুসংগতি ও স্বাভাবিকতা বুদ্ধিকে কিছুমাত্র বিচলিত করে না তাহা হাস্যরসের বিষয় নহে। বিকৃত আকার, বিকৃত বাক্য, বিকৃত বেশ, বিকৃত চেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা নট যে রসের সৃষ্টি করেন তাহাই ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে হাস্যরসের অবলম্বন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই স্থলে উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোকে আর একটি শব্দের লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'কুহকাৎ' স্থলে 'কুতুকাৎ' পাঠও দেখা যায়। তাহাতে অর্থ হয়, বিকৃত আকার প্রভৃতির দ্বারা যে কৌতুক উৎপন্ন হয় তাহাই হাস্যরস। বস্তুত হাস্যরসের সহিত কৌতুকের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

সাধারণ ভাবে দুঃখের সহিত আমোদের একটা প্রভেদ আছে। নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না।…কৌতুকের মধ্যেও নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে; সেই পীড়াটা অনতিঅধিক মাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা সুখকর উত্তেজনার উদ্রেক করে সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হাসিয়া উঠি। (৪)

বিরোধ কিংবা অসংগতি আকস্মিকতা অর্থাৎ যাহা কিছু কৌতুকজনক তাহাই হাস্যকর। এ বিষয়ে ইওরোপীয় পণ্ডিতগণও একমত। (৬)

যাহা স্বাভাবিক ও সংগত তাহার সহিত অস্বাভাবিক ও অসংগতের যে বিরোধ তাহাই হাস্যরসের মূল কারণ। (৭) সে হাস্যরস শব্দগতই হউক বা অর্থগতই হউক বা চরিত্রগতই হউক।

কি wit কি humour কি ব্যঙ্গ কি বিদ্রূপ হাস্যরসের যে কোনো শ্রেণীতেই এই সংগতি অসংগতির বিরোধটাই হইল মুখ্য কথা। wit-এর মধ্যে যে হাস্যরস তাহা তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বিদ্যুৎশিখার মত চকিত আলোকে বুদ্ধিকে বিচলিত উত্তেজিত করিয়া তুলে। সেই আকস্মিক উত্তেজনায় একপ্রকার দুঃখাবহ সুখের উদয় হয়। এই সুখ হাস্যরসের কারণ।

Humour এবং wit-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিবার পূর্বে বলা আবশ্যক যে humour শব্দটি বড় ব্যাপক। বাংলায় ইহাকে এক কথায় হাস্যরস বলা যায়। কিন্তু wit-এর সহিত তুলনা করিবার সময় ইহার অর্থ কিছু সংকীর্ণ হইয়া যায়। সে ক্ষেত্রে humour-কে উচ্চস্তরের humour বলা যায়। এই humour wit-এর মত বুদ্ধিকে তৃপ্ত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কেও প্রীত করে। বাহ্যিক বিদ্রূপের আবরণে ইহা অন্তরের সমবেদনাই প্রকাশ করে। মানুষের চরিত্র, মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অসামঞ্জস্য কতই আছে। (৮) সে অসামঞ্জস্য দেখিয়া কেহ তিরস্কার করে, কেহ ব্যঙ্গোপহাস করে আবার কেহ বা সস্নেহে একটু পরিহাস করে। উচ্চস্তরের humour এই স্নেহ পরিহাস।

সর্বশ্রেণী হাস্যরসের সহিত, শব্দের অর্থের কৌতুক কৌতূহলের সহিত যে প্রশস্ত হাস্যরসের সম্বন্ধ নাই তাহা নয়। wit প্রভৃতি অবরোহ শ্রেণীর হাস্যরস মহত্তর হাস্যরসের সোপান। অনেক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর হাস্যরস উচ্চতর হাস্যরসের অঙ্গভাবে—বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ—বাক্য ও অর্থের ন্যায় পরস্পর সংযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস এইরূপ। বাক্চাতুর্য আছে কিন্তু তাহা অর্থকে সার্থক করিবার জন্যই। বাক্য অর্থকে অতিক্রম না করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ ও সফল করিয়া তুলিয়াছে। কথা আছে কিন্তু তাহা ভাবকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য নহে, বহন করিবার জন্য।

সেক্সপীয়র সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন :

His humor, it is true, is everywhere, even the grimmest and wildest tragedies cannot keep it out; but if we are to look at it more closely, we must restrict ourselves to the broadly comic scenes and characters. (১০)

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও এই কথাটি খাটে। 'শেষের কবিতা' তাঁহার "ব্যঙ্গাত্মক রচনা"র একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হইতে পারে এবং "wit ও humour বাঁধাবাঁধির মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান আছে বলিলে প্রতিবাদ নাও করিতে পারি, কিন্তু অতদূর যাইব কেন? হাতের কাছে স্রোতস্বিনী থাকিতে সমুদ্রপারের সন্ধান করার প্রয়োজন কি? সুতরাং "চিরকুমার সভা" দিয়াই আলোচনা শুরু করা যাক।

'চিরকুমার সভা'র মূল তত্ত্ব লইয়া গুরুগম্ভীর গ্রন্থ রচনা করা চলে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' তাহার দৃষ্টান্ত।

"…কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে গিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।" (১১)

---

(৪) কৌতুকহাস্যের মাত্রা। পঞ্চভূত

(৬) Comic effect implies contradiction…and incongruity excites laughter.—Bergson.

Laughter is the result of an expectation, which, of a sudden ends in nothing.—Kant.

(৭) Humour thus grew to turn on a contrast between the thing as it is, or ought to be, and the thing smashed out of shape and as it ought not to be—Stephen Leacock

(৮) It reaches its real ground when it becomes the humour of situation and character. Stephen Leacock,—Humour,

(১০) Priestley, English Humour

(১১) 'জীবনস্মৃতি'

এই ভাবটাই 'মুক্তি' কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে :

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসী একদিন এই মুক্তির স্বাদ পাইয়া বাঁচিয়াছিল :

"যাক্, রসাতলে যাক্ সন্ন্যাসীর ব্রত।
দূর কর, ভেঙে ফেল দণ্ড কমণ্ডলু!
পাষাণ সঙ্কল্পভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার।"(১২)

'চিরকুমার সভা'র সন্ন্যাসীরাও প্রকৃতির সহিত বিরোধ করিয়াছিল। তবে তাহাদের এবং তাহাদের গুরুর বৈরাগ্য সাধনের উদ্দেশ্য ছিল দেশ-সেবা, নির্বাণলাভ নহে। এই পার্থক্য। উদ্দেশ্যটা এ ক্ষেত্রে গৌণ। উপায়টাই মুখ্য এবং উপায়টা যে উপায় নয় তাহাই উজ্জ্বল মধুরে চিত্রিত করা হইয়াছে।

প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। প্রতিপক্ষের দুর্বলতায় সেই অসম্ভাব্যতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। একজন শীর্ণদেহ ক্ষীণজীবী লোক যদি তাল ঠুকিয়া ব্যায়ামপুষ্ট বৃহৎকায় পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে যায়—তাহা হইলে কৌতুকের কারণ ঘটে। শ্রীশ বিপিন ও পূর্ণর 'চিরকুমার সভা'র সভ্য হওয়ায় সেই কারণের উদ্ভব হইয়াছে। সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন :

"যে চিরকুমারদের ব্রতভঙ্গ করিবার জন্য রম্ভার দরকার হয় না, শুধু স্ত্রীলোকের পানের বাটা বা রুমাল হইলেই চলে, তাহাদের পরাজয়ে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় তাহা উচ্চাঙ্গের নহে।" পুরাণে অপ্সরাদের দ্বারা মুনিঋষিদের তপোভঙ্গের বৃত্তান্ত পাঠ করা যায় কিন্তু তাহাতে হাস্যরসের—অপকৃষ্ট হাস্যরসেরও—সঞ্চার হয় বলিয়া তো জানি না। বলবানের সহিত বলবানের যে বিরোধ, সমানে সমানে যে দ্বন্দ্ব, তাহার মধ্যে অসংগতি কোথায়?

মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগর সারা জীবন ধরিয়া মনসার সঙ্গে বিরুদ্ধতা করিয়া শেষ পর্যন্ত যখন তাঁহার পায়ে ফুল দিতে বাধ্য হইলেন তখন হাসি পায়, না বেদনাবোধ হয়?

উৎকৃষ্ট হাস্যরসের মধ্যে যে আনন্দ তাহা বেদনাবিনির্মুক্ত নয় সত্য, কিন্তু সে বেদনার মাত্রা অল্প। যে বেদনায় হাসি পায়, মাত্রা বাড়াইতে থাকিলে তাহাই একসময়ে নয়নে অশ্রুসঞ্চার করে। চাঁদসদাগরের পরাজয়ে—সমবলের সহিত সমবলের বিবাদে অন্যতরের পরাজয়ে—বেদনার মাত্রা অধিক! চাঁদসদাগরের পরাজয় কৌতুকের নহে তাহা করুণার বিষয়। শ্রীশ বিপিনের পরাজয় তাহার বিপরীত বলিয়াই তাহা সকরুণ না হইয়া সকৌতুক হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ হাস্যরস যে রসে "laughter and tears become one" সে রস 'চিরকুমার সভা'র কোথায়?

প্রথমত পরাজয় জিনিসটাই করুণ। প্রকৃতির কাছে principle-এর পরাজয়—করুণার বিষয় সন্দেহ নাই। চিত্রাঙ্গদার কাছে ব্রহ্মচর্যব্রতধারী অর্জুনের সত্যভঙ্গে যে করুণতা আছে চিরকুমার সভার সভ্যদের ব্রত ভঙ্গেও তাহাই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান; তবে প্রথমটার মধ্যে গাম্ভীর্যের কারণ এই যে, সেখানে সমানে সমানে লড়াই। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে অসমানে অসমানে সংঘর্ষ। হাস্য ও করুণ উভয় রস এখানে অবিচ্ছিন্ন হইয়া সূক্ষ্মতর রসে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

'চিরকুমার সভা'র সভ্যদের পরাজয় অপেক্ষা সভাপতির যে পরাজয় তাহারই মধ্যে আঘাতের পরিমাণ অধিক। Humour-এর উৎকর্ষ এই স্থানেই বিশেষভাবে অনুভব করি। সযত্নপোষিত বহুদিনের মতটিকে পরিহাস করার মধ্যে তাঁহার দৃঢ়নিষ্ঠার অভাব লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং এই নিষ্ঠার অভাবই নাকি তাঁহাদের চরিত্রকে শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্র হইতে দেয় নাই। তবে কি নিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য আত্মহত্যা করিলেই চন্দ্রবাবুর চরিত্র "শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্রের সঙ্গে এক আসন পাইতে" পারিত?

'চিরকুমার সভা' সর্বতোভাবে কমেডি। এমন কি 'বৈকুণ্ঠের খাতা'ও সে হিসাবে ট্র্যাজেডি। বৈকুণ্ঠের লেখা ছাড়িয়া দেওয়ায় পাঠকের মনে আমোদ হয় না বরং বিষাদই দেখা দেয়। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার লেখা লইয়া লোকে হাস্য পরিহাস করে :

"আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিস! সবাই হাসে আমি কি তা জানি নে ঈশেন? ও সব রইল পড়ে। সংসারে লেখায় কারো কোনো দরকার নেই।"

বৈকুণ্ঠ তাঁহার বাতিক সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহার খেয়াল লইয়া লোকে হাস্য পরিহাস করে। কিন্তু চন্দ্রবাবু শেষ পর্যন্ত সে বিষয়ে অন্ধ। বাহিরের জগতে যেমন নিতান্ত নিকটের বস্তু ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান না অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও তেমনি। 'চিরকুমার সভা'র সভাপতি যথারীতি সভাতলে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া, সম্ভবত সভ্যদের ভোট লইয়া, চিরকুমারব্রত উঠাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। এদিকে ব্রত যে উঠিয়া গিয়াছে সে দিকে তাঁহার খেয়ালমাত্র নাই। যে ব্রত প্রস্তাবের অপেক্ষা না করিয়াই অন্তর্ধান করিয়াছে তাহাকে উঠাইবার জন্য সভ্যদের সহিত তুমুল তর্ক করিয়া শেষ পর্যন্ত যখন বুঝিলেন "তাহলে কুমারব্রত উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করাই বাহুল্য" তখনও তাঁহাকে হতাশ হইতে দেখি না। তাঁহার দৃষ্টিতে সভার ব্রত গেলেও সভাটি অক্ষুণ্ণ রহিল, বরং নূতন নিয়মে সভার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল।

কমেডির অনুরোধে চন্দ্রবাবুর মত পরিবর্তন আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চরিত্র পর্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝা যায় নাটকের অনুরোধে চরিত্রের বা চরিত্রের অনুরোধে নাটকের গৌরব কোথাও ব্যাহত করা হয় নাই।

আর যে মত পরিবর্তনের কথা বলা হইয়াছে তাহাই বা কিরূপ? তিনি "অম্লানবদনে" সভার নিয়ম শিথিল করিয়া দিলেন। কিন্তু কৌতুক যে এইখানেই। 'চিরকুমার সভা'টি ঠিকই রহিল শুধু সভার নিয়মাবলী হইতে কৌমার্যব্রতের নিয়মটি মাত্র তুলিয়া দেওয়া হইল।

চন্দ্রবাবু সংসারানভিজ্ঞ লোক। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু সেই উদ্দেশ্যসাধনের উপায়গুলি ব্যবহারিক জগতে অচল। "মাতৃভূমির উন্নতির জন্য ক্রমাগতই নানা মতলব তাঁহার মাথায় আসিতেছে।" "বিষয়কর্মে চন্দ্রবাবুর মত অপটু কেহ নাই কিন্তু তাঁহার মনের খেয়াল বাণিজ্যের দিকে।" তিনি ভারতবর্ষের দারিদ্র্যমোচনকেই সভার প্রধান কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে দারিদ্র্যমোচনের "আশু উপায় বাণিজ্য" এবং সেই বাণিজ্যের সূত্রপাত করিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করিয়া বলিলেন :

"মনে কর আমরা সকলেই যদি দিয়াশলাই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করি। এমন যদি একটা কাঠি বের করতে পারি যা সহজে জ্বলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহলে দেশে সস্তা দেশলাই নির্মাণের কোনো বাধা থাকে না।" এই প্রসঙ্গে জাপানে ও য়ুরোপে কত দিয়াশলাই প্রস্তুত হয়, কি ভাবে প্রস্তুত হয়, তাহারা কি কাঠ এবং কি কি মালমসলা ব্যবহার করে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিলেন।

তাহার পরে শ্রীশের বাসায় অকস্মাৎ সবেগে প্রবেশপূর্বক অর্ধঘণ্টা-কালব্যাপী যে বক্তৃতা করিলেন—শ্রীশের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও বসিবার সময় এবং বিলম্ব হইয়া গিয়াছে বলিয়া পূর্ণবাবুর কথায় কর্ণপাত

---

(১২) 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'

করার অবসর পাইলেন না—সেই বক্তৃতার কথা মনে করুন। ডাকাতি শিকার প্রয়োজন, আইনের ব্যবসায়ের আবশ্যকতা, গোঁফ দাড়ি ছেঁটে ইত্যাদি প্রভৃতি সংশোধনের চেষ্টা, চিরকুমার সভা বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িলে তাহাকে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা, ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ পুরাতন পুঁথি শিলালিপি তাম্রশাসন আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর ক্রমাগত প্রস্তাবের মুখে যে চন্দ্রবাবুকে দেখিতে পাই তাঁহার চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার humour এর সৃষ্টি করেন নাই? দ্বিতীয় উক্তিতে চন্দ্রবাবুর দেশোদ্ধারের আগ্রহ সম্বন্ধে আরও নূতন তথ্য পাওয়া যায়:

"কিন্তু তিনি তাঁর ডেপুটেশনের আশা ছাড়েননি। তিনি বলেন সমবায় কৃষিতত্ত্ব বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিখে আসবে আর গ্রামে গ্রামে তাহাদের শিখিয়ে বেড়াবে—এক টাকা করে শেয়ার নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক খুলে বড় বড় পল্লীতে নূতন নিয়মে এক একটা দোকান বসিয়ে আসবে—ভারতবর্ষের চারদিকে বাণিজ্যের জাল বিস্তার করে দেবে।"

অন্য চরিত্রের কথা যাহাই হউক কিন্তু চন্দ্রবাবুর কথায় wit এর কোনো স্থান নাই, পরন্তু মারপ্যাঁচ নাই। লেখক সেই humour সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে বিদ্রূপ থাকিলেও অসূয়া নাই, যাহা আঘাত করিতে গিয়া প্রশ্রয় দিয়া যায়।

চন্দ্রবাবু বাতিকগ্রস্ত মানুষ। কিন্তু তিনি কুমারীকে কুমারসভার সভ্য করিয়াছেন এবং অম্লানবদনে বিবাহকে চিরকুমার সভার principle করিয়া লইয়াছেন।" এবং সমালোচক মহাশয়ের মতে "প্রতিভার বাতিকগ্রস্ত লোকের ইহা লক্ষণ নয়।" ঠিক কি কি লক্ষণ থাকিলে খাঁটি বাতিকগ্রস্ত লোক বলা যায় তাহা জানি না, কিন্তু বাতিকের রূপ কি ধারাবাহিক হইবেই হইবে? আর সেই বাতিক সম্পূর্ণ নীরন্ধ্র না হইলেই হাস্যরস নির্দোষ হইবে না? উৎকৃষ্ট হাস্যরসের কি উহাই সর্বপ্রধান মানদণ্ড?

বাংলায় রসিক লোক বলিতে যাহা বুঝায় রসিক দাদা সত্যসত্যই সেইরূপ রসিক। অক্ষয় যে তাঁহাকে "সার্থকনামা" বলিয়াছেন সে কথা সত্য। কিন্তু তিনি যে শিষ্টসত্য রক্ষা করিবার জন্যই রসিকতা করেন ইহা কেহ স্বীকার করিবে না। তবে এই কথাটির মধ্যেই রসিকতা আছে। অন্তর যাহা চেষ্টা দ্বারা আর যাহাই আসুক হউক না কেন, রসিকতা নয়। "সেন্স" এবং "কমিক" মত রসিকতাও প্রকৃতির মধ্যে না থাকিলে কেহ টানিয়া বাহির করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব সুপরিস্ফুট। কবিতায় তাহার অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। আলোচ্য নাটকেও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব প্রচুর আছে।

রসিকদাদার চরিত্র আলোচনা করিতে গেলেই সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রোক্ত শৃঙ্গারসহায়গণের কথা মনে পড়ে।

শৃঙ্গারসহায়া বিটচেটবিদূষকাদ্যাঃ স্যুঃ।
ভক্তানর্মসু নিপুণাঃ কুপিতবধূমানভঞ্জনাঃ শুদ্ধাঃ॥ (১৩)

এই শৃঙ্গারসহায়কদের সাধারণ গুণ হইল এই,—ইহারা নায়কের অনুরক্ত, পরিহাসরসিক এবং শুদ্ধচিত্ত।

ইহাদের মধ্যেও আবার গুণভেদে শ্রেণীবিভাগ আছে। যাহারা সম্ভোগের দ্বারা বঞ্চিত, চতুর, কলাবিদ্যাতেও কিছু কিছু দক্ষ, সুবক্তা, মনোজ্ঞবেশকুশলী এবং গোষ্ঠীতে সর্বজনপ্রিয় তাহাদের নাম বিট।

সম্ভোগহীনসম্পদ্ বিটস্তু ধূর্তঃ কলৈকদেশজ্ঞঃ।
বেশোপচারকুশলো বাগ্মী মধুরোঽথ বহুমতো গোষ্ঠ্যাম্॥ (১৪)

আর এক শ্রেণীর শৃঙ্গারসহায় হইল বিদূষক!

কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্মজ্ঞঃ॥ (১৫)

পুষ্প বসন্ত প্রভৃতির নামে তাহার নাম হইবে, সে কর্ম বপু বেশ ভাষা প্রভৃতির দ্বারা হাস্যোৎপাদন করিবে, কলহপ্রিয় এবং ভোজনে পটু হইবে।

বিট বিদূষকের অনেকগুলি গুণ লইয়া রসিকচরিত্র পরিকল্পিত, যদিও শাস্ত্রমতে রসিক বিটও নহেন বিদূষকও নহেন। তিনি কোনো নায়কের শৃঙ্গারে সহায়তা করিতেছেন না।

শৃঙ্গারসহায় নায়কের অনুরক্ত হইবে। রসিক যে কাহার অনুরক্ত নন তাহা বলা কঠিন। তিনি পরিহাসরসিক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তিনি যে শুদ্ধচরিত্র তাহাও সংশয়াতীত। তিনি দরিদ্র বটেন কিন্তু টাকা উড়াইয়া দরিদ্র হন নাই, তিনি চতুর, মনোজ্ঞবেশকুশলী, গোষ্ঠীতে সর্বজনপ্রিয়, সুবক্তা। তিনি কৌতুকবচনে শ্রোতার হাস্য উৎপাদনে সমর্থ। এই সদানন্দ বৃদ্ধের অন্তরটি যেমন সুন্দর বাহিরটিও তেমনি। সমস্ত অবস্থাবিপর্যয়ের তিরস্কার সহিয়াও তাঁহার মুখের প্রফুল্লতা মলিন হইতে পায় না। তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং চরিত্রমাধুর্যে সমগ্র নাটকটি বিশুদ্ধ হাস্যরসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

নৃপ ও নীর শকুন্তলার অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। "নৃপ শান্ত স্নিগ্ধ, নীর তাহার বিপরীত, কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্বদাই আন্দোলিত।" নৃপর গম্ভীরতা এবং সারল্যের পটভূমিকায় নীরর কৌতুকচপল চরিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনসূয়া প্রিয়ংবদা শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের মিলন ঘটাইয়াছিল। কিন্তু এখানে তাহারাই এক রকম নায়িকার আসন দখল করিয়াছে (অবশ্য নায়িকা বলিয়া যদি কাহাকেও ধরা যায়)। সুতরাং দূতীবৃত্তি তাহাদের দ্বারা চলে না। সে কাজটা রসিকদাদার দ্বারাই সম্পাদিত হইল এবং সুরসিক অক্ষয়েরও তাহাতে অনেকখানি হাত ছিল।

মৃত্যুঞ্জয় ও দারুকেশ্বরের এই দুইটি চরিত্রের মধ্যে যে বিদ্রূপ আছে তাহার মধ্যে করুণা অপেক্ষা বিদ্বেষ অধিক। ভণ্ডামির প্রতি, মূঢ়তার প্রতি, চারিত্রিক দীনতার প্রতি কবির তীব্র কশাঘাত বহন করিবার জন্য ইহাদের আবির্ভাব। অসংগতি ইহাদের চরিত্রেও আছে আবার চন্দ্রবাবুর চরিত্রেও আছে। কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি এক নহে। চন্দ্রবাবুর খেয়াল দেখিয়া যে হাসি পায় তাহার সহিত বেদনার এবং এই দুইটি বিবাহার্থীর চরিত্র যে হাস্যের উদ্রেক করে তাহার সহিত কিছু নিষ্ঠুরতার যোগ আছে। হাস্যরসের মধ্যে যদি শ্রেণীভেদ করিতে হয় তো এই ক্ষেত্রে তাহার সুযোগ আছে।

হাস্যোদ্দীপক চরিত্র বলিতে যাহা বুঝি শৈলবালার চরিত্র ঠিক সেরূপ নহে, কিন্তু তাহার কথায় বার্তায় কার্যকলাপে রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সুগভীর করুণার সহিত এই রসিকতার অপূর্ব সম্মিলনে একটি পরম রমণীয় নূতন রসের উৎপত্তি হইয়াছে।

শৈলবালার চরিত্র সরল অথচ সুগভীর। বাল্যবিধবা শৈলবালার অন্তরালে করুণার অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা প্রবহমান, কিন্তু তাহার বহিরঙ্গের প্রফুল্লতা উপর হইতেও টের পাওয়া যায়। অশ্রুবিন্দুর উপরে আলো পড়িলে তাহাও উজ্জ্বল দেখায়। শৈলবালার উজ্জ্বলতাও বুঝি সেইরূপ। কিন্তু সে নিজে যেমনই হউক নাটকটির মিলন মধুর পরিণতিসম্পাদনে তাহার অংশ নিতান্ত কম নয়। অক্ষয় রসিকদাদা স্বাভাবিক বেশভূষায় যে হাসি হাসাইয়াছেন শৈলর পুরুষবেশ আমাদের সেই উচ্চহাস্য উদ্দীপন করিতে পারে নাই কিন্তু সমস্ত প্রহসনের মধ্যে উচ্চতর হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে এই শৈল। অন্য চরিত্রের বহিরাবরণে তাহাকে শেষ পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখে। সে খেলা সারিয়া খুশী মনে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পূজায় বসে।

উচ্চতর হাস্যরস নির্দিষ্ট সীমা পার হইলে অশ্রুর উদ্রেক করে। হাস্যরসের আলোচনা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। অতএব পাঠকের অশ্রুর আশঙ্কা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর সত্ত্বেও লেখনী সংযত করিতে হইল।

---

(১৩) সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ, কারিকা ৭৭

(১৪) " " " ৭৮

(১৫) সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ কারিকা ৭৯

তরুণ শিল্পী কিশোরী রায়

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

শিল্প সমালোচকেরা সাধারণতঃ খ্যাতি-সম্পন্ন শিল্পীদের সম্বন্ধে লিখিয়া থাকেন, তাহাতে সুবিধা আছে—ভুল হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়াও তো শিল্পী থাকিতে পারে, যারা জনসাধারণের মধ্যে তেমন পরিচিত নহেন। অজ্ঞাতবাস তরুণ শিল্পীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অনেক সময় তাঁহারা নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশ করার সুযোগ পান না। অনেক তরুণ শিল্পীই অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যান। তাঁহাদের সুযোগ দেওয়া উচিত, যাহাতে তাঁহারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজেদের শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হন।

শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য

ফকির

গ্রাম চিত্র

নতুন শিল্পীদের প্রকাশ করিতে কিন্তু সাহস, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন হয়। নতুনদের উৎসাহিত করার সার্থকতা আছে। শিল্পসমালোচকদের যেমন কর্ত্তব্য তাহাদের সম্বন্ধে জনসাধারণকে জানানো, তেমনি শিল্পের পৃষ্ঠপোষকদেরও কর্ত্তব্য তাহাদের কাজ দিয়া টানিয়া তোলা। এঁরাই ভবিষ্যতে একদিন বড় আর্টিষ্ট হইবেন।

ছাত্রদের ভিতরে মাঝে মাঝে প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পী দেখিতে পাই, যতদিন তাহারা শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষা করেন, প্রচুর কাজ করিয়া যায়, কিন্তু বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া গেলে দেখিতে পাই, তাহাদের শক্তি ক্রমশঃ ম্লান হইতে

থাকে। তাহাদের দল, কল্প-প্রচেষ্টা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, কিন্তু সব সময় তাহা হয় কি !

কিশোরী রায় নামে যে তরুণ শিল্পীর পরিচয় দিতেছি ইনি ১৯৩১ সনে গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্ট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁহার কাজ দেখিয়াছি, তখনি তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। (ছাত্রজীবনে তিনি কাজের উৎকর্ষতার জন্য ছাত্রবৃত্তি ও পারিতোষিকলাভ করিয়াছেন) সম্প্রতি তাঁহার কাজ দেখিয়া আনন্দলাভ করিলাম। তৈলচিত্রে তিনি পারদর্শী, অনেক পোর্ট্রেট, পেন্টিং তিনি করিয়াছেন। রং ফলাইবার ক্ষমতা আছে। প্রতিকৃতিতে ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। সর্বাপেক্ষা

বালিকা

বালক

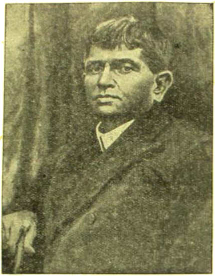

পালকিয়া স্কুলের হেডমাষ্টার

কিশোরী রায়

[illegible] বরোদা রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্যের মূর্তি। ইহা এখন বরোদার ষ্টেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। নর্ত্তকীর মূর্তি অনবদ্য ছবি। আলো-ছায়ার খেলায় বিভিন্ন রং এর সমাবেশে ছবিটি [illegible] করিয়াছে। বালকের মূর্তিতে এবং বালিকার মুখের হেড স্টাডির চিত্রে প্রতিকৃতি অঙ্কনের বৈশিষ্ট্য আছে। বালকের মূর্তিতে বালসুলভ সরলতা প্রকাশ পাইয়াছে। বালিকার মূর্তি যেমন তুলি: উভয় অঙ্কনের উদাহরণ।

বাল্যবয়সে কিশোরীবাবু স্যার এন্. এন্. সরকারের ও প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতিকৃতি আঁকিয়াছিলেন। খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত ও. সি. গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার কাজ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

চিত্রকরের নিজের প্রতিকৃতি (self portrait) সুন্দর হইয়াছে। কিশোরীবাবু ম্যুরাল পেন্টিংএও পারদর্শী। শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরীর আনুকূল্যে রক্সি সিনেমা, চিত্রা সিনেমা ও [illegible] রাজপ্রাসাদে তিনি ম্যুরাল পেন্টিং করিয়াছেন।

ম্যুরাল পেন্টিং

উত্তরপাড়া গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল ও কলিকাতা হিন্দুস্কুলে তিনি কিছুদিন ড্রয়িংএর শিক্ষকতা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি [illegible] স্কুলে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কোকিল ও গাধা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

[রুশ গাথাকার ইভান্ ক্রাইলভ হইতে]

বন-পথে কোকিলকে দেখি কয় গাধা,—
"দেখা পেয়ে হলো ভালো, বলো দিকি দাদা,
লোকে বলে, দাদা তুমি গান গাও না কি !
সত্য কথা ? না, ও শুধু লোকের চালাকি ?
জানি তো জগতে খ্যাতি— শুধু চাটু-স্তুতি !
গান গাও, শুনি— তুষ্ট হয় কিনা শ্রুতি !"

কোকিল ধরিল গান,—কণ্ঠে কিবা তার
কল-সুর বহু,—বাকী রহিল না আর !
আকাশ ছাপিয়া ওঠে কোকিলের গানে—
বিভোর হইল নদী ভুলি কল-তানে !
কুঁড়ি যত কুঁড়ি হয়ে রয়ে গেল বনে—
ফুল হয়ে ফুটিবে যে, রহিল না মনে !
বাতাস বহিতেছিল, হইল নিথর—
মৌন-মুখ যত পাখী শাখার উপর !
মেষ-চরা মাঠে থামে রাখালের বাঁশি—
বিহ্বল রাখালী গানে দাঁড়াইল আসি !

কোকিলের কণ্ঠে জাগে যে সুর-মূর্চ্ছনা
মুগ্ধ তার নিখিলের সকল চেতনা !

গান থামে। গাধা নেড়ে কয় তবে মাথা,—
"মন্দ খুব লাগিল না তব সুর দাদা !
কিন্তু তুমি শুনেছো কি কণ্ঠ মোরগের !
বাসা যার—[illegible]
গ্রীবা তুলে ঠোঁট খুলে গলা যবে খোলে—
শোনো যদি, বুঝিবে সে গান কারে বলে !
গলা তব আছে মানি, কেরামতি নাই !
সেটুকু শিখিতে হবে মোরগের ঠাঁই।"
নিঃশব্দে গাধার কথা কোকিল শুনিল—
তার পর উড়ে গেল—জবাব না দিল !

কবি কহে, আমাদের করো ভগবান,
হেন সমালোচকের হাত থেকে পরিত্রাণ !

সুফিবাদের উদারতা

এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ (কেন্টাব), বার-এট্-ল

জীবনের প্রধান কাম্য হচ্ছে সত্য-স্বরূপ, প্রেম-স্বরূপ বিশ্বপ্রভুর সঙ্গে মিলন। তিনি কিন্তু থাকেন সমস্ত পর্দার অন্তরালে—আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বহুদূরে। অথচ সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে, অতি ক্ষীণ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে আমাদের তাঁর দিকে অগ্রসর হতে হবে। তিনি থাকেন যেমন সীমার ওপারে, তাঁর কাছে যাবার পথও তেমনি সংখ্যাতীত। যে কোন পথ বেয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হবে, তা নির্ভর করে তার মনের উপর, তার সংস্কৃতির উপর, তার সুযোগ সুবিধার উপর, তার পারিপার্শ্বিকতার উপর, তার মনের, তার চিত্তের বৈশিষ্ট্যের উপর। বিভিন্ন কৃষ্টির সংঘাতের ফলে সুফিবাদের জন্ম। সুফিরা স্বভাবতঃই তাই এই মূল্যবান সত্যটিকে অতি স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই তাঁরা সর্বধর্মের প্রতি, সর্ব-কৃষ্টির প্রতি, আর মানব চরিত্রের এবং সভ্যতার সর্ববিধ বিকাশের প্রতি একান্ত উদার সহানুভূতির ভাব পোষণ করতেন, কেন না তাঁরা ভাল করেই জানতেন যে পথ বিভিন্ন হলেও সত্যের যাঁরা প্রকৃত সাধক, সত্য স্বরূপের যাঁরা প্রকৃত ভক্ত, লক্ষ্য সব তাঁদের অভিন্ন। এও তাঁরা অতি স্পষ্ট করেই জানতেন যে আমাদের যাত্রাপথ অতি দীর্ঘ, অন্তহীন। যতই চলি না কেন, চলার আমাদের শেষ নাই। সুতরাং নিত্য নূতন পাথেয় নিয়ে, নিত্য নূতন উদ্যমে আমাদের অগ্রসর হতে হবে সীমার অতীত অপরূপ, অচিন্তনীয় এক আনন্দলোকের উদ্দেশে। কোন নির্দিষ্ট এক অবস্থায় উপস্থিত হয়ে, বিশেষ কোন মনজিলে পৌঁছে একথা বলবার অধিকার, যে যাত্রা আমাদের শেষ হয়েছে, নূতন পথের সন্ধান আর আমাদের করতে হবেনা—কখন আমরা পাবনা। একটা সরাইখানায় এসে পৌঁছলেই আর একটা সরাইখানা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। প্রকৃত তীর্থ যাত্রীকে দুর্দমতা নিয়ে নূতন উদ্যমে আবার অগ্রসর হতে হবে। সুফিদের এই দৃষ্টি ভঙ্গী অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে সুফিশ্রেষ্ঠ জালাল-উদ্দীন রুমীর মূসা এবং মেষ পালকের উপাখ্যানে :

মূসা পথের ধারে এক মেষ-পালককে দেখতে পেলেন ; সে তখন প্রার্থনায় রত ছিল।

খোদাকে সম্বোধন করে সে বলছিল, হে খোদা, হে প্রভু আমার, কোথায় তুমি ? আমি যে তোমার সেবা করতে চাই ! তোমার জুতা আমি সেলাই করতে চাই ! প্রভু হে আমার।

তোমার প্রেমেই এই জীবনকে আমি উৎসর্গ করেছি ! আমার সন্তান-সন্ততি, আমার গৃহ, আমার সংসার সবই তোমার প্রেমে উৎসর্গিত !

প্রভু হে, কোথায় তুমি ?

আমি যে তোমার কেশ বিন্যাস করবার জন্য লালায়িত ! তোমার পাদুকার সংস্কার করতে চাই, তোমার ছিন্ন বস্ত্র তালি দিতে চাই ! তোমার গায়ের জামা সেলাই করতে চাই, তোমার মাথার উকুন মারতে চাই !

হে মহামহিম প্রভু আমার ! তোমার জন্য আমি দুগ্ধ সরবরাহ করতে চাই। অসুখে বিসুখে একান্ত আপন জনের মত তোমার আমি সেবা করতে চাই, তোমার হাতে আমি চুমো দিতে চাই, তোমার পা টিপে দিতে চাই, তোমার শয়নের জন্যে আমি শয্যা প্রস্তুত করতে চাই !

তোমার বাড়ীটি একবার যদি দেখতে পাই, রোজ দুবেলা তা হলে তোমার জন্য দুধ আর ঘি এনে দিই ! পনির, পাটা, চিনি-পাতা দই, আঙ্গুর, বিরিয়ান, এইসব উপাদেয় খাদ্য তোমার জন্য তাহলে আমি প্রস্তুত করি !

আমার কাজ কি জান !

যত রকম উপাদেয় আহার্য আছে সব তোমার জন্য সংগ্রহ করা !

আর তোমার কাজ কি জান ?

তৃপ্তির সঙ্গে সে সব আহার করা !

আমার যত মেষ ছাগল প্রভৃতি আছে সবই তোমার জন্য উৎসর্গিত !

হে প্রেমাস্পদ, তোমার চিন্তায় দুই চক্ষু বেয়ে আমার অশ্রুর ধারা অবিশ্রান্ত বয়ে যাচ্ছে।"

মেষ পালক অনর্গল এই ভাবে প্রলাপ বকে যাচ্ছিল। মহাপুরুষ মূসা তাকে সম্বোধন করে বললেন, "কাকে উদ্দেশ্য করে এসব তুমি বলছ ?"

মেষ পালক বললে "যিনি আমার স্রষ্টা, যিনি আকাশ এবং পৃথিবী রচনা করেছেন, তাঁর কাছেই আমার প্রাণের কথা নিবেদন করছি।"

মূসা বললেন "তুমি একটা অপোগণ্ড মূর্খ ! এত আত্মনিবেদন নয়, এ যে নির্বোধের প্রলাপ ! একান্ত ধর্মগর্হিত আচরণ, অর্বাচীনের অর্থহীন বাচালতা !

জুতা আর মোজা এসব তো মানুষের ব্যবহারের জন্য। সত্যের যিনি উজ্জ্বল আধার, তাঁর প্রতি এই সব দৈহিক প্রয়োজন আরোপ করা যায় না।

সাবধান, তোমার এই বাচালতা যদি বন্ধ না কর, তোমার রসনা যদি সংযত না কর, খোদার রোষের আগুন তাহলে আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদের এই পৃথিবীকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করবে।

খোদাকে সত্যই যদি তুমি বিশ্বের মহাপ্রভু বলে বিশ্বাস কর, তা'হলে তাঁর বিরুদ্ধে এই সব অসংগত প্রলাপোক্তি করবার দুঃসাহস তোমার হয় কি করে ?

ওরে হতভাগ্য ! বিশ্বের যিনি মহাপ্রভু তোর এই অর্থহীন বন্দনার তাঁর কোন প্রয়োজন নাই। তুই কি মনে করিস, চাচা কিম্বা মামুর সঙ্গে তুই কথা বলছিস !

মহামহিম খোদার প্রতি দেহরূপ সীমাবদ্ধ স্থূল গুণের আরোপ করা, দৈহিক প্রয়োজনাদির আরোপ করা কত বড় অন্যায় !

দুধ সেই পান করে, যাকে শরীর পালন করতে হয়, জুতার প্রয়োজন তার—পা না হলে যে হাঁটতে পারে না !

হাত পায়ের প্রয়োজন আমাদের অবশ্য আছে, কিন্তু খোদার প্রতি এসব আরোপ করলে তাঁর পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয় !

'তিনি কারও পিতা নন, কেউ তাঁর পিতা নয়' খোদার প্রতি এই ভাবের উক্তিই শোভন ! পিতা এবং পুত্র উভয়েরই তিনি স্রষ্টা ! দেহধারী জীবের জন্য অন্নের প্রয়োজন ! আর দেহধারী জীব হল ভবনদীর এপারের জিনিস !

যে জন্মায়, সে মৃত্যুর অধীন ! সীমার বন্ধনে সে আবদ্ধ ! তার আবির্ভাব সময় সাপেক্ষ ! তার জন্য প্রয়োজন স্রষ্টার, তার জন্য প্রয়োজন হেতুর, কার্য্যকারণের !"

মূসার ভৎ'সনা শুনে মেষ পালক কুণ্ঠাকাতর কণ্ঠে বললে, "হে মূসা ! সত্যই তুমি আমার মুখ বন্ধ করলে ! অনুশোচনায় অন্তর আমার এখন ভারাক্রান্ত।"

গভীর অনুতাপে আর তীব্র মর্ম-যাতনায় মেষ পালক তার সাজোবাস ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেললে, ঘন ঘন সে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলো ! তার পর এক দৌড়ে সেই অন্তহীন প্রান্তরে সে অদৃশ্য হল !

ভক্তের লাঞ্ছনায় বিশ্বপ্রভুর অন্তর বিচলিত হল। মুসাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—

"আমার ভৃত্যকে কেন তুমি আমার কাছ থেকে তাড়ালে? মিলন স্থাপন করবার জন্য তোমায় আমি পাঠিয়েছি, বিচ্ছেদের সৃষ্টি করবার জন্য পাঠাইনি! যতদূর সম্ভব বিভেদ এবং বিচ্ছেদ পরিহার করবে, কেননা বিভেদ আর বিচ্ছেদই হল আমার কাছে সব চেয়ে ঘৃণ্য!

প্রত্যেককে আমি তার নিজস্ব স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছি, আত্মপ্রকাশের জন্য প্রত্যেককে তার নিজস্ব ভাষা দিয়েছি!

অন্যে যাকে প্রশস্তি বা মঙ্গলাচরণ বলে মনে করে, তুমি তাকে বল অপবাদ: অন্যে যাকে মধু বলে মনে করে, তুমি তাকে বল বিষ!

অন্যে যাকে খোদার নূর বা জ্যোতি বলে মনে করে, তুমি তাকে আগুন বল; অন্যে যাকে গোলাপ বলে, তুমি তাকে বল কণ্টক!

অন্যে যাকে কল্যাণ বলে, তুমি তাকে বল অকল্যাণ! অন্যে যাকে বলে ভাল, তুমি তাকে বল মন্দ!

তোমাদের পবিত্রতা এবং অপবিত্রতা উভয়, থেকেই আমি মুক্ত; ক্রোধ এবং চাতুরী উভয় থেকেই আমি মুক্ত!

নিজের লাভের জন্য এ বিশ্ব আমি সৃষ্টি করিনি; ভৃত্যদের উপর করুণা বর্ষণের জন্যই বিশ্বের সৃষ্টি!

সিন্ধবাসীকে হিন্দবাসীর ভাষা বলতে বাধ্য করো না; আর হিন্দবাসীকে সিন্ধবাসীর ভাষা বলতে বাধ্য করো না!

মানুষের স্তবস্তোত্রের ফলে আমি পবিত্রতা লাভ করি না; এসবের ফলে তাদেরই অন্তর পবিত্র হয়; মুক্তার ধারা বর্ষণ করতে থাকে!

মানুষের বাইরের আবরণ আমি দেখি না, তার মুখের কথায় আমি প্রতারিত হই না; আমি দেখি তার অন্তর, অন্তর দেখেই আমি বিচার করি!

যে সত্যই অনুতাপের আগুনে দগ্ধ তার অন্তর আমি দেখতে পাই, মুখের ভাষা তার সে অনুতাপ প্রকাশ করুক আর নাই করুক, কিছু তাতে আসে যায় না।

অন্তরই হচ্ছে আসল জিনিস; ভাষা তার বাহ্যিক আবরণ মাত্র! আবরণ হল আপেক্ষিক (relative) জিনিস; আসল দেখবার জিনিস হল সত্তা—মূল বস্তু!

রূপক, কথার জাল, প্রহেলিকা আর কুহেলিকা—এসব নিয়ে কত দিন চলবে? আমি চাই প্রাণের অনন্ত প্রবাহ; তারই সঙ্গে তুমি সম্প্রীতি স্থাপন কর!

মানুষের প্রাণে প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দাও। কল্পনা-জল্পনা, তর্কাতর্কি, কথার মারপ্যাঁচ সব সেই আগুনে পুড়িয়ে ফেল!

হে মুসা! বিবেকী সংযত লোকেরা হল এক দল, আর বিদগ্ধপ্রাণ উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকেরা হল আর একদল!

প্রেমিককে সর্বক্ষণ দগ্ধ হতে হয়; যে পল্লী জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তার জন্য সব খাজনা মাফ! প্রেমিক ভুল বকলেও তাকে ভ্রান্ত বলো না! তার পাপ যে শত পুণ্যের চেয়ে কাম্যতর! যে সন্তরণে ব্যস্ত, তার জন্য পাদুকার কি প্রয়োজন?

যারা মাত (ভাব-বিভোর) তাদের কাছ থেকে শরাশরিয়তের পথে চলার আশা করো না!

প্রেমের ধর্ম হচ্ছে সব ধর্ম থেকে ভিন্ন, প্রেমিকের ধর্ম, প্রেমিকের পথ, সেত খোদা ছাড়া আর কিছু নয়! দুঃখের সমুদ্রে প্রেম পরমানন্দে সন্তরণ করে বেড়ায়!"

সত্যস্বরূপ খোদার ভর্ৎসনা শুনে মুসা মেষ পালকের সন্ধানে প্রান্তরের দিকে দৌড়লেন। তাঁর পদচিহ্ন তন্ন তন্ন করে সেই প্রান্তরে তিনি খুঁজতে লাগলেন।

প্রেমিকের পদচিহ্ন সাধারণ মানুষের পদচিহ্ন থেকে ভিন্ন। সহজেই তা চেনা যায়!

এক পা তাঁর দাবার ছকের ঘোড়ার মত একে বেঁকে যায়; আর এক পা সেই ছকের হাতির মত এক কোণ থেকে বিপরীত কোণের দিকে যায়। কখনও সে পা সমুদ্রের ঢেউএর মত মাথা উঁচু করে অগ্রসর হয়, আবার কখনও মৎস্যের মত পেটের উপর ভর করে চলে! নিজের চলার কাহিনী কখনও আবার সে মাটির উপর লিখে লিখে যায়, বালকবালিকারা মাটির উপর যেমন ছবি আঁকে, ঠিক সেইভাবে। কখনও পরিশ্রান্ত হয়ে সে দাঁড়ায়, কখনও ঊর্ধ্বশ্বাসে সে দৌড়তে থাকে; কখনও আবার মাটির আঘাতে গড়িয়ে চলে, ঠিক একটা বলের মত!

খুঁজতে খুঁজতে উদ্‌ভ্রান্তের সন্ধান শেষে তিনি পেলেন। পরমানন্দে তাকে অন্তরের অভিনন্দন জানিয়ে মুসা বললেন: বন্ধুবর, মহা সুসংবাদ তোমার জন্য এনেছি। ইচ্ছামত চলবার অনুমতি খোদা তোমাকে দিয়েছেন। শরার পদ্ধতির অনুসরণ করবার প্রয়োজন তোমার আর নাই। বিধি নিষেধের বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত! ভাব-বিভোর প্রাণ তোমার যা চায়, তাই তুমি বলতে পার?

তোমার ধর্মদ্রোহিতা—সেই হল প্রকৃত ধর্ম!

তোমার অন্তরের নিজস্ব আলো—সেই হল ধর্মের অনাবিল উৎস! প্রকৃত শান্তির সন্ধান তুমিই পেয়েছ; তোমার সাধনার বলেই বিশ্ব ধর্ম-রাজ্য বিরাজ করছে!

হে মুক্ত মানব, তুমি খোদার মহিমার অপূর্ব এক নিদর্শন! অকাতরে বলে যাও যা বলতে চাও; অকাতরে করে যাও যা করতে চাও!"

মেষ পালক বললেন "হে মুসা! ওসব ছেড়ে আমি এখন বহুদূরে চলে এসেছি। হৃদয়ের বিগলিত রক্তে সর্বাঙ্গ আমার লাল হয়ে গেছে।

আমি 'সাদরাতুল মানতাহা' (ইন্দ্রিয়াতীত বিশ্ব) অতিক্রম করে এসেছি। সে বিশ্ব ছেড়ে দীর্ঘ এক বৎসরের পথ আমি চলে এসেছি!

তোমার চাবুকের আঘাতেই আমার ভাবের ঘোড়া দৌড়তে শুরু করেছিল। লাফ দিয়ে আকাশ ডিঙিয়ে বহুদূরে এখন সে চলে এসেছে!

আমার বর্তমান অবস্থা বর্ণনার অতীত! ভাষা আমার মনের ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম!"

এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে রুমী বলেছেন: সুরের শিল্পী বাঁশিতে যে সুর তোলে সে হচ্ছে বাঁশির শক্তি অনুযায়ী! শিল্পীর অন্তরে যে সুরের খেলা চলেছে বাঁশী তার সন্ধানও পায় না!

হে পাঠক, তুমি খোদার যে বন্দনা গান কর, তাঁর বিষয় যে সব স্তব-স্তুতি কর, সে সব মেষ-পালকের স্তব-স্তুতির মতই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর।

মেষ পালকের বন্দনার চেয়ে তোমার বন্দনা ভাল হতে পারে বটে, কিন্তু খোদার যোগ্য মোটেই নয়! তোমার বন্দনাও মেষ পালকের বন্দনার মতই রূপক আর কল্পনার আবিলতায় ভরপুর! পর্দা যখন সরে যাবে, তুমি তখন বলে উঠবে, "মানুষ যা ধারণা করেছিল, এত তা নয়।"

রুমী হলেন সুফিবাদীদের মুখপাত্র। কোরান ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ রুমীর মসনবীর মত প্রভাব মোসলেম-জগতে বিস্তার করতে পারেনি। যে উদার মনোভাব রুমীর চিন্তা মধ্যযুগের মোসলেম জগতে প্রবর্তন করেছিল তার ফল ভারতের মুসলীম রাষ্ট্রীয় জীবনেও দেখা দিয়েছিল, আর ভারতের হিন্দু মুসলিমের সাধারণ সভ্যতাকেও সে ভাব বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। মধ্যযুগের সুফিসম্প্রদায় প্রভৃতি সকলেই ছিলেন রুমীর মানস সন্তান। ভারতের মুসলমান ভূপতিরাও ভাবের এবং আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে তাঁর একাধিপত্য স্বীকার করতেন। সুতরাং রুমীর ভাব এবং চিন্তাধারা বিশেষভাবে আমাদের প্রণিধান যোগ্য। বক্ষ্যমান উপাখ্যানে আমরা রুমীর মূল আদর্শগুলি অতি স্পষ্ট করে দেখতে পাই।

এই উপাখ্যানে মুসাকে সম্বোধন করে বিশ্বপ্রভু বললেন: "আমার ভক্তকে কেন তুমি আমার কাছ থেকে তাড়ালে? মিলন স্থাপন করবার জন্য তোমায় আমি পাঠিয়েছি, বিচ্ছেদের সৃষ্টি করবার জন্য পাঠাইনি। যতদূর সম্ভব বিভেদ এবং বিচ্ছেদ পরিহার করবে, কেননা, বিভেদ এবং বিচ্ছেদই হল আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য!" বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মিলনের পথ খুঁজে বের করা, তাদের বিরোধ দূর করা, তাদের ঐক্যের সূত্রগুলিকে পরিস্ফুট করে তোলা, এই ছিল মধ্যযুগীয় সুফিবাদের প্রধান লক্ষ্য। এ আদর্শ পরিপূর্ণভাবে ভারতের বাস্তব জীবনে প্রবেশ করেছিল মহাপ্রাণ সম্রাট আকবরের শাসনে।

বিশ্বপ্রভু আরও বললেন: "প্রত্যেককে আমি তার নিজস্ব স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছি; আত্মপ্রকাশের জন্য প্রত্যেককে তার নিজস্ব ভাষা দিয়েছি। যা একের প্রশংসা ও স্তবস্তুতি বলে মনে করে, তুমি তাকে বল অপবাদ; যা একে মধু বলে মনে করে, তুমি তাকে বল বিষ!

• • • •

হিন্দবাসীকে হিন্দবাসীর ভাষা বলতে বাধা করো না; আর সিন্ধবাসীকে সিন্ধবাসীর ভাষা বলতে বাধা করো না।"

গোঁড়া শরিয়তপন্থী আলেমগণ বিভিন্ন মানবের স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতেন না। বিভিন্ন আদর্শের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা স্বীকার করতেন না। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সত্য থাকতে পারে সে কথাও তাঁরা স্বীকার করতেন না।

মধ্যযুগে মুসলমানেরাই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি, এসিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিস্তৃত এক ভূখণ্ড মুসলমানদের শাসনাধীনে ছিল। গোঁড়া ধার্মিকেরা যদি তখন একচ্ছত্র আধিপত্যের সুযোগ পেতেন তাহলে মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রসমূহে আধ্যাত্মিক অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াত তা সহজেই অনুমেয়। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে রুমী, প্রমুখ সুফিদের উদার ভাবধারাই মধ্যযুগে সভ্যতার আদর্শকে রক্ষা করেছিল। সুফিবাদ যে এইভাবে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

খোদা মুসাকে সম্বোধন করে বললেন: মানুষের উপাসনার ফলে আমি পবিত্রতা লাভ করি না; এদের ফলে তাদেরই আত্মা পবিত্র হয়, মুক্তার ধারা বর্ষণ করতে থাকে।

মানুষের বাইরের আবরণ আমি দেখি না; সুন্দর কথায় আমি প্রভাবিত হই না। আমি দেখি তার অন্তর—অন্তর দেখেই আমি বিচার করি:

• • • •

অন্তরই হচ্ছে আসল জিনিস, ভাষা তার বাহ্যিক আবরণ মাত্র। আবরণ হল আপেক্ষিক জিনিস (Relative); আসল দেখবার জিনিস হল সত্তা—মূল বস্তু!

• • • •

রূপক, কথার জাল, অলংকার আর কুহেলিকা—এ সব নিয়ে আর কত দিন চলবে? আমি চাই প্রাণের অনন্ত প্রবাহ; তারই সঙ্গে তুমি সম্প্রীতি স্থাপন কর! মানুষের প্রাণে প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিও। জল্পনা কল্পনা, তর্কাতর্কি, কথার মারপ্যাঁচ সব সেই আগুনে পুড়িয়ে ফেল!"

প্রত্যেক ধর্মের, প্রত্যেক সভ্যতার পতন হয় যখন মানুষ প্রাণের অনন্ত প্রবাহ ছেড়ে বাইরের আচারের চিন্তায়, ক্রিয়া-কর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করে। সুফি আদর্শের আবির্ভাবের সময় মুসলিম সভ্যতা এই দুর্যোগ সংকটেই এসে উপনীত হয়েছিল। সুফিরা মানুষকে আবার সত্যের অব্যাহত প্রবাহের দিকে নিয়ে গেলেন। ক্রিয়া-কর্মের বদ্ধ জলাশয় থেকে মুক্ত করে মানুষের মাঝে আদর্শের অন্তহীন স্রোত জাগিয়ে দিলেন। ফলে দিকে দিকে দেখা দিল এক অভিনব আত্মিক জাগরণ!

প্রত্যেক সভ্যতাই শেষে গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়। নূতন পথে চলবার ক্ষমতা মানুষ হারিয়ে ফেলে—ফলে ঘটে মৃত্যু। সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখে, নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করে ভাবসিক্তের প্রেমিকের দল। তারা নিজেদের পথ নিজেরাই খুঁজে নেয়, কারও পদাঙ্কের অনুসরণ করেনা। এই সত্যটি রুমী প্রমুখ সুফিবাদীরা অতি স্পষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। রুমী বলেছেন: "মস্ত মাস্ত (ভাবসিক্তেরা) তাদের কাছে গতানুগতিক পথে চলার আশা করো না। প্রেমের ধর্ম হচ্ছে সব ধর্ম থেকে ভিন্ন। প্রেমিকের ধর্ম, প্রেমিকের পথ, সে ত খোদা ছাড়া আর কিছু নয়। দুঃখের সমুদ্রে প্রেম পরমানন্দে সন্তরণ করে বেড়ায়।"

যে প্রেমিক সে কোন বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলতে পারে না। তার গতির ধারা তার নিজস্ব। রুমীর কথায়: "প্রেমিকের পদচিহ্ন সাধারণ মানুষের পদচিহ্ন থেকে ভিন্ন। সহজেই তা চেনা যায়। এক পা তার লেখার কলমের খোঁচার মত এঁকে বেঁকে যায়; আর এক পা সেই কলমের ডাটির মত এক কোণ থেকে বিপরীত কোণের দিকে যায়। ……"

তার পর এই উপাখ্যানে আমরা পাই মানবাত্মার পূর্ণ স্বাধীনতার অকুণ্ঠিত ঘোষণা, স্বাধীন চিন্তার সোনালী সনদ:

"অপরের অনুসরণ করবার দরকার নাই; বিধি-নিষেধের বাঁধাবাঁধি নাই।

ভাবসিক্তের প্রাণ যা চায়, তাই তুমি বলতে পার!

তোমার ধর্মদ্রোহিতা, সেই তো হল প্রকৃত ধর্ম!

তোমার অন্তরের নিজস্ব আলোক—সেই তো হল ধর্মের অনাবিল উৎস!"

প্রেমিকের চলার শেষ নাই। নিত্য নূতন পথে সে অগ্রসর হচ্ছে, নিত্য নূতন সত্যের নিত্য নূতন সৌন্দর্যের সন্ধান সে পাচ্ছে—সে যে অনন্ত পথের যাত্রী। মেষপালক তাই মুসাকে সম্বোধন করে বলছে: আমি "সাদরাতুল মান তাহা" (ইন্দ্রিয়াতীত বিশ্ব) অতিক্রম করে এসেছি। সে বিশ্ব ছেড়ে দীর্ঘ এক বৎসরের পথ আমি অতিক্রম করেছি।"

আমাদের ভাষা, আমাদের শিল্প, আমাদের সাহিত্য আমাদের অন্তরের গভীরতম অনুভূতিকে কখনও প্রকাশ করতে পারবে না, কেননা সে অনুভূতি অবর্ণনীয়, প্রকাশের অতীত। রুমী তাই বলেছেন: "মুরলী শিল্পী বাঁশীতে যে সুর তোলে সে হচ্ছে বাঁশীর শক্তি অনুযায়ী! শিল্পীর অন্তরে যে সুরের খেলা চলেছে বাঁশী তার মানদণ্ড নয়।"

আমাদের আরও মনে রাখতে হবে, যে, আমাদের ধর্ম, আমাদের কল্পনা, আমাদের সাধনা, আমাদের বিদ্যা, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের জ্ঞান খোদার অচিন্তনীয় মহিমার, অবর্ণনীয় ঐশ্বর্যের তুলনায় একান্তই তুচ্ছ, একান্তই অকিঞ্চিৎকর। রুমীর কথায়: তুমি খোদার যে বন্দনা গান কর, তাঁর নিকট যে সব স্তবস্তুতি কর, সে সব মেষপালকের স্তব-স্তুতির মতই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর! মেষপালকের বন্দনার চেয়ে তোমার বন্দনা ভাল হতে পারে বটে, কিন্তু খোদার যোগ্য মোটেই নয়। তোমার বন্দনাও মেষপালকের বন্দনার মতই রূপক, ভাব-কল্পনার আবিলতায় ভরপুর!"

চোখের সামনে থেকে যখন আমাদের পর্দা সরে যাবে, নগ্ন সত্যের সঙ্গে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হবে, তখন আমাদের চিন্তার, আমাদের ভাবের তুচ্ছতা দেখে আমরা আশ্চর্য হব। সবিস্ময়ে আমরা তখন বলে উঠব: "মানুষ যা ধারণা করেছিল এত তা নয়!"

অপরাধ-বিজ্ঞান

(৪)

শ্রীআনন ঘোষাল

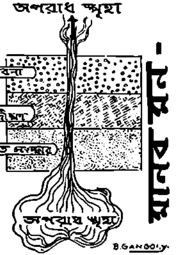

অপরাধী মাত্রেই মদের ন্যায় নারীর প্রতি আসক্ত হয়। অনেক সময় নারীই তাদের মধ্যে অপরাধের বাসনা আনে! যৌন অপরাধীদের সম্বন্ধে বিশেষ রূপে একথা বলা চলে। যৌন অপরাধীরা নারী বিশেষকে ভালবাসে এবং তারা সাধারণতঃ বেশ্যাসক্ত হয় না। কিন্তু অভ্যাস ও স্বভাব অপরাধীরা নারী মাত্রকেই ভালবাসে এবং বেশ্যাসক্ত হয়। স্বভাব অপরাধীরা সর্ব্বদাই বেশ্যাসক্ত থাকে। যৌন অপরাধীরা প্রায়ই বিবাহিত বা বিবাহে ইচ্ছুক থাকে। অভ্যাস অপরাধীরাও প্রায়ই বিবাহিত হয়। কিন্তু স্বভাব অপরাধীরা বিবাহের ধার দিয়াও যায় না। স্বভাব ও অভ্যাস অপরাধীরা হুল্লোড় (Orgory) ভালবাসে। হুল্লোড় তাদের নিকট মাদক দ্রব্যের মতই প্রিয়। অবসর সময়টুকু তারা নারী ও মদের মধ্যেই ডুবে থাকে। বেশ্যা নারীরা অনেক সময় তাদের দুষ্কার্য্যে সাহায্যও করে। তাই চোরেরা প্রায়ই দুষ্কার্য্যের জন্য বেশ্যা-নারীর বাড়ী থেকেই যাত্রা করে এবং দুষ্কার্য্য সমাধানের পর দ্রব্যাদি নিয়ে রাতারাতি বেশ্যা-নারীর বাড়ীতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং সকাল পর্য্যন্ত সেইখানেই অপেক্ষা করে। প্রায়ই দেখা যায় স্বভাব-অপরাধীরা স্বভাব-বেশ্যাদের চিনে নেয়। তারা কখনও গৃহস্থ মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দেয় না বা দেবার প্রয়োজন মনে করে না। বিবাহ তাদের কাছে অদ্ভুত। একনিষ্ঠা তাদের কাছে অজ্ঞাত। অপরদিকে অভ্যাস-অপরাধীরা অভ্যাস-বেশ্যাদের সঙ্গেই মিলিত হয়। অনেক সময় তারা বিবাহও করে। বিবাহ না করলেও তাদের মধ্যে প্রায়ই একটা সাময়িক একনিষ্ঠা দেখা যায়। স্বভাব বেশ্যারা প্রায়ই নিম্ন-শ্রেণীর বেশ্যা হয়। এইজন্য স্বভাব-অপরাধীরা খোলার ঘর, বস্তি প্রভৃতিতেই আনাগোনা করে বেশী। অপরদিকে অভ্যাস-বেশ্যারা বাস করে উত্তম বাটীতে। এই জন্য অভ্যাস-অপরাধীদের উচ্চ শ্রেণীর বেশ্যা গৃহেই সন্ধান মিলে। এইজন্য অপরাধী-বিশেষে কেবল স্বভাব বা অভ্যাস অপরাধী তা জানা থাকলে, পুলিশ তাদের সহজে খুঁজে আনতে পারে।

স্বভাব-অপরাধীদের স্নায়ু সবল থাকে, কিন্তু অভ্যাস অপরাধীদের স্নায়ু অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হয়। কোনও বড়-চুরির পর প্রায়ই দেখা যায়, অকুস্থলে বিড়ি পড়ে আছে। এরূপ ক্ষেত্রে অপরাধী অভ্যাস-অপরাধীর দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। চুরি করবার সময় অভ্যাস-চোরেরা প্রায়ই "নারভাস" হয়ে উঠে। বিড়ি খাবার পর তাদের উক্তরূপ "নারভাসনেস্" কেটে যায়। দেহতত্ত্বের নিয়মই এই। বিড়ি খেতে না পেলে অনেক সময় তারা ফিরে যায়। কিন্তু স্বভাব-চোরেরা চৌর্য্যকার্য্যে ক্ষেত্রে কোনও রূপ অস্বস্তি বা "নারভাসনেস" অনুভব করে না। চৌর্য্যকার্য্য তাদের কাছে একটা সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। যৌন চোরেরা কখনও বড় রকমের বা বিপজ্জনক কাজে হাত দেয় না। তারা প্রায়ই সুযোগমত অপরাধ করে। ধর্ম্মের দিক থেকে বলতে গেলে বলতে হয়, স্বভাব-চোরেরা নাস্তিক ও কমিউনিষ্ট মতাবলম্বী। ধর্ম্ম নিয়ে তারা কখনও মাথা ঘামায় না। চৌর্য্যবৃত্তিই তাদের ধর্ম্ম। তাদের মধ্যে জাতিভেদ বা উচ্চ নীচ নেই। কিন্তু অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস দৃঢ় হয়। জাতিভেদও থাকে। অনেক সময় তারা সফলতার জন্য ঈশ্বরের পূজাও করে। এদেশের অনেক ডাকাত ডাকাতির পূর্ব্বে কালীপূজা করত। সকল দেশের স্বভাব-অপরাধীরা একইরূপ প্রকৃতির হয়। কিন্তু অভ্যাস-অপরাধীরা দেশভেদে বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। দেশ-বিদেশের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, রীতিনীতি তাদের বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষে অভ্যাস-অপরাধীরা প্রায়ই শাস্তির প্রত্যাশায় থাকে। বস্তুতান্ত্রিক ইউরোপ ও আমেরিকার অপরাধীরা পরলোকের শাস্তিতে বিশ্বাসী নয়। ভারতবর্ষের অপরাধীদের কিন্তু

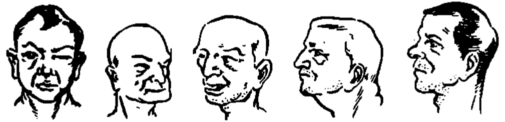

দৈহিক গোত্রানুরূপ দেখা যায়—ইহাদের সহিত আদিম মানবের রূপের মিল আছে

(দৈব ও অভ্যাস-অপরাধীদের) প্রায়ই মনে মনে আপশোষ করতে দেখা যায়। নিম্নের দৃষ্টান্তটুকু প্রণিধানযোগ্য কোলকাতার কোনও এক অভ্যাস-অপরাধীর ধারণা হয়, তাকে মিথ্যে মামলায় জেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এজন্য তদন্তকারী অফিসারের উপর তার কোনও বিরাগ দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে এইরূপ বলে। তার বিবৃতিটুকু নিম্নে তুলে দেওয়া হল।

"ঠিক আমি এটাতে অবশ্য দোষী নই। পূর্ব্বে আমি এমন অনেক অপরাধ করেছি, কিন্তু ধরা পড়ি নি। বোধ হয় আমার পাওনা সাজাটা ভালয় ভালয় কেটে গেল। হাঁ, আমি বিশ্বাস করি পাপের শাস্তি আছে। একদিন না একদিন কোনও না কোনও উপলক্ষে ইহলোকে না পরলোকেও শাস্তি নিতেই হবে। যাক শাস্তিটা ইহলোকেই কেটে গেল। পরলোকের জন্য তোলা রইল না। ফরিয়াদি যখন প্রহার করছিল তখন তাকে গালি দিচ্ছিলাম কেন? শুনুন তবে। বেদনার জন্য তাকে গালি দিচ্ছিলাম। পরে কিন্তু তাকে আমি আশীর্ব্বাদ করেছি। আমার পাওনা শাস্তিটা ভালোয় ভালোয় জেলের মধ্যে উনি কাটিয়ে দিলেন।"

রুশ দেশীয় কুকুর মানুষ

স্বভাব-অপরাধীদের অপরাধ স্পৃহা গোত্রগত অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তারা তা লাভ করে। বহু চেষ্টাতেও তাদের স্বভাব শোধরান যায় না। কিন্তু অভ্যাস-অপরাধীরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী হয় না। পরবর্ত্তীকালে অভ্যাস দ্বারা তারা অপরাধী হয় এবং অবস্থাভেদে তারা শুধরেও যেতে পারে। স্বভাব-অপরাধীরা চালিত হয় সহজবৃত্তি বা instinct দ্বারা। স্বভাব ও অভ্যাস-অপরাধীরা প্রায়ই মিল খায় না। মিল খেলেও বেশী দিন মিল থাকে না। স্বভাব-অপরাধীদের স্বভাব ও বৃত্তি প্রায়ই হীন ও পশু-সুলভ হয়। অভ্যাস-অপরাধীরা অনেকটা সাধারণ মানুষের মতই থাকে। স্বভাব-অপরাধীরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশা করে না। অভ্যাস-অপরাধীরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।

স্বভাব, অভ্যাস ও দৈব অপরাধীদের ন্যায় আবার স্বভাব-উকিল, অভ্যাস-উকিল ও দৈব-উকিলও দেখা যায়। এমন অনেক স্বভাব-উকিল আমি জানি যারা চোরেদের মামলা বিনা পয়সাতেও করে থাকে। চোরেদের রক্ষা করে তারা বেশ একটা আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এক কথায় চোর না হয়ে তারা উকিল হয়ে পড়েছে। এমন অনেক অপরাধী-দল আছে যারা অপরাধ করার আগে উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করে, শুধু তাই নয় তাদের মাসিক মাহিনা দিয়ে থাকে। তবে এইরূপ স্বভাব-উকিলের সংখ্যাও কম। সাধারণতঃ উকিলরা সচ্চরিত্র সজ্জন সত্যবাদী ও ধর্ম্মভীরু হয়। অভ্যাস-উকিলেরা প্রায় দেওয়ানি কোর্টে প্র্যাক্‌টিস করে। ফৌজদারী কোর্টে এলে তারা ধর্ম্মভীরু উকিল হয়। দৈব উকিল প্রায়ই প্র্যাক্‌টিস করে না।

স্বভাব অভ্যাস ও মধ্যম অপরাধীদের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হল, এইবার এদের প্রধান দুইটী উপবিভাগ সম্বন্ধে বলা যাক। স্বভাব অভ্যাস ও মধ্যম প্রত্যেক অপরাধী গোষ্ঠী দুইটী প্রধান উপবিভাগে বিভক্ত। যথা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি এই সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অপরাধীদের মধ্যে অপরাধ স্পৃহার তারতম্য ছাড়া কয়েকটী আকৃতি ও প্রকৃতিগত প্রভেদ দেখা যায়। এই সব প্রভেদ থেকে শাস্ত্রজ্ঞেরা অপরাধী বিশেষ, একজন সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় অপরাধী তা চিনে নিতে পারে। সক্রিয় অপরাধীরা সাধারণতঃ হিংস্র ও শোণিতলোলুপ হয়। প্রায় দেখা যায় ডাকাতি ও খুন, বলাৎকার ও খুন একসঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে। বলাৎকার শোণিতাত্মক অপরাধ। এই জন্য এই সকল অপরাধের সঙ্গে দংশন আঘাত প্রভৃতিও সংঘটিত হয়। দেওয়াল ভেঙ্গে চুরি করতে এসে সক্রিয়-চোর যদি বাধা পায় বা পলায়নে অক্ষম হয় ত সে আঘাত ও খুনও করে থাকে। পেশাদারী খুনেরা খুনের সঙ্গে সঙ্গে সিঁদ-চৌর্য্য বা Burglary করে থাকে। এক কথায় কি শোণিতাত্মক, কি শোণিত-সাম্পত্তিক, বা কি সাম্পত্তিক সক্রিয় অপরাধীদের তিনটী উপবিভাগীয় অপরাধীর মধ্যেই কম বেশী শোণিত (পান বা) দর্শন স্পৃহা জাগ্রত অবস্থায়ই বর্ত্তমানে।

অপরদিকে নিষ্ক্রিয় অপরাধীরা খুন জখম প্রভৃতির ধার দিয়েও যায় না। কেহ কেহ বিষ প্রয়োগে যারা চুরি করে বটে, কিন্তু বাধা পেলে আঘাত হানে না। আঘাত হানা তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। পলায়নের চেষ্টা করে মাত্র। শোণিত-স্পৃহা তাদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কোন সময়েই উহা তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় না। সাধারণ চোরেদের কাছে সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র থাকে না।

সাধারণতঃ সক্রিয় অপরাধীরা পেশীবহুল, শক্তিমান ও সাহসী হয়। নিষ্ক্রিয় অপরাধীরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও শান্তিপ্রিয় হয়ে থাকে। পূর্ব্বেই বলেছি, আদিম যুগের মানবগণ অপরাধপ্রবণ ছিল। তাদের মধ্যে শক্তিমানরা ডাকাতি খুন প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করত। অপরদিকে দুর্ব্বলেরা সরল ও সহজ চৌর্য্য প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করত। আজিকালকার অপরাধীরা তাদেরই উপযুক্ত বংশধর। তাই তাদের মধ্যে উক্তরূপ বিভাগ আজও দেখা যায়। নিষ্ক্রিয় অপরাধীরা দৈহিক বলে হীন হলেও চাতুর্য্যে তারা সক্রিয় অপরাধীদের পরাস্ত করতে সক্ষম। দৈহিক গঠন, বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবহার প্রভৃতি থেকে অপরাধী বিশেষ একজন সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় অপরাধী তা বলে দেওয়া যায়। আমি ১০জন বিভিন্ন অপরাধীদের দেহাবয়ব ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে নিম্নলিখিত ফল পেয়েছি।

	বলবান ও স্বল্প-বুদ্ধি	দুর্ব্বল ও বুদ্ধিমান	মাধ্যমিক শক্তি ও বুদ্ধি
ডাকাতি আদি	৪	×	×
সরল চৌর্য্য	১০	×	×
পকেটমার	×	১২	×
শঠ	×	১০	×
খুনে	২	×	১
যৌন-অপরাধী	১	×	২

এই দৈহিক গঠন ও বুদ্ধিমত্তা ছাড়া আরও কয়েকটী বিষয়েও তারা বিভিন্ন হয়। সাধারণতঃ অপরাধীরা উল্কী বা tattoo ভালবাসে। সাধারণ

মানুষের ন্যায় উহা তারা বক্ষে ও হস্তে ধারণ করেই ক্ষান্ত হয় না। উল্কী-চিত্র তারা পৃষ্ঠদেশ, উরু এমন কি যৌন-স্থানেও ধারণ করে। সক্রিয় অপরাধীরাই বেশী সংখ্যক উল্কী-চিত্র ধারণ করে। বোধ হয় এতদ্বারা তারা ভীষণাকৃতি হতে চায়। তাদের অস্থিরচিত্ত বে-পরোয়া ভাবই এর জন্য দায়ী। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা একত্রে সাপ ও ব্যাঙ, নারিকেল গাছ, পরী এবং প্রিয়ার নাম তাদের হস্তে ও বক্ষে ধারণ করে। অপর দিকে নিষ্ক্রিয় অপরাধীরা প্রায়ই উল্কী পরে না। পরলেও তারা উহা কম সংখ্যায় পরে। বরং পোষাক পরিচ্ছদের দিকেই তাদের ঝোঁক থাকে বেশী। আত্মগোপনের প্রয়োজনেই বোধ হয় তারা উল্কী ধারণ করে না। সাধারণতঃ তারা চতুর, বুদ্ধিসম্পন্ন ও শান্ত-প্রকৃতির হয়। সক্রিয় অপরাধীদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হয় না, উল্কী ধারণ করলেও উহা তারা পৃষ্ঠে ও উরুতে ধারণ করে, সক্রিয় অপরাধীদের ন্যায় বক্ষে ও হস্তে ধারণ করে না। নিষ্ক্রিয় স্বভাব-অপরাধীরা সাধারণতঃ প্রজাপতি, ফুল, ফল প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করে। নিষ্ক্রিয় অভ্যাস-অপরাধীরা ভাই-বোন, স্ত্রীর নাম, এবং দেবদেবীর চিত্রও ধারণ করে। এই সব উল্কী চিহ্ন থেকে অপরাধীদের প্রকৃতি, মানসিক অবস্থা ও তাদের অপরাধ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। এ বিষয়ে এখনও আমি অনুসন্ধান করছি। অপরাধীদের ন্যায় সৈন্যরাও উল্কীচিহ্ন ধারণ করে, কিন্তু তারা প্রায়ই নিশান, কামান, নোঙ্গর, স্ত্রী-মূর্তি, বাজা, সাংকেতিক অক্ষরাদিই ধারণ করে।

মনের দিক থেকেও এই নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় অপরাধীরা বিভিন্ন হয়। সক্রিয় অপরাধীরা হিংস্র, নির্দয় ও সেই সঙ্গে ভাবপ্রবণও হয়। এ সম্বন্ধে কয়েকটী দেশী ও বিলাতী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এক জার্মান অপরাধী তার প্রিয়াকে খুন করে। খুন করার পর হঠাৎ তার মনে হয়, প্রিয়ার

বালক অপরাধী—দৈহিক ও মানসিক উভয় দোষাদুষ্টের অধিকারী

বালক অপরাধী—সামাজিক দোষাদুষ্টের অধিকারী

প্রিয় পাখীটি খাদ্যের অভাবে মারা যেতে পারে। সে তখন কবরস্থান থেকে ফিরে এসে, তার পাখীটাকে খাইয়ে যায়। উক্ত কোলকাতায় (১৯৩৬) প্রসিদ্ধ খুনে গুণ্ডা খাঁদা ওরফে অবিনাশ বক্সী প্রতিদ্বন্দ্বী পাগলাকে ছুরিকা দ্বারা নিহত করে। কিন্তু এতেও তার আত্মতৃপ্তি হয় না। সে তার পায়ের শিরা দুটাও কেটে দেয়। পরে তার মুণ্ডুটাও কেটে নিয়ে, ঝোলায় পুরে সেটাকে তার প্রিয়াকে দেখিয়ে আসে। সক্রিয় অপরাধীরা, বিশেষ করে শোণিতাত্মক সক্রিয় অপরাধীরা প্রায়ই খেয়ালী হয়। খেয়াল মত তারা দান ধ্যান বা দাক্ষিণ্যও করে থাকে। বাহাদুরী বা Bravado গুণটি সক্রিয় অপরাধীদের মধ্যে অধিক পরিস্ফুট হয়। নিজেদের মধ্যে একজন বীর বা বাহাদুর বলে পরিচিত হবার একটা আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই তাদের পেয়ে বসে। এজন্য তারা অনেক সময় বিপদ বরণও করে। নিজেদের দুষ্কার্যের কাহিনী জাঁকালো করে সাথীদের কাছে বলতে তারা ভালবাসে। একারণ পুলিশ-গোয়েন্দারা সহজেই এদের খবর পায়।

একাচারী আদিম মানুষ

অপর দিকে নিষ্ক্রিয়-অপরাধীরা প্রায়ই নাস্তিক, নিষ্ঠুর, বেপরোয়া বা ভাবপ্রবণ হয় না। অহেতুক দান ধ্যানও তাদের মধ্যে দেখা যায় না। আক্রান্ত হলেও তারা প্রায়ই প্রতি-আক্রমণ করে না। গোপনে কাজ করা, পলায়ন, শঠতা চাতুরী প্রভৃতিই তাদের প্রধান অস্ত্র। এই সকল গুণাগুণ থেকে অপরাধীবিশেষ একজন সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় অপরাধী তা বলে দেওয়া যায়। একজন নিষ্ক্রিয় অপরাধী যদি রাহাজানি (robbery) "কেসে" অভিযুক্ত হয়—ত পুলিশের উচিৎ তার নির্দোষিতা প্রমাণ করা। অনুরূপ ভাবে একজন সক্রিয় অপরাধীর বিরুদ্ধে যদি "পিকপকেটের" অভিযোগ আসে ত তদন্তকারী অফিসারের অভিযোগ সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া উচিৎ। একই অপরাধী সময় বিশেষে খুন, জখম, ডাকাতি, রাহাজানি বা সবল-চৌর্য অপরাধ করলেও করতে পারে, কিন্তু সেই অপরাধীরা কখনও পিক-পকেট, শঠতা বা সহজ ও সরল-চৌর্য্যের কাজে হাত দেবে না। তবে দুয়ার ভেঙ্গে চুরি করতে এসে সবল-চোরেরা যদি দুয়ার খোলা পায় ত সে কথা স্বতন্ত্র।

এই সক্রিয় অপরাধীদের প্রত্যেক গোষ্ঠীই আবার তিনটী করে উপবিভাগে বিভক্ত। যথা—শোণিতাত্মক, সাম্পত্তিক ও শোণিতসাম্পত্তিক। এ কথাও পূর্বে বলেছি শোণিতাত্মক অপরাধীরা নিষ্ক্রিয়ই হউক বা সক্রিয়ই হউক উহারা কখনও দল-বেঁধে অপরাধ করে না। বড় জোর চার পাঁচ জন তাদের

দলে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু উহার চেয়ে বেশী সংখ্যক লোক তাদের দলে থাকে না। এই সব অপরাধ প্রায়ই তারা একক, দুই বা তিন জনে মিলে করে থাকে। দলে অপরাপর লোক থাকলেও, প্রত্যক্ষভাবে একজন ব্যক্তিই কার্য্য সমাধান করে। শোণিতাত্মক অপরাধীদের চোখের পলক অস্থির হয়। উহারা প্রায় চঞ্চল প্রকৃতির হয়। চলিবার সময় উহারা অঙ্গুলির উপর ভর দিয়ে চলে। অপরদিকে সাম্পত্তিক অপরাধী দলে আরও বেশী লোক দেখা যায়। তবে তাদের দলে দশ বা বার জনের বেশী লোক প্রায়ই থাকে না। নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় উভয়বিধ সাম্পত্তিক-অপরাধীদের সম্বন্ধে এই একই কথা বলা চলে। উহারা গোড়ালি চাপিয়া চলে, অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া চলে না। উহাদের মধ্যে চঞ্চলতা দৃষ্ট হয় না। দৃষ্টির মধ্যে বৈশিষ্ট্যও দেখা যায় না; শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধীদের দলে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক লোক দেখা যায়। ডাকাতির দলে অনেক সময় একশতেরও বেশী লোক দেখা যায়। যে সকল শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধী একক অপরাধ করে তাদের প্রকৃতি প্রায়ই শোণিতাত্মক অপরাধীর মত হয়। ডাকাতি অপরাধীরা শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধীর পর্যায়ভুক্ত হলেও, অনেক সময় তাদের দলে সক্রিয় শোণিতাত্মক, সক্রিয় শোণিত-সাম্পত্তিক এবং সক্রিয় সাম্পত্তিক এই ত্রিবিধ অপরাধীই বর্তমান থাকে। ডাকাতির সময় প্রায়ই দেখা যায়, কতকগুলি লোক কেবলমাত্র খুন জখম নিয়ে থাকে কাহারও কাহারও লক্ষ্য কেবল মাত্র সম্পত্তি আহরণের দিকে, কেহ কেহ কেবলমাত্র গাত্র হতে অলঙ্কার ছিনাইতে যায়। দলের মধ্যে এই ত্রিবিধ-অপরাধীর অবস্থান হেতুই এইরূপ দেখা যায়। নিষ্ক্রিয় ভাবে যে সকল অপরাধীরা বিষপ্রয়োগাদি দ্বারা সম্পত্তি আহরণ করে, তাদের দলেও বহু লোক ষড়যন্ত্রীরূপে যোগ দেয়। রাজা বা প্রধানের প্রাণ নাশ করে রাজ্যলাভের জন্য; মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে বাটীর ভৃত্য পর্যন্ত বহু লোককে বিষ প্রয়োগাদি ষড়যন্ত্রের কার্য্যে লিপ্ত হতে দেখা গেছে। (ক্রমশঃ)

দস্যু প্রকৃতি

উজ্জ্বলা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

লিপির মুখে পেয়েছি যার প্রথম পরিচয়,
চোখের দেখা পাইনি আজো তার।
খবর পেয়ে—আসছে, বেশী দেরী হবার নয়;
কুঞ্চিতকেশে কোমল অলকার।

ঐ দিকের ঐ পর্দাখানি হঠাৎ যাবে স'রে,
দাঁড়াবে সে ঐখানে ঐ চৌকাঠখানি ধ'রে,
ঈষৎ হেসে হাত তুলে সে নমস্কারটি ক'রে
আঁচল টেনে সরিয়ে দেবে হার।

আস্‌বে তাকে দেখ্‌ব প্রথম, দীর্ঘদিবস ক'রে
লিপির মধ্যে সঙ্গ পেলাম যার।
চিঠিতে সে বল্‌তো 'তুমি', 'আপনি' হবে আজ,
চারদিকে যে হিতাকাঙ্ক্ষীগণ!

লজ্জানিবারণের মতন দূর করেছি লাজ
সাজ যত প্রণয়-সম্ভাষণ।

খামের মধ্যে পেয়ে আমার প্রেমের লিপি যত,
জবাবগুলি এসেছে ঠিক্ অভিধানের মত;
আজ্‌কে ট্রেনে চ'ড়ে এসে পুরানো সেই কত
[illegible] বল্‌লো অনেকক্ষণ।

এবারে তার দেখা পেলে বলব—অনুগ্রহ
করো আমায়, ক'রোনা বর্জন।

শব্দ ক'রে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে আগে,
দ্বারের পথে সজাগ করি কাণ।
বাইরে ও কার পায়ের শব্দ বিশ্রীরকম লাগে!
পুলিশ বলে 'মশায় কাকে চান?'

'উজ্জ্বলাকে'—মিষ্টি ক'রেই কাশ ক'রেই শোনাই
কোথায় আলাপ? আপনি কি তার দাদা—আমায় বোঝাই

[illegible] মা ঘর'—রাগ না ক'রে আমাই [illegible]
চিঠির সূত্রে চেনাশোনার ভাগ।
চাইনা আমি' বলেন তিনি এমন আনাগোনাই!
'আসবে না সে, আপনি উঠে যান!'

উজ্জ্বলাকে দেখ্‌তে পেলাম জান্‌লা ধ'রে আছে,
টুক্‌রো কাগজ পড়লো মাটির পরে।
কুড়িয়ে নিতে হঠাৎ কুকুর এগিয়ে এলো কাছে
লোকটা খাড়া দাঁড়িয়ে সে চত্বরে।

কি লিখেছে—বাইরে গিয়ে দেখ্‌ব মনে ভেবে
এগিয়ে চলি—চাকর এলো লিখনখানি নেবে!

পথের ওপর কাগজ ছিঁড়ে পায়ের তলায় ফেলে
ব'লে দিলাম—'সেই তোমাদের ঘরে
কাগজ আমার এখন' দেখি এই ব'লে সংক্ষেপে—
বাতায়নে পর্দা ওড়ে ঝড়ে!

হিন্দু-বিবাহ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় হিন্দু-বিবাহ-বিধি সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ার ফলে দেখা যাইতেছে যে, অনেকেই এ বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রায়-ই অনেকে এ বিষয়ে বহুবিধ প্রশ্ন প্রেরণ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর পৃথক ভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর আমি গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রবন্ধে আত্মীয়-বিবাহ সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি—তাহার পুনরালোচনায় বিশেষ প্রয়োজন দেখি না; কিন্তু অনেকেই দেখিতেছি তাহার মধ্য হইতেও প্রশ্নের অবকাশ সন্ধান করিয়াছেন।

আমি জানাইয়াছি মাদ্রাজ-ব্যতীত অন্য অঞ্চলের হিন্দু-আইনে কতদূর পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ গণ্ডী ও "ত্রিগোত্রান্তরিত সিদ্ধান্তের" অর্থ কি। সেই সঙ্গে ইহাও জানাইয়াছি মাদ্রাজ অঞ্চলে কিরূপ নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়। বহু পত্রের মধ্যে একটীকে আদর্শ করিয়া কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। নিম্নে সেই পত্রের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"মাতুল-ভাগিনেয়ী বিবাহ, মামাত, পিসতুত, মাসতুত ইত্যাদি cousin বিবাহ আইন বিরুদ্ধ দেখিলাম। কিন্তু ঐ রূপ বিবাহের কথা আজকাল সমাজে শুনিয়া থাকি। • • • জানিতে ইচ্ছা হয় তাঁহারা কি অন্য কোনও উপায়ে ঐ রূপ বিবাহ সিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন? • • • শুনিয়াছি যে ঐরূপ ভাবে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস যদি কেহ করেন এবং উভয়েই যদি প্রাপ্তবয়স্ক হন তবে তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাসে অন্যে আপত্তি তুলিতে পারে না, বা বাধা দিতে পারে না; • • • তবে তাঁহারা নিজেরাই যদি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে চাহেন সে আলাদা কথা। • • • ঐ বিবাহ অন্য কোনও ভাবে সিদ্ধ করা যায় কিনা জানিতে কৌতূহল হয়। আজকাল যেরূপ শুনা যাইতেছে তাহাতে এই সকল বিবাহের সিদ্ধির পথ যদি সত্যিই কোনও রূপ না থাকে তবে হওয়া প্রয়োজন। উহাতে সমাজের অনিষ্ট না হইয়া বরং ইষ্টই হইবে। অনেকের মতে নিকটাত্মীয়ের বিবাহ সন্তানের পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু মাদ্রাজীদের (যেখানে মাতুল-ভাগিনেয়ী বিবাহ সুপ্রচলিত) • • • কথা বিবেচনা করিলে সে কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।" লেখিকার নাম প্রকাশ করিলাম না।

বর্ত্তমানে যে বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজে ক্ষেত্রবিশেষে আত্মীয়-বিবাহ হইতেছে একথা অতি সত্য। আমি আমার এক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি তাঁহাদিগের জ্ঞাতি গোত্রের মধ্যে আপন মাসতুত ভাইবোনে বিবাহ হইয়াছে—দিদিমা তাঁহার দৌহিত্র ও দৌহিত্রীকে সামনে পাশাপাশি বসাইয়া খাওয়াইতে থাকেন ও আনন্দ পান এবং এ বিবাহ পাত্রপাত্রীর অভিভাবকগণের অনুমতিক্রমেই ঘটিয়াছে। এরূপ বিবাহ বহুক্ষেত্রেই সংঘটিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এক মাতুল-ভাগিনেয়ী-বিবাহ (আপন নয়) আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল (১)।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এইরূপ বিবাহ সিদ্ধ-বিবাহ কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে—পূর্ব্ব প্রবন্ধে (২) আলোচনা করিয়া থাকিলেও, পুনরায় বলিতেছি সাধারণতঃ মাদ্রাজ-ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানে এরূপ বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নহে। প্রশ্নকারিণী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—অপরে মোকদ্দমা করিয়া এইরূপ বিবাহিতদিগের সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারে কি না? এ সম্বন্ধে প্রশ্নকারিণীর অনুমান ঠিক। এইরূপ বিবাহ যদি কেহ করিয়াই থাকে ও স্বামী স্ত্রীরূপে বসবাস করে তাহাতে অপরের করিবার কি আছে? তাহাদিগের একত্রে বসবাসের স্বাধীনতা অবশ্যই আছে—তাহাদিগের সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য আদালতে মামলা আনয়ন করিবার অধিকার কাহারও নাই—অবশ্য উভয়েই যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়। কন্যা যদি সাবালিকা না হন ত' কন্যার পিতা ফৌজদারী মামলা আনয়ন করিয়া বলিতে পারেন এ বিবাহ বিবাহই নয় এবং তাঁহার কন্যাকে অবৈধভাবে আটক রাখা হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি; কেননা আইনের চক্ষে অপ্রাপ্তবয়স্কের মতের কোন মূল্যই নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাদিগের মধ্যে যদি কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটে, সেরূপ ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহ্য করিতে না পারিয়া হয়ত' তাহারা সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাহিবে ও আদালতের শরণাপন্ন হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ গণ্ডী সম্বন্ধে নিজেদের অনুকূলে প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিলেই তাহাদিগের বিবাহ যে অসিদ্ধ-বিবাহ সেইরূপ ঘোষণা করাইয়া লইতেও পারিবে।

আদালতে এইরূপ যে সকল মামলা রুজু হয় আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উভয়পক্ষ জানিত যে তাহারা নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ও তাহাদিগের বিবাহ অসিদ্ধ; কিন্তু আপাত (?) প্রণয়ের ফলেই একে অপরকে অপরিত্যাগ্য বলিয়া মনে করিয়াছে ও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। কিছুদিন পরে দেহের মায়া ও চোখের নেশা কাটিয়া গেলে এবং বহুক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকের চাপে অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে ও সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে চায়। আদালত অবশ্য এই বিবাহকে অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করে; কিন্তু আমার মনে হয় যাহারা জানিয়া শুনিয়া শাস্ত্রবিগর্হিত বিবাহ করিয়া পরে আবার সেই বিবাহ ছিন্ন করিতে চায় তাহারা দণ্ডার্হ। তাহাদিগের বিবাহের জন্য দোষ দিই না—যতটা দোষ দিই তাহাদিগের সেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টার।

আর একটি গোলযোগ হয় এইরূপে বিবাহিত দম্পতির কাহারও মৃত্যুর পর। মনে করুন কোন ব্যক্তি তাঁহার মাসতুত ভগিনীকে বিবাহ করিয়া স্বোপার্জ্জিত বহু অর্থসম্পদ রাখিয়া মারা গেলেন; গোলমাল বাধিবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির

---

(১) বিজন বনাম মতিলাল ৫৩ ক্যালকাটা উইকলী নোটস ৭৫৮-৭৫৯

(২) ভারতবর্ষ আষাঢ় ১৩৫০

উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ। উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ আসিয়া বলিবেন উক্ত ব্যক্তির পুত্র উক্ত ব্যক্তির ঐ পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী নয়; প্রকৃত উত্তরাধিকারী তাহারাই, কেন না উক্ত ব্যক্তির পুত্র তাঁহার বৈধ পুত্র নয়; উক্ত ব্যক্তির পুত্রের মাতা উক্ত ব্যক্তির রক্ষিতা মাত্র, কেন না উক্ত ব্যক্তির পুত্রের মাতা উক্ত ব্যক্তির মাসতুত ভগিনী সুতরাং তাহাদিগের বিবাহ অসিদ্ধ। অবশ্য যিনি মৃত্যুকালে সম্পত্তি রাখিয়া যাইবেন না বা সম্পত্তি রাখিয়া গেলেও উইল করিয়া যাইবেন তিনি আইনকে ফাঁকী দিবেন অনায়াসে।

এইবার প্রশ্ন, কোনও প্রকারে (হিন্দু আইন ব্যতীত) এই বিবাহকে সিদ্ধ করা যায় কি না? ধর্মান্তরের প্রশ্ন উঠিয়াছে। ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে অবশ্যই বহুক্ষেত্রে আইনকে ফাঁকী দেওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন আমি প্রশ্নকারীকে ধর্মত্যাগের পরামর্শ দিতেছি কিন্তু এইরূপ ধারণা করা ভুল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আইনের আলোচনা করিতে বসিয়া প্রশ্নের উত্তরে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে ধর্মান্তর গ্রহণের সাহায্যে এরূপ বিবাহকে সিদ্ধ করা যায়। কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে বিবাহের পর ধর্মান্তর, নয় ধর্মান্তরের পর বিবাহ করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে সাধারণের মনে যে একটী ভুল ধারণা আছে তাহা সংশোধন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

হিন্দুদিগের মধ্যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার রীতি আছে। যাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয় জন্মদাতা পিতার পরিবারের সহিত তাহার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তাহার নবজন্ম হয় তাহার পালক-পিতার গৃহে।

অনেকে আত্মীয়-বিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য পোষ্য-গ্রহণ রীতির সহায়তা গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। পাত্র বা পাত্রীকে কেহ পোষ্যরূপে (পোষ্য কন্যা যদিও আমাদিগের দেশে অচল) গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের ধারণা হইল এইরূপে তাহার স্বাভাবিক পরিবারের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন হইল এবং আত্মীয় আর আত্মীয় রহিল না ও এইভাবে আত্মীয় বিবাহে আর বাধা রহিল না।

আত্মীয় বিবাহ ভাল কি মন্দ সে বিচার করিবার প্রয়োজন আমার নাই, কিন্তু যে ক্ষেত্রে দৈবক্রমে কোনরূপ অঘটন ঘটিয়াই গিয়াছে সেক্ষেত্রে তাহাদিগকে সমাজ হইতে বিতাড়িত না করিয়া যদি আইনকে এইরূপে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাহাদিগের বিবাহকে সিদ্ধ বিবাহ করান যাইত তাহা হইলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে আনন্দিতই হইতাম। অনেকে বলেন আত্মীয়-বিবাহ সন্তান-সন্ততির পক্ষে অনিষ্টকর—একথার বিচার করিবেন বিজ্ঞানবিদ্গণ এবং ইহার সত্যাসত্য নিরূপিত হইবে সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাহায্যে—যে বিজ্ঞানের অনুকূলে ও প্রতিকূলে বহু কথাই বলা চলে। খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজে পাগল ও দুরারোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি আত্মীয়-বিবাহের ফলে বা অন্যকারণে হইয়াছে তাহার বিচারে আমি অক্ষম। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে আত্মীয় বিবাহ করিয়াও ইংরাজ ভারতের অধীশ্বর; জার্ম্মানী শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হইতেছে ইহাই যে, পোষ্য-রীতির দ্বারা এইরূপ বিবাহকে সিদ্ধ করা চলে না। পোষ্য গৃহীত হইলে বালকের জন্মদাতা পিতার পরিবারের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইলেও, উক্ত পরিবারের নিকট আইনের চক্ষে সে মৃত (?) বলিয়া গণ্য হইলেও, শাস্ত্রকারগণ বলেন বিবাহ ব্যাপারে তাহাকে তাহার জন্মদাতা পিতার সম্পর্ক বিচার করিতেই হইবে। তাহা যদি না হইত, সে মাসতুতভগিনী কেন সহোদরাকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারিত। শাস্ত্রকারগণ হয়ত এইরূপ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করিয়াই উক্তরূপ বিধান দিয়া গিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক মারফৎ ও ব্যক্তিগতভাবে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন আত্মীয়-বিবাহ সম্বন্ধে আমার মতামত কি ও আত্মীয় বিবাহ আমাদিগের দেশে চালু হওয়া উচিৎ কিনা?

আমার নিবেদন এই যে, দেশাচার বহুক্ষেত্রে শাস্ত্র-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়াছে—সেই সকল দেশাচার মানিবার পক্ষপাতী আমি নহি; কিন্তু যে সকল স্থলে শাস্ত্রব্যবস্থা ও দেশাচার একমত সে সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আমি দেশাচার অনুসরণ করার পক্ষপাতী। শাস্ত্রব্যবস্থা ও দেশাচার না মানিয়া হয়ত কেহ আত্মীয় বিবাহ করিলেন কিন্তু তাঁহার পুত্র কন্যার বিবাহের সময় ত' দেশাচার আবার বিরাট মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইবে? মাত্র আত্মীয়-বিবাহ কেন—সমাজের যে কোন বিধি—সে বিধি যতই অযৌক্তিক হউক না কেন, ভাঙ্গিতে গেলে, প্রথম প্রথম বিধি-ভঙ্গকারীকে এইরূপ বাধার সম্মুখীন হইতেই হইবে। সুতরাং প্রচলিত বিধি ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন; শেষ পর্য্যন্ত নিজের মনের জোর দেখাইতে পারিবে কি না।

আত্মীয়-বিবাহ সকল ক্ষেত্রে সমর্থন আমি করি না। স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা এক জিনিষ নহে। মাসতুত ভাইটী ও বোনটীর মেলা-মেশার যে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল তাহার অপব্যবহারের অপরাধ তাহাদেরই—যাহারা সে অপরাধ করিয়াছে। সমাজ ত' বলিতেই পারে আমরা তোমাদের নূতন সম্পর্ক স্বীকার করিব না। কিন্তু তাহা হইলেও যদি কোনও উপায়ে তাহারা বৈধভাবে বিবাহ করিতে পারে ত' সে বিবাহকে স্বীকার করিয়া লইবার মত ঔদার্য্য আমার আছে। 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক মারফৎ ও ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রায়ই যে সকল চিঠি-পত্র পাইয়া থাকি তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারি—আমাদের সমাজে চঞ্চলতা আসিয়াছে ও সেই চঞ্চলতা যদি স্থায়ী হয় ও সমর্থন পায় তাহা হইলে সমাজে বিবাহ ব্যাপারে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিবেই।

ব্যক্তির সমষ্টিতে গোষ্ঠি ও গোষ্ঠির সমষ্টিতে সমাজ। ব্যক্তি যদি সমাজ ব্যবস্থা না মানে ও এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে রক্ষণশীল দল যতই আপত্তি করুন না কেন, সমাজের পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইবেই।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একটী কথা বলিবার আছে—অবাধ মেলামেশার সুযোগের অপব্যবহার যে সকল ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে--অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে তাহার মধ্যে অনেক স্থলে অভিভাবক শ্রেণীর অন্যায় সন্দেহই উক্তরূপ অপব্যবহারের কারণ। এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ের মেলামেশা সুদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না, তা

সেই ছেলে মেয়ের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক যাহাই হউক না কেন। এই অন্যায় সন্দেহ তাঁহারা যদি আপনাদিগের মনের মধ্যেই রাখিতেন তাহা হইলে হয়ত' সন্তাপের বিশেষ কারণ ঘটিত না। কিন্তু ঐ সন্দেহ নিতান্ত মূর্খের ন্যায় প্রকাশ করিয়া সন্দেহভাজন (?) ছেলে ও মেয়েটীর মনে যে বীজ বপন করেন অনেক ক্ষেত্রে সেই বীজ হইতেই মহীরুহের সৃষ্টি হইয়া তাহাদিগকে ভিন্ন পথে টানিয়া লইয়া যায়। ভ্রমর যদি গোবিন্দলালকে অন্যায় সন্দেহ না করিত গোবিন্দলাল হয়ত রোহিণীর অনুরক্ত হইত না। রোহিণীর প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াই সে ভ্রমরকে শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল। সাধুকে সর্বক্ষণ চোর অপবাদ দিলে কালে সে সম্মোহিত হইয়া যদি চুরিই করে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! এক্ষেত্রে চুরির অপরাধে চুরি যে করিয়াছে তাহাকে দণ্ড দিবার সঙ্গে সঙ্গে চুরি করার মনোবৃত্তির সৃষ্টি যে করিয়াছে তাহাকে অধিকতর দণ্ড দেওয়া উচিৎ।

ফাউস্ট

কাজী আবদুল ওদুদ

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বর্গে প্রস্তাবনা। বিশ্বপ্রভু ও দেবদূতের দল—সেখানে উপস্থিত হলো মেফিস্টোফিলিস (শয়তান)। রাফায়েল গেব্রিয়েল ও মিকায়েল পদমর্য্যাদা অনুসারে প্রথমে এই তিন দেবদূতের স্তুতি নিবেদন—মিকায়েল এঁদের মধ্যে মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ। রাফায়েল গাইলেন জ্যোতিষ্ক ও আলোকের মহিমার গান—সৃষ্টির প্রভাতে তারা যেমন উজ্জ্বল ছিল, আজো তেমনি উজ্জ্বল; গেব্রিয়েল গাইলেন ধরণীর দ্রুতগতি, দিবারাত্রির সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, সফেন সমুদ্রের কল্লোল ও পর্ব্বতের ধৈর্য্যের গান; আর মিকায়েল গাইলেন বিচিত্র ঝড় ও জনপ্লাবী ধ্বংসের তাণ্ডবের গান—এই বিরাট ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টি দেখতে কত শান্ত! আর এই তিন দেবদূত সমস্বরে গাইলেন—

দেবদূতগণ বীর্য্যলাভ করে তোমা থেকে
কিন্তু তাদের কারো সাধ্য নেই তোমার অন্ত পাবার,
তোমার সৃষ্টি আজো তেমনি দীপ্ত,
যেমন দীপ্ত ছিল সৃষ্টির প্রভাতে।

ভাব-গাম্ভীর্য্যে এই দেবদূতদের স্তব বিশ্বসাহিত্যে বিখ্যাত। কবি শেলী এর যে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন সেটিও প্রসিদ্ধ।

দেবদূতদের স্তবের পরে মেফিস্টোফিলিসের উক্তি; প্রথম থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে তার বক্র ভঙ্গি—

প্রভু, তুমি আবার অনুগ্রহ করে'
জানতে চেয়েছ আমাদের দিন কেমন কাটছে,
আবার আমাকে ডেকেছ,
তাই উপস্থিত হয়েছি তোমার দাসদের মধ্যে।
মাফ কোরো, এঁদের উদার গম্ভীর সুরে সুর মেলানো
আমার সাধ্য নয়, সেজন্যে আমি অবশ্য এঁদের দ্বারা তিরস্কৃত।
আমার করুণ দশা নিশ্চয় তোমার করুণার উদ্রেক করতো
যদি হাসি তামাসা বহুপূর্বে তোমাতে লোপ না পেত।
সূর্য্য, নক্ষত্র, রকম বেরকমের জগৎ, এদের সম্বন্ধে আমার কিছুই
বলবার নেই;
মানুষ নিজেকে কত অসুখী করেছে—আমি ভাবি শুধু সেই কথা।
এই ক্ষুদ্র ভূদেবতাটি আজো চলেছে তার প্রাচীন পথে,
আজো তেমনি খেয়ালী সে যেমন ছিল সৃষ্টির প্রভাতে।
জীবনে হয়ত আর একটু সুখ সে পেতো
যদি তোমার দেওয়া স্বর্গীয় জ্যোতি তার ভাগ্যে না জুটতো!
এর নাম সে দিয়েছে বিচার-বুদ্ধি—এর থেকেই বেড়েছে তার ক্ষমতা
যে কোনো পশুর চাইতে আরো বড় দরের পশু হবার।
আমার শতকোটি নমস্কার তোমার সামনে—এই কীটটিকে মনে হয়
এক লম্বাঠ্যাং ফড়িং,
লাফিয়ে সে ওড়ে, আর উড়ে সে লাফায়,
ঘাসের মধ্যে পড়ে গায় সেই একই সুর।
যদি সেই ঘাসের মধ্যেই মুখ গুঁজে সে পড়ে থাকতো!
যেখানে সে গোবরের স্তূপ পায় তাতেই ঢুকিয়ে দেয় তার নাক।

বিশ্বপ্রভু পরম মোহন ভঙ্গিতে বল্লেন—

তাহলে এর চাইতে আর বেশী কিছু তোমার বলবার নেই?
এসেছ চিরদিনের মতো অদ্ভুত মনোভাব নিয়েই?
পৃথিবীতে কোনো দিনই ভাল কিছু পড়বে না তোমার চোখে?

মেফিস্টো বল্লে—ভাল কিছুই তার চোখে পড়ে না; মানুষের যা দশা তাতে তাকে আরো দুঃখ দিতে তারো মনে বাধে। বিশ্বপ্রভু তখন তাকে ফাউস্টের কথা বল্লেন, বল্লেন সে তাঁর অনুগত সেবক। মেফিস্টো বল্লে—

তা বটে! তোমার সেবা সে করে' চলেছে কিন্তু অদ্ভুত ভাবেই।
মর্ত্ত্যের খাদ্য ও পানীয় এই অভাগার রুচিকর নয়,
তার খেয়াল ছুটেছে দূরে দূরান্তে;
অর্দ্ধ-সচেতন সে তার এই পাগলামি এই অতৃপ্তি সম্বন্ধে—
আকাশ থেকে সে চায় উজ্জ্বলতম তারকা
মর্ত্ত্য থেকে চায় নিবিড়তম উন্মাদনা,
নিকট ও দূরের যত কাম্য
কিছুর দ্বারাই প্রশমিত হয় না তার বুকের বিক্ষোভ।

বিশ্বপ্রভু বল্লেন—

তার সেবা যদিও আজো দিশাহারা
ফিরিয়ে নিয়ে যাব আমি তাকে নির্মলতর প্রভাতে;
গাছে নতুন পাতা দেখা দিলেই মালীর চোখে ভাসে
ভবিষ্যতের ফুল ও ফলের ছবি।

মেফিস্টোফিলিস নিজের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, বল্লে—

কি বাজি রাখবে বল? তোমার পথ থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়া
এখনো সম্ভবপর, যদি আমাকে পুরোপুরি অনুমতি দাও
ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে আসতে আমার পথে।

বিশ্বপ্রভু বল্লেন—

যতদিন সংসারে সে আছে
ততদিন নিষেধ নেই তোমার,
মানুষ ভুল করবেই, যতদিন চলবে তার জীবন ও প্রয়াস।

মেফিস্টোর ধারণা বদলালো না। বিধপ্রভু তখন বলেন—

তাকে হতাশে দেবার যত চেষ্টা পার কর,
কিন্তু শেষে লজ্জিত হয়ে তোমাকে বলতে হবে—
সৎলোক পাপের পীড়নে একান্ত দিশাহারা হলেও
অন্তরে অন্তরে অনুভব করে সত্য পথের ইঙ্গিত।

বিধপ্রভু মেফিস্টোকে বলেন—অস্বীকৃতি পরায়ণ আত্মা- the spirit that denies -অর্থাৎ মানুষ বা জগতের মহত্ত্ব লঘুকরণায় যে বিশ্বাসী, সে শুধু পরিহাস বৃত্তি ; বলেন, তার মত বাচাল পার্ষদ প্রতি তাঁর কখনো ঘৃণার উদ্রেক হয় না ; মানুষ সম্বন্ধে বলেন—

মানুষের কর্মের উদ্দীপনা সহজেই আসে, নষ্ট হয়,
খোঁজে সে নির্বাধ বিশ্রাম ;
সেজন্য ইচ্ছা করে—দিই তাকে এমন সঙ্গী
যে অস্থির করে, উত্তেজিত করে, সৃষ্টি করে চলে—
শয়তানের মত।।

আর দেবদূতদের লক্ষ্য করে' বলেন—

প্রেম ও কর্তব্য-পরায়ণ ঈশ্বরের পুত্রগণ !
তোমরা ভোগ কর মহৈশ্বর্যময় চিরজাগ্রত সৌন্দর্য !
যে সদাসক্রিয় সৃষ্টির জগৎকে রেখেছে চিরবিকাশের পথে
তার অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে হও বন্দী, হও করুণা-অভিষিক্ত,
প্রবাহের যে সব চপল রূপের উদয় বিলয় হচ্ছে
তোমাদের চতুর্দিকে
সে সকলে দান কর স্থায়ী রূপ
অবিনশ্বর ভাবের সহায়তায়।

এর পর স্বর্গের দুয়ার উপরে যবনিকা পতন হলো ; দেবদূতগণ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। মেফিস্টোফিলিস একা একা বলে—

বুড়োর কথা শুনতে সময় সময় মন্দ লাগে না,
তবে চলিও খুব সভ্যভব্য হয়ে ;
এত বড় কর্তা ব্যক্তির পক্ষে এ খুব সৌজন্যের পরিচয়
যে শয়তানের সঙ্গে এমন সহৃদয় বাক্যালাপ তিনি করেন।

এই স্বর্গ প্রস্তাবনা সম্পর্কে বাইবেলের Job-এর (আয়ুব নবীর) কাহিনী সহজেই মনে পড়ে।—এর বিরুদ্ধে কোনো কোনো বড় সাহিত্যিক—কোলরীজ তাঁদের অন্যতম—এই অদ্ভুত অভিযোগ এনেছিলেন যে এতে ভগবানের সামনে শয়তানের এমন ঔদ্ধত্য দেখিয়ে ধর্মভাবকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। চরিতকার লুইস দেখাতে চেষ্টা করেছেন, মধ্যযুগের লোক-নাট্যের মধ্যেও ভগবানকে নিয়ে এমন ব্যঙ্গবিদ্রূপ অপ্রচলিত ছিল না—(কতকটা আমাদের দেশের যাত্রার মত)। বলা বাহুল্য গেটে এখানে তাঁর কাহিনীর পৌরাণিক রূপ অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছেন মূলতঃ।

বিধপ্রভুর উক্তির শেষ কটি ছত্রে সত্য ও সৌন্দর্যের যে অপূর্ব ধ্যান প্রকাশ পেয়েছে তা এক হিসাবে গেটের জ্ঞানবত্তার চরম কথা। ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে আবার এই ধরণের চিন্তার সাক্ষাৎ আমরা পাব। এই সদাসক্রিয় সৃষ্টিধর্মের দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল যেমন তাঁর সাহিত্য, তেমনি তাঁর ব্যক্তিত্ব।

লুইস বলেন, নান্দীতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে বিরাট সংসার-যাত্রার ছবি, আর স্বর্গ প্রস্তাবনায় দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে এতে রূপায়িত হয়েছে মানুষের আত্মিক সংগ্রাম। এই স্বর্গ প্রস্তাবনার দ্বারা ফাউস্ট প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে—যদিও এই দুয়ের রচনা ও প্রকাশের মধ্য কালের ব্যবধান সুদীর্ঘ। ফাউস্ট যে মূলতঃ বিরাট সংসার-জীবনের আলেখ্য, তারই মধ্য স্থান পেয়েছে মানুষের আত্মিক জীবনের বিশ্লেষণ, এই বড় কথাটা মনে না রাখলে ফাউস্টের মর্যাদা উপলব্ধি সম্ভবপর নয়।

এর পর মূল নাটক আরম্ভ হচ্ছে। এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কালে রচিত। বিশেষ করে' প্রথমে ফাউস্ট-পরিকল্পনার মূলে ছিল জ্ঞানের স্বল্পতায় অসন্তোষ ও মধ্যযুগের যাদুবিদ্যার সহায়তায় প্রকৃতির রহস্যের পূর্ণ উপলব্ধি ও জীবনে পূর্ণ উপভোগ ; কিন্তু পরে এর উপজীব্য হয়েছে মানুষের অন্তর-প্রকৃতির অনন্ত অতৃপ্তি ও সীমাহীন অগ্রগতি—যা রূপ পেয়েছে চতুর্থ দৃশ্যে ফাউস্ট ও মেফিস্টোর মধ্যে নিষ্পন্ন চুক্তিতে। এই দুই ভাবের অসঙ্গতি যে কোনো কোনো স্থলে বিদ্যমান সমালোচকরা তা দেখতে প্রয়াস পেয়েছেন। তবে এর বিভিন্ন কালে রচিত অংশসমূহের সমবায়ে কবি যে একটি অখণ্ড কাব্য খাড়া করাতে সমর্থ হয়েছেন, তা তাঁরা স্বীকার করেছেন। ক্রোচে এর বিভিন্ন অংশের স্বাতন্ত্র্য দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন বেশী। তাঁর কাব্য-বিচারের একটি মূল সূত্র হচ্ছে All art is lyrical সকল শিল্পই মূলতঃ গীতধর্মী, তাই তাদের বিচ্ছিন্নতা ও শ্রেষ্ঠ রূপ-সৃষ্টির সন্ধান তিনি করেন সমগ্র কাব্যে তত নয় যত এর বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন ভাব-মুহূর্তে। ক্রোচের এই মত অবশ্য সর্ববাদিসম্মত নয়, তবে এতে সত্যের পরিমাণ যে অনেক, অনেকের মতো আমাদেরও ধারণা তাই ; সেই সঙ্গে কাব্যের সমগ্রতার দিকে ক্রোচের চাইতে আর একটু বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি। কিন্তু এসব আলোচনা পরে হবে।

ফাউস্ট প্রথম খণ্ড অঙ্কে বিভক্ত নয়, পঁচিশটি দৃশ্যের সমষ্টি। প্রথম দৃশ্য ফাউস্টের পাঠাগার—উচ্চছাদবিশিষ্ট সংকীর্ণ গথিক কক্ষ—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মধ্যযুগের বিচিত্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, সে সবের মধ্যে রয়েছে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পুরোনো হাড়। ফাউস্ট তার টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে'—তাকে দেখাচ্ছে অস্থির। তার বিখ্যাত স্বগতোক্তি আরম্ভ হলো-

অধ্যয়ন করেছি আমি দর্শন,
আইন ও চিকিৎসা-বিদ্যা,
এবং হায়—ধর্মশাস্ত্রও—
এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, একাগ্র মনে ;
কিন্তু এত বিদ্যা আয়ত্ত করেও
হয়ে আছি অধম নির্বোধ—জ্ঞান বাড়ে নি কণামাত্রও।
সবাই বলে আমাকে আচার্য, অধ্যক্ষ,
এই দশ বৎসর ধরে' নাকে দড়ি দিয়ে চালাচ্ছি আমি,
উপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে যে দিকে খুশী,
আমার শিষ্যদের—কিন্তু বুঝেছি
আসলে জানা যায় না কিছুই !
এই জ্ঞানে দগ্ধ হচ্ছে আমার অন্তর।
নিঃসন্দেহ আমি বেশী ধূর্ত সেই অন্তঃসারহীন দলের চাইতে
যাদের বলা হয় আচার্য অধ্যক্ষ ব্যাখ্যাতা প্রচারক ;
সংকোচ ও দ্বিধা আর দুর্বল করে না আমার মন,
নরক ও শয়তান আর কম্পিত করে না আমার বুক,
তাতে আনন্দহীন হয়ে চলেছে আমার অন্তর।
বিশ্বাস করি না আর যে বাস্তবিকই কিছু জানা যায়,
বিশ্বাস করি না আর যে শিক্ষার সাহায্যে
মানুষকে করা যায় উন্নত, করা যায় পরিবর্তিত।
ভূমি ও বিত্তেরও অধিকারী নই আমি,
সংসারে নেই আমার কোনো সমাদর, কোনো কর্তৃত্ব,—
এমন হয় অদৃষ্ট দুর্দৈব কুকুরের ক্ষেত্রও।
তাই আশ্রয় নিয়েছি যাদু-বিদ্যার,—
যদি সন্ধান পেয়ে যাই বহু রহস্যের
দেবযোনিদের শক্তিতে অথবা বাণীতে ;
রক্ষা পাব তাহলে না বুঝি যা তার আবৃত্তি থেকে,—

হয়ত তাহলে পাব সেই সূক্ষ্মতম শক্তির সন্ধান
যার দ্বারা বিধৃত ও চালিত বিশ্বজগৎ ;
সন্ধান পাব বিশ্বজগতের বীজ কারণের, তার শক্তিধর্মের ;
ফাঁকা কথার ব্যবসার তাহলে পারবো পরিহার করতে।

এমন সময়ে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো আকাশের চাঁদের দিকে, সে বলে—

…তোমার বিনিদ্র আঁখি, ওগো বন্ধু,
দেখেছে আমাকে গ্রন্থ পাঠে নিবদ্ধ ;
তার চাইতে যদি তোমার স্নিগ্ধ আলোকে
দাঁড়াতে পারতাম গিরিমালার শীর্ষে,
পর্বতের কন্দরে কন্দরে বিচরতাম দেবযোনিদের সঙ্গে,
তোমার ধূসর আলোকে ভাসতে পারতাম মাঠে মাঠে,
দূষিত জ্ঞান-বাষ্প থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে
যদি নবীভূত হতে পারতাম তোমার শিশির-স্নানে !

কিন্তু এই উন্মুক্ত জগতের পরিবর্তে ফাউস্ট বন্দী তার বহু শতাব্দীর পাষাণাগারে ; তার বর্ণচিত্রিত শার্সির ভিতর দিয়ে আলোক প্রবেশ করে কষ্টে, কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথির স্তূপ জমেছে সেখানে ছাদ পর্যন্ত, তারই সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে পুরুষপরম্পরা-সংগৃহীত বিচিত্র আকৃতির যন্ত্রপাতি। ফাউস্ট বলছে—

হায়, এই আমার জগৎ !

অধীর হয়ে সে খুললে মধ্যযুগের বিখ্যাত জ্যোতিষী নোস্ত্রাদামুস-এর (১৫০৩-১৫৬৬) গ্রন্থ। নোস্ত্রাদামুস ও তাঁর পূর্বে মধ্যযুগের আরো অনেক জ্ঞানী বিশ্বজগৎকে ভাগ করেছিলেন তিন স্তরে—মর্ত্য, স্বর্গ, অতি-স্বর্গ, (ভারতীয় ভূর্ভুবঃ স্বঃ তুলনীয়)। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের কক্ষ পর্যন্ত মর্ত্য লোক, সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রের জগৎ হচ্ছে স্বর্গলোক, আর তার ঊর্ধ্বে অতি-স্বর্গ বা দিব্য-লোক। ইতালীয় ভাবুক Pico Di Mirandalo (১৪৬৩-১৪৯৪) এই তিন জগতের নাম দেন Macrocosm (বৃহৎ জগৎ), আর মানুষ সম্বন্ধে বলেন—

“এই তিন জগতের সঙ্গে আছে আর একটি জগৎ, নাম Microcosm (ক্ষুদ্র জগৎ), তার মধ্যে আছে এই তিন জগতের সব কিছু। এই জগৎ হচ্ছে মানুষ, তাতে আছে—ভৌতিক উপাদানে নির্মিত দেহ, স্বর্গীয় চেতনা, বিচারবুদ্ধি, পরম নির্মল আত্মা, আর ঈশ্বরের সাদৃশ্য।” নোস্ত্রাদামুসের বই খুলে ফাউস্ট দেখলে Macrocosm (বৃহৎ জগতের) চিহ্ন ; বিশ্বরহস্যের সম্মুখীন হয়ে সে অন্তরে অনুভব করলে অপরিসীম আবেগ, পড়লে নোস্ত্রাদামুসের এই চার ছত্র—

সূক্ষ্ম জগৎ পড়ে আছে নির্মুক্ত ;
তোমার চেতনা অর্গলবদ্ধ, তোমার হৃদয় মৃত ;
ওঠো জাগো হে জ্ঞানার্থী, ছুটে চল,
ধৌত কর তোমার অন্তর প্রভাত লালিমায়।

কিন্তু “ক্ষুদ্র” ও “বৃহৎ”-এর এই সব চিহ্নিত তত্ত্ব সম্বন্ধে সে মন্তব্য করলে—

কি মহিমময় দৃশ্য ! কিন্তু হায় শুধু দৃশ্য।

বিশ্বপ্রকৃতিকে লক্ষ্য করে সে বলে—

ওগো অসীমা প্রকৃতি, তোমাকে কেমন করে' নেব আপনার করে' ?
ওগো স্তন্যধারা, ওগো অস্তিত্বের আদি উৎস,
স্বর্গ ও মর্ত্যের নির্ভর,
তোমাকে মিনতি জানায় বিশীর্ণ চিত্ত,—
প্রবাহিত হচ্ছ তুমি, পোষণ করছ তুমি ; আর আমি মরবো দুঃখে ?

অধীর আগ্রহে বইখানির পাতা উল্টাতে উল্টাতে ফাউস্টের চোখ পড়লো ভূমি-দেবতার চিহ্নের উপরে। পরম আগ্রহে এই দেবতাকে স্মরণ করে' সে মন্ত্র উচ্চারণ করলে। এক উজ্জ্বল শিখা জ্বলে উঠলো, সেই শিখায় দেখা দিল দেবতা।

দেবতার ভয়াবহ মূর্তি দেখে ফাউস্টের শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তার এমন দশা দেখে দেবতা তাকে বিদ্রূপ করে' বলে—

…তুমি সেই (মহিমাকাঙ্ক্ষী) আমার মহিমার সামনে
কাঁপছে যার অস্তিত্বের তলদেশ পর্যন্ত,
এক কুণ্ডলীকৃত কৃমি !

তখন পুনঃ সাহসের সঙ্গে ফাউস্ট বলে—

অগ্নিমূর্তি, তোমাকে ভয় করবো আমি ?
আমি ফাউস্ট, তোমার সমকক্ষ।

দেবতা তার পরিচয় দিয়ে বলে, সে জীবন-প্রবাহ— অনন্ত পরিবর্তন অনন্ত প্রকাশ তার রূপ— সেই পরিক্রম ধারণ করে' শোভা পান বিধাতা। ফাউস্ট বলে, সেও তারই মতো চির-প্রয়াসী। তখন দেবতা বলে—

তুমি তার মতো যাকে বোঝো,
আমার মতো নও।

এই বলে দেবতা অন্তর্হিত হলো। ফাউস্ট বিহ্বল হয়ে বলে-

তোমার মতো নই !
কার মতো তবে ?
আমি, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি,
তোমার মতনও নই !

এমন সময়ে দরজায় ঘা দিলে ভাগনার—ফাউস্টের সেবক ও শিষ্য। ফাউস্ট তার পরম উদ্দীপনার ক্ষণে এমন বাধা পেয়ে একান্ত বিরক্তি বোধ করলে। ভাগনার প্রবেশ করলে মধ্যযুগীয় বিদ্যার্থীর ঢোলা-ঢালা কোর্তা পরে', তার মাথায় নৈশ শিরস্ত্রাণ, হাতে প্রদীপ।— ভাগনার গ্যেটের এক বিখ্যাত সৃষ্টি। সে একান্ত দীপ্তিহীন—কেতাবকীট, সাধুকল্প, শ্রদ্ধাবান, কঠোর পরিশ্রমী সে—পুরোনো পুঁথি ঘাঁটা যেন তার জীবনের পরমার্থ। জ্ঞানে ফাউস্টের একান্ত অবিশ্বাস, কিন্তু পুস্তকগত জ্ঞানে ভাগনারের সংশয়মাত্র নেই। সে বলে—

অপরাধ নেবেন না—আপনার আবৃত্তি শুনলাম,
আপনি নিশ্চয়ই গ্রীক নাটক আবৃত্তি করছিলেন ?
আমারো বাসনা এ বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করি
কেননা বর্তমানে এর চাহিদা হয়েছে।
অনেকের মুখে শুনেছি, ধর্মপ্রচারকের
নটের কাছ থেকে শিখবার আছে।

ফাউস্ট বলে—

হাঁ, যখন ধর্মপ্রচারক স্বভাবতঃ নট,
কখনো কখনো এমন ঘটে।

ফাউস্টের বিদ্রূপ ভাগনারের অবোধ্য। সে বলে—

সারা বছর ঘরে' পড়তে পড়তে মনে হয় একান্ত বন্দী আমি,
ছুটির দিনেও নেই মুক্তি,
জগৎকে দেখি যেন কাচের শার্সির ভিতর দিয়ে,—
কেমন করে' সেই জগৎকে জয় করা যাবে বাগ্মিতার দ্বারা ?

ফাউস্ট বলে—

সেই জয় কখনো ঘটবে না তোমার ভাগ্যে যদি অনুভূতি না জাগে,
যদি অন্তরাত্মা থেকে উৎসারিত না হয় সেই অনুভূতি—
আদিম, অকৃত্রিম,—বলের দ্বারা
যা জয় করে নেয় শ্রোতার মন।
চলতে পার জোড়াতালি দিয়ে, রিপু করে',
এখানকার খোসা ওখানকার ছিবড়া কুড়িয়ে আয়োজন
করতে পার ব্যঞ্জনের,
ভস্মস্তূপে ফুৎকার দিয়ে
চেষ্টা করতে পার আগুন জ্বালাতে !
তাতে তাক লাগাতে পারবে শিশুর দলের, বাঁদরের দলের ;

যদি তাতে তুষ্ট হতে চাও—ভাল।
কিন্তু কখনো তৃপ্তি দিয়ে অন্তর স্পর্শ করতে পারবে না
যদি তোমার নিজের অন্তর না হয় প্রদীপ্ত।

অন্তরের আবেগ, উদ্দীপনা, এ সব ভাগনারের কাছে দুর্বোধ্য। সে বোঝে কঠোর পরিশ্রমে প্রাচীন পুঁথির অর্থ উদ্ধার করা, আর তা থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাই ; তার দুঃখ, এজন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না—আয়ু অল্প। তার কথায় ফাউস্ট বলে—

তাহলে পুঁথির পাতাই তোমার কাছে পূত উৎস-ধারা,
তার বারি পান করে মেটে তোমার পিপাসা !
অন্তরের অন্তস্তল থেকে যে ধারা উৎসারিত না হয়
তা ত নয় জীবনদায়িনী সুধা।

ভাগনার বিনীত হয়ে বলে—

অপরাধ নেবেন না, বড় আনন্দ বোধ হয়
অতীতের ভাব-জগতে নিজেকে নিয়ে যেতে,
দূরে দেখতে আমাদের বহু পূর্বে কোনো জ্ঞানী কি কথা ভেবেছেন,
আর তাঁর সেই চিন্তাধারা আজ কি মহৎ উৎকর্ষ লাভ করেছে।

ফাউস্ট বিদ্রূপ করে বলে—

উৎকর্ষ লাভ করে' আকাশের তারা পর্যন্ত উঠেছে।

তারপর সে ভাগনারকে বোঝাতে চেষ্টা করলে—

শোনো বন্ধু, যে সব যুগ গত হয়ে গেছে
সে সব হচ্ছে সাত সিল মেরে প্যাক করা বইয়ের মতো ;
যার নাম দিচ্ছ অতীতের ভাবরাজি
সে সব তোমাদের ভাব ভিন্ন আর কিছু নয়,
অতীত যা তাতে প্রতিবিম্বিত ;
অনেক সময় সেই প্রতিবিম্বকে তোমরা কর কিসে বিকৃত !
তখন সে দৃশ্যে ব্যথিত হয় অন্তরাত্মা।
দেখেই যেতে হয় পালিয়ে ;
যেন জঞ্জাল ও আবর্জনার স্তূপ ;
বড়জোর একে বলতে পার এক খেলা—
কথা উপদেশ সব গুরুগম্ভীর,
শোভা পায় পুতুল-নাটেরই মুখে।

ফাউস্টের কথায় ভাগনার কেবলই বিস্ময়াপন্ন হচ্ছে, কিন্তু প্রকাশ তার প্রবৃত্তি নেই, সে বলে—

কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, মানুষ, মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক !
এ সবের কথা একটু আধটু বুঝতে চায় সবাই।

ফাউস্ট বলে—

হাঁ বুঝতে চায় মানুষের সমাজে যা জ্ঞান নামে
প্রচলিত সেই চিজ।
ছেলের ডাক-নাম কে প্রকাশ করে দেবে ?
দুইচার জন যারা বাস্তবিকই কিছু বুঝেছিল,
চায়নি কিছু গোপন করতে, নির্বুদ্ধির মতো অকপটে
সবাইকে ডেকে বলেছিল মনের কথা,
তাদের চড়ানো হয়েছে ক্রুশে অথবা পোড়ানো হয়েছে আগুনে।
তাহলে বন্ধু, রাত হয়ে গেছে অনেক,
এইবার শেষ হোক আমাদের আলাপ।

ভাগনার খুশি হয়ে বলে—

আপনার সঙ্গে আনন্দে রাত জেগে
জ্ঞানগর্ভ আলাপ করতে কত আনন্দ পাই !
কাল ঈস্টারের দিন, ছুটি,
আমি কিন্তু অনুমতি প্রার্থনা করে' রাখছি দুই একটি প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করবার।
একাগ্র সাধনা আমার পণ্ডিত হব,
জেনেছি বহু, কিন্তু জানতে চাই সব।

ভাগনার চলে গেলে ফাউস্টের দীর্ঘ স্বগতোক্তি আরম্ভ হলো—

তাকেই কখনো ত্যাগ করেনা সব আশা
অসার বস্তু প্রাণ-পণে আঁকড়ে থাকায় যার আনন্দ।
লুব্ধ হয়ে হাৎড়ে সে ফেরে গুপ্ত ধন,
আর হাতে কেঁচো ঠেক্‌লে লাফিয়ে ওঠে ফুর্তিতে।

কিন্তু ধরিত্রীর এই "দীনতম নির্বুদ্ধিতম সন্তানে"র প্রতি সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে—কেননা ভূমি-দেবতার ভয়ঙ্কর রূপ দেখে যখন তার বুদ্ধি বিভ্রান্ত ও অন্তরাত্মা অবসন্ন হয়ে পড়েছিল তখন ভাগনারের আগমনের ফলে সে ফিরে পেয়েছিল আপন সম্বিৎ। তার এখনকার নূতন চেতন সম্বন্ধে সে বলছে—

নিজেকে জ্ঞান করেছিলাম ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি,
—যেন আমার করায়ত্ত চিরন্তন সত্য—
হচ্ছিলাম দিব্য আলোকে ও ঔজ্জ্বল্যে স্নাত,
হেলায় চেয়েছিলাম (আমার মনোভাব) মাটির মানুষের প্রতি :
আমি যেন মহত্তর দেবদূতের চাইতেও, আমার নির্বাধিত শক্তি
আনন্দে সঞ্চরণ করে ফিরবে প্রকৃতির শিরায় শিরায়,
যাবে তাকেও অতিক্রম করে', আনন্দে সৃষ্টি করে' চলবে
দেবতার মতো—সেই আমার দশা দেখ !
একটি বজ্রবাণী ছিন্ন করেছে আমাকে আপন স্থান থেকে !

আর আমার সাহস নেই তোমার সঙ্গে নিজের তুলনা করি।
লাভ করেছিলাম তোমাকে নিকটে আকর্ষণ করবার শক্তি
কিন্তু তোমাকে আয়ত্ত করবার শক্তি না।
সেই পরম উদ্দীপনার মুহূর্তে
নিজেকে জ্ঞান করেছিলাম কত ক্ষুদ্র কত মহান ;
কিন্তু তুমি সবলে নিক্ষেপ করেছ আমাকে
পুনরায় মানুষের অনিশ্চিত ভাগ্যের 'পরে।
কোন্ পথ করবো বর্জন ? কার নির্দেশ করবো গ্রহণ ?
অবলম্বন করবো কি সেই (পুরাতন) বদ্ধ-সংস্কার ?
হায়, যেমন প্রতি দুঃখ তেমনি প্রতি কর্ম
ব্যাহত করে জীবনের গতি।

অন্তরাত্মার যা মহত্তম ভাবনা
তারো সঙ্গে জড়িয়ে থাকে হীন চিন্তা ·
সংসারে যাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ তা যখন লাভ হয়
তখন শ্রেষ্ঠতরকে মনে হয় প্রতারণা ও মিথ্যা।
আমাদের সুমহৎ ভাবনা, জীবনের সম্পদ ও শোভা—
সংসারের দ্বন্দ্ব-কোলাহলে হয় মূক, নিষ্প্রাণ।
আশাবতী কল্পনা যাত একদা দুঃসাহসে ভর করে'
তার কামনাকে করেছিল অনন্ত-অভিসারী,
কিন্তু আজ সে পরিতুষ্ট সংকীর্ণ পরিসরে—
যেহেতু সময়ের তরঙ্গাভিঘাতে অতল হয়েছে বহু সৌভাগ্য-তরণী।
দুশ্চিন্তা বাসা বেঁধেছে আমাদের মর্মমূলে :
তা দিয়ে চলেছে সে গোপন দুঃখরাজি,
অস্থিরচিত্ত সে, পাশমোড়া দিয়ে, আন্দোলিত করছে আনন্দ ও শান্তি
নতুন নতুন মুখোশ পরে' আসছে সে—
আসছে গৃহ কিম্বা স্ত্রী সন্ততির রূপে,
আসছে আগুন অসি বিষ পাত্রের অস্ত্রের রূপে :
বেশী ভয় আমাদের সেই সব বিপদের যা ঘটেনা কখনো

হারানো মা বা কোনোদিন যদি তার শোকে কেঁদে !
দেবতার মতো নই আমি ! বুঝেছি সে কথা মর্মে মর্মে ;
আমি বরং কৃমি কীট—ধূলায় যে আছে লুটিয়ে,
ধুলোয় কাটাচ্ছে জীবন, ধুলোয় লাভ করছে জীবিকা,
ধুলোয় হচ্ছে পিষ্ট পদাহত পথিকের পাদস্পর্শে।

মানব জীবনের ও মানব প্রয়াসের অকিঞ্চিৎকরতার চিন্তায় ফাউস্ট একান্ত মগ্ন হলো। চারদিকেই সে দেখলে ব্যর্থতার চিহ্ন। বহু শতাব্দীর পুঁথিপত্র ত তাকে কেবল শিক্ষা দিয়েছে, নিজের দুঃখ বাড়িয়ে চলাই মানুষের ভাগ্য, তারই মধ্যে কচিৎ কখনো নিঃসঙ্গ এমন কাউকে পাওয়া যায় যাকে বলা যায় সুখী। মড়ার মাথার খুলিকে লক্ষ্য করে সে বল্লে—

ওগো শূন্যগর্ভ করোটি, কটমট করে তাকিয়ে ত বলতে চাও—
তোমারো মস্তিষ্ক ছিল আমারই মতো অপরিচ্ছন্ন,
চেয়েছিল সে উজ্জ্বল দিন, কিন্তু পেয়েছিল ম্রিয়মাণ আলো আঁধার,
খুঁজেছিল তাতে সত্যের তৃষ্ণা, কিন্তু পতিত হয়েছিল হায় ভুলের গহনে !

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও তার মনে হলো ব্যর্থতার চিহ্ন—

মধ্যদিনেও রহস্যময়ী,
প্রকৃতি আছে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে যতই করো অভিযোগ ;
তোমার মনের চোখে যদি না দেয় সে ধরা
বৃথা তবে যত কল কব্জা ও হাতুড়ি।

তার মনে হলো তার পিতার আমলের যতসব যন্ত্রপাতি ও পুঁথিপত্র সে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে অথচ সে সবের ব্যবহার সে জানেনা বা করে না, সে সবের ভার তাকে বহন করতে না হলেই হতো ভাল—

পূর্বপুরুষ থেকে যা পেয়েছ
তাকে নতুন করে অর্জন কর প্রকৃতই পেতে হলে।
যাতে কাজ দেয় না তা দুঃসহ বাধা,
যে কাল যা সৃষ্টি করে তাতে কেবল সেই কালেরই প্রয়োজন।

এমন সময়ে তার চোখ পড়লো বিষের শিশির উপরে। তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বুঝলে সে এর সাহায্যে মিটবে তার মনের যত জ্বালা। মনে হলো তার মৃত্যুর পরে সে জীবন শুরু করতে পারবে নতুন নির্মলতা পেয়ে। কিন্তু সে নিজেকে প্রশ্ন করলে—

এই দেবভোগ্য আনন্দ, এই মহৎ অস্তিত্ব,
সত্য কি তোমার মতো কৃমির ভাগ্যে ?

সে নিজের মনকে আরো সবল করলে—

হাঁ, উন্নততর লোকে যাত্রার অভিপ্রায়ে
আমি পিঠ ফেরাচ্ছি পৃথিবীর কোমল সূর্যের পানে।
আমি ভেঙে খান খান করবো সেই দুয়ার,
আর সবাই যারে পাশ কাটিয়ে চলে ভয়ে ভয়ে !
মানুষের মহিমা দেবতার উচ্চ মহিমার সাথে
সমান হয়েছে এই বজ্রবাণী কাজ দিয়ে ঘোষণা করবার ;—
ভয় নেই সেই আঁধার অতলে ঝাঁপ দিতে
কল্পনা যাকে নিয়ে রচনা করে বিভীষিকা ;—
ভয় নেই সেই সঙ্কটের পানে অগ্রসর হতে
যার সংকীর্ণ পরিসর দিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে নরকের আগুন ;
সময় হয়েছে হাসিমুখে পা বাড়িয়ে দিতে
যদিও তাতে লাভ হয় পূর্ণ নিশ্চিত বিলয়।

সে নামিয়ে নিলে তার উজ্জ্বল কাচের পেয়ালা—যা তার বহু উৎসব-দিনের সাক্ষী ; স্মরণ করলে সেই সব বন্ধু-সম্মেলনের দিন, সেই সব সম্মেলনে পেয়ালার উপরে অঙ্কিত কারুকলার ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা। তারপর তাতে বিষ ঢেলে সে মুখে তুলে ধরলে। এমন সময়ে ধ্বনিত হলো ঈস্টারের আনন্দময় ঘণ্টাধ্বনি ও সঙ্গীত।

দেবদূতদের সঙ্গীত—

খৃষ্ট হয়েছেন উত্থিত !
মরণ পীড়িত তোমাকে নমস্কার—
ভাগ্যহীনেরা
অনুসরণকারীরা
পারবে কেন তোমাকে বন্দী না করে।

এই পরিচিত পবিত্র সঙ্গীত তাকে স্পর্শ করলে। মুখ থেকে সে পেয়ালা নামিয়ে দিলে। সে স্মরণ করলে খৃষ্টের মরণ মৃত্যু-রজনীতে দেবদূতগণের কণ্ঠে ভগবানের এই নূতন অঙ্গীকার।

তারপর ধ্বনিত হলো নারীদের শোক—তারা পরম যত্নে ধৌত করেছিল, সুবাসিত করেছিল, সজ্জিত করেছিল খৃষ্টের দেহ, সেই দেহ আর তারা দেখছে না !

এর পর দেবদূতদের দ্বিতীয় সঙ্গীত—

উত্থিত হয়েছেন খৃষ্ট !
পরেছেন তিনি আনন্দের বসন,—
যে দুঃখ তাঁকে হেনেছিল আঘাত,
যে পরীক্ষা তাঁকে ফেলেছিল ফাঁদে,
সব অবসান হয়েছে মহিমায় !

ফাউস্ট বল্লে—

স্বর্গীয় সঙ্গীত-ধ্বনি,
আমাকে কেন খুঁজ করতে এলে এই ধূলির 'পরে ?
ধ্বনিত হও বরং কোমল হৃদয়ের দেশে।
তোমাদের বাণী প্রবেশ করে আমার কর্ণে
কিন্তু অন্তরে নেই ত প্রত্যয় !
প্রত্যয়ের প্রিয়তম সন্তান নাম অঘটন।
দেশ থেকে আসছে এই আনন্দধ্বনি
সাহস নেই আমার মনের সেই দেশে বিচরণ করতে,
কিন্তু অভ্যস্ত হয়েছি এই ধ্বনিতে শৈশব থেকে,
নতুন করে' ডাকতো এই ধ্বনি আমাকে জীবনের পথে।
সেদিনে, রবিবাসরের শুভ্র স্তব্ধতায়
অনুভব করতাম স্বর্গের উষ্ণ চুম্বন ললাটের 'পরে ;
মধুর ঘণ্টা বাজতো গম্ভীর রবে রহস্যময় শক্তি সঞ্চার করে',
প্রার্থনা ডুবিয়ে দিত আমাকে আনন্দ-সাগরে ;
অজানা পুলক
ডাক দিত কাননে কান্তারে,
বুক ভরতো আনন্দে, অঝোরে ঝরতো অশ্রু,
অনুভব করতাম অন্তরে নতুন জগতের জন্ম।
এই ধ্বনিতে সূচিত হতো তরুণ-তরুণীর আমোদ কৌতুক,
সূচিত হতো সব বসন্তের উৎসব ;
স্মৃতি ধরেছে আমাকে জড়িয়ে শিশুর মতো,
রোধ করছে আমাকে চরম পদক্ষেপ থেকে।
বাজো বাজো স্বর্গের বাদ্য, এত মধুর এত কোমল !
অঝোরে ঝরছে অশ্রু—ধরণী, ফিরে পেলো তার সন্তান !

এর পর খৃষ্টশিষ্যদের সঙ্গীত—

বিজয় গৌরবে
ছিন্ন করেছে সে কি কবর-বাস,
আসীন হয়েছে এখন পরম মহিমায় ?
মহৎ বিকাশের আনন্দে
সমীপবর্তী সে কি স্রষ্টার আনন্দের ?
হায়, ধরণীর দুঃখ
আজো আমাদের ভাগ্য।

আমরা হায় শিকল,
দেখিনা তাকে সংসারে ;
কাঁদিলেও কাঁদি আমরা ;
প্রভু, তাই তোমার পরম শান্তি !
এর পর দেবদূতদের তৃতীয় সঙ্গীত—
খৃষ্ট হয়েছেন উত্থিত,
গ্লানির গর্ভধাম থেকে।
ছাড়ো তোমার কারাগার
নিস্তার হও তা থেকে !
অনুরাগে তাঁর মহিমা গেয়ে,
কাজে দেখিয়ে সেই প্রেম,
জ্ঞান করে' সবে আপন ভাই,
ভাগ দিয়ে সবে খেয়ে,
সবার কানে দিয়ে স্বর্গের আশ্বাস
যেখানে যে আছে দুঃখী,
লাভ হয় প্রভুর সান্নিধ্য —
আজো দেখো তাঁকে জাগ্রত !

(ক্রমশ:)

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপন

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায় এম-এস্-সি

একটিমাত্র বর্ণের অর্থাৎ 'প' বর্ণের আধিক্য ব্যতীত, 'বিজ্ঞাপন' শব্দটির সহিত 'বিজ্ঞান' শব্দের গঠন বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু এই একটি বর্ণের জন্য অর্থের কত তফাৎ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য বর্ণাধিক্যের জন্য অর্থের এইরূপ বিভিন্নতা অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয় যেমন, স্মরণ, বিস্মরণ, চুম্বক-চুম্বন, ইত্যাদি। শব্দতাত্ত্বিক নহি, সুতরাং এ বিষয়ে অনধিকার চর্চা না করাই শ্রেয়ঃ। তবে এইমাত্র বলা যায় যে শব্দবিশেষে বা অর্থের দিক হইতে আপাতঃ পার্থক্য থাকিলেও, এই সকল শব্দ দুটির মূলতঃ এক। যেমন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপন, দুইটি শব্দেরই সংস্কৃত জ্ঞা ধাতু হইতে উৎপত্তি। সে যাহা হউক, শব্দ দুইটির মধ্যে ব্যাকরণগত ঘনিষ্ঠতা থাকিলেও আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই ঘনিষ্ঠতা কম নহে। ব্যাপকভাবে ধরিতে গেলে, 'বিজ্ঞান অর্থে কোন বিষয়ে রীতিবদ্ধ জ্ঞান' (Systematised knowledge) এবং 'বিজ্ঞাপন' অর্থে অপরকে কোন বিষয় 'জ্ঞাত করা' এইরূপই আমরা বুঝি। বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞান, এই দুই শব্দ সম্বন্ধে যে কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতে পারে, বাহতঃ অবশ্য তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এইরূপ মনে করা যে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নহে, আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা বুঝা যাইবে।

বহুকাল হইতে দৈনন্দিন বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান যে বিশেষ কৃতকার্যতার পরিচয় দিয়া আসিতেছে, অধুনা আমরা তাহা সম্যক উপলব্ধি করি। মনের ক্ষেত্রেও মনঃসম্বন্ধীয় কত প্রকার সমস্যার সমাধান বিজ্ঞান করিয়াছে এবং কত গভীরতম সমস্যার নির্দেশ ও তাহাদের রহস্যোদ্ঘাটনে প্রয়াস পাইতেছে, তাহা সত্যই একটি অভাবনীয় ব্যাপার। প্রয়োজন ক্ষেত্র অনুযায়ী, বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখার সৃষ্টি হইয়াছে এবং মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। বিশিষ্ট প্রণালী ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বহু পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে, বৈজ্ঞানিকগণ মনের সম্বন্ধে যে সকল মূল্যবান তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন, সেগুলি কার্য্যক্ষেত্রে বিধিবদ্ধভাবে প্রয়োগ করা যে অযৌক্তিক নহে, তাহা স্বীকার করিতে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞানের (অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের) মধ্যে এইখানেই যোগাযোগের সূত্র। বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য মানবমনের উপর কোন বিষয়ে রেখাপাত করা। সুতরাং মনের ক্ষেত্রেই যখন বিজ্ঞাপনের কার্য্যকারিতা সীমাবদ্ধ তখন মনোবিজ্ঞানের মূল্যবান তথ্যের উপর নির্ভর করা ব্যতীত, বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সাফল্যলাভ করিতে পারে না। সে যাহা হউক আমাদের দেশে বিজ্ঞাপন কার্য্য মোটামুটি কি ভাবে চলিয়া আসিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। তবে এই আলোচনা করিতে যাইলে, অপর একটি প্রসঙ্গের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। প্রসঙ্গটি হইতেছে প্রচারকার্য্য। বিজ্ঞাপন, সাধারণ প্রচার কার্য্যের একটি বিশেষ অঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং প্রচার কার্য্যকে মোটামুটি কেন্দ্র করিয়া আলোচনা শুরু করিব।

আমরা এখন সভ্যজগতে বাস করিতেছি এবং শিল্প বা বাণিজ্যের উন্নতিই যে জাতির সভ্যতা বা কৃষ্টির পরিচায়ক, তাহা আমরা সাধারণভাবে মানিয়া লই। কোন ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি, বিস্তারলাভ বা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার অন্যতম প্রধান উপায় যে প্রচারকার্য্য তাহা সর্ববাদিসম্মত। পূর্বে যখন রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী বা সংবাদপত্রের তেমন প্রচলন ছিল না, তখন ঢাঁড়া পিটাইয়া, ঘণ্টা বাজাইয়া এবং চিৎকারের সাহায্যে লোক জমাইয়া স্থানীয় প্রচারকার্য্য চলিত। এখনও যে এ রীতি নাই তাহা নহে। গ্রামে গ্রামে, রেলগাড়ীতে, এমন কি বড় বড় সহরের পথে ঘাটেও ফিরিওয়ালার চিৎকার লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। ফিরিওয়ালা ভিন্ন কত রকম ভাবে যে প্রচারকার্য্য চলে, তাহা দেখিলে রীতিমত বিস্ময় লাগে। সংবাদপত্র, বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা এবং সিনেমার পর্দার মধ্যস্থতায় 'প্রচারকার্য্য' বিশেষভাবে চলিতেছে। গৃহস্থের বাড়ীর দেওয়ালে, 'বিজ্ঞাপন মারিও না' নোটিশ বিলম্বিত থাকা সত্ত্বেও, কত শত প্লাকার্ড যে সেই দেওয়ালেই আটকাইয়া যায়, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বিজ্ঞাপন আঁটার ফলে কাগজের কি ইঁটের দেওয়াল আবিষ্কার করাই সময় সময় কঠিন হইয়া পড়ে। তারপর দেখা যায় হ্যাণ্ডবিল বিতরণের প্রথা। নির্দিষ্ট সংখ্যক হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করিতে পারিলেই কর্তব্য সম্পাদিত হইবে, এই বুদ্ধিতে বিতরণকারী নিরীহ পথচারীর পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাহাদের হাতে কত সময়ে হ্যাণ্ডবিল গুঁজিয়া দিয়া আসে। ইচ্ছা থাকিলেও এড়াইয়া যাইবার কোন পথই পথচারী খুঁজিয়া পায় না। ট্রামে বা বাসে চাপিয়াও নিস্তার নাই। চলন্ত গাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া একটি দলাপাকানো কাগজ সজোরে আপনার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। আপনি ত প্রথমটা চমকাইয়া উঠিলেন, তারপর হয়ত বিরক্তিভরে কাগজের দলাটি খুলিয়া দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে, "...হতাশ হইবেন না,...এই ত সুবর্ণ সুযোগ..."। সুবর্ণ সুযোগই বটে ! "সাতদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর বড় আটা......" ইত্যাদি সাধুভাষা মনের মধ্যে ভীড় করিয়া আসিতে না আসিতেই আপনার গন্তব্যস্থান আসিয়া পড়িল, আপনি নামিয়া পড়িলেন। হ্যাণ্ডবিলের সাধু উদ্দেশ্যের কি শোচনীয় পরিসমাপ্তি।

তারপর দেখি ক্যান্‌ভাসার্ ও Salesmanএর প্রচলন। ইহাদের মধ্যেও আবার তথাকথিত সভ্যতার নির্দেশানুযায়ী, সাজ-পোষাকের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। সাহেবী পোষাক হইতে আরম্ভ করিয়া পাগ্‌ড়ী ও রং-চংএ জামা, গেরুয়া বসন ইত্যাদি কত রকম সাজ পোষাকই দেখা যায়। সেদিন হঠাৎ দেখিলাম রাস্তায় খুব ভীড় জমিয়াছে, ভাবিলাম হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ভীড়ের নিকট যাইতেই সে সন্দেহ দূরীভূত হইল। দেখিলাম, এক ব্যক্তি আজানুলম্বিত একটি ঘাগ্‌রা পরিয়া, মাথায় পরচুলা চড়াইয়া যথারীতি নারীবেশে সজ্জিত হইয়াছে। মুখে তাহার পুরু করিয়া এক পোঁচ রং লাগানো, পায়ে ঘুঙুর বাঁধা, এক হাতে একটি ছোট হাতবাক্স ও আর এক হাতে একটি শিশি। ব্যক্তিটি (নারী-সংস্করণ) নারী-সুলভ অঙ্গভঙ্গী ও ব্রীড়ার সহিত নৃত্যসহকারে সপ্তম সুরে গান গাহিয়া দর্শকবৃন্দকে শিশিস্থিত দ্রব্যের বহুমূল্যতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণের প্রয়াস পাইতেছে। দর্শকদের কাহারও কাহারও বিস্ফারিত চক্ষু, আত্মবিস্মৃত ভুঁড়ির আরাম ও সভয় হাস্যও লক্ষ্য করিলাম। বিক্রয় যে হইতেছে না তাহা নহে, দু একজনকে কিনিতেও দেখিলাম। শুধু স্ত্রীবেশী পুরুষ কেন, মাঝে মাঝে মেয়েদেরও ক্যানভাসার বা Saleswomanরূপে দেখা যায়। নারী বা তাহার প্রতিকৃতির মধ্যস্থতায়, দ্রব্যবিশেষ জনসাধারণের নিকট ক্রয়ের ব্যাপারে লোভনীয় হয় কিনা জানি না। বিশেষজ্ঞেরা হয়ত 'হাঁ' বলিবেন, কিন্তু 'হাঁ' বলিলেও তাহারও যে একটা সীমা ও রকমফের আছে, ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। আবার কখনও কখনও দেখা যায়, সে কোনরূপ বাহ্যিক আড়ম্বর নাই, যেটুকু আছে তাহা কেবল ভাষার মারপ্যাঁচ। সাধারণের অবস্থা বুঝিয়া বিক্রেতারা চিৎকার করে, "বহুৎ সস্তা মিলিতে বাবু, এইসান্ কভি নেহি মিলেগা।" এই হাঁক-ডাকে অনেকেই আকৃষ্ট হন এবং কেবল ভাষার মারপ্যাঁচে, বাসি, পচা, ভাঙ্গা ইত্যাদি অব্যবহার্য দ্রব্য অনায়াসেই বিক্রীত হইয়া যায়। শুধু যে চাউল, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি ইহলোকের দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চলে তাহা নহে, পরলোকে কি করিয়া অক্ষয় লাভ ঘটিবে সে সম্বন্ধেও চলে। 'তিনদিনে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য, পাঁচদিনে কুণ্ডলিনীকে সুষুম্নাপথে জাগ্রত করাইবার ক্ষমতালাভ ও সাতদিনে ভগবদ্দর্শন', এইরূপ মতবাদ সম্বলিত পুস্তকও বাজারে চালাইবার চেষ্টা হইয়া থাকে। কতপ্রকার বিচিত্র ও অদ্ভুতভাবে প্রচারকার্য্য চলে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমি কয়েকটির উল্লেখ করিলাম মাত্র যাহা সকলেরই নজরে আসিয়া থাকিবে। এইরূপ এলোপাতাড়ি প্রচারকার্য্যের ফলে কত কোম্পানী যে লালবাতি জ্বালিয়াছে এবং কতজন যে রীতিমত লোকসান খাইয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রচারকার্য্যের অন্যতম হইতেছে বিজ্ঞাপন। অমুক দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়, তাহার গুণাবলী কি ইত্যাদি বিবরণযুক্ত একটি বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে বা পত্রিকায় মুদ্রিত হইল। ইহাতে সব সময় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় না দেখিয়া, এই ধরণের বিজ্ঞপ্তির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন ঘটিল। প্রথমেই দেখা যায়, ভাষার সংযোগ, যেমন, 'সস্তা অথচ উত্তম', 'নিজ দেশে প্রস্তুত', ইত্যাদি। এইরূপ দাবী অবশ্য সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যখন জনৈক প্রসাধন-ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপনের ঘটা দিয়া দাবী করিয়া বসিলেন যে ......'ব্যবহার করিলে, মুখের রঙ্ উজ্জ্বল হইবে এবং রমণী যতই শ্যামবর্ণা হউন না কেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গৌর আভা ফুটিয়া উঠিবে' তখন কি তিনি ভাবিয়া দেখেন যে শ্যামবর্ণা নারীগণ, যাঁহাদের জন্য বিশেষ করিয়া বিজ্ঞাপনটি উদ্দিষ্ট, তাঁহাদের মনে এই দাবী কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে? কেহ হয়ত একবার পরীক্ষা করিবেন এবং তাহাই শেষ, আর কেহ হয়ত একেবারে গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, এই ভাবিয়া যে—কয়লা ধুলে কি ময়লা ছাড়ে? ইহার সহিত তুলনা করুন, বিদেশী বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপনসমূহ যথা—'Johnny walker, born in 1820, but still going strong', 'you don't know what you are missing......' ইত্যাদি। আবার দেখা যায় যে দুইটি কাল্পনিক ব্যক্তির মধ্যে প্রশ্নাকারে একটি কথোপকথন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যেমন, "উঃ কি রকম শীত প'ড়েছে দেখো"—"কেন গায়ে ত অনেকগুলো জামা চড়িয়েছ, তাতেও শীত ভাঙছে না—" "আঃ তাই কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, উঃ হুঃ...আচ্ছা তোমার গায়ে ত মনে হয় গোটাদুই জামা, তোমার শীত করছে না"—"একটুও না বরং গরম হচ্ছে—হাঁ ভাল কথা, এক কাজ কর...এর দোকানে যাও। সেখান থেকেই, আমি এই জামা কিনেছি, প্রায় বছর পাঁচেক হ'লো, একটুও টসকায়নি, যেমনটি কিনেছিলাম, ঠিক তেমনটি রয়েছে, অথচ দামটাও একদম জলের মত সস্তা"। তারপর আমরা দেখিতে পাই, বিজ্ঞাপনে চিত্র ব্যবহার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে পুরুষ অপেক্ষা নারীচিত্রের প্রচলন একটু বেশী। বিজ্ঞাপনদাতারা হয়ত মনে করেন যে নারীচিত্র সাধারণের নিকট বেশ আকর্ষণের বস্তু হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রব্য অনুযায়ী ইহা হয়ত কার্য্যকরী হইতে পারে, কিন্তু তাহার কি কোন সীমা নাই? জনৈক কবিরাজ মহাশয়, বিজ্ঞাপন দেন, "অম্লশূল...এইরূপ...ঔষধ থাকিতে, হজম হইল না বলিয়া, পেটে হাত বুলাইয়া ও ঢেঁকুর তুলিয়া দুঃখ করিতে হইবে না..."। ইহার সহিত আছে ডানাযুক্ত উলঙ্গ পরীর চিত্র, বটিকাহস্তে উড্ডীয়মান। হজমের ঔষধের বিজ্ঞাপনে এইরূপ চিত্রের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে, আপনারাই বিচার করুন। আবার দেখা যায় যে বিজ্ঞাপনের সহিত কোন বিশিষ্ট নামজাদা ব্যক্তির দ্রব্য সম্বন্ধে নিজ অভিমত জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কিন্তু কখনও কখনও এমনও হয় যে এই প্রণালীর অপপ্রয়োগবশতঃ বিজ্ঞাপনটি সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছে এবং ইহার আসল উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে। যেমন ধরুন না কেন, কোন বিখ্যাত মহাশয় ব্যক্তি যাঁহার মাথায় কোনদিন টাক পড়ে নাই এবং অনেকেই তাহা জানেন, তিনি যদি অভিমত প্রকাশ করেন,—"এই তৈল ব্যবহার করিয়া আমার কেশবিরল মস্তকটি কেশপূর্ণ হইয়াছে"—তাহা হইলে সাধারণের নিকট বিজ্ঞাপনের মূল্যটি কিরূপ দাঁড়াইবে? এই ত গেল সংবাদপত্রে, পত্রিকায় বা সিনেমার পর্দায় বিজ্ঞাপন দিবার সাধারণ কয়েকটি প্রণালী।

কেহ কেহ আবার সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের বিজ্ঞাপন প্রথা অবলম্বন করেন। ইহা পূর্ব্বকথিত প্রণালীর মত স্থির (static) নহে, ইহাতে গতি (motion) আছে। যথা, শেয়ালদহ ষ্টেশনে দেখা যায় যে একটি কাঁচের আধারের মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানীর বিজ্ঞাপনগুলি তড়িতের সাহায্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে। চৌরঙ্গীতে ব্রিষ্টল্ হোটেলের উপরে 'ইলেক্‌ট্রিক লাইন্‌স' দ্বারা বিজ্ঞাপনের এক নূতন ধরণের প্রচলন কিছুদিন চলিয়াছিল। ফারপো হোটেলের বারান্দায় 'নিয়ন' আলোকে প্রজ্বলিত, 'বোতল ডগ, বেবি'এর চিত্র আপনারা হয়ত এখনও ভোলেন নাই। কোন কোন দোকানের 'শো-কেস্'-এ সজ্জিত ঘূর্ণায়মান ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি আপনারা হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'পিয়ার্স' সাবান কোম্পানী নীল আকাশকে পশ্চাদ্‌ভূমিরূপে ব্যবহার করিয়া এরোপ্লেন নিঃসৃত ধূমের সাহায্যে অভিনব উপায়ে 'P-e-a-r-s' এই শব্দটি লিখিয়া অনেককেই বিস্মিত ও আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। চলচ্চিত্রের সাহায্যে সিনেমায় কোন মোটর কোম্পানী (যতদূর মনে পড়ে ফোর্ড মোটর কোম্পানী) এবং 'ডাল্‌ডা বনস্পতি' তাঁহাদের দ্রব্যের সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গতিযুক্ত (dynamic) বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে আরও বহু উদাহরণ আছে।

আবার স্থির ও গতিযুক্ত বিজ্ঞাপনের মাঝামাঝি একটি প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ঠিক স্থির নহে, অথচ সম্পূর্ণ গতিযুক্ত বলাও চলে না। মানবমনে কৌতূহল উদ্রেক করাই এই প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য। যেমন

বলুন না কেন, দৈনিক সংবাদপত্রে একটি পৃষ্ঠায় বেশ বড় করিয়া একটি মাত্র অক্ষর মুদ্রিত হইল—'D', তাহার নীচে ছোট অক্ষরে লেখা রহিল, 'Do you know, what it is?—wait, see to morrow's paper', পরদিন 'D' এর পার্শ্বে সম অক্ষরের আর একটি অক্ষর ছাপা হইল, 'O'; তার পরদিন ছাপা হইল 'X' উদ্দেশ্য হইতেছে 'BOX' এই শব্দটি ছাপা। 'আর কি ছাপা হইবে', এই কৌতূহল, বিজ্ঞাপনের দিকে সাধারণের মনোযোগ যে আকর্ষণ করিবেই তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই প্রণালীর বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে, যেহেতু সমস্ত বিষয়টি একই সময়ে ছাপা হইতেছে না এবং কিয়ৎপরিমাণে পরিস্ফুট বটে, কারণ পড়িতে যেরূপ ধারাবাহিকতা আছে, ইহাতেও ঠিক সেইরূপ বর্তমান। Capstan Cigarette কোম্পানীকে কয়েক বৎসর পূর্বে এই প্রণালী অনুযায়ী বিজ্ঞাপন দিতে দেখিয়াছিলাম। প্রণালীটি মূলতঃ অনেকের নিকট খুবই সাধারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ইহার পিছনে যে কতখানি চিন্তাধারা লুক্কায়িত আছে, তাহা চিন্তা করিলে সহজেই অনুমিত হইবে।

ইহা ব্যতীত 'বিনামূল্যে অতিরিক্ত উপহার' বা 'কন্‌সেশন্‌' ইত্যাদি ঘোষণা সময় সময় আশানুযায়ী ফলপ্রদ হয়। কিন্তু এই প্রকার ঘোষণা, আসল দ্রব্য সম্বন্ধে যে অনেকের মনে লঘু ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে, সে দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

কত বিভিন্ন উপায়ে আমাদের দেশে প্রচার কার্য্য চলে, তাহা দেখা গেল। ইহাও বুঝা গেল যে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যে সকল দিকে লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন, সেগুলি সবই মনঃসম্বন্ধীয়। মনোবিদের মতে বিজ্ঞাপনের দ্বারা এইরূপ হওয়া উচিৎ যাহাতে বস্তুবিশেষ সম্বন্ধে জনসাধারণ একটি স্বতঃ আকর্ষণ অনুভব করেন, তাহা পাইবার জন্য তাঁহাদের মনে তীব্র ইচ্ছার উদ্রেক হয়, প্রয়োজন মাত্র বস্তু বিশেষটির কথাই প্রথম স্মরণ হয় এবং পরিশেষে তাঁহারা যাহাতে কোনরূপ বাধা অনুভব না করিয়া সেই বস্তু ক্রয় করিতে পারেন তাহা কার্য্যে ফলবতী করা। মানবমনের সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া, কৌতূহল সৃষ্টি করিয়া, বস্তুবিশেষ লাভ করিবার বাসনা উৎপাদনই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সোপান।

মনের দুই অংশ—সজ্ঞান (conscious) ও নির্জ্ঞান (unconscious) সকল প্রকার মানসিক বৃত্তি মনের দুই অংশেই বর্তমান। মনের যে কোন সমস্যার ব্যাপারে, সজ্ঞান বা নির্জ্ঞান কোন অংশকেই অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। বিজ্ঞাপনদাতাদের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তাঁহাদের কার্য্যাবলী সজ্ঞান মনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। যুক্তির দ্বারা, তর্কের দ্বারা সজ্ঞান মনের সকল বাধা দূর করা হয়ত সম্ভব, কিন্তু নির্জ্ঞান মনের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না—নির্জ্ঞান মন যুক্তির বা তর্কের বশীভূত নহে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, যে নির্জ্ঞান অংশে যে সকল মানসিক বৃত্তি বা প্রবণতা জমা থাকে, সজ্ঞান মন তাহাদের 'গর্হিত' বলিয়াই মনে করে এবং তাহাদের কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রকাশের পথে অহর্নিশ বাধা দেয়। মনে করুন, একদা হঠাৎ এক তন্বীশ্যামাশিখরদশনা···দেখিয়া আপনার মাথা ঘুরিয়া গেল,—তাহাকে পাইবার জন্য দুর্দমনীয় লোভ আপনাকে পাইয়া বসিল। এই লোভ যে আপনার নির্জ্ঞান মনের সে কথা বলাই বাহুল্য। সজ্ঞান মনের কাছে অগ্রাহ্য হয়। সে এক ধমকে আপনার নির্জ্ঞানের এই প্রেরণাকে কাবু করিয়া দিল, বলিল, 'ছিঃ ছিঃ কর কি, তোমার এ আকাঙ্ক্ষা দুর্নীতিপরায়ণ ও সমাজ বিরুদ্ধ।' এ রকম বাধা অনুভব না করিলে, মানবসমাজের কি অবস্থা হইত, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আপনারা বলিতে পারেন যে, নির্জ্ঞান মন যদি এতই খারাপ, তাহা হইলে তাহাকে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিবার কি প্রয়োজন। ইহা যুক্তির কথা বটে, কিন্তু যেহেতু নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব বা তাহার কার্য্যাবলী অস্বীকার করিবার ত কোন উপায় নাই। সে যাহা হউক, সৌন্দর্য্যবোধ, আকর্ষণ, লাভের বাসনা বা অর্জন-ইচ্ছা (acquisitive Complex) ইত্যাদি, ইহাদের স্থিতি মনের নির্জ্ঞান অংশেই। কি পন্থা অবলম্বন করিলে বিজ্ঞাপনদাতা, মনের এই নিভৃত অংশে তাঁহার আবেদন পৌঁছাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন, মনোবিদ্‌গণ তাহারও নির্দেশ দিয়াছেন। নির্জ্ঞান-বস্তু সজাগ করিয়াই কার্য্য শেষ হইল না। কারণ সজাগ হইলেও সজ্ঞান মনের সহিত তাহার সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। বিশেষজ্ঞের মতে বিজ্ঞাপনের ভাষা এমন হওয়া উচিৎ যাহার দ্বারা নির্জ্ঞান মন সাড়া ত দিবেই, উপরন্তু তাহা এমন ভাবে কার্য করিবে, যাহাতে সজ্ঞান মনের বাধা দিবার কিছুই থাকিবে না। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের দ্বারা উদ্দীপিত ইচ্ছার শক্তি এত প্রবল হইবে যাহার ফলে সজ্ঞান মনের সকল বাধা, আপত্তি বা রুচি তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। অতএব, বিজ্ঞাপনদাতার নিকট সজ্ঞান বা নির্জ্ঞান, মনের কোন অংশই অগ্রাহ্য করিবার নহে। বিদেশী বিজ্ঞাপন-দাতাগণ যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন তাহা তাঁহাদের বিজ্ঞাপন-ধারা হইতে অনুমান করা যায়।

মনোবিদ্‌গণ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। আমাদের দেশীয় বিজ্ঞাপন-দাতাগণ, অনেক ক্ষেত্রে কিরূপ খেয়ালীপনার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়াছি। মনোবৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তিস্থাপন ব্যতিরেকে, বিজ্ঞাপনদাতাগণের অভীপ্সিত ইচ্ছা কখনই সাফল্যলাভ করিতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশমণ্ডলী, বিশেষভাবে আমেরিকা, এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগামী। ইহাদের প্রচারকার্য্যের পদ্ধতি সত্যই অদ্ভুত। নিত্য নূতন প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে এবং এই কার্য্যের জন্য সকল কোম্পানী নিয়মিতভাবে মনোবিদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রচার কার্য সম্বন্ধে মনোবিদ্‌গণ রীতিমত গবেষণাও করেন। প্রচারকার্য ও তাহার গবেষণার জন্য অজস্র অর্থ মার্কিণবাসীরা ব্যয় করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যের তুলনায় অল্প হইলেও, আমাদের দেশেও প্রচারকার্য্যের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা নিতান্ত অল্প নহে, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক রীতিনীতির অভাব থাকে বলিয়া, আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। অনেক সময়ে দেখা যায় যে বিজ্ঞাপনদাতাগণ পাশ্চাত্য প্রথা অবাধ নকল করিয়া কার্যে অগ্রসর হইয়া থাকেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিৎ, যে আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষার বিকাশ ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী পাশ্চাত্য প্রণালী যদি বিবেচিতভাবে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের অভীপ্সা কখনই সাফল্য লাভ করিবে না।

গান

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

দেখেছি গো তারে শেফালীর বনে
সোনালী শারদ প্রভাতে।
শুনেছি গো তাঁর বাঁশরীর তান
মধুর মাধবী নিশাতে।
বন-পথে তারে দেখেছি
ফাগুনের খেলা-শেষে;
স্নিগ্ধ মুরতি গোপনে বিলায়
বন-যূথিকার বেশে।
দীঘীর বুকে শুভ্র কমল—
সেখানে সে যে গো রূপে চল্-চল্!
দখিন বাতাসে সে যে ভেসে আসে
আমারি হৃদয় মাতাতে।

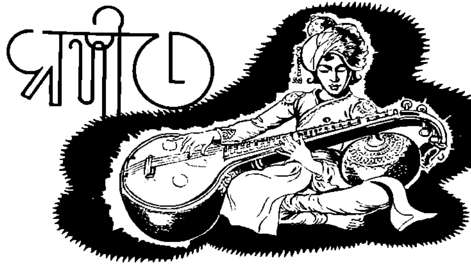

কীর্ত্তন

কুঞ্জ কলিতে ভুঞ্জিতে মধু
যেমতি ভ্রমর আসে
আজিকে তেমতি রাধিকা শ্রীমতী
মিলিল শ্যামের পাশে।
মুরলীর মধু বঁধু মন ভরি'
ঢালিয়াছে শ্যাম চিত পরিহরি
(তাই) সরম ভরম তেয়াগিনী রাধা
চিত-আনন্দে ভাসে।

শ্যামে নীল তনু তনুর পরশে
সাজিল মধুর অতি
যেন রে গগনে চাঁদের উদয়
ঢালিতে বিমল জ্যোতিঃ,
শ্যামহীনা কিগো বিরহিনী বাঁচে
অতনু মদনে যৌবন যাচে
উছল নয়নে এমন পীরিতি
অঙ্গেতে পরকাশে।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত। সুর, আখর ও স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এম-এস্-সি

প্রথম লহরী—নট-বেলাবলী

গমা -পা পা । পা পা পা মা -ধা পা মা গা রা I
কুঁ০ ০ ঞ্জ ক লি তে ভুঁ ০ ঞ্জি তে ম

গা পা পা । পা গা মা । পা -ধা পধা -নর্সা -ধনা -া I
যে ম তি ভ্র ম র আ ০ সে০ ০ ০ ০ ০ ০

পা ধর্সা র্সা র্সা র্সা র্সা । না র্সা না ধা ণা ধা I
আ জি০ কে তে ম তি রা ধি কা শ্রী ম তী

পা ধা পা । মা গা মা । পা -ধা পধা । -নর্সা -ধা -না I (১)
মি লি ল শ্যা মে র পা ০ শে০

আস্থায়ী

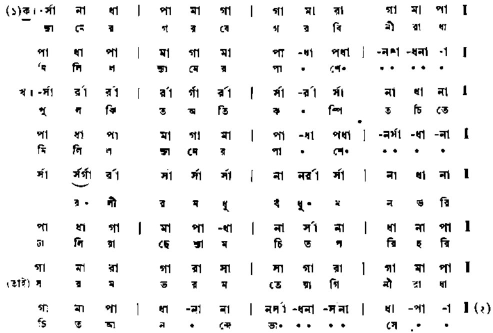

আস্থায়ী

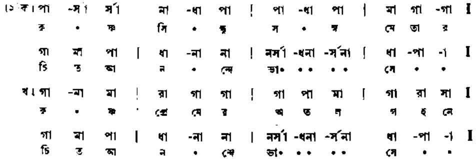

দ্বিতীয় লহরী—বেহাগ

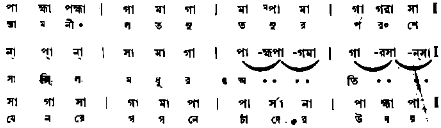

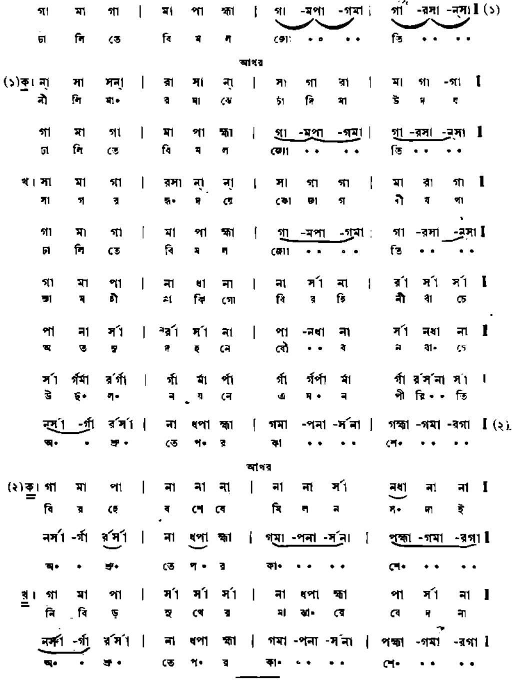
আথর
আথর

পসেস্‌ড ও পথেরদাবী

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার গুহ এম্‌-এ

পসেস্‌ড (Possessed) ও পথের দাবী উভয়েই বিখ্যাত উপন্যাস। দুই উপন্যাসের বিষয়বস্তুও প্রায় এক। অত্যাচারী শাসকের অধীনে দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চিত্ত বিক্ষোভের চিত্রই এই দুইটি পুস্তকে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই আলোড়নের বৈচিত্র্য পসেস্‌ড-এ পথের দাবী হইতে বেশী। পথের দাবীতে এই অগ্নি উদ্গার আমরা শুধু একজনের (সব্যসাচীর) বক্তৃতায় পাই (সুমিত্রাও অবশ্য দুএকবার মুখ খুলিয়াছে, কিন্তু সব্যসাচীর তুলনায় তাহা একেবারে ফিকে)। কিন্তু ইহার অধিকাংশই ভারতীকে উপদেশ ও নির্দেশের ধরণে দেওয়াতে, তাহা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে না, ইহাতে যেন আবেগের পূর্ণতা নেই। একমাত্র সব্যসাচীকে বাদ দিলে, অন্যান্য চরিত্রগুলির যে এ বিষয়ে বিশেষ মাথা ব্যথা আছে তাহা আমাদের মনে হয় না। ব্রজেন্দ্র ত দেশোদ্ধারের অপেক্ষা সব্যসাচীর যাহাতে পতন হয় সেই চেষ্টাই অধিকতর করিয়াছে, সুমিত্রার অবশ্য দেশের জন্য ব্যথা থাকিয়াছে বটে, কিন্তু মনে হয় তাহা দেশের বকলমে প্রেমাস্পদের (সব্যসাচীর) নিকটে নিজেকে উৎসর্গ করা। ইহাকে শরৎচন্দ্র পুস্তকের মধ্যভাগে রাখিয়া বইয়ের ভারকেন্দ্র করিয়াছেন। বস্তুতঃ পথের দাবী যদিও বিপ্লবীদের লইয়া লিখিত উপন্যাস, কিন্তু তাহাতে সমস্যার মূল-কারণকে মোটেই হাত দেওয়া কিংবা সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখা হয় নাই। আখ্যায়িকার গঠন কৌশলে ভারতী অপূর্ব ও সব্যসাচী সুমিত্রার আখ্যান বিন্দুমাত্রও নগণ্য নহে, ইহারা পুস্তকের একটী বৃহৎ অংশই অধিকার করিয়াছে।

কিন্তু পথের দাবীর উৎকর্ষ এই বলিয়া নহে যে ইহা একটী মনোজ্ঞ রাজনৈতিক উপন্যাস, কিংবা অপূর্ব ভারতীর প্রণয় কাহিনী বেশ জমিয়া উঠিয়াছে অথবা ইহাতে সব্যসাচী কি সুমিত্রার বক্তৃতার ভিতর দিয়া আমাদের বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিত্র ফুটিয়াছে; এই বইতে সব্যসাচীর কল্পনার মধ্যে একজন অতি-মানবের একটী পরিপূর্ণ চিত্র শরৎচন্দ্র ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সব্যসাচীর আদর্শ, আশা, আকাংক্ষা— এক কথায় এই অতি-মানবটীর সমগ্র মনুষ্যত্বের একটী বিরাট চিত্র লেখক এই পুস্তকে ফুটাইয়াছেন। এই সব্যসাচীর মতবাদ পাঠক সমাজের পূর্ণ সমর্থন পাইবে না সত্য, হয়ত তাঁহার কর্মপ্রণালীও সকলে পছন্দ করিবেন না, কিন্তু নিজের আদর্শকে রূপ দিতে তাঁহার নিষ্কাম উৎসর্গকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তিনি একজন বিপ্লবী ও বিপ্লবীরা যে মানুষের জীবন লইয়া খেলা করিবে একথা নিতান্তই জানা, কিন্তু যখন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত আমরা অপূর্বর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা শুনি তখন এই সব্যসাচীই তাহাকে বাঁচাইয়া দিলে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

পথের দাবীর মূল সুর এই সব্যসাচীর মধ্য দিয়াই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই গ্রন্থে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও শুধু সব্যসাচীর চরিত্রের জন্যই পথের দাবী অপূর্ব অবদানরূপে সাহিত্য সমাজে আদৃত হইয়া আসিতেছে।

বইয়ের গঠন কৌশল লইয়া আলোচনা করিলে সমালোচকের সন্ধানী দৃষ্টি ইহার মধ্যে বহু ত্রুটিই বাহির করিতে পারিবে। ব্রজেন্দ্রর কথাই ধরা যাক। তাহাকেই একমাত্র সব্যসাচীর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখি। অপূর্বর শাস্তিকালীন দৃশ্যে লেখক ব্রজেন্দ্রের যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকে অসম প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই মনে হয়। শেষ পর্যন্ত অপূর্ব বাঁচিয়া যাওয়াতে একমাত্র ব্রজেন্দ্র ব্যতীত সকলেই আশ্বস্ত হইয়াছে। এই ব্রজেন্দ্রই আবার বইয়ের শেষে সব্যসাচীকে ধাওয়া করিয়া তাঁহাকে বর্মামুলুকে একরকম তাড়াইয়াছিল এবং আরও আশ্চর্য্যের কথা যে, এই ব্রজেন্দ্রই সব্যসাচী সুমিত্রার প্রেমের ব্যাপারে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। এ যেন ব্রজেন্দ্র চরিত্র শেষ পর্যন্ত আমাদের নিকট স্পষ্ট হয় না।

সত্য কথা বলিতে গেলে পথের দাবী আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা শুধু ইহাই বুঝিতে পারি যে, বইতে একটি চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অন্য চরিত্রগুলির সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু যেখানে অপূর্ব ভারতী, সুমিত্রা এমন কি হীরা সিং নিজেদের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, ব্রজেন্দ্র সে রকম ফোটে নাই।

লেকচার একটি গুরু শিষ্য সংবাদে পরিণত হইয়াছে; ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্তের এই মত মানিয়া লইতে হয়।

বইতে যত দোষই থাকুক না কেন (তাহার কিছু কিছু উপরে আলোচিত হইয়াছে) ইহা শুধু সব্যসাচীর চরিত্রের পরিকল্পনা ও তাহার পরিণতির জন্য বঙ্গ সাহিত্যে অসাধারণ।

এইবার আমি পসেস্‌ড-এর (possessed লেখক রুশ ঔপন্যাসিক ডষ্টয়েভস্কি) আলোচনা প্রসঙ্গে পথের দাবীর সহিত ইহার সাদৃশ্য নির্ধারণের চেষ্টা করিব।

পথের দাবীর মত পসেস্‌ডও মূলতঃ রাজনৈতিক উপন্যাস।

অপূর্ব-ভারতীর প্রেমোপাখ্যানের মত ইহাতেও প্লট হিসাবে stepan verbara ও Liza Nikolayএর প্রণয় স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। শশীর মত পসেস্‌ড এ আমরা এক কবির দেখা পাই—তিনি kirillov। তাঁহার মুখে কয়েক জায়গায় এমন উচ্চাংগের কথা দেওয়া হইয়াছে যে তাহা জগতের যে কোন সাহিত্যে দুর্লভ। shatovএর হত্যার দৃশ্যের সহিত অপূর্বর শাস্তিকালীন দৃশ্য মিলাইলে উভয় পুস্তকের সাদৃশ্য পরিস্ফুট হইবে।

অপূর্ব ও shatov দুজনকেই বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে (আমাদের অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে অপূর্বর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, শাটভের বিরুদ্ধে তাহা নাই এবং সে কখনও দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিত কিনা সন্দেহ)। একে ত শাটভ নিরপরাধ, তাহার লেখক যেমন হঠাৎ শূন্য—হইতে তাহার আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে আনিয়া এই নিষ্ঠুর ব্যাপারটায় পাঠকের চোখে খোঁচা মারিয়া জল বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র সেরূপ কিছু করেন নাই। অপূর্ব যে দোষী এবং তাহার শাস্তিতে যে আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিৎ নহে, শরৎচন্দ্র গোড়াতে এই প্রকার একটা আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন।

অপূর্বকে হীরা সিং এবং শাটভকে Erkel ও ভুলাইয়া আনিল প্রায় একই জায়গায় অর্থাৎ লোকালয়ের বাহিরে জনসাধারণের সংশ্রবশূন্য একপোড়ো বাড়ীতে। দুই পুস্তক মিলাইয়া পড়িলেই এই স্থানের পরিকল্পনায় উভয় লেখকের সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চোখে পড়িবে। (Possessed, Heinemaned, p 562 এবং পথের দাবী পৃঃ ২০০)। কিন্তু এই পোড়ো বাড়ীতে আসার পর হইতে উভয়ের ভাগ্য স্রোত ভিন্ন খাতে বহিয়া চলিয়াছে। দলপতি সব্যসাচী যেখানে অপূর্বর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা রদ করিলেন, অপর দলপতি Pyotr সেখানে

সকলে গুলি করিয়া শাতভকে হত্যা করিল এবং এইখানেই উভয় গ্রন্থের মূল পার্থক্য। শরৎচন্দ্র যেখানে তাঁহার কোন পুস্তকেই কাটাকাটি খুনাখুনিকে প্রাধান্য দেন নাই ডস্টয়েভস্কি তাঁহার প্রায় সকল বইতেই হত্যা বিভীষিকা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

এই কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়াই কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে বই দুইটি বুঝি অপর সমস্ত বিষয়েও এক। পথের দাবীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে এই বইটি শুধু একটি চরিত্রের (সব্যসাচীর) আংশিক জীবন কাহিনী, অপর দিকে পসেস্‌ড্ প্রায় কুড়ি বৈপ্লবিক ও অবৈপ্লবিক চরিত্র লইয়া আলোচনা করিয়াছে এবং সমস্ত বইটি পড়িলে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে (পাদটীকা দ্রষ্টব্য) রুশদেশের জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতর যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহার একটি বিরাট চিত্র দেখি, অত্যাচারে নিপীড়িত মানব আত্মার আলোকের সন্ধানে যে ভুল পথে চলিতেছিল তাহা স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়ে, কিন্তু পথের দাবীতে এ সব কিছুই নাই। সব্যসাচীকে তাহার পার্শ্বচর ও চরেরা বুঝিতে পারে নাই।

পাদটীকা :—পসেস্‌ড্-এর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Boris Souvarin রচিত 'Stalin' পুস্তকের ২২-২৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। গত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে রুশিয়ায় বিখ্যাত নৈরাজ্যবাদী বাকুনীনের নেতৃত্বে একটা বৈপ্লবিক দল গঠিত হয়। পরে বাকুনীনের অন্যতম শিষ্য ও সহকারী Neochayev এই দলের ভিতরে একটি গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করেন। ইহার নাম Narodnaya Rasplava অথবা The Peoples avenger। পরে এই দলের সভ্যেরা পারস্পরিক বৈরিতা সাধনে নিজেদের শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার করেন এবং Neochayev-এর প্ররোচনায় একজন সভ্য অপর সভ্যদের দ্বারা নিহত হন। Neochayev তাঁহার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার গুজব রটান ও অন্যান্য অভিযোগ আনেন। পসেস্‌ড্‌কে এই সময়কার ক্ষুদ্র দল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিবার অপচেষ্টার সাহিত্যিক নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্র-অর্ঘ্য

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

আশী বসন্তের বুক ভ'রে দিল রূপ, রস, ফুল, ফলে,
দীপ্ত যে রবি আপন গরবে, সে আজ অস্তাচলে।
নিরুদ্দেশের যাত্রী যে ছিল সুন্দরী অভিসারে
শেষ খেয়া পথে পাড়ি দিল শেষে, ডাক দিয়েছে যে পারে।
একেলা মানুষ হয় যদি আর এক মাটি শুধু দান
আমি বলেছিল তোমার তরীতে হবে একটুক্ স্থান :
ঘর ছাড়া তাই ঠাঁই ক'রে নিল তারই এক পাশটিতে ;
হয় তো শান্তিনিকেতনও তারে পারেনি শান্তি দিতে।
বিপুল ধরার মহা-বুভুক্ষা, সর্বগ্রাসী রূপ
বিকৃত জীবন, কুৎসিত কত, কঙ্কালসার স্তূপ,
ক্রুর অভিশাপে পতিত, ম্লান দিন মানবের গ্লানি
হেরি কত নিশি জেগে কেটে গেছে তুমি আমি কিবা জানি!
কত বাঁশি তার হারিয়েছে সুর, মুরজ গেছে কেটে,
কতবার তার সাধের বীণার কত তার গেছে কেটে
তোমরা খবর রেখেছ কি তার কত দিন কত পলে
নিশীথ শয়ন ভিজে গেছে তার দুই নয়নের জলে?
যে কবি আপন সাধনার ধনে ফিরেছে দ্বারে দ্বারে
জগতের তরে আহ্বান আসন, সভায় বসান তাঁরে,
সেও দেখে গেল তারে মরণের শঙ্কাহীন খোলা যেন,
রক্ত-পিয়াসী বাত্যাঝড়েতে ধাওয়া হয় পথিক যেন।
পশ্চিমে যার দেহ-লাবণ্য প্রীত-যৌবন আঁখি
তারেও কত শেষে যারা দিল চোখে বাধা ছিল তার ফাঁকি।
সবই জানি—তবু তোমরা যে বল সে কবি আজিকে নাই
এর মত আর মিথ্যা কি আছে মানিতে চাহিনা তাই।'
যে রবির করে বিকশিত হ'ল কত কুসুমের দল,
তোমাদের মনে দিল যে আসন, অর্ঘ্য নয়ন-জল,
আজি হ'তে শত বর্ষ পরেও যদি বাতায়ন ধারে
বসে বসে কত যামিনী যাপিবে হর্ষ বিষাদ ভারে,
মানস-বিশ্ব ব্যাপী যে রয়েছে অন্তর্লোক ভরা,
মৃত্যু তাহার এত কি সহজ? সহজ এত কি মরা!
যে ছিল অসীম, সত্তায় ছড়ায়ে, জুড়েছে নিখিল লোক,
অমরত্বের দাবী আছে তার, আছে বেঁচে, বৃথা শোক।

আগমনী

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

শ্মশানের মাঝে এসো মা গৌরী
যেথা চিতা জ্বলে শুধু,
প্রান্তরে যেথা শ্যামলতা নাই
চারিদিক্ করে ধু-ধু!

সেথায় এবারে বসাব বোধন
আগমনী হবে কণ্ঠ-রোদন

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিব কেবল
তব বেদীতল ঘিরে—
জাগিতেছি মোরা আজিকে যাহারা
দুখের অশ্রুনীরে।

তব পদতলে লুটাব আমরা
দু'মুঠার লাগি' কেঁদে হব সারা।

বরাভয়করা এসো মা এবার
অসুর নাশিতে দুর্গে।
অশিবের বেশে এসো মা শিবানী—
সিংহবাহিনী ভার্গে।

মায়ের বুকেতে ক্ষীর-সুধা নাই,
মরিয়া বাঁচায়, সন্তান তাই,

অসুর-শত যেথা উঠেছে—
আকাশ বাতাস ব্যেপে!
বাজুক্ তোমার ভৈরবী-শিঙা
ধরণী উঠুক্ কেঁপে।

তুমি এস মাগো সকল হানিয়া
'ভাঙো খেলাঘর—সবই নাশিয়া

স্থান দাও মাগো চরণপ্রান্তে,
মরিতেই হবে যদি :—
এস দুর্গতিনাশিনী দুর্গে,
দুঃখেরে পরিহরি!

বাহির বিশ্ব

মিহির

সিসিলি ও ইটালী

আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে সিসিলির যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। সিসিলির উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের পার্ব্বত্যক্ষেত্রে অক্ষশক্তির সেনাবাহিনী শেষ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবে মনে হইয়াছিল; হয়ত তাহাদের পরিকল্পনাও সেইরূপ ছিল। কিন্তু আমেরিকান্ সেনাবাহিনী শেষ মুহূর্ত্তে পুনঃপুনঃ অক্ষশক্তির সেনার পশ্চাদ্ভাগে অবতরণ করিয়া তাহাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে। সিসিলি জয়ের পর সম্মিলিত পক্ষের সেনা টিরিনিয়ান্ সাগরের লিপারি ও ইয়োলি দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছে।

সিসিলি ইটালী আক্রমণের পাদভূমি; এই পাদভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সম্মিলিত পক্ষ এখন, যুদ্ধের স্বাভাবিক গতি হিসাবেই, দক্ষিণ ইটালীর সংযোগ-সূত্রে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করিতেছেন। সৈন্য অবতরণ করাইবার পূর্ব্বে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণে সামরিক লক্ষ্যবস্তু ও সংযোগ-সূত্র চূর্ণ করা একান্ত সামরিক প্রয়োজন।

মুসোলিনির পতনের পর ইটালী স্বতন্ত্র সন্ধির জন্য আগ্রহান্বিত হইবে বলিয়া সম্মিলিত পক্ষ যে আশা করিয়াছিলেন, সেই আশা বিফল হওয়ায় এখন ইটালীর প্রতি সামরিক বল প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়াছে। জার্ম্মানীও সম্মিলিত পক্ষের এই আসন্ন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে; উত্তর ইটালীতে জার্ম্মানীর বহু সৈন্য ও সমরোপকরণ ইতিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইটালীর ভূমিতে জার্ম্মানী তাহার প্রতিরোধাত্মক সংগ্রাম চালাইতে চায়; সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। সম্মিলিত পক্ষের সহিত বাদোগ্লিও-ইমানুয়েল্ সরকারের স্বতন্ত্র সন্ধির ইচ্ছা যদি থাকিয়াও থাকে, তাহা হইলেও জার্ম্মানী উহা সম্ভব করিতে দিবে না। ইটালীর ভূমিকে যুদ্ধের ভীষণতা হইতে আর রক্ষা করা সম্ভব না বলিয়াই মনে হয়।

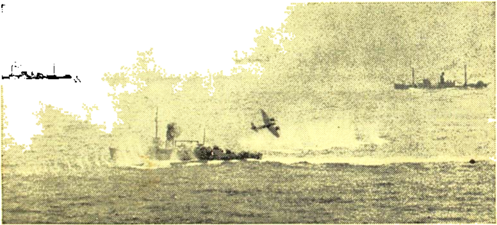

বৃটিশ বো-ফাইটার কর্ত্তৃক জার্ম্মান কনভয় আক্রমণ

ইটালীকে জার্ম্মানীর সহিত সামরিক সম্বন্ধচ্যুত করাইবার মূল্য অত্যন্ত অধিক; কিন্তু তবুও ইটালী আক্রান্ত হইলেই যুরোপে "দ্বিতীয় রণাঙ্গণ" সৃষ্ট হইল বলা চলিবে না। সম্মিলিত পক্ষ উত্তর আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র, যুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে, অদূর ভবিষ্যতে ইটালী যে আক্রান্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। এই নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা জানিয়াও জার্ম্মানী পূর্ব্ব যুরোপে তাহার সমরায়োজন হ্রাস করে নাই; এখনও তাহার দুই শত ডিভিসন সৈন্য সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে নিযুক্ত। রুশিয়ার পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এইরূপভাবে জার্ম্মানীকে আঘাত করুক, যাহাতে পূর্ব্ব যুরোপ হইতে জার্ম্মানীর অন্ততঃ ৬০ ডিভিসন সৈন্য স্থানান্তরিত হয়। বলা বাহুল্য, ইটালীর যুদ্ধে তাহা হইবে না। ইটালীর ভূমিতে প্রধানতঃ ইটালীর সৈন্যই জার্ম্মানীর প্রতিরোধ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিবে, জার্ম্মানীর গায়ে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ আঁচ লাগিবে না। রুশিয়ার প্রতি জার্ম্মানীর চাপ হ্রাস করাইয়া দ্রুত যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে হইলে জার্ম্মানীর গায়ে প্রত্যক্ষভাবে ও প্রবলভাবে আঘাত করা প্রয়োজন। ইটালীকে জার্ম্মানীর সহিত সম্বন্ধচ্যুত করাইবার সামরিক মূল্য যতই হউক না কেন, তাহাতে এই উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

কুইবেক সম্মিলনী

আগষ্ট মাসের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কুইবেক্ সম্মিলনী। আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে—সিসিলির যুদ্ধ শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই মিঃ চার্চ্চিল সদলবলে আটলান্টিক পাড়ি দেন। ক্যানাডার অন্তর্গত কুইবেকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। অন্যান্য ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতিক ও সমরনায়কও এই সম্মিলনীতে আলোচনায় যোগদান করেন। কুইবেক্ সম্মিলনীর অবসানে মিঃ চার্চ্চিল ও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের যে যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, সম্মিলনীর সিদ্ধান্ত কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবে। ক্যানাডার পার্লামেন্টে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন—কুইবেকের

সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত গোপন সংবাদ যথাকালে জার্মানী, ইটালী ও জাপানকে জানান হইবে।

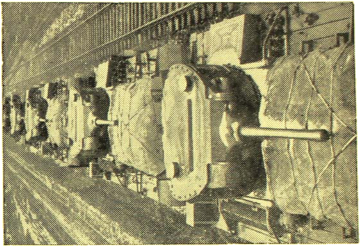

রেড-আর্মির জন্য ২০টনের ক্যানেডিয়ান ট্যাঙ্ক

সামরিক বিষয়ে কুইবেকে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহা গোপন রাখা স্বাভাবিক। রাজনৈতিক বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত এখন প্রকাশিত হইলে বহু অপ্রীতিকর আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদের উদ্ভব হইতে পারে, কাজেই উহাও এখন স্বভাবতঃ গোপন থাকিবে। কুইবেকের পর দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সম্মিলিত পক্ষের প্রধান সেনাপতিপদে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগের কথা ঘোষিত হইয়াছে। গত জুন মাসে যখন ভারতের বড়লাটপদে মার্শাল (লর্ড) ওয়াভেলের নিয়োগ এবং ভারতের প্রধান সেনাপতিপদে স্যর ক্লড অচিন্‌লেকের নিয়োগের কথা ঘোষিত হয়, তখনই বলা হইয়াছিল যে, দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার সামরিক দায়িত্ব হইতে ভারতের প্রধান সেনাপতিকে মুক্ত করা হইবে; ঐ পদে আর একজন সেনাপতি নিযুক্ত হইবেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগে এখন সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনের ভার সত্যই ভারতের প্রধান সেনাপতির উপর রাখা চলে না। এই কার্য্যের গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তির অখণ্ড মনোযোগ এই বিষয়ে পতিত হওয়া প্রয়োজন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নাম গত ০ বৎসর ব্যক্ত হয় নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অপরিচিত হইলেও লর্ড মাউণ্টব্যাটেন্ নাকি জল, স্থল ও আকাশের সমর-প্রচেষ্টার সামঞ্জস্য বিধানে অত্যন্ত দক্ষ। দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনের জন্য এইরূপ সেনাপতিরই প্রয়োজন। এই দিক হইতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগ সন্তোষজনক বলিতে হইবে।

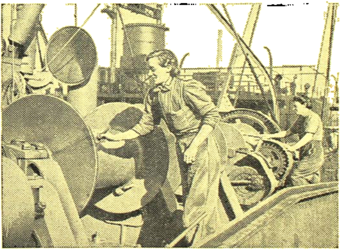

বৃটিশ জাহাজ রঞ্জন কার্য্যে নিযুক্ত মহিলা কর্মী

কুইবেকের পর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বৃটেন, আমেরিকা ও রুশিয়া কর্ত্তৃক ফরাসী জাতীয় মুক্তি পরিষদের স্বীকৃতি। অবশ্য, এই বিষয়ের গুরুত্ব তত অধিক নয়। জেনারল জিরো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনেই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। আর জেনারল দ-গল্ ছিলেন বৃটেনের সমর্থনপুষ্ট; রুশিয়া পূর্ব্বেই জেনারেল দ-গলকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই এই দুই ব্যক্তির মধ্যে আপোষ হইয়া যে ফরাসী জাতীয় মুক্তি পরিষদ গঠিত হইয়াছে, তাহাকে বৃটেন, আমেরিকা ও রুশিয়ার মানিয়া লওয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। অবশ্য, ফরাসী জাতীয় মুক্তি পরিষদকে ফ্রান্সের সরকার বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, ফ্রান্সের পক্ষ হইতে যুদ্ধ পরিচালনের এবং ফরাসী স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার অধিকার যে এই প্রতিষ্ঠানের আছে, তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ফ্রান্স সম্পর্কিত সমস্যার আশু মীমাংসা হইলেও উহার চরম সমাধান এখনও বাকী আছে। ফ্রান্স জার্মানীর কবল হইতে উদ্ধার হইবার পর ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতে

পারে। তখন, এক পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থকদের রাষ্ট্রীয় অধিকারে বসিত করিবার দাবীতে এবং অন্য পক্ষে বিশৃঙ্খলা এড়াইবার অজুহাতে প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিত আপোষ করিবার অপচেষ্টায় নূতন জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

কুইবেক সম্মিলনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত কাগজেতে কেবল এই দুইটি বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে, অন্যগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কুইবেকে রুশিয়া আমন্ত্রিত হয় নাই; রুশিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহ বিভাগ টাস্ এজেন্সী বলিয়াছেন—রুশিয়া এই সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকুক, ইহা অভিপ্রেতও ছিল না। সম্মিলিত রাষ্ট্রের সংবাদপত্র জানাইয়াছেন—ক্যাসাব্লাঙ্কার পর অকস্মাৎ কুইবেক সম্মিলনী আহ্বানে রুশিয়ায় বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছে। ইহার নিহিত অর্থ—ক্যাসাব্লাঙ্কাতে যুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল এবং তথায় সেই সম্পর্কে ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়। রুশিয়ার প্রশ্ন—সেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই কুইবেকে নূতন সম্মিলনী আহ্বানের কি কারণ ঘটিল? রুশীয় 'যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণী' নামক পাক্ষিক পত্রিকা ত্রিশক্তির (রুশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেন) বৈঠকের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—উহাতে সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলির সম্বন্ধে মীমাংসা হইবে। ঐ পত্রিকা এমন কথাও বলিয়াছেন, যে যুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত সরকার সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির মনোভাব রুশিয়ার পক্ষে আশঙ্কার বিষয়। কুইবেকে রুশিয়ার প্রতিনিধির অনুপস্থিতি এবং ঐ সম্মিলনী সম্পর্কে রুশিয়ার পক্ষ হইতে এইরূপ মনোভাব প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মঃ লিট্‌ভিনফকে আমেরিকার দৌত্যকার্য্যের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। ইহার অল্পকাল পূর্ব্বে মঃ মেইস্কিও লণ্ডন হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন।

বৃটিশ বোমারুর ক্রুগণ গত ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে কি প্রকারে বার্লিন সহরে বোমা বর্ষণ করিয়াছে তাহার আলোচনা করিতেছে

রুশিয়াকে বাদ দিয়া কুইবেক সম্মিলনী এবং রুশিয়া সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে আশঙ্কা হয়, রুশিয়ার সহিত ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির রাজনৈতিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছে। যুরোপে ব্যাপকভাবে যুদ্ধ প্রসারিত করিয়া জার্মানীকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিবার ইচ্ছা হয়ত ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির নাই; তাঁহারা হয়ত আপাততঃ ইটালীকে আক্রমণ করিয়া দ্বিতীয় রণাঙ্গনের জন্য আন্দোলনকারীদের মুখ বন্ধ করিতে চান। রুশিয়ার পক্ষে ইহা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক; এই জন্যই হয়ত এই বিষয়ের আলোচনার সময় রুশিয়াকে ডাকা হয় নাই। কুইবেকে ইটালীর কোন গোপন সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, এইরূপ সন্দেহ করা হয়ত অন্যায়। যুরোপে যুদ্ধ প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ রাজনৈতিক সমস্যাও উদ্ভব হইবে। ইহা অনুমান করা সঙ্গত—যে সকল দেশের সরকার এখন লণ্ডনে মজুত আছে, সেই সকল দেশ অক্ষশক্তির কবল হইতে মুক্ত হইবামাত্র ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগুলির পক্ষ হইতে তথায় লণ্ডনস্থিত সরকারগুলির পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইবে। এই প্রচেষ্টায় রুশিয়ার সমর্থন থাকা স্বাভাবিক নহে। 'যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণীর' মন্তব্য এই বিষয়ে সুস্পষ্ট। যে সকল দেশের কোন সরকার এখন লণ্ডনে মজুত নাই, সেই সকল দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও রুশিয়ার সহিত ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির মতবিরোধ সম্ভব। আজ সম্মিলিত পক্ষের ইটালী অভিযান আসন্ন; এই ইটালীর বাদোগ্‌লিও, ইমানুয়েল, প্রাভী প্রভৃতি

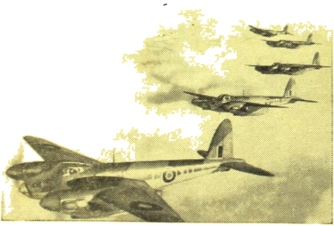

দূর গগনে শ্রেণীবদ্ধ বৃটেনের দ্রুততম 'মসকুইটো' বোমারু

ব্যক্তির সহিত মীমাংসায় রুশিয়া স্বভাবতঃ আপত্তি করিবে। কুইবেকে য়ুরোপের অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রসঙ্গের সহিত ইটালীর রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া স্বাভাবিক। এই সকল আলোচনায় ও এই বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তে রুশিয়ার সমর্থন পাওয়া যাইবে না—ইহা নিশ্চিত জানিয়াই হয়ত রুশ প্রতিনিধির জন্য কুইবেকের দরজা বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

বৃটিশ প্রচার সচিব মিঃ ব্রাকেন্ শুনাইয়াছেন যে, এখন ত্রিশক্তির সম্মিলনের চেষ্টা হইবে। কুইবেকে গৃহীত কোন সামরিক বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যদি এই প্রস্তাবিত সম্মিলনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে, তাহা হইলেই মঙ্গল।

রুশ রণাঙ্গন

সম্প্রতি সোভিয়েট বাহিনী দক্ষিণ রুশিয়ার সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটী খারকভ্ অধিকার করিয়াছে। খারকভ্ ইউক্রেণের দ্বিতীয় রাজধানী; যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইহা শ্রমশিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। যুদ্ধের সময় ইহা দক্ষিণ রুশিয়ার বিশাল সামরিক ঘাঁটীতে পরিণত হইয়াছে। গত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া আক্রমণের ৩ মাস পরেই জার্ম্মানী খারকভ্ অধিকার করে; তদবধি গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত উহা জার্ম্মানীর অধিকারভুক্ত ছিল। ঐ সময় জার্ম্মানী খারকভের বিরুদ্ধে তাহার সকল শক্তি নিয়োগ করে এবং মার্চ্চ মাসে পুনরায় ইহা অধিকার করিয়া লয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ফেব্রুয়ারী মাসে খারকভ্ হস্তচ্যুত হইবার পর হিট্‌লার কোন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন নাই। মার্চ্চ মাসে খারকভ্ পুনরধিকৃত হইবার পর বক্তৃতাকালে উল্লাসে তিনি বলেন—রুশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনের ঘাঁটী পুনরায় অধিকৃত হইয়াছে, সুতরাং আর চিন্তা নাই ইত্যাদি। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনের জন্য জার্ম্মানীর নিকট খারকভের গুরুত্ব যেমন অধিক, প্রতি-আক্রমণ পরিচালনের জন্য রুশিয়ার পক্ষেও ঐ ঘাঁটীর গুরুত্ব তেমনই। খারকভ্ হস্তচ্যুত হওয়ায় নীপার নদীর পূর্ব্ববর্ত্তী সমগ্র অঞ্চলটিতে জার্ম্মানীরা বিপন্ন হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ খারকভ্ অধিকারের পর সোভিয়েট সেনাবাহিনী দ্রুত পশ্চিম ইউক্রেণে আক্রমণ প্রসারিত করিয়াছে।

ওরেল্ অধিকারের পর ব্রিয়ানস্কের দিকে সোভিয়েটের যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল, উহার গতি আপাততঃ কিছু মন্থর হইয়াছে। তবে, এই অঞ্চলে স্মলেন্‌স্ক লক্ষ্য করিয়া চারি দিক হইতে সত্বর সোভিয়েট সেনার আক্রমণ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা আছে।

সুদূর প্রাচী

নিউ জর্জ্জিয়া দ্বীপপুঞ্জে মুণ্ডা সম্মিলিত পক্ষের অধিকারভুক্ত হইয়াছে; তবে নিউগিনিতে সালামুয়া অধিকার করা এখনও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অবশ্য উহার পতন আসন্ন। অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী ঘাঁটীগুলি হইতে জাপান বিতাড়িত হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ কাটিয়াছে বটে; কিন্তু যতদিন জাপান নিউ বৃটেনের বিশাল রবাউল্ ঘাঁটী ব্যবহারের সুযোগ পাইবে, ততদিন অষ্ট্রেলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইবে না।

আলিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জ হইতে জাপান সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভুত্ব করিবার জন্য উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের এই ঘাঁটীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ইহা ব্যতীত, জাপান এখান হইতে আমেরিকা মহাদেশেও ত্রাস সঞ্চার করিতে পারিত। আলিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জ পুনরায় সম্মিলিত পক্ষের হাতে আসায় প্রশান্ত মহাসাগরের জলে প্রভুত্ব করিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীতে জাপান বঞ্চিত হইল; আমেরিকা মহাদেশের বিপদও দূরীভূত হইল। সম্মিলিত পক্ষ এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাপানী দ্বীপপুঞ্জে দূরপাল্লার বিমান প্রেরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে এই অঞ্চল হইতে জাপানের উত্তর কিউরাইল্ দ্বীপপুঞ্জে দুইবার আক্রমণ চালিত হইয়াছে।

সুদূর প্রাচীর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সম্মিলিত পক্ষের ভারত মহাসাগরের পূর্ব্ব তীরে অভিযানের আয়োজন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিতেছেন—সম্মিলিত পক্ষ অতি সত্বর ভারতবর্ষ ও সিংহলকে ঘাঁটী করিয়া ব্রহ্মদেশে এবং মালয়ে জলপথে ও আকাশপথে আক্রমণ চালাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থলপথেও ব্রহ্মদেশে হামলা চলিবে। ব্রহ্মদেশ আক্রমণই জাপানকে প্রত্যক্ষ আক্রমণের উপায়। সম্মিলিত পক্ষ এতদিনে এই বিষয়ের প্রতি অবহিত হইয়াছেন। কেবল স্থলবাহিনী পরিচালনা করিয়া ব্রহ্মদেশ পুনরায় জয় করা সম্ভব নহে। কাজেই, ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে ভারত মহাসাগরের পূর্ব্ব তীরে সমুদ্রপথে ও আকাশপথে আক্রমণ চালিত হইবে—ইহা মনে করাই সঙ্গত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—সমগ্র পূর্ব্ব ভারতে পুনরায় জাপানী বিমানের আক্রমণাশঙ্কা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতিরোধাত্মক প্রয়োজনে জাপান অতি সত্বর এই অঞ্চলের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইবে বলিয়া মনে হয়।

৩০।৮।৪৩

শারদ-স্বপন

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

শারদ-প্রভাতে আজি খুলে দিয়ে বদ্ধ বাতায়ন,
বাহিরে তাকায়ে দেখি কী বিচিত্র সোনালী স্বপন।
হাসিতেছে কচি রোদে ধানক্ষেত চক্রবাল রেখা,
দূর্ব্বার আঁচল ভরে ঝরে' পড়ে কার কাব্যলেখা।
আকাশের নীল গায়ে ছুটি ছুটি সাদা মেঘগুলি,
করিছে চপল নাচ। কোন্ শিল্পী বুলায়েছে তুলি
দূর শুভ্র নদীতীরে, ঘন বন তার পরপারে
আসিছে প্রভাতী খেয়া, তারি সাথে ওঠে বারোয়ারে
শুভ্রকাশবনে দোল, পাখীদের আনন্দের ডাক,
শিউলীর মজলিসে কী উৎসব হেরিনু নির্ব্বাক!
বাহিরেতে এই যবে ঘরে মোর কঠোর বাস্তব,
তারি অগ্নিকুণ্ডে বসি' হেরিলাম এ মধু উৎসব।
বদ্ধ আমি বসে আছি আত্মহারা খুলি' বাতায়নে,
ভুলে গেনু দগ্ধজ্বালা ক্ষণিকের শারদ-স্বপনে।

মেঘ্‌লা আঁধার

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মেঘ্‌লা আঁধারে করে ঝুপঝুপ জল।
নদী চলে কূলে কূলে উছল উছল।
ওপারের কিনারায় মহিষ দু'টি
মাথা তুলে জলে চলে গুটি গুটি।
নৌকা চলেছে এক তুলে ছেঁড়া পাল।
কতকটা সাদা তার কতকটা লাল।
নদীর বাঁকের মুখে মেঘ সরায়ে
দিবাকর উঁকি দেয় চোখ রাঙায়ে।
মেঘে মেঘে রচিয়াছে তরল ছায়া।
গায়ে গায়ে ধরে সেই ছায়ার মায়া।
সে ছায়ায় নদী ফোটে ধোঁয়াটে সাদা।
সে ছায়ায় আঁখি পায় মোহন বাধা।
মেঘলা সকালে আজ বধূ রাণী
জাগিতে চাহে না তুলে বদনখানি।

সাময়িকী

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের আবেদন—

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৯ দিন বর্দ্ধমান ও নদীয়া জেলার বন্যাবিধ্বস্ত স্থানগুলি দেখিয়া আসিয়া ২৬শে আগষ্টের সংবাদপত্রসমূহে এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেশের প্রকৃত অবস্থা শুধু বর্ণনা করেন নাই—এ অবস্থায় গভর্ণমেন্টের ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—স্থানীয় লোকদিগের সহযোগে আমি কালনা, মেমারী ও নবদ্বীপে এবং কৃষ্ণনগর সহরে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছি। এইসব বিভিন্ন কমিটি সত্বর দূরে সাহায্য প্রেরণ করিবে। অতি দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ভাত এবং দরিদ্র মধ্যবিত্তদিগকে চাল, ডাল ও আলু প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কাপড়ও বিনামূল্যে এবং যাহারা দাম দিতে সমর্থ তাহাদের অর্দ্ধ মূল্যে বস্ত্র প্রদান করা হইবে। শিশুদিগকে স্থানে স্থানে বিনামূল্যে দুগ্ধ দানের ব্যবস্থা করা হইবে। গভর্ণমেন্ট সাহায্য দান ব্যাপারে প্রায় কিছুই করিতেছেন না—যাহা করিতেছেন তাহার কোন ব্যবস্থা নাই এবং তাহা সন্তোষজনক নহে। এখনও ঐ সকল স্থান হইতে গভর্ণমেন্টের এজেন্টগণ খুব বেশী দামে ধান ও চাউল ক্রয় করিয়া অন্যত্র প্রেরণ করিতেছে। গভর্ণমেন্ট খাদ্য শস্য মজুত সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গে গভর্ণমেন্ট হইতে যে সকল বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে তাহার সংখ্যা খুবই কম। মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার প্রতি গ্রামে একটা করিয়া বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা উচিত। এগুলি গভর্ণমেন্টের খরচে চলা উচিত। তাহা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যে যত খাদ্য দান করিতে পারেন করুন। যে সকল লোকের বসতবাড়ী নষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য কিছুই দেওয়া হয় নাই। যে লোক সাধারণ প্রতিষ্ঠান (বেসরকারী) সাহায্য দান করিতেছেন, গভর্ণমেন্ট তাহাদিগকে স্বল্প মূল্যে চাল দিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। মধ্যবিত্ত দরিদ্র পরিবারগুলিকে সাহায্য দানের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। তাহারা যাহাতে সস্তা দরে খাদ্য-দ্রব্য পায় গভর্ণমেন্টের এখনই সে ব্যবস্থা করা উচিত। সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধি দেখা দিয়াছে, কাজেই ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যাপক ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বস্ত্র বিতরণের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য স্ত্রীলোক বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণে অক্ষম হইয়াছে। তাহাদের অবিলম্বে কাপড় দেওয়া দরকার। কৃষিঋণ দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু চাষীরা বীজ কোথায় পাইবে তাহা তাহারা জানে না। বন্যার জল চলিয়া গেলে অনেক চাষের জমী পাওয়া যাইবে—গম, বার্লি, ছোলা, মটর প্রভৃতির বীজ বিতরণ করা হইলে চাষীরা ঐ সকল জমীতে ফসলই চাষ করিতে পারে। প্রত্যেক স্থানেই লোক আমাকে বীজ সরবরাহ করিবার কথা বলিয়াছে।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া যাহাতে সকল লোককে সাহায্য দান করা হয়, সেজন্য কি সরকারী, কি বেসরকারী—সকল সম্প্রদায়ের সকলের অবিলম্বে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে—

গত ২৪শে আগষ্ট কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চের বিচারে মুর্শিদাবাদের জেলা পুলিস সুপারিন্টেডেন্ট মিঃ আর-পি-পোলার্ড মুক্তিলাভ করিয়াছেন। প্রধান বিচারপতি ডার্ভিশায়ার, বিচারপতি খোন্দকার ও বিচারপতি সমকে লইয়া স্পেশাল বেঞ্চ গঠিত হইয়াছিল। মিঃ পোলার্ড বহরমপুরের উকীল শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল মজুমদারকে প্রহার করার অভিযোগে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ২শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরে মিঃ পোলার্ড ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলে নদীয়ার দায়রা জজের আদালতে আপীলের বিচার হয়—দায়রা জজ আপীল ডিসমিস করেন। তাহার পর মিঃ পোলার্ডের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল করা হইলে হাইকোর্ট স্পেশাল বেঞ্চে উক্ত মামলার বিচার হয়।

হাইকোর্টের বিচারপতিগণ এই মামলায় যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে অপর একটি মামলার কথা টানিয়া আনা হইয়াছে। জিয়াগঞ্জে ধান লুঠ লইয়া সেই মামলা হইয়াছিল—সেই মামলা সম্পর্কে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ-কে-ফজলল হক মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্-কে-চট্টোপাধ্যায় আই-সি-এসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সকল পত্রের কথা মিঃ পোলার্ডের মামলার মধ্যে টানিয়া আনিয়া হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাঁহাদের রায়ে মিঃ ফজলল হকের এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল মজুমদারকে প্রহার করা সম্পর্কে যে মামলা হইতেছিল, তাহার সহিত জিয়াগঞ্জ ধান লুঠের মামলার কি সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা হাইকোর্টের রায় পড়িয়া কিছুই বুঝা যায় না। মিঃ পোলার্ড শ্রীযুক্ত মজুমদারকে প্রহার করিয়া যে অন্যায় করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে হাইকোর্টের রায়ে কোন উল্লেখ নাই। মিঃ ফজলল হকের সহিত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র ব্যবহার সঙ্গত হইয়াছে কিনা তাহা মিঃ পোলার্ডের মামলার বিচারাধীন বিষয় ছিল না। কেন যে ঐ সকল পত্রের কথা এই মামলার মধ্যে টানিয়া আনা হইয়াছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য মনে হয়, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ মিঃ পোলার্ডের

মামলার সহিত অন্য মামলার কথা টানিয়া আনিয়া উভয়ের পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। তাঁহাদের ইহা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেজন্য কেহই হাইকোর্টের এই বিচার ফল মানিয়া লইতে সম্মত হইতেছেন না। আমাদের মনে হয়, হাইকোর্টের বিচারপতিরা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, নিজেরাই সেই অপরাধে অপরাধী হইয়া বিষয়টি গণ্ডগোল করিয়া ফেলিয়াছেন।

কলিকাতার অবস্থা—

২১শে আগষ্ট—২১শে আগষ্ট শনিবার কলিকাতার পথ হইতে ৪৮ জন অনাহার-ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্যাম্বেল ও বেহালা এ-আর-পি হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল—তন্মধ্যে ৮ জন তখনই মারা যায়। ক্যাম্বেল হাসপাতালে ২০ জন পুরুষ ও ৪ জন শিশু—মোট ২৪ জনকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—তন্মধ্যে ২ জন অল্পক্ষণ পরেই মারা যায়। বেহালায় ৪ জন পুরুষ, ১১ জন জন স্ত্রীলোক ও ৯ জন শিশু—মোট ২৪ জনকে ভর্ত্তি করা হয়—তন্মধ্যে ৩ জন শিশু ও ৩ জন পুরুষ মারা যায়। শনিবারে হিন্দু সৎকার সমিতি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য পুলিসের নিকট হইতে ১১টি মৃতদেহ পাইয়াছিল।

২২শে আগষ্ট—২২শে আগষ্ট রবিবার ১০জন অনাহার-ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে—তন্মধ্যে ১০জন পুরুষ, ৭ জন স্ত্রীলোক ও ২টি শিশু। বেহালা এ-আর-পি হাসপাতালে ঐ দিন একটিমাত্র শিশুকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। ঐ দিন বেহালা এ-আর-পি হাসপাতালে ১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে—তন্মধ্যে ৪ জন পুরুষ ৩ জন স্ত্রীলোক ও ৫ জন শিশু। ১১ জনকে ঐ দিন বেহালা হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু সৎকার সমিতি রবিবার পুলিসের নিকট হইতে ৪টি ও কানাল সাউথ রোডের ভবঘুরে-নিবাস হইতে ৪টি মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য পাইয়াছিল। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ২০০ এবং চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে ১০০ অনাহারক্লিষ্ট রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২৩শে আগষ্ট—গত ২৩শে আগষ্ট সোমবার কলিকাতার পথ হইতে মৃতপ্রায় অনাহারক্লিষ্ট ৩৯জনকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—তন্মধ্যে ১২জন মহিলা, ৬জন শিশু ও ২১জন পুরুষ। বেহালা এ-আর-পি হাসপাতালে ঐ দিন কোন অনাহারক্লিষ্ট লোক লইয়া যাওয়া হয় নাই। ২৩শে আগষ্ট হিন্দু-সৎকার সমিতি ও আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম কলিকাতার রাজপথ হইতে ২৪টি মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া সেগুলির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বেহালা এ-আর-পি হাসপাতালে সোমবার ৭জন অনশনক্লিষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১০ই আগষ্ট হইতে ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৯দিনে শুধু হিন্দু সৎকার সমিতি রাজপথে ১০০টি মৃতদেহ পাইয়া তাহাদের সৎকার করিয়াছে। রাজপথ হইতে সংগৃহীত লোকদিগকে ক্যাম্বল হাসপাতালে নিম্নলিখিত তিন প্রকার খাদ্য প্রদান করা হইতেছে—(ক) চাল—৪ছটাক, ডাল ১ ছটাক, মসলা ৩/৮ ছটাক ও সবজী—১ ছটাক (খ) বার্লি—১ ছটাক, চিনি—১ ছটাক (গ)—দুধ—৪ ছটাক, বার্লি—১/২ ছটাক ও চিনি—১/২ ছটাক।

২৪শে আগষ্ট—মঙ্গলবার ক্যাম্বেল ও বেহালা এ-আর-পি হাসপাতালে মোট ৮৭ জন অনাহার-ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। বেহালা হাসপাতালে ঐ দিন মোট ৭ জন মারা গিয়াছে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হাসপাতালে ২৩শে সোমবার ৪ জনকে ভর্ত্তি করা হয়। মঙ্গলবার পথ হইতে ১৪টি মৃতদেহ কুড়াইয়া নিমতলা ও কাশী মিত্র শ্মশানঘাটে দাহ করা হয়।

২৫শে আগষ্ট—বুধবার ৪৫ জন অনাহারক্লিষ্টকে ক্যাম্বেল ও বেহালা হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। বুধবার ক্যাম্বেলে ৮ জন ও বেহালায় ৬ জন অনাহারজনিত রোগে মারা গিয়াছে। গত ১৬ই আগষ্ট হইতে ২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ১০ দিনে বেহালা হাসপাতালে মোট ৩৩৬ জনকে ভর্ত্তি করা হয়, তন্মধ্যে ১৫ জনকে ক্যাম্বেলে পাঠান হয়, ১৩৩ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় (চিকিৎসার পর) এবং ৬৭ জন মারা যায়। এখনও তথায় ১২১ জন অনাহারক্লিষ্ট রোগী আছে—এবং তথায় ১৭৯টি স্থান খালি আছে—তথায় মোট ৩০০ রোগী রাখার ব্যবস্থা আছে।

উপরে মাত্র কয়দিনের বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝা যাইবে। প্রধান সহরের যদি এইরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার গ্রামগুলির কি শোচনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

শেষ কোথায় ?

যাহারা উত্থানশক্তিরহিত, মৃতপ্রায় বা মুমূর্ষু কলিকাতার রাস্তা হইতে তাহাদের তুলিয়া লইয়া ক্যাম্বেল বা বেহালার হাসপাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাদের অনেকেই যাইবার পথেই বা চিকিৎসালয়ে পৌঁছিয়া মরিতেছে। ইহা ছাড়া শতকরা পঁচাত্তরটি লোক উপযুক্ত পথ্য ও সেবা পাইলে বাঁচিয়া যাইতে পারে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস। আমাদের প্রশ্ন—ইহাদের ছাড়িয়া দিলে দাঁড়াইবে কোথায়—এবং তাহার শেষ ফল কি ? যাহারা সমাজের ও সংসারের সমস্ত অবসান করিয়া কলিকাতার পথে পড়িয়া মরিতেছিল, তাহারা হাসপাতাল হইতে বাহির হইলে দাঁড়াইবে কোথায় ? বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয় নাই ; তাহা হইলেও দুর্ভিক্ষকালে যেমন সাময়িক আশ্রম করিয়া সেবা ও অন্নের ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা অচিরে হওয়া দরকার। সমস্যা কেবল কলিকাতার নয়,—সারা বাঙ্গালার, সুতরাং এরূপ আশ্রম বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলে হওয়া দরকার। তাহা ছাড়া আমাদের বিশ্বাস অনশনে কাতর হইলেও যাহাদের দেহে কিঞ্চিৎ শক্তিও অবশিষ্ট আছে, পল্লীর দিকে যদি তাদের আহারের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে তাহারা নিজেদের কুটীরে বাস করিতে পারে এবং তাহাদের জন্য আর স্বতন্ত্র বাসস্থান ও চিকিৎসার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। তাহাতে যে কেবল ব্যয় আছে তাহা নহে, গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ একস্থানে অনেকটা নিবদ্ধ হইয়া পড়ে। আমরা সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে চাই।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা—

বোম্বায়ের ইণ্ডিয়ান রোড এণ্ড ট্রান্সপোর্ট ডেভালপমেণ্ট এসোসিয়েসন হইতে ১৯৪৩ সালের জন্য একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

হইয়াছিল এবং শ্রেষ্ঠ ৮ জন প্রবন্ধ-লেখক প্রত্যেকে ২৫০ টাকা করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের লেখক, কলিকাতা কর্পোরেশন কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সেনগুপ্ত উহার একটি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের এই সাফল্যে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

গমের "হাত-ফেরতা"—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে আলোচনাকালে প্রকাশ পায় যে পঞ্জাবের কোনও মন্ত্রী বাঙ্গালায় সাহায্যে গম প্রেরণ করিতে নানা অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছেন। মন্ত্রী মহাশয় সার ছটুরাম উহার উত্তরে বলিয়াছেন যে এই অপবাদের কোনও ভিত্তি নাই। বাঙ্গালায় প্রেরণের জন্য তিনি ২,১৮,৪৫৪ টন গম ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন; কেন্দ্রীয় সরকার তাহা হইতে মাত্র ৯১,০০০ টন গম বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন বাঙ্গালার দুর্দ্দশার জন্য তিনি পঞ্জাবের চাষীর নিকট যে দরে গম ক্রয় করেন কলিকাতায় তাহার পড়তা সাড়ে বারো টাকা মাত্র। বাঙ্গালা সরকার তাহাই কলকে তাহা ১৫৲ টাকা মণে বিক্রয় করেন এবং প্রতি মণ পেষাই করার জন্য ৪৲ হিসাবে দেন; তাহার পর মিল হইতে ১৯৲ দরে আটা ক্রয় করিয়া বাজারে ২০৲ দরে বিক্রয় করিবার ইস্তাহার বা বিজ্ঞপ্তি দেন; বাজারে আটা বিক্রীত হয় ৩০৲ দরে। এই দারুণ অন্নকষ্টের সময় গমের উপর এত লাভ করিয়া বিক্রয় করার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া শতকরা ১০ ভাগের উপর গম পঞ্জাবে পড়িয়া রহিল, ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় নয়।

খুচরার অভাব—

বাজারে আবার খুচরা রেজকীর দারুণ অভাব দেখা দিয়াছে এবং তাহার ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষকেই সর্ব্বদা দারুণ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। কোন দোকানেই টাকা দিয়া ১।০ আনার জিনিস কিনিবার উপায় নাই। অথচ দোকানদারগণ ক্রেতাদের নিকট যে খুচরা পান, সেগুলি কোথায় যায়, তাহা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ কণ্ট্রোলের দোকানে বা সরকারী 'গ্রেণ ষ্টোরে' খুচরা লইয়া না গেলে কোন জিনিষই দেওয়া হয় না। এক একটি ঐরূপ দোকানে প্রত্যহ ৪।৫ শত টাকার জিনিষ বিক্রীত হয়। সেই ৪শত টাকার খুচরা পরদিন যদি তাঁহাদিগকে ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হয়, তবে তাঁহাদের পক্ষে কম কষ্টকর হয় না। এ অবস্থায় তাঁহারা ক্রেতাদিগের নিকট হইতে টাকা লইয়া খুচরা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন কেন? এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের তদন্ত করিয়া এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে ক্রেতাদিগকে অযথা হয়রাণ হইতে না হয়। বাজারে প্রয়োজনীয় খুচরা থাকা সত্ত্বেও লোকের পক্ষে এই কষ্ট সহ্য করা সঙ্গত হয় না। কিছুদিন গভর্ণমেণ্ট খুচরার সন্ধান করিয়া লোককে শাস্তি দিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থাও কি এখন আবার পরিত্যক্ত হইয়াছে?

বাহিরের সহানুভূতি—

পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ পাঞ্জাববাসী সকল জমীদারকে বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে পাঞ্জাব হইতে সকল অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বাঙ্গালায় প্রেরিত হয়, সেজন্য তিনি সকলকে অবহিত হইতে বলিয়াছেন।

পাঞ্জাব নেতা রাজা নরেন্দ্রনাথ, নবাবজাদা রসিদ আলি, পণ্ডিত কে-সন্তানম্, বেগম ইফতিখারউদ্দীন প্রভৃতি এক আবেদন প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধাদি বাঙ্গালায় পাঠাইতে আবেদন জানাইয়াছেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা সকলকে বাঙ্গালা রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন।

সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু নিজে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষে ৫শত টাকা দান করিয়াছেন এবং যুক্ত প্রদেশবাসী সকলকে সাহায্য করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ রাওলপিণ্ডিতে গমন করিয়া বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা তথায় বিবৃত করিলে স্থানীয় অধিবাসীরা রায় সাহেব বরকৎরাম চোপরাকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। ঐ কমিটী বাঙ্গালার দুর্দ্দশাগ্রস্তদের জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন।

রেশন ব্যবস্থা—

কলিকাতার বালীগঞ্জ অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট যে "গ্রেণ ষ্টোর" খুলিয়াছেন, তাহা হইতে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। অতি দরিদ্র ব্যক্তি ছাড়া আর কাহাকেও চাউল দেওয়া হয় না। অপর সকলকে বাড়ীর প্রত্যেক লোকের জন্য মাথা পিছু সপ্তাহে এক সের আটা, আধ সের ডাল, এক ছটাক লবণ, এক পোয়া চিনি, এক পোয়া সরিষার তৈল ও ৫ আউন্স কেরোসিন তৈল দেওয়া হইতেছে। এক সের আটা বা এক পোয়া চিনি এক জন লোকের এক সপ্তাহের পক্ষে যে পর্য্যাপ্ত নহে, সে কথা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা এই সুলভ-খাদ্য পাইতেছেন, তাহারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষ কোথায় পাইবেন, তাহারও কোন ব্যবস্থা নাই। সাধারণ খাদ্যদ্রব্য লোক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করে না—কিন্তু যদি প্রয়োজন মত জিনিষই না পাওয়া যায়, তবে লোক কি করিবে? অবশিষ্ট জিনিষগুলি কি লোককে অত্যধিক দাম দিয়া অন্য দোকান হইতে ক্রয় করিতে হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা মন্দের ভাল হইলেও ইহার যে সকল সংশোধন প্রয়োজন, সেগুলির বিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

চাউলের দর নিয়ন্ত্রণ—

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, চাউলের ঊর্দ্ধতম মূল্য ২৮শে আগষ্ট তারিখে প্রতি মণ ৩০৲, ১০ই সেপ্টেম্বরে ২৪৲ এবং ২৫শে সেপ্টেম্বরে ২০৲ নির্দ্ধারিত হইল। প্রথম কথা, এই দরে চাউল পাওয়া যাইবে কি না; না পাওয়া গেলে সরকার চাউল পাইবার কি ব্যবস্থা করিবেন। দ্বিতীয় কথা—২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে মণ প্রতি ২০৲ দর দিতে হইবে; বাঙ্গালা দেশে কয়জন লোকের এই সঙ্গতি আছে? যাহারা অনাহারে মরিতেছে, তাহাদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই হওয়া দরকার। এই সঙ্গে বাঙ্গালা হইতে চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা হইল, তাহাও বলা হইয়াছে।

এ কথার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝা গেল না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বহুবার বলা হইয়াছে, চাউলের রপ্তানী হয় না; কয়েকদিন পূর্ব্বে এক অর্ডিনান্স জারি করিয়া চাউল রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে; তাহার উপর আবার নূতন আদেশ।

বেঙ্গল রিলিফ কমিটী—

গত ২১শে আগষ্ট শনিবার বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর এক সভায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উপস্থিত সকলকে জানাইয়াছিলেন যে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত মোট ৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটী, ১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা কলিকাতা ষ্টক একস্‌চেঞ্জ এবং ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা টাটারা দান করিয়াছেন। বেঙ্গল রিলিফ সোসাইটীর কার্য্যালয় বর্ত্তমানে ৮ নম্বর একস্‌চেঞ্জ প্লেস, কলিকাতায় অবস্থিত।

দোহাদে রবীন্দ্র উৎসব—

গত ২২শে শ্রাবণ বোম্বাই প্রদেশের দোহাদ সহরে প্রবাসী বাঙ্গালী সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতি উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবে পৌরহিত্য করেন। সভায় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার সরকার রবীন্দ্র সঙ্গীত গান করেন এবং শ্রীযুক্ত সলিলকুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত জগদীশ বক্সী রচিত একটি গান করেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

দোহাদে (বোম্বাই) প্রবাসী বাঙ্গালী সমিতির রবীন্দ্র স্মৃতি বাসরে সমবেত বাঙ্গালীবৃন্দ

কলিকাতায় খাদ্য আমদানী—

নয়া দিল্লী হইতে খবর আসিয়াছে যে আগষ্ট মাসের প্রথম ১৮ দিনে বাঙ্গালার বাহির হইতে বাঙ্গালায় মোট প্রায় ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য রেলযোগে আমদানী করা হইয়াছে—তন্মধ্যে ১৪ হাজার টন গম, সাড়ে ৩ হাজার টন চাউল ও ২ হাজার টন বাজরা! ইহা ছাড়াও করাচী হইতে জাহাজে করিয়া প্রচুর খাদ্যশস্য কলিকাতায় পাঠান হইয়াছে এবং আগষ্ট মাসের মধ্যেই ৫ হাজার খাদ্যশস্য কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া মনে হয়।

সাম্প্রদায়িক দাবী—

কটকের ডাঃ মানগোবিন্দ সাহু গত ১লা ভাদ্র তারিখে দেহরক্ষা করেন। তখন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অনুযায়ী তাঁহার অন্ত্যেষ্টির দাবী জানাইলে এক বিতণ্ডার সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডাঃ সাহুর মৃতদেহ হিন্দুর শ্মশান ও মুসলমানের কবরস্থানের মধ্যস্থলে সমাধির ব্যবস্থা করিয়া কলহের মীমাংসা করেন। ইহাতে হিন্দুর দাবী রক্ষিত হয় নাই, কারণ যোগী সম্প্রদায় ছাড়া হিন্দুদের সমাধির ব্যবস্থা নাই। যাহা হউক, কলহের নিষ্পত্তি হইয়াছে, সুখের বিষয়। ডাঃ সাহু জীবিতকালে উভয় সম্প্রদায়ের বিধি নিয়ম এমনভাবে পালন করিতেন যে তাঁহার সাম্প্রদায়িক মতামত বুঝা যাইত না, ইহা সুখের বিষয়। সমাজে এই মতবাদের লোক বেশী থাকিলে এক বড় সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

যুদ্ধায়োজনে খাদ্যোৎপাদন—

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কার্টিন তাঁহার সহকারী মন্ত্রীদের সহিত একমত হইয়া স্থির করিয়াছেন যুদ্ধায়োজনে অস্ত্র শস্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনার সহিত অষ্ট্রেলিয়ার প্রয়োজনের সমস্ত খাদ্যোৎপাদনের চেষ্টা সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। একরূপ বহুকালব্যাপী যুদ্ধে যে জাতি অন্নের সুচারু ব্যবস্থা না রাখে, সে জাতি সর্ব্বদাই অন্তর্বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়া পড়িবে; ভারতবর্ষে এই দিক সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া চলার ফলে আজ ভারত গভর্ণমেণ্ট বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ত্তমানে কোনও প্রকারে এই ভীষণ অবস্থা কাটাইয়া উঠিলেও সমস্ত জাতির খাদ্যের জন্য সর্ব্বপ্রকারে সচেষ্ট থাকা দরকার।

শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়—

গত ২৫শে আগষ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় চীফ-এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে

আরও ৫ বৎসরের জন্য ঐ পদে নিযুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আগামী ২৪শে ডিসেম্বর তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ার কথা ছিল। শৈলপতিবাবু তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার জন্য সর্ব্বত্র সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার এই পুনর্নিয়োগে কলিকাতাবাসী সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

প্রভাতচন্দ্র বসু—

দেওয়ান বাহাদুর প্রভাতচন্দ্র বসু

রেলওয়ে রেট্স এডভাইসারি কমিটীর সদস্য দেওয়ান বাহাদুর প্রভাতচন্দ্র বসু গত ৫ই আগষ্ট পাটনা সহরে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি খুলনা জেলার দামোদর গ্রামের অধিবাসী সারদাচরণ বসুর পুত্র। বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া ১৯১৩ সালে প্রভাতচন্দ্র মাত্র ৩০ টাকা বেতনে ই-বি-রেলে কেরাণীর কার্য্যে যোগদান করেন এবং অসাধারণ অধ্যবসায় মেধা ও প্রতিভা-বলে ক্রমে ক্রমে বহু উচ্চপদে নিযুক্ত হন। ১৯২৮ সালে তিনি রায় বাহাদুর এবং ১৯৪১ সালে দেওয়ান বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম রেলওয়ে রেট্স এডভাইসারী কমিটীর সদস্য হইয়াছিলেন।

ব্যারাকপুর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি—

সম্প্রতি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভাটপাড়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় গৃহে ব্যারাকপুর (২৪ পরগণা) মহকুমা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে ভাটপাড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভাদুড়ী সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করেন এবং সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় চৌধুরী ও স্থানীয় স্কুল সাব ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত কানাইলাল মণ্ডল অধিবেশনের সকল আয়োজন সম্পাদন করেন। সভাপতি মহাশয় প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকগণের অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বি-টি শিক্ষা দান ব্যবস্থা—

১৯৪২ সাল হইতে কলিকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজ কার্য্য বন্ধ করায় পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষকগণের পক্ষে বি-টি পড়ার বড়ই অসুবিধা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের ইউনিয়ন খৃষ্টান মিশনের কর্ম্মীরা বহরমপুরে একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া শিক্ষা দিতেছেন। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট তথায় বার্ষিক ৪৮৫০ টাকা সাহায্য করিতেন। সম্প্রতি তথায় উহার স্থানে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ফলে তথায় ১৯৪৩-৪৪ সালে ৮০ জন ও ১৯৪৪-৪৫ সালে ৫০ জন শিক্ষককে বি-টি পড়ান হইবে। ইহার ফলে পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষার্থীদের অসুবিধা দূর হইবে, তাঁহাদিগকে আর ঢাকায় যাইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে না।

কাঙাল সাহিত্য ও সংগীত সমাজ—

নদীয়া জেলার কুমারখালির যুবকবৃন্দের চেষ্টায় সম্প্রতি, কুমারখালি গ্রামে সাধক হরিনাথ মজুমদারের স্মৃতি রক্ষার্থ কাঙাল সাহিত্য ও সংগীত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মজুমদার মহাশয় সর্ব্বসাধারণের নিকট কাঙাল হরিনাথ নামে পরিচিত ছিলেন। ঐ সঙ্গে কুমারখালির অন্যান্য সুধীগণের স্মৃতিরক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের নামে 'জলধর স্মৃতি পাঠাগার' খোলা হইয়াছে। তত্ত্বাচার্য্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র, মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী ও সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল বরেণ্যনেতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়গণের স্মৃতি রক্ষারও আয়োজন করা হইতেছে। এই সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য ডাক্তার হরিপদ সাহাকে সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মজুমদারকে সম্পাদক করিয়া তথায় সমাজের একটি কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হইয়াছে। সমাজের কর্ম্মীরা যে সকল নেতার স্মৃতি রক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুরূপ ব্যক্তির দেশে অভাব নাই। কাজেই আমাদের বিশ্বাস, সমাজ সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

নূতন এটর্ণী—

কলিকাতা ৫৮ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় মল্লিক (সেন) মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান চিন্ময় মল্লিক বি-এল সম্প্রতি এটর্ণীসিপ শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের সলিসিটার হইয়াছেন। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

পুরী-মন্দির সম্মিলন—

গত ২৯শে আগষ্ট পুরীধামে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পুরী মন্দির সম্মিলনে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অনাচারের কথা আলোচিত হইয়াছিল। যাহাতে মন্দির পরিচালনায় কোন দোষ ত্রুটি না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্যামাপ্রসাদবাবু সকলের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। গভর্ণমেণ্টও যাহাতে এ বিষয়ে অবহিত হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন

করেন, সেজন্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতির সহিত পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ—সেজন্ত পুরীর মন্দিরে অনাচারের কথা শুনিয়া বাঙ্গালী মাত্রই বিচলিত হইয়াছেন।

কলিকাতায় মৃত্যুর হার বৃদ্ধি—

কলিকাতা সহরে প্রত্যহ বহু অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর আগমনের জন্ত সহরের সাপ্তাহিক মৃত্যুর হার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। গত ৫ বৎসরকাল গড়ে প্রতি সপ্তাহে কলিকাতায় ৫৮৮ জন লোকের মৃত্যু হইত; গত জুলাই মাস হইতে মৃত্যুর হার বাড়িয়া যায়—ঐ সময়ে এক সপ্তাহে ৮৭৪ জন মারা গিয়াছিল। কিন্তু গত ২২শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় মোট ১১২৯ জন লোক মারা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, খাদ্যাভাবজনিত রোগেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। খাদ্য সরবরাহের যে ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মৃত্যুর হার যে আরও বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ডাক্তার রাধাবিনোদ পাল—

ডাক্তার রাধাবিনোদ পাল মহাশয় আইনজ্ঞানের জন্ত বাঙ্গলার সকলের সুপরিচিত। তাঁহাকে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথমে অস্থায়ীভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহার পর কয়েকবার তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৯৪৩ সালের জুন মাসে তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে তিনি আবার আইন ব্যবসায়ে মন দিয়াছেন। তাঁহাকে সম্প্রতি আবার বিচারপতির পদ প্রদান করা হইলে তিনি তাহা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। গত ডিসেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যখন অস্থায়ীভাবে বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন, তখন তাঁহার প্রতি দারুণ অবিচার করা হইয়াছিল। ঐ সময়ে দুইটি অতিরিক্ত জজের পদ খালি ছিল—তাহার কোনটিতে ডাক্তার পালকে নিযুক্ত করা হয় নাই; ডাক্তার পাল হাইকোর্টে চাকরী লওয়ায় তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল—কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঐ কাজ করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার প্রতি অবিচার যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

খাদ্যাভাবের কারণ—

পাটনার 'বিহার হেরল্ড' পত্র বর্ত্তমান খাদ্যাভাবের কারণ সম্বন্ধে কয়েকখানি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া বহু তথ্য প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ—১৯৪৩ সালের প্রথম ৭ মাসে ভারতবর্ষ হইতে চাউল ও গম রপ্তানী হইয়াছে ২২ লক্ষ ১৫ হাজার মণ। ঐ সময়ে সৈন্যবাহিনীর জন্ত চাউল ও গম ক্রয় করা হইয়াছে ৭৫ লক্ষ ৬০ হাজার মণ। ১৯৪২ সালে ভারতে অবস্থিত যুদ্ধ বন্দীদের জন্ত ৭২ হাজার গোহত্যা করা হইয়াছে। ঐ সালে ভারতে অবস্থিত চীনা, বৃটীশ ও মার্কিণ সৈন্যদের জন্ত ২ লক্ষ ১৬ হাজার গোহত্যা করা হইয়াছে। এই সকল সংখ্যা সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রয়োজন নাই। আমাদের খাদ্যাভাবের কারণ যে কত বেশী, তাহার হিসাব নাই।

সংস্কৃত কলেজের নূতন প্রিন্সিপাল—

ডক্টর শ্রীযুক্ত অনন্তপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী এম-বি-ই মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের নূতন প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইনি স্বর্গত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্রী-পুত্র। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম হওয়ার পর বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের 'শাস্ত্রী' ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ্-ডি উপাধি লাভ করেন এবং প্যারিস ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। গত ২৬ বৎসর কাল তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ১৯৩৪ সাল হইতে তিনি পাটনা কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন। ১৯৪১ সালে তিনি এম-বি-ই উপাধি লাভ করেন। আশা করি, তাঁহার পরিচালনায় বাঙ্গলার সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করিবে।

ডক্টর অনন্তপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হুগলী জেলায় বন্যা—

বেহুলা ও বেহু নদীর মধ্য দিয়া দামোদরের বন্যার জল প্রবেশ করিয়া হুগলী জেলার সদর মহকুমার পাণ্ডুয়া ও বলাগড় থানার অন্তর্গত ১১টি ইউনিয়নের প্রায় ৮০খানি গ্রাম প্লাবিত করিয়াছে। প্লাবিত স্থানের পরিমাণ ৪৫ বর্গ মাইল এবং ঐ স্থানের লোক সংখ্যা প্রায় ২৭ হাজার। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দুর্দ্দশাগ্রস্তদের জন্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট ৯০ হাজার টাকা এককালীন সাহায্য ও ১ লক্ষ টাকা কৃষি-ঋণ চাহিয়াছেন। প্রায় দুই হাজার কাঁচা বাড়ী নষ্ট

হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে মেরামত করিতে প্রায় ২০ হাজার টাকা প্রয়োজন

বাঙ্গালার দুঃখ জ্ঞাপন—

কলিকাতার মেয়র মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা গত ১৭শে আগষ্ট মিঃ উইনষ্টন চার্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট কুইবেকে তার প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন—"কলিকাতা সহরে এবং বাঙ্গালা প্রদেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাবের জন্য দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। লোক অনাহারে মারা যাইতেছে। এখনই আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে যাহাতে ভারতে খাদ্যশস্য প্রেরিত হয়, আপনারা দয়া করিয়া তাহার ব্যবস্থা করুন।"—এই তার প্রেরণ 'অরণ্যে রোদন' হইবে কি না কে জানে ?

ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘ—

গত ১৫ই আগষ্ট কলিকাতায় ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘের বার্ষিক সভায় ইউনাইটেড প্রেসের শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত আগামী বৎসরের জন্য নূতন সভাপতি এবং হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের শ্রীযুক্ত তারেশচন্দ্র নাগ নূতন সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সেনগুপ্ত মহাশয় সভাপতি হইয়াই ২২শে আগষ্ট তাঁহার গৃহে সঙ্ঘের নূতন কার্য্যনির্ব্বাহকগণকে এক প্রীতি-সম্মেলনে আপ্যায়িত করিয়াছেন এবং গত ২৮শে আগষ্ট অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়-বিভাগের শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে নূতন সভাপতিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সাংবাদিকগণের এক প্রীতি-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানের এই অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার সময় নূতন কার্য্যনির্ব্বাহকেরা যদি দরিদ্র সাংবাদিকগণকে সুলভে খাদ্যাদি দানের কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন তবেই তাঁহাদের কার্য্যভার-গ্রহণ সার্থক হইবে। আশা-করি, নূতন সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

উত্তরপাড়ায় মন্ত্রী সম্বর্দ্ধনা—

গত ২১শে আগষ্ট বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী খাজা সার নাজিমুদ্দীন হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় গমন করিলে তথায় স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর সহিত অন্যান্য ১১জন মন্ত্রী ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অধিকাংশ পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী তথায় গমন করিয়াছিলেন। রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় সকলকে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। প্রধান মন্ত্রী অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছেন—"আমরা আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, চাউল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘব করিবার যে দৃঢ়সঙ্কল্প আমরা করিয়াছি, তাহা সার্থক করিবার জন্য আমরা কোন চেষ্টাই বাদ রাখিব না এবং কোন কারণেই তাহা হইতে লক্ষ্যচ্যুত হইব না।" ইহা কি শুধু মুখের কথা, না ইহার মধ্যে কোনরূপ আন্তরিকতা আছে? আমরা ত আন্তরিকতার কোন লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি না।

বালিকার কৃতিত্ব—

ত্রিপুরা রাজ্যের চীফ মেডিকেল অফিসার ক্যাপ্টেন কে-এম বোসের কন্যা কুমারী বাণী বোস এবার মাত্র ১৪ বৎসর ৭ মাস বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্রীমতী ১৯৩৯ সালে ১০ বৎসর ৭ মাস বয়সে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা পাশ করিয়াছিল। তাহার উদ্যম প্রশংসনীয়।

শিল্পী হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

শিল্পী হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ গত মাসের ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে

দেশনেতা রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব—

কলিকাতা ঠনঠনিয়ার প্রসিদ্ধ দেববংশের স্বর্গত এডভোকেট উপেন্দ্রচন্দ্র দেবের কনিষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব গত ৩১শে আগষ্ট অপরাহ্নে ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতার কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের অস্থায়ী সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯০১ সাল হইতে সারা-জীবন কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি রাজনীতিক গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। তিনি কিছুদিন সরকারী চাকরী করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি ঐ চাকরী ত্যাগ করেন। কিছুকাল তিনি শিক্ষকতা, সংবাদপত্রসেবা; প্রভৃতি কাজও করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালের পর তিনি আর কোন চাকরী করেন নাই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দুইবার তাঁহাকে কয়েকদিনের জন্য আটক থাকিতে হয়। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য পরিষদের ডিক্টেটার হিসাবে ও ১৯৩১ সালে পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে—কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪০ সালে ২৭শে জুন ভারতরক্ষা আইনে তাঁহাকে গ্রেপ্তার

করিয়া ২০শে আগষ্ট মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বহুদিন উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন। গত কয়েক বৎসর বাঙ্গালার রাজনীতি ক্ষেত্রে সকল কর্মীই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত এবং তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ লইয়া বাঙ্গালার কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালিত হইত। তিনি সারা জীবন অবিবাহিত ছিলেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত বন্ধুগণকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালা দুর্ভিক্ষ-কথার প্রচার বন্ধ—

৩১শে আগষ্ট নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এক মুলতুবী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করেন। বাঙ্গালার খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যে বিবৃতি বাঙ্গালার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহা দেশের অন্যান্য প্রদেশে প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে বিবৃতিটি প্রচার বন্ধের কোন হেতু দেখা যায় না। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের যে সকল চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতিতে বর্ণিত বিষয় অপেক্ষা ভীষণ। শ্যামাপ্রসাদবাবুর বিবৃতি প্রচারিত হইলে বাঙ্গালার বাহিরের লোকজন হয়ত বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে অধিক সাহায্য প্রেরণ করিতেন—বিবৃতিটি প্রচারিত না হওয়ায় সাহায্য আসার পথ রুদ্ধ হইতে পারে। যাঁহারা বিবৃতির প্রচার বন্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত এদিক দিয়া জিনিষটির বিষয় ভাবিয়া দেখেন নাই।

খাদ্য উৎপাদন বাড়াও—

কিছুদিন যাবৎ কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষগণ সহর অঞ্চলের পতিত অনাবাদী জমি কিংবা ফুলবাগানের জন্য ব্যবহৃত ভূখণ্ডে চাষ আবাদ করাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে একটী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি এই প্রদর্শনী ওয়েলিংটন স্কোয়ারে খোলা হইবে। গত জুলাই মাসে ঐ স্থানে কৃষি প্রদর্শনী ক্ষেত্রের ভিত্তি পত্তন করেন কলিকাতার মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেব। সেই সময় হইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মাঠে নানা প্রকার তরিতরকারী ও ফসল উৎপন্ন করা হইতেছে—সেপ্টেম্বর মাসে তাহাই জনসাধারণকে দেখান হইবে। অনেকগুলি নার্শারী তাঁহাদের নিজ চেষ্টায় উৎপন্ন তরকারী ও ফসল দেখাইবেন। প্রদর্শনীতে এইরূপ হাতে নাতে কাজ করিয়া দেখাইলে কৃষি প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সফল হয়, কারণ জনসাধারণ নিজ চক্ষে চাষের সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থা বুঝিতে ও শিখিতে পারেন। কলিকাতায় অনেক বাড়ীরই আশে পাশে জমি পড়িয়া আছে। চেষ্টা করিলে কলিকাতাবাসী সেই জমিতে নিজেদের প্রয়োজনীয় তরিতরকারী-শাক ডাঁটা, কুমড়া, ঝিঙ্গা, লাউ প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া লইতে পারেন। আজকাল বাজারে তরকারীর যা দাম তাহাতে বাড়ীতে তরকারী উৎপন্ন করার চেষ্টা শুধু সখের দিক দিয়া নহে, পয়সার দিক দিয়াও লাভজনক। আবার হঠাৎ কোন কারণে দুচার দিনের জন্য যদি বাজার বন্ধ হইয়া যায় তো টাট্‌কা তরকারীর অভাব মিটাইবার যে সমস্যা তাহাও আংশিকভাবে সমাধান করা যাইবে।

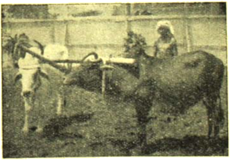

কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অধিক ফসল উৎপাদন চেষ্টায় কৃষি-কার্য্য

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অধিক ফসল উৎপাদন আন্দোলন সভায় মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজার বক্তৃতা

ছাত্রগণকে বৃত্তি দান—

বাঙ্গালা সরকার সরকারী ও বেসরকারী কলেজসমূহের ৮ হাজার মেধাবী অথচ দরিদ্র ছাত্রকে মাসিক ৮ টাকা হারে ৩ মাস সাহায্য দান করিবেন। সাড়ে ৩ হাজার মুসলমান, সাড়ে তিন হাজার বর্ণ-হিন্দু ও এক হাজার অনুন্নত হিন্দু ছাত্র ঐ বৃত্তি পাইবে। সরকারী ও বেসরকারী, হাইস্কুল ও মাদ্রাসার উচ্চ ৪ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেও ঐ ভাবে মাসে ২৬ হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে। আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে বৃত্তিদান আরম্ভ হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট ঐ বাবদে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন।

চট্টগ্রামের দুরবস্থা—

চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীদের দুরবস্থার শেষ নাই। সেখানে টাকা দিয়াও আর জিনিষ পাওয়া যায় না। লোক না খাইয়া নীরবে ঘরে পড়িয়া মরিতেছে। কবর দেওয়া বা দাহ করার কোন ব্যবস্থা নাই। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর

সেন, অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের জন্য সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

প্রমথনাথ মল্লিক—

গত ৮ই ভাদ্র (ইং ২৫শে আগষ্ট ১৯৪৩) কলিকাতার বিখ্যাত ধনী রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার শ্যামবাজারের ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি জমিদার বংশভূত হইলেও বাণীর সেবায় বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন এবং তরুণ বয়স হইতেই সাহিত্য সেবায় প্রবৃত্ত হন। তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই বহু গ্রন্থ ও সন্দর্ভ রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে 'অবকাশ লহরী' (পদ্য গ্রন্থ) 'সন্ধ্যা' (উপাখ্যান) 'দুটী কথা' (ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ) তরুণ বয়সে রচিত হয়। ইংরাজীতেও তিনি (Origin of caste, History of the vaisyas in Bengal নামক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থাদি রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রবীণ বয়সের রচনা "কলিকাতার কথা" ২খণ্ড এবং "মহাভারত" ও 'চণ্ডী' বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া থাকিবে। ইংরাজীতে তিনি The Mahabharat as it was, is and ever shall be এবং The Mahabharat as a history and a drama' লিখিয়া য়ুরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যা-

রায় বাহাদুর প্রমথনাথ মল্লিক

বিশারদগণের নিকট হইতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার দেশসেবা ও দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায়-বাহাদুর উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। তিনি কিছুকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থানীয় কমিটীর সদস্য ছিলেন। বহু য়ুরোপীয় পরিচালিত কোম্পানীর তিনি ডিরেক্টর ছিলেন এবং অর্থনীতি বিষয়ক সমস্যায় তাঁহার অভিমত সর্বত্র অতি মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনি অতি অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন এবং সাহিত্য-সেবকগণকে বিশেষ সমাদর করিতেন।

কাশীধামে অবনীন্দ্র উৎসব—

মহারাজকুমার রবীন রায় (সস্ত্রীক) শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাশীধামে যে উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে সমবেত সুধীবৃন্দ

দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান—

মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটী কলিকাতা ও সহরতলীর অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। সোসাইটীর কার্য্য ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যহ ৩০ হাজার লোককে বিনামূল্যে খাদ্য দেওয়া হইবে, ৫০ হাজার লোককে সুলভে পরোটা দেওয়া হইবে এবং ২৫ হাজার লোককে প্রত্যহ সুলভে খিচুরী দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া সহরের সাতটি ওয়ার্ডে মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহকে সুলভ মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হইতেছে। ৭নং ওয়ার্ডে সুলভে মধ্যবিত্ত পরিবার-বর্গকে খাদ্য দিবার জন্য ২০২।১ হ্যারিসন রোডে একটি অফিসও খোলা হইয়াছে। এই সকল কার্য্যের জন্য সোসাইটী ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। সোসাইটী এ পর্য্যন্ত ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯ শত ৬৪ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। সোসাইটীর কার্য্যালয়—৩২১ আপার চিৎপুর রোডে অবস্থিত।

সোসাইটী নিম্নলিখিত স্থানসমূহে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করিতেছেন—মলাট, মেতুয়া, মথুরা খানা, সরিষা, পার্ব্বতীপুর, গাজিয়মন, ঘোড়াদাহা, দিঘীরপাড় ও মধুসূদনপুর। এই ৯টি কেন্দ্রের প্রত্যেক স্থানে প্রত্যহ ৫শত লোক খাওয়ানো হইতেছে। প্রথম ৪টি স্থান ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় অবস্থিত এবং বাকী ৫টি স্থানে সুন্দরবনের মধ্যে। কসবা, সোনারপুর, ম্যাডক স্কোয়ার, ও ৮৫।২ বিডন ষ্ট্রীট (দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের সহযোগে) এই ৪টি স্থানে প্রত্যহ এক হাজার করিয়া লোক খাওয়ান হইতেছে। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার বিভীষণপুর ও পিছাবনীতে এবং সদর মহকুমার সাবং নামক স্থানে সোসাইটী খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করিতেছেন। বর্দ্ধমান জেলার কালনায় এবং মেদিনীপুর জেলার গোলা গ্রামে (সদর মহকুমায়) আরও দুইটি কেন্দ্র খোলা হইবে।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সুলভে পরোটা বিক্রয়ের ব্যবস্থা

কলিকাতার রাজপথে অনাহারক্লিষ্টের শব ফটো—পান্না সেন

হইয়াছে—কলিকাতার জগমোহন মল্লিক লেন, নিউ জগন্নাথ ঘাট রোড, সেণ্ট্রাল এভেনিউ, শোভাবাজার, শ্যামবাজার, হাওড়া, ভবানীপুর ও বালীগঞ্জ। বর্ত্তমানে প্রত্যহ ৫০ মণ পরোটা বিক্রীত হইতেছে—আরও অধিক আটা সংগৃহীত হইলে অধিক কেন্দ্রে পরোটা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে ১৮২নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে প্রত্যহ বেলা ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ১২ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে বিনামূল্যে দুধ বিতরণ করা হইতেছে।

কলিকাতা রিলিফ সোসাইটীর পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে প্রত্যহ বিকাল সাড়ে ৪টা হইতে সাড়ে ৬টা পর্য্যন্ত এক আনা মূল্যে আধসের করিয়া খিচুড়ি বিক্রয় করা হইতেছে। ক্রেতাদিগকে পাত্র লইয়া যাইতে হইবে—বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ১৫৫ রসা রোড ভবানীপুর। ১২৬ লোয়ার সার্কুলার রোড। ৮৪ আপার সার্কুলার রোড: পপুলার ক্যাণ্টিন, ৭১ রাসবিহারী এভেনিউ, বালীগঞ্জ। পপুলার ক্যাণ্টিন, ৯৩ এ বহুবাজার ষ্ট্রীট। পপুলার ক্যাণ্টিন, ১নং আর-জি-কর রোড'…শ্যামবাজার বাজার।

অনাথ শিশুদের রক্ষা—

সিন্ধুদেশ হইতে ডাক্তার অমরনাথ সুরি ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে জানাইয়াছেন যে যতদিন বাঙ্গালায় অন্নাভাব থাকিবে, ততদিন তিনি বাঙ্গালার ২ শত অনাথ শিশুকে রক্ষা করার ভার গ্রহণ করিবেন। মহালক্ষ্মী কটন মিলের শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্তও ১০ বৎসরের কম বয়সের ১ শত শিশুকে যতদিন না তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হয় ততদিন প্রতিপালন করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটী ১০ শত শিশুকে মজঃফরপুরে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

আশ্রয় ব্যবস্থা—

বাঙ্গালা সরকার এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে কলিকাতায় আগত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য তাঁহারা ১১ শত লোকের উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহা নিম্নলিখিতরূপ—বেহালা হাসপাতাল—৩০০, ক্যাম্বেল হাসপাতাল ২৫০, লেক ক্লাব গৃহ—১২০, কামারহাটী হাসপাতাল—৩০০, উত্তরপাড়া হাসপাতাল—৪০০, কোন্নগর হাসপাতাল—১৫০, সুরেশচন্দ্র রোড হাসপাতাল—১৫০। কলিকাতার রাস্তা হইতে কুড়াইয়া প্রথমে তাহাদের ১০ নলিন সরকার ষ্ট্রীটে বা ৫৫ হরিশ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটে রাখা হইতেছে। ঐ জন্য লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ এবং সাখাওয়াত হাই স্কুল গৃহও গ্রহণ করা হইয়াছে।

পণ্ডিত মালব্যের আবেদন—

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এক আবেদন প্রচার করিয়া বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে ভারতবাসী সকলকে বাঙ্গালার দুর্দ্দশাগ্রস্তদিগকে সাহায্য দান করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। সার তেজবাহাদুর প্রমুখ যাঁহারা অর্থসংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারা যাহাতে অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, সেজন্য মালব্যজী সকলকে সাহায্য করিতে বলিয়াছেন।

বোম্বায়ের সাহায্য—

বোম্বাই হইতে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাঙ্গালার সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়া ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের নিকট ৫০ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও অর্থ এবং খাদ্যদ্রব্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

পাটনার সাহায্য—

পাটনার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস, রায় বাহাদুর শ্যামনন্দন সহায়, ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রভৃতি বাঙ্গালাকে সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। সে জন্য তথায় 'বঙ্গীয় সাহায্য ভাণ্ডার' খোলা হইয়াছে।

হুগলী জেলায় সাহায্য দান—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছে যে তিনি হুগলী জেলায় কৃষি ঋণ

হিসাবে ৮০ হাজার, দুঃস্থ নিঃস্বগণ সাহায্য বাবদে ২০ হাজার টাকা ও বিদ্যালয়ের জন্য ১৪ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। শ্রীরামপুর মহকুমায় বিনামূল্যে খাদ্যদানের জন্য ৬০ হাজার টাকা এবং আরামবাগ মহকুমায় কৃষকদের জন্য আরও দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

পাঞ্জাব ধনীর সাহায্য—

পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ধনকুবের সার গঙ্গারামের পৌত্র লালা শ্রীরাম ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে জানাইয়াছেন, তিনি বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত একশত লোককে পাঞ্জাবে আহার ও বাসস্থান দিবেন। ঐ সকল লোকের যাতায়াতের খরচও তিনি বহন করিবেন।

যুক্তপ্রদেশের সাহায্য—

গত ২২শে আগষ্ট সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু 'লীডার' সংবাদপত্রের মারফৎ দ্বিতীয়বার এক আবেদন জানাইয়া বাঙ্গালার এই দুর্দিনে বাঙ্গলার সকল লোককে সাহায্য করিবার জন্য যুক্তপ্রদেশবাসী সকলকে অনুরোধ করেন। ফলে ঐ দিন পর্য্যন্ত এলাহাবাদে সাহায্য ভাণ্ডারে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৭শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

কুমার গোকুলচন্দ্র লাহা—

স্বর্গত রাজা হৃষীকেশ লাহার পুত্র কুমার গোকুলচন্দ্র লাহা বরাহনগরের নিকট আড়িয়াদহে ও ডায়মণ্ডহারবারের নিকট বালগাছিতে অন্ন বিতরণ কেন্দ্র খুলিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান সাতগাছিতে চাউল বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের কলিকাতার বাসগৃহেও প্রত্যহ খাদ্য বিতরণ করা হইতেছে।

পাইকপাড়া রাজবাটী—

পাইকপাড়া রাজবাটীর কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতারা গত ২২শে আগষ্ট হইতে তাঁহাদের বাড়ীতে অন্নদান কেন্দ্র খুলিয়াছেন। তাঁহারা আগামী ৩মাস কাল প্রত্যহ ২শত লোককে খাইতে দিবেন।

বিড়লা শিক্ষা ট্রাষ্ট—

বিড়লা শিক্ষা ট্রাষ্টের কর্তৃপক্ষ ভদ্র পরিবারের দুইশত বাঙ্গালী বালককে (৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক) জয়পুর রাজ্যের পিলানীতে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে আহার, বাসস্থান ও শিক্ষাদান করিবেন। আগামী ১ বৎসর কাল এই সাহায্য চলিবে এবং তাহাদের দেখাশুনার জন্য কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককেও লইয়া যাওয়া হইবে।

দিল্লীতে কমিটী গঠিত—

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার জন্য দিল্লীতে বেঙ্গল রিলিফ এসোসিয়েশন নামক যে সমিতি গঠিত হইয়াছে—লেডী প্রতিমা মিত্র তাহার সভানেত্রী এবং ডাক্তার সুধীরকুমার সেন তাহার সাধারণ সম্পাদক হইয়াছেন। ১নং রেসকোর্স রোড, নিউ দিল্লীতে সভানেত্রী কর্ত্তৃক সমস্ত সাহায্য গৃহীত হইতেছে।

রেলের আয় বৃদ্ধি—

১৯৪১-৪২ সালের রেলের হিসাব হইতে জানা যায় যে রেল বিভাগে ঐ বৎসরে মোট আয় হইয়াছে ১ শত ২২ কোটি টাকা—ব্যয় হইতে আয় বেশী হইয়াছে ২৮ কোটি টাকা। ১৯৪২-৪৩ সালে মোট আয় হইয়াছে ১ শত সাড়ে ৪৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হইয়াছে ৪৪ কোটি টাকা। ভারতের মোট রেলপথ ৪০ হাজার মাইল—তন্মধ্যে সামরিক প্রয়োজনে মাত্র সাড়ে ৮ শত মাইল রেল সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। এত আয় সত্বেও রেলের যাত্রীদিগকে এখনও পূর্ব্বের মত নানা অসুবিধাই ভোগ করিতে হইতেছে।

ছাত্রের কৃতিত্ব—

সন্তোষের জমীদার স্বর্গত কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান সুনীলকুমার রায় চৌধুরী কলিকাতা হিন্দু স্কুল হইতে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। দেবেন্দ্রনাথও আই-এ হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সুনীলকুমার দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া কৃতী হউন—ইহাই আমরা কামনা করি।

দিল্লীতে সিটি ক্লাব—

গত ৭ই ভাদ্র দিল্লীতে সিটি ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও পূর্ণিমা সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন রায় বাহাদুর শ্রীযুত শৈলেশ্বর সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় ক্লাবের খেলাধূলা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছিল। বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুরবস্থায় সাহায্য করিবার জন্য নূতন দিল্লী, পুরাতন দিল্লী, তিমারপুর প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধি লইয়া সভায় একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ লক্ষ্মীচাঁদ—

কলিকাতা ৩১নং কটন ষ্ট্রীটের মেসার্স বৈদ্যনাথ লক্ষ্মীচাঁদ কোম্পানী সম্প্রতি প্রত্যহ দুই হাজার করিয়া দুঃস্থ ব্যক্তিকে অন্নদান করিতেছেন। পূর্ব্বে বহু দিন তাঁহারা সুলভে পুরী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কবি বসন্তকুমারের সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৯শে শ্রাবণ হাওড়া টাউন হলে স্থানীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সুকবি শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভায় পৌরহিত্য করেন এবং কলিকাতার বহু খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ এস ওয়াজেদ আলি ও সভাপতি মহাশয় কবি বসন্তকুমারের কাব্যালোচনা করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শতাব্দীর শিল্প—হেনরী মুর

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় এম-এ (লণ্ডন), এফ-আর-এ-আই (লণ্ডন)

শিল্পকলার মধ্যে বোধহয় ভাস্কর্যই সবচেয়ে কঠিন এবং আরও কঠিন হচ্ছে ইহা তারিফ করা। অবশ্য এর মূলে যে কয়েকটি কারণ আছে তা অনিবার্য নয়। ভাস্কর্যে স্বভাবতই ধৈর্যের আবশ্যকতা এবং শক্তির প্রয়োজন হয়েছে এবং পরে তৈরী মূর্তিটির যথাস্থানে প্রতিষ্ঠাও রুচির পরিচয় দেখান দরকার। কেননা ভাস্কর্য অন্দরের সৌখীন শিল্প নয়—ইহা স্থানের প্রসারতা ও উন্মুক্ততার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। তাই ভাস্কর শিল্প সত্যিকারের জনশিল্প - ইহা সমষ্টিগত।

এই হিসাবে হেনরী মুরের ভাস্কর্য আজ সমগ্র পৃথিবীর—বিশেষভাবে ইংলণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একদিকে তিনি যেমন কঠিন পাথর কুঁদে রূপ দিয়েছেন তেমনি ফুটিয়ে তুলেছেন এক কবিত্বময় ছন্দ। কঠিন পদার্থের ভেতর দিয়ে যে রূপ ও ছন্দের এরকম ভাবপ্রকাশ হতে পারে, তা হেনরী মুর অদ্ভুতভাবে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন।

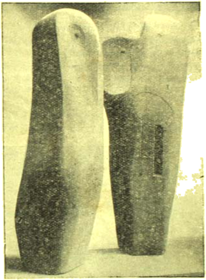

দুটি মূর্তি

ভাস্কর হিসাবে মুরের বিশেষত্ব এই যে তিনি প্রত্যেকটি কঠিন পদার্থের ভেতর দিয়ে নানাভাবে পরীক্ষামূলক কাজ করেছেন। প্রথমে মার্বেল ও পাথরে, পরে কাঠে এবং বর্তমানে সীসা দিয়ে শিল্প-সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন পদার্থের গুণের তারতম্য হিসাবে হেনরী মুরের শিল্পও বিভিন্ন রূপ পেয়েছে। আদিম ভাব পূর্ণ বৃহৎ পাথরের মূর্তিগুলির স্থান, পরে আঁশযুক্ত কাঠের ছোট মূর্তিগুলি অধিকার করে এবং মুরের তৈরী সীসার মূর্তিগুলিই আজকাল খুব জনপ্রিয়। এগুলি আকারে ছোট এবং এর গঠন-কাজও ঝরঝরে। এই সীসার কাজে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হঠাৎ বেরিয়ে-আসা কর্কশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কি ভাবে সুন্দর নিটোল গঠন পেয়েছে। হেলান দিয়ে বসা মূর্তিগুলির অঙ্গবিন্যাস প্রথমে অমসৃণ ছিল, পরে সীসার মূর্তিগুলিতে সুন্দর ও কমনীয় ভঙ্গী বিকশিত হয়ে ওঠে। এই বাস্তব পদার্থের ভেতর দিয়েই শিল্পী তার নূতন ভাব প্রকাশ করার সুযোগ পান। মুরের তৈরী কোন কোন মূর্তিতে একদিকে যেমন তাদের সংযোগে জ্যামিতিক রেখা দেওয়া হয়েছে, তেমনি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একটি উদ্বেলিত ভঙ্গী। বর্তমানে হেনরী মুরের তৈরী যে সব মূর্তি তাদের ছায়া আবৃত তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে হলে শিল্পীর আঁকা ছবিগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া দরকার। মুরের চিত্রে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং বর্ণ বিন্যাসের প্রাধান্যই বেশী। কিন্তু তাঁর ভাস্কর্যে ভাবপ্রবণতা সুপরিস্ফুট।

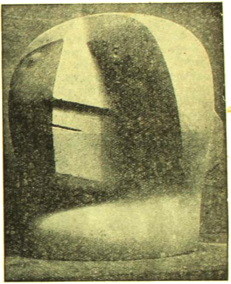

একটি মাথা

শিল্পীর এই মনোভাব খুবই সুলক্ষণ বলে মনে হয়। তাঁর অঙ্কিত চিত্রে একটা সঙ্গীতের রেশ এবং রেখাটানের ছন্দ উপলব্ধি করা যায় বলেই হেনরী মুর মুখ্যতঃ ভাস্কর শিল্পী হতে পেরেছেন। যদিও হেনরী মুর তাঁর শিল্পের জন্যে নানাদেশের বিভিন্ন যুগের ভাস্কর্য পর্যবেক্ষণ করেছেন কিন্তু প্রধানতঃ আদিম শিল্প থেকেই তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন বেশী। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষ কখনও পাথরে রক্ত মাংসের রূপ পেতে পারে না, কিন্তু ভাবের সাহায্যে পাথরকে জীবন্ত করে তোলা যায়।

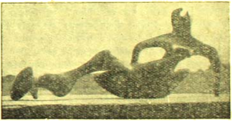

সীসার তৈরী হেলান নগ্ন-নারী

তাই হেনরী মুরের মূর্তিগুলি আকারে মানুষের মত বড় হতে পারেনি, কেননা তাহলে শক্তির অপচয় ঘটত। কিন্তু পাথর, কাঠ কিংবা সীসার ছোট ছোট মূর্তিগুলিতে শিল্পী ফোটাতে সক্ষম হয়েছেন এক অনির্বচনীয় ভাব ও জীবনগতি।

হেনরী মুর প্রাকৃতিক জগৎ নিয়ে কারবার করেছেন বটে, কিন্তু কখনও তার হুবহু অনুকরণ করেন নি। বিশেষভাবে বর্তমানের ফটোগ্রাফিক্ বাস্তব্ ভাস্কর্য্য কিংবা মোমের পুতুলের আধিক্যতার দিনে হেনরী মুরের দান অতুলনীয়। প্রাকৃতিক জগতের সৃষ্টি কাজে যে ধীর ও মন্থর গতি চলেছে, তাতে শিল্পী কোনটেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাই তিনি কুৎসিত পাথরকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এই প্রচেষ্টায় তিনি কখনই পাথরের স্বভাবজাত গুণ নষ্ট হতে দেননি। যেমন, অনেক পাথরে কিংবা কাঠের টুকরোয় মানুষের ও জন্তুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়; সেই সব পদার্থের স্বভাবজাত গুণটি হেনরী মুর নষ্ট না করে খোদাই কাজের নৈপুণ্যে এক অনির্বচনীয় ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন।

হেনরী মুর বিশ্বাস করেন—বস্তুর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত রূপ রয়েছে তাকে রূপ দেওয়াই শিল্পীর একমাত্র কাজ হওয়া উচিত। বস্তু বিবর্তনে যে আকার লাভ করে তা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য্য হতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় তার পরিণতি অসম্পূর্ণ। সুতরাং শিল্পীর কাজ তাকে এমনভাবে রূপ দেওয়া—যার অন্তর্নিহিত অর্থ সহজেই ধরা পড়ে।

কংক্রীটের একটি নারীমূর্তি

কিন্তু আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যেখানে সব জিনিষটাই একটু গোলমেলে। নাগরিক সভ্যতা আমাদের জীবন যে প্রভাবান্বিত করেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই, সুতরাং আমাদের চিন্তাধারাও সেই সঙ্গে বদলাতে বাধ্য। সেইজন্যে দেখা যায় আধুনিক ভাস্কর শিল্পীদের কারবার মানুষের দেহ নিয়ে; অবশ্য বহু প্রাচীন কাল থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। কিন্তু হেনরী মুরের বিশেষত্ব যে তাঁর মূর্তির গঠনের মধ্যে একটা বিশ্বভাব লক্ষ্য করা যায়—যে সত্য সাধারণতঃ ফুটে ওঠে প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে।

ছাত্রাবস্থায় হেনরী মুর তাঁর অঙ্কন ও খোদাই কাজে জীবন্ত মূর্তি থেকে অনুপ্রেরণা নিতেন এবং এখনও তিনি এই অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নি।

এককথায় বলতে গেলে শিল্পী প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে—বিশেষভাবে শক্তির সঙ্গে এমন ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন যে অনুভূতির সাহায্যে তিনি একটা আদর্শ রূপ দিতে সক্ষম। এর ফলে শিল্পী সহজেই প্রাকৃতিক বস্তুর অবাঞ্ছনীয় অংশ বাদ দিয়ে একটা বিন্যাস ও জীবনগতি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

কাঠের তৈরী হেলান নর-নারী

বড় বৃষ্টিতে ভাঙা পাথর, ঝিনুক, সমুদ্রের নুড়ি কিংবা হাড় প্রভৃতি হল হেনরীমুরের শিল্প উপাদান। এই সব বস্তুতে তিনি তাঁর ভাবকে রূপান্তরিত করে তুলেছেন বটে, কিন্তু মনুষ্য মূর্তির হুবহু পাথরে নকল শিল্পী একটা বীভৎস ব্যাপার বলে মনে করেন। হেনরী মুরের মতে ভাস্কর শিল্পীর আদর্শ হবে উপাদান বস্তুর স্বভাবজাত গুণ ও গঠন বজায় রেখে চিন্তাধারাকে রূপান্তরিত করা। তাই হেনরী মুরের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আকৃতি ও ভাবধারার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য।

আলিঙ্গন

খেলা ধুলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

ইষ্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে পুলিসকে পরাজিত ক'রে এবার আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হ'লো। ইতিপূর্ব্বে মাত্র তিনটি ভারতীয় টীম আই এফ এ শীল্ড পেয়েছে; মোহনবাগান, মহমেডান ও এরিয়ান্স। এবার ফাইনাল খেলা খুব দর্শনীয় হয়নি। পুলিস প্রথম গোল খাবার পরই দুটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে। বাকী সময় একা ইষ্টবেঙ্গলই আক্রমণ চালিয়েছিলো তার ফলে আরও দুটি গোল হয়। পুলিসের রক্ষণভাগ অসম্ভব খুব দক্ষতার সঙ্গে খেলেছে। উইলার্স একাধিক অব্যর্থ সট প্রতিরোধ ক'রেছেন, ভেটার্ণ ওয়াটিস্ ও তাঁর জুটি যথেষ্ট সহযোগিতা ক'রেছেন। হাফ-লাইন অত্যন্ত দুর্ব্বল; ফরওয়ার্ডে ডি বেরো ছাড়া কারো খেলা উল্লেখ করবার মত নয়। ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণ ভাগের আদান প্রদান দর্শনীয়। তুলনায় আপ্পারাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তার পরই সুনীল ঘোষ। হাফ-লাইন থেকে ফরওয়ার্ডরা মোটেই সহযোগিতা পাননি ফলে সমস্ত আক্রমণ ভাগের ভার এঁদের দুজনকেই নিতে হ'য়েছে। সুনীল প্রথমার্দ্ধে স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেননি কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে উন্নত খেলা দেখিয়ে পুলিসকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলেছিলেন; ব্যাকে চক্রবর্ত্তী ও মজুমদার দুজনেই ভাল খেলেছেন। সোমানার গোলটিই সবচেয়ে দর্শনীয় হ'য়েছিল।

সিভিক গার্ড ও এ আর পি বাদে বোধ হয় সব রকম টীম এবার শীল্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রেছিলো। কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে আই এফ এ লক্ষ্য রেখেছেন যাতে ক'রে সংখ্যায় খুব বেশী টীম শীল্ডে যোগদান করে। এতে শীল্ড খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্রমশঃ খুব খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড গুণগত, পরিমাণগত নয়। শীল্ডের অধিকাংশ খেলা দেখার অযোগ্য; বোধ হয় অফিস লীগের খেলাও তার চেয়ে ভাল হ'য়ে থাকে। একই স্থান থেকে একাধিক দুর্ব্বল টীমকে কেন নেওয়া হয় তার কারণ বুঝি না। ঢাকা ছাড়া বাংলার কোন জেলা থেকে একটির বেশী টীমকে নেওয়া উচিত নয়। তাতে কোন জেলা থেকে টীম এলে তারা একটু শক্তিশালী হবে আর কলকাতার বাইরের উদীয়মান বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা অন্ততঃ একাধিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন। বর্ত্তমানে যেভাবে একটি ক'রে ম্যাচ খেলে হেরে চলে যাচ্ছেন তাতে কলকাতার বাইরের বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করবার বা উন্নত খেলা দেখাবার অথবা দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মোটেই সুযোগ পাচ্ছেন না। স্থানীয় তৃতীয় শ্রেণীর টীমকেও শীল্ড খেলতে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব্বে এ ধরণের ব্যবস্থা ছিল না। মফঃস্বল ও স্থানীয় এইরূপ টীমগুলি পূর্ব্বে বোধ হয় কুচবিহার বা ট্রেডস কাপে যোগদান করার অযোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'তো। এবারের শীল্ডে ইষ্টবেঙ্গলের দিকের সবচেয়ে ভাল খেলা হ'য়েছে চতুর্থ রাউণ্ডে ইষ্টবেঙ্গল-ভবানীপুরে। খেলা শেষ হবার মাত্র কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ইষ্টবেঙ্গল একটি গোল দিয়ে জয় লাভ করে। ভবানীপুরের সঙ্গে খেলায় দুদলই সমান সমান খেলেছে এবং বহু সুযোগ নষ্ট ক'রেছে; তুলনায় ভবানীপুরই বেশী। তাদের পরাজয় সত্যসত্যই দুর্ভাগ্যের। বাকী সব খেলাতেই ইষ্টবেঙ্গল জিতেছে খুব সহজেই। সেমি-ফাইনালে বি এণ্ড এ রেল দলকে ৭-১ গোলে পরাজয়ও এক রেকর্ড।

পুলিসের দিকের এবং এবারের শীল্ডের সবচেয়ে ভাল খেলা মোহনবাগান বনাম মিডিয়াম রেজিমেণ্ট। খেলাটি প্রথম দিন গোলশূন্য 'ড্র' হয়। মোহনবাগান দ্বিতীয় দিনে এক গোলে জয়লাভ করে। বহুদিন পরে ক'লকাতায় একটা সত্যিকারের ভাল মিলিটারী টীম খেলতে এসেছিলো। আশ্চর্য্য এদের 'Seeded' হিসাবে নেওয়া হয় নি। পটারের মত গোলরক্ষক যে টিমে দেখেছি তার বাকী দশ জন খেলোয়াড় ছিলো সাধারণ শ্রেণীর। কিন্তু গোলরক্ষকের অতুলনীয় খেলার সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ড বিগ্রেডের জোন্স ও ডেভিসের মত ব্যাক আর ডায়গামনের ম্যাকেঞ্জির মত ক্ষিপ্র আউটের সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না। অন্ততঃ গত কয়েক বৎসরের ভেতর যে দেখা যায়নি তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা ক্ষিপ্রতায় নবগণ মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে দর্শকদের আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ ক'রেছে। মোহনবাগানের রক্ষণ ভাগে ভট্টাচার্য্য, মান্না এবং এস দাসের চতুরতা ও দক্ষতা অসীম। বিপক্ষ ফরওয়ার্ডদের নিখুঁত সেণ্টার ও বল কাটাবার অদ্ভুত কৌশল সত্ত্বেও চতুরতায় ও শক্তিমত্তায় এঁদের অতিক্রম করা অসাধ্য। ব্যাক-ত্রয়ের সম্মিলিত শক্তি আবার প্রচুর সাহায্য ক'রেছে ফরওয়ার্ড লাইনকে। হাফে অনিলই একমাত্র খেলেছেন। ফরওয়ার্ড লাইনের আদান প্রদান মুগ্ধ ক'রেছে; মুখার্জিকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হ'য়েছিল। তবে সৈনিক দল তাঁদের পুরাতন প্রথা মত বেশ একটু গায়ের জোর দিয়ে খেলেছেন ফলে মান্না ও রায়চৌধুরীকে মাঠ ত্যাগ ক'রতে হয়। মান্না এর ফলে এ বছর আর খেলতে পারেন

নি। রায়চৌধুরী পুনরায় নেমে নিজের জায়গায় না খেলে লেফট আউটে খেলেন। দ্বিতীয় দিনে এস মুখার্জি লেফট আউট থেকে অতি সুন্দর ভাবে গোল দিয়েছেন। সেমি-ফাইনালে আবার এই মোহনবাগানকেই তিন দিন ড্র ক'রে চতুর্থ দিনে পুলিশের কাছে পেনাল্টি গোলে হারতে দেখেছি। চার দিনই সমানে আক্রমণ চালিয়ে ফরওয়ার্ড লাইন খালি অজস্র সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট ক'রেছে। দ্বিতীয় দিন ডি সেন পেনাল্টি পেয়ে সোজা গোল-কিপারের গায়ে মেরেছেন। ইষ্টবেঙ্গল লীগের খেলায় শেষ ম্যাচে যেমন পুলিশকে ভাল খেলেও হারাতে পারেনি ফাইনালে তেমনি তার শোধ নিয়েছে। কিন্তু অনুরূপ খেলেও মোহনবাগান তৃতীয় দিনে একটিও গোল ক'রতে পারে নি। অথচ এই খেলায় তাদের অন্ততঃ তিন গোলে জেতা উচিত ছিলো। ফরওয়ার্ড লাইনে সকলেই সমান ভাবে সুযোগ নষ্ট ক'রে এসেছেন; রায়চৌধুরীর খেলা সমালোচনার অযোগ্য।

আক্রমণভাগের সকল ইনম্যানই অজস্র সুযোগ পেয়ে তার এক অংশেরও সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। যেখানে ইনম্যান-খেলোয়াড়দের কোন চেষ্টাই কাজে এলো না সেখানে ইনম্যানে দিয়ে না খেলিয়ে আউট দিয়ে খেলানই উচিত ছিল। তা না করার দরুণ মোহনবাগানের আক্রমণভাগের দুর্ব্বলতার সন্ধান পেতে বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের বেশী সময় লাগে নি। আউটের খেলোয়াড়রা দলের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পাননি। যে কয়েকবার পেয়েছেন তার বেশীর ভাগেই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। রেজিমেন্ট দলের মত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ইনম্যানেরা অনেক সুযোগ পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি, কিন্তু আউটের খেলোয়াড়ই দলের সম্মান রক্ষা করেছেন। বিপক্ষ দলের অবলম্বিত খেলার পদ্ধতির বিপক্ষে কিরূপ পদ্ধতি কার্য্যকরী হবে এ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান কম দলের খেলোয়াড়দেরই আছে। সকল খেলোয়াড়দেরই মনে রাখতে হবে পরিবর্ত্তনশীল আক্রমণ পদ্ধতিই কার্য্যকরী, আর তা যত অতর্কিত হবে তত হবে বিপক্ষ দলের পক্ষে মারাত্মক। এবার আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সেমি-ফাইনাল খেলায় চারটি স্থানীয় দল উঠেছিল। তার মধ্যে তিনটিই ভারতীয় দল।

রেফারিং ঃ

রেফারিং কোন দেশে কোনকালেই একেবারে নির্ভুল হয় না। কিন্তু সকলপ্রকার ভুলেরই একটা মাত্রা আছে। সে মাত্রা অতিক্রম করলেই দর্শকমণ্ডলীর ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, চারিপাশেই রেফারীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। রেফারির বিরুদ্ধে অহেতুক দর্শকদের উত্তেজনা প্রকাশেরও কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই যদি তাঁর বিচারে কোথাও ত্রুটী না থাকে। বিস্তৃত মাঠের উপর খেলার দ্রুত পরিবর্ত্তন অনুধাবন ক'রে একজন রেফারীর পক্ষে নির্ভুল বিচার দেওয়া সব সময় সম্ভব নয়। খেলোয়াড় কিম্বা রেফারীর ত্রুটীবিচ্যুতি কিন্তু সহস্র সহস্র দর্শকের চক্ষু ফাঁকি দিতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিক্ষোভ একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে খেলা দেখতে দর্শকেরা পারেন না। বহুদিন থেকেই কলকাতার মাঠে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায় রেফারিং সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। রেফারীরা মারাত্মক ভুলের পরিচয় দিয়ে কোথাও বা দর্শকদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন, কেহবা লাঞ্ছিত হয়েছেন আবার কেহবা ভাগ্যক্রমে পুলিশের হেপাজতে বাড়ী পৌঁছে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছেন। রেফারীকে মারপিট করা আমরা যেমন সমর্থন করি না, তেমনি সমর্থন করি না অযোগ্য রেফারীর নিয়োগও। আমাদের মনে রাখতে হ'বে অর্থের বিনিময়ে বহু কষ্ট স্বীকার করে তবে দর্শকেরা মাঠে খেলা দেখতে পান। সুতরাং নিকৃষ্ট খেলা কিম্বা খেলা পরিচালনার মারাত্মক ত্রুটির বিরুদ্ধে তাঁদের বিক্ষোভ যত প্রকাশ হ'লে কোন মতেই তা অখেলোয়াড়ী মনোভাব বা অন্যায় বলা চলে না। রেফারীর ভুলত্রুটিতে দর্শকদের কাছ থেকে প্রতিবাদ সঙ্গত যদি তা একটা সীমা ছাড়িয়ে না যায়। আমাদের মনে হয় দর্শকদের 'sporting spirit' দেখানোর সাধু উপদেশ দেওয়ার থেকে যদি এসোসিয়েশন অযোগ্য রেফারীদের খেলা পরিচালনা থেকে অব্যাহতি দেন তাহলে যেমন পুলিশের সাহায্যেরও কোন প্রয়োজন হয় না এদিকে তেমনি সারাদিনের পরিশ্রমে রৌদ্রে গলদঘর্ম হয়ে বা শ্রাবণের জলধারায় অসময়ে স্নান করেও নির্দ্দোষ আনন্দলাভের প্রাচুর্য্যে দর্শকবৃন্দ হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরতে পারেন। রেফারিং সম্বন্ধে দৈনিক এবং সাময়িক পত্রিকায় বহু আলোচনা সত্ত্বেও দুঃখের বিষয় অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। বর্ত্তমান বছরেও কোন কোন রেফারীর মারাত্মক ভুল ত্রুটি দেখা গেছে। রেফারী সম্প্রদায়ের যে সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধান qualification পরিবেশ তার অভাব থাকার এবারে কোন কোন রেফারীর খেলা পরিচালনায় ভুলত্রুটি ধরা পড়েছে। রেফারীর ভুলত্রুটির উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে, তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব প্রকাশ করা। সেরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব কোন রেফারীরই প্রতি আমাদের নেই। জনসাধারণের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য সেই কর্ত্তব্যের প্রেরণায় আমরা রেফারিং সম্বন্ধে আলোচনা করছি। যোগ্য ব্যক্তিকে অস্বীকার করবার অধিকার কারও নেই। যোগ্য ব্যক্তির উপর খেলা পরিচালনার ভার পড়লে দর্শকদের মধ্যে বিক্ষোভ, রেফারীদের লাঞ্ছনা, পুলিশের হস্তক্ষেপ এই সব অপ্রিয় ঘটনা আর ঘটবে না। রেফারীদের মারাত্মক ভুল ত্রুটির সুযোগ পেয়ে তাঁদের সম্বন্ধে যে সব কথা মাঠের দুষ্ট লোকেরা রটনা ক'রে তারও মুখ বন্ধ হবে। কাগজগুলিও রেফারীদের দোষ ত্রুটি আলোচনা করতে গিয়ে যে ভাবে তাঁদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা পাবে। তা না হয়ে নির্ভুল রেফারিং সম্ভব নয়—এই সুযোগ নিয়ে যদি রেফারিং দিন দিন নিকৃষ্ট হ'তে থাকে তাহলে মাঠের মধ্যে শৃঙ্খলা নষ্ট হবে, দুষ্ট লোকের ভিত্তিহীন প্রচার বাক্যই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এসোসিয়েশনের দুর্নাম এবং সম্ভ্রান্ত রেফারীদেরও কলঙ্ক প্রচার করবে। আমরা এসোসিয়েশনের সুনাম এবং রেফারীদের সম্মান রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট বলেই এতগুলি কথা বলছি।

• • • •

রেফারীদের মধ্যে যিনি সভ্য হিসাবে কোন ক্লাবের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁকে সেই দলের খেলা পরিচালনার ভার দেওয়া হয়না। এ সম্বন্ধে রেফারী এসোসিয়েশনের কোন

লিখিত আইন নেই, তবে এ ব্যবস্থা তাদের প্রচলিত প্রথায় দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা এসোসিয়েশনের অবলম্বিত নীতির প্রশংসা করি। মানুষমাত্রেরই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। বিস্তৃত মাঠে দলের খেলা পরিচালনা করতে গিয়ে যদি কোথাও অজ্ঞাতসারেই রেফারীর ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয় এবং তার জন্য সেই দল সুবিধা পায় তাহলে রেফারী পক্ষপাতিত্ব করছে এই ধারণায় দর্শক এবং বিপক্ষদলের সমর্থকেরা উত্তেজিত হয়ে এক গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে পারেন। অবশ্য অন্য রেফারীর ত্রুটিবিচ্যুতিতে বিক্ষোভও দেখা দিতে পারে কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই দর্শকেরা রেফারীর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন না, তার বিচারে কোথাও না কোথাও ত্রুটিবিচ্যুতির সন্ধানে পেলেই উত্তেজিত হন। কিন্তু দুই দলের কোন পক্ষেরই সভ্য নয় এ রকম কোন রেফারীর পরিচালনায় খেলতে কোন দলের আপত্তি থাকে না, সমর্থক বা দর্শকদেরও না।

কিন্তু সম্প্রতি এক ভদ্রলোক দর্শক হিসাবে এক শ্রেণীর রেফারীর খেলা পরিচালনা ব্যাপারে (তাঁদের পরিচালনার যোগ্যতা বা অযোগ্যতার প্রশ্ন না তুলে) আপত্তি জানিয়েছেন। সাধারণের তরফ থেকে তাঁর বক্তব্য এই যে, বর্তমানে এই শ্রেণীর রেফারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাবান সংবাদপত্রের খেলাধূলা বিভাগের বেতনভুক্ত কর্মচারী। খেলা পরিচালনায় তাঁদের দোষ ত্রুটির ঘটনা যে, ব্যক্তিগত প্রভাবে তাঁদের কাগজে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে না বা পরে হবে না তা কেউ জোর করে বলতে পারেন না। তাঁর বক্তব্য, সংবাদ পরিবেশনই সংবাদপত্রের একমাত্র কাজ নয়। অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য জনমত সংগঠনের কঠিন দায়িত্ব সংবাদপত্রেরই আছে এবং সংবাদপত্র জনমত সংগঠনের একমাত্র অন্যতম সহায়ক। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে যদি রেফারীদের ভুলভ্রান্তির সমালোচনা কাগজে না হয় তাহলে কোনদিনই রেফারিংয়ের ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নত হবে না। পুলিশের সাহায্যেই খেলার মাঠে শান্তি রক্ষা করতে হবে। জাতির পক্ষে এবং পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে এ ব্যবস্থা মোটেই শোভনীয় নয়।

• • • •

রেফারীরা নিজেদের দোষত্রুটি ধামাচাপা দেবার জন্য কি পরিমাণ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করছেন তা জানা নেই। তবে জানি ক'লকাতার কোন ইংরাজি দৈনিক পত্রিকার খেলাধূলা বিভাগের পরিচালকমণ্ডলী সহকর্মীর খেলা পরিচালনায় দোষ ত্রুটি উল্লেখ ক'রে নিরপেক্ষভাবে খেলার সংবাদ পরিবেশনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। জনসাধারণ বলতে পারেন পত্রিকার সুনাম রক্ষার জন্যই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠাবান দলের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর রেফারীর ভুলত্রুটি দেখা দিলে তা উপেক্ষা করা কখনও কখনও সম্ভব হয়ত হবে না। কারণ সেখানে প্রবল জনমত আছে। কিন্তু দুর্বল দলকে উপেক্ষা অনায়াসেই করা যায়। তা ছাড়া সকল কাগজই যে নিরপেক্ষ সমালোচনা করার নীতি বরাবরই অবলম্বন করবেন তার নিশ্চয়তা কোথায়?

আমাদেরও তাই মনে হয় সংবাদ বা সাময়িক পত্রিকার খেলাধূলা বিভাগের পরিচালকগণের কোন খেলা পরিচালনার ভার না নিয়ে নিরপেক্ষ থাকাই শোভন।

ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে এই নিয়ে আলাপ আলোচনাও হয়ে গেছে। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা'র খেলাধূলা বিভাগের পরিচালকগণই এই বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা আরম্ভ করেন। এই পত্রিকার কোন সহযোগী ইংরাজি দৈনিক পত্রিকা ইউরোপের সংবাদ পত্রের সাংবাদিকদের খেলা পরিচালনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে নজির দিয়েছিল।

আমাদের বক্তব্য, ভারতবর্ষ বিলাত নয়। সেখানের জনমতের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ আকাশ পাতাল। ক'লকাতা সহরের মত সেখানে কোথাও দুটিরের প্রধান শ্রেণীর কাগজ নেই বলেই সেখানে ব্যক্তিগত প্রভাবে কারও দোষ ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব নয়। জনমতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেখানের সাংবাদিকদের সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হয়, সত্য গোপনে যথেষ্ট বিপদ আছে। আমাদের দেশের মত নিরীহ দর্শক বা পাঠকের সংখ্যা সেখানে অল্প। জনমতেরও আকার ক্ষুদ্র প্রমাণ নয়। স্বাধীন দেশ বলেই তা সম্ভব হয়েছে। সেখানের খেলার মাঠে রেফারীদের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিলে কেবল আস্ফালনজনিত বিক্ষোভই দেখা দেয় না, দাঙ্গাও হয়ে যায়। খ্যাতনামা ফুটবল খেলার সমালোচক W. Capel-kiby এবং Frederick W. Carter লিখিত পুস্তক থেকে খেলার মাঠের আবহাওয়ার বিবরণ একবার উদ্ধৃত করেছিলাম সেখানের 'sporting spirit'এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত (?) দেখাবার জন্য। এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই পুনরায় উল্লেখ করছি।

"আর্জেন্টাইনে একবার দুটি টিমের ভেতর খেলা হ'চ্ছে; প্রবল উত্তেজনার ভেতর একপক্ষ অপর পক্ষকে গোল দিলে। যারা গোল খেলে তাদের একজন খেলোয়াড় বিপক্ষের একজনকে ধাক্কা দিয়েছে। সাটি নামে একজন খেলোয়াড় রেফারিকে ব'ললে তাহ'লে গোল অগ্রাহ্য ক'রে দেওয়া হ'ক। কিন্তু রেফারি তাতে রাজি না হওয়ায় সাটি রেফারির নাকের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুঁসি লাগালে। বলা বাহুল্য এর পর সাটিকে পুলিস দিয়ে মাঠ থেকে বার ক'রে দিতে হ'য়েছিলো।

আর্জেন্টাইনের লা প্লাটা নামক আর একস্থানে রেফারি যখন অনেক কথা কাটাকাটির পরও স্থানীয় ক্লাবের পক্ষে একটি পেনাল্টি দিলেন না তখন ঐ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রেফারির মাথাটিকে চমৎকার তাক করে রিভলবার ছুড়ে ছিলেন। কোন খেলোয়াড়ের আচরণ অথবা রেফারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে রিভলবারের ফাঁকা আওয়াজ করাটা ওখানে কোন রকম দোষণীয় নয়।

১৯৩২ সালে নববর্ষের দিন একটি ফুটবল ম্যাচে রেফারি বার্ট্রাম বার্কিং টাউন টিমের বিরুদ্ধে একটি পেনাল্টি দেওয়ার ফলে খেলাটি ড্র হ'য়ে যায়। রেফারি কিন্তু মাঠের সন্নিকটস্থ ষ্টেশনে অক্ষত দেহে পৌঁছতে পারেন নি। চক্ষু দুটি তাঁকে একেবারে হারাতে হয়নি বটে তবে তাঁকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হ'য়েছিলো।

ঠিক একই সময়ে, যদিও এই ঘটনা স্থল থেকে বহু দূরে এক জটিল স্পোর্টস্‌ম্যানের (?) মুষ্টি চালনার ফলে ওয়াটসন নামে অপর এক রেফারির জন্য খেলার মাঠে ডাক্তার ডাকবার প্রয়োজন হ'য়েছিলো।

রেফারিকে লাঞ্ছনা করা বিষয়ে পূর্বে প্রেগের বেশ একটু সুনাম ছিলো; অবশ্য বর্তমানে তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

পৃথিবীর বিখ্যাত ইণ্টার ন্যাশনাল রেফারী মুখেরের এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। একবার প্রেগে বোহেমিয়া ও ইংলণ্ডের খেলায় তাঁকে রেফারী হ'তে অনুরোধ করা হয় কিন্তু সেইদিনই তাঁর অপর স্থানে যাবার কথা ছিলো ব'লে তিনি সে অনুরোধ রাখতে পারলেন না। পরে এক ষ্টেসনে তিনি একটি 'ইভনিং পেপার'-এ দেখেন তাতে বড় বড় হরফে লেখা র'য়েছে যে, বিখ্যাত রেফারি জন লুই বোহেমিয়া ও ইংলণ্ডের খেলা পরিচালনা ক'রতে গিয়ে এরূপ গুরুতর ভাবে জখম হ'য়েছেন যে তাঁকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠাতে হ'য়েছে।

প্রেগে খেলা থাকলে মুখের ফাইনাল বাঁশী বাজাতেন একেবারে সেণ্টারের কাছে এসে। তারপর একেবারে ছুটে ড্রেসিং রুমে ঢুকে দরজায় খিল দিতেন। অবশ্য তিনি ভিতর থেকেই রেফারীর দর্শনপ্রার্থী উন্মত্ত জনতার কোলাহল শুনতে পেতেন। প্রবাদ আছে, সেখানে রেফারিং ক'রতে যাবার আগে রেফারিরা তাঁদের লাইফ ইন্সিওরেন্সের কাগজগুলো ঠিকমত আছে কিনা দেখে যেতেন। একবার একজন বিখ্যাত সুইডিস রেফারি একটি খেলা পরিচালনার পর ড্রেসিং রুমে আশ্রয় নিয়ে সেইখান থেকেই শুনতে পেলেন বাইরে থেকে উন্মত্ত দর্শকবৃন্দ তাঁর রক্ত দর্শনের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। তিনি ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, তিনি যদিও মোটেই ব্যস্ত হ'চ্ছেন না তবে তাঁর গৃহিণীকে তিনি যে জীবিত অবস্থায় আছেন এইটুকু টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিতে পারলে বড়ই ভাল হয়। কেননা তাঁর গৃহিণীর নিকট প্রেগের ফুটবল খেলার দর্শকদের সুনাম অজানা নেই।

আরও অনেক ঘটনার সংবাদ পৃষ্ঠাব্যাপী (দুঃখের বিষয় কাল কাটিতেই) লিখিত আছে। এই প্রকার জনমতের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রকে বেশ সাহসে খেলার সমালোচনা লিখতে হয় এবং রেফারীকেও সকলদিক বিবেচনা করে কাজ করতে হয়।

আমাদের এখানে 'ধামা চাপা' এবং ধামা ধরার প্রচলন যে কি পরিমাণ তা রাজনীতি থেকে আরম্ভ ক'রে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনুভব করছি। সাধারণের উদ্বেগ সেই কারণেই। সাংবাদিকদের সহযোগিতা নানাভাবে রেফারী এসোসিয়েশন পেতে পারেন। কিন্তু এই এসোসিয়েশনের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট না থাকলে কিম্বা খেলা পরিচালনার ভার না নিলে যে এসোসিয়েশনের পক্ষে খেলা পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে এ কথা কারও মনে উদয় হয় না।

এসোসিয়েশনের সুনাম এবং সাংবাদিকদের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

ফুটবল খেলা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

প্রঃ—কোন দলের আক্রমণ ভাগকে তাঁর বিপক্ষদলের পেনাল্টি গণ্ডির মধ্যে বে-আইনী খেলার দরুণ 'পেনাল' নিয়ম (Law of Tripping, Kicking, Striking, Holding, Pushing with Hand or Arm, and Jumping at an opponent, Violent or Dangerous Charging, or Charging from Behind (unless intentionally obstructional ; and the intentional Handling of the Ball) অনুসারে রেফারী শাস্তি দিয়েছেন। বিপক্ষদলের গোল রক্ষক 'ফ্রি কিক' মারলে বলটি দুর্ভাগ্যক্রমে রেফারীর কাছে বাধা পেয়ে ঐ খেলোয়াড়েরই গোলে প্রবেশ করেছে। এ ক্ষেত্রে রেফারীর বিচার কি?

উঃ—'কর্ণার কিকে'র নির্দেশ দেওয়াই নির্ভুল বিচার।

প্রঃ—'পেনাল্টি' কিক'এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; একমাত্র গোলরক্ষক এবং যে খেলোয়াড় কিক্ করবে এই দু'জন ছাড়া সকল খেলোয়াড়ই পেনাল্টি গণ্ডীর বাইরে বল থেকে দশ গজ দূরে আছে। খেলোয়াড়ের বল মারার ঠিক মুহূর্ত্তে সঙ্গেই (at the actual moment of the ball being Kicked) তার দলের একজন খেলোয়াড় দ্রুতবেগে গোলের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এক্ষেত্রে কি নির্ভুল বিচার হবে যদি (১) গোল হয় (২) গোলরক্ষক বলটি প্রতিরোধ করে কিম্বা (৩) বলটি 'বার' অতিক্রম করে যায়।

উঃ—গোল হ'লে পুনরায় 'কিক্' মারতে হবে। গোলরক্ষক বলটি প্রতিরোধ করলে বা বলটি 'বার' অতিক্রম করলে খেলা সাধারণ ভাবেই চলবে।

প্রঃ—পূর্ব্বোল্লিখিত পেনাল আইন অনুসারে এক পক্ষের রক্ষণভাগ 'ফ্রি কিক' পেয়েছে। ব্যাক বলটি 'কিক' নিতে গিয়েছে এবং নিজ দলের গোলরক্ষককে বলটি পাশ দিতে গেলে বলটি দ্বিতীয় খেলোয়াড় দ্বারা না খেলা অবস্থায় তার গোলে প্রবেশ করেছে। রেফারী কি নির্দেশ দিবে?

উঃ 'কর্ণার কিকে'র নির্দেশই এখানে নির্ভুল বিচার।

মাঠের সমস্যা ঃ

শীল্ড প্রতিযোগিতার গত বৎসরের মত এবারও মাঠের সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; যার জন্য দর্শকদেরই যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়েছিল। গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিযোগিতার পরিচালকমণ্ডলী এবার পূর্ব্ব থেকেই ব্যবস্থা নেবেন ভেবেছিলাম ; কার্য্যেও সেরূপ দেখিয়েছিলেন কিন্তু শেষের দিকে কি দুর্গ্রহের কোপে পড়ে যে তাঁরা সংকল্পচ্যুত হলেন তা জনসাধারণের

ধারণার অতীত। লীগের সেমিফাইনাল খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে জল কাদা অতিক্রম ক'রে বেশীর ভাগ দর্শকই দ্রুতবেগে পৌঁছতে পারেন নি। চারি পাশের খানা ডোবায় বহুজনের পা পড়েছিল। পিচ্ছিল পথে দর্শকদের পদস্খলন হাস্য রসের সৃষ্টি করলেও পরিচালকমণ্ডলীর অব্যবস্থার কথা না স্মরণ ক'রে কেউ থাকতে পারেন নি। এই মাঠের তুলনায় ভাল মাঠ থাকা সত্বেও কি কারণে যে পরিচালকমণ্ডলী দর্শকদের অসুবিধার কথা উপেক্ষা ক'রে এই মাঠেই খেলার ব্যবস্থা করলেন তা সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশ পেয়েছিল। পুলিশ ক্লাব নাকি নিরপেক্ষ মাঠেই খেলতে চেয়েছিল। কিন্তু তাই বলে কি কর্দমাক্ত, লম্বা ঘাসে পরিপূর্ণ এবং অনুপযুক্ত মাঠই পরিচালকমণ্ডলীর বিবেচনায় খেলাবার উপযুক্ত হ'ল? রেফারীও এই মাঠের অবস্থা দেখে খেলা পরিচালনার অনুপযুক্ত বলে অভিমত দিয়েছিলেন। খেলার পক্ষে মাঠের অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে রেফারীর বিচারই চরম এবং বলবৎ। দুঃখের বিষয় এক্ষেত্রে রেফারীর মতামত পূর্ব্ব ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন আনতে পারে নি। 'ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে' খেলার ব্যবস্থা করতে পরিচালকমণ্ডলী কেন যে অসুবিধা বোধ করেছিলেন তা জনসাধারণের বোধগম্য নয়। অথচ আই এফ এ-র হ্যাণ্ডবুকে ৯নং আইনে এরূপ লিখিত আছে—

"All Clubs enter for this competition (I. F. A. Shield Tournament) on the understanding that they will place their grounds daily properly marked and in proper condition at the disposal of the Governing Body when required for playing off any tie or drawn game in any of the five competitions run directly by the Indian Football Association."

একমাত্র এই আইনের আশ্রয় নিয়েই পরিচালকমণ্ডলী পুলিশ ক্লাবের অভিপ্রেত নিরপেক্ষ মাঠ (Neutral Ground) ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডেই খেলার ব্যবস্থা করতে পারতেন। ৭ই আগষ্ট তারিখে ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে ফাইনাল খেলা হবার কথা পূর্ব্ব থেকেই ঘোষণা করেছিলেন। ৯ই তারিখ থেকে ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে রাগবি খেলা আরম্ভ হবার কথা। সুতরাং ৭ই তারিখের পর ক্যালকাটা ক্লাবের পক্ষে নাকি মাঠ দেওয়া সম্ভব ছিল না। গত বছরের অভিজ্ঞতার দরুণ পরিচালকমণ্ডলী সেই কারণে গোড়ার দিকে অনেকগুলি খেলা দিয়ে সুব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু কার পরামর্শে শেষের দিকে কয়েক দিনের ব্যবধানে একটি ক'রে খেলিয়ে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করলেন তার হদিস কোন দিক থেকেই জনসাধারণ পাচ্ছিলেন না। জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা সেই কারণে হয়েছিল যে, খেলার মাঠের গ্যালারীর কণ্ট্রাক্টরের অনুরোধেই খেলার গুরুত্ব দেখে পরিচালকমণ্ডলী নাকি এরূপ ব্যবস্থা করেন। একথা কতখানি সত্য জানি না। তবে এটা ঠিক মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের মত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের ক্লাবের খেলাগুলি দু'চার দিনের ব্যবধানে দিলে কণ্ট্রাক্টরের প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সুবিধা করা হয়। এ ক্ষেত্রে খেলার সে ব্যবস্থা হওয়ায় সাধারণের মধ্যে এ ধারণাটা বদ্ধমূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার ফলে দর্শকদের কি দুর্ভোগ পেতে হয়েছিল তার কথা পরিচালকমণ্ডলীর অজানা নেই। চাক্ষুষ প্রমাণও পেয়েছেন। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, তাঁদের টিকিট পাওয়ার জন্য রৌদ্রে গলদঘর্ম্ম হ'য়ে লাইনে দাঁড়াতে হয় না, ঘোড়সওয়ারের তাড়নায় লাইনচ্যুত হয়ে পাশের খানা ডোবায় ভয়ে সাঁতরাবার জন্য ছুটতে হয় না। সেরূপ হবার সম্ভাবনা কোন দিন নেই বলেই দর্শকদের সুবিধার জন্য ক'লকাতার মাঠে ষ্টেডিয়ামের জল্পনা কল্পনা ভেসে যায়, দর্শকদের সুখ সুবিধার কথাও উপেক্ষণীয়। দর্শকদের এ দুর্ভোগ পেতেই হবে। প্রতিযোগিতার পরিচালকমণ্ডলীর নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ, দর্শকদের প্রতি তাঁদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি যেন আর এ ভাবে প্রকাশ না পায়। দর্শকদের কৃপাতেই তাঁদের অস্তিত্ব, ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা আর গ্যালারীর ঠিকাদার ব্যবসায়ীর প্রাধান্য।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ ঃ

দ্বিতীয় বিভাগ : (১) সালকিয়া—২৬ পয়েণ্ট ; (২) এরাট চাত্রসন—২৬। উভয় দলের চ্যাম্পিয়ানশীপ খেলায় সালকিয়া ফ্রেণ্ডস এসো: ২-১ গোলে বিজয়ী হয়েছে।

তৃতীয় বিভাগ : (১) পোর্ট কমিশনার্স—২১ পয়েণ্ট ; (২) বোলাওয়েষ্ট্রাট—২০ পয়েণ্ট।

চতুর্থ বিভাগ : (১) মিলখুন স্পোর্টস—২৯ পয়েণ্ট ; (২) শ্যামবাজার ইউঃ—২৪ পয়েণ্ট।

দি অল ইণ্ডিয়া ফুটবল

অ্যানুয়্যাল (১৯৪৩)ঃ

সৌরেন্দ্রলাল ঘোষ সম্পাদিত বহু তথ্যপূর্ণ ফুটবল খেলার এই বার্ষিকখানি ক্রীড়ামোদী মাত্রেরই অবশ্য প্রয়োজনীয়। দর্শক এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে বহুলপ্রচার কামনা করি।

পরলোকে হেডলে ভেরিটি ঃ

ক্রিকেট খেলোয়াড় ক্যাপটেন হেডলে ভেরিটি সিসিলির যুদ্ধে আহত অবস্থায় ইটালীতে বন্দী হয়ে সামরিক হাসপাতালে ৩১শে জুলাই মারা গেছেন।

১৯০৫ সালের ১৮ই মে ভেরিটির জন্ম। ক্রিকেট খেলায় ভেরিটির মত [illegible] মাত্র [illegible] কাগজকলমে তাঁর খ্যাতি [illegible] গেছে। পরবর্তীকালে কয়েক বছর তিনি ইয়র্কশায়ার কৌন্টির উচ্চ সম্মান লাভ করেন। তিনি আর ক্রিকেটের মাঠে [illegible] তিনি [illegible] তাঁর ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৩১ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড আজও ক্রিকেট মহলে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। নটিংহামশায়ারের বিপক্ষে ইয়র্কশায়ারের পক্ষে ভেরিটি মাত্র ১০ রান দিয়ে ১০টী উইকেট পান এবং [illegible] মাত্র ৩ রানে ৭টা উইকেট লাভ করেন। লর্ডস মাঠে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় ১০৪ রানে ১৫টা উইকেট পাওয়ার ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০-৩৯ সালের মধ্যে মোট ২৯,০৯৯ রানে ২,০০০টা উইকেট পেয়েছিলেন। এছাড়াও ক্রিকেট খেলায় তাঁর বোলিং নানাভাবে অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর মৃত্যুতে ইংলণ্ডের ক্রিকেট মহল সত্যিকারের একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়কে হারাল। পৃথিবীর সর্বত্রই যেখানে ক্রিকেটের প্রচলন, ভেরিটির মৃত্যু সংবাদে ক্রীড়ামোদীরা সমবেদনা জ্ঞাপন করবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "জীবন-দেবতা"—২।০
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত উপন্যাস "পরিশেষ"—২।০
সুবোধ বসু প্রণীত শিশু নাটিকা "[illegible]"—৸০
হিরণ্ময়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শিশুদের কবিতাগ্রন্থ "মণি ও মীনু"—২৲
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির-প্রকাশিত "শ্রীঅরবিন্দ মন্দির" (ইংরাজি)—(দ্বিতীয় বার্ষিক জয়ন্তী-সংখ্যা। কাগজে বাঁধাই)—৮৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "নব-নায়িকা"—২৲, উপন্যাস "অ-কাজ"—১।০
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত 'চরিত্রহীনা'—৩৲
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত গল্পগ্রন্থ 'ভাড়াটে বাড়ী'—২৲
শ্রীনবগোপাল দাস প্রণীত উপন্যাস 'অনবগুণ্ঠিতা'—২।০
ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের নবযুগ'—৩।০
এম, আকবর আলি প্রণীত "বিজ্ঞানে মুসলমানের দান" (১ম খণ্ড)—১।০

পূজার ভারতবর্ষ—শারদীয়া পূজা উপলক্ষে আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ২৫ ভাদ্রের মধ্যে কার্ত্তিকের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইবেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাণ্ডুলিপি না পাইলে বিজ্ঞাপন ছাপা না হইবার সম্ভাবনা।

কর্ম্মকর্ত্তা—ভারতবর্ষ

আমাদের পুস্তক বিভাগের গ্রাহকগণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে—

বর্ত্তমানের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় অধিকাংশ প্রকাশকই নানা কারণে পূর্ব্বপ্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং সকল পুস্তকের মূল্য কিছু না কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে—ইহা উপলব্ধি করিয়াই যেন গ্রাহকগণ পুস্তকের অর্ডার প্রেরণ করেন। মফঃস্বলবাসী গ্রাহকগণের পক্ষে সকল পুস্তকের বর্ত্তমান মূল্য জানা না থাকিতে পারে এবং পূজার মরশুমে এ-সম্বন্ধে লিখালিখি করিয়া পুস্তক পাঠাইতে হইলে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা বলিয়া এই ব্যবস্থাই সমীচীন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী “—পানীয়া ভরনে কো যাঁহ” ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ভারতবর্ষ

কার্ত্তিক—১৩৫০

প্রথম খণ্ড | একত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

চক্রবর্ত্তী ও চক্রবর্ত্তিক্ষেত্র

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ্-ডি

মধ্যযুগের ভারতীয় রাজসভাসমূহে যে-সকল চাটুকার পণ্ডিত অবস্থান করিতেন, তাঁহাদের অত্যুক্তিপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। সেই জন্য, চন্দেল্লরাজ ধঙ্গের প্রশস্তিকারগণ যখন দাবী করেন—

কা ত্বং কাঞ্চীনৃপতিবনিতা কা বয়ম্ অঙ্গদেব্যঃ
কা ত্বং রাঢাধিপতিপ্রসূঃ কা বয়ং কুন্তলেশী।
ইত্যালাপাঃ সমরজয়িনো যস্য বৈরিস্ত্রিয়াণাং
কারাগারে সজলনয়নেন্দীবরাণাং বভূবুঃ।—

তখন এই হাস্যকর কাহিনীর উপর ঐতিহাসিকগণ কোনও গুরুত্ব আরোপ করেন না। কারণ কাঞ্চী, অঙ্গ, রাঢ় এবং কুন্তলেশের রাজমহিষীগণকে চন্দের কারাগারে বন্দিনী করিতে পারা দূরের কথা, ঐ রাজ্যসমূহের সকলগুলির সহিত চন্দেল্লরাজের বিজয়াত্মক বিগ্রহসম্পর্ক ঘটিয়াছিল কিনা, তাহাই সন্দেহের বিষয়। যাহা হউক, প্রাচীনতর যুগের ভারতীয় রাজগণের দাবীতে এত অধিক অত্যুক্তিপ্রিয়তা দেখা যায় না। এই জন্য যে-রাজা যত প্রাচীন, ঐতিহাসিকগণ তাঁহার দাবীতে তত অধিক আস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন যুগের হিন্দুরাজগণেরও কোন কোন দাবীকে আক্ষরিক অর্থে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

বৈদিক যুগ হইতেই প্রাচীন হিন্দুসম্রাট্গণকে দাবী করিতে দেখা যায়, যে তাঁহারা "সমগ্র পৃথিবী"র শাসক অথবা বিজেতা। শতপথব্রাহ্মণে (১৩।৫।৪।১৩) দুষ্যন্তপুত্র মহাবলপরাক্রান্ত ভরতরাজের সম্বন্ধে একটি পুরাতন গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে—পরঃসহস্রানিন্দ্রায়াশ্বমেধানাহরদ্বিজিত্য পৃথিবীং সর্বামিতি; অর্থাৎ, সম্রাট্ ভরত "সমগ্র পৃথিবী" জয় করিয়া সহস্রাধিক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। মৌর্যরাজ অশোক (খৃষ্টপূর্ব ২৭২-২৩২) তাঁহার পঞ্চম শৈলানুশাসনের ধৌলিসংস্করণে দাবী করিয়াছেন যে তিনি "সমগ্র পৃথিবী"তে ধর্মমহামাত্রনামক রাজকর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় সম্রাট্গণ সকলেই "সমগ্র পৃথিবী" বিজয়ের কিংবা শাসনের দাবী করিয়াছেন। সমুদ্রগুপ্তের কীর্তিকে বলা হইয়াছে—সর্বপৃথ্বীবিজয়জনিতোদয়ব্যাপ্তনিখিলাবনিতলা। মালবাভিযাত্রী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের জনৈক অমাত্য নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—কৃৎস্নপৃথ্বীজয়ার্থেন রাজ্ঞৈবেহ সহাগতঃ। স্কন্দগুপ্তের নামে দাবী করা হইয়াছে—এবং স জিত্বা পৃথিবীং সমগ্রাং, ভগ্নাগ্রদর্পান্ প্রতিকৃতঃ কৃত্বা, ইত্যাদি। যাহা হউক, সকলেই জানেন যে এই গুপ্তসম্রাট্গণের রাজ্য অবশ্যই উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। এমন কি অশোকের পঞ্চম শৈলানুশাসনের যেখানে "সর্বপৃথিবীতে" পাঠ আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, ধৌলি ব্যতীত অন্যান্য সংস্করণগুলিতে সেই স্থানে "সর্বত্র বিজিতে" (অর্থাৎ, রাজ্যের সর্বত্র) পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার একটি পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে রাজর্ষি ভরতের সাম্রাজ্য যতদূর বিস্তৃত ছিল, জম্বুদ্বীপের দক্ষিণাংশের সেই অঞ্চলই ভারতবর্ষ আখ্যা লাভ করিয়াছিল। এই সকল বিবরণ হইতে কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন, যে সমগ্র পৃথিবী কথাটি প্রাচীন হিন্দুরাজগণ আপন আপন রাজ্যের

অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে। কারণ, প্রাচীন সাহিত্য হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত "সমগ্র পৃথিবী"র সীমা জানিতে পারা যায়।

মহাভারতে কর্ণ এবং পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য ছিল "সমগ্র পৃথিবী" বশীভূত করা। দিগ্বিজয়ী কর্ণ সম্বন্ধে পরিষ্কার বলা হইয়াছে—

এবং স পৃথিবীং সর্ব্বাং বশে কৃত্বা মহারথঃ।
বিজিত্য পুরুষব্যাঘ্রো নাগসাহ্বয়মাগমৎ॥

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মহাভারতের দিগ্বিজয়ীরা যে সকল জনপদ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, পুরাণের বর্ণনা অনুসারে সেগুলি ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত। কালিদাসের রঘু চতুর্দ্দিক জয় করিয়া একচ্ছত্র লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও পূর্ব্বদিকে প্রাগ্জ্যোতিষ বা আসাম, পশ্চিমে পারসিক বা পারস্য, উত্তরে বাহ্লীক বা বাল্খ, এবং দক্ষিণে পাণ্ড্যদেশ অর্থাৎ আধুনিক মদুরা ও তিনেবেলী জেলা পর্য্যন্ত মাত্র অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ জয় করিলেই পৌরাণিক হিন্দুরাজগণ "সমগ্র পৃথিবী" বিজেতার খ্যাতি লাভ করিতেন। এই ভারতবর্ষের বর্ণনা করিতে গিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণকার লিখিয়াছেন—হিমালয়াদাসমুদ্রং পৃথ্বীং ক্ষেত্রং চ ভারতম্। মার্কণ্ডেয় পুরাণকার আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—

এতত্তু ভারতং বর্ষং চতুঃসংস্থানসংস্থিতম্।
দক্ষিণাপরতো হ্যস্য পূর্ব্বেণ চ মহোদধিঃ।
হিমবানুত্তরেণাস্য কার্ম্মুকস্য যথা গুণঃ॥

এই ভারতবর্ষ নামক "সমগ্র পৃথিবী" জয় করিয়া কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে ইহা লাভ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুসম্রাটগণ দিগ্বিজয়ী (অর্থাৎ চতুর্দ্দিক্স্থিত জনপদসমূহের বিজেতা) অথবা দিগন্তপতি (অর্থাৎ চতুর্দ্দিক্স্থিত দেশসমূহের অধীশ্বর) রূপে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। ইহার মূলে ছিল একচ্ছত্র, সার্ব্বভৌম বা চক্রবর্ত্তী হইবার পৌরাণিক আদর্শ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (৯।১) চক্রবর্ত্তিক্ষেত্র অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী সম্রাটের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র বর্ণিত হইয়াছে; উহা উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে সমুদ্র দ্বারা সীমাবদ্ধ এই ভারতবর্ষ। আরিয়ান নামক একজন প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "একটা ন্যায়বোধের বাধা আছে বলিয়া ভারতীয় রাজগণ ভারতবর্ষের বাহিরে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেন না।"

প্রাচীন সাহিত্যে দুইরূপে পূর্ব্বোক্ত চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের সীমার উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেকস্থলে কেবল "চতুঃসমুদ্রান্তর্বর্ত্তী সমগ্র পৃথিবী" রূপে ইহার বর্ণনা দেখা যায়। গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ কুমারগুপ্তের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

চতুঃসমুদ্রান্তবিলোলমেখলাং
সুমেরুকৈলাসবৃহৎপয়োধরাম্।
বনান্তবান্তস্ফুটপুষ্পহাসিনীং
কুমারগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি॥

স্থলান্তরে আবার এই চতুঃসমুদ্রান্তা পৃথিবীকে সমুদ্রপর্য্যন্তা বা আসমুদ্রা মহীরূপে বর্ণিত দেখা যায়। কালিদাসের—"আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্" এবং ভাসের (?)—

ইমাং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাম্।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ॥

ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যাহা হউক, ভারতবর্ষের চারিদিকে চারিটি সমুদ্রের অস্তিত্ব কল্পনার কারণ নিঃসন্দেহরূপে বুঝা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় সাধারণগণ মনে করেন, যে এস্থলে সমুদ্র অর্থ বিস্তৃত বা অজ্ঞাতদেশসমূহ বুঝাইতেছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সম্বন্ধে ত্রিসমুদ্রকথাটীর বহুল ব্যবহার দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে ঐ চতুঃসমুদ্রের তিনটি অবশ্যই ভারত মহাসাগর, আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর। ভারতবর্ষের উত্তরদিকে কোন সমুদ্র নাই। সম্ভবতঃ মানস সরোবরের ন্যায় কোন হ্রদ অথবা মধ্য এসিয়ার মরুভূমির বালুকাসমুদ্র ভারতের উত্তরে সাগরের অস্তিত্ব কল্পনার খোরাক যোগাইয়াছিল।

কোন কোন স্থলে চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের বিভিন্ন সীমায় বিশিষ্ট স্থান কিংবা সীমাচিহ্নের উল্লেখ দেখা যায়। মেহেরৌলি স্তম্ভলিপিতে চন্দ্র নামক জনৈক নরপতিসম্পর্কে বলা হইয়াছে—

যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেষ্বাহববর্ত্তিনোঽভিলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে।
তীর্ত্বা সপ্তমুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জ্জিতা বাহ্লীকা
যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্য্যানিলৈর্দক্ষিণঃ॥

আমরা অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এই দিগ্বিজয়ী চন্দ্ররাজ গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ব্যতীত অপর কেহ নহেন।* যাহা হউক, এই স্থলে চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের সীমা দেওয়া হইয়াছে—উত্তরে বাহ্লীক বা বাল্খ, দক্ষিণে দক্ষিণসাগর বা ভারতমহাসাগর, পূর্ব্বে বঙ্গ বা মধ্য ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাংলা, এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদের সপ্তমুখ। প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিকগণের রচনায় সিন্ধুর সাতটী মোহনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মোহনাগুলি আরব সাগরের পারে।

যশোধর্ম্মা নামক মালবের একজন দিগ্বিজয়ী নরপতির মন্দসোর স্তম্ভলিপিতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়।

আ লৌহিত্যোপকণ্ঠাত্তলবনগহনোপত্যকাদা মহেন্দ্রাৎ
আ গঙ্গাশ্লিষ্টসানোস্তুহিনশিখরিণঃ পশ্চিমাদা পয়োধেঃ।
সামন্তৈর্যস্য বাহুদ্রবিণহৃতমদৈঃ পাদয়োরানমদ্ভি-
শ্চূড়ারত্নাংশুরাজিব্যতিকরশবলা ভূমিভাগাঃ ক্রিয়ন্তে॥

এখানে চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের সীমা—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে মহেন্দ্র অর্থাৎ তিনেবেলী জেলার অন্তর্গত মহেন্দ্রগিরি, পূর্ব্বে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে পশ্চিমপয়োধি বা আরব সাগর। মহেন্দ্র পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার

---

* সম্প্রতি "জার্ণাল অব দি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল" পত্রিকায় ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে এই চন্দ্ররাজ কুষাণবংশীয় কণিষ্কের সহিত অভিন্ন। কারণ একটী তিব্বতীয় কিংবদন্তী হইতে জানা যায়, কোন একজন কণিষ্কের "চন্দ্র" উপনাম ছিল। দুঃখের বিষয়, এই সামান্য প্রমাণটুকু ব্যতীত শ্রীযুক্ত মজুমদারের সিদ্ধান্তের পক্ষে আর কোনই যুক্তি নাই। চন্দ্ররাজ বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু কণিষ্কের বৈষ্ণবত্ব প্রমাণিত হয় নাই, বরং কিংবদন্তী হইতে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ প্রমাণিত হয়। চন্দ্রের লিপিতে কুমারগুপ্তের (৪১৪-৫৫ খ্রীঃ) বিলসড় লিপির অনুরূপ পঞ্চম-শতাব্দীর অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে; কণিষ্কের কোন লিপিতেই এই প্রকার অক্ষর দেখা যায় না। মথুরায় অপেক্ষাকৃত নবীন অক্ষরে লিখিত জনৈক কণিষ্কের একখানি লেখা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু এই অক্ষরও পঞ্চমশতাব্দীর অক্ষর অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। আর একটা কথা এই, যে-কণিষ্কের চন্দ্ররাজের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে, তাঁহার বহুসংখ্যক লিপির মধ্যে কোনটিতেই তাঁহাকে "চন্দ্র" নাম দেওয়া হয় নাই, কেবল কণিষ্কই বলা হইয়াছে, অথচ মেহেরৌলি লিপিতে এই সুপরিচিত কণিষ্ক নাম দেখা যায় না। সুতরাং আমার বিবেচনায়, নূতন আবিষ্কার দ্বারা সমর্থিত না হইলে (তাহার সম্ভাবনা নিতান্তই কম), ডক্টর মজুমদারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ঐতিহাসিক জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায়, চন্দ্ররাজকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত অভিন্ন বলিলে সর্ব্বাপেক্ষা কম জবাবদিহি করিতে হয়।

সাধারণ নাম; কিন্তু কোন কোন স্থলে এই পর্ব্বতকে কলিঙ্গ কিংবা পাণ্ড্য দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বাণভট্টরচিত কাদম্বরীতে (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২৪-২৫) চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের সীমা দেওয়া হইয়াছে—উত্তরে গন্ধমাদন, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, পূর্ব্বে উদয়শৈল এবং পশ্চিমে মন্দরাচল। বদরিকাশ্রম যে-শৈলের উপর অবস্থিত উহারই নাম গন্ধমাদন। পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে উদয়পর্ব্বত পূর্ব্বসমুদ্রে অবস্থিত। এস্থলে পৌরাণিক মন্দর পর্ব্বতকে পশ্চিম সমুদ্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কারণ হর্ষচরিতে (নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২১৭) বাণভট্ট চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের পশ্চিম সীমারূপে পৌরাণিক অস্তগিরির উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষচরিতে প্রদত্ত সীমা—উত্তরে গন্ধমাদন, দক্ষিণে সুবেল, পূর্ব্বে উদয়াচল এবং পশ্চিমে অস্তগিরি। সুবেল পর্ব্বতমালা সিংহলে অবস্থিত; ইহার অন্তর্গত ত্রিকূট পাহাড়ের উপর প্রসিদ্ধ লঙ্কানগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। পৌরাণিক অস্তগিরির অবস্থান পশ্চিমসমুদ্রগর্ভে।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় কৃষ্ণরাজের করহাড তাম্রশাসনের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের সীমা উল্লিখিত হইয়াছে।

অনয়া পূর্ব্বাপরজলনিধিহিমশৈলসিংহলদ্বীপাৎ ।
যং ভয়কাতরমপি মণ্ডলিনশ্চণ্ডদণ্ডভয়াৎ ॥

এস্থলে সীমা—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সিংহলদ্বীপ, পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র বা বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিমসমুদ্র বা আরব সাগর।

পরমার বংশীয় রাজগণের লিপিতে (এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১।২৩৪, শ্লোক ১৯) ভোজনৃপতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

আ কৈলাসান্মলয়গিরিতোহস্তোদয়াদ্রিদ্বয়াদ্ আ
ভুক্তা পৃথ্বী পৃথুনরপতেস্তুল্যরূপেণ যেন ।
উন্মূল্যোর্ব্বীভরগুরুগণা লীলয়া চাপযজ্যা
ক্ষিপ্তা দিক্ষু ক্ষিতিরপি পরাং প্রীতিমাপাদিতা চ ॥

এখানে চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের সীমা—উত্তরে কৈলাস পর্ব্বত, দক্ষিণে মলয় বা ত্রিবাঙ্কুর পর্ব্বতশ্রেণী, পূর্ব্বে উদয়গিরি এবং পশ্চিমে অস্তগিরি।

বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরা সংজ্ঞক যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকার উপসংহারে কল্যাণীর চালুক্যবংশীয় সম্রাট্ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের প্রশস্তি কীর্ত্তন করা হইয়াছে। উহার ষষ্ঠ শ্লোকে দেখিতে পাই—

আ সেতোঃ কীর্ত্তিরাশে রঘুকুলতিলকস্য চ শৈলাধিরাজাদ্
আ চ প্রত্যক্পয়োধেশ্চটুলতিমিকুলোত্তুঙ্গরিঙ্গত্তরঙ্গাৎ ।
আ চ প্রাচঃ সমুদ্রান্নৃপতিশিরোরত্নভাস্বৎপদাব্জঃ
পায়াদাচন্দ্রতারং জগদিদমখিলং বিক্রমাদিত্যদেবঃ ॥

এস্থলে চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের সীমা—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র এবং পশ্চিমে পশ্চিমসমুদ্র।

বাংলাদেশের পালবংশীয় সম্রাট্গণের লিপিতেও চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের সীমাজ্ঞাপক শ্লোকসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপরাক্রান্ত নরপতি দেবপালের সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

✓ আ গঙ্গাগমমহিতাৎ সপত্নশূন্যাম্
আ সেতোঃ প্রথিতদশাস্যকেতুকীর্ত্তেঃ ।
উর্ব্বীম্ আ বরুণনিকেতনাচ্চ সিন্ধোর্
আ লক্ষ্মীকুলভবনাচ্চ যো বুভোজ ॥

এখানে সীমা—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র এবং পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র। এইরূপ আর একটী শ্লোক আছে; কোন কোন লিপিতে ইহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিগ্রহপালের, কোন লিপিতে বা রাজ্যপালের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে দিগ্বিজয়মূলক সভাপণ্ডিতের বর্ণনা যে-কোন বিজয়কামী নরপতির সম্পর্কেই প্রয়োগ করা চলিত। শ্লোকটি এই—

দেশে প্রাচি প্রচুরপয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং
স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনু মলয়োপত্যকাচন্দনেষু ।
কৃত্বা সান্দ্রৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ
প্রালেয়াদ্রেঃ কটকমভজন্ যস্য সেনাগজেন্দ্রাঃ ॥

এস্থলে সীমা—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে মলয়োপত্যকা বা ত্রিবাঙ্কুরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল, পূর্ব্বে পূর্ব্বদেশ এবং পশ্চিমে মরুদেশ অর্থাৎ রাজপুতানা মরুভূমি। পালরাজগণের লিপিতে ধর্ম্মপালের দিগ্বিজয়জ্ঞাপক অপর একটী শ্লোক পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, এই শ্লোকটিতেও চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের সীমার ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

✓ কেদারে বিধিনোপযুক্তপয়সাং গঙ্গাসমেতাম্বুধৌ
গোকর্ণাদিষু চাপ্যনুষ্ঠিতবতাং তীর্থেষু ধর্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ ।
ভৃত্যানাং সুখমেব যস্য সকলানুদ্ধৃত্য দুষ্টানিমান্
লোকান্ সাধয়তোহনুষঙ্গজনিতা সিদ্ধিঃ পরত্রাপ্যভূৎ ॥

বোধ হয়, এস্থলে সীমা দেওয়া হইয়াছে—উত্তরে কেদারতীর্থ, পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর সঙ্গম এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে গোকর্ণ ও অন্যান্য তীর্থ।

উপরে আলোচিত বিবরণসমূহ হইতে চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের নিম্নলিখিত সীমা পাওয়া গেল। উত্তরে বাহ্লীকদেশ, হিমালয়পর্ব্বত, গন্ধমাদন, কৈলাসপর্ব্বত অথবা কেদারতীর্থ। দক্ষিণে ভারতমহাসাগর, মহেন্দ্রগিরি, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, সুবেলপর্ব্বত, সিংহলদ্বীপ, মলয়পর্ব্বত ইত্যাদি। পূর্ব্বে বঙ্গদেশ, ব্রহ্মপুত্রনদ, উদয়পর্ব্বত, বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বদেশ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম এবং প্রাগ্জ্যোতিষ। পশ্চিমে সিন্ধুনদের মোহনা, আরবসাগর, মন্দরপর্ব্বত, অস্তগিরি, রাজপুতানার মরুভূমি, পারস্য ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন এই যে এই বিশাল চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের সহিত ভারতীয় রাজচক্রবর্ত্তিগণের প্রকৃত সম্পর্কটা কিরূপ ছিল। ঐতিহাসিকগণ জানেন, উপরে উল্লিখিত রাজগণের অধিকাংশেরই রাজ্য কেবলমাত্র ভারতবর্ষের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি, প্রাচীন ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর মৌর্য্যবংশীয় অশোকের সাম্রাজ্যও দক্ষিণ ভারতের চোল, কেরল এবং পাণ্ড্যদেশ গ্রাস করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রাচীন হিন্দু-সম্রাট্গণের চক্রবর্ত্তিত্বের এবং "সমগ্র পৃথিবী" অধিকারের দাবীর অর্থ কেবল এইটুকু যে অপরের অনধীন সম্রাট্ হিসাবে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শত্রু ও মিত্ররাজগণের মধ্যে তাঁহাদের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ঐরূপ দাবীর মধ্যে আর যদি কিছু থাকে, উহা পৌরাণিক চক্রবর্ত্তিত্বের আদর্শমূলক অত্যুক্তি মাত্র। দিগ্বিজয়কারী সম্রাটের সমগ্র চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রজয়ের দাবীও অনুরূপ অতিশয়োক্তিমূলক। উহার ঐতিহাসিক সার কেবল এইটুকু, যে সেই দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী বিশাল চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন এক বা একাধিক ভূখণ্ড জয় অথবা জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক যুগের কোন ভারতীয় নরপতি প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষের বিজেতা বা শাসক ছিলেন না।

এই প্রসঙ্গে অপর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উপরে যে সমগ্র ভারতব্যাপী চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের কথা বলা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে আবার এই বিশাল দেশকে বিভক্ত করিয়া উত্তরে এবং দক্ষিণে দুইটী বিভিন্ন চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরভারতের সম্রাট্গণ কখনও কখনও আপনাদিগকে হিমালয় এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র পৃথিবীর চক্রবর্ত্তী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে দক্ষিণাপথের কোন কোন সম্রাট্ আবার আপনাকে ত্রিসমুদ্রব্যাপী সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর বলিয়া দাবী করিয়াছেন দেখিতে পাই।

উপরে বাংলার পালবংশীয় সম্রাট্ দেবপালের চক্রবর্ত্তিত্বজ্ঞাপক একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে বস্তুতঃ দাবী করা হইয়াছে, যে দেবপালের

সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ এবং বঙ্গোপসাগর হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই দেবপালের সাম্রাজ্য-সম্বন্ধেই অপর একখানি লিপিতে ভিন্ন প্রকারের দাবী উত্থাপিত হইয়াছে। এই লিপিতে দেখিতে পাই—

> আ রেবাজনকান্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলাসংহতের্
> আ গৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিম্নো গিরেঃ।
> মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণজলাদ্ আ বারিরাশিদ্বয়ান্
> নীত্যা যস্ত ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ।

এখানে বলা হইল, দেবপালের সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত এবং বঙ্গোপসাগর হইতে আরবসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যাহা হউক, এই দুইটী দাবীরই উদ্দেশ্য দেবপালের চক্রবর্ত্তিত্বস্থাপন করা। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সাম্রাজ্য মাত্র পূর্ব্বভারতের কিয়দংশে সীমাবদ্ধ ছিল। চৌহানবংশীয় চতুর্থ বিগ্রহরাজ বা বীসলদেবের একখানি লিপিতেও দেখিতে পাই—

> আ বিন্ধ্যাদা হিমাদ্রের্বিরচিতবিজয়স্তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গাদ্
> উদ্গ্রীবেষু প্রহর্ত্তা নৃপতিষু বিনমৎকন্ধরেষু প্রসন্নঃ।
> আর্য্যাবর্ত্তং যথার্থং পুনরপি কৃতবান্ ম্লেচ্ছবিচ্ছেদনাভি
> দেবঃ শাকম্ভরীন্দ্রো জগতি বিজয়তে বীসলঃ ক্ষোণিপালঃ।
> ব্রূতে সম্প্রতি চাহমানতিলকঃ শাকম্ভরীভূপতিঃ
> শ্রীমদ্বিগ্রহরাজ এষ বিজয়ী সন্তানজানাত্মনঃ।
> অস্মাভিঃ করদং ব্যধায়ি হিমবদ্বিন্ধ্যান্তরালং ভুবঃ
> শেষস্বীকরণায় মাস্তু ভবতামুদ্যোগশূন্যং মনঃ।

এস্থলে কেবল উত্তরসীমা হিমালয় এবং দক্ষিণ সীমা বিন্ধ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে; পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সীমা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত আখ্যাতে সে ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে। কারণ মনুর মতে হিমালয়, বিন্ধ্য, পূর্ব্বসমুদ্র এবং পশ্চিমসমুদ্র দ্বারা সীমাবদ্ধ দেশই আর্য্যাবর্ত্ত।

দাক্ষিণাত্যের শাতবাহনবংশীয় রাজগণ আপনাদিগকে দক্ষিণাপথপতি বা দক্ষিণাপথেশ্বর বলিয়া প্রচার করিতেন। এই বংশের মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ গৌতমীপুত্র শাতকর্ণিকে (১০৬-৩০ খৃঃ) "ত্রিসমুদ্রতোয়পীতবাহন" বলা হইয়াছে; অর্থাৎ দাবী করা হইয়াছে, যে দিগ্বিজয়ব্যপদেশে তাঁহার অশ্বসমূহ ভারত মহাসাগর, আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের জল পান করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই গৌতমীপুত্রই মহাভারতে ত্রিসমুদ্রাধিপতিরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। যাহা হউক, শাতবাহন লিপিতে আরও দেখা যায় যে গৌতমীপুত্র বিন্ধ্য, সহ্য (পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা), মলয় (ত্রিবাঙ্কুরের পর্ব্বতশ্রেণী), মহেন্দ্র (পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা) প্রভৃতি শৈলসমূহের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে লিপিতে তাঁহাকে এইরূপে দক্ষিণাপথের একচ্ছত্র সম্রাট্রূপে দাঁড় করানো হইয়াছে, উহাতেই আবার তাঁহার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন জনপদসমূহের একটী তালিকা পাওয়া যায়। উহা হইতে জানা যায়, প্রকৃতপক্ষে গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির সাম্রাজ্য দক্ষিণে কৃষ্ণানদীর তীরস্থিত ধনকটক হইতে উত্তরে মালবের অন্তর্গত আকর ও অবন্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত দাবীটি চক্রবর্ত্তিসূচক এবং সত্যানুগতিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তীকালে বাদামির চালুক্য বংশীয় রাজগণ আপনাদিগকে "ত্রিসমুদ্রমধ্যবর্ত্তিভুবনমণ্ডলাধীশ্বর" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন, যে দক্ষিণভারতের সম্রাট্গণ প্রকৃত চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের উত্তর সীমা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় কৃষ্ণ এবং কল্যাণীর চালুক্যবংশীয় ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের চক্রবর্ত্তিত্বজ্ঞাপক দুইটী শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে চক্রবর্ত্তি ক্ষেত্রের উত্তরসীমায় কৈলাস এবং শৈলরাজ বা হিমালয়ের উল্লেখ দেখা যায়। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ দিগ্বিজয়ব্যপদেশে হিমালয় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। অবশ্য এই দাবীর মূলে অনেকখানি ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অখ্যাত পাণ্ড্যবংশীয় রাজগণ সম্পর্কে যখন দাবী করা হয়—"মহীপতীনাং হিমাচলারোপিতশাসনানাম্", তখন ইহাকে অত্যুক্তি এবং সত্যানুগতিকতামূলক প্রশস্তি না মনে করিয়া উপায় নাই। ইহার মূলে সত্য (হয়ত কোন দিগ্বিজয়ীর সামন্তরূপে) কেবল এইটুকু থাকিতে পারে যে কোন একজন পাণ্ড্যরাজ কোন সূত্রে উত্তর ভারতের কোন নরপতির সংস্রবে আসিয়াছিলেন। এই সংস্রব মিত্রতা বা বিগ্রহমূলক হইতে পারে; সামান্য দূত সমাগম বা দূতবিনিময়-মূলক হওয়াও অসম্ভব নয়।

শিবের দুঃখ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

কোটিকল্প কাল ধরি' জটার গহনে তোরে ধরিনু মাথায়,
আজও না পাইনু রস; মন্দাকিনি, দিন মোর কাটে যে তৃষ্ণায়!
অসহ অন্তরজ্বালা! কণ্ঠের কালসর্পবিষেরই সমান;
—অন্তরের যত দুঃখ, এই অতৃপ্তির মাঝে হেরি মূর্ত্তিমান।

জানি কি পুণ্য লভেছ; মর্ত্ত্যজীব আজি যারা পূজিছে তোমারে
হে কল্যাণি, সেই সর্ব্বজীবমাঝে শিব আজি দেখে সবাকারে।
পান করি' তব বারি, স্নান করি—যারা অঙ্গ লভি পরশন,
জানি, কি আনন্দে তা'রা ও শীতল অঙ্গে করে আত্মনিবেদন।

বুঝিয়াছি, কি আশায় মোরই কাছে কত কাল করি' আরাধনা
মানবের কত দুঃখে তব আশে ভগীরথ পেয়েছে সাধনা,
তোমারই প্রসাদ লভি'! মোর চেয়ে শতগুণ কাম্য ভাগ্য তার,
মর্ত্ত্যের সে আর্ত্তজনে ঈর্ষা ভুলি' মহাদেব করে নমস্কার।

থাক্ কপালে চন্দ্র! সুরধুনি, আজি আমি যদি তোর হয়,
শূন্য হোক্ জটাজুট—তৃপ্ত কর্ এ ভক্তের তৃষার্ত্ত অন্তর।
চিরদিন আমি যোগী, মোরই যদি ভাগ্যদোষে এ দুঃখ-লিখন,
না জানি সে কত দুঃখ মর্ম্মে পুষি' মর্ত্ত্যবাসী কাটায় জীবন!

গৃহ-প্রবেশ

(নাটিকা)

শ্রীকানাই বসু

বসুবাবুকে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মহালক্ষ্মী আর অপেক্ষা
করিতে পারিলেন না। তিনি চুপে চুপে সকলের
অদৃষ্টিগোচরভাবে বলিলেন—

মহালক্ষ্মী। হ্যাঁ দাদা, চাবিটা তা হলে কি—

প্রসন্ন। আচ্ছা আচ্ছা, সে হচ্ছে।

বসু। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) হ্যাঁ, ভালো কথা। (সুকুমারীকে) মা, তোমার চাবিটা যে আমার কাছে রয়েছে। বড্ড ভুলে যাচ্ছিলুম।

চাবি বাহির করিতে তাঁহার কিছু বিলম্ব হইল। এ পকেট ও পকেট দেখিয়া পরিশেষে ভিতরের ফতুয়ার পকেট হইতে চাবি বাহির হইল। এই সময়ের মধ্যে মহালক্ষ্মী পৃথ্বীশ, প্রসন্নবাবু ও সুকুমারী পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল ও নিম্নলিখিত মত কথা বলিল :—

প্রসন্ন। চাবি? আপনার কাছে?

মহালক্ষ্মী। (পরম তৃপ্তির সহিত) দেখ্, বউ দেখ্। আমার কথা তো তোরা হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলি।

সুকুমারী মাথা নিচু করিয়া নীরবে রহিল। যেন তাহার নিজের কাকাই চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে। এমন সময়ে মহালক্ষ্মীর সোৎসাহ দৃষ্টি পড়িল একটি দড়ি-বাঁধা চাবির উপর, সেইমাত্র বসুবাবু বাহির করিয়াছেন।

মহালক্ষ্মী। ও কি? ওটা কি চাবি?

বসু। ঐ যে তোমাদের মিষ্টির ভাঁড়ারের চাবি মা। বামুন ভোজন হয়ে গেলে পর আমি ভাঁড়ারে চাবি দিয়ে এসেছি। এটা রাখো মা।

সুকুমারী। (তাহার হারানো রিং নয় বলিয়াই অতিশয় খুশী হইলেন) দিন কাকাবাবু। (চাবি লইলেন)

প্রসন্ন। (ডান হাত বাড়াইয়া) দাও দাও, আমার কাছে দাও। তোমার যা ভুলো মন। আবার এটা কোথায় রেখে বাড়ী শুদ্ধু হুলস্থূল করে তুলবে। (চাবি লইয়া) বরং আমার রিংএ এটা লাগিয়ে রাখি। ভাঁড়ারের এ চাবিটাও হারালে বাড়িকে অন্ধকারে পড়তে হবে।

বলিতে বলিতে ট্যাঁক খুলিতে লাগিলেন। প্যাঁচের পর প্যাঁচ খুলিয়া চাবির রিং বাহির করিয়া তাহাতে যখন ভাঁড়ারের চাবি লাগাইতে গেলেন, তখন দেখা গেল রিং হইতে একটি দীর্ঘ চেন ঝুলিতেছে।

প্রসন্ন। এটা আবার লাগালে কে?

সুকুমারী। ওমা! ঐ তো আমার চাবি গো! ঐ তো—

মহালক্ষ্মী। সেই দেড় হাত চেন!

প্রসন্ন। সে কি? এটা তোমার চাবি? তাহলে আমার চাবি কোথায় গেল? (সুকুমারীর প্রসারিত হাত হইতে চাবি সরাইয়া লইয়া) রোসো, রোসো, আমার চাবিটা—(বলিতে বলিতে দুই হাতে দুই দিকের ট্যাঁক অনুভব করিয়া) ও—, এই যে আমার চাবি রয়েছে। (বাম ট্যাঁক হইতে নিজের রিং বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিয়া) তাহলে এটা তোমারই বটে। এই নাও, সাবধানে রেখো, বুঝলে? আবার যেন হারিও না। (চাবি দিলেন ;

মহালক্ষ্মী। (তিরস্কারের সুরে) তুমি ট্যাঁকে করে নিয়ে বসে আছ! আর এদিকে এই হুলস্থূল কাণ্ড! ধন্যি বলি দাদা তোমাকে?

প্রসন্ন। (অপ্রতিভ হাসিয়া) তোরা হুলস্থূল কাণ্ড করলি তা কী করব বল্। আমি তো গোড়া থেকে বলছি কোথায় আছে, ঠিক পাওয়া যাবে। এই দেখ্, পাওয়া গেল তো? তোদের খালি মিথ্যে ব্যস্ত হওয়া বই তো নয়।

সুকুমারী। তা হ্যাঁ গো, তোমার কাছে চাবিটা গেল কী করে?

প্রসন্ন। আমার কাছে? আমার কাছে—, তুমিই দিয়েছ নিশ্চয়।

সুকুমারী। আমি আবার কখন দিলুম তোমাকে। শোনো কথা। কক্ষণো আমি দিইনি।

প্রসন্ন। বাঃ, তুমি না দিলে আর কে দেবে? আমি কি আর চুরি করতে গেছি?

সুকুমারী। না না, আমি কক্ষণো চাবি দিইনি তোমাকে।

প্রসন্ন। তুমি দাওনি? তবে কে যেন দিলে আমাকে—, কে দিলে—(চিন্তিত)

বসু। প্রসন্নবাবু, আমি একটা চাবি আপনার হাতে দিয়েছিলুম—সেই দুপুর বেলায়, সোফায় পড়েছিল—

প্রসন্ন। ও—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনিই দিয়েছিলেন বটে। বড্ড উপকার করেছিলেন আপনি, তা নইলে আর কি পাওয়া যেত।

সুকুমারী। দেখলে! বাইরের ঘরে ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা কইতে কইতে কখন আঁচল থেকে খসে পড়েছে। দেখেছ ঠাকুরঝি?

মহালক্ষ্মী। তুমিই দেখ ভাই।

বসু। তাহলে যদি অনুমতি করেন, আমি এবার আসি প্রসন্নবাবু, আসি মা, দাদু ভাই আমি চলুম।

সুকুমারী। না কাকাবাবু, সে হবে না।

খোকন। না দাদু, আপনি এখুনি যাবেন না।

প্রসন্ন। বিলক্ষণ, আপনার তো এখনো খাওয়াই হয়নি।

বসু। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সরবৎ মিষ্টি খুব খেয়েছি। মা আমাকে আদর যত্ন করে দিয়েছেন।

সুকুমারী। সে কেমন কথা! না না, আপনার না খেয়ে যাওয়া হতেই পারে না।

বসু। (বিব্রত হইয়া) আজ থাক, মা, আমি আর একদিন এসে খেয়ে যাব। আমার তো একরকম ভিক্ষে করেই খাওয়া। আর তুমি আদর করে বলছ, তার আবার কথা। কিন্তু আজকের দিনটা আমাকে তুমি মাপ কর মা।

প্রসন্ন। সে কী করে হবে। কি বল পিন্টু? আজকের দিনে না খেয়ে যাওয়া, সে হতেই পারে না। তুমি একটু বল না।

পৃথ্বীশ। তা তো বটেই। তা, আপনি খেয়ে দেয়েই যান না, ইয়ে—বসুবাবু।

ডাকু। হ্যাঁ দাদু, তুমি—আপনি নেমন্তন্ন খাবেন কিন্তু।

বসু। তাই তো। আপনারা এত করে বলছেন, আমি আর না বলতে পারছি না। কিন্তু তাহলে আগে আমার কয়েকটি কথা আপনাদের শুনতে হবে। তারপর যা আমাকে আদেশ করবেন।

— প্রসন্ন। বলুন না।

বসু। বলি। (কী করিয়া আরম্ভ করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না) দেখুন, আপনারা কেন আমাকে এত খাতির যত্ন করছেন তা আমি জানি না। বোধহয় আপনাদের প্রকৃতিই এই। কিম্বা অন্য কোন লোকের সঙ্গে আমাকে ভুল করেছেন। আমি অবশ্য সে লোক নই।

আমি আপনাদের চিনি না। না, এখন চিনি না বলে মিথ্যা কথা বলা হল। কিন্তু আপনারা তো আমাকে চেনেন না। আমি হচ্ছি—আমি—আমি একটা জোচ্চোর—হাঁ জোচ্চোর ছাড়া আর কী বলব। তবে আপনাদের আমি ঠকাতে পারিনি, নিজেই ঠকে গেছি। (মহালক্ষ্মী ও পৃথ্বীশ পরস্পরের দিকে চাহিল) আমি অন্য কোনো জোচ্চুরি করি না, কেবল বিনা নেমন্তন্নে লোকের বাড়ী খেয়ে বেড়াই। তাও পেটের জ্বালায়।

প্রমথ। থাক্ থাক্ সে কথা বঙ্কুবাবু।

বঙ্কু। না প্রমথবাবু, আমার জন্যে আপনি লজ্জা পাবেন না। এখানে নিজে ধরা দিচ্ছি, আর কত জায়গায় খেতে বসে ধরা পড়ে গিয়ে দশ লোকের সামনে অপমানিত হয়ে উঠে এসেছি। সুতরাং আপনি লজ্জিত হবেন না।

প্রমথ। না না, সে কথা নয়। বলছি এখন এত বেলায় আবার কী দরকার এসব কথায়।

বঙ্কু। (নিজের কথার সূত্র ধরিয়া) আজ কিন্তু আপনাদেরই বাড়ীতে আসব বলে আসিনি। এদিকে কোথায় নাকি একটা শ্রাদ্ধবাড়ী—

প্রমথ। সে সব কথা ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। ওরকম হয়েই থাকে। আপনি অন্য কথা বলুন না। আর না হয় তো একটা গান করুন বরং। কি বল গো?

বঙ্কু। আচ্ছা, আমি সংক্ষেপেই বলছি। (মিনিট খানেক মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যখন মাথা তুলিলেন, তখন চোখে জল ভরা বোধ হইল) চিরদিন এরকম ছিলুম না প্রমথবাবু। আমিও ভদ্রলোক ছিলুম, এই রকম সংসার (মহিলাদের ও ছেলেদের নির্দেশ করিলেন)—থাকগে। কিন্তু এক মাসের মধ্যে স্ত্রী ছেলে মেয়ে সব হারিয়ে সেখানে আর থাকতে পারি নি। এক বস্ত্রে বাড়ী ঘর ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ি। তারপর—তারপর আর কি বলব। তারপর এই তো অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। (বলিতে বলিতে চাদর জামা ইত্যাদির পাটে পাটে যে জীর্ণতা ও দীনতা এত যত্নে চাপা দিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাই প্রকাশ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন) কিন্তু লোক দুঃখ যত প্রবলই হোক, উদর তাদের চেয়ে প্রবল, প্রমথবাবু।

(কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। সেই স্তব্ধতায় দুঃখের বাতাস যেন
ভারি হইয়া উঠিল। প্রমথবাবু লজ্জায় ও সংকোচে
ম্রিয়মান হইয়া অবশেষে বলিলেন—)

প্রমথ। তাইতো আপনাকে তামাক দিতে গেলনা তো। ওরে—

বঙ্কু। আপনি ব্যস্ত হবেন না, প্রমথবাবু। তারপর যা বলছিলুম। ভুলেই গিয়েছিলুম যে আমিও এক দিন ভদ্রলোক ছিলুম। কিন্তু অনেক দিন পরে আজ যখন একটি লক্ষ্মীপ্রতিমা আমাকে কাকাবাবু বলে ডাকলে, দুটি সোনার চাঁদ ছেলে দাদু বলে গলা জড়িয়ে ধরলে, ভদ্রলোকের বাড়ীতে ভাঁড়ার আগলাবার ভার দিলে আমাকে বিশ্বাস করে, তখন আর জোচ্চুরি করে খেতে প্রবৃত্তি হ'ল না। তাই চলে যেতে চাইছিলুম মা। তবে একটি ভিক্ষে করি মা, অনেকদিন কারও আপনার লোক সাজতে পাইনি, যদি অনুমতি দাও মাঝে মাঝে এসে দাদুদের সঙ্গে একটু খেলা করে যাব।

পৃথ্বীশ। আপনি থাকেন কোথায়?

বঙ্কু। থাকি কোথায় ঠিক বলা শক্ত। পাঁচটা দোকানে খাতা লিখে দি, দু পাঁচ টাকা যা পাই তাতে যা হোক করে হোটেলে দুটো খাই, আর ওদেরই কারো একটা দোকানে আমাকে শুতে দিয়েছিল। কিন্তু কাল সে আশ্রয়টুকুও গেছে। তারা আর অন্য চেষ্টা দেখতে বলেছে। তাদের দোকান বাড়াচ্ছে, জায়গা সঙ্কুলান হবে না। এইবার বেলাবেলি ফিরে ঘুরে দেখি। যদি কোথাও রাতটুকু কাটাবার মত একটু আশ্রয় যদি জোটাতে পারি।

সুকুমারী। (আঁচলে চোখ মুছিয়া) আপনার কথা তো আমরা সব শুনলুম। এবারে আমার একটা কথা আপনাকে শুনতে হবে, কাকাবাবু।

বঙ্কু। বল মা, কি তোমার হুকুম?

সুকুমারী। ও কথা বলবেন না, ওতে যে আমাদের অকল্যাণ হয় কাকাবাবু।

বঙ্কু। আচ্ছা মা, বল কি তোমার ইচ্ছে।

সুকুমারী। আপনার যাওয়া হবে না।

বঙ্কু। (ম্লান হাসিয়া) সে তো আমি আগেই বুঝেছি। বেশ আমি খেয়ে দেয়েই যাব। এতদিন বিনা নেমন্তন্নে লুকিয়ে চোরের মত খেয়ে বেড়িয়েছি, আজ বরং মা লক্ষ্মীর নেমন্তন্ন পেয়ে বুক ফুলিয়ে খেয়ে যাব।

সুকুমারী। না আপনার খেয়েও যাওয়া হবেনা। আপনার যাওয়াই হবে না।

বঙ্কু। (অতি বিস্মিত) আঁা—?

প্রমথ। (স্ত্রীর প্রস্তাবে খুশী হইয়া) মানে বুঝতে পারছেন না? বড় বউ বলছেন যে ভুলটা উনি করেছিলেন সেইটেই না বজায় থাকুক না। আপনাকে উনি কাকাবাবু বলেছিলেন, আপনি কাকাবাবুই থেকে যান, ছেলেদেরও একটা দাদু থাকুক। আর পিন্টুর গানবাজনারও সুবিধে হবে, কি বল গো, এই না?

বঙ্কু। এ কি বলছেন আপনি প্রমথবাবু! আমার মতো একটা লক্ষ্মীছাড়া, জোচ্চোর লোককে আপনি বাড়ীতে আশ্রয় দেবেন!

প্রমথ। আহাহা, আশ্রয় দেব কেন? কি আশ্চর্য! এতগুলো ঘর পড়ে রয়েছে, একটাতে শোবেন বইতো নয়। এতে আর আশ্রয় দেবার কথা উঠছে কেন? আপনি দয়া করে থাকলে আমার ভারি উপকার হয় বঙ্কুবাবু। এই দেশটা নতুন জায়গা, কাউকে চিনি না, জানিনা, সারাদিন আমরা দুজনেই বাইরে বাইরে থাকব, তবু আপনার মতো একজন প্রবীণ লোক বাড়ীতে থাকলে কতবড় একটা ভরসা থাকে বলুন তো। চোর ডাকাত তো চারিদিকেই ঘুরছে। কি বলিস লক্ষ্মী? (হাস্য)

মহালক্ষ্মী। (গম্ভীর হইয়া) হুঁ।

বঙ্কু। না না, প্রমথবাবু, বুড়োমানুষ বলে এত দয়া—, না না, আমাকে ক্ষমা করবেন। চিরকালের জন্যে আপনার গলগ্রহ হয়ে থাকতে আমার মতো জোচ্চোর লোকেরও—

পৃথ্বীশ। গলগ্রহই বা হবেন কেন বঙ্কুবাবু? ছেলেদুটোর জন্যে মাষ্টার মশাই একজন ঠিক করার বড় দরকার ছিল, সেটা আপনি দয়া করে মিটিয়ে দিন না। আর আমাকেও একটু যদি (ইঙ্গিত ও তবলা দেখাইয়া) সাহায্য করেন, তাহলে—

প্রমথ। ঠিক ঠিক, তাহলে খালি বড় বউয়ের ভুলটাই নয়, আমার ভুলটাও সংশোধিত হয়ে যায়। বাঃ বাঃ পিন্টু, বড্ড মনে করিয়ে দিয়েছ।

বঙ্কু। (দুই চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছে, কয়েক মুহূর্ত নীরবে প্রমথ, পৃথ্বীশ ও সুকুমারীর দিকে চাহিয়া চাদর-দিয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন) আর আমার কিছু বলবার রাখলেন না। অন্ন ও গৃহই শুধু নয়, আজ আমাকে সম্মান পর্যন্ত দান করলেন। দেশ নেই ঘর নেই, আত্মীয় স্বজন বহুদিন আমাকে ছেড়ে গেছে। আজকের রাতটা কোথায় কাটাবো তাই ভেবে পাগল হচ্ছিলুম, আর ভগবান আমার সকল সমস্যা চিরদিনের মতো মিটিয়ে দিলেন। আজ গৃহ-প্রবেশই বটে। (দুই চোখ দিয়া জল পড়িল)

প্রমথ। তা হলে পিন্টু, তুমি ওঁকে ওপোরে নিয়ে যাও, তামাক টামাক—(কমলিকে) আর দেখ, একটা কাপড় জামা বার করে দিও ভাই।

পৃথ্বীশ। আসুন।

পৃথ্বীশ জোর ছাড়িয়া উঠিতে তাহার হাতটাটা পড়িয়া গেল।
বন্ধুবাবু দেখিয়া বলিলেন—"এই যে এটা আপনার—
পৃথ্বীশ লজ্জিত ভাবে সেটি লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান
করিল। পশ্চাতে বন্ধুবাবু ও ছেলেরাও
বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের দিক হইতে নিখিলের প্রবেশ

নিখিল। নাঃ, No trace, রাস্তার কোথাও পাত্তা পাওয়া গেল না। তবে আপনারা খুব সাবধানে থাকবেন দাদা।

প্রসন্ন। (হাসিমুখে) না, না, সে সব মিটে গেছে ভাই। আর ভয় নেই।

নিখিল। ভয় নেই কি বলছেন? চলে গেছে বলে ভাবছেন, আর ভয় নেই? এই বারেই তো real ভয় আরম্ভ হল। বাড়ীর ভেতরের প্ল্যান সব দেখে গেছে, এখন তো any thing might happen any moment. যাক, আপনি ভাববেন না। আমি আপনার সদর থানায় একটা ডায়রি লিখিয়ে দিয়ে এসেছি, বদমাকে নিয়ে একটা descriptionও দিয়ে দিলুম। সাবধানের বিনাশ নেই। কি বল গো?

মহালক্ষ্মী গম্ভীর মুখে ঠোঁট ও হাত উল্টাইয়া অন্য
দিকে চাহিয়া রহিলেন

প্রসন্ন। ও, তুমি সেই বন্ধুবাবুর কথা বলছ?

নিখিল। বন্ধু বন্ধু জানি না, সেই বুড়োর কথা বলছি।

প্রসন্ন। হাঁ, তাঁরই নাম বন্ধুবাবু, তিনি তো—

নিখিল। চলে গেছে বলে নিশ্চিন্ত হবেন না দাদা।

প্রসন্ন। না, চলে যাবেন কেন। তিনি তো বারান্দার ওপারে।

নিখিল। ওপারে রয়েছে? কক্ষণো না। আমি বেশ করে দেখেছি। every nook and corner দেখেছি।

সুকুমারী। হাঁ হাঁ, ভাই আছেন। তিনি ফিরে এসেছেন।

নিখিল বিস্ময়ে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল

প্রসন্ন। সে তোমাকে সব পরে বলব এখন। চমৎকার লোক। আর কি চমৎকার যে গান করেন। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। সন্ধ্যে বেলায় শোনাব তোমাকে।

নিখিল। বটে!

সুকুমারী। ঠাকুর জামাই, ভাই, রাগ ক'রো না। আমার চাবিটাও পাওয়া গেছে এই বাড়ীতেই।

নিখিল। You dont say so! চাবি পাওয়া গেছে? এই বাড়ীতেই?

সুকুমারী। (হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া) হাঁ ভাই এই বাড়ীতেই।

নিখিল। That's very bad। কোথায় ছিল?

মহালক্ষ্মী। (আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাত বাড়াইয়া প্রসন্নকে দেখাইয়া বলিলেন) ঐ ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'র, ওঁকে।

বলিয়াই আবার গম্ভীর মুখে অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন

প্রসন্ন। (কুণ্ঠিত হাস্যে) ওটা আমার কাছেই ছিল হে। কখন চাঁ্যাকে রেখে দিয়েছিলুম, একদম খেয়াল ছিল না। ছি ছি ছি। তবে, হারাই নি আমি।

নিখিল। Good Gracious! আপনার চাঁ্যাকে ছিল? (একটু পরে কি মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিল) কিন্তু আমি বলেছিলুম চাবি চুরি যায় নি, বলুন বৌদি, বলেছিলুম কি না?

সুকুমারী। হাঁ ভাই, তা তুমি বলেছিলে। কিন্তু তুমি এও বলেছিলে যে চাবি হারায় নি।

মহালক্ষ্মী। আমি হারায় নায় বলছি যে কথা—সে কথা মানা হল না।

নিখিল। হারায় নায় সে কথাই তুমি বলে থাক না কেন, তা আমি এখনো মানতে পারলুম না, very sorry। আমি এখনো বলছি চাবি হারায় নি। আর চুরি তো যায় নি বটেই। তোমার দাদার যত দোষই থাকুক না কেন, চোর তিনি নন, এটা মানো তো? তবে যদি বৌদির সঙ্গে খুনসুটি করবার জন্যে লুকিয়ে রেখে থাকেন, কি বলেন বৌদি?

সুকুমারী। সে বয়েস আর নেই ভাই।

মহালক্ষ্মী। কিন্তু হারিয়ে তো গিয়েছিল।

নিখিল। No, my dear Sir, No, হারিয়ে যায় নি। তোমাকেই যদি প্রশ্ন করা যায়—'বৌদি চাবি কি হারিয়ে ফেলেন? অর্থাৎ Was it lost to her? তোমাকে বলতেই হবে "By all means, No." চাবি নিরাপদেই ছিল, in fact, safest custodyতে ছিল। তবে কিছুক্ষণের জন্যে পাওয়া যাচ্ছিল না বটে। That's nothing, সেটুকু ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। বাবা, এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন, হারিয়ে গেলে আর পাওয়া যাচ্ছে না, এ দুটোর তফাৎ? বাড়ীর কর্তার কাছে, master of the houseএর কাছে, বাড়ীর কোনো সম্পত্তি থাকলে সেটা কি হারিয়ে গেছে বলতে পারা যায়?

মহালক্ষ্মী এই প্রবল যুক্তিতে পরাজিত হইলেন বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবীর অসাধারণ বুদ্ধি বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়ে গর্বাতিশয্যে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রসন্নবাবু স্মিতমুখে এই বক্তৃতা উপভোগ করিলেন এবং যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন। নিখিল বক্তৃতা শেষ করিয়া সকলের মুখের দিকে চাহিয়া এই নীরব প্রশংসা উপভোগ করিলেন। হঠাৎ সুকুমারী চঞ্চল হইলেন।

সুকুমারী। ওমা! আমার কী আক্কেল দেখো! ঠাকুর জামাই সেই কোর্ট থেকে এসে অবধি এই দৌড়ঝাঁপ, বকাবকি করছেন, আমি একটু জল খেতে পর্যন্ত দিই নি। এসো ভাই, তুমি ভেতরে এসো, একটু কিছু—

নিখিল। না বৌদি, আমি একেবারে বাড়ীই যাই। এই দাসপাশের বন্ধন থেকে মুক্ত না হলে মুখ দিয়ে কিছু গলবে না।

সুকুমারী। তা এখানেই কাপড় ছাড় না ভাই, কাপড় দিচ্ছি।

নিখিল। গাড়ী রয়েছে, কতক্ষণ আর লাগবে। আর ছেলে গুলোকেও আনতে হবে। আমি ঘুরেই আসি।

প্রসন্ন। হাঁ হাঁ। তুমি আর ওকে দেরি করিয়ে দিও না। নিখিল, তুমি ভাই সকাল সকাল এসো। তুমি এসে দাঁড়ালে আমি একটা মস্ত ভরসা পাই।

নিখিল প্রস্থানোদ্যত

মহালক্ষ্মী। ওগো দেখ, ভালো করে দরজা জানলাগুলো বন্ধ করে ঘরে চাবি দিয়ে এসো। আর আলমারির চাবি যেন—

নিখিল। (দ্বারের কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) হাঁ নিশ্চয়। আমি সব দরজা জানলায় চাবি দিয়ে আসব বই কি। আর সব চাবি এনে রাখতে হোবো তোমার দাদার কাছে, কাকে কেউও টের পাবে না। কি বল?

প্রস্থান

মহালক্ষ্মী। দাদাকে ঠাট্টা! দিয়ে যেন কিছু ভুল করেন না। (ফিরিতেই নজর পড়িল নিখিল টুপি ফেলিয়া গিয়াছেন) এই দেখ বাবুর হুঁসিয়ারি, এখানে টুপি ফেলে গেছেন আর কাল কোর্টে যাবার সময় আমার মাথা খেয়ে ফেলবেন।

দ্রুত টুপি লইয়া প্রস্থান

প্রসন্ন হাস্য করিতেছিলেন। সুকুমারী ধীরে ধীরে আগাইয়া
আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে প্রণাম করিতে তিনি
বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

প্রসন্ন। এ কী, এ কী? তোমার আবার এ কী কাণ্ড।

হরকুমারী। (প্রণামান্তে) কাণ্ড আবার কি। আজকের দিনে তোমায় একটা পেন্নামও করব না?

প্রসন্ন। আজকের দিন কালকের দিন আর কি। রোজই তো তোমার—

হরকুমারী। তা হোক, তবু আজকের দিনে আর একটা করতে হয়।

প্রসন্ন। তা বেশ করেছ, বেশ করেছ।

হরকুমারী। বেশ করেছিই তো। দেখ, আমাকে লোকে বোকা বলে, আমি তো বোকাই। কিন্তু তোমাকে যারা চিনতে পারে না, তাদের মতন বোকা নেই আর।

প্রসন্ন। (সহাস্যে) কে আবার আমাকে চিনতে পারলে না। যাক, তুমি তো চিনতে পেরেছ এই আমার ভালো।

হরকুমারী। চিনতে পেরেছি এত বড় অহঙ্কার আমি করব না। তবে এইটুকু বলি, সংসারে তোমার মতন লোক যদি আরও বেশী থাকত, তাহলে—(আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল)

প্রসন্ন। হাঁ হাঁ, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা সে সব কথা পরে হবেখন। এখন অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। চারদিকে ঝঞ্ঝাট।

হরকুমারী। থাকুক ঝঞ্ঝাট, তুমি এসো, একটু কিছু মুখে দেবে এসো।

প্রসন্ন। চল, তোমাদেরও তো খাওয়া দাওয়া হয়নি।

হরকুমারী। এই যে সবই হবে। তুমি এসো না।

প্রস্থান

প্রসন্ন। হাঁ, এই দিকটায় একটা ব্যবস্থা করেই, ফণা, ফণা কোথায় গেলি আবার—

বলিতে বলিতে প্রস্থান

কয়েক মুহূর্ত পরেই ফণার প্রবেশ

তাহার পরক্ষণেই নেপথ্যে পূর্ণেন্দুর কণ্ঠ—

কইরে ফণা, কার্পেটটা কি তুই ওপোরে আনবি, না, কী?

ফণা। এই যে যাই ছোটবাবু।

ফণা কার্পেট গুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়
"ফণা, ফণা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রসন্নবাবুর প্রবেশ

প্রসন্ন। এই যে এটা পাতছিস তো। হাঁ, দেখে যেন চট্ করে, আর দেরী করা নয়, বুঝলে বস্তু?

ফণা। কার্পেট? হাঁ, তাইতো পাতছি বড়বাবু।

প্রসন্নবাবুর প্রস্থান

ফণা কার্পেট পাতিতে সুরু করিবার পর, ভিতর হইতে পূর্ণেন্দুর
ডাক আসিল—'ফণা।' ফণা ত্রস্তে কার্পেট গুটাইতে
গেল। তারপর কী ভাবিয়া কার্পেট ছাড়িয়া দিয়া
সেই কার্পেটে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গভীর
চিন্তামগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
ধীরে ধীরে যবনিকা নামিল

গুরু গোরক্ষনাথ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

'মহাজ্ঞান' যেন শিব, মহামায়া করেন হরণ,
কদলীতে ভুলিলেন যুগব্যাপী সাধনার ধন
নিজেরে হরণ করে। তপ শুধু তুষার মতন
বহ্নি তার তপস্বীরে একদিন করে তন্ময়।
দেহের বলের সাথে ক্ষীণ হয় মানসের বল,
জরা আসে, শ্লথ হয় যৌবনের সংযম শৃঙ্খল।
অলক্ষিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হিংস্র পশু কেটে ফেলে ঘোর
ইন্দ্রিয় শার্দূল উঠে মানে নাক শাসন কঠোর,
শোণিত পিশিত চাহে। যুগে যুগে ফেরাঘাটে পড়ি'
আবাল্য তপস্যা করি কত গুরু যায় গড়াগড়ি।
পুত্রে সঁপিয়া-জরা ভোগে মগ্ন রাজর্ষি যযাতি,
চ্যবন ভিক্ষা মাগে ফিরাইতে যৌবনের ভাতি।

কেবা বৈরী তপস্যায়? তপ করে বিশ্বাচরণ?
প্রতিশোধ নিতে তাই কেবা রচে কদলীপত্তন,
সাধনার মরুপথে? রুদ্ধ করি ইন্দ্রিয়ের দ্বার
কঠোর নিগ্রহ রুদ্ধ দিনে দিনে করে অস্বীকার,—
করে রোষ উদ্দীপন? আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি
নিখিল নিত্যরূপা, একি নয় তাঁরে অস্বীকৃতি?

পুরুষকারের সাথে প্রকৃতির এই যে সংগ্রাম
চলিতেছে যুগে যুগে, লভিতেছে একই পরিণাম
মহাযোগী মহাদৈত্য। মা বলিয়া না নিলে শরণ
মহাতপস্বীরও গতি চণ্ড মুণ্ড শুম্ভেরি মতন।
হে গুরু গোরক্ষনাথ, মোহমুগ্ধ গুরুর পতনে
যে শিক্ষা লভিলে তুমি তব দীর্ঘ তাপস জীবনে
মহা জ্ঞান হ'তে তাই ঢের বড়। বিজয়ী শক্তির
পাষাণ হৃদয়ে তুমি ঝরাইলে বাৎসল্যের ক্ষীর।

মা বলি শরণ নিয়ে তারে তুমি জিনিলে সংগ্রামে
বামারে দক্ষিণা তুমি ক'রেছিলে সাধনার বামে।
মনে জাগে সেই চিত্র, মৃদঙ্গে ধরি দুটী হাতে
পতিত পঙ্কল হ'তে উদ্ধারিলে গুরু মীননাথে।
গুরু হ'তে শিষ্য বড় এই সত্য জাগে তার মনে,
[illegible] জ্ঞানলোকে যুগে যুগে ক্রমবিবর্তনে,
শিষ্যপরম্পরাক্রমে সাধনার শক্তি বেড়ে যায়,
শিষ্যরাই মধ্যপথে প্রমত্ত গুরুরে বাঁচায়।
ধ্যান হতে গুরু যদি ভ্রমক্রমে হন পদচ্যুত,
শিষ্য করে উদ্‌যাপন গুরু ত্যক্ত অসমাপ্ত ব্রত।

সংস্কৃত কোশ-কাব্য

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ভারতের মধ্যযুগে সংস্কৃত কাব্য যখন নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, তখনও তার সঞ্জীবনী শক্তি যে ক্ষীণ হয়নি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংস্কৃত কোশকাব্যসমূহ বা বিভিন্ন কবির রচিত কবিতা সংগ্রহ। প্রতিকূল অবস্থায়ও সংস্কৃত সাহিত্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তো হারায়নি, বরং তা সত্ত্বেও যে এত বিশিষ্ট কবি এত অজস্র মণিমুক্তা সদৃশ কবিতা রচনা করেছিলেন, তাতে সংস্কৃতের অমরত্বই প্রমাণিত হয়। এ পর্যন্ত মাত্র এগারখানা সংস্কৃত কোশকাব্য ছাপা হয়েছে; তন্মধ্যে পিটার্সনের সংশোধিত গ্রন্থত্রয় সুবিদিত। তদ্ভিন্ন জহলনের সূক্তিমুক্তাবলী, শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিত-রত্নাকর, কাশিরাজের সূক্তিহার, রূপগোস্বামীর পদ্যাবলী, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, লক্ষ্মণভট্টের পদ্যরচনা, হরিভাস্করের পদ্যামৃততরঙ্গিণী এবং সুন্দরদেবের সূক্তিসুন্দর এপর্যন্ত ছাপা হয়েছে। এ কোশকাব্যগুলিকে একটী একটী অমূল্য রত্নখনি বললেও কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না। কোশকাব্যের প্রত্যেকটী কবিতা প্রায়ই ভিন্ন কবির লিখিত বলে ছন্দ ও ভাবের দিক থেকে ভিন্ন এবং স্বকীয় অর্থের নিমিত্ত অন্য কোনও কবিতার অপেক্ষা রাখে না। এক একটী বিষয়বস্তুর বর্ণনাকল্পে বিভিন্ন কবির কতিপয় কবিতার সুসজ্জিত থাকে; ফলে, বিভিন্ন সূত্রে গ্রথিত কতিপয় কবিতা একটী মাল্যের আকার ধারণ করে। ঈদৃশ বহু মাল্যের সমাবেশে এক একটী কোশকাব্য রত্নপেটিকারূপে বিরাজ করে। এ প্রকারে এক একটী কোশকাব্যে প্রায় দেড়শত দুশত কবির কবিতা উদ্ধৃত থাকে। অবশ্য কোনও কোনও কোশকাব্যে কবির নাম দেওয়া থাকে না।

এ কোশকাব্যসমূহে অসংখ্য কবির নাম আছে—যা' অন্য কোনও গ্রন্থ থেকে জানা যায় না। এ গ্রন্থগুলি না থাক্‌লে এ কবিদের নাম চিরতরে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হ'য়ে যেত। এ সব কবিদের মধ্যে অনেক নারী-কবির নামও উদ্ধৃত আছে। মুসলমান রাজদরবারে যাদের খুব সম্মান প্রতিপত্তি ছিল, ঈদৃশ অনেক কবির বিবরণ বা উল্লেখও এসব গ্রন্থে এখন দেখ্‌তে পাই। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিরচিত কোশকাব্যসমূহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দৃষ্ট হয় যে ঐ ঐ গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত কবিরা প্রায়ই সংকলয়িতাদের সমসাময়িক। সুতরাং এ সব গ্রন্থ থেকে ঐ ঐ শতাব্দীতে বিশিষ্ট সংস্কৃত কবিদের অভ্যুত্থানের বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায়। কোশকাব্যে অনেক কবির নাম সমুদ্ধৃত আছে, যাঁদের নাম অন্য কোনও সূত্রে পাওয়া গেলেও বা তাঁদের লিখিত অন্যান্য গ্রন্থাদি পাওয়া গেলেও তাঁদের সময় নির্ধারণের কোনও উপায় থাকে না। কিন্তু আজ কোশকাব্যগুলির তারিখ নির্দেশ করে আমরা নিতে পেরেছি বলে তদুদ্ধৃত কবিতার রচয়িতাদের তারিখ ঐ থেকেই কতকটা নিরূপিত হয়। কারণ, যে কোশকাব্যে কোনও কবির কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে, সে কবি ঐ কোশকাব্যের রচনা সময়ের পরবর্তী কালের হ'তে পারেন না। ঐ ঐ কবিতায় সমুদ্ধৃত রাজাদির নাম প্রভৃতি থেকেও অনেক সময় কবির সময়ের একটা নির্দেশ পাওয়া যায়। আবার, বিষয় বিভাগ অনুসারে কবিতাগুলি সুসজ্জিত থাকে বলে সংস্কৃত সাহিত্যে বিষয় বিশেষের কীদৃশ বর্ণনা পাওয়া যায়, তার একটা প্রকৃষ্ট ধারণাও এ কোশকাব্য থেকেই পেতে পারি।

কোশকাব্যসমূহের একটী দোষ এই যে, বিভিন্ন কোশকাব্যে একই কবিতা দুই বা ততোধিক কবির নামে কখনও কখনও দেখা যায়। প্রাচীন কোশকাব্যসমূহে এ দোষ কথঞ্চিৎ বেশী দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু পরবর্তী কোশকাব্যে এ দোষ এত অল্প যে ইহা উল্লেখযোগ্য না বল্লেই চলে। কাব্য রসাস্বাদ ও কবিবর্গের আত্মপরিচয়, ভারতের মধ্যযুগের সভ্যতা, সামাজিক অবস্থা নিরূপণ প্রভৃতির দিক থেকে কোশকাব্যসমূহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অথচ এ গ্রন্থগুলির যত্ন এখনও আমাদের দেশে হয়নি। এ অমূল্য গ্রন্থরাজি এখনও যে উপেক্ষিত হয়ে আছে, ইহা নিতান্তই ক্ষোভের বিষয়।

আমাদের কাছে এ-রকম কয়েকটী কোশকাব্যের হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত আছে; বিষয় গৌরবে ও গ্রথন প্রণালীতে এ পুস্তকশ্রেণীর মধ্যে বেণীদত্তকৃত পদ্যবেণী[১] অতি উচ্চাঙ্গের। এ পুস্তকের একটীমাত্র পুঁথি জগতে বিদ্যমান; তা বর্তমানে পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউটে সুরক্ষিত আছে। তাই কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করবো।

পদ্যবেণীর সংকলয়িতা বেণীদত্ত খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। তিনি খৃষ্টীয় ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্চ-তত্ত্ব-প্রকাশিকা নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[২] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত সুন্দরদেবের বিরচিত সূক্তিসুন্দরে[৩] বেণীদত্তকৃত পদ্যবেণীর কবিতা উদ্ধৃত আছে। সুতরাং এ গ্রন্থ নিশ্চয় কিছু আগে রচিত হ'য়েছিল। পুনরায় দেখা যায় এগ্রন্থে হরিনারায়ণ মিশ্রকৃত সম্রাট শাজাহানের (১৬২৮-১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে) প্রশংসামূলক কবিতা আছে।[৪] সুতরাং উক্ত গ্রন্থ ঐ ১৬২৮ সালের আগে তৈরী হ'তে পারে না। ইহা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এ গ্রন্থ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হ'য়েছিল।

পদ্যবেণী থেকেই জানা যায়[৫]—বেণীদত্তের পিতার নাম জগজ্জীবন এবং পিতামহের নাম নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠকে বেণীদত্ত মাণিক-বংশের ভূষণ বলে অভিহিত করেছেন। পদ্যবেণীতে জগজ্জীবনের ষোলটী কবিতা এবং তৎকৃত জগজ্জীবন-প্রভা থেকে ছ'টী কবিতা সমুদ্ধৃত হয়েছে। এ গ্রন্থে নীলকণ্ঠকৃত একটী কবিতা[৬] এবং মাণিক কৃত দুইটী কবিতাও[৭] উদ্ধৃত হয়েছে। মনে হয়, এ নীলকণ্ঠ বেণীদত্তের পিতামহ এবং মাণিকও তাঁর পূর্বপুরুষদের অন্যতম। সুতরাং কবি বংশপরম্পরাক্রমে কবিত্বশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন, এ বলা চলে। তাঁর কয়েকটী কবিতায় তিনি বনমালি নৃপতির প্রশংসা করেছেন[৮]; কবি যে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। খুব সম্ভবতঃ ইনিই বেণীদত্তের গ্রন্থান্তরে প্রশংসিত বীরবীরাখ্য।[৯] অন্যত্র বেণীদত্ত শ্রীরাম নামক রাজার প্রশংসা করেছেন।[১০] এ রামরাজ কবির গ্রন্থান্তরে প্রশংসিত বীরসিংহসুত।[১১] এতদ্ভিন্ন বেণীদত্ত পদ্যবেণীর ৯০ সংখ্যক কবিতায় প্রতাপ নামক নৃপতিরও গুণগান করেছেন। কবির পূর্বপুরুষ মাণিকও রাজীবদেব নৃপতির প্রীতিভাজন ছিলেন, পদ্যবেণীতেই তার প্রমাণ আছে।[১২]

কোশকাব্যকারগণ সাধারণতঃ সংকলিত গ্রন্থে স্বকীয় কতিপয় কবিতা সন্নিবিষ্ট করেন। এ বৈশিষ্ট্য বেণীদত্তের গ্রন্থেও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। পদ্যবেণীর ৮৮৯ কবিতার মধ্যে ২০১টী কবিতা বেণীদত্তের স্বকৃত। তিনি গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই কবিতা রচনা ক'রে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেণীদত্তের কবিতাগুলি ভাষার দিক থেকে সুললিত হলেও ভাবের ও অর্থের দিক থেকে লঘু। অনেক ক্ষেত্রে কবিতায় বহু কষ্টকল্পিত অর্থ দিয়েই পাঠককে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তা হলেও তাঁর কবিতা প্রতিভাপূর্ণ ও মধুপ্রাণবন্ত বলে পরবর্তী সংকলয়িতাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁর কবিতাও স্বকীয় গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

যদিও বেণীদত্ত সুকবি ছিলেন না, তা হলেও তিনি উচ্চদরের কাব্য-রসিক ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁর কবিতা নির্বাচন অতীব সুরুচিসম্মত; তাঁর সংগৃহীত প্রত্যেকটি কবিতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, চমৎকারিত্বপূর্ণ, ভাব ও ভাষায় অভিনব।

পদ্যবেণীতে[১৩] ছ'টী তরঙ্গ। প্রথম তরঙ্গে বাহান্নটী কবিতায় দেবতা-বর্ণন। শিব, বিষ্ণু, ভবানী ও সূর্য বিষয়ক কবিতাই কেবল এ-তরঙ্গে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় তরঙ্গে ১২০টী কবিতায় রাজাদিবর্ণন। সাধারণভাবে রাজস্তুতি; বিশিষ্ট কোনও কোনও রাজার নামোল্লেখসহ প্রশংসা; রাজার দান, সৌন্দর্য, কীর্তি ও প্রতাপ, রাজার চতুরঙ্গবল, বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রাদি, যুদ্ধগমন, অরিপলায়ন, অরি স্ত্রী ও অরি-বসতী বর্ণন এ অধ্যায়ে আছে। এ তরঙ্গে নিম্নলিখিত নয় জন কবি বিভিন্ন রাজার

স্তুতিগান করেছেন ; যথা—অকবরীয় কালিদাস বা গোবিন্দভট্ট—সম্রাট আকবর, বীরভানুপুত্র রামচন্দ্র, গণপতি ও স্বর্ণরেখ ; তাম্বুকর—বীরভানু ও নিজামশাহ ; চিন্তামণি—জাহাঙ্গীর ও তৎপুত্র শাহ পরবেজ ; হরিনারায়ণ মিশ্র—সম্রাট সাজাহান ; বাণী কণ্ঠাভরণ—দিল্লীন্দ্রচূড়ামণি ; গণপতি—বাসুদেব ; রামচন্দ্র ভট্ট—বীরসিংহ ; রাজশেখর—বীরভূপ ; শঙ্করভট্ট—কর্ণনারায়ণ ; এবং শ্রীবাচিক—রাজীবশেখর। বেণীদত্তের গুণানুরাগী ও শুভাকাঙ্ক্ষী রাজাদের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তৃতীয় তরঙ্গে এক শত কবিতায় নারীর বাল্য, বয়ঃসন্ধি ও তারুণ্য, বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং তিলক, [illegible], সৌন্দর্যলিপ্সা ও কর্ণাভরণের বর্ণন। চতুর্থ তরঙ্গে এক শত পঁচাশী কবিতায় প্রিয়প্রিয়ার বিপ্রলম্ভ, নায়িকা ও নায়ক ভেদ, অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চমে ১২৩টী কবিতায় চন্দ্রোদয়, প্রভাত প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন অংশের বিবরণ ; কবিতাগুলির অধিকাংশই শ্লেষমূলক। ষষ্ঠে ৬৭টী কবিতায় ষড় ঋতু বর্ণন ; তদনন্তর মহাদেব ও জনার্দন বিষয়ক কবিতা ; তৎপর বিভিন্ন পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি বিষয়ক অন্যোক্তি ৭৮টী কবিতায় ; তারপর ৩৩টী কবিতায় উদার, খল ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তি ও ইন্দু, ধন প্রভৃতি বস্তুর স্তুতি বা নিন্দা। অতঃপর কাব্য ও কবি প্রশংসা পাই বারটী কবিতায় ; এ অংশে ১৮৮ নং কবিতায় গণপতি স্বর্ণরেখ কবির এবং ১৮৯ সংখ্যক কবিতায় তাম্বুকর কবির রচয়িতা উভয়ে প্রশংসা করেছেন। তৎপর মূলের সাহিত্যিক মত অষ্ট রসের বর্ণনা আছে তিনটী কবিতায়, সমস্যাপূরণ উনত্রিশটী কবিতায় ; অতঃপর তিনটী কবিতায় দশাবতার-বর্ণন ; তৎপর গঙ্গা, যমুনা ও বেণী বর্ণন এবং সর্বশেষে কতিপয় বিবিধবিষয়ক কবিতা। বাস্তবিক এ ষষ্ঠ তরঙ্গ কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ নহে, কিন্তু বাহুল্যেও ভরপুর। এ সম্পূর্ণ তরঙ্গকে একটী প্রকীর্ণ-অধ্যায় নামেও অভিহিত করা চলে।

পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে বেণীদত্ত দেবতা, রাজা, নারী, প্রেম, প্রকৃতি ও অন্যোক্তি প্রভৃতি বিবিধ বিষয় নিয়ে ছয়টী অধ্যায় ভাগ করে নিয়েছেন। অন্যান্য কোষকাব্যেও এ বিষয়গুলি পাওয়া যায় ; কিন্তু কোনও কোনও কোষকাব্যে তিন হাজার, সাড়ে তিন হাজার শ্লোক থাকে বলে বিষয়ের সংখ্যা ও বিভিন্ন বিষয়ের বিভাগ, উপবিভাগ প্রভৃতি অত্যধিক বেশী বৃদ্ধি হয়।

পদ্যবেণীতে মোটের উপর ১১৪ জন কবির কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে। এদের মধ্যে ভর্তৃহরি, আনন্দবর্ধন, ক্ষেমেন্দ্র, অকবরীয়-কালিদাস, তাম্বুকর ও জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ প্রভৃতি দশ পনের কবি ছাড়া অন্যান্য কবিদের নাম সুবিদিত নহে। এর মধ্যে মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি দু' একজন বাঙ্গালী কবিও আছেন এবং কেরলী, গৌরী, পদ্মাবতী, মোরিকা ও বিকটনিতম্বা এ পাঁচ জন নারী কবির কবিতাও উদ্ধৃত আছে।

এতদ্ভিন্ন কয়েকটী কবিতায় কবির নাম উল্লেখ না থাকলেও কবিতার আকর গ্রন্থের নাম উল্লিখিত আছে। ভোজ-প্রবন্ধ থেকে দুটী, জগজ্জীবন গ্রন্থ থেকে ছটী, রত্নাবলী থেকে একটী, সুভাষিতমুক্তাবলী থেকে একটী এবং বাণীরসাল গ্রন্থ থেকে একটী কবিতা বেণীদত্ত পদ্যবেণীতে সংগৃহীত করেছেন। কেবল ১০৮টী কবিতায় আকরগ্রন্থ বা কবির নাম বেণীদত্ত উল্লেখ করেন নি।

এ সব কবি ও গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ প্রদান অতীব প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থানাভাবে তা' এখানে সম্ভবপর নয় বলে' তা' থেকে বিরত রইলাম।

পদ্যবেণী সুসংবদ্ধ উৎকৃষ্ট কবিতার সংকলন গ্রন্থ। তাই—গুণ-পরিচয়ে উৎকৃষ্ট কবিতা নির্বাচন করে তার বিশ্লেষণ করাও এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। একটী কবিতার সৌন্দর্য বিশেষ করে মনকে আকৃষ্ট করে ; —তৎসম্বন্ধে দু' একটী কথা বলে' এ প্রবন্ধ শেষ করি। কবিতাটী রামচন্দ্র ভট্ট কৃত—গ্রন্থের বাষট্টি নম্বর শ্লোক—

> বৈকুণ্ঠাভঃ প্রকামঃ কমলমুকুলশিরাঃ কুন্তলাকৃষ্টদৃষ্টিঃ
> কোকশোকাপহারো নমিতপরিজনো বিশ্ববিখ্যাতকীর্তিঃ।
> হংসখাদকচিত্তঃ সমরপরিদৃঢ়ঃ কঞ্জনাভাব্জযুক্তো
> বীর শ্রীবীরসিংহ বিদিত তব রিপুঃ কিন্তু মুক্তাদিবর্ণঃ।

এ কবিতায় কবি রাজা বীরসিংহকে সম্বোধন করে' বলছেন যে তাঁর রিপু তাঁরই মত, কেবল প্রত্যেক বিশেষণের আদি-বর্ণ বাদ দিতে দিতে হয় ; যেমন রাজা নিজে শ্রীর আকার পরিপূর্ণ (বৈকুণ্ঠাভ), তাঁর শত্রু অতি কুণ্ঠাযুক্ত (কুণ্ঠাভ) ; তাঁর শির কমলশোভিত (কমলমুকুলশিরাঃ), তাঁর শত্রুর শির মলযুক্ত (মলমুকুলশিরাঃ), তাঁর দৃষ্টি কুন্তলের দিকে আকৃষ্ট (কুন্তলাকৃষ্টদৃষ্টিঃ), তাঁর শত্রুর দৃষ্টি তলাশ্রিত (ন্তলাকৃষ্টদৃষ্টিঃ) ইত্যাদি। এ কবিতার বর্ণন-ভঙ্গিমা সত্যি সুমধুর।

প্রাঞ্জলতার দিক থেকে একটী মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করছি—উদয় কবি বিষ্ণুকে ভক্তি নিবেদন করছেন—

> করাম্ভোজে যস্য মদনমথনশ্রী পদযুগঃ
> মনঃপুষ্পশ্রেণী মধুপনিবহো রচরণঃ।
> কলাকূটব্যাপী ব্রজযুবতিসঙ্গী জলমুচঃ
> গভীরাভোগশ্রী মম স শরণং নন্দনন্দনম্।

এরূপ ভাব, ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ ও ব্যাকরণের উৎকর্ষব্যঞ্জক কবিতা সমন্বিত। সত্যি এ গ্রন্থের সর্ব বর্ণ ছত্রে ছত্রে কবিতার মাধুর্য ও সর্ববিধ উৎকর্ষ উপচিয়ে পড়ছে।

১। এ পুস্তক আমার ব্যবহারের জন্য লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান্ Dr. H. N. Randle মহোদয় প্রথম উক্ত লাইব্রেরীতে নিয়ে যান। পরে ভাণ্ডারকর ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ আমার বিনা মাশুলে আমার কাছে এ পুঁথি পাঠান। উভয় Dr. Randle ও ভাণ্ডারকর ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices, পুঁথি নং ১৬০৬।

৩। ১৩৫৮-১৩৫৯ সালের সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় মৎকর্তৃক সম্পাদিত।

৪। দুগ্ধমৌলিজটাং বহতি মহাবাহাবরে, ইত্যাদি কবিতা, পদ্যবেণী ১৪১ নং কবিতা।

৫। যথা প্রথম তরঙ্গের অন্তে—ইতি শ্রীবাচিক বংশাবতংস—শ্রীনীলকণ্ঠাত্মজ-জগজ্জীবন-সূনু-বেণীদত্ত-বিরচিতায়াং পদ্যবেণ্যাং প্রথমতরঙ্গঃ প্রাক্ বিশ্রামাৎ।

৬। ১৮১ নং কবিতা। ৭। ১৭২ ও ১২৪ নং কবিতা।

৮। পদ্যবেণীর ৫৩, ১০০, ১৩১ ও ১৪১ নং কবিতা। ৯। ৯৩ ও ১০১ নং কবিতা।

১০। পদ্যবেণীর ৮৩ ও ৮৪ নং কবিতা এবং হরিকৃষ্ণস্তবের ৮০ নং কবিতা।

১১। কণ্ঠাভরণ ইত্যাদি, ১০২ নং কবিতা। মহেশেরা অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন।

১২। ৮৫ কবিতার শেষের দুপংক্তি—ভাবদিগন্তান্ সদঠীতা বাণী রাজীবনেত্র সমাজেশায়।

১৩। বেণী অর্থে জলপ্রবাহ বুঝায়। ঐ জন্যই বিভিন্ন অংশের নাম তরঙ্গ দেওয়া হয়েছে।

১৪। পদ্যবেণী ৫৩, ১০৬ ও ১৩৮ নং কবিতা।

১৫। ৬৪ নং কবিতা, ৬৬, ৯৩, ১০৪-১০৬ এবং ১৩৯।

১৬। ৭০ নং কবিতা। ১৭। ৭৭ নং কবিতা।

১৮। ৬৮ নং কবিতা। ১৯। ৬২, ১০০, ১৩১—১৩৩ নং কবিতা।

২০। ১৪৩ ও ১৪৯ নং কবিতা। ২১। ১৩১ নং শ্লোক।

২২। ৭৮ নং কবিতা। ২৩। ৮৯ নং কবিতা। ২৪। ৬২ নং কবিতা।

২৫। ৮৭ নং কবিতা। ২৬। ১১২ নং কবিতা। ২৭। ১২৪ নং কবিতা।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চর ইস্‌মাইলে বসন্ত আসিয়াছিল।

সমস্ত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া একটির পর একটি ঋতু-বিবর্তন চলিতেছে। যেন কালের অক্ষমালা হাতে লইয়া জীবধাত্রী পৃথিবী ধ্যানে বসিয়াছে—এই ধ্যানের মধ্য দিয়া বৎসরের শেষে সে পূর্ণতার একটা সিদ্ধিলাভ করিবে। বসন্তের মধ্য দিয়া সেই পূর্ণতা আসিয়া মানুষের কাছে দেখা দেয়। দিকে দিকে ফুল ফুটিয়া ওঠে—প্রজাপতি উড়িয়া যায়, পিয়াল-বনে কৃষ্ণসার মৃগ শৃঙ্গ দিয়া মৃগীকে কণ্ডূয়ন করিতে থাকে। বসন্তের বাতাসে পুষ্প-শরের পাপড়িগুলি রঙ ছড়াইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে এই মধু-ঋতুটা অমর হইয়া আছে।

কিন্তু যেখানে বাঁও মিলাইয়া বাঁশ পুঁতিতে হয়—বছরের পর বছর বালির নোনা কম করিয়া নতুন মানুষের উপনিবেশ রচনা করিতে হয়—আদি-জননী সিন্ধুর কোল হইতে হামাগুড়ি দিয়া যেখানকার মাটি বেশি দূর উঠিয়া আসিতে পারে নাই, সেখানে ফাল্‌গুনী বাতাস আলাদা রূপ লইয়া আসে। পর্তুগীজদের ভাঙা-গীর্জার পাশ দিয়া যেখানে নদীর জল ঘূর্ণি রচিয়া খরস্রোতে সরিতেছে, সেখানে বালির মধ্যে পুঁতিয়া থাকা মরচে-পড়া ভাঙা লোহার কামানটা আর এক অভিনব বসন্তের স্বপ্ন দেখে! দক্ষিণা বাতাসে গঞ্জালেসের বোম্বেটে জাহাজ বঙ্গোপসাগরের মোহানা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—সুরভি-চঞ্চল ফাল্গুন রাত্রিতে বাসরের মিলন-মাধুরীকে চূর্ণ করিয়া পর্তুগীজদের বন্দুক আর মশাল সামনে আসিয়া দাঁড়ায়!

আর তখনই চর ইস্‌মাইল নিজের সত্যিকারের স্বরূপটাকে চিনিতে পারে: তাহার ঈশান-দিগন্তে খানিকটা সুতীব্র হিংসা মেঘে মেঘে ঘন কুঞ্চিত হইয়া ওঠে, নদীর জল স্লেটের মতো কালো হইয়া যায় এবং তারপর—

• • •

বিকালের দিকেই মণিমোহনের মনে হইল যে মা-ফুন্ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছে। এই দুইদিন হইতেই বর্মী মেয়েটির স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে নানাভাবে আন্দোলন তুলিয়া ফিরিয়াছে। খানিকটা অনির্বাণ আগুনের মতো মেয়েটির রূপ—মনটাও যে আগুনের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। আর তাহার পাতিব্রত্যের আদর্শটাও যেমন বিচিত্র, তেমনই উপভোগ্য। পশ্চিম বঙ্গের একটি শান্ত-গ্রামে, একতলা বাড়ীর একখানি কুঠুরীতে বসিয়া বাণী সেটা কল্পনাই করিতে পারে না।

কিন্তু বেলা পড়িয়া আসিয়াছে এবং খান-ইটের কথাটাও সে ইহার মধ্যেই ভুলিয়া যাইতে পারে নাই। তা ছাড়া মনের অজ্ঞাত-প্রান্ত হইতে একটা আকর্ষণও যেন সে অনুভব করিতেছিল। সমুদ্রের একেবারে মোহানায়—পৃথিবীর উপান্তে এমন একটি বিস্ময়কর বস্তু যে সে আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে এটাও নিতান্ত কম কথা নয়।

সুতরাং বাহির হইয়া পড়িতেই হইল।

বর্মী মেয়েটি বোধ হয় তাহার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ সে বেশ করিয়া সাজিয়াছে। সিল্কের ঘাগরার উপর চমৎকার একটি রঙিন্ জ্যাকেট পরিয়াছে—মাথার চুলগুলি বেণী বাঁধিয়াও চমৎকার ভাবে চূড়ার উপরে বাঁধা। কি একটা সুগন্ধিও বোধ হয় সে মাখিয়াছে, গন্ধে বাতাসটা নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হইল অরণ্যের কালো অন্ধকার হইতে রহস্যময়ী কোনো রাজকন্যা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা-ফুন হাসিয়া বলিল, মনে আছে তো?

—মনে না থেকে উপায় আছে নাকি?

—সত্যি তুমি না এলে আমি বড্ড রাগ করতুম সরকারীবাবু। সারা দুপুর ব'সে খাবার তৈরী করেছি তোমার জন্যে, অবশ্য তোমাদের বাঙালিরা যা খায়।

বাঁশের মাচাটির উপর ভালো করিয়া বসিয়া লইয়া মণিমোহন প্রশ্ন করিল, কিন্তু কেন এ সব তুমি করতে গেলে?

—কেন করতে গেলুম?—মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিতেই লাগিল: তোমার বড্ড সুবিচার আছে সরকারীবাবু, তাই তোমাকে আমার মনে রয়েছে।

—মনে রয়েছে। কথাটা মণিমোহনের যেন খচ্ করিয়া বাজিল। এমন করিয়া ভালো লাগাটা প্রকাশ করা ইহাদের পক্ষেই সম্ভব। আচ্ছা, বাণী এমন করিয়া কথাটা কি কখনও বলিতে পারিত। মণিমোহন ভালো করিয়া মা-ফুনের দিকে চাহিল। অপূর্ব রূপসী দেখাইতেছে তাহাকে। প্রসাধনের ফলে তাহার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রূপ তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিয়াছে—হঠাৎ মনে হইতে পারে তাহার চোখ দুটি যেন নীল সুরায় পরিপূর্ণ দুটি মদের পাত্র। তাহার তীব্র যৌবনশ্রী দেহ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়া যেন দিক্ দিগন্তরকে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিতে চায়।

মেয়েটি ততক্ষণে একটা চীনা মাটির রাইস্-প্লেট্ করিয়া একরাশ খাবার আনিয়া হাজির করিয়াছে। বেশির ভাগই ডিমের তৈরী। মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তোমার স্বামী?

মেয়েটি তীক্ষ্ণ কৌতুকের কণ্ঠে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল—হাসিটা ধারালো লোহার ফলার মতো নিষ্ঠুর এবং রূঢ়। যেন এমন হাসির কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না।

—আমার স্বামী! ও হতভাগাটার কথা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছ না দেখছি। তা সে তো মরেছে।

—মরেছে! চমকিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল: সে কি!

মেয়েটি হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল: মরবে! আমার হাতে ছাড়া কি তার মরণ আছে! সে আজও সহর থেকে ফেরেনি।

—কিন্তু তার তো ফেরবার কথা ছিল। এই নির্জন বাড়ীতে বিচিত্র সুন্দরী এই তরুণী মেয়েটির স্বামী অনুপস্থিত—ন্যায়শাস্ত্রের দিক হইতে জিনিসটা মনোরম নয়; কিন্তু মণিমোহনের আজ কি হইল কে জানে—তাহার অবচেতন সত্তাটা এই সংবাদে যেন

খুসি হইয়া বলিয়া উঠিল: ঠিক এমনটিই সে আশা করিয়াছিল বটে।

—তা হলে তো—

—তা হলে—তা হলে কি? ভয় করছে আমাকে! কিন্তু যা ভাবছ আমি তত খারাপ লোক নই সরকারীবাবু। সকলকে উট মারা আমার স্বভাব নয়।

—তাই দেখছি—মণিমোহন খাবারের ডিসটার দিকে মন দিল।

বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে—নদীর উপর রক্ত ছড়াইয়া সূর্য বোধ হয় এতক্ষণে অস্ত নামিয়াছে। বাঁশ বনের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার এখানে একটু আগে হইতেই ডানা মেলিয়া দিল। মা-হ্ন একটা লন্ঠন জ্বালিয়া আনিল। সেই আলোয় তাহার মুখখানা রহস্যে যেন কোমল ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে।

মা-হ্ন মণিমোহনের কাছে ঘেঁষিয়াই বসিল একরকম। তাহার বেশ-বাস হইতে একটা অপরিচিত সুগন্ধি অত্যন্ত উগ্র হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে—যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয় বহিয়া সে গন্ধটা সমস্ত শিরা-উপশিরাকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলিতেছে। অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অতিরিক্ত কোমল কণ্ঠে মেয়েটি বলিল, খাচ্ছ না কেন? বাঙালিদের মতো তৈরী করতে পারিনি বলে?

মণিমোহন অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত চেতনায় যেন ঝন ঝন করিয়া অস্বাভাবিক একটা কোলাহল বাজিয়া উঠিতেছে। আর একটু দেরী হইলে হয়তো বা সে ধরা পড়িয়া যাইবে। তার রক্ত অস্বাভাবিক খরস্রোতে সর্বাঙ্গ দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

কিছু একটা তাহার বলা উচিত, কিন্তু কোনো কথাই এই মুহূর্তে সে খুঁজিয়া পাইল না। কেবল ইতস্তত করিয়া বলিতে পারিল। না বেশ হয়েছে, খুব খেয়েছি। তারপরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আচ্ছা, অন্ধকার হয়ে গেল, আমি এখন চললুম।

মা-হ্ন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

—কিন্তু যাবে কি করে?

—ওঃ—অন্ধকারের জন্য ঠেকবে না। আমার সঙ্গে টর্চ আছে।

—অন্ধকারের কথা বলছি না—ঝড় আসছে যে।

—ঝড়!—বাহিরে মুখ বাড়াইয়া সে দেখিল সত্যই ঝড় আসিতেছে। এতক্ষণ যেটাকে সে সন্ধ্যা বলিয়া মনে করিতেছিল, সেটা কাল-বৈশাখীর অকাল ছায়া মাত্র।

আকাশ একেবারে কষ্টি পাথরের রঙ ধরিয়াছে, তাহার উপর কয়লার জমাট ধোঁয়ার মতো রাশ রাশ কালো মেঘ আসিয়া আরো বেশি করিয়া জমা হইতেছে। একদল সাদা বক সেই কালো পটভূমিটার তলা দিয়া সন সন করিয়া উড়িয়া গেল—পলকের জন্য বিদ্যুতের একটা দীর্ঘ সরীসৃপ ধূসর দিগন্তটাকে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া জ্বলিয়া গেল যেন। মনে হইল তেঁতুলিয়ার মোহানা ছাড়াইয়া, চর-কুকুরার দীর্ঘ নারিকেল-বীথিকে ডিঙাইয়া কোন্ একটা রহস্যময় দেশ আছে—সেখানকার সভা-প্রাঙ্গণে কি একটা বিরাট উৎসবের আয়োজন হইল। সেই উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে কে একটা প্রকাণ্ড মৃদঙ্গে ঘা দিয়াছে;—কালো আকাশে তাহার হাতের সোনার বলয়টা ঝিকমিক করিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই একটা গম্ভীর নির্ঘোষ সমস্ত অনুষ্ঠানটারই সূচনা করিয়া দিল।

মণিমোহন বলিল, তাই তো। তা হলে আর দেরী করা যায় না। আমি চললুম।

মেয়েটি কিন্তু তাহার পথ ছাড়িল না: কি করে যাবে? পৌঁছবার আগেই তুমি ঝড়ের মুখে পড়ে যাবে যে।

—তা পড়লেও উপায় নেই। মোটে আমাকে যেতেই হবে—মণিমোহনের কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস লাগিল।

বর্মী মেয়েটির সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া যেন একটা সংকেত ঘনাইয়া আসিতেছিল: এ দেশের ঝড় যে কি তুমি তো তার খবর রাখো না সরকারীবাবু, নইলে—

কথাটা শেষ হইল না। সমুদ্রের ওপারে সেই যে বিরাট জলসাটা বসিয়াছিল, সেখানে যাহাদের নাচিবার কথা ছিল তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। একটা দমকা ঝাপটায় পিছনের সমস্ত বাগানটা তারস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল—অনেকগুলি পায়ের নূপুরের ঝঙ্কার আকাশ-কাঁপানো একটা শাঁ শাঁ শব্দ করিয়া সম্মুখে বহিয়া গেল। একরাশ ধুলা-বালি ও শুকনা পাতা আসিয়া চোখে-মুখে উড়িয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য ধুলার একটা ঘূর্ণমান আবরণ ছাড়া সামনে আর কিছুই রহিল না।

মা-হ্ন মণিমোহনের হাত ধরিয়া ঘরের ভিতরে টানিয়া আনিল। খোলা জানলা দিয়া ঝাপটায় ঝাপটায় বাঁশের পাতা আসিয়া পড়িতেছে, পাল্লা দুইটাকে ক্রমাগত আছড়াইতেছে। মা-হ্ন জানলাটাকে বন্ধ করিয়া দিতে না দিতেই বার কয়েক দপ-দপ করিয়া ঘরের লন্ঠনটা নিবিয়া গেল।

এমনই করিয়া ঝড় আসাটা পশ্চিম বঙ্গের ছেলের জীবনে অভিনব, তাই মণিমোহন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল—মুখ দিয়া তাহার অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ বাহির হইল শুধু।

পরক্ষণেই সে অনুভব করিল, তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া কোমল-দেহের একটা অত্যন্ত কঠিন বন্ধন আসিয়া পড়িয়াছে। সেই অপরিচিত সুগন্ধিটার গন্ধ যেন ক্লোরোফর্মে রূপান্তরিত হইয়া তাহার স্নায়ুগুলির উপরে কাজ করিতে চায়।

চকিত হইয়া সে নিজেকে সেই বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া নিতে চাহিল—তাহার মনের সামনে বাণীর মুখখানা সিনেমার ছবির মতো আসিয়া দেখা দিতেছে। শরীরের প্রত্যেকটি রোমকূপে যেন অসহ্য অনুভূতি উগ্র হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু ছাড়াইতে চাহিলেও সে ছাড়াইতে পারিল না। বাহিরের সমস্ত গর্জনের মধ্য দিয়াও সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল: এখন তুমি আমার—আমার। জোর করে আমাকে ছাড়াতে পারবে, কিন্তু আমার কোমরের ছোরাখানাকে ছাড়াতে পারবে না।

ভয়ে তাহার সমস্ত দেহ হিম হইয়া গেল।

ইহাদের প্রেম ভালোবাসা নয়। আগুন জ্বলিয়াছে। এ আগুনে জ্বলিয়া সুখ আছে কিনা কে জানে, কিন্তু অন্ধকারে মণিমোহন স্পষ্ট একখানা ঝলমলে ছোরা যেন চোখের সামনেই দেখিতে পাইতেছিল।

বাহিরে তখন প্রবল ঝড়ের গর্জন চলিতেছিল। মণিমোহন ভীত-কম্পিত চরণে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

* * * *

দরজাটা এমন ভাবে প্রবল একটা শব্দ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল যে তাহার আঘাতে সমস্ত ঘরখানাই কাঁপিয়া উঠিল। খড়খড়াটা

হইতে খানিকটা ছাট উড়িয়া আসিয়া বলরামের মুখের উপরে ছড়াইয়া পড়িল এবং দেওয়ালের গায়ে ছবি খট্ খট্ করিয়া ঘরের ওপাশে উড়িয়া চলিয়া গেল! গ্রুপ ফটোগ্রাফ্‌খানা হঠাৎ বাতাসের ধাক্কায় ঝন্ ঝন্ করিয়া দেওয়াল-ঘড়িটার উপরে পড়িল, এবং পরক্ষণে চারিদিকে রাশি রাশি কাঁচ ছাড়া কিছু আর দেখিবার রহিল না।

বলরাম চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রচণ্ড ঝড় সুরু হইয়াছে। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, রামনাথ—রামনাথ?

কিন্তু কোথায় রামনাথ? বিকালে সে আড্ডা দিতে গিয়াছিল, ইহার মধ্যে সেখান হইতে ফিরিতে পারে নাই নিশ্চয়ই। ফিরিলে অন্তত দু' একবার তাহার চেহারাটা চোখে পড়িত।

দরজা-জানালাগুলি শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিয়া বলরাম বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। ঝড়ের গতিটা আজ ভালো নয়—বছরে প্রথম কাল-বৈশাখী উঠিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় তাহার সংঘাতটা এমন প্রচণ্ড!

—মুক্তো, মুক্তো?

মুক্তোর সাড়া আসিল না।

তিন চারদিন হইতেই মুক্তোর যেন কি হইয়াছে। ভালো করিয়া কথা বলে না সে। এমন কি ময়ূর-কণ্ঠী রঙের শাড়ীখানা দেখিয়াও সে খুশি হইয়াছে কিনা বোঝা কঠিন। এমনিতেই বলরাম তাহাকে ভালো করিয়া বুঝিতে পারেন না, তার উপর কয়দিন হইতেই ব্যবহারটা তাহার পুরোপুরি দুর্বোধ্য ঠেকিতেছে।

কিছু একটা অসুখ-বিসুখও করিতে পারে। সেদিন তাহার এত সাধের বোয়াল মাছ কিনিয়া আনা হইয়াছিল কিন্তু সে খায় নাই। পাতে ফেলিয়াই উঠিয়া গেছে। কিন্তু অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও বলরাম কোনো উত্তর পান নাই—মুক্তো যেন তাঁহাকে এড়াইয়া চলে আজকাল।

ঝড়ের গতিটা ক্রমেই বাড়িতেছে—মুক্তোর খবরটা একবার লওয়া দরকার! হয় তো জানলাটা খুলিয়াই বসিয়া আছে সে। ঝড়ের মুখে জোরালো বৃষ্টির ছাট আসিতেছে—সব ভিজিয়া যাইবে যে।

—মুক্তো, মুক্তো?

বলরাম মুক্তোর ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

অনুমান মিথ্যা নয়। জানালাটা খোলাই আছে বটে। বাহিরে অন্ধকার দুর্যোগের দিকে সে চোখ মেলিয়া বসিয়া আছে—থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুতের একটা প্রখর আলোয় তাহার বিষণ্ণ মুখখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

বলরাম ডাকিলেন, মুক্তো?

মুক্তো উত্তর দিল না।

—মুক্তো, মুক্তো, তোমার কি হয়েছে?

মুক্তো এইবার তাঁহার দিকে চাহিল। অজস্র জল আসিয়া তাহার সমস্ত মুখটা ভাসিয়া গেছে, চুলগুলি গালের দুই পাশে আসিয়া লেপ্‌টাইয়া আছে। তাহার মুখ বাহিয়া যে জল পড়িতেছে, মনে হইল তাহার সঙ্গে চোখের জলও যেন মিশিয়া রহিয়াছে।

বলরাম চকিত কণ্ঠে কহিলেন: কেন এমন তুমি এমন জানালা খুলে ব'সে আছো? বাইরে সাংঘাতিক ঝড় চলেছে—তা ছাড়া এ ভাবে ভিজলে অসুখ করবে যে। জানালাটা বন্ধ করে দাও শিগ্‌গির।

কিন্তু মুক্তো জানালা বন্ধ করিল না—কোনও উত্তরও দিল না। যেন কথাটা সে কানে শুনিতেই পায় নাই। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অদ্ভুত ও অপরিচিত ভয়ের অনুভূতি আসিয়া তাঁহার মনকে অভিভূত করিয়া দিল।

দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলরাম মুক্তোকে স্পর্শ করিলেন।

—কি হয়েছে তোমার? কথা বলছ না যে? মুক্তো?

একটা ঝট্‌কা মারিয়া মুক্তো সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ দুইটি জলে টলটল করিতেছে, এবার সে দুটি হইতে যেন আগুন ছিট্‌কিয়া বাহির হইতে লাগিল।

অস্বাভাবিক একটা চীৎকার করিয়া উঠিল সে। শুনিয়া বলরাম যেন কাঠ হইয়া গেলেন।—কেন, কেন তুমি এমন করলে? এমন করবার কি অধিকার ছিল তোমার?

জড়িত স্বরে বলরাম আবার নির্বোধের মতো শুধাইলেন, কি হয়েছে?

—কি হয়েছে? এখনো তুমি জানতে চাও? তুমি না চিকিৎসক? আমার দিকে চেয়েও কি বুঝতে পারছ না কি হয়েছে? এখন আমি কি করব—কোথায় যাব?

ইহার পরেও না বুঝিবার মতো নির্বুদ্ধিতা বলরামের ছিল না।

তিনি তো কাঠ হইয়াই ছিলেন, এইবার যেন পাথর হইয়া গেলেন।

জানালা দিয়া বিদ্যুতের আর এক ঝলক আলো আসিয়া মুক্তোর সর্বাঙ্গ উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া গেল। বলরাম যেন স্পষ্ট দেখিলেন, আসন্ন মাতৃত্বের স্নিগ্ধ কোমল একটা শ্রী-সম্পাতে সে যেন অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিশীর্ণ মুখ, তাহার মলিন চক্ষু এবং পূর্বের ব্যবহারগুলি—সব কিছু মিলাইয়া বলরামের মনে কোথাও সন্দেহের আভাসমাত্র আর অবশিষ্ট রহিল না। বিস্ময়ে ভয়ে যেন মূঢ় হইয়া গেলেন তিনি।

চর ইস্মাইলের নোনা মাটিতে ফসল ফলিতে সুরু হইয়াছে। ঝড়ের প্রচণ্ড দাপাদাপির সঙ্গে সে সত্যটা বলরামের হৃৎপিণ্ডের রক্ত ধারায় তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে লাগিল।

• • •

সন্ধ্যার আগে হইতেই জোহান এই জায়গাটিতে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। চরের দক্ষিণ-দিকে যেখানে পর্তুগীজদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষটা একটু একটু করিয়া তেঁতুলিয়ার জলে লোপ পাইবার উপক্রম করিতেছে, আর খানিকটা খাড়া পাড়ের ভাঙা গা বাহিয়া রাশি রাশি ঘাসের শিকড় ঝুলিতেছে, সেইখানে একটা গাছের ছায়াতেই সে অপেক্ষা করিতেছিল। লিসি এখানে আসিবে। সন্ধ্যাটা আর একটু ঘন হইয়া পড়িলে নিশ্চয় আসিয়া পড়িবে সে—এই রকমই কথা আছে।

জায়গাটা পুরোপুরি নিরিবিলি এবং নির্জন। নীচে একটা গাছের সঙ্গে একখানা এক দাঁড়ের ছোট ডিঙি সে বাঁধিয়া

বাঁধিয়াছে। সেইখানা তাড়াতাড়ি বাহিয়া গেলে তিন চার ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমের চরে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে তাহারা। সেখানে বন্দোবস্ত সবই আছে, তার পর একখানা বড় নৌকা লইয়া সোজা চাঁদপুরের পথে। ওখান হইতে রেলে চাপিয়া চিদাম্বরম্ তিনদিনের পথ।

ডি-সুজা অবশ্য টের পাইবে রাতারাতিই। কিন্তু সে টের পাইলে তো বড় বহিয়া গেল। হৈ চৈ সে করিবে না, করিয়া লাভও নাই। জোহানের হাতেই ডি-সুজার মামলাটা রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলে সে যে কোনো সময়েই তাহাকে নাজেহাল করিতে পারে।

জোহান স্বপ্ন দেখিতেছিল। লিসিকে লইয়া ঘর বাঁধিবে সে। রেলে যদি চাকরী পায়, তবে তো কথাই নাই। লাল-ইটের ছোট্ট একটি কোয়ার্টার। বাইরে একফালি সবজীর বাগান, একটা ছোট মুরগীর খোঁয়াড়। সারাদিন এঞ্জিন চালাইয়া সে যখন কালি-ঝুলি মাখা দেহ লইয়া ঘরে ফিরিবে, সঙ্গে সঙ্গে লিসি গরম জল আনিয়া হাজির করিয়া দিবে। চায়ের সরঞ্জাম লইয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিবে। দুই জনের হাসিতে আনন্দে চমৎকার কাটিয়া যাইবে দিনগুলি।

কিন্তু গঞ্জালেস?

গঞ্জালেসের কথা ভাবিতেই মাথা গরম হইয়া গেল জোহানের। চেহারা একটু বেশি কটা বলিয়াই কি সে এত প্রিয়পাত্র নাকি? গঞ্জালেসের চাইতে সেই বা এমন কমটা কিসের? তাহার দেহেও তো পর্তুগীজের রক্তই বহিতেছে।

কিন্তু লিসি এখনো আসিতেছে না কেন? জোহান চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, এই তো তাহার আসিবার সময়। তা ছাড়া—

চকিতে তাহার চোখে পড়িল—কিসের একটা প্রত্যাশায় তেঁতুলিয়ার জল যেন থমথম করিতেছে। এত ধীরে ধীরে স্রোত বহিয়া চলিতেছে যে হঠাৎ দেখিলে মনে হইতে পারে নদীর বুঝি কোনো গতি নাই। দু পাশের গাছ-পালাগুলি যেন ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে।

ঝড় আসিতেছে।

লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে—এ সাধারণ ঝড় নয়। মেঘের কালো স্তূপটাকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া বিদ্যুতের শিখাটা অনবরত লক লক করিয়া উঠিতেছে। সঙ্কেতটা অশুভ।

কিন্তু লিসি!

লিসি কি প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে ঠকাইলই শুধু, আসিল না?

—জোহান!

ঠিক সেই মুহূর্তেই লিসি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জোহান আগ্রহভরে তাহাকে কাছে টানিয়া লইতে চাহিল, তুমি এসেছ?

—হাঁ, এসেছি। কিন্তু যাবে কি করে! ঝড় আসছে যে!

আর ত দেরী করা যায় না লিসি। এখানে এমন ভাবে এখনো পড়ে থাকা যায় না। চলো ডিঙি ছেড়ে দিই—তারপর—

কিন্তু তারপরে যে কি হইবে সেটা জোহান আর শেষ করিতে পারিল না।

পিছন হইতে নামানো একটা দায়ের কোপ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জোহানের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল এবং জোহান সেটাকে ভালো করিয়া টের পাইতে না পাইতেই তাহার মাথাটা ছিটকিয়া তিনহাত দূরে চলিয়া গেল।

লিসি আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মুহূর্তে তাহার সমস্ত মুখখানা রক্তহীন ও শাদা হইয়া গেছে। অস্বাভাবিকভাবে চিৎকার করিয়া সে বলিল, একি হল?

বর্গিটা হাসিতেছিল।

লিসি বলিল, কিন্তু এমন তো কথা ছিল না।

সে বলিল, না। কিন্তু দরকার ছিল।

লিসি জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

তখন চারদিক কাঁপাইয়া প্রলয় ঝড় শুরু হইয়া গেছে। হাজার হাজার ফণা তুলিয়া তেঁতুলিয়ার জল ডাঙা পাড়ের উপর আসিয়া ছোবল মারিতেছে—চর ইস্মাইলের নারিকেল আর সুপারীর বন দিক দিগন্তব্যাপী এই উৎসবের বিরাট আয়োজনে যোগ দিয়াছে। দক্ষিণ হইতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ ঝোড়ো বাতাসকে থর্ থর্ করিয়া কাঁপাইয়া দিয়া ভাসিয়া গেল—বরিশাল গান গর্জন করিতেছে।

* * * *

লিসি যখন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল—তখন কালো অন্ধকারে ঝোড়ো নদীর উপর পাল তুলিয়া বর্গিদের বজরা উড়িয়া চলিয়াছে।

মাথার উপর একটা কালো লণ্ঠনের আলো বজরার সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে। লিসি চোখ মেলিয়া ডাকিল, ঠাকুর্দা!

বর্গিটি হাসিল।

—তোমার ঠাকুর্দাকে জোহানের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছি। সে বেঁচে থাকলে আমরা সবাই ধরা পড়তুম। চর ইস্মাইলের ব্যবসা আমরা তুলে দিলুম।

—আর আমি? আমি?

লিসি প্রাণপণে উঠিয়া বসার চেষ্টা করিল।

—গঞ্জালেস্ যা করত তাই করেছি। আমরাও তো বীরপুরুষ—কাজেই তোমাকে বোটে তুলে নিয়ে এলাম। ভালো করিনি?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লিসির জগৎ ক্রমশঃ বিন্দুবৎ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ফুলিয়া উঠিয়াছে বজরার পাল। নদীর কালো জল বিদ্যুতের আলোয় যেন সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ দাঁত মেলিয়া নিষ্ঠুরভাবে অট্টহাসি করিতেছে। তিন শতাব্দী আগে বড় বড় কামান লইয়া হার্মাদদের বোম্বেটে জাহাজ বঙ্গোপসাগরের নোনা-মোহনায় যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিল, তাহার জের আজও মিটিয়া যায় নাই। দেশ-দেশান্তর কাল-কালান্তর পার হইয়া তাহারি নিঃশব্দ ধারা বহিয়া চলিতেছে। বর্বরতা দিয়া যে জীবনের গোড়াপত্তন হইয়াছে, বর্বরতাতেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে আর একদিন।

কেবল পোষ্ট অফিসের কাচের দরজাটার ফাঁক দিয়া কেরামদী বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। হরিদাস সাহার নৌকা এখন তেঁতুলিয়ায় পাড়ি জমাইতেছে। এই বাতাসের ঝাপটায় সে নৌকা ও-পারে পৌঁছিবে কিনা কে জানে।

হয়তো পৌঁছিবে না। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! যখন যেখানে স্বপ্নের তপস্যায় ধ্যান করিতে বসে নাই—সেখানে সে মুক্ত-জটা উড়াইয়া তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে; যেখানে বস্তুহীন শূন্য স্বপ্নছবিকে তীব্র প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে আহুতি দিয়া প্রখর বহ্নি-শিখায় কামনার যজ্ঞ চলিতেছে—সেখানে সামঞ্জস্যই সব চেয়ে বড় কথা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্বপ্ন লইয়া পৃথিবী যেখানে নতুন করিয়া মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিতে চায়—সেখানে পাওয়া কিংবা হারানো সব সমান হইয়া গেছে।

উপনিষদের নবীন যৌবন এমনি করিয়াই পূর্ণতার—প্রবীণতার পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

আধুনিক সাহিত্যরস

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

নূতন শতাব্দী যে একটি অপূর্ব ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত সৃষ্টি করে' অতীতের সমগ্র আয়োজনকে জলাঞ্জলি দেবে একথা কেউ কল্পনা করেনি। ইউরোপীয় সাহিত্য ক্রমশঃ ভেঙে চুরে' গেল এক নব্য আন্দোলনের পাকচক্রে। সমুদ্র বেলায় উদ্দিষ্ট বারিতরঙ্গ যেমন বার বার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে' সব কূল ভাসিয়ে দেয়, তেমনি আধুনিক সাহিত্যও যে মনোজগৎকে বিধ্বস্ত করছে এবং যে অচিন্তিত আকস্মিক শক্তিকে বার বার প্রকাশ করছে তা তরঙ্গতাণ্ডবের মত বিস্ময়কর। সেকালের সকল সম্পদ তা'তে জলময় হয়ে গেছে।

এ প্রলয়পয়োধি জলে প্রাচীনেরাও যে আত্মসমর্পণ করেনি তা' নয়। ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্যিকরা নূতন যুগের আবেষ্টনেও নিজেদের কেউ কেউ আত্মরক্ষা করেছেন। বস্তুতঃ পূর্ব হ'তেই এ পরিবর্তনে ছায়া এসেছিল। কবিবর Yeats এই নূতনত্বের উর্মিভঙ্গেই বহুকাল চলে আসেন। রাজকবি John Masefield নিজের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করেন। "A consecration" কবিতায় এর প্রমাণ আছে। তিনি রাজকবি হয়েও বলেছেন :—

"Not the ruler for me but the ranker,
the tramp of the road
The slave with sack on his shoulders
pricked on with the goad
The man with too weighty a burden
too weary a load
The sailor, the stoker of steamers,
the man with the cloud.—"

ধনিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক যে বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে তা' কবিকেও লক্ষ্যচ্যুত করেছে সন্দেহ নেই।

সাহিত্যের এই বিপ্লবের দু'টি দিক স্পষ্টই চোখে পড়ে। এক দিকে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সংঘাতের ফলে জাগ্রত মহাযুদ্ধ—যা সকল পক্ষকে মথিত করে' ইউরোপকে মহাকালের রুদ্র শ্মশানে উপস্থিত করে; অন্য দিকে এল বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাতীত বিজ্ঞানের বিপ্লব—যা অতীত শতাব্দীর সমগ্র প্রতীতি ও অবলম্বন ধূলিসাৎ করে। নাগরাজের ফণার প্রান্তে নিযুক্ত যে সত্যের শীর্ষে ইউরোপ আত্মহারা হয়ে নৃত্য করেছে—সে সত্য আজ কুজ্ঝটিকায় পরিণত হয়েছে। তার সকল সিদ্ধান্তই হয়ে গেছে অপ্রচুর ও অসংলগ্ন। ইউরোপের চিত্ত আজ কোথায় আশ্রয় খুঁজবে? Theory of Relativity দেশকালের সমগ্র সংস্কার ধ্বংস করেছে। যে বহিরঙ্গ 'বাস্তবতা' ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি সে সম্বন্ধে সমস্ত ধারণা বিপর্য্যস্ত হয়েছে। ইদানীং Radium ও X-ray এক অজানা অপরিচিত লোকের বার্ত্তা উদ্ঘাটিত করেছে এবং জড়বস্তুকে স্বচ্ছ করে' তার ভিতরকার আনবিক ক্ষয় ও পুষ্টির নূতন তথ্য চোখে ফেলেছে। ওদিকে আনবিক সংস্কারকেও গতিমূলক বলে' সমগ্র বিশ্বকেই এক উদ্ভব ও চলন্ত বস্তুর রূপ দেওয়া হয়েছে। যা চোখে পড়েনি কখনও—তাই চোখে পড়ল। একেই বলা হয়েছে ..."the insight into a new interiority"। যখন বিজ্ঞান মনে করেছে জ্ঞানের শেষ সীমান্তে মানুষ এসেছে—তখনই দেখা গেল জ্ঞানের উপায়গুলি দেখা যায় নি। বুদ্ধির সাহায্যে কূল পাওয়া যায় না এ প্রতীতি দার্শনিক Bergson ঘনীভূত করলেন। ফলে সমগ্র সাধনার পরম্পরা anti-intellectual হয়ে পড়ল। সাহিত্যে আধুনিক Dada movement এই বুদ্ধিবাদের প্রতিবাদ। Dada দলের কবি বলেন :—"We write without taking into account the meaning of words." এ অবস্থায় ইউরোপীয় সাহিত্য ছুটল, জগতের বহিরঙ্গ সত্যপ্রকাশে নয়—অন্তরঙ্গ সত্য প্রতিপাদনে। জার্মাণীর Expressionist সাহিত্যের অন্যতম নেতা Kasimir Edschmid বলেন: "The world is there. It would be absurd to reproduce it. The greatest task is to search out its intrinsic essence and create it anew."

এক দিকে বাহির ভেঙে পড়ল অদ্ভুত দুর্বিপাকে—অন্যদিকে ভিতর্ শতখণ্ড হয়ে গেল নূতনত্বের সন্ধান প্রচারে। এ অবস্থায় পুরাতনকে নিয়ে চর্ব্বিত চর্ব্বণ সম্ভব হ'ল না। মৃত্যুর নিপুণ শিল্প অজানার ললাটে নূতন বার্ত্তা লিখে গেল।

এ বাস্তব প্রকাশ পেল ইউরোপের আধুনিক সাহিত্যে—যা সমগ্র জগতে আজ বিস্ময়ের মত ব্যাপ্ত হয়েছে। এ সাহিত্যের লৌকিকতার সমাবেশ এবং সমস্ত পুরাতন সংস্কার বর্জন করে' মহাযুদ্ধের আয়োজনের ভিতরেই উহার কবিতা প্রণীত হয়েছে। টেনিসনের আবেগ, সুইনবার্ণের অবসন্ন ঔদাসীন্য, রসেটির রসপ্রদীপ, এক সময় ভিক্টোরীয় যুগের বড় ক্ষীণ হয়ে পড়ে। সমসাময়িক Whitmanএর প্রবর্তিত বাস্তবের বৈচিত্র্য আবিষ্কার করে তা'ও ভবিষ্যযুগের উদ্দাম বিস্ফোরণের তুলনায় অতি সামান্য বিবর্তন মাত্র। ফরাসী সাহিত্যের Decadent যুগ, উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমে ইংলণ্ডে উপস্থিত করে এক সৌন্দর্য বিপ্লব। প্রকৃতি বড় না আর্ট বড় ? এ প্রশ্নের উত্তরে Oscar wilde আর্টের কণ্ঠেই জয়মাল্য দান করে। নাগরিক সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। Arthur Symons এই আন্দোলনকে classicও বলতে চান নি—romanticও বলতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলেন: "If what we call the classic is indeed the supreme art then this representative literature of to-day, interesting, beautiful, novel as it is, is really a new and beautiful and interesting disease."

এই সাহিত্য নাগরিক বিলাসিতায় মণ্ডিত হয়ে সাহিত্যাকাশে এক নূতন কাব্যবল্লরী সৃষ্টি করে। W. E. Henley 'নগর প্রশস্তি'তে বলেছে :—

"Trafalgar Square.
The fountains volleying golden glaze
Gleams like an angel market. High aloft
Over his couchant Lions in a haze
Shimmering and bland and soft
Our sailor takes the golden gaze
Of the saluting sun..."

[London Voluntaries]

এই ভাবধারায় সৌন্দর্যের সোনার ছবিদের পেছনে সকলে ছোটেনি। Francis Thompson প্রমুখ কবিও এই শতাব্দীর শেষেই অন্য পথে নিজের কাব্য প্রতিভা দেখিয়েছে। Celtic সাহিত্যের মুকুটমণি W. Yeats ও A. E. রহস্যবাদের অদ্ভুত মরীচিকা রচনা করে' সকলকে মুগ্ধ করেছে। সমসাময়িক সাহিত্যে Kiplingও নিয়ে এসেছিল প্রাচীন ইংলণ্ডের traditionalism, যা' সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

এক দিকে উদ্দাম সৌন্দর্যপিপাসুদের এই অসংযত সাধকতা—অন্যদিকে Francis Thompsonএর ধ্যানময় আত্মবিস্মৃতি—এ দুটিই নূতন প্রগতির অপূর্ব পাথেয় হয়ে পড়ে। এক দিকে দেখা গেল প্রত্যক্ষের দিকে অপ্রত্যক্ষের দুর্বার টান—অন্যদিকে অপ্রত্যক্ষের উদ্দেশে প্রত্যক্ষের অপূর্ব আত্মসমর্পণ! চিত্তের এই অঘটনঘটনপটু উৎসাহ সকল যুগে সম্ভব হয় নি; Laurence Binyon লণ্ডন সম্বন্ধে একটি কবিতায় নগরটিকে একটি অবাস্তব স্বপ্নে পরিণত করেছে :—

"All is unreal; the sound of the falling of feet
Coming figures and far off hum of the street
A dream, the gliding hurry, the endless lights
Houses and sky—a dream, a dream!"

[London visions]

অপর দিকে Francis Thompson বলছেন :—

"I laughed in the morning eyes
I triumphed and I saddened with all weather
Heaven and I wept together
And its sweet tears were salt with
mortal mine"

[The hound of heaven]

ইংলণ্ডের ভাবধারায় এমনি করে স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রভাব এক নূতন যুগের বিরহ বেদনাকে যেন ফেনিল করে তোলে নূতন ঐশ্বর্যে। নানা বিরোধের পুঞ্জীভূত প্রাচুর্য উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমকে অপূর্বভাবে চুম্বিত করেছে। Yeatsও এ সত্য অনুভব করেছে প্রচ্ছন্নভাবে :—

"We were the last romantics chose for theme.
Traditional sanctity and loveliness
But all is changed—that high horse
riderless!"

[Coole and Ballylee]

Hardyও এ অবস্থায় একক হয়ে পড়ল।—"Hardy lived entrenched behind in his sombre defences enduring the seige perilous"। সুইনবার্ণ ও আত্মসংবরণ করে নিজের ভিতরকার প্রেরণাকে নিজের ভিতর টেনে নিল। যুদ্ধোত্তর ইউরোপ নূতন নিবৃত্তিতে নিজকে মণ্ডিত করে। সুইনবার্ণ সম্বন্ধে কোন লেখক বলেছেন: "From now on, renunciation, rejection, escape are the commonest attributes of the poet."

ইংলণ্ডের সাহিত্য ১৯১১ সালে "Rhythm" কাগজ কর্তৃক সামান্য ভাবে প্রভাবিত হয় নি। R. Aldington ও T. S. Eliot এর পরে "Egoist" কাগজ বাহির করে' সমগ্র কাব্যের রূপপরম্পরাতে এক গভীর বিপ্লব উপস্থিত করে। এ কাগজই সাহিত্যে "Imagist আন্দোলন" সুরু করে। এ চক্রে T. E. Hulme [১৯১৭ সালে মহাযুদ্ধে নিহত হয়], Ezra Pound, Hilda Dolittle প্রভৃতি সুপরিচিত কবিগণ একযোগে কাজ করেছে।

এসব কবিরা জাপানী Tanka ও hokkv কবিতার ভঙ্গী গ্রহণ করে। এ ধরনের কবিতায় আছে অসম ছন্দ [vers lebre], কাজেই এক লাইন অন্য লাইনের দৈর্ঘ্যকে সহজেই মুক্ত করেছে। যা খুসি তা করা হয়েছে এক একটি লাইনের পরিমাপকে। কবিতাকে করা হয়েছে ছোট এবং একে বলা হয়েছে "tightening of the bolt"। বিষয় বস্তুকেও অর্থহীন করা হয়েছে। এসব কবিতাকে ইচ্ছা করেই অর্থহীন করা হয়েছে। এদের কোন

মানে নেই—আছে ভাসমান লীলা-লালিত্য [surface art]। যাতে করে' ইন্দ্রিয়কে চট্ করে মুগ্ধ করতে পারে বাক্যের লঘু ও সুপটু বয়ন—কিন্তু এসব কবিতার লক্ষ্যই হল তাই।

কিন্তু জাপানী টঙ্কা কবিতা ঠিক এ রকম নয়। জাপানী কবিতা symbolic গূঢ় ও গভীর অর্থযুক্ত। ইউরোপ একে অনুকরণ করল উদ্‌ভ্রান্ত পথে। একটি মূল জাপানী কবিতা উদ্ধৃত করলে একথা স্পষ্ট হবে। কবি Saigyo Hoshiর একটি কবিতার অনুবাদ এখানে দিই :—

"Since I am convinced
That reality is in no way
Real
How am I to admit
That dreams are dreams?"

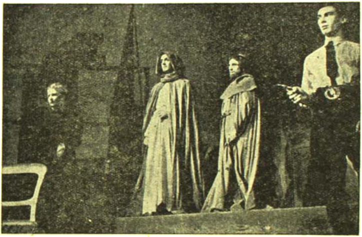

'দি টাইম চায়ন্‌ল্ রেড' নাটকের একটি দৃশ্য

Helda Dotelttle-এর একটি কবিতা উদ্ধৃত করি। এ কবিতায় ভঙ্গী ও প্রতিপাদ্য ভাষায় রূপক বা প্রচ্ছন্ন রস নেই—

"Apples on the small trees
Are hard
Too small
Too late ripened
By a desperate sun
That struggles through sea mists"

Ezra Pound-এর কবিতা চটুলতায় মুখর :—

"Tree you are
moss you are
you are violets with wind above them
A child—so high you are
And all this is folly to the world"
[Repostes]

একই তালে লিখা। এ কবি ১৯১৪ সালে Imagoist চক্র ত্যাগ করে।

মহাযুদ্ধোত্তর সাহিত্য ক্রমশঃ একেবারে রূপান্তরিত হয়। জীবনের ভাব ভাষা ছন্দ প্রকৃতি একেবারে অভিনব হয়ে পড়ে। সকল দেশের যুবকদের এক অভিনব দ্যূতযজ্ঞে আহুতি দিতে হয়। দিনের পর দিন মাটি খুঁড়ে trench-এর ভিতর কালযাপন করা—অজানা শত্রুর সহিত অহর্নিশ লড়াই করা নিয়ে আসে চিত্তের এক অভাবনীয় বর্বরতা। ইউরোপের যুব শক্তি এরকম জীবনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। মৃত্যুর লেলিহ জিহ্বা অহরহ এসব তরুণদের মন গলিত ও ছিন্ন করে'—সভ্যতার বিষাক্ত পানপাত্রকে সকলের সামনে ধরে। "All is quiet on the western front" ছিল একটা কথার কথা মাত্র। এই তথাকথিত প্রশান্ততার অন্তরালে ছিল সমরক্ষেত্রের ভিতর লুকান বড়িঝালা। জীবন্ত কবরকে দেশপ্রেমের পাহিরে বাড়িয়েও কেউ সান্ত্বনা পায় নি।

সকল শিবিরেই ক্রমশঃ তরুণদের নামধামও মুছে গেল—এক একটি চাকতিতে নম্বর দিয়ে (identification card) তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হল—যেন তারা খুঁটী মাত্র, নাম-ধামহীন। সকলকে এমনিভাবে 'depersonalised' বা ব্যক্তিত্বহীন করা হল। সবারেও এক রকমের পোষাক [Uniform] পরিয়ে সকলকে বৈশিষ্ট্যহীন করতে ইতস্ততঃ করা হয়নি। ট্রেঞ্চের (trench) ও হাসপাতালের identification disc—পরিচয়ের চাকতি ও যুদ্ধের unemployment cards একসঙ্গে এক নিঃশ্বাসে মানুষকে অমানুষ করে ফেলে। এ আবেষ্টনে যে কাব্য সাহিত্য জন্মায় তাও কি কখনও আরাম কেদারায় রচিত সাহিত্যের স্বর্ণ ও আস্বাদ পেতে পারে?

কাজেই যুদ্ধের কবিতায় নূতন ব্যঞ্জনা ও নূতন বক্রোক্তি এসে পড়ে। পাদরীরা বক্তৃতায় বলতে সুরু করে, যুবকেরা যুদ্ধের যজ্ঞ হ'তে ফিরে অপরূপভাবে পরিবর্তিত হবে! এ কথাকে বিদ্রূপ করে' Siegfried sassoon বললে :—

'We are none of us the same...
For George lost both his legs and Bell's stone blind
you will not find
A chap who has served that has not found
some change.

এ উত্তর যুদ্ধোত্তর যুগের তরুণদের যোগ্য বটে। Wilfred Owen-এর কবিতাকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যুদ্ধের কবিতা বলা হয়। এ

কবিতায় লঘু দেশহিতৈষণার কথা নেই। প্রশ্ন হল দেশ কার এবং কোথা? সব ব্যাপারই একটা প্রচ্ছন্ন সামাজিক নিষ্পেষণ মাত্র। Wilfred Owen যুদ্ধের ভিতরকার করুণ রসকেই প্রাধান্য দিয়েছে: "my subject is war and the pity of war. The poetry is in the pity": Owen যুদ্ধে মৃত যুবকদের জন্য গির্জার ঘণ্টাধ্বনিকেও পরিহাস মনে করে।

"What passing bells for those who die as cattle?
Anthem for doomed youth.

যুদ্ধের রক্তাক্ত বাস্তবতার ছবি এঁকে এরূপ উক্তির সার্থকতা কবি দেখিয়েছেন :—

"The blood
came gurgling from the froth corrupted lungs
Bitter in the end."

W. W. Gibsonএর কবিতা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে :—

"This blood steel
Has killed a man
I heard him squeal
As on I ran."

এ যেন পশুর কাতরোক্তি—মানুষের নয়। সব যেন একটা বর্বর মৃগয়া মানুষ হত্যার। এর ভিতর অন্য কোন দোহাই চলে না।

ইগ্নাজিও সিলোন

অপরদিকে Julien Grenfell যুদ্ধের ভিতর বীভৎস ও কুৎসিত ইতরতা মাত্র দেখেনি—এর ভিতর কোথাও বা পরম শান্তিও প্রত্যক্ষ করেছে। কোন আলোচক বলেন :—Death to him was a rest to which he would go confidently as men go each night to bed" তজ্জন্যে মৃত্যুর আবেষ্টনও অবসন্ন করতে পারে না সব সময়। এ হ'ল কবির অনুভূতি।

"The thundering ltne of battle stands
And in the air death moans and sings
But day shall clas him with strong hands
And night shall fold him in soft wings"
[Into Battle]

এ কবির :—

"The great red eyes
They burn me through and through
They glare upon me all night long
They never sleep
[The furnace]

এমন একটা দুঃসহ আতঙ্ক মনোজগতের পক্ষেও পূর্ণ, যা' ফ্রয়েডেরও ভীতিজনক। বস্তুতঃ এই যুগটিই একটা অজানা হাহাকার, একটা অন্ধ ক্রন্দন ও দুর্ভেদ্য বিভীষিকার আলোড়নে সমগ্র ইউরোপের কম্পমান চিত্তকে আকুল করে তোলে।

এ অবস্থায় ছন্দ, কবিতায়—"repeat of a pattern" বা পৌনঃপুনিক নক্সার সম্ভব হয় না। ভীতি, জিঘাংসা বা হত্যার অনুভূতি আলঙ্কারিক গালিচার-মত হিসাব কেতায় দোরস্ত, পারিপাট্যে কল্পিত হয় না। সব ভাঙা-চোরা, এলোমেলো, ওলটপালট—কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের ছড়ান পত্রপুষ্পের বিস্তৃত শৃঙ্খলহীনতার রূপ ধারণ করে। Osbert sitwell vers liboএর সার্থকতা সম্বন্ধে বলে :—"you can not write in the idiom of the day before yesterday"। দুনিয়ার চিন্তাধারা আজ উদ্বেলিত মত্ততায় আত্মহারা। মত্ততারও একটি অনুরূপ ছন্দ দরকার। বিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক Franz Kafkaর "The castle" সম্বন্ধে "A-Calder marshall এক সময় বলেন :—"It has a logic which is internally coherent but in relation to the known world is madness"। এসব কবিতারও একটি প্রচ্ছন্ন সঙ্গতি আছে—যদিও বাহির থেকে মনে হয় এসব একেবারে পাগলামি বা ভণ্ডামি।

ইউরোপের নব্য কবিতায় অনুপ্রাস আছে—'stone'এর সঙ্গে 'stones'এর সঙ্গত করা হয়েছে। আবার স্বরবর্ণের ধ্বনির মিলকেও কোথাও গ্রহণ করা হয়েছে—যেমন bloodএর সঙ্গে sunএর। কোথাও বা bloodকে cloudএর জুড়িদার করা হয়েছে (Yeats, Owen প্রভৃতির কবিতায়)। punctuation বর্জন, বিরতি (pauses)—এসব নানা রকম নূতন কৌশলে আধুনিক মনের বেতালের একটা সঙ্গতি দেওয়া হয়েছে। Yeats প্রাচীন হলেও এক্ষেত্রে নূতনদেরও কোন কোন বিষয়ে অগ্রণী। এদেশের রবীন্দ্রনাথও অসম ছন্দের বিচিত্র কারিকায় নিজের নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

মহাযুদ্ধে দেশ ভেঙেছে এবং সবচেয়ে বেশী প্রচ্ছন্ন ভাবে ইউরোপের মন ভেঙেছে। কাব্যে ও চিত্রে তা অতি প্রস্ফুটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

নব্য যুগের কৃতির বাইরের এসব কারসাজিতে মাত্র নয়—এদের দৃষ্টিভঙ্গী যেন পক্ষীর মত নিকটের বস্তুকে দূর করেছে ও

অতীতের আচ্ছাদনকে বর্জ্জন করেছে। 'Samuel Butlerএর "The way of the flesh" সাহিত্যে যে নূতন বিপ্লবের প্রবৃত্তি উপস্থিত করে তা ছাড়িয়ে গেছে এ যুগ। বার্ণাড শ'য়ের ভোজবাজি, ইবসেনের বাস্তু হ'তেই প্রেরণা পায়—কিন্তু নব্য সাহিত্যের দানের নিকট এরা হতপ্রভ। বার্ণাড শ'কে Lenin বলেছে: "a good man fallen among the Fabians" John Strachey বলছেন :—"Mr Shaw as he himself told us, had the most passionate desire for success fame, money and power and for the enjoymant of those good things in his lifetime. He has triumphantly secured them and paid as a price his opportunity for immortality." নব্য সাহিত্য সমস্ত বাধা ভেঙে এক নব্য মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের জন্য ব্যগ্র। এযুগের D. H. Lawrence, T. S. Eliot, Stephen Spendor, Auden, Cecil Day. Lewis Louis Macniece, স্পেনের F. G. Lorca প্রভৃতি রুশিয়ার Domin Bednyi ও জার্মাণীর Karl Broger প্রভৃতি কবিদের ভূমিকা একেবারে নূতন রকমের। সমস্ত বাধপ্রতিবাধ অতিক্রম করে এরা গেছে এক নূতন বাস্তবতার সমুদ্র সঙ্গমে। সমগ্র জগতের পক্ষে এই প্রধান সাহিত্যের একটি নূতন অধ্যায়। এক অভিনব নিষ্ঠার ভিতর যেন আবার নব্যতর পথিক শিল্পীর অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাষা মুখর হয়েছে এবং অজস্র বিস্তৃত বিচিত্র রঙীন কাচের তৈরী যবনিকা-পর্য্যায়ের ভিতর দিয়ে যেন নূতন উষার এক উদ্দাম বর্ণকেলি ফলিত হয়েছে। এদের রচনা—পুরাতনের প্রতিবাদ। এদের সম্ভার অপূর্ব্ব এবং আয়োজনও অভিনব। এদের দর্শন মামুলি পরিপ্রেক্ষিতের সমগ্র বাধা হ'তে মুক্ত। এরা যেন উর্দ্ধলোকে কম্পিত চিত্তে হাওয়াই-জাহাজ হ'তে দুনিয়ার স্পন্দন দেখছে এক নিঃশ্বাসে—সব আলো, ছায়া ও কুজ্ঝটিকার আবরণ ঠেলে!

বাইবেলে ছিল "knock and it shall be given to you।" ইদানীং আঘাতের পর আঘাত প্রচণ্ডতম হয়ে উঠেছে। তাতে পাওয়া গেছে কি? সব না হারালে সব কিছু পাওয়া যায় না। ইউরোপের সব দম্ভ চূর্ণ হয়েছে এ অগ্নিপরীক্ষায়। Francis Thompsonএর ভাষায় ইউরোপ দাঁড়িয়েছে আজ একান্তভাবে নগ্ন হয়ে। রুশীয় কবি Demian Bednyi ইউরোপের অশান্ত সুর ধ্বনিত করে বলছে—

"Up up ye people, avenger's of the
world's suffering
Wake up arise, strike dead, strike
Strike them all dead—the malefactors
All those who have stolen our bread."

এ আক্রমণ হ'তে ভগবানও বাদ পড়েন নি :—

"Ye workers, now smash to pulp
With your fists that phantom God
You are the master of the fate of the world."

'দি ডগ্ বিনিথ্ দি স্কিন্' নাটকের একটি দৃশ্য

ঈশ্বর বিরোধী কবিরা স্বর্গ মর্ত্ত্য কোথাও কোন বাধা মানে নি—নিজের প্রগল্ভ জয়যাত্রায়। জড়বাদী রুশ অধ্যায় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেনা অপর দিকে। রুশ-ভক্ত নব্য জার্ম্মাণ সাহিত্যকে আত্মার অভিব্যক্তি মনে করে। নৈতিক চিন্তার ভিত্তিই এই আত্মবাদে। কোন লেখক বলেন—"The German expressionists tried to formulate the inner dissonance of the spirit." একজন রুশীয় লেখক sher shenerich বলেন: "poetry is the art of the combination of words—the word is nothing but an animal cry" ধ্বনির ভিতর যে আত্মার বাসনা থাকতে পারে—এ বিশ্বাস আধুনিক রুশ দার্শনিকদের নেই।

ইউরোপের নব্য সাহিত্যের ক্রম সম্বন্ধে M. Faugel বলেন: "After classicism romanticism, after romanticism realism, after realism symbolism, after symbolism all the isms of the world।"

D. H. Lawrenceএর কবিতার একদিকে আছে sex-mysticism ও cult of bloodএর খাতির—অন্য দিকে এ কবির দরদভরা মানবিকতা একটি উপাদেয় উপহার। দলগত রেষারেষি ও দলগৌরব বর্জ্জন করেও যে সাধারণ জীবনযাত্রায় অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য আছে Lawrence তা' অতি সুন্দরভাবে দেখিয়েছে। অতি সাধারণ বিষয়কেও রসসম্পুটে ভাষাক্রান্ত করতে জানে—এ নূতন কবি।

"I will give you all my keys
you shall be my chamberlain
when I hear you jingling through
All the chambers of my soul
How I sit or laugh at you
In your close house keeping role :"

এই মানবিকতা—নূতন বিপ্লবের ছায়াপাতকে অস্বীকার করে নি :—কবি বলছেন :—

"The old dreams are beautiful,
beloved soft and sure,
But worn out that hide no more
The matter they stand before :"

অতীতকে প্রত্যাখ্যান হল নূতন কবিদের রক্তের বাণী ! T. S. Eliot-এর আমেরিকায় জন্ম। এ কবির The waste land—অপূর্ব রচনা—পরবর্তী অধিকাংশ কবিরই আদর্শ স্থানীয়। যুদ্ধের বর্বরতা, সভ্যতার ক্ষয় শৈথিল্য প্রভৃতির ভিতর এ কবি আশার পথ দেখেনি :—

"Son of man
You cannot say or guess for you know only
A heap of broken images, where the sun beats
And the dead tree gives no shelter, the cricket
no relief"

[The wasteland]

Auden সুপরিচিত কবি। Auden-র জগত neurosis ও hysteria-তে ভরা—চারিদিকে যেন শুধু যুদ্ধের লুকোন ছুরিকার রক্তধার শানিয়ে তুলছে। আধুনিক দুনিয়াটা এরকম—গোয়েন্দা, ছদ্মবেশ ও নানারকমের গুপ্ত আয়োজনে পূর্ণ ! এ কবির Orators গ্রন্থে ভবিষ্যতের ভয়াবহ মূর্ত্তি নানাভাবে ছায়াপাত করেছে। 'Look stranger' কাব্যে ভাষার বয়ন ও মাধুর্য্য সহজে চোখে পড়ে—এসব অস্পষ্ট নেই :—

"Look stranger, at this island now
The leaping light for your delight discovers
Stand stable here
And silent be"

[Look stranger]

লাইনগুলো ধীরে ধীরে যেন একটি মন্দিরের চূড়া রচনা করছে ! বন্ধুর জন্মদিনে Auden জানলা হ'তে রজনীর অন্ধকারে ধূমপান করে দেখছে সমস্ত দুনিয়া ঝুকে' পড়ছে ইতিহাসের ক্রোড়ে ! কয়েকটি লাইন চমৎকার :—

"And all sway forward on the dangerous flood
Of history that never sleeps or dies
And, held one movement, burns the land."

Stephen Spenderএর কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। Auden, Spender ও Day Lewsকে "Pylon চক্র" বলা হয়। নামটি হয় Spenderএর Pylons কবিতা হ'তে। এর রচনা চমৎকার। ভবিষ্যতের ছায়াপথকে বর্ণনা করা হচ্ছে :—

But far above and far as sight endure
Leke whips of anger
with tightening's danger
There runs the quick perspective of time

(The Pylons)

এ কবিও নব্য যুগের উৎসর্গ, ত্যাগ ও আত্মদানের রোমান্সে মুগ্ধ—তাই অতীতের মহাজনদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে অকুণ্ঠ। যদিও তারা প্রাচীনযুগের—তবুও মৃত্যুহীন ছিল তাদের বর্ণ :—

"I thank continually
The names of those who in their lives fought
for life
Who wore at their hearts the fire's centre
Born of the sun, they travelled a short while
towards the sun,
And left the vivid air singed well their honour.

[I think continually]

এ রকম আবহাওয়া উনবিংশ শতাব্দীর আরামপুষ্ট কবিরা সৃষ্টি করতে পারে নি। "সূর্য্য হ'তে জাত"—born of the sun—এ রকম উক্তি প্রাচ্য কাব্যেই সাজে ভাল—ইউরোপীয় কাব্যে নয়। একালের সকল কবিই যুদ্ধের মৃত্যুবরণ নিয়ে তাদের তাজমহল তৈরী করেছে—কেউ বাদ যায় নি :—

এন্‌ডো চন্‌সন্

"Consider : only one bullet in
ten thousand kills a man

Ask ! was so much expenditure justified
on the death of one so young and silly
streched under the olive trees O world, O
death ?

একটি তরুণের নির্মম হত্যায় দশ সহস্র গুলির পাশবপ্রয়োগ কুৎসিৎ নয় কি ?

Cecil Day Lewisএর 'Magnetic mountain' অভিনব কাব্য। কোন আলোচক বলেন, "It is the symbol of the new world to be created" এ নূতন জগৎ জাগছে রক্তাক্ত সাগর মন্থনে—ইউরোপের পক্ষে দ্বিতীয় পথ নেই। প্রতীচ্য বুদ্ধিজীবির নিকট এ প্রতীতি যে কিরূপ মর্মন্তুদ তা কল্পনা করা কঠিন।

"And if our blood alone
will melt this iron earth
Take it. It is well spent
Easing a saviour's birth !"

কবি স্পষ্টভাবে বলছে :—

"It is now or never : the hour of the knife
The break with the past, the major operation"

Macnieceএর কবিতার এক একটি লাইন অনেক সময় অন্য কবির তিন লাইনের সমান। আধুনিক কবিতার সীমান্ত কতটা এগিয়ে যেতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় :—

"So a friend of min-cemes in
And goes again alive but as good as dead
And you are left above, no better than dead
And you dare not turn the leaden pages of the
book or touch the flowers the hooded
and arrested hours"

[Persens]

স্পেনের কবি F. A. Lorca এত সহজ ভাষায় এত সহজ উপায়ে লিখতে জানে—যাতে মনে হয় এ জটিল যুগও এক নূতন শৈশবের সীমান্তে প্রতীক্ষা করছে মৃত্যুর ক্রোড়ে :—

From Cadiz to Gibraller
how good the path !
An lass
An lad
How good the path
How many boats in the port
And in the square, how cold—
(Song of the Andulasian Sailors)

আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যে E. W. Forsterএর নাম উল্লেখ করতে হয়। বিস্ময়ের বিষয় এ লেখক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি চমৎকার উপন্যাস লিখেছেন—তার নাম হচ্ছে A passage to India। একজন ইংরাজের পক্ষে এরকম বই লিখা এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। Qarterly Review এই গ্রন্থ সমালোচনা করে বলেছে : That magnificent novel the greatest of this century. Lowes Dickinson বলেন : In "A passage to India" he has given us indeed a classic on the strange or tragic fact of history and life called India"। এই গ্রন্থের সূক্ষ্ম রসসম্পাত ও শ্লেষের কারুতা মুগ্ধকর। একদিকে কয়েকটি ইংরাজ ও ইংরেজরমণী, অন্যদিকে কয়েকটি ভারতীয়কে নিয়ে Forster এমন এক অদ্ভুত আলোকপাত করেছেন ভারতের নব্য সামাজিকতার উপর, যে তাতে অবাক হতে হয়। ইউরোপীয় ক্লাব ও সমাজ, ভারতীয় বিচারালয়, মারামারি গুণ্ডা, সব মুসলমান চরিত্র—(ডাক্তার আজিজ তার ভিতর প্রধান) অধ্যাপক গডবোল ও তাঁর কৃষ্ণপ্রীতি, বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার মিঃ দাস প্রভৃতির ভিতর দিয়ে এখানকার ইউরোপীয় সমাজের রূপান্তরিত অবস্থা দেখিয়ে ঔপন্যাসিক সকলের তাক্ লাগিয়েছে।

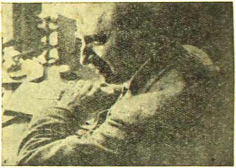

ই. এম. ফর্ষ্টার

ভারতের সম্পর্কে আধুনিক চিন্তার সহিত পাশ্চাত্য এই সামাজিকতা একেবারে নূতন ব্যাপার।

Christopher Isherwood উপন্যাস ক্ষেত্রে প্রভূত যশঃ অর্জন করেছেন। Good bye to Berlin একখানি অপূর্ব উপন্যাস। নাৎসীপূর্ব জার্মাণীর এমন চমৎকার রসপ্রধান মুকুর পাওয়া কঠিন। সমগ্র ইউরোপের নব্য প্রভাবে Isherwood পরিপূর্ণ। Rex Warnerএর Wild good chaseএ সমসাময়িক (১৯৩১ খ্রীঃ) ইংলণ্ডের উৎকট অবস্থা কল্পিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ James Joyceএর "ulyses", বা ফরাসী Proustএর "অতীত স্মৃতি'র মত ব্যাপারই নয়। Proustএর আট ভল্যুমে সম্পূর্ণ অতিকায় উপন্যাস এক অদ্ভুত ব্যাপার সন্দেহ নেই। Freud মনের নিম্নস্তরে অন্তঃস্পর্শী গুহা আবিষ্কার করে এদের রাজপথ কেটে দিয়েছে। এসব সাহিত্যিক সে সব ভাল করে কাজে লাগিয়েছে মাত্র।

প্যারী নগরীর Vendredi কাগজ ছিল নব্য সাহিত্যিকদের মিলন কেন্দ্র। এদের ভিতর Andro Chamson কে প্রতিনিধি বলে ধরা যেতে পারে। ছোট গল্প লিখায় Chamson ওস্তাদ। "The Power of words" "my enemy" প্রভৃতি গল্প চমৎকার। Ignatucio Silone একজন স্বইটজারল্যাণ্ডবাসী ইটালীয় যুবক। এ লেখকের প্রতিভা প্রচুর। "The fox" 'Journey to Paris' অতি সুন্দর রচনা। Silone এর বৃহৎ উপন্যাস "Bread and wine" একটি নূতন পথ কাটতে চেষ্টা করেছে।

নব্য নাট্যকার Sean O'caseyর "The star turns red" Vanity Theatreএ অভিনীত হয়েছে। এ থিয়েটার আধুনিক নাট্যিকদের একটি প্রধান মিলনস্থল হয়ে পড়ে। নাট্যকার হচ্ছে আইরিশ যুবক। কোন আলোচক বলেন "For sheer dramatic excitement I know of nothing to beat the scene in Act III. Group theatreএর Isherwood Audenএর 'Dog beneath the skin, ১৯৩৫ সালে খুব সফলতার সহিত অভিনীত হয়। এসব নাটকে কাব্যের গাম্ভীর্য্য ও তরলতার এক অপূর্ব্ব মিলন হয়েছে। নব্য সাহিত্যের রসকল্পে শক্তিত্বের সহিত মিল খেয়েছে বেদনা ও মানুষের মাধুর্য্য। বহু সাহিত্যিক এই বিরূপ পথে অগ্রসর হয়েছে। ফ্রয়েডের থিউরীও মার্কসের বিরোধের পশ্চাতে মত্ততা ও হেঁয়ালি, রক্তাক্ত আবেগ ও অন্ধ হতাশা সাহিত্যের আসমানি সৃষ্টিতে সস্তা চমকি কাজের বৈচিত্র্য উপস্থিত করেছে।

পূজা

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

চঞ্চলচপল গঙ্গার প্রবাহচুম্বিত গ্রামখানা অতীত সম্পদের স্মৃতি-সম্ভারে অঙ্গ মুড়িয়া দিনযাপন করিতেছে। শূন্য ভিটাগুলি পড়িয়া আছে, জানালা-কবাটহীন পাষাণ বাড়ীগুলি বিগত ঐশ্বর্য্যের আবাসভূমিতে রূপান্তরিত—বিপুলায়তন পুষ্করিণী শৈবালজালে আচ্ছন্ন। নানাপ্রকার সরীসৃপ ও উদ্ভিদকীর্ণ গাছ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে। বিহঙ্গ এবং শ্বাপদ-কুলের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই এখানকার নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে না।

নিবিড় বনের মধ্যে একটি শিবমন্দির। মন্দির মধ্যে এখনও শিবমূর্ত্তি বিরাজমান। তিনি নির্ব্বাক হইয়া এখানেই পড়িয়া আছেন; পূজকশ্রেণী সব পরলোকে—তাই যত্ন করিবার কেহ নাই। তিনি অনড়, কাজেই এ মন্দির ত্যাগে অসমর্থ।

দিনকতক মনে বড়ই কষ্ট হইত। সেই ভক্তদের নিত্য ধূপদীপের, যাগযজ্ঞ, হোম ইত্যাদির কথা বারেবারেই মনে পড়িত। শিবরাত্রির সময় দুই তিন দিন ধরিয়া জনসমাগম, আমোদ-প্রমোদ, সন্ন্যাসীর দলের উচ্চারিত 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার যেন ছায়ার মত দূরে দূরে ভাসিয়া বেড়াইত।

আপন হাতে সৃষ্ট জীব-মানবের সেবা ছিল তাঁহার খুবই প্রীতিপ্রদ। মানুষ যে তাঁহার কথা ভুলিয়া যায় নাই এবং সে যে তাঁহাকে বুঝিবার জন্য ব্যাকুল এ চিন্তাও মনকে নাড়া দিত। তারপর বন ক্রমে ঘন হইয়া আসিতে লাগিল। মন্দিরের চূণ সুরকী খসিয়া পড়িতে লাগিল, যেখানে ফাটল ধরিল; সেখানে অশ্বত্থ গাছের কচি পাতা বাতাসে দোল খাইতে লাগিল। শেষে ছাদে ছিদ্র দেখা দিল।

সেবারে বর্ষ বিদায়ের দিনে পিপাসার্ত্ত দেবতার মাথায় মেঘরাজা জল ঢালিল—ছাদের ছিদ্রপথ বাহিয়া নামিয়া আসিয়া সে জল দেবতাকে স্পর্শ করিল। বহুদিন অবহেলিত হইয়া থাকিবার পর প্রথম সেবার স্পর্শ মিলিল।

দিন কাটিয়া যায়। দেবতা লক্ষ্য করিলেন যে ঝড়ে কোথা হইতে বুঝি বীজ আসিয়া পড়িয়াছিল, কয়েকটি ধুতুরা গাছ জন্মিয়াছে; একপাশে অনেকগুলি অজানা ফুলের গাছ শাখা মেলিয়া দিয়াছে—ফুলও ফুটিয়াছে, বড় সুন্দর গন্ধ। পূর্ব্বে দোয়েল, ময়নার দেখা মিলিত না, এখন তাহারা গাছের উপর আসিয়া বসে—সুমিষ্ট গান শুনাইয়া যায়।

দেবতার মনে চমক লাগিল। মনে পড়িল তাইত তিনি তো শুধু মানুষকে নহে, প্রকৃতিকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের সেবা তো এতদিন পাইয়া আসিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতির কথা তো তখন মনে পড়ে নাই। তাঁহার অর্চ্চনায় তো ছেদ পড়ে নাই—প্রকৃতি এখন সে ভার লইয়াছে।

শতাব্দীর শিল্প—ম্যাতিস্

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় এম-এ (লণ্ডন), এফ-আর-এ-আই (লণ্ডন)

চল্লিশ বছর ধরে হেনরী ম্যাতিস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তাঁর শিল্পে এক নূতন ভাবধারা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। সেঁজানের মৃত্যুর পর ফ্রান্সে আর এত বড় প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাব হয় নি।

তাঁর শিল্পের বৈশিষ্ট্য এবং প্রভাবে একমাত্র পিকাসোর শিল্পের সঙ্গে তুলনা হতে পারে ; চিত্রাঙ্কনে উভয়েই এক নূতন ধারা সৃষ্টি করেন এবং উভয়েই এক একটি শিল্প-পদ্ধতির আচার্য বলে স্বীকৃত হন। পৃথিবীর এমন দেশ নেই যেখানে আজ ম্যাতিসের শিল্প প্রভাব বিস্তার করে নি।

নগ্ন নারী

ম্যাতিসের শিল্পে বর্ণবিন্যাস এবং প্রকাশভঙ্গী এমনভাবে স্পষ্ট এবং নিজস্ব যে গত বহুদিন ধরে উদীয়মান শিল্পীদের পক্ষে উহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া ম্যাতিসের শিল্পকলা আধুনিক ফার্নিচার শিল্পের উপরেও পরিষ্কারভাবে রেখাপাত করেছে এবং ম্যাতিসের বহু বৎসরব্যাপী এই সাধনার মূল্য নানাদিক থেকে ঐতিহাসিক মূল্যের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক শিল্পের সমালোচক হিসাবেও ম্যাতিসের খ্যাতি রয়েছে। তিনি কম লেখেন বটে, কিন্তু তাঁর সমালোচনায় থাকে ঝরঝরে, নির্ভীক উক্তি। "শিল্প শিল্পের জন্যই"—এই মতবাদ তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করেন। তাঁর মতে "What I dream of is an art that is equilibrated, pure and calm, free of disturbing subject matter, an art that can be for any intellectual worker, for the business man or the writer, a means of soothing the soul, something like a comfortable armchair in which one can rest from physical fatigue" অর্থাৎ একরকম শিল্প সৌখীনতার জন্যে। অবশ্য ম্যাতিসের এই ঘোষণার ভেতর শিল্প যে আদর্শচ্যুত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখন দেখা যাক্ তাঁর মতানুযায়ী কোন্ ধরণের শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে? যে সব চিত্রে গভীর চিন্তা নেই কিংবা মন উদ্বেলিত করে তোলে না, সে সব ভাবধারা ম্যাতিস গ্রহণ করেন। এমন কি যান্ত্রিক যুগের বাস্তব জীবনের বিষয়বস্তু তাঁর মনকে পীড়িত করে তুলত। ম্যাতিসের শিল্পে সহর নেই, যানবাহন কলকারখানা অর্থাৎ সত্যিকারের মানুষের জীবন কিছুই দেখান হয়নি। তাঁর বিষয়বস্তুতে সব সময়ই অবাস্তব, অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ, যেখানে কোন উত্থান পতন নেই, চিন্তাধারা নেই, যেন সব অচলায়মান।

এই মতবাদ দিয়েই তিনি তাঁর শিল্প থেকে মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী একেবারে মুছে ফেলে দেন। এমন কি প্যারিস রাজপথ কিংবা ফ্রান্সের গ্রাম্য দৃশ্য কখনই ম্যাতিসের শিল্পে স্থান পায়নি। বিলাসিতার যূপকাষ্ঠে তিনি এই সব বিষয়বস্তু একেবারে বিসর্জন দেন।

যখন তিনি উত্তরে শিল্প প্রধান দেশে থাকতেন তখন পারতপক্ষে তিনি কখনই কলকারখানার রূপ শিল্পে ফোটাতে চেষ্টা করেন নি। যখন আবার দক্ষিণ দেশে ছিলেন সবসময়েই তিনি গ্রীষ্মের প্রখর দৃশ্য এড়িয়ে চলেছেন। আফ্রিকার মরুভূমির ব্যাপকতা কিংবা সমুদ্রের বিশালত্ব তাঁর মনের উপর কোনরূপ রেখাপাত করতে পারেনি।

চুল বাঁধায় রত-নারী

ম্যাতিস যে শুধু উত্তেজক বিষয়বস্তুর কাছ থেকেই দূরে থাকতেন তা

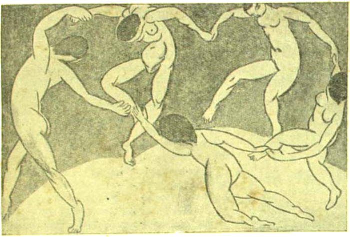

নৃত্য

না তিনি কখনই কোন বিষয়বস্তু খুঁজে বের করতেন না—তাঁর কাছে এর কোন অস্তিত্বই ছিল না। তাঁর মতে: "a picture must carry its complete significance in itself as such and must produce an impression on the onlooker even before he elicits its meaning."

তিনি নিজের ঘরেই তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু খুঁজে পেতেন। নিজের ষ্টুডিও, পরিবার ও একটি মডেল দিয়েই তাঁর ছবির কারবার চলত। বছরের পর বছর ধরে একই বিষয়বস্তু বারবার ম্যাতিস এঁকেছেন কিন্তু প্রতিবারই তাঁর আঁকা ছবিতে থাকত একটা নূতনত্ব। "পিয়ানোর ধারে একজন নারী" কিংবা "[illegible]", "শিশুরা খেলারত" এই ধরণের বিষয়বস্তু নিয়েই তাঁর পরীক্ষামূলক কাজ চলেছে। ম্যাতিস খোলা জায়গার চেয়ে তাঁর নিজস্ব ষ্টুডিওর চারকোণের দেয়ালগুলি বেশী পছন্দ করতেন। সেইজন্যে তাঁর শিল্পে প্রাকৃতিক দৃশ্যের একান্ত অভাব এবং এ বিষয়ে দু' একখানি ছবিও যা তিনি এঁকেছেন তার সঙ্গে ঘরের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ম্যাতিসের শিল্পের বিশেষত্ব হচ্ছে যে দৈনন্দিন বাস্তব জীবন থেকে দর্শককে দূরে একটা অলৌকিক জগতে টেনে নিয়ে যায়। দর্শকেরা শুধু তাদের মানস চক্ষু দিয়েই সমস্ত জিনিসটা উপলব্ধি করে, চিন্তার কিংবা ভাবনার কোন সময় পায় না। অর্থাৎ এক কথায় এই শিল্প-আদর্শের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবজীবনকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা।

জীবনের আনন্দ

এই ভাবধারাই ম্যাতিস তাঁর ছবির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। বর্তমান জটিল বিক্ষুব্ধ জগতে তিনি দুর্ভোগীদের মনে শান্তির ছবি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন—তিনি তুলে দিয়েছিলেন দর্শকের বিশ্রাম আসন। চল্লিশ বছর ধরে তিনি দেখেছিলেন ভাঙাগড়ার ইতিহাস, যুদ্ধ এবং বিপ্লব, কিন্তু এসব কিছুই তাঁর মনে কোন রেখাপাত করতে পারিনি। তিনি যেন এসব বিষয়ে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন। তাই ১৯২৮ সনে তাঁর এক বন্ধুর কাছে তিনি বলতে পেরেছিলেন: "A picture must hang quietly on a wall. The onlooker should not be perturbed or confused, he should not feel the necessity of contradicting himself, of coming out of himself. A picture should give deep satisfaction, relaxation and pure pleasure to the troubled consciousness."

শিল্পে এই নির্লিপ্ত ভাব একটা যুগের পূর্ব লক্ষণ সূচনা করে। ইম্প্রেশনিজম্ (Impressionism) ম্যাতিসের আদর্শ ছিল কিন্তু বর্তমান শিল্পীরা সেই চিরাচরিত প্রথা ছেড়ে' পাড়ি দিয়ে এক নূতন প্রেরণা নিয়ে এলেন। তাদের চিত্রে জনমজুরেরা স্থান পেল, দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-সুখের ইতিহাস নিয়ে ছবিগুলি হয়ে উঠল। এইভাবে দুই দল প্রাচীন ও নূতনের দল। ম্যাতিস "ফর্মালিজম্" (Formalism)-এর এতদূর ভক্ত হয়ে উঠেন যে তিনি বিষয়বস্তুকে খর্ব করে দেখাতে

মোটেই দ্বিধাবোধ করতেন না। ম্যাতিসের দু'একখানি ছবি থেকেই এই সত্যটা বেশ উপলব্ধি করা যেতে পারে। ১৯০৭-১৯১০ সালে তিনি প্রাচীর চিত্র অঙ্কনে খুব মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তাঁর আঁকা

মুক্তি

“জীবনের আনন্দ” কিংবা “নৃত্য” ছবি দুখানিতে “ফর্ম্মালিজম্”এর চূড়ায় তিনি পৌঁছিয়েছেন; রং এবং তুলির টানের সমাবেশে ছবিগুলি পূর্ণ।

কয়েক বছর ধরে ম্যাতিস্ এই “ফর্ম্মালিজম্” নিয়ে আঁকড়ে রইলেন, কোনদিনই এই সুখকর পথ থেকে সরে যেতে চেষ্টা করেন নি। তাঁর এই সুখবাদিত্বের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর আঁকা “ঝড়” ছবিখানি। একজন নারী একটি আরামদায়ক ঘরে বসে রয়েছে, তার জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে—ঝড় বৃষ্টি। বাইরের জগতের সঙ্গে ভেতরের কোন যোগাযোগ নেই, একেবারে সম্পূর্ণভাবে পৃথক।

ম্যাতিস ছিলেন বিলাসিতার পূজারী, তাই তাঁর শিল্পে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী স্থান পায়নি—তিনি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যপূর্ণ ফুলদানী, প্রাচ্যের কার্পেট, জমকালো পোষাক ও অলঙ্কার এবং ফুল প্রভৃতি বেশী পছন্দ করতেন। কতিপয় সৌখীন ব্যক্তির জন্যেই যেন তিনি শিল্প কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

কিন্তু ম্যাতিসের এই দিকটা ছাড়াও আর একটা দিক যে রয়েছে তা একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। ম্যাতিসের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর শিল্পে একটা স্নিগ্ধ শান্ত ভাব নিয়ে আসা। যদিও তিনি কয়েকখানি ছবিতে এই ভাব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু তাঁর 'Still lifes' এবং কয়েকটি অঙ্কিত মূর্ত্তি এমন উন্মাদময় হয়ে উঠেছে যে সেখানে জীবন ও গতির প্রাধান্যই বেশী। এইখানে দে'গার কাজের নরনারীর মূর্ত্তির সঙ্গে ম্যাতিসের “ফর্ম্মালিজম্”এর পার্থক্য। ম্যাতিস গতানুগতিক প্রথা ভেঙেচুরে শিল্পে তাঁর নিজের রূপ দিলেন। কিন্তু এইখানে ম্যাতিসের মনে যে দ্বন্দ্ব তার আবার পরিচয়ও পাওয়া যায় এবং এই হচ্ছে বুর্জ্জোয়া জগতের প্রধান দ্বন্দ্ব।

ম্যাতিস নিজেই বলতেন যে কারবারি লোক এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্যেই তিনি কেবলমাত্র ছবি এঁকেছেন। আমেরিকা এবং জার-শাসিত রাশিয়ার ধনী লোকেরাই ম্যাতিসের ছবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা ম্যাতিসের শিল্পে এই সাহসিকতায় মুগ্ধ হন এবং বুর্জ্জোয়া শিল্প জগতে ম্যাতিসের এই পরীক্ষামূলক কাজ যে খুবই প্রগতিশীল ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই হিসাবে বর্ত্তমান যুগে পিকাসোর যে স্থান—বুর্জ্জোয়া সমাজে গড়ে উঠবার সময় ম্যাতিসের শিল্পেরও সেই হিসাবে সার্থকতা মোটেই কম নয়।

স্পেনের মেয়ে

মৌনা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ধীরে এস তুমি ধীরে পুন যাও চলি,
সবার পিছনে নিজেরে লুকায়ে রাখো,
ওরা কথা বলে, তুমি চুপ ক'রে থাকো
কিছু না বলিয়া চোখে বল, বলি বলি।
মৌন তোমার সংকোচী পুষ্প কলি
ফোটে ধীরে ধীরে, আঁধারে বড়ই ঢাকো
সৌরভ তার লুকাবারে পার' নাক',
ফুলের বারতা আঘ্রাণে জানে অলি।
শুনি আমি তব মৌন ভাষার সে বাণী।
কাছে এল যারা তাহারা রহিল দূরে,
তুমি দূর হ'তে হলে অন্তিকতম
আনত নয়নে মেলিয়া হৃদয়খানি।
আমি কেঁপে উঠি অনাহত সুরে সুরে,
শুধু অবচনে পরাণে পশিলে মম।

পরদেশিনী

শ্রীসুবোধ বসু

ভন্টু প্রেমে পড়িয়াছে। সেই সূত্রেই আমার লাহোরে আসা। ভন্টু আমার মাসতুত ভাই। সম্পর্কটা সুবিধার নয়, তবে আমার নাকি তাহার উপর কিছুটা প্রভাব আছে, তাই আমাকেই পাঠান হইয়াছে। উদ্দেশ্য, তাহার ব্যাধির প্রতিকার।

আমাকে দেখিয়াই ভন্টু হাউমাউ করিয়া উঠিল। কহিল, দা'দা এসেচ, ভালো করেচ। আত্মীয়-স্বজন সবাই ত্যাগ করলেও তুমি ত্যাগ করোনি। কালই বিয়ে।

কহিলাম, বলিস্ কি, আমাকে কি একটুও সময় দিবিনে ?

'যথেষ্ট সময় আছে', ভন্টু কহিল, 'বিয়ে তো আজ নয়। তুমি আচ্ছা করে' আজ ঘুমিয়ে জিরিয়ে নাও, ওসব হাঙ্গামা কাল।'

'বিয়েটা তবে পাকাপাকিই ঠিক হয়ে গেছে ?' গম্ভীর হইয়া কহিলাম।

ভন্টু গলায় টাই আঁটিতেছিল। কহিল, 'নইলে আর কাল বিয়ে হচ্ছে কি করে' ? কি রকম যে তোমার অবনতি হয়েচে…'

এইবার রাগিয়া গেলাম। প্রেমে পড়িয়াছেন উনি, আর অবনতি হইয়াছে আমার! কহিলাম, দেখ্, ভন্টে, তুই ইরিগেশান্ ইঞ্জিনিয়ারই হোস্ আর যাই হোস্, আমাদের সেই ভন্টে ছাড়া আর কিছু নস্। অঙ্ক পারতিস্ না বলে আমার হাতে কত কানমলা খেয়েচিস মনে আছে ? এ বিয়ে হ'তে পারবে না।'

ভন্টু একটু ঘাবড়াইয়া গেল। চেয়ারটার হাতলে বসিয়া পড়িয়া কহিল, এর মানে ! তবে কি বুঝব তুমিও ওদের দলে ? আমি তো তোমাকে দেখে খুসি হ'য়ে উঠেছিলাম, ভেবেছিলাম, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন অন্তত একজনও আছে। বিয়েটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার…'

'মোটেই নয়।' যথাসম্ভব রাশভারি গলায় জানাইয়া দিলাম। 'এর সঙ্গে তোর সমস্তটা পরিবারের সম্পর্ক।'

'কি রকম ?' ভন্টু বেশ প্রতিবাদের সুরেই প্রশ্ন করিয়া বসিল।

এই প্রশ্নের উত্তরে যে যুক্তিটা মাসিমাদের বাড়ি হইতে আমাকে আগেভাগেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহা ট্রেনে আমি একাধিকবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়াছি, সেটা হঠাৎ যেন আমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্যই মন হইতে পলাতক হইল। ফলে আমি অবজ্ঞার হাসি হাসিলাম। ভাবটা এই যে, এমন অসম্ভব প্রশ্নও কোনও অর্বাচীন করিতে পারে ! এই সময়টুকুর মধ্যে উপযুক্ত জবাবটাকে যোগাড় করিয়া আনিলাম।

কহিলাম, পাঞ্জাবী মেয়ে কি কখনও বাঙালী পরিবারের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে ? প্রথমত, ভাষার কথাটাই ধরা যাক্। ঐক্য সাধনের পক্ষে ভাষাটা যে…'

'মায়া খুব ভালো বাংলা বলতে পারে ; ও শান্তিনিকেতনে ছিল তিন বছর।' ভন্টু আমার এমন অমোঘ যুক্তিজালটা বিস্তার করিতে না করিতেই ছিঁড়িয়া দিল।

'কিন্তু বাঙালী রান্না যে বাঙালীর পক্ষে কত বড়…'

'শান্তিনিকেতনে-রান্নার ক্লা'সে বাঙালী রান্নাও শেখান হয় দা'দা।' ভন্টু চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে কহিল।

'তা ছাড়া', না দমিয়া কহিলাম, 'গৃহে থাকলেই গৃহদেবতাদির…'

'মায়া-রা হিন্দুই।'

মহা বেয়াদপ ভন্টুটা। এত কষ্ট করিয়া যে সমস্ত যুক্তি খাড়া করিয়াছি, সামান্য দু-চারটা কথায় এমন করিয়া তাহাদের উড়াইয়া দিতে থাকিলে কোন্ আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন লোকের না রাগ হয় !

'শোন্ ভন্টু।' স্বরটা অসম্ভব-গম্ভীর করিয়া কহিলাম, 'বিদেশী মেয়েকে বিয়ে করলে…'

'সামনের ম্যাপ্-টা একবার দেখে নাও দা'দা', ভন্টু প্যান্টের বগলস্ লাগাইতে লাগাইতে কহিল, 'পাঞ্জাবটা ভারতবর্ষের মধ্যেই !'

'কিন্তু, কিন্তু', রাগিয়া কহিলাম, 'মেয়েরা পা-জামা পরবে, এ কি রকম ?'

'পাঞ্জাবী মেয়েরা শাড়িও পরে', ভন্টু কহিল। 'সালোয়ার তোমার পছন্দ না হ'লে মায়া না হয় শাড়িই পরবে। আমি অবশ্য সালোয়ার পছন্দ করি।'

মায়া, মায়া, মায়া ! রাগিয়া টং হইলাম। নামটায় যে আপত্তি করিবার কিছু নাই, সেটা আমাকে বিশেষভাবে জানাইয়া দিবার জন্যই বারবার নামটা বলা হইতেছে। আর তোর পছন্দ ! তোর পছন্দের মূল্য কি ? এখন তো পাঞ্জাবের গালাগালিও তোর কাছে গান মনে হইবে !

'বিয়েটা তবে হচ্ছেই ?' অননুমোদনের সুরে কহিলাম।

'হচ্ছে বৈ কি।'

'কে বিয়ে দেওয়াবে ? বাঙালী পুরুত আছে লাহোরে ?'

'থাকা আশ্চর্য কি, হীরামণ্ডীতে কালীবাড়ি আছে।' ভন্টু জুতার মধ্যে পা ঢুকাইয়া কহিল। 'তবে তার দরকার হবে না।'

'মানে ?' বিস্মিত হইয়া কহিলাম।

'রেজিষ্টারি করে বিয়ে হচ্ছে।' ভন্টু কহিল।

'এ বিয়ে হ'তে পারে না।' জোর দিয়া কহিলাম, 'কিছুতেই হতে পারে না।'

উত্তরে ভন্টু কোটের পকেট হইতে মস্ত বড় একটা খাম বাহির করিয়া ভিতরের কার্ডটা ঈষৎ খুলিল এবং সবই আমার হাতে তুলিয়া দিল। কহিল, 'এটা তোমার নিমন্ত্রণ পত্র। রেজেষ্টারি অপিসের পর বাড়িতে আসা, একটু বিশ্রাম, তারপর 'পেলেটি'র রেস্তরাঁতে লাঞ্চ-পার্টি। ম্যাল্-এর উপর দেখাইনি হোটেলটা ?'

অবশ্যই দেখিয়াছি এবং তাহার লাঞ্চের কথা শুনিয়া রসনা সজল হইয়াছে। কিন্তু কর্তব্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই বিবাহে বাধাদানের জন্যই এত পয়সা-কড়ি ব্যয় করিয়া

আমাকে সুদূর পাঞ্জাবে পাঠান হইয়াছে। সামান্ত লাভের জন্ত কি কর্ত্তব্য ভুলি।

কহিলাম, ভন্টু ?

'কি ?'

'মনে পড়ে ছোটবেলার কথা ?'

'কোন্ কথা ?'

'সব কথা…'

'না।'

'বিয়ের আগেই', গভীরভাবে আহত হইয়া কহিলাম, 'তোর এই দশা, তবে বিয়ের পরে কি হবে ?'

'হয়ত আবার মনে পড়তে পারে।' ভন্টু মুচকিয়া একটু হাসিয়া কহিল। 'আমার অফিসের বেলা হয়েচে ন'দা, এবার আমি উঠি। তুমি না-হয় দুপুর বেলা একটা টাঙ্গা নিয়ে শালিমার বাগানটা দেখে এসো, তিন-তলা বাগান…'

'সেই পাঞ্জাবি মেয়েটাকে', বেশ রাসভারী স্বরেই কহিলাম, 'আমি প্রথমে দেখতে চাই।'

'ভাংচি দেবে নাকি ?'

'দিই না-দিই তোর কি', রাগিয়া কহিলাম। 'আমি না-দেখা পর্য্যন্ত কিছুতেই তাকে তোর বিয়ে করা চলবে না।'

সেই কনে দেখিতেই লরেন্স গার্ডেন-এ আসিয়াছি। স্থান, ঐ বাগানেরই একটি কৃত্রিম শৈলের শৃঙ্গ। কাল, সন্ধ্যার প্রাক্কাল। দূরে সরকারী পশুশালার বাসিন্দাদের বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি। এইখানে আমাকে বসাইয়া রাখিয়া ভন্টু কনেকে পথ-দেখাইয়া আনিতে গিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া গিয়াছে। আমার সন্দেহ হইতেছে, ভন্টু মেয়েটাকে শিখাইয়া পড়াইয়া আনিতেছে। ঝোপঝাড়ের কোথাও বসিয়া একটু প্রেম করিয়া আসিতেছে না, এমনও বলিতে পারি না।

দুজনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছিপছিপে, পাঁচ ফুটের উপর উঁচু গৌরাঙ্গী মেয়ে। সুঠাম দেহ, দীর্ঘ চোখ, সূক্ষ্ম ভ্রূ, সুগোল বাহু, আঙুলগুলি লম্বা লম্বা। চলার ভঙ্গি সতেজ, সপ্রতিভ। পরণে সিল্কের শাড়ি, পায়ে দামী জুতো।

নিকটে আসিলে দেখিলাম, দুজনেরই মুখ গম্ভীর। মনে হইল যেন, সামান্ত পূর্ব্বে একটু মান-অভিমান গোছের ব্যাপার হইয়া থাকিবে। কারণ আন্দাজ করিতে পারিলাম না।

পরিচয় করাইবার প্রয়োজন হইল না। মুখটা যথাসাধ্য সহাস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া মেয়েটা হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। কহিল, 'নোমস্কার, ন'দা, আমি মায়া।' মিষ্টি গলায় পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণ। বেঞ্চের একদিকে সরিয়া জায়গা করিয়া কহিলাম, বস, মা, বস, এইখানটায় বস।…এখানে কোথায় থাক ?

'সেণ্ট্ অগাষ্টিন উইমেন্স্ কলেজে আমি পড়াই।' মায়া পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল—'কলেজ হষ্টেলেই থাকি।'

'মাস্টারণী !' মনে মনে কহিলাম। প্রকাশ্যে কহিলাম, 'বেশ, মা, বেশ। বাংলা কোথায় শিখেচ ?'

'গুরুদেবের আশ্রমে। শান্তিনিকেতনে। আগেও একটু একটু জানতাম।'

'গান গাইতে পার ? ছবি আঁকতে পার ? চামড়ার উপর কাজ করতে পার ?'

মায়া দেবী মৃদু হাসিলেন। কহিলেন, সামান্ত।

কনে দেখিতে আসিলে আর কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়, ভাবিতে লাগিলাম। কহিলাম, 'জুতো জোড়া খুলে ফেল তো মা, খড়ম-পা কিনা একবার দেখে নিই !'

মেয়েটা কিছু না বুঝিয়া হাঁ করিয়া তাকাইল। ভন্টু বিরক্ত-ভাবে কহিল, 'ও-সব থাক্ ন'দা।'

'যা, যা, তুই ফোপরদালালি করতে আসিস্ না। কনে-দেখার জানিস্ কি তুই !' বলিয়া তাহাকে থামাইলাম। কিন্তু সে প্রশ্ন পরিত্যাগ করিলাম। কহিলাম, 'চুলটা একবার ছেড়ে দিলে ভালো হ'তো, কতটা লম্বা, কতটা আসল, কতটা নকল, এসব দেখে নিতে পারতাম।' ইহাতেও মেয়েটা অবাক হইয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বিরত হইলাম।

'জান, ন' দা', সহসা মেয়েটা কহিয়া উঠিল, 'ছোটবেলা থেকেই তোমাদের বাংলা দেশ আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকেচে। গুরুদেবের লেখা গান গাইতে শুনতাম প্রতিবেশী মিসেস্ সেনদের বাড়িতে, আর আমার মন চলে যেত ধানের ক্ষেত আর তালের বন ভরা বাংলা দেশে ; তোমাদের জল-ভরা খাল, মেঘে-ভরা আকাশ, কেয়া-ফুলের গন্ধভরা সজল-সন্ধ্যা আমার স্বপ্ন ভরে' ফেলত। তারপর শান্তিনিকেতনে যখন গেলুম, তখন বাঙালী জাতটাকে…'

'তাতে কি আর সন্দেহ আছে মা', আমি উচ্ছ্বাস আর বাড়িতে না দিয়া কহিলাম, 'তার তো চাক্ষুষ পরিচয় কাছেই রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন করি…'

'ন'দা !' বেশ একটু অসন্তুষ্ট ভন্টুর স্বর।

আমিও দমিবার পাত্র নই। ভন্টুদের বাড়ি হইতে আমাকে যাহার জন্ত সুদূর লাহোরে পাঠান হইয়াছে, তাহা ভুলিয়া কর্ত্তব্যের অবহেলা করিতে পারিব না। ভন্টুর অসন্তোষ উপেক্ষা করিয়া কহিলাম, 'কিন্তু প্রশ্ন করি, মা, এটিকে সংগ্রহ করলে কি করে ?'

মায়া হাসিয়া ফেলিয়া ঈষৎ রক্তিম মুখে কহিল, 'ভগবান জুটিয়ে দিয়েছিলেন ন' দা' (এবং ভন্টুর দিকে দৃষ্টিটা বিদ্যুতের মত দ্রুত বুলাইয়া লইয়া), আবার তিনিই…'

'তোমার বাপ-মায়ের মত আছে ?'

'না নেই।' মায়া স্বীকার করিল। 'ওঁকে বিরত করবার জন্ত ওঁর আত্মীয়স্বজন যে যুক্তি দেখাচ্ছেন, আমার স্বজনদেরও সেই যুক্তি। এ কি যুক্তি না সংস্কার, আপনিই বলুন ? সারা ভারত-বাসী নাকি এক জাতি ; মহাত্মা গান্ধী আমাদের সকলের নেতা। অথচ একই দেশের দুটো আলাদা অঞ্চলের দুইজন শিক্ষিত নরনারী যদি এক সঙ্গে ঘর বাঁধতে চায়, তবেই আত্মীয়দের প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা সামনে বাধার হিমালয় এনে উপস্থিত করবে। বেশ-ভূষা, ভাষা-ছন্দ, আহার-বিহার, রীতি-নীতি, বাধার কি অন্ত আছে…'

'ব্যাপারটা অত সহজ নয় মা', আমার লাহোরের গাড়ি-ভাড়া-পাওয়া বিবেক এই উচ্ছ্বাসে ভড়কাইয়া গিয়া কহিল, 'বিভিন্ন রীতি-নীতির মধ্যে বাধা বেড়ে' উঠেচে, তাদের মিলন শেষ পর্য্যন্ত…'

'ইংরেজ-আমেরিকানে, আমেরিকানে-জাপানে যদি হামেশাই বিয়ে হ'তে পারে এবং তা সাফল্যজনক হয়', নাম্‌রা প্রতিবাদ করিয়া কহিল, 'তবে একই দেশের দুটো আলাদা প্রদেশের মধ্যে বিয়ে হ'লে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? ভারতীয় ছেলের মেম বিয়ে—তা আমাদের প্রায় বরদাস্ত হয়ে গিয়েছে অথচ তার চেয়ে ঢের অনেক কম বিসদৃশবাবি, তাতে আমরা এখনও চমকে উঠি।...আধুনিক শিক্ষায় আমরা সকলেই কমবেশী ইংলণ্ডাইজড্ হয়ে উঠেছি রুচি, রীতি, ভাষার দিক থেকে। অথচ একশত বছরের পূর্বেকার ব্যবধানের দোহাই দিয়ে...'

আমি লজ্জিত হইয়া কহিলাম, 'থাক, থাক, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। ওরা হলো গিয়ে সাহেব। সাহেবদের তো সবই সহজ হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে—'

কিন্তু আমার এমন অকাট্য যুক্তিটা না শুনিয়াই সহসা মেয়েটা উঠিয়া দাঁড়াইল। বেশ একটু চাপা তীব্র গলায় কহিল, 'আর তোমাদের দরকার হবে না, দা'দা; তোমার ভাইকে আমি মুক্তি দিয়েছি।' এবং ভণ্টুর প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া কহিল, 'আমি বিদেশিনী মেয়ে; তোমাদের এত বড় সর্বনাশটা কি করতে পারি! মায়ের কাছ থেকে ছেলে কেড়ে সকল শান্তি নষ্ট করব; সোনার সংসারে আগুন লাগিয়ে দেব? তা কি উচিত? তাই তোমাদের শান্তি অক্ষুণ্ণ রেখে নিজেই আগে দূর হয়ে গেলুম। তার সুখশান্তির কথা ভাববার প্রয়োজন নেই! নমস্কার!'

স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। কহিলাম, 'এর মানেটা কি হ'লো, দাদা? দাঁড়াও বলছি, যেও না! আমি হচ্ছি গিয়ে ভণ্টুর দাদা, গুরুজন। এই রকম চটাং বড় বদ্‌মেজাজ তো সুবিধের কথা নয়। ব্যাপারটা কি হয়েছে, খুলে বলো দেখি?'

এতক্ষণে দুজনের গম্ভীর মুখের তাৎপর্যটা বুঝা গেল। ভণ্টুর মা শেষ পত্র লিখেছেন ইংরেজি ভাষায় (অবশ্য ইংরেজি এবং পাঞ্জাবী উভয়ের নিকট সমান দুর্বোধ্য) নাম্‌রার নিকট বহু জটিল যুক্তিপূর্ণ এক অর্দ্ধ-তিরস্কার এবং অর্দ্ধ-আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতেই এমন আকস্মিকভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হইয়াছে। পাঞ্জাবীদের জেদটার দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ, সেটা এমন শক্ত ও মজবুত যে ভাবিয়াছিলাম মনটাও সমান শক্ত হইবে। কিন্তু দিয়া এই পাঞ্জাবী মেয়েটা সম্পূর্ণ হতাশ করিল। কাল সকালে গিয়ে ঠিক, একটা চিঠি তাহাকে দাখিল করিয়া ছাড়িল। অদ্ভুত এই মেয়েমানুষগুলি। পাঞ্জাবে আসিয়াও একটুও বদলায় নাই দেখিতেছি। ভাবিলাম, মনের কথাটা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দেই। কিন্তু ইহা যে আমার রুচির বিরুদ্ধে যাইবে, তাহা বুঝিয়া অতি কষ্টে জিহ্বাটাকে শাসন করিলাম।

'দা'দা', সহসা বিদেশিনী কহিল, 'ভালো করে একটু চেয়ে দেখ তো? আমাকে কি রাক্ষসের মতো মনে হচ্ছে? তোমাদের দেশের মেয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য কি আমার কিছুই নেই? প্রকৃতি কি আমার একেবারেই আলাদা?...'

কহিলাম, তা নয়। তবু কথাটা হচ্ছে কি, না, জান—ওকি হচ্ছে ভণ্টু, চোখ চকচক করছে কেন? দেখছ না, বাঙালীর ছেলের কাণ্ডটা? কেলেঙ্কারী! আমাকে পর্য্যন্ত লজ্জা দিয়ে ছাড়লে ভণ্টে। তুমি পাঞ্জাবীর মেয়ে, বাংলা দেশের পুরুষটাকে সহ্য করবে কি করে, একটুতেই যে গলে যায়? শুনছি ভণ্টু, তা বেশ, কালই বিয়েটা হয়ে যাক, দেরি করা কাজের কথা নয়...'

'তা হয় না দা'দা', নাম্‌রা দৃঢ়তার সঙ্গে কহিল। 'আমার মায়েদের কাছে আবেদন, মাতৃত্বের নামে আবেদনকে অবজ্ঞা করার মত জোর আমার নেই...'

'তুমিও বাঙালীর সংসর্গে নষ্ট হয়ে যাচ্ছ, মা!' আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল। 'বড্ড সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে উঠছ। মাসিমা কি জানেন নাকি, তুমি কি রকম! সে কি বাংলা দেশ থেকে কখনও বাইরে বেরিয়েছে? বাঙালী মেয়ে হ'লে—সে খড়ম-পা মেয়ে, শঙ্খিনী-পা মেয়ে, কটা-চুল মেয়ে প্রভৃতির ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত, আর তুমি তো হাজার দেড়েক মাইল দূরের পাঞ্জাব-প্রদেশের মেয়ে। পাঞ্জাবী বলতে মাসিমা ট্যাক্সিওয়ালা ছাড়া আর চেনেন কি? হয়ত ভেবে বসেছেন, তোমার গালেও গালপাট্টা আছে। তোমার ভয় নেই। আমি গিয়ে সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলব'খন। সব ভয় ভাঙিয়ে দেব...কিন্তু শুনছিস্ ভণ্টু, পেনেটির শাক-এর 'মেনু'টা আমার কাছে জিজ্ঞেস করে' নিতে হবে, আমি হচ্ছি গিয়ে বরকর্তা, যা করবার আমিই করব। একটু দাঁড়াও, দূর্ব্বো ছিঁড়ে আশীর্বাদটা...'

• • • •

ভণ্টু ও নাম্‌রার বিবাহ হইয়া গিয়াছে পাঁচ মাসেরও উপর। মাসিমাদের ঝাড়ির ভয়ে এখনও বাংলা-দেশে ফিরিতেছি না, তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছি। মাসিমাকে বুঝাইবার ভার লইয়াছিলাম। তাহা যে অসাধ্য তাহা বলিবার সময়ই জানিতাম। কিন্তু তখন ও-ধরণের থিয়েটারি কথা কিছু না বলিলে, মেয়েটা নিশ্চয়ই নারীত্ব কলাইয়া সারাটা জীবন হা-হুতাশ করিয়া মরিত। তবে ঠিক করিয়াছি, মাসিমাদের গাড়ি-ভাড়ার টাকাটা ফেরৎ দিব।

মহাস্থানগড়

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। হেমন্তের কুয়াশাহীন আকাশের নীলিমার মধ্য দিয়া স্নিগ্ধ নীলাভ শুভ্র জ্যোৎস্না চারিদিক রজত ধবল শোভায় উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর একপ্রান্তে স্কন্দদেবের মন্দির। মন্দিরের প্রান্ত-বাহিনী করতোয়া নদী তাহার বিশাল কলেবর লইয়া বহিয়া যাইতেছিল, আর সোপান শ্রেণীতে তরঙ্গাঘাত ধ্বনিত শব্দ যেন এক অভিনব সুর-তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া আকাশে বাতাসে আনন্দ-বার্ত্তা প্রচার করিতেছিল।

স্কন্দদেবের মূর্ত্তি অনুপম রূপ সজ্জায় সজ্জিত। কুমারের বীরত্ব-ব্যঞ্জক অভিব্যক্তি, নয়নে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টি। সাধক ও সাধিকারা এক বিশেষ উৎসবে সে মন্দিরে সমবেত হইয়াছেন। নাগরিক ও নাগরিকারা নাগর বেশে সকলে সেখানে সমুপস্থিত। নর্ত্তকী কমলা—নগরের শ্রেষ্ঠা রূপসী স্বর্গের উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভার মতই তাহার খ্যাতি, নৃত্য করিতেছিল অপরূপ ভঙ্গিতে। সঙ্গীত ও নৃত্যে নূপুরের রিণিঝিনি রবে, তন্বী তরুণীর উচ্ছ্বসিত দেহ-সৌন্দর্য্য, বিলাসী তরুণদের হৃদয়ে জাগাইতেছিল কামনার তীব্র লালসা। নর্ত্তকীর সুবর্ণ-রঞ্জিত উড়নী দুলিতেছিল খেলিতেছিল, আর বেণী? নিবিড়-নিতম্বিনী কমলার পৃষ্ঠদেশ চুম্বন করিয়া নাগরজনকেও হার মানাইতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে সৌরভে বিভোর সেই উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত নৃত্য-তরঙ্গ-মুখর স্কন্দদেবতার সেই নাটমণ্ডপে সকলের অজ্ঞাতে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন এক তরুণ অতিথি। দীর্ঘ তাহার দেহ, বলিষ্ঠ তাহার শরীর, কুঞ্চিত স্কন্ধবিলম্বী তাহার কুন্তলরাশি, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা, বিশাল দুইটি নয়ন, মুখে তাহার প্রভাতারুণের ন্যায় সমুজ্জ্বল দীপ্তি। শুভ্রবেশ, শুভ্র কারুকার্য্যখচিত কাশ্মীরি শাল কম কলেবরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। এই নবাগত তরুণ, নীরবে নৃত্যপরায়ণা কমলার দিকে অপলকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন নর্ত্তকীর অপরূপ নৃত্যভঙ্গি। সকলের দৃষ্টি সেদিকে না পড়িলেও, কমলার দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। দুইজনের নয়নে নয়নে মিলন হইল, কেহ জানিল না, অন্যে কেহ লক্ষ্যও করিল না।

নৃত্য শেষে নাগরিকের দল চলিয়া গেল। উজ্জ্বল দীপমালা ম্লান হইয়া আসিল। পূজক ও গাত্রোত্থান করিলেন, এমন সময় নর্ত্তকী সুবর্ণ-পাত্রে তাম্বূল রচনা করিয়া নবাগত তরুণের কাছে আসিয়া উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

তরুণ অতিথি তাম্বূল গ্রহণ করিলেন। উভয়ে আলাপ হইল—কৌশলে কমলা তরুণের পরিচয় জানিতে—চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারিল না, তারপর অনুরোধ করিলেন—রাজপথে বৃথা ঘুরিয়া বেড়ানো অপেক্ষা তাহার গৃহে অতিথি হইলে কমলা আপনাকে ধন্য মনে করিবে। অতিথি সম্মত হইলেন এবং কমলার গৃহে পাইলেন আশ্রয়।

এদিকে সে সময়ে রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধনের কাছাকাছি কোথায় একটা সিংহ আসিয়াছে, তাহার ভয়ে পৌরজন ভীত, সিংহ অনেকের প্রাণনাশ করিয়াছে। সেই জন্য নগরবাসী শঙ্কিত। একদিন গভীর নিশীথে—অতিথি শুনিলেন সিংহের গভীর গর্জ্জন যেন মেঘমন্দ্র। কাহাকেও না বলিয়া রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ধীরে নীরবে কমলার পুরী হইতে তরুণ পথিক বাহির হইলেন এবং নগরীর প্রান্তদেশে এক বনানীর কাছে সিংহের সহিত হইল তাঁহার সাক্ষাৎ। সিংহে ও মানুষে চলিল যুদ্ধ। সিংহ মরিল। বিজয়ী অতিথি নীরবে আসিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে নগরের লোকেরা বিস্মিত হইল, দেখিল সিংহ মৃত। আর সিংহের মুখ-বিবরে একটি স্বর্ণ কেয়ূর। কেয়ূরের গায়ে খোদিত লিপি—"কাশ্মীর-রাজ জয়াপীড়।"

গৌড়রাজ জয়ন্ত বিস্মিত হইলেন, তবে কি জয়াপীড় তাঁহার রাজধানীতে কোথাও আছেন? কোন্ উদ্দেশ্যে—কেন জয়াপীড় আসিলেন? নগর কোতোয়ালকে বলিলেন:—সন্ধান কর কোথায় আছেন ছদ্মবেশে কাশ্মীর রাজ। অবশেষে সন্ধান মিলিল নর্ত্তকী কমলার প্রমোদ-ভবনে। অমনি রাজা মহাসমারোহে জয়াপীড়কে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিলেন এবং একদিন শুভ লগ্নে তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন রাজকুমারীর অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী কল্যাণী দেবীর। সে বিবাহের উৎসব দিনেও কমলা নৃত্য করিয়াছিল কিন্তু সেদিন সেই সভাস্থলে কমলার নৃত্যভঙ্গী হইয়াছিল বিফল, আর বাজি তাল ভঙ্গ ও হইয়াছিল, কিন্তু সে সভাস্থলে কোন কবি ছিলেন না, তাহা হইলে হয়ত কমলার উপর অভিশাপ বর্ষিত হইত। কমলার নয়ন-কোণে যে অশ্রুরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল জয়াপীড় কি তাহা

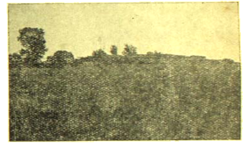

মহাস্থানগড়ের সাধারণ দৃশ্য

দেখেন নাই?—দেখিয়াছিলেন বলিয়াই পরে কমলাকেও তিনি বিবাহ করিয়া নিজ রাজ্য কাশ্মীরে লইয়া গিয়াছিলেন।

কহ্লন মিশ্র "রাজতরঙ্গিনীতে" লিখিয়াছেন:—কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় বা বিনয়াদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন এক বিপুল সৈন্যদল সহকারে, কিন্তু যেমন জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন অমনি তাঁহার শ্যালক জজ্জ কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ক্রমে ক্রমে জয়াপীড়ের সৈন্যগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, তখন নিরুপায় বিনয়াদিত্য ধনসম্পদকে বিদায় দিয়া সঙ্গে অতি সামান্য সৈন্য লইয়া আসিলেন প্রয়াগধামে। প্রয়াগধাম হইতে পরে ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে আগমন করিলেন এবং আশ্রয় লইলেন নর্ত্তকী কমলার গৃহে এবং একটি সিংহ বধ করিয়া নগরবাসীর কাছে পরিচিত হইয়া পড়িলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-রাজ জয়ন্ত তাঁহার কন্যা কল্যাণী দেবীকে জয়াপীড়ের হস্তে সমর্পণ করেন এবং জয়াপীড় পাঁচজন গৌড়দেশীয় নৃপতিকে পরাজিত করিয়া জয়ন্তকে গৌড়দেশের সার্ব্বভৌম নরপতির পদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কহ্লনের এই কাহিনী ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করেন না।—ঐতিহাসিকগণ জয়াপীড়ের গৌড়বিজয় কাহিনীর মধ্যে কোনরূপ সত্য আছে বলিয়া মনে করেন না। মার্ অরেল্ ষ্টাইনের মতে:— It is impossible in the absence of other records to ascertain the exact elements of historic truth underlying kalhan's romantic story * * * The king's wanderings during the exile seem to have taken him to Bengal and to have subsequently been embellished by popular imagination." * অর্থাৎ কহ্লনের এই বিবরণের মধ্যে কতটা সত্য আছে তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে, কেননা এমন কোনও ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়না, যাহার দ্বারা ইহা সত্য বলে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ জয়াপীড় রাজ্যচ্যুত হইয়া গৌড়দেশে বা বাঙলা দেশে গিয়াছিলেন এবং তাহা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে এই অপূর্ব্ব উপন্যাসের কাহিনী।

ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ (Vincent A. Smith) জয়াপীড়ের বাঙালা দেশে গমন সম্বন্ধেই একেবারে সন্দিহান, তিনি উহা একান্ত কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বলেন। *

'গৌড়রাজমালার' লেখক স্বর্গীয় রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিয়াছেন :—"যতদিন না সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, ততদিন জয়ন্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিম্বা জয়াপীড়ের অজ্ঞাতবাস উপন্যাসের উপনায়ক মাত্র, তাহা বলা কঠিন।"

[গৌড়রাজমালা : পৃঃ ১৮]

মহাস্থানগড় বেড়াইতে আসিয়া সেদিন জঙ্গলের খালের পাশে বসিয়া আমার কাছে ইতিহাস ও উপন্যাস এক হইয়া গিয়াছিল। করতোয়া শীর্ণ-কলেবরা ধীরে মন্থরগতিতে বাহিয়া যাইতেছে। একদিনকার জনদেবী মন্দিরের ভিত্তি মূল, কয়েকটি সিঁড়ি ও কক্ষ চিহ্ন আজ মৃত্তিকাস্তূপ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। আমি তাহা দেখিতে দেখিতে অতীতের একটি দিনের কথা স্মরণ করিতেছিলাম সে কাহিনী সত্য বলিয়াই মনে হইতেছিল—মনে হইতেছিল—কমলা কি এখনও এখানে নৃত্যপরায়ণ ছন্দে উৎসব নিশীথে দেখা দেয় নাকি ?

ফাল্গুনের শেষ। আমি সে সময়ে মহাস্থানগড় দেখিতে গিয়াছিলাম। বগুড়ার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গত ভক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। প্যারীবাবুর পুত্রেরা আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আমি পরদিন সকালবেলা একখানি একা ভাড়া করিয়া চলিলাম মহাস্থানগড় দেখিতে। মহাস্থান বগুড়া সহর হইতে প্রায় সাত মাইল বা তাহা অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী দূর হইবে। সহরের কতকটা দূর পর্য্যন্ত পথ এক রকম মন্দ নয়, তারপর রাস্তা পাকা হইলেও সুবিধাজনক নহে। বেলাও বাড়িতেছিল। করতোয়া নদী মহাস্থানের পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

পথের দুই দিকে গ্রাম ও কোথাও বিস্তৃত মাঠ। আমি যে সময়ে গিয়াছিলাম সে সময়ে পথের অনেকটা অংশ ভগ্নপ্রায় ছিল, তাই মোটর বা ঘোড়ার গাড়ী না পাওয়ায় আমাকে একার আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সে একার ঘোড়া দুইটি আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতেছিল।

মহাস্থানের কথা বরাবর শুনিয়া আসিয়াছিলাম, তাই দেখিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম। খানিকদূর আসিতেই পথে পড়িল 'ভীমের জাঙ্গাল'। বগুড়া হইতে দুই মাইল দূরে বৃন্দাবনপাড়া গ্রামে ভীমের জাঙ্গালের উচ্চতা বেশ সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। এই জাঙ্গালটি পথের দুই দিক দিয়া সমান্তরালভাবে বহিয়া চলিয়াছে। বগুড়া সহর হইতে ভীমের জাঙ্গাল আরম্ভ হইয়া রংপুর জেলার পাশিতলা পর্য্যন্ত এই জাঙ্গাল চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভীমের জাঙ্গালের চিহ্ন অনেক স্থান হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বগুড়া সহরের উত্তরে ফুলবাড়ীর নিকট কতকটা চিহ্ন আছে, এই জাঙ্গালের উপর মহাস্থানগড় অবস্থিত। এই গড় সহর হইতে সাত মাইল, আট মাইল—কোন কোন স্থানে অতীতের কীর্ত্তিবিভূষিত ধ্বংসাবশেষ ১০।১১ মাইল দূরেও আছে। করতোয়া নদীর স্রোত গড়ের যে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে সেই স্থান পাথরঘাটা নামে পরিচিত।

আমরা 'ভীমের জাঙ্গালের' উপরে উঠিয়া অল্প একটু স্থান বেড়াইয়া আসিলাম। উহার উপরে ছোট ছোট ঝোপ জঙ্গল ও গাছপালা রহিয়াছে। অনেকের মতে এই জাঙ্গাল কৈবর্ত্তনায়ক ভীমের স্মৃতি বহন করিতেছে। পার্ব্বতীপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ১০।১২ মাইল দূরে ও 'ভীমের গড়' নামক একটি দুর্গ আকারের ধ্বংস চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ভীমের জাঙ্গালের লোহিতবর্ণের মৃত্তিকাস্তূপ বরাবর পশ্চিম মুখে যাইয়া নানা গ্রাম ও পল্লী অতিক্রম পূর্ব্বক করতোয়া তীরের ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত গিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই যে মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীর তাহাকেই 'ভীমের জাঙ্গাল' বলে। 'ভীমের জাঙ্গাল' নামের পথটি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ই দেখা যায়। ইহা মহাস্থানগড়ের উপপুর নামে পরিচিত।*

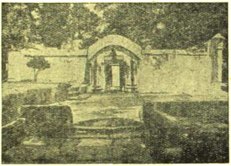

দরগার সাধারণ দৃশ্য

আমরা এইরূপ মৃত্তিকা প্রাচীরবেষ্টিত সুরক্ষিত স্থান বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানেও দেখিয়াছি, সেকালে এইরূপ নগর রক্ষার ব্যবস্থা ছিল, আবার বন্যার আকস্মিক আক্রমণ হইতে নগর বা পল্লীর রক্ষার জন্যও ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে—সেরূপও দেখিয়াছি।

বৈদ্যদেবের কমৌলিগ্রামে আবিষ্কৃত লিপি "কমৌলি-লিপি" নামে প্রসিদ্ধ। সেই কমৌলি-লিপি হইতে জানা যায় পালবংশের নরপতি রামপাল ভীম নামক কৈবর্ত্ত রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পিতৃভূমি বরেন্দ্রীর উদ্ধার সাধন করেন। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত

---

* Chronicles of the kings of Kashmere, vol 1, p, 94.

* Jayapida, or Vinayaditya, the grandson of Muktapida, is credited with even more adventures than those ascribed to his grand father. Probably it is true that he defeated and dethrond the king of Kanauj, apparently Vajrayudha. But the romantic tale of his visit incognito to the capital of Paundravardhana iq Bengal, the modern Rajshahi District, then the seat of government of a king named Jayanta, unknown to sober history, seems to be purely imaginary.—V. A. Smith Early History of India 3rd edition, P. 372-373,

* Bhim is said to built a large fortified town south of Mahasthan which is marked by great earth work still in places as much as the twenty feet high. Those earthworks are called by people Bhim Jangal. Hunters statistical account of Bogra Dist, p. 196,

'রাম চরিতে' এবং কমৌলি তাম্রশাসনে এ বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা: "রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া রাবণ-বধান্তে জনক-নন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন, রামপাল দেবও (যথাবৎ) সেইরূপ দুর্ণর্ব সমুত্তীর্ণ হইয়া, ভীম নামক ক্ষৌণীনায়কের দর্প নাশ করিয়া জনকভূমি [বরেন্দ্রী] লাভে ত্রিজগতে [শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়] আত্মযশ বিস্তৃত করিয়াছিলেন। [গৌড়লেখমালা' –১০৮ পৃষ্ঠা] প্রশস্তিটি এই—

"তস্তোর্জ্জিত—গৌরবস্থ নৃপতঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
পুত্রঃ পালকুলাব্ধি—শী—
ত কিরণঃ সাম্রাজ্য বিখ্যাতকীর্তিঃ।
ত্রেতে যেন জগত্রয়ে জনকভূ-লাভাৎ যথাবর্ণ
ক্ষৌণী-নায়ক-ভীম—
রাবণ-বধাদ্যাব্ধ যেতঃবনাৎ।

[বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসন, চতুর্থ শ্লোক—গৌড়লেখমালা—১২১ পৃষ্ঠা]

বেলা যখন প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে—ঠিক্ সেই সময়ে আমরা মহাস্থানগড়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। পূর্ব্বদিকে শ্যামল মাঠের প্রান্ত দিয়া করতোয়া বা সদানীরা প্রবাহিতা। একপাশে শুধু নদীর জল। মধ্যদেশ বিশুষ্ক প্রায়—আর মাঠের পর মাঠ—তার পর সে মাঠ গিয়া ঠেকিয়াছে নদীর পর পারের কোন্ এক অপরিচিত পল্লীর প্রান্ত সীমায়। উত্তর বঙ্গের শীত তখনও পালায় নাই, কাজেই বিশেষ ক্লান্তি অনুভব করি নাই।

মহাস্থানগড়ের বিস্তৃত সমতলভূমি উত্তর ও দক্ষিণে বহু স্থান লইয়া বিস্তৃত। সমতলভূমি হইতে উহার বিস্তার বড় কম নহে। আর সমতলভূমি হইতে উহার উচ্চতাও হইবে প্রায় ১০।১৫ ফুট। আমরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে একটি ছায়া-শীতল-পল্লবঘন আম্রবৃক্ষের নীচে দাঁড়াইয়া দেখিলাম মহাস্থানগড়ের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। গড়ের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ইষ্টক রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। শুধু পূর্ব্ব দিকের স্থানে স্থানে কিছু কিছু অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে।

আমি এখন চলিলাম গড়ের নীচ দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে সেই রাস্তাটি ধরিয়া শেষ প্রান্তে যে স্থানে মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে মাটি খুঁড়িয়া কতকগুলি অট্টালিকার ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে সে স্থান দেখিতে। পথটি ধূলিভরা—সে পথ দিয়া আবার গোরুর গাড়ী ও এক্কা চলিতে থাকায় চারিদিকে ধূলির ঝড় উঠিতেছিল।

পথের বাঁদিকে গড় অবস্থিত।

করতোয়া যেখানে বাঁকিয়া চলিয়াছে তাহারি প্রান্তে মহাস্থান গড়ের প্রায় দেড় মাইল দূরে দক্ষিণ দিকে বাঘোপাড়া গ্রামে স্কন্দের ধাপ অবস্থিত। এইখানেই নাকি স্কন্দদেবের বিরাট মন্দির ছিল। ভিত্তি বেশ সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে এবং কয়েকটি গৃহের সামান্য প্রাচীর, গর্ভগৃহ এবং নাটমণ্ডপের কতকটা অংশও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোপানাবলি বেশ ভালই আছে। এক সময়ে যে মন্দিরটি বৃহদাকার এবং নানারূপ কারুকার্য্যখচিত ছিল তাহা এখনও খোদিত ইষ্টক হইতে উপলব্ধি করা যায়। স্কন্দের মন্দিরাবশেষের পার্শ্ব দিয়া একটু উপরে উঠিলাম, সেখানেও আর একটা মন্দির ছিল, তবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় ছিল বলিয়া অনুমান করিলাম। সেই উচ্চস্থান হইতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারদিকে বিশাল প্রান্তর ও সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শুধু ভিত্তিভূমিই দেখা যাইতেছিল, আর দেখিতেছিলাম উঁচু মাটির স্তূপ।—একজন সরকারী রক্ষী চৌকিদার সেখানে একটি টিনের ছোটঘরে বাস করিতেছিল। সে আমাকে সাদরে সেলামের পর সেলামই যে শুধু জানাইল তাহা নহে, পরম যত্নসহকারে টাট্‌কা গোরুর দুধ দিয়া চা পান করাইল এবং একা এই নির্জ্জন স্থানে কল্‌কাতা সহর ছেড়ে—এখানে যে তাহার ভাল লাগিতেছিল না, তাহা বলিতেছিল, আর সে পুনঃ পুনঃ আমাকে এই অনুরোধ করিল যাহাতে শীঘ্রই কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে পারে সে চেষ্টা করিতে। আমার মুখে কয়েকজন প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্তৃপক্ষের নাম শোনায় আমার প্রতি বোধ হয় তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাহাও যে অহেতুকী নহে তাহা ঐ সরলীর কথায়ই উপলব্ধি করিলাম। বাস্তবিকই সন্ধ্যার পর এই নির্জ্জন পরিত্যক্ত অতীতের শ্মশানে বাস করা কি সহজ?

চৌকিদার আমাকে সঙ্গে করিয়া একে একে সব দেখাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল এবং সঙ্গী হইল।

যাঁহারা গৌড় দেখিয়াছেন, যাঁহারা পাণ্ডুয়া দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন অতীতের গৌরব স্মৃতি বিজড়িত সেই বনজঙ্গল ও মাঠ ময়দানার কতবড় মহাশ্মশান, কত বড় শোক দুঃখের সমাধিভূমি! মহাস্থানের বিশাল প্রান্তর ও তেমনি শত শত স্মৃতিবিজড়িত মহাশ্মশানভূমি।

এইবার আমরা গোবিন্দের ধাপের কাছে আসিলাম। গোবিন্দের ভিটা মহাস্থানগড়ের উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে—প্রাথমিক গুপ্তযুগের স্মৃতিচিহ্ন লইয়া বিরাজিত। গোবিন্দের ধাপটিও বেশ উচ্চভূমিতে অবস্থিত। এদিকে ওদিকে বুনোঘাস ও কণ্টকগুল্ম পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল—এক সময়ে গোবিন্দ বা বিষ্ণুদেবের মন্দির যে বৃহদাকারে ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই মন্দিরের গাত্রোত্তরে যে একটা বিশেষত্ব ছিল—ভারতের অন্যান্য দেবমন্দিরের সহিত যে সাদৃশ্য ছিল তাহা এ মন্দিরের ধ্বংস-চিহ্ন দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়।—একবারে গোবিন্দের ধাপের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত করতোয়ার জলে বাঁধ দিয়া খনন করায় নদীগর্ভ হইতে বহু প্রস্তরখণ্ড এবং একটি প্রস্তর প্রাচীরের কতকটা অংশ বাহির হইয়াছিল। ঐ প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৫০ ফিট। বন্যার জলে কোথায় যে তাহা ভাসিয়া গিয়াছে আজ আর তাহার কোনও অস্তিত্বই দেখা যায় না। গোবিন্দের ভিটাটি আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। নিম্নাংশে সিঁড়ির প্রশস্ত ধাপ, তার পরে ভিত্তির উপরের এক দীর্ঘ লম্বিত অংশে উহার গায়ে স্তরে স্তরে টেরাকোটা আছে, কোনটিতে দেবমূর্ত্তি কোনটিতে অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট পশুপক্ষীর—কোথাও বিবিধ কারুকার্য্যমণ্ডিত লতাপাতা ফুল ও ফল কোথাও বা জালিকাটা এইরূপ রহিয়াছে। তার উপরিভাগে মৃত্তিকার স্তূপ—ইষ্টকরাজি—উভয় পার্শ্বেই ঐরূপ; সর্ব্বোপরি আবার ইষ্টক স্তূপ—এই সব দেখিয়া মনে হয় যে মন্দিরটি প্রকৃতপক্ষেই উচ্চ শিখরবিশিষ্ট এবং বৃহদায়তনের ছিল। এখনও উহার অনেকাংশ যে নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে তাহাই মনে হয়। স্থানীয় লোকে ইহাকে বলে গোবিন্দের ভিটা—অনেকের মতে ইহার প্রাচীন নাম ছিল গোবিন্দ দ্বীপ, কেননা উহার চারিদিক বেড়িয়া সদানীরা কলকল্লোলে বহিয়া যাইত। এক সময়ে যে এখানেই বিষ্ণুমন্দির ছিল সে কথা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন।

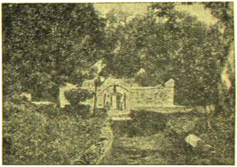
মন্দিরের প্রবেশ পথ, খোদিত লিপি সংযুক্ত চৌকাঠ

গোবিন্দের ভিটার সংলগ্ন একটি ঘাট অতি পুণ্যস্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রতি বৎসর বারুণী ও পৌষসংক্রান্তির দিন নারায়ণীযোগ উপলক্ষে এখানে উত্তরবঙ্গের এবং বঙ্গের নানা স্থান হইতে স্নানার্থী নরনারী আসিয়া থাকে। যাত্রীসমাগমে তখন এই নির্জ্জন প্রান্তর জনকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। করতোয়া পুণ্য নদী। পৌষমাসে সোমবারে মূলানক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যা তিথি হইলে "নারায়ণী" নামক যোগ হয়। ঐ সময়ে নৈশযোগে করতোয়াতে স্নান করিলে কোটিকুল উদ্ধার হয়। এ বিষয়ে 'করতোয়া মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ আছে। মহাভারতের 'বনপর্ব্বে' যে তীর্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে করতোয়ার কথাও আছে। করতোয়া নদীতে অবগাহন স্নান করিয়া ত্রিরাত্র যদি কোন নর বাস করে তবে তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে।

কালিকা-পুরাণে আছে :

করতোয়া সদা গঙ্গা পূর্ব্বভাগার্দ্ধবিজিতা।
বারর্ক্ষিত কাম্যাপি তাবৎ দেশঃ পুরঃ হরঃ।

যোগিনীতন্ত্রে ও করতোয়ার উল্লেখ আছে। করতোয়া-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে :

করতোয়ে সদানীরে সরিৎ শ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে। ইত্যাদি

আমরা ক্রমশঃ মানকালির ঢাপের কাছে আসিলাম। ঐ ঢাপের পশ্চিম দিকে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের চিহ্ন দেখা যায়। এ বিষয়ে 'বগুড়ার ইতিহাস' লেখক বলেন : "দায়ুদ শাহের সহিত আকবর শাহের সেনাপতি খান্ খানান্ মুনিমখাঁর যুদ্ধকালে মুনিম খাঁ টাঁড়া অধিকার করিলে দায়ুদশাহ এবং রাজুখা কালাপাহাড় ও সোলেমান খাঁ মানকালী ও বাবুই মানকালী ঘোড়াঘাটে পলায়ন করেন। মুনিম খাঁ, মজনুন খাঁ কাকশালকে ঘোড়াঘাটে প্রেরণ করেন। ঘোড়াঘাটে সোলেমান খাঁ মানকালী ও অন্যান্য পাঠান প্রধানগণ পরাজিত ও নিহত হন। বাবুই মানকালী ও রাজু পলায়ন করেন। * * সম্ভবতঃ এই সকল সময় মহাস্থানগড় কিছুকালের জন্য এই মানকালীদিগের অধীনে ছিল। কানিংহাম সাহেব এইস্থানে একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের পাদপীঠের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে "নারায়ণ" এই শব্দটি উৎকীর্ণ ছিল।"

আমরা মানকালীর ঢাপের ইষ্টকাদি এবং অন্যান্য কারুকার্য্য খচিত ইষ্টকাদি দেখিয়া অনুমান করিতে পারি যে উহা পাঠানদের আমলের পূর্ব্বে বৌদ্ধ বা হিন্দুদেরই কোনও মঠ বা বিহার ছিল।

রৌদ্র বাড়িতেছিল। আর আমরা ধ্বংসের পর ধ্বংস চিহ্ন ও আবিষ্কৃত বিহার ও মন্দিরের ভিত্তি, প্রাচীরের অংশ ইত্যাদি দেখিয়া যাইতেছিলাম। সে সকলের বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক আর তাহাদের প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য এখন পর্য্যন্ত সঠিক্ ভাবে জানা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

পরশুরামের বাড়ী নামে পরিচিত যে ধ্বংসস্তূপের নিকট আসিলাম—তাহার অনেকটাই রহিয়াছে মৃত্তিকাগর্ভে, যে সামান্য অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে তিনটি কক্ষ উল্লেখযোগ্য। কক্ষ তিনটি ক্ষুদ্র—মাটি ও ইট একসঙ্গে গাঁথিয়া তৈয়ারী—কক্ষের মেঝগুলিও ইষ্টকনির্ম্মিত। কাছেই একটি ইঁদারা দেখিলাম, ইঁদারাটি বেশ বড়, শুনিলাম ইহার নাম জীয়ৎকুণ্ড। এইরূপ জীয়ৎকুণ্ড বা পুকুরের পরিচয় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। আমিও এইরূপ 'জীয়ৎকুণ্ড' বা পুকুর বাঙ্গলার নানাস্থানে অন্ততঃ ২০০ শত ২৫০ শত দেখিয়াছি। আর সর্ব্বত্র একই কাহিনী—গোমাংস ফেলিয়া উহার সঞ্জীবনীশক্তি বিনষ্ট করা হইয়াছে। এখানে কয়েকটি প্রস্তরখণ্ডের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। পরশুরাম ছিলেন—মহাস্থানগড়ের শেষ নৃপতি।

এইরূপ ভাবে নানা পরিত্যক্ত ভিটা, প্রত্নতত্ত্ববিভাগের খননের ফলে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংস চিহ্ন ইত্যাদি অনেক দেখিলাম, সে সকলের প্রকৃত ইতিহাস এখনও উদ্ধার হয় নাই ভবিষ্যতে হয়ত হইবে। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খনন কার্য্য বন্ধ ছিল। Mr S C Mukerjee I C S যখন বগুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময় একবার মহাস্থানগড়ের খনন কার্য্য চলিয়াছিল।

আমার কাছে বিশেষ ভাল লাগিয়াছিল সুলতান সাহেবের দরগা। আমরা সেই গোবিন্দের ভিটা হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা জঙ্গলস্থান দেখিতে দেখিতে দর্গার পশ্চাদিক দিয়া খাড়া উঁচু পথে দর্গার পেছনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই দর্গাতে মহাস্থান-বিজয়ী সুলতান সাহেবের সমাধি বিদ্যমান। এখানকার এই দর্গা, মসজিদ ইত্যাদি সুরক্ষিত। আমরা পরিশ্রান্ত দেহে দর্গার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর আছে। দরগাটি আশ্রমের মত নির্জ্জন ও তরু-ছায়া শীতল। আমগাছ, কাঁটালগাছ, তেঁতুলগাছ ও পাকুড়গাছ প্রভৃতি নানা তরু উহাকে শান্ত ও সমাহিত করিয়া রাখিয়াছে। সাহ সুলতানের সমাধিটি সুরক্ষিত। এই আস্তানার প্রাচীরের বাহিরে প্রবেশ দ্বারের পশ্চিম পার্শ্বে একটি সুবৃহৎ গৌরীপাট ও যে প্রস্তরাসনে বসিয়া পুরোহিত পূজা করিতেন, সে আসনখানি দেখিলাম। গৌরীপাটের ব্যাস হইবে প্রায় ৩ ফুট ৩। ফুট।

সুলতান সাহেবের দরগায় যাইবার সোপানশ্রেণী

আমি কানিংহামের লিখিত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রকাশিত পুরাতত্ত্ব বিবরণী এই দর্গার বিষয় বিশেষ করিয়া পড়িয়াছিলাম। লক্ষ করিয়া দেখিলাম আস্তানার দ্বারের প্রস্তরনির্ম্মিত চৌকাঠের সম্মুখে প্রস্তরফলকের উপরিভাগে প্রাচীন বাঙ্গালায় খোদিত রহিয়াছে 'শ্রীনরসিংহ দাসস্য'। লেখাটি তেমনি আছে—অনেকে অনুমান করেন এই লেখা আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর পুরাতন বর্ণলিপি।

আস্তানার চারিদিকে যে প্রাচীরের কথা বলিয়াছি—উহার উচ্চতা হইবে প্রায় ৬ ফিট। প্রাচীরের গায়ে অনেক ছোট ছোট কুলুঙ্গি দেখিলাম।

এই আস্তানার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ৬০০ একর জমি 'পীরপাল' আছে। এই পীরপাল দিল্লীর একজন সম্রাটের সনন্দমূলে প্রদত্ত। ঐ মূল সনন্দটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ জানিতে পারিলাম।

কথিত আছে পূর্ব্বে "যে স্থানে সাহ সুলতানের সমাধি অবস্থিত,

তথায় পূর্ব্বে (উত্তরাধব) ভূমিকেশ্বর নামক শিবের মন্দির ছিল। আস্তানার প্রাচীরের বহির্ভাগে প্রবেশ দ্বারের পশ্চিম পার্শ্বে একটি সুবৃহৎ গৌরী পাট ও প্রস্তরাসনে বসিয়া পুরোহিত শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন সেই প্রস্তরাসন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।" (বগুড়ার ইতিহাস ৮০ পৃষ্ঠা)

আমি দরগার বাহিরের সোপানের পাশে যে বসিবার স্থান আছে সেখানে বসিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পরে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম এবং মাঠের পথ দিয়া—চলিলাম শীলাদেবীর ঘাটের দিকে। মাঠের মধ্য দিয়া যে দু'পেয়ে পথ করতোয়া নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছে সেই পথ দিয়া শীলাদেবীর ঘাটের কাছে আসিলাম। ঘাটের কাছে একটি আম গাছ। পথটুকু দর্গা হইতে প্রায় আধ মাইলের উপর। ফাল্গুনের মধ্যাহ্ন তপন তখন আগুন ছড়াইয়া দিয়াছিল। আম গাছটির নীচে বসিলাম। সম্মুখে করতোয়ার স্রোতোধারা বহিয়া চলিয়াছে—আর মাঠের পর মাঠ, তার পর বনবীথিকাচ্ছন্ন পল্লী। বাতাস বহিতেছিল, শ্রান্ত শরীর জুড়াইয়া গেল।

এই শীলাদেবীর ঘাট সম্বন্ধে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদ এই যে মহাস্থানগড়ের শেষ রাজা পরশুরামের সঙ্গে সুলতান মাহি সোয়ারের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে পরশুরাম নিহত হন, পরশুরামের কন্যা বা ভগিনী শীলা দেবী সুলতানের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য খঞ্জরের আঘাতে সুলতানকে নিহত করিয়া করতোয়া গর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করেন। তিনি যে স্থানে আত্ম বিসর্জ্জন করেন—সেই স্থানে স্নান করিলে কিরূপ পুণ্যলাভ হয় শুনুন:

"বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে যৎপুণ্যং রাহুদর্শনে।
শিলাদীপং সমাসাদ্য তচ্চ কোটি গুণং ভবেৎ।
পৌষে বা মাঘ মাসে বা যদি সোমযুতা কুহূঃ।
ব্যতিপাতেন যোগেন কোটি কোটি গুণং ভবেৎ।"

শীলা দেবীর সম্পর্কে এই কাহিনীর মধ্যে কোনরূপ সত্য আছে বলিয়া কোনও ঐতিহাসিকই মনে করেন না। তবে বুকানন হ্যামিল্টন হইতে আরম্ভ করিয়া—যিনিই মহাস্থানগড় সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন তিনিই শীলা দেবীর কাহিনী লিখিতে ভুলেন নাই। একজন ইংরাজ ভ্রমণকারীও ত "Lay of Mahasthangarh" নামে একটি গাথাই রচনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন শিলাদীপ তীর্থই সম্ভবতঃ সঙ্গে সঙ্গে—শীলা দেবীর ঘাটে রূপান্তরিত হইয়াছে এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

এইবার মহাস্থানগড় সম্বন্ধে আমার দুই একটি কথা বলিতেছি। বর্ণিত আছে পুরাকালে পরশুরাম ঋষি তপস্যার জন্য ভারতবর্ষের বিবিধ স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরবর্ত্তী এই নির্জ্জন স্থানটিকে মনোনীত করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং সিদ্ধিলাভ করিবার পর উহা মহাস্থান এই নামে আখ্যাত করেন। এ বিষয়ে নানা পুরাণে নানারূপ কাহিনী আছে। পুরাণো মানচিত্রে—মুস্তানগড় নামে উল্লিখিত আছে—উহা বানান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রসূতই সম্ভব। মহাস্থান অতি প্রাচীন তীর্থ, সে কতদিনের প্রাচীন বলা কঠিন।

এক সময়ে ইহা পুণ্ড্রনগর, পুণ্ড্রবর্দ্ধন এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে পরিচিত ছিল। সেকালের পুণ্ড্রবর্দ্ধন ছিল এক সমৃদ্ধিশালী মহানগরী। এইখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী একে একে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোস্লেম-পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে। এইখানে একদিকে যেমন হিন্দুতীর্থযাত্রীরা বৎসরের পর বৎসর স্নান করিতে সমবেত হইয়াছেন, তেমনি চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ানচুয়াং হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বৌদ্ধ ভ্রমণকারী এই তীর্থে এখানকার বিহার ও মঠে তীর্থযাত্রী রূপে আসিয়াছেন। ইউয়ানচাংয়ের লিখিত বিবরণী হইতে এই মহানগরীর অতীত ঐশ্বর্য্য, সমৃদ্ধি, নগরবাসী ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পরিচয়—দর্শনস্থান, মঠ-মন্দির ও বিহারের স্থাপত্য কৌশল সবই জানিতে পারা যায়।

মহাস্থান গড়ের বর্ত্তমান ভগ্ন চিহ্নের পরিমাণ হইবে ৫০০০ ফুট উত্তর ও দক্ষিণে, আর পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩০০০ ফুট। সমতল ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা এখনও স্থানে স্থানে ১৫।২০ ফিটের কম হইবে না। কত মন্দির মঠ, মূর্ত্তি, শিলালেখ, ইষ্টক ও দেবদেবীর মূর্ত্তি, মুদ্রা ইত্যাদি যে এইস্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার অনেক পরিচয় সরকারের প্রকাশিত পুরাতত্ত্বঘটিত বিবরণীতে আছে। গড়ের দক্ষিণে কালীদহ সাগর। মনে হয় গড়ের প্রাকারের মাটি এই স্থান হইতে উঠানো হইয়াছিল। ঐ কালীদহ সাগর মধ্যে একটি দ্বীপ আছে। এখানে নাকি এক সময়ে মনসা দেবীর এক মন্দির ছিল।

মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত একখানি শিলালেখ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এখন ঐ শিলালেখখানি কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। শিলালেখনের অক্ষরগুলি মৌর্য্য যুগের ব্রাহ্মী। এই অনুশাসনটি যে মৌর্য্য যুগের তাহা নিঃসন্দেহ।

এই শিলালেখখানি হইতে জানা যায় যে মৌর্য্য যুগের কোন শাসনকর্তা (তিনি মৌর্য্যবংশীয় নাও হইতে পারেন) পুণ্ড্রনগরের অধিষ্ঠিত মহামাত্রকে আদেশ দিয়াছিলেন সংবংগীয়দের দুর্ভিক্ষজনিত ক্লেশ নিবারণের জন্য দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা। একটি হইতেছে—সংবংগীয়দের নেতা গলদনকে গণ্ডক মুদ্রা ঋণ দিয়া সাহায্য করিবে। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি হইতেছে ধান্যাগার বা গোলাঘর হইতে দুর্ভিক্ষ বা পীড়িত ব্যক্তিদিগের ধান দান করিবে। পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রের প্রতি এই আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য নির্দ্দেশ ছিল। আরও লিখিত ছিল যে—যখন পুনরায় সুদিন আসিবে, তখন ঋণদানের মুদ্রা এবং ধান্য গোলাজাত করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ টাকা এবং ধান প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। মৌর্য্য যুগে বাঙ্গালা দেশের স্থান বিশেষে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গ দেশেও যে রাজা গোলাঘর নির্ম্মাণ করিতেন, ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এই লিপি হইতে ইহা অনুমিত হয় যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন সে সময়ে মৌর্য্যরাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল।

মহাস্থানগড়ের চারিদিকে অনেক কিছু দেখিবার আছে, তাহার মধ্যে বৈরাগীর ভিটা, মুনির ঘোন, জীয়ৎকুণ্ড, পরশুরামের বাড়ী, মানকালী বা মানকালির ধাপ মন্দির, শাহ সুলতানের দরগা, পরশুরামের সভাবাটী, কালীদহ সাগর, শীলাদেবীর ঘাট, ব্যাঘ্রনখ খাল, খাগড়া দুয়ার, গোবিন্দের ভিটা—এই গোবিন্দের ভিটার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইখানে আদি গুপ্তযুগের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। যে স্কন্দের ভিটার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি উহা মহাস্থানগড়ের প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে বাঘোপাড়া গ্রামে অবস্থিত। উত্তরে গোবিন্দের ভিটা ও দক্ষিণে স্কন্দের ভিটা এই 'ক্রোশ পরিমিত স্থান পুণ্যভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

স্কন্দ গোবিন্দয়োর্মধ্যে ভূমি সংকৃতবেষ্টিতা।
অধ্যারোহণ মাত্রেণ নর নারায়ণো ভবেৎ।

মহাস্থান গড় হইতে প্রায় চারি মাইল দূরের একটি গ্রামের নাম 'বিহার।' ঐ গ্রামের পাশেই একটি বৌদ্ধবিহার ছিল—উহা ভাসু বিহার নামে পরিচিত—ঐ বিহারের চারিদিক খনন করিয়া অনেক কিছু প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। আমরা সময়াভাবে ভাসু বিহার দেখিবার সুযোগ করিতে পারি নাই।

বগুড়া ফিরিবার পথে দেখিয়া আসিয়াছিলাম—গোকুলের মেড়। এইখানে নাকি বেহুলার বাসর ঘর ছিল—এইরূপ কাহিনী প্রচলিত। গোকুল নামক গ্রামে অবস্থিত বলিয়া গোকুলের মেড় নামে আখ্যাত। এই স্তূপটি পাহাড়পুরের স্তূপেরই মত এক সময়ে জঙ্গলাকীর্ণ ও পরিত্যক্ত ছিল। আমি এই গোকুলের মেড় দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছিলাম। উক্ত স্তূপটিকে খননের ফলে বাহির হইয়াছে প্রায় ১৭০টি কক্ষ বিশিষ্ট এক বিরাট উচ্চ দেবায়তনের ধ্বংসাবশেষ। প্রত্যেকটি কক্ষ একটির পর একটি পরস্পর সংলগ্ন। স্তূপের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে প্রায়

পাঁচ ফুট বিস্তৃত কতকগুলি উচ্চ সোপানশ্রেণী প্রকাশিত হইয়াছে। সোপান শ্রেণীর উচ্চতা প্রায় পঁচিশ ফুট হইবে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ইহা একটি বিরাট বৌদ্ধবিহার বা দেবায়তন ছিল। আর সিঁড়ি বাহিয়া মৃৎকাচ্ছ শিখরে ছোট একটি কক্ষের পাশে আসিলাম সেখানে অল্প একটু অঙ্গন সেইটিও ইটের গঠিত। এখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকের দৃশ্য দেখিলে মনে হয় এক সময়ে এই মহাস্থানগড়—এই পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী, এই বিস্তৃত সমতল ও অসমতল ভূমি কি এক বিরাট নগরী ও শিক্ষা-সভ্যতা ও ধর্মকেন্দ্রস্থল ছিল। এই বিরাট মন্দির দেখিয়া মনে হইল এমন করিয়া যাঁহারা সুবৃহদাকারের বহু কক্ষ বিশিষ্ট দেবায়তন গড়িতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদের শিল্প নৈপুণ্য এবং স্থাপত্যবিদ্যা যে কত বড় পারদর্শিতা ছিল তাহা এক নিমেষেই বুঝিতে পারা যায়। না জানি বহু শিখর-বিশিষ্ট এই বিরাট দেবায়তন এই স্থানের কি অপরূপ সৌন্দর্য্যই না বৃদ্ধি করিত।

এই মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে নীচের দিকে টালির উপর নানা প্রকার জীবজন্তু, লতা, ফুল-ফল, মানুষ, পশু ও পক্ষীর চিত্র খোদিত রহিয়াছে। মন্দিরটি যে এক সময় স্থাপত্য-কীর্ত্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন ছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।—অনেকে অনুমান করেন যে এই মন্দিরটি গুপ্ত যুগের—ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর সমকালের হইতে পারে। এই প্রান্তেই নেতাই ধোপানীর পাট নামে আর একটি স্তূপ রহিয়াছে। আমি তখন শুনিয়াছিলাম যে এই স্তূপটিও খনন করা হইবে। কিন্তু সে সময়ে তাহা হয় নাই, সম্ভবতঃ কোনও এক সুযোগে সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই দিকে মনোযোগী হইবেন।

এখানকার কয়েকটি মূর্ত্তি ও প্রত্ন-চিহ্ন 'বগুড়ার ইতিহাস' লেখক প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় দান করিয়াছেন। যে সকল মুদ্রা, শিলালেখ ও মূর্ত্তি ইত্যাদি মহাস্থান ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে পাওয়া গিয়াছে সে সমুদয়ের সবিস্তার পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে।—মহাস্থানের চারিদিকে ও বগুড়া জেলার নানাস্থানে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কিছু নিদর্শন রহিয়াছে। ভাসু বিহার (Vasu Bihar) অবশ্য দর্শনীয়। কানিংহাম ইহাকে হুয়ান চাং বর্ণিত পোশি পো বিহার (Poshipo) বলিয়া মনে করেন। এইখানকার একটি দীঘি গুনক দীঘি নামে পরিচিত। গুনক নামে একজন নৃপতি নাকি উহা খনন করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার প্রদীপের দীপ্তি যখন বগুড়া সহরের ঘরে ঘরে দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে, তখন বগুড়ায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রশঙ্করবাবুদের আবাস ভবনে ফিরিয়া আসিলাম। মহাস্থান দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল—মানুষের যত দম্ভ—যত অহঙ্কার ও ঐশ্বর্য্য-সাধনা—কালপুরুষের করাল আক্রমণে এমন মহাশ্মশানেই পরিণত হয়।

বাঙ্গালীমাত্রেরই মহাস্থান দেখা উচিত, তাহা হইলে আপনা হইতেই বাঙ্গালীর প্রাণে তাহার অতীত কীর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে আবার নূতন করিয়া বঙ্গগৌরবকীর্ত্তি সাধনে উদ্বোধিত করিবে, মনে হইবে তাহার বাসভূমি জন্মভূমি পুণ্যভূমি। মহাস্থান দেখা তেমন কঠিনও নহে। বগুড়া হইতেই মহাস্থান এবং তাহার নিকটবর্ত্তী ঐতিহাসিক কীর্ত্তি বিমণ্ডিত স্থানগুলি দেখা যায়, তবে ভাল করিয়া দেখিতে হইলে এক সপ্তাহ থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে ভ্রমণের আনন্দ এবং দর্শনের আনন্দ উভয়ই হইতে পারে।

দেব নিন্দা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দেবতাকে লক্ষ্য করে যারা পরিহাস,
বোঝে না অবুঝ কত বড় করে ক্ষতি,
দণ্ড চরণ ফেলি ঘোরে চারি পাশ
যে বেদীতে করে মহাপুরুষেরা নতি।

২

জগৎ বন্ধু যে প্রেমের কথা কহি',
মুনি ঋষি সাধু করেন যাঁদের ধ্যান,
চরণেতে নত যত ইন্দ্রিয় জয়ী,
সে প্রেমের কথা বুঝিবে কি অজ্ঞান!

৩

সাপের মহিমা জানে নাকো সকল,
গরুড়ের কথা চড়াই বলিবে কি ?
মন্দিরে উঠে লাফাইয়া ভেক দল
বেড়াইয়া মরে বিগ্রহের চৌকী।

৪

যুগের যুগের মহামানবেরা সব—
যে প্রেমের কথা কহিল ধন্য তাই,
ভকতের বুকে যে প্রেমের উৎসব
তাঁর কি সহজে দেখাতেও ঠাঁই নাই।

৫

তুলসী তরুরে করো না কলঙ্কিত,
অন্ততঃ সেথা থমকি দাঁড়ায়ে রও,
সাধু সজ্জন যেথা হেথা শঙ্কিত,
মহিমা বুঝার অধিকারী তার নও।

৬

তোমা চেয়ে আরও যদি নিকৃষ্ট জীব,
ভক্ত, দেবতার, করে থাকে অপমান,
দূষিত কর না নিজেই নিজের জিব
কাটি ফেলো আর হিসাবে মলো কান।

মা

শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন রায়

ট্রেণ থামতেই প্রস্ফুটিত শিউলী ফুলের মত সুনন্দা টুপ্‌ ক'রে নেমে পড়ল।

আধুনিক তরুণী সুনন্দা। সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে—কিন্তু বিয়ের রং লাগে নি বুঝি ভাল করে। কপালে দুই ভ্রূর মাঝখানে, যেখানে থাকা উচিত ছিল একটি ছোট্ট রাঙা সিন্দুরের টিপ, সেখানটা ফাঁকা, ছোট্ট কপালে ওসব জবড়জং জিনিস নাকি মানায় না—সুনন্দার এই মত। সিঁথির প্রান্তে একটা শীর্ণ ক্রমবিলীয়মান সিন্দুর-রেখা এয়োতীর চিহ্ন ঘোষণা করছে অবিশ্যি, তাও তত জোরালো সুরে নয়, কিন্তু রঙের এই অল্পতা পূরণ করা হয়েছে ঠোঁটের এবং গালের রংয়ের প্রাচুর্যে।

ছিপছিপে গড়নের শরীরকে সাপটে জড়িয়ে শাড়ীটা বেশ লতিয়ে উঠেছে। গায়ে হাত-কাটা ব্লাউজ, কুমারী মেয়ের মত খাটো আঁচল ওপরে উঠবার কোন প্রয়াস না করে ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে।

হাইহিল্ জুতোর খুট্‌ খুট্‌ শব্দের তরঙ্গ তুলে সুনন্দা খানিকটা পেছিয়ে গেলো, চাকর মহুয়া পিছনের কামরায় মালপত্র নিয়ে বসেই আছে হয়ত। যে হাবা গঙ্গারাম! তবে কি কিছু ঠিক আছে নাকি! স্বামী অশোককে বিশেষ কিছুই করতে হোল না। কোন কাজ করে নিজেকে বড় মনে করবার অবকাশই বা পেল কোথায় সে! সুনন্দা একাই একশো।

…ষ্টেশনটি ছোট। সুনন্দাদের এখানে পাক্কা দুঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। মেন লাইনে তাদের যাত্রা এখানেই শেষ। এবার ব্রাঞ্চ লাইনে যাত্রা সুরু করতে হবে। সুনন্দার আর বিরক্তির সীমা নেই। সেই কখন থেকে শুধু একঘেয়ে খটাখট্‌ শব্দ, তারপর আবার এই দুঘণ্টা ধরে ধুঁকতে থাক বসে বসে!

অশোক দোষী চোরের মত মুখ কাচুমাচু করে বলল—'তুমি ওয়েটিং রুমে না হয় বস একটু; আমি বরং দেখি কিছু ফল-ফলুরী যদি পাওয়া যায়—'

সুনন্দা ওয়েটিং রুমের দিকে এগোতে এগোতে নিখুঁত বিলিতী কায়দায় 'স্রাগ্' করে চলল,—'বেশ যাও। তবে জিনিষ-পত্র গুলো সব এক জায়গায় গুছিয়ে রেখে যেও। আমি আর ধেই ধেই করে তোমার চাকরের পেছনে নাচতে পারব না কিন্তু।'

—বেশ, মৃত গলায় উত্তর করল অশোক।

ওয়েটিং-রুম ফার্ষ্ট থেকে আরম্ভ করে থার্ড অবধি সকল শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যই ওই সবে ধন নীলমণি।

সেটিও আবার খালি নয়, একটি স্ত্রীলোক তার বছর তিনেকের মেয়েকে নিয়ে আগে থেকেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছে।

ওয়েটিং-রুমে পা দিতেই সুনন্দা একবার থমকে দাঁড়াল, মুখ দিয়ে বিরক্তি যেন উপ্‌চে পড়তে লাগল তার। অশোক মৃদুস্বরে বলল—'কি করবে বল, কোনমতে দুঘণ্টা চালিয়ে নাও, লক্ষীটি।'

সুনন্দা চোখের ইশারায় ঘরের মাঝখানে ঘোমটা দেওয়া কাপড়ের পুঁটলিটির দিকে অশোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—উপায় নেই—গোছের মুখ-ভঙ্গী করে অস্ফুট কণ্ঠে বলল—'বেশ যাও।'

অশোক চলে যেতেই স্ত্রীলোকটি ঘোমটা তুলে ডাগর চোখ দুটি মেলে সুনন্দার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখের দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না—এমন দৃষ্টি শুধু দেখা যায় টিকিট-চেকার দেখে টিকিট-বিহীন যাত্রীর চোখে। সুনন্দা এসব কিছুই গায়ে মাখল না। গায়ে না মাখাই তার স্বভাব।

সোজাসুজি ভাঙা বেঞ্চিটার ওপর বসে রুমাল দিয়ে সুগৌর মুখখানি সযত্নে মুছতে মুছতে বলল—'কোথায় যাবেন?'

বধূটি অস্ফুট স্বরে কি একটা জায়গার নাম করল। সুনন্দা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—'আপনার মেয়ে বুঝি! কথা জমাবার খাতিরে পথে ঘাটে এরকম আলাপ অনেক সময় হ'য়ে থাকে। বধূ ঘাড় নেড়ে চুপ করে রইল। আঃ কি গেঁয়ো যে বাবা! শুধু ঘাড় নেড়েই খালাস! কথা বলাও বারণ নাকি!

সুনন্দা নেহাৎ দায়ে পড়েই আবার বলল—'ট্রেণে খুব ভীড় হয়েছিলো, নয়?

এবার বধূর মুখ খুলল, সলজ্জ কণ্ঠে বলল—'হ্যাঁ, খুব ভীড়। আপনার আর কষ্ট কি, নামলেন তো দেখলাম সেকেণ্ড ক্লাস থেকে—কথা বলে সে ফিক্‌ করে একটু হেসে উঠল।

মেয়েটি এতক্ষণ পাশে ব'সে গোটা তিনেক আঙুল একসঙ্গে মুখের মধ্যে পু'রে দিয়ে অবাক হয়ে সুনন্দাকে দেখছিলো, হঠাৎ তার হারানো বায়নাটা মনে পড়ে গেলো হয়ত। অনুনাসিক স্বরে মার আঁচল ধরে বলল—'মা খিঁদে পেয়েছে।'

বধূ মেয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল,—'এই তো বাবু আনতে গেছেন, এলেন বলে—'

মেয়ে কিন্তু দেরী করতে রাজী নয় এক মিনিটও—'না এক্ষুণি দাও।'

বধূর মহা মুস্কিল! কি ব'লে এখন সান্ত্বনা দেবে সে মেয়েকে; মেয়েটিও অনুনাসিক সুরটা চড়িয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে তা কান্নার পর্দায় তুলে নিয়ে আসছে।

সুনন্দার আর সহ্য হোল না। সে ঠোঁট চেপে দাঁতে চিমটি কাটল—'ভারী অসভ্য তো!

অসভ্য মেয়ের সুসভ্য হওয়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না। তার কান্নার সুর তখন সপ্তমে উঠেছে।

বধূ ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েকে টেনে কোলে তুলে রাগত স্বরে শুধরে উঠল—'চল্‌, বাইরে ঘুরে আসি।

মেয়ে সেই একঘেয়ে কান্নার মাঝেই বিকৃত গলায় কঁকিয়ে উঠল—'না, যাব না আমি'—

সুনন্দা হঠাৎ ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়াল। বধূ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—'ও কি আপনি উঠছেন যে!'

সুনন্দা খিঁচিয়ে উঠল—'কান্না সহ্য হয় না আমার, যাই, বাইরে ঘুরে আসি গে।'

বধূ অপ্রতিভ হয়ে বল্‌ল—'আপনি বসুন, আমি নয় বাইরে গিয়ে থামিয়ে আসছি।'

সুনন্দা বধূটির মুখের ওপর ছোট্ট একটা 'না' ছুঁড়ে মেরে খুট্‌ খুট্‌ শব্দে বেরিয়ে গেলো। তার প্রতি পাদক্ষেপ যেন বধূর বুকে এসে তালে তালে হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগল—অসভ্য··· অসভ্য···অসভ্য···

দু' বছর পর, পূর্ব্ব-কথিত ষ্টেশন।

ওয়েটিং-রুমের সামনে আসতেই কচি গলায় কান্নার আওয়াজ এসে পৌঁছুল সুনন্দার কানে, সে দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল, দেখলো—একটি বছর খানেকের ছোট্ট ছেলে ঘরের অপরিচ্ছন্ন মেজেটার ওপর গড়াগড়ি দিয়ে গলা ফাটিয়ে কাঁদছে, আর তার সামনে বসে বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে কি সব বলে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। কান্না ছাপিয়ে মেয়েটির গলার স্বর ছেলের কানে যাচ্ছে কি না সন্দেহ। গেলেও তার ক্রন্দন বিরতির কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না কিন্তু।

সুনন্দা একমুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ এক অদ্ভুত কাজ করে বসল। গভীর যত্নসহকারে খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে স্নিগ্ধস্বরে মেয়েটিকে বল্‌ল—'তোমার মা কোথায়, খুকী?

খুকী বেশ সপ্রতিভভাবে জবাব দিল—'মা তো চানের ঘরে গেছেন।'

সুনন্দা কৃত্রিম অনুযোগের সুরে খুকীর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বল্‌ল—'এ রকম ভাবে ফেলে বুঝি যেতে হয়? তোমার বাবাই বা গেলেন কোথায়?'

খুকী খোকার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলল—'বাবা ওটির জন্যে দুধ আনতে গেছেন।' একটা দম নিয়ে, 'আচ্ছা বল তো দু'জনে এক সঙ্গে যাবার কি দরকার ছিল! আমি সামলাতে পারি নাকি সব!'

সুনন্দা খুকীর ডেঁপোমি দেখে হেসে হাত দিয়ে তার চুলে একটা ছোট্ট নাড়া দিয়ে আদরের সুরে বলল—'সত্যিই তো, ছোট্ট মেয়ে পারে নাকি সব সামলাতে!'

খুকী কিন্তু এবার আপত্তি তুলল, চোখ ঘুরিয়ে কি রকম একটা মজার ভঙ্গী করে বলল—'হ্যাঁ ছোট বই কী! তুমি তো জান সব!'

খোকা এর মধ্যে নতুন মুখ দেখে কান্না থামিয়ে অবাক হ'য়ে সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর নরম কোলা কোলা হাত দু'টি সুনন্দার মুখের ওপর চেপে ধরে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠল।

সুনন্দা চোখ বড় করে বলল—'ওমা, ছেলের হাসবার কি হোল গো—' খুকী ফিক্‌ করে হেসে জবাব দিল—'ও এমনি পাগলা। কখন যে কি করে তার ঠিক নেই।'

—'ওগো, নাও এটাকে, আমি আর পারি না বাপু—' বলে অশোক দরজার সামনে দাঁড়াল, তার হাতে গরম কাপড়ে জড়ানো ফুটফুটে একটি ছোট্ট শিশু।

—'আমি পারব না এখন, হাত আটকা রয়েছে দেখছো না!' কথাগুলি ফুলঝুরির মত ঝরে পড়ল সুনন্দার জিবের ফাঁক দিয়ে।

কথা ব'লে অশোকের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুনন্দা এক মুহূর্ত্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর সলজ্জ হাসি হেসে খোকার নোংরা গালে নিজের রাঙা ওষ্ঠাধর গভীর আবেগে চেপে ধরল।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অশোক বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল।

ডক্টর দে

(নাটিকা, পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

তৃতীয় দৃশ্য

মধুপুর—পরদিন সকাল বেলা—অতুলবাবুর বসিবার ঘর। টেবিলের ধারে অতুল, রোহিণী ও প্রভাত বসিয়া আছে। পুষ্প চা ঢালিয়া দিতেছে। একটি 'কাপে' চা ঢালিয়া দিতে রোহিণী উহা হাতে তুলিয়া প্রভাতকে দিতে গেল।

পুষ্প। আঃ কি কর দিদি! তোমার কাউকে চা এগিয়ে দিতে হবে না, তুমি নিজে খাও।

রোহিণী। কি বলিস্‌ পুষ্প? ওঁকে আগে না দিয়ে আমি নিজে নেবো? অত অসভ্য আমি নই।

পুষ্প। বেশ, তবে তুমি চুপ করে বোসো দেখি! আমিই সব দিচ্ছি।

রোহিণী। এতে তোর রাগের কথা কি হোলো, পুষ্প!

পুষ্প। রাগ আবার কিসের? আমি দিচ্ছি সবাইকে, মাঝখান থেকে তোমার ব্যস্ত হবার কি দরকার?

প্রভাত। (বিব্রত ভাবে) দেখুন, আমি নিজেই নিচ্ছি। মানে ওতে আর কি? (উঠিতে যাইতেছিল)

পুষ্প। না, না, আপনি বসুন। আমি আগে খাবারের রেকাবীটা দিই আপনাকে।

রোহিণী। তুই চা দে না। আমি না হয় খাবারটা এগিয়ে দিচ্ছি।

পুষ্প। না তোমাকে ছট্‌ফট্‌ করতে হবে না (ধরিয়া বসাইল) আমি দিচ্ছি (খাবার দিয়া, রোহিণীর প্রতি নিম্নস্বরে) চোর বলে কান ধরিয়ে দিচ্ছিলে, এখন আবার অত সৌজন্য কেন?

অতুল। তা পুষ্পই দিক না। তুমি সত্যি এত ব্যস্ত হোচ্ছো কেন?

রোহিণী। ব্যস্ত আবার কিসের? তোমাদের কথা শুনলে গা জ্বালা করে।

পুষ্প। (চায়ের বাটি প্রভাতকে দিয়া) দেখুন—আর দুধ চিনি কিছু লাগবে কি না?

প্রভাত। (এক চুমুক খাইয়া) না, আর কিছু না। আপনি

একেবারে, মানে ঠিক যেমন আমার—অর্থাৎ যেমনটি আমি চাই, আপনি অমনি ঠিক—মানে আমার পছন্দ মত তৈয়ারী, মানে—

পুষ্প। (তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া) খাবারগুলো খেয়ে দেখুন। (সকলকে খাবার ও চা দিল)

মোহিনী। ওগুলোও সব পুষ্পর নিজের হাতের তৈয়ারী।

পুষ্প। আমি কি তাই বলেছি? কচুরী-ক'খানা কেমন আমি করেছি। দেখুন প্রভাতবাবু একটু মুখে দিয়ে—ভাল হয় নি বোধ হয়।

প্রভাত। খুব ভাল হয়েছে—মানে, কচুরী একেবারে—

অভয়। (খাইতে খাইতে) বা—আঃ! বো—ওনাজেব! হাতের গুণ আছে, আমি জানি।

মোহিনীর বাড়ীর ভিতরের দিকে প্রস্থান

পুষ্প। আচ্ছা, আপনাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না। মোহিনীদি পান্তুয়া করেছে আপনি ঐগুলো খান। তবে কাল থেকে গলা শুকিয়ে আছে—ওতে একটু রস আসবে গলায়।

অভয়। ঠাট্টা কোরতে যে বড়! অভয় ত—ভয় করে না কাউকে, তা সে তুমিই হোক আর যে—ওই হোক। একেবারে নি—র্ভয়—কি না, নির্গত ভয়ঃ যস্য সঃ—ন-বহুব্রীহি।

বিন্দার প্রবেশ

বিন্দা। মোর মনিব কৌঠি?

পুষ্প। কাকে চাও? প্রভাতবাবুকে? এই যে তিনি, এইখানে।

বিন্দা। বাবু! কলকত্তারু গুটে বাবু আসিছন্তি।

প্রভাত। কৈ? কে?

বিন্দা। বেগ, বাক্সোন, মুণ্ডা পটা সেঠি ধরি কিরি, বাবু সে বগাড়ে বসিছন্তি।

পুষ্প। এইখানে নিয়ে আয়।

বিন্দা। (হঠাৎ কাঁদিয়া) বাবু—হাসিনিবাবু আসি কিরি মতে দু'জনের মারি পকাইলা। মু কৌড় দোষ করিথিলি? মুক আপনাকু ধরিথিলা। মু কহুচি "মোর বাবু অছি, ছোড়ি দিঅ—পড়া, ছাড়ি দিঅ"। উ ছাড়িল না—মু কিস করিবি? মার খাইকি মোর পরাণ গলা, বাবু! (কাঁদিতে লাগিল)

প্রভাত। (লুকাইয়া একটা টাকা দিয়া) যা, যা, কাঁদিস নে। আচ্ছা, চল্ আমিও যাচ্ছি। সে বাবুকে এইখানেই নিয়ে আসছি।

প্রস্থান

বিন্দা চোখ মুছিতে মুছিতে টাকাটা তিন চারি বার বাজাইয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপরেই অটল এবং অনুকূলের প্রবেশ

অটল। দেরী হয়ে গেছে নাকি? (ঘড়ি দেখিয়া) নাঃ, ঠিক সময়ে এসে গেছি। চা তৈয়ারী আছে ত?

পুষ্প। হাঁ, আছে। তুমি বোসো, আমি ঢেলে দিচ্ছি।

পুষ্প চা ঢালিয়া অটল ও অনুকূলকে দিতে লাগিল

অটল। বাঃ—পুষ্পর এই সবকটা লোক পেলে, বুঝেছ অনুকূল! আমার ঠিক মনের মতনটি হয়।

অনুকূল। তুমি ত এখনও ছেলেই দেখ নি! ছেলের বাপকে দেখে ত আর পাত্র পছন্দ করা যায় না।

অটল। আরে, সে ছেলে হচ্ছে ডাক্তার। চাইলেই অমনি ডাক্তার পাত্র পাওয়া যায় কি না?

পুষ্পর হাত কাঁপিয়া একটু চা টেবিলের উপর পড়িয়া গেল

আঃ দিলে চা ফেলে! অত হাত কাঁপতে কেন রে? মিরগী রোগে ধরল না কি!

অনুকূল। (একবার মাত্র পুষ্পর মুখের প্রতি চাহিয়া) ওর শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই। দে, দে পুষ্প! আমি ঢেলে নিচ্ছি। তুই চুপ ক'রে একটু পাশের ঘরে শু'গে না দেখি।

অটল। আরে না। কোথাও কিছু নেই, অসুখ হ'তে যাবে কেন? (পুষ্পর কপালে হাত দিয়া) নাঃ! জ্বর টর নেই ত। বরং ঘেমে উঠেছে। মানে—শেষ রাত্তিরটা একটু ঘুমিয়ে নে। তা হোলো না, কেবল সমস্তক্ষণ আজ সকাল পর্য্যন্ত ঐ ছেলেটাকে নিয়ে বাড়ীর সবাই ব্যস্ত রইল। সে যাক্—(পুষ্পর প্রতি) তুই একটু ঐখানে বোস্ দেখি, একটা কথা বলি। (পুষ্প ম্লান মুখে বসিল) আজ, আর ওবেলা নাগপুর থেকে এক ভদ্রলোক তোকে দেখতে আসবেন—বেলা চারটে আন্দাজ! একটু ভাল কাপড় চোপড় প'রে—তোদের ঐ সব, কি বলে, পাউডার কাউডার একটু মুখে টুকে দিয়ে ফিট্ ফাট্ হয়ে থাকিস্। মোহিনী তোকে দেখে শুনে সাজিয়ে গুছিয়ে দেবে অখন।

পুষ্প। না, আমাকে কারও সাজাতে গোছাতে হবে না।

অটল। তা বেশ! দরকার কি? তুই নিজেই ত সব পারিস্।

পুষ্প। না।

অটল। না, মানে?

পুষ্প। আমাকে কারও দেখতে আসতে হবে না।

অটল। (ক্রুদ্ধভাবে) মানে—মানে?

পুষ্প। মানে—আমাকে দেখতে আসবে, আর আমি সং সেজে ব'সে থাকতে পারবো না।

অটল। তবে কি একেবারে না দেখে শুনে কেউ অমনি যাও, বাজিয়ে, খোসামোদ ক'রে বউ ব'লে ঘরে নিয়ে যাবে ঠাউরেছ?

পুষ্প। খোসামোদ কারও কাউকে করতে হবে না।

অটল। আজ্ঞে, খাতির করতে হয় যে! এদিকে ষোল কলা পূর্ণ হয়ে, তারপরে পাঁচটি পক্ষ যে বয়েস হোলো।

অনুকূল। আমাদের ত রেওয়াজ সেই দিদি! কাজেই বুড়োদের খোসামুদি করতে হয় বই কি!

পুষ্প। আমার জন্যে কারও কিছু করতে হবে না।

অটল। বটে! এই জন্যে অনুকূল, তোমাদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য। একটা ভাল পাত্র—হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার—অবস্থা ভাল; কত ক'রে যোগাড় করলাম, আর ঝিঝী মেয়ের কথা শোনো। কারও কিছু করবার দরকার নেই, আর অমনি একটা রাজপুত্র ঐ বিদ্যাধরীকে বিয়ে করতে আপনি ছুটে আসবে!

অনুকূল। রাজপুত্র হলেও ত তুমি তার হাতে ওকে দিচ্ছ না?

অটল। না। ডাক্তার ছাড়া আর কারও হাতে দেবো না—এ আমার প্রতিজ্ঞা। অটলের প্রতিজ্ঞা অটল।

অনুকূল। তা এ ছেলেটি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বটে, কিন্তু সত্যিকারের বিদ্যেসাধ্যি কতদূর আছে সেটা জানো। আর টাকা রোজগার করাও ত চাই!

অটল। বিদ্যেসাধ্যি? আরে তার সঙ্গে টাকা রোজগারের কি সম্পর্ক? বিদ্যেসাধ্যি—এই আমার কতখানি ছিল? সেই—"বাঘের বুঝি পাই এখন হইল, রাম শ্যাম দু'টি ভাই খেলিতে আইল"—বাস্, ঐ পর্য্যন্ত। তা বলে পয়সা রোজগার কি কম করেছি? রেখে দাও ওসব বিদ্যেটিদ্যে!

অনুকূল। (পুষ্পর মুখের প্রতি চাহিয়া) দেখ্‌চো, অটল? সত্যিই পুষ্পর শরীরটা আজ ভাল নেই। আজ দেখাশোনাটা না হয় থাক্ না।

অভয়। (হঠাৎ) উ—উ

অনুকূল। কি হোলো? কি হোলো আবার?

অভয়। না; কি—চ্ছু হয় নি।

অটল। তবে উ-উ ক'রে উঠলে কেন?

মন্তু। ও—উনুন না। ই উনি—অর্থাৎ পু—উপল ব—বলছেন

অটল। উনি ত বলছেন, আর তুমি যে তাড়া বলতেই পারছ না! একটু জিরিয়ে নাও, দেখি।

মন্তু। বে—এল্! আমি এই (মুখে হাত দিয়া) চু—উপ্।

অটল। দেখো পুষ্প! ও-সব নব্য চাল তোমার চলবে না আমার কাছে। আমি তাদের আসতে বলেছি, তুমি প্রস্তুত থাকবে, বাস্!

মধুসূদন। তা চলো না, না হয় গিয়ে এখনই ব'লে আসি "মেয়ের শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। যেদিন সুবিধে হবে আবার বলে যাবো।"

অটল। না যাবো, করো তোমরা। আমি তাদের একেবারেই বারণ ক'রে আসছি। তারপরে ঐ বাড়ী বেচে তোমরা যাবে ত যাও কোরো। (লাঠি ঠুকিয়া প্রস্থান)

মধুসূদন। বড় রেগেছে। যাই একটু ওর সঙ্গে। (প্রস্থান)

মন্তু। (পুষ্পর প্রতি) হাঁ—আজ্ঞা করতে মধুসূদনবাবু একেবারে (তুড়ি দিয়া) ভো-ভাঁ।

পুষ্প। উঃ!

(পুষ্প হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইবার মত হইতেই মন্তু তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিল। পুষ্পর মাথাটি মন্তুর কাঁধের উপর আসিয়া পড়িল)

মন্তু। (ধীরে ধীরে) পুঁ—উ—উপ্ল! ও পু—উ

(সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর হইতে রোহিণীর প্রবেশ। মন্তুর মুখ চুণ হইয়া গেল।)

মন্তু। মা—মানে হ'চ্ছে

রোহিণী। থাক্—আর মানেতে কাজ নেই।

মন্তু। পুষ্প ফে—ফে—এন্ট্

রোহিণী। feigned!

মন্তু। হাঁ। অ—অজ্ঞান।

রোহিণী। তাই ত দেখছি। একেবারে অজ্ঞানই ত দেখছি। তা তুমি ত বেশ ধ'রে আছ।

মন্তু। না: শো-ওনোই না। বলছি faint করেছে, জ—জল দিয়ে এসো একটু। নইলে তুমি ধরো, আমি জ—জল নিয়ে আসি।

(রোহিণী পুষ্পকে ধরিল, মন্তু জল আনিতে ছুটিল)

মন্তু। (জল লইয়া ফিরিয়া) গাঁ—জ্ঞান হ'য়েছে?

রোহিণী। হাঁ। কেন অজ্ঞান হোলো বলো ত?

মন্তু। আগে পাশের ঘরে শুইয়ে দিয়ে এসো—বলছি।

(পুষ্পকে রোহিণী পাশের ঘরে লইয়া গেল। প্রভাত ও নিশীথ প্রবেশ করিল)

মন্তু। আ—আসুন প্রভাত বাবু!

(রোহিণীর পুনঃপ্রবেশ)

প্রভাত। (নিশীথকে দেখাইয়া) Dr Mitra—আমার বিলিতী বন্ধু, এখানে বেড়াতে এসেছেন। (অপর দিকে দেখাইয়া) আর এঁরা হচ্ছেন মিসেস্ সিংহ ও মিষ্টার মন্তু সিংহ। (সকলের সহিত সকলের অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদন)

রোহিণী। আজই আমাদের ফেরবার কথা ছিল, কিন্তু হোলো না প্রভাতবাবু।

প্রভাত। সে ত, মানে, খুব ভালই হোলো।

মন্তু। ভা—ভ্যালো? ভালোটা কি—ইসে?

প্রভাত। মানে! এই সবাই থাকলে বেশ

মন্তু। হাঁ, তা হলে আর আবার আ—আপ্—আপনার বাড়ীতে আমরা যাই, আর রা—রাত্তিরে আবার আপনি জানলা টপ্কানো প্র্যা—প্র্যাক্টিশ করেন—কেমন?

(নিশীথ ও রোহিণী হাসিয়া ফেলিল)

মন্তু। (রোহিণীকে) তু—উমি হাস্চ যে?

রোহিণী। বেশ ত! এবার প্রস্তুত হয়ে থাকবে। বীরত্বটা দেখাবে ভাল ক'রে।

নিশীথ। শুনছিলাম সব প্রভাতের কাছে। কিন্তু ও আজ সত্যিই আপনাদের জন্যে সব ঠিক করে রেখেছে। কোনও কষ্ট হবে না আপনাদের।

মন্তু। না, উনি আর পু—উপল কাছে থাকবেন।

রোহিণী। কেন? ওঁর বাড়ীটা আমার বেশ ভাল লেগেছে। ঐখানেই না হয় আমরা—অবশ্যি যদি ওঁর কোনও অসুবিধে না থাকে।

মন্তু। আমার অ—অসুবিধে আছে।

রোহিণী। উনিও আপনার বাড়ীটি দেখে খুব খুসি হয়েছিলেন। পাছে সত্যি আপনাদের কোন কষ্টভোগ করতে হয়, তাই বোধ হয় আর থাকতে চাইছেন না।

মন্তু। না; তা—আর হচ্ছে না।

প্রভাত। দেখুন, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। কাল বড় কষ্ট দেওয়া হয়েছে আপনাদের। এখন আমাদের বাড়ীতেই আপনাদের দিন কতক—

মন্তু। কেন বলুন দেখি? আপনি ত আ—আমি ইয়ে।

রোহিণী। আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে। কিন্তু আপনার স্ত্রী সঙ্গে এলেন না যে? তিনি এলে তাহলে আর—

নিশীথ। প্রভাতের এখনও বিয়েই হয় নি।

রোহিণী। সত্যি!

মন্তু। তা এ আর আ—আশ্চর্যির কথাটা কি? অনেকে কোন কালেই বিয়ে করে না। স্ত্রীলোকের সং—সংসর্গও পছন্দ করে না। বু—উঝেচ?

রোহিণী। সত্যি প্রভাতবাবু?

প্রভাত। (তাড়াতাড়ি) আজ্ঞে না—মানে, তা কখনই না, তবে আমি—মানে—আচ্ছা দেখুন কাল রাত্তিরে প্রথম বাড়ী ঢোকবার সময় চমৎকার গানের সুর কানে আসছিল। সে কি আপনি গাইছিলেন?

রোহিণী। হাঁ উনি অমনি যখন তখন গান গাইতে বলেন।

মন্তু। (দুঃখভাবে) তা বলে এখন ব—বলি নি।

প্রভাত। আচ্ছা, আপনারা তা হলে বসুন, আমরা এইবার উঠি।

মন্তু। (স্বগত) বাস্, বাঁ—বাঁচা গেল।

(বন্ধুকে লইয়া প্রভাতের প্রস্থান)

(স্টেজ অন্ধকার; পরে ধীরে ধীরে আলো এবং দৃশ্যান্তর প্রকাশ)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মধুপুর। সময়—সাত দিন পরে সকাল বেলা। প্রভাতের বাড়ির ফটকের সম্মুখ। বিকাশ একখানা Door-plate যথাস্থানে লাগাইতেছে। প্রভাত ও নিশীথ দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। উহাতে লেখা আছে—Dr. P. De.

বিকাশ। এইবার দেখো দেখি, লাগানো ঠিক সোজা হয়েছে কি না।

নিশীথ। লাগানো সোজাই হয়েছে কিন্তু ঐ Doctor কথাটার মানে বোঝা সব লোকের পক্ষে মোটেই সোজা হবে না।

বিকাশ। কেন, বলো দেখি?

নিশীথ। সঙ্গে সঙ্গে 'পি-এইচ-ডি' লেখা থাকলেও বা কথা ছিল।

বিকাশ। ও! তুমি বলচ—এই 'ডাক্তার' লেখা দেখে প্রভাতের কাছে এখনই সব রোগী এসে জুটতে পারে কিম্বা কোনও রোগীর বাড়ী থেকে call আসতে পারে।

প্রভাত। ও বাবা! তাহলেই চিত্তির আর কি! মুছে ফ্যালো, মুছে ফ্যালো ওটা তবে।

নিশীথ। তার উপর একটি নবযৌবনা যদি রোগীরূপে এসে উপস্থিত হয়।

প্রভাত। এই! মুছে ফ্যালো ওটা।

বিকাশ। ভাগো নিশীথ! তুমি ওকে অমন করে ভয় দেখিও না।

প্রভাত। না ভাই, নিশীথ সত্যি কথাই বলেছে। এ রকম করে শুধু ডাক্তার লেখাটা মোটেই উচিত হয় নি।

বিকাশ। উচিত হয় নি? কেন? তুমি যে Doctorate পেয়েছ সে হিসেবে ত আর ভুল হয় নি। এখন Dr. De লিখতে হবে, আর লোকে ডাকবেও তোমাকে Dr. De বলে।

প্রভাত। (হাসিয়া) তবে যত দিন নিশীথ ডাক্তার এখানে আছে, ততদিন আর ভয় কি? ও চলে গেলে তখন দেখা যাবে, হাঃ!

নিশীথ। কিন্তু তারা রোগী দেখাতে লোকে চাইবে প্রভাত ডাক্তারকে, নিশীথ ডাক্তারকে না—বুঝেছ?

প্রভাত। (সভয়ে) বলো কি? তা হলে কি হবে? বিকাশ! তুমি সত্যি সত্যি একটা গোলযোগ না বাধিয়ে আর ছাড়ছো না, দেখছি। যা হয় একটা 'পি-এইচ-ডি, কি এইচ-ডি' যোগ করে দাও ঐখানে। নইলে আর রক্ষে থাকবে না।

বিকাশ। তা হলেই সব গোলযোগ মিটে যাবে বুঝি? সব লোক অমনি "পি-এইচ-ডি"র মানে বুঝবে কি না! রোগী সব মানে করে নেবে—'পি এইচ, ডি' মানে Passed Homeopathic Doctor.

নিশীথ। আরে থাক্, যেতে দাও; অন্ততঃ আমি যে-কটা দিন আছি, তোমার গায়ে তত দিন কোনও আঁচ লাগবে না। এর ভেতর দিয়ে, ভাই কি, একটা adventurous সন্ধানও মেলে যেতে পারে।

(পথের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই) ঐ যে! অনুকূল বাবু আসছেন—

প্রভাত। এই মাটি করেছে! এখনই বলবেন "তোমার কবিতাটা শেষ করেছ ত? প'ড়ে শোনাও দেখি"। সত্যি ভাই সাহিত্যিকের সঙ্গে বেশী মেশামিশি মোটেই সুবিধের নয়।

নিশীথ। এ সাহিত্যিকের সঙ্গে না মিশলে তোমার যে আবার অন্য কারও সঙ্গে মেশামিশির সুবিধা হয়ে ওঠে না। আর সময় বিশেষে কবিতা টবিতা লেখা ভালই।

বিকাশ। আজ কাল কবিতা লিখতে তোমার এমনিই ত হাত সড়সড় করে। ও ভদ্রলোকের আর দোষ দাও কেন বলো? (অনুকূল-বাবুর প্রতি) আসুন, আসুন অনুকূলবাবু!

অনুকূলের প্রবেশ

প্রভাত। মানে, আজ একলাই বেরিয়ে পড়েছেন বুঝি?

অনুকূল। কি আর করি, বলো? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর পারলাম না। পুষ্পর কথা জিজ্ঞাসা কোরছো ত?

প্রভাত। আজ্ঞে তা নয়, মানে, একলা বেরিয়েছেন—তাই বলছি। হ্যাঁ, তা—উনিই বা এলেন না কেন বেড়াতে?

অনুকূল প্রভাতের বন্ধুদ্বয়ের দিকে চাহিয়া লইলেন।
উহারা মুচকি হাসিল

অনুকূল। উনি কে? আমাদের পুষ্পর কথাই ত আমি বলছিলাম। সেই কোন্ সকাল থেকে উঠানে ছুটোছুটি ক'রে তার পায়রা খাওয়ানো হ'চ্ছে। কখন থেকে জানেন? সেই ভোরে আপনি যখন ছাতে ব'সে কবিতা লেখেন, সেই তখন থেকে এই পর্য্যন্ত ওঁর পায়রাদের ছোলা খাওয়ানো শেষ হোলো না।

নিশীথ। তুমি আজ কাল ভোরে উঠে ছাতে গিয়ে ব'সে থাকো না কি? আমাদের উঠতে বেলা হয় ব'লে টের পাইনি। ও!

প্রভাত। হ্যাঁ। উনি যে আমাকে কবিতা লেখার task দিয়ে যান। আর ভোরে উঠে ছাতে ব'সে লিখতে বলেছেন।

অনুকূল। দেখুন না—কথাটা আপনারা বুঝে দেখুন না? কবিতার উপযোগী আবহাওয়া না হ'লে কিছুই করবার জো নেই। যোগাযোগ ঠিক হয় হলে, তখন কলমের মুখে আপনি চমৎকার দানা কাটতে থাকে।

নিশীথ। প্রভাত আজ কাল তাই লিখছে জান। (প্রভাতকে) যে কবিতা লেখাটা হাতে করে এতক্ষণ ঘুরছিলে সেটা শুনিয়ে দাও না।

প্রভাত। সেইটেই ত অনুকূলবাবুর দেওয়া task. উনি উৎসাহ দেন বলেই যা কিছু এগোতে পেরেছি।

অনুকূল। নিশ্চয় এগোবে। আরও এগোতে এগোতে এমন হবে যে তখন আর ঠেকায় কে? একেবারে দিগ্বিজয় ক'রে তবে ছাড়বে। কৈ, লেখাটা দিয়ে এসো না, একবার দেখি। ততক্ষণ পুষ্পও এসে পড়বে। তাকে বলে এসেছি আপনার বাড়ীর সামনে এসে meet করতে।

প্রভাত। (ব্যস্তভাবে) তা হলে, এখনই এনে, মানে উনি এসে পড়বার আগেই আপনাকে শুনিয়ে দিই　　(প্রস্থান)

নিশীথ। (অনুকূলকে) কি task দিয়েছিলেন আপনি?

অনুকূল। এই ফুলহার সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করতে বলেছিলাম।

বিকাশ। হাঁ, হাঁ—ফুলহার না পুষ্পহার—এমনি একটা কিসের লিখেছে বটে!

অনুকূল। পুষ্পহার না কি? তা ও-জিনিষ ত একই।

প্রভাতের প্রবেশ

প্রভাত। দেখুন, এ তেমন সুবিধে হয় নি।

অনুকূল। (লেখাটা হাতে লইয়া) কি অসুবিধে হোলো, বলুন ত? এ দিকে ত সুবিধে হবারই কথা। ফুলহারের চেয়ে আপনার পুষ্পহার কবিতার পক্ষে অনেক ভাল।

প্রভাত। আজ্ঞে, ঠিক বলেছেন। 'ফুলহার' শুনে—এই 'কণ্ঠহার' কিম্বা 'হেলে-হার'—এই রকম যেন মনে হচ্ছিল তাই তার বদলে, মনে হোলো আবার—

অনুকূল। পুষ্পহারই ভাল—না? তা বেশ হয়েছে। 'পুষ্পহারের' সঙ্গে কেমন এইসব খাপ খায় বলুন দেখি—এই ধরুন, যেমন 'বাপ্তার'

প্রভাত। (প্রগাঢ় ভক্তিভরে) আপনি কি অন্তর্যামী? আমি ঠিক ঐ রকমই feel করেছিলাম।

অনুকূল। করেছিলেন ত? পুষ্পহারের কথা লিখতে গিয়ে বাপ-তারও feel করেছিলেন ত?

প্রভাত। (সলজ্জ হাসির সহিত) নিশ্চয়ই!

অনুকূল। হ'তেই হবে। আচ্ছা পড়ুন ত শোনা যাক্।

প্রভাত। (কাগজখানা লইয়া ও দুই তিন বার ঘ্রাণ করিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া) "পুষ্পহার"।

শতপারিজাতমল্লিকাফুল্ল ফুল পুষ্পহার!
প্রভাতে বিলাও পরাণ মাতানো সৌরভ সম্ভার

পিছন হইতে পুষ্পর প্রবেশ

ওগো শুভ্র পুষ্পহার!
ওগো অমল পুষ্পহার!
ওগো কোমল পুষ্পহার!

(পুষ্প ধীরে ধীরে আবার চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু
অনুকূল তাহাকে ধরিয়া রাখিল

অনুকূল। এই যে, একটু পড়ো দিদি! শব্দটুকু শুনে যাই। শোন না—কবির কি মধুর উচ্ছ্বাস!

ওগো কোমল পুষ্পহার!
ওগো

(প্রভাত বেগে পলাইবার উপক্রম করিতেই নিশীথ তাহার গতিপথ রোধ করিল)

নিশীথ। (নিম্নকণ্ঠে প্রভাতের প্রতি) কি করো ছিঃ! (প্রকাশ্যে উচ্চতর কণ্ঠে) আরে, না···না—প্রভাত! এখন আর ওঁর জন্যে তোমাকে চেয়ার আনতে ছুটতে হবে না। ওঁরা এখনই বেড়াতে যাবেন যে!

প্রভাত। (নিরস্ত হইয়া অপ্রতিভভাবে) হাঁ, আমি তাই ত যাচ্ছিলাম। একখানা চেয়ার আনতেই ত যাচ্ছিলাম।

অনুকূল। তা হলে এখন আর পড়া যাবে না বুঝি ওটা? কিন্তু চমৎকার লেগেছিল। (ফিরিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া)

ওগো শুভ্র পুষ্পহার!
ওগো কমল পুষ্পহার!
ওগো কোমল পুষ্পহার!

উঃ, এ রকম উচ্ছ্বাস ওতে আরও আছে নিশ্চয়, প্রভাতবাবু? যেমন—(পুষ্পের দিকে ঈষৎ আড় ফিরিয়া)

ওগো আকুল পুষ্পহার!
ওগো দোদুল পুষ্পহার!

পুষ্প। (একটু গম্ভীরভাবে) তুমি যাবে দাদামশাই?

অনুকূল। (ফিরিয়া) ঐ যে অজয় আর রোহিণী আসছে।

(রোহিণী ও অজয়ের প্রবেশ)

এতক্ষণে বুঝি তোমাদের সময় হোলো?

রোহিণী। হাঁ, এতক্ষণে চিকিৎসকের পোষাক ক'রে নিয়ে তবে বেরুলো ছেলে। আজই আমাদের যেতে হবে কিনা!

অনুকূল। কেন, আর দুটো দিন থেকে গেলে হোতো না?

অজয়। আর না—আপনি ওকে না—নাচিয়ে দেবেন না দাদামশাই। তা হলে একেবারে মরে যাবে। আর এক পা বাড়ানো যাবে না।

অনুকূল। কি রকম? (পুষ্পের প্রতি) এখানে আমাদের কবিতাটা যেমন জমে গিয়েছিল সেই রকম নাকি?

অজয়। এক একটা গাড়ীর ঘোড়া দে—এতে দেতে কেমন থ-মেরে যায়, দেখেন নি? জোর ক'রে চালাতে গেলে প্রথমে চা—আট, ছুড়বে। তারপরে ও চালাবার চেষ্টা করলে গাড়ীর সঙ্গে একেবারে Ri-i-ight angle ক'রে দাঁড়াবে! তখন একেবারে ঘোড়াটা খুলে দেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না।

রোহিণী। (রুষ্টভাবে) বেশ তাই যাও না। তোমারও তাহলে accidentএর ভয় থাকে না।

অনুকূল। সত্যি সত্যি চটে গেলে না-কি দিদি? অজয় একটু রসিকতা করছিল। (হঠাৎ Door-plateএর উপর দৃষ্টি পড়িতেই) এ আবার কবে হোলো? Dr P. De! প্রভাতবাবু কি ডাক্তার নাকি? বেশ, বেশ!

প্রভাতের বন্ধুরা পরস্পর ও উহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল

পুষ্প। চলো দাদামশাই। এই বেলা বেড়িয়ে আসি। বেলা হয়ে গেলে তখন আর ভাল লাগে না।

অনুকূল। সত্যি দিদি! প্রভাতটি যেমন মিষ্টি লাগে—

পুষ্প। মিষ্টি লাগে ত চলো না—দেরী কোরছ কেন তবে?

পুষ্প ও অনুকূলের প্রস্থান। প্রভাত ও বন্ধুগণ অল্প দূর অনুগমন করিতে সঙ্গে চলিল

অজয়। চ—লো। ওদের সঙ্গেই একটু ঘুরে আসা যাক্।

রোহিণী। তুমি যাও।

অজয়। আর তু—মি?

রোহিণী। আমি যাবো না।

অজয়। বাড়ী ফিরে যাবে? আচ্ছা, তা—আই চলো।

প্রভাত ও বন্ধুগণের পুনঃ প্রবেশ

রোহিণী। তুমি পুষ্পদের সঙ্গে বেড়াওগে না—আমি এঁদের সঙ্গে একটু আলাপ করে বাড়ী ফিরে যাচ্ছি।

অজয়। (নিম্নস্বরে রোহিণীকে) আর বেশী আলাপ করলে শেষে আমাকে আবার বি—ইলাপ করতে না হয়। (পুনরায় স্বাভাবিক স্বরে) কিন্তু প্রভাতবাবু ডাক্তার মানুষ—এখনই হয় ত ওঁকে বে—রোতে হবে।

প্রভাত। না—না—মোটেই তা নয়। আপনার সে চিন্তা করতে হবে না।

অজয়। তা সে চিন্তা না করলেও ঠিক নি—শ্চিন্ত হ'তে পারছি নে, মশাই!

একটি যুবকের ব্যস্তভাবে প্রবেশ

যুবক। (Door-plateএর দিকে চাহিয়া) এখানে ডাক্তার দে থাকেন কি?

নিশীথ। হাঁ থাকেন।

যুবক। এখন বাড়ী আছেন?

নিশীথ। আছেন। আপনার কি দরকার?

যুবক। একবার এখনই আমার সঙ্গে আসতে হবে। আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুখ হ'য়ে পড়েছেন। আপনিই কি Dr De?

প্রভাত। (তাড়াতাড়ি) না—উনি Dr Nishit Mitra কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন। খুব ভাল ডাক্তার—ওঁকেই নিয়ে যান আপনি। কি হয়েছে আপনার স্ত্রীর?

যুবক। এই দুদিন হোলো আমরাও কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি। কিন্তু কি মুস্কিলে যে পড়েছি এখানে এসে। এখানকার লোকগুলো সময়মত এক পেয়ালা চা পর্য্যন্ত তৈয়ারী করে দিতে পারে না। আর সকালবেলা এসে বেটারা বলে কি—"চায় কা চিজ্ নেহি মিলতা"।

নিশীথ। তা সে যাক্ গে! অসুখটা কি তাই বলুন।

যুবক। সে যাক যে কি মশাই? তাই থেকেই ত অসুখ।

নিশীথ। কি রকম?

যুবক। সকালবেলা উঠে বিছানায় বসেই এক কাপ চা ওঁর চাই-ই চাই। দেরী হলেই আর রক্ষে নেই।

অজয়। র—ক্ষে নেই কি রকম? চা ত আমরাও খাই। (রোহিণীকে দেখাইয়া) ই—ইনিও ত খান।

রোহিণী। আঃ বলতে যাওনা ওঁকে। শোনাই না।

যুবক। সে রকম চায়ের নেশা ওঁর থাকলে আপনারাও টেরটা পেতেন। সত্যি কথা বলতে কি—কলকাতায় চায়ের চিনি যদি না পাওয়া যায় সেই ভয়েই এখানে চলে আসা।

নিশীথ। বেশ। তারপর হোলো কি?

যুবক। আগে আগে সময়মত চা না পেলে মাথা-টাথা ধরত, কিন্তু এখানে এসে আজ সকালে বিছানায় চা-টা না পেয়ে একেবারে যে উৎপটাং কাণ্ড! মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা—দেখতে দেখতে চোখ দুটো একেবারে পলাশফুলের মত লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে কি সব আবোল তাবোল বকুনি! এতক্ষণ বোধ হয় ফিট্-টিট্ কিছু হয়ে থাকবে। আর দেরী না করে চলুন মশাই।

রোহিণী। তা আপনি নিজে দৌড়ে চারটি চা নিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী ক'রে দিলেই ত পারতেন !

যুবক। না, না—এখন আর অত সহজে হবে না। ডাক্তার একজন চাই-ই চাই ! (নিশীথের প্রতি) আচ্ছা, দেখুন—তাড়াতাড়ি solion এর মত Intravenous চা দেওয়া যায় না ? দেখে শুনে যা হয় কিছু করবেন চলুন। আমার বাড়ীতে আবার দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি নেই—এমন মুস্কিলে আমি পড়েছি !

রোহিণী। তাই ত ! চলুন ডাক্তারবাবু, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি। মহিলাটি একা—ভদ্রলোক তাই বেশী বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

নিশীথ। বেশ ত ! বেশ ত ! Doctor De তোমরাও এসো না। (অক্ষয়ের প্রতি) আপনি কি ভয়ে—

অক্ষয়। হাঁ—দাঁড়ান মশাই !

একটু হাসিয়া সকলেই অগ্রসর হইল

অক্ষয়। (রোহিণীর প্রতি) সত্যি সত্যি তুমি যা—চ্ছ নাকি ?

রোহিণী। হাঁ। বুঝতে পারছ না ? বিদেশে একা বিপন্ন মহিলা। আমাকে যেতেই হবে।

যুবক। চলুন, চলুন—আর দেরী করলে চলবে না।

সকলের প্রস্থান

অক্ষয়। ওঃ—কি রকম গিন্নির ! যেতেই হবে ! বেশ ! আমাকেও তা হলে পিছনে পিছনে যে—তেই হবে। (লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পশ্চাদ্গমন)

ষ্টেজ অন্ধকার পরে ধীরে ধীরে আলো এবং দৃশ্যান্তর প্রকাশ

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গলার অনাদৃত সম্পদ—বাব্‌লা বা বাবুল

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশ, ভারত সরকার পঁচিশ লক্ষ বাব্‌লার কাঁটা ক্রয় করিতেছেন ; উদ্দেশ্য—(আল্)পিনের পরিবর্তে তাহা ব্যবহার করা হইবে। কারণ, এখন তাম্র-পিত্তলের তার দ্বারা নির্মিত এবং তাহাতে নিকেল করা আলপিন্ যুদ্ধের বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

এদেশে যাহা প্রায় বিনা পয়সায় পাওয়া যায় তাহার দ্বারা আমাদের অভাব দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহার পরিবর্তে আমরা সর্বদা বিদেশী দ্রব্য আমদানি করিয়া থাকি। এই যুদ্ধে আমরা তাহার বহু পরিচয় পাইয়াছি, যাহাতে আমাদের দেশের অতি সাধারণ জিনিষ বিদেশী দ্রব্যের অভাব মিটাইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধাবসানে হয়ত আমরা এ কথা ভুলিয়া যাইব। আবার ঠিক বিদেশী দ্রব্য আসিয়া তাহার পূর্বস্থান অধিকার করিয়া বসিবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে। পল্লীর দিকে নানাভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু দ্রব্য আছে, যাহার প্রকৃত ব্যবহার করিতে পারিলে পল্লীবাসীর কিছু আয় হয়। পল্লীকে দূরে ফেলিয়া পল্লীপ্রধান ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে গিয়া আমরা আপন শক্তির উৎসকে শুষ্ক ক্ষীণ করিয়াছি—"সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।" যাহা বিদেশীর কাজে লাগিয়াছে, তাহাই সরবরাহ করিয়া লোকের দু পয়সা উপার্জন হইয়াছে। যেখানে বিদেশীর স্বার্থের হানি হয়, সেখানে সে অন্য পরিবর্ত-বস্তুর ব্যবহারের উৎসাহ দেয় নাই। সুতরাং পল্লীর বহুতর সামগ্রী—পূর্বে যাহা লোকের সুখের অন্ন যোগাইত তাহা উপেক্ষিত হওয়ায় লোকের দুঃখ দুর্দশাও অভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাবুল বা বাব্‌লা এইরূপ একটী অনাদৃত বৃক্ষ। ভারত সরকার আজ বাব্‌লা কাঁটা ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তাহার দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাব্‌লা গাছ বাঙ্গালা দেশের, কেবল বাঙ্গালা দেশের কেন—ভারতবর্ষের একটী আয়কর বৃক্ষ। কতক লোকে ইহার সন্ধান জানে, কিছু আদরও করিয়া থাকে। কিন্তু এখনকার যুগে কাঁটা ছাড়াও বাবুলের প্রায় প্রতি অংশের অন্য ব্যবহার রহিয়াছে।

ভারতের উত্তরাংশে ও মাদ্রাজ এবং সিন্ধুতে প্রচুর বাব্‌লা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই, রাজপুতানা, পঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলেও অজস্র গাছ জন্মিয়া থাকে। সিন্ধু অঞ্চলে এক একটী গাছ ৩০ হইতে ৫০ হাত দীর্ঘ হয়, শাখাহীন কাণ্ড ১৩।১৪ হাত এবং তাহার পরিধি ৩।০ হাত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এ জাতীয় বৃক্ষ অন্য স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। মাদ্রাজ, বিহারে ও সিন্ধুর কতকাংশে বাবলার বড় বড় জঙ্গল দেখা যায়। বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণ খান্দেশ ও পুনা বিভাগে এবং মধ্য প্রদেশের অমরাবতী, আকোলা ও বুলদানা বিভাগ হইতেও বহু পরিমাণ কাষ্ঠ সরবরাহ হইয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশ ও বাঙ্গালা উভয় প্রদেশেই বাব্‌লা গাছের অভাব নাই।

বন ছাড়াও এক একটী বৃক্ষ স্বতন্ত্র অবস্থিত—এরূপ বহু বৃক্ষ এক এক অঞ্চলে দেখা যায়। যে সকল স্থানে কোনও চাষ হয় না, অবহেলায় পড়িয়া থাকে, সেরূপ স্থলে বাব্‌লা অতি সহজেই জন্মে ও বৃদ্ধিলাভ করে। জমির আইল বা আল, খালের ধার, রেল লাইনের দুপাশে বাব্‌লা গাছ জন্মে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে যাইতে হইলে দুধারে বহু বাবুল গাছ দেখা যায়।

বাব্‌লা গাছ সাধারণতঃ অন্য গাছের সংস্পর্শ বা সান্নিধ্য সহ্য করে না ; সেই কারণে বাব্‌লা গাছের তলায় অন্য গাছ বিশেষ জন্মে না, কেবল ঘাস থাকিলে তাহার আপত্তি নাই। ইহা কখনও পত্রশূন্য হয় না এবং সুন্দর হরিদ্রাবর্ণের ফুল উৎপাদন করে। ফুলে দীর্ঘাকৃতি ফল হয়, তাহারও সদ্ব্যবহার আছে।

বাবুল কাঁটার কথা নূতন উঠিলেও বহুকাল ছালের জন্য বাবুলের কদর রহিয়াছে। বাবুলের ছাল চর্মশোধন বা ট্যানিং-এর কার্য্যে বিশেষ উপযোগী। ভারতের নিজস্ব কয়েকটী পদার্থ আছে, তন্মধ্যে বাবলার ছাল একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গরাণ (Coripos Roxburghiana), আভারাম (Cassia auriculata), অর্জুন (Terminalia Arjuna) প্রভৃতি গাছের ছাল, হরিতকী, ডিভিডিভি (Caesalpina Coriaria) গাছের ফল প্রধান। বাবলার ছালে শতকরা ১১ হইতে ১৮ ভাগ ট্যানিন বা কষায় দ্রব্য রহিয়াছে। সুতরাং তাহার যে প্রচুর প্রয়োজন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কলিকাতার অতি নিকটে যে কয়টি ট্যানারী বা দেশী উপায়ে ট্যান্ করিবার কারখানা আছে, তাহারা বৎসরে সওয়া লক্ষ হইতে দেড় লক্ষ মণ বাবলার ছাল ব্যবহার করে। ইহার মধ্যে পঁচিশ হাজার মণ আন্দাজ বাঙ্গালা দেশ হইতে সংগৃহীত হয় ; বাকী পঞ্জাব ও বিশেষ করিয়া যুক্তপ্রদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। বাবুলের ছাল কেবল যে সাধারণের চটিসাও চর্মশোধনে উপযোগী তাহা নহে, ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের প্রয়োজনানুযায়ী চর্ম প্রস্তুত কাজেও ইহার সমাদর রহিয়াছে। যত্ন সহকারে ইহার ছাল সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিলে সাধারণ বাঙ্গালীর কিছু অর্থাগম হইতে পারে।

বাবুলের ফলে ট্যানিন্ থাকায়, তাহাও চর্মশোধনের কাজে লাগিবে। ইহার ট্যানিনের অংশ দেখিয়া এক সময় মনে হইয়াছিল যে বাবুল ফলও

বিদেশে রপ্তানী করা চলিবে। কিন্তু নানা স্থানের অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের অথচ অধিক পরিমাণ ট্যানিনযুক্ত বৃক্ষত্বক বা ফল (যথা, wattle bark 34%, divi-divi pods 46%, tannin) পাওয়া যাওয়াতে বাংলা ফলের রপ্তানির চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হয়। বাবুলের ফল ও তাহার সহিত হীরাকষ, হর্তুকি, খয়ের গাছের ছাল প্রভৃতি যুক্তভাবে মিশাইয়া কালো রং পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বস্ত্রাদি রঞ্জনের কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাবুলের আঠার প্রয়োজন নানা ব্যবহারে। "আরবী" গঁদ (gum arabic) যে বস্তু, তাহা হইতে ভারতীয় বাবলার আঠা কিছু স্বতন্ত্র। উহা উত্তর আফ্রিকার সুদান ও সেনেগাল প্রদেশের এ্যাকেশিয়া সেনেগল (Acacia Senegal) বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত। সুদানে ইহার প্রচুর চাষ আবাদ হইয়া থাকে। ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাসের মধ্যে গাছের ফল পাকিবার পর সমান্তরাল ভাবে ছাল চিরিয়া দেওয়া হয় বা ত্বকের উপর হইতে অতি পাতলা পর্দা তুলিয়া দেওয়া হয়। তখন ফোঁটা ফোঁটা আঠা ছালের উপর জমে এবং শুকাইয়া কঠিন হইয়া থাকে। তিন হইতে আট সপ্তাহ অন্ত হইলে সংগ্রহ করিয়া আনা হয়। ভারতীয় আঠা ইহা হইতে স্বতন্ত্র হইলেও ইহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছাপার কাজ, ঔষধাদি প্রস্তুত (mucilage), কাগজ সাইজিং (sizing) বা লেখার উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত, ঘরের কলি দেওয়ার সময় চূণের সহিত মিশ্রণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভাবের সময় লোকে বাবলার আঠা খাইয়া জীবন ধারণ করে। মিষ্টান্ন প্রস্তুতের সময় ইহা সামান্য পরিমাণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নানা প্রকার রোগে বাবলার আঠা ঔষধার্থে কাজে লাগে।

ছাল উদ্ধার করিবার সময় সাধারণতঃ গাছ কাটিয়া ফেলা হয়। ব্যবসায়ীরা ট্যানিং-এর উদ্দেশ্যে ছাল সংগ্রহ করিতে হইলে গাছ ছয় হইতে আট বৎসরের অধিক পুরাতন হইতে দেয় না। কিন্তু যাঁহারা কাঠ সংগ্রহ করিতে চান, তাঁহারা যত বড় গাছ পান, তাহাদের ততই মঙ্গল। মেসার্স পিয়ার্সন ও ব্রাউনের পুস্তকে মিঃ জে. ডি. মেটল্যাণ্ড-কারওয়ান (Maitland-Kirwan) লিখিত বনবিভাগের ৩০নং প্রচার পুস্তিকা (Forest Bulletin) হইতে উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখিতে পাই, যে বৎসরে হায়দরাবাদ হইতে ৬০,০০০ ঘনফুট (c. ft.) তক্তা-আসবাবের উপযোগী (timber) কাঠ ও ১৩,৮০,০০০ ঘনফুট জ্বালানী পাওয়া যাইতে পারে। বেরুক্ (সিন্ধু) হইতে ৩১৮০,০ ফুট কাঠ ও জ্বালানী, অমরাবতী হইতে ১২,০০০ ঘনফুট কাঠ, বুলডানা হইতে ১৮,০০০ ঘনফুট কাঠ, চিন্দোয়ারী-রাধনাব হইতে ৪৪,০০০ ঘনফুট কাঠ, আকোলা ও কর্ট্র হইতে যথাক্রমে ৭৩,২০০ এবং ৬,২০,৩০০ ঘনফুট জ্বালানী পাওয়া যাইতে পারে। যদি বাংলা অঞ্চল প্রদেশে বা জেলার হিসাব স্বতন্ত্র পাওয়া না-গেলেও সে পরিমাণ যে উপেক্ষণীয় নহে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাবুল কাঠের ব্যবহারই বাংলা দেশে ইহার অধিকাংশ পরিচয় রাখিয়াছে; বিশেষ যাহারা ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহারাই বাবলা-ছালের পরিচয় রাখে। কাঠ সম্বন্ধেও আমাদের জানিবার অনেক কিছু বাকী। সাধারণতঃ আমরা হালের মুঠি, বাড়ির চাপড়া তাক্তা খুঁটি, আর না হয় খানিক কাঠ (খাঁড়ি) করিবার জন্য সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করি। তাহার পর যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ছোট ছোট ডাল (কেক্‌ড়ি) বেড়ার কাজ বা লতা গাছের আশ্রয় হিসাবে চাষীর বিশেষ কাজে লাগে।

বাবলা কাঠ খুব দৃঢ় এবং "তৈয়ার" করিতে (seasoning) পারিলে বহু কাজের বিশেষ উপযোগী হয়। জলের সংস্পর্শে উপরের অসার অংশ শীঘ্র নষ্ট হইলেও, সারাংশ বহুদিন টিকিয়া থাকে। ঘন সন্নিবিষ্ট (grain) অংশ বা তন্তুর জন্য উৎকৃষ্ট কাঠের হিসাবে বাবলার বিশেষ স্থান আছে। তাহা ছাড়া সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলে—যেখানে অন্য কাঠ অনেকটা দুষ্প্রাপ্য—সেখানে লোকব্যবহার রক্ষা করিয়াছে। গাড়ীর চাকা এবং নাভি বা চাকার বেড়াই, পাখি (spoke), অন্যান্য সকল অংশ, যোয়াল এবং চাষের সরঞ্জামে বাবলা বিশেষ সমাদৃত। যন্ত্রপাতির হাতল বা বাঁট, কীলক, খোঁটা, নৌকার হাল ও দাঁড়, খাটিয়ার পায়া, লাট্ বা লাটিম প্রভৃতি খেলার দ্রব্য, কাপড়ের ছাপা প্রভৃতি কাজে বহুতর ব্যবহার রহিয়াছে।

পাতা ও কাঁচা ফল পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বাবলার সুবিধা—যখন অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে, বা যে সকল দেশে সাধারণতঃ বৃষ্টি কম হয়, অন্য গাছ জন্মায় না বা শুকাইয়া যায়—সেখানেও বাবুল গাছের কোনও ক্ষতি হয় না।

অনাদৃত বাবলা সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হইল। কিন্তু এই সকল বস্তু বা বৃক্ষাদি হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা উদ্ধার করার চেষ্টা দিনের প্রয়োজন। এই সেদিন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রকার ববিন্ বা মাটাই সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভর ছিলাম, কাঠ না আসিয়া প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ববিন্ বিদেশ হইতে আসিত। এখন যুদ্ধের সুযোগে যে কেবল ববিন্ আনা কম হইয়াছে তাহা নহে, অপরিচিত অবজ্ঞাত হলদু (Adina cordifolia) এবং অন্যান্য দুই তিন প্রকার কাঠ হইতে সমস্ত ববিন্ এখন এদেশে প্রস্তুত হইতেছে। কলিকাতার মধ্যে ও সন্নিকটে অন্ততঃ ২০টী কারখানা কাজ করিতেছে। তিপাই (plywood) তক্তা এখন ভারতবর্ষে প্রচুর তৈয়ারী হইতেছে। আশা করা যায় চায়ের বাক্স প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া যে এক কোটী টাকা প্রতি বৎসর বিদেশে যাইত, তাহাও রোধ হইবে।

শাস্তি না পুরস্কার ?

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

১

প্রাবৃটের ঘনঘটা। প্রলয় বিষাণের গভীর রোল। কড় কড় নিনাদে দিগ্‌দিগন্ত ত্রস্ত। শন্ শন্ শব্দে উন্মত্ত পাগল ঝঞ্ঝাবায়ু দিক্‌দেশে ছুটছে। কালো কালো বিদ্রোহী মেঘ নিরন্তর রবির কিরণকে করছে কারারুদ্ধ। চারিদিকে প্লাবন।

মনসাডাঙ্গার ভূমি উচ্চ। দামোদরের বানে বহুগ্রাম ধ্বংস হয়েছে। গ্রামান্তর হতে মনসাডাঙ্গায় অজানা লোকের স্রোত বইছে—ভূতের মত চেহারা, চোখে নিরাশার চাহনি, কেহ প্রায় বিবসন, কারো দেহে ছিন্ন বস্ত্র। মায়ের কোলে রোরুদ্যমান শিশু। গ্রামবাসীরা জানে না, এই দেশান্তরের যাত্রীরা আসে কোন দেশ হতে। যাত্রী নিজে জানে না সে যাবে কোথায়। ছেলে খাঁকড়ে ধরে থাকে মাকে। জননীর জঠরে দারুণ ক্ষুধা, মনে দারুণ জ্বালা, কিন্তু নিরাশা-নির্ভয়; গৃহছাড়া ভাবীকালের বিভীষিকাকে ভ্রূকুটি করতে শিখেছে। কারণ যার বাড়া গাল নেই—সে মৃত্যু তো তাদের শিয়রে। এত দীনতা—তবু প্রাণ চায় জীবন, আসন্ন মরণের কোলে।

মনসাডাঙ্গা দামোদর হতে দূরে। কিন্তু কে জানে অজয় কখন ক্ষেপে উঠবে। এদের পাগলামী যে ছোঁয়াচে। দামোদর

ক্ষেপলে তার তাণ্ডব তালে নেচে ওঠে বাঁকা, কসাই, অজয়, রূপনারায়ণ। খানা ডোবা ভাসে, আর অসংখ্য গরু বাছুর, ছাগল ভেড়া, বুড়ো যুবা, ছেলে মেয়ে।

মাঠে মাঠে অজয়ের কূল মাত্র তিন ক্রোশ। যে কোনদিন কচি ধানের ক্ষেতে স্রোত বইতে পারে। কঙ্কালে যুক্তিতর্কের শক্তি থাকে না। তাই একদল মনসাডাঙার দিঘীর পাড়ে বসল। শ্রান্ত মনে ভাবনা শুধু শিশুগুলার জন্যে। যে বিশ্বজননী তাদের উদ্বাস্তু করেছেন তাঁরই বেদীর পাদমূলে যাযাবরদের প্রার্থনা কঙ্কালসার শিশুগুলির মঙ্গল-তরে।

মনসাডাঙা কুবেরের রাজধানী নয়। ‘সেথায় লোকে অগ্রাণে, পৌষে ধান মাড়ে, সারা বছর খায়। তবু গৃহছাড়াকে দেখে গ্রামবাসীর গলায় ভাতের গ্রাস গলে না। যার যা খুদকুড়া আছে সে তার ভাগ দিলে তাদের—যারা আকাশ-তলে বসে বৃষ্টিতে ভেজে, ভিন্‌গাঁয়ের পলাতক, কাঁদবারও যাদের শক্তি নেই।

এই গ্রামে রামু চার বছর হল একখানি ছোট মুদীর দোকান খুলেছে। সে গ্রামবাসীদের বল্লে—শুনছি নাকি কেতুগ্রামে কলকাতার ছেলেবাবুরা চাল বিলোতে এসেছে। তাদের ডাকতে পারলে হয়।

তরুণ, পটল সামন্ত ছুটল তাদের ডাকতে। তার মা মানা করলে, অবাধ্য ছেলে শুনল না। মা মনে মনে গর্ব্বিত হল। ঠাকুরকে বল্লে—"কাঠ-গোঁয়ারটাকে দেখো ঠাকুর।"

২

রামু দোকানী, যতটুকু পারে করে। কিন্তু তার শক্তি কতটুকু? তার মনের গভীরে, একটা গোপন কথা লুকানো ছিল। তার সমাচার জানতো কেবল রামু আর তার অন্তর্যামী বিধাতা। অজয়ও ফুলছিল। নিকেশীপাড়ার মাঠে জল উঠেছে। ছেলেবাবুরা মাঠে মাঠে ঘুরে কলা, মূলা, কচু ইত্যাদি যথাসম্ভব জোগাড় করছিল।

কচু! রামু শিউরে উঠল। তার রহস্য তো পোঁতা ছিল কচুর মূলে। বাবুরা কচুর খোঁজে সজনেতলার গাছ ওপড়ালে, তার গোপন গুহার সন্ধান পাবে। আর কে জানে অজয়ই বা কি খেলা খেলবে। সপরিবারে রামুকেই হয়তো ভিটে ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রী হতে হবে। রামু একটু হাসলে। গৃহছাড়া হলেও সে লক্ষ্মীছাড়া হবে না। তাই সকলকে সর্পিল বিজলী রেখা যখন আকাশে ফুটলো, রামু শিউরে উঠল না!

গ্রাম তখন নিদ্রামগ্ন, আঁধারে ঘেরা, মাঠে একটা জোনাকীরও আলো নেই। গ্রামের শ্রান্ত কুকুরগুলাও নীরব।

শাবল হাতে রামু ঘোষ ডোবার ধারে সজনেতলায় গেল। পরিচিত পথ, পায়ে পথে সচ্ছন্দ ঘনিষ্ঠতা। গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে রামু একবারও হোঁচট খেলে না। ডোবার ধারে চিকুর হানলে যেন তাকে দেখিয়ে দেবার জন্যে, কোথায় আজ চার বৎসর তার সকল আশা, ভীষণ ভয়, হর্ষ ও শিহরণ লুকানো ছিল। আজ হাওয়ায় দুলে উঠল বিজয়নিশান—স্বচ্ছন্দজাত বুনো কচুপাতা।

রামু বসল—টুক্ টুক্ টুক্ শাবলের মৃদু পীড়নেই ভিজে মাটি উঠে এল। শেষে শাবলের আঁচড় পড়ল কঠিন জিনিষে।

সে গর্ত্তে হাত পুরলে। উঃ! সর্ব্বনাশ! কিসের কামড়। নিমেষে, সারা অঙ্গে, বিষের স্রোত ক্রুর, নিষ্ঠুর উন্মত্তো ছুটাছুটি করতে লাগল। উদ্বেল দামোদরের বানের মত মারাত্মক, কিন্তু শীতল স্রোত নয়। গর্জ্জনহীন নীরব নৃশংস অগ্নিবন্যা—হিংস্র কেউটের বিষ!

কেউ তার ছট্‌ফটানি দেখলে না। কোনো মানুষের কান তার কাতর ক্রন্দন শুনলে না। শৃগালের দ্বিতীয় যাম অবসানের সমবেদনার গানেও রেশ ছিল—হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া—ঠিক হুয়া—হুয়া হুয়া।

৩

বন্ধু অনিলের কথা শুনে, নিখিল সেন জননীর অনুমতি চাইল দরিদ্রনারায়ণের সেবার। শ্রীমতী উমা দেবী তখন ঠাকুর ঘরে বসে চন্দন ঘষ ছিলেন পাথরের শ্রীকৃষ্ণকে সাজাবার জন্যে। বল্লেন—"অভ্যাস নেই বাবা, রোগে পড়বে।"

—কেন মা, অনেক ছেলে তো যাচ্ছে। তারাও তো মায়ের ছেলে।

উমা দেবী একটু কাবু হলেন। বল্লেন—তাদের মায়েরা ভাল। শিশুকাল থেকে ছেলেদের নষ্ট করেনি। আমি যে তোকে নষ্ট করেছি বাবা—সময়ে খাইয়ে, গায়ে কাপড় জড়িয়ে, পায়ে জুতো পরিয়ে।

নিখিল পীড়াপীড়ি করলে। উমা দেবী কাতর হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকালেন। সেদিন জন্মাষ্টমী। তিনি বল্লেন—"বড় ভয় হয় বাবা। আচ্ছা, আমি এক'শ টাকা দিচ্ছি, ওদের দে।"

নিখিল বল্লে—টাকার দান তো সেবা নয় মা। তুমি এক শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করছ, শত শত দরিদ্রনারায়ণ আজ বানের জলে ভেসে যাচ্ছে, অনাহারে শুকিয়ে যাচ্ছে, শিশুগুলো পাশে পাশে মরছে। তোমার একছেলে—

তার আন্তরিকতা মায়ের প্রাণকে ছিঁড় ছিঁড় করে টেনে বাড়ালে। জননী আজ বিশ্বজননীর বিশাল স্নেহের স্পন্দন অনুভব করলে। মাতৃস্নেহ স্বর্গের শতমুখ ঝরণা হয়ে শত শত কাঙাল ছেলের ওপর বর্ষিত হল।

চোখ মুছতে মুছতে শ্রীমতী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করলে। ছেলের মুখের হাসি গোপাল-বিগ্রহের মুখে ফুটে উঠল। ব্রজদুলালের মধুর হাসি প্রতিবিম্বিত হল পুত্রের সুমিষ্ট অধরে।

৪

প্রাণপণে খাটলে, অনিল, নিখিল, সুবোধ, চণ্ডী, আরও কত তরুণ। পটল সামন্তের নিমন্ত্রণে তাদের সেবাকেন্দ্র হ'ল মনসাডাঙা।

অতি ভোরে চার বন্ধুতে গেল কচু খুঁজতে। সজনেতলায়, তারা রামু ঘোষের ক্লিষ্ট গোটান দেহ দেখে বিস্মিত হ'ল।

কি ব্যাপার! নীলবর্ণ সঙ্কুচিত দেহ।

সুবোধ সদ্য পাশকরা ডাক্তার। সে বল্লে, সর্পাঘাত।

চণ্ডী বললে—এই গর্ত্ত থেকে কিছু বার করতে গিয়ে বেচারা সাপের কামড়ে মরেছে। আহা!

নিখিল নির্নিমেষ নয়নে মৃতের মুখের পানে তাকিয়েছিল।

অনিল বল্লে—কি নিখিল?

নিখিল ধীরে ধীরে বল্লে—চিনতে পারছ না? আমাদের মুখা হুতা।

অনিল চিনলে, বল্লে, তাইত! এই ত চার বছর পূর্ব্বে তোমার মায়ের গহনার বাক্স নিয়ে পালিয়েছিল।

নিখিল ধীরে ধীরে বললে—হ্যাঁ, বোধ হয় সেই বাক্সই—

বাকীটুকু বলতে পারলে না। তারা সন্তর্পণে গর্ত্ত থেকে বাক্সটা বার করলে। তখনও বাক্সের ডালায় খোদাই করা নাম পড়া যাচ্ছিল—"শ্রীমতী উমা দেবী"। বাক্স বন্ধ। অভাগা রামু যক্ষের ধন আগলাচ্ছিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিখিল বল্লে—ওঃ! নারায়ণ! কি ভীষণ শাস্তি!

সুবোধ বল্লে—ওর শাস্তি না তোমার নারায়ণসেবার পুরস্কার নিখিল?

অভিমানে গর্জ্জে উঠে নিখিল বল্লে—ছিঃ! সুবোধ! ছিঃ!

সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা

শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-টি

প্রত্যেক জাতির প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিলে—সেই জাতির জাতীয় জীবনের বিবর্তন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক জীবনের ভাবধারার সহিত পরিচিত হওয়া যায়। সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন যদিও কেবলমাত্র সেই জাতির শিক্ষানীতির পরিবর্তনের দ্বারা সম্ভব নয়, তথাপি জাতীয় জীবনের কোনরূপ পরিবর্তন হইলে তাহা সেই জাতির প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম প্রতিফলিত হইবে। সেই কারণে যে যুগ কেবলমাত্র লিখন, পঠন, সংখ্যাজ্ঞান (3R) এবং দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের সন্তান-সন্ততির নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে সে যুগের অবসান হইয়াছে।

রাশিয়ার বিপ্লবাত্মক [illegible] যুগের অবসানের পর রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তনের সহিত শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন সমস্যা দেখা দিল। সমাজের মঙ্গলের ও দেশের কল্যাণের সহিত শিক্ষার সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ তাহা বিপ্লবী নেতাগণ বুঝিতে পারিলেন। সমাজ সংস্কারকদের সাথে সাথে শিক্ষা সংস্কারকগণ তাঁহাদের শক্তি শিক্ষার সংস্কারে নিয়োগ করিলেন। কম্যুনিষ্ট ভাবধারার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নূতন শিক্ষা প্রবর্তন করিলেন। মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী শিক্ষার নূতন সংজ্ঞা দেওয়া হইল এবং শিক্ষার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সর্বাঙ্গে সার্থক ও শক্তিশালী করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। তাঁহাদের মতে শিক্ষা তখনই কোন মানে থাকিতে পারে এবং মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর ও হিতকারী হইতে পারে যখন ইহা প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যেক মানুষের জীবনের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত থাকে—তাই লেনিনের মতে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষার প্রধান কাজ হইল বুর্জোয়া জীবনের অবসান করা—কেননা ইহাই হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রগঠনের মূলনীতি—সুতরাং যে স্কুল মানুষের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন—সমাজ ও রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন—সে স্কুল মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ। (··· Our task in the school world is to overthrow the bourgeoise and we declare openly that the school apart from life, apart from politics, is a lie and hypocrisy"—Lenin)

এই মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হইল—শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আদর্শবাদী সমাজতান্ত্রিক ভাবাপন্ন করিয়া তোলা। তাহারাই হইবে ভবিষ্যত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নূতন মানুষ—যাহারা মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাস করিয়া—প্রলিটারিয়েট ডিক্টেটরশিপকে বাঁচাইয়া রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে—যাহাদের মনে মনে শ্রমিক ও ধনিকের ভেদাভেদ জনিত বিবাদের তীব্র চেতনা সর্বদা জাগরূক থাকিবে—অথচ মন যাহাদের শ্রেণীবিদ্বেষমুক্ত হইবে—যাহারা নিজের সমগ্র শ্রমিকদের সংহত শক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস ও অপরিসীম ভরসা রাখিবে এবং অন্য শোষণকারীদের উপর রাখিবে তীব্র ঘৃণা—যাহারা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করিবে না—বিশ্বাস করিবে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে এবং পারস্পরিক সহনশীলতায় এবং পরিশেষে যাহারা আন্তর্জাতিক উচ্চ আদর্শে আদর্শবান হইয়া বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ গড়িয়া তুলিবে। বলিষ্ঠ দেহে বলিষ্ঠ মন লইয়া তাহারাই হইবে নূতন রাষ্ট্রের নূতন মানুষ। সোভিয়েট রাষ্ট্রের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হইল এইরূপ উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত নূতন মানুষ সৃষ্টি করা।

(…we must educate warriors for socialism who clearly understand the problems of their class and are all to evaluate independently all of the most important expressions of the contemporary culture—The task of the Education is to mould the ideal Communist citizen"

—Pinkevitch)

অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার সহস্ররূপ উদ্দেশ্য সহস্রভাবে বলা হইয়াছে—যেমন "চরিত্রের উন্নতি"—"ব্যক্তিত্বের বিকাশ" "জ্ঞানের উন্মেষ" "বিজ্ঞানের উৎকর্ষ" 'কৃষ্টির সংস্কার' ইত্যাদি—কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ যে কেমনভাবে কোন মনোভাবাপন্ন হইয়া গড়িয়া উঠিবে—তাহার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই। সোভিয়েট শিক্ষার উদ্দেশ্য অত্যন্ত সহজ সরল অনাড়ম্বর এবং সহজবোধগম্য—ইহার তুলনায় অন্যান্য রাষ্ট্রের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য কেমন যেন অস্পষ্ট থাকিয়া যায়—।

শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি ইহাই হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার বিশিষ্ট গুণাবলীর পূর্ণ পরিণতিলাভে সহায়তা করা—তাহা হইলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে ইহার বেশী একটী সুস্পষ্ট পন্থা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেরূপ করা হয় নাই।

সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লবের পর রাষ্ট্রজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সোভিয়েট শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তন হইয়াছে এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেই সেই শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। শিক্ষা যখন নূতন সামাজিক জীবনকে গড়িয়া তুলিবার এবং সেই সামাজিক ব্যবস্থাকে সচল রাখিবার খুব বেশী সহায়তা করে—তখন শিক্ষা মানুষের জীবনে যত অল্প বয়স হইতে আরম্ভ করা যায় ততই মঙ্গল। সেই কারণে সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রত্যেক গ্রামে বা নগরে রাষ্ট্রপরিচালিত নার্শারী স্কুল বা শিশু-শিক্ষা-কেন্দ্র (creches) স্থাপন করা হইয়াছে। এই শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের দিনমানে রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে—প্রথম—শিশুদের শারীরিক ও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়—স্ত্রীলোক শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের সাথে কাজ করিবার সহায়তা করা। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিশুদের অত্যন্ত যত্নসহকারে সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। বলকারক খাদ্যে তাহাদের দেহের পুষ্টিসাধন করা হয় এবং তাহাতে তাহাদের মনের স্ফূর্তি বাড়িয়া ওঠে। তাহাদের খেলিবার সাথীদের সহিত খেলিবার সুযোগ করিয়া দিয়া তাহাদের প্রথম সামাজিক শিক্ষার সুরু হয় এবং যতটুকু সম্ভব তাহাদের নিজেদের এবং নিজ নিজ স্কুলগৃহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার স্বতঃস্ফূর্ত মনোবৃত্তি এবং সহজাত দায়িত্ববোধ বিকাশের সহায়তায় তাহাদের কর্মজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান করিয়া তুলিবার শিক্ষা দেওয়া হয়।

নার্শারী স্কুলের পর কিণ্ডারগার্টেন (kindergarten) শিক্ষা আরম্ভ হয়। সমস্ত শিক্ষাই প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতি, কর্মজীবন ও সমাজ—এর (Nature, Labour and Society) মধ্য দিয়া দিতে হইবে—ইহাই হইল সোভিয়েট শিক্ষা প্রণালীর মূলনীতি এবং কিণ্ডারগার্টেন বিভাগেই সর্বপ্রথম এইরূপ প্রণালীতে শিক্ষা আরম্ভ করা হয়। ছাত্রেরা সেই সমস্ত কার্যে নিজেদের নিয়োগ করে—যাহা তাহাদের পরবর্তীকালে জীবনযাত্রার পরিপন্থী—এমন কি খেলাগুলিও শ্রমিকদের দ্বারা ব্যবহৃত যন্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নকল সংস্করণ। পল্লীর কাহিনী—দৈত্যদানবের গল্প—শাখা উপশাখা—রূপকথা, ধর্মবিষয়ক পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি রাশিয়ার

প্রচলিত শিশুপাঠ্য পুস্তক হইতে একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া কোন রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সোনার কাঠি পরশে পালঙ্ক-শায়িতা নিদ্রিতা রাজকন্যার ঘুম ভাঙাইল—এইরূপ রাজপুত্র রাজকন্যার রূপকথা পড়িয়া শ্রমিক ও কৃষকের পুত্রকন্যাদের কোন লাভ নাই। ধর্মের সহিত ধর্মশিক্ষা ও একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে—রাজনীতি ও অর্থনীতির তীব্র চেতনাবোধ ধর্মচেতনাকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করিয়াছে, প্রাচীন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুবিধাবাদী মনোবৃত্তিপ্রসূত এইসব অলীক ও অবাস্তব কাহিনী এবং ধর্মবিষয়ক নীতিশিক্ষা শিশুমনকে অযথা স্বপ্ন-বিলাসী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া তোলে—এই মনোভাবের অনুসরণ করিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রে স্বতন্ত্র শিশু-পাঠ্য পুস্তকের সৃষ্টি করা হইয়াছে—যাহা অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রচলিত শিশু-পাঠ্য পুস্তক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—যাহা মানুষের পারিপার্শ্বিক দৈনন্দিন কর্মজীবন এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার শেষে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষারম্ভের পূর্বে শিশুরা প্রায় ৮ বৎসর বয়সে কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বারা শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান (oktiabrata) এর সভ্য হইয়া যোগ্যতা অর্জন করিয়া থাকে এবং এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত শিশুদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীদের জন্য নির্দ্ধারিত প্রতিষ্ঠানসমূহের (Pioneers and Komsomols) ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে। octobnistyদের প্রধান কার্য্য হইল—কৃষক ও শ্রমিকদের কার্য্যে সহায়তা করা—অধ্যয়ন করা—এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে দৃঢ় করা। (First and most important—constantly help the workers and peasants in their struggle—second, study—third and last—make strong your own organisation—woods)

বাধ্যতামূলক স্কুলের শিক্ষা আট বৎসর হইতে আরম্ভ হয় এবং বার বৎসরের প্রারম্ভে শেষ হইয়া থাকে।

সমাজকল্যাণের পরিপন্থী বলিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপ্রণালী, পাঠ্যতালিকা, পাঠোন্নতি এবং পাঠ্যপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা হইয়াছে—মানবজাতির কল্যাণের মূলে—কি রাজনীতি—কি সমাজনীতি—কি অর্থনীতি—সকলেরই মূলে রহিয়াছে—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠন—সুতরাং শিক্ষাপ্রণালী ও পাঠ্যতালিকা সর্বাংশে সেইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে চিরাচরিত পাঠ্যতালিকার পরিবর্তন করিয়া মানবজীবনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত—প্রকৃতি, কর্ম-জীবন ও সমাজের উপর ভিত্তি করিয়া সম্পূর্ণ নূতন পাঠ্যপ্রণালী ও পাঠ্যতালিকার সৃষ্টি করা হইয়াছে। ছাত্রগণের মানসিক জীবনের ক্রমোবর্ধমান জ্ঞানোন্মেষের সহিত খাপ খাওয়াইয়া এই পাঠ্যতালিকা চারিটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

প্রথম—(১) প্রকৃতি—ঋতুর পরিবর্তন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং নিজ নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি সাবধান হইতে শিক্ষালাভ।
(২) কর্মজীবন—শিশুদের নিজ নিজ গ্রাম বা নগরের, নিজ নিজ বাসভূমির চারিপার্শ্বের শ্রমজীবন বিষয়ে জ্ঞানলাভ।
(৩) সমাজ—নিজ গৃহের পরিবারবর্গের মাঝে বাস করিয়া এবং স্কুলের খেলার সাথীদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া প্রথম সামাজিক জীবনের উপলব্ধি।

দ্বিতীয়—(১) প্রকৃতি—জল, স্থল ও বায়ুর বিষয় জানা, নিজেদের চারিধারে গাছপালা ও জীবজন্তুদের প্রকৃতি ও উপকারিতার বিষয় জানা এবং তাহাদের প্রতি যত্ন লইবার শিক্ষা।
(২) কর্ম-জীবন—যে গ্রাম বা নগরে ছেলেরা বাস করে সেই গ্রাম বা নগরের কৃষক ও শ্রমিকদের দৈনন্দিন কর্ম-জীবনের বিষয় জানা।
(৩) সমাজ—গ্রাম বা নগরের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিষয় সাধারণ জ্ঞানলাভ।

তৃতীয়—(১) প্রকৃতি—বিজ্ঞানের বিষয় প্রাথমিক জ্ঞানলাভ নিজ নিজ প্রদেশের প্রকৃতির ও মানুষের বিষয় জানা।
(২) কর্ম-জীবন—নিজ নিজ প্রদেশের অর্থনীতির জ্ঞান।
(৩) সমাজ—প্রাদেশিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং নিজ নিজ প্রদেশের অতীত ইতিহাসের জ্ঞানলাভ।

চতুর্থ—(১) প্রকৃতি—সম্মিলিত সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘ (U. S. S. R.) ও অন্যান্য দেশের ভূগোল এবং মানুষের জীবনের সহিত পরিচয়।
(২) কর্ম-জীবন—সোভিয়েট রাষ্ট্র (U. S. S. R.) ও অন্যান্য দেশের অর্থনীতির জ্ঞান এবং মানুষের কর্ম-জীবনের সহিত অর্থনৈতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগের পরিচয় লাভ।
(৩) সমাজ—সোভিয়েট ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রের সংগঠন ও মানবজাতির অতীতের ইতিহাসের সহিত পরিচয়।

শিল্প, সংগীত, কলাবিদ্যা, চিত্রাঙ্কন, ক্রীড়া প্রভৃতি আনন্দদায়ক শিক্ষাপদ্ধতির সহায়তায়—প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতি, কর্ম-জীবন ও সমাজ-জীবনের মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের এইরূপ অভিনব প্রচেষ্টা ছাত্রদের কম্যুনিষ্ট আদর্শে এমন আদর্শবান এবং কার্য্যক্ষেত্রে অনুরূপ জীবনযাপনের জন্য এরূপভাবে উপযুক্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে—যেন তাহারা পর্য্যায়ক্রমে শিশু, বালক ও তরুণদের জন্য নির্দ্ধারিত, প্রতিষ্ঠানসমূহের (Oktiabrata, Pioneer and Komsomols) সভ্য বা Comrade হইবার সর্বাংশে উপযুক্ত হইতে পারে এবং শিক্ষাশেষে তাহাদের প্রকৃত কম্যুনিষ্ট জীবনের সুরু হয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের জনগণের জীবনের সহিত জনশিক্ষা অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। জীবনযাত্রা প্রণালী শিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা শিশুকাল হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। শিক্ষাই জীবন—কেবলমাত্র জীবনধারণের উপযোগী করিবার উপায় নহে—এই মতবাদকে যদি কোথাও সর্বাঙ্গীন-ভাবে গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে—তবে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ায় তাহা হইয়াছে। এই মতবাদকে সর্বতোভাবে কার্যে পরিণত করা বাস্তবক্ষেত্রে হয়ত সম্ভবপর হয় নাই কেননা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রাচীন রক্ষণশীলতার বাধা পদে পদে রহিয়া গিয়াছে—এবং যে সমস্ত শিক্ষা-নায়কগণ এবং শিক্ষাব্রতীরা কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে অনুকূল মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেন নাই—তথাপি সোভিয়েট শিক্ষা-প্রণালীর অভিনবত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ত্রুটী হয়ত ইহার অনেক আছে—বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিচার করিলে ইহার বিরুদ্ধে হয়ত অনেক অভিযোগ আনিতে পারা যায়, কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে সমালোচনা তখনই শোভা পাইবে—যখন ইহার অনুরূপ কোন উচ্চ আদর্শ এবং তাহার বাস্তবরূপ তাহারা জগতের সম্মুখে ধরিতে পারিবে।

কথা :— মনোজিৎ বসু

সুর ও স্বরলিপি :—জগৎ ঘটক

শ্যামা আমার নীরব কেন
রোদন ভরা বিশ্বমাঝে।
কানে কি তোর যায় না কাঁদন—
মহাকালের শঙ্খ বাজে॥
তোর ছেলে মা অনাহারে
ঘুরে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে—
মেয়ে যে তোর নিরাবরণ
সে কি মা তোর বুকে বাজে?

দেশ জুড়ে মা হিংসা খালি
হানাহানি চল্‌ছে কত,
ত্রিনয়না! তবু কি তুই—
দেখিস না মা পীড়ন যত।
কি ফুল আজি দেব মা পায়
রাঙা জবা সেও ঝ'রে যায়,—
তুই যে শ্যামা জগৎ মাতা
নীরব থাকা তোর কি সাজে॥

II র্সা র্সা -া ণা দণা -দণা । র্সা র্সর্ঋা -র্জ্ঞা । জ্ঞর্ঋা র্সা -া I
শ্যা মা ০ আ মা০ ০র নী র ০ ব্ কে ন ০

I পা পা -জ্ঞপা । -দণা ণদা পা । জ্ঞা -মজ্ঞা মজ্ঞা । ঋা সা -া I
রো দ ০ন্ ০ ০ ভ রা বি ০ শ্ব মা ঝে ০

I া া সা । ঋা সা সণ্ । সা -ঋা জ্ঞা । জ্ঞপা জ্ঞা পা I
০ কা নে কি তোর যা য়্ না কাঁ০ দ ন্

I পদা ণর্সা র্ঋা । জ্ঞর্ঋা র্সা -া । ণা -ণধা ণা । ণদা পা -া II
ম ০ হা০ ০ কা লে র শ ০ঙ্ খ বা জে ০

II সা -া ঋা । জ্ঞমা মা -া । মা গমা -পদা । পমা মপা -া I
তো র্ ছে লে মা ০ অ না০ ০০ হা রে ০

I পা পদা -পদা | না র্সা -া | র্সা নর্সা -র্না | দা পা -া I
ঘু রে০ ০০ বে ড়া য় দ্বা রে ০ দ্বা রে ০

I পা পদা -ণর্সা | র্রা র্রা -া | র্সর্রা র্সর্জ্ঞা জ্ঞর্রা | র্সনা র্সর্সা -া I
মে ঘে০ ০০ মে তো য় নি০ রা০ ০ ব০ র ণ

I পা পধা -পধা | ধপা মগা -মা | পা পদা র্সণা | ণদা পা -া I
সে কি০ ০০ না০ তো০ য় বু কে০ ০ বা জে ০

I পা পা -জ্ঞপা | -দণা ণদা পা | জ্ঞা ঋজ্ঞা ঋজ্ঞা | ঋা সা -া II
ঘো র ০ন্ ০০ ভ রা বি ০ ষ মা ঝে ০

II সা -া ণ্া | সা দ্ণ্া -দ্ণ্া | সা -া জ্ঞা | ঋসা ঋজ্ঞা -া I
দে শ্ জু ড়ে মা০ ০০ হিং ০ সা খা লি

I ঋা জ্ঞঋা -জ্ঞা | মা পা -া | পা -দা পদণা | ণদা পা -া I
হা না০ ০ হা নি ০ চ ল্ ছে০ ক ত ০

I া া পা | দা পা মা | পা দা ণা | র্সা -া -া I
০ ০ ত্রি ন য় না ত বু কি তু ট ০

I পা পা পদা পপা মা -া | জ্ঞা জ্ঞসা -জ্ঞা | জ্ঞপা পমা -া I
দে খি স্ না০ মা পী ড়০ ন্ য ত

I পা দপণা -র্সর্রা | র্রা র্রা -া র্রা র্রা র্রা | র্সর্রা -র্জ্ঞা জ্ঞর্রর্সা I
কি ছু০ ০ল্ আ জি ০ দে ব মা শা০ ০ ০র্

I া া র্সর্জ্ঞা | র্রা র্সা না | পদা মা পদা | দর্রা র্সা -া I
০ ০ রা০ ভা জ বা দে০ ও ঝ'০ রে০ দা হ্

I র্সা -র্রা র্সা | -া পধা র্সণা | পদা পা -মা | জ্ঞমা মা -জ্ঞা I
তু ই যে ০ জা মা ম০ গ ং মা০ তা ০

I া া ন্া | সা জ্ঞা মা | পা -ণা পা | ণদা পা -া I
০ ০ নী রব্ থা কা তো র্ কি সা জে ০

I পা পা -জ্ঞপা | -দণা ণদা পা | জ্ঞা ঋজ্ঞা ঋজ্ঞা | ঋা সা -া IIII
ঘো র ০ন্ ০০ ভ রা বি ০ ষ মা ঝে ০

শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ্‌-ডি

শরৎচন্দ্রের সর্বপ্রথম উপন্যাস 'শুভদা' তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার রচনাকাল ১৮৯৮, ২০শে জুন হইতে ২ শে সেপ্টেম্বর—প্রকাশকের উক্তি হইতে জানা যায়। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের একটা বিশেষ অনন্যসাধারণ আকর্ষণ আছে। তাঁহার যে মৌলিক রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে পূর্ণবিকশিতরূপে পাঠকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছে, তাঁহার এই প্রথম রচনায় সেই বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু পূর্বাভাস মিলে। এই জন্যই ইহা পাঠকের মনে তীব্র কৌতূহল জাগায়।

অবশ্য উপন্যাসটী যে কাঁচা হাতের রচনা তাহার প্রচুর নিদর্শন প্রতি পৃষ্ঠায় ছড়ানো। প্রথমতঃ চরিত্র-পরিকল্পনায় গভীরতা ও সঙ্গতির অভাব। নায়িকা শুভদার মধ্যে পুরাণ—মহাকাব্য-বর্ণিত সতী স্ত্রীর যে চরম ত্যাগশীলতা ও সহিষ্ণুতা মূর্ত হইয়াছে, তাহাই তাহার বৈশিষ্ট্য স্ফুরণের অন্তরায়। তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ললনার পদস্খলন, সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাহার অনিশ্চিত সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার ক্রমপরিণতি—সমস্তই অস্পষ্ট ও অপরিণততার চিহ্নিত। এই সমস্ত ধোঁয়াটে ভাববিপর্যয়ের মধ্যে যাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার অনির্দেশ্য অতৃপ্তি বোধ। সদানন্দের আত্মভোলা পরোপকার-প্রবৃত্তিও বেশ জীবন্ত হয় নাই। হারাণ মুখোপাধ্যায়ের দুঃশীলতার মধ্যে স্ত্রীর প্রতি একটু দুর্বল সহানুভূতি ও নিষ্ফল আত্মগ্লানি এবং নেশাখোরের সুলভ বাগাড়ম্বর ও উদ্ভট আত্মম্ভরিতা তাহাকে কতকটা ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট করিয়াছে। মুখুজ্যে-পরিবারের মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যা ছলনা অনেকটা সুস্পষ্ট ও সুচিত্রিত—তবে বিবাহে তাহার ভোগলিপ্সার পূরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশ প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। কতকগুলি চরিত্র—যেমন কৃষ্ণ ঠাকুরাণী ও বিন্দু—বেশ সজীব, কিন্তু উপন্যাসে ইহাদের কোন স্থান নাই, ইহারা আগন্তুক মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাসও শিথিল ও আকস্মিক। বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলি কেন্দ্রাভিমুখী হয় নাই। মুখুজ্যে-পরিবারের ইতিহাস-বর্ণনায়ও ভাব-সংহতির অভাব। শুভদার মূক, শত আঘাতেও অটল—পাতিব্রত্য যেন জড়শক্তির স্বভাবজ অপরিবর্তনীয়তার মতই ঠেকে—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা-প্রবাহ যেন এখানে জমিয়া পাথর হইয়াছে। পরের অনুগ্রহের অনিয়মিত তৈল নিষেকে যে পরিবারের সংসার-রথ গড়াইয়া গড়াইয়া চলে, যেখানে একটানা দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতা জীবনযাত্রার গতিবিধি ও পরিবেশ নিয়মিত করে, তাহার ইতিহাসে ঔপন্যাসিক উপাদানের রিক্ততা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু এই সমস্ত অপূর্ণতার মধ্যেও শরৎচন্দ্রের প্রতিভার প্রথম অঙ্কুর আত্মগোপন করিয়া আছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভেই কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সংবাদ রটনার মধ্যে তীব্র-অতর্কিততার সুর এবং এই মুখ-রোচক পরচর্চার মাঝখানেই অকস্মাৎ জিহ্বার বক্র-রেখা ও বিধুর গ্রাম্য দলাদলির অনুধাবন-লব্ধ তীক্ষ্ণ বাস্তব-বোধ—শরৎচন্দ্রের সুপরিচিত প্রকাশ-ভঙ্গী ও চিন্তাধারার উদাহরণ। বোধ হয় এই পরিণতির ছাপটুকু প্রকাশক-উল্লিখিত পরবর্তী পরিমার্জনার ফল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নেশাখোর ও সংসার-উদাসীন ভাই-এর প্রতি রাসমণির অভিশাপের ভিতর দিয়া যে অস্বীকৃত ভ্রাতৃস্নেহ ব্যথিত অশ্রূচ্ছ্বাসরূপে উদ্বেলিত হইয়াছে তাহাকে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব রীতি-প্রসূত বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার এইরূপ বক্র, তির্যক্ গতি ও ঈর্ষা-ক্রোধ-ঔদাসীন্যের বিকৃত ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া তাহাদের স্বরূপ-মাধুর্য্যের উদ্ঘাটন শরৎচন্দ্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ইহার পূর্বসূচনা—তাঁহার প্রথম রচনাতেও লক্ষিত হয়।

সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়—নবম পরিচ্ছেদে পতিতা কাত্যায়নীর সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব। ইহা তাঁহার সুপরিচিত পরবর্তী মনোভাবের সহিত মূলতঃ অভিন্ন। এখনও পতিতা-চরিত্রকে আদর্শ স্বর্ণে রঞ্জিত করার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই সত্য, কিন্তু এই চিত্রে তাঁহার সহানুভূতির ছাপটী সুস্পষ্ট। পতিতাকে তিনি পিশাচীরূপে দেখেন নাই—তাহার নিরাসক্তি, যাহা সাধারণতঃ হৃদয়হীনতা নামে অভিহিত হয়—পিছনে আছে সমর্থনীয় আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তি। কাত্যায়নী হারাণ মুখুজ্যের দুঃখে আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়াছে, অর্থ-সাহায্য ও হিতোপদেশের দ্বারা তাহার কল্যাণ-কামনা করিয়াছে—তাহার প্রত্যাখ্যানের মধ্যেও কোনও পরুষ অবমাননার তিক্ততা নাই। পতিতা জীবনের করুণ অসহায়তা প্রথম হইতেই শরৎচন্দ্রের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে। কাত্যায়নীর শেষোক্তির মধ্যে সমাজ-পরিত্যক্তার চিরন্তন দুর্ভাগ্যের মর্মস্পর্শী আবেদন ধ্বনিত হইয়াছে। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ললনার বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনের সংকল্প ও সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাহার অবৈধ-প্রণয়-সম্পর্ক ব্যাপারে লেখক নিরপেক্ষ মনোভাব দেখাইয়াছেন—এক স্থান ছাড়া (২য় অধ্যায়, ১১শ পরিচ্ছেদ) অন্যত্র মুখ ফুটিয়া প্রশংসাও করেন নাই ও নিন্দার ক্ষীণতম ইঙ্গিতমাত্রও সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। মোটের উপর এই বিষয়ে তাঁহার অনুচ্চারিত সমর্থনই অনুমান করা যায়। সুতরাং দেখা যায় যে সামাজিক নিগ্রহের পাত্রপাত্রীদের সম্বন্ধে তাঁহার নৈতিক উদারতা একটা আকস্মিক আবির্ভাব নহে, পরন্তু তাঁহার লেখক-জীবনের আরম্ভ হইতেই বর্তমান।

ইহা ছাড়া মাঝে-মধ্যে বর্ণনায় ও চিন্তাশীল মন্তব্যেও আমরা তাঁহার ভবিষ্যৎ রীতি-পদ্ধতির পূর্বাভাস দেখিতে পাই। তাড়ির আড্ডার সরস, বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা (১ম অধ্যায়, ৫ম পরিচ্ছেদ), রুগ্ন বালক মাধবের রঞ্জিত, ব্যাধিজর্জর মনের পরলোক-কল্পনা (৮ম পরিচ্ছেদ), অটল ধৈর্য্যের প্রতিমূর্তি শুভদার হঠাৎ অসহ্য অন্ন-ব্যাকুলতার মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়া, মুখরা কৃষ্ণপ্রিয়ার রুক্ষ-কাঠিন্যের মধ্যে গোপন স্নেহ-নির্ঝরের প্রবাহ (১২শ পরিচ্ছেদ), ভালবাসার সহিত দুঃখের নিত্য সম্বন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বাস্তবপ্রধান মনোবৃত্তির মধ্যে হঠাৎ সুগভীর ভাবোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি (২য় অধ্যায়, ১১শ পরিচ্ছেদ) ও অন্তরের দাহ হিংস্র ও মর্মান্তিক আক্রোশ শান্ত করিবার জন্য সদানন্দের কৌশলময় ব্যবহার (১২শ পরিচ্ছেদ)—এই সমস্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা ভাবী উপন্যাস সম্রাটের নিপুণ বাগ্‌-স্পর্শের কথঞ্চিৎ পূর্ব-সংকেত অনুভব করি। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা যে ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক পথ ধরিয়াই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার প্রথম উপন্যাস তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

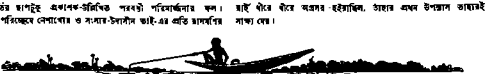

জঙ্গম

বনফুল

১৭

মাঘ মাসের শীত। সকাল হইতে একটা প্রখর পশ্চিমে হাওয়া উঠিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল, রৌদ্রকিরণে চতুর্দ্দিক ঝলমল করিতেছে, তবু কনকনে শীত, হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছে। আঙুলের ডগাগুলি বরফ-শীতল। গায়ে গেঞ্জি, সার্জের পাঞ্জাবী, মোটা সোয়েটার, তবু শীত করিতেছে! শঙ্কর উঠিয়া ওভার-কোটটা গায়ে দিল।

"ছিত করচে?"

খুকী মন্তব্য করিল। খুকীর শীত নাই। একটা সাধারণ ফুট-ফ্ল্যানেলের ফ্রকই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরের কোণে একটি টুলের উপর বসিয়া এবং আর একটি উচ্চতর টুলের উপর খাতা রাখিয়া একটি পেন্সিল সহযোগে সে হিজিবিজি কাটিতেছিল। লিখিবার সময় শঙ্কর যেমনভাবে বসে ঠিক তেমনিভাবে একটু ঝুঁকিয়া টুলের উপর বাম কনুইয়ের ভর দিয়া বসিয়াছে। যদিও আজকাল কাগজ পেন্সিল দুর্ম্মূল্য, তবু তাহাকে একটা ছোট পেন্সিল এবং পুরাতন খাতা দিতে হইয়াছে। সে 'চিঠি' লিখে! বাবা যাহা যাহা করে সব তাহার করা চাই। এমন-কি পোড়া সিগারেটের টুকরা কুড়াইয়া সে বাবার মতো 'হিগ্‌লেট'ও খায়!

"বড্ড শীত করছে"

"চা খাবে?"

"খাব"

"মাকে বলে' আসি—"

পাকা গৃহিণীর মতো মুখ করিয়া খুকী রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

শঙ্কর খবরের কাগজটি মুড়িয়া রাখিয়া দিল। এতক্ষণ সে খবরের কাগজ পড়িতেছিল। জাপান ও জার্ম্মানীর যুদ্ধোদ্যম আশঙ্কাজনক। ভারতবর্ষের যুদ্ধে যোগদান করা উচিত কি না ইহা লইয়া নেতাদের মধ্যে বিতণ্ডা চলিতেছে। উচিত কি? শঙ্কর ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ক্ষণপরেই মনে হইল—আদার ব্যাপারী শুধু শুধু জাহাজের ভাবনা ভাবিয়া মরিতেছি কেন! যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানও যেমন তাহার অসম্পূর্ণ, সম্পর্কও তেমনি অসংলগ্ন। বহু সহস্র মাইল দূরে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে, এদেশের উলুখড়দেরও আপাতত চিন্তিত হইবার কোন হেতু নাই। যুদ্ধ এদেশে উপস্থিত হইলে যথাকর্ত্তব্য চিন্তা করা যাইবে। যুদ্ধ সম্পর্কে কোন প্রেরণাই তাহার মনে জাগিল না।

কট কট কট কট কট···

'ডাসা' বাজিতেছে। মহরম আসিয়া পড়িল না কি! এইবার দলে দলে মুসলমান প্রজারা আসিয়া ধারের জন্য দ্বারে ধর্ণা দিবে। যে উদ্দেশ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ঠিক হইয়াছিল যে চাষের জন্যই চাষীদের ধার দেওয়া হইবে, যাহাতে তাহারা ভাল বীজ, ভাল সার, ভাল গরু কিনিয়া ভালভাবে চাষ করিতে পারে। ভাল ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে। কার্য্যকালে কিন্তু দেখা গেল যে প্রত্যেকটি চাষী ধার চায়—হয় বিবাহের জন্য, না হয় মহাজনদের ধার শোধ করিবার জন্য, কিম্বা কোন পর্ব্ব উপলক্ষে। ভাল ফসল উৎপন্ন করিবার দিকে তাহাদের তত উৎসাহ নাই। তাহারা জানে যে যত ভাল ফসলই তাহারা উৎপন্ন করুক না কেন, সে ফসল তাহাদের ভোগে কখনও লাগিবে না। তাহা মহাজনে গ্রাস করিবে। যে ঋণজালে তাহারা জড়িত প্রত্যেক বছর ফসল দিয়াই সে ঋণের খানিকটা পরিশোধ করিতে হয়—অনেক সময় মহাজন মাঠ হইতেই ফসল কাটাইয়া লইয়া যায় এবং নিজের খুশি মতো একটা মূল্য ধার্য্য করিয়া দেয়। তাহারা জানে যে ফসল যত ভালই হোক, ঋণ কখনও পরিশোধ হইবে না। মহাজন ফসলের দাম যাহা দিবে তাহাই তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই—কারণ ওই মহাজনরাই বিপদে-আপদে টাকা ধার দেয়—মহাজনদের বাড়ীই হাত পাতিয়া জীবন-ধারণ করিতে হয়—মহাজনরাই মালিক। বস্তুত বলিতে কার্য্যতঃ ওই মহাজনদেরই ক্রীতদাস তাহারা। মহাজনদের ঘরে দশ মণের জায়গায় বিশ মণ ফসল পৌঁছাইয়া দিলে যদি সত্যই তাহারা ঋণমুক্ত হইতে পারিত সে-চেষ্টা তাহারা নিশ্চয়ই করিত। কিন্তু অধিকাংশ চাষারই জমি সামান্য—কিন্তু ঋণ প্রচুর। সুদের চক্রবৃদ্ধিতে সে ঋণ পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। সে পর্ব্বত ধূলিসাৎ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দেশের আইন তাহাদের অনুকূল নয়—চাষের উন্নতি করিয়া ঋণ-শোধ করিবার আশাও তাহারা করে না। ভাল সার, ভাল গরু, ভাল বীজ লইয়া কি করিবে তাহারা? ঋণমুক্ত হইবে? অসম্ভব! বংশ পরম্পরা ধরিয়া এই সত্য তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে যে ঋণ আছে এবং থাকিবে। তাই বলিয়া কি বিবাহ করিতে হইবে না? 'হোলি' 'ছট্' 'দশমীতে' রঙীন নূতন কাপড় পরিতে হইবে না? কোন সামাজিক অপরাধে 'হুক্কা-পানি' বন্ধ হইলে 'গোতিয়া'দের আহারে তুষ্ট করিয়া জাতে উঠিতে হইবে না? ইহাই তো তাহাদের জীবন। চাষের উন্নতির জন্য নয়, এই জীবনকে আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্যই তাহাদের টাকার দরকার। এই জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে কিছুক্ষণের জন্য অব্যাহতি পাইবার নিমিত্তই তাহারা তাড়ি মদ গাঁজা আফিংও খায়। এসব বাদ দিয়া তাহারা বাঁচিবে কিসের আশায়! তাই তোমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত নৈতিক বক্তৃতা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্ম্মে প্রবেশ করে না। তোমাদের মতো তাহারাও জীবনকে ভোগ করিতে চায়। শঙ্কর ইহা বোঝে, তাই আর আপত্তি করিতে পারে না। লিখিত আইন অমান্য করিয়াও ধার দিয়া ফেলে। মহরমের বাজনা শুনিয়া তাই সে মনে মনে বিব্রত হইয়া পড়িল। চাষের মিথ্যা ওজুহাতে আবার একদল

লোককে একগাদা টাকা দিতে হইবে। অথচ না দিয়াও উপায় নাই। এ এক মহাসমস্যা। এবার কিন্তু সে টাকা দিবে না ঠিক করিয়াছে। সেবার অত টাকা মহাজনদের সিন্দুকে ঢুকিয়াছিল, এবার সে টাকা দিবে না—জিনিস কিনিয়া দিবে। নিপুণ আর নিতাই একটু যদি সাহায্য করে অনায়াসেই উহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনিয়া দেওয়া যায়। মেয়েদের জিনিস হাসি কিনিতে পারে। হাসিও এক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। হাসির তত্ত্বাবধানে ও কার্যকুশলতায় মেয়ে-স্কুলটার বেশ উন্নতি হইতেছিল। কিন্তু কলকাতার শিক্ষিত বেহারী-ভদ্রলোক একটা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। হাসি 'হিন্দি নোইং' নয়। কাজ-চলা-গোছ হিন্দি সে অবশ্য শিখিয়াছে—কিন্তু হিন্দি পরীক্ষা পাশ না করিলে গভর্ণমেন্টের চক্ষে 'হিন্দি নোইং' হওয়া যায় না। পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে। হাসি পরীক্ষা দিতে রাজি নয়। যাঁহারা 'হিন্দি নোইং' শিক্ষয়িত্রীর জন্য আন্দোলন করিতেছেন তাঁহারা যে হিন্দি ভাষার প্রতি অথবা বেহারী সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিবশত করিতেছেন তাহা নয়। তাঁহাদের সর্ববিষয়ে বাঙালীদের অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া এ ধারণা হয় না যে স্বকীয় বেহারী বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহারা খুব বেশী অবহিত। এই শিক্ষিত বেহারীগণ বাঙালীদেরই মতো চাকরি-লোলুপ, বাঙালী পোষাক পরেন, ছেলে মেয়েদের বাঙালী নাম রাখেন, বাঙালী আচার পছন্দ করেন, বাঙালীদের সাহিত্য হইতে চুরি করেন কিন্তু বাঙালীদের ভাল দেখিতে পারেন না। ইংরেজ সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীদের যে মনোভাব ছিল, বিংশশতাব্দীতে বাঙালী সম্পর্কে ইঁহাদের ঠিক সেই মনোভাব। হাসি যে স্কুলের উন্নতির জন্য এত পরিশ্রম করিতেছে তাহা ইঁহাদের নিকট অবান্তর ব্যাপার, আসল কথা হাসি 'বাঙালিনী'—তাহাই তাহার চরম অপরাধ। কোন একটা ছুতা করিয়া তাহাকে তাই তাড়াইতে হইবে। মেষশাবককে বধ করিবার জন্য নেকড়ে বাঘের ছুতার অভাব কোন কালে হয় না। শিক্ষা-বিভাগের আইনও তাঁহাদের স্বপক্ষে আছে।

বাংলায় ইংরেজি-শিক্ষায় শিক্ষিত তাহাদেরই এই মনোভাব; অশিক্ষিত জনসাধারণ হাসিকে ভালবাসে, ভক্তি করে। শঙ্কর বারম্বার এই সত্যটাই নানারূপে উপলব্ধি করিতেছে—যত গলদ যত কলহ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই। শিক্ষা-বিভাগের আইনের কবলে নিতাই বেচারাও কবলিত। এই সব কারণে তাহার সমস্ত স্কুলগুলি গভর্ণমেন্ট সম্পর্করহিত করিবার ইচ্ছা শঙ্করের কিছুদিন পূর্ব্বে হইয়াছিল। গভর্ণমেন্ট যে টাকা সাহায্য করেন তাহা যৎসামান্য—সে সাহায্য না লইয়াও শঙ্কর স্কুলগুলি চালাইতে পারে। কিন্তু অন্য মুশকিল আছে। ইনস্পেকটার মহাশয়ের কলমের খোঁচায় কাঁটা-পোখর স্কুলটি যখন গভর্ণমেন্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল তখন স্কুলটা উঠিয়াই গেল। অর্থাভাবে নয়, ছাত্র জুটিল না। যে স্কুল হইতে পাশ করিয়া গভর্ণমেন্টের 'নোক্‌রি' মিলিবে না সে স্কুলে কেহ পড়িতে চায় না। কেহই 'শিক্ষা' চায় না, সকলেরই উদ্দেশ্য 'নোক্‌রি'। গভর্ণমেন্ট অননুমোদিত 'জাতীয়' স্কুলে ছাত্র জুটিবে না। এ মনোভাব যদিও প্রশংসনীয় নয়, তবু শঙ্কর ভাবিয়া দেখিয়াছে 'নোক্‌রি'র লোভে তবু খানিকটা শিক্ষা তো হয়—তাহাই মন্দের ভাল। নিতাই আইনত নিজেকে 'কোয়ালিফাই' করিতেছে। মূর্গি-মদ-পরিতুষ্ট ইনস্পেক্টার দয়া করিয়া তাহাকে 'টাইম' দিয়াছেন। হাসিকেও রাজি করিতে হইবে। হাসি দিন দিন কেমন যেন গম্ভীর হইয়া পড়িতেছে। মুখে হাসি নাই, প্রসন্নতা নাই—চোখে কেমন যেন একটা দৃষ্টি। কোথাও যায় না, কাহারও সহিত মেশে না। নিজের ছেলেকেও কাহারও সহিত মিশিতে দেয় না। নিখুঁত নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্যটুকু করিয়া নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। অমিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিল—আলাপ জমে নাই। খুব কম কথা বলে—মনে হয় সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক সেই-টুকুরই উত্তর দিয়া চুপ করিয়া যায়। ক্রমাগত প্রশ্ন করিয়া করিয়া আলাপ জমানো যায় না। অমিয়ার আর হাসির কাছে যাইবার উৎসাহ নাই। সুরমা কিন্তু মাঝে মাঝে যায়। কারণ, সুরমার জীবনের একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-সূচী আছে, তদনুসারে সে নিয়মিতভাবে সমস্ত সামাজিক কর্ত্তব্যগুলি করিয়া যায়। কবে কাহার বাড়ি যাইতে হইবে, কাহার বাড়িতে কবে কোন খাবারটি পাঠাইতে হইবে, কোন মেয়েটিকে কবে কোন গানটি শিখাইতে হইবে, কবে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে—এ সমস্তই সুরমা বাঁধা-নিয়ম অনুসারে করে। ঠিক নিয়মিতভাবে আসন বুনিয়া চলিয়াছে। অথচ উৎপলের সম্বন্ধেও সে উদাসীন নয়—উৎপলের জন্য অন্ততঃ একটি খাবার তাহার নিজের হাতে করা চাই—উৎপলের অনেক চিঠির জবাব সেই লেখে। পড়াশোনাও করে। পাড়ার কয়েকজন বাঙালী ও বেহারী মেয়েকে ব্যাডমিণ্টন খেলাতেও উৎসাহিত করিয়াছে। কৃষ্ণনার সহিত তর্ক করিবারও অবসর পায়। তুমুল তর্ক করিয়া বন্ধুত্বও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। অদ্ভুত রকম ছন্দোময় তাহার জীবন। অদ্ভুত রকম মাত্রাজ্ঞান আছে। অমিয়ার সহিত যখন কথা কয়, মনে হয় শিক্ষায় দীক্ষায় সে অমিয়ারই সমান। ঠিক সমান স্বচ্ছন্দতার সহিত সে সেদিন পুলিশ সুপারিন্‌টেনডেণ্টের মেম সাহেবের সহিতও আলাপ করিল। কোথাও কখনও বেসুরা হয় না। সুরমার কর্ম্মতৎপরতায় শঙ্কর মুগ্ধ। বহুকাল পূর্ব্বে এই সুরমাকে ঘিরিয়া তাহার মনে যে মোহ জাগিয়াছিল সে মোহ এখন কিন্তু আর নাই। নিজের স্ত্রীরূপে অমিয়ার স্থানে সুরমাকে সে কল্পনাই করিতে পারে না। সুরমা কারুকার্য্যমণ্ডিত পালঙ্ক, অমিয়া হয় তো অতি সাধারণ তক্তাপোষ। কিন্তু সুনিদ্রার জন্য শঙ্করের পালঙ্কের আর প্রয়োজন নাই, তক্তাপোষই যথেষ্ট—বরং পালঙ্কে হয়তো মোটেই নিদ্রা আসিবে না এ আশঙ্কাও আছে। না, সুরমাকে ঘিরিয়া সে মোহ তাহার আর নাই। তবু সুরমা-চরিত্রে সে মুগ্ধ।

"বাবুজি—"

দ্বারপ্রান্তে রহিম দেখা দিল। তাহার সহিত পূরণও আসিয়াছে। মহরমে কি কি জিনিস লাগে তাহারই আলোচনা করিবার জন্য শঙ্কর রহিমকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। শঙ্কর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিতেই রহিম এবং পূরণ উভয়েই সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

"পূরণের কি খবর"

পূরণ কোন উত্তর না দিয়া সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর তখন রহিমকে বলিল—"মহরমে তোদের কি কি হয়

বল তো। এবার আর টাকা পাবি না কেউ—জিনিস কিনে দেব ভাবছি। মহরমে কি কি করবি বল—"

রহিম নিজের ভাষায় মহরম-পর্ব্ব বর্ণনা করিতে লাগিল।

আমরা যেমন পূজা-পার্ব্বণে একজন পুরোহিত নিযুক্ত করি উহারাও তেমনি একজন 'মোজাবের' নিযুক্ত করে। 'মোজাবর'কেই সব করিতে হয়। আমাদের দুর্গা পূজায় যেমন ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী আছে, মহরমেও তেমনি আছে। 'ছট্‌মী'র দিন দুইটি কর্ত্তব্য। প্রথম 'কেলা কাট্‌টি'। সকালে কলার গাছ কাটিতে হয়। তাহার পর পাড়ার লোক দল বাঁধিয়া গিয়া 'ইমামবাড়াতে সমবেত হইয়া সেই কলাগাছ পুঁতিয়া আসে। বৈকালে দ্বিতীয় কর্ত্তব্যটি করা হয়। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নদী হইতে মাটি আনা। পরিষ্কার মাটির গামলায় সে মাটি রাখিয়া পরিষ্কার কাপড় দিয়া তাহা আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। এই হইল 'ছট্‌মী'র কাজ। সপ্তমীর দিন 'ফুরসান'—অর্থাৎ শূন্য, বিশেষ কিছু করিবার থাকে না। 'অঠমী'র দিন কিন্তু অনেক কাজ। সেদিন 'ইমামবাড়াতে' শরবৎ এবং তিল-চৌরি লইয়া যাইতে হয়। 'তিল-চৌরি' চাল চিনি এবং তিল দিয়া প্রস্তুত একপ্রকার মিঠাই—প্রত্যেক ঘরেই তৈয়ারি করে। শরবৎ এবং তিল-চৌরি ইমামবাড়াতে লইয়া যাইবার পর 'মোজাবর' নেমাজ পড়েন। সেই নেমাজ-পূত শরবৎ তিল-চৌরি ঘরে আনিয়া রাখা হয়। তাহার পর 'মলিদা' বানাইয়া কিছু বুঁদিয়া এবং লাল সুতা উহার উপর দিয়া মুরতজ্ আলির পাঞ্জার নিকট লইয়া গিয়া ভোগ দেওয়া হয়। ভোগ দিবার পর সেগুলি ঘরে আনিয়া সকলে মিলিয়া খায়। সেই 'অঠমী'তেই রাত দুইটার সময় 'তাসা' বাজিয়া ওঠে। মাটির কড়ার উপর চামড়া দিয়া এই বাদ্যটি প্রস্তুত, কোমরের কাছে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কাঠি দিয়া বাজাইতে হয়। 'তাসা' বাজিলেই সকলে নিজেদের নিশানে তাজিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাজিয়া-নিশান-সমন্বিত এক একটা দলকে 'আখাড়া' বলে। আপন আপন আখাড়া লইয়া তাসা বাজাইতে বাজাইতে লাঠি খেলিতে খেলিতে সকলে মুরতজ্ আলির বাজারে যায়। সেখানে নিশান নামাইয়া ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে। তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া আসে। 'নউমী'র দিন দিনে কিছু হয় না। রাত্রে একটু ভালো আহারের ব্যবস্থা থাকে সেদিন। পোলাও হয়। রাত্রি নয়টা দশটা নাগাদ পোলাও লইয়া মোজাবর-সহ সকলে ইমামবাড়াতে যায়। সেখানে 'ফতেহা' হয়—মোজাবর 'দোয়া' মাঙে—অর্থাৎ সকলের জন্য ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া বাড়িতে সেই পোলাও আহার করে। ইহার সঙ্গে মাংসও থাকে। রাত্রি দুইটার সময় আবার 'তাসা' বাজিয়া ওঠে। আবার সকলে 'আখড়া' লইয়া বাহির হয়, পূর্ব্বদিনের মতো মুরতজ আলির বাজারে যায়, সেখানে নিশান তাজিয়া নামাইয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে—ভোর হইতে না হইতে আবার বাড়ি ফিরিয়া আসে। 'দশমী'র সকাল বেলাটা স্নানাদি করিয়া গত রাত্রির শ্রম অপনোদন করিতেই কাটিয়া যায়। অপরাহ্নে—বেলা দুইটা নাগাদ—আবার আখড়া বাহির হয়। সেদিন চতুর্দ্দিক হইতে 'আখাড়া' আসিয়া রাস্তার চৌমাথায় জমিতে থাকে। সেখান হইতে সকলে 'কারবালা'য় যায়। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী যাহার আখাড়া আগে যাইবার আগে যায়, যাহার পিছনে যাইবার কথা সে পিছনে থাকে। আগে পিছে যাওয়া লইয়া অনেক সময় দাঙ্গাও বাধে। কারবালায় পৌঁছিয়া 'দফ্‌না' দিতে হয়। নিশানে নিশানে কাগজের যে ফুল থাকে সেই ফুলগুলিকে ছোট ছোট পরিষ্কার কাপড়ের টুকরায় বাঁধিয়া কবর দেওয়া হয়—কবরের ভিতর 'কফন' থাকে। এই কাগজের ফুল কবর দেওয়াই 'দফ্‌না' দেওয়া। 'দফ্‌না' দিবার পর নিশানগুলির সম্মুখে 'শিন্নি' দিয়া সকলে আপন আপন বাড়ি ফিরিয়া যায়। এই উপলক্ষে কারবালার কাছে মেলা বসে, অনেকে সেখানে জিনিসপত্র কেনে। 'দশমী'র পর চারদিন কাটিয়া গেলে 'ফুল-পান' হয়। সকলে পানের সহিত এক টুকরা ফুল চিবাইয়া খায়। ইহা হাসান-হোসেনের মৃত্যুদিবস-পালন। চল্লিশ দিন পরে 'চলিশবা' হয়। আবার 'আখাড়া' লইয়া মুরতজের কাছে সকলে যায়। ইহাকে 'চেহেলুম'ও বলে অনেকে।

বর্ণনা শেষ করিয়া রহিম বলিল যে সে এবার মানত করিয়াছে নিশান চড়াইবে।

"তোরাও হিন্দুদের মতো মানত করিস না কি"

শঙ্করের অজ্ঞতা দেখিয়া রহিম হাসিল। তাহারা মানত করে বই কি। কেহ নিশান চড়ায়, কেহ তাগা বাঁধে, কেহ ফুল পরে। অনেক হিন্দুরাও মহরমে মানত করে—এই পুরণই তো এবার হাত বাঁধিয়াছে!

"তাই না কি"

পুরণ সসঙ্কোচে একটু হাসিল।

ইতিপূর্ব্বে শঙ্করের অনেকবার মনে হইয়াছে এখন আবার মনে হইল হিন্দু মুসলমান সমস্যা লইয়া শিক্ষিত-সাংবাদিকদের যে দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক শরক্ষেপ যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে সে দ্বন্দ্ব ইহাদের মধ্যে নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল। কিছুদিন পূর্ব্বে মংলার বউটা একটা সদ্যোজাত শিশু রাখিয়া মারা গিয়াছে। প্রায় একই সময়ে আলিজানেরও ছেলে হইয়াছিল। আলিজানের বউ মংলার ছেলেকে স্তন্যদান করিয়া মানুষ করিতেছে। যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা খবরের কাগজের পাতায়, শিক্ষিত সমাজের বক্তৃতা-মঞ্চে, রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্সে বিষ উদ্গীরণ করে সে সমস্যা ইহাদের মধ্যে নাই। সে সমস্যা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, ইহাদের নয়। ইহাদের একটি সমস্যাই আছে—তাহা দারিদ্র্য। সেই নিদারুণ সমস্যার প্রবল চাপে ইহারা সকলেই একজাত হইয়া গিয়াছে। সকলেই বিপন্ন। বাহিরের ধর্ম্ম যাহাই হউক—অন্তরে সকলে এক। ইহারা মহরমই করুক আর 'ছট্‌'ই করুক, সকলেই দেবতার কাছে মানত করে—একই ভাষায় একই প্রার্থনা জানায়—ভগবান আমাদের বাঁচাও।

রহিম পুরণ উভয়েই টাকা ধার চাহিল। চাহিলে এ লোকটি যে 'না' বলিতে পারে না এ খবর ইহারা জানিয়াছে--তাই ইহারই কাছে বারবার ছুটিয়া আসে। কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে এমনভাবে কত টাকা সে দিতে পারে? জিনিস কিনিয়া দিলেই বা কি সুবিধা হইবে? জিনিস কিনিতেও টাকা লাগিবে—অথচ ইহারা সুখী হইবে না। নিজেদের উৎসবে নিজেরা জিনিস কিনিলে যে আনন্দ হয় পরের দেওয়া জিনিসে ঠিক সে আনন্দ হয় না। সে আনন্দে ইহাদের বঞ্চিত করার কি অধিকার আছে তাহার?

টাকা নিয়ে যে মহাজনদের ধার শোধ করবে তা হবে না—"

"সেই বাদ্ নেই, ফিরিয়ে দিলা দিচ্ছিরে—"

উভয়েই সমস্বরে শপথ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ইহাদের শপথও যে সব সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা শঙ্কর বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল এই নিদারুণ শীতে উভয়েই অতি জীর্ণ সূতির চাদর জড়াইয়া আছে, পরিধানেও অতি মলিন ছিন্ন বসন—হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে নাই। অথচ সে কোটের উপর ওভার কোট চড়াইয়াছে! বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আর সে তুলিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল—"আচ্ছা কাল আসিস—দেব—"

উভয়ে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

আবার শঙ্করের মনে প্রশ্ন জাগিল—ব্যাঙ্কের টাকা এমনভাবে খরচ করা কি ঠিক হইতেছে? সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল ব্যাঙ্কের যদি কিছু ক্ষতি হয় আমিই না হয় তাহা নিজের টাকা হইতে পূরণ করিয়া দিব। নিজের টাকা! নিজের কত টাকা আছে তাহার! উৎপল তাহাকে যে বেতন দেয় তাহার সমস্তই তো খরচ হইয়া যায়। পৈতৃক কিছু টাকা অবশ্য রাজীবলোচনের কাছে জমা আছে—(অম্বিকাবাবুর রাজীবলোচনের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল)—কিন্তু সে টাকার পরিমাণ কত শঙ্করের জানা নাই। পিতা যে উইল করিয়া তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন এই অভিমানে সে এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধানই করে নাই এতদিন। রাজীবলোচনের কাছে যত টাকাই থাক তাহা বর্তিত অমিয়ার। উইল সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু টাকা খরচ করিবার অধিকার তার নাই।

"তোমার আদুরে মেয়েকে নিয়ে আর পারি না বাপু, সমস্ত দেশলাই কাঠিগুলো বাক্স থেকে বার করে মেঝেময় ছড়িয়েছে"

অমিয়া খুকীকে দুম্ করিয়া বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

খুকী কাঁদিল না। তাহার সমস্ত মুখে যেন আহত আত্মসম্মান দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—বিস্ফারিত চক্ষুর কোণে অশ্রুর আভাস, ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে।

"মা দুষ্টু,—এস তুমি আমার কাছে—"

মুহূর্তে সমস্ত দুঃখ অন্তর্হিত হইল—হাসিতে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—শঙ্করের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—"বাবা বালো—"

অমিয়া চা লইয়া প্রবেশ করিল।

"চায়ের কথা ঠিক বলেছে দিয়ে তাহলে"

"তক্ষুণি। উনুন জোড়া ছিল বলে দেরি হয়ে গেল—"

খুকী শঙ্করের বুকের উপর চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

"মা আদুরে করছ মেয়েটিকে বুঝবে মজা। দুধ খাবি চল—"

"আমি দুদ্ খাব না। বাবার কপে চা খাব"

শঙ্কর হাসিয়া উঠিল।

"দেখেছ আস্পর্দ্ধা! চল্"

অমিয়া জোর করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

"না—না—না—"

"আচ্ছা একটু চা দিচ্ছি—দুধ খাও গিয়ে। লক্ষী তো—"

ডিসে একটু চা ঢালিয়া দিতে হইল। খুকী অমিয়ার কোল হইতে ঝুঁকিয়া তাহা পান করিতেছে এমন সময় বাড়ির উঠানে "কোঁকর কোঁ" শব্দে মুরগী ডাকিয়া উঠিল।

"বমু—"

"হাঁ জমরু এসেছে—চল"

খুকী আর যাইতে আপত্তি করিল না।

চা-পান শেষ করিয়া শঙ্কর আবার ইজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িল। নানা চিন্তার আলো-ছায়ায় তাহার মনটা বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। কট—কট—কট—কট—। কাছে দূরে সর্বত্র মজুরদের বাজনা বাজিতেছে। কিন্তু এই বাজনার অন্তরালে অপরিশোধ্য ঋণের যে কাহিনী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে সেই কাহিনীটাই শঙ্করের অন্তরে জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়া রহিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল এত করিয়াও কিছু হইতেছে না। ইহারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। সকলেরই অর্থাভাব। কাহারও স্বচ্ছলতা নাই। এমন কি তাহার নিজেরও। টাকা—টাকা—টাকা—সকলেরই ওই এক চিন্তা!

(ক্রমশঃ)

জঞ্জাল

শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

সনাতন ভারতের বাণী—'অমৃতের পুত্র তোরা'
স্বাস্থ্যহীন কঙ্কর নাস্তিক, মত্ত গর্ব্বে বলীয়ান,
ক্লিষ্ট শিশু ক্ষুধাতুর জীব পারে না বাঁচিতে আর,
ক্ষীণ কণ্ঠ গর্জ্জে ওঠে অবিরত স্ফুলিঙ্গ সমান।
থাম্, থাম্ ওরে মিথ্যাবাদী, রাখ্, তুলে কাব্যকথা,
ভুলে যারে পুঁথির দর্শনের মিথ্যা ও ছলনা;
দেখ্, চেয়ে নয়ন উন্মীলি রাজপথের ঐ ছবি—
কি করুণ, বীভৎস মূর্ত্তি ওই উলঙ্গ লাঞ্ছনা!
আহত দলিত পিষ্ট মানবতা করে আর্ত্তনাদ,—
ঊর্দ্ধপানে বাহু তুলি বিধাতারে দেয় অভিশাপ,
শক্তিহীন নিষ্ফল আক্রোশে গুমরি গুমরি কাঁদে,
তবুও জাগে না বক্ষে বিদ্রোহের অগ্নিভরা প্রাণ।
মুষ্টিমেয় ক্লিবের দল চলমান জীবন্ত কঙ্কাল
রাজপথ বেয়ে চলে সভ্যতার অপূর্ব্ব জঞ্জাল।

প্রশ্ন

শ্রীগোপাল ভৌমিক

জীবনের সুপ্রভাত কল্পনা-মদিরা
রহস্য-কুহেলী দিয়ে রেখেছিল ঘিরে;
প্রথম প্রভাতে তাই বলেছি, রুচিরা—
হও যদি সুদুর্লভ মরণের তীরে
তোমাকে রাখ্‌ব ধরে। চিরচঞ্চল
রবে তুমি, হে আমার একমাত্র প্রিয়া—
জীবন-প্রান্তরে শুধু স্মৃতির কমল—
আহরণ করে যাব, ওগো অনিন্দিতা।
প্রতিশ্রুতি তব আজ। তোমাকে হারায়ে
একে একে বহুদিন হয়ে গেছে গত:
বাস্তবের অভিঘাতে রয়েছি দাঁড়ায়ে—
কোথা গেল সেদিনের স্বপনের ব্রত?
জৈবধর্ম্মে, হে মানবী, তুমি কিগো হবে—
বিস্মৃতি-বিলীন হলে হৃদয়ের স্রোতে?

একখানি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন

অধ্যাপক শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম-এ

বারাণসীতে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার স্যার বিজয়ানন্দ মহোদয় তাঁহার আনন্দবাগস্থ মিউনিসিপ্যালিটির একটি রাস্তাপথ ক্রয় করিয়া তত্র একটি রাজহর্ম্য নির্মাণ করাইয়া দিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে যে বিস্তৃত খনন কার্য্য চলিতেছে তাহারই ফলে একখানি তাম্রশাসন ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া বারাণসীর সুবিখ্যাত জুয়েলার্স খাড়া ব্রাদার্স এণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত তারাদাস খাড়া মহাশয়ের নিকটে আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত তারাদাসবাবুর নিকট হইতে উহা বর্ত্তমান লেখকের হস্তে আসিয়াছে।

তাম্রশাসনটি ৩ খানি তাম্রফলকের সমষ্টি। একটি গোলাকার রিঙ্ এবং কীলক দ্বারা তিনটি ফলক পুঁথির আকারে নিবদ্ধ। ফলক তিনটি ৬″×৩″ আকারের। প্রথম ফলকটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ লিপি আরম্ভ হইয়া দ্বিতীয় ফলকটির উভয় পৃষ্ঠা এবং তৃতীয়টির প্রথম পৃষ্ঠাতে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছয় পংক্তি লিপি আছে। নিম্নে উহার পাঠ প্রদত্ত হইল।

প্রথম ফলক—২য় পৃষ্ঠা

পংক্তি ১। স্বস্তি শাস্তনপুরা-
দনেকসমরশতবিজয়িপুর
" ২। বর ললামভূতক
হীর (কো) র্ত্তি প্রহরাব-
নগু ছিদ্র
" ৩। রাজস্বনোর্থরিতুকা
গুণবিদ্ধ স্বর্ণমেনাযো হরিয়া
" ৪। ক্ষত দুক্লাস্বরক্ষ্যা
প্রধানমহিষী অনঙ্গমহাদে
" ৫। ব্যা হরিয়াজো চ
ক্রি (কৃ ?) তাকাম্বুজো
পগম্বিরেক
" ৬। গোত্র গো বি শ
না রা য় ণ মাতৃবৎসপদ
ধংসবাস

দ্বিতীয় ফলক—১ম পৃষ্ঠা

পংক্তি ১। কুমার বাসুদেবদেব কোক-
টিক নগরাং বিজয়ে
" ২। বরতাকমারবিস্মীহামা-
ত্রগণঃ সর্বান্নাথ ক
" ৩। নগর বাস্তব্যানুদবাসকৃষ্ণ পরিজন পুরন্দরাদ্দন
" ৪। প্রতি(ব্র)তিকাবণিজ্যবণিকগ্রাম নিবাসিনশ্চ সংবু
" ৫। ক্ষ ইমদর্শ বাবেন্দ্রতি বিদি তমস্ত ভবতাং যথাস্মা
" ৬। ভির্মহামাত্রগণেন অনঙ্গমহাদেবী নন্দকীয় এবাস্ক

দ্বিতীয় ফলক—২য় পৃষ্ঠা

পংক্তি ১। নগরে মহামানেন ভূমেপ্তকৃশদেকা
" ২। কৌণ্ডিন্যগোত্রেত্র্যম্বপ্রবরদ্বিজৌপনিষৎ সিদ্ধান্তবিদ্বন্মোমস্য
" ৩। দিবাঃ মহাকার্ত্তিকপৌর্ণমাস্যাং উদকপূর্ব্বং প্রতিপাদিত অতি চ

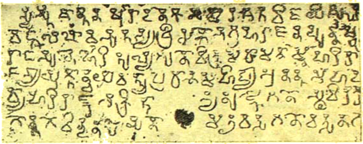
প্রথম ফলক—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

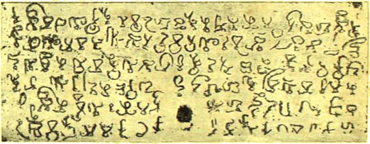
দ্বিতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠা

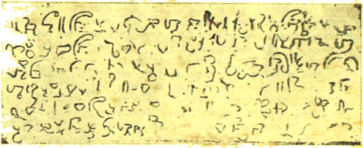
দ্বিতীয় ফলক —দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

৮। তেষামাচন্দ্রার্ক ক্ষিতিসমকালিকেতদ্ভুমুক্তাঃ পুনঃ
৯। সন্দ্রহরেণ বা অঙ্গুল বা বিঘ পতিতা ন কেনাচি
১০। বলামথায় উৎপাদ ইতি। আহেন্দ্র বর্দ্ধ

তৃতীয় ফলক—১ম পৃষ্ঠা

পংক্তি ১। শাস্ত্রকারাঃ নৃভিঃ বসুন্ধরাণি বর্ষ গে মোদতি
২। ভূমিদঃ আচ্ছেত্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ(২)
৩। স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাম্ শ্বাবুপচ্যত সহ
৪। প্রহ হস্তু প্রোতি বিবিধ হিতি কোষঃ পিতৃষঃ তক্ষ
৫। হাস্যমোহবালো গুরুত্বশঃ জবস্তি তত্র এতানি য
৬। এতদ্বুদ্ধিভিরিতি। বর্দ্ধিতস্য মহামাত্রগণস্য দূতঃ।

তাম্র শাসনটি ভূমিদানের একটি দলিল। পূর্ববংশীয় শ্রীমাকোণ্ঠ প্রহরাজের পৌত্র এবং বিটুরাজের পুত্র অনেকসমরশতবিজয়ী এবং পূর্ব বঙ্গের কলঙ্কার ন্যায় হরিকুলাঙ্গপবিক্রমশালী হরিরাজ এবং তাঁহার যোগ্য বংশোৎপন্ন প্রধান বাহিনী অবধ্য মহাদেবীর আদেশে শাক্তপুর হইতে গোবিন্দনারায়ণ, বংশনাথ, শশাঙ্ক, বিষ্ণুদেব প্রভাকর ইত্যাদি নামধেয় মহামাত্রগণ আযুক নগরের নিবাসী সমস্ত বালক বৃদ্ধ পরিজন সহিত প্রকৃতিপুঞ্জ এবং বণিকগণ তথা উক্ত গ্রামনিবাসী সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছেন যে কৌণ্ডিন্য গোত্রজ উপনিষৎ সিদ্ধান্তবিৎ সোমস্বামীকে মহাকার্ত্তিক পূর্ণিমা দিবসে আযুক নগরে কিছু ভূমি দান করা হইল। অতঃপর ভূস্বামীর কেহ বা অন্য কোন বিষয়পতি এই দানের কোনরূপ প্রত্যবায় উৎপাদন করিবেন না। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণও বলিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাম্রশাসনটির ভাষা সংস্কৃত। অক্ষর ব্রাহ্মী। প্রত্যেক অক্ষরের শীর্ষে ত্রিকোণাকৃতি মাত্রা এবং নিম্নে প্যাঁকড়ি (loop) থাকায় গুপ্ত যুগের ব্রাহ্মী লিপির সৌসাদৃশ্য পরিস্ফুট।

লিপিটির মধ্যে সময়জ্ঞাপক সাল তারিখ ইত্যাদি নাই। পূর্ববংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল বা তাঁহাদের রাজ্যের অবস্থানও কিছু জানা যায় নাই। 'অনেক সমরশতবিজয়ী' হরিরাজ কাহাদের সহিত সমরে জয়ী হইয়াছিলেন তাহাও ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয়। মহামাত্র বলিতে কি রাজ্যের officer বুঝাইতেছে তাহাও সঠিক নির্ণয় করা যায় না। অশোকের অনুশাসনে মহামাত্রগণের অন্তঃপ্রকার বাহিরের কথা অবগত হওয়া যায়। আযুক নগর বা শাক্তপুর কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারাণসীতেই বা কেন তাম্রশাসনটি ভূগর্ভে প্রোথিত পাওয়া যাইতেছে ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বিচার্য্য। অক্ষরলিপিতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার

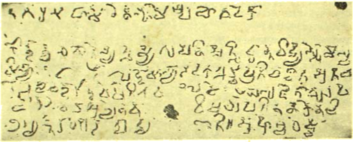

তৃতীয় ফলক—প্রথম পৃষ্ঠা

করিলে লিপিটি গুপ্ত যুগের বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত ভাষা ও বিষয়পতি প্রভৃতির উল্লেখও ইহার সমর্থক প্রমাণ। "মোদতি" "হরেত" ইত্যাদি ব্যাকরণদুষ্ট পদসম্বলিত ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। "ভারতবর্ষের" মারফৎ এই সকল প্রশ্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সমাজে উপস্থিত করিলাম।

কন্যা-কুমারী

শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী

পথ শেষ হয়ে আসছে। আর একটি মাত্র লক্ষ্য আমাদের বাকী আছে। এই আটদিন আটরাত্রি কেটেছে যেন একটা ঘূর্ণীর মধ্যে। সকাল থেকে রাত্রি অবধি কেবল ছুটোছুটি, তাড়াহুড়ো—এই ট্রেন ধরা, এই মাল ওজন করা—রাতে কাটাবার ব্যবস্থা করা, refreshment room-এ অবশিষ্ট কিছু আছে কিনা তার সন্ধান করা, আবার খাবার জল এবং তার মহামূল্যবান বাক্সটা সামলানো, খুকুর দুধ যোগাড় করা—সবকিছুর মধ্যে কোথাও যেন একটুও ফাঁক ছিল না। আবার তারি মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে, দেখে নিতে হয়েছে ভারতবর্ষের দক্ষিণ মুখ। অমন করে কি দেখা যায়। চোখ দুটো যেন ক্যামেরার লেন্স কেবল দেখেই চলেছে, দেখেই চলেছে—কেবলের photographer-এর মত নেই একটুও ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে দেখা—কোন্ ছবিটা নেবার মত, কোন্টা না। কেবল প্লেটের উপর ছাপ পড়েই চলেছে।

এতক্ষণে একটু যেন দম হোল—মনটা যেন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দুধারে ধানের ক্ষেতের সবুজ-সজল বাতাস ঢুকেছে—ঢেউ। মনে পড়ে আমাদের সেই বাংলা দেশ। এতদিন ভুলেই ছিলাম কোথায় কোন্ ১০০০ মাইল দূরে—সেই সব বন্যাবিধ্বস্ত গ্রাম, আসন্নের চিহ্ন মাত্র সেখানে আজ বিলুপ্ত। এতদূরে, দুর্ভিক্ষের ব্যর্থ কান্নার আওয়াজ এসে পৌঁছায় না। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা অত্যন্ত গভীর মিল রয়েছে। এখানে এলেই বাংলা দেশকে মনে পড়ে যায়। তেমনি নীলাকাশ, মাঠভরা ধানের ক্ষেতে গভীর আশার বাণী—শুধু তার

ভারতের শেষপ্রান্ত

পাশেই পথের ধূলার ওপর উপবাসক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ উলঙ্গ ভিখারীর দল। অসীম ঐশ্বর্যের মাঝে অপরিসীম রিক্ততার লাঞ্ছনা। এখানকার মেয়েদের পোশাক অনেকটা আসামীদের মত—লুঙ্গি ও চাদর মাথার ওপর বেড় দিয়ে নেমে আসে—কিন্তু পরবার ধরণটা এমন, যেন দূর থেকে মনে হয় বাঙালীর মেয়ে। তেমনি শ্যামলা রং, মুখের-গড়নটা সুডৌল। চক্রবালে দেখা যায় পূর্বঘাটের পাহাড় চলেছে—পাশে পাশে এঁকে বেঁকে আকাশ ধরণীর মাঝখানে যেন একছড়া মালা। মাঝে মাঝে জলা—দুধারে কখনো গ্রাম কখনো দুএকটা মন্দিরের চূড়ো দেখা যায়। এত চমৎকার, এমন চোখ জুড়ানো রূপ ধরণীর, তার মাঝখান দিয়ে চলেছে রাজপথ—সাদা কংক্রিটের রাস্তা—মসৃণ, কোথাও এতটুকু উঁচু নীচু নেই গাড়ি যেন চলেছে গড়িয়ে। আমার দুবছরের খুকু পাশে বসে কত কি বকছে মনের আনন্দে।

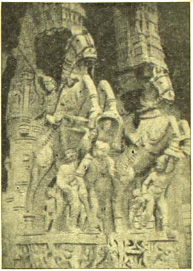

শুচীন্দ্রমের শিল্পকলা

নাগেরকোয়েল-পার হয়ে এসেছি। এখন বাসের বদলে চলেছি ট্যাক্সিতে। ভারতবর্ষের শেষপ্রান্তে এসেও বন্ধু পেয়েছি। এই যানবাহন তাঁরই আতিথেয়তা। এখানে বেড়িয়ে কত লোকের সঙ্গেই দেখা হোল, কত সৌজন্য, কত সহৃদয়তা, কত অকারণ স্নেহ, কত অযাচিত উপকার যে পেয়েছি তার আর ঠিক নেই। আমাদের ডানদিকে শুচিন্দ্রমের মন্দির। তার অপূর্ব কারুকার্য-খচিত চূড়া দেখা যাচ্ছে। আমরা ফেরবার সময় এই মন্দির দেখে এসেছিলাম। ভারতবর্ষে বোধ হয় এই একমাত্র মন্দির, যেখানে ত্রিমূর্তির একসঙ্গে পূজা হয়—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। তাছাড়া এই মন্দিরের আর একটী বৈশিষ্ট্য আছে। একটা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পূজাবেদীর ওপর কোন মূর্তি নেই—রয়েছে একটা দর্পণ। পাণ্ডাদের ভাঙা ভাঙা ইংরেজি থেকে বোঝা গেল—আত্মাতেই ভগবানকে উপলব্ধি করার ব্যঞ্জনা এই দর্পণে। নিরাকার আত্মায় ভগবানের উপাসনাবিধি ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে কিনা জানি না। এই মন্দিরের সঙ্গে কত যে গল্প, কত কল্পনা জড়িয়ে আছে তার ঠিক নেই। মানুষ নিজের ইচ্ছামত এবং সাধ্যমত যতদূর যায় কল্পনার দৌড় ততদূর পর্যন্ত গল্প বানিয়েছে। সে সব একত্র করলে একটা পুরাণ। কুমারিকা অন্তরীপে যে মন্দির আছে কন্যাকুমারীর—তার সঙ্গেও জড়িয়ে আছে এই মন্দিরের গল্প।

অসুর দলনের জন্যে শিব আপন শক্তিকে দুইভাগ করলেন—তার একটা অংশ কালীঘাটের কালী—অন্য অংশ কন্যা কুমারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তে। দেবী আপন কৌমার্যের সাধনায় সমুদ্রকূল ধ্যান করলেন—সেই উপলক্ষে উৎসবের অনুষ্ঠান হোল মন্দির প্রাঙ্গণে। দলে দলে দেবতা এলেন—সেই সঙ্গে এলেন শুচিন্দ্রমের ত্রিমূর্তি। কুমারীর চন্দনানুলেপিত শুভ্র প্রসন্ন মূর্তিখানি দেবমনে ঘটালো বিভ্রম। ত্রিমূর্তি কন্যার পাণি প্রার্থনা করলেন। সব আয়োজন স্থির হল। কত দুষ্প্রাপ্য মাঙ্গলিক সংগ্রহ হল তখন দেবতার দল চঞ্চল হয়ে উঠলেন মনে মনে। দেবী যে চিরকুমারী, বিবাহ হলে তাঁর শুভ পবিত্র ক্ষমতাগুলি যাবে নষ্ট হয়ে—আবার বেড়ে উঠবে অসুর-শক্তি। কি করা যায়? নারদ যোগালেন বুদ্ধি। বিবাহ স্থির—তুরি-ভেরীর ব্যবস্থা হয়েছে—ত্রিমূর্তি চলেছেন গোধূলি-লগ্নে—মধ্য-রাত্রির শুভযোগে লগ্ন। সে লগ্ন না ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন সময় নারদের চক্রান্তে মুরগী ডেকে উঠল প্রভাতের সূচনা করে, পাখীরা গাইল গান। হতবুদ্ধি দেবতা ভাবলেন লগ্ন নষ্ট হল। নিরাশ হৃদয়ে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গেলেন নিজের মন্দিরে। ওদিকে সাগরতীরে, মালা হাতে অপেক্ষা করে আছেন সজ্জিতা কন্যা—কখন আসবে বর। হায়! শুভক্ষণ বৃথা চলে গেল—আকাঙ্ক্ষিতের সহিত মিলন হল না।—যত আয়োজন হয়েছিল ছড়িয়ে পড়ল নুড়ি হয়ে দুই সমুদ্রের উপকূলে। শ্বেত ও রক্ত চন্দনের গুঁড়ায় বালি বিচিত্রিত হল। এখানকার বালির রং কোথাও লাল কোথাও সাদা—কোথাও দুটিতে মিশে হয়ে উঠেছে অপরূপ। কুমারিকার সাগরবেলায় যে সমস্ত ক্ষুদ্র নুড়ি অথবা বালি ছড়িয়ে আছে তা দেখতে ঠিক চালের মত। কিছু আছে মোটা লালচে—কিন্তু বেশীর ভাগই আতপ চালের মতই শুভ্র ও সূক্ষ্ম। তাই লোকে বলে এ সেই দেব-বিবাহের অন্ন বালু হয়ে গেছে।

শুচিন্দ্রমের মন্দিরের গায়ে কত অসংখ্য মূর্তি—কত দেব যক্ষ রক্ষ। ত্রিমূর্তি সমেত প্রত্যেকটী যেন পাথরে পেয়েছে প্রাণ। মূর্তিগুলির পরিপুষ্ট দেহ—সুগোল সুন্দর গড়ন—মেয়েদের মাথায় দক্ষিণী খোঁপা। এক জায়গায় চারিটী পাথরের স্তম্ভ দুই প্রান্তে খচিত। বোঝা যায় একই বৃহৎ শিলাখণ্ড থেকে এ চারটী স্তম্ভ খোদিত করা হয়েছে। এদের গায়ে হাত দিয়ে আঘাত করলে চারটী বিভিন্ন সুর বেজে ওঠে—পিয়ানোর চেয়ে তা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। কি অদ্ভুত এমন কখনো দেখিনি আমি। স্বামী এই আশ্চর্য জিনিষটি দেখতে পেলেন না। পরনে ছিল কোট প্যান্ট। বিদেশী পোষাকে মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করার নিয়ম নেই এখানে। খালি গায়ে কেবল একটী মাত্র কটিবাস পরে, বিনা উত্তরীয়তে দেবদর্শন করতে হয়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সর্বত্র এই নিয়ম। [illegible] শুধু এখানে নয়, দক্ষিণের সমস্ত মন্দিরগুলিতেই [illegible]

মাদুরার শিল্পকলা

[illegible] মুক্ত [illegible]। মন্দিরের দ্বার সকল জাতির হিন্দুর কাছে উন্মুক্ত, কেবলমাত্র বিধর্মীর প্রবেশ নিষেধ। অস্পৃশ্যতার কালিমা মুছে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি যে নূতন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে সে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশের ফল। ১৯৪০ সালে এ বিধিটির প্রবর্তন হয়।

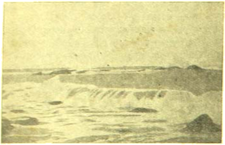

কন্যাকুমারিকা

বলে যাই ইতিমধ্যে—সাতটা প্রকাণ্ড দরজা পার হয়ে সাতটা বিশাল প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করার কথা; সে প্রাঙ্গণের দেওয়াল—পাহাড়ের মত দৃঢ়; দুর্ভেদ্য দুর্গের চেয়েও সুরক্ষিত অঙ্গন। সেই সপ্তদ্বারের অন্তরালে, সূর্যালোকও যেখানে প্রবেশ করতে সঙ্কুচিত হয়, যেখানে শিল্পীর তুলি এসে অকস্মাৎ থেমে গেছে, অন্ধকার, যেখানে পিতলের প্রদীপাধারে সহস্র দীপ জ্বলছে দিন রাত্রি, চন্দন-ধূপ ও চন্দন তেলের গন্ধে বাতাস উঠেছে ভারী হয়ে, সেইখানে, মন্দিরের গহন অন্তরে বিগ্রহ শ্রীরঙ্গনাথের অনন্ত শয়ান মূর্তি। অনন্তশয়ান নারায়ণ তাঁর অমায়িকতার মত প্রসন্ন বক্ষের উপর ধারণ করে আছেন সোনার লক্ষ্মী—বোধহয় সে তাঁর গলার সরু হারের সঙ্গে গাঁথা। আমরা বেরিয়েছি ভোর বেলায়—শুধু এক কাপ চা খেয়ে, পথে একছড়া কলা কিনেছিলাম—তাও সময় হয় নি খাবার। তখন বেলা দুপুর। অন্তরে এসে দাঁড়ালাম দুজনে। ওরা কোন প্রশ্ন না করে আমাদের নামে শুরু করল পূজা। খুব তাড়াতাড়ি সে সব পূজা শেষ হয়—মন্ত্রে সঙ্গে সঙ্গে বাজে ঘণ্টা আর সুর করে গান হয়। ওরা কর্পূরের দীপ জ্বেলে দেখাল, নারায়ণের মুখ, তাঁর যুগল চরণ, আর দেখাল তাঁর বুকের উপরে স্বর্ণলক্ষ্মী। তার পরে আমাদের মাথায় প্রকাণ্ড সোনার মুকুট পরিয়ে করল আশীর্বাদ। নারায়ণের মাথায় ছিল অসংখ্য ফুলের মালা—তা থেকে একটী ফুল এনে দিল আমার হাতে, আর দিল চন্দন ও হলুদের গুঁড়ো—ওরা কপালে দিল তিলক কেটে। মন যেন কেমন করে ওঠে—মনে হয়, যেন কোন অতীত যুগে ফিরে গেছি—ভুলে গেছি আজকের দিনের কর্মমুখর পৃথিবী। কোথায় চলেছে স্বার্থে স্বার্থে প্রচণ্ড সংঘাত—কোথায় উঠেছে ব্যর্থ কান্নার রোল—সে কথা এখানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠের কোন পাহারে, প্রাচীরের কোন স্তরে—অজস্র দেবদেবীর মূর্তিগুলির রেখায় রেখায়, হাজার থামওয়ালা সভাগৃহের কোনায় কোনায় কোথাও লেখা নেই। এখানে কেবল জ্বলছে ঘীয়ের বাতি। সংস্কৃত মন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনি উঠছে বাতাসে বাতাসে—বাজছে শঙ্খ, বাজছে ঘণ্টা—আর সানাই বাজছে করুণ সুরে। অভিষেকের জল যাচ্ছে গড়িয়ে—ভেসে আসছে অপরূপ এক গন্ধ চন্দন-ধূপের।

বেরিয়ে আসছি আস্তে আস্তে—এক থামের দেখি, পাথর ওপর দুটী ছোট সুন্দর পায়ের ছাপ। এইখানে কমলার মন্দির আছে আলাদা। সে যেন রাজার অন্তঃপুর, দেবী বাইরে বেরুতে পান না। তাঁর উৎসব রথযাত্রা সব হয় ঐখানেই। তবু তিনি কোন ফাঁকে চুপিচুপি এসে উঁকি মেরে দেখে যান নিজের স্বামীকে। তাঁর স্বচ্ছ নির্মল হৃদয়ে কোন বাসনার ছাপ পড়ে না, তিনি শুধু এসে দেখে চলে যান। এ পায়ের ছাপ তাঁরই।

এই সব গল্প শুনতে এত আশ্চর্য লাগে। মানুষের মনের সুন্দর ভাবগুলিকে কি আমরা পূজা করি দেবতা রূপে। এই যে চুপি চুপি দেখতে আসা, এই যে বুকের ওপর প্রিয়ার আসন—এ সমস্ত কেন? অথচ শুধু মানবের সুন্দরতম বৃত্তিগুলিকেই যে দেবতার মধ্যে দেখেছে তাও নয়। ভারতবর্ষের দেবতা মানুষের মতই ভাল মন্দ নানাগুণের অধিকারী। মানুষের মতই তাকেও সাধনা করতে হয়, তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করতে হয়, সেও দুর্বলচিত্তে পাপ করে, আবার পাপকে পরাভূত করে মেলে দেয় আপন চিত্তের সৌন্দর্য। শুধু ভালটুকুই নয়, দোষেগুণে জড়িয়ে এবং সমস্ত দোষগুণকে অতিক্রম করে যে দেবতা মানুষের অন্তর্লোকে প্রতিষ্ঠিত এ কি তাঁরই পূজা? এই সব গল্প কি তারই সাধনা। কিন্তু মন খারাপ হয় একথা ভাবতে—যে, যারা এতদিন চিত্তের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিগুলিকে উপনিষদের মধ্যে দিয়েছিলেন ভাষা, তাঁদেরই দেশের লোকের কল্পনা এত ছোট হয়ে গেল কি করে যে দেবতাকে তারা শুধু মানুষরূপেও না, অতি সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারলে না।

ভাল লাগছে—মনোরম পথ আমাদের সব ক্লান্তি দূর করেছে—ভারতের দীর্ঘতম ফেরো কংক্রিটের রাস্তা—দুধারে প্রকৃতির অজস্র আনন্দ-মেলা। সুন্দরী ধরণীর আয়োজনে কোথাও কৃপণতার লেশমাত্র নেই। পাশেই প্রকাণ্ড পাহাড়ের একটী খাঁজে ছোট সাদা মন্দির। ঐ পাহাড়ে, যত রকম ওষুধের গাছ-গাছড়া, শিকড়, ফল ইত্যাদি পাওয়া যায় শোনা গেল। ওটা নাকি গন্ধমাদন পর্বত। লক্ষ্মণের জন্যে বিশল্যকরণী বেছে নেবার পর হনুমান লঙ্কা থেকে এই পাহাড়টিকে নাকি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আর সাগর লঙ্ঘন করে সে পাহাড় এসে পড়ে ঠিক এইখানে।

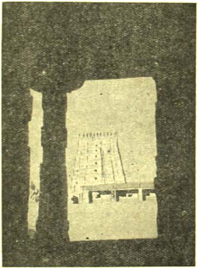

রামেশ্বরের স্বর্ণচূড়া

অবশেষে যাত্রা শেষ হল। ঐ শোনা যায় মন্দিরের মহাসাগরের

কোলাহল। হাওয়ায় হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠছে কেশ-বেশ। মনটা ভরে আনন্দে কানায় কানায়। মনেই হচ্ছে না যেন দুটো বেলা কেটে গেছে। অতিথিশালার দ্বারে এসে পৌঁছুলাম। চাকো মহাশয়ের কৃপায় এসেছি রাজার অতিথি হয়ে। কি আরামের ব্যবস্থা। প্রকাণ্ড ঘর, তার তিনটী জানালা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে আরব-সাগরের নীলাম্বে। ঠাণ্ডা বাতাস বেয়ে শীতল হয়ে এসেছে। স্নান শেষ করে খাবার জন্যে কোন রকম ছুটোছুটি করার বালাই নাই। প্রথম সূপে আরম্ভ করে, আর মধুর অন্তে আহারটী সমাধা হল পরিপাটীরূপে। খুকুও আমাদের পাশে বসে খাওয়া শেষ করলে চীৎকার লাফালাফির মধ্যে। সমুদ্রের বাতাস ওকে এক মুহূর্ত্তে যেন নূতন করে দিল, খুশীতে ও পাগল হয়ে উঠেছে। ছুটে বেড়াচ্ছে দুরন্ত হাওয়ার মত।

বেরিয়ে পড়েছি—কালকের দিনটীমাত্র হাতে আছে। পরশু সকালে ছেড়ে যেতে হবে এই অপরূপ স্থান। আবার সুরু হবে প্রবাসের ক্লান্ত একটানা ছন্দ।

কন্যা-কুমারীর মন্দিরটী ছোট—তার উচ্চচূড়া উদ্ধত গর্ব্বিতের মত দেবতার আকাশকে স্পর্শ করেনি। কুমারীর মতই বিনম্র নত। চন্দন মাখা শুভ্র মুখখানি পবিত্র সুকুমার। কপালের ওপর জ্বলছে হীরার টীকা।

দেখেছি রামেশ্বরের বিশাল মন্দির, মাইলখানেক জোড়া। সে একেবারে অন্ধকার। কত তার প্রকোষ্ঠ, কত তার প্রাঙ্গন, কত তার সভাগৃহ। বোধহয়, সেতুপতি রাজাদের সেই ছিল দুর্গ। হয়ত তখনকার অভিজাত মণ্ডলীর প্রায় সমস্ত—সেই সপ্তকুণ্ড বেষ্টন করা বিরাট মহলে।

দেখেছি মাদুরায় মীনাক্ষী দেবীর মন্দির। কি বিচিত্র তার কারুকার্য্য। প্রত্যেক মূর্ত্তির মধ্যে যেন চঞ্চল জীবন স্রোত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। নটরাজের কি অপূর্ব্ব আত্মভোলা রূপ। কত বিভিন্ন নৃত্য ছন্দের পরিকল্পনা। উদ্দাম নৃত্যের দুরন্ত গতিবেগ কি করে ফুটে উঠেছে পাথরের গায়ে। মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের সোনার চূড়াটী ছোট। কিন্তু তার গোপুরম? photograph এ তার রূপ ধরা অসম্ভব। ছবি এঁকে বোঝানো যায় না। প্রত্যেকটী অংশ বহুক্ষণ ধরে দেখলে তবে যদি তার একটু আভাস মেলে। আমাদের সেই সময় ছিল কোথায়? সে যেন অসংখ্য শক্তির সূক্ষ্ম বন্দী হয়ে আছে পাথরের বন্ধনে। আমাদের সঙ্গে যদি কোন সোস্যালিষ্ট বন্ধু থাকতেন তাহলে বলতেন—কত দরিদ্রের রক্ত নিষ্কাশিত অজস্র অর্থ, কত শিল্পীর প্রাণান্ত পরিশ্রম, কত মানুষের আত্মবলিদানে এর সৃষ্টি—সে কথা মনে কর কি? কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনো সোস্যালিষ্ট বন্ধু ছিলেন না—তাই নির্ভয়ে বললাম—হে পিতামহগণ, তোমাদের আয়ু ত শেষ হোতই, কিন্তু সেই আয়ু দিয়ে যা রেখে গেছ আমাদের জন্য তার অমরতা অতুলনীয়।

"তারা চলে গেছে তাহাদের গান,
দু'হাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান,
দেশে দেশে তার নাহি-পরিমাণ,
ভেসে ভেসে যায় কত।"

ত্রিচিনোপল্লীতে গিয়ে হঠাৎ দেখা হোল শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের সঙ্গে—এত দূর দেশে এসে বাঙালীর মুখ দেখা—চোখ বিশ্বাস করতে চায় না। তাঁরা ৩ জন বাঙালী officer ছিলেন Railwayতে। কি হৈ হৈ করে আনন্দে কেটেছে সেই রাত তা আর বলার নয়। তাঁরা মাদুরায় তাঁদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার কাছে দিয়ে দিলেন আমাদের ভার। পরদিন মাদুরা থেকে রামেশ্বর যাব। একদিনের এ্যাড্ভেঞ্চার। দুর্গম পথ। ট্রেণ একটা যায় বটে, সে যাত্রীতে ঠাসা। কত দেশের কত শ্রেণীর যাত্রী। ক্ষুধা নিবারণের কোন উপায় নেই, দু পয়সার ডাবের জল ছাড়া। ষ্টেশন থেকে যেতে হবে গোযানে কিম্বা পায়ে হেঁটে। সারাদিন কোথায় কাটবে জানি না। বড়ুয়া-দম্পতী কোন আপত্তি শুনলেন না, সাগ্রহে খুকুকে নিয়ে গেলেন নিজেদের কাছে। তার সমস্ত আবদার সামলে তাকে রাখলেন; আমরা নিশ্চিন্তে ঘুরে এলাম। সাধারণ ম্যাপে রামেশ্বর ভাল বোঝা যায় না। সেই যে একটুখানি বেরিয়ে গেছে সমুদ্রের মধ্যে, সেখানে দুধারে সমুদ্র ক্রমশ: বিস্তৃত হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেছে সীমার চিহ্ন। অকূল সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলেছে আমাদের লৌহযান। রামচন্দ্র যে সেতু বেঁধেছিলেন লঙ্কা পর্য্যন্ত সে নিশ্চয় এমন ছিল না। তার খণ্ড খণ্ড পাথরের টুকরো এখনো দেখা যায় এখানে ওখানে জলের ওপর মাথা জাগিয়ে রয়েছে স্থির হয়ে, দূরে দেখা যায় সাদা বালির চড়া। তারও ওপারে

— "তমাল তালী বনরাজী নীলা"।

একটা পাণ্ডা জুটলো ট্রেণে। টাঙ্গায় করে তার বাড়ি নিয়ে গেল। ঘণ্টা দেড়েক সমুদ্রস্নানের পর রামেশ্বরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাওয়ার পিঁড়ি পেতে কলাপাতায় দিল মোটা চালের ভাত, কিছু সবজি আর চাটনী। আহা সে ত অন্ন নয়, যেন অমৃত। অপরাহ্ণ কাটল মন্দিরে। এখানে মন্দিরে এলেই চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে না। রামেশ্বরেই একমাত্র পাণ্ডার দর্শন পেলাম তাও নাছোড়বান্দা নয়। সে যা দেবে তাতেই খুশী। এদেশের লোকেরা খুব ভদ্র অথচ আত্মনির্ভর। গায়ে পড়া, গলে পড়া ভাবও নেই, আবার দাম্ভিকতাও নেই। কুলি থেকে রিক্সাওয়ালা সবাই ইংরেজি বলে, কিন্তু সাহেবের পায়ে পায়ে ঘুরতেও দেখি নি। সবার সঙ্গেই সমান ওজনে কথা কয়। সহরের রাস্তায় রাস্তায়, দোকানে বাজারে, রঙীন সিল্কের শাড়ি পরে, নারকেল তেল মাখা ঘন কালো চুলে ফুলের মালা পরে, কানে হীরার দুল পরে মেয়েরা ঘুরে বেড়ায় দলে দলে। কেউ তা দেখে সশঙ্ক হয়ে ওঠে না। ছেলেদের সঙ্গে এদের ব্যবহারে কোথাও জড়তা নেই। অত্যন্ত সহজ সাবলীল, অথচ ইউরোপীয় ন্যাকামীতে ভরা নয়। কথা কইছে, জিনিষ কিনছে, বেচছে, দরে বনছে না অথচ মুখে বলছে 'মাডাক্কী অথবা আম্মা'। কখনো হাঁ করে তাকিয়ে দেখে না। কখনো কোন জিনিষ হাতে হাতে দেয় না। সামনে এসে মাটিতে নামিয়ে রেখে দাঁড়াবে চুপ করে।

এ আমার খুব ভাল লেগেছিল।

কন্যা-কুমারীর মন্দিরটী যেন ছোট সহজ অনাড়ম্বর সরলতার প্রতিচ্ছবি। রামেশ্বর প্রকৃতির সঙ্গে এর এত তফাৎ যে এলেই সে কথা মনে পড়ে।

ভোর বেলা। উঠেছি সূর্য্যোদয়ের আগে। পূর্ব্বদিকে অল্প অল্প সোনা উঠছে ফুটে। ভারত মহাসাগরের জলে পড়েছে ছায়া। এই ত ভারতের শেষ প্রান্ত। তারপরে আর কিছু নেই। তিন দিকে বিশাল বারিধির অনন্ত কল্লোল। এইখানে স্নানতীর্থ। অল্প একটু ঘাটের মত করা আছে—শুধু ডুব দেবার পুণ্যার্থীদের জন্য। জলের তলায় প্রচ্ছন্ন আছে বড় বড় পাথর—কত গোপন স্রোত—কত হাঙরের দল করছে আনাগোনা। এ সমুদ্র স্নানের জন্য নয়। শুধু চেয়ে থাক—সেই ভালো। কিন্তু এখনও একটু রক্ত গরম আছে। চারিদিকে অসীমের দুর্বার আহ্বান। সাবধানীর উপদেশ বৃথা গেল। উনি নিলেন দুই কাঁধে দুই ক্যামেরা, আমি গলায় ঝুলিয়ে নিলাম হাত ব্যাগ—ওতে আছে যথাসর্ব্বস্ব। একজন লোক অযাচিত এগিয়ে চল পথ দেখাতে। আমরা ঠিক "মহাজন যেন গতঃ স পন্থা" এই নীতি অনুসারে তাকে অনুসরণ করলাম। একটু এপাশ ওপাশে গেলেই ঢেউএর আছাড় খেয়ে কঠিন পাথরের ওপর নিশ্চিত মৃত্যু। উপলসঙ্কুল বন্ধুর পথ। পায়ের নীচে সরে সরে যাচ্ছে বালি ও ছিলে পাথরের টুকরো। আমার বুক অবধি জল ভরে উঠেছে। শক্ত করে ধরে আছি পরস্পরের হাত। পাথরটা কি প্রকাণ্ড। এই পাথরটায় ওঠবার জন্যেই ত এত কষ্ট

পাথার। এটা নাকি আগে জোড়া ছিল। অনবরত ঢেউএর আঘাত খেয়ে খেয়ে সরে এসেছে এতদূর। কিন্তু কি করে উঠব। কি ভীষণ পিছল—ওরা জলের নীচে থেকে চালের মত বালি তুলে ছড়িয়ে দিল। তবুও আছাড় খাওয়ার আশঙ্কা গেল না। উত্তেজনায় বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল। মনে পড়ল—

"কভু বন্ধুর, ঘন পিচ্ছিল।
কভু সঙ্কট ছায়া শঙ্কিল।
বঙ্কিম দুর্গম।
খর কণ্টকে ছিন্ন চরণ
ধূলায় রৌদ্রে মলিন বরণ
আশে পাশে হতে তাকায় মরণ—
সহসা লাগায় ভ্রম।"

অনেক কষ্টে, ওরে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে অবশেষে উঠে এলাম পাথরের ওপর। সবচেয়ে উঁচু যায়গায় এসে দাঁড়ালাম উত্তরদিকে মুখ করে। এখানটা প্রায় শুকনো, ঢেউএর উচ্ছ্বাস এত উঁচুতে এসে পৌঁছায় না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভারতবর্ষের ম্যাপ। বাঁ দিকটা ও প্রায় সোজাই উঠে গেছে। ডানদিকটা একটুখানি চওড়া হয়ে একটা বালিয়াড়ির পাশ দিয়ে বেঁকে উঠে গেছে। অর্থাৎ মুখটা একেবারে pointed নয়—কারণ, মুখই চওড়া। সেই ছেলেবেলায়, যখন ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে জিওগ্রাফীর পড়া করতে হোত তখন কি মনেও করতে পেরেছি যে ঝলকে এমন আশ্চর্য্যভাবে দেখা যায় ভারতবর্ষের রূপ। সমস্ত দিন কাটল নানা ভাবে। সমুদ্রের ভেতরে প্রায় আধ মাইল দূরে একটা প্রকাণ্ড পাথর আছে। তার নাম "বিবেকানন্দ পাহাড়"। বিবেকানন্দ নাকি প্রত্যহ সমুদ্র সাঁতরে ওখানে গিয়ে বসে থাকতেন ধ্যানমগ্ন হয়ে।

সূর্য্য অস্ত গেল। দুটী একটী করে তারা উঠতে সুরু। মহাসিন্ধুর বসে ওপার রাত্রির স্নিগ্ধ পবিত্রতার অনুভব করছি। এখানে জলের ঝাঁটি এসে লাগে না—শুধু বোঝা যায় তার বিরাট সত্তা। চাঁদ নেই পূর্ব্বগগনে—তবু কেমন একটা স্তিমিত আলোর রেশ যেন লেগে আছে অন্ধকারের গায়ে। মহামৌনের অন্তর থেকে উৎসারিত হচ্ছে অবিশ্রান্ত সঙ্গীত। কালো আকাশের গায়ে জ্বলছে অসংখ্য তারা। অপার্থিব পরিপূর্ণ শান্তি। এ যে বেদনার, এর তুলনা নেই।—"হে সাগর, হে সঙ্গীত, তোমার অনন্ত কলকোলাহল মধ্যে যদি টেনে নিয়ে যাও আমাকে এই মুহূর্ত্তে, যাব তাই সব ফেলে। চোখ জলে ভরে আসছে, হঠাৎ বেদনার মত অব্যক্ত আনন্দ। তোমার বালিতে মাথা রাখি, হে অনন্ত, এই লও আমার প্রণাম। এই ত সত্য-মন্দির। এতদিন যা দেখে এলাম সে ত তোমার আমার মতই মিথ্যার মেলা। সেখানে এতটুকু ভক্তির সাথে জড়িয়ে, মানুষের কত ঈর্ষা, কত লোভ, কত লালসা, কত প্রতিযোগিতা ঠেলাঠেলি করে আকাশে ঠেকেছে। যদি পার কেউ, ফেলে দিয়ে এস যত জঞ্জাল—এখানে এসে একেবারে পায়ের কাছে বসতে পারে। কোন আচারের কোন ধর্ম্মের কোন নিয়মের কোন অহঙ্কারের বাধা নেই। এই ত ওঁর আসন। এই ত সকল তীর্থের তীর্থ।—কি গম্ভীর, কি উদার, কি মধুর, কি বিশাল, কি অগাধ, কি স্থির, কি চঞ্চল, কি উদাম, কি অনির্ব্বচনীয়—

"হে মহাপথিক
অবারিত তব দশদিক
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম।
নাইকো চরম পরিণাম।
তীর্থ তব পদে পদে
চলিয়া তোমার সাথে
মুক্তি পাই চলার সম্পদে।"

মহাকবি কালিদাসের শ্লোকচতুষ্টয়

কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী কাব্যব্যাকরণতীর্থ

মহাকবির নানা প্রতিভাপূর্ণ কবিকিংবদন্তীর মধ্যে একটি প্রধান হইতেছে "কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান শকুন্তলম্" অর্থাৎ কালিদাসের সর্ব্বকাব্যের মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদিও মহাকবির টীকাকার মল্লিনাথসূরি বলিয়াছেন "মাঘে মেঘে গতং বয়ঃ" অর্থাৎ মহাকবির মেঘদূত কাব্য ও মাঘকবির শিশুপাল বধ কাব্যের টীকা করিতেই তাঁহার জীবন সায়াহ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। সাধারণ সুধী-সমাজে মহাকবির খণ্ডকাব্য মেঘদূত ও অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্যকেও বাদ দিয়া চলা অসম্ভব। তবুও মহাকবির সম্বন্ধে এই কিংবদন্তী বিশেষরূপে প্রচলিত আছে যে, কালিদাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা অভিজ্ঞান শকুন্তল। মহাকবির মানসকন্যা শকুন্তলা নাটকের সর্ব্বতোমুখী রসধারার আলোচনার মধ্যে আরও একটি কিংবদন্তী আছে যে,—"তত্রাপি শ্লোকচতুষ্টয়ম্" কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক ত' শ্রেষ্ঠই—তাহার মধ্যে আবার চারিটি শ্লোক শ্রেষ্ঠ। তখনই আমাদের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগিল। মহাকবির সকল কাব্যই ত' স্বর্গীয় অমৃতধারা। যাহার এক এক বিন্দু পান করিলে কোন যুগে কোন কবিপ্রাণে মৃত্যু আসিবে না, সে কবি হইবে কাব্যজীবনে অমর। সেই অমৃতধারার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধারা হইল সর্ব্বরসভাববতী শকুন্তলা। মহাকবির এই মানস-কন্যার যে নানাভাবময় রূপরসের সন্ধান বিন্দুমাত্র পাইয়াছে তাহারই কবিজীবন রূপালোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। এই আলোকছটার মধ্যে আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চারিটি জ্যোতি দেদীপ্যমান্। কোথায় সেই জ্যোতির সন্ধান—তখনই কবি মন বলিয়া উঠিল—"যত্র যাতি শকুন্তলা" অর্থাৎ যেখানে শকুন্তলা তাঁহার পতিকুলে যাইতেছেন, সেই স্থলেই কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসকলাযুক্ত চারিটি কবিতা। কবির অপরূপ কাব্য কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌরভে কবিমনকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। কে সেই প্রথম ভাবময়ী কবিতা সুন্দরী? তখনই মনে পড়িল—মহর্ষি কণ্বের উক্তি—

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া,
কণ্ঠঃ স্তম্ভিত বাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ,
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং ন তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ।

এই স্থলে কাব্যরসের সেই মধুকরস্বরূপ মহাকবির কাব্য কোকনদের মধ্যে এই যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ—ইহার মধ্যে কোথায় যে মধুলিপ্ত আছে তাহারই অনুসন্ধানে তৎপর হইয়া উঠিলাম। তখনই প্রথমে মনে পড়ে "উপমা কালিদাসস্য" মহাকবির উপমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসসম্পদ। তাহা হইলে কি এই শ্লোকে মহাকবির উপমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে? কিন্তু

না—উপমা সৌরভে গাবিনী ত' এই সুন্দরী নয়। তবে কিসে শ্রেষ্ঠা এই কবিতা সুন্দরী? তখনই কবি-মন সেই রস সন্ধান করিতে থাকে। তখন মিলে সেই সন্ধানে কিছু মধু। মহাকবির মত করিয়া বোধ হয় এমন মধুর বাৎসল্য রসের পরিবেশন আর কেহ করেন নাই। মহাকবি আদিরসের কবি। কিন্তু আদিরসের কবি কালিদাস শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার অবতারণা করিয়া যে মধুর বাৎসল্য রস-সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এই শ্লোকটি অনুধাবন করিলেই বেশ বোঝা যায়। মহাকবি বাৎসল্যরসকে যে ভাবে ফুটাইয়াছেন মহাকবির পূর্ব্বে কোন কবিই এরূপ সুন্দর করিয়া কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময় মনের অবস্থার কথা বর্ণনা করেন নাই। বিশেষ করিয়া এ চিত্র যেন বাঙ্গালীর পরিবারের নিজস্ব চিত্র। তাই বাঙ্গলা চিরকাল মনে করে যে কবি কালিদাস বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর। পিতামাতার মনে যে আনন্দ-সলিল উথলিয়া উঠে তাহাই এক চোখে ঝরে আনন্দাশ্রু রূপে, অন্য চোখে জাগিয়া উঠে সেই কন্যার বিরহ দুঃখ। তাহার চতুর্দ্দিকের বহুমুখী স্মৃতি তখনই দুঃখের অশ্রু-সাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া ঝরিয়া পড়ে দুঃখাশ্রু-রূপে। এই যে অপরূপ হাসি কান্না ইহাই ধরা পড়িল কবির লেখনীতে। মহাকবির মানসকন্যা শকুন্তলা ঠিক যেন ঘরের বধূ, বাঙ্গালীর কন্যা।

ইহার পরই মহাকবির সেই অমৃতনিষ্যন্দী দ্বিতীয় শ্লোক—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা,
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রবৃত্তি সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্।

"……শুন তপোবন তরু,
তোমাদের বারিদান না করিয়া যেই
বিন্দু বারি না করিত পান; পত্রপুষ্প
অলঙ্কারে অঙ্গপ্রসাধনে যত প্রীতি
আছিল যাহার, তবু স্নেহবশে যেই
একটি পল্লবচ্ছেদ করে নাই কভু;
প্রথমে ফুটিলে ফুল, আনন্দে অধীরা
উৎসবে মাতিত যেই সরলা বালিকা;—
কর আশীর্ব্বাদ, দেহ অনুমতি সবে,—
আজ তোমাদের সব আদরের সেই
শকুন্তলা যায় চলি স্বামীগৃহে তার।"

মহাকবির এই কবিতাটির মধ্যে কোনরূপ অলঙ্কার বৈচিত্র্য বা ধ্বনি বৈচিত্র্য কিংবা অর্থের বাহুল্য নাই। এই কবিতাটির মধ্যে আছে মানব-জীবনের একটি স্বাভাবিক সুন্দর অপরিহার্য্য ঘটনার অপরূপ বর্ণনা। এই বর্ণনা-বৈচিত্র্যের মধ্যেই মহাকবি কালিদাসের বৈশিষ্ট্য; সেই বৈশিষ্ট্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে এই শ্লোকটি। মহাকবি যেমন তাঁহার কাব্যে নায়িকার বর্ণনা একটিমাত্র শ্লোকে সুন্দরভাবে করিয়াছেন, যে বর্ণনা-ভঙ্গী আজিও বিশ্বের কবিমনকে মুগ্ধ করে—সেইরূপ এই কবিতাটিতেও কন্যার পিতৃ-গৃহ হইতে প্রথম স্বামীগৃহে যাত্রার সময় মনের এবং মনের বাহিরের অবস্থার কথা অতি করুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনার রূপ যুগে যুগে ঠিক একই আছে ও থাকিবে। সেই জন্য এই শ্লোকটি পড়িলেই মনে হয় আমার জীবনের এইমাত্র প্রত্যক্ষীকৃত একখানি ছবি দেখিতেছি। সেই কারণে কবির এই শ্লোকটি উপমা বহুল না হইলেও মহাকবির রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্লোকের পর্য্যায়ে পড়িয়াছে।

ইহার পর মহাকবির রচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তৃতীয় শ্লোকটির সহিত শকুন্তলার জীবনের সমস্ত ঘটনা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইলেও তাহার মধ্যে আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে।—

অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ কুলঞ্চাত্মনঃ,
ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিঞ্চ তাম্।
সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্ব্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃ পরং ন খলু তদ্বধূবন্ধুভির্যাচ্যতে।

এই যে পরস্পরের মধ্যে অনুরাগের ফলে বিবাহ, ইহার দায়িত্ব সর্ব্বকালেই নরনারীর নিজস্ব দায়িত্ব। এই দুই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সাংসারিক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ মহাকবি তাঁহার কাব্যে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব সুন্দর। মহাকবির এই শ্লোক রসমাধুর্য্য ও বর্ণনাবৈচিত্র্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

মহাকবির চতুর্থ শ্লোকটিই সর্ব্বজনপরিচিত। এই শ্লোকটি বিবাহের আশীর্ব্বাদে প্রতিমন্ত্রের মতই অনেকে মনে করেন। এইজন্য জন-সমাজে অনেকে এইটি শকুন্তলার শ্লোক বলিয়া না জানিলেও কবিতাটির সরলতার সকলেই প্রীতিলাভ করেন। এই কারণে বিবাহের মধুর মাঙ্গলিকে ইহাকে সাদরে বরণ করিয়া থাকে। এইখানে শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হইতেছে—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্, কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।

আধুনিক ব্যবহারে সপত্নীজনের স্থলে ননান্দৃজনে এই পাঠ ব্যবহৃত হয়। নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ বধূজীবন; তাহার অনাড়ম্বর বর্ণনার যে চরম উপদেশ এই শ্লোকের মধ্যে উপদিষ্ট হইয়া আমাদের মনে যে অশ্রুজলের সঞ্চার করে তাহা সুদীর্ঘ সংবেগ: এই শ্লোক চারিটি যে কালিদাসের অপূর্ব্ব কাব্য রচনার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন তাহা পড়িলেই অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায় এবং সেই অতীত যুগের মহাকবির উদ্দেশে শ্রদ্ধায় মস্তক আপনিই নত হইয়া পড়ে।

রায়-বাঘিনী

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী বি-এল

শাহান্‌শা দিল্লীর সম্রাট আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ভারতে বিশেষতঃ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে পাঠানদের প্রভাব খর্ব্ব হয়নি—তাঁর পিতা সম্রাট হুমায়ুন পাঠান বীর শের-শাহের আক্রমণে শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেন নি। আকবর হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার ক'রে তার ভিত্তি সুদৃঢ় ও রাজ্য আরো প্রসারিত করেন। তিনি ভারতবর্ষকে নিজ বাসভূমি বা জন্মভূমি মনে ক'রে হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে প্রীতি ঐক্য বন্ধন যাহাতে সুদৃঢ় হয় তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। পরবর্ত্তীকালে সম্রাট আকবর ভারতে এক মহাজাতি গঠনের যে ব্রত গ্রহণ করেন তার মধ্যে বাংলার স্থান ছিল। তখনও বাংলা ও উড়িষ্যার স্থানে স্থানে মোগল বিদ্বেষ পাঠান-শক্তি প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে মোগল সম্রাটের কার্য্যে বাধাদানে বদ্ধপরিকর হ'য়েছিল।—পাঠান শক্তি বিক্ষিপ্ত—আর মোগল সম্রাটের পতাকাতলে সুনিয়ন্ত্রিত জাতির সমাবেশ। এই সময়ে বর্ত্তমান হুগলী জেলার খানাকুলের পার্শ্বস্থিত ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভূরশুট রাজ্য শাসন করতেন ব্রাহ্মণ রাজা রুদ্রনারায়ণ। তিনি অতীব বিক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। দায়ুদ খাঁ সম্রাট আকবরের অধীনতা ত্যাগ ক'রে স্বাধীন বঙ্গাধীপ হ'তে চাইলে—আকবর, সেনাপতি মুনায়েম খাঁকে গৌড় বিদ্রোহীর দণ্ড বিধানে পাঠান। তখন দায়ুদ খাঁ রাজা রুদ্রনারায়ণের সাহায্য ভিক্ষা করেন, কিন্তু রাজা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

করেন ও তিনি পাঠান দমনে আকবরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। দায়ুদ খাঁ পরাজিত হ'য়ে উড়িষ্যায় পলায়ন করেন—সেই সময় হ'তেই রুদ্রনারায়ণের উপর পাঠানদের আক্রোশ ছিল। তারা সুযোগ পেলেই বাংলাদেশে লুণ্ঠন ও অত্যাচারের চেষ্টা করতো। রাজা রুদ্রনারায়ণ তার গুরু হরিদেব ভট্টাচার্য্যের নিকট দীক্ষা নিয়ে আমতার নিকট কাট্‌শাঁকড়া গ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও আরো অনেক মন্দির নির্মাণ এবং সরোবর ইত্যাদি খনন করেন। রাজা রুদ্রনারায়ণের পত্নী ভবশঙ্করী সর্দার দীননাথ চৌধুরীর কন্যা। দীননাথ নিজে একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যা ভবশঙ্করীকে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী করেছিলেন। বিবাহের পর রাণী সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে রাজাকে সাহায্য করতেন। রাণী ভবশঙ্করী রাজ্যের সর্ব্বজাতির যুবক যুবতী সকলকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষালাভে বাধ্য করেন এবং দেশের স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। প্রজাগণ তাঁকে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী জ্ঞানে ভক্তি করতো। তাঁর প্রেরণায় ভূরশুট রাজ্যের অধিবাসীরা অসীম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। রাজা রুদ্রনারায়ণ শিশুপুত্র ও বিধবা পত্নী ভবশঙ্করীকে রেখে অকালে পরলোকগমন করেন। রাণী ব্রহ্মচারিণী ব্রত গ্রহণ ক'রে বৈধব্যের নির্লিপ্ত জীবন নিয়ে—পবিত্র দেহ ও মন দেশসেবায় নিয়োগ করলেন।—দুর্দ্ধর্ষ পাঠান বীর ওসমান্ এই সুযোগে ভূরশুট রাজ্য ধ্বংস ক'রে বাংলা দেশে পাঠান রাজ্য প্রতিষ্ঠা মানসে ভূরশুট রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করেন। দুর্ব্বৃত্তেরা রাণীকে কাট্‌শাঁকড়া শিবমন্দির হ'তে অপহরণ করবার ষড়যন্ত্র করলে।

রাণী প্রিয় স্বামীর শোকে অধীর হ'য়ে তখন কাট্‌-শাঁকড়া শিবমন্দিরে বাস করছিলেন। গুরু হরিদেব ভট্টাচার্য্য এই সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন রাণীর সকাশে—নির্দ্দেশ দিলেন, দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে—তাঁর পবিত্র দেহ উৎসর্গ করতে বললেন দেশের কল্যাণে—আর জানালেন, সেই সেবাতেই হবে তাঁর স্বর্গীয় স্বামীর পবিত্র আত্মার তৃপ্তি। রাণী গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে দেশের জন্য করলেন অপূর্ব্ব ত্যাগ!

গুরুদেব তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। রাণী খবর পেলেন ওসমান ছদ্মবেশে অনুচরসহ নিশীথ সময়ে শিবমন্দির আক্রমণ ক'রে রাণীকে অপহরণ করবেন। তিনি তাঁর কয়েকজন সহচরী ও দেহরক্ষিণীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হতে আদেশ করলেন। রাণী সন্ধ্যার পূজাপর্ব্বাদি শেষ ক'রে স্বয়ং রণবেশে সুসজ্জিতা হ'লেন ও একাগ্রমনে দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে আত্ম-নিবেদন করলেন। গভীর রজনীতে রণবাদ্য বেজে উঠল—ওসমানের অনুচরগণ বন্দী হ'ল—ওসমান কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করল। রাণী আবার রাজধানীতে এসে স্বহস্তে রাজকার্য্য পরিচালনার ভার নিলেন।

ওসমান দ্বিতীয় সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল—কিছুদিন পরে রাণীর সেনাপতিকে উৎকোচ দিয়ে ও ভূরশুট রাজ্যের সিংহাসনের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে—ওসমান বহু সৈন্যসহ প্রকাশ্যভাবে দুর্গ আক্রমণ করলো। রাণী সংবাদ পেয়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'লেন—অসংখ্য নরনারী তাঁর পতাকাতলে এসে দাঁড়াল। রাণী রণবেশে সাক্ষাৎ চণ্ডীকারূপে অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্য পরিচালনা করলেন—সৈন্যগণের হুঙ্কারে অশ্বের হ্রেষা রবে ও বন্দুকের শব্দে রণক্ষেত্র মুখরিত হ'ল—পাঠান হ'ল বন্দী! এই ব্রাহ্মণ-দুহিতার শক্তি-চালনায় পাঠান শক্তি হ'ল বিধ্বস্ত—ওসমান পরাজিত হ'য়ে কোনক্রমে উড়িষ্যায় পালিয়ে গেল—পাঠানের অত্যাচার হোল চিরতরে নিবৃত্ত—বাংলা পাঠান অত্যাচার হ'তে হ'ল মুক্ত—বাংলার একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই ব্রাহ্মণ কুলললনার বীরত্ব-গাথায় মুখরিত হ'য়ে উঠলো। সম্রাট আকবর সেই সুযোগে মোগল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করলেন। গুণগ্রাহী সম্রাট এই অপূর্ব্ব বীর্য্যবতী বাংলার নারীকে শ্রদ্ধাভরে "রায়-বাঘিনী" খেতাবে ভূষিত করলেন—আম্বেরের মহাবীর মানসিংহ সম্রাটের প্রতিভূরূপে এলেন সেই সম্মান দিতে।

দেবী শঙ্করীর "কাট-শাঁকড়ার শিবমন্দির," "দেবী ভবানীর মন্দির" এখনও অতীতের সাক্ষ্যদান করছে—রাণী "রায়-বাঘিনীর গোড়ো" এখনও পড়ে আছে গৌরবের স্মারকরূপে তাঁর অমর স্মৃতি বুকে নিয়ে।

কুমারিকা অন্তরীপ

শ্রীরাধারাণী দেবী

তিন সমুদ্রের মোহানার মুখে দাঁড়িয়ে
নাগরিক মনের রূপ গেল বদলে।
বদলে গেল ভাবনা-চাওয়ার গতি।
স্তব্ধ হয়ে গেল বিজ্ঞানযুগের সভ্যমনের
আপনচক্রে যথানিয়মিত আবর্তন।
বিপুল বিস্ময় আর বিপুল আনন্দে হৃদয় হয়ে গেল আপ্লুত।
জয় হোক—জয় হোক আদিম ধরিত্রী জননীর!
কী আশ্চর্য অপূর্ব মহিমাময় বিরাট প্রকাশের মধ্য দিয়ে
তিনি দেখালেন আজ আপনার অপরূপ রূপ!
জয় হোক সেই বিচিত্ররূপিণীর।
ভারতমাতার চরণতল স্পর্শ করলাম।
প্রণাম করলাম মায়ের চরণাঙ্গুলির শেষ নখর-প্রান্ত ছুঁয়ে।
দেখলাম দেশ-মাতৃকার মূর্ত্তিময়ী রূপের
অপরূপ গঠনভঙ্গী-রেখা।
দেখলাম সাগরে-শৈলে-কাননে-কূলে অপূর্ব সমাবেশ।
দেখলাম সিন্ধু-উদ্ধৃতা ভারতবর্ষ—
আবাল্য যা' ছিল ধ্যানের সামগ্রী—কল্পনার বস্তু—
ছিল মানচিত্র দৃষ্ট রেখাসমষ্টি মাত্র।
অনন্যভূতপূর্ব উপলব্ধিতে হৃদয় মন হয়ে পড়ল অভিভূত।
যে-অনুভূতি এনে দিল মনের মধ্যে এক বিরাট ব্যাপ্তি,
এক অনাস্বাদিতপূর্ব প্রগাঢ় প্রশান্তি—মুক্তির অমল উল্লাস।
রোগ শোক দুঃখ অভাব-পীড়িত সহস্র বন্ধনে ঘেরা জীবন,
অসংখ্য তুচ্ছতার লৌহতারে বেষ্টিত কারা-আঙ্গিনা হতে
হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছে যেন নির্বাধ মুক্তির উন্মুক্ত প্রান্তরে।
প্রকৃতি-মা যেখানে আপন মহিমায় স্বপ্রকাশিতা।

মাথার উপরে গাঢ় নীল আকাশ সোণালী রৌদ্রে ঝলমল,
উড়চে তারই প্রশান্ত বুকে সিন্ধুশকুন দু'চারটি,—
নগরীর জনকল্লোল নেই, যানবাহনের বিচিত্র রোল নেই,
পাখীর কোলাহল, পালিত পশুর ডাক এখানে স্তব্ধ।
অসংখ্য শৈল-সঙ্কুল সাগরের উন্মত্ত কল্লোলের সাথে
মিশেছে যেখানে

অবাধ বাতাসের উদ্দাম উল্লাসধ্বনি।
নারিকেল বনে বনে ধ্বনিত হয়ে চলেছে
শত শত অদৃশ্য নূপুরের কনক-ঝঙ্কার!
তালীকুঞ্জে বেজে চলেছে ঘন করতাল-ঝনন্-ঝণন্।
পদতলে সাগরবেলায় বর্ণাভাময় রক্তবর্ণ বালুকারাশি!
কোথাও বা তারা হয়ে উঠেছে রজত-ঝিকমিকী গাঢ়-কৃষ্ণবর্ণ!
ভূমিতলে আস্তৃত বিন্দু বিন্দু প্রস্তর-কণা পুঞ্জ—
অবিকল বিকীর্ণ ধান্যশস্য রবিশস্য রাশি।
মুগ্ধ হলাম মায়ের এই অণোরণীয়ান্ সৌন্দর্যের পাশাপাশি
আকাশে সাগরে পর্বতে শৈলে মিলিত
মহতোমহীয়ান্ সৌন্দর্য-শোভায়।

তুলারাশিস্থ ভাস্কর

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

“বৈশাখের তারা” প্রবন্ধে যে সব গ্রহ তারকার উল্লেখ করেছি, তাদের সকলকে কার্ত্তিকে দেখা যাবে না। যারা উঠ্‌তো পূর্ব্ব গগনে, তাদের এখন সন্ধ্যায় অস্ত যেতে দেখা যাবে। সূর্য্য যে পথে চলতেন ব'লে মনে হ'ত, কার্ত্তিক হ'তে ছ' মাস তাঁকে সে পথ ছেড়ে দক্ষিণ পথে চলতে দেখা যাবে। কারণ আশ্বিন সংক্রান্তির পর সূর্য্যের দক্ষিণায়ন। তার কারণও অতি সংক্ষেপে মোটামুটি বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

অবশ্য সূর্য্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হ'বে সায়ন তুলা সংক্রান্তিতে। ইংরাজি মতে সে দিন ২১ সেপ্টেম্বর। হিন্দু পঞ্জিকার গণনায় এ বৎসর সায়ন তুলা সংক্রান্তি ৮ই আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর। সেদিন দিনমান রাত্রিমান সমান। দিনপঞ্জীর বাম পার্শ্বে মার্জিনে প্রথমে লেখা আছে—দিবা ৩০।০।০ রাত্রি ৩০।০।০। ১০ আশ্বিন হ'তে দিবা ভাগ কমতে আরম্ভ হবে। ২৩ ডিসেম্বর ৮ পৌষ সায়ন মকর সংক্রান্তি, রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—দিবা ২৬।১৯।৩৩ রাত্রি ৩৩।৪০।২৭। পরদিন অর্থাৎ ৯ই পৌষ দিবা ২৬।২০।৪৪ কাজেই রাত্রি ৩৩।৩৯।১৬ উভয়ে মিলে ৬০ দণ্ড বা এক দিন।

পূর্ব্বে বলেছি পৃথিবীর মেরু সূর্য্য ও চন্দ্রের টানে রাশিচক্রে পেছিয়ে যায়। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্য-পথকে চন্দ্রপথ তাই দুই বিন্দুতে ছেদ করে। এই দুইটি বিন্দুর একটির নাম রাহু, একটির নাম কেতু। রাহু হ'তে কেতু সর্ব্বদা সমান অন্তরে অবস্থিত। রাশি চক্রে এ বিন্দু দু'টিও পেছোয়—দেড় বছরের কিছু অধিক সময়ে এক এক রাশি বা ৩০ ডিগ্রি।

রবি এক রাশিতে এক মাস থাকে, শশী সপাদ দুই দিন। রাহু ও কেতু এক রাশিকে দেড় বৎসরের কিছু বেশি দিন ভোগ করে। তার অর্থ রাহু এবং কেতু সচল। যে দুই বিন্দুতে সূর্য্য এবং চন্দ্রপথ মিলিত হয় সে দুই বিন্দু স্থির নয়। ধীরে ধীরে চন্দ্রপথ সরে যায়। সূর্য্যের যেমন অয়ন চলন, চাঁদের তেমনি রাহু কেতুর রাশি ভোগ এবং পাতাপসরণ। আজ যাকে ধ্রুব তারা বলি, হাজার বছর পরে আর সে তারা ধ্রুব তারা থাকবে না। মহাভারতের যুদ্ধের দিনে ছোট ভালুকের লেজের দিকে মেরু রেখে মাথা নেড়ে নেড়ে ঘড়ী আবর্ত্তিত হ'ত না। কার্ত্তিক মাসে চন্দ্রপথ সূর্য্য পথের সঙ্গে মিলিত হবে কর্কটে অশ্লেষা নক্ষত্রের কাছে এবং মকরে শ্রবণা নক্ষত্রের নিকট।

এ বৎসর রাহু এবং কেতু যথাক্রমে কর্কটে এবং মকরে এসেছে ১৯ বৈশাখ ৩ মে রা: ৪০।১৩ পলে।

সিংহে এবং মীনে তারা প্রবেশ করেছিল অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্রপথ আকাশ চক্রের ঐ দুই বিন্দুতে মিলিত হ'য়েছিল—২৭ আশ্বিন ১৩৫৮। সিংহে রাহু ছিল ১৮ মাস ২১ দিন।

ঠিক ১৮ মাসে রাহু কেতু ৩০ ডিগ্রি সরে না। কিছু দিন বেশী লাগে। আমি দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সন ১৩০৯ সালে ১২ আষাঢ় রাহু তুলা রাশিতে প্রবেশ করেছিল। পরের বছর ২০ পৌষ কন্যায় গিয়াছিল। ১৮ মাসের ৮ দিন পরে। বৃশ্চিকে ছিল ৭ ফাল্গুন ১৩৬৩ হ'তে ২১ ভাদ্র ১৩৬৫ সাল ১৮ মাস ১৪ দিন। প্রকৃত পক্ষে ঠিক ১৯ বৎসর অন্তর চন্দ্রের একই নক্ষত্র এবং তিথি ভোগ হয়।

গ্রীক দেশের জ্যোতির্বিদ মেটন ৪৩২ খৃঃ পূর্ব্বে এ তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। তাই ইংরাজি জ্যোতিষ এ তত্ত্বকে বলে মেটনিক সাইকেল। ১৯ বছর পূর্ব্বের একখানা পাঁজি নিলে দেখা যাবে যে ঐ বছরের পয়লা বৈশাখ হতে চৈত্রের শেষ দিন অবধি এ বছরের তিথি নক্ষত্র প্রায় দিনের পর দিন হুবহু মিলে যাবে। কেবল এক ঘণ্টার প্রভেদ হবে। চাঁদ রাশি চক্রে একবার পরিক্রমণ করে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১১ সেকেণ্ডে। কিন্তু ঐ সময়ে সূর্য্য সরে যায় ব'লে চান্দ্রমাস হয় ২৯·৫৩০৫৮৮৭ দিনে অর্থাৎ সাড়ে ২৯ দিনের সামান্য বেশী সময়ে। এক বছরে ৩৬৫¼ দিন। তার ১৯ গুণ ৬৯৩৯·৭৫ দিন। ঐ সংখ্যাকে ২৯·৫৩০৫৮৮৭ দিয়ে ভাগ দিলে প্রায় ২৩৫ হয়। ২৯·৫৩০৫৮৮৭ × ২৩৫ = ৬৯৩৯·৬৮৮। উনিশ বছরে পূর্ণিমা-অমাবস্যা হয় ২৩৫ বার অর্থাৎ চান্দ্র মাসের সংখ্যা ২৩৫। ব্রহ্ম-গুপ্তর গণনা অনুসারে ভাস্করের মতে ১৯ বছর অপেক্ষা ১০১ বছরে আরও সূক্ষ্ম মিল হয়। জ্যোতিষ অনুসারে সূক্ষ্ম নিরয়ণ বর্ষমান ৩৬৫·২৫৬৩৬৩ এবং চন্দ্রের ভ-গণের সূক্ষ্ম মধ্যম মান ২৭·৩২১৬৬১ দিন। এই হিসাবে তিথি নক্ষত্রের পুনরাবর্ত্তন ১৯, ১৬০ এবং ১৬৩৬ বৎসরে ঘটে। হিন্দু জ্যোতিষের রাহু কেতুর দ্বাদশ রাশির অবস্থিতি কাল হিসাব করলে মূলত মেটনিক চক্রের

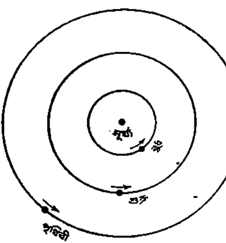

১নং চিত্র

অনুরূপ। মেটন প্রাচীন, কি ব্রহ্মগুপ্ত প্রাচীন—তা' আমি জানি না। একজন অপরের তত্ত্ব নিয়েছিলেন অথবা উভয়েই এক সঙ্গে স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন কিনা সে কথাও আমি বলতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে চন্দ্রগ্রহণের কথা উল্লেখযোগ্য। গ্রহণের কারণ স্কুল-পাঠ্য ভূগোলে পাওয়া যায়। কিন্তু তার হিসাব কি পদ্ধতিতে হয় সে কথা উচ্চ গণিত-জ্ঞান সাপেক্ষ। মোট কথা যে রাশিতে রাহুর অবস্থান সে রাশিতে অর্থাৎ সেই মাস ব্যতীত চন্দ্রগ্রহণ অসম্ভব। বলেছি রাহু-স্থিতি ১৮ বৎসর এবং কতিপয় দিন। প্রাচীন কালদীয় জ্যোতিষী সরোষ নির্ণয় করেছিলেন ১৮ বৎসর ১০ দিন কিম্বা ১১ দিন অন্তর চন্দ্রগ্রহণ হয়। ঠিক তার অনুরূপ সিদ্ধান্ত নাই হিন্দু জ্যোতিষে। জ্যোতিষে সে

কার দিক বলা কঠিন। হয়তো উভয়েই এক সঙ্গে গণনার দ্বারা আবিষ্কার করেছেন। (১)

বর্ষা গ্রহ নক্ষত্র দেখা বা চেনার সমীচীন কাল নয়। তবু আষাঢ় এবং শ্রাবণে বহুদিন সন্ধ্যায় শুক্রের উজ্জ্বল রূপ মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতি ছিল পৃথিবীর নিকটে, কিন্তু শুক্র তাকে পেছিয়ে দিয়ে নিজের দীপ্ত রূপে মানুষকে তুষ্ট করেছিলেন।

বুধ এবং শুক্র পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের নিকটে অবস্থিত। তাই এদের বলা হয় অন্তর্গ্রহ। কখনও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কখনও সূর্য্যাস্তের কিছুকাল মাত্র পরে তাদের পূর্ব্ব বা পশ্চিম গগনে দর্শন পাওয়া যায়। বুধ রবির নিকটতম গ্রহ। সে ৮৭ দিন ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্য হ'তে সে মাত্র সাড়ে তিন কোটি মাইল দূরে। সূর্য্যের নিকটে থাকে তাই সূর্য্যের কিরণ তাকে হতশ্রী করে। আমরা যেমন চাঁদের এক দিক মাত্র দেখতে পাই, বুধেরও তেমনি মাত্র এক দিক দেখি। চাঁদ তার নিজের অক্ষে ঘোরে না। (২) সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রাচীন যুগে চন্দ্র সম্বন্ধে এই সত্যটি বড় কবিতায় বর্ণনা করেছেন।

তরণিকিরণ সঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ড
দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি
তদিতরদিশি বালাকুন্তল শ্যামলশ্রী
র্ঘটইব নিজ মূর্ত্তিচ্ছায়য়েবাতপস্থ।

কার্ত্তিকের সংক্রান্তি জল-বিষুবসংক্রান্তি। কার্ত্তিকের প্রথম দিনে বুধকে হস্তা নক্ষত্রে পাওয়া যাবে, রবি উদয় হবেন তুলায়। শুক্র পূর্ব্বফল্গুনীতে। সুতরাং এরা উভয়েই প্রভাতের তারকারূপে সূর্য্যের অগ্রদূত হয়ে পূর্ব্ব গগনের ললাটে জ্বল জ্বল করবে। রাত্রি দশটায় পশ্চিমে কৃষ্ণপক্ষের গভীর নদী এবং তার সন্নিকটে পূর্ব্বে লোহিত বর্ণ মঙ্গল গ্রহকে পাবার কথা। কিন্তু চাঁদের আলোয় সে ম্লান হবে। শ্যামা পূজার অমানিশার সন্ধ্যায় মঙ্গলকে পূর্ব্বে দেখবার সুবিধা অধিক। দুটি লাল তারা, মঙ্গল পৃথিবীর সন্নিকটে তাই তাকে বড় দেখা যাবে।

আমি "বৈশাখে"র রোহিণী-অর্দ্ধচন্দ্রবাসের পূর্ব্বে তারার বৃশ্চিক রাশির তারাদের কথা বলেছি। কার্ত্তিকে সূর্য্য অস্ত যাবে তুলায়। অতএব উজ্জ্বল সর্প তুলা রাশির নক্ষত্র দেখা যাবে না। বৃশ্চিকের জ্যেষ্ঠা (আন্টারিস) প্রথম শ্রেণীর তারা। সূর্য্যাস্তের সময় তাকে দেখা সম্ভব। ছায়াপথও পশ্চিমে টলবে। তার পূর্ব্বতীরে শ্রবণাকে আন্দাজ করে দেখার অবসর হবে। দক্ষিণের মানচিত্রে (৩) ধনুরাশিকে দেখে সন্ধ্যার পর দক্ষিণ পশ্চিম আকাশে তার তারাব্যূহ চেনা সহজ হবে। উত্তর আকাশে শ্রবণার উত্তর পূর্ব্বে ডেলফিন নামক এক তারার গোষ্ঠী। তার দক্ষিণে দেখা যাবে মকর রাশির তারা। কুম্ভে বড় তারা নাই। মীনের অনেক দক্ষিণে ফোমালহট প্রথম শ্রেণীর তারা। সে পৃথিবী হতে ২৪ আলোক-বর্ষ দূরে। এর দক্ষিণ-পূর্ব্বে একেবারে দক্ষিণ আকাশের নীচে এরিডেনাস-ব্যূহের তারকা একেনার। একেনার থেকে সোজা পূর্ব্বদিকে রেখা টানলে দক্ষিণ আকাশে অগস্ত্য ক্যানোপাসকে দেখা যায়। তাকে ফাল্গুন চৈত্রে চেনা সহজ। দক্ষিণ আকাশের সর্ব্বোজ্জ্বল তারকা সিরিয়স লুব্ধক। তার পরেই ক্যানোপাস বা অগস্ত্য।

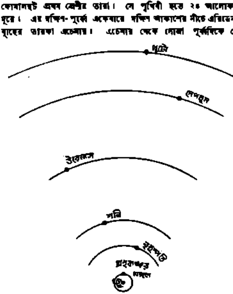

২য় চিত্র

আমি কৃত্তিকার উপরে পারস্যুসের কথা বলেছি। পৌষ মাসে পারস্যুস, অ্যাণ্ড্রোমিডা এবং পেগেসাসকে দেখবার অধিক অবসর হবে। পারস্যুসের উপরের তারাগুলি অ্যাণ্ড্রোমিডা এবং তাদের নীচের তারা ব্যূহে প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ পেগেসাস। এর এককোণে পূর্ব্বভাদ্রপদ। অন্য কোণে উত্তরভাদ্রপদ। এদের পশ্চিমে কাশ্যপেয়া। এর হতে সোজা রেখা টানলে পেগেসাসের নীচের তারা দুটিতে পৌঁছায়। কাশ্যপেয়ার শেষের তারার আরও পশ্চিমে সিফিয়সব্যূহ। পারস্যুস ব্যূহের নীচে মিথুনের দক্ষিণে সিটাস—সমুদ্র-দানব নামে এক ব্যূহ আছে। এই সব ব্যূহকে জড়িয়ে গ্রীক কবিরা এক গল্প রচনা করেছেন কিম্বা প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যানকে রূপ দিয়ে এদের নামকরণ করেছে সে কথা বলা

---

(১) পি-এম-বাগচীর পঞ্জিকায় গ্রহণের পরিলেখ এবং গণনা প্রশংসনীয়। ১৫ শ্রাবণ ১৩৫০ দিনপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

(২) পুরাতন ইংরাজি জ্যোতিষ গ্রন্থ অন্য রকম বলে; যথা Parker (7th Edition)। নবীন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্বিদ Camille Flammarionএর গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ—"The Sun's close proximity...immobilised the globe of Mercury just as the Earth has immobilised the moon, forcing it to present perpetually the same side to the Sun."

Sir James Jeans—The Stars In Their Courses—(1931 Ed).—"The Moon is so tightly held in the Earth's gravitational grip that it cannot rotate in this grip, and so always presents the same face to the earth. Mercury is in a similar situation. It is so tightly held in the gravitational grip of the Sun that it always presents the same face to the Sun."

The Marvels and Mysteries of Science নামক অতি আধুনিক গ্রন্থে Ellison Hawkes F. R. A. S. বলেন—"To explain more clearly why it is that the Moon always presents the same face to us, we may take the example of a horse that canters around the ring at a circus. The ring master is in the position of an inhabitant of the Earth, for although the horse is making a complete revolution around him he never sees his off side."

(৩) জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষ।

কঠিন। সিফিয়স্ বাপ, কাশ্যপেয়া জননী, আন্ড্রোমীডা তাদের কন্যা। দেবতাদের প্রসন্ন করবার জন্ত তাকে হাত পা বেঁধে রাখা হ'য়েছিল। কাশ্যপেয়া বসে দেখতে, সিফিয়স উপর হ'তে প্রতীক্ষা করলেন! একটা দানব সিটাস্ সমুদ্র হ'তে উঠে তাকে ধরতে এলো। তখন পারস্যুস্ পেগেসাস নামক অশ্বে চড়ে এসে তার মাথা কেটে দিলে। অনেক ধূলা উড়লো। ধূলা কৃত্তিকা মৃগশির প্রভৃতি ছোট ছোট চিক্‌চিকে তারার দল। কল্পনা প্রাচীন জাতিদের আনন্দ পরিবেশন করে। পেগেসাস পক্ষযুক্ত ঘোড়া। কবিরা তার পিঠে বসে কল্পনা-রাজ্যে ওড়ে। এই সব গল্পের সঙ্গে সংযোগ করলে তারাগুলিকে সাধারণের পক্ষে চেনবার আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মে ব'লেই বোধ হয় ঐ রকম সব পরিকল্পনা। নীরস বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সরস করতে উৎসুক ছিলেন প্রাচীন কবিরা সকল দেশে। আন্ড্রোমীডার সর্পিল নেবুলা দেখা যায়। আকাশ গঙ্গার মত, সেটিও দূরের নক্ষত্র জগতের ছায়া। না লক্ষ বৎসরে আলো পৌঁছে।

বলেছি রবিকে কেন্দ্র ক'রে গ্রহরা ঘোরে। পৃথিবী এবং সূর্য্যের মধ্যে বুধ এবং শুক্র। বুধের বর্ষ প্রায় ৮৮ দিনে, শুক্রের প্রায় ২২৫ দিনে, পৃথিবীর ৩৬৫¼ দিনে। পৃথিবীর বাহিরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে মঙ্গল ৬৮৭ দিনে, বৃহস্পতি ১২ বৎসরে, শনি ২৯ বৎসরে, উরেনাস ৮৪, নেপচুন ১৬৫ বৎসরে। প্লুটোর পরিক্রমণ-কাল এখনও ঠিক জানা যায়নি। এদের চলার বেগ জানলে হর্ষ উৎপন্ন হয়। আমাদের পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ছুটছে—১৮.৫ মাইল, বুধ ২৯.৭, শুক্র ২১.৭, মঙ্গল ১৫, বৃহস্পতি ৮.১, শনি ৬, উরেনস ৪.২, নেপচুন ৩.৪ এবং প্লুটো ২.৯ মাইল। যে প্ল্যানেট রবির যত নিকট তার দৌড়ের বেগ তত বেশী। পরিক্রমের কাল দূরত্ব অনুপাতে কম বেশী। পৃথিবীর এক বছরের অনুপাতে বুধ—০.২৪, শুক্র—০.৬২, মঙ্গল—১.৮৮ বৃহস্পতি—১১.৮৬ শনি—২৯.৪৬ উরেনাস—৮৪.০১ নেপচুন—১৬৪.৭৯, প্লেটো—২৪৮ বৎসর।

আবার আমরা মেষরাশি দেখতে পাব। প্রায় মধ্যরাত্রে মেষের তারাগুলি মাথার উপর আসবে। তাদের পশ্চিমে রোহিণী অলডিবরণ কালপুরুষ প্রভৃতি। তাদের দক্ষিণে সিরিয়স বা লুব্ধক—তারাদের মধ্যে সর্ব্বোজ্জ্বল। এদের সব কথা বলেছি "বৈশাখের তারা" প্রবন্ধে।

গ্রহ-নক্ষত্রের চলাফেরা আকার-প্রকার অনুশীলন করায় মনে বিমল সুখ হয়। এ প্রবন্ধ বিস্তর-প্রবেশে বিমুখ। কাল, আয়তন, উজ্জ্বলতা, গ্রহদের উপগ্রহের সংখ্যা প্রভৃতির তত্ত্ব নিত্যই অনুশীলনের ফলে অল্প অল্প পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে। জ্যোতিষ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করতে হ'লে নূতন সংস্করণের পুস্তক পড়া কর্ত্তব্য।

আমি এ প্রবন্ধে পাঁজি দেখে তারা গ্রহের স্থান নির্দ্দেশ করবার কথা বলেছি, কারণ সকল পাঠকের পক্ষে পঞ্জিকা সংগ্রহ সম্ভব। অন্ততঃ পাঁজির সাহায্যে চন্দ্র সূর্য্যের গতি বোঝা গেলে, ক্রান্তিপথের উপর নীচে স্থির নক্ষত্রদের পরিচয় সহজসাধ্য হবে। সূক্ষ্ম গণনা কিম্বা নক্ষত্রদের সংখ্যা, নাম, দূরত্ব, উজ্জ্বলতা প্রভৃতির সূক্ষ্ম সমতার পাশ্চাত্য জ্যোতিষ অনুশীলনের ফলে বিদিত হওয়া যায়। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে যাদের নিত্য আকাশে দেখি, তাদের বিষয় সামান্য জ্ঞানও মনকে প্রসার করে।

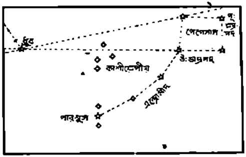

আব্‌দাল্লা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

মাঝে মাঝে চড়ায় ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে নৌকাগুলো চলেছে। সব সমবয়সী আমরা এক নৌকায়। অবশ্য শিকারীর কথা আলাদা। আমাদের ঝোঁক, ছিলো আগে আগে চলবো। নতুন নতুন দেশের, সব প্রথমে আমরাই। তাই বেছে বেছে হাল্কা নৌকা আর ওস্তাদ ছোকরা মাঝি নিয়ে আমরা পদ্মায় ভেসেছিলুম। কিন্তু পদ্মার কূলের খবর তখন কে জানতো! শেষে নৌকা ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে আমরাই পড়লুম পিছিয়ে। একটা চরে লেগে নৌকা ভিড়ে যায় খস-স্-স্-স্। মাঝি জলে নেমে নৌকার কোণা ধরে ঠেলতে থাকে। আমাদের উৎসাহ বেড়ে যায়। ক্ষোভ করতে থাকি—নৌকায় কেন চাকা থাকে না! এই সুযোগে তা হলে চাকা মারা যেত। মাঝিকে বার বার জলে নেমে পড়তে দেখে আমাদের সাহস বাড়তে থাকে। শেষে আমরাও যোগান দিতে লাগ্‌লুম। যেন নৌকা ঠ্যালবার জন্যেই আমাদের আসা। এমনিতর আমোদ-পনা। হঠাৎ শিকারীর ধমক, চুপ্! নৌকার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে চুপ করে থাকলুম। ব্যগ্রভাবে চারিদিকে চাইবার চেষ্টা করছি। কোথাও কোন নিশানা নেই। ফিস্‌ফাসে বন্দুক জেনে নিলে, প্রকাণ্ড এক আব্‌দাল্লা। দেখলুম, তাই বটে। দূরে, একটা চরে, একেবারে জলের ধারে একটা পাখী দাঁড়িয়ে। হাসি পেল। এতবড় পদ্মার মধ্যেকার ওইটুকু চরই মানাচ্ছে ভালো। তার মধ্যে কোথায় একরত্তি আব্‌দাল্লা, তাকে আবার মারতে হবে। অত্যন্ত অনাবশ্যক মনে হলো। বন্দুকের চোঙা নৌকার কাণা ঘেঁসে উঁচু হোয়ে উঠ্‌লো। মনে মনে বলতে লাগলুম, যা ব্যাটা, আব্‌দাল্লা, মোটরূপে তোর দেখছি আজ সদ্‌গতি হলো প্রায়। ভালোই হলো। কোথায় কোন্ বাগাড়ে, ঠোকরাঠুকরি কোরে মরে থাকতিস্। অমন সুন্দর দেহটার গতি হোত না। আজ তুই কতকগুলি সিভিলাইজড্ মানবের উদর-সেবায় আত্মসমর্পণ করবি—বন্দুকের নল নামিয়ে শিকারী বললে, ভারী চালাক অর্থাৎ আব্‌দাল্লা পালিয়েছে। মানে, সে-পালানোর একটু মজা ছিল। নৌকার চাল দেখে আব্‌দাল্লা ঠিকই ধরেছিল। অথচ পুরো বিশ্বাস করতে বোধহয় ওর মন সরছে না। এমনিতর ইতস্ততঃ, ইয়ার হাঁসটা দু পা করে দৌড়ে চরের ওপর ছোটে আর একটু করে পাশ ফিরে দ্যাখে। একবার ডানদিকের চোখ পাতে। আর একবার বাঁ দিকের চোখ। ভাবছিলুম, বলব হাঁসটাকে, দূর্ ওয়ার। কিন্তু শিকারীর ভয়। আব্‌দাল্লা উড়্‌লো, বড়ো রকম চক্কোর মেরে। লম্বা লম্বা পা ঝুলিয়ে, বড়ো ঠোঁটটি এগিয়ে, হাঁসটা জলের ওপর দিয়ে একলা আকাশে নিঃসঙ্গ কোন্‌দিকে উড়ে গেল।

বাহির-বিশ্ব

মিহির

ইটালীর আত্ম-সমর্পণ

গত ৮ই আগষ্ট সমগ্র বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে শ্রবণ করে যে, ইটালীর সহিত বৃটেন ও আমেরিকার শত্রুতার অবসান ঘটিয়াছে; ইটালী বিনা সর্ত্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। বাদোগ্লিওর প্রতিনিধির সহিত আইসেন্‌হাওয়ারের যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় পাঁচ দিন পূর্ব্বে; বিশেষ সামরিক কারণে এই সংবাদ প্রকাশে বিলম্ব করা হয়। তাহার পর ঘটনাস্রোতের গতি অত্যন্ত দ্রুত; আত্মসমর্পণের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ইঙ্গ-মার্কিণ সেনা ক্যালেব্রিয়ায় অবতরণ করিয়াছিল। ইহার পর দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইটালীতে সম্মিলিত পক্ষের নূতন সেনা অবতরণ করিয়াছে; ঐ অঞ্চলে বিশাল নৌ-ঘাঁটি টারান্টো এবং আড্রিয়াটিকের বন্দর বারি ও ব্রিন্দিসি এখন তাহাদের অধিকারভুক্ত। জার্ম্মাণী কালবিলম্ব না করিয়া ইটালীতে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে; সমগ্র উত্তর ইটালী, রাজধানী রোম ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে এখন তাহারা প্রতিষ্ঠিত। সম্মিলিত পক্ষের কিছু সেনা নেপল্‌সে অবতরণ করিয়াছিল, জার্ম্মানরা এখন তথায় তাহাদিগকে প্রবলভাবে বাধা দান করিতেছে। কিন্তু জার্ম্মাণ সেনা গত ১২ই সেপ্টেম্বর মুসোলিনীকে বন্দী অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে। এখন মুসোলিনীর নেতৃত্বাধীনে জার্ম্মানীর অধিকৃত অঞ্চলে নূতন ফ্যাসিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত অনুসারে প্রায় সমগ্র ইটালীর নৌবহর সম্মিলিত পক্ষের পোতাশ্রয়ে চলিয়া আসিয়াছে; তবে, ইটালীর বিমানবাহিনীর আগমনের কোন সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত অনুযায়ী সম্মিলিত পক্ষ কর্সিকা এবং ইটালীর নিজস্ব দ্বীপগুলি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ঘাঁটী রূপে ব্যবহারের অধিকারী। কর্সিকা ও আড্রিয়াটিকের বিশাল ইটালীয় দ্বীপ সার্ডিনিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা এখনও জানা যায় নাই। তবে ঈজীয়ান্ সাগরের প্রবেশদ্বারে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ডোডেকেনীজের ইটালীয় কর্ত্তৃপক্ষ জার্ম্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

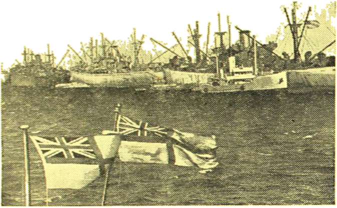

একটি উত্তর আফ্রিকান পোর্টে আমেরিকায় নির্ম্মিত "লিবার্টি" জাহাজ হইতে মাল খালাস করা হইতেছে

ইটালীর আত্মসমর্পণের পর ইহাই গত একপক্ষকালের সংঘটিত আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী।

ইটালীর আত্মসমর্পণে সম্মিলিত পক্ষ ইটালীর বিশাল নৌবহর লাভ করিয়াছেন; ইহাই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান লাভ। এই নৌবহর ইউরোপে অভিযান পরিচালন সম্পর্কে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ভূমধ্য সাগরে একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অনুসারেই মুসোলিনী তাঁহার নৌবহর গঠন করিয়াছিলেন। ভূমধ্য সাগরে এই নৌবহর সত্যই বিশেষ কার্য্যকরী হইবে। ইটালীতে পরিচালিত বর্ত্তমান যুদ্ধে অথবা দক্ষিণ ইউরোপের অন্ত কোথাও অভিযান পরিচালনে সম্মিলিত পক্ষ ইটালীর নৌবহরের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন।

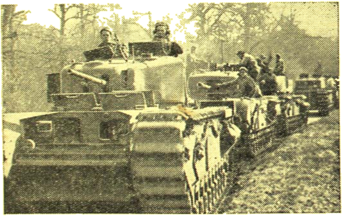

'চার্চ্চিল ট্যাঙ্ক' পরিচালনায় ক্যানেডিয়ান আর্ম্মির ট্যাঙ্ক-রেজিমেন্ট রণস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত

ইহার ফলে ভূমধ্যসাগর অঞ্চল হইতে ইঙ্গ-মার্কিণ নৌবহরের একটি বিশাল অংশ প্রাচ্যে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইবে। প্রাচ্য অঞ্চলের যুদ্ধে নৌবহরের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। কাজেই ইটালীয় নৌবহর পরোক্ষে প্রাচ্য অঞ্চলের যুদ্ধেও সম্মিলিত পক্ষের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে বলিতে হইবে, ইটালীয় নৌবহর সমগ্র বিশ্বব্যাপী রণক্ষেত্রে যুধ্যমান পক্ষদ্বয়ের শক্তিসাম্য পরিবর্ত্তিত করিল।

প্রিন্সেস্ এলিজাবেথ, নিজ রেজিমেন্টের সৈন্য-পরিদর্শন করিতেছেন

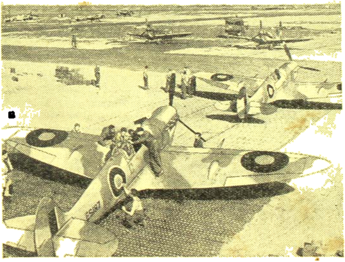

স্পিট্‌ফায়ার্ স্কোয়াড্রন্ প্রস্তুত হইতেছে

তাহার পর, সম্মিলিত পক্ষ এখন জার্ম্মাণীর সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবার সুবিধা পাইয়াছেন; অথচ শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলে সৈন্য অবতরণ করাইবার অগ্নিপরীক্ষা তাঁহাদিগকে দিতে হয় না। জার্ম্মানী ও জার্ম্মান অধিকৃত অঞ্চলে আক্রমণ প্রসারের পক্ষে ইটালী একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি; জার্ম্মানী এই ঘাঁটি রক্ষার জন্য বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করিবে। সমগ্র ইটালী যদি সম্মিলিত পক্ষের অধিকৃত হয়, তাহা হইলে খাস জার্ম্মানী ও ফ্রান্স প্রত্যক্ষভাবে বিপন্ন হইবে; জার্ম্মানীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি প্রচণ্ড বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হইবে। কাজেই, এই অবস্থার সৃষ্টি নিবারণের জন্য জার্ম্মানীকে প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। সম্মিলিত পক্ষ দক্ষিণ ইটালী হইতে বল্কান অঞ্চলে আঘাত করিবার সুবিধালাভ করিয়াছেন; আড্রিয়াটিক সাগর এখন তাঁহাদের পক্ষে নির্ব্বিঘ্ন। মার্কিণ সমর-নায়কগণ যদি একই সময়ে বল্কানে আঘাত করিতে প্রয়াসী হন এবং সঙ্গে উত্তর ইটালী হইতে জার্ম্মানীকে বিতাড়নের জন্য প্রবল চেষ্টা চলে, তাহা হইলে ইটালীর ভূমি গুরুত্বপূর্ণ রণক্ষেত্রে পরিণত হইবে। জার্ম্মানী তখন স্বভাবতঃ অন্যান্য রণক্ষেত্র হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইবে। ইহার ফলে সম্মিলিত পক্ষ উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সে ও জার্ম্মানীতে প্রত্যক্ষ অভিযান পরিচালনের সুবিধা পাইবেন। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জই জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘাঁটি। যে কারণেই হউক, এতদিন এই ঘাঁটি ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। ইটালীতে জার্ম্মানীর সহিত সংঘর্ষ আরম্ভ হওয়ায় এই ঘাঁটী ব্যবহারের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরে এইরূপ অর্কাচীন রাজনীতিকের অভাব নাই, যাঁহারা সোভিয়েট রুশিয়াকে অত্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁহাদের ধারণা—সোভিয়েট বাহিনী যদি মধ্য ও পশ্চিম য়ুরোপে প্রবেশের সুযোগ পায়, তাহা হইলে ঐ সকল দেশে কম্যুনিষ্ট আদর্শ প্রবর্ত্তিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, এই জন্যই তাঁহারা য়ুরোপে "দ্বিতীয় রণাঙ্গন" সৃষ্টি করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি জার্ম্মা-

নীর চাপ হ্রাস করাইতে চান না। এই দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকেরা যদি এখনও ইঙ্গ-মার্কিন সামরিকনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকারী থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইটালীতে লব্ধ এই মূল্যবান সুযোগ যথাযথ ব্যবহৃত হইবে না। এই সম্পর্কে [illegible]—রুশিয়ার পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ এই অভিযোগই করা হইয়াছে যে, ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতিকগণ ইউরোপে জার্মানীকে প্রবলভাবে আঘাত করিয়া যুদ্ধের দ্রুত অবসান ঘটাইতে চান না।

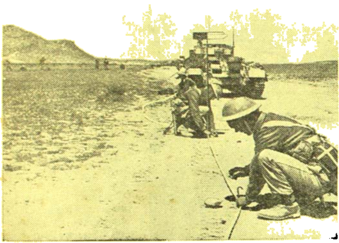

ব্রিটিশ সংস্কারক সৈনিকগণ নির্দিষ্ট স্থানে শ্বেত দড়ি দ্বারা চিহ্ন করিয়া রাখিতেছে

অবশ্য, বিপক্ষেও যুক্তি আছে। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি অবিশ্বাসের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পক্ষে ইউরোপখণ্ড হইতে দূরে থাকা সম্ভব ততক্ষণ, যতক্ষণ তাঁহারা নিশ্চিত জানেন যে, জার্মানী শক্তিশালী; তাহাকে সোভিয়েট রুশিয়া একাকী পরাজিত করিতে পারিবে না। কিন্তু জার্মানীর সমর-যন্ত্র যদি ভাঙিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, যদি জার্মানীতে ও জার্মানীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিতে বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা যদি স্পষ্ট হইয়া উঠে, তাহা হইলে তখন কম্যুনিজম্-ভীত রাজনীতিকেরা তাঁহাদের রুশ-বিরোধী মনোভাবের জন্যই ইউরোপে আক্রমণ প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করিবেন। জার্মানীর পরাজয়ের সময় ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যদি ইউরোপখণ্ড হইতে দূরে থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধাবসানকালে ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাহারা যথাযথভাবেই মোড়লী করিতে পারিবে না। কাজেই ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরের রুশ-বিরোধী রাজনীতিকেরা যদি বুঝিয়া থাকেন যে, পাশ্চাত্য মিত্রদের সামরিক সহযোগিতা ব্যতীতই রুশিয়ার পক্ষে জার্মানীকে পরাজিত করা সম্ভব, তাহা হইলে ইটালীতে লব্ধ সুযোগ ব্যবহারের জন্য তাঁহারা ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

ইটালীর আত্মসমর্পণে জার্মানীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিতে গভীর নৈতিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য হইয়াছে। একদিকে রুশরণাঙ্গন হইতে গত কিছুকাল জার্মানীর ক্রমাগত পরাজয়ের সংবাদ, তাহার পর আবার জার্মানীর প্রধান সহচরের এইভাবে পদত্যাগ! কাজেই হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের যে সকল সুবিধাবাদী রাজনীতিক এতদিন হিটলারের সমর্থন করিতেছিলেন, তাঁহারা এখন তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে বিব্রত হইয়াছেন। বাদোগ্লিওর ন্যায়, সময় থাকিতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির তোষামদ করিতে পারিলে যে ভবিষ্যতে সুবিধা হইতে পারে, এই কথা তাঁহাদের মনে উদয় হইয়াছে। ঐ সকল দেশের জনসাধারণও জার্মানীর পরাজয়ের সংবাদে এবং অক্ষশক্তির শিবিরে এই ভাঙনে উৎসাহী হইয়া উঠিতেছে। সামরিক প্রয়োজন ব্যতীতও এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নিবারণের জন্য হিটলার এখন ইটালীর প্রতি বিশেষভাবে অবহিত। ইটালীর উত্তরাংশে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া হিটলার তথায় মুসোলিনীকে বসাইয়াছেন; সম্ভবতঃ রোমকেই ফ্যাসিষ্ট ইটালীর রাজধানী করিবার ব্যবস্থা হইবে। জার্মানীর পক্ষে ফ্যাসিষ্ট ইটালীর শক্তিবৃদ্ধি করা যেমন রাজনৈতিক প্রয়োজন, সম্মিলিত পক্ষেরও তেমনি ফ্যাসিষ্ট ইটালীকে চূর্ণ করিয়া ইউরোপের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধীদিগকে উৎসাহিত করা রাজনৈতিক প্রয়োজন।

আমেরিকান সৈনিকগণের সামরিক কার্য্যের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় বন্য-অশ্বগুলিকে শিক্ষাদান করা হইতেছে

ইটালীর ভূমি রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় এই প্রাচীন রাষ্ট্রটি এখন শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই মহা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া ইটালীর

কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনাও আছে। ইটালীর যে সকল ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী বিপ্লবী এতদিন চরম নির্য্যাতন সহিয়া ফ্যাসিষ্টদের অবসান প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতালাভ করিলেন। এই সকল ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী রাজনীতিক যদি কূটনৈতিক একতা অর্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বাদোগ্লিও, গ্রাণ্ডি প্রভৃতি সুবিধাবাদী রাজনীতিক আর ইটালীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। ইটালীতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পূর্ব্ব ইউরোপের রণক্ষেত্র

পূর্ব্ব য়ুরোপে সোভিয়েট বাহিনীর প্রচণ্ড অভিযান চলিতেছে। ইউক্রেনে তাহারা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে; রুশ সেনা এখন ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ হইতে ৮০ মাইল দূরে উপনীত। নীপারের পূর্ব্ব তীরে জার্মানীর মুষ্টি অত্যন্ত শিথিল হইয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে স্মোলেন্‌স্ক ও গুরুত্বপূর্ণ রেল-জংসন ব্রিয়ান্‌স্ক এখন সোভিয়েট সেনার অধিকারভুক্ত; এই অঞ্চলে জার্মানীর বিমানঘাঁটি রোস্‌লাভ্‌ল সোভিয়েট বাহিনীর পরবর্ত্তী লক্ষ্য। কৃষ্ণসাগরের বিশাল নৌঘাঁটি নভরোসিস্ক রুশ সেনা অধিকার করিয়াছে।

রুশ রণাঙ্গনের বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, আগামী শীতকালে রুশ ভূমি হইতে জার্মানরা সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইবে। এই শরৎকালেই জার্মান বাহিনীর নীপারের পূর্ব্ব তীরে বিতাড়িত হইয়া ক্রিমিয়া, কিয়েভ ও লেনিনগ্রাডের উত্তরে পরিচালিত যুদ্ধ শেষ হইবার সম্ভাবনা।

হিটলার তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, সামরিক কৌশল হিসাবেই তাঁহারা এখন কোন কোন অঞ্চলে রণক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতেছেন। জার্মানী এই নীতি অত্যন্ত বাধ্য হইয়াই অবলম্বন করিয়াছে। গত বসন্তকালেও জার্মানী রুশিয়ায় পুনরায় আক্রমণাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার স্বপ্ন দেখিতেছিল। খারকভ পুনরধিকৃত হইবার পর গত ২১শে মার্চ্চ এক বক্তৃতায় হিটলার বলেন—We have stabilised the front and have taken steps to ensure that in the months to come we shall achieve success. তাহার পর গত জুলাই মাসে জার্মানী আক্রমণাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্তও হইয়াছিল; সোভিয়েটবাহিনীর প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতে সে এখন এইভাবে রণনীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। অবশ্য জার্মানীর প্রতিরোধমূলক রণনীতি এখন সাফল্যের সহিত অনুসৃত হইতেছে বলিতে হইবে; কারণ সোভিয়েট বাহিনী ষ্টালিনগ্রাডের পর আর কোথাও জার্মান সেনাদল নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই।

জার্মান সমর-নায়কগণ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, রণক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিজয়লাভের সম্ভাবনা আর নাই। তাই তাঁহারা রণক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়া দীর্ঘকাল প্রতিরোধ-মূলক সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিতে আকাঙ্ক্ষী। জার্মান রাজনীতিকেরা আশা করেন—দীর্ঘকাল প্রতিরোধ-সংগ্রামের দ্বারা তাঁহারা সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে সন্ধির আগ্রহ সঞ্চার করাইতে সমর্থ হইবেন। ইহা সম্ভব হউক, আর নাই হউক, রণক্ষেত্র হইতে যদি ক্রমাগত পরাজয়ের সংবাদ আসে, তাহা হইলে জার্মানী তাহার নিজ দেশের ও তাহার অধিকৃত দেশের জনসাধারণকে শান্ত আর অধিক কাল শান্ত রাখিতে পারিবে না। এইভাবে জার্মানীর সামরিক হিসাব হয় ত রাজনৈতিক অবস্থার সহিত তাল রাখিতে পারিবে না।

শিশুপুত্র প্রিন্স মাইকেলসহ ডাচেস্ অব কেণ্ট

প্রাচীর যুদ্ধ

প্রায় আড়াই মাস চেষ্টার পর নিউগিনির অন্তর্গত সালামোয়া সম্মিলিত পক্ষ অধিকার করিয়াছেন; লে এখনও অধিকৃত হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের এই তৎপরতা। কিন্তু এখানে তাঁহাদের সাফল্যের গতি অত্যন্ত মন্থর। জাপানও প্রতিরোধ-সংগ্রামের দ্বারা কালহরণের নীতি গ্রহণ করিয়াছে; কারণ

সে জানে, তাহার ইউরোপীয় সহযোগী পরাভূত হইলে সে কখনও একাকী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে পরাভূত করিতে পারিবে না। সম্মিলিত পক্ষের এক একটি স্থান অধিকারে যদি এইভাবে সময় নষ্ট হয়, তাহা হইলে জাপানের প্রতিরোধমূলক সংগ্রামের নীতিই সফল হইয়েছে বলিতে হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের সাম্প্রতিক সাফল্যে ঐ দ্বৈপায়ন মহাদেশের নিরাপত্তা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইলেও এখনও উহা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। রবাউল, বুগান্ভিলে প্রভৃতি স্থানে জাপান এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত।

সম্প্রতি চীনের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ সুং প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাপান পুনঃ পুনঃ চীনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে; সে মাঞ্চুরিয়া ব্যতীত সমস্ত চীন পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ম্যাদাম্ চিয়াং-কাই-সেক্ আমেরিকায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, জাপান এখন কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করিয়া চুংকিং-চীনকে দখলে টানিতে প্রয়াসী হইয়াছে। চীনের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া ম্যাদাম বলেন—জাপানের কূটনৈতিক কৌশল তাহার সামরিক অভিযান অপেক্ষা অধিক আশঙ্কাজনক। মিঃ সুং ও ম্যাদাম্ চিয়াং-এর উক্তি প্রকাশের পর সম্মিলিত পক্ষ ব্রহ্ম-অভিযানে প্রবৃত্ত হইতে নিশ্চয়ই আর বিলম্ব করিবেন না; ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া অবিলম্বে চীনের শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যদি এই বৎসর শীতকালেও ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে প্রাচ্য অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষ অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে পারেন। ১৭।৮।৪৩

দেশ-বিদেশের নামের পরিচয়

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল্

বর্ত্তমান যুদ্ধ আমাদের খুব ভাল ক'রেই ভূগোল পড়াচ্ছে। নিত্যই এমন সব স্থানের নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটছে; এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধ যদি এমন সর্ব্বব্যাপী না হ'ত ত' এদের নাম আমাদের মত সাধারণ লোকের কাছে অজ্ঞাতই র'য়ে যেত। এক এক সময়ে এক একটা এমন অদ্ভুত নাম নজরে পড়ে যার উচ্চারণ নির্দ্ধারণ ক'রতে বেশ কষ্ট হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত সন্দেহ থেকে যায় যা উচ্চারণ ক'রছি তা ঠিক কিনা। নামটি যে ভাষার—সেই ভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকলে তার উচ্চারণ করা ত' সহজ হ'তই, উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে তার একটা অর্থ নির্দ্ধারণ করা হয়ত' অসম্ভব হ'ত না।

'ইটালী'-র কথাই বলি। ইটালী কথাটি আসলে গ্রীক 'ভেটুলিয়া' কথার অপভ্রংশ মাত্র। ভেটুলিয়ার অর্থ গোবৎস বা বাছুরের দেশ। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ইটালীতে মানুষ থাকে না, বাছুরই থাকে। মনে হয় ইটালী এক সময় পশুপালনের জন্য বিখ্যাত ছিল ও গ্রীকরা এই দেশ থেকে বাছুর বহুল পরিমাণে পেত।

'ইরাণ'-এর সঙ্গেও আমরা খুব পরিচিত। 'ইরাণ' চিরকাল 'ইরাণ' নামে পরিচিত ছিল না। অতি প্রাচীনকালে উহা ছিল 'অইর্যানা ভয়েজ'(অ) যার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হ'চ্ছে 'আর্য্যবীজ' অর্থাৎ আর্য্যদের ক্রীড়াভূমি। পরবর্ত্তী যুগে পহ্লবীতে এর রূপ হ'ল 'ইরাণ-বেজ' ও তারও পরবর্ত্তী যুগে উহা হ'ল মাত্র 'ইরাণ'। ইরাণ-এর নামের সার্থকতা আছে। আর্য্যগণ অতি আদিতে—স্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে তবে অনেকে বলেন যে, মধ্য এশিয়ার কোথাও বাস ক'রে পরে তাঁরা দলে দলে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে—ইরাণ অঞ্চলে একটি বিশিষ্ট দল আসে ও পরে এদের মধ্য হ'তে আবার বহু উপদল ভারতবর্ষে আসে। ভারতবর্ষে যারা এসেছে তারা পারস্য—ইরাণ অঞ্চল হ'তেই এসেছে।

'ভারতবর্ষ' নামটী কিন্তু 'ইরাণ'-এর (ইরাণ বলিতে উক্ত শব্দের আদিরূপ বুঝাইতেছি) মত প্রাচীন নয়। ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে রাজা ভরত-এর নামে।

ব্যক্তি বিশেষের নামে দেশের নাম কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। কলম্বস গেলেন ভারতবর্ষের খোঁজে—ভারতবর্ষ-এর খোঁজ না পেলেও তিনি পেলেন আমেরিকার খোঁজ। বেচারা কলম্বস! আমেরিকার নাম তাঁর নামে হ'ল না, হ'ল কলম্বসের খোঁজে যিনি বেরিয়েছিলেন স্পেন দেশীয় সেই আমেরিগো-র নামে।

'পৃথিবী'র সঙ্গে ত' মহারাজা 'পৃথু'র নাম জড়িয়ে আছে।

'ইরাণ' যেমন আর্য্যাবাস বা আর্য্যদের দেশ 'রাজপুতানা'ও ঠিক সেই রকম 'রাজপুত্রাগার' বা রাজপুত্র বা রাজপুতদের দেশ। ঠিক এই ভাবেই 'ভোট'-এর দেশ ভোটানাম বা 'ভূটান'।

'আর্জ্জেন্টাইন'—এদেশে রৌপ্য খনি আগেই বা কত ছিল আর এখনই বা কত আছে সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই; কিন্তু 'আর্জ্জেন্টাইন' কথাটি এসেছে লাটিন আর্জেন্টুম থেকে, যার অর্থ হ'চ্ছে—রৌপ্য।

অনেক সময় নাম থেকে আমরা দেশের সম্বন্ধে একটা ভৌগলিক ধারণা পাই যেমন 'পাঞ্জাব'। পাঞ্জাব কথার অর্থ পঞ্চ আব। আমরা সকলেই জানি পাঞ্জাবের পাঁচটি নদীর কথা।

'মেসোপটেমিয়া' নামটা অদ্ভুত বটে কিন্তু যদি আমাদের ভাষাজ্ঞান থাকত তাহ'লে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এর সম্বন্ধে, এই স্থানটির ভৌগলিক অবস্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে পারতুম। 'মেসো' শব্দের অর্থ—'মধ্য' ও পটেমোস শব্দের অর্থ—'নদী'। 'মেসোপটেমিয়া' এই রকম ক'রে হ'চ্ছে—উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী। মানচিত্র খুললে দেখা যাবে এর একধারে টাইগ্রিস ও অন্যধারে ইউফ্রেটিস এই উভয় নদী প্রবাহিতা। 'মেসোপটেমিয়া' আসলে বর্ণনাত্মক নাম। সংস্কৃতে অনুবাদ করলে এর নাম দাঁড়ায়—অন্তর্বেদী।

'অষ্ট্রেলিয়া'-র কথাই ধরা যাক না! অষ্ট্রেলিয়ার গোড়ার অংশটী এসেছে ল্যাটিন 'অষ্ট্রা' থেকে। 'অষ্ট্রা' কথাটির অর্থ হ'চ্ছে—দক্ষিণ। 'অষ্ট্রেলিয়া' মানে 'দক্ষিণের মহাদেশ' এছাড়া আর কিছুই নয়।

য়ুরোপের মানচিত্র সামনে রেখে 'ইজিয়ান সি'-র নিচের দিকে খুঁজে যান [illegible] 'ডোডেকানীজ' দ্বীপপুঞ্জ। যুদ্ধের গোড়ার দিকে এর নামটা শোনা গিয়েছিল। বলতে পারেন এই দ্বীপপুঞ্জ কতগুলি দ্বীপের সমষ্টি? 'ডোডেকানীজ' কথাটা এককথা নয়, এর প্রথম অংশ 'ডুও' ও পরের অংশ 'ডেকা'। 'ডুও' অর্থে দুই বা দ্বি ও 'ডেকা' অর্থে দশ অর্থাৎ দুই ও দশ একুনে বার। ডোডেকানীজ এইরূপে বারটী দ্বীপ।

অনেক সময় স্থান বা দেশের নামের সঙ্গে দেবতারাও জড়িত থাকেন। ভারতবর্ষে এর উদাহরণ বহু স্থলেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরেও এরকম দেখা যায় একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না।

সংস্কৃত 'ভজন', প্রাচীন পারসীক 'বাগইরন্' ও 'ব্যাবিলন' একই। প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে ব্যাবিলনের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। 'ব্যাবিলন' কথাটির অর্থ দেবতার বা ভগবানের মন্দির। 'বাব' শব্দের অর্থ মন্দির ও ইলু শব্দের অর্থ দেবতা বা ভগবান।

'বোগদাদ' শহরের সঙ্গেও দেবতাকে জড়িয়ে ফেলা হ'য়েছে। 'বোগদাদ'কে সংস্কৃত ক'রলে এর রূপ দাঁড়াবে—ভগদত্ত; প্রাচীন পারসীক ভাষায় বলা হবে 'বগদাত'। 'বগ' অর্থে ভগবান ও 'বগদাত' অর্থে ভগবানের নির্ম্মিত অর্থাৎ বোগদাদ ভগবানের নির্ম্মিত এই আখ্যাই পেয়েছিল—কেন তা কে জানে?

পারসিয়ান গাল্ফ-এর দক্ষিণ দিকে চাইলে মানচিত্রে ছোট অক্ষরে হরমুজ্ বা ওরমুজ্ প্রণালী দেখতে পাওয়া যাবে। এই ওরমুজ্-এর সঙ্গে আর একটী দেবতার নাম জড়িয়ে আছে। প্রাচীন পারসীকদের দেবতা ছিল অহুরমজ্দা, যার সংস্কৃত হ'চ্ছে অসুরমেধা। এই অহুরমজ্দা-রই অপভ্রংশ হ'চ্ছে ওরমুজ্।

অক্ষশক্তির অন্যতম ইটালীকে প্রথম উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার ক'রেছি, এবার পূর্ব্ব ভূভাগে যারা ব'সে আছে তাদের কথাই বলা যাক্।

ওদের আমরা জাপানী ব'লেই জানি। জাপান দেশের লোক ওরা, সেই কারণেই ওদের জাপানী বলা হবে এত' খুব সহজ কথা; কিন্তু মুস্কিল হ'চ্ছে এই যে, এই ক বছর আগে জাপান থেকে যারা খেলতে এসেছিল' শুনেছি তাদের জামায় ইংরাজি 'N' (এন্) লেখা ছিল। জাপান থেকে যারা দেশের প্রতিনিধি দল হ'য়ে আসছে তাদের জামায় 'J' লেখা থাকাই উচিৎ ছিল নাকি?

না—তা নয়। জাপানীরা তাদের দেশের নাম বলে 'নিপ্পন'। জাপান নাম দিয়েছে বাইরের লোক।

'জ্যাপ জাপান'—এক রকম কাল রং। যে কোন ভাল রংএর দোকানে পাওয়া যাবে। এই রংএর উপাদান র'য়েছে যে গাছে সেই গাছের নাম জাপান। বহির্দেশীয় বণিকেরা দেশ না চিনে তাদের বাণিজ্যের উপাদানই বেশী ক'রে চিনলেন; ফলে গাছের নামে দেশের নাম হ'ল জাপান (১)।

জাপানীরা বলেন তাদের দেশের নাম 'নিপ্পন'। নিপ্পন কথার অর্থ সূর্য্যোদয়ের দেশ। এ নামও কিন্তু দান করা। কোরিয়াবাসীরা সকালে দেখত, সূর্য্যোদয় হ'চ্ছে পূবে। যেখানে প্রথম সূর্য্যকে দেখত সেই দেশকেই তারা নাম দিলে সূর্য্যোদয়ের দেশ (২)। জাপানের পতাকাও সূর্য্যাঙ্কিত।

১-২। জাপান ও নিপ্পন সম্বন্ধে এই তথ্য আমি প্রথম পাঠ করি বহুপূর্ব্বে একটি বাংলা সাময়িক পত্রিকায়—এই পত্রিকার নাম স্মরণ ক'রতে না পারার অক্ষমতার জন্যে দুঃখিত।

এই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি মহাশয়ের নিকট অশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অবদমন (Repression)

যাদুকর পি-সি-সরকার

সুপ্রসিদ্ধ মনোবিদ্ ফ্রয়েড কর্তৃক আবিষ্কৃত মনঃসমীক্ষণ (বা ইংরাজীতে সাইকো-এ্যানালিসিস) মনোবিজ্ঞানে যুগান্তর আনিয়াছে। এ যাবৎকাল মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্বাভাবিক মানুষের মনের জাগ্রত চৈতন্য অবস্থা লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু ফ্রয়েড সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে চৈতন্যের দিক দিয়া বিচার করিলে মনকে তিনটি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা জাগ্রত চৈতন্য (Conscious state), মগ্নচৈতন্য (Sub-Conscious state) ও সুপ্ত চৈতন্য (unconscious state). এই সম্পর্কে মনকে সমুদ্রে ভাসমান বরফের পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে—যাহার মাত্র একতৃতীয়াংশ লোক চক্ষুর অন্তর্গত এবং বাকী অধিকাংশ জলমগ্ন এবং লোকচক্ষুর বহির্ভূত। জাগ্রত চৈতন্য অবস্থা মানুষের সহজ জ্ঞানদ্বারা বিচার করা সম্ভবপর, অন্তর্দৃষ্টি (Introspection) দ্বারা মগ্ন চৈতন্য অবস্থাও কিছুটা বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু সুপ্ত চৈতন্য অবস্থা উপযুক্ত মনঃসমীক্ষণ ব্যতীত বুঝা যাইবে না। পূর্ব্বকালে মনোবিদ্‌গণ তাঁহাদের গবেষণা শুধু জাগ্রত চৈতন্য পর্য্যবেক্ষণেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন কিন্তু তাহা কখনও নির্ভুল হইতে পারে না; কারণ ফ্রয়েড প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে মনের জাগ্রত চৈতন্য অবস্থা উহার মগ্নচৈতন্য ও সুপ্তচৈতন্য উভয় অবস্থা দ্বারা বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত হয়। কাজেই জাগ্রতচৈতন্য সম্বন্ধে নির্ভুল গবেষণা করিতে হইলে মনের অপর দুই স্তর সম্বন্ধে প্রথম বিচার করিতে হইবে। মনোবিদ্‌গণ বলেন মানুষের জীবনে বৃত্তি (instinct)র প্রভাব অসামান্য এবং পশুর ন্যায় তাহারাও বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। তাঁহারা মনকে ভিন্নভাবে বিভক্ত করিলেও যৌক্তিকতা বা বুদ্ধিশক্তির প্রভাব মনের উপর অধিক পরিমাণে বিদ্যমান এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের সত্তা শুধু এই যৌক্তিকতা বা বুদ্ধিশক্তির উপরই নির্ভর করে না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানই প্রমাণ করিয়াছে যে ইহা সত্য নহে। মানুষ যে সমস্ত বিষয় চিন্তা করে অর্থাৎ মানুষের জাগ্রত চৈতন্য মনে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হয় সেজন্য বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা মগ্নচৈতন্য ও সুপ্তচৈতন্য স্তরই বিশেষভাবে দায়ী। যে শক্তি দ্বারা এই নিয়ন্ত্রণ হয় তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ভাবগ্রন্থি বা "কমপ্লেক্স"। সহজ কথায় এই ভাবগ্রন্থিকে মানবমনের গোপন প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে। কারণ উহা এমন অনেকগুলি ধারণার সমষ্টি যাহার সহিত মানবমনের একটা মূলগত অনুরাগ বা বিরাগ আছে। এইজন্যই ভাবগ্রন্থি জাগ্রতচৈতন্যকে আমূল নিয়ন্ত্রিত করে, অথবা কখনও কখনও মানসিক বিকারের সৃষ্টি করে। ফ্রয়েড দেখাইয়াছেন যে এই কমপ্লেক্সগুলির উৎপত্তি হয় শিশুকালে এবং চিরদিন অবচেতনলোকে অবস্থান করিয়া জাগ্রতচৈতন্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু মজা এই যে—মানুষের ভাবগ্রন্থিদ্বারা যে তাহার জাগ্রতচেতনা প্রভাবান্বিত হয় ইহা তাহারা স্বীকার করিতে চাহে না। মনোবিদ্‌গণ প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহার মূলে রহিয়াছে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহ (instinct)। ভাবগ্রন্থি বা কমপ্লেক্সগুলির মূল প্রকৃতি অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে উহা উক্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রাণী হিসাবে মানুষ অপর প্রাণীর ন্যায় প্রধানতঃ আত্মরক্ষা (self preservation) ও যৌন (Sex) এই দুই প্রবৃত্তির অধীন হইলেও সামাজিক প্রাণী হিসাবে মানুষের আরও একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে ইহার নাম দলপ্রবৃত্তি (Herd instinct)। প্রথমোক্ত প্রবৃত্তি দুইটি ব্যক্তিগত এবং তৃতীয়টির প্রধান লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে সমাজের স্বার্থ। কারণ প্রথম প্রবৃত্তি দুইটি ব্যক্তিবিশেষের জীবনধারণের প্রধান উপায়। এইজন্য কখনও কখনও প্রথমোক্ত দুই প্রবৃত্তি এবং শেষোক্ত প্রবৃত্তিতে বিরোধ উপস্থিত হয়। বিশেষ করিয়া যৌন প্রবৃত্তি সংশ্লিষ্ট ভাবগ্রন্থি ও সামাজিক প্রবৃত্তিজাত ভাবগ্রন্থির বিরোধিতা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। সেইজন্য মানুষ সামাজিক শিক্ষার ফলে যতবেশী সামাজিক ব্যক্তিরূপে পরিণত হইতে থাকে ততই তাহাদের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিসমূহ খর্ব্ব হইতে থাকে এবং এখানেই দুই দলের ভাবগ্রন্থির বিরোধিতা আরম্ভ হয়। কোনটিই সহজে হার মানিতে চাহে না। ইহাকেই মনোবিজ্ঞানে ভাবগ্রন্থির বিরোধ বা conflict বলা হইয়াছে। এই বিরোধ তুমুল অশান্তির সৃষ্টি করে। মন কিছুক্ষণ একবৃত্তির অধীন চলিল তারপর অপর বৃত্তির অধীন চলিল—এই অশান্তির ভার মানব মনে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিয়া দেয় এবং এই বিচ্ছিন্নতা (dissociation) মনের ঐক্য (unity) নষ্ট করিয়া দেয়। কারণ এক সত্তার স্থলে পরস্পর স্বতন্ত্র সত্তার আবির্ভাব হয়। একজন যাদুকর

রক্ষককে সচরাচর মিথ্যাকথা বলে, মামলা সংক্রান্ত বিষয়েও অনুরূপ করে, কিন্তু পারিবারিক জীবনে এবং বন্ধু বান্ধবদের প্রতি খুবই ভদ্র, মিষ্টভাষী ও সত্যবাদী। এখানে একই ব্যক্তির মনে রহিয়াছে দুইটি পরস্পর-বিরোধী বৃত্তির সংগ্রাম। মনোবিদ্‌গণ দেখিয়াছেন যে মানুষের মনে এইভাবে বহুবিধ বৃত্তির সংগ্রাম সর্বক্ষণ এবং উহা মনের স্বাস্থ্য ও উন্নতির পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। সুতরাং এই বিরোধের একটা আপোষ মীমাংসা প্রয়োজন। কিন্তু ভাবপ্রবৃত্তিগুলি এক একটি জড়শক্তি (forces) স্বরূপ, কাজেই ইহার সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন অসম্ভব। সেইজন্য স্বাভাবিক জীবনে মানুষ তাহাদের সমাজবিরুদ্ধ ভাবপ্রবৃত্তিকে সামাজিক ভাবপ্রবৃত্তি দ্বারা চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। মানুষ জোর করিয়া চেতনস্তর হইতে অস্বস্তিকর চিন্তাধারাগুলিকে চাপিয়া রাখে। ইহারই নাম অবদমন (Repression) বা জোর করিয়া মনের চেতনস্তর হইতে কোন ভাবপ্রবৃত্তির ক্রিয়া দমন করা বা সরাইয়া দেওয়া। যদি সেই দমিত চিন্তাধারা অবচেতনলোকে থাকে এবং পুনরায় জাগ্রত না হয় তখন অবদমন (repression) কার্য্যকরী হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু দমন করা ও ধ্বংস করা এক কথা নহে। যাহাকে দমন করিয়া রাখা যায় সেইটিই পুনরায় সুযোগ পাইয়া মনের মধ্যে উঠিয়া আসিতে চেষ্টা করে এবং মনে প্রবল অশান্তির সৃষ্টি হয়। জড়শক্তি যেমন কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিয়া নিজেকে প্রকাশ করে সেইরূপভাবে জাগ্রতচৈতন্য হইতে বিতাড়িত কমপ্লেক্সসমূহ মনের অবচৈতন্য ও মগ্নচৈতন্য লোকে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশে চেষ্টিত থাকে। ইহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মানুষের যৌক্তিকতা ও সামাজিক বুদ্ধি সর্ব্বদাই সতর্ক প্রহরীর ন্যায় সেই অবদমনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতেছে। যুক্তির দ্বারা সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইলে বিরুদ্ধবৃত্তির অবদমন করা সহজসাধ্য হয়। কিন্তু চোর অনেক সময় সাধুর ছদ্মবেশে যেরূপভাবে গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করে সেইরূপ অসামাজিক ভাবপ্রবৃত্তিগুলি সামাজিকতার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ফ্রয়েড ও তাঁহার অনুসরণকারী মনোবিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন যে আমরা শিল্প সাহিত্য প্রভৃতির নানারূপ বিভিন্ন সৃষ্টি দেখিতে পাই তাহা দমিত ভাবপ্রবৃত্তির সামাজিক উপায়ে প্রকাশ চেষ্টার ফল। অবদমিত ব্যাপার সোজাসুজি উপস্থিত না হইয়া অন্য কোন গৌণ উপায়ে আত্মপ্রকাশ করে ইহার উদাহরণ আমরা প্রত্যহই পাইতেছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ ভ্রম প্রমাদ, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে প্রচলিত ঠাট্টা, তামাসা, ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গরচনাপ্রীতি প্রভৃতি দ্বারা আমাদের মগ্ন চৈতন্য ও অবচৈতন্য স্তরে অবস্থিত দমিত ভাবপ্রবৃত্তির প্রকাশ অভিলাষ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। মনোবিদ্ ডাক্তার বার্ণার্ড হার্ট প্রদত্ত একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতেছে। একজন ভদ্রলোক তাঁহার বন্ধুর সহিত একটি গির্জ্জার পার্শ্ব দিয়া বেড়াইবার সময় সেই গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পান। কিন্তু গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিবামাত্র ভদ্রলোকটি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—ঘণ্টাধ্বনি বিশ্রী বিকট আওয়াজ করিয়া কোলাহলের সৃষ্টি করিতেছে মাত্র, ইহাতে কোনরূপ তাল নাই ইত্যাদি। এই কথায় তাঁহার বন্ধু অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন কারণ গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। অনেক প্রশ্নের পর সমস্ত রহস্যের সমাধান হইল। এই ভদ্রলোকটির কবিতা লেখার অভ্যাস আছে এবং ঐ গির্জ্জার পাদ্রীরও কবিতা লেখার অভ্যাস আছে। একবার একটি পত্রিকাতে উভয় ব্যক্তির কবিতার সমালোচনা প্রকাশিত হয়; তাহাতে এই ভদ্রলোক লিখিত কবিতাগুলির খুবই নিন্দা করা হয় কিন্তু পাদ্রীর কবিতাগুলি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। ইহাতে এই ভদ্রলোক পাদ্রীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু অসামাজিক বলিয়া এই অসন্তুষ্টিজনিত কমপ্লেক্সটিকে ভদ্রলোক অবদমন করেন। ভদ্রলোক এই আসল ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অবদমিত কমপ্লেক্সটি বর্ত্তমানে অন্য উপায়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তিনি গির্জ্জার ঘণ্টা শুনিলেই রাগ করিয়া উঠেন। এইরূপভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও অনেক অবদমন ঘটিতে পারে। যেখানে আমরা আসল ঘটনা ভুলিয়া যাইয়া হয়ত কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির উপর অযথাই রুষ্ট হই ও গালাগালি আরম্ভ করি। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—যে কোন অবদমিত কমপ্লেক্সই এই কাণ্ড ঘটাইয়া পরোক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। ইরিন নাম্নী একটি বালিকা অনেকদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তাহার মাতাকে শুশ্রূষা করে কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া মাতার মৃত্যু হয়—ইহার ফলে সে অত্যন্ত মানসিক আঘাত পায়। বাড়ীর দৈনন্দিন কার্য্য যেমন সেলাইকরা রান্নাকরা প্রভৃতি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতে করিতে হঠাৎ সে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া পড়িত এবং তাহার রুগ্না মাতার সেবা শুশ্রূষা ও মৃত্যু ঘটনার সংশ্লিষ্ট ব্যাপার সমূহের হুবহু অভিনেত্রীর ন্যায় পুনরভিনয় করিত। এইরূপ করিবার সময় সে সাংসারিক প্রভৃতি সমস্ত কাজকর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইত, কিন্তু কিছুকাল পরে জাগ্রত হইয়া পুনরায় দৈনন্দিন কাজে মন নিয়োগ করিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সে এই অস্বাভাবিক ঘটনার বিষয় কিছুই বলিতে পারিত না; এমন কি তাহার মাতার মৃত্যু ঘটনা সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ, সমস্ত অবদমন জন্য তাহার জাগ্রত চৈতন্য হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। তাহাকে সকলেই 'পাগল' হইয়াছে বলিতেন। ইহার মূলেও ঐ অবদমনের ক্রিয়া। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবদমন কার্য্যকরী হইয়া নির্দ্দোষভাবে বা সমাজবিরোধী না হইয়া কাজ করিয়া চলে, ততক্ষণ সমাজ সমস্ত সহ্য করে। কিন্তু যখনই অবদমন সম্পূর্ণ কার্য্যকরী না হইয়া হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া সমাজের আইনবিরুদ্ধ কার্য্যাবলী করিতে থাকে তখনই সমাজ তাহাকে 'উন্মাদ' বলিয়া আখ্যা দেয়। সমস্ত মানসিক রোগেই চৈতন্যবিচ্ছেদ ঘটে, এই চৈতন্যবিচ্ছেদ কোন বিশেষ 'কমপ্লেক্স'কে সার্ব্বজনিকভাবধারার সহিত সংযুক্ত না রাখার ফল।

অবদমন কার্য্যকরী না হইলে দমিত চিন্তাধারা সোজাসুজি মনো-চেতনস্তরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তাহাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিতে হয়। অনেকে এই সময় নানাপ্রকার গবেষণা অথবা জনহিতকর কাজ অথবা অসামাজিক কার্য্যে মন নিয়োগ করে। ক্রমে হতাশ হইয়া অনেককে যুদ্ধে যাইতে বা কখনও কখনও আত্মহত্যা করিতে দেখা যায়। অনেকে আবার—যাহারা বহিঃস্থানকে না পাইয়া অবদমনকে কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে গবেষণা অথবা পড়াশুনা কার্য্যে অতিশয় মনোযোগী হইতে থাকে। কেউ বা এইরূপ অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া সুরাপান করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে অল্পকালের জন্য বিস্মৃতি আসিলেও পরে কিন্তু ফাঁক পাইলেই ঐ দমিত চিন্তা মাথা নাড়া দিয়া উঠিতে চেষ্টা করে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বর্ণিত দেবদাসের নাম এখানে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। পার্ব্বতীকে ভুলিবার জন্য দেবদাস বহু চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে সুরাপান আরম্ভ করে এবং তাহাতেই যকৃৎদুষ্ট হইয়া শেষে মারা যায়। মনোবিদ্‌গণ বলেন অবদমন করা অনুচিত। দমিত দুঃখ (suppressed grief) হইতে অনেক সময় নানারূপ দুরারোগ্য কুৎসিৎ ব্যাধি হইতে দেখা যায়। উপযুক্ত মানসিক চিকিৎসক মনঃসমীক্ষণদ্বারা সমস্ত দিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলে এই সমস্ত ব্যাধি আরোগ্য হয়। যুক্তির দ্বারা সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইলেই অবদমন কার্য্যকরী হইবে। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকে যদিও বলেন যে অবদমন করা অহিতকর কিন্তু পৃথিবীতে বাস করিতে হইলে অবদমন একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্যক্তির উপর সমাজের দাবী অস্বীকার করা যায় না, ঠিক সেইভাবে সমাজের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যুক্তি লইয়া সমস্ত সমস্যার সমাধানে চেষ্টিত হইতে হইবে। তবেই অবদমন কার্য্যকরী হইবে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করিবে।

শ্রীঅরবিন্দম্

নরেন্দ্রদেব

(ত্রিসপ্ততিতম জন্মোৎসবে)

শ্রীঅরবিন্দ

স্মৃতির পরিধি আজি ক্ষীণ ।
—তবু মনে পড়ে সেই প্রথম যেদিন
তোমারে দেখিয়াছিনু কলেজ অঙ্গনে
দুঃসহ-শাসিত এক দুর্যোগের দীপ্ত শুভক্ষণে ।
সেদিন কিশোর মোরা অধীর-চঞ্চল—
চূর্ণ করিবারে ব্যগ্র চরণ-শৃঙ্খল ;
অশান্ত সে অর্বাচীন বিদ্রোহেরে করিতে দমন
চলেছিল দেশব্যাপী লাল-দেব উগ্র উৎপীড়ন,
নির্যাতিত নিষ্পেষিত বিদলিত তরুণের মন .
নিরুপায়ে রুদ্ধ ক্ষুব্ধ রোষে
দুর্জয় পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রসম ব্যর্থতায় ফোঁসে ।
সেদিন তাদের তুমি দিয়াছিলে নবীন সন্তোষ,
যৌবনের সে দুরন্ত দুর্বার বিরোধ
পেয়েছিল খুঁজি সার্থকতা ।
শুনি তব অভিনব আশার বারতা
মন্ত্র শান্ত ভুজঙ্গের মত,
পদপ্রান্তে হয়েছিল নত ।
মৃত্যু-ব্রতে দীক্ষা তব জেগেছিল তাদের অন্তরে ।
নবীন জগতে তুমি এনেছিলে নব যুগান্তর !
জননীর মুক্তির স্বপনে
প্রাণ দিতে এল জনে জনে ।
তুমি সেই মহাযজ্ঞে ছিলে পুরোহিত ;
কৃশ তনু, খর্বকায়, শ্যামবর্ণ, চাপল্য-রহিত,
অন্তরে কোমল,
দুটি পদ্ম আঁখি প্রান্তে কী প্রশান্ত গভীর অতল
ভারতের মুক্তি লাগি সর্বত্যাগী হে অনন্যমন,
সেদিন তোমার মাঝে দেখেছিনু দিব্য-সম্ভাবনা !

তারপরে গেছে দিন, গেছে কত দুর্যোগের রাত ;
উত্তাল-করাল-ঝঞ্ঝাবাত—
জীবনের ভিত্তিমূলে দিয়েছিল নাড়া ;
সহসা আহ্বানে কার দিলে তুমি সাড়া ;
বরি' নিলে স্বেচ্ছা-নির্বাসন,
সুদূর দক্ষিণে সিন্ধু তীরে বিছাইয়া যোগীর আসন
ধ্যানমগ্ন হয়েছিলে স্বদেশের মুক্তি সাধনায় ।
সে আরাধনায়,
চাহনি আপন মোক্ষ, আত্মসিদ্ধি নহে কাম্য তব তপস্যার
তোমার আকাঙ্ক্ষা ছিল সমাজের বিপুল উদ্ধার !
জাতির উন্নতি লাগি কী কঠোর করিলে প্রয়াস
এই নরদেহে চাহি দেবতার প্রত্যক্ষ প্রকাশ—
বহু বর্ষ গোঙাইলে সংগোপনে একান্তে নীরবে ;

ঈশ্বর করিবে তুমি ধরণীর নশ্বর মানবে—
তব কৃচ্ছ্র তপস্যার এই নবদান
জনে জনে হবে ভগবান
এই বার্তা রটি গেল যবে,
কি জানি সে কবে
দূর হয়ে গেল যত ভৌগলিক সীমা সংকীর্ণতা ;
'দৈবী-জীবনে'র সেই লোকোত্তর নূতন বারতা
দেশে দেশে লভিল প্রচার
মুক্ত মানবের ভীড়ে ভরি গেল তোমার দুয়ার ।
আশ্রম স্থাপিল তারা তব পুণ্য নামে
প্রতিষ্ঠিতা হ'ল 'মাতা' ভাগবতী সেই মহাধামে ;
সেই সে 'যুগল রূপ !' সনাতনী 'গুরু' আর 'চেলা'—
দর্শনে প্রণামে—ধ্যানে—কর্মে ধর্মে শুরু হল খেলা !

দীর্ঘ দুই যুগান্তের পারে ;
আমি গিয়াছিনু বহু কল্পনায় হেরিতে তোমারে ।
যোগ-সিদ্ধ তুমি নাকি আজ,
জ্যোতির্ময় দিব্যরূপে সুখাসনে করিছ বিরাজ ;
কত কথা শুনি ভক্ত মুখে,—
ভাবিতাম আজ তুমি অধ্যাত্ম-তপস্যা লভ সুখে ।
জাতির বেদনা আর পরাধীন স্বদেশের মায়া
পারে না স্পর্শিতে বুঝি যোগ-বর্মে ঢাকা তব কায়া ;
ভুলিয়াছ' জন্মভূমি—কাঁদে সে যে আজও আর্ত স্বরে !
বিরূপ অভিমান জমেছিল তাই তব 'পরে ;
বিপুল আক্রোশ ছিল পুঞ্জীভূত মনে এতদিন !
যোগ-সিদ্ধ কি অসিদ্ধ নাহি জানি হে যোগী প্রবীণ,
শুধু স্নিগ্ধ দৃষ্টি হেরি—শান্ত স্মিত হাস্যভরা মুখ—
জুড়াইয়া গেছে হিয়া, আশ্চর্য সেই ক্ষুব্ধ বুক ।
নিঃশব্দ তোমার বাণী পশিয়াছে আজি মোর কানে,
বুঝিয়াছি—সুখ দুঃখ স্বর্গ মর্ত্য দেবতা-দানব—
সবাই এইখানে !

সাময়িকী

বাজারের অবস্থা—

১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকা নিম্নলিখিত সংবাদগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—(১) ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে কাকদ্বীপের বাজারে চাল, ধান কিছুই নাই (২) কুড়িগ্রামের বাজারে চাল নাই—পূর্ব্ব হইতেই আটা ও ময়দা ছিল না (৩) ৯ই ও ১০ই সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের বাজারে আদৌ চাল ছিল না (৪) চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে বাগেরহাট বাজার হইতে চাউল একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে (৫) গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট ১৬ টাকা মণ দরে কুমিল্লার বাজারে কোন চাল পাওয়া যায় না। ভাল আউশ চাল ৭০ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। (৬) চাঁদপুরের বাজারে চাল নাই (৭) ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি এ পর্য্যন্ত ৭০টি মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে—ঐ সকল শব পথে পড়িয়াছিল—তাহাদের আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না। এইরূপ সংবাদ প্রত্যহ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে খাদ্যশস্য বাঙ্গালায় আসিতেছে, তাহা কোথায় যাইতেছে?

নূতন বাজেট—

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী বাঙ্গালার ১৩৫০-৫১ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, ১৩৪৯-৫০ সালে আয় হইয়াছে ১৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৭ হাজার। ব্যয় হইয়াছে ১৭ কোটি ৭০ লক্ষ ১৬ হাজার। ঘাটতি হইয়াছে ২৩ লক্ষ ১৯ হাজার। ১৩৫০-৫১ সালে আয় ধরা হইয়াছে ১৮ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮৯ হাজার। ব্যয় ধরা হইয়াছে ২২ কোটি ৮০ লক্ষ ৫৭ হাজার। ঘাটতি হইবে—৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬৮ হাজার। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে বিপন্নদের সাহায্যের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহার ফলেই এত বেশী ঘাটতি হইয়াছে। রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে কত ব্যয় হইবে, তাহা এখনও ঠিক করা সম্ভব হয় নাই, কাজেই ঐ বাবদ কোন ব্যয় বাজেটে ধরা হয় নাই। তবে উহাতে প্রচুর ব্যয় হইবে এবং তাহার জন্য পরে অতিরিক্ত বরাদ্দ পেশ করা হইবে। দুর্ভিক্ষ সাহায্য বাবদ গত বৎসর ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে—এ বৎসর ঐ বাবদ ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। বর্ত্তমান দুঃসময়ে কি ইহা অপেক্ষা অধিক টাকা এই বাবদে ব্যয় করা সম্ভব হইবে না?

দুর্নীতি ও ঘুস দমন—

যুদ্ধ সংক্রান্ত কণ্ট্রাক্ট ও সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে দুর্নীতি ও ঘুষের প্রাবল্য দেখিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট একটি অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ আইন ও আদালতের দ্বারা যে সব অনাচার সহজে দমন করা সম্ভব হয় না, এই অর্ডিনান্স অনুযায়ী ব্যবস্থা দ্বারা তাহা নিরাকরণ সম্ভব হইবে। এই ব্যবস্থা সামরিক বিভাগ সম্বন্ধে হইয়াছে। কিন্তু অসামরিক সরবরাহের ব্যাপারেও অনুরূপ ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ শুনা যাইতেছে। এ বিষয়ে কি কর্ত্তৃপক্ষের কোন কর্ত্তব্য নাই?

কৃষি আয়কর বিল—

গত ১২ই সেপ্টেম্বর রবিবার কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক জনসভায় বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিলের প্রতিবাদ করা হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন, সাধারণ বিক্রয়কর ও পাট বিক্রয়কর হইতে গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক প্রায় দেড় কোটি টাকা আয় হয়। উহা জাতিগঠনমূলক কাজে খরচ করিতে হইবে, ইহাই ছিল আইনের উদ্দেশ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্যে ঐ টাকা খরচ করা হয় না। কৃষি-আয়করও ঐরূপ জাতিগঠন কাজে ব্যয় করা হইবে না, ইহা বলা যাইতে পারে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যয়ভার বহন করা উচিত। প্রধানত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে এই কর দিতে হইবে। তাহাদের আয় সামান্য। বর্ত্তমানে তাহাদের চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই তাহাদের উপর নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা সঙ্গত হইবে না।

ভাবী বড়লাটের ভাষণ—

১৪ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে এক ভোজ সভায় ভারতের ভাবী বড়লাট ফিল্ডমার্শাল ভাইকাউণ্ট ওয়াভেল ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতের সৈন্য ও অস্ত্রসম্ভার পাঠাইয়াই মিশর, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, ইরাক ও পারস্যে ইংরাজ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। জাপানের সহিত যুদ্ধেও ভারতীয়দের সাহায্যই বৃটিশকে জয়ী করিবে। সে জন্য তিনি ভারতের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক সমস্যা এবং খাদ্যসমস্যার সমাধানে বিশেষ মনোযোগী হইবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ আশার কথা আমরা পূর্ব্বেও বহুবার শুনিয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই। তাহা হইলেও লোক আশায় বাঁচিয়া থাকে; আমরা যদি খাদ্য সঙ্কটে না মরিতে পারি, তবে বড়লাটের প্রদত্ত আশায় নির্ভর করিয়া জীবিত থাকিব।

নীলফামারীর অবস্থা—

রংপুর নীলফামারি হইতে ১৭ই সেপ্টেম্বর খবর আসিয়াছে—তথায় গত কয়দিন মোটেই চাল, আটা, ধান, ময়দা কিছুই পাওয়া যায় নাই। অনাহারে প্রত্যহ বহু লোক মারা যাইতেছে পথের উপর সর্ব্বত্র মৃতদেহ পড়িয়া আছে।

কচুরী পানা আক্টের ব্যবস্থা—

কচুরী পানার হাত হইতে শস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা সরকার বঙ্গীয় কচুরী পানা আইন সর্ব্বপ্রথম ঢাকা জেলার আড়িয়াল বিলে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ঢাকার কলেক্টার ১ লক্ষ লোকের উপর প্রাথমিক নোটিশ জারি করিয়াছেন। শস্যক্ষেত রক্ষার উদ্দেশ্যে কচুরি পানা যাহাতে নড়াচড়া করিতে না পারে তজ্জন্য পঞ্চাশী কাঠ দিয়া ২৪ মাইল দীর্ঘ একটি বেড়া দেওয়া হইবে। তজ্জন্য ১৯৪৩-৪৪ সালে আনুমানিক ২০১৬৪৫ টাকা ব্যয় হইবে। এই বেড়ার ভিতর যাহাদের জমি থাকিবে সেই কৃষকদিগকেই এই ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে।

বিধ্বস্ত স্থানে ধানের চারা রোপণ—

দামোদর বন্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চলে নূতন করিয়া ধানের চারা রোপণের ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার কৃষি বিভাগের একজন অফিসারকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ভারত সরকার বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে বাঙ্গালা সরকারকে প্রচুর আমনধানের বীজ ও চারা দিবেন আশ্বাস দিয়াছেন।

নিমন্ত্রণ নির্দ্দেশ—

বাঙ্গালার সরকার এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে অতঃপর আর কোন ভোজে ৫০ জনের অধিক লোককে নিমন্ত্রণ করা চলিবে না। এই দারুণ অন্নকষ্টের দিনে এই আদেশ দ্বারা লোক উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

অনশনে মৃত্যুর খবর—

প্রত্যহ কলিকাতার রাজপথে ও হাসপাতালসমূহে কতজন অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে বা কতজন আশ্রয় লাভ করে, এতদিন গভর্ণমেণ্ট তাহা প্রকাশ করিতেছিলেন। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে অতঃপর আর ঐ হিসাব প্রকাশ করা হইবে না। লোক এতদিন মৃত্যুর হার দেখিয়া বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছিল। এখন আর তাহা বুঝা যাইবে না। ইহার ফলে সংগৃহীত সাহায্যের পরিমাণ হয় ত কমিয়া যাইবে। দুঃখ-দুর্দ্দশার হিসাব দেখিলে লোকের মন গলিয়া যাইত—এখন আর তাহা সম্ভব হইবে না। এই হিসাব প্রকাশ বন্ধের উপদেশ কে দিয়াছেন, জানি না। তবে তিনি যে চিন্তা না করিয়াই এই কাজ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চাউল ক্রয়—

সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে গত ৯ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ২৪ টাকা মণ দরে ২৫ হাজার মণ চাউল কলিকাতায় ক্রয় করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট এই চাউল লইয়া কি করিবেন বা কি করিয়াছেন সেই প্রশ্নই আজ সকলের মনে জাগিতেছে। এই চাউল কে বিক্রয় করিয়াছে? যাহারা বিক্রয় করিয়াছে, তাহারাই বা এই চাউল পাইল কোথায়? কতদিন পূর্ব্বে বিক্রেতারা এই চাউল সংগ্রহ করিয়াছিল এবং কত দরেই বা তাহারা উহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট এত কড়াকড়ি করিয়া আইন করা সত্ত্বেও এই চাউল ছিল কোথায়? এই সব প্রশ্নের উত্তর যদি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে লোক তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবে।

নিরন্ন অপসারণ—

গত ১০ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে দ্বিতীয় দফায় ১১১জন নিরন্ন ব্যক্তিকে হাওড়া জেলার ডোমজুড়ে 'আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে' লইয়া যাওয়া হইয়াছে। প্রথম দফায় ১১৪জনকে গত ৮ই সেপ্টেম্বর ২৪পরগণা আমডাঙ্গায় 'আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে' লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখান হইতে ক্রমে তাহাদিগকে নিজ নিজ বাসস্থানে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—

১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি নিম্নলিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। (১) আই-এ ও আই-এস্-সি—১৪ই ফেব্রুয়ারী (২) ম্যাট্রিকুলেশন—১৬ই মার্চ্চ (৩) বি-এ ও বি-এস্-সি—২২শে মার্চ্চ (৪) এল্-টি ও বি-টি—১৭ই এপ্রিল (৫) বি-কম্—৮ই মে।

কলিকাতায় মৃত্যু—

গত ১৬ই আগষ্ট হইতে ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কয়দিনে কলিকাতার পথে ৩০২জন এবং হাসপাতালসমূহে ২৭৩জন লোক অনশনজনিত রোগে মারা গিয়াছে। গড়ে প্রত্যহ অনাহারে কলিকাতায় ৩১জন লোক মারা যাইতেছে।

খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা—

বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার জে-পি শ্রীবাস্তবের উপর পূর্ব্বে খাদ্য ও সিভিল ডিফেন্স উভয় বিভাগের কার্য্যভার দেওয়া ছিল। বর্ত্তমানে খাদ্য সরবরাহ সমস্যা সঙ্কীর্ণ হওয়ায় তাঁহার উপর শুধু খাদ্য বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। রক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার ফিরোজ খান নুনের উপর সিভিল ডিফেন্স বিভাগেরও ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

মেয়র ফণ্ড প্রতিষ্ঠা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদিগের এই সভায় স্থির হইয়াছে যে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে সাহায্য দানের জন্য শীঘ্রই 'মেয়র ফণ্ড' খোলা হইবে। স্যার হরিশঙ্কর পাল উক্ত ধনভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ হইবেন।

বড়লাটের প্রতি উপদেশ—

বড়লাটের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য স্যার জগদীশপ্রসাদ এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—বাঙ্গালায় এবারে যেরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, কখনও সেরূপ দুর্ভিক্ষ হয় নাই। বড়লাট ও তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যদিগের উচিত—সকলে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়া নিজ চক্ষুতে বাঙ্গালার অবস্থা দেখা ও তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা করা। শুধু ইস্তাহার প্রচার করিয়া কোন লাভ হইবে না—সত্বর কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। যে বাঙ্গালাকে সৈন্যকেন্দ্র করিয়া জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, সেই বাঙ্গালা হইতে যাহাতে সত্বর দুর্ভিক্ষ দূর হয়, সে বিষয়ে সকলকেই অবহিত হইতে হইবে।

কলিকাতার পথের দৃশ্য—

ফটো—তারক দাস (অমৃতবাজার পত্রিকা)

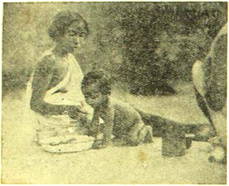

খাবার মিলিয়াছে, তাহাতে শিশুর আনন্দ প্রকাশ

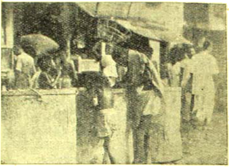

ময়লার মধ্য হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া
লোকেরা তাহা ভক্ষণ

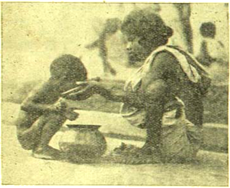

খিচুড়ি পাইয়া মাতা শিশুকে তাহা খাওয়াইতেছে

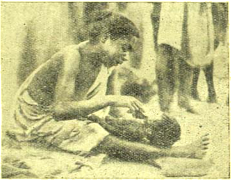

খাদ্যাভাবে মৃত পুত্রকে—স্নেহরতা মাতা কর্তৃক
বৃথা খাওয়ানের চেষ্টা

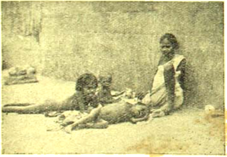

খাদ্যাভাবে জীর্ণ শীর্ণ শিশু সহ মাতা

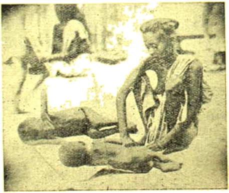

মাতা ও সন্তান—সকলেই খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায়

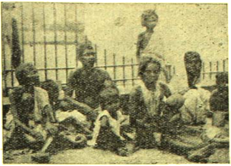

এক সময়ে অবস্থা ভাল ছিল—খাদ্যাভাবে গৃহত্যাগের পর ফুটপাথ আশ্রয় হইয়াছে

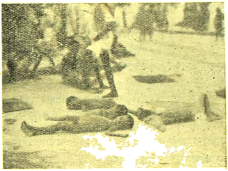

মাতাপিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, অসহায়, খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায় শিশুর দল

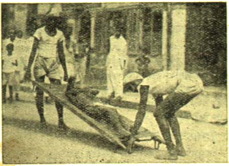

রাজপথে মৃত ব্যক্তিকে সরানো হইতেছে

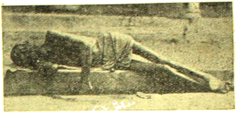

খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিয়া শ্রান্ত অবস্থায় চিরনিদ্রায় মগ্ন

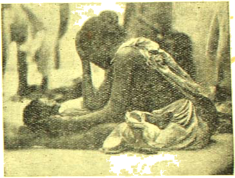

পথে মৃত শিশু কোলে লইয়া মাতার ক্রন্দন—মর্ম্মন্তুদ এই দৃশ্য

মফঃস্বলে খাদ্য প্রেরণ—

১৭ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দী জানাইয়াছেন, কলিকাতা হইতে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের জিলাসমূহে ৫ লক্ষ ৭১ হাজার মণ চাল, ডাল ও বাজরা পাঠান হইয়াছে; তন্মধ্যে শুধু মেদিনীপুরে ২৭ হাজার মণ খাদ্য গিয়াছে। পাঞ্জাব হইতে সরাসরি বাঙ্গলার জেলাসমূহে খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হইয়াছে।—কিন্তু এই সকল খাদ্য কোথায় পৌঁছিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে বিবৃতি—

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রী মিঃ এচ-এস• সুরাবর্দ্দী বাঙ্গলার খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ লিখিত বিবৃতি পাঠ করিতে তাঁহার ৪৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। উহাতে খাদ্যের অবস্থার উন্নতিবিধান সম্পর্কে কোন নূতন কথাই ছিল না।

নূতন বড়লাটের আগমন—

নূতন বড়লাট ভাইকাউণ্ট ওয়াভেল আগামী ২০শে অক্টোবর দিল্লীতে পৌঁছিয়া নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ঐ দিন দিল্লীতে প্রয়োজনীয় দরবার প্রভৃতি হইবে।

F

বাঙ্গালাকে খাদ্য দাও—

ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য-সচিব স্যার জে-পি শ্রীবাস্তব গত ৮ই সেপ্টেম্বর লাহোরে যাইয়া এক সাংবাদিক সম্মিলনে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—বাঙ্গালায় খাদ্যদ্রব্যের তীব্র অভাব ঘটিয়াছে, আগামী তিন মাসই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্কটজনক সময়। ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে ধার করিয়া, কাড়িয়া, চুরি করিয়া—যে কোন ভাবে শস্য সংগ্রহ করাই বাঙ্গালার এই সমস্যা সমাধানের—বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট লোককে বাঁচাইয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কাহারো পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না—উদ্বৃত্ত খাদ্য লইয়া তাহাদের অতি দ্রুত বাঙ্গালায় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। এজন্য মালগাড়ী পাওয়ার কোন বাধাই হইবে না। বাঙ্গালায় যে সব মাল প্রেরিত হইবে, তাহা যাহাতে যোগ্য হস্তে যায়, তিনি সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

মিঃ রবার্ট র‍্যাণ্ড—

আমেরিকান যুক্তরাজ্যের একটি ২৭ বৎসর বয়স্ক যুবক কলিকাতায় আসিয়া যুক্তরাজ্যের কলিকাতাস্থ যুদ্ধ অফিসের সংবাদ-প্রচারক নিযুক্ত হইয়া খুব দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার নাম মিঃ রবার্ট র‍্যাণ্ড। সম্প্রতি এলাহাবাদের নিকট বামরৌলীতে উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে গ্রাজুয়েট হইয়া তিনি সাংবাদিকের কাজ শেখেন ও ১৯৪৩ সালের প্রথমে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন।

আলুর মূল্য বৃদ্ধি—

ভাদ্রমাসের শেষ ভাগে সহসা আলুর দর বাড়িয়া গিয়া এক টাকা সের দরে কলিকাতার বাজারে উহা বিক্রীত হইয়াছে। আলু এদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে—তথাপি আলু কেন যে এত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তাহার কারণ বুঝা যায় না। কিছুদিন হইতে বিদেশ হইতে প্রচুর আলু আমদানী হইতেছিল—এবার আর সেই বিদেশী আলু কলিকাতার বাজারে আসা সম্ভব হয় নাই। এ অবস্থায় দেশের লোক যদি এখন হইতে এ বিষয়ে অবহিত হইয়া বিদেশী আলু ব্যবহার বন্ধ করে ও ব্যবসায়ীরা অসময়ের জন্য দেশী আলু জমাইয়া রাখে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যে পরনির্ভরতার ফলে চাউল দুষ্প্রাপ্য, তাহাই আলুর বাজারেও এই অবস্থা আনয়ন করিয়াছে।

বন্দীদের মুক্তি সমস্যা—

ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কাহাকেও আটক রাখা যে বে-আইনী তাহা কলিকাতা হাইকোর্ট ও ফেডারেল কোর্টের বিচারে স্থির হইয়াছে। তাহার পরও গভর্ণমেণ্ট ঐ আইনে ধৃত ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দান করেন নাই। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে ৬২ জন ও বিপক্ষে (গভর্ণমেণ্ট পক্ষে) ১১১ জন সদস্য ভোট দেওয়ায় সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার সময় স্যার নাজিমুদ্দীন, মিঃ আবদার রহমন সিদ্দিকী ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হইয়াছিল। এই ভোটের সংখ্যা দ্বারাই বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝা যায়।

পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য্য—

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয় অবসর গ্রহণ করায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয় তাঁহার স্থানে প্রাচ্য বিভাগে স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তর্কাচার্য্য মহাশয় গত কয়েক বৎসর অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে কার্য্য করিতেছিলেন।

দামোদর বন্যা ও তাহার প্রতীকার—

গত ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার পূর্ণিমা সম্মিলনীর উদ্যোগে কলিকাতা বালীগঞ্জ ১৮নং অশ্বিনী দত্ত রোডে অধ্যাপক নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গৃহে এক সভায় ডক্টর মেঘনাদ সাহা মহাশয় 'দামোদর বন্যা ও তাহার প্রতীকার' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন; ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বহু সুধী ব্যক্তি আলোচনায় যোগদান করেন। ডক্টর সাহা শুধু বৈজ্ঞানিক নহেন, জনসেবক। তিনি এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া আন্দোলন চালাইলে, দেশ তদ্বারা অবশ্যই উপকৃত হইবে।

মফঃস্বলে চাউলের অভাব—

যশোহর, বরিশাল, ঘাটাল, মুন্সীগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে তারযোগে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জানান হইয়াছে যে কোন বাজারে আর টাকা দিয়াও চাল পাওয়া যাইতেছে না। এ বিষয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের জানাইয়াও কোন কাজ হয় নাই। (১০ই সেপ্টেম্বরের সংবাদ)

মেজর উপেন্দ্রনাথ—

মেজর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বি এণ্ড এ রেলের ডেপুটী চিফ মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়া কাঁচরাপাড়ার বিরাট রেল কারখানার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয় নিযুক্ত হইলেন। উপেন্দ্রবাবু কাঁচরাপাড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান এবং রায়বাহাদুর উপাধিধারী। আমরা তাঁহার আরও উন্নতি কামনা করি।

কলিকাতার পথে ভিক্ষুকের সংখ্যা—

সম্প্রতি এক সরকারী হিসাবে বলা হইয়াছে, কলিকাতার রাজপথে বর্ত্তমানে যে সকল নিরাশ্রয় ভিক্ষাজীবী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। উহাদের মধ্যে প্রায় ৬২ হাজার লোক অন্নসত্রসমূহে এক বেলা খাইতে পায়, বাকী ১৮ হাজার লোক গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করে।

বোম্বায়েও আলুর অভাব—

বোম্বায়ে প্রত্যহ এক হাজার হইতে দেড় হাজার বস্তা আলুর প্রয়োজন হয়; কিন্তু বর্ত্তমানে প্রতিদিন গড়ে ২।০ শত বস্তার বেশী আলু যাইতেছে না। আলু রপ্তানী সম্বন্ধে মাদ্রাজ সরকার

যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, তাহার ফলে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

ভারত হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানী—

১৯৪৩ সালের জানুয়ারী হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে মোট ৯২ হাজার ১ শত ৩১ টন খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে—তন্মধ্যে গমজাত দ্রব্য—২১১৯৫ টন ও চাউল—৭০৯১২ টন।

অনাথ শিশু প্রেরণ—

কলিকাতা হইতে দুস্থ অনাথ শিশুদিগকে বাহিরে প্রেরণ করা হইতেছে। প্রথম দলে গত ৬ই সেপ্টেম্বর ৭০জনকে পাঞ্জাবে প্রেরণ করা হইয়াছে; তথায় তাহাদের আহার, বাসস্থান, শিক্ষাদান প্রভৃতির ভার আর্য্য প্রতিনিধি সভা গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮২নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে শিশুদিগকে গ্রহণ করিয়া শিবনারায়ণ দাসের লেনে রাখা হয়। ঐরূপ বহু শিশু এখনও বাহিরে প্রেরণ করা হইবে।

বাহিরের সাহায্য—

লাহোরের আর্য্য প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ও ৬৩ হাজার মণ খাদ্যশস্য বাঙ্গালার সাহায্যের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। শুধু প্রয়াগ সিং দাতব্য প্রতিষ্ঠান ১ লক্ষ টাকা ও ২২ হাজার মণ খাদ্যশস্য দান করিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর স্যার মরিস হ্যালেট যুদ্ধ সাহায্য সমিতির এক লক্ষ টাকা বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ সাহায্যের জন্য বাঙ্গালার গভর্ণরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মাদ্রাজের 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' নামক দৈনিক সংবাদপত্র বাঙ্গালার সাহায্যের জন্য ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৯০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ৫০ হাজার টাকা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

বোম্বায়ের সিন্ধিয়া নেভিগেশন কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত শান্তিকুমার মোরারজী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে জানাইয়াছেন—বাঙ্গালার দুর্গতদের সাহায্যের জন্য তাঁহারা বিনা মাশুলে এক জাহাজ মাল করাচী হইতে কলিকাতা বন্দরে আনিয়া দিবেন। বোম্বায়ের 'জন্মভূমি' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শেঠ বাঙ্গালার দুঃস্থদের জন্য ৫৬ হাজার মণ বাজরা দিতে সম্মত হইয়াছেন। সিন্ধু প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রোল দামে বাঙ্গালার জন্য ১০ লক্ষ মণ গম দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে দান—

বরিশালের মিঃ আই-বি গুপ্ত যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

অনাথ শিশুর দল—ইহাদিগকে লাহোরে প্রেরণ করা হইয়াছে

অধ্যাপক সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাকেই পরে 'আশুতোষ অধ্যাপক' নিযুক্ত করা হইবে। সাতকড়িবাবু সুপণ্ডিত ব্যক্তি; তাঁহার এই নিয়োগে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

১৯ বারে বি-এ পাশ—

শ্রীযুক্ত কালীনাথ দে মহাশয়ের বয়স ৪১ বৎসর—তিনি গত ২৫ বৎসরের মধ্যে ১৮ বার বি-এ পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এবার তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন।

সর্ব্বধর্ম্ম মিলন মন্দির—

রাওলপিণ্ডির খ্যাতনামা ধনী সর্দার আত্মা সিং নামধারী রাওলপিণ্ডিতে ৫০ হাজার টাকায় এক খণ্ড জমী কিনিয়া তথায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাশাপাশি মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ ও গুরুদ্বার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোক তথায় যাইয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমত অনুসারে উপাসনা করিতে পারিবেন।

মোহনলাল মক্কর—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মোহনলাল মক্কর মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে গত ১৬ই ভাদ্র পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ১৯৩০ সাল হইতে তিনি কাউন্সিলার ছিলেন এবং কংগ্রেসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তিনি কলিকাতা বড় বাজারের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

নূতন গভর্ণর—

বাঙ্গালার গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট সহসা অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার স্থানে বিহারের গভর্ণর স্যার টমাস রাদারফোর্ড বাঙ্গালার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া গত ৬ই সেপ্টেম্বর কার্য্যভার গ্রহণ

করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী মিঃ আর-এফ-মুডি সার টমাসের স্থানে বিহারের গভর্ণর হইয়াছেন।

কলিকাতায় জনসভা—

গত ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে এক জনসভায় বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের জন্য বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার কার্য্যের নিন্দা করা হইয়াছে। সভায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ এ-কে-ফজলল হক, ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা, মিঃ সামসুদ্দীন আহমদ প্রভৃতি এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় এইসমস্যা সমাধানের কথাও আলোচিত হইয়াছিল।

বড়লাটপত্নীর আবেদন—

বড়লাটপত্নী লেডী লিন্‌লিথগো গত ৫ই সেপ্টেম্বর রেডিও মারফত এক আবেদন জানাইয়াছেন, বাঙ্গালার জনগণের দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে—খাদ্যাভাবে বহু লোক মারা যাইতেছে। এ সময়ে রেড ক্রস্ সোসাইটীর মারফত বাঙ্গালায় দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেজন্য সকলের উক্ত সোসাইটীকে অর্থদান করিয়া সাহায্য করা উচিত। সমস্ত অর্থ দুগ্ধদান কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে।

হাজার টিন গম বিতরণ—

পাঞ্জাবের হিন্দুরা বাঙ্গালার দুঃস্থগণের জন্য পাঞ্জাবের সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টারের মারফত এক হাজার টিন গম পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উহা বিতরণের ব্যবস্থা করিবেন।

রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব—

রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব—গত মাসে আমরা ইঁহার পরলোকগমনের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি

পরলোকে কুমুদিনী বসু—

'ব্যবসা-বাণিজ্য' সম্পাদিকা খ্যাতনামা লেখিকা কুমুদিনী বসু গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর শনিবার রাত্রিতে ৬০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বদেশী যুগের নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা ছিলেন এবং ১৯১০ সালে স্বদেশী যুগের অপর নেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কুমুদিনী ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ পাশ করিয়া তিনি 'সুপ্রভাত' নামক মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯৪১ সালে শচীন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুর পর তিনি আবার 'ব্যবসা-বাণিজ্যের' সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। শিখের বলিদান, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, মণিমালা, সমাধি প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া তিনি সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করেন। মহিলাদের উন্নতি বিধানের জন্য বহু প্রকার আন্দোলনের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নারী রক্ষা সমিতি, নারী কল্যাণ আশ্রম প্রভৃতি পরিচালনা করিতেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৪০ সালে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের জামসেদপুর অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রী হন।

নৃপেন্দ্রনাথ ও জগদীশ প্রসাদ—

বড়লাটের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য সার জগদীশপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি ও বড়লাটের শাসন পরিষদের অপর ভূতপূর্ব্ব সদস্য সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এক যুক্ত আবেদন প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন—বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সত্বর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া এখনই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। একদিনের বিলম্বে লোকের দুঃখদুর্দ্দশা বাড়িয়া যাইবে। তাঁহাদের আবেদন খাদ্য-সচিব সার জে-পি শ্রীবাস্তবের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

সবজী বীজ বিতরণ—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত সবজীগুলির বীজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। একটি প্যাকেটে সিকি তোলা বীজ থাকিবে। ভারতীয় সবজী ৬ রকম—লাউ, বেগুন, মূলা, পালম, পেঁয়াজ ও কুমড়া এবং বিদেশী সবজী ৬ রকম—ফুলকপি, বাঁধাকপি, নোল-খোল, টোমাটো, ফ্রেঞ্চ বীন ও কলাই—এই ১২ রকমের বীজ পাওয়া যাইবে। মিউনিসিপাল অফিস, এ-আর-পি অফিস, সিভিক গার্ড অফিস, সরকারী শাসন বিভাগের ও কৃষি বিভাগের কর্মচারী প্রভৃতির নিকট বীজ পাওয়া যাইবে।

মেদিনীপুরে সাহায্য দান—

লোকের ধারণা মেদিনীপুরে গত বৎসরের ঝড়ে যাহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, এখন আর তাহাদিগকে কোন সাহায্য দেওয়া হয় না। এ ধারণা ঠিক নহে। সম্প্রতি মেদিনীপুরে ১২ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হইয়াছে ও ২৪ হাজার মণ খাদ্যশস্য দুঃস্থ লোকদিগের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য মেদিনীপুরে ৩৮ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ, প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা বিতরণের জন্য ও ৬১ লক্ষ টাকা কাজ করাইয়া দানের ব্যবস্থা আছে।

উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রীর আশ্বাস—

উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী দিল্লী যাইলে বাঙ্গালার সরবরাহ সচিবের সহিত তথায় তাঁহার এক চুক্তি হইয়াছে। ফলে উড়িষ্যা হইতে ৪ লক্ষ মণ ধান বাঙ্গালায় প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যা লইয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের সহিত উড়িষ্যা গভর্ণমেন্টের যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারও আপোষ হইয়া গিয়াছে।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

দেশের দারুণ দুর্দ্দিনে অনাথ ভাণ্ডারের (আরিয়াদহ ২৪ পরগণা) কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় দুস্থ ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দানের নানা প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুলভ বস্ত্র বিতরণ করা হইতেছে ও প্রত্যহ এক শত লোককে বিনা মূল্যে খাদ্য প্রদান করা হইতেছে। এ বিষয়ে বেলঘরিয়ার মোহিনী মিলের পরিচালকগণ অনাথ ভাণ্ডারকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতেছেন।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে সাহায্য দান

নূতন গভর্ণরের চেষ্টা—

বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর স্যার টমাস রাদারফোর্ড কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালার খাদ্যসমস্যা সমাধানে মনোযোগী হইয়াছেন। ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি ভারতীয় বণিক সমিতি সংঘের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ জি-এল-মেটা, কলিকাতায় ভারতীয় বণিক সংঘের সভাপতি মিঃ এম-এল-সাহা, মুসলমান বণিক সংঘের সভাপতি খাঁ বাহাদুর জি-এ-দোসানী, বঙ্গীয় ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সহ-সভাপতি মিঃ জে-কে মিত্র এবং মাড়োয়ারী বণিক সমিতির সভাপতি মিঃ এম-এল-খেম্‌কার সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন।

শ্রীমতী নাইডুর আবেদন—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় বিচলিত হইয়া নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের কর্ম্মীদিগকে এ বিষয়ে তৎপর হইয়া কাজ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং নিম্ন ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইতে আবেদন করিয়াছেন—নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের সাহায্য সমিতির সম্পাদিকা—পি ৪৮৬ সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন—

পরলোকগত ব্যারিষ্টার বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় তাঁহার স্থানে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রিয়নাথবাবু সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা বহরমপুর-নিবাসী রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ সেনের ভ্রাতা।

বাঙ্গালার খাদ্য কমিশনার—

সিভিলিয়ান মিঃ এচ-এস-ই-ষ্টিভেন্স বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন—তিনি বাঙ্গালার খাদ্য কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারীর কাজও করিতে হইবে। বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এন-এম-আয়ার ঐ বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী এবং সরবরাহ ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাঞ্জাবের দান—

পাঞ্জাবের সনাতন ধর্ম্ম প্রতিনিধি সভা বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের জন্য ১৩ই সেপ্টেম্বর ১১টি মালগাড়ীপূর্ণ চাল ও গম এবং নগদ ১২ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। আর্য্য প্রাদেশিক সভা বাঙ্গালায় খাদ্যদ্রব্য প্রেরণের জন্য পূর্ব্বে ৩০ খানা মালগাড়ী পাইয়াছিলেন, সেগুলি প্রেরণের ব্যবস্থা করার পর ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা আরও ১১ খানা মালগাড়ী পাইয়াছেন।

আটার দর সমস্যা—

পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের খাদ্যবিভাগের মন্ত্রী সর্দ্দার বলদেব সিং ১৫ই সেপ্টেম্বর লাহোরে প্রকাশ করিয়াছেন যে গত ১৫ই আগষ্টের পর পাঞ্জাব হইতে বাঙ্গালায় ৫০ হাজার টন গম প্রেরণ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট ঐ গম ১০ টাকা ৪ আনা মণ দরে

কিনিয়াছেন ; ভাড়া সমেত উহা ১১ টাকা ৮ আনা মণ দরে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে—তাহা হইতে আটা করিয়া অনায়াসে সাড়ে ১২ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা যায়। কিন্তু বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সাড়ে ১৭ টাকা মণ দরে আটা বিক্রয় করিতেছেন। এই ব্যাপারে হয় বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট নিজে, না হয় কোন দালাল ব্যবসায়ীর দল এই লাভ ভোগ করিতেছেন। এই অভিযোগের উত্তর দিবে কে?

সিন্ধু দেশ হইতে খাদ্য প্রেরণ—

ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ মত সিন্ধু দেশের গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে ৫৫ হাজার টন খাদ্যশস্য প্রেরণ করিতেছেন—তন্মধ্যে গম ৫০ হাজার টন ও চাল ৫ হাজার টন। ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তন্মধ্যে ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হইয়াছে। বাকী শস্য যাহাতে সত্বর বাঙ্গালায় আসে, সেজন্য সিন্ধু গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

অন্ধের পরীক্ষায় সাফল্য—

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বসু নামক একজন অন্ধ এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-টি পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন অন্ধ ব্যক্তি ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-টি পরীক্ষা পাশ করেন নাই।

ডক্টর জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ এ-কে-চন্দ ছুটী লওয়ায় ভাইসপ্রিন্সিপাল ডক্টর জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ তাঁহার স্থানে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। ডক্টর ঘোষ খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক—'ভাস্কর' ছদ্মনামে 'ভারতবর্ষে' তাঁহার বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই সম্মানলাভে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ডক্টর জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ

চন্দ্রলেখা

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

অন্তহীন অন্ধকারে তুমি চন্দ্রলেখা
সান্দ্রঘন অরণ্যেতে ক্ষুদ্র বনপথ,
বর্ষণমুখর রাতে মনমত্ত কেকা,
কুসুম কুটীরে চলে তব চৈত্ররথ।

একদা গোধূলিলগ্নে পরি' রক্ত চেলি
ভীরু বিহঙ্গের মত মোর বক্ষপুটে
নির্ভয়ে লুকালে মুখ—পুলকমগ্ন কেলি,
অতনু পরাগ মাখি' পদপ্রান্তে লুটে।

প্রতি পলে লাবণ্যের পাই পরিচয়,
অঙ্গে উপচীয়মান আকাশের শশী।
একে একে শতদল উঠিল বিকশি'
পরিপূর্ণ সুষমায় নিষ্কলঙ্ক প্রণয়।

তন্দ্রায় তমিস্রা ঘিরি' অন্তরের রূপ,
দেহের দেউলে যেন ত্রিদিবের ধূপ।

নদীর চরে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কোমল কচি তৃণের 'পরে চরণ দু'টি ফেলে
ঘাটের ধারে ভরতে এলে ঘট ;
ঘোমটা দিলে আমার পানে নয়ন দু'টি মেলে
তোমার গায়ে রাঙিয়ে গেল তট।
মানুষ মোরা—মিলেছি আজ নদীর পথে এসে
পথটি না হয় একটু আঁকা বাঁকা !
নাইবা হলেম তোমার চেনা, হোলো দেখাই শেষে
শোভন নহে মুখ ফিরিয়ে থাকা।
বলতে সাধ প্রাণের কথা তোমায় অবিরত,
চোখের জল দিচ্ছে নীরব করে।
তোমার গাঁয়ে জড়িয়ে আছে আমার স্মৃতি যত,
আমার গান দুখায় ফুঁকে মরে।
এমন দিনে এসেছিলেম পারের তরী নিয়ে
মনের সাথে মধু, ধরাতে মোর ;
সন্ধ্যাবেলা অন্তরেতে প্রেমের মালা দিয়ে
আনন্দেতে ছিলেম নিশিভোর।
স্রোতের বুকে ক্ষণিক ছায়া রোদের ঝিলিমিলি,
আমরা দু'টি চরের কোলে দাঁড়িয়ে নিরিবিলি।

ভারতীয় চিকিৎসক সমাজের সমস্যা

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ এম্-বি

চিকিৎসক সম্প্রদায় বলিতে আমি কেবলমাত্র তাঁহাদেরই ধরিতেছি, যাঁহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতিতে শিক্ষিত এবং সরকারের প্রতিষ্ঠিত বা অনুমোদিত কোনও না কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা কর্মে রত।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা আমাদের দেশে প্রধানতঃ সরকারের চাকর ও সৈন্যদলের চিকিৎসা কার্যে সাহায্যের জন্য প্রচলিত হয়। সেজন্য গোড়ার দিকে ইহা সত্য সত্যই অর্থকরী বিদ্যা ছিল। কালক্রমে এই শিক্ষা দেশে বিস্তৃতি লাভ করিলে সরকারী প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিকিৎসকের আবির্ভাব হয় এবং তাঁহারা সাফল্যের সহিত চিকিৎসা র্থ বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ন ও মানে স্পৃহণীয় হইয়া ওঠে। ইহারাই প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার নামে পরিচিত। দেশবাসী যতই পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইতে লাগিল পুরাকালের আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসা প্রথা ততই অনাদৃত হইতে লাগিল এবং এই প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইরূপে যদু-বংশের মত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন একদিন আসিল যখন "চাহিদা অপেক্ষা আমদানী বেশী" হওয়ায় এই চিকিৎসক গোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষের বীজ উপ্ত হইল, সরকারের চাকরিতেও প্রতিযোগিতা দেখা দিল। এই সুযোগ লইয়া সরকার তাঁহার চাকুরিয়াদের মাহিয়ানা প্রভৃতির উন্নতি স্থগিত করিলেন এবং নিজের দেশ হইতে আনীত চিকিৎসকদের উচ্চতর বেতনে উচ্চতরপদে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে দেশীয় চিকিৎসক কর্মচারীর মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিল এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারদের মধ্যেও উক্ত উচ্চপদে বিদেশীয়দের প্রতিযোগিতায় কারণ অন্তর্দাহ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইল।

এই অসন্তোষ, অন্তর্দাহ ও সংঘর্ষ ব্যাপকভাবে দেখা দিল সমগ্র চিকিৎসক গোষ্ঠীর মধ্যে গত মহাযুদ্ধের সময় এবং তাহার অব্যবহিত পরে। যুদ্ধের সময় এক নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতীয় চিকিৎসকের অনেকে আই-এম-এসে যোগদান করিল এবং বিলাতী চিকিৎসকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিল; কিন্তু সেই সেবার ক্ষেত্রেও বিলাতী ও দেশীর মধ্যে সাম্যনীতির অভাব অত্যন্ত রূঢ়ভাবে প্রকট হইল। বিলাতী আই-এম-এসএর তুলনায় ভারতীয় সাময়িক আই-এম-এসএর পারিশ্রমিক প্রভৃতির বৈষম্য এবং যুদ্ধের সময়ও স্থায়ী আই-এম-এস কর্মীগণকে যুদ্ধে না পাঠাইয়া বে-সামরিক কাজে বসাইয়া রাখা, জনসাধারণকে বিশেষ করিয়া চিকিৎসক সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ করিল। তাহার উপর দেশীয়ের দল যখন যুদ্ধান্তে ঘরে ফিরিয়া দেখিল যে তাহাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তাহাদের পূর্বের কর্মক্ষেত্র অপরের দ্বারা অধিকৃত, অথচ যুদ্ধকালীন সাহায্য দানের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগের কোনওরূপ সরকারী চাকরীতেও বহাল করিবার সম্ভাবনা নাই, তখন এদেশী চিকিৎসক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সুখ সুবিধা, অভাব ও অভিযোগের আলোচনা করিবার প্রচেষ্টা করিবার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হইল।

বর্তমান যুগে সংঘের প্রাধান্য সর্বত্র। সংঘবদ্ধ না হইয়া অর্থাৎ পশ্চাতে লোকমতের বল না থাকিলে, সাধারণভাবে দেশের উন্নতির জন্য কোন কাজ করাই সম্ভব নহে। চিকিৎসকের কর্তব্য কেবলমাত্র রোগের চিকিৎসাতেই নিবদ্ধ নহে। রোগ যাহাতে না হইতে পারে তাহার প্রচেষ্টাই বর্তমান কালের চিকিৎসকের বড় কর্তব্য। এই শেষোক্ত কর্তব্য সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে জনমত গঠনের প্রয়োজন সর্বাগ্রে এবং সেইজন্য সমগ্র চিকিৎসক গোষ্ঠীর মিলিত হওয়া আবশ্যক। এই মিলনের ক্ষেত্র এমন প্রশস্ত হওয়া দরকার যেখানে সকল শ্রেণীর চিকিৎসক উচ্চ নীচ ভেদ ভুলিয়া একই পংক্তিতে বসিয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় নির্ধারণ করিবে, সে সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের গোষ্ঠীগত সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করিবে, ক্ষুদ্র কলহ ও রেষারেষির নিরাকরণ করিবে, সরকারের সহিত মতদ্বৈধ থাকিলে প্রয়োজনমত প্রতিবাদ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে না এবং মিলিত জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে সরকারের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের নীতি দেশের কল্যাণ ও প্রয়োজনোপযোগীরূপে পরিবর্তিত করিবার প্রচেষ্টা করিবে। ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান কালক্রমে এমনিই শক্তিশালী সংঘ হইয়া উঠিয়াছে যে আজ উহা সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের চিকিৎসা পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের চিকিৎসকগণের একত্রে সম্মিলিত হইবার প্রচেষ্টা প্রথম হয় কলিকাতায়, বোধ হয় ১৮৯৪ সালে। যতদূর জানা যায় তাহার পর আর একবার হয় বোম্বাইয়ে ১৯০৯ সালে। এই দুটি সম্মেলনই আহূত হইয়াছিল মূলতঃ চিকিৎসাবিজ্ঞান ও চিকিৎসা পদ্ধতির আলোচনার জন্য এবং দুটি সম্মেলনেরই কর্মকর্তা ছিলেন বেশীর ভাগই সরকারী লোকে। এই দুইটির কোনটিতেই চিকিৎসক গোষ্ঠীর সুখ, সুবিধা, অভাব ও অভিযোগের আলোচনার স্থান ছিল না।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের কয়েকটি বড় বড় সহরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমসাময়িক উন্নতির আলোচনা ও নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য এবং স্থানীয় চিকিৎসকমণ্ডলীর সামাজিক মিলন ক্ষেত্র হিসাবে কয়েকটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু কোনও নিখিল-ভারত চিকিৎসক সংঘের প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায় না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৯১৭) অধুনালুপ্ত বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কলিকাতায় এক নিখিল-ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের উদ্যোগ করেন। বোম্বাইএর বিখ্যাত ডাক্তার রাঘবেন্দ্র রাও ইহার সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসকগণের যে সকল সভা-সমিতি আছে তাহাদের সকলের কার্যপ্রণালীকে একই ধারায় নিয়ন্ত্রিত করা এবং সেজন্য কর্ম পদ্ধতি নিয়মিত করা। কিন্তু ইহাও সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র, বৎসরান্তে তিনদিন দেবী পূজার মত। এইরূপ বাৎসরিক সম্মেলন পর পর চার বার আহূত হয়। তাহার পর ক্রমেই উৎসাহ ও সহযোগিতার অভাবে এবং কোনও স্থায়ী কর্ম-নির্বাহক-সমিতি না থাকায় এই বাৎসরিক 'বারোয়ারী'ও বন্ধ হইয়া গেল।

দীর্ঘ আট বৎসর মোহাচ্ছন্ন থাকিবার পর চিকিৎসক গোষ্ঠী পুনরায় জাগ্রত হইয়া দেখিল তাহাদের অভাব, অসুবিধা, বিধি নিষেধের অত্যাচার ও অভিযোগ প্রভৃতি শুধু যে যেমন ছিল তেমনিই আছে তাহা না, বরং দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইয়া দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান ও কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবের যুগ্ম সহযোগিতায় পুনরায় কলিকাতায় এক নিখিল-ভারত চিকিৎসক সম্মেলন আহূত হয়। পূর্বগামী সম্মেলন কয়টির দ্বারা বিশেষ কোন স্থায়ী ফল হয় নাই এবং এরূপ সাময়িক সম্মেলন হইতে তাহা সম্ভবও নহে বুঝিতে পারিয়া

এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এক নিখিল-ভারত চিকিৎসক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়—যে সংঘের উদ্দেশ্য সমগ্র ভারতের চিকিৎসকগণকে একই মন্ত্রে দীক্ষিত করা, একই ভাবে অনুপ্রাণিত করা এবং একই ধারায় তাঁহাদের কর্মপ্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করা—যাহাতে তাঁহারা সমবেত-ভাবে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিতে পারে, দেশে চিকিৎসকগণের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রী স্থাপিত হয় এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা হয়। এই সম্মেলনে ইহাও স্থির হয় যে এই সংঘ ব্যাপকভাবে কায করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে, সহরে ও অন্যান্য বড় বড় সহরে শাখাসংঘ স্থাপন করিবে এবং প্রচার কার্যের সুবিধার জন্য একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিবে।

এই সংঘের জন্মকালে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধাত্রীর কাজ করিয়াছিলেন এবং পরে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ইহার লালন পালনের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল আমি তাঁহাদের একজন। ইহার ক্রমবিবর্তন, পুষ্টি ও বৃদ্ধি যেমন আমাকে আনন্দ দেয় তেমনি ইহার দেহে কোনও রোগের বা অপুষ্টিজনিত দুর্বলতার লক্ষণ দেখিলে স্নেহশীল চিত্ত স্বতই ব্যথাতুর হইয়া হইয়া উঠে।

এই সংঘের বয়স প্রায় ১৩ বৎসর, কিন্তু তবুও তাহার পতাকা তলে ভারতের কতজন চিকিৎসক আসিয়া মিলিত হইয়াছেন? যখন সারা ভারতে উপযুক্ত চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় ৩৫,০০০, তখন সংঘের সভ্য সংখ্যা ৫২৬৫ অর্থাৎ শতকরা ১৫ জন মাত্র। ইহার কারণ কি তাহা অনুসন্ধানের সময় আসিয়াছে।

নিখিলভারত চিকিৎসক-সংঘ (I. M. A.) জীবনের প্রথম স্পন্দন অনুভব করে আমাদের এই বাংলাদেশে। সেজন্য শৈশবে ও বাল্যে তাহার এইখানেই লালিত পালিত হইবার ব্যবস্থা হয়ত সঙ্গতই ছিল, কিন্তু আজ সে যখন যৌবনের দ্বারে প্রবেশোন্মুখ তখন আর তাহাকে বাংলার ছোট গণ্ডির ভিতর আটকাইয়া রাখিবার অপচেষ্টা করা কেবল মাত্র অনর্থক নহে, তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পূর্ণ বিকাশের পক্ষেও হানিকর। বাংলায় জন্ম হইলেও পুষ্টি ও দীর্ঘ আয়ুর জন্য তাহাকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের উপর নির্ভর করিতেই হইবে, সুতরাং তাহার স্থান আজ এমন জায়গায় হওয়া উচিত যেখানে থাকিলে সে প্রাদেশিক আওতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া সমভাবে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অপর্যাপ্ত পরিমাণে জীবন-রস-ধারা শোষণে সমর্থ হইবে। সেই কারণে সংঘের কেন্দ্রীয় অফিস বর্তমান ভারতের কেন্দ্র স্বরূপ দিল্লীতে স্থানান্তরিত করাই সঙ্গত।

মূল সংঘকে সত্য সত্যই শক্তিশালী ও সমগ্র চিকিৎসকসম্প্রদায়ের যথার্থ মুখপাত্র রূপে কার্যকরী করিতে হইলে প্রাদেশিক সংঘগুলিকে আরও বড় করিয়া তুলিতে হইবে, কারণ ব্যষ্টির সহযোগিতায় যে সমষ্টি হয় তাহা অবিসংবাদিত সত্য।

নিখিল-ভারত-চিকিৎসক-সংঘের অধীনে আজও সকল প্রদেশে প্রাদেশিক সংঘ স্থাপিত হয় নাই। যে সকল স্থানে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও কয়েকটি শাখা অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষীণজীবী এবং অপুষ্ট।

অন্যান্য প্রাদেশিক সংঘের আলোচনা হয়ত এখানে অবান্তর, কিন্তু আমাদের বাংলা দেশে যে প্রাদেশিক সংঘ আছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সংঘের আরও প্রসার আবশ্যক। ১৯৩৫ সালে ইহার জন্ম কালে ইহার সভ্য সংখ্যা ছিল ৫৫৫; ১৯৪২ সালে অর্থাৎ ৭ বৎসরে ইহার সভ্য সংখ্যা হইয়াছে ১০১৬ জন। অথচ বাংলা দেশে 'উপযুক্ত' চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় ১২০০০ অর্থাৎ শতকরা ৯০ জনেরও বেশী এখনও সংঘের বাহিরে।

বাংলার পাঁচটি ডিভিশনের মধ্যে অন্তত একশতটি সহর আছে যেখানে কম পক্ষে দশ জন করিয়া I. M. A.-র সভ্য হইবার যোগ্য চিকিৎসক আছেন, অথচ আজ পর্যন্ত সারা দেশে মাত্র ১৩টি শাখা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক কলিকাতা সহরেই ৭টি। এই জন্য বৎসরে অন্তত প্রত্যেক জেলার সদরে একটি করিয়া শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল না কি? বাঁকুড়া, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পাবনা এবং রাজসাহীতে আজও কোনও শাখা প্রতিষ্ঠিত নাই এবং যে কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের অনেকের সভ্যসংখ্যায় অত্যন্ত দুর্বল। ঢাকার মত সহর, যেখানে সভ্য হইবার যোগ্য চিকিৎসক অন্তত ২৫০ জন, সেখানে I. M.A-র সভ্য মাত্র ৯ জন! কলিকাতায়, যেখানে ডাক্তারের সংখ্যা ন্যূনকল্পে ৩০০০, সেখানে কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠের শাখা গুলির সমবেত সভ্য-সংখ্যা ৩৮৭ অর্থাৎ শতকরা ১৩ জন! এই যে সংখ্যা-বৈষম্য ইহার কারণ কি সে বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক, কারণ I. M. A.-কে সত্য সত্যই শক্তিশালী করিতে হইলে ইহার পিছনে সংখ্যার গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন। "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ" বিষ্ণু শর্মার এই উপদেশ অবহেলার নয়। আমার স্থির বিশ্বাস, তাঁহারা সকলে স্বার্থমুক্ত হইয়া ঐক্য ও সংঘবদ্ধভাবে সচেষ্ট হইলে এই সংখ্যা-বৈষম্য সহজেই উল্টাইয়া দেওয়া যায়।

কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব বাংলার জীবিত চিকিৎসক প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন। এক সময় চিকিৎসক মণ্ডলীর মধ্যে ভাব ও ঘনিষ্ঠতার আদান প্রদানের এবং সামাজিক মেলামেশার ইহাই একমাত্র ক্ষেত্র ছিল। ইহার প্রথম জীবনে সরকারী ও সরকারের অনুগ্রহ পুষ্ট বা অনুগ্রহপ্রার্থী কয়েকজন ইহার কর্ণধার ছিলেন বলিয়া সে সময়ে এই প্রতিষ্ঠানে সরকারের কোনও নীতির প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধ সমালোচনা করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের চিন্তার এবং ভাবধারারও গতি পরিবর্তিত হইয়াছে, সেজন্য বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানেও চিকিৎসা বা দেশের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বহু সমস্যা, সরকারের সহিত মতানৈক্য বা বিরোধের আশঙ্কা থাকিলেও নির্ভীকভাবে আলোচিত হইতেছে। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্মপ্রণালী হইতে নিখিল ভারত চিকিৎসক সংঘের উদ্দেশ্যের পার্থক্য আর কোথায়? যতদূর জানা যায় এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সভ্যের মধ্যে বোধ হয় অর্ধেকের উপর নিখিল ভারত চিকিৎসক সংঘেরও সভ্য। এক্ষেত্রে পাশাপাশি দুইটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কেবলমাত্র নিষ্প্রয়োজন নয়, শক্তির অপচয় ও অর্থের অপব্যয়ের কারণ; বিশেষতঃ যখন নিখিল-ভারত চিকিৎসক সংঘকে নূতন করিয়া গড়িতে হইতেছে এবং কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবের মত একটা তৈয়ারী জিনিষ সমুচিত পুষ্টি ও সুব্যবহারের অভাবে জীর্ণ হইতেছে। অনেকেই জানেন যে নিজস্ব গৃহনির্মাণ উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠান আজ বিপুল ঋণভারে প্রপীড়িত। প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্তব্য ইহাকে ঋণমুক্ত করিবার চেষ্টা করা।

আমার মনে হয় দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই মূল উদ্দেশ্য যখন এক এবং তাহাদের পুষ্টির উৎস যখন চিকিৎসক গোষ্ঠীর অনেকেরই কষ্টার্জিত অর্থ, তখন সামান্য ব্যক্তিগত কলহ ও মনোমালিন্য, ক্ষুদ্র সংস্কার ও স্বার্থকে দূরে রাখিয়া কেবলমাত্র গোষ্ঠীর কল্যাণ-কামনা-প্রচেষ্টাকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যদি মিলিত পরামর্শ সভা আহ্বান করেন, তবে সহজেই এমন একটি সর্বসম্মত সূত্রের সন্ধান মিলিতে পারে যাহাতে দুইটি প্রতিষ্ঠান একত্র হইয়া নিখিল-ভারত চিকিৎসক সংঘের পতাকা হস্তে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে পারে।

এ কথা যদি সত্যই হয় তবে একমাত্র কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব বঙ্গীয় প্রাদেশিক সংঘের সকল কার্যভার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা রাখে। এমনি করিয়াই পাটনা মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, নিখিল ভারত চিকিৎসক সংঘের জন্মের পূর্বে স্থাপিত হইলেও আজ বিহার ও দিল্লীর প্রাদেশিক সংঘের কাজ গ্রহণ করিয়াছে; তাহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের অস্তিত্ব বা বিশেষত্ব লুপ্ত হয় নাই, মানেরও কোনও লাঘব হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব ছাড়াও আরও একটি চিকিৎসক-সংঘ

তির বাহার পৃথক অস্তিত্ব বর্তমান পরিস্থিতিতে অবান্তর এবং ভেদ-বুদ্ধির পরিচায়ক। আমি নিখিল-ভারত লাইসেন্সিয়েট-অ্যাসোসিয়েশনের কথা বলিতেছি। এই সংঘ নিখিল-ভারত চিকিৎসক সংঘের জন্মের বহু পূর্বে এক বিশেষ শ্রেণীর চিকিৎসকের সুখ সুবিধা দেখিবার জন্য স্থাপিত হয়। এক সময় এই সংঘ নিজ শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট কাজ করিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহার পৃথক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। এই সংঘ আজও যে কেন নিখিল ভারত চিকিৎসক সংঘের সহিত একাত্মভাবে মিলিত হইতেছে না তাহা সাধারণ বোধশক্তির অতীত। রাষ্ট্রক্ষেত্রে সমগ্র দেশবাসী যখন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখিতেছে, চিকিৎসক গোষ্ঠীর মধ্যে যখন গ্র্যাজুয়েট ও লাইসেন্সিয়েট রূপ কৃত্রিম শ্রেণী বিভাগের বিরুদ্ধে উভয় সংঘের পক্ষ হইতে একই সঙ্গে আবেদন, নিবেদন, প্রতিবাদ ও লোকমত গঠনের প্রয়াস চলিতেছে—তখন ক্ষমতা-লোলুপ দলগত-স্বার্থবিদ্ কয়েকজনের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কি আজও এই "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" নীতি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে?

সমগ্র ভারতের কথা জানি না, কিন্তু বাংলাদেশে এই লাইসেন্সিয়েট-সংঘের ১৮টি শাখা আছে এবং তাহাদের সমবেত সভ্যসংখ্যা ৮১০। এই কয়েকটি শাখা কি নিখিল ভারত চিকিৎসক সংঘের সহিত এক হইয়া যাইতে পারে না? এই সংঘের মূল সভাপতির দায়িত্বপূর্ণ ও গৌরবময় আসনে যিনি বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত তিনি নিখিল ভারত চিকিৎসক সংঘের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি কি এক বলিষ্ঠতর অখণ্ড নিখিল-ভারত চিকিৎসক-সংঘের প্রতিষ্ঠায় আপনার শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিবেন না?

আজও যে বহু চিকিৎসক নিখিল-ভারত চিকিৎসক সংঘে যোগদান করেন নাই তাহার কারণ, তাহাদের স্বভাবগত লজ্জাশীলতা, কোথাও বা অসামর্থ্য এবং হয়ত বা স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র দলাদলি, মনের সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্র স্বার্থের সহিত সংঘাত, কুতর্ক, সংশয় ও অতি-বুদ্ধি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ, আজও তাঁহাদের মধ্যে এই সংঘের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ধারণা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এজন্য প্রচারকার্য প্রয়োজন। এত বড় যে বিশ্ব-গ্রাসী 'কুরুক্ষেত্র' যুদ্ধ তাহাতে প্রত্যেক যুধ্যমান জাতির প্রচার বিভাগ আছে, কিন্তু এই সংঘের, কি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে, কি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে কাহারও প্রচার-বিভাগ নাই। তাহার কারণ এদেশে প্রচারকার্যের প্রয়োজনীয়তা, কি ব্যবসায়ী মহলে, কি শিক্ষিত ও সংঘের অধিনায়কদের মধ্যে, আজও অবহেলিত বা অজ্ঞাত। যদিও বলিতে কুণ্ঠা বোধ করি, নিজের নিজের প্রচারকার্যে অনেকেই পটু।

প্রচারকার্যের প্রধান সহায় পত্রিকা। সংঘের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ-পরিচালিত যে পত্রিকা আছে তাহার আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা; কিন্তু সকলেই জানেন চিকিৎসা ব্যবসায় ও চিকিৎসক গোষ্ঠীর অভাব অভিযোগ ও অসুবিধা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকমের। একমাত্র কেন্দ্রপরিচালিত পত্রিকার পক্ষে সকল সময়ে এই সকল বিষয়ে সম্যক আলোচনা এবং তাহার প্রতিকার করিবার প্রচেষ্টা করা সম্ভব হইয়া উঠে না। এজন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক সংঘের পরিচালনায় একখানি করিয়া পত্রিকা প্রকাশ করা কর্তব্য। এই পত্রিকায় চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রবন্ধ বড় না থাকুক (কারণ সেগুলি বিদেশীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে অধিক লোকের দৃষ্টি-পথে পড়িবে) চিকিৎসক-গোষ্ঠীর অভাব অভিযোগ, সুবিধা ও অসুবিধা, জনস্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেগুলি করিতে কি অন্তরায়, দেশের ও দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব কতখানি এবং কি ভাবে ইহার সামঞ্জস্য করা যায়, এইরূপ বিবিধ আলোচনা থাকা বাঞ্ছনীয়।

এইরূপ একখানি পত্রিকা প্রাদেশিক সংঘের পক্ষ হইতে প্রকাশ করা সম্ভব কি না তাহা উক্ত প্রাদেশিক সংঘের কর্তৃপক্ষের ভাবিয়া দেখা দরকার। পূর্বে কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছি তাহা যদি কার্যকরী হয় তবে ঐ ক্লাবের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকাখানিকে সহজেই এ দেশের প্রাদেশিক সংঘের মুখপাত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ভারতীয় চিকিৎসক গোষ্ঠীর সমস্যা বহু, কোনটা ছাড়িয়া কোনটা বলিব? যাঁহারা এই সকল সমস্যা পূরণের জন্য চিরদিন মস্তিষ্কচালনা করিয়া আসিয়াছেন, আমার অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও যোগ্যতর সেই সকল ব্যক্তির উপর এই সকল চিরন্তন সমস্যার পূরণের ভার দিয়া আমি শুধু বলিতে চাই যে বহু মঞ্চ হইতে বহুদিন ধরিয়া উক্ত এবং বারংবার পুনরুক্ত অনুরোধ, উপরোধ, নিবেদন ও প্রতিবাদের মন্তব্যগুলি বৎসরের পর বৎসর এই সকল চিকিৎসক সম্মেলনে গ্রহণ করিয়া অনর্থক শক্তির অপচয় আর না করাই বাঞ্ছনীয়। দেশের ও দেশবাসীর যথার্থ কল্যাণের জন্য চিকিৎসক ও চিকিৎসিতের সমবেতভাবে কি করিতে পারে এবং কি করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে পথ স্থির করা এবং দেশবাসীকে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া এবং নিজ নিজ অন্তরের মধ্যে সেই সকল নির্দেশ অনুসারে আপনাদের কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সময় এখন আসিয়াছে।

আমি এখনও দুইটি সমস্যার উল্লেখ করিতে চাই—দুইটিই জটিল।

আমার মতে বর্তমানে চিকিৎসক গোষ্ঠীর প্রধানতম সমস্যা—ঔষধের সমস্যা। উপযুক্ত ঔষধ না মিলিলে চিকিৎসকের প্রয়োজন লোপ পাইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বর্তমান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে দেশবাসী ঔষধের যোগান সম্বন্ধে যে কত অসহায় তাহা সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছে; গত মহাযুদ্ধের সময়ও এই অবস্থা আসিয়াছিল এবং তাহার ফলে আমাদের দেশে কয়েকটি ঔষধের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু সেবার যুদ্ধ-বিরতির পর বিদেশী প্রচার বিজ্ঞাপনের কল্যাণে এবং রাষ্ট্রের, দেশবাসীর ও চিকিৎসক গোষ্ঠীর নিজেদের অবহেলায় ও অসহযোগিতায় সে সকল প্রতিষ্ঠানের অনেকেরই অকাল মৃত্যু হইয়াছে। এবারেও যুদ্ধের ফলে আবার কিছু নূতন প্রচেষ্টা হইতেছে। এই সকল দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বর্তমান যুদ্ধ বিরতির পরও বাঁচাইয়া রাখার দায়িত্ব চিকিৎসক গোষ্ঠীকে লইতে হইবে।

বিলাতী প্রচারণা এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতৃবর্গের আশীর্বাদে আমরা আজও বিদেশী ঔষধ খুঁজিয়া মরিতেছি। আজও বড় ডাক্তারকে পরামর্শের জন্য ডাকিলে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে বলেন—'মার্কের [illegible] খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, নতুবা ফল ভাল হইবে বলিয়া ভরসা হয় না।' কাজেই ঐরূপ বিদেশী ঔষধ আজ বহুগুণ উচ্চ মূল্যে বিকাইতেছে; যে পাইতেছে সে যে রকমই কষ্ট হউক না কেন তাহা সহ্য করিয়া উহা ক্রয় করিতেছে, যে পাইতেছে না সে হতাশ হইয়া পরমাত্মীয়ের মৃত্যুর জন্য আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছে।

এই নিদারুণ পরিস্থিতি কেবল মাত্র সাধারণভাবে দেশবাসীর এবং বিশেষ করিয়া চিকিৎসক গোষ্ঠীর অসহায় অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয় না যে সকল প্রতিষ্ঠান বহু বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও দেশের বর্তমান দুর্দিনে বিবিধ প্রয়োজনীয় ঔষধাদি যথাশক্তি প্রস্তুত করিয়া দেশবাসীর জীবন রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের প্রতিও অবিচার করা হয়। শিশু যখন হাঁটিতে আরম্ভ করে তখন তাহার অপরের সবল বাহুর অবলম্বন চাই। সে অবলম্বন তাহাকে না দিয়া তাহার হাঁটিবার অসামর্থ্য লইয়া তিরস্কার, পরিহাস বা কৈফিয়ৎ তলব করা যেমন হাস্যকর তেমনই মর্মান্তিক।

প্রত্যেক ভারতীয় চিকিৎসকের কর্তব্য এইসকল দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতায় ও সহানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ করা—যাহাতে তাহাদের প্রত্যেকেই কালে Merck, Bayer, B D. H., P. D. অথবা B. W. এর মতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। চিকিৎসকের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সদুপদেশ

ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের যদি কোন দোষ বা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে সরকার বন্ধু ভাবে তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা সে সকল সংশোধন করিতে পারে। যে সকল চিকিৎসক হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের উচিত দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রস্তুত ঔষধাদি নিশ্চিন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে বারংবার পরীক্ষিত হইবার সুযোগ দেওয়া, কোনও দোষ দেখিলে তাহা দেখাইয়া নিজের জ্ঞান থাকিলে কি উপায়ে উহা সংশোধন করা যাইতে পারে তাহার নির্দেশ দেওয়া। পাশ্চাত্যে যে সকল প্রতিষ্ঠানের আজ জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা তাহারা সকলেই হাসপাতালসমূহ হইতে এই সকল সুবিধা না পাইলে আজ এত বড় হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

এই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে যে সকল প্রতিষ্ঠান সমর্থ তাহাদের কর্তব্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংলগ্ন হাসপাতাল স্থাপন করা, যাহাতে স্বকীয় প্রস্তুত ঔষধাবলী ব্যাপক ভাবে পরীক্ষিত হইতে পারে। ইহাও যদি সম্ভব না হয় তবে হাসপাতালগুলিকে যথোচিত অর্থ সাহায্যও করা যাইতে পারে। কারণ একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে দেশের বহু হাসপাতালই আজ অর্থাভাবে পঙ্গু।

অপর যে সমস্যার কথা এখন উল্লেখ করিতেছি তাহা একান্তই চিকিৎসক গোষ্ঠির ঘরোয়া সমস্যা—কিন্তু বর্তমানে ইহাই তাঁহাদের প্রধানতম সমস্যা—কারণ ইহা অন্নবস্ত্রের—কাজেই জীবন মরণের সমস্যা। যুদ্ধের অনিবার্য ফল স্বরূপ দেহ ধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় আহার্য ও পরিধেয়ের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে সে তুলনায়, কয়েকজন কীর্তনীয় চিকিৎসকের কথা ছাড়িয়া দিলে, সাধারণ চিকিৎসকের আয় বাড়িয়াছে কি? চিকিৎসকও মানুষ, তাঁহাকেও স্ত্রী-পুত্র ও অন্যান্য অবশ্যপোষ্যের মুখে দুইবেলা শাকান্নের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত সত্য যে এই দুর্দিনে অনেক চিকিৎসকের আয় বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, আহার্য ও পরিধেয়ের মূল্যের ক্রমবৃদ্ধির অনুপাতে ক্রমশঃ হ্রাস হইতে হ্রাসতর হইতেছে, কারণ তাহাদের যাঁহারা আহার যোগাইয়া থাকেন, সেই গোষ্ঠীর মধ্যে অধিকাংশই আজ অভাবগ্রস্ত। প্রাচুর্যের সময় যাহারা বিলাস হিসাবে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন আজ তাঁহাদের অনেকেই নিজেদের বা আত্মীয় পরিজনের জীবন-সংশয়-কর ব্যাধির সময়েও চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে অক্ষম। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি চিকিৎসাকার্যকে আপনার জীবনোপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে সে কি করিবে? চিকিৎসা কার্য ব্যবসা নহে, 'সেবাব্রত', 'নোবল প্রফেসন'—এই সকল দিবারাত্র জপ করিলেই তাহার 'সংসার' শান্তি মানিবে কি? শুনিয়াছি বিলাতে ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান যুদ্ধকালীন মহার্ঘতা হেতু তাহার সভ্যদের 'দর্শনী' শতকরা ২০৲ টাকা বৃদ্ধি করা অনুমোদন করিয়াছেন এবং সে দেশের লোক তাহা মানিয়া লইয়াছে। বর্তমান নিখিল ভারত চিকিৎসক-সংঘ যদি আজ এইরূপ কোনও নির্দেশ দেয় তবে আমাদের দেশবাসী তাহা মানিয়া লইবে কি? কিন্তু আজ যদি এই সংঘের পিছনে '২৫ পার্সেন্টের' জোর থাকিত তাহা হইলে আমাদের দেশবাসীও সংঘের অনুরূপ নির্দেশ—"তেল নুন লকড়ির" মূল্য বৃদ্ধির মত অনিবার্য বলিয়াই বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইত।

"কৃষ্ণকীর্তন"-এর মধ্যগত একটী পদের বিভিন্ন আদর্শ

শ্রীহরিদাস পালিত ও শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

রাঢ় দেশে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ঝুমুরের গান একাধিক প্রচলিত আছে। সে সব গান বড়ু চণ্ডীদাসের নয়। দেখা যায় একাধিক ঝুমুরের গানের পরে 'বাসলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে' ভণিতা জুড়িয়া চণ্ডীদাসী পদ করা হইয়াছে। কীর্তন গায়কেরা এইরূপ একাধিক পদ চণ্ডীদাসের বলিয়া গাহিয়া থাকেন। বাঁকুড়া এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত উত্তর পশ্চিমাংশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গীতি প্রচলিত আছে তাহার ভাব ও ভাষার সহিত 'কৃষ্ণকীর্তন'-এর পদের অনেক সাদৃশ্য আছে। স্থানে স্থানে শুধু ভাষার পরিবর্তন হইয়াছে এবং আরও দেখা গিয়াছে যে ঐ ভাষা আসানসোল, রাণীগঞ্জ—বর্দ্ধমান জেলা এবং ঝিগুড়ি আদি পল্লী অঞ্চলের ব্যবহার্য ভাষা।

আমরা উক্ত অঞ্চলগুলিতে প্রচলিত একটী গান লইয়া 'কৃষ্ণ কীর্তন' লিখিত একটী পদের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্দ্ধমান—(ঝিগুড়ী)

(১)

আল পাগের রাখাল, তুহে হরোছে আমার মন,
শুন্ অল পাগের রাখা সকল কাজেই বিঘিন্ বাধা,
হঠাৎ হবে করিল্ কি কারণ। কেনে বলিল নিঠুর বচন।
দেখ, আমার বিন্দাবনে, ময়ূর ময়ূরী সনে দুলনাতে খেলিছে কেমন।
তাহেই বলি পাগের রাখা।
পায়ে ধরি (তর) বিস্না বাধা হঠাৎ হবে করিল্ কি কারণ।

এই পদে (ঝুমুরের গান) চণ্ডীদাসের কোন ভণিতাই নাই।

মানভূমের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা (বি, এন, আর—আদরা পারিপার্শ্বিক) দেহাতীয় গীতাদি রচনা ও গান করিয়া থাকে, উহারই আদর্শ লিখিত হইল। মানভূম জেলায় স্থান বিশেষে ভাষার কিছু কিছু পার্থক্যও দেখা যায়।

(মানভূম—আদরা)

অল পাগের রাখাল হরে লয়েছে আমার মন।
শুন্ অল পাগের রাখা, সকল কাজেই বিঘিন্ বাধা,
কেন্হে বলিলি নিঠুর বচন।
দেখ আমার বিন্দাবনে, ময়ূর ময়ূরী সনে,
দুলনাতে খেলিছে কেমন।
তাই বল্লিল পাগের রাখা ভড়— ধরি (তর) বিস্না বাধা—
হঠাৎ হবে কহিল্ কি কারণ।

এখানে 'ভড়' অর্থে পা এবং হির—(জল)।

আবার বীরভূমের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে (দুবরাজপুর পারিপার্শ্বিক) উক্ত গানের আরও একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

বীরভূম—

ওলো পাগের রাখালো তুড়ে মোহেছে আমার মন।
শুন্ ওলো পাগের রাখা সকল কাজেই বিঘিন্ বাধা,
কেনে বোলিস্ নিঠুর বোচন।
দেখ, আমার বিন্দাবনে, মোয়ূর-মোয়ূরী সনে,
দু দোনাতে খেলিছে কেমন।
তাই বোলিলো পাগের রাখা, পায়ে ধরি তোর বিস্না বাধা,
হোঠাৎ তোবে কোরিল্ কি কারোণ।

উপরোক্ত গান তিনটী সাহিত্যপরিষদ-মুদ্রিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র বৃন্দাবন-খণ্ডের একটী পদের অনুরূপ বলিয়া তাহার তুলনা করা যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদটি এইরূপ—

কহ্লারাগঃ। রূপকং।
তোহ্মাতে বাঢ়িল মোর মনে ল।
আল হের মন প্রাণ রাখাল, কেহ্নে বোল নিঠুর বচনে।
হের মোর বৃন্দাবনে ল।
আল হের দুর প্রাণ রাখাল বিফল করহ কি কারণে ॥১॥

এই রকমের গান 'রাঁচি' ও পারিপার্শ্বিক স্থানে 'মুণ্ডা' ভাষায় অনেক পাওয়া যায়। তাহা হইলে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' লিখিত গান কোন জেলার ভাষা? বিচার করিবার অবকাশ আছে সন্দেহ নাই।

'তোহ্মাতে'—শব্দটী সাধারণতঃ মালদহ জেলায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাঢ়ের মধ্যে ব্যবহৃত হইত কিন্তু এখন বিরল। 'আহ্মার' শব্দটীও বিশেষ প্রচলিত ছিল।

এইরূপ উপরিকথিত জেলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বিভিন্ন লেখককৃত গান সংগ্রহ করিয়া কীর্তন গায়কেরা বাসলী ও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা দিয়া একাধিক পদ চণ্ডীদাসের করিয়া লইয়াছেন।

খেলাধুলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সম্পাদক: [illegible] চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল খেলা ঃ

ফুটবল খেলায় আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের খেলার উপরই নির্ভর করছে দলের জয় পরাজয়। আক্রমণ ভাগের থেকে রক্ষণভাগ খুব শক্তিশালী করা মারাত্মক ভুল নয় কিন্তু আক্রমণ ভাগ যদি গোল দিতে সক্ষম না হয় তাহলে শক্তিশালী রক্ষণভাগের কোন সার্থকতা নেই। মনে রাখতে হবে উভয় দলের গোলদানের তারতম্যের উপরই জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হবে। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের উপরই গোল দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের প্রধান কাজ বিপক্ষদলের আক্রমণকে ব্যর্থ করা এবং নিজদলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের যথাযথ সময়ে বল সরবরাহ করে আক্রমণের সহযোগিতা করা। একমাত্র আত্মরক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য হ'লে দলের পরাজয় অনিবার্য্য না হলেও যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন ঘটায়, তার সম্মুখীন হয়ে খুব কম সময়েই বিপদ থেকে দল আত্মরক্ষা করতে পারে।

বর্ত্তমানে ফুটবল খেলার পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। বর্ত্তমানের অবলম্বিত পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত। ফুটবল খেলার প্রথম যুগে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে খেলোয়াড়রা খেলত না। ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের ফলে দেখা গেল খেলায় একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এমনি পরিবর্ত্তনের মধ্যেই 'ড্রিবলিং-এর আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে একাই গোল দিয়ে কৃতিত্ব পাবার আকাঙ্ক্ষা দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠেছে। দলের মধ্যে কোন কোন খেলোয়াড় ড্রিবলিং ক'রে একাই দু' তিনজন বিপক্ষদলের খেলোয়াড়কে পরাভূত ক'রে যে গোল দিতে পারত না তা এমন নয় কিন্তু এই পদ্ধতি অবলম্বনে অনেকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হ'ল। খেলোয়াড়রা নামের জন্য এমন স্বার্থপর হয়ে উঠল যে নিজ দলের অন্য খেলোয়াড়কে গোল করার সহজ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে নিজেই গোল করবার চেষ্টা করতো। কিন্তু সকল সময়েই এ পদ্ধতি কার্য্যকরী হ'ত না। আক্রমণভাগের খেলায় পরস্পরের সহযোগিতার অভাব দেখা দিল। এই অসুবিধা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সম্মিলিত খেলার ('combined play') জন্ম হল। 'combined play' প্রবর্ত্তন হবার পর ড্রিবলিং খেলার জৌলুষ দর্শক এবং খেলোয়াড়দের আকৃষ্ট করতে পারলো না। বর্ত্তমানে 'ড্রিবলিং' খেলার তিরোধানে অপর খেলোয়াড়দের সহযোগিতা ছাড়া একের কৃতিত্বে গোল করবার প্রচেষ্টা খুবই কম। বেশীর ভাগ গোলই খেলোয়াড়দের পরস্পর সহযোগিতায় সম্মিলিত খেলার ফলেই হচ্ছে। সম্মিলিত খেলার প্রধান উদ্দেশ্য পরস্পরের সহযোগিতায় বলটি বিপক্ষদলের গোলের যতদূর সম্ভব নিকট দূরত্বে এনে আর কালবিলম্ব না করে গোলের সন্ধান করা। সম্মিলিত খেলায় গোল করবার যেমন সহজ সুবিধা পাওয়া যায় তেমনি বিপক্ষদলকে অনায়াসে পরাস্ত করা যায় যেটা ড্রিবলিং খেলার পদ্ধতিতে সকল সময়ে সম্ভব নয়। সম্মিলিত খেলায় আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা আক্রমণ আরম্ভ ক'রে পাঁচজনে পরস্পরের সহযোগিতায় বলটি নিয়ে অগ্রসর হলেই বিপক্ষদলের হাফব্যাকদের অন্ততঃ একজনও পিছিয়ে পড়বে। এর অর্থ আক্রমণ ভাগের পাঁচজন খেলোয়াড়দের বাধা দিতে গিয়ে বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের পাঁচজন খেলোয়াড় সকল সময়েই তাদের উপর সমান লক্ষ্য রাখতে পারবে না, কারণ আক্রমণভাগের খেলার গতি সকল সময়েই একই ধারায় অবলম্বিত হবে না। যেদিকে দলের আবির্ভাব নিশ্চিত ভেবে রক্ষণভাগ অগ্রসর হয়েছে সেদিকে বল না পাঠিয়ে আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা যেখানে রক্ষণভাগের খেলোয়াড় কম সেইদিক দিয়েই অগ্রসর হলে গোলের সম্মুখীন হবে। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের দৃষ্টি অতিক্রম করা অন্তত একজন আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরও পক্ষে সম্ভব। খেলার গতি ভিন্নমুখী থাকায় কোন না কোন আক্রমণভাগের খেলোয়াড় unmarked অবস্থায় থাকতে পারে। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের প্রধান উদ্দেশ্য হবে 'unmarked' খেলোয়াড়কে বলটি পাঠিয়ে আক্রমণের পদ্ধতি অতর্কিতে পরিবর্ত্তন করা। এই অতর্কিত আক্রমণ পদ্ধতিই হচ্ছে বিপক্ষদলের পক্ষে সব থেকে মারাত্মক। বিপক্ষদল আত্মরক্ষার সময় খুব কম পায় এবং অন্য দিক থেকে খেলোয়াড় পৌঁছে তাকে বাধা দিবার পূর্ব্বেই সে বলটি নিজের আয়ত্বে এনে নিজেই গোলের সন্ধান করতে পারে কিম্বা নিজের গোল দেবার অসুবিধা দেখলে দলের অপর সহযোগীকে বলটি পাশ দিয়ে তার সুবিধা করতে পারে। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে তার সহযোগীরা কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের সঙ্গে বল নিয়ে 'Tackle' করবার সময় কোন অসুবিধা বোধ করলেই দলের unmarked খেলোয়াড়কে বলটি পাশ দিয়ে খেলার গতির ধারা পরিবর্ত্তন করবে। বলটি পেয়ে সেই

খেলোয়াড় তখন এগিয়ে যাবে যতক্ষণ না বিপক্ষদলের খেলোয়াড় তাকে বাধা দিতে অগ্রসর না হয়। অগ্রসর হলেই বলটি পাঠাবে দলের এমন একজন খেলোয়াড়কে যে 'unmarked' অবস্থায় আছে। খেলোয়াড় বাধা দিতে অগ্রসর না হলে সে বলটি নিয়ে সোজাসুজি গোলের মুখে অগ্রসর হয়ে গোলের সন্ধান করবে। মনে রাখতে হবে দুএক সেকেণ্ডের বিলম্বে খেলার গতিও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে যাবে, বিপক্ষদলের রক্ষণভাগের কোন না কোন খেলোয়াড় এগিয়ে এসে তাকে বাধা দিবে। পাঁচ সেকেণ্ডের বিলম্বে বিপক্ষদলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড় পিছিয়ে এসে দলের রক্ষণভাগকে শক্তিশালী করে তুলবে এবং আক্রমণ প্রতিরোধ করবে। আক্রমণ সময়ে বলটি একজন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে অপরের কাছে এমনিভাবে অগ্রসর হবে। ফলে বিপক্ষদল বলের সঠিক গতি নির্ণয় করতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের একটি বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে যে, তারা যেন পরস্পরের সহিত একসূত্রে সর্বদাই অবস্থান করে। এর অর্থ প্রত্যেক খেলোয়াড় অপর খেলোয়াড়দের অবস্থান সম্বন্ধে এমন সঠিক ধারণা নিয়ে অগ্রসর হবে যে, বলটি পাস দেবার পরই যার উদ্দেশ্যে বলটি দেওয়া হ'ল সে ভিন্ন যেন অন্য কারও আয়ত্তে না গিয়ে পড়ে। আক্রমণের সময় পাঁচজন খেলোয়াড়ই একই লাইনে অগ্রসর হবে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের মধ্যে ব্যবধান হবে মাত্র কয়েক গজ। ইনসাইড খেলোয়াড়রা উইংম্যান খেলোয়াড়দের থেকে সেন্টার ফরওয়ার্ডের নিকট দূরত্বে থাকবে। খেলোয়াড়রা বেশী নিকটবর্তী হলে বিপক্ষদলের সুবিধা হবে এই যে, একজন খেলোয়াড়ই দু'জন খেলোয়াড়ের উপর লক্ষ্য রাখতে পারবে। সেই কারণে নির্দিষ্ট ব্যবধান রেখে অগ্রসর হওয়ার নীতিই কার্য্যকরী। আক্রমণ আরম্ভ হলে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের লক্ষ্য থাকবে লাইনে পরস্পরের ব্যবধান ঠিক আছে কিনা। বল পেয়েই আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় টাচ লাইনের সমান্তরালভাবে বল নিয়ে অগ্রসর হবে যে পর্য্যন্ত বিপক্ষের একজন খেলোয়াড়কে draw না করতে পারবে। এইরূপ ভাবে অগ্রসর হলে সে বিপক্ষকে জানতে দিবে না কোথায় সে বলটি পাস করবে, আর বিপক্ষ দল শেষ সময় পর্য্যন্ত নানা সন্দেহের মধ্যেই অবস্থান করতে বাধ্য হবে। কোন কোন খেলোয়াড়কে যে দিকে বলটি পাস দিতে সে মনস্থ করেছে ঠিক তার কিছু বিপরীত দিকে বল নিয়ে অগ্রসর হ'তে দেখা গেছে। ফলে "this draws the defence across." এবং গ্রহীতাও সামনে নিরাপদে ছুটে গিয়ে বলটি পায়। যে সময়ে ইনসাইড খেলোয়াড়কে বল নিয়ে বিপক্ষদলের খেলোয়াড়ের সম্মুখীন হ'তে হয় সে সময়ে সে দলের একমাত্র রাইট সাইড আউট unmarked অবস্থায় থাকে। ইনসাইড খেলোয়াড় যদি প্রতিবন্ধ না হয়ে অগ্রসর হতে পারে তাহলে তার পক্ষে বলটি পাস দেওয়া সহজ। লম্বা পাস হলে বিপক্ষকে অতিক্রম করা সহজ হবে। আর পাস যত বেশী লম্বা হবে বিপক্ষ দলকে অতিক্রম করা তত বেশী সহজ হবে। একদিকের 'আউট' থেকে অপর দিকের আউটের খেলোয়াড়কে যে লম্বা পাস দেওয়া হয় সেগুলি বেশী কার্য্যকরী হয়, এতে গোলের অব্যর্থ সন্ধানের সুযোগ পাওয়া যায়। বিপক্ষদলের খেলোয়াড়রা সহজে বল অনুসরণ করতে পারে না।

কোন সময় ডজ্ করবে কিম্বা পিছনে পাস দিবে ঃ

খেলায় একাধিক কারণ বশত দলের unmarked খেলোয়াড়কে বল পাস করা কোন কোন সময় সম্ভব হয় না। আবার কোন খেলোয়াড়কেই unmarked অবস্থায় না পাওয়া যেতে পারে। অথবা যে কোন কারণে দলের একজন খেলোয়াড়ের অভাব হেতু আক্রমণ ভাগ অসুবিধা বোধ করে। সে অবস্থায় আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়কে বিপক্ষের সঙ্গে tackle করতে হ'লে কি করা উচিত। সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী বলটি ডজ্ করে বিপক্ষের ব্যূহ অতিক্রম করবার চেষ্টা করতে পারে অথবা পিছনে দলের খেলোয়াড়কে বলটি পাস করতে পারে।

ডজ্ ঃ

প্রথম সে বলটি ডজ্ করে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে সুকৌশলে অতিক্রম করতে পারে। বলটি পায়ে নিয়ে পা এবং শরীরের এমন অঙ্গভঙ্গী করবে যাতে করে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় তার ছলনাই প্রকৃত উদ্দেশ্য ভেবে তার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে উদ্যত হবে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় প্রতিরোধের ভাব প্রকাশ করলেই আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় পূর্ব্ব সংকল্প অনুযায়ী খেলার দিক্ পরিবর্তন করে বিপরীত দিক দিয়ে বলটি নিয়ে তাকে অতিক্রম করে যাবে। ডজ্ করার উদ্দেশ্য 'making him expect one thing and then doing the opposite.' প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই ডজ্ করার মধ্যে একটা না একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ ডজ্ করার কৌশল একই ধরণের হয় না বিভিন্ন রকমের। তবে বেশীর ভাগ সময়েই বলটি পা দিয়ে স্পর্শ না ক'রে কেবলমাত্র শরীরের অর্দ্ধেক এক দিকে সঞ্চালন করা হয়। ফলে তার শরীরের ভার এক পায়ের উপর ন্যস্ত হয় এবং তার গতির পথ নির্দেশ ক'রে দেয়। এটা কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য তৎক্ষণাৎ তার গতি পরিবর্তন ক'রেই বিপরীত দিক দিয়ে বল নিয়ে বিপক্ষকে অতিক্রম করা। এমন দ্রুতগতিতে কাজ হয় যে, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে সেই অনুযায়ী কাজ করা বিপক্ষের পক্ষে সকল সময় সম্ভব হয় না, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়। সব থেকে ভাল ডজ্ হচ্ছে, বলটি বিপক্ষের এক পাশ দিয়ে এগিয়ে দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে তাকে ঘুরে ছুটে গিয়ে বলটি ধরা। এই শ্রেণীর ডজ্ খেলোয়াড়দের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটায় না। তবে মনে রাখতে হবে, যে ক্ষেত্রে আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় দ্রুতগতিতে বলটি নিয়ে যেতে গিয়ে বিপক্ষের সম্মুখীন হবে সে ক্ষেত্রেই এ শ্রেণীর ডজ্ কার্য্যকরী। অথবা বিপক্ষের খেলোয়াড় সম্মুখে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে এবং যখন ক্ষিপ্রগতিতে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় সে অবস্থায় এই শ্রেণীর কৌশল অবলম্বন করা আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় পক্ষে কার্য্যকরী।

পিছনে পাস ঃ

সামনে বল নিয়ে যেতে কোন অসুবিধা বোধ করলে আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা ডজ্ না ক'রে দলের হাফকে বলটি 'ব্যাক পাস' ক'রে 'unmarked position'এ গিয়ে দাঁড়াতে পারে। এই শ্রেণীর পাসে একটা অসুবিধা এই যে, আক্রমণের গতি মন্দীভূত করে দেয়। কিছুক্ষণের জন্য বল সামনে অগ্রসর না

হওয়ায় বিপক্ষদলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা দ্রুত ভাবে রক্ষণব্যূহ সাজাবার সময় পেয়ে যায়। তবে যদি হাফ ব্যাক ঠিক পিছনে-নিকট দূরত্ব ব্যবধানে অগ্রসর হয় তাহলে খুব বেশী বিপদ হয় না। হাফব্যাক বিপক্ষের একজনকে টানবে (Draw) এবং unmarked অবস্থায় নিজ দলের খেলোয়াড়কে বলটি পাশ দিবে। যে পর্যন্ত না বিপক্ষের একজনকে draw না করা যায় সে পর্যন্ত সে বলটি এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিপক্ষের খেলোয়াড়কে draw করার উদ্দেশ্য নিজ দলের একজন খেলোয়াড়কে unmarked অবস্থায় পাওয়া। এই ভাবে কয়েক বার বলটি পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান ক'রে গোলের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যায়। এই ধরণের movement 'Tringle game' নামে পরিচিত এবং সাধারণত দু'জন ফরওয়ার্ড এবং একজন উইং হাফের মধ্যেই এই ভাবে বলটি আদান প্রদান করে অগ্রসর হওয়া যায়।

মোটের উপর অপর যে কোন তিনজন খেলোয়াড়ের মধ্যে এই বলটি আদানপ্রদান করে গোলের মুখে অগ্রসর হ'তে পারা যায়। যে সময়ে গোলের নিকটে সোজাসুজি আক্রমণ অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং দলের কোন খেলোয়াড়কেই unmarked অবস্থায় পাওয়া যায় না সে সময় সেণ্টার ফরওয়ার্ড দলের সেণ্টার হাফের কাছে বলটি পিছনে দিতে পারে। সেণ্টার হাফকে বলটি back pass করা মানেই আউট সাইড খেলোয়াড়কে প্রস্তুত হবার জন্য সঙ্কেত করা। সেণ্টার হাফ সেণ্টার ফরওয়ার্ডের কাছ থেকে বলটি পেয়েই বলটি পেনাল্টি এরিয়ায় এগিয়ে দিবে। এই ধরণের পাশের জন্য আউট সাইড পূর্ব্ব থেকেই প্রস্তুত থাকবে এবং ব্যাক তাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসবার পূর্ব্বেই আউট সাইড খেলোয়াড় বলটি 'ফ্লাইং শট' মেরে গোল লক্ষ্য করবে।

খেলার সর্ব্বক্ষণই প্রত্যেক ফরওয়ার্ড চেষ্টা করবে নিজেদের কি ভাবে unmarked positionএ রাখা যায়। এই unmarked position থেকেই সহযোগিদের কাছ থেকে pass পাওয়া সব থেকে কার্য্যকরী হবে। নিয়মিতভাবে খেলার দরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা এমন বোঝাপড়া হয়ে যায় যে, প্রত্যেক খেলোয়াড় প্রত্যেকের 'পাশ'গুলি সম্বন্ধে একটা পূর্ণ ধারণা লাভ করে এবং পাশগুলি পাবার জন্যে প্রত্যেক খেলোয়াড় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের স্থান নির্ণয় করে নিতে পারে। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের সম্মিলিত খেলার পদ্ধতিতে এই বোঝাপড়া, এবং বল পাশের anticipation যেমন দর্শনীয় তেমনি বিপক্ষের পক্ষে মারাত্মক। বিপক্ষের খেলোয়াড়দের যদি ঘুরে গিয়ে বল নিতে হয় তাহলে তারা বলটি তার কাছে আসবার পূর্ব্বেই পাশ করবে। বলটি যখন তার কাছে আসবে সে সময় unmarked position যেন পাওয়া যায়। ফরওয়ার্ডের সকল খেলোয়াড়ই এই ধারণায় থাকবে যে, বলটি যে কোন খেলোয়াড়ের কাছে আসতে পারে। এবং তার জন্য প্রত্যেকেই প্রস্তুত থাকবে।

বলটি নিজের দলের খেলোয়াড়কে পাশ দিয়ে পুনরায় তার কাছ থেকে return pass পাবার জন্য ছুটে না গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে খেলার অবস্থা দেখা খেলোয়াড়দের একটা মস্ত ভুল। বল খেলা অবস্থায় কোন ভাল খেলোয়াড় কখনও স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না। তারা খেলার গতির অবস্থার সঙ্গে বার বার নিজেদের position বেছে চলে।

অনেক ফরওয়ার্ড বিপক্ষের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বল সংগ্রহ করতে কয়েকবার চেষ্টা করেই হতাশ হয়ে ছেড়ে দেয়। তারা ভাবে তার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে, বলটি নেবার দায়িত্ব এবার হাফ-ব্যাকদের। কিন্তু হাফ ব্যাককে draw করতে ফরওয়ার্ড যে সময় দিবে তাতে বিপক্ষের খেলোয়াড়ই তার নিজের সাফল্য বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবে। ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়রা যদি হতাশ হয়ে ছেড়ে না দিয়ে বিপক্ষের খেলোয়াড়কে কেবল অনুসরণ করে তাহলে তাকে উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে বলটি তাড়াতাড়ি পাশ করতে হবে, এর ফলে বলটি বাধা দিতে হাফব্যাকের যথেষ্ট সুবিধা হবে।

রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের এক বিষয়ে মস্ত ভুল দেখা যায়। তারা বিপক্ষের একজন ফরওয়ার্ডকে বাধা দেবার ভার একজনের উপর ছেড়ে দিয়ে বাকি সকলেই পিছনে হটে গোল রক্ষার ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আত্মরক্ষার এ পন্থা মারাত্মক। অন্ততঃ একজন ফরওয়ার্ড (ইনসাইড) দলের হাফব্যাককে সহযোগিতার জন্য পিছিয়ে আসবে এবং তাকে অনুসরণ করবে। অনেক ব্যাকই বলটি clear করবার পূর্ব্বে বিপক্ষের ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়ের সঙ্গে প্যাচ দিয়ে বলটি ডজ ক'রে নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে খুবই পছন্দ করে। ব্যাকের এই দুর্ব্বলতা কিন্তু বিপক্ষের অপর ফরওয়ার্ডের যথেষ্ট সুবিধা ক'রে দেয়।

গোলের মুখে অনেক সময় দেখা গেছে, যে খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে বলটি পাশ করা হয়েছে তার কাছে পৌঁছবার পূর্ব্বেই তারই দলের অপর এক খেলোয়াড়কে অতিক্রম ক'রে বলটি চলেছে। এ অবস্থায় বিপক্ষের খেলোয়াড় যদি বলটি বাধা দিতে অগ্রসর না হয় তাহলে বলটি না গ্রহণ করাই তার উচিত; যার উদ্দেশ্যে বলটি পাশ করা হচ্ছে তাকেই বলটি পাবার সুযোগ দিতে হবে। তবে সে যদি দলের অপর খেলোয়াড়দের থেকে ভাল positionএ উপস্থিত থাকে তাহলে গোল সন্ধান করা তার পক্ষে অনধিকার নয়।

মোহনবাগান ক্লাব ঃ

প্রত্যেক জাতিরই সাফল্যময় জীবনের এক একটি গৌরবময় অধ্যায় আছে। তেমনি ফুটবল খেলার ইতিহাসে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে ১৯১১ সাল স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ঐ বৎসর মোহনবাগান ক্লাব সর্ব্বপ্রথম খাঁটি বাঙ্গালী এবং ভারতীয় ক্লাব হিসাবে ফুটবল খেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায় আই-এফ-এ শীল্ড বিজয়ী হয়। সে আজ বহুদিনের কথা। তারপর ৩১ বৎসরের দীর্ঘ সাধনায় মোহনবাগান ক্লাবকে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতায় সম্মান অর্জ্জন করতে দেখা গেছে। মোহনবাগান ক্লাব ছাড়া আরও কয়েকটি ভারতীয় ক্লাব নিজেদের সাফল্যে জাতীয় সম্মান এবং গৌরব আরও বৃদ্ধি করেছে। একমাত্র ভারতীয় ক্লাব হিসাবে শীল্ড বিজয়ের রেকর্ড মোহনবাগান ক্লাবের আর নেই, তবু আজও এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্ব অর্জ্জিত জনপ্রিয়তাকে কোন দলকেই অতিক্রম করতে দেখা গেল না। ১৯১২ সালের শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাব বহুবার তার দলের সমর্থক এবং দেশের ক্রীড়ামোদীদের হতাশ করেছে। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত আশা

আকাঙ্খা মর্ম্মন্তুদ বেদনার দীর্ঘ নিশ্বাসে খেলার মাঠে শেষ হয়েছে। তবু আগামী কালের কথা স্মরণ ক'রে ক্রীড়ামোদীরা এই প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর সমর্থন করে আসছেন।

মোহনবাগানের এই জনপ্রিয়তা একমাত্র খেলাধূলার কৃতিত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। খেলাধূলার মধ্যে বহু শিক্ষণীয় বিষয় অর্জ্জন করবার আছে। একমাত্র জয়লাভই যাদের খেলার মধ্যে দেখা দিয়েছে তারা দলের সভ্যদেরই সমর্থন পেয়েছে কিন্তু জনপ্রিয় হয়নি।

মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়দের গত ক'বছরের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড আলোচনা করলে দেখা যাবে যে কোন শক্তিশালী ফুটবল দলের তুলনায় এই দলের রক্ষণভাগ বেশী শক্তিশালী কিম্বা সমকক্ষ, কিন্তু আক্রমণ ভাগের খেলা সেই তুলনায় নৈরাশ্যজনক।

ফুটবল খেলার নীতি হিসাবে বলা চলে বিপক্ষকে উপর্য্যুপরি আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। যেখানে গোল দেওয়ার তারতম্যের উপরই খেলার জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় সেখানে আক্রমণ ভাগকে দুর্ব্বল রেখে রক্ষণ ভাগকে শক্তিশালী করার কোন মূল্য নেই। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা যদি সুযোগ পেয়েও গোল দিতে না পারে তাহলে তাদের চমৎকার খেলা, এবং রক্ষণ ভাগের ক্রীড়াচাতুর্য্য কোন কাজে আসে না। মোহনবাগান ক্লাবের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা গত কয়েক বছর এই দলের জয় লাভের সমস্ত আশা নির্ম্মূল করেছে। অথচ আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের খেলার উন্নতির দিকে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী খুব সচেষ্ট আছেন বলে মনে হয় না। যে ক্ষেত্রে বাঙ্গালার বাইরে খেলোয়াড় আমদানী তাঁদের উদ্দেশ্য নয় সেক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষাধীনে রেখে দলের খেলোয়াড়দের খেলার উন্নতির ব্যবস্থা করা অযৌক্তিক নয়। ক্লাবের খেলোয়াড়রা বার বার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে তাঁদের বর্ত্তমান শিক্ষকের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

খেলার অবস্থা এবং বিপক্ষদলের খেলার পদ্ধতির উপর যে নিজ দলের খেলার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়রা অন্ততঃ খেলায় তার পরিচয় খুব কমই দেন। যেখানে সকল ইন্‌ম্যানই বার বার অকৃতকার্য্য হচ্ছিলেন সেখানে আউট ম্যান দিয়ে খেলান পরীক্ষামূলকই কেবল নয় খুবই কার্য্যকরী। খেলোয়াড়দের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার অভাব যথেষ্ট দেখা গেছে। সর্ব্বোপরি গোলের মুখে অগ্রসর হয়ে অজস্র সুযোগ পেয়েও খেলোয়াড়রা ব্যর্থতার চরম দৃষ্টান্তের পরিচয় দিয়েছেন।

মোহনবাগান ক্লাব বহুদিনের প্রাচীন একটি জাতীয় জনপ্রিয় ফুটবল প্রতিষ্ঠান। তার খেলার ত্রুটিবিচ্যুতির সম্বন্ধে আলোচনা করার উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের সুনাম খর্ব্ব করা নয়। ত্রুটির কথা আলোচিত হ'লে পরিচালকমণ্ডলী ত্রুটী সংশোধনের চেষ্টা করবেন, খেলায় খেলোয়াড়দেরও দায়িত্বজ্ঞান আসবে। প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে তার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় দরবারে নিজ জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবে।

ফুটবল সম্পূর্ণ বিদেশী খেলা। সুতরাং 'কোচ' হিসাবে বিদেশী খেলোয়াড়রাই খ্যাতি অর্জ্জন করে এসেছেন। মোহনবাগান ক্লাবের মত ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বিদেশী 'কোচ' আনিয়ে খেলোয়াড়দের ফুটবল খেলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। আর্থিক প্রশ্নটা বড় নয়। আজও মোহনবাগানের চ্যারিটি খেলায় অধিক সংখ্যক দর্শক সমাগম হয়। প্রয়োজন হ'লে এ উদ্দেশ্যে দেশের লোকের সহযোগিতার অভাব হবে না। বর্ত্তমানের পরিস্থিতিতে বিদেশী 'কোচ' আনানো হয় তো সম্ভব হবে না। কিন্তু আমাদের দেশের নামকরা অবসর প্রাপ্ত ফুটবল খেলোয়াড়ের ত অভাব নেই। কেবল মোহনবাগান ক্লাব কেন সকল ফুটবল প্রতিষ্ঠানের উচিত একাধিক প্রবীণ খেলোয়াড়দের শিক্ষাধীনে রেখে ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নত করা।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশী প্রণীত "অল-ইণ্ডিয়া প্লেয়ার ইন্‌ডাষ্ট্রি কোং"—১৲
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "বসন্তপুরের মাঠ"—৩৲
শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত "বার্ষিক-শিশুসাথী"—২।০
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "চিতা বহ্নিমান"—৩৲
শ্রীরাধারমণ দাস-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "বজ্রাঘাত"—১৲
শ্রীঅবোধকুমার সান্যাল প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মাটী আর পাথর"—১॥০
মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্দীন প্রণীত "নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা"—।০
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আপন-প্রমাদ"—২৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "রাতের-স্বপন"—২৲
শ্রীশিশিরকুমার বসু প্রণীত উপন্যাস "দাম্পত্য-কলহে চৈব"—১।০
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত প্রণীত "পলিসিনেস দি গ্রেট"—৸০,
"ফরাসী গল্পগুচ্ছ"—১৸০
শ্রীমন্মথনাথ মিত্র অনুদিত ইসাডোরা ডানকানের আত্মচরিত
"আমার জীবন"—২।০
কৃষ্ণধন রায়চৌধুরী প্রণীত "চণ্ডী" (কাব্যানুবাদ)—।৵০
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ভারতবর্ষ ও মার্কস্‌বাদ"—২৲
শ্রীহরবিত দত্ত প্রণীত কবিতা গ্রন্থ "মর্ম্মবাণী"—১৲
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ইউরোপ ভ্রমণ"—১।৵০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

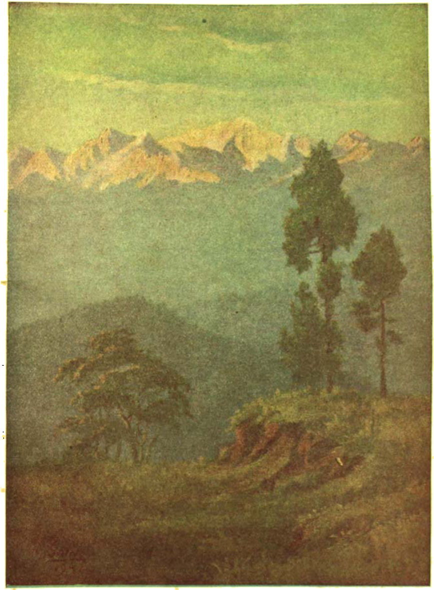

শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible] সেন

কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্য্যোদয়

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ—১৩৫০

প্রথম খণ্ড | একত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ইংরাজ আমলের আদিযুগে মূল্যনিয়ন্ত্রণ

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি

এদেশে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যনিয়ন্ত্রণ সমস্যাকে জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারীরা একটা নূতন সমস্যা মনে করিতেছেন। গত যুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চাউলের দাম শতকরা ৬১ ভাগ এবং গমের দাম ৮৮ ভাগ বাড়িয়াছিল। এরূপ বৃদ্ধিতে কেহই বিশেষ বিচলিত হন নাই; কাজেই সে সময় মূল্যনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উঠে নাই। ঊনবিংশশতাব্দীতে আমাদের প্রভুরা Laissez-Faire বা অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারের নিরপেক্ষ থাকার নীতি অনুসরণ করিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের নিজের স্বার্থ কিসে বজায় থাকে জানে; সুতরাং তাহারা নিজে যাহা ভাল বুঝে তাহাই করুক, তাহা হইলেই সকলের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে এই ছিল সে যুগের অর্থনীতির মূলমন্ত্র। এ হেন যুগে মূল্য-নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে সরকার নিরতিশয় পাপকর্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাই বিগত শতাব্দীর ইতিহাস হইতেও আধুনিক সমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আর্থিক ব্যাপারে সরকারী নিরপেক্ষতা নীতি ইংরাজেরা পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই; তাই সে যুগের বাঙ্গালা-বিহারের অন্ন কষ্টের সময় ইংরাজ শাসকগণ মূল্যনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টার বিবরণ যদি সকলে অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে হয়তো আজকালকার অনেক ভুলভ্রান্তির হাত হইতে আমরা অব্যাহতি পাইতাম।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইংরাজ সরকার সর্বপ্রথমে মূল্যনিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। মারাঠাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে অনেক চাষী কৃষী ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল; অনেক গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তাহার উপর আবার ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে সহসা ভীষণ বন্যা আসিয়া মাঠের ও ঘরের সকল শস্য নষ্ট করিয়া দিল। ইহার ফলে এমন এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে গত ষাট বৎসরের মধ্যে জিনিষপত্রের দাম কখনও এত বেশী বাড়ে নাই। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে টাকায় আড়াই মণ—তিন মণ চাউল পাওয়া যাইত; আর ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে তাহার দাম উঠিল টাকায় বাহান্ন সের, আরও দাম বাড়িয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কাতে কোম্পানী নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন যে তাঁহাদের অধীন স্থানসমূহে অর্থাৎ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী চল্লিশখানি গ্রামে সাধারণ চাউল টাকায় পঞ্চাশ সের করিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। তাঁহারা হলওয়েল সাহেবকে নির্দেশ দিলেন যে প্রত্যেক বাজারে এই নিয়মের কথা ঘোষণা করিতে হইবে এবং জানাইয়া দিতে হইবে যে ইহার চেয়ে বেশী দামে চাউল বিক্রয় করিলে গুরুতর দণ্ড দেওয়া হইবে (Despatch to Court of Directors, January 2, 1752)। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে চাউলের দাম বাড়িতেছে দেখিয়াই কোম্পানী দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এবারে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মূল সমস্যা আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে দুইটী Price Control Conference আহ্বান করিয়াছিলেন তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নাই, কেননা ১৯২৯-৩৪ খৃষ্টাব্দের মূল্য হ্রাসের সময় কৃষকেরা যে ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে তাহার জন্য তাহাদিগকে অধিক মূল্য গ্রহণ করিতে দেওয়া হউক। সমস্যা যখন কেবলমাত্র মাথা তুলিতেছিল, তখন তাহার

সমাধান করিবার কোন চেষ্টাই হইল না। যাহা হউক, ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী চাউলের দাম বাঁধিয়া দিয়াও চাউলের দাম কমাইতে পারিলেন না। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় টাকায় আটাশ সের দরে চাউল বিক্রয় হইতে লাগিল। গুরুতর শাস্তি দিবার ভয় দেখাইয়াও কোম্পানী মূল্য-নিয়ন্ত্রণে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে চাহিদা ও সরবরাহের কথা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন দর বাঁধিয়া দিলে তাহা কার্যকরী হয় না। এই সাধারণ কথাটা এযুগেও উপলব্ধি না করার ফলে মূল্যনিয়ন্ত্রণ যে প্রহসনে পরিণত হইয়াছিল ইহা সকলেই জানেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের নিদারুণ সঙ্কটের দিনে ইংরাজ সরকার প্রজার দুঃখ লাঘবের ও প্রাণরক্ষার কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা শুধু খাদ্যশস্য মজুতকারীদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে এই ঘোষণা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। যেখানে শস্য কিছু পাওয়া যায়, সেখান হইতে রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এদিকে রেজা খাঁ অভিযোগ করেন, কোম্পানীর কর্মচারীদের গোমস্তারা একধার হইতে ফসল কিনিয়া লইতে লাগিল; তাহারা জোর করিয়া চাষীকে বীজধানও বেচিতে বাধ্য করিল। এইসব কথা পরে যখন বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা শুনিলেন তখন তাঁহারা এইরূপ অপরাধীদের নাম জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐ সব নাম জানান হইল না। ইহা হইতে তাঁহারা সন্দেহ করিলেন যে গোমস্তাদের পিছনে এমন সব লোক ছিল যাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অসাধারণ; সুতরাং তাহারা নিজেদের মানমর্যাদা রক্ষার জন্য সমস্ত ব্যাপার চাপিয়া গেল। আজকালও যে এরূপ ব্যাপার হইতেছে না তাহা নহে। দেশের চরম দুর্দিনে গরীবের রক্ত শোষণ করিয়া প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা যুগে যুগে স্ফীত হইয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় কোম্পানীর সৈন্যদের খোরাক জোগানের ব্যবস্থাও দেশের খাদ্য-সঙ্কটকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল। সৈন্যদের জন্য পূর্ব হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিয়া রাখা হয় নাই। কাজে কাজেই যেখানে কিছুপরিমাণ খাদ্য মিলিত, সেইখানেই কোম্পানীর সৈন্য লইয়া যাওয়া হইত। ফলে সেখানে খাদ্যের অভাব আরও গুরুতর হইত।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতে আবার ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মন্বন্তর দেখা দিল। তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস বাঙ্গালার বড়লাট। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কার্যকুশলতা সহকারে প্রথম হইতেই মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে কমিটি অব রেভিনিউ প্রত্যেক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে জানাইলেন যে বৃষ্টির অভাবে ফসল অনেক জায়গাতেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একেই তো খাদ্যদ্রব্যের অভাব দেখা দিয়াছে; ইহার উপর আবার যেন বণিকেরা মাল কিনিয়া মজুত রাখিয়া দাম বাড়াইয়া না দেয়। কমিটি তাই ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে আদেশ দিলেন যে ঢোলসহরত করিয়া জেলার প্রত্যেক গঞ্জ ও বাজারে যেন ঘোষণা করা হয় যে—কোন ব্যবসায়ী যদি মাল গোপন করিয়া লুকাইয়া রাখে বা বাজারে আনিতে অথবা যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিক্রয় করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে এবং তাহার মাল কাড়িয়া লইয়া গরীবদিগকে বিতরণ করা হইবে (মজঃফরপুর রেকর্ড হইতে শ্রীযুক্ত কালিপদ মিত্র কর্তৃক Indian Historical Records Commission এর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত)। ঐ তারিখে যুক্তিসঙ্গত মূল্য কি তাহা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই এবং শাস্তি কিরূপ কঠোর হইবে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হয় নাই। দাম বাঁধিয়া দেওয়ার পরিবর্তে এবার যাহাতে দাম বাড়িতে না পারে তাহার দিকে সরকার বাহাদুর মনোযোগ দিয়াছিলেন। যদি মালের আমদানী না থাকে, তাহা হইলে দাম বাড়িবেই। তাই আমদানী যতদূর সম্ভব বজায় রাখিবার জন্য সরকার বাহাদুর যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যেখানে অপেক্ষাকৃত বেশী ধান-চাল ছিল সেখান হইতে যেখানে অভাব বেশী সেখানে রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হইল। ত্রিহুত ও সারণ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটরা নিজের নিজের এলাকা হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শোর সাহেব তাঁহাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি লিখিলেন যে পাটনা ও দানাপুরে শস্যের এমন অভাব দেখা দিয়াছে যে তাহার আশু প্রতীকার না করিলেই নয়; অতএব ব্যাপারী ও মহাজনদিগকে যেন ত্রিহুত ও সারণ জেলায় অব্যাহতভাবে মাল কিনিয়া বিহারের সর্বত্র রপ্তানী করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, পরে দাম আরও বাড়িবে ভাবিয়া যাহারা মাল না বেচিবে তাহাদের মাল যেন কাড়িয়া লইয়া বাজার দরে বিক্রয় করা হয়। কাহার কত মাল মজুত আছে তাহা যেন ম্যাজিষ্ট্রেটরা বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে অনুসন্ধান করেন। কমিটি অব রেভিনিউ প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেটকে মফঃস্বলে যাইয়া কোথায় কত ধান চাল মজুত আছে ও ফসলের অবস্থা অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কিরূপ তাহার খোঁজখবর লইতে আদেশ দেন। একসঙ্গে যখন অনেক ব্যাপারী ও মহাজন কোন জায়গায় মাল খরিদ করিতে চায়, তখন সাধারণতঃ সেখানকার দাম বাড়িয়া যায়। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে তাঁহারা যেন সেখানকার দাম বাড়িতে না দেন। মহাজনদিগকে যদি চড়াদামে না কিনিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে চড়াদামে বেচিতেও নিষেধ করা যায়। ওয়ারেন হেষ্টিংস যে এই নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত ঘোষণা হইতে বুঝা যায়—"Notice is hereby given to all merchants, Europeans as well as natives—Deparies, Ryots, Goldars and Ammuldars, zemindars, renters and others that whoever shall be found to hoard up and to evade bringing to market the grain they may have in store over and above what may be esteemed necessary for the subsistence of their Hoveies or to attempt selling it at an exorbitant price shall upon information and sufficient evidence there of be subject to have the whole confiscated and to such other penalties as Government may think proper to inflict." অর্থাৎ এতদ্বারা দেশীয় ও ইউরোপীয় সকল বণিক, বেপারি, রায়ত, গোলদার, আমালদার, জমীদার ও অন্যান্য সকলকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে তাঁহাদের নিজেদের হাবেলির খাইবার জন্য যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার চেয়ে বেশী যদি কেহ মজুত করিয়া রাখেন অথবা অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উহার খবর ও প্রমাণ পাইলে সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইবে এবং অন্য যে কোন শাস্তি সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন তাহা দিবেন।

গত মে—জুন মাসে (১৯৪৩) বিহার ও বাংলার মধ্যে যখন অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত হইয়াছিল, তখন কেনা-বেচার কোন দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই, অথবা দাম যাহাতে না বাড়িতে পারে তাহারও চেষ্টা করা হয় নাই। ফলে ঐ সময়ে পাটনায় চাউলের দাম ১৭।১৮ টাকা হইতে ২৫-২৬ টাকায় উঠিল; পাটনাবাসীরা অবাধবাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। অথচ কলিকাতায় চাউলের দর ৩০।৩৫ টাকার চেয়ে কম হইল না। কলিকাতায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজোট থাকার দরুণ তাঁহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইল না। অবাধ বাণিজ্যের যাহা কিছু সুবিধা বণিকেরা পাইল; বাংলা ও বিহারের কৃষক ও জনসাধারণ তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইল না। কেন্দ্রীয় সরকার যদি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হয়তো এতটা বিভ্রাট ঘটিত না।

এখানে কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য সমস্যাদের সুব্যবস্থা করিবার জন্য একটি সরকারী বিভাগ খুলিতে অনেক দেরী করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে যখন দেখা গেল যে শস্য ভাল হইবার আশা নাই, তখনই ওয়ারেন হেষ্টিংস টমাস্ গ্রাহাম, জর্জ ফার্বিং, টমাস্ ল এবং জর্জ টেম্পলকে লইয়া একটি committee of Grain নিযুক্ত করেন। ইঁহাদের কর্তব্য ছিল কোম্পানীর অধীন সকল এলাকার দর নিয়ন্ত্রণ ও পর্য্যবেক্ষণ করা এবং শস্যের বিক্রয় ও বণ্টন ব্যবস্থা করা। কমিটি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিজ নিজ এলাকায় কত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং গত বৎসরের কত শস্য উদ্বৃত্ত আছে তাহার বিবরণ জানাইতে আদেশ দেন। প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যহ শস্যের বাজারদর কত ছিল তাহা কমিটিকে জানাইতে হইত। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে শস্যের দর খুব বেশী বাড়িতে পারে নাই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে অবস্থার যখন খানিকটা উন্নতি হইল, তখন উক্ত কমিটির সভ্যগণ সকলকে বিদায় দিয়া কেবলমাত্র সভাপতির নিয়োগ বহাল রাখা হইল। কমিটির যাবতীয় কর্তব্য সভাপতিই অতঃপর নির্ব্বাহ করিবেন স্থিরীকৃত হইল। এইরূপ কোন কর্মচারীকে যদি বরাবর নিযুক্ত রাখা হইত, তাহা হইলে আধুনিক সমস্যার সূত্রপাতের সময়ই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারিত।

যেমন এখানে, তেমনি সেকালে স্থানীয় শাসকেরা অন্নকষ্টের আশঙ্কা দেখা দিলেই নিজের এলাকা হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিতেন। ইহাতে দেশের মজুত শস্য বিভিন্নস্থানে সমভাবে বণ্টিত হইতে পারে না। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের সহকারী সচিব দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে শস্যের ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানী-রপ্তানীর উপর হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করেন। দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট দেখিতে পান যে পনেরো হাজার মণ শস্য তাঁহার এলাকার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, তাই তিনি উহা ধরিয়া রাখেন। এইরূপ কার্য্য নিবারণের উদ্দেশ্যে উক্ত আদেশ প্রদত্ত হয় (Bengal District Records, Dinajpore, No. 161 and 162)।

ট্রামে বাসে

শ্রীমতী মীরা রায়

প্রণব বলে মেয়েরা মুখে যতই পুরুষের সমান পর্য্যায়ে দাঁড়ানোর দাবী করুক না কেন সেটা শুধু নিজেদের সুবিধাটুকুর বেলা। আমাদের সঙ্গে সমান পাল্লায় কষ্টসহিষ্ণুতায় ওরা কখনো দাঁড়াতে চায়? এই তো, ধরো না কেন, ট্রামে বাসে উঠ্‌লে তাদের আলাদা লেডিজ্ সীটটি খালি ক'রে দিতে হ'বে, এটা তাদের জন্মগত দাবী। কোথায় রইল তোমার 'ইকোয়াল রাইট্স'? কই, কোনদিন তো কোন মেয়েকে শুন্‌লাম না ছেলেদের বল্‌ছে না, না, আপনারা বসুন, এটুকু পথ আমি দাঁড়িয়েই যেতে পারবো। বরং ছেলেরা সীট ছেড়ে না উঠ্‌লেই তাদের মনে মনে রাগ হ'বে—আর ভাববে 'কি অসভ্য এই লোকগুলি।' শুধু কি তাই? সেদিন তো একটি মেয়ে স্পষ্টই বল্‌ল, 'লেডিজ সীট ছেড়ে দিন'। উঃ, নারী প্রগতির কি চরম পরিণতি!

প্রণব সব কথা মনে মনে ভাবে, আর ঘামে। ঘামে কেন? বাঃ ঘামবেই তো, সে যে উঠেই বাঁ দিকের লম্বা বেঞ্চিতে ব'সেছে। আর, বাসের এই চার-সীটে বেঞ্চিটি যে লেডিজ সীটের নামাবলী নিয়ে শুচিতা রক্ষা করে চলে একথা কলকাতার কে না জানে?

তবু রক্ষা এই যে বাস ছাড়ার মধ্যে কোন লেডি এখন পর্য্যন্ত ওঠে নি। উঠ্‌লে কি হ'বে প্রণব তা' এখনও ঠিক জানে না। জানবার কথাও নয়, কারণ সমস্যাটি বেশ জটিল। প্রথমতঃ, বাসের আর সব সীটই ভর্ত্তি, শুধু প্রণবেরটিই খালি, তবে এটি লেডিজ মার্কা-মারা। দ্বিতীয়তঃ, একজন লেডি যদি অনুগ্রহ ক'রে ওঠেন তাহলে প্রণব এক কোণায় এবং তিনি অন্য কোণায় বসলে তাঁর কোনও শুচিতায় বাধবে কিনা। অবশ্য মধ্যে দুজনের মতো জায়গা ফাঁকা থাকছে। বাতাসের ব্যবধান বা 'এয়ার গ্যাপ' বিদ্যুতের পক্ষে যথেষ্ট 'ইনসুলেটার' বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে ইনসুলেশন থিওরী খাটবে কি!—তৃতীয়তঃ, যদিও একজন মাত্র মেয়ে উঠলে প্রণব চেষ্টা ক'রে ব'সে থাকতে পারে, দুজন বা তিনজন উঠ্‌লে সে কি করবে? একসঙ্গে চারজন উঠ্‌লে অবশ্য সমাধানটা অনেক সহজ হ'য়ে যায়।

এ সব সমস্যা প্রণবের মাথায় আগেও এসেছে, কিন্তু আজকের মতো বাস্তব অবস্থায় ঠিক যেন সে আর কখনো পড়েনি। তা না হ'লে সে দিনও সে বাড়ীতে ঝগড়া ক'রেছে তার দিদির সঙ্গে "আচ্ছা দিদি, তোমরাও তো কলেজে পড়েছ, ট্রামে বাসে ঘুরেছ, তোমরা কখনো পুরুষদের সঙ্গে বেঞ্চিতে বসোনি? এমন কি কোনদিন হয়নি যে তোমাদের পাশে জায়গা খালি র'য়েছে, অথচ ভদ্রলোকেরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন? বস্‌তে বলেছ কখনো?"—দিদি বলেন "তা অবশ্য কখনো বলিনি, তবে বস্‌লে আপত্তি করতাম না।" "অনেক অনুগ্রহ তোমাদের। সবাই সমান।" বলে রাগ ক'রে প্রণব চা'য়ে চুমুক দিয়েছে "আপত্তি তোমরা মনে মনে করো।"—দিদি হেসে বলেন "কি ক'রে জান্‌লি মনে মনে করি? তুই কখনো ব'সে দেখেছিস কেউ সে রকম ভাব দেখিয়েছে?" প্রণব বলে "হুঁঃ, বসি আর তারপরে বলুক 'উঠুন', কিম্বা 'লেডিজ সীটে কেন বস্‌ছেন'—তখন আমার সম্মানটা কোথায় থাকবে বাস ভর্ত্তি লোকের মধ্যে? তারপরে বাসের মধ্যের সব শিভালরাস হতভাগাগুলো আমাকে নাজেহাল করুক আর কি—'হ্যাঁ মশায়, লেডিজ সীটে কেন বস্‌ছিলেন?' আর ওদের যদি আমার যুক্তি বলি তাহ'লে ওরা বুঝবে কিছু? ওদের ইন্টেলেক্‌চুয়াল ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব'লে কিছু আছে?" দিদি বলেন "রোজই তো এতটা পথে ইউনিভার্সিটি যাস, যদি কখনো সে রকম হয় তাহ'লে ব'সেই দেখিস্। আর তুই বল্‌লে—" একটু মুখ টিপে হেসে বলেন "বোধহয় কারো আপত্তি হ'বে না, চেহারাটা তো ঠিক 'কংসরাজের বংশধর' ব'লে মনে হয় না।" "আঃ, দিদি—!" ব'লে প্রণব উঠে পড়ে।

কিন্তু সে যাই হোক্, আজ যে সম্মুখ সমস্যা। কিন্তু না, এ রকম

আর চল্‌তে দেওয়া হ'বে না। সীট খালি থাক্‌বে অথচ ঝাঁকানি খেতে খেতে পড়ি-কি-মরি ক'রে বাসের ডাণ্ডা ধ'রে বাদুড়-ঝোলা হ'য়ে এতটা পথ যেতে হ'বে? তা হ'তে পারে না।

"রো-খ্‌কে"—কণ্ডাক্টর হাঁক্‌ল। এই যে, যেখানে বাসের শুরু—। তা হোক্‌, যথেষ্ট এবার গ্যাপ্‌ র'য়েছে। প্রণব ঘাবড়ায় না, স'রে গেল একেবারে বেঞ্চির ওই কোণায়। কিন্তু মেয়েটি? হ্যাঁ, ঐ যে, চোখ স্ফীত হ'য়েছে একটু। হ'বেনা? সমস্ত বেঞ্চিটার অধিকার যে এখন ওর—অন্ততঃ ও তাই মনে করে, কারণ চিরকাল তাই মনে ক'রে এসেছে। কিন্তু আজ আর প্রণব উঠ্‌ছে না, যতই তুমি চোখ পাকাও।

মেয়েটি একটু ইতস্ততঃ করল। তাই বোধহয় বাসশুদ্ধ লোকের দৃষ্টি বেঞ্চিটার ওপর এসে পড়ল। আর দু সেকেণ্ড দেরী হ'লেই প্রণবকে হয় নিজে থেকেই উঠে পড়তে হ'বে, আর তা না হ'লে তৃতীয় সেকেণ্ডে বাসের শিভালরাস লোকগুলো ব'লে বস্‌বে মশায়, লেডিজ সীট ছেড়ে দিন, উনি বস্‌বেন। প্রণবের কানের দিকে ব্লাড সার্কুলেশন বাড়তে আরম্ভ করেছে। কিন্তু আজ তার ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-বিচারবুদ্ধি অসাধারণ হ'য়ে উঠেছে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সহজভাবে প্রণব বল্‌ল "বসুন"। সে বোধহয় একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বসে পড়ল বেঞ্চির কোণটিতে।

এবার ভুরু কুঞ্চিত হ'লো প্রণবের। ব্যাপারটা যে একটু দৃষ্টিকটু হ'লো, মেয়েটি তা বুঝেছে। সত্যিই তো, এত বড় বেঞ্চিতে ছেলেটি যদি ওই কোণায় ব'সে থাকে তাহ'লে এই কোণায় তার না বস্‌বার সঙ্গত কারণ কি থাকতে পারে? ছি ছি, ছেলেটি তাকে নিশ্চয়ই একটু গেঁয়ো, একটু ব্যাকওয়ার্ড মনে ক'রছে। সে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল। অজান্তে তার দৃষ্টি প্রণবের দিকে কখন ফিরেছিল সে বুঝতে পারেনি। প্রণব এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল, এখন সহজভাবে সামনের দিকে দৃষ্টি ফেরালো। সে অনুভব করতে পারল মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মেজাজ আবার বিগড়ে গেল—যতই তাকাও আমি কখনই উঠ্‌ছি না, এটি জেনে রেখো—মনে মনে প্রণব সংকল্প অটল ক'রে ব'সে রইল।

"টুং"—। বাস থাম্‌ল।—আবার নূতন ক'রে সমস্যা আরম্ভ হ'লো। নবাগতাটিরও একটু খট্‌কা! আরে বাপু, এখনো তো দুটো যায়গা খালি রয়েছে ব'লো না—প্রণব মনে মনে গর্জ্জাতে থাকে। কিন্তু আগের মেয়েটি প্রণবকে অবাক ক'রে দিল, সে প্রণবের দিকে একটু সরে এসে ওর জন্য অন্য ধারে কোণায় যায়গা ছেড়ে দিল। প্রণব মনে মনে গজ্‌গজ্‌ করতে থাকে অনেক সম্মান দেখিয়েছে আমাকে। দেখব আর একজন উঠ্‌লে কি করো। কিন্তু না বাপু, আর কারো উঠে কাজ নেই, আমার এক্সপেরিমেণ্টেও আর দরকার নেই। এখন ভালোয় ভালোয় আর খানিকটা পথ পার হ'তে পারলে বাঁচি। আর একজন উঠ্‌লে আর বসা চলবে বলে মনে হ'চ্ছে না, যদিও যায়গা আর একজনের মতো ঠিকই আছে।

কিন্তু কেন? ওঁরা, রাস্তা-ঘাটে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবেন, সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে চাকরী নেবেন, ট্রামে বাসে ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে উঠ্‌বেনও, কিন্তু পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বস্‌লেই ওঁদের যত জাত যাবার ভয়! এর কোন মানে আছে? প্রণবের ইচ্ছা হ'লো ভীড়ের মধ্যে দাঁড়ানো ভদ্রলোকদের কাউকে বলে 'এইখানে একটা সীট খালি র'য়েছে ততক্ষণ বসুন না'। কিন্তু থাক্‌, এ সব কুসংস্কার দূর করবার মতো আউট্‌লুক্‌ এদের নেই। কিন্তু যাক্‌, আর প্রয়োজন হ'বে না ষোলকলা পূর্ণ হ'লো। এবার কি করা যায়? তৃতীয়াগতার জন্য সে উঠ্‌বে, কি উঠবে না? ইনি তার পাশে নিশ্চয়ই বস্‌বেন না।

সত্যই তিনি একটু থমকে দাঁড়ালেন। প্রণব উঠবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। "বসুন্‌ না, এখনি উঠ্‌বার দরকার কি, যায়গা তো র'য়েছে" ব'লে প্রথমা তরুণীটি প্রণবের পাশে সরে এসে অন্যদিকে যায়গা ক'রে দিল। প্রণব তাজ্জব! কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ল—উঃ আমার সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা! যাক্‌, তাও মন্দের ভাল।

হঠাৎ মেয়েটি নিম্নস্বরে বল্‌ল 'এবারে যদি আর কেউ ওঠে?' "তা হ'লে আমাকে উঠ্‌তে হ'বে" প্রণব নীরস স্বরে বল্‌ল। কেন আমিও তো উঠ্‌তে পারি, সব সময় আপনারাই দাঁড়িয়ে যাবেন তার কি মানে? প্রণব বল্‌ল 'বেশ তা যদি হয় তবে যখন সীট খালি ছিল তখন দাঁড়ানো ভদ্রলোকদের বস্‌তে বল্‌লেই পারতেন!' মেয়েটি উত্তর দিল 'সংস্কারে বাধে, এখনও অতটা পারিনা আমরা। তবে কেউ বস্‌লে আপত্তি করতাম না।' আবার সেই উত্তর!

'রো-খ্‌কে'। এবার দু'টি। যাক্‌, দুজন হোক আর একজনই হোক্‌, প্রণবকে এবার উঠ্‌তেই হ'বে। প্রণব উঠে দাঁড়ালো। পাশের মেয়েটিও। "আপনি উঠ্‌লেন কেন?" প্রণব প্রশ্ন করল। মেয়েটি উত্তর দিল "আমরা তো অনেকক্ষণ বসে এসেছি, এবার একটু দাঁড়াই।"

সেদিন সন্ধ্যার চায়ের টেবিলে প্রণব যেন বেশ শান্ত হ'য়ে ব'সেছে, স্বাভাবিক তর্কমুখরতা যেন তার আজ নেই। প্রতি সন্ধ্যায় চায়ের মজলিসটি প্রণবই চঞ্চল ক'রে রাখে। দাদা বল্‌লেন উঃ আজকাল ট্রামেবাসে যা ভীড়; বৌদি কথাটার শেষ করলেন 'ইচ্ছে হচ্ছিল নেমে হেঁটে আসি।' দাদা বল্‌লেন তার পরে এক সময় লেডিজ সীট খালি ক'রে দেওয়া নিয়ে কি কাণ্ড হ'লো! অতো ভীড়, তাও তাঁরা উঠ্‌বেন, আবার একজনের জন্য সমস্ত সীট খালি ক'রে দিতে হ'বে। দিদি হেসে বল্‌লেন "চুপ করো দাদা, আবার প্রণবের লেকচার সুরু হবে ঐ নিয়ে।" প্রণব শান্তভাবে বল্‌ল "না"। 'না' কেন? সবাই অবাক হ'য়ে তাকাল। "সবাই সমান নয়, তাই বলছি"—প্রণব বল্‌ল। দিদি অবাক্‌, বল্লেন—"সে কি রে?" প্রণব বলল্‌ "আমার মত বদলেছে।"

হিন্দুধর্ম্মে শক্তিবাদ

স্বামী বেদানন্দ

প্রায় সহস্র-বর্ষের পরাধীন হিন্দুজাতি আজ দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষ, আত্মরক্ষায় উদাসীন ও অক্ষম, পদে পদে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ;—ইহার মূল কোথায় ? হিন্দুজাতি পরাধীন কেন ? কেনই বা হিন্দুর এই ক্লৈব্য দৌর্বল্য ? বৈজ্ঞানিক শক্তি-সমৃদ্ধ অভ্যুদয়শালী জাতিসমূহের অবজ্ঞা-সূচক অভিমত—অতিমাত্র ধর্মপ্রবণতাই হিন্দুজাতিকে ইহ-বিমুখ এবং ভগবান্, পরকাল, মুক্তি ইত্যাদির প্রতি প্রলুব্ধ ও আসক্ত করিয়াছে ; ফলে হিন্দু ঐহিক অভ্যুদয় ও ঐশ্বর্য্য বঞ্চিত। আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতার আলোকে আলোকিত ভারতের হিন্দুগণের কণ্ঠেও উপরোক্ত মন্তব্যই একটু ভিন্ন আকারে উদ্গীরিত—হিন্দুজাতির অধঃপতনের বীজ—হিন্দুধর্ম। সহজ কথায়—হিন্দুধর্মই হিন্দুজাতির অধঃপতনের সর্বনাশের কারণ।

উক্ত ধারণা ও মন্তব্য যে নিতান্ত অসার ও বাল-সুলভ তাহা বলাই বাহুল্য। হিন্দুসমাজে বর্তমান প্রচলিত ধর্ম—হিন্দুধর্মই নয়, পরন্তু অধর্ম, অপধর্ম—হিন্দু ধর্মের মৃত কঙ্কালের বিকট, বিকৃত পরিহাস ; তাকে যদি কেহ হিন্দুধর্মের খাঁটি স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন তবে তিনি নিতান্ত অজ্ঞ, কৃপার পাত্র।

হিন্দুধর্মের মর্মবাণী শক্তিবাদ ; হিন্দুধর্মের সাধনা—শক্তির সাধনা। মানবাত্মা অনন্ত শক্তির আধার ; সেই শক্তিকে স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় পরিপূর্ণরূপে ফুটাইয়া তোলাই হিন্দু ধর্মের প্রেরণা ও সাধনা। জগৎ ও জীবন—মিথ্যা নয়, মায়া নয়, জীবন সংগ্রামকে উপেক্ষা করিয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন হিন্দুধর্মের নির্দেশ নয় ; পরন্তু জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত কর, জীবন সংগ্রামে বীর-বিক্রমে বিজয়ী হইয়া আত্মশক্তিকে বিকশিত কর, কর্ম প্রচেষ্টাকেই ধর্ম সাধনায় রূপান্তরিত করিয়া আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে বাস্তব জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়া বল—"তুমিত জড় কিছু নহ, তুমি যে নিত্য বিশ্বনাথ ! পাগল ভোলা ! একি এ খেলা মৃত্যু ঘেরি নিত্য রত..।"

হিন্দুর মূল ধর্মগ্রন্থ—বেদ ! বেদের মন্ত্রসকল, সূক্ত, প্রার্থনা, স্তুতি প্রভৃতির আলোচনায় দেখি—সেগুলির মধ্যে শক্তি সাধনার বাণীই ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত :— "হে ঈশ্বর ! তুমি বীর্য্য-স্বরূপ, আমাকে বীর্য্য দান কর ; তুমি বল-স্বরূপ, আমাকে বল দান কর, তুমি তেজঃ-স্বরূপ আমাকে তেজঃ দান কর, তুমি মন্যু স্বরূপ (শত্রুগণের সম্বন্ধে বা ক্রোধ স্বরূপ) আমাকে মন্যু দান কর।"[১] ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রবীর্য্য এই উভয় সম্পদই যেন আমি প্রাপ্ত হই।[২] হে অগ্রণী বীর, ধাবমান হও, বিজয় কর ; তোমাদের বাহুবল প্রচণ্ড হউক।[৩] আমার ব্রহ্মতেজঃ সুতীক্ষ্ণ হউক, বল বীর্য্য অক্ষুণ্ণ হউক।[৪] যাহাতে শত্রুবিনাশ করিয়া বলবান হইয়া, সর্বদা বিজয়ী হইয়া রাষ্ট্রের সেবা করিতে পারি, বীরবৃন্দের মধ্যে এবং জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে শির উচ্চ করিয়া থাকিতে পারি তাহার সাধনা করিব।[৫] আমি বিজয়ী বিশ্বজয়ী এবং দিকে দিকে শত্রুজয়ী হইব।[৬] হে তেজস্বী বীর ! সৈন্যবাহিনী লইয়া উত্থিত হও, ব্যূহ রচনা কর ; শত্রুসৈন্যকে নষ্ট, ভ্রষ্ট, পরাজিত কর।[৭] দুষ্ট শত্রুগণকে বিনাশ কর।[৮]

গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা প্রত্যেক আর্য্য হিন্দু উপাসনা কালে জগৎস্রষ্টা অনন্তশক্তি ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া ধ্যান করিত—সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত রক্তমাংসের দেহ আমি নহি, যিনি বিশ্ব প্রসবিতা, বিশ্বনাথ, আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর সহিত যুক্ত, আমি তিনিই, সুতরাং আমি ক্ষুদ্র, দুর্বল, ক্ষীণ নহি ; রোগ, শোক, মোহ আমার নেই ; আমি মহৎ, আমি অনন্তশক্তির অধিকারী ; আমি অজর, অমর, দেহাতীত আত্মা। "যিনি ভূলোক, দ্যুলোক, স্বর্লোক—এই ত্রিজগতের প্রসবিতা, সেই দেবতার বরণীয় তেজোশক্তিকে আমি হৃদয়ে ধ্যান করি। তিনি আমাদের বুদ্ধিতে প্রেরণা দান করুন"।[৯] "আমি শত শরৎকাল বেঁচে থাকবো, শত শরৎকাল দেখ্‌বো, শত শরৎকাল ধরে শুন্‌বো, শত শরৎকাল ধরে বল্‌বো। শত শরৎকাল অতিক্রম করেও বেঁচে থাকবো।"[১০] উপনিষৎ হিন্দুকে শিক্ষা দিয়াছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" বলহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। আত্মাকে লাভ করিতে পারে কে ? "আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী"—যে ব্যক্তি আচার্য্যের আশীর্বাদ প্রাপ্ত, যার শরীরে সামর্থ্য, মনে বল, মস্তিষ্কে মেধা প্রতিভা আছে ; তারই আত্মার নিহিত মহাশক্তি জাগ্রত হন।

উপনিষৎ আর্য্যহিন্দুকে প্রেরণা দিয়াছে—জগৎ অসার, মিথ্যা, মরীচিকাবৎ। কিন্তু সমস্তই ব্রহ্ম বা ভগবান।[১১] বিশ্বজগতের সমস্ত কিছুই ভগবানের দ্বারা পরিব্যাপ্ত।[১২] তিনি অণু হইতেও অণুতর, মহৎ হইতে মহত্তর।[১৩] সর্বত্র তিনি ওতঃপ্রোত, অনুস্যূত।

তবে জগৎ ও জীবনকে বাদ দিয়া উড়াইয়া দিবে কিরূপে ? সুতরাং ত্যাগী হইয়া ভোগ কর।[১৪] রিপু ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া অনাসক্তভাবে জীবনের যাবতীয় কর্তব্য কার্য্য বীরের মত সম্পাদন কর। পলায়ন করিবে কোথায় ? কেন ? এই সংসারে কর্তব্য কার্য্য করিতে করিতে শতবর্ষ বাঁচিবার সঙ্কল্প কর।[১৫]

গীতা সর্বোপনিষদের সার। গীতায় উপদিষ্ট ধর্মের প্রথম কথা—"হে অর্জ্জুন ! ক্লৈব্যতা পরিহার কর"।[১৬] "ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য পরিত্যাগ পূর্বক শত্রু-সন্তাপ-কারী তুমি উত্থিত হও"।[১৭] "তুমি যে অজর, অমর আত্মা, তুমিত দেহ নও। কেহ কাহাকেও হত্যা করেনা, বা কেহ কাহারও দ্বারা হত হয় না।[১৮] সুতরাং তুমি প্রাণপণে স্বধর্ম স্বকর্তব্য পালন কর। কল্পিত ধর্মের মোহে কর্তব্যচ্যুত হইও না। স্বধর্ম পালনের পথে যতই হিংসা-মূলক কর্ম করিতে হউক না কেন, তাহাতে বিকম্পিত হইও না। কারণ মনে মনে কর্মের বাসনা (শত্রুক্ষয়

প্রার্থনা—১। "তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।" ২। "ইদং মে ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে শ্রিয়মশ্নুতাম্।" ৩। "নেতা জয়তা নর উগ্রা বঃ সন্তু বাহবঃ।" ৪। "সং শিতং ম ইদং ব্রহ্ম সংশিতং বীর্য্যং বলম্।" ৫। "সপত্নক্ষয়ণো বৃষাভিরাষ্ট্রো বিষাসহিঃ। যথা হমেষাং বীরাণাং বিরাজানি জনস্য চ।" ৬। "অভীষাডস্মি বিশ্বাষাডাশামাশাং বিষাসহিঃ।"

৭। "উত্তিষ্ঠ ত্বং দেব জনার্বুদে সেনয়া সহ। ভঞ্জন্ মিত্রাণাং সেনাং ভোগেভিঃ পরিবারয়।" ৮। "জহি বিশ্বা অরাতিঃ।" ৯। "ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" ১০। "পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং। শৃণুয়াম শরদঃ শতং। প্রব্রবাম শরদঃ শতং। ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।" ১১। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ১২। "ঈশা-বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" ১৩। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" ১৪। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" ১৫। "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।" ১৬। "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ !" ১৭। "ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।" ১৮। "নায়ং হন্তি ন হন্যতে।"

ও রাজ্যলাভের কামনা) পোষণ করিয়া ও বাহ্য কোন কারণে যদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া কর্তব্য-বিরত হও, তবে তুমি মিথ্যাচারী, পাপী। অতএব তুমি ওঠ, যশোলাভ কর, শত্রুজয় করিয়া রাজৈশ্বর্য্য ভোগ কর।১৯

চণ্ডীতে মহাশক্তির বোধন, অর্চ্চন, প্রয়োগ-পদ্ধতি, মহামায়ার আবাহন, প্রপত্তি সম্পাদন ও তদীয় মহাশক্তি ও আশীর্ব্বাদ প্রভাবে দৈত্য ও অসুরকুল বিনাশের লীলাকাহিনী। সমগ্র দেবগণের সম্মা (শক্তিবৃন্দের সঙ্ঘ-তেজঃ) হইতে মহামায়ার উদ্ভব। "অনন্তর অতি ক্রোধপূর্ণ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শঙ্করের বদন হইতে মহাতেজ নির্গত হইল। তখন ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতেও অতি মহত্তেজঃ নির্গত হইয়া মিলিত হইল। সমস্ত দেব-দেহ সম্ভূত সেই তেজোরাশি মিলিত হইয়া নারীরূপে পরিণত হইল।"২০ গীতায় আত্মশক্তির সাধনা; চণ্ডীতে জাতি-সাধনা বা সঙ্ঘ-শক্তি-সাধনা। গীতায় আত্মশক্তির সন্ধান ও প্রেরণা; চণ্ডীতে আত্মশক্তি ও সঙ্ঘশক্তি উভয়ের রহস্য উদ্ঘাটন ও প্রয়োগ-কৌশল। গীতা Theory, চণ্ডী Practice.

মূলাধারে প্রসুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তিকে তীব্র সংকল্প ও কঠোর তপস্যাবলে উদ্বোধন ও চক্রে চক্রে উত্থান-পূর্ব্বক সহস্রারে অবস্থিত পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত করিবার সাধন-পদ্ধতি তন্ত্রে বিবৃত।

তন্ত্র বলেন—শক্তিই শিব। শিবই শক্তি। ব্রহ্মা—শক্তি, বিষ্ণু—শক্তি, ইন্দ্র—শক্তি, রবি শশী গ্রহাদিও—শক্তি; বিশ্বজগতের সমস্তই শক্তি।২১ তন্ত্রের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও মহাশক্তির লীলা-বিকাশ। মাতৃ-স্বরূপ শিবের স্থায়—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মহাশক্তির সহিত নিত্য-যুক্ত হওয়াঃ অনন্ত শক্তিমান ও অভীঃ হইয়া বিশ্বজ্ঞান ও শিবত্ব লাভ—তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। তন্ত্রের শিক্ষা—"ভোগের দ্বারা ভোগকে জয় করিয়া (পরিত্যাগ করিয়া নয়) শিবত্ব লাভ সম্ভব।"

আর্য্য হিন্দুসমাজে জীবন গঠনের পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে দেখিব—শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির যুগপৎ অনুশীলন তাহার মূলকথা। পঞ্চম বা অষ্টম বর্ষ বয়সে প্রত্যেক আর্য্য বালক গুরু-গৃহে গমনপূর্ব্বক এই জীবন-গঠনের সাধনা গ্রহণ করিয়া লইত। আহার-বিহারে কঠোরতা, ইন্দ্রিয়-সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালন, গুরুর আদেশে সাধ্যের ক্লেশসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন এবং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন। এইরূপে বিদ্যার্থী—আর্য্য বালকের আহার-বিহারে, কঠোরতা ও ক্লেশসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা শারীরিক শক্তি, ব্রহ্মচর্য্য পালন ও বীর্য্যরক্ষার দ্বারা শারীরিক ও নৈতিক শক্তি, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও গুরুসেবার দ্বারা আধ্যাত্মিক তেজঃ লাভ হইত। সর্ব্ববিধ শক্তির অনুশীলন ও অর্জ্জনপূর্ব্বক আর্য্য যুবক জীবন-সংগ্রামে সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হইত।

হিন্দুর দেবতা—শক্তি-ঘন-মূর্ত্তি; বিশ্বের অমঙ্গল ও অশান্তি উৎপাদন-কারী দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতির নাশ সাধনই দেবতার লীলা। হিন্দুর দেবতা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত—বীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। শিবের হস্তে পাশ, শরভ, পিনাক, ত্রিশূল—বিষ্ণুর করে চক্র ও গদা, কালীর করে শাণিত খড়্গ; দুর্গার দশকরে শেল, শূল, চক্র, শরভ, পট্টিশ প্রভৃতি দশ অস্ত্র; ইন্দ্রের করে বজ্র, বরুণের নাগপাশ, যমের দণ্ডও। হিন্দুর শাস্ত্র বলিতেছেন—"দেব ভূত্বা, দেবং যজেৎ" দেবতার মত হইয়া দেবতা পূজা কর অর্থাৎ আরাধ্য দেবতার জ্ঞান, সত্ত্ব, শক্তি, কার্য্যাবলী, আচরণ ও সম্পাদন করিয়াই যথার্থ দেবতার পূজা হয়। শুধু ফুল বিল্বপত্র ও অশ্রুজলে পূজা সার্থক হয় না।

হিন্দুর বিশ্বাস—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং তিনি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী যে বীর্য্যের সাধনা তাহা আমরা গীতায় দেখিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দুগ্ধপোষ্য শিশুরূপে পুতনা বধ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত তৃণাসুর, বকাসুর, কালীয়, কেশী, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্বদৈত্য, কালযবন ইত্যাদি বধ করেন। কুরুক্ষেত্রে সমরের নায়ক—শ্রীকৃষ্ণ প্রধান-যজ্ঞের নায়কও শ্রীকৃষ্ণ; পাণ্ডবগণের খাণ্ডবদাহন, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং দিগ্বিজয়ের বুদ্ধিদাতা ও রক্ষক শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনে শুধু শক্তির খেলা। এই শক্তি-সাধনার ধর্ম্ম তিনি আচরণ ও প্রচার করিয়াছিলেন।

ভগবদবতার শ্রীরামচন্দ্রের জীবনেও এই শক্তির খেলা; রাক্ষস বংশ সমূলে বিনষ্ট করিয়া তিনি ধার্ম্মিকগণকে নিষ্কণ্টক করেন। এই রাক্ষস-বংশ বিনাশের জন্য বানর, হনুমান, ভল্লুকগণকে লইয়া তিনি বিরাট সঙ্ঘশক্তি রচনা করিয়াছিলেন, সে দিগ্বিজয়ী বাহিনীর শক্তির নিকট রাবণের বৈজ্ঞানিক রণশক্তি ও সভ্যতা চূর্ণিত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের বীর্য্যপূর্ণ জীবন ও কর্ম্মলীলা রামায়ণে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবের শৌর্য্য-বীর্য্যময় দিগ্বিজয় ও ধর্ম্মসাম্রাজ্য গঠনের ইতিহাসই মহাভারতে বর্ণিত। এই দুই মহাগ্রন্থই হিন্দুর জাতীয় জীবন ও চরিত্র গঠনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপাদান যোগাইয়াছে।

হিন্দুর ভক্তি-সাধনার মূলেও—শক্তিবাদ। শক্তি-বিহীন ভক্তি—ভণ্ডামি—শক্তি যেখানে ভক্তি সেখানে। ভক্তি—জ্ঞান-কর্ম্ম সকলেরই মূল শক্তি। হনুমানের মত ভক্ত কোথায়? কিন্তু হনুমানের ন্যায় মহাবীর, মহাতেজস্বী, মহাকর্ম্মী, মহাজ্ঞানীই বা কোথায়; প্রহ্লাদ হরি-ভক্তিতে আত্মহারা, বিগলিত; কিন্তু কি তার শক্তি! ত্রিভুবনজয়ী হিরণ্যকশিপুর সাধ্য হইল না—এই শিশু প্রহ্লাদকে হরিনাম গানে বাধা দেওয়া। ধ্রুব ভক্ত, পঞ্চম বর্ষীয় শিশু, কিন্তু ভক্তি প্রভাবে কত বড় শক্তি তার, একদিন গভীর রাত্রিতে, গহন অরণ্যে তপস্যার জন্য নির্ভীক চিত্তে চলিল।

দধীচি, শিবি, দিলীপ, হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, ভীষ্ম, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর জীবনে ও চরিত্রে কি মহা-শক্তির স্ফুরণ দেখি—সত্য রক্ষায়, প্রতিজ্ঞা পালনে, কর্ত্তব্য সম্পাদনে, সতীত্ব রক্ষায়, বিশ্বকল্যাণের আকাঙ্ক্ষায়। শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু জাতি জীবনে মরণে, ত্যাগে ভোগে, জ্ঞানে-ভক্তিতে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে, ক্ষমায় সহিষ্ণুতায়—এই শক্তির আদর্শকেই ধ্যান করিয়া আসিতেছে। স্বধর্ম্ম ও স্বজাতি রক্ষায় রাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিংহ কি অতুলনীয় শক্তির খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত বিজয়-নগর রাজ্যের নাবালক রাজাকে রক্ষার জন্য তদানীন্তন শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ মাধবাচার্য্য মঠের নির্জ্জনবাস পরিহারপূর্ব্বক বিজয়নগরের মন্ত্রিত্ব ও সৈনাপত্য গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুকে পরাজিত করিয়া রাজ্য নিরাপদ হইলে পুনরায় মঠের আশ্রয়ে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করেন।

হিন্দুজাতি আত্মবিস্মৃত। হিন্দু আজ নিজ বেদ, উপনিষদ, পুরাণেতিহাস প্রভৃতির অধ্যয়নে ও তাৎপর্য্য গ্রহণে বিমুখ। নিজ ধর্ম্মবীর পূর্ব্বপুরুষের জীবন ও কর্ম্মলীলার কীর্ত্তি-কাহিনীর সন্ধানে উদাসীন, হিন্দু

১৯। "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।"

২০। "ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত।
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেব শরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা।"

২১। "শক্তিঃ শিবঃ। শিবঃ শক্তিঃ, শক্তি ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ। শক্তি-রিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ, শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহো ধ্রুবম্। শক্তিরূপং জগৎসর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী।"

তাই আজ বীর ধর্ম্মের আদর্শ বাণী ও সাধনা ভুলিয়া বিদেশী, বিজাতির কণ্ঠোচ্চারিত রাষ্ট্র ধারণাকে গ্রহণ পূর্ব্বক অধিকতর দুর্ব্বল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হইলেও হিন্দুজাতি যাঁহার কৃপায় অনেক শতাব্দীর শত বিপ্লব, রক্তপাত, বিপদাপদ অতিক্রম করিয়া আজিও অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ বুঝি পুনরায় এ জাতির শিরে বর্ষিত হইতেছে. তাই স্বামী বিবেকানন্দের মুখে হুঙ্কার শুনিয়া হিন্দুজাতির নিদ্রাভঙ্গ হইতেছিল—"strength—strength is what we want, muscles of iron and nerves of steel and inside dwelling a mind as invincible as thunderbolt; we want ক্ষাত্রতেজঃ plus ব্রহ্ম বীর্য্য।" পুনরায় দলনেতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীও সেইরূপ নিনাদে জাতিকে আহ্বান করিতে চাহিয়াছেন। "মহাপাপ কি? দুর্ব্বলতা, ভীরুতা কাপুরুষতা। মহাপুণ্য কি? বীরত্ব, পৌরুষ, মনুষ্যত্ব" এবং আত্মরক্ষার প্রেরণা সঞ্চার ও রক্ষীদল গঠন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুসমাজে শক্তির সাধনা ও প্রয়োগ পুনঃ প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অজ্ঞাত-অতীত

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

বৈশাখের খর দ্বিপ্রহরের উন্মুক্ত প্রান্তরে বসিয়াছি। মাথার উপর বেনামূলের ছায়ামণ্ডপ। ঘন ঘন জলসিঞ্চনেও শীতল হয় না। পার্শ্বস্থ জলপাত্র নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মরত কুলীমজুরদের অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনা যাইতেছে। ভূ-গর্ভ হইতে তাহারা ভারতের অতীত গৌরব উদ্ধার করিতেছে। ভারত সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শন স্বরূপ লুপ্ত স্থাপত্য শিল্প। আমি তাহাদের পরিচালনা করিতেছি।

বাঙলায় বহুদূরে আছি। নিয়মমত পত্র পাই না মালতীর। প্রায় পাঁচ ছয় দিন কোন সংবাদ আসে নাই। মালতীকে মনে পড়িয়া যাইতেছে। আমার নবজাত সন্তান বাসুদেবকেও। এক অপরিচ্ছন্ন ধূলি-মলিন পথের একতলা বাড়ীর একটি প্রায়-অন্ধকার কক্ষে মালতী হয়ত' বাসুদেবকে সস্নেহে ঘুম পাড়াইতেছে, কিম্বা কাঁথা সেলাই করিতেছে, নয়ত' সেও চিন্তা করিতেছে। আমাকেই চিন্তা করিতেছে হয়ত'। সেখানেও রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে। এখানে কাননে ডাকিতেছে তিতির ও চন্দনা, সেখানে বস্তীগৃহের আলিসায় ও পথের ডাষ্টবিনের পাশে ডাকিতেছে কাক আর চড়াই।

চিন্তায় বাধা পড়িল। কুলী সর্দ্দার আসিয়া ডাকিল, বাবো—

মুদিত চক্ষু উন্মীলন করিলাম। টেবিলের উপর সে রাখিল একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের ভগ্নবলয়। তাহাকে বিদায় করিয়া বলয়টি দেখিতে দেখিতে বিস্মিত হইয়া গেলাম যেন। অতি সুন্দর কারুকার্য্য। প্রস্তরের উপর মনিদিলা সংলগ্ন একটি সর্প, ইহার চক্ষুদ্বয়ে বিন্দুর মত দুইটি নীলা।

বহুক্ষণ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছি। সিগারেট ধরাইয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মালতীকে নহে, আরতী ও বীরভদ্রকে।

পরম শান্তিপূর্ণ আনন্দ কলরবে মুখরিত সেই নগর। প্রতি গৃহে সর্ব্বদা শুনা যায় সঙ্গীতের কলতান ও নৃত্যপরাদের নূপুর নিক্কণ। হত্যার তাণ্ডব লীলা নাই, অশান্তির কোলাহল নাই—প্রশান্ত নগর, পরিতুষ্ট সৌম্যকান্তি, নীরোগ, সদাহাস্যময় ইহার নাগরিকবৃন্দ। আরতী ও বীরভদ্র এই নগরের অধিবাসী।

তরুণ সূর্য্যের আলোকপাত ও ময়ূরের কেকারবে নিদ্রাভঙ্গ হয় আরতীর। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসে। অদূরে সিংহদ্বারের পার্শ্বে নূতন সূর্য্য। প্রণতি জানায় আরতী যুক্তকরে। সহসা মনে পড়িয়া যায় তাহার আগামী রাত্রির কথা। বীরভদ্রের আগমন-বার্ত্তা আসিয়াছে। সুদূর সিংহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে সে নগরের পণ্য সামগ্রী বহন করিয়া। আরতীকে পত্র পাঠাইয়াছে, আজ রাত্রে দেখা হইবে নদীতীরে কুঞ্জবনে। অপূর্ব্ব আনন্দে রোমাঞ্চিত হয় আরতীর সর্ব্বশরীর। আপন মনে সে হাসে। শয্যাত্যাগ করিতে চাহে না; বসিয়া বসিয়া বীরভদ্রকে চিন্তা করিতে ভাল লাগে যেন।

সহচরী ও সেবিকা ইন্দ্রা আসিয়া বলে, ওঠ সখি, সূর্য্যকিরণ এসে পড়েছে তোমার বাতায়ন পাশে। তাহাকে বক্ষে চাপিয়া গুঞ্জন করে আরতী। দুষ্টমনে হাসে সে কথায়। ইন্দ্রা বলে সহাস্যে, রাতের দেরী আছে এখনও।

দর্পণ লইয়া আরতী দেখে স্বীয় মুখমণ্ডল। আরক্ত লোচন বিস্তৃত হইয়া উঠে। স্খলিত বসনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় স্নানাগারের দিকে।

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যায় যেন। উচ্চস্বরে ডাকি, সর্দ্দার—

সর্দ্দার ছুটিয়া আসে। জল দিয়া যায়, কূপের শীতল জল। জলপান করিয়া নিভিয়া যাওয়া সিগারেট পুনরায় ধরাইয়া আবার বলয়টি দেখি। কে সেই শিল্পী—যাহার নিপুণ সৃজন ইহা! শিল্পীকে ধন্যবাদ।

আরতী বসিয়া আছে বাতায়নে। প্রাসাদের নহবৎমঞ্চে ভৈরবীর আলাপ চলিতে থাকে। দেবালয়ে আরতি আরম্ভ হয়। তাম্র ঘণ্টা সশব্দে ঝঙ্কার করে। কি মনে করিয়া আরতী তুলিয়া লয় আপন তার-যন্ত্র। স্বেচ্ছায় বাজাইয়া যায়। ময়ূর পাখা মেলিয়া নৃত্য করিতে থাকে। পদলগ্ন নূপুর বাজে ইহার নৃত্যের তালে। বীরভদ্রকে স্মরণ করে আরতী। আজ রাত্রে তাহার দর্শন মিলিবে। সে চিন্তা করে কোন্ বসনে ও ভূষণে আজ

নাচিবে। অভিসারিকা আরতী। তাহার হাত যেন চলে না। ময়ূর নৃত্য থামাইয়া উড়িয়া যাইয়া বসে কদম শাখায়। ক্রোধ হইয়াছে তাহার। গ্রীবা ফুলাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠে সে। সহাস্যে ডাকে আরতী, আয় কুকা আয়। কুপিত ময়ূর দৃষ্টি ফিরায় না।

দিনমান আপন গতিতে ব্যোমপথ অতিক্রম করিতে থাকে। ক্রমশঃ বেলা বাড়িয়া যায়। অপরাহ্নে নগরের কলরব স্তিমিত হইয়া আসে। বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষীর আলয় কোলাহলপূর্ণ হয়। শাবকেরা ব্যগ্রকণ্ঠে কলতান করে আহারের লোভে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া।

প্রাসাদ ও বৃক্ষ শিখর রক্তিম হয় অরুণ পুনঃশর সূর্য্যের শেষ রশ্মিতে। যে রশ্মিতে কুৎসিৎ সুন্দর হয়;—সর্ব্বশোভাবর্দ্ধক রশ্মিজাল।

আরতী চন্দন ধূপের ধূম্ররেখায় কেশ শুষ্ক করে। ইন্দ্রা আসে সাজ-সজ্জার বিভিন্ন উপকরণ লইয়া। পদ্ম-গন্ধি তৈলে আরতীর কেশবিন্যাস করিতে বসে। আরতী পরিতৃপ্ত হয় না যেন, নূতন ধরণে কেশ বন্ধন করিয়া দিতে হইবে। অবশেষে চূড়া করিয়া বন্ধন করে কেশ, মালতীর স্তবকে চূড়া ঘিরিয়া দেয়। সীমন্তে পরাইয়া দেয় মুক্তার সীঁথি। কর্ণে দুলাইয়া দেয় নবরত্নের কর্ণিকা, তাহার মধ্যস্থানে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড। প্রতি অঙ্গে লেপন করে চূর্ণ শ্বেতচন্দন।

প্রায়-নগ্ন আরতী দর্পণে আপন মূর্ত্তি দর্শনে লজ্জিত হয়। ইন্দ্রা তাহার বক্ষবন্ধন করিয়া দেয় শুভ্র রেশমের কঞ্চুলীতে। কণ্ঠে পরাইয়া দেয় মুক্তার সাতনরী। আরতীর চাঞ্চল্যে ঘন ঘন দুলিতে থাকে সেই কণ্ঠহার। দুই বাহুতে বাঁধিয়া দেয় মণির বাহুবন্ধনী, মণিবন্ধে মরকতের মণি-বন্ধনী। আরতী মৃদুকণ্ঠে গীত গাহিতে গাহিতে উঠিয়া দাঁড়ায়, ইন্দ্রার সবিনয় অনুরোধে। বসন পরিধান করাইতে হইবে। সযত্নে পরাইয়া দেয় নীলাম্বর, স্বর্ণসূত্রের নক্সা তাহাতে। অঞ্চল লুণ্ঠিত হয় ভূমিতে। কঙ্কালিকায় জড়াইয়া দেয় প্রবালের চন্দ্রহার। নিতম্বে দুলিয়া পড়ে সে আভরণ।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। বাতায়ন পথে স্বর্ণাভ গগনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে আরতী। রাত্রির বিলম্ব নাই বড় বেশী। পদতলে অলক্ত অঙ্কনরত ইন্দ্রা সহাস্যে বলে, এখনও দেরী আছে, সে-ই দ্বিপ্রহর রাত্রে, নদীতীরে কুঞ্জবীথিতে—। আরতী হাসে।

পুনরায় চিন্তায় ছেদ পড়ে। একটা কুলী রমণী আসিয়া দাঁড়ায়। বলে—একটু আগুন দে বাবু, নেশা করব।

বিরক্ত হইয়া বিদায় করিলাম, তাহাকে তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া। সিগারেট ধরাইয়া চক্ষু বুজিলাম। কুলী রমণী ধূম পান করিতে করিতে গান ধরিল, কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া। ভাষা বুঝিলাম না, প্রেম সঙ্গীতের মত সুর।

আরতী তাম্বুলরাগে রঞ্জিত করিল ওষ্ঠপ্রান্ত। ইন্দ্রা তূলিকার সাহায্যে তাহার চক্ষু আবৃত করিতেছে কৃষ্ণকজ্জলে। ললাটের মধ্যস্থানে, ভ্রূ যুগলের সন্নিকটে অঙ্কিত করিল রক্তচন্দনের স্বস্তিকা-তিলক। কপোল রঞ্জিত করিয়া দিল লাক্ষ্যার ক্ষীণ স্পর্শে।

বেশ বিন্যাস শেষ হইল আরতীর। দর্পণ তুলিয়া দেখিল আপাদমস্তক। আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহার ওষ্ঠে। ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ইন্দ্রার মুখপানে। ইন্দ্রা কহিল, কোন ভয় নেই সখি—তুমি যে অভিসারিকা। আমি যাই, কাল প্রাতে সকল কথা শুনব তোমার—। বিপদে ইষ্টকে স্মরণ ক'র।

ইন্দ্রা বিদায় লইল।

কুলী রমণীটি ধূমপান শেষ করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল একবার। ছলনা-পূর্ণ ছলনাময়ীর দৃষ্টি। দৃষ্টি ফিরাইলাম আমি লজ্জায় ও ক্রোধে। সে চলিয়া গেল ধীরে ধীরে।

আরতী বাতায়নে বসিয়া অপেক্ষা করে ব্যগ্রচিত্তে। দ্বিপ্রহর রাত্রি কখন আসিবে!

রাত্রি ঘনাইয়া আসে ক্রমে। নগরের আলো নিভিয়া যায়। নগর নীরব হয়। সুপ্ত নগর। নবমীর পাণ্ডুর চন্দ্র আকাশ প্রান্তে উদিত। জ্যোৎস্নায় আবৃত হয় পুরস্থান। প্রাসাদ-সমূহের শীর্ষভাগ জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল হয়। কয়েকটা পেচক ডাকিতে থাকে বৃক্ষশাখায়।

কয়েকটি নীলপদ্ম হাতে লইয়া আরতী ধীরে ধীরে পথে বাহির হয় সভয়ে। দ্রুতপদে নিঃশব্দে অগ্রসর হয় আপন গন্তব্য অভিমুখে। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে তাহার দ্রুতবক্ষ স্পন্দনে। পক্ষীর ঝাপটে শিহরিয়া উঠে সে! বহু পথ অতিক্রম করিয়া সে উপনীত হয় নদীতীরে, কুঞ্জবীথিতে। কুঞ্জবীথি যেন নির্জ্জন। আপনার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনা যায় মাত্র। ক্ষীণকণ্ঠে সে ডাকে, কৈ তুমি কৈ? কণ্ঠস্বরে তাহার ব্যাকুলতা।

কোন উত্তর আসে না। বিকল চিত্তে সে বসিয়া পড়ে একটি শিলাসনে। ঝিল্লীরব হইতে থাকে। কে যেন হাসিতেছে। মৃদু হাস্যের শব্দ। সহসা কে ডাকে মিষ্টকণ্ঠে, আরতি! বহু-প্রত্যাশিত তথাপি আরতীর সভয় শিহরণ।

—চন্দ্র!

—আরতী। এই যে আমি, এই দিকে।

কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া আরতী অগ্রসর হয়। পুলকে মুগ্ধ হয় দুইজনে। বক্ষে টানিয়া চন্দ্রালোকে দেখে বীরভদ্র আরতীর রূপশোভা। বলে, সুন্দর!

বহুক্ষণ বহুবাক্যবিনিময় চলিতে থাকে।

বিদায়কালে আরতী বলে, কৈ, দাও উপহার দাও আমায়।

নিজের হস্তমুক্ত করিয়া বীরভদ্র সাদরে পরাইয়া দেয়, একটি বলয়। জ্যোৎস্নালোকে আরতী দেখে সে বলয়। বলে, অতি সুন্দর।

রাত্রির শেষ প্রহর। আরতী দ্রুত অগ্রসর হয় গৃহমুখে। বনের পথ দীর্ঘ। দেহ তাহার ক্লান্ত পথশ্রমে। কে যেন পথ-রোধ করে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। আরতী সভয়ে লুকাইয়া পড়ে বৃক্ষের পাশে। পথরোধকারী হাসিয়া উঠে, অট্টহাস্য। বন-কম্পিত হয় সে শব্দে। অনুরোধের স্বরে সে ডাকে, এসো, প্রেয়সী, এসো। আরতী বলে, কে! কে তুমি? পথ ছেড়ে দাও।

—এসো, কাছে এসো সুন্দরী। ক্ষুধার্ত্তের কণ্ঠস্বর। সবলে চাপিয়া ধরে সে আরতীকে আপন বক্ষপাশে। বহু চেষ্টা করে আরতী মুক্তির জন্য। অবলা শেষে পড়ে মাটিতে লুটাইয়া। ভাঙ্গিয়া যায় উপহার প্রদত্ত বলয়। আরতী চিৎকার করিয়া উঠে। অন্ধকারে খুঁজিতে থাকে সেই বলয়। উষ্ণ অশ্রুধারা নামে তাহার চোখে। বলয় খুঁজিয়া পায় না।

এই সেই বলয়। আরতি ইহাকে খুঁজিয়া পায় নাই। বীরভদ্রের উপহার।

পুনরায় সিগারেট ধরাইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছি বলয়টি। চীফ্ সার্জেনের মিঃ সেনের ডাকে চমকাইয়া উঠিলাম আমি।

—ইউ মিঃ ঘোষ, কাজ দেখছেন না আপনি? কি ভাবছেন বসে বসে? রুক্ষ কণ্ঠস্বর তাঁহার।

আজ্ঞে না, কাজ চলেছে।

—কাজ ত চলেছে, আপনি কি করছেন? নতুন বিয়ে করেছেন বুঝি, তাই এত ভাবনা!

মিঃ সেনের বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া মালতীকে, বাসুদেবকে, সমগ্র কলিকাতাকে মনে পড়িয়া গেল। মুখের পাইপ নামাইয়া সেন কহিলেন, গো অন, আপনার কাজে যান্।

—যে আজ্ঞে।

সেন চলিয়া গেলেন বিলাতি কায়দায় মার্চ করিয়া।

নিভিয়া যাওয়া সিগারেট পুনরায় ধরাইলাম। বেয়ারা আসিয়া কহিল, বাবু চিঠি হায়।

চিঠি খুলিয়া দেখিলাম মালতীর চিঠি। চিঠি রাখিয়া দিলাম, পরে পড়িব। চিন্তা করিতে ভাল লাগে যেন আমাদের অজ্ঞাত অতীত।

ডক্টর দে

(একাঙ্কিকা)

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান মধুপুর—অতীনের বাড়ি—'তরুণালয়'।

সময়—আরও সাতদিন পরে।

তরুণালয়ের সুসজ্জিত বসিবার ঘর; মাঝখানে নীল মখমল মোড়া চেষ্টারফিল্ড সুইট। মধ্যে একটি ছোট গোল টেবিল কারুকার্যখচিত রেশমী কাপড়ে ঢাকা। একধারে দেওয়ালের কাছে নীলরংএর গদী মোড়া একখানি সোফা। বামদিকের দরজা দিয়া বাহিরে যাওয়া আসার পথ। দক্ষিণের দরজাটি পাশের ঘরে [illegible], ঐ ও মধ্যের দরজা দিয়া ভিতর বাড়ী যাওয়া যায়। দরজাগুলিতে চিত্রিত পরদা ঝুলানো। রোহিণী গান গাহিতেছে। অনুকূল ও পুষ্প বসিয়া শুনিতেছে।

(রোহিণীর গীত)

কীর্তন

যমুনা ঘাটের পথে   সিনান করিতে যেতে
হইল তাহার সাথে দেখা।
সেইদিন হতে হিয়ার পরতে
মূরতি রয়েছে লেখা।
(চিতে আমার রয়েছে লেখা)
(নিত্য আমার চিতে সেরূপ রয়েছে লেখা)
(আমার, আঁধার হিয়া আলো করে সেই কালো রূপ রয়েছে লেখা)
নয়ন যুগল   নীল শতদল
শিখীপাখা শিরে সাজে।
অমিয় নিঝর   সুখ সুধাকর
অধরে মুরলী রাজে।
(মুরলী বাজে)
(কৃষ্ণ অধর পরশ পেয়ে আনন্দে মুরলী বাজে)
(অধর সুধায় মত্তমুরলী রাধা রাধা বলি মধুর বাজে)
হাসির বিলাসে নয়ন সুষমায়
করেছে মানস চুরি।
বঁধুর বিরহে জীবন না রহে
আঁখি মোর যায় ঝুরি।
(বিরহানলে জ্বলে মরি)
(আমি যে বিরহে মরি)
(বাঁশী নুপুর এখনও শোনে আমি যে বিরহে মরি)
(তার বিরহে পরাণ দহে আঁখি মোর যায় ঝুরি)

অনুকূল। কি মিষ্টি গলা রোহিণীদির! গলাটা একটু জল খাইয়ে রাখিস ভাই! নইলে পিঁপড়ে ধরবে।

রোহিণী। আচ্ছা! কিন্তু তুমি আমাকে আর বসিয়ে রেখোনা। দেখতে দেখতে আরও এক হপ্তা কেটে গেল। আজ যেতেই হবে আমাদের।

প্রস্থান

অনুকূল। (পুষ্পের প্রতি) চল্ নাতনি, কাল আমরা একবার বৈদ্যনাথ ঘুরে আসি। পাশের বাড়ীর ছেলে দুটিকেই বলে এলাম আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে।

পুষ্প। হঠাৎ তোমার এ খেয়াল হোলো যে!

অনুকূল। ওরে! তোর কথা আমি একটাও ভুলি নে। তুই এসে অবধি বলছিলি যে এ জায়গাটা তোর মোটে ভাল লাগছিল না—কেমন যেন নির্জন আর ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল।

পুষ্প। হাঁ, তাই ত ঠেকছিল। এখন তবু পাশের বাড়ীতে ওঁরা এসে আশ পাশটা একটু সজীব বলে মনে হ'চ্ছে।

অনুকূল। তা ত হবেই। ওরা ত আমার যা তা মানুষ না—মানুষের মত মানুষ। বিশেষ ঐ ডাক্তার ছেলেটি যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনিই সুন্দর ওর মনটি।

পুষ্প। এই ত ক'দিন ওঁরা এসেছেন, এরই মধ্যে অমনি সুন্দর মনের খবরটি পর্যন্ত তোমার কাছে পৌঁছে গেল?

অনুকূল। তোর কাছেই কি পৌঁছোয় নি? বরং পৌঁছে পুরোনো হ'য়ে গেল।

পুষ্প। ইস্!

অনুকূল। তোদের কাছে এ সব খবর বেতারে আসে কি না! সত্যি ছেলেটিকে আমার বড় পছন্দ। ওর বন্ধু নিশীথও বড় ভাল।

পুষ্প। কিন্তু দু'জনের স্বভাবের অনেক পার্থক্য—না, বাবামশাই!

অনুকূল। হাঁ। (ভাবাবিষ্টভাবে) প্রশান্ত—যেন প্রথম চেতনার প্রেরণা। নবজাগরিত বিহঙ্গের কাকলি যেন তার স্বর। স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত তার মুখচ্ছবি!

পুষ্প। (বাধা দিয়া) তুমি থামো কবি! উঃ, সাহিত্যিকের সঙ্গে কথা কওয়াই দায়।

অনুকূল। (হাসিয়া) দায় ব'লে দায়! একেবারে মর্মান্তিক হয়ে যায়।

পুষ্প। আচ্ছা, এইবার তোমার নিশীথ-এর বর্ণনাটা শোনা যাক দেখি।

অনুকূল। নিশীথ—যেন দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপ শান্ত ক'রে, নক্ষত্রখচিত প্রথম রজনীর স্নান জ্যোৎস্নার দ্যুতিকে বিলিয়ে দিয়ে, আপনি অভিসারে জেগে থাকে। প্রশান্ত আর নিশীথের মধ্যে অনেক প্রভেদ। আর তা হওয়া যে অনিবার্য।

পুষ্প। কেন?

অনুকূল। প্রশান্তের চেয়ে নিশীথ বয়সে বড়। আর নিশীথ বিবাহিত।

পুষ্প। আর এ—প্রশান্তবাবু?

অনুকূল। অ—অবিবাহিত। না হেঃ! কিন্তু, প্রশান্ত হ'চ্ছে ডাক্তার। ওর বাড়ীর ফটকের পাশে লাগানো Door-plate খানায় লেখা আছে—Dr Do. দেখেছিস্ ত!

পুষ্প। আমি ডাক্তারগুলোকে দু'চোখে দেখতে পারিনে।

অনুকূল। তা ত জানি। কিন্তু কেন, বল দেখি?

পুষ্প। মানুষের বুকের শুকনো হাড়পাঁজরাগুলো ছেড়ে ছেড়ে, আর হার্টগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে, ওদের হৃদয়ের কোমলবৃত্তি সব একেবারেই ওরা হারিয়ে ফেলে—এই আমার ধারণা।

অনুকূল। তোর এটা মস্ত ভুল, মামণি! মস্ত ভুল। অপরের অন্তর যদি না বুঝতে পারে—আর নিজের অন্তর দিয়ে পরের ব্যথায় পরিত্রাণ যদি না করতে পারে, তা হলে কখনই সে ভাল চিকিৎসক হতে পারে না। কিন্তু একটা কথা জানিস ত?

পুষ্প। কি কথা?

অনুকূল। ডাক্তার বর না পেলে তোর দাদাভাই কখনও বিয়ে দেবে না।

পুষ্প। আঃ, কি কথার সঙ্গে কি কথা যে এনে ফেলো তুমি! বিয়ে কে চাইছে?

অনুকূল। (দ্বারের দিকে দেখাইয়া) ঐ। ঐ যে—কে আসছে। (পুষ্প একটু থতমত খাইয়া পরে চলিয়া যাইতে উদ্যত) যাস্ নে বোস্। আর আমার তোর কি হোলো? বোস্। প্রশান্তকে দুটো কথা জিজ্ঞেস্ করব—কি উত্তর দেয় শোন্-ই না।

প্রশান্ত ও নিশীথের প্রবেশ

অনুকূল। এই যে আসুন নিশীথবাবু! বসুন। বোসো Doctor Do! আচ্ছা তুমি হঠাৎ Doctor হতে গেলে কেন বলো দেখি।

প্রশান্ত। কেন তাতে আপত্তি কিসের?

অনুকূল। না, আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে—সকলের ওটা মানে, কেউ কেউ ডাক্তারিটা যেন পছন্দ করে না, তাই বলছি।

প্রশান্ত। (নতমুখী পুষ্পর পানে একবার মাত্র চাহিয়া যেন হতভম্বের মত) ও—কিন্তু দেখুন, আমি—মানে, সে রকম ডাক্তার ত নই।

পুষ্প। (হঠাৎ) বাবামশাই! আসছি এখুনি— (প্রস্থানোদ্যত)

অনুকূল। (পুষ্পর হাত ধরিয়া) যাস্ কখন। একটু বোস্—এঁরা এই এলেন।

প্রশান্ত। (আগ্রহের সহিত, অনুকূলের প্রতি) শুনুন, আমি এই—মানে, এই সব—মানে হ'চ্ছে, মানুষের চিকিৎসা করা ডাক্তার আমি নই।

অনুকূল। তার মানে? তবে কি পশুর ডাক্তার?

(পুষ্প অকস্মাৎ কম্পন করিয়া বেদনাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বসিয়া রহিল)

প্রশান্ত। না, না। আমি সে সব ডাক্তারই নই। মানে আমি হচ্ছি—

নিশীথ। (বাধা দিয়া) তুমি হোচ্ছো কি সেইটে বরং একটু স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করো না। কেবল বলবে—"আমি মানুষের ডাক্তার নই, ও-সব ডাক্তার নেই"—যত সব আবোল তাবোল! শুনুন আপনারা, আমি বলছি—আমাদের প্রশান্ত ডাক্তার বটে, তবে Ph. D.

(পুষ্প ও অনুকূলের মুখ প্রফুল্ল হইল)

প্রশান্ত। ঐ নিশীথ ঠিক ক'রে বলেচে। আমার মনে হচ্ছিল যেন মানুষের রোগ দেখা ডাক্তার মনে ক'রে আপনারা হয় ত, কেন জানি না, বিরূপ হ'চ্ছিলেন। সেই জন্যে কেমন—মানে, ইয়ে হ'য়ে গিয়ে, আমি গুছিয়ে বলতে পারছিলাম না। (পুষ্পর প্রতি, একটু হাসিয়া) আমি রোগী দেখা ডাক্তার নই—সে হ'চ্ছে আমাদের এই নিশীথ।

নিশীথ। অর্থাৎ আপনাদের ঘৃণাটা অনায়াসে প্রশান্তের ওপর থেকে উঠিয়ে আমার ওপর চাপাতে পারেন তাতে প্রশান্তের কোনও আপত্তি নেই।

পুষ্প। (ঈষৎ হাসিয়া) আমি কাউকে ঘৃণা করতে যাবো কেন?

পাশের ঘরে প্রস্থান

অনুকূল। চিকিৎসককে ঘৃণা করলে যে পুষ্পর কিছুতেই চলবে না। ছেলেবেলায় ওর প্রায়ই অসুখ বিসুখ করত। কেবল ডাক্তারের জন্যেই এখন খুব ভাল স্বাস্থ্য হয়েছে। সেই জন্যে ওর দাদু ডাক্তার ছাড়া আর কারও সঙ্গে ওর বিয়ে দেবেন না। এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'অটলের প্রতিজ্ঞা অটল।'

প্রশান্ত। বলেন কি!

অনুকূল। কেন? আপনার কি অন্যরকম কোনও ভাল পাত্র জানা আছে নাকি?

নিশীথ। আমার একটা পাত্রের সন্ধান আছে—আমার জানা-শুনা বিশেষ বন্ধুলোক। (প্রশান্তের দিকে সহাস্যদৃষ্টি)

প্রশান্ত। চুপ করো নিশীথ!

নিশীথ। আচ্ছা, তুমি কথাটা ইচ্ছে ক'রে পাকে ফেলে দিয়ে অপরাধী হ'তে চাও কেন বলো দেখি?

অনুকূল। অনেকে অপরাধ জেনে নিজে ইচ্ছে ক'রে সাজা নিতে চায়, জেলখানায় গিয়ে ঘানি ঘোরানোটা পারে ব'লে। (হঠাৎ বাহিরে দৃষ্টি পড়িতেই) একি? অটল একটা লোকের উপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে আসছে যে! কোথাও ব্যথাটাথা লাগল না কি?

(সকলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। একজন চাকরের কাঁধে ভর দিয়া অটলের প্রবেশ। সকলে মিলিয়া তাহাকে সোফায় শোয়াইয়া দিল। পুষ্প ভিতর দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল)

অটল। এই যে ডাক্তারবাবু। প্রশান্তবাবু! আপনিও ত ডাক্তার? আমার প্রাণ যায়—বড় যাতনা!

নিশীথ। (প্রভাতের প্রতি নিম্নস্বরে) এমন সুযোগ আর হবে না। এই বেলা ডাক্তার হয়ে বুড়োর চিকিৎসা করো। ভাল হোয়ে গেলে অবিলম্বে কার্য্যোদ্ধার!

প্রভাত। কিছুই জানিনে যে ভাই!

নিশীথ। যত্ত সব! (উচ্চতর কণ্ঠে) আমাদের কি করতে হবে বলো প্রভাত! তুমি ওষুধ-পত্তর দাও।

পুষ্প। (নিশীথের প্রতি বিস্ময়ে) আপনি ওষুধ দিন ডাক্তারবাবু!

নিশীথ। (নিম্নকণ্ঠে) সব ভার আমার। আপনার কোনও চিন্তা নেই। (উচ্চকণ্ঠে) ভাখো ভাই প্রভাত, ভাল করে ভাখো। আমি তোমার ষ্টেথস্কোপ,, ইমার্জেন্সি ব্যাগ, থার্ম্মমিটার সব এখনই নিয়ে আসচি। (অটলের কাছে গিয়া) তাই ত! কোথায় ব্যথা বল্লে? (এই বলিয়া ব্যথার জায়গাটি আগে আগে পরীক্ষা করিয়া লইল) হাঁ, ভাল কথা! আমার পেটে ব্যথার জন্যে তুমি যে ট্যাবলেট সেদিন আমাকে দিয়েছিলে সে আমার পকেটেই আছে। ভাল মনে করো ত' একটা ততক্ষণ খাইয়ে দাও।

প্রভাত। হাঁ, হাঁ—মানে নিশ্চয়! নিশ্চয় সেইটেই দিতে হবে।

নিশীথ। আমি তা হলে দৌড়ে তোমার জিনিষ-পত্রগুলো নিয়ে আসচি। তুমি ওটা খাইয়ে দাও জল দিয়ে। (অনুকূল ও পুষ্পের প্রতি নিম্নতর কণ্ঠে) ট্যাবলেট খেলেই সেরে যাবে।

প্রস্থান

প্রভাত ট্যাবলেট খাওয়াইয়া দিল

অটল। পেটের এইখানে—এই ডান দিকটায় ব্যথা ডাক্তারবাবু। কোথাও কিছু নেই, আচম্‌কা ব্যথাটা হল—খুব জোর!

প্রভাত। (অসাবধানে) তাইত! পিলে টিলে ফেটে গেল না ত?

অটল। ওখানে পিলে কি করে হবে? সে ত বাঁ দিকে। (ক্লিষ্ট-স্বরে) আচ্ছা ডাক্তার দেখচি!

অনুকূল প্রভাতকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য হাতে টান দিল

প্রভাত। (সামলাইয়া লইবার চেষ্টায়) হাঁ বটেই! পিলেটা বাঁ দিকেই ত থাকে।

অনুকূল। (বাধা দিয়া) থাকেই ত! তবে এখনকার দিন-কালটা কেমন প'ড়েছে। সেখানে—কলকাতায় রাস্তায় নামতে গেলেই ঘাড়ের ওপর হয় "মোটরকার," না ত দুতলা Bus, নইলে প্রগতির rush—এম্‌নি ক'রে প্রতিপদে পিলেটা চম্‌কে চম্‌কে পেটের বাঁ দিক থেকে কখনও কখনও সে ডান দিকে এসে পড়তে পারে বৈ কি! হাঁ, তা হতে পারে—নিশ্চয় হতে পারে। ভাখো ডাক্তার! ভাল করে ভাখো—চম্‌কানো পিলের ওপর আচম্‌কা ব্যথা!

প্রভাত। একটা গরম জলের ব্যাগ পেলে হোতো।

পুষ্প। Hot water bottle বাড়ীতে আছে—আমি ভর্তি করে আনচি।

প্রভাত। হাঁ একটু শিগ্‌গির করে আনুন!

অটল। দাঁড়াও, দাঁড়াও! ব্যথাটা যেন কমচে বোধ হচ্ছে।

অনুকূল। কেমন? ডাক্তারের এলেম আছে।

নিশীথের প্রবেশ

নিশীথ। এই তোমার সব ওষুধ এনেছি। আর Injectionএর syringe আর

অটল। আবার Injection কি হবে। ব্যথাটা অনেক কমে গেছে—ঐ এক ওষুধেই একেবারে সেরে যাবে, আর কিছু করতে হবে না। বাঃ—বলিহারি ডাক্তারি। বলিহারি ডাক্তার প্রভাতবাবু!

প্রভাত। তবে আর ওসব কি হবে নিশীথ? চলো, ওগুলো বাড়ীতে রেখে আসা যাক্‌।

অটল। হাঁ, ওসব আর লাগবে না। দেখি, একটু ব'সে। বাঃ—আর কিছু করতে হবে না। ভাগ্যি, প্রভাতবাবু মধুপুরে এসেছিলেন! ওঃ, চমৎকার ডাক্তার!

অনুকূল। তোমার খুব জোর বরাত, অটল! যে প্রভাতবাবু আজ এখানে উপস্থিত ছিলেন। তা তোমার কি, প্রভাতবাবু! পরশু কলকাতায় ফিরে যেতেই হবে?

প্রভাত। (কথাটার উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া) আজ্ঞে, পরশু কলকাতায়—মানে

অনুকূল। (বাধা দিয়া) তোমার মা যখন লিখেচেন তখন সে পাত্রীটিকে তোমার দেখতেই হচ্ছে—বিশেষ তিনি যখন স্পষ্টই বলে দিয়েচেন যে ক'নে তোমাকে নিজে পছন্দ ক'রে নিতে হবে! (নিশীথ অনুকূলের কথার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য সন্দেহ করিয়া প্রভাতের গা টিপিয়া দিল) আচ্ছা, তুমি এখন এসো ত, তার পরে কথা হবে।

প্রভাত ও নিশীথের প্রস্থান। অনুকূলের মুখের প্রতি
পুষ্পের সশঙ্ক ব্যগ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ

অটল। প্রভাত ছেলেটি বেশ—না? পুষ্পর জন্যে তুমি—হাঁ, মা' ত পুষ্প তোর বাবামশাই আর ডাক্তারবাবুদের জন্যে গোটা কতক খুব ভাল করে পান সেজে নিয়ে আয় ত!

পুষ্পের প্রস্থান

বলছিলাম, পুষ্পর জন্যে ঐ রকম একটি পাত্র ভাখো। খাসা ছেলে! আবার ডাক্তার!

অনুকূল। এই প্রভাতেরই ত পুষ্পর উপযুক্ত পাত্র। আমি ওর সকল খবর নিয়েছি। সকল দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ।

অটল। সত্যি না কি? তা হ'লে ওর কলকাতা যাবার আগেই একেবারে পাকাপাকি করে ফ্যালবার চেষ্টা করো। সেখানে আবার মেয়ে পছন্দ হ'য়ে গেলে, আর উপায় থাকবে না।

অনুকূল। হাঁ, ও যে মেয়ে নিজে পছন্দ করবে তার সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। শুনলে ত সব। কিন্তু তোমরা দু'জনে যে এদিকে মুস্কিল বাধিয়ে বসে আছ। তুমি চাও ডাক্তার নাতজামাই, আর পুষ্পর তাতে ঘোর আপত্তি।

অটল। সত্যি না কি? ডাকো ত ওকে। ওর আব্দারে আব্দারে আর আমি পারি নে, অনুকূল!

অনুকূল। (অন্দরের দিকে) পুষ্প, একবার এদিকে আয় ত দিদি!

পুষ্পের প্রবেশ

অটল। তোর না কি ডাক্তার বর অপছন্দ? তুই ডাক্তার বিয়ে করতে রাজী নস্‌। তোকে নিয়ে আমার মহামুস্কিল!

পুষ্প। আমি বিয়েই করব না, তা ডাক্তার!

অনুকূল। (পুষ্পর স্বরভঙ্গী অনুকরণ করিয়া) হাঁ, চাই ত। ও বিয়েই করবে না! সত্যিই ত, বিয়ে কি আবার!

অটল। আচ্ছা ডাক্তার তোর চক্ষুশূল কেন হোলো বল্‌ দেখি?

অনুকূল। ও বলে ঐ রোগী দেখা ডাক্তারগুলোকে দু'চক্ষে ও দেখতে পারে না।

অটল। রোগী দেখা ডাক্তার! আরে, সুস্থ মানুষের আবার ডাক্তার কি হবে? বা রে বাঃ! চিকিৎসক ডাক্তার—এদের মান কত?

অনুকূল। কেবলমাত্র নামে ডাক্তার হ'লে ওর বোধ হয় কোনও আপত্তি নেই—শুধু এই সাধারণ ডাক্তারিটা না করলেই হোলো।

পুষ্প। যাও, আমি চল্লাম।

প্রস্থান

অটল। কিন্তু অনুকূল, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি যে ডাক্তারের হাতে ছাড়া আমি পুষ্পকে আর কোথাও সম্প্রদান করব না। আর তুমি ত জানো যে অটলের প্রতিজ্ঞা অটল।

অনুকূল। তা জানি। এই প্রভাতের সঙ্গে কিন্তু পুষ্পর বিয়ে দিলে, বোধহয় তোমাদের দুজনেরই ঠিক মনোমত হয়। পুষ্পকে তা হলে এমন ডাক্তারের হাতেই দেওয়া হয় যার চিকিৎসা করে বেড়াতে হবে না। এতে তুমি রাজী ত?

অটল। কিন্তু রাজী। তুমি ঠিক ক'রে দাও। আমি তোমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করছি যে যদি প্রভাত সম্মত হয়, তাহলে আমি তার সঙ্গেই বিয়ে দেবো। শুধু ডাক্তার হলেই হোলো—ব্যস্। অটলের প্রতিজ্ঞা অটল!

অনুকূল। তুমি সব কথাটা না শুনেই প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেল্লে। শোনো, শোনো—প্রভাত Doctor বটে—তবে পি-এইচ-ডি।

অটল। সে আবার কি জিনিষ? বলি, ডাক্তার ত বটে। ও তুমি পাকা ক'রে ফেলো। প্রভাতকে অন্য পাত্রী দেখার আর সুযোগ দিও না। তবে প্রভাত আবার পুষ্পকে বিয়ে ক'রতে রাজী হ'লে হয়।

দ্বারের পর্দা ঠেলিয়া প্রভাত প্রবেশ করিয়া শেষ কথা কয়টি
শুনিবামাত্র আবার বাহিরে যাইতেছিল

অনুকূল। আরে পালাচ্ছেন কেন হে প্রভাত? None but the brave deserves the fair! এখন তুমি পুষ্পকে বিয়ে করতে রাজী আছ কি না তাই বলো।

প্রভাত ঘরের ভিতরেই রহিয়া গেল। বাহির হইতে নিশীথও
তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল

প্রভাত। আজ্ঞে, আপনারা আমায় কি অনুমতি করছেন?

অটল। অনুমতি আমরা কিছুই করছি নে, শুধু সম্মতি চাইছি।

প্রভাত। (সবিস্ময়ে) তা আমি কি আপনাদের—মানে, আপনারা হচ্ছেন আমার—অর্থাৎ

নিশীথ। (তাড়াতাড়ি) অর্থাৎ উনি বলছেন যে আপনারা হলেন ওঁর গুরুজন—আপনাদের কাছে স্পষ্ট বলতে লজ্জা বোধ করছেন। তবে আমি জানি—উনি খুবই সম্মত আছেন।

প্রভাত সলজ্জভাবে মৃদু হাসিতে লাগিল। ভিতরের দিকের দরজার পিছনেই একটি গ্লাসের ডিশ ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। পর্দার ফাঁক দিয়া দেখা গেল যে পুষ্প লজ্জাহাসি হাসিতে হাসিতে ডিশটি কুড়াইয়া লইতেছে এবং এক একবার বাহিরের ঘরের দিকে চোখ নিক্ষেপ করিতেছে। অনুকূল উঠিয়া গেল এবং তাহাকে আনিয়া প্রভাতের পাশে দাঁড় করাইয়া দিল। অটল তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিল। রোহিণী বাহিরে আসিতেই এই দৃশ্য দেখিবামাত্র দৌড়াইয়া বাড়ী হইতে একটা শাঁখ আনিয়া বাজাইয়া দিল। অন্নদাও হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইল। ইহাদের দুইজনেরই যাত্রা করিবার পোষাক।

অন্নদা। এ যে—এক হোলো—বাঁ—বাঁচা গেল।

অটল। বুকে অনুকূল। অটলের প্রতিজ্ঞা অটল।

অনুকূল। এদিকে আবার ডাক্তারটিও হয়ে গেল যে! পুষ্পর বর—Initials P. H. D—to P. DE, Ph. D.

যবনিকা

ধর্ম্ম, সমাজ ও সেবাব্রত

ডাঃ শ্রীউমাপ্রসন্ন বসু এফ-আর-সি-পি

'ত্রিদিবে উত্তোলিত করেন'—যাহা মনুষ্যকে দেবত্বের পথে উন্নীত করে তাহাই ধর্ম্ম। আচার্য্য বলিতেছেন যাহা পশু-সাধারণের ধর্ম্ম (Animality) তাহা হইতে উন্নীত হওয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব—যথা প্রকৃতির প্রবল ক্ষুধাদির জয় লাভ করা)। গর্ভাবস্থায় সন্তান জননীর গর্ভে থাকিবামাত্র তাঁহার দেহের সাহায্যে পাইয়া জীবন ধারণ করে। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সন্তান জঠরের ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া উঠে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জঠরাগ্নি স্তন্য পান দ্বারা নির্ব্বাপিত না হয় ততক্ষণ মুহুর্মুহুঃ কাঁদিতে থাকে। পিপীলিকা মাছি ধরিয়া খায়—ভেক পিপীলিকাকে খায়—সর্প ভেককে খায়—ময়ূর সর্পকে খায়—শৃগাল ময়ূরকে খায়—সিংহ শৃগালকে খায়। আবার অন্যদিকে যাঁহারা 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' বলিয়া নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা জীবন্ত ধান বা যব মাড়িয়া খাইয়া প্রাণী হিংসা করিয়াই জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। সুতরাং এ জগতে সবলের দুর্ব্বলকে বধ করিয়া জীবন ধারণ করাই ত দেখি বিধি।

অহিংসা ব্রত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ঋষিগণ পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্রীহি অথবা যবের বধ না করিয়া প্রাণ ধারণ অসম্ভব। প্রাণী সাধারণ সকলেরই পরমায়ু নির্দ্ধারিত আছে। এই হিসাবে ধান যবেরও আয়ু তিন বৎসরের অধিক নয়। তিন বৎসরের ঊর্দ্ধে পুরাতন ধান্যকে চাউল করিয়া তদ্দ্বারা অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলে অহিংসা ব্রত রক্ষিত হইতে পারে। তাই মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই।

'অজৈর্যষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ।
অজ সংজ্ঞানি বীজানি, ন বঃ ছাগং হন্তুমর্হথ।'

অর্থাৎ তিন বৎসরাধিক প্রাচীন ধান যাহা অজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে (যাহার জনন শক্তি নাশ হইয়াছে) তাহার দ্বারা যজ্ঞ করিতে হইবে। ইহাই বৈদিক বিধি। অজ শব্দের অর্থ ছাগ নয়।

ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ঋষিগণ তপস্যা বিধি করিয়াছেন। তপস্যার অর্থ 'দেহমনাদির তাপ হইতে আত্মরক্ষা'। এই জন্য তাঁহারা আহারের পরিমাণ ও কালাদি নিয়মে আবদ্ধ করিবার জন্য উপবাসাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন—যথা চান্দ্রায়ণ ব্রতে অমাবস্যায় নিরম্বু উপবাস করিতেন। প্রতিপদাদিতে কুক্কুটাণ্ড পরিমিত এক এক গ্রাস আহার বাড়াইয়া পৌর্ণমাসীতে পনর গ্রাস খাইতেন এবং কৃষ্ণ প্রতিপদাদিতে এক গ্রাস এক গ্রাস করিয়া কমাইয়া অমাবস্যায় পুনরায় নিরম্বু উপবাস করিতেন। এইজন্য একাদশী আদি ব্রত ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাসে দুইটি একাদশী করিতে হয়। তাহাতে উপবাস করিবার বিধি আছে। উপবাসের অর্থ উপ মানে সমীপে (দেবতার নিকটে) বাস। অন্য দিন [illegible] পুত্র কন্যাকে লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় ব্যবহার দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। একাদশীর দিনে [illegible] দেবতার নিকট বাস করিয়া পুত্র কন্যাদি বা ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার নিরোধ কর্ত্তব্য। এইরূপে ক্ষুধাকে জয় করা যায়।

প্রাণী সাধারণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহাকে প্রবৃত্তি মার্গ বলে। এই ইন্দ্রিয় বৃত্তির ব্যবহার হইতে ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দমনে আনয়ন করতঃ স্ব স্ব রূপের অনুসন্ধান (অর্থাৎ আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথায় যাইব) করিবার জন্য ধ্যানে নিরত হওয়াই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। ইহাকে নিবৃত্তি মার্গ বলে। পুত্র কন্যাদির ইন্দ্রিয় বৃত্তির অনুশাসনে থাকাকে প্রাণীধর্ম্ম (Animality) বলে। পিপীলিকা, মৌমাছি, ইঁদুর, বাঁদর সকলেই দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। Alexander Selkirk কে কবি বলিয়াছেন—

'Society, friendship and love
Divinely bestowed on man.'

ইহা কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্য নয়। বন্য জানোয়ারও দলবদ্ধ হইয়া যৌন সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাস করে। আত্মরক্ষার জন্য কামড়ায়, পুত্রাদি উৎপন্ন করিয়া তাহাদের প্রতিপালন করে; আহার্য্য বস্তু জমা করে। মনুষ্য যদি এই সকল কর্ম্ম করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে তাহা হইলে সে প্রাকৃতিক প্রাণিত্বেরই প্রতিপাদন করে। ইহা হইতে অধিক কি করিলে মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হইতে পারে ইহাই বিচার্য্য। ঈশ্বর চিন্তন, আত্মচিন্তন পশুতে নাই। মানুষেরই ইহা বিশেষ সম্পদ্। সুতরাং তাহার অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। গীতার শেষে ভগবান বলিয়াছেন—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।

ইহার সারার্থ এই যে—আমি কে, ঈশ্বর কে, আত্মা কি ইত্যাদি যে জ্ঞান তাহাই গীতার ধর্ম্ম সংবাদ।

মনুষ্যের জীবনে তিনটী অবস্থা কেহ কেহ বলেন—একটী প্রাতিভাসিক (যাহাকে স্বপ্ন বলে), অন্যটী ব্যবহারিক (যাহাকে জাগ্রত অবস্থা বলে) এবং অপরটী পারমার্থিক (যাহা আংশিকভাবে সুষুপ্তিতে ও পূর্ণাংশের ধ্যান সমাধিতে মিলিয়া থাকে)। স্বপ্ন দৃষ্ট ও অন্ধকারে রজ্জু সর্পের দৃষ্ট তুল্যাতুল্য (অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে) অর্থাৎ সিনেমা চিত্রের খেলার মত। সূক্ষ্ম বিচারে জাগ্রত ব্যবহারিক সত্তা ও প্রাতিভাসিক বলিয়া মনে হয়। ব্যবহারিক সত্তাকালে প্রাণিমাত্রেরই ধর্ম্ম, যাহা প্রকৃতি প্রেরণায় ঘটিয়া থাকে, তাহা একই।

সৃষ্টি শব্দের অর্থ বৈষম্য—যেমন একটি সরিষার বীজ বপন করিলে প্রথমে মূল, পরে অঙ্কুর, পরে পাতা, ফুল ও সর্ব্বশেষে ফলের সৃষ্টি হয়। বীজ হইতে এই সকল ভিন্নভিন্ন উৎপন্ন হয় কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কোন সমতা নাই, উপরন্তু বৈষম্যই রহিয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে বিষ্ণুর নাভি হইতে যেমন ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল, তৎসহই বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু, কৈটভ দৈত্যদ্বয়ের উদ্ভব হয়। ইহারা জন্মিয়া নিরীহ ব্রহ্মাকে মারিতে উদ্যত হয়। ইহার মর্ম্ম এই যে সৃষ্টির মূলে বৈষম্য (ব্রহ্মা ও মধু কৈটভ) এবং একজন সাত্ত্বিক ব্যক্তি জন্মিলে দুইজন অসাত্ত্বিক লোক জন্মে এবং অসাত্ত্বিক সাত্ত্বিকের বিপদ ঘটায়। ফলতঃ সৃষ্টিতে সমতা অসম্ভব ব্যাপার।

মানব সমাজেও তদনুরূপ চারিটী বিভাগের লোক দৃষ্ট হয়—Missionary (ব্রাহ্মণ), Military (ক্ষত্রিয়), Merchant (বৈশ্য), Manual Labour (শূদ্র)—ইহাও সৃষ্টির বৈষম্যের পরিচায়ক। বুদ্ধির বিভিন্নতা বশতঃই এইরূপ বিভেদ ঘটিয়া থাকে। সমাজবদ্ধ জীব আপনাদের সুখ সৌকর্য্য সাধিবার জন্য Division of labour এর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আপন আপন কর্ম্মদ্বারা প্রত্যেক শ্রেণী সমাজের উন্নতি করিয়া থাকেন। এই সব বৈষম্যের জন্য সকলের সমতা সম্ভবপর নয়। সমাজবদ্ধ লোক যৌনসঙ্গ করিতেও কিছু পরিমাণে নিয়মাবদ্ধ হইয়া থাকে—যাহাকে বিবাহ বলে। অনিয়মিত যৌনসঙ্গ কোন সভ্য সমাজে [illegible] করে না। দেশ কাল পাত্র ভেদ জন্য আহারাদি ভেদও অনিবার্য্য হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে যেরূপ আহার বিহার সম্ভবপর, গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে তাহা সম্ভবপর নয়। ইহাই প্রকৃতপক্ষে আচার ভেদের কারণ।

ত্রিগুণা প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্ব, রজ, তম গুণের ভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাও বৈষম্যের পরিচায়ক, যেমন ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত মিছরি, আফিম ও চরস—এ তিনটি বস্তুই [illegible]। কিন্তু মিছরি উদরস্থ হইলে শরীরে শান্তি দেয়—সাত্ত্বিক গুণের আবির্ভাব হয়। আফিং খাইলে নিদ্রালস-পরতন্ত্র হয় এবং তমগুণের আবির্ভাব হয়। চরস খাইলে শরীর উগ্র হয় এবং রজগুণের আবির্ভাব হয়। দুধ ও মাসকলাই উভয়েই ভাল। কিন্তু দুগ্ধ গুণে ত্রিদোষ নাশক। মাস ত্রিদোষ বর্দ্ধক। একটু প্রমাণ মানিতে হয়। ঈশ্বর উপাসনা সত্ত্বগুণ দ্বারাই লাভ হয়। তাই রজগুণী ও তমগুণী আহার্য্য ও রজ-তমগুণী ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাজ্য। প্রকৃতির এই বৈষম্যের জন্য সমাজেও শ্রেণী বিভাগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যে সমাজ উপাসনা করিবার জন্য ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা নিন্দনীয় নহে।

কেহ কেহ বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি পাঠ করার উপদেশ দিয়া থাকেন। এতদ্ তৎসম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সমীচীন মনে হয়। Reformer Martin Luther এর দেশে Goethe, Schopenhauer, Fitze প্রভৃতি মনীষীগণ যখন উপনিষদ্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে উহা আপনাদের Prayer Book করিয়াছিলেন। তৎপশ্চাৎবর্ত্তীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা Roman অক্ষরে অনুবাদ সংস্কৃত সহিত সমাজে প্রকাশ করেন। এক্ষণে তাঁহারা দেবনাগর অক্ষরে পাঠের সুব্যবস্থা করেন ও Leipzig University দেবনাগর অক্ষরে বেদ যার সারভাগ ও ঐ সকল উপনিষৎ ছাপাইয়া পাঠে রত আছেন। পুরাতন ইংরাজী ভাষায় লিখিত Bible, Shakespeare, Milton প্রভৃতি কবিদের সময় অপেক্ষা ইংরাজী ভাষার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে তথাপি কেহ Bible, Shakespeare, Milton এর অনুবাদ পাঠে তুষ্ট হন না। Paraphrase করিয়া উহা বুঝাইয়া থাকেন। তেমনি সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ ত্যাগ না করিয়া মূলপাঠসহ উহার অর্থ প্রচার ব্যবস্থা চালানই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় এবং সংস্কৃত ব্যাখ্যার জন্য University কর্তৃপক্ষের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নির্লিপ্তভাবে ধর্ম্মাচরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। আত্মীয়স্বজনের মায়া ও ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় নিজেকে ব্রতী করা গৃহীর পক্ষে সহজসাধ্য নহে। কিন্তু সেই কারণে সংসারী ব্যক্তি কি ধর্ম্মাচরণে বিরত থাকিবে? গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়াই তাহাকে ভগবৎ চিন্তা ও ধর্ম্মকার্য্য করিতে হইবে। গৃহী তাহার সমস্ত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াও ধর্ম্মচর্চ্চা ও ঈশ্বরে আত্ম-নিবেদন করিবে ইহাই এই আশ্রমের নিয়ম। গৃহী হইয়াও যিনি আসক্তি বা লোভে আত্মহারা হন না ও আত্ম সংযম করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত মহৎ। দরিদ্রনারায়ণের সেবা ধর্ম্মাচরণের একটী প্রশস্ত পথ। ভগবান দরিদ্ররূপে মানুষের সেবা লইবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এই জনসেবায় যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় তাহা অনাবিল। তাহাতে আনন্দ আছে কিন্তু আত্ম-বিস্মৃতি নাই, যশ আছে কিন্তু যশলিপ্সা নাই। এই সেবাব্রতের অনুষ্ঠানে মানুষের মনে অহমিকা স্থান পায় না, বিনয় ও শান্তিতে ভরিয়া উঠে। সে আনন্দ অভিনব ও অপার। এই সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ইহকালে শান্তি ও পরকালে পুণ্য অর্জ্জন হয়। এই ধর্ম্মে ধনী ও দরিদ্রের সমান অধিকার। যাঁহার অর্থবল আছে তিনিই অর্থ-সাহায্য দ্বারা দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিতে পারেন; যাঁহার অর্থের অভাব তিনি সাধ্যমত সেবা ও কায়িক পরিশ্রম করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন। এই মার্গ সরল ও সুপ্রশস্ত। সকল সুখ দুঃখ ভুলিয়া ইহাতে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারেন। আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দেশে এই সেবাব্রতের মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় তিনি সমাজকে এই সেবা মন্ত্রে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম তাঁহারই শিক্ষার পরিণতি। দেশে সেবা প্রতিষ্ঠান যত বিস্তৃতি লাভ করিবে ও সেবাধর্ম্মের প্রভাব যতই বৃদ্ধি পাইবে জাতির উন্নতির পথ ততই প্রশস্ত হইতে থাকিবে। নরনারায়ণের সেবাব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও মেরুদণ্ডস্বরূপ। ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করি সমাজ হিংসা, দ্বেষ ভুলিয়া সেই সেবাধর্ম্ম প্রচারে রত হউক।

আত্মচরিত

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

বাতগ্রস্ত চন্দ্রকান্তবাবু বাঁধানো খাতাখানি টেনে নিয়ে মোটা অক্ষরে নোট করে' রাখ্‌লেন—

কত বড় ইম্পার্টিনেন্ট্‌! দিনের পর দিন মন জোগাইয়া চলিয়াও যদি তিলমাত্র শান্তি পাওয়া গেল! মাত্র ছয়টা বৎসর—কত বড় আশা করিয়া ছেলেকে বিবাহ দিয়া বউ আনিয়াছিলাম। সব বুঝিয়া সুঝিয়া একাকার হইয়া গেল। স্বামী ভিন্ন সংসারে আত্মীয় দূরে থাক্‌, কর্ত্তব্য-সম্পাদনের দিক দিয়া পর্য্যন্ত আর কেহ রহিল না। আজ মুখের উপর স্পষ্ট কিনা বলিয়া দিল—'এর চাইতে বেশী আমি পারবো না।' মোষ্ট্‌ আন্‌গ্রেটফুল এ্যাণ্ড্‌ ইম্পার্টিনেন্ট্‌ ভিন্ন ইহাকে আর কি বলা যায়? হীরালাল পর্য্যন্ত আজকাল অধিক ক্ষেত্রে নির্ব্বাক। অথচ ইহাদেরই পিছনে আজও আমাকে অর্থব্যয় করিয়া চলিতে হয়। শুধু দুটি ভাত রান্না করিয়া দেওয়া ভিন্ন এ সংসারে এই স্থবির প্রাণীটির এতটুকু পরিচর্য্যা করিবার কেহ নাই। শরীরে জোর পাইনা, নতুবা মালিস্‌টা···ঔষধটার জন্য আর ভাবিতে হইত না। আজ যদি অন্ততঃ সে বাঁচিয়া থাকিত, তবে আর এমন অযত্নে দিন কাটিত না। এ সংসারে হাসি-তামাসা হইতে সুরু করিয়া স্নো-পাউডার আর সাবানের সরঞ্জাম সবটাই চলে, অগতির মধ্যে হতভাগ্য এই বুড়ো।—[১৯-১১-৩৩]

স্বল্প-পরিসর এই দিনপঞ্জীকে অবলম্বন ক'রে বৃদ্ধ চন্দ্রকান্তবাবুর বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের ইতিবৃত্তকে সামান্য অনুমান করা বিশেষ কিছু শক্ত নয়। এমন বৃদ্ধদের জন্য শুধু কবি বা ঔপন্যাসিকই নয়, আমাদেরই নিজস্ব আটপৌরে লোকদেরও মমতা হয়।—

সারাজীবন পেশ্‌কারি করে' যে অর্থ তিনি রোজগার ক'রেছেন, চেষ্টা করে' সামান্য অঙ্কের জমা লিখেও তা থেকে তাঁর অতিবড় প্রয়োজনেও মাথা গুঁজ্‌বার মতো কোথাও একখানি চৌচালা দাঁড় করা'তে পারেন নি। স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে এখান থেকে সেখানে শুধু বাড়ী বদল করে' করে' মাসিক ভাড়ার রসিদ কেটেছেন। অর্থের অপচয় তাতে কম ঘটেনি। তারপর খাওয়া পরা, বুকের ধন সুধা আর হীরুকে মানুষ করা, এটা ওটা কতটা। স্ত্রী পুষ্পলতার সংসারে 'নাই নাই' ভাবটা কোনোদিন আর ঘুচ্‌লো না। এমন দিন নেই—এই নিয়ে কর্ত্তা-গিন্নীতে ঝগড়া না হ'য়েছে, কিন্তু মীমাংসা হয় নি। পাশের বাড়ীর লোকেরা পর্য্যন্ত শুনে শুনে মাঝে মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা ক'রেছে—পেস্কারি সেরেস্তায় কম অর্থ তো নয় রে বাবা, যে এমন কষ্ট বউটার! তারপর যে ঘুষের ব্যাপার, কথায় বলে—পেস্কার আর দারোগা!

অবিশ্যি পাড়াপ্রতিবেশীর পক্ষে এ আলোচনা বিচিত্র নয়; কিন্তু তা' হ'লেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে চন্দ্রকান্ত কোনোদিন সজ্ঞানে কোনোপ্রকার গোপন উৎকোচ গ্রহণ করেননি। অন্তরের সংস্কারে না বাধ্‌লে এই দিয়ে পুষ্পলতার সংসারকে হয়ত আরও অনেকটা স্বচ্ছল ও সজীব ক'রে তুল্‌তে পারতেন, কিন্তু এ পথে তাঁর চিত্তের দীনতা ছিল। এই দীনতাই তাঁকে আজীবন পঙ্গু করে' রেখেছে।

অবস্থাপন্ন পরীবন্ধু লোকনাথ বাঁড়ুয্যে এক সময় ব'লেছিলেন, "দ্যাখো হে চন্দ্রকান্ত, টাউনের দক্ষিণপাড়ায় বিঘে আড়াই সস্তা জমি হাতে আছে; রাজী হও তো দু'জনে ভাগে কিনে ফেলি। তোমারও একটা পার্মানেণ্ট্‌ ঠিকানা হয়, আমিও মাঝে মধ্যে কাজে কর্ম্মে এসে সহরে থাক্‌তে পারি।"

চন্দ্রকান্ত তখন নিজের অবস্থার কথা জানিয়ে ব'লেছিলেন, "টাকা নেই"

উত্তরে লোকনাথবাবু অনিশ্চিত কালের জন্য ঋণ দেবার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

কিন্তু অনেক চিন্তা ক'রেও চন্দ্রকান্ত ঋণ গ্রহণের সাহস করেনা; লোকনাথ বাঁড়ুয্যেও বিষয়টা নিয়ে পরে আর মাথা ঘামান নি। ফলে জমিটা আজ পর্য্যন্ত ক্রেতার অভাবে পড়ে' আছে—বছরের পর বছর তবু তার দাম বেড়ে চলার বিরাম নেই।······

ঝগড়ার ঝাঁকে ঝাঁকে রাত্রে যখন মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হ'য়েছে, চন্দ্রকান্ত কাতরকণ্ঠে তখন স্ত্রীকে ব'লেছেন, "সত্যি তোমাকে সুখী ক'রতে পারলুম না, পুষ্প। এ যে আমার কত বড় অক্ষমতা—বলে' শেষ ক'রবার নয়। জীবনে বাবার এক বোঝা দেনা ঘাড়ে করে' সংসার-পথে নেমেছিলাম; নিজে রোজগার করে এতদিনে অতিকষ্টে তবে তা' শোধ করলাম। তাই জমি কেনার জন্যে লোকনাথ যখন দেনার আশ্বাস দিয়েছিল, নিই নি; কেন জানো? ভবিষ্যতে হীরু যাতে সে যন্ত্রণা থেকে অন্ততঃ রেহাই পায়—এই জন্যে। দেনার বোঝা যে কত বড় কঠিন, আমি তার স্বাদ পেয়েছি।"

স্বামীর কথায় পুষ্পলতা প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পান নি; বরং হৃদয় তাঁর আর্দ্র হ'য়ে উঠেছে।······

এমনি ক'রেই ক্রমাগত দিন চলে।

সুধা আর হীরুর বয়সও মায়ের কোলে সেই প্রসূতি-গৃহে আবদ্ধ নেই। দিনে দিনে প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের ছাপ তাদের দেহ মনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

সুধার জন্যে পাত্র ঠিক না ক'রলে নয়। অর্থের কথা ভাবতে গিয়ে চন্দ্রকান্তের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। কিন্তু আজ না হোক্‌, কাল তো এর ব্যবস্থা একটা ক'রতেই হবে!··· খোঁজ-খবরের ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে সোজা তিনি একদিন বিজ্ঞাপন ছেড়ে দিলেন খবরের কাগজে। কতকগুলো চিঠি এসেও ইতিমধ্যে জড়ো হোলো। সব ক'টিপত্রেই যোগাযোগ স্থাপনের পথ পণের দাবীতে রুদ্ধ। এক রকম মাথায় হাত দিয়ে ব'সবার অবস্থা। কিন্তু দেবতার কাছে অন্তরের অভিযোগের মাঝ দিয়েও সুযোগের সূর্য্য একদিন হেসে ওঠে।···পাশের গাঁয়ের দাসেদের বাড়ীতে একদিন যে-খবরটার

বিয়ে হ'য়ে গেল সুধারাণীর। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে চন্দ্রকান্ত প্রাণভ'রে সেদিন ভগবানের উদ্দেশে একবার প্রণাম ক'রে ব'ল্লেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ বিধাতা।"

হীরু তখন আই-এ ক্লাসের ছাত্র। প্রথম বার ফাইনালে এপিয়ার হ'য়েও দ্বিতীয় বার আবার মাথা ঘ'ষচে। চন্দ্রকান্তের অর্থের ঘাট্‌তি সর্বত্র। তবু হীরু তাঁর একমাত্র বংশধর, একমাত্র আশা।—পড়াবার বিরাম নেই চন্দ্রকান্তের; বলেন—"পরীক্ষে সেরেফ্ 'লাকের' ওপর নির্ভর করে। কত ভালোছেলেও তো 'সাক্‌সেস্‌ফুল' হ'তে পারে না! এই নিয়ে কি মন খারাপ করে' বসে' থাক্‌লে চলে?"

পুষ্পলতার বুঝ্‌তে বাকী থাকে না যে, স্বামীর সান্ত্বনাটা বস্তুতঃ অন্তর্মুখী নয়, বহির্মুখী। "আমিও তো তাই বলি" বলে' মাঝে মাঝে তিনিও সায় দেন।···

হীরুলালও সত্যি সত্যি পাশ ক'রে ওঠে। আবার অর্থ, আবার বই.···বি-এ-র সেশন্ পার হ'য়ে যায়।—চন্দ্রকান্ত সাহসে বুক বাঁধেন, ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, "এবার বাবা সত্যি কিন্তু ভালো রেজাল্ট করা চাই।"···দেখতে দেখতে হীরুলালও সত্যি সত্যি গেজেটে নাম তুলে চ'ম্‌কে দিলে বাপ-মাকে। ভগ্নীপতি চিঠি দিলে—"কন্‌গ্রাচুলেশন্ দাদা—এ দেখছি একেবারে রোমাঞ্চকর কাহিনী!···" মা ব'ল্লেন—"হীরু আমার লক্ষ্মীমন্ত।" বাপ ব'ল্লেন, "আন্‌-এক্স্‌পেক্টেড্‌লি বিউটিফুল।"—

বাড়ীতে কালীপুজোর ধুম প'ড়ে গেল।···

ছেলে এবার মত ক'রলে—আইন প'ড়বে।

পুষ্পলতা ধরে বসলেন স্বামীকে। চন্দ্রকান্ত ব'ল্লেন, "তবে এবার নিজের হাতের গয়না বাঁধা দাও; আমি একদম ফতুর হ'য়ে গেছি। তার চাইতে মাথায় ওসব দুর্বুদ্ধি না খেলিয়ে, কালেক্টরিতে লোক নিচ্ছে—ছেলেকে ইণ্টারভিউতে পাঠিয়ে সোজা ঢুকে পড়তে বলো কাজে। যথেষ্ট পাশ ক'রেছে, আর দিয়ে দরকার নেই।"

কিন্তু পাশের এই প্রাচুর্য্যটুকুই তো যথেষ্ট নয়! দ্বন্দ্বটা যে সেইখানেই। ছেলের অস্বীকৃতি জানিয়ে আর এক দফা ঝগড়া হ'য়ে গেল স্ত্রীতে আর স্বামীতে। ফলের মধ্যে হীরুলালের ক'ল্‌কাতা-যাত্রাই প্রধান হোলো। পুষ্পলতার হাতে গয়না বাঁধা পড়েনি, বিক্রীত হ'য়েছে চন্দ্রকান্তের পিতৃ-আমলের সোনার পকেট-ওয়াচটি। ভবিষ্যৎ বংশধরের জীবন রক্ষায় তর্ক ক'রেছেন, কিন্তু কার্পণ্য করেননি কোনোদিন। সন্তানের কল্যাণ দেখা—এ যে কত বড় আশা, পৃথিবীর বাপ-মা'রাই শুধু ভাবতে পারেন।

দু'বছর বাদে সত্যি সত্যি সেই আশা-বৃক্ষে বুঝি ফল ফ'ল্‌লো!

—স্বাধীনচেতা হীরুলাল এতদিনে এসে 'বারে' জয়েন্ ক'রলে।—চারদিক থেকে ঘট্‌কালি সুরু হোলো দিনের পর দিন।

পুষ্পলতা ব'ল্লেন, "তোমার তো আগামী বছরেই পেন্সন্, মন্দ কি, কাজে থাক্‌তে থাক্‌তে হীরুর বিয়েটাও দিয়ে দাও না! খরচ পত্তর তেমন একটা নাই বা ক'র্‌লাম। আনন্দের ব্যাপারে হীরুর বন্ধু ক'জনই যথেষ্ট।"

চন্দ্রকান্ত জবাবে ব'ল্লেন, "আমার কর্তব্য শেষ ক'রেছি, এবারের ভার তোমার হাতে। বাইরের কাজে আমি আছি।"

বস্তুতঃ কাজটা উপস্থিত মতো বাইরের দিক থেকেই এলো এবং অন্তঃপুরের যুক্তযোগেও শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধকেই এসে নাব্‌তে হোলো। কোথাকার কোন্ এক কুলীন ঘরের কমলরাণী বউ হ'য়ে ঘরে প্রবেশ ক'রলে। আনন্দে সেদিন পুঞ্জীভূত অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা চাপা পড়ে' গেল।···পুষ্পলতা ব'ল্লেন, "যেমন আমার হীরু, ঠিক বউটিও হ'য়েছে তার মতই, কি বলো? আমিও কিন্তু এমনটাই চেয়েছিলাম।" উত্তরে চন্দ্রকান্ত ব'ল্লেন, "তোমার মনের মতো হ'লেই হোলো।"

কিন্তু চওয়াটা শেষ পর্য্যন্ত অনেকখানি এগিয়ে গেল। সেদিন কথায় কথায় কি একটা জিজ্ঞেস্ ক'রতে গিয়ে পুষ্পলতাকে রীতিমত অপমানসূচক কথা শুন্‌তে হোলো কমলরাণীর মুখে। স্বামীর কানে যদিও তক্ষুণি তা' তুলে দিতে তাঁর ভরসা হোলো না, কিন্তু এক সময় আর চাপা দিয়ে রাখ্‌তে পারলেন না।—"জানো, বউটাকে যা' ভেবেছিলাম, তা' তো নয়! আমাকে কিনা এরই মধ্যে যা' নয় তাই ব'ল্‌তে সুরু ক'রে দিয়েছে।"

সেদিনও চন্দ্রকান্ত অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শুধু ব'লেছিলেন, "এও একটা জীবনের অভিজ্ঞতা। তার চাইতে চলো এবার কাশীধাম রওনা হই।"

বস্তুতঃ ভিটা ছেড়ে চন্দ্রকান্তের আর নড়া হোলো না। সরে' প'ড়লেন পুষ্পলতা।···হঠাৎ এক সময় কঠিন হৃদ্‌রোগে তিনি আক্রান্ত হ'য়ে প'ড়লেন। মফঃস্বলের ডাক্তার দিয়ে নিরাময় করা কঠিন হ'য়ে দাঁড়ালো। ঠিক করলেন প্রভিডেণ্ট্ ফাণ্ড্ থেকে টাকা তুলে ক'ল্‌কাতায় নিয়ে যাবেন। কিন্তু ডাক্তারেরা একেবারে আশা ছেড়ে দিয়ে শেষ জবাব দিতে রাজী হ'লেন না।—

সংবাদ পেয়ে স্বামী ও পুত্রকন্যা নিয়ে সুধারাণী এলো গ্রাম থেকে। প্রথম দৃষ্টিতেই তাক্ লেগে গেল তার ভ্রাতৃ-জায়ার পরিচর্য্যার বহর দেখে! দাদাটিরও যে আজকাল তেমন নজর আছে মায়ের দিকে বোঝা গেল না।···চন্দ্রকান্তবাবুর দৃষ্টি এক একবার অতীত জীবন থেকে ঘুরে আসে। অথচ ঐ আশা পর্য্যন্তই। সংসারের হাওয়া বদ্‌লেছে—শক্তি তো নেই তার কিছু ক'রবার মতো! অথচ এই হীরুলালেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই সারা জীবন তাঁদের কেটে গেছে।

পুষ্পলতার এতটুকু মাত্র অভিযোগ আর ভাষা হ'য়ে প্রকাশ পেলো না। স্বামীর কোলে মাথা রেখে তিনি শেষ নিশ্বাস ফেল্‌লেন। দুঃখে অনুশোচনায় চন্দ্রকান্তের অশ্রু জমাট বেঁধে গেল!

অশৌচান্ত চুকে গেলে সুধারাণী ধরে' ব'স্‌লে, "এবারে চলো বাবা, এখন তো আর ল্যাঠা নেই, কিছুদিন আমার ওখানেই থেকে আস্‌বে।—"

বড় মেয়ে মঞ্জুলীও একেবারে গলা জড়িয়ে ধ'র্‌লে দাদামশাই-এর—"এবার তোমাকে নিয়ে গিয়ে তবে ছাড়বো, হ্যাঁ—।"

চন্দ্রকান্তও এতদিন বাদে নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন—বড় দীন, বড় দুর্ব্বল মনে হোলো আপ্‌নাকে। সাজানো ঘরের প্রত্যেকটি স্থান জুড়ে আছে পুষ্পলতার সুকোমল করপুটের ছাপ—বুক ফেটে কান্না আসে। কিছু-দিন ঘুরে

গিয়ে সবে' না থাকলে হয়ত পাগল হ'য়ে যাবেন তিনি! বাধ্য হ'য়ে তাই চাকুরির মেয়াদ না ফুরোতেই পেন্সন্ নিয়ে একদিন রওনা হ'য়ে প'ড়লেন মেয়ের বাড়ী। তবু যখন-তখন হিসেব-কষা টাকার অঙ্ক পাঠা'তে কসুর করেন নি ছেলেকে। একমাত্র বংশধর, টীকলালের কষ্টের কথা তিনি ভাবতে পারেন না কখনো!···

মেয়ের ঘরে এমনি ক'রেই বছরের পর বছর গড়িয়ে চ'ললো। মাঝখানে প্রথম নাতনি হ'বার সংবাদ পেয়ে একবার মাস দু'য়েক এসে থেকে গেছেন চন্দ্রকান্ত ছেলের কাছে। এখন আর তাঁর নিজের ব'লতে কি আছে? কমলরাণীর সংসার, টীকলাল তো তার হাতের পুত্তলিকা মাত্র। বুড়ো মানুষের ঠাঁই কোথায়? তবু তাঁর সর্ব্বচিত্তের কামনা—ছেলে তাঁর অনন্ত সমৃদ্ধির মধ্যে আয়ুষ্মান্ হ'য়ে সুখে থাক্।

টীকলালের সুখের সংসার বাস্তবিকই এক সময় অপরিসীম স্বাচ্ছন্দ্যে ফেঁপে উঠলো। কিন্তু জীবনে কত বড় পাপ ক'রেছিলেন চন্দ্রকান্ত—কে ব'লতে পারে! নইলে আজ তাঁকে হঠাৎ এমন দুরারোগ্য বাত রোগে আক্রমণ ক'রে ব'সবে কেন? হঠাৎ বিধাতা এমন ক'রে তাঁকে শয্যাশায়ী ক'রে ফেললেন কেন? আজ যে সারা পৃথিবী গৃহাভ্যন্তরেই আবদ্ধ হ'য়ে গেল। এর চাইতে বিধাতা কি তাঁকে একেবারে পুষ্পলতার পথে টেনে নিতে পারতেন না?

সুধারাণী প্রাণপণে বাবাকে শুশ্রূষা করে' চ'ললে। কিন্তু গ্রামদেশ। ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায় না। তাই ব'ললে, "আমার জন্যেই আজ তোমার এই কষ্ট। এমন জানলে সত্যি তোমাকে এই গ্রাম বিভুঁয়ে আনতুম না। এখন যে ভালো চিকিৎসার দরকার হ'য়ে প'ড়লো। দাদাকে লিখে দি, এসে তোমাকে নিয়ে যাক্।"

আকস্মিক প্রয়োজনবোধে চন্দ্রকান্তও আর বিনা চিকিৎসায় গাঁয়ে থাকতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। বাধ্য হ'য়ে তাই আবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে চন্দ্রকান্তকে ফিরে আসতে হোলো সহরে। কিন্তু শেষ বয়সে সন্তানের কাছ থেকে যতটুকু তিনি আশা ক'রেছিলেন, টীক কিম্বা কমলরাণীর আচরণে এতটুকু আভাস তার মিললো না।

এর মধ্যেই একদিন স্বামীর অজ্ঞাতে কমলরাণী বলে' ফেললে, "সাধ করে' মেয়ের বাড়ী গিয়ে থাকলেন, কোথায় সেবা যত্নে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে,—কিন্তু কই?"

চন্দ্রকান্তের সারা চোখে সেদিন অন্ধকার নেমে এলো। এ তিনি এলেন কোথায়? পুষ্পলতাও ছেলের বিয়ের পর দু'দিন যেতে না যেতে কমলরাণীর সম্বন্ধে একদিন অভিযোগ জানিয়েছিলেন; সেদিন সে কথা নিয়ে ভাববার তিনি অবকাশ পান নি। আজ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করে' মৃতা স্ত্রীর উদ্দেশে মনে মনে একবার বলে' উঠলেন, "তোমার ধারণা সেদিন মিথ্যে হয়নি পুষ্প! আজ দেখে যাও আমি কোথায়।"

অথচ চন্দ্রকান্ত এদের কাছে তো বেশী কিছু আশা করেন নি। একটুখানি ভদ্রতা, একটুখানি শিষ্টাচার, আর সামান্য একটু তৃপ্তি। তৃপ্তি অর্থে সেঁকটা, মালিশটা, সময়মতো একটু ওষুধ তুলে দেওয়া—এই যা—। অর্থের সাহায্য তো তিনি চাননি। ভগবান তাঁকে যা' দিয়েছেন, তা' থেকেই বরং এখন-তখন সর্ব্বক্ষণের জন্য উপযাচক হ'য়ে তিনি সামর্থ্য মতো এদের প্রয়োজন মিটিয়ে আসছেন। অন্ততঃ ভদ্রতার দিক দিয়ে তার একটা দাম থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আজ তিনি চেয়ে দেখলেন—বানের জল অন্যদিকে বইছে। তবু আজ এদের অনুগ্রহের উপর ভর ক'রে থাকতে হবে। মাসের পর মাস নিজে পেন্সন ভোগ ক'রেও আজ তিনি অপমানে লাঞ্ছনায় কমলরাণীর হাতের ক্রীড়নক মাত্র। কবরেজ মালিশ দেবার বিধান দিয়েছে। শুনে কমলরাণী স্পষ্ট জানিয়ে দিলে—এর চাইতে বেশী আর সে পারবে না। বেশীর মধ্যে শুশ্রূষা, কমের পক্ষে দু'গ্রাস ভাত বেড়ে দেওয়া।···এ দুঃখ আজ চন্দ্রকান্ত কোথায় গিয়ে ঢাকবেন? বৃদ্ধ, স্থবির তিনি—তারুণ্যের জয় সর্ব্বত্র। কে শুনবে আজ তাঁর কথা?···

পৃথিবীতে মানুষের কাছে যখন কিছু বলার থাকে না, একমাত্র নিজের মন ভিন্ন সেখানে আর কি আছে! চন্দ্রকান্ত আজ স্তব্ধ হ'য়ে গেছেন;—দুঃখ যখন বুক ছাপিয়ে ওঠে, বাঁধানো নোট-বুকখানিকে টেনে নিয়ে নিঃশব্দে শুধু কথাগুলিকে তিনি নোট করে' রাখেন। এই তাঁর স্থবিরকালের আত্মচরিত, নিঃসঙ্গ বার্দ্ধক্য জীবনের অলক্ষ্য ইতিহাস।

বাঙ্গলার মন্বন্তর

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

লোকে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" নাম আজও সভয়ে উচ্চারণ করে; তখন খৃষ্টাব্দ ১৭৭০, ইংরেজ শাসনের সবে সূত্রপাত, কারণ তার মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে ক্লাইভ সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে বাদশাহ সাহ আলমের নিকট বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। দেশে নানা অশান্তি, নানা কর্ত্তা, নানা শাসন; তখন এক ভীষণ যুগ পরিবর্ত্তনের মুখে এক বৎসরের অল্প বৃষ্টি ও পর বৎসরের অনাবৃষ্টিতে দেশে অন্নাভাব ঘটিয়াছিল। আমলে নামে ১৭৭০ সালে অর্থাৎ আজ হইতে পৌনে দু'শ বৎসর পূর্ব্বে বিশাল জগতের বিচ্ছিন্ন এক কোণে যে অর্থনৈতিক শোষণ অন্তরালে পশ্চাতে থাকিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াছিল, আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সারা বিশ্বের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ সংস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও পুরাতন রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের এক ঘটনার পুনরভিনয় হইতেছে মাত্র। আবার যদি কমিশন বসে, আবার যদি হাণ্টারের মত নির্ভীক ঐতিহাসিক "পঞ্চাশের মন্বন্তরের" ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, দেখা যাইবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অপেক্ষা বর্ত্তমানের দুর্ভিক্ষ গুরুত্ব হিসাবে মোটেই কম নয়; বরং প্রায় দুই শত বৎসরে সভ্যতার ধারা, লোক সেবার মান, যান বাহনের সুবিধা সবই উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আজ যে ভাবে লোক মরিয়াছে, তাহাতে মনে হয়—বর্ত্তমানের দুর্ভিক্ষ মহামারী পৌনে দুইশত বৎসরের আগের ঘটনা অপেক্ষা তুলনায় তীব্রতর।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দুর্দ্দশার কথা বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দ মঠে" লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে হাকিম ছিলেন, তাই তিনি সকল আইন বাঁচাইয়া যে কয়টী কথা লিখিয়াছেন, তাহাকে ১৮৭৮ সালের Famine Commissionএর রিপোর্টের ইংরেজি ভাষার হুবহু বাঙ্গলা অনুবাদ বলা চলে। তাহা ছাড়া স্যর জন সোর (Sir John Shore) লিখিত কয়টী

লাইন পত্রে লিখিত আছে; ইংরেজি বলিয়া তাহার সহিত বাঙ্গালী আমরা বিশেষ পরিচিত নহি। কিন্তু এই বর্ণনাই প্রকৃত অবস্থার নিখুঁত চিত্র বলিয়া মনে হয়।

সার্ জন সোর বা পরবর্তী কালে লর্ড টেনমাউথের কবিতার হণ্টারের প্রদত্ত অনাথ ঘোষ কৃত বাঙ্গালা তর্জ্জমা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না:—

"এখন(ও) মানসক্ষেত্রে সেই দৃশ্য করি নিরীক্ষণ—
নয়ন কোটরগত, শীর্ণ দেহ, শবের বরণ।
শুনি—মাতৃ আর্তনাদ, শিশুকণ্ঠে কাতর ক্রন্দন,
নিরাশের হাহাকার, যাতনায় অস্ফুট রোদন।
মৃত ও মরণাহত এক সাথে গড়াগড়ি যায়;
শিবার অশিব রবে শকুনির চীৎকার মিশায়;
কুকুর ডাকিয়া ফিরে,—দিবাভাগে খর রবি করে
স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করে মৃত ও মুমূর্ষু একত্র ধরে।
সে দৃশ্য লেখনী-মুখে বর্ণনার যোগ্য নাহি হয়,
কালে তাহা স্মৃতি হ'তে কোন দিন মুছিবার নয়।"

পঞ্চাশের মন্বন্তরের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র সে দিন; ২২শে জুলাই তারিখের পূর্ব্বে কোনও পত্রিকা ইহা লিখিতে ভরসা করে নাই। এই জুলাই উড়িষ্যার লোক "হয়ত অনাহারে **মরিয়াছে**" বলিয়া প্রকাশ পায়। তারও কিছুদিন আগে হইতে লোক অনাহারে মরিতেছে; আর এই কয়মাসের মধ্যে যে ঘটনা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা টেনমাউথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত বিবরণকে অতিক্রম করিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে যে কয়টা বড় বড় আকাল হইয়াছে, হয়ত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর এই পঞ্চাশের মন্বন্তরই বড়; ইতিমধ্যে ১৭৮৩ সালে হইয়াছে। পরে ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার সঙ্গে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ—তাহাতে অন্ততঃ দশ লক্ষ লোক মরে; ১৮৭৩-৭৪, ১৮৭৬-৭৮, ১৮৮৪-৮৬, ১৮৯২ আর ১৮৯৭ সালে বাঙ্গলায় শুধু অন্নাভাব হইতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার চেষ্টায় যে সকল ভুল করা গিয়াছে, সেইগুলি সাধারণতঃ অবলম্বিত হয়, আর মড়ক হয় বেশী। মাত্র দু একবার, একবারই বলি ১৮৭৩-৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে দুই কোটী লোকের সঙ্কট হইলেও যে সকল উপায় অবলম্বন করার ফলে লোকক্ষয় হয় নাই বলিলেই হয়, সেইগুলি সাধারণতঃ উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

সকল দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে মনে রাখিতে হইবে, বাঙ্গালা যে সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিল, সকল বিদেশীর লোভের বস্তু ছিল, সে সম্পদ বিদেশী ব্যবসার নামে তাহার দেশে লইয়া গিয়াছে; শিল্প প্রভৃতি যাহা যে উপার্জ্জনের পথ ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, লোক নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর বিদেশী শাসন যন্ত্রের খরচ মিটাইতে তাহাকে দাবিয়া দোহন করিয়াছে; তাই হঠাৎ একটা দুঃসময় আসিলে লোককে একেবারে বিহ্বল করিয়া ফেলে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে, বিশেষতঃ কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করিবার পর যে শোষণ চলে, তাহার পরই অজন্মা হওয়ায় শুল্ক খুব বেশী হইয়া ১৭৭০ সালের মন্বন্তর সৃষ্টি করে।

তখনকার যে মারাত্মক ভুল বাঙ্গালা দেশে এক কোটী লোকের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল, তাহার কতগুলি এখনও পালিত হইতেছে; তবে এখন একটা বিরাট যুদ্ধের নূতন অজুহাত আছে, তফাৎ এই মাত্র।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের একটা বড় লক্ষণ, অভাবের সূচনা হইতেই "They resolved to lay up a six months store of grain for their troops." অক্টোবরে যখন চারিদিক হইতে দারুণ অভাবের সংবাদ পাওয়া গেল, তখন সঙ্কটের মাসে "যাহার দুই এক কাহন হইয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন (আনন্দমঠ)।" ঠিক এই মাসেই Collector General "saw an alarming prospect of the province becoming desolate." এই ঘটনার বর্ত্তমান সংস্করণে আমরা দেখিতে পাই, সরকারী ভাষায়, "Large scale purchases are made on behalf of the Army for the increasing requirements of our Defence Forces." তাহা ছাড়াও "Provincial and State Governments have to build up strategic reserves as a safeguard against emergency conditions."

তখনকার দিনে, কোম্পানী চাউল মজুত করিবার খুব চেষ্টা করিলেন, "not very successfully, to obtain grain from the British officers at Allahabad and Fyzabad." আমরা কিছুদিন পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, অন্য প্রদেশ হইতে সাহায্য প্রার্থনা, সরকারী ভাষায়, "chilly response" পাইয়াছিল, বিশেষতঃ লাট-শাসিত প্রদেশ হইতে।

তখনকার দিনে "it is probable that private trade was active." এমন ব্যক্তিগত লাভের ব্যবসা কোম্পানীর কর্মচারীরা করিলেন, যে চাউল পাইবার আর সম্ভাবনা রহিল না, হাহাকার পড়িয়া গেল। এখন বাঙ্গালা সরকার নিজে ব্যবসা করিয়াছেন। চারিদিক হইতে কত আপত্তি সে যুগে উঠিয়াছিল; Court of Directors খুব কড়া কড়া ভাষায় অপরাধকারীদের নাম জানিতে চাহিয়াছিলেন—তাহাদের অপকর্ম্মের, অর্থগৃধ্নুতার,—rapacity and corruption-এর বহু নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলই হয় নাই। আজও চারিদিকে কলরব উঠিলে মাত্র ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে খাদ্য সচিব মহাশয় স্বীকার করিলেন—অন্য প্রদেশের তণ্ডুল বাঙ্গালায় বিক্রয় করিয়া গভর্ণমেণ্টের লাভ হইয়াছে, তবে সেটা ব্যবসার প্রথম দিকটায়। সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন নাই।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় "hoarding and buying up grain" এর বিরুদ্ধে আদেশ জারি হইয়াছিল এবং দেখা যায় "they laid an embargo on exportation which was taken off on the 14th Nov, 1770." এ সকলের ফল যাহা হইয়াছিল তাহা এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

এখনও আমরা প্রতিনিয়ত মজুৎদারের বিরুদ্ধে হুঙ্কার শুনিতে পাই; কি হইতেছে, তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। রপ্তানীর ব্যাপারে আরও অনেক কথা বলা চলে; তখন সে হুকুমে কোনও ফল হয় নাই। এখন হুকুম জারি করাইতেই প্রাণান্ত। দেশে যখন কয়মাসে দারুণ হাহাকার উঠিয়াছে, তখন মাত্র ২৭শে জুলাই (১৯৪৩) তারিখে রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙ্গালাকে একেবারে শ্মশান করিয়া দিয়া গেল; অবশ্য তাহার পূর্ব্বেকার এবং পরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সংযোগ বিচার করিতে হইবে। এই অবস্থা সমষ্টির ফলে, বাঙ্গালার অভিজাত সম্প্রদায় একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়ে, দেশের জনশক্তি ক্ষুণ্ণ বা শূন্য হইয়া যায়, কতগুলি জীবন্মৃত কঙ্কাল মাত্র পড়িয়া থাকে। জনপদ শূন্য হইয়া গিয়াছিল, চাষের জমি জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। চাষী আমদানী করিতে জমিদারদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব ছিল না। কিন্তু রাজস্ব আদায়ে কোনও ত্রুটী হয় নাই, পরিমাণও হ্রাস পায় নাই। অনেক মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন যে রাজস্বের পরিমাণ, এমন কি তার বৃদ্ধি হইতে সহজেই মনে করা যায় যে এই মন্বন্তরের গুরুত্ব সম্বন্ধে যত কথা শোনা যায়, ততটা হয় ত ঠিক নয়। ইহার উত্তরে ইতিহাসকার বলিয়াছেন "It is on record that this years revenue was collected by measures of unusual severity." মোট কথা সকলেই শেষ

পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে বাঙ্গালা দেশে "dreadful depopulation" অর্থাৎ ভীষণ লোকক্ষয় হইয়াছিল।

১৭৫৭ খৃঃ অঃ হইতে নিয়মিত শোষণের ফলে ১৭৭০ সালের মহামারী। সে ধাক্কা ভাল করিয়া সামলাইয়া উঠিবার সুযোগ আর হয় নাই। দেশে সকল সময়েই অভাব বর্তমান থাকিত, তাহাতে আবার ১৭৮৩ সালে বাঙ্গালায় দারুণ অন্নাভাব দেখা দিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে কিছু কিছু শুভ লক্ষণ দেখা যায়; জলপথে রপ্তানী বন্ধ হইয়াছিল আর একটা কমিটি সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর চূড়ান্ত (drastic) হুকুমের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল; ইহাকে নির্দেশ দেওয়া হয়:

"We direct that you do in the most public manner issue orders by beat of tom tom, in all the bazars and *gunges* in the district under your charge, declaring that if any merchant shall conceal his grain, refuse to bring it to market and sell it at a reasonable price, he will not only be punished himself in the most exemplary manner, but his grain will be seized and distributed among the poor."

আমরা বর্তমানে এই রকম আদেশের সহিত খুব বেশী পরিচিত হইয়া পড়িয়াছি, একেবারে বর্ষার ধারার মত ইহারা প্রতিনিয়ত বর্ষিত হইয়া পড়িতেছে। তাহার ফল সম্বন্ধে প্রত্যেকেই ভুক্তভোগী। চার টাকা মণের চাউল সাধারণতঃ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ; মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে সত্তর, আশী ও একশ' —অনেক স্থলেই একেবারে পাওয়া যায় না।

আর একটা ঘটনা এই স্থানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ চিরকালের জন্য রোধ করিবার উদ্দেশ্যে—

"It was decided that buildings of solid masonry should be constructed to serve the purpose of perpetual granaries to the two provinces of Bengal and Behar, and the chief Engineer prepared a plan for a circular building in Patna, which stands as a monument of past resolutions, bearing its inscription "FOR THE PERPETUAL PREVENTION OF FAMINES IN INDIA" কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে "empty and disused". এক কাহন ধান কখনও তাহার মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই মাত্র গত ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৩) তারিখে Foodgrains Policy Committee সুপারিশ করিলেন "A central foodgrain reserve should be created." তাহাতে মনে হইল "History repeats itself." এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঞ্চিত শস্য "গোলাজাত" করিবার জন্য solid masonry structure হইবে কিনা, সেটাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ইহার পরই ১৮৬৬ সালের দারুণ দুর্ভিক্ষ উড়িষ্যা ও বাঙ্গালাকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ইহাকে সাধারণতঃ "উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ" বলা হয়, কারণ উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত অঞ্চল "eventually the tide of famine raged so high all over Orissa that local inequalities may almost be submerged and lost sight of in one-spreading sea of calamity" আর বাঙ্গলা দেশের মেদিনীপুর, the blackest portion of the famine tract, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, নদীয়া, হুগলী আর মুর্শিদাবাদ জেলা আক্রান্ত হইয়াছিল।

আজ বাঙ্গালা দেশের অবস্থাও সেইরূপ। কে না জানে যে বাঙ্গলা দেশ আজ one-spreading sea of calamityর তলায় ডুবিয়া যাইতেছে। দূর দূরান্তর কোণ হইতে চাপা স্বরে কান্না ভাসিয়া আসিতেছে, আর খাদ্য সচিব মহাশয় ২৫শে সেপ্টেম্বর বলিয়াছেন "that every single part of Bengal was not in the grip of famine." ইহা কখনই সত্য নহে। বোধ হয় সেই সব অঞ্চলে কোনও সাহায্য করিবার প্রয়োজন নাই, এই কথা মনে করিয়া বাঙ্গালা সরকার একটু নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহেন।

১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের অব্যবস্থার সহিত বর্তমান বাঙ্গালা, এমন কি ভারত সরকারের অব্যবস্থার অনেক তুলনা করা চলে। ১৮৬৬ সালে বিভিন্ন জেলার Collectorরা আংশিক অজন্মা লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিতে চাহিলেন, হয়ত কিছু খাদ্য মজুদ করা প্রয়োজন হইতে পারে—"this was discouraged by the Commissioners and refused by the Board of Revenue." অক্টোবর মাসে রেভিনিউ বোর্ড মত এক বিবৃতিতে বাঙ্গালা সরকারকে জানাইলেন যে ফসল কিছু কম হয়ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে চিন্তার কোনও কারণ নাই; কারণ "such a crop by itself provide food for the people, even though the stocks in hand might be, as they probably were, much below the usual amount, and this being the case, there could be no famine."

এইখানেই আমাদের বর্তমান অবস্থার কথা একটু বলা দরকার। অন্ন হাত ছাড়া হইবার চিন্তার উপর গত বৎসরের প্রথম হইতেই মনে হয়—বৎসরের শেষের দিকে অন্নাভাব হইতে পারে। এ কথা প্রকাশ করিলেন ভারত সরকারের খুব মোটা মাহিনার রাজকর্মচারী, সুতরাং তাঁহাদের কর্তব্য সেইখানেই শেষ হইল। ৩০শে এপ্রিল তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত হইল একটা লোকের শব ব্যবচ্ছেদে পেটের মধ্যে ঘাস পাওয়া গিয়াছে; ক্ষুধার তাড়নায় ঘাস খাইয়া হজম করিতে পারে নাই। সেটা নিতান্ত তাহার ভাগ্য, কারণ আরও কত জীব ঘাস খাইয়া স্বস্থ হইয়া বেড়াইতেছে এবং ল্যাবরেটরী বলিতেছে যে উহার চপ খুব পুষ্টিকর; কিন্তু হতভাগ্য অথবা প্রাণত্যাগ করিল। বাঙ্গলা সরকার বিচলিত হইবার নহেন, যতই আসন্ন দুর্ভিক্ষের রব ওঠে তাঁহারা ততই জোর করিয়া বলেন দেশে কোনও অভাব নাই। আমাদের মন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেব ৭ই মে তারিখে বলিলেন—"I believe the solution is in sight." ৮ই মে: "There was, in fact, a sufficiency of foodgrains in Bengal" আবার ৩০শে মে: "He did not wish to say that there was not enough rice in Bengal or that enough rice would not be coming from outside." ১৮৬৬ সালে তদানীন্তন লাট Sir Cecil Beadonএর গভর্ণমেন্ট বলিয়াছিলেন, "There were no genuine dearth, large stores being in the hands of dealers···who are keeping back stocks out of greed." আর ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলা সরকার বলিলেন "I am firmly convinced that the prices are by no means justified by the present stock position—if only the hoards in Bengal could be made mobile, the situation could be eased.' আর মজুতদারদের উদ্দেশ্যে বলিলেন "Let them not think that they can run their hoards underground; or that they will succeed in dissipating the hoards." তিনি তাহার জন্য "perfecting the plan to disgorge the hoards." দুইটি মহামারীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার কি অদ্ভুত সাদৃশ্য।

১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে তণ্ডুল আমদানী করিবার জন্য খুব জোর

তাগিদ চলে, কিন্তু তখন সব বিফল। চারিদিকে লোক ঘোরাঘুরি সুরু করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে খাদ্যদ্রব্য লুঠ হ'তে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 'the extent of the impending calamity was far from realized" ২৮শে মার্চ তারিখে সার আর্থার কটন দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে সরকারী কাজ আরম্ভ করিতে বলেন। এদিকে কলিকাতায় চাঁদা তুলিয়া লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইলেও "the Board of Revenue still doubted whether there was any great real deficiency of food." ক্রমে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইল। সৈন্য, কয়েদী এবং সরকারী চাকুরিয়াদের জন্য টাকা দিয়াও যখন চাউল পাওয়া গেল না, তখন ২৮শে মে তারিখে "the Lieutenant Governor gave way" এবং বাহির হইতে চাউল আমদানীর হুকুম দিলেন। সময় মত ব্যবস্থা না করায় দশ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে। Famine Commission পরে Board of Revenueকে খুব তাড়া করিল। ১৮৬৭ সালে ২১শে আগষ্ট তারিখে Revenue Board নরম সুরে এক "apologia"তে—প্রায় আধ ক্ষমা regretএর সঙ্গে—বলিলেন যে সময় মত কাজে হাত না দেওয়ায় এবং যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত হওয়ায় এই দুর্দৈব ঘটিয়াছে। দুঃখিতচিত্তে তাঁহারা বলিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সমস্ত অনভিজ্ঞ—want of experience on the part of the administration—লোক থাকায় তাঁহারা আসন্ন দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখিয়াও বুঝিতে পারেন নাই। কাজে হাত দিতে বিলম্ব হওয়ায় ফলে "Money was of little use, for it could not be exchanged for food." আরও বলিলেন যে আর কিছু না করিলেও ৩১শে জানুয়ারী তারিখে মিঃ Ravenshawর টেলিগ্রাম পাইয়াই যদি কাজে নামিতেন, তাহা হইলে অনেকের প্রাণ রক্ষা পাইত। আরও অনেক কথা তাঁহারা বলিয়াছিলেন, তার একটা কথা এখন স্মরণ করা যাইতে পারে: দুর্ভিক্ষ নিবারণে কোনও সুফল পাইতে হইলে "The discovery of the full truth should be made, and very extensive measures adopted, many months before the actual outburst of the unmistakeable famine occurred."

আমরা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে এর সকল দোষগুলিই দেখিতে পাইতেছি। অভিজ্ঞতা কাহারও নাই, অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগও কাহারও নাই; আর একজন তার পাইয়াই অন্য লাভজনক কাজের তদ্বির করিতেছেন, আর নূতন খাতায় সহি করবার আগে আবার নূতন পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। ইহা হইল বাঙ্গালা ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারী বদলের সিনেমা দেখানো। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ছয়টী Price Control Conference হইয়াছে। দর যেরূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহার কথায় আর কাজ নাই। ১৯৪২ সালে ডিসেম্বরে Food Department সৃষ্ট হইল; ১৯৪২ এপ্রিল মাসে Food Advisory Council হইল, মোটা দুই চার অধিবেশনও তার হইয়া থাকিবে; ১৯৪৩ এপ্রিল Regional Food Commissioners হইল। আর ভেল্কি ও ভোজবাজীর মত পরে পরে চারজন Food Member হইলেন, হয়ত মাত্র দুচার মাস হইতে ৫।৭।১০ দিন আড়াআড়ি। এ সকল কেন্দ্রীয় ঘটনা; বাঙ্গালার পটপরিবর্ত্তনের সকল কথা বলা অসম্ভব।

১৮৬৬ সালের মতই এবারেও সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে, কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। এই দুর্দিনের মহার্ঘ্য সরিষার তৈল নাকে দিয়া সব নিদ্রিত ছিলেন, এবারেও টাকা ফেলিলেও চাল মিলিতেছে না। কলিকাতার লোকে চাঁদার খাতা খুলিয়াছে, তখনও private charityর উপর দিয়া চলিয়া যাইবে মনে করিয়া সরকার বসিয়াছিলেন। লোক যে গাঁ ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে সে সম্বন্ধে তাহা কাহারও নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে পারে নাই। কিন্তু এইরূপ "wandering" যে দুর্ভিক্ষের সূচনা করে তাহা Famine Codeএর প্রথম সূত্র। ১৮৭৮ সালের Famine Commission এর সম্মুখে Sir Richard Temple জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে এই খাদ্যের সন্ধানে *Wandering* is "perhaps the most immiment symptom of danger that can possibly appear in times of famine. It is always followed by mischief more or less grave; it is often the precursor of mortality; probably more mortality happens in this way than in any other.… the best prevention of wandering is the timely preparation of a framework of village relief; the villages to be grouped in circles. If the precaution be early, prompt and efficient, the wandering will be stopped."

গ্রামে থাকিতে থাকিতে খাদ্যদ্রব্য পাইলে লোকের ঘর বাড়ী রক্ষা হইতে পারে, আর যে সঙ্কীর্ণ পথ খোলা আছে, তাহা হইতে হয়ত জীবিকার্জ্জনের কিছু সুরাহা হইতে পারে। আর কিছু না হইলেও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ভিক্ষা লাভের একটা সান্ত্বনাও থাকিতে পারে।

এমনিভাবেই তখন লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সহরমুখো হইয়াছিল; এক কলিকাতাতেই ১০ হইতে ১০ হাজার লোক জমিয়াছিল; আর এখন সরকারী আন্দাজ ১,০০,০০০। এমনিভাবেই তখন লোক রাস্তায় পড়িয়াছিল; তাহারা "lay about the town in a wretched and mendicant condition." আর আগষ্ট মাসের জলে ভিজিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোক মরিয়াছে: "The people were then in the lowest stage of exhaustion; the emaciated crowds collected at the feeding stations_had no sufficient shelter, and the cold and wet seemed to have killed them in fearful numbers." ১৮৬৬ সালের সহিত ১৯৪৩ সালের একই অবস্থা। ৭৭ বৎসর আগের ভুল যে আবার ঘটিবে এ কথা নিজেরা না ভুগিলে, চোখে না দেখিলে হয়ত বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

আরও একটা কথা আছে। ১৮৬৬ সালে আগষ্ট মাসে সরকার বাহাদুর লক্ষ্য করিলেন, বাহিরের লোক আসিয়া সহরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। তাহাতে প্রায় এক রকম জোরপূর্ব্বক সহরের অন্নসত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; অনশনক্লিষ্ট লোকদের সহরের বাহিরে লইয়া যাইবার একটা ব্যবস্থাও হইয়াছিল। আজও সেই পুরাতন কথা; পূর্ব্ব হইতে এর ব্যবস্থা এবারও হয় নাই।

সে সময় স্থানে স্থানে এই ভাবে রন্ধন করা খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইত। তাহা লইয়া অনেক বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। কটকের Relief Manager, Mr. Kirkwood এ বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি করেন। রন্ধন করা দ্রব্য বা cooked food, তাঁহার মতে "a mode of relief which degrades the recipient," রন্ধন করা খাদ্য, লইলে বিক্রয় প্রভৃতি দ্বারা উদ্দেশ্যের অপব্যবহার করিতে পারে না, বা অনেকে আসিয়া সাহায্য লইতে পারে না, এ কথা অতি সত্য, কিন্তু "while some of these kept away may be no proper objects, I believe greater portion would be those whose caste prejudice and not uncommendable pride, would rather meet death than starvation." এই দুর্ভিক্ষেও এ কথা বড় করিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সকলেই এত অসহায় যে যাহারা আত্মসম্মান বাঁচাইবার জন্য ভিক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের রক্ষা করিবার কোনই ব্যবস্থা হইতেছে না।

বাঙ্গালার বড় রকমের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে একবারই ভাল রকম ব্যবস্থা হইয়াছিল; হিসাব মত ধরিতে গেলে সে প্রায় একরকম আদর্শ ব্যবস্থা। ১৮৭৩-৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে, সূত্রপাতেই বিপদের গুরুত্ব অনুধাবন করিবার সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল; প্রয়োজন অনুযায়ী রাজকর্মচারীদের প্রস্তুত থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। অন্নের সন্ধানে যাহাতে লোক গ্রাম ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কোনও একটা কেন্দ্রে অন্ততঃ যাহাতে কিছু সাহায্য পায়, দেহে শক্তি থাকিতে যাহাতে কাজ পায়, প্রার্থী সাহায্য পাইবার উপযুক্ত কি না এবং কেহ তাহাকে চিনে কি না, এই সকল প্রশ্নের উত্তর যাহাতে কোনও জানা লোক দিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোট লাট সার জর্জ ক্যাম্পবেল (Sir George Campbell) বলিয়াছিলেন, "The moment we go beyond the stage of great public works, it is impossible to deal with the people in detail unless we have them localised and individualised, village by village and name by name. We cannot send them away from the roads till the village machinery is ready to receive them."

সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে ৫০ হইতে ১০০টী গ্রাম লইয়া ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলা হইয়াছিল "with at least one grain depot from which the smaller granaries in the circle should be supplied." আর এই সকল ক্ষুদ্র বিভাগগুলি যাহাতে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারী পরিদর্শন করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সার জর্জ ক্যাম্পবেলের কর্মকুশলতা ও দূরদৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া ১৮৭৩ সালে ৭ই নভেম্বর তারিখে তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটকে ভারত সরকার লিখিয়াছিলেন "Her Majesty's Government may rely upon the Government of India using every available means at whatever cost, to prevent as far as they could, any loss of lives of Her Majesty's subjects in consequence of the calamity which threatened Bengal."

এই তোড়জোড়, সাজ সরঞ্জামের পিছনে আবার একবার ভারতের বাহিরে তণ্ডুল রপ্তানীর বিভ্রাট ঘটিয়াছে, অনেকেই সে কথা জানেন না। ২৯শে অক্টোবর, (১৮৭৩) ছোটলাট বাহাদুর ভারত সরকারকে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে (১) relief work আরম্ভ করিতে, (২) বাহির হইতে চাউল আমদানী করিতে এবং (৩) ভারতবর্ষ হইতে চাউল রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। বড়লাট বাহাদুর রপ্তানী বন্ধ করিতে সম্মত হইলেন না; বাঙ্গালা সরকারকে তাহা জানাইয়া দিয়া সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটকে তাঁহার মতামত জানাইলেন। সাত সমুদ্র পার হইতে নিজ মতের সমর্থন জানাইয়া সার জর্জ ক্যাম্পবেলকে নিজ মতের সারবত্তা বুঝাইয়া দিলেন। বড়লাট বাহাদুরের আপত্তির কারণ, বাহিরে যে সব ভারতীয় কুলি আছে, ইউরোপীয়দের বাগিচা আর আবাদ করিতে যাহারা গিয়াছে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, সিংহল ও অন্যান্য স্থানে আছে, তাহাদের খাওয়াইতেই হইবে। ইংলণ্ড, পারস্য সাগরে যে চাল যায় তাহাও বন্ধ করা হইবে না। এখনকার যুক্তি তখন হইতে ভিন্ন নয়। সিংহলে ভারতীয় কুলি আছে, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্য আছে, নানা স্থানে ছত্রাকারে অবস্থিত নানা দেশের সৈন্যের জন্য ভারতবর্ষ একাই রসদ সরবরাহের ভার লইতে পারিবে। ১৯৪১ অক্টোবর মাসেই সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টকে সাহায্য করিবার জন্য "On the procurement of foodstuffs for the Defence Services of India and abroad" এক Standing Committee গঠিত হইয়াছিল। তাহার পর নানা প্রকারে দেখা গেল, রপ্তানী বন্ধ হইবার নয়। ১৮৭৩-৭৪ সালে সাধারণের জীবন রক্ষার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার সব কয়টাই আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, কেবল দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানীর কথা একটুও ভুলি নাই।

এক্ষেত্রে আমরা যে নীতি অনুসরণ করিলাম তাহা "India particularly suited to meet the requirements of the Empire and the various theatres of war in Middle East and elsewhere, has harnessed all its available resources to maintain a regular food supply in sufficient quantity and desired standard quality for the Defence Forces in the country and abroad."

ইহার ফলে আমরা জগতে কত সুনাম ক্রয় করিয়াছি, তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে।

আবার ১৮৭৫-৭৬ সালে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; তাহাতে দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় অন্নকষ্ট হয়; ১৮৭৮-৮০তে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও বীরভূম এবং ১৮৯১-৯২ সালে দিনাজপুরে অন্নকষ্ট দেখা দেয়। গুরুতর প্রাণহানির খবর কোনও বারেই নাই; বোধ হয় ১৮৭৩-৭৪ সালের শিক্ষা ও সঞ্চিত জ্ঞান, বাঙ্গলা দেশকে তখনও পরিত্যাগ করে নাই। ১৮৯৭ সালে একেবারে সারা উত্তরভারত, তাহার মধ্যে বাঙ্গালা আর মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং বর্ত্তমানে মধ্যপ্রদেশগত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সম্পর্কে রমেশ দত্ত মহাশয় বলিলেন "Millions of people died of starvation," রপ্তানীর ব্যাপার আবার খুব বড় করিয়া দেখা দেয়; অবস্থতির সঙ্গে রাজস্ব আদায় চলিতে থাকে, আর লোকে মুখের অন্ন বিক্রয় করিয়া সরকারের রাজস্ব দিতে থাকে। এত বড় দুর্ভিক্ষের সময়ও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাজস্ব আদায় হইয়াছে। Collectorরা ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন, আর দেখাইলেন যে খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানী ভারতবর্ষে ইহা অপেক্ষা বেশী আর কখনও হয় নাই। ১৮৯৭-৯৮ সালে চাউল ১৩ লক্ষ টন, আর গম ১ লক্ষ ১৯ হাজার টন; পর বৎসর চাউল ১৯ লক্ষ টন, আর গম ১০ লক্ষ টন বিদেশে গিয়াছে; দেশের লোকের অবস্থা কি হইল দেখিবার প্রয়োজন হইল না।

আবার ১৯০০ সালে ভারতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হইয়াছে; পঞ্জাব, রাজপুতানা, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে এই দুর্ভিক্ষ মহামারী ঘটায়। বাঙ্গালায় কিছুই হয় নাই। কিন্তু কথাটা উঠাইবার প্রয়োজন আছে। ১৮৯৭ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত, রমেশ দত্ত মহাশয়ের ভাষায়,—"The terrible calamity lasted for (these) three years and millions of men perished. Tens of thousands were still in relief camps, when the Delhi Durbar was held in January 1900." সাধারণ জনগণের স্বার্থের সহিত রাজসরকারের স্বার্থের সমতা নাই; তাহাতেই এ দেশে বারে বারে এই রকম দুর্ভিক্ষ আর মহামারী সম্ভব। আর সেই কারণেই দরবারের উৎসব ও ব্যয়ে কোনও বাধা হয় না।

১৮৭৩-৭৪ সালে "Her Majesty's subjects"এর জীবনের যে দাম দেওয়া হইয়াছিল, তা কয়েক বছর পরেই বাতিল হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে তাহা সম্পূর্ণরূপে তামাদী হইয়া গিয়াছে।

এইবার ১৯৪৩ সালের দারুণ দুর্ভিক্ষের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর আর বোম্বাই অন্নকষ্টের মধ্যে থাকিলেও সে সকল স্থানে কাহারও মৃত্যু হয় নাই; উড়িষ্যায় মরিয়াছে, সংখ্যায় বেশী নয়; আর বাঙ্গলা দেশের কথা কিছু না বলাই ভাল।

অতীতকালের সঞ্চিত বড় ভুল একালে এক সঙ্গে ঘটিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে সকল দুর্ভিক্ষই অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি এবং কচিৎ মূষিক, পতঙ্গ ও

শুক প্রভৃতি "ঈতি" বা উপদ্রবের জন্য হইয়াছে। এবার বাকীটা অর্থাৎ "অত্যাসন্নাঃ রাজানঃ" অর্থাৎ বিবাদী রাজারা অতিশয় সন্নিকটস্থ লাভ করিয়াছেন। "উলুখাগড়ার" জীবনের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, এখানে তাহার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এবার দুর্ভিক্ষের জন্য মানুষই অধিক মাত্রায় দায়ী। সৈন্যদের জন্য ভাণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে; রাজ সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন; মজুতদারদের ভীতি প্রদর্শনের কোনও ফল হয় নাই; আসন্ন দুর্ভিক্ষের লক্ষণ উপেক্ষা করা হইয়াছে; অনভিজ্ঞ রাজপুরুষেরা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া খুশীমত এক একটি আইন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, আবার রদ করিয়াছেন; অকারণ বিশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাল যাপন করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে খাদ্য দ্রব্য আমদানী করিবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল, তাহা হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের মত খাদ্যের সন্ধানে লোক সহরে আসিবার পর তাহাদের আবাসের ব্যবস্থা হয় নাই, হাজারে হাজারে মরিয়াছে, এখনও সেইরূপ মরিতেছে।

দুর্ভিক্ষের যে সকল মুখ্য কারণ বলিয়া বর্ত্তমানে আলোচিত হয়, তাহা এখন ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; অতীতের ভুল সকল যাহা সম্পূর্ণরূপে পালিত হইয়াছে, তাহাই মাত্র প্রদর্শিত হইল।

এই সঙ্গে ১৯২৩ সালে ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চলে পোলাণ্ড, আর্মেনিয়া, ইউক্রাইন ও রুশে যে দুর্ভিক্ষ হয় আর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকের সেবার যে ব্যবস্থা হয়, তার বিবরণ দিয়া শেষ করিব। ১৯২১ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত কেবল রুশে ৭ কোটি ডলার খরচ হইয়াছিল, তন্মধ্যে সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট দেন ১ কোটি ১৭ লক্ষ ডলার, আমেরিকান গভর্ণমেন্ট ২ কোটি ২৭ লক্ষ ডলার, আমেরিকান Relief Administration ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ডলার, আমেরিকান Red Cross ৩৮ লক্ষ ডলার, আমেরিকান ধর্ম্ম ও সেবাদল সঙ্ঘ ৫০ লক্ষ ডলার, ইউরোপীয় গভর্ণমেন্ট ও অন্যান্য সাহায্য প্রতিষ্ঠান প্রায় ৫০ লক্ষ ডলার'। "The combined relief organisations fed a total of 11 million Russians at the peak of the famine, while an additional million were fed by other foreign agencies." ইহার মধ্যে American Relief Administration শতকরা ৮৭ ডলার খরচ করিয়াছিল।

ভারতের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে বৈদেশিক রাষ্ট্রের যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে, কারণ ভারত আজ নানা উপায়ে সাহায্য করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উপনিবেশ

দ্বিতীয় পর্ব্ব

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিভ্রান্ত বসন্ত

মানুষই কি কেবল রচনা করে ইতিহাসকে? ইতিহাস মানুষকে রচনা করেনা কোনোদিন?

ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী। দুশো বছর ধরিয়া পর্তুগীজেরা কি না করিয়াছে ভারতবর্ষের উপরে। ঝড়ের রাত্রে বাসুকীর ফণার মতো নীল সমুদ্র যখন দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, বোম্বেটে জাহাজের পালগুলি তখন ঝড়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডানার মতো তাহারি উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়া গেছে। অন্ধকার—স্বর্গ মর্ত্ত্য-পাতাল হইতে অন্ধকার ঠেলিয়া উঠিতেছে, সমুদ্র আর্ত্তনাদ করিতেছে পিঁজরায় বাঁধা বন্য-জন্তুর মতো। আর সেই সমুদ্র আছড়াইয়া পড়িতেছে পৌরাণিক যুগের অতিকায় দৈত্যের মতো গ্র্যানাইট পাথরের খাড়া পাহাড়ের গায়ে। মৃত্যুর প্রতীক কালো অ্যালবাট্রসের কান্না ছাপাইয়া উঠিতেছে সমুদ্রের মত্ত হুংকারকে।

আর তাহারই নীচে এই ঝড়ের মধ্যেও অনেকগুলি আলো মিট্‌মিট্‌ করিতেছে—সুরাটের বন্দর। অকস্মাৎ মশালের আলো—আর্ত্তনাদ—বন্দুকের শব্দ। পর্তুগীজেরা বন্দর লুঠ করিতেছে। অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়িয়া ছবির মতো দেখা দেয় আর একটি দৃশ্য। বঙ্গোপসাগর। সপ্তগ্রামের বণিকদের বহর চলিয়াছে সিংহলে বাণিজ্য করিতে। হার্মাদের জাহাজ হইতে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সকালের আলোয় উদ্ভাসিত নির্ম্মল নীল সমুদ্র লাল হইয়া গেল মানুষের রক্তে।

সময়ের চাকা ঘুরিয়া চলে অবিশ্রান্ত। স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব চলে। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার। নবাবের ময়ূর-সিংহাসন সহস্র চূর্ণ হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ড হইয়া। পলাশীর জনশূন্য প্রান্তরে, ঘন নিবিড় আমের বনের বিষণ্ণ ছায়ায়, গঙ্গার পরপারে যখন মলিন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, তখন সমুদ্রের ওপারে সাম্রাজ্যবাদের নূতন সূর্য দেখা দেয়।

ভাস্কো-ডা-গামার জাতি। ভারতবর্ষকে প্রথম যাহারা অপরিচিত প্রাচীন নির্নিরীক্ষ্য অন্ধকার হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল, আজ ভারতবর্ষের মাত্র কয়েক ইঞ্চি জমীতে তাহাদের অধিকার আছে মাত্র। তাহাদের দিগ্বিজয়ী গৌরব আজ ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় নিয়া আত্মগোপন করিয়াছে, ইংরেজের ম্যান্-অফ্-ওয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে এমন সাধ্য কি! চক্রবর্তী ইংরেজের ছত্র ছায়ায় আশ্রয় লইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ হার্ম্মাদেরা আজ পায়জামা গুটাইয়া জমিতে লাঙল ঠেলিতেছে, বিড়ি টানিতেছে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে চোখ মুখ বুজিয়া কুইনাইন গিলিয়া চলিয়াছে।

ইতিহাস রচনা করিয়াছে মানুষকে। ঘুমের দেশ এই ভারতবর্ষ। কোথায় ককেশাস পাহাড়ের তলা হইতে প্রথম আসিয়াছিল যাযাবর মানুষের দল। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্যের মধ্যে তাহাদের সমস্ত শৌর্য্য গেল তলাইয়া। শক আসিল, হূণ আসিল, গ্রীক আসিল, মুসলমান আসিল—কৃষ্ণবর্ণের মাটিতে পা দিয়া তিনদিনের বেশি কেউ তাহাদের জাগিয়া থাকিতে পারিল না। পর্তুগীজেরাই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে কি করিয়া? বর্ত্তমানের সূর্য্যও হয়তো একদিন অস্তে নামিবে, সেদিন ইতিহাসের এই ক্ষুধা যে তাহাকেও গ্রাস করিবে না—এমন ভবিষ্যদ্বাণী আজ কে করিতে পারে?

সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের বংশধর স্যামুয়েল গঞ্জালেস্‌। শুঁটকী মাছের ব্যবসা করে সে। সন্দীপ হইতে ষ্টিমারে করিয়া সে চট্টগ্রামে ফিরিতেছিল। বাংলা দেশের একেবারে তলার দিকে নদী আর সমুদ্র একাকার হইয়া আছে একেবারে—সাদা আর নীলের একটা বিচিত্র সৌন্দর্য। বহুদূরে বাতাসে সবুজ বন মাথা নাড়িতেছে—জলের প্রান্ত-রেখার সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গেছে বিচিত্রভাবে। মাথার উপর দিয়া পাখী উড়িয়া চলিয়াছে—ষ্টিমারের চোঙা হইতে ধোঁয়া উড়িতেছে, আর জলের উপর তাহার ছায়া কাঁপিতেছে আঁকাবাঁকা ছবির মতো।

রেলিং ধরিয়া গঞ্জালেস্‌ দাঁড়াইয়াছিল। সামনে পিছনে নৌকা নাচিতেছে, ওপারে তীরের গায়ে ষ্টিমারের ঢেউ যে একতাল ফেনা লইয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে, এতদূর হইতেও সেটা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নদীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া নানারকমের অর্থহীন অলস ভাবনা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে পাক খাইয়া চলিয়াছিল। ভাবনার সুর কাটিয়া দিল এমন সময় ডি-সুজা আসিয়া।

সে-ও এই ষ্টিমারের যাত্রী। অনেকক্ষণ হইতে কৌতূহলী চোখ মেলিয়া স্যামুয়েলকে লক্ষ্য করিতেছিল সে—মানুষে মানুষে এত সাদৃশ্যও সম্ভব! যেন ডেভিড গঞ্জালেস্‌ এতদিন পরে যৌবন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখা দিল।

—কোথায় যাওয়া হবে?

প্রশ্ন শুনিয়া গঞ্জালেস্‌ বিরক্ত হইয়া তাকাইল, কিন্তু বকাতি। কহিল, চিটাগাং। তুমি কোথায় যাবে?

ডি-সুজা দন্তহীন মুখে হাসিল, একই পথের পথিক। তুমি বুঝি ওখানেই থাকো? কি করো?

—মাছের ব্যবসা।

মেরীর নাম করিয়া ডি-সুজা শপথ করিল একটা।

—চিনেছি তোমাকে। তুমি স্যামুয়েল গঞ্জালেস্‌ তো?

স্বীকার করিয়া স্যামুয়েল বিস্মিত চোখে তাকাইয়া রহিল।

—তোমার বাপের সঙ্গে আমার খাতির ছিল খুব। একসঙ্গে দুজনে গোয়াতে হোটেল খুলেছিলুম, তার পর সেখান থেকে ম্যাড্রাসে। কিন্তু বেশিদিন চলল না—পুলিশ পিছে লাগল কি না।

বচন-ভঙ্গির অসম্বদ্ধতায় উত্তরোত্তর বিস্ময় বোধ করিতেছিল গঞ্জালেস্‌। কিন্তু পিতৃবন্ধু, সুতরাং সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, হোটেল খুললে কিন্তু তাতে পুলিশ পেছনে লাগল কেন?

—বাঃ, লাগবে না? মদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু লাইসেন্স তো ছিল না। পুলিশ অবশ্য সবই জানত, ভাগ-বাঁটোয়ারাও ছিল—কিন্তু ওই টাকাপয়সার ব্যাপারেই শেষ পর্যন্ত আর বনল না। ব্যাটাদের পেট তো আর সহজে ভরবার নয়। কাজেই—বাকীটা যে সম্পূর্ণ বলা বাহুল্য, এমনি একটা ভাব দেখাইয়া খানিকটা দন্ত-বিকাশ করিল সে।

গঞ্জালেসের লোকটাকে নেহাৎ মন্দ লাগিল না। মুখের দিকে চাহিলেই বোঝা যায়, খালি বাতাসেই তাহার বয়স বাড়ে নাই। বহু ঝড় পাড়ি দিয়া আসা নৌকার ছেঁড়া পাল আর ভাঙা-দাঁড়ের সঙ্গে কোথায় কি যেন সামঞ্জস্য আছে তাহার। সর্বাঙ্গে যুদ্ধের চিহ্ন। নিরুত্তাপ নিস্তেজ জীবনে দুঃসাহসী যে পর্তুগীজের রক্ত গঞ্জালেসের ধমনীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডি-সুজার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকাইয়াই সে রক্তে যেন দোলা লাগিয়া গেল। আর তা ছাড়া পিতৃবন্ধু। নিজের বাপকে অবশ্য সে খুব ভালো করিয়া মনে করিতে পারে না, মনে করিবার মতো কোনো স্মৃতি কখনো সে রাখিয়াও যায় নাই। অতি শিশুকালে গঞ্জালেস্‌ দু একবার দেখিয়াছে লোকটাকে। কোথায় কোথায় থাকিত, কি যে করিত, কেউ বলিতে পারিত না। গঞ্জালেসের মা এক মিশনারীর বাড়িতে খাঁটুনিগিরি করিত, সেই অন্নেই বহু দুঃখে তাহারা মানুষ। বাপের মাঝে মাঝে দেখা পাইত—তবে তাহার আবির্ভাব ঘটিত মূর্তিমান একটা দুর্যোগ বা দুঃস্বপ্নের মতো। এক মুখ দাড়ি, ছেঁড়া পায়জামা, মুখে অশ্রাব্য শপথ এবং কদর্য গালাগালি। যে কয়েকটা দিন থাকিত, তাহাদের মাকে ধরিয়া বেধড়ক প্রহার করিত, শিশুদের ধরিয়া আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিত। আর সমস্ত দিন মদ গিলিত অশ্রান্তভাবে। যেন তাহার পেটের মধ্যে সাহারা মরুভূমির মতো কি একটা বিরাট ব্যাপার রহিয়াছে;—পৃথিবীতে যত মদ আছে, একটানে চোঁ চোঁ করিয়া শুষিয়া লইতে পারিবে।

এই তো বাপের সম্পর্কে তাহার স্মৃতি। শুধু এইটুকুই অবশ্য নয়, চুলের তলায় অনেকখানি কাটা চিহ্নও পিতারই সস্নেহ অবদান। তবু বড় হইয়া গঞ্জালেস্‌ তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। দুঃসাহস ছিল তাহার রক্তে, ছিল বিদ্রোহ। সব ভাঙিয়া চুরিয়া বেপরোয়া-ছন্দে জীবনটা বহিয়া গেছে তাহার, প্রয়োজনের গণ্ডীতে নিজের দুর্দান্ত মনটাকে সে মারিয়া ফেলে নাই। ইংরেজের আইন তাহাকে ধরিবার বহু চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই—ছুঁইয়া গেছে মাত্র। নবাব আলীবর্দী খাঁর কামানের পাল্টা জবাব দিয়াছিল সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের দুরন্ত বাহিনী। ডেভিডের কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেছে পুলিশের রাইফেলের গুলি, কিন্তু তাহার পিস্তলের লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই।

আর গঞ্জালেসের মুখের দিকে চাহিয়া ডি-সুজাও এমনি কিছু একটাই ভাবিতেছিল বোধ হয়। সন্ধ্যা আসিতেছে। নদীর খাদ-মিশানো সমুদ্রের জল ধূসর হইয়া আসিতেছে। তাহারি উপর ঝলমল্‌ করিতেছে দিনান্তের লাল আলো। দূরের সবুজ বনরেখা সে আলোয় রঙীণ হইয়া উঠিয়াছে—সমুদ্রের শাড়ীতে কেউ যেন জরীর পাড় বসাইয়া দিয়াছে। আর সেই আলো জ্বলিতেছে গঞ্জালেসের বড় বড় দুটি পিঙ্গল চোখের ওপর,—একটা উগ্র দীপ্তি তাহা হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে যেন। সুগঠিত দীর্ঘ দেহ—সেদিকে চাহিলেই তাহার বাপকে মনে পড়িয়া যায়। আম্বালা ষ্টেশনের সেই শিখ ষ্টেশন মাষ্টারটা। গঞ্জালেসই তো তাহার মাথায় ঠাসিয়া কুড়ালের কোপ বসাইয়া দিয়াছিল—আর সেই সুযোগে সে ভাঙিয়া নিয়াছিল অফিসের ক্যাশবাক্স। গঞ্জালেসের সেই ঘাতক-মূর্তিটা ডি-সুজা আজো ভুলিতে পারে নাই। কুড়ালের সাদা শুভ্র ফলাটা রক্তে রাঙা—সেই সঙ্গে বিচূর্ণ মস্তিষ্কের খানিকটা ঘিলু ছিট্‌কাইয়া আসিয়া কপালে লাগিয়াছে গঞ্জালেসের। পকেট হইতে একটা রুমাল বাহির করিয়া সেগুলি মুছিতে মুছিতে কি একটা রসিকতা করিয়াছিল সে।

হাসিলে কি উজ্জ্বল যে দেখাইত ডেভিডের দাঁতগুলি।

স্যামুয়েলের দিকে চাহিয়া আজ আবার তাহার বাপকে মনে পড়িল। সেই প্রশস্ত কপাল, সেই তীক্ষ্ণ উদ্ধত চোয়াল, স্থূল

হইবার কারণ নাই কোনোখানে। কেবল মুখে সে বিদ্রোহ নাই—আছে শান্ত খানিকটা দুর্বলতা মাত্র।

কয়েক মিনিট দুজনেই দুজনের দিকে চাহিয়া রহিল নীরবে। পায়ের নীচে এঞ্জিনের ছন্দে ছন্দে কাঠের মেঝেটা দ্রুত লয়ে কাঁপিতেছে, প্যাডলের ঘায়ে জলে হু হু শব্দ। মাঝে মাঝে শাদা ফেনা বিকালের রোদে জাপানী বলের মতো স্ফীত হইয়া ছিট্‌কাইয়া উঠিতেছিল আকাশের দিকে।

প্রশ্নটা গঞ্জালেসই করিল প্রথমে।

—চিটাগাংয়ে কেন চলেছ তুমি?

ডি-সুজা বকের পাখার মতো শাদা ভুরু দুইটাকে দুই দিকে প্রসারিত করিয়া একটু হাসিল মাত্র—জবাব দিল না।

—ব্যবসা-ট্যাবসা আছে বুঝি?

—ব্যবসা? সতর্কভাবে ডি-সুজা চারিদিকে তাকাইল একবার। ডেকের এদিকটা একেবারে নির্জন—একটু দূরে কতকগুলি মুসলমান চিঁড়া আর আম লইয়া অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ফলারে বসিয়াছে। নীচে প্যাডেলের আঘাতে বিচূর্ণ বিক্ষুব্ধ জল হইতে একটানা গর্জন উঠিতেছে। এঞ্জিনের যান্ত্রিক শব্দ বাজিতেছে ক্রমাগত এবং বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ তাহাদের চারিদিকে একটা ধ্বনির যবনিকা টাঙাইয়া দিয়াছে।

—ব্যবসা? দন্তহীন মুখে হাসিটাকে প্রকটিত করিয়া ডি-সুজা বলিল, হাঁ, ব্যবসা আছে বটে। তবে সেটা নিতান্ত আইনসঙ্গত নয়—এই যা।

—তার মানে? গঞ্জালেস্ চমকিয়া উঠিল। ডি-সুজার সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া যে বিচিত্র রহস্যের আবরণ, সেটা একটু একটু সরিতেছে যেন।

—তুমি ডেভিডের ছেলে তো? তোমাকে বলতে ভয় নেই তা হলে। আফিং কোকেনের কিছু কারবার আছে, তবে ডিউটি দেবার হাঙ্গামাটা আর পোষায় না। বুঝেছ তো?

—বুঝেছি। শান্ত নিরুত্তাপ রক্তে আবার দোলা লাগিল গঞ্জালেসের। ডি-সুজার বয়স হইয়াছে, চুলগুলিতে শাদার নিষ্কলঙ্ক আস্তর। চোখ দুটি ম্লান—কিন্তু বহু ঝড়-পার-হইয়া আসা নৌকার ছেঁড়া পাল আর ভাঙা দাঁড়ের মতো একটা নির্ভীক দৃঢ়তা তাহাকে ঘিরিয়া আছে।

—কোথায় গিয়ে উঠবে চিটাগাংয়ে?

ডি-সুজাকে চিন্তিত দেখাইল, তাই তো ভাবছি। আড্ডা যেটা ছিল সেটার ওপর ওদের নজর পড়েছে, কাজেই সেখানে ওঠা ঠিক হবেনা। তা ছাড়া আধ মণ মাল আছে সঙ্গে—হোটেলে গিয়েও ওঠা যাবেনা।

—আধ মণ!

—হাঁ, অন্তত এক হাজার টাকার জিনিস। তা ছাড়া ধরা পড়লে হেঁ—হেঁ—ডি-সুজা হাসিল: স্রেফ দশ বছর ঠুকে দেবে। তা এই বুড়ো বয়সে ওটা আর পারব না।

গঞ্জালেস্-এর চোখে মুখে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইল।

—কিছু যদি মনে না করো, আমার একটা আস্তানা আছে। সেখানে বেশ থাকতে পারা যাবে।

—মনে করব:—বিলক্ষণ! আপ্যায়নের হাসি হাসিল ডি-সুজা: তুমি ডেভিডের ছেলে! কিন্তু তোমার জায়গাটা, কি বলে, কোনো ভয়টয় নেই তো?

—না, কোনো ভয়টয় নেই—আশ্বাস দিল গঞ্জালেস্।

অতএব পথেই দুজনের অন্তরঙ্গতা অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। আরো কয়েক ঘণ্টার পথ চট্টগ্রাম। ইহারই মধ্যে ডি-সুজা দিব্যি গল্প জমাইয়া লইল গঞ্জালেসের সঙ্গে। সে আর ডেভিড্। কি না করিয়াছে দুইজনে, পৃথিবীর কোন্ বৈচিত্র্য সন্ধান করিতে তাহারা বাকী রাখিয়াছে। তবে এখন আর সেদিন নাই। ইংরেজের আইন বড় বেশি কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছে—তা ছাড়া সে সব দিনের দুঃসাহসী মনই বা আজকাল কোথায়! বাংলা দেশে যে সব পর্তুগীজ উপনিবেশ রাখিয়া আছে, ডাকাতি রাহাজানির চাইতে তাহারা এখন জমিতে লাঙল ঠেলিতে ভালোবাসে, সাহেবী রেস্তোরাঁয় বাবুর্চি হইতে চায়। 'জেণ্টু'-দের সঙ্গে তাহারা এক পংক্তিতে নামিয়া বসিয়াছে—ইহার চাইতে অসম্মান ও অগৌরবের ব্যাপার সমগ্র পর্তুগীজ সমাজে আর কি হইতে পারে!

বলিতে বলিতে ডি-সুজা উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে, মুঠা করিয়া ধরে গঞ্জালেসের হাতটা। কব্জীর তলায় তামাটে চামড়ার নীচে তাহার ঠেলিয়া-ওঠা মোটা নীল শিরাগুলি রক্তের আন্দোলনে থর থর করিয়া কাঁপে, নিশ্বাস পড়িতে থাকে দ্রুত তালে।

সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ বহিয়া যায় গঞ্জালেসের—যেন ডি-সুজার উত্তেজিত চাঞ্চল্যটা তাহার মধ্যেও সংক্রামিত হইতে শুরু করিয়াছে। বলে, ঠিক কথা।

—ঠিক কথা নয়? বপ্নাতুর হইয়া ওঠে ডি-সুজার চোখ। পর্তুগীজের দিগ্বিজয়ী গৌরবের ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাগুলি পার হইয়া আবার কি আসিয়া দেখা দিতে পারেনা? আগুন জ্বলিতেছে সপ্তগ্রামের বন্দরে। বন্দুকের শব্দে রাত্রির তন্দ্রার্ত হৃৎপিণ্ড দুইটা কাঁপিয়া উঠিতেছে থর থর শব্দে। বিবাহ-বাসর হইতে সুন্দরী মেয়েদের ছিনাইয়া আনিয়া বজরার অন্ধকারে সেই রাক্ষস-বিবাহ। আশীর্বাদীর কামানের গোলাগুলি লাল আগুনের পিণ্ডের মতো সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু হার্মাদদের জাহাজকে তাহা স্পর্শও করিতেছে না।

শুধু কি তাই? বীর রস হইতে ডি-সুজার মন মাঝেমাঝে বর্তমান পৃথিবীতেও ফিরিয়া আসে। ইহারই মাঝে মাঝে ডি-সুজা নিজের পরিবারের গল্পও বলে। লিসিকে সে অত্যন্ত ভালোবাসে—ওই মা-মরা নাতনীটার জন্যই তাহার যা কিছু দুর্বলতা। ও না থাকিলে আবার হয়তো সমস্ত ভারতবর্ষটায় সে আর একবার অভিযান করিতে বাহির হইয়া পড়িত—কিন্তু লিসিকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারেনা। তাহার ঘর সংসার যাহা কিছু লিসিই আগলাইয়া রাখিয়াছে। নিজে ডি-সুজা সামান্য যা কিছু টাকা-পয়সা করিয়াছে তা ওই লিসির জন্যই—ভালো দেখিয়া একটা ছেলে জোটাইতে পারিলে তবে নিশ্চিন্ত।

ডি-সুজাকে গঞ্জালেসের ভালো লাগিয়া গেল।

চট্টগ্রামে আসিয়া ডি-সুজা গঞ্জালেসের আতিথ্য লইল। শুধু আতিথ্যই লইল না—চর-ইস্মাইল হইতে একটি বার ঘুরিয়া আসার সনির্বন্ধ অনুরোধও জানাইল তাহাকে। গঞ্জালেস্ রাজী হইল, তারপর একদিন চাঁদপুর হইতে নৌকায় পাড়ি দিয়া চর-ইস্মাইলে আসিয়া দর্শন দিল।

প্রকৃতির একেবারে কোল ঘেঁষিয়া সদ্যোজাত শিশু চর-ইস্মাইল। অবশ্য একেবারে সদ্যোজাতও নয়। ইতিহাসের দিক দিয়া খুঁজিতে গেলে গত তিনশো বৎসর ধরিয়া সমুদ্রচারী জলদস্যুদের সে সম্বন্ধে আভাস দিয়াছে—এককালে এখানে তাহাদের বিরাট উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে উপনিবেশ অবশ্য নদীগর্ভে অনেকখানি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু মাটির মধ্যে পুঁতিয়া যাওয়া মরিচা-পড়া কামান সেদিনের স্মৃতি বহিয়া আজও মুখ তুলিয়া আছে আকাশের দিকে।

তবু চর-ইস্মাইল শিশু। শিশুর মতো অপরিণত—শিশুর মতো নিজেকে ভাঙিয়া চলে। চূর্ণ খেলনার ধূলি ভাঁটার টানে নামিয়া যায় বঙ্গোপসাগরে। দেহ আর মনের ক্ষুধা আদিম অমার্জিত রূপ লইয়া দেখা দেয়। অতীত নাই—কিন্তু বাতাসে বাতাসে তাহার নিশ্বাস এখনো ছড়াইয়া আছে।

এমনি একটা পটভূমিতে গঞ্জালেস্ দেখিল লিসিকে।

আরাকানী-বার্মমিশানো তামাটে মুখে ছোট ছোট চোখ দুটিকে আরো ছোট করিয়া লিসিও তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। নির্ভয় নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি। বলিল, তুমি কে?

ভাব দেখিয়া গঞ্জালেসের হাসি পাইল। বলিল, দেখতেই পাচ্ছ।

—ও, তুমি স্যামুয়েল গঞ্জালেস্, তাই না? ঠাকুর্দা তোমার খুব গল্প করছিল।

—তা হবে।

লিসি আর একবার ভালো করিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তুমি গাছে উঠতে পারো?

—গাছে? বিস্মিত হইয়া গঞ্জালেস্ বলিল, গাছে কেন?

—গাছে কেন কি? লিসিকে ততোধিক বিস্মিত মনে হইল, নারকেল পাড়তে হবে যে।

—নারকেল পাড়তে! না, সে আমি পারব না।

অসীম অবজ্ঞা ও অনুকম্পায় লিসি চোখ মুখ কুঞ্চিত করিল, গাছে উঠতে পারোনা তো অমন চেহারাখানা রেখেছ কেন? আমি গাছে উঠতে পারি, তা জানো?

—সত্যি নাকি!

—ওঃ, বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি?

কথাটা বলিবার অপেক্ষামাত্র, তারপরেই কিছু আর করিতে হইলনা। চট্ করিয়া কাপড়-চোপড় একটু সামলাইয়া দা হাতে লিসি কাঠবেড়ালির মতো তরতর্ করিয়া নারিকেল গাছে চড়িয়া বসিল। তারপর সেখান হইতে বিজয়িনীর মতো গলা বাড়াইয়া গঞ্জালেস্কে ডাকিয়া কহিল, এই দেখলে তো?

গঞ্জালেস্ দেখিল এবং দেখিবামাত্র ভাবান্তর ঘটিয়া গেল তাহার।

লিসি গাছ হইতে ঝুপঝাপ্ করিয়া গোটা কয়েক ঝুনো নারিকেল নীচে ফেলিয়া আবার তেমনি অবলীলাক্রমে নামিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। আর সেই মুহূর্তে গঞ্জালেসের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। পরিশ্রমে লিসির তামাটে মুখখানা চমৎকার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কপালের প্রান্তে প্রান্তে ঘামের বিন্দু। তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া গঞ্জালেসের নেশা ধরিয়া গেল।

দু পা আগাইয়া আসিয়া হঠাৎ গঞ্জালেস্ লিসির একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, বাঃ, তুমি তো দেখতে বেশ।

লিসি ভ্রূভঙ্গী করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু খুব যে এমন একটা ভয় পাইয়াছে তাহা মনে হইলনা। বলিল, বেশ তো, তাতে তোমার কি?

—কিছু কাজ আছেই তো। আচ্ছা, পছন্দ হয় আমাকে?

হাত ছাড়াইয়া লিসি প্রস্থানের উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া সোজা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—কেন পছন্দ হবে তোমাকে? নারকেল গাছে উঠতে পারো না, খালি লম্বা চওড়া চেহারা থাকলেই চলে?

ব্যাপারটা গঞ্জালেস্ আরো সোজা করিয়া আনিল, আচ্ছা, নারকেল গাছে চড়াটা না হয় রপ্ত করে নেব। কিন্তু আমাকে বিয়ে করবে তুমি?

—বিয়ে! তোমাকে! লিসি তাহার মঙ্গোলীয়ান মুখখানাকে এমন ভাবে বাঁকাইল যে গঞ্জালেস্ একেবারে সংকোচে কেঁচোটি হইয়া গেল: তার চাইতে খুঁড়ো ডি-সিল্ভাকে বিয়ে করলে ক্ষতি কি?

খুঁড়ো ডি-সিল্ভা ব্যক্তিটি কে, সে সংবাদটা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবার আগেই বেগে লিসি গেল অদৃশ্য হইয়া। দূরে কোথা হইতে চমৎকার বাঁশির সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল—বাজাইতেছিল জোহান।

লিসির কাটা-ছাঁটা স্পষ্ট জবাবে গঞ্জালেস্ কিন্তু খুশি হইয়া গেল। চর-ইস্মাইলের এই রুক্ষতায় লিসির এমনি রুক্ষতাই তো স্বাভাবিক। আরো বিশেষ করিয়া পর্তুগীজদের রক্ত তাহার শরীরে! তাহার ঠাকুর্দা ইংরেজের আইনকে অস্বীকার করিয়া আফিঙের ব্যবসা চালাইয়া চলিয়াছে।

কথাটা শেষ পর্যন্ত ডি-সুজার কাছে সে পাড়িল।

ডি-সুজা এক রকম মুখিয়া ছিল বলিলেই হয়। দন্তহীন মুখে প্রাণপণে যে মুরগীর ঠ্যাংটাকে সে কায়দা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কথাটা শোনা মাত্র সেটা ঠকাস্ করিয়া প্লেটের উপর খসিয়া পড়িল। ঝোলমাখা পাকা গোঁফ জোড়া খাড়া করিয়া ডি-সুজা বলিল, বটে বটে!

—যদি আপত্তি না থাকে—

—আপত্তি! কি বলছ তুমি! ডি-সুজা মুরগীর ঠ্যাং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেল, বলিল, আমি তো সেই কথাই ভাবছিলাম। ডেভিডের ছেলে তুমি, তোমার মতো যোগ্যপাত্র আর কোথায় মিলবে। বললে বিশ্বাস করবে না, প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি, সেদিন থেকেই ভাবছি লিসিকে তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব।

বিনয়ে গঞ্জালেস্ মাথা নত করিয়া রহিল।

ডি-সুজা কহিল, এর মতো সুখের কথা আর কি আছে। দাঁড়াও, লিসিকে আমি এক্ষুণি ডাকছি—বলিয়া ঝোল মাখা গোঁফ জোড়া ফুলাইয়া চীৎকার করিয়া সে লিসিকে ডাকিল।

লিসি আসিয়া উপস্থিত হইল। ডি-সুজার মুখের অবস্থাটা লক্ষ্য করিয়া কহিল, কি হয়েছে? কেন মিছিমিছি চ্যাচাচ্ছ অমন ক'রে?

—বাঃ, চ্যাচাব না! এই—একে চিনিস্ তো? ডেভিড গঞ্জালেসের ছেলে?

বাঁকা কটাক্ষে গঞ্জালেসের দিকে চাহিয়া লিসি বলিল—হুঁ, খুব চিনি।

—খালি চিনলেই চলবে না।

—কি করতে হবে তবে?

—ওকে বিয়ে করতে হবে তোর।

—বিয়ে! কি সব যা তা বলছ ঠাকুর্মা! লিসি ঠাকুর্মাকে ধমকাইয়াই উঠিল এক রকম। ডি-সুজা লিসির কথার সুরে থতমত খাইয়া গেল। তাহার আকস্মিক উৎসাহে মস্ত একটা আঘাত লাগিয়াছে।

—বিয়ে। যাকে তাকে ধরে বিয়ে করলেই হয় বুঝি।

—যাকে তাকে কিরে! ডেভিডের ছেলে যে ও—ডি-সুজা বিস্মিত শ্রদ্ধায় থামিয়া গেল। ইহার চাইতে বড় পরিচয় কি আর হইতে পারে মানুষের!

কিন্তু এ পরিচয়ে লিসি বিচলিত বা বশীভূত হইল না। বলিল, হলেই বা ডেভিডের ছেলে, নারকেল গাছে যে উঠতে পারে না সে খবর রাখো?

ডি-সুজা চটিয়া গেল: কেন, নারকেল গাছে ওঠাটা এমন কি ভয়ানক ব্যাপার? জানিস, এমন ছেলে আজকালকার দিনে দেখা যায় না? কত বড় ব্যবসা, কত টাকা—কেমন সুখে রাখবে বল্ দিকি?

—ছাই!

ডি-সুজা তাতিতেছিল, আগুন হইয়া গেল এবারে। চীৎকার করিয়া কহিল, এ সব কথা কার্ কাছে শুনেছিস তুই? জোহান বুঝি?

—তুমি আবার পাগলের মতো চ্যাচাচ্ছ ঠাকুর্মা!

—নাঃ, চ্যাচাব না! ঝোলমাখা গোঁফজোড়া শিকারী বিড়ালের মতো ফুলাইয়া ডি-সুজা সরোষে কহিল—পাজী, নচ্ছার, হতভাগা! মেরীর নাম করে বলছি, একদিন ওর সব কটা দাঁত উড়িয়ে দেব আমি।

গঞ্জালেস্ বোকার মতো বসিয়াছিল এতক্ষণ। বড় বেশি বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে বোধ করিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, আহা-হা, কেন মিথ্যে মাথা গরম করছ!

—না, মাথা গরম করব না, একেবারে ঠাণ্ডা জল হয়ে থাকব। জোহানের মতলব আমি কিছু বুঝি না আর! কেবল আমার বড় রোজগটা? লিসিকে শুধু বাগাবার চেষ্টায় আছে ও।

লিসি খানিকক্ষণ চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া ডি-সুজার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে—অনেকটা যাদুকরেরা যেভাবে সম্মোহন-বিদ্যা প্রয়োগ করে সেই রকম। ফলও পাওয়া গেল অবিলম্বেই।

ডি-সুজা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সুর নরম হইয়া আসিল তাহার—কহিল, বাঃ, অমন ক'রে তাকিয়ে আছিস্ যে! আমি—আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি?

লিসি গম্ভীর গলায় বলিল, হুঁ। ফের যদি তুমি ওই সব আবোল্ তাবোল্ বকবে, তা হলে আমি ঠিক ওই জোহানের সঙ্গে সোজা চলে যাব।

একবার ঝাঁৎকাইয়া উঠিয়াই ডি-সুজা থামিয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা গঞ্জালেসের কিন্তু ভারী ভালো লাগিয়া গিয়াছিল। লিসির রুক্ষতাটা তাহার চোখে যত বেশি করিয়া পড়িতে লাগিল, ততই সে দিনের পর দিন প্রলুব্ধ বোধ করিতে লাগিল নিজেকে। মনটা তীব্র না হইলে নেশা জমিতে চায় না—একপাত্র হুইস্কির মতোই লিসি আকর্ষণ করিতেছিল তাহাকে। নারিকেল গাছে উঠিতে না পারিলেও সে প্রতীক্ষা এবং প্রত্যাশা করিয়া রহিল।

কিন্তু চর্ ইসমাইলে পড়িয়া থাকিলেই গঞ্জালেসের চলে না। তাহার বিরাট ব্যবসা আছে—দাবির এবং কাজেরও অভাব নাই। সুতরাং একদিন তাহাকে আবার চট্টগ্রামে ফিরিতে হইলই। যাইবার আগে সে আশা লইয়া গেল যে লিসির কৃপাবৃষ্টি শেষ পর্যন্ত তাহার উপর নিশ্চয়ই পড়িবে।

যাইবার আগে ডি-সুজা কহিল, ডেভিডের ছেলে তুমি—আমাদের গৌরব। বাপের নাম বাঁচিয়ে রাখা চাই। তত্ত্বকথাটা গঞ্জালেস্ মাথা পাতিয়া লইল বটে কিন্তু বাপের নাম বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য খুব প্রবল একটা উৎসাহ বোধ করিল না। ডেভিডের চরিত্রের দুঃসাহসিক দিকটাকেই সে লক্ষ্য করিয়াছে শুধু, তাহার কার্য-তালিকা খুব অনুকরণ-যোগ্য বলিয়া ভ্রম তাহার কখনো হয় নাই। (ক্রমশঃ)

"পঞ্চনদীর তীরে"

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

পঞ্চনদীর তীরে বইকি! বঙ্গের শ্যামল ভূমি, বিহারের রুক্ষ এবং পার্বত্য প্রান্তর পিছনে রেখে, যুক্ত প্রদেশ পার হয়ে শতদ্রু বিপাশা নদী অতিক্রম ক'রে পাঞ্জাব প্রদেশের মধ্য দিয়ে আমাদের পাঞ্জাব মেল একটানা গতি নিয়ে ছুটতে লাগল। যত চলি প্রকৃতির রূপ বদ্‌লায়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাহিরের ও অন্তরের চেহারা বদ্‌লায়, বেশ ভূষা ভাষা সবেরই রূপান্তর ঘটে। তবে শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির এই দিকটার সঙ্গে পাঞ্জাবের একটি সাদৃশ্য রয়েছে দেখলুম। এ কথা সত্যি যে বাঙ্গালা দেশ শস্যশ্যামলা, কিন্তু অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির ফলে তার দুর্ভিক্ষ আর মানুষের পীড়নকেও অস্বীকার করা চলেনা, সেই তুলনায় পাঞ্জাবে প্রচুর পরিমাণে বর্ষা না নামলেও খালের সুব্যবস্থায় দেশ বেশ সমৃদ্ধিশালী হতে পেরেছে। দিক সবুজ প্রান্তরের পর প্রান্তরে শস্যের প্রাচুর্য পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, মাঠে মাঠে আরও দামরিকী শস্য ভরে উঠেছে।

সীমাহীন পথ আর ফুরোয়না—, ক্রমাগতই চলেছি, পুরোপুরি আট চল্লিশ ঘণ্টা পর। চৈত্রের এক সন্ধ্যেবেলা ইরাবতী নদীর তীরে লাহোরে আমরা পৌঁছুলুম। আমাদের দূরে সম্মুখে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী। লাহোর পাঞ্জাবের রাজধানী, সেইদিক থেকে কলিকাতার সঙ্গে এর তুলনা চলে, আবার চলেনা।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তক্‌তকে শহরটি—মাল নামীয় বড় রাস্তাটিকে পরিবেষ্টন ক'রে বড় বড় হোটেল, অফিস ও বিভিন্ন দোকান প্রভৃতি রয়েছে। অন্যান্য পথঘাটও রাজধানীর সম্মান রক্ষা করেছে।

মাইল [illegible] দূরে মডেল টাউন তো আরও উন্নত পারিপাট্যের ও ও সৌখীন রুচির পরিচয় প্রদান করে। তবে কলিকাতার তুলনায় যানবাহনাদির অত্যন্ত অসুবিধা—ট্রাম নেই, বর্তমান পেট্রোল সমস্যার দরুণ শহরের মধ্যে বাস চলেনা, রিক্সা নেই—ধনীদের ট্যাক্সি এবং প্রাইভেট কার ছাড়া একমাত্র টাঙ্গাই সর্বত্রই ব্যাপক অভিযান। লোকের এই প্রয়োজনের সুবিধা নিয়ে টাঙ্গাওয়ালা অত্যন্ত দর চায়—নিয়ম আছে প্রথম ঘণ্টা দশ আনা, পরের ঘণ্টাগুলো ছয় আনা—কিন্তু সে হিসেবে যেতে কেউ সম্মত হয়না। সেই জন্যে নারী পুরুষ প্রত্যেকেই ওখানে সাইকেল ব্যবহার করে, এমন কি পুত্রকন্যাসহ দুইখানা সাইকেলে স্বামী-স্ত্রী ভ্রমণে বেরিয়েছে দেখা যায়। এই অসুবিধে ছাড়া water carries ব্যবস্থায় পায়খানা ও under ground drain না থাকায় অত্যন্ত মাছি—সর্বত্র মাছি ভন্‌ভন্ করছে—পল্লীগ্রামকেও হার মানিয়ে দেয়। বিদ্যুত শক্তির ব্যবস্থা এখানে অত্যন্ত ব্যয় সংক্ষেপের মধ্যে হয়ে থাকে—ডাইনামোর পরিবর্তে কাংড়া পাহাড়ের water falls এর current দ্বারা এই কাজটি সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

বর্তমানের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে—ওদেশে এখনও সাজো সাজো রব পড়ে যায়নি, ইওরোপের যুদ্ধের সময় আমরা যেমন নির্ভিক ছিলুম, ওরা এখনও ঠিক তেমনি রয়েছে; বাঙ্গালায় এখন অত্যন্ত দুঃসময়—এই কথা বলে ওরা এবং কলিকাতার বোমা পড়ার প্রত্যক্ষ সংবাদটি আমার কাছে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে। নিষ্প্রদীপে রাত্রি জীবন ওখানে সমস্যামূলক হয়নি—সস্তা জাপানি পাওয়া এক নিদারুণ ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। তবে চাল ডাল লবণ তৈল ঘৃত চিনি ইত্যাদি কলিকাতার দরেই বিক্রয় হয় এবং কেরোসিন তৈল, কয়লা ও চিনি দুষ্প্রাপ্য—, কেবল আটার দরটা সস্তা ছিল। চার আনা প্রতি সের পাওয়া যেত। বাঙ্গালা দেশের তুলনায় পাঞ্জাবে তরী তরকারী দুর্মূল্য—, শাক লাউ পর্যন্ত সের দরে বিক্রয় হয়—, এক কি দুই পয়সায় যে লাউ আমাদের দেশে পাওয়া যায়, কম পক্ষে সে লাউএর দর ওখানে বারো আনা—, টমাটোর সের বারো আনা, তবে কন্দমূল এবং উৎপন্ন কিছু সস্তায় পাওয়া যায়।

এখানে লোকের অভাবের হাহাকার নেই, ভিক্ষা নেই, লাহোর ব্যয়বহুল জায়গা হলেও দেশবাসীর জীবনযাপনের সঙ্গে সমতা রক্ষা ক'রে চলে। কারণ পাঞ্জাবীরা আয়হীন নয়, অলস নয়—, রাজভক্ত জাতি ওরা, তাই ওদের পরিবার থেকে কেউ না কেউ যুদ্ধে যোগদান করেছে, তাই সরকারী বৃত্তি ভালো রকম পেয়ে থাকে—, এ ছাড়া কৃষিতে ভাল ফসল উৎপাদন হয়ে থাকে। অসামরিক পরিশ্রমও ওরা করতে পারে।

আনারকলি ও ডাব্বি বাজার লাহোরের সর্বজনপরিচিত বাজার। এখানে জুতো মোজা, নানাজাতীয় কাপড়, জামা, টুপি, বাসনপত্র, ঘড়ি আসবাবপত্র সবরকম জিনিস পাওয়া যায়—, কতকটা কলিকাতার চাঁদনী ও চিৎপুরের মত। ডাব্বি বাজারে দাম অপেক্ষাকৃত কিছু কম। অন্যান্য নির্দিষ্ট বাজার বস্তুত ওখানে কিছু নেই—, ছোট ছোট দোকানে খাবার বিক্রয় হয়—, মাংসের ভিন্ন দোকান,—মৎস্যের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়না।

পাঞ্জাবের মেয়েদের কয়েকদিক থেকে আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছিল। ওদের মধ্যে আদৌ জড়তা নেই, চকিত ভাবাপন্ন, শিক্ষার সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ ওরা। "নারীর আপন ভাগ্যকে জয় করবার অধিকার" নারীর নিজেরও যে আছে, সে কথা ওরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে এবং কার্য্যকরী করে তুলেছে। বাঙ্গালীর মেয়ে যেখানে সংস্কার আর রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে থাকে,—ওরা সেখানে সৌন্দর্য্য এবং স্বাস্থ্যের উপাসনা করে। বাঙ্গালীর মেয়ে যেখানে অনুকম্পার আর নিষ্পেষিত হয়, স্বাবলম্বী জীবন যাত্রায় ওরা সেখানে নারীত্বকে সম্মানিত করে। তাই দেখতে পেয়েছিলুম—, দুধ এবং ফল ওদের স্বাস্থ্যমূলক খাদ্য—শিশু থেকে তরুণরা তো নিয়মিতভাবে এই খাদ্যের সদ্ব্যবহার করে থাকে—, বয়স্কা নারী পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেনা। কত দিন দেখেছি কত মহিলা রেষ্টুরেন্টে গিয়ে রিফ্রিজারেটারের মধ্যে রক্ষিত বরফের মত ঠাণ্ডা দুধ খেয়ে নিয়ে আপন আপন কাজে চলে গিয়েছে। স্বাবলম্বী হওয়ার দিকেও প্রত্যেক মেয়ের ঝোঁক রয়েছে দেখলুম। বাইরে বেরিয়ে উপার্জন করবার মত যাদের যথেষ্ট শিক্ষা থাকেনা—, তারাও ঘরে বসে কেউ গালিচা তৈয়ারী ক'রে, জুতোর জরির কাজ ক'রে, কেউবা শাড়ীতে ও অন্যান্য কাপড়ে নানারকম ফুল ও কল্কা তুলে নানাভাবে পয়সা উপার্জন করে। এই স্বাবলম্বন-বিদ্যা প্রত্যেক দেশের মেয়ের পক্ষে একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

পাঞ্জাবের কি নারী কি পুরুষ উভয়েই জাতীয়তার দিক থেকে সম্পূর্ণ রিক্ত, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন ওদের মধ্যে দেখতে পেলুম না, অত্যন্ত বিলিতী ভাবাপন্ন ওরা,—মেয়েরা শাড়ী ও সালোয়ার ব্যবহার করে। পুরুষেরা প্রায় প্রত্যেকেই হ্যাট পরিধান করে। গৃহসজ্জায় কথাবার্তায় সর্বত্রই ইংরেজের অনুকরণই বিদ্যমান। এইদিক থেকে বাঙালী দেখলুম—অনেক উন্নত হয়েছে, একদিন বাঙালী পাড়ার ছেলে মেয়েদের স্পোর্ট দেখতে গেলুম, দেখলুম তারা জাতীয়তার সম্মান রক্ষা করেছে, প্রত্যেকটি মেয়ের পরিধানে ঢাকাই, টাঙ্গাইল, শান্তিপুরী, মুর্শিদাবাদী প্রভৃতি শাড়ী রয়েছে। না হয় মাদ্রাজী বেনারসী পরেছে।

লাহোর সম্রাট শাজাহানের জন্মভূমি। তাই তাঁর সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার পরিচয় এখানেও কিছু পাওয়া যায়। লাহোর সহর থেকে মাইল চারেক দূরে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত সালামার গার্ডেন,—সৌন্দর্য্যের যেন প্রত্যক্ষ নিদর্শন। চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত "ত্রিতল উদ্যানই" এই সালামারের বৈশিষ্ট্য। সর্বোচ্চ ধাপে আম-কানন, ছায়াশীতল নির্জন পথ, আরও নানাজাতীয় বৃক্ষ লতাদিতে শোভিত হয়েছে। "গোলাবী বাগ" দ্বিতীয় ধাপের বৈশিষ্ট্য,—শুধু গোলাপের সমারোহ সেখানে—হলদে, গোলাপী, লাল, রং-বেরঙের পদ্মর চেয়েও বড় গোলাপ বাগান আলোকিত করে রয়েছে, মনোমুগ্ধকারীরূপে সে উদ্যান অপূর্ব। প্রায় সাড়ে চারিশত কারুনিক ঝর্ণা প্রথম ধাপে ইতস্ততঃ সজ্জিত হয়ে রয়েছে, মধ্যে লাল পাথরের বেদী, মার্বেলের পর্দা, ফাউন্টেনের বাহার—সম্রাটদের প্রমোদ-ভবন একদিন এই উদ্যান ছিল। বর্তমানে ছেলে মেয়েরা আমোদ পিকনিক প্রভৃতি করে, মাসের প্রথম সপ্তাহটি শুধু মেয়েদের জন্যেই নির্দিষ্ট।

ইরাবতী নদীর ব্যারেজের পাশ দিয়ে একদিন সাহদরা গেলুম। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও বেগম নূরজাহানের সমাধি প্রাঙ্গণ এই সাহদরা। উদ্যানে পরিবেষ্টিত সাদা পাথরের বিরাট সৌধ ব্যতীত জাহাঙ্গীরের সমাধিতে বিশেষ কিছুই বৈশিষ্ট্য নেই। প্রকাণ্ড তোরণ অতিক্রম করে নূরজাহানের সমাধি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলুম। সমাধি-সৌধ আজ ভগ্নস্তূপের সামিল হয়েছে, চতুর্দিকে জঙ্গল; দেওয়াল ধসে পড়ছে, প্রাচীর-গাত্রে গায়ে মৌমাছি চাক করেছে। প্রদীপ নেই, পুষ্পমাল্য নেই, প্রহরী নিযুক্ত নেই—মৃত সমাধি যেন আজও কৃতকর্মের অনুশোচনায় মূক হয়ে রয়েছে।

ফেরবার মুখে ফোর্টে গেলুম। সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত এবং বৈকাল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এই ফোর্ট খোলা হয়—দুই আনা দর্শনী। এই দুর্গ মোগল রাজত্বের সাক্ষ্য প্রদান করছে, সম্রাট আকবর এই দুর্গ তৈরী করতে শুরু করেছিলেন, সম্রাট সাজাহান শেষ করেছিলেন, পরে কিছুদিনের জন্যে শিখ সম্প্রদায়ের হস্তগত হয়েছিল। আজ আর সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য পরিচয় ওর মধ্যে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, লাল পাথরের প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ, ভেতরে কেবল কড়ি

বরগা ইঁট পাথরের ভগ্ন স্তূপ, তারই মধ্যে দিয়ে উপরে উঠলুম। প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ কেবল শীসমহল, রঙ-বেরঙের কাঁচ যুক্ত প্রাচীর গাত্র—আয়নারই রাজ্য—আয়নার সমারোহ মৃত সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্তিমিত হয়ে রয়েছে। অধিকাংশ প্রকোষ্ঠ প্রায় ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে, দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস অর্থাৎ দরবার কক্ষ এবং মতি মসজিদের চিহ্ন এখনও অক্ষত হয়ে রয়েছে। মিউজিয়মের মধ্যে রণসজ্জা, লৌহ পোষাক, অসি, বর্ম প্রভৃতি অস্ত্র, টাকা পয়সা ইত্যাদি সযত্নে সংরক্ষিত, শিখ রাজত্বের গৌরবের পরিচয় এইগুলি, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ উদ্ধার করেছেন। অস্ত্রশস্ত্রগুলির পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। বিশ্বাস হয় না কিছুতেই—সত্যই কি ভারতবাসীর একদিন এইগুলি ব্যবহার করবার অধিকার ছিল? নীচে নেমে এসে দেখলুম, প্রকাণ্ড লৌহ দুয়ারে শিখ রাজত্বের কুলুপ আজও আঁটা রয়েছে, কত যুগ যুগান্ত অতিবাহিত হয়েছে, কত ঝড় কত রৌদ্র ও বৃষ্টির দৌরাত্ম্য বয়ে গিয়েছে, তবু ওই কুলুপ নিঃশব্দে রয়েছে, রণজিৎ সিং বিদায় কালে বলে গিয়েছিলেন, তাঁরই উত্তরাধিকারীরা কেউ একদিন ওই বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করবে—হয়তো সেই প্রতীক্ষায় ওই কুলুপ আজও নিঃশব্দে রয়েছে।

শিখ সম্প্রদায়ের গুরুদ্বার লাহোরের একটি দর্শনীয় জায়গা। নানকের প্রচারিত ধর্ম প্রচারই এই গুরুদ্বারের বৈশিষ্ট্য, ষ্টেশন থেকে মাইল খানেকের মধ্যে সারকুলার রোডের উপর এই মন্দির অবস্থিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ, নগ্ন পায়ে, মস্তক শিরস্ত্রাণে আবরিত করে কোনও ধূমপানীয় দ্রব্য সঙ্গে না নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। শিখেরা এইখানে তার জাতীয়তার সম্মান রক্ষা করেছে। মন্দিরের প্রধান প্রকোষ্ঠে গ্রন্থের অর্চনা হয়,—দশম গুরুর পর থেকে এই গ্রন্থই শিখ সম্প্রদায়ের দেবতা। এই মন্দিরে পঞ্চম গুরু অর্জুনসিংহের স্মৃতি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এই স্মৃতির সঙ্গে অনেক অলৌকিক কাহিনীও জড়িত আছে। অর্জুনসিংহের সমাধি মন্দির ধূপধূনা পুষ্প সৌরভে আমোদিত। সোনার গিল্টি করা মন্দির-চূড়াটি উজ্জ্বল ঝকমকে। এই মন্দিরের পাশেই রণজিৎ সিংহের সমাধি মন্দির, পারিপাট্য-সুন্দর সমাধি সৌধটি, রাজপরিবারের কয়েকজনের সমাধি একত্রে ওই মন্দিরের মধ্যে রয়েছে, এমন কি জনপ্রিয় রণজিত সিংহের প্রজ্বলিত চিতায় দুইটি কবুতরও আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদেরও সমাধি সযত্নে রক্ষিত আছে।

এখান থেকে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে কবি ইকবালের সমাধি দেখলুম—বিরাট সৌধের আড়ম্বর নেই—লৌহবেষ্টিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছোট একটু সমাধি বেদী—কবি প্রতিভার যেন বেদীপাষাণ। ওরই পাশে পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর সমাধি রয়েছে।

লরেন্স গার্ডেন লাহোর সৌন্দর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এমন কোনও ফুল নেই যা ওই বাগানে না পাওয়া যায়। পুষ্প সমারোহই ওই কাননের বৈশিষ্ট্য। পাহাড় ঘিরে ঘেরা পুষ্পময় উদ্যানে—পরিচ্ছন্ন সুন্দর পাহাড়ের গায়ে স্তবকে স্তবকে রং-বেরংএর ফুল ফুটে রয়েছে,—মধ্যে মধ্যে পায়ে চলা লাল কাঁকরের সঙ্কীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে উপরে চলে গিয়েছে—মনোরম পরিকল্পনায় শীর্ষ উদ্যানটি রচিত।

সান্ধ্যভ্রমণকারীরা দলে দলে এখানে বেড়াতে আসে। আরও খানিকটা এগিয়ে এই পাহাড় সংলগ্নই বোটানিক্যাল ও জুলজিক্যাল বাগান অবস্থিত। এগুলির মধ্যে বিশেষ কিছুই বৈশিষ্ট্য নেই। এম্প্রেস রোডের উপর এই লরেন্স গার্ডেনের অনুকরণে সিমলা পাহাড় রচিত হয়েছে। তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা পাহাড়ের মাথায় অত্যন্ত সাধারণ একটি পার্ক।—

কত প্রভাত ও কত সন্ধ্যা এই সিমলা পাহাড়ে আমার কেটে গিয়েছে। লাহোরের মিউজিয়মে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখিনি,—নানা দেশ বিদেশের নানা যুগের শিল্প স্থাপত্য প্রভৃতি সংগ্রহ করেছে,—চিত্র মহলে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের ও নন্দলাল বসুর অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখে এই দূরদেশে বাঙালীর সম্মানে, বাঙালীর স্মরণে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

একদিন শিখ সম্প্রদায়ের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির দেখতে কয়েক ষ্টেশন আগে অমৃতসর গেলুম। লাহোর প্রকাণ্ড ষ্টেশন—যেমন গাড়ীর আনাগোনার অন্ত নেই, তেমনি যাত্রীর ভীড়—যাতায়াতের পথও অগণিত—যেন গোলকধাঁধার সৃষ্টি করে। ষ্টেশনের ব্যবস্থা ভাল, রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ টিকিট দেখে নির্দ্দিষ্ট পথটি বলে দিয়ে থাকেন।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে অমৃতসর পৌঁছলুম, অত্যন্ত অপরিষ্কার রাস্তাঘাট ক্লক-বাজার, হালবাজারের মধ্যে দিয়ে প্রায় মাইল দেড় দুই রাস্তা অতিক্রম করে স্বর্ণ মন্দিরের সম্মুখে টাঙ্গা এসে থামলো। স্থাপত্য কলার দিক থেকে স্বর্ণমন্দির সত্যই অতুলনীয়। উদ্যান এবং সরোবর বেষ্টিত প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে এই স্বর্ণমন্দির অবস্থিত। সোনার গম্বুজটি সূর্য্যের দীপ্তিতে ঝলমল করছিল। মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলুম—প্রাচীরগাত্র, তার সর্ব্বাঙ্গই স্বর্ণোজ্জ্বল,—ঝকঝকে শ্বেত পাথরের মেঝে,—ধূপ-ধূনো প্রদীপ জ্বলছে, আতর ফুল চন্দনের গন্ধে দেবালয় আমোদিত, রেশম বস্ত্রে আচ্ছাদিত "গ্রন্থের" চতুর্দ্দিক ঘিরে ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন করছে।

শিখ সম্প্রদায়েরা এখনও ধর্ম্মকে আপন প্রথানের মধ্যে সঙ্কীর্ণ করেনি—প্রণামীর সঙ্গে প্রসাদের কোনই যোগাযোগ নেই,—প্রত্যেকে হালুয়া প্রসাদ পেয়ে থাকে। প্রাঙ্গণের অন্যান্য প্রান্তে নানকের উপবেশন কক্ষ "কালথাকাত", পঞ্চমগুরু অর্জ্জুন সাহেবের স্মৃতি মন্দির প্রভৃতি রয়েছে।

ফেরবার পথে জালিয়ানওয়ালাবাগ হয়ে এলুম। শীতলা মন্দিরে গেলুম, বেশ বড় মন্দির; বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, দুই ধারে সিঁড়ি অতিক্রম করে বিচিত্র কারুকার্য্য করা মন্দিরে রূপার বড় তোরণ দ্বার—ভিতরে দুর্গা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, শীতলা প্রমুখ দেবদেবীর মূর্ত্তি রয়েছে।

লস্যি পাঞ্জাবের একটি পরম উপাদেয় পানীয় খাদ্য। বিশেষ কিছুই নয়—বরফ মিশ্রিত ঘোলের সরবৎ,—তৈরী করবার কৌশলে অপার্থিব হয়ে ওঠে, ইঞ্জিনের বাষ্পের মত ধূমায়িত দেহ-মন যেন মুহূর্ত্তে স্নিগ্ধ শীতল হয়ে যায়।

তখন ছিল চৈত্রমাস—কিন্তু আবহাওয়া অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠেনি,—রাত্রে রীতিমত ঠাণ্ডা অনুভব করতুম। বাঙলা দেশের এক ঘণ্টা পরে সূর্য্য ওইখানে উদিত হয় এবং অস্ত যায়। পাঞ্জাবের ছেলে মেয়েদের সুন্দর স্বাস্থ্য ও শক্তিসম্পন্ন চেহারা পাঞ্জাবের উন্নত জলহাওয়ার পরিচয় প্রদান করে।

এ কথা সত্য যে লাহোর অত্যন্ত ব্যয়বহুল জায়গা—বড় হোটেলগুলির খরচ অত্যন্ত বেশী, দৈনিক প্রায় উনিশ টাকা,—সাধারণের উপযোগী "হিন্দু হোটেলে" সে অনুপাতে খরচ অনেক কম। দৈনিক একখানি ঘরের ভাড়া দুই টাকা, নিজের ইচ্ছামত খাদ্যদ্রব্য কিনে চলে—একজনের আহারের উপযোগী খাদ্য বারো চোদ্দ আনা পড়ে।

ভ্রমণের দিক থেকে লাহোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান। কেননা কত রাজপুরুষের উত্থান পতনের স্মৃতি এই রাজধানীতে জড়িত রয়েছে, স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকেও স্বর্ণ মন্দির শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছে। শুধু তাই না—প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই রাজধানীর নাম একদিন লবপুর ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের নামানুসারে এই নামকরণ করা হয়েছিল। লবের চরণচিহ্ন আঁকা বর্ত্তমানের এই লাহোর তীর্থক্ষেত্রের দিক থেকেও স্মরণীয়।

জঙ্গম

বনফুল

১৮

হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পাইয়া শঙ্করকে কলিকাতা চলিয়া যাইতে হইল। যে এডভোকেট জীবন চক্রবর্তীকে ক্ষতিপূরণের দাবী জানাইয়া চিঠি দিয়াছিলেন তিনি কলিকাতাবাসী। তিনিই শঙ্করকে অবিলম্বে কলিকাতা যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। কলিকাতার লোককে দিয়া কাজ করানোর নানারূপ অসুবিধা আছে। তথাপি দুইটি কারণে এই ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইনি উৎপলের বন্ধু। দ্বিতীয়ত এ অঞ্চলের কোন ভাল উকিল কেনারাম চক্রবর্তীর পুত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে রাজি নহেন। মনে মনে কেনারাম চক্রবর্তীর উপরে সকলেই চটা, কিন্তু খোলাখুলিভাবে তাহা প্রকাশ করিতে সকলেই অনিচ্ছুক। লোকটাকে সবাই ভয় করে। জীবন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মকোর্দ্দমা করার ইচ্ছা শঙ্করেরও তেমন ছিল না, কিন্তু উৎপল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন কথাটা তুলিয়াছে এবং সমস্ত টাকা যখন উৎপলেরই—তখন 'না' করিবার আর সঙ্গত উপায় রহিল না। মকোর্দ্দমা করিতে অস্বীকার করিলে উৎপল হয়তো আপত্তি করিত না—কিন্তু ওই 'হয়তো' জিনিসটা বড়ই অনিশ্চিত, বিশেষত টাকাকড়ির ব্যাপারে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করাই নিরাপদ। উৎপল যদিও তাহাকেই সর্ব্বময় কর্তা করিয়া রাখিয়াছে তবু সে যেন স্বাধীন নয়—একটা অদৃশ্য পরাধীনতার বন্ধন তাহাকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে—কিছুতেই সে যেন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। নেপথ্যবাসী উৎপল নীরবে থাকিয়াও যেন তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। কেন এমন হয়? ট্রেনে বসিয়া শঙ্কর এই কথাটাই ভাবিতেছিল। মনটা ভাল ছিল না। অনেকদিন পরে অমিয়াকে বিশেষত খুকীকে ছাড়িয়া আসিয়া সে কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। আসিবার সময় মেয়েটা বড় কাঁদিয়াছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দায়ে পড়িয়া তাহাকে যাইতে হইতেছে। কি দরকার ছিল এই কলহ করিবার! সে কেন সোজাসুজি উৎপলের প্রস্তাবে আপত্তি করিল না? কেন তাহার এই দীনতা!

ট্রেন চলিতেছে···দুইধারে চাষের জমি। কৃষিপ্রধান দেশ··· জমিই এ দেশের সব। চাষের উন্নতি হইলেই এদেশের উন্নতি। চাষের উন্নতির জন্যই ইঁদারা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই ইঁদারাকে কেন্দ্র করিয়াই মকোর্দ্দমা বাধিয়াছে! সহসা শঙ্করের একটা কথা মনে হইল। ইঁদারা করাইয়া লাভ কি! মকোর্দ্দমায় জিতিয়া জীবন চক্রবর্তীর নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করিয়া পুনরায় পঁচিশটা ইঁদারা করাইয়া দেওয়া যদি সম্ভবও হয় তাহা হইলেই কি চাষীদের দুঃখমোচন হইবে? যে অঞ্চলে জল-কষ্ট নাই সে অঞ্চলের চাষীরাই কি সুখী? তাহা তো নয়। সকলেই দুঃখী, সকলেই ঋণগ্রস্ত, সকলেরই 'টাকা'র অভাব। 'টাকা' রোজগার করিবার জন্যই প্রত্যহ দলে দলে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া ফ্যাক্টরিতে, কলিয়ারিতে চা-বাগানে চলিয়া যাইতেছে। সকলেরই 'টাকা'র দরকার। টাকা না থাকিলে জমিদারের খাজনা দেওয়া যায় না, মহাজনের ধার শোধ হয় না, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা যায় না, এমন কি বিবাহ পর্য্যন্ত করা যায় না। প্রতি পদক্ষেপে নগদ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু 'টাকা' তাহারা কিছুতেই পায় না। যে টাকার লোভে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে ছুটিয়া যায় সে টাকা তাহারা শহরেও সঞ্চয় করিতে পারে না। শহরে বাড়ি ভাড়া আছে, কাবুলিওলা আছে, ঘুস আছে, মদের দোকান আছে। শহরের টাকা শহরেই রাখিয়া আসিতে হয়। শহরে বাস করিয়া তাহারা কেবল 'শহুরে' হয়। বিলাসিতার নেশায় কুসংসর্গে জর্জ্জরিত হইয়া পশুর মতোই অবশেষে মরিয়া যায়। কয়েকটা ইঁদারা করাইয়া দিলেই কি ইহাদের দুঃখ ঘুচিবে? এক সময় ছিল যখন তাহারা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়েই প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিস পাইত। দেশের রাজা খাজনা হিসাবে উৎপন্ন শস্যেরই অংশ লইতেন—'টাকা' চাহিতেন না। শস্যের বদলেই তাঁতি কাপড় দিত, নাপিত ক্ষৌর-কার্য্য করিত, ধোপা কাপড় কাচিত, কুম্ভকার বাসন প্রস্তুত করিত, পুরোহিত পূজা করিতেন, অধ্যাপক টোল চালাইতেন। আজকাল কিন্তু সকলেই 'টাকা' চায়। চাষীরা 'টাকা' পাইবে কোথায়? তাহারা টাকা উৎপাদন করে না—উৎপাদন করে শস্য। যে শস্য না হইলে পৃথিবীর কাহারও চলে না সেই শস্য যাহারা রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া উৎপন্ন করে তাহারাই আজ টাকার ফেরে পড়িয়া নিরন্ন, বিবস্ত্র—আর আমরা তাহাদের আসল দুঃখটা না বুঝিয়া কেবল কতকগুলা বাঁধা বুলি কপচাইয়া মরিতেছি। আমরা তাহাদের নিকট টাকার দাবী করি বলিয়াই তাহারা তাহাদের কষ্টার্জ্জিত শস্য লইয়া রক্ত-শোষক মহাজনদের দ্বারস্থ হয় এবং যে কোন মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া 'টাকা' সংগ্রহ করে। সারা বছরের খাইবার সংস্থানও অনেকের থাকে না, বীজের শস্যও অনেককে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। এই যেখানে চাষের পরিণাম সেখানে চাষের জন্য জল সরবরাহ করিলে কতটুকু সুবিধা হইবে—যদি উৎপন্ন শস্যের পরিবর্ত্তে তাহারা জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি না পায়? এ চাষ করিয়া লাভ কি তাহাদের! যত শস্যই হোক না তাহা বিক্রয় করিয়া 'টাকা'য় রূপান্তরিত করিতে হইবে এবং তাহার দর ঠিক করিবে মহাজন—যে মহাজন পূর্ব্বে টাকা ধার দিয়া সুদের সুদ করিয়া বসিয়া আছে! মহাজনরাও নিরুপায়। কারণ তাঁহারাও মহত্তর জনের নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য।

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল। চাষীদের নয়···খুকীকে নয়—অমিয়াকে নয়—শৈলকে। সেই ফলসা গাছটার তলায় শৈল যেন দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। কোঁচড়ে মিত্তিরদের বাড়ির পেয়ারা। কোঁচড় হইতে একটা ডাঁসা পেয়ারা বাহির করিয়া শঙ্করকে দেখাইয়া ভুরু নাচাইয়া

ঘাড় নাড়িল—তাহার পর তাহাতে কামড় দিল। সমস্ত মুখখানাতে দুষ্টামি মাখানো। হঠাৎ সে কাঁদিয়া উঠিল—শঙ্করদা, শিগ্‌গির এসো—এটা পেয়ারা নয় ওল—মুখ কুটকুট করছে আমার—শিগ্‌গির এস তুমি—এসো না—। ছুটিয়া যাইতে গিয়া শঙ্কর হোঁচট খাইল। ঘুম ভাঙিয়া গেল। হঠাৎ এতদিন পরে শৈল আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিল কেন? শৈলর কথা তো সে বহুদিন ভাবে নাই। শঙ্কর উঠিয়া বসিল। শৈলর মুখখানাই চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। সত্যই পরলোক বলিয়া কিছু আছে না কি? প্রায় চার বৎসর হইল শৈল মারা গিয়াছে। যে সন্তানের জন্য তাহার এত আকাঙ্ক্ষা ছিল সেই সন্তান প্রসব করিতে গিয়াই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সন্তানটিও বাঁচে নাই। মিষ্টার এস. কে. বোস আবার বিবাহ করিয়াছেন। অন্যমনস্ক হইয়া শঙ্কর শৈলর কথাই ভাবিতে লাগিল। ঠিক করিল কলিকাতায় গিয়া তাহার নামে তর্পণ করিবে। হয় তো তাহার তৃষিত আত্মা এখনও কোথাও একবিন্দু জলের জন্য আশা করিয়া আছে! হয় তো···ট্রেণ্ একটা বড় ষ্টেশনে আসিয়া প্রবেশ করিল। 'চা-গরম' 'গোশত-রোটি' 'চাই কমলালেবু', যাত্রীদের কলরব, কুলীর চীৎকার, ট্রলির ঘড়ঘড়ানি—হুড়মুড় করিয়া একটা প্রচণ্ড কোলাহল মনের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল···শৈল কোথায় হারাইয়া গেল!

কলিকাতায় পৌঁছিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

চার বৎসর পরে এই তাহার কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ। সেই যে গিয়াছিল আর আসে নাই। কলিকাতার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে 'বিফল' দেওয়াল—রাস্তায় রাস্তায় পার্কে পার্কে ট্রেঞ্চ। রাত্রে 'ব্ল্যাক্ আউট'···মাঝে মাঝে 'সাইরেন' বাজিতেছে···মাথার উপর 'এরোপ্লেন' ঘুরিতেছে। চায়ের দোকানে, বৈঠকখানায়, ট্রামে বাসে সর্ব্বত্রই যুদ্ধের আলোচনা। ···জাপান ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতেছে···জওহরলাল কোন বক্তৃতায় কি বলিয়াছেন, মহাত্মাজির মাত্র দুই চারিটি উক্তি হইতে কি আভাসিত হইতেছে, সে সবের সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির কি সম্পর্ক এই সব লইয়াই কথা, আলোচনা, তর্ক। দীর্ঘ চার বৎসর পল্লীগ্রামে বাস করিয়া সে সত্যই যেন গেঁয়ো হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখিবার প্রয়োজনই সে অনুভব করে নাই—এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আগ্রহই নাই তাহার। একটা মহাযুদ্ধ লাগিয়াছে বটে, তাহার আঁচ গৌণভাবে আমাদের গায়েও লাগিতেছে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা ইতিপূর্ব্বে এমন প্রত্যক্ষভাবে তাহার অন্তরকে বিচলিত করে নাই। সত্যই একটা কিছু হইবে না কি। সে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিল। আর এক মুশকিল, পুরাতন পরিচিত দলের কাহারও সহিত দেখা হইল না। সকলেই হয় অনুপস্থিত, না হয় অসুস্থ। কাহারও সহিত যে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিবে তাহার উপায় নাই। নীরা—অনিল—পলাশকান্তি—রেণুকা—নিলয়কুমারের দল পলাশকান্তির সহিত আসাম-পরিভ্রমণে গিয়াছেন। প্রফেসার গুপ্ত পক্ষাঘাতে শয্যাগত। কাহারও সহিত দেখা করেন না। ভন্টু সে ঠিকানায় নাই। চুনচুনও ঠিকানা বদলাইয়াছে। খুঁজিলে হয় তো চুনচুনকে বাহির করা যায়—কিন্তু কি দরকার! চুনচুনের যে ছবিটি মনে আঁকা আছে তাহাই তো চমৎকার। তাহার রূপ-পরিবর্ত্তন করিয়া কি হইবে। নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—হয় তো সে সন্তান-সম্ভবা—কিম্বা হয় তো—না দরকার নাই। বর্ত্তমানের চুনচুন আপন কক্ষ-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে যাইবার চলিয়া যাক। যে চুনচুন একদা তাহার হৃদয়-হরণ করিয়াছিল তাহার ছবিটাই অমর হইয়া থাক শুধু। চুনচুন সম্বন্ধে মনের গহনে যে দুর্ব্বলতা প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল এতদিন পরে সহসা তাহা আবিষ্কার করিয়া শঙ্কর নিজের কাছেই যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। না—চুনচুনের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা সে আর করিবে না।

সেকালে আর যে কে তাহার পরিচিত ছিল ভাবিতে গিয়া অনেকগুলি মুখ একে একে মানস-পটে ফুটিয়া উঠিল। বিনি, মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, মুক্তো, মুক্তোর সহোদরবর্গ, ভন্টু, ভন্টুদের পরিবার, অরিজিনিল-প্রোটোটাইপ, নিবারণবাবু, আসফি, সারথি, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, বেলা মল্লিক, প্রফেসার গুপ্ত, মুকুজ্যে মশাই, মৃন্ময়, মিসেস স্যানিয়াল, চিরঞ্জীব দাস, সংবাদক পত্রিকার পূর্ব্বতন কর্ম্মচারীবৃন্দ, করালিচরণ, লোকনাথ ঘোষাল—ছোট বড় আরও কত লোক মনের পর্দায় যেন মিছিল করিয়া আসিল এবং মিলাইয়া গেল। কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—কেহ অস্পষ্ট। ছায়া-ছবির মিছিল। কাহারও সম্বন্ধে কিন্তু মনের সে আগ্রহ আর নাই। এমন কি তাহার নিজের শ্বশুরবাড়ির সম্বন্ধেও তাহার আগ্রহ অতিশয় কম। বিবাহের পর হইতে সে শ্বশুরবাড়ি যায় নাই বলিলেও চলে। শিবিবাবু মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন, মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইয়া অনিয়াকে লইয়া যান। পূজার সময়, জামাই-ষষ্ঠীতে কখনও কিছু টাকা, কখনও কিছু কাপড়-জামা পাঠান। ইহার অধিক কোন সম্পর্ক নাই। শ্বশুরবাড়ি দূরের কথা, নিজের মায়ের সহিতই বা তাহার নিবিড় সম্পর্ক কতটুকু? মা পাগলা গারদে আছেন, মাসে মাসে তাঁহার জন্য সে টাকা পাঠাইয়া দেয়। মাঝে একবার রাঁচি গিয়াছিল—কর্ত্তব্যবোধেই গিয়াছিল—কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মায়ের পাগলামি আরও যেন বাড়িয়া গেল। ডাক্তারেরা দেখা করিতে মানা করিলেন। প্রতি মাসে টাকা পাঠাইয়া তাই সে নিশ্চিন্ত আছে। প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক থাকিলে সে কি ডাক্তারদের মানা শুনিত? সে কি মাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত? না, সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, মায়ের সহিতও তাহার প্রাণের গভীর সম্পর্ক নাই। যাহা আছে তাহা কর্ত্তব্যের সম্পর্ক মাত্র। প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা বড় কঠিন। মনে যে সুর বাজে সেই সুরের যাহারা সমঝদার তাহাদেরই সহিত কেবল অন্তরঙ্গতা হয়, বাকী সকলে পর। মনে চিরকাল এক সুর বাজে না। আপনজনও চিরকাল এক থাকে না। নূতন সুরের নূতন সমঝদার আসিয়া জোটে—সেই তখন অন্তরতম হয়। পুরাতন আপনজনেরা স্মৃতির ফলকে কখনও বা সামান্য চিহ্ন রাখিয়া, কখনও বা না রাখিয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যায়।

ট্রামের এককোণে বসিয়া শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। ট্রামটা প্রায় খালি—সামনের দিকে আর একজন মাত্র যাত্রী বসিয়া আছেন। শঙ্কর একটা হোটেলে আসিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে সে কতক্ষণই বা থাকিতে পারে। সমস্ত দিনই ট্রামে-বাসে.

কাটিতেছে। মফস্বলের লোক অনেক দিন পরে কলিকাতা আসিয়াছে—বড়লোকের বহু ফরমাস আছে। কোনটা চান্দনীতে পাওয়া যায়, কোনটা বড়বাজারে, কোনটা জানবাজারে, কোনটা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে। চরকির মত ঘুরিতে হইতেছে। এডভোকেট মহাশয়ের সহিতও পরামর্শটা সমাধা হয় নাই। সম্মুখে উপবিষ্ট যাত্রীটি শঙ্করের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিল।

"আরে কে, শঙ্কর না কি। অ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—চিনতেই পারি নি! ভাবছিলুম কে না কে—অ্যাঁ—"

শঙ্করও এতক্ষণ চিনিতে পারে নাই। ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিল। ভনটুর মেজকাকা—ওরফে বাবাজি—ওরফে নৃত্যানন্দ! সেকালের গোঁফদাড়ি কিছুই নাই—সমস্ত কামাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই সহসা চেনা আরও কঠিন।

"অনেক দিন পরে দেখা হ'ল। তারপর ভালো তো সব—"

বাবাজি নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

"চলে যাচ্ছে এক রকম"

"ভনটুর কাছে শুনেছিলাম তুমি দেশে ফিরে গেছ। তা ভালোই করেছ এক রকম। কোলকাতা ভদ্রলোকের বাস করবার অযোগ্য হয়ে পড়ছে ক্রমে। জাপান যদি অ্যাটাক্ করে সকলকেই পালাতে হবে—"

"ভনটুর খবর কি"

"ভনটুর চিঠিপত্র পাও না?"

"গোড়ায় গোড়ায় পেয়েছিলাম দু'একখানা। তারপর আর পাই নি।"

তাহার ঠিকানাটা কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে এমন সময় বাবাজি সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন—"আপিঙ খেলেই মানুষ জব্দ হয়ে যায়—ইন্‌জেকশন নিলে কি আর রক্ষে আছে তার"

"কে ইন্‌জেকশন নেয়?"

"তোমার ভনটু গো—"

"আপিঙের ইন্‌জেকশন? মানে, মর্ফিয়া?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকম কি একটা যেন নাম তার।"

"মর্ফিয়া নেয়! কেন?"

"কেন আবার, নেশা! পায়ের হাড় ভেঙে মেডিকেল কলেজে যখন পড়েছিল তখন সেখানকার ডাক্তাররা ওই ইনজেকশন দিয়ে দিয়ে ওর সর্ব্বনাশটি করে দিয়েছেন। এখন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-বেলা ও-বেলা ইন্‌জেকশন না হলে চলে না—নিজেই পট্ পট্ ছুঁচ ফুটিয়ে নেয়—"

"অত মর্ফিয়া পায় কোথা".

"পায় কোথা—শোন কথা একবার! পায় ডাক্তারদের মারফত। আজকালকার লক্ষ্মীছাড়া ডাক্তারগুলো পয়সা পেলে না করতে পারে হেন কাজ তো নেই। ফী পেলেই প্রেসকৃপশান লিখে দিচ্ছে—"

বাবাজি হাত উল্টাইয়া মুখ-ভঙ্গি করিলেন।

"ঘেন্না ধরে গেছে—বুঝলে—সমস্ত সংসারের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে—"

"ভনটুর ঠিকানাটা কি"

"সে তো এখানে নেই। তার আপিস দিল্লীতে উঠে গেছে। সে এখন দিল্লীতে—"

"বৌদিরা? বৌদিরাও সেখানে না কি"

"ওরা তো বহুকাল হ'ল ভিন্ন হয়ে গেছে—এ খবর জান না বুঝি তুমি—"

"না"

শঙ্কর আর কিছু বলিতে পারিল না।

বাবাজি কিছুক্ষণ বিষণ্ণমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া পকেট হাতড়াইয়া একটা পকেট-বুক বাহির করিলেন। সেটা একবার খুলিয়া কি দেখিয়া আবার সেটা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

"ওদের খবর কতদিন জান না"

"ভনটুর বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম—তারপর আর জানি না—"

"দাদা বেঁচে থাকতে কিছু হয় নি—তারপরই এই কাণ্ড—"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বাবাজি পুনরায় বলিলেন—"ভনটুর বউ বড়লোকের মেয়ে—কাঁহাতক সে আর আঁস্তাকুড়ে হাঁটু গেড়ে বাসন মাজতে পারে বল—"

বাবাজির চোখে যেন একটা বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলিয়া গেল। শঙ্কর যেন বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিল। যে ভনটুকে সে চিনিত সে যে স্ত্রীর পরিশ্রম-লাঘবের জন্য বৌদিদির সহিত মনোমালিন্য করিয়া পৃথক হইয়া যাইতে পারে এ কল্পনাও কোনদিন সে করে নাই।

"বউকে বাসন-মাজা থেকে রেহাই দেবার জন্যে অবশ্য ভনটু আলাদা হয় নি। আলাদা হল একটা তুচ্ছ কারণে, আর তোমার ওই বৌদির জেদে। ভয়ঙ্কর লোক তোমার ওই বৌদিটি। আমি পট্ করে' মাঝ থেকে খামকা জড়িয়ে পড়লাম—"

এমনভাবে শঙ্করের দিকে চাহিলেন যেন শঙ্করই এ জন্য অপরাধী। তাহার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ট্রাম আসিয়া মেডিকেল কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। শঙ্কর প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

"আসল কারণটা তাহলে কি"

"আসল কারণ হল ভনটুর ছেলেটা। ছেলেটা হয়ে উঠেছিল ভয়ানক আদুরে। কারণও ছিল। ভনটু গ্রাহ্য করত না যদিও, কিন্তু ভনটুর স্ত্রীর মনে একটা ক্ষোভ হতই যে তার ছেলের ঠিক যত্ন হচ্ছে না। দুধ পেত না, খাবার পেত না, খেলনা পেত না, ভাল পোষাক পেত না—দিতে হলে সব ছেলেকেই দিতে হয়—পয়সায় কুলোত না ভনটুর। এ সমস্তর অভাব ভনটুর স্ত্রী পূরণ করত আদর দিয়ে দিয়ে। ভনটুর বৌদি ছেলেটাকে সমীহ করত। ভয়ানক আদুরে করে তুলেছিল ছেলেটাকে। যা হাতের কাছে পেত ভাঙত—বই পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত—কেউ কিছু বলত না। হাতে কাঁচি পেলে তো রক্ষেই নেই, যা পাবে কেটে ফেলবে। ভনটুর বই খাতা কাগজ-পত্তর এমন কি ভনটুর একটা দামী স্যুট পর্য্যন্ত কাঁচি চালিয়ে দিলে একদিন সাবড়ে। দুপুরে সবাই ঘুমুত, ভনটু আপিসে, বড় ছেলে দুটো স্কুলে, কর্ত্তা সেই অবসরে সব জিনিস নষ্ট করতেন বসে বসে। রাগলে ভনটুর চেহারা কি রকম হয়, তা নিশ্চয় তোমার অজানা নেই। আপিস থেকে ফিরে এসে রোজ সে অনর্থ করত! অথচ আসল অপরাধীর নাম বলতে কারও সাহস হত না—ভনটুর স্ত্রীর তো হতই না, তোমার বৌদিরও হত না, ছেলেগুলোও ভয়ে চুপ করে' থাকত। কারণ নাম বললেই ভনটু নির্দ্দয় ঠেঙাবে—"

বাবাজি চুপ করিলেন।

"তার পর?"

"ভন্টু কিন্তু ঠেঙানো বন্ধ করলে না। সে ভুল করে' মনে করত যে তার ভাইপোরাই বোধহয় এ সব করছে। তারা যত বলত আমরা করি নি—তত তার রাগ চড়ে যেত—মনে হত ওরা মিছে কথা বলছে। তার নিজের ওইটুকু ছেলে যে কাঁচি চালাতে পারে এ সন্দেহও তার মনে হত না। তার এ ভুল ভাঙিয়েও কেউ দিত না—এইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য্য। ভাইপো তিনটে রোজ মার খেয়ে মরত—তবু সত্যি কথাটা বলত না। না ভুল করছি—একদিন একজন বোধ হয় বলেছিল—কিন্তু সে আরও বেশী মার খেয়ে ম'ল—ভন্টু বিশ্বাসই করলে না তার কথা। ভন্টুর মার যে কি মার তা'তো জানই। মারতে মারতে বেত ফেটে ছ্যাতরা ছ্যাতরা হয়ে যেত! শেষকালে তোমার বৌদি একদিন এক কাণ্ড করে' বসল। একটা খোলার বাড়ী দেখে সেইখানে একদিন উঠে গেল দুপুরে—ভন্টু তখন আপিসে—"

বাবাজি পুনরায় নীরব হইলেন।

"তার পর?"

"তারপর আর কি। সেই থেকেই ভিন্ন। ভন্টু অনেক সাধ্য-সাধনা করলে—কিন্তু বৌদি আর কিছুতেই ফিরল না। কেন আলাদা হয়ে গেল তাও ঘূণাক্ষরে বললে না—মানে সত্যি কথাটা বললে না—শুধু বললে তোমার সংসার বেশী ঝামেলা সহ্য হয় না তাই সরে' এসেছি—"

"ভন্টুর দাদা ফিরে এসেছিলেন বুঝি—"

"হ্যাঁ অনেক দিন। সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে বেশ মুটিয়ে ফিরেছে। চাকরি করছে আবার"

"তারপর?"

"তারপর আর কি। কিছুদিন পরেই ভন্টু দিল্লীতে বদলি হয়ে গেল। ওরাও কোলকাতার খরচ চালাতে না পেরে নৈহাটিতে গিয়ে বাসা বাঁধল। সেখানেই এখন আছে। আমি মাঝ থেকে কেবল বিপদে পড়ে গেছি"

"আপনার কি হল"

"জড়িয়ে পড়েছি। ঠাকুরের আদেশ অমান্য তো করতে পারি না—"

"ঠাকুরের আদেশ মানে? বুকুদ্যো বলাইয়ের?"

বাবাজি বিস্মিত হইলেন।

"ঠাকুরকে তুমি চিনলে কি করে?"

"আমার শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল যে—সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও আলাপ। চমৎকার লোক। ও রকম পরোপকারী লোক আমি আর দেখি নি—"

"ওই! ওই পরোপকারের ঠেলাতে আমিও অথৈ জলে পড়েছি—"

"কি রকম?"

"গুজরাটে গেলাম প্রভাস তীর্থ করতে। মন বসল না। ফিরে এলাম। এসে শুনলাম ওরা সব নৈহাটিতে। কর্ত্তব্যের খাতিরেই গেলাম একদিন দেখা করতে। সেখানে গিয়ে দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার রৈ-রৈ কাণ্ড। ফন্তির হয়েছে টাইফয়েড, আর ঠাকুর সেখানে রয়েছেন। আমি তো অবাক! শুনলাম বিষ্ণুচরণের সঙ্গে ওঁর পুরীতে আলাপ হয়েছিল না কি। দেখলামও খুবই স্নেহ করেন বিষ্ণুচরণকে। ফন্তির চিকিৎসা উনিই চালাচ্ছেন। বড় ডাক্তার আসছে, বরফ, লেবু, আঙুর—সমস্ত ওঁরই খরচে। এত টাকা যে উনি কোথা থেকে পান ভগবানই জানেন। আমি প্রণাম করতেই বললেন—আরে তুমি কোথা থেকে এখানে! আমি যে বিষ্ণুচরণের কাকা—এ খবর ঠাকুর জানতেন না। শুনে খুব খুশি হলেন—বললেন বাঃ, বেশ ভালই হল—এখন কি করছ তুমি। বললাম প্রভাস তীর্থটা সেরে এলাম। বললেন—তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে আর কি হবে—তুমি এদের কাছেই থাকো। আমি তো শুনে অবাক! এদের কাছে থাকব! কিন্তু ঠাকুরের মুখের ওপর কিছু বলতে ভরসা করলাম না। হাত পেতে ফন্তির সেবায় লেগে পড়তে হল। কি করি, ঠাকুর নিজে হাত লাগাচ্ছেন—আমি কি করে ঘুমোই। একদিন ঠাকুরকে আড়ালে পেয়ে বললাম—ঠাকুর, নাম-জপ করে' মন ভরছে না, আমাকে একটা মন্ত্র দিন আপনি। ঠাকুর হেসে ফেললেন, বললেন—পাগল নাকি! আমি কি মন্ত্র দেব তোমাকে। আমি জোর করে' চেপে ধরতে বললেন—আচ্ছা, আমি যা বলব তা সত্যি সত্যি করবে? আমি বললাম, নিশ্চয়। ঠাকুর কি বললেন শুনবে?"

বাবাজির চক্ষু দুইটি যেন অক্ষি-কোটর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

"কি বললেন?"

"তুমি বিষ্ণুচরণদের সেবার ভার নাও! এরা বড় দুঃস্থ হয়ে পড়েছে। এদের সেবা করলে তোমার পুণ্য হবে। কর্ম্মযোগও মুক্তি-লাভের একটা শ্রেষ্ঠ পথ। তুমি কায়মনোবাক্যে এদের সেবা কর দিকি—আনন্দ পাবে, মুক্তিও পাবে। কোন মন্ত্রের দরকার নেই। বিশ বাঁও জলে পড়ে গেলুম—বুঝলে। বললাম, আপনি যা বলছেন তা করতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখন এদের এই দুরবস্থা, বিষ্ণুচরণের আর বংসানাস্ত—এর ওপর আমার নিজের ভার ওদের কাঁধে চাপালে ওরা সেটা ঠিক সেবার স্পিরিটে নেবে কি। আমার নিজের যা বিষয় আশয় ছিল তা' তো সব ফুটকড়াই হয়ে গেছে। ভন্টুকে দিতে চেয়েছিলাম সে নেয়নি—বন্ধুর গর্ভেই গেল শেষকালে সব। ঠাকুর বললেন—না, গলগ্রহ হতে বলছি না। ওদের সাহায্য করতে বলছি। তোমাকে রোজকার করতে হবে। যা রোজকার করবে—সব এনে বউমার হাতে দেবে। চাও তো এক্ষুণি তোমার একটা চাকরির জোগাড় করে দিতে পারি। আমার চেনা একজন রেশমের কারবারী বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আমার আর কিছু বলবার উপায় রইল না। কিছুদিন পরে সত্যিই ঠাকুর চাকরিটি জুটিয়ে দিলেন এবং তার কিছুদিন পরে ফন্তি যে-ই একটু সেরে উঠল অমনি অন্তর্ধান করলেন—তাঁর যা চিরকালকার স্বভাব—"

"তারপর?"

"তারপর আর কি, সেই চাকরি করছি। নৈহাটি থেকে রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি। কিন্তু ব্যাপারটা বোঝ একবার—"

বাবাজির চোখের দৃষ্টিতে পুনরায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

শঙ্কর বুঝিল বাবাজি সেবাটা কায়মনোবাক্যে হয়তো করিতেছেন, কিন্তু সে বিষয়ে নির্ব্বিকার নন।

"ভন্টু কিছু সাহায্য করে না ?"

"আগে আগে করত কিছু কিছু। এখন আর পারে না। পারবে কি করে? একে দিল্লীর ভীষণ খরচ—তার ওপর ওই ইন্‌জেকশন্‌ কিনতে হচ্ছে অগ্নিমূল্যে"

"ইন্‌জেকশন্‌ রোজ নেয় ?"

"রোজ দু'বেলা। রেশমের ক্যানভাসিং করতে যাবে আমি একবার দিল্লী গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি তার বউ বেশ ছিমছাম করে'—মানে নিজের মনের মত করে' সংসারটি গুছিয়ে নিয়েছে। ছেলের ট্রাই-সাইকেল, সাটিনের ঘরে দোলা, রেডিও কিনেছে একটা—"

"আর ভন্টু ?"

"ভন্টু উঁচুমানে চাকরি করছে। সন্ধের পর আপিস থেকে ফিরে ইন্‌জেকশন্‌ নেয়—আর হাতে বসে বসে' বেড়ে গলায় গান গায়। আর মাঝে মাঝে হা হা করে হাসে—মর্মান্তিক সে হাসি, বুঝলে—"

"কি গান গায় ?"

"নিজে তৈরি করেছে গান সে। টুকে এনেছি আমি—দেখবে ?" বাবাজি পকেট হইতে পকেট-বুকটি বাহির করিলেন এবং একটি পাতা খুলিয়া শঙ্করকে দিলেন।

শঙ্কর পড়িল।

সাহকাসদকি করতে করতে চিনি দিল্লী চলাম পার
নৈচাচিতে বারাসিবে যেমন ডাকছে বিড্‌ডিকার
খুকখুক, খুকখুক, খুকখুক—
ঘটিকা খেলায় আটকে গিয়ে পড়লাম বিষম প্যাঁচায়
চুনোপুঁটি খোকিং হুকা তিমি মাছের আড্ডায়
খুকখুক, খুকখুক, খুকখুক—

"দাও, এবার আমাকে নাবতে হবে—এই মোড়কে—"

ট্রাম থামিল। পকেট বুক লইয়া বাবাজি নামিয়া গেলেন। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এতক্ষণ সে যেন তন্ময় হইয়া একটা উপন্যাস-পাঠ করিতেছিল। ট্রামে অনেক যাত্রী উঠিয়াছে সে লক্ষ্যই করে নাই। তাহার যেখানে নামিবার কথা সে স্থান বহুক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে। এডভোকেট ভদ্রলোক আবার বাহির হইয়া না যান। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্যা এখন ভন্টু নয়—তাহার সমস্যা এখন উকীল এবং টাকা। অনেক জিনিসও কিনিতে বাকী আছে। সহসা মনে পড়িল কুমোরটুলিতেও একবার যাইতে হইবে।

চলন্ত ট্রাম হইতে সে লাফাইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন এম্‌-এসসি

অধুনা যে কোন সভ্য দেশে খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যার স্থান সকল সমস্যার ঊর্ধ্বে। শান্তিতে কি সংগ্রামে, এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান উদ্ভাবনে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব সকল দেশেই স্বীকৃত। বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট যে এই দায়িত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি এদেশে বিদেশে অনেকের মনেই ঘোরতর সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। শান্তির সময় এই সমস্যার স্বরূপ অনেকের দৃষ্টি এড়াইয়া গেলেও, আজ এই পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে ঘনীভূত খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যার উলঙ্গ রূপ কাহারও দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। তাই শান্তির সময় যে প্রশ্ন সাধারণতঃ চাপা পড়িয়া থাকে, আজ তাহাই প্রবল হইয়া জনসাধারণের চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। সে প্রশ্ন, যে দায়িত্বের উপর পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নরনারীর স্বাস্থ্য ও সুখ নির্ভর করে, তাহা যথার্থ যোগ্যতার সহিত প্রতিপালন করিতে বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট সক্ষম হইয়াছে কিনা।

যুদ্ধ আজ দেশ হইতে দেশান্তরে, রাজ্য হইতে সাম্রাজ্যে, সমুদ্র হইতে মহাসমুদ্রে বহ্নির ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়া পৃথিবীকে অস্থির ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। অধিকৃত ইউরোপ ও চীন এবং অনধিকৃত পৃথিবীর বহু স্থান হইতে অভাব, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর সংবাদে চিত্তের কোমল বৃত্তিগুলি প্রায় কুলিশ কঠিন হইতে চলিল। এই বিপুল অনাস্বাদিত যুদ্ধ সংঘাতে মূক জনসাধারণের চিত্তে আজ শুধু এই প্রশ্নই জাগিতেছে, এ যুদ্ধ কিসের জন্য? লক্ষ লক্ষ নরনারীর অপূর্ব আত্মাহুতিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই যে সমুদ্র মন্থন চলিয়াছে, ইহার শেষে কি সত্যই অমৃতের সন্ধান মিলিবে না গরল উঠিয়া মানবের জগৎকে পুনর্ব্বার বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। আর যদি দুই-ই উঠে, কোন দেবগণের জন্য অমৃত লুটিয়া কোটি কোটি পৃথিবীর অধিবাসীকে বঞ্চিত রাখিবে? রাষ্ট্র ধুরন্ধরদিগের মোহবাক্য আজ আর অবিশ্বাসকের কার্য্য করিতে পারিতেছে না। ইহা আজ সর্ব্বজনবিদিত যে রাজনীতিবিদ্‌ ও রাষ্ট্রনায়কেরা মারণ যুদ্ধে নিজেদের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া পৃথিবীব্যাপী কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করিতে পারে বটে, কিন্তু শান্তিপ্রিয় সাধারণ ব্যক্তিকেই অস্ত্র ধরিয়া অস্ত্রের সম্মুখীন হইতে হয়।

কিন্তু যে রাষ্ট্র যে জাতি বা যে দেশের সংহতি রক্ষা করিতে গিয়া অগণিত লোক মৃত্যু পণ করিতেছে, তাহাদের উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজন মিটাইতে রাষ্ট্রনায়কগণ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন? আমাদের দেশের কথা আপাততঃ তুলিব না; কারণ ইহার সমস্যার স্বরূপই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বড়র দিক হইতেই আরম্ভ করা যাক্‌। শুনিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ডের গড়পড়তা ঐশ্বর্য্য পৃথিবীর যে কোন দেশের অপেক্ষা বেশী;* কিন্তু সেই দেশেও খাদ্য-বিলি ব্যবস্থায় এতই নাকি গণ্ডগোল যে জন সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক উপযুক্ত পুষ্টির অভাব ভোগ করিয়া থাকে। তারপর সহস্র সহস্র লোকের বাসস্থানে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা একেবারে নাই বলিলেই চলে। খাদ্যের সুব্যবস্থা যেখানে আছে, অনুসন্ধান লইলে দেখা যাইবে, পুষ্টির দিক দিয়া সে খাদ্য তালিকা হয়ত মোটেই সন্তোষজনক নহে। উদরপূর্ণ খাওয়া দাওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্যের অধোগতি প্রতিরোধ করা যাইতেছে না এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সম্প্রতি পূর্ব্ব ইউরোপের বহুস্থানে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্য্য ও ফল, সব্জী ও প্রাণী-ঘটিত খাদ্যের অভাবে বহু সংখ্যক লোক উপযুক্ত পুষ্টি লাভে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পুষ্টির দিক হইতে খাদ্য নির্ব্বাচনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকারী

---

* Even in a wealthy country like England, where the average wealth is more than in the rest of the world, there is such maldistribution of food that one third of the total population is malnourished—Editorial article: Science and culture: January, 1943.

মহলের বড় কর্তারা যে এতদিন অবহিত হন নাই তাহার আরও প্রমাণ আছে। ইংলণ্ডে বহু কমিটি ও এসোসিয়েশন পুষ্টি সমস্যা লইয়া স্বাধীনভাবে কিছু কিছু কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের কার্য্যকে সম্বদ্ধ করিয়া কোন একটী বিশেষ নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির মধ্য দিয়া সমগ্রভাবে পুষ্টি সমস্যার সমাধানকল্পে কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান না থাকায় এই সকল চেষ্টা ফলবতী হইবার সুযোগ পায় নাই। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সুযোগ না থাকায়, কর্তৃপক্ষগণ মাঝে মাঝে গ্রহণ করিয়া নিজেদের দোষ ত্রুটী স্খালন করিবার সুবিধা পাইয়া গিয়াছেন। বৃটিশ সাপ্তাহিক, Chemical Age, ৩১শে অক্টোবর (১৯৪২) সংখ্যার সম্পাদকীয় সন্দর্ভে এই সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

"Whenever circumstances have made it desirable that the nation should change its food habits, it has always seemed possible for authorities to find a so-called expert who is prepared to announce that the food we have been eating is not really well suited to us, but that another food which happens to be plentiful and which previously has been despised is really very much better. The pronouncements of such "food experts", particularly during the early part of the war, have sometimes appeared to be sadly contradictory." অর্থাৎ,

"অবস্থাভেদে জাতির খাদ্যতালিকা পরিবর্ত্তনের যখনই প্রয়োজন ঘটিয়াছে তখনই কর্তৃপক্ষদিগের হাতের কাছে এমন একজন তথাকথিত খাদ্যবিশারদকে পাইতে কষ্ট হয় নাই যিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া বলিতে প্রস্তুত, আমরা এতদিন ধরিয়া যে খাদ্য আহার করিতেছিলাম পুষ্টির দিক দিয়া তাহা আশানুরূপ নহে; বরং যে খাদ্যটীকে আমরা একদা অবহেলা করিয়াছিলাম এবং প্রচুর পরিমাণে যাহা পাওয়াও যায়, প্রকৃতপক্ষে সেই খাদ্যটীই হইতেছে পুষ্টির দিক হইতে অধিকতর সন্তোষজনক। বলা বাহুল্য, এই সকল তথাকথিত খাদ্যবিশারদদিগের অভিমত, বিশেষ করিয়া যুদ্ধের প্রথমভাগে, একান্ত ভাবে পরস্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হইত।"

উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যব্যবস্থা অবলম্বনে এইরূপ শৈথিল্য ও উদাসীনতা প্রদর্শন যদি ইংলণ্ডের ন্যায় দেশের গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে এই সমস্যার স্বরূপ অন্যদেশে যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় এ সমস্যা এতদূর উগ্র নহে এবং আমরা যতদূর সংবাদ রাখি, এই ব্যাপারে উক্ত দেশদ্বয়ের কর্তৃপক্ষ অধিকতর তৎপর ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কথা হইল, এইরূপ উদাসীনতারই বা কারণ কি? রাষ্ট্রনায়কগণ সত্য সত্যই যে এ সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করিতে অক্ষম ইহাও বিশ্বাস করা সুকঠিন। তবে এ রোগের আসল মূল কোথায়?

সম্প্রতি এবার্ডিনস্থ রোয়েট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের (Rowett Research Institute, Aberdeen) ডিরেক্টর স্যার জন্‌ অর তাঁহার "Fighting For What?" নামক পুস্তকে এই প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্যার জন খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিঘটিত ব্যাপারে ইংলণ্ডের একজন বিশেষজ্ঞ। এই ব্যাপারে তাঁহার ন্যায় একজন বৈজ্ঞানিকের মতের গুরুত্ব স্বভাবতঃই অনেক বেশী এবং সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি আধুনিক 'potential plenty' মতবাদের উল্লেখ করিয়া বলেন, অর্থনীতিবিশারদদিগের অভিমত—আমরা নাকি প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করিতেছি। পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীর প্রত্যেকের পক্ষে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে সকল পার্থিব দ্রব্য অপরিহার্য্য বিজ্ঞান ও মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির কল্যাণে আজ আমরা তাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করিতে সক্ষম। অথচ পৃথিবী হইতে দারিদ্র্য কিছু পরিমাণে কমিয়াছে এইরূপ সুসংবাদ আমরা সহসা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। অন্য দেশের কথা সঠিক বলিতে না পারিলেও ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি দুর্ভাগার অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় ছয়ের একভাগ অধিবাসীর কথা বলিতে পারি। তাহাদের কপালে গড়পড়তা বাৎসরিক আয় সেই ৬০, টাকাতেই থাকিয়া গিয়াছে এবং উপযুক্ত পুষ্টি, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাবে প্রত্যেকে ২০ বৎসরের অধিক বাঁচিবার আশা দুরাশা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ইহা অদৃষ্টের পরিহাস নহে। দৈবক্রমে একবার আমেরিকা কিংবা ইংলণ্ডের অধিবাসী হইতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু সেই আয় বাড়িয়া সহস্রের উপর দাঁড়াইত এবং পুরা ষাট বৎসর পার্থিব জীবনের রস নিংড়াইয়া উপভোগ করিবার সহজ আশা পোষণ করিতে পারিতাম। এইদিকে নিষ্ঠুর দুঃসংবাদ নিত্যই শুনিতেছি; পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ উপবাসী অধিবাসীর চোখের সম্মুখে ইংলণ্ডের নদীতে দুধ ঢালিয়া নষ্ট করা হইতেছে, আমেরিকায় শস্য পুড়াইয়া ছাই করা হইতেছে এবং কোটী কোটী কমলা লেবু ইংলণ্ড ও স্পেনের মধ্যবর্ত্তী দরিয়ায় নিক্ষিপ্ত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে শুনা যাইবে, উহার বা পাটের মূল্য রক্ষা করিতে যাইয়াই নাকি এইরূপ সর্ব্বনাশা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে; অন্যথা রাষ্ট্রের ও জাতির প্রভূত ক্ষতি ঠেকান যাইত না।

স্যার জনের মতে একচেটিয়া ধনতন্ত্রবাদকে প্রশ্রয় দিবার ফলেই সর্ব্বনাশের পথ আজ এইরূপভাবে প্রশস্ত হইতে পারিয়াছে। বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট বৃহত্তর জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব ভুলিয়া বড় বড় ব্যবসাদার ও ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকেই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছে অথবা স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপ একটী অন্যায় ও অযৌক্তিক নীতির উপর গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি স্থাপিত হওয়ায় দেশের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে যেটিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জটিল ও প্রায় একরূপ সমাধানের অতীত করিয়া তুলিয়াছে তাহা হইল এই খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যা। স্যার জন লিখিয়াছেন:

"The defects of the system were most glaring in the case of food. While many millions of people in the world did not have sufficient food for their needs an International wheat committee devised measures to reduce the production of wheat. These measures were approved by Governments. They were approved by the British Government at a time when in India and in other parts of the Empire, people for whose welfare the Government was responsible were suffering from lack of food. In Great Britain the object of the Agricultural Marketing Boards was to limit production plus imports to what could be sold at a profit. The intention was to adjust supply to the economic demand, even though it was well known that millions of the population were suffering in health from the lack of the foods which these measures prevented being produced or imported in greater amounts." অর্থাৎ,

"যে ব্যবস্থা এতদিন চলিয়া আসিতেছে তাহার ত্রুটীগুলি খাদ্যের ব্যাপারে বিশেষভাবে ধরা পড়ে। পৃথিবীর বহু লক্ষ লোকের তাদের প্রয়োজনের অনুরূপ যথেষ্ট খাদ্যের অভাব, এদিকে ইন্টারন্যাশনাল হুইট কমিটি গম উৎপাদন কমাইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বসিয়া আছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন ক্রমেই হইয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট নিজেই এইরূপ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ভারতবর্ষ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের লোকেরা অন্নাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। অথচ এই সকল দেশের অধিবাসীর কল্যাণ বিধানের (এবং তাহা নিশ্চয়ই খাদ্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্পাদন করিয়া) দায়িত্ব নাকি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত। এমন কি গ্রেট বৃটেনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বোর্ডের উদ্দেশ্য হইল—দেশের উৎপাদন ও আমদানী এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করা

যাহাতে যথেষ্ট লাভের অবকাশ থাকে। এইরূপ নীতি বলবৎ থাকায় যে ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইবে তাহাতে অধিক উৎপাদন বা অধিক আমদানীর পথ যে একরূপ বন্ধ তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ খাদ্যের অভাবেই লক্ষ লক্ষ লোক স্বাস্থ্যরক্ষায় ক্রমশঃই অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে।"

যাহা হউক এই সকল সমালোচনার ইতিমধ্যেই কিছু কিছু সুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংলণ্ডে নিউট্রিশ্যন কাউন্সিল জাতীয় কোন একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে স্থাপন করিবার সপক্ষে জনমত গঠিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত নিউট্রিশ্যন কাউন্সিলের স্বরূপ কি হইবে তাহা লইয়া অবশ্য এখনও প্রচুর তর্কের অবকাশ রহিয়াছে। অনেকের মতে এইরূপ কাউন্সিল মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়াই অধিকতর অভিপ্রেত। অনেকে আবার মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের অধীনে নিউট্রিশ্যন কাউন্সিল পরিচালিত দেখিবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নিউট্রিশ্যন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত দেখিবার পক্ষপাতী। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যার সুচিন্তিত সমাধান উদ্ভাবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজনীয় হইলেও যে অপরিহার্য্য নহে, ইহাই হইল তাঁহাদের যুক্তি। তারপর পুষ্টি সমস্যার বৈজ্ঞানিক দিক সম্বন্ধে যাঁহারা আমাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়াছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা ছিলেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের লোক। বস্তুতঃ পুষ্টি বিজ্ঞান (Science of Nutrition) বহুতর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদিগের সম্মিলিত গবেষণার ফল। সুতরাং নিউট্রিশ্যন কাউন্সিলের স্বরূপ যেরূপই হউক, ইহাতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সম্মিলিত চেষ্টার যথেষ্ট সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক। স্যর জন ওর ইংলণ্ডে একটি ন্যাশন্যাল ফুড বোর্ড (National Food Board) সংস্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ বোর্ডের কাজ হইবে, দেশের সমগ্র লোকের খাদ্যের একটি সঠিক হিসাব রচনা করিয়া তদনুযায়ী খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং খাদ্যের মূল্য এইরূপভাবে বাঁধিয়া দেওয়া যাহাতে ইংলণ্ডের প্রত্যেকটি পরিবার তাহা কিনিয়া খাইতে পারে। তিনি এইরূপ আরও অনেক সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়াছেন। তবে কার্য্যক্ষেত্রে এই সকল পরামর্শ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহাই হইল ভাবিবার কথা।

আপাতঃদৃষ্টিতে খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যা দেশ বা জাতিবিশেষের সমস্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহা ভুলিলে চলিবে না যে এই সমস্যার একটি আন্তর্জাতিক দিকও রহিয়াছে। প্রথমতঃ এই সমস্যার বৈজ্ঞানিক দিক লইয়া যে সকল গবেষণা অত্যাবশ্যক তাহা কোন বিশিষ্ট দেশের ভৌগলিক সংস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। বিভিন্ন দেশের পুষ্টি বিজ্ঞান লেবরেটরিতে মানবদেহের পুষ্টি ও খাদ্য দ্রব্যাদির খাদ্য মূল্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন সেই বিষয়ে প্রত্যেক দেশের কর্তৃপক্ষ যাহাতে অবহিত থাকিতে পারেন তজ্জন্য একটি উপযুক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। তারপর পৃথিবীর সকল স্থানের খাদ্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা সমান নহে; সুতরাং বিভিন্ন দেশের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যাদির আদান প্রদানের ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। কিন্তু এই আদানপ্রদানের ব্যাপারে লোভী ও স্বার্থপর ব্যবসায়ীর খাদ্যদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিবিধানকল্পে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ভার্জিনিয়ার নিকটবর্ত্তী উষ্ণ প্রস্রবণে (Hot Springs) মিলিত জাতিদিগের যে অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতে খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যার এই আন্তর্জাতিক স্বরূপ স্বীকার করা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থায় যাহাতে ঐক্য ও সমতা রক্ষা সম্ভব হয় এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি অধিবাসী যাহাতে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় তাহার সম্ভাব্যতা আলোচনা করিবার জন্যই উক্ত অধিবেশন পরিকল্পিত হইয়াছিল। ৩৮টি দেশের প্রতিনিধি ইহাতে যোগ দান করে। আমাদের নিকট এই জাতীয় অধিবেশন ও বৈঠকের মূল্য খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না। তাহার উপর, উক্ত অধিবেশনে আলোচনা ব্যতীত ভবিষ্যৎ কর্ম্ম পদ্ধতির কোন খসড়াও রচিত হয় নাই। যুদ্ধ একবার শেষ হইলে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য যে অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার স্তোকবাক্য রাষ্ট্রধুরন্ধরদিগের মুখে ত আমরা কতবার শুনিলাম। সুতরাং এই সকল বিজ্ঞ আলোচনার সাময়িকভাবে কিছু প্রভাব থাকিলেও মানবের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে আশান্বিত হইবার নিশ্চয়তা কোথায়?

তাহার পর আরও একটি কথা আছে। এই যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা লইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভুরা মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া পড়েন, তাহাতে এশিয়া ও আফ্রিকার হতভাগ্য অধিবাসীদিগের সত্যই কি কোন স্থান আছে? ভবিষ্যতে খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থায় যাহাই স্থিরীকৃত হউক, এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসিদিগের খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যার সুব্যবস্থা না হইলে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত দেখিবার আশা দুরাশা মাত্র। শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যেও অনেকে এই আশঙ্কা সম্বন্ধে সম্প্রতি সচেতন হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। উপরিউক্ত Chemical Age-এর সম্পাদকীয় সন্দর্ভে অবশেষে স্বীকার করা হইয়াছে :

"The problem is important because food is the first necessity of life and there can be no security for an enduring peace so long as large masses of people are condemned to live on the verge of starvation."

দুর্ভিক্ষপীড়িত মুমূর্ষু জাতির নিকট ভবিষ্যতের আশা নিরর্থক। তথাপি আশার বিরুদ্ধে আশা করাই মানুষের চিরন্তন স্বভাব। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মানুষের শুভবুদ্ধি সত্যসত্যই জাগ্রত হউক।

চিরন্তনী

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ

বিবর্ত্তনের নিত্য নূতন
ছন্দের মাঝে,
চোখের পলকে বহু-বিধ
হ'তেছে হারা।
অনাদি স্রোতের ঢেউয়ের মাথায়
'খণ্ড-প্রবাহ ভাসিয়া বেড়ায়,
পশ্চাতে তাদের উছলি' উঠে
যৌবন-ধ্বনি—
দিয়ে তাদের চির-প্রসাদ
চিরন্তনী।

বর্ত্তমানের লীলা-চঞ্চল
গতির বেগে,
বিশ্ব-প্রকৃতি অধীর আবেগে
উঠিছে জেগে;
অতীত কালের ছবির কোঠায়
মুহূর্ত্তে তারা কোথা চ'লে যায়,
অনন্ত স্রোতে রচে শুধু তারা
ক্ষণিক স্মৃতি—
তাদের বেড়িয়া করিছে নৃত্য
সে শাশ্বতী।

যুগ যুগ ধরি' যতগুলি দীপ
হ'য়েছে আলা,
চিরন্তনীর গলায় দুলিছে
তাহারি মালা;
ভবিষ্যতের অসীম প্রসার—
শাশ্বতী জানে কোথায় কি তার,
সর্ব্বকালের কারণ' বিহীন
অভেদ ত্রুটি,
তাহারি মাঝারে শাশ্বত-রূপ
উঠিছে ফুটি।

ভক্তিরস

শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

প্রাচীন আলংকারিকগণ ভক্তির রসতা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু বোপদেবকৃত মুক্তাফলের একাদশ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে হাস্য, শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, অদ্ভুত ও বীররূপে ভক্তিরসই অনুভূত হয়, যথা, 'ব্যাসাদিভির্বর্ণিতস্য বিষ্ণোর্বিষ্ণুভক্তানাং বা চরিত্রস্য নবরসাত্মকস্য শ্রবণাদিনা জনিতশ্চমৎকারো ভক্তিরসঃ।' ১১।২,

মহকবি ব্যাস প্রভৃতি দ্বারা বর্ণিত বিষ্ণু বা বিষ্ণুভক্তগণের (গোপী প্রভৃতির) নবরসাত্মক চরিত্রের শ্রবণ, কীর্তন, দর্শন, স্মরণ ও অভিনয় দ্বারা জনিত চমৎকার যে চিত্তের ভাব প্রকাশিত হয়, উহাই ভক্তিরস। উহা সৎ সামাজিক বা রসিকগণ আস্বাদন করেন। এখানে বোপদেব স্পষ্টই 'ভক্তিরস' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীপাদ হেমাদ্রি মুক্তাফল গ্রন্থের কৈবল্য দীপিকা টীকা প্রণয়ন করেন। উহাতে ভক্তিরস সম্বন্ধে বিশেষ বিচার দৃষ্ট হয়। ইনি ত্রয়োদশ খৃষ্ট শতাব্দীর লোক। দেবগিরি বা আধুনিক কালের দৌলতাবাদের যাদববংশীয় রাজা মহাদেবের তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনিই বোপদেব দ্বারা মুক্তাফল গ্রন্থ প্রণয়ন করান। মুক্তাফলের শেষে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,

হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ। ১৯।৫৫,

মুক্তাফল শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রকরণ গ্রন্থ। উহার লক্ষণ এইরূপ,

'শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্যান্তরে স্থিতম্
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ।'

কোন একটী প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের বিষয় বিশেষ প্রতিপাদক ও প্রধান শাস্ত্রের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাই যে গ্রন্থ দ্বারা সাধিত হয় তাহাকে পণ্ডিতগণ প্রকরণ বলেন অর্থাৎ কোন একটী বৃহৎ শাস্ত্রে যে সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই সকলের কোন কোন বিশিষ্ট অংশ লইয়া সহজে ও সংক্ষেপে প্রতিপাদনার্থ যে গ্রন্থ বিরচিত হয় তাহাই প্রকরণ। (Monograph). এখানে মুক্তাফলের উপজীব্য গ্রন্থ শ্রীভাগবত। হেমাদ্রির পাণ্ডিত্যপ্রতিভা সুধীসমাজে অবিদিত নহে। চতুর্বর্গচিন্তামণি তাঁহার অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। দাক্ষিণাত্যে এই স্মৃতি গ্রন্থের বিশেষ প্রচলন আছে। যাহা হউক হেমাদ্রির পূর্বে ভক্তিরস সম্বন্ধে বোধহয় কেহ এতাদৃশ গবেষণা করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রবর শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী স্বীয় ভাগবতসন্দর্ভের বহুস্থানে মুক্তাফল টীকার উল্লেখ করিয়া প্রমাণরূপে উহা গ্রহণ করিয়াছেন। কৈবল্য-দীপিকায় উক্ত আছে, সৈব সদ্যঃ প্রকর্ষেণাস্বাদ্যমানা রসঃ। যথাহুঃ ভাবা এবাতিসম্পন্নাঃ প্রযান্তি রসতামিতি। ভক্তিরসানুভবাদ্ভক্তঃ। যথা তৃপ্ত্যনুভবাৎ তৃপ্ত ইত্যুচ্যতে। ১১।২

সেই ভক্তিই চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া রস নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ ভক্তি বা স্থায়ীভাব ভগবৎপ্রতিই বিভাবাদি সামগ্রীদ্বারা পুষ্ট হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। সেইজন্য বলা হয় যে স্থায়ীভাবসকল শ্রোতার লাভ করিয়া রসতা প্রাপ্ত হয়। ভক্তিরস অনুভূত হয় বলিয়াই ভক্ত শব্দে অভিহিত হয়, যেমন তৃপ্তি অনুভব করিলে লোকে বলিয়া থাকে ইনি তৃপ্ত। অতএব হাস্য প্রভৃতি স্থায়ীভাবসকল ভগবানে প্রযুক্ত হইলে ভক্তিরসপদবী প্রাপ্ত হয় কারণ শ্রীভাগবতে উক্ত আছে, যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে। ভক্তিরসের সামগ্রী (কারণ সমষ্টি) টীকায় এইরূপ প্রদত্ত আছে—যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশই স্থায়ীভাব, এখানে 'নিবেশয়েৎ' এই বাক্যে কোন বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে না। ইহা সম্মতি মাত্র। কাম ক্রোধাদি ভাব মানুষের স্বাভাবিক। যে বিষয়ে মানুষের আদৌ প্রবৃত্তি নাই তাহাতে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বিধি। ভট্টপাদ বলেন, 'বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ'। চরিত্রশ্রবণাদি উদ্দীপন বিভাব অর্থাৎ ইহা দ্বারা স্থায়ীভাব উদ্দীপিত হয়। বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তগণ আলম্বন বিভাব অর্থাৎ তাঁহাদের আশ্রয় করিয়াই রস সম্ভব হয় বা তাঁহারাই রসের আশ্রয় ও বিষয়। অশ্রুাদি অনুভাব বা রসের কার্য্য। ধৃতি প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব উহার। স্থায়ীভাবের অভিমুখে বিশেষভাবে সঞ্চরণ করিয়া উহাকে পুষ্ট করে, কিন্তু সমুদ্রের বক্ষে তরঙ্গের মত উত্থিত হইয়া বিলীন হয়। 'অভিনবগুপ্তহেমচন্দ্রাদ্যৈর্ভক্তাবপি ভাবত্বমুক্তং তদসৎ, রসত্বস্থাপিতত্বাৎ। সামগ্রীসদ্ভাবেঽপি প্রত্যাখ্যানমরোচকতামাত্র-শরণং'।' শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্য ভরতমুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ে শান্তরস বিচারপ্রসঙ্গে অভিনব ভারতী টীকায় বলেন, 'এবং ভক্তাবপি বাচ্যমিতি' (৩৪২ পৃঃ বরদা সংস্করণ) অর্থাৎ আর্দ্রতাস্থায়ী স্নেহকে যে রস বলা হয় তাহা যুক্তিযুক্ত নহে কারণ স্নেহ রতি উৎসাহাদিতে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ ভক্তির সম্বন্ধেও যে অভিনব গুপ্ত ও হেমচন্দ্র স্থায়ীভাব নির্দেশ করিয়াছেন তাহা সমীচীন নহে, কারণ পূর্বেই ভক্তির রসত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। ভক্তি রসের সামগ্রী থাকিলেও যদি উহার রসতা স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সে বিষয়ে অরুচিই একমাত্র কারণ।

প্রাচীন আলংকারিকগণ বলেন যে প্রধানরূপে অভিব্যক্ত সঞ্চারী ভাব, দেব, গুরু, মুনি, নৃপতি প্রভৃতি বিষয়ক রতি, অথবা বিভাবাদি দ্বারা অপরিপুষ্ট বা উদ্বুদ্ধ মাত্র রত্যাদি স্থায়ীভাব নামে অভিহিত হয়, কিন্তু রসাখ্যা লাভ করে না।

নবরসাত্মক ভক্তিরস অসার্ব্বজনিক অর্থাৎ সকল ব্যক্তির পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য নহে বলিয়া যদি ভক্তির রসতা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে সকল রসেরই উচ্ছেদ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, কোন রসেরই সত্তা থাকে না; কারণ অন্যান্য রসও সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্য বা অন্যান্য রসের অভিজ্ঞ বিদগ্ধ সহৃদয় বা সামাজিকের অনুভূতিই প্রমাণ। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সামাজিকের মত বিশুদ্ধ চিত্ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব সে সকল রসের সত্তাও রক্ষিত হয় না। শ্রোত্রীয় জরদ্মীমাংসক ও তার্কিক নাট্যমণ্ডপের মধ্যে বিদ্যমান থাকিলেও চমৎকার অনুভব করিতে সমর্থ না হইয়া সাধারণ ব্যক্তির মত অবস্থান করেন। এইরূপ প্রণয়বর্জিত জড়তাবিশিষ্ট শৃঙ্গার রসাস্বাদে বঞ্চিত ও গাঢ় বিষয়াসক্ত চিত্ত ব্যক্তিও শান্তরস আস্বাদনে অনভিজ্ঞ। যাহার শোক কখনও অনুভূত হয় নাই সে করুণ রসের উদ্রেককালে পাষাণের মত অবস্থান করে। সেইজন্য যাহার রসবাসনা বা সংস্কার আছে তাহারই রসাস্বাদ সম্ভব, ইহা সর্ববাদি-সম্মত। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলেন,

'প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা
এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে।'

(দক্ষিণ ১ম লহরী ৩)

যাহার পূর্বজন্মের বা ইহজন্মের ভক্তি সংস্কার বিদ্যমান আছে তাহারই হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদন উপজাত হয়। অতএব ভক্তিরসদর্শন সারগর্ভ বিচারপূর্ণ। সাহিত্যদর্পণেও উক্ত আছে—

'ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্।'

আধুনিক ও প্রাক্তন রতি প্রভৃতি বাসনাই রসোদ্বোধের হেতু।

আত্মারাম ও হরবোলা

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

"আত্মারাম পড়ো।"

"ধান দাও খাই।"

আত্মারাম-পাখী কিছুতেই 'বুলি' শেখে না। শুধু ধান খাইতে চাহে। এরূপ ধান-পিয়াসী আত্মারামকে 'রাধাকৃষ্ণ' বুলি শেখাইবার ব্যর্থচেষ্টা অনেকে করিয়াছেন, আমিও করিয়াছি।

সেবার-গ্রামে একটা 'ধানের মরাই' বাঁধিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। মনে করিলাম—মরাইয়ের মাথার উপর আত্মারামের বাসা বাঁধিব। আশাতীত ধানের মালিক হইতে পারিলে আত্মারাম নিশ্চয়ই বুলি শিখিবে। আত্মারাম ঘরামী ভালো, তাই তাহাকেই ডাকিলাম।

"আত্মারাম! একটা মরাই বাঁধো।"

"যে আজ্ঞে, ধান জোগাড় করুন।"

—ধান জোগাড় করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! হঠাৎ আত্মারাম নদীর ওপারে গিয়া পুচ্ছ তুলিয়া নৃত্য সুরু করিল।

"ধান নিয়ে এপারে আসুন।"

অবাক্ হইয়া আত্মারামের 'শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত' ছন্দের রোমাঞ্চকর নৃত্য দেখিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, আত্মারাম ধান ভালবাসে, ধানের মালিক হইতে চাহে, কিন্তু বুলি শিখিতে চাহে না। অনুনয়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"কেন আত্মারাম! পারাপারের প্রশ্ন তুলছ কেন? পাখীর আবার এপার-ওপার কি?"

মনের উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া আত্মারাম সদম্ভে উত্তর করিল—"পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল এ-পারে।"

নদীর অপর পারেও তখন 'পাখী-জাগরণ' আরম্ভ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে পাখীরা সব সমবেত হইল। তুমুল আন্দোলন। কর্ণপ্রদাহী কলরব। দুপারেই মরাইয়ের দাবী, আর জনসংখ্যা বেশী প্রমাণ করিবার অক্লান্ত চেষ্টা। আমি তখন এক নৌকা ধান লইয়া মাঝ-নদীতে ভাসিতে লাগিলাম। কোন্ পারে যে মরাই-বাঁধা হইবে, তাহা ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইলাম না।

আত্মারামকে ডাকিয়া বলিলাম—"শোনো আত্মারাম! আর্কিমিডিস্ বলেছেন 'যেখানেই দাঁড়াও, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল সেখানে।' সুতরাং পারাপারের প্রশ্নটা ছেড়ে দাও—হোক্ না দু'পারে দুটো মরাই? তা'তেই বা ক্ষতি কি?"

এ যুক্তিও আত্মারাম কানে তুলিল না। মুহুর্মুহু পাখীদের সভা আহ্বান করিতে লাগিল, গরম গরম বক্তৃতার সাহায্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তাহার একমাত্র যুক্তি এই ডেমোক্রেসির যুগে 'majority must be granted.'

বেগতিক দেখিয়া আমি ঘোষণা করিলাম—"যে পারের পাখীরা খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া আগে মরাই বাঁধিতে পারিবে আমার ধান সেই পারেই তুলিব।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মারাম বাগ্মী-ঘরামী। ওজস্বিনী বক্তৃতার সাহায্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কৌশলও জানে ভালো। কিন্তু আত্মারামের সহকর্ম্মী পাখীরা যে তাহাকে বিশ্বাস করে না, মরাইয়ের উচ্চ চূড়ায় তাহাকে বসাইতে চাহে না, এ তথ্যটা তাহার জানা ছিল না। তাই, মরাই বাঁধা হইল নদীর অপর পারে, আত্মারামের অনুগামী পাখীরাও একে একে উড়িয়া গেল সেখানে। আত্মারামের দুঃখের সীমা রহিল না। আমি এখনো বলি—

"আত্মারাম পড়ো"

আত্মারাম এখনো বলে—

"ধান দাও, খাই।"

(২)

হরবোলাকে বলিলাম—

"হরবোলা! তুমি তো সব বুলিই বলতে পার, শুধু 'রাধাকৃষ্ণ' বলো না কেন?"

"আজ্ঞে, চিত্তে সুখ নেই।"

হরবোলা ঈশান-কোণের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। একখণ্ড কালো মেঘ দেখিলেই শিহরিয়া উঠে। ঝড়ের ভয়। হরবোলার ঘরের খুঁটিগুলি নাকি বেসামাল। হঠাৎ একদিন কি ভাবিয়া আত্মারামের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া হরবোলাও মরাই বাঁধা আন্দোলনে যোগদান করিল। আত্মারামের পায়ে গিয়া আত্মারামের মন্ত্রশিষ্য হইল।

"হরবোলা! তুমি তো এ-পারের পাখী, ওপারের জন্যে তোমার এত দরদ কেন?"

হরবোলা একটু হাসিয়া হরেক রকম বুলি আওড়াইল। তাহাতে বোঝা গেল—পারাপারের প্রশ্ন লইয়া সে মোটেই মাথা ঘামাইতেছে না। তাহার মতে, সংসার অসার, মরাই-বাঁধা মিথ্যা, সত্য শুধু তার ঘরের খুঁটি, আর ওই একখণ্ড কালো মেঘ। তবু হরবোলাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলাম—

"হরবোলা! পড়ো—'রাধাকৃষ্ণ' পড়ো।" হরবোলা হাসিল। সে হাসি অতি গভীর অর্থপূর্ণ। সে হাসি বুঝিতে পারেন, চার্চিল, রুজভেল্ট, তোজো বা হিটলার, আর কেহ পারেন না। আত্মারামের পারাপার ঘটিত মরাই-আন্দোলনের দক্ষিণবাহু হরবোলাকে হঠাৎ একদিন দেখা গেল—এ পারের মরাই-চূড়ায় বসিয়া মুদ্রিত নয়নে ধান খাইতেছে। আত্মারামের আত্মা সে দৃশ্য দেখিয়া খাঁচাছাড়া হইল—পূর্ব্বান্ত হইয়া বাষ্পাকুল নয়নে চিৎকার করিয়া উঠিল—

"Thou too Brutus ?"

হরবোলা একটু হাসিয়া কহিল—"রাধাকৃষ্ণ!"

সন্ধ্যাসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য কবি-প্রতিভার ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করতে হ'লে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবি-জীবনে যে অপূর্ব্ব স্থান আছে তা সকলেই স্বীকার ক'রতে হবে। বিশ্ব-কবির কাব্যমন্দিরের প্রথম তোরণ সন্ধ্যা-সঙ্গীত, অমর কবির প্রতিভা সূর্য্যের প্রতিভা বিকাশ সন্ধ্যাসঙ্গীতে। অতএব রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা বুঝতে সন্ধ্যাসঙ্গীত অপরিহার্য্য।

কবির 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' একটা বিষাদ, একটা দুঃখ, একটা নিরাশার ধারা পূর্ণ হ'য়েছে। সন্ধ্যাসঙ্গীতের মূল সুর দুঃখ। মহাশিল্পীরা এই দুঃখের বেদনার মধ্য দিয়েই চিরন্তন শাশ্বত আনন্দ প্রকাশ ক'রে থাকেন, তাই বিশ্বশিল্পী রবীন্দ্রনাথের জীবনে এর ব্যত্যয় হয়নি। আদি কবি তাঁর জীবন সায়াহ্নে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটার জীবনে সন্ধ্যাপতিত হ'তে দেখে বেদনায় আপ্লুত হ'য়ে যে মহাকাব্য রচনা ক'রলেন, তা আজ পর্য্যন্ত জাতি নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর প্রাণে আনন্দ দিচ্ছে। মহাশিল্পীদের জীবনে এই সন্ধ্যা—এই দুঃখ সমভাবে বর্ত্তমান। রবীন্দ্রনাথও প্রথম কাব্য লিখলেন 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'। এখানেও সেই সন্ধ্যা, সেই দুঃখ। এই সন্ধ্যা এই দুঃখ পরবর্ত্তী রবীন্দ্রকাব্যকে আলোকোজ্জ্বল ও আনন্দপূর্ণ ক'রেছে। সন্ধ্যার মাঝেই প্রভাতের সম্ভাবনা, দুঃখের মাঝেই সুখ। বিরাট আনন্দের মাঝে, সুমহান প্রভাতের মূলে, দুর্ব্বিশাল অন্ধকার বর্ত্তমান। সৃষ্টির আদিতে সুগভীর রাত্রি। অতএব যে রবীন্দ্রকাব্য গানে, ভাষায়, ছন্দে, ভাবে, রসে ও বৈচিত্র্যে পৃথিবীর সাহিত্য-পটভূমিতে অভ্রভেদী হিমাদ্রির ন্যায় উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান, সেই অলৌকিক সাহিত্যের মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের দুঃখ। রবীন্দ্রনাথ দুঃখের কবি। এই দুঃখ তাঁর পরবর্ত্তী কাব্যধারায় অন্তর্নিহিত ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হ'য়ে সেই বিরাট সাহিত্যকে আরও রসঘন ও আনন্দ-নিবিড় ক'রেছে। মেঘমলিন প্রভাতসূর্য্য যেমন মধ্যাহ্নে তীব্রতর হ'য়ে সমস্ত জগৎকে প্লাবিত ও উত্তপ্ত করে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাসূর্য্যও তেমনি তাঁর কবিজীবন-প্রভাতের বিষাদ মেঘ কাটিয়ে জগতের মাঝে সগৌরবে উজ্জ্বলতম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অতএব রবীন্দ্রনাথের বিরাট কবি-প্রতিভার মূলে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র যৌক্তিকতা বর্ত্তমান। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ইহা অবশ্যম্ভাবী। তিনি মহাশিল্পী, তিনি বিশ্বশিল্পী।

রবীন্দ্রনাথের এই দুঃখ, এ কিসের দুঃখ? এ দুঃখ রবীন্দ্রনাথের ঐ বালক বয়সে জগৎকে রসে ও আনন্দে উপলব্ধি ক'রতে না পারার দুঃখ। বালক রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র প্রতিভার নিকটে এই জগৎ তখন ধরা দেয়নি, কিন্তু ধরা দেবার সম্ভাবনা আছে। ওই ক্ষুদ্র প্রতিভার মাঝেই তার বিরাটত্ব বর্ত্তমান। তাই ভবিষ্যৎ মহাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁর তখনকার সেই ক্ষুদ্রত্বের মাঝে বিরাটত্বের অনুভূতি পেয়েছেন এবং সেই বিরাটত্ব প্রকাশের জন্য তাঁকে বার বার মোচড় দিচ্ছে, আর রবীন্দ্রনাথও তাকে প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতর হয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাকুলতা সফল হয়নি, বিশ্ব-ব্যাপী প্রতিভা প্রকাশের পথ পায়নি। এই পথ না পাওয়ার এই বিফলতার দুঃখই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'। বালক রবীন্দ্রনাথ আকণ্ঠ মধু পান করেছেন, কিন্তু অতখানি সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর হয়নি, তবু তাঁকে সহ্য ক'রতেই হবে, এই না পারার দুঃখই তাঁর দুঃখ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যমুকুল অপরিণত বয়সেই পুষ্পপ্রয়াসী। এই প্রয়াস, এই বিশ্ব-প্লাবিনী আশার পথবিহীনতাই দুঃখ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য প্রতিভায় সারা জগৎকে তোলপাড় করিতে চান, কিন্তু তা অত শীঘ্র নয়, এই দ্বিধাই রবীন্দ্রনাথের দুঃখ। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যের প্রথম কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"অয়ি সন্ধ্যা, তোরি যেন স্বদেশের প্রতিবেশী
তোরি যেন আপনার ভাই
প্রাণের প্রবাসে মোর দিশা হারাইয়া
কেঁদে কেঁদে বেড়ায় সদাই।"

এই কাঁদুনে প্রতিবেশীটি কে? কে এই উদাসী প্রবাসীটি কবি-হৃদয়ে বসবাস ক'রছে? এ আর কেউ নয়, এ বালক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চির বিরহী চির-অতৃপ্ত চির-উপবাসী আর একটি রবীন্দ্রনাথ। এই বিরহী কবিটি বাইরে আসে না, সে থাকে প্রাণের নিভৃতে, সঙ্গোপনে থেকে কবিকে দুনিয়ার নিত্য নূতন রস-মাধুর্য্য থেকে চির অতৃপ্তির পথে চালিত করে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী জীবনে এই পৃথিবীকে রসে ও আনন্দে উপভোগ করলেও তাঁর জীবনে একটা চির-বিরহ র'য়ে গেছে। যে কথা তাঁর পরবর্ত্তী কাব্যে পাই,

"ওরে কবি এই বেলা তুই গান গেয়ে নে
থাকতে দিনের আলো,
ধ'রে নে এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া
এই ভালো এই ভালো।"

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে জগৎকে রূপে ও মাধুর্য্যে উপলব্ধি করতে না পারার দুঃখ, আর শেষ জীবনে উপলব্ধি ক'রেও দুঃখ।

কবি 'গান আরম্ভ' কবিতায় কবিতাকে আহ্বান ক'রছেন,

"হৃদয়ের অন্তঃপুর হ'তে
বধূ মোর ধীরে ধীরে আয়।"

তারপর বধূকে নিয়ে কোথা বাসা বাঁধবেন?

"অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার"

রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে অসীমের একান্ত আবির্ভাব তার পরিচয়ও এই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' পাই। তিনি অনন্ত আকাশের কোলে বাসা বেঁধেছেন, অতএব তাঁর কবিতা হবে অসীমের যাত্রী, পৃথিবীর আকাশে বাতাসে তার গতি, দূরদিগন্তে তার চল-চঞ্চল মৃদু-মঞ্জীর। সীমা পরিত্যাগ ক'রে অসীমের পথে, খণ্ডকে পরিত্যাগ ক'রে অখণ্ডের দিকে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য অনুসন্ধিৎসা। রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই অরূপের পথে অভিসার ক'রে গেছেন। 'সন্ধ্যা' কবিতায় কবি নিসর্গের স্নেহাকাঙ্ক্ষী ঐ বাল্য-জীবনে অরূপের নাগাল না পাওয়াটাই দুঃখ।

"স্রোতস্বিনী ঘুম ঘোরে
গাবে কুলু কুলু স্বরে
হৃদয়ে জড়িত আধ গান
ঝিল্লীরা ধরিবে এক তান
দিনশ্রমে সন্ধ্যা বায়ু মৃদুমুখে যেতে যেতে,
গান গাবে অতি মৃদুস্বরে।"

পরবর্ত্তী জীবনে কবি নিসর্গের ভালোবাসা লাভ ক'রে শ্রেষ্ঠ নিসর্গ কবিতা লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা বিশ্বের দরবারে অত্যুজ্জ্বল মণিরূপে চিরদিন দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে।

"দুখের-বিলাপ" কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' প্রকৃত তাৎপর্য পাই। রবীন্দ্রনাথ এই জগতকে গভীরভাবে ভালবাসতে চান, এই দুনিয়ার নৈসর্গিক শোভা, প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে চান, কিন্তু তিনি পারছেন না এক জায়গায় তাঁর অক্ষমতা রয়ে গেছে। কবি প্রকৃতিকে ভোগ করেন কাব্যে, সুন্দর মনোহারিণী কবিতার মধ্যেও আবার এই কবিতা সুন্দর হয় মধুর প্রকাশ ভঙ্গীতে।

কিন্তু কবির প্রকাশভঙ্গীরই অক্ষমতা। কবি বলেছেন,

"কেন সুখ আর কর আশা,
সুখ শুধু কাঁদিয়া কহিল
ভালোবাসা, ভালোবাসা গো।"

রবীন্দ্রনাথ এই ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষাকে, বাসনাকে চিরদিন কামনা ক'রে গেছেন। এই ভালোবাসার অক্ষমতাকেই তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ ব'লে গেছেন। পরবর্তী কাব্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বদেবতার কাছে এই অক্ষমতার জন্য নালিশ ক'রেছেন।

"যদি প্রেম না দিলে প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে
এমন গানে গানে,
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে,
যদি প্রেম না দিলে প্রাণে।"

আবার 'অনুগ্রহ' কবিতায় কবি এই দেখে দুঃখ প্রকাশ ক'রেছেন যে জগতের মধ্যে মানুষের মাঝে শুধু অনুগ্রহের পালা চ'লছে। দুর্ব্বল সবলের অনুগ্রহ চাইছে, ক্ষুদ্র বৃহতের অনুগ্রহ চাইছে। বাস্তব জীবনের আনাচে কানাচে শুধু প্রতি পদে অনুগ্রহ। কবি কিন্তু এই অনুগ্রহ চান না; তিনি ঈশ্বরকেও বলেছেন যে যদি তিনি তাঁকে অনুগ্রহ ক'রে সৃষ্টি ক'রে থাকেন তবে তিনি সে অনুগ্রহ চান না।

"তবে হে হৃদয়হীন দেব
… … …
মহা অনুগ্রহ হ'তে তব
মুক্ত তুমি করহ আমারে
চাহিনা থাকিতে এ সংসারে।"

কবি নিজের প্রতিভায়, নিজের স্বকীয়তায়, নিজের স্বাতন্ত্র্যে বড় হ'তে চান, কারও কোন সাহায্য বা দয়ার প্রার্থী নন।

"কবি হ'য়ে জন্মেছি ধরায়
ভালোবাসি আপনা ভুলিয়া
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া"

কবি বলেছেন যদি অনুগ্রহ পেতেই হয় তাহ'লে যেন তিনি অনুগ্রহের বদলে দুঃখই পান। রবীন্দ্রনাথ এই ব'লে প্রার্থনা করেছেন ভগবানের কাছে।

"হে দেবতা, অনুগ্রহ হ'তে
রক্ষা কর অভাগা কবিরে
অপযশ অপমানে দাও
দুঃখ জ্বালা বহিব এ শিরে।"

যে প্রতিভা একদিন সারা পৃথিবী প্লাবিত ক'রবে, যে মনীষা একদিন সারা দুনিয়াকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত ক'রবে, যে বিরাট প্রতিভার পদতলে সারা পৃথিবী মাথা নোয়াবে, এ যেন তারি পূর্ব্ব নির্দ্দেশ!

সন্ধ্যাসঙ্গীতের শেষ কবিতায় কবির আর এক রূপ।

কবির জীবনে এবার বিষাদের মেঘ কাটতে আরম্ভ ক'রেছে, কবি এবার অনেকটা জগতের রসমাধুর্য্য প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'রতে পারছেন। পৃথিবীর আনন্দ ও সত্যের সহিত এবার পরিচিত হচ্ছেন, তাই তিনি তাঁর বিষাদম্লান অনুভূতিকে ভুলতে আরম্ভ ক'রেছেন। তিনি সত্যিই এবার জগতের আনন্দকে কাছে পেয়েছেন, এবার তিনি সৌন্দর্য্যের অধিকারী। পিছনে অন্ধকার প'ড়ে থাক, সামনে শুধু আলো, হাসি, গান। এই সামনের পথে তিনি এবার চ'লবেন, আর পেছনে নয়। কবি বলেছেন,

"বল মোরে বল দেখি এ আমার গানগুলি
কেন আর ভালো নাহি লাগে?"

আবার ব'লেছেন,

"একে একে ভুলে যাব সুর
গান গাওয়া সারা হ'য়ে যাবে।"

কবির সন্ধ্যাসঙ্গীত শেষ হ'য়ে গেল, এর-পর কবিকে আমরা দেখি "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতায়।

যৌবন সীমান্তে

শ্রীশীতল বর্দ্ধন

ম্লান ফুলে হের শত ক্লান্ত আঁখি কাঁদে;—
দেহের বাসনা মগ্ন হয় অবসাদে।
সবুজ শেওলী ঢাকা কালো জীর্ণ ঘাট,
স্রোতে আকাশের ছায়া কাঁপিছে বিরাট!
কামনার রসে পান-পাত্রটিরে ভরি
কোরেছি 'নির্ব্বাণ' পান সকল বিস্মরি;
পায়ে দৃঢ় তব রথী ওষ্ঠের পরশ,
করিত চঞ্চল চিত্ত পুলকে অবশ।
দুঃখে আজ হয়রাণ বন বুল-বুলী
জপিতেছে যৌবনের মিঠা দিনগুলি।
জোনাকীর মত স্মৃতি মনের আঁধারে
বেদনার গুঞ্জরণ করে বারে বারে।
শত তৃপ্তি-সুপ্তি আজ চাহিছে আবার,
বাঞ্ছিত আমার মাঝে শত কোটি বার!

জরার ছায়ায় ম্লান যৌবনের আলো,
ফুলের মেঘেতে যেন সন্ধ্যাকাশ কালো।
অতীতের স্বপ্ন ভুলে অন্ধরাত্রি দিয়া,
বৃথাই খুঁজিতে নারি অন্তঃপুর হিয়া।
পূর্ণ হয় ক্ষীণ নদী, ঝরিত বকুল—
নব কুঁড়ি রূপে আসে প্রবালে আকুল;
শীতের কুয়াশা কোলে বসন্ত ঘুমায়,
শিহরি জাগিয়া ওঠে ফাগুন চুমায়!
মনের নিভৃত কোণে যার ইন্দ্রজাল,
চঞ্চল করিবে সে যে অন্তরের তাল;
ঝরিত ফুলের রেণু চাহে ফিরিবারে,
মধু-স্মৃতি-ভরা পুষ্প কুঞ্জের দুয়ারে।
যযাতির রূপ-তৃষ্ণা কাতর পরাণ,—
কোথা পাব মিটাইতে শক্তি ভগবান?

শরৎচন্দ্র ও বঙ্গীয় সমালোচক

অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী এম-এ

জনৈক ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রকে নাকি প্রশ্ন করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আপনার লেখাকে বাঙালী অধিক ভালবাসে কেন। উত্তরে শরৎবাবু বলেছিলেন, আমি লিখি তোমাদের জন্যে, সাধারণের জন্যে; তিনি লেখেন আমাদের অর্থাৎ অসাধারণদের জন্যে, আমাদের মধ্যে তফাৎটা হল এইখানে। এই প্রশ্নোত্তরের নির্ভরযোগ্যতা যাই হোক, শরৎসাহিত্যে বুদ্ধিজীবীর কোন খোরাক মিলতে পারে না—একথাটা স্পষ্ট গলায় প্রচার করতে অনেকের উৎসাহ দেখা যায়। সমালোচকরা অনেকেই শরৎপ্রতিভাকে অকুণ্ঠ সম্বর্ধনা জানাতে রাজী হননি। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে অবশ্য লঘু শরৎ-সমালোচনার নমুনা কিছু কিছু পাওয়া যায়। গ্রন্থ আকারে—দুই চারিটি শরৎ-সমালোচনা আমাদের হাতে এসেছে, তবে দুর্ভাগ্য দুটিই যেন লেখকের প্রথম, যা প্রকৃত সমালোচকের দৃষ্টিই নয়—। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা অনেকাংশে পাণ্ডিত্যমণ্ডিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের নিমিত্তই তাঁর গ্রন্থ—এরূপ মনোভাবই প্রকট হয়েছে। এও সমালোচকের দৃষ্টি-কোণের বৈকল্যের পরিচয় দিচ্ছে বৈ কি! সাধারণতঃ সমালোচকরা শরৎচন্দ্রকে প্রায় উপেক্ষা করে এসেছেন। এই অবজ্ঞার মূলে কোন হেতু বর্তমান আছে কিনা বলা মুস্কিল—এখনো পর্যন্ত যথাযথ শরৎ-সাহিত্য সমালোচনা আমরা দেখতেই পেলাম না।

বঙ্গীয় সমালোচকদের সমালোচনা এখানে করব না। শরৎ-সাহিত্যের মান নিরূপণ করতেই তাঁরা অনেকে শঙ্কিত হয়ে পড়েন, সে বিষয়ে কিছু বলছি। একজন কথা-সাহিত্যিক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, শরৎচন্দ্রকে তাঁর ভাল লাগেনা, শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্র নির্জীব বলে মনে হয় তাঁর কাছে। আর একজন লেখক অনুরূপ মত পোষণ করে থাকেন, তাঁর মতে শরৎবাবুর সৃষ্টিতে প্রাণস্পন্দন প্রচুর, কিন্তু চিত্রাঙ্কন নেই, অনিন্দনীয় সমাবেশ আছে, কিন্তু পরিণতি নেই। এই ত্রুটী খণ্ডন করতে কোনও চেষ্টা লক্ষিত হয়নি, তাঁর চরিত্রগুলি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, বিশেষ ছাঁচ থেকে তাদের জন্ম, তাই বিকশিত হয়ে উঠতে তারা অক্ষম। কেউ বা তাঁর সম্বন্ধে বলে থাকেন—বড় শিল্পীর লক্ষণ তাঁর লেখায় প্রচুর বিদ্যমান আছে, তাঁর অনুভূতি আছে, আরও আছে জীবন্ত অভিজ্ঞতা, কিন্তু তাঁর চরিত্রসৃষ্টি কোথাও মূর্ত হয়ে উঠেনি প্রতীকের প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকায়। আর এক সমালোচকের মত অনুসারে তাঁর চরিত্রাঙ্কন একটিমাত্র নির্যাতিতের প্রতীক অবলম্বন করে সর্বত্র অগ্রসর হয়েছে। এঁরা সবাই বলতে চান—চরিত্রাঙ্কনে বৈচিত্র্য নেই শরৎচন্দ্রের, কেননা সামাজিক আদর্শের অনুপ্রেরণায় তাঁর সৃষ্টি। সমাজসংস্কারকের অন্তরালে প্রতি পদে পদে কথাশিল্পী নির্বাসিত হয়ে গেছেন।

এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক না হলেও এর সবটাই বিচারসহ হতে পারে না। শিল্পী শরৎচন্দ্রকে কোথাও আমরা অধিক প্রকট হতে দেখেছি। সংস্কারক শরৎচন্দ্র কোথাও অধিক আত্মপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু শিল্পী সংস্কারকের দ্বারা নিজেকে কোথাও ম্লান হতে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। যদিও 'শেষপ্রশ্ন' সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু তার জবাব জীবনশিল্পী নিজেই দিয়ে গিয়েছেন।

প্রতীকবর্জিত সৃষ্টির নিদর্শন তাঁর উপন্যাসগুলিতে অতি বিরল, প্রায় নেই। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি পরস্পরের সান্নিধ্য ঘেঁষে রয়েছে এবং তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। হুবহু একরকমের না হলেও একজাতীয় বৈশিষ্ট্যে তারা সমুজ্জ্বল। একসঙ্গে তাঁর গ্রন্থাবলী পড়তে গেলে এই জিনিসটি আরও বেশী করে চোখে পড়ে। এই কারণেই অনেক অসহিষ্ণু পাঠক তাঁর প্রতি অবিচার করে বসেন। একথা প্রমাণ করতে আমাদের বেশী দূর যেতে হয় না।

শরৎচন্দ্রের কল্পিত নারীচরিত্র সাধারণ পাঠকের বিস্ময়। বঙ্গনারীর বাহির ও অন্তরকে এমন সুস্পষ্ট ও সুন্দর করে আমাদের সামনে আর কেউ তুলে ধরতে পারেন নি। সতীর অশ্রু ইন্দ্রধনুর আভার কাছ থেকে বহুবর্ণরঞ্জিত নারীর চিত্র আমরা পেয়েছি। কোথাও প্রচ্ছন্ন মনোবলের মহাপ্রাণ আহত আত্মবোধ, কোথাও বাৎসল্যরসে সিক্ত অপূর্ব স্নেহপ্রবণতা, কোথাও ঈর্ষাবর্জিত সরলপ্রকৃতিকে তিনি রূপ দিয়েছেন। তাঁর বর্ণসমাবেশ সর্বত্র কোন Image বা কল্পিত আদর্শকে অনুসরণ করেছে। এজন্যেই তাঁর স্নেহশীলা নারীর একনিষ্ঠতার পরিচয় আমাদের পক্ষে স্পষ্ট। যে চোখ দিয়ে আমরা অন্নদাদিদিকে চিনি, তার সহায়তায় আমাদের পক্ষে মেজদিদি, জ্যেঠাইমা, নারায়ণী, পোড়াকাঠ, শৈলজা (নিষ্কৃতি), বিন্দু ও তাদেরই সগোত্রাদের অন্তরে প্রবেশ করতে অসুবিধা হয় না। বাৎসল্যরসের খনি বিন্দুর ছেলে, বাংলার কথাসাহিত্যে সর্বাধিকমহৎ খ্যাতি অর্জন করলেও একজাতীয়তার হাত থেকে রেহাই পায় না। অথচ পক্ষপাতশূন্য মন্তব্য করা চলে—শরৎচন্দ্র বঙ্গভাষায় বাৎসল্যরসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। অনুরূপ বিশ্লেষণ অন্যত্র প্রযুক্ত হতে পারে। তাঁর সামর্থ্য অতি বিরাট হলেও একরঙের তুলি দিয়ে এঁকেছেন রমা, বিজয়া, অভয়া, ষোড়শী ও কমলাকে। এরা সবাই একমতের বাদিনী, আত্মচেতনা ও মনোবলের জীবন্ত বিগ্রহ এবং শিল্পীর কল্পিত Ideal womanhood বা আদর্শ-নারীত্বের মহিমাদীপ্তি। আরও আশ্চর্য্য হতে হয় এই ভেবে যে রমণীচরিত্রে রুক্ষতা ইনি অতি সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন এবং এখানেও তাঁর মনে একটিমাত্র Image বা চরিত্রাদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই স্বর্ণমঞ্জরী (অরক্ষণীয়া), এলোকেশী (বিন্দুর ছেলে), মেজবৌ, নয়নতারা (নিষ্কৃতি), কাদম্বিনী (মেজদিদি) প্রভৃতিকে আলাদা আলাদা করে দেখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। "ছলনাময়ী ও রহস্যময়ী নারী" এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করতেন বলে তিনি contradiction বা বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির এক এক স্থানকে নারীদের একটি সংজ্ঞারূপে কল্পনা করেছিলেন। এই সঙ্গে তাঁর একটী দুর্বলতার কথাও স্মরণে আনতে পারি—যেমন, পুরুষের সম্মুখে আহার্য্য পরিবেশন করে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে তাঁর অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাসের নায়িকারা বঙ্গীয় মহিলার এ একটি বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করতে অনেকবার সচেষ্ট হয়েছেন। এর থেকে মনে হয় বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়েও চিত্রকর শরৎচন্দ্র তাঁর মানসীকেই চিত্ররূপ দিতে ভালবাসতেন।

শরৎচন্দ্রের কল্পনায় পুরুষ নারীর মহিমা ও উৎকর্ষ লাভ করতে পারে না। তাঁর নায়কেরা নায়িকাদের অনুগত হয়ে চলে। তাঁর উপন্যাসজগতে বিচরণ করতে দেখা যায় কয়েক শ্রেণীর পুরুষকে। উদাসীন শ্রেণীর পুরুষচরিত্র অতুলনীয় সৃষ্টি—আশুবাবু, গিরিশ, মাধব, এরা সবাই আত্মভোলা উদাসীনতার জাতিভ্রাতা। আর এক শ্রেণীর পুরুষ শরৎ-সাহিত্যে সাধারণত নায়কের স্থান অধিকার করে থাকে—যেমন, বৃন্দাবন, রমেশ, নরেন, সব্যসাচী প্রভৃতি—সামাজিক উজ্জ্বলতার এই যুবকদল এক পথের পথিক, সমতাবাদর্শে ভাবুক, এরা পরস্পরের এত সন্নিকর্ষ-লাভ করেছে যে এদের মধ্যে পার্থক্য অন্তর্ধান করে। "মানুষেরই মাঝে শয়তান" সৃজন করতে অসাধারণ পটুতা শরৎচন্দ্রের। তাঁর "রাসবিহারী"

[illegible] দুর্গত মানবকুলের মধ্যেই, তার সাক্ষাৎ বেশী লোকালয়েও আমরা ভাল করেই চিনি। একসঙ্গে একজাতীয় চরিত্রের এতগুলি উদাহরণ সামনে থাকায় শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিক্ষমতার উপরে সন্দিহান হওয়া তাঁর পাঠকদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

শরৎচন্দ্র নারীর সামাজিক মূল্য নির্ণয়ে চেষ্টিত হয়েছেন। যৌন স্বতন্ত্রতাবাদ প্রচার তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্যরূপে ফুটে উঠেছে চরিত্রহীন, গৃহদাহ ও শেষপ্রশ্ন এই তিনটি উপন্যাসে। চরিত্রহীনের অসম্পূর্ণ বিকৃত সংস্করণ 'গৃহদাহ' এবং সম্পূর্ণ ও পরিণত সংস্করণ 'শেষপ্রশ্ন'। অচলার মধ্যে কিরণময়ীর বিকৃত পরিণাম আমরা দেখতে পাই এবং কিরণময়ীকে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে দেখি কমল-চরিত্রে। এর থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত করে বসেন শিল্পী হিসাবে নূতনত্ব সৃষ্টির ক্ষমতাই নেই শরৎচন্দ্রের।

সমালোচকরা যে কারণে শরৎসাহিত্য প্রসঙ্গে নায়িকা-সৃজন করেন তা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন নি। তাঁদের হয়ে তাঁদের বক্তব্য সম্পূর্ণ অনুমান করে নেওয়াও দুষ্কর। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাঁদের বিভিন্ন সময়ের উক্তিগুলি থেকে যে প্রতিকূল মতের দিকে অবনত হই তা যুক্তির পথ বেয়ে চলে নি। অর্ধশিক্ষিত ঔপন্যাসিক জনতার মাঝে হারিয়ে গিয়েছিলেন এবং পদবিমর্দিত সমাজের উন্নতি সাধন করতে শিল্পের আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছিলেন এ মেনে নিতে পারি না। কোথাও কোথাও সামাজিক আদর্শ প্রচারের নেশা তাঁকে অধিকতররূপে পেয়ে বসেছে, যেমন পণ্ডিত মশাই ও পল্লী-সমাজে। কিন্তু সজাগ শিল্পী নিজেকে যথেষ্ট সংশোধন করে নিয়েছেন। প্রচার নিরপেক্ষ Abstract Artবাদীরা তবু আপত্তি তুলতে পারেন, কারণ সামাজিক প্রচার তাঁর প্রায় সকল রচনায় অল্পাধিকভাবে রয়েছে। কিন্তু সজাগ শিল্পী নিজের মতকে নির্বাসন দিয়ে সৃষ্টিরত হতে পারেন বলে বিশ্বাস করা চলে না।

বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে তাঁর অক্ষমতার কথা বলা হয়। শিল্পজগতে প্রতিভাবানরা কম বেশী একজাতীয় সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী। একা তিনি এ নিয়ম অতিক্রম হতে পারেন না। এই একটি মৃদু কারণ প্রদর্শন করে শরৎচন্দ্রকে দুর্নাম রটিয়েছেন, অথচ একজন অতি বড় রবীন্দ্রভক্ত হয়ে তিনি বোধ হয় বিস্মৃত হয়েছেন কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ [illegible] জাতীয় ব্যক্তিত্ব হতে পারেন নি। রবিকথিত "দুই নারী"র কথা বহুবিশ্রুত। লক্ষ্মী ও উর্বশী, গৃহিণী ও প্রণয়িনীর মানস প্রতীক সম্মুখে রেখে কবি নারী-চরিত্রাঙ্কণে রত হয়েছেন। তাঁর "শেষের কবিতা" তাত্ত্বিক দিক দিয়ে "দুই বোনে"র সহোদর। প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে প্রেম ও রোমান্স নির্বাণপ্রাপ্ত হয় এই একটি তত্ত্ব প্রচারে কবি অনেকবার অনেক আকারে মুখর হয়েছেন। রুশ উপন্যাসের উল্লেখও এক্ষেত্রে অনাবশ্যক হবে না আশাকরি। তুর্গেনিভের নিহিলিষ্ট চরিত্রগুলি এত বেশী সমজাতীয় যে তাদের পৃথক অস্তিত্বের কিন্তু আমাদের অগোচর হয়ে যায়। গোর্কী ও সমরসেটের বিদ্রোহী চরিত্রগুলি এক ছাঁচে গড়া, অথচ পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণে সমান দক্ষ। একথা মনে রেখে শরৎচন্দ্রের উপরে অবিচার করা অশোভনীয়।

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবকে যথোচিত মূল্য না দেওয়া মানে সত্যের অমর্যাদা করা। মহামনীষী যে বিরাট অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে শিল্পীর ভূমিকায় নেমেছিলেন তার তুলনা বঙ্গভাষায় মেলে না। তাঁর বিচিত্র জীবন বিশ্লেষণ করেছে, কিন্তু সর্বত্র তাঁর মনোবীক্ষণ বস্তুনিষ্ঠাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কথাশিল্পী দার্শনিকের মনের একাগ্রতা লাভ করেছেন বলেই তাঁর সৃষ্টির মৌলিক বস্তুপ্রেরণার কেন্দ্রস্থল হয়েছে মাত্র দুই একটি মানস কল্প বা Image। আধুনিক অধিকাংশ কথাশিল্পীর মত জীবনের উপর মানস প্রতিফলনের উৎপাত [illegible] তাঁর মনকে দখল করে ছিল। এ কথা সব চেয়ে বেশী খাটে তাঁর নয়, আধুনিক যুগের। শরৎ সাহিত্যের সমালোচকরা এই জিনিসটি উপেক্ষা করে থাকেন। দার্শনিক শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ শ্রীকান্ত চরিত্রে হয়েছে অতি পরিস্ফুট, শ্রীকান্তের মত চরিত্র তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলীতে নেই সমগ্র বঙ্গসাহিত্যেও নেই। ভবঘুরে খেয়ালী জীবন-বাদের পূজারী শ্রীকান্ত শুধু একটি চরিত্র নয়, ঔপন্যাসিকের বিপুল অভিজ্ঞতার প্রকাশমাত্র নয়; শ্রীকান্ত একটি তত্ত্ব বা জীবনকেই আলিঙ্গন করে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশলাভ করে। শ্রীকান্ত গতিশীলতার শুধু পতাকাবাহী নয়, তাকে ঘিরে রয়েছে সমগ্র শরৎচন্দ্রের ভাবুক মন। এই জন্য শ্রীকান্ত শরৎ-সাহিত্যেও অদ্বিতীয়, তার দ্বিতীয় নেই। এই সৃষ্টি কৃতির শিল্পীর সম্ভাবনার উচ্চতম সীমার ইঙ্গিত করে।

আড়িয়লখাঁ নদী

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে। কিন্তু তাহার বিস্তীর্ণ বালুকা-তটে হয়তো লুকানো আছে কত পুরানো দিনের অজানা কাহিনী; হয়ত অতীতের বিস্মৃতি অন্ধকার হইতে হয়তো ভাসিয়া আসিবে তাহার গুঞ্জন-কল্লোল। এ পরিবর্তন কখনো ঘটিয়াছে অকস্মাৎ; আবার কখনও চলিয়াছে শত শত বৎসর ধরিয়া। ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের প্রান্তবর্তিনী আড়িয়লখাঁ নদী এমন একটি পরিবর্তনের স্মৃতিবিজড়িত।

ঢাকা বিভাগের মানচিত্রে কয়েকটি স্থানের নাম-সাদৃশ্য অনুসন্ধানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঢাকা জেলার ভাগ্যকুল গ্রামের নিকটবর্তী আড়িয়ল বিল, লৌহজঙ্গের কিছু পূর্বে আড়িয়ল গ্রাম এবং এগারসিন্দুর দক্ষিণ পূর্বে আড়িয়লখাঁ নামে একটি নদী আছে। নাম-সাদৃশ্য চূড়ান্ত প্রমাণ না হইতে পারে। কিন্তু এ সব নামের সহিত ফরিদপুর জেলার নদীটির নামের সাদৃশ্য কি খুবই লক্ষণীয় নয়?

আজকাল পদ্মার বিস্তারবিসারী জলস্রোত ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার সীমা নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু ইহার দুই কূল খুঁজিয়া প্রাচীন বিক্রমপুর পাওয়া। রেনেলের মানচিত্রেও (১৭৭০ খৃঃ অঃ) এই ভূমিবিভাগ দেখা যায় না। এ পরিবর্তন শত [illegible] বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছে। তাহার পূর্বে পদ্মা, ভুবনেশ্বর ও আড়িয়লখাঁর পথে চলিত। (১নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য)

ঢাকা জেলার তেওতা গ্রামের পাশে ভুবনেশ্বর নামে একটি নদীর খাত আছে। (১) রেনল ড্রইং আঁকিয়া আধুনিক মানচিত্রে ফরিদপুর শহরের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ পূর্বে ভুবনেশ্বর নদের উদ্ভব দেখানো হইয়াছে। তেওতার প্রান্তবর্তী ভুবনেশ্বর ঠিক এই বরাবরই পদ্মায় আসিয়া মিশিত। ফরিদপুরের ভুবনেশ্বর কিছু পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া বাঁকিয়া ষোল মাইল দক্ষিণে পুনরায় পদ্মায় মিশিয়াছে। এখান হইতে পশ্চিম দক্ষিণে আড়িয়লখাঁর প্রবাহ। কিন্তু তাহার আরও একটু পশ্চিমে একটি মৃত নদীর খাত আছে। উহা মধুপাড়া গ্রামের পাশে আজও দেখা যায়। পুরাতন সেটেলমেন্ট ম্যাপে ইহার নাম বিলপদ্মা।

---

(১) ঢাকার ইতিহাস ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায় পৃঃ ৪২

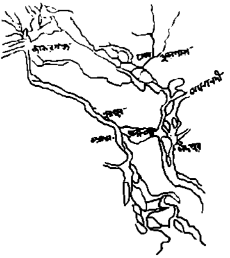

১নং মানচিত্র (রেনেল অঙ্কিত ৫নং শীট হইতে।)

২নং মানচিত্রে দেখা যাইবে যে এই ফরিদপুর জেলায় ভুবনেশ্বর তেওতার আড়িয়ল নদীর দক্ষিণ প্রান্তে যায়। ইহা ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী। সম্ভবতঃ এই ভুবনেশ্বর নদের পথে বিলপথার মধ্যে প্রবাহিত ছিল; পরে আড়িয়লখাঁর পথ খুলিয়া যায়।

ফরিদপুর জেলায় যেখানে আড়িয়লখাঁ নদীর উদ্ভব যেখানে হইয়াছে ঠিক তাহার পূর্ব দিকে পদ্মার অপর তীরে আড়িয়ল বিল। সাধারণ্যে উহা আজও আড়িয়লখাঁ বিল (২) নামে পরিচিত। উহা পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ১২ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় সাত মাইল প্রশস্ত। বিলের মধ্য সাধারণতঃ বিস্তৃত নদীটির গতি পথ নির্দেশ করে। আড়িয়লখাঁ বিলে একটি পূর্ব পশ্চিম প্রবাহিনী নদীর পরিচয় পায়। যে সকল নদী ইহার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইয়াছে (৩) তাহারা হয় পদ্মার শাখা নদী, না হয় পদ্মার পূর্বাভিমুখী স্রোত কর্তৃক খনিত উপজাত নদী। সুতরাং সকলেই আধুনিক। এই আড়িয়ল বিল এক সময় গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (৪) ৩নং মানচিত্রে দেখা যাইবে যে আড়িয়ল বিলের উত্তর এবং উত্তর পূর্বদিকের ভূমি প্রাচীন। পক্ষান্তরে পূর্বদিকের ভূমি যেমন নদী গর্ভ সব পতিত এবং নিম্ন। ব্রহ্মপুত্র অদ্যাপি এ পথেই একদিন প্রবাহিত হইত।

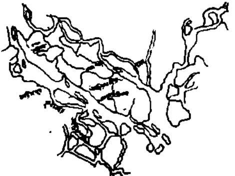

২নং মানচিত্র (মেজর টুইডি অঙ্কিত ১৮৬১ সালে অঙ্কিত মানচিত্র হইতে।)

ঢাকা জেলার উত্তর পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্তী (৫) আড়িয়লখাঁ নদীর নাম পূর্বে করিয়াছি। এই মানচিত্রে এখানকার ভূমি খণ্ড দেখা যাইবে। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত কতদূর পর্যন্ত প্রাচীন ভূমির উপর। কিন্তু তাহার দক্ষিণ অংশ সব পতিত ও নিম্ন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মির্জা নাথন ঢাকা নগরীকে দোলাই নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়াছেন।(৬) রেনেলের মানচিত্রেও ঢাকা হইতে জোকাপাড়া (মুক্তাপাড়া) পর্যন্ত দোলাই খাল দেখা যায়। বুড়িগঙ্গার অপর পারে যেমন বেষ্টিত ব্রহ্মপুত্রের খাল ইহারই দক্ষিণ পশ্চিম প্রবাহিত।

ইছামতী, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা ও বর্তমান পদ্মার প্রবাহে ঢাকা জেলার দক্ষিণ অংশের প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আড়িয়লখাঁ নদীর পশ্চিম প্রবাহের চিহ্ন লুপ্ত প্রায়। শুধু ভূমিসংস্থান অনুসন্ধানীর সম্মুখে এক সুদূর অতীতের ছবি তুলিয়া ধরে।

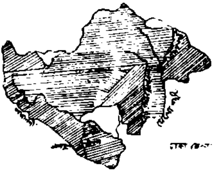

৩নং মানচিত্র (ডাঃ রাধাকমল মুখার্জির Changing Face of Bengal গ্রন্থ হইতে।)

পূর্ববঙ্গের ভূমি সংগঠনে পদ্মার প্রভাব যে সমস্ত প্রবল অনুভূত হয় সেখানে আড়িয়লখাঁ বর্তমান আড়িয়ল বিলের পথে প্রবাহিত ছিল। ভূকম্পনে তাহার গতি বিভিন্ন হওয়ায় নদী একটু দক্ষিণে সরিয়া যায়।

---

(২) রেনেলের ম্যাপে আড়িয়ল ফুকাইম বিল। পার্শ্ববর্তী ফুকাইম গ্রামের নাম হইতে এ নাম হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

(৩) ইছামতী, ধলেশ্বরী, কালীগঙ্গা, বুড়িগঙ্গা প্রভৃতি।

(৪) Relics of the Great Ice Age in the plains of N. India by T. H. D. La Touche, Quoted by S. C. Mazumder in his Rivers of the Bengal Delta pp. 59-64.

(৫) J. R. A. S. B. VIII pp 9-10.

(৬) Baharistan-i-Ghaibi; "It is well to remember that access to Dacca from the Meghna side was through these two channels, (of the Dulai) and that the fatulla Dhaleswari section by which Buriganga now falls into the Dhaleswari did not then exist. (Islamic Culture Oct 1942, p. 394.)

এই সময়ের পশ্চিমে কুমারনদের ক্ষীণ রেখা পড়িয়া থাকে। পদ্মা প্রথমতঃ সেই পথ অবলম্বন করে। কিন্তু পদ্মা তাহার শাখা দিয়েছে। অল্পকাল পরেই পদ্মার প্রবাহ আরও দক্ষিণে আড়িয়লখাঁর পথে ধাবিত হয়। আড়িয়লখাঁর স্রোতবেগই বোধহয় পদ্মাকে প্রথমতঃ পশ্চিমের পথ ধরিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু পদ্মার বিপুল জলরাশি অর্দ্ধশতকাল পরেই আড়িয়লখাঁর পথ খুলিয়া লয়। বহু পরবর্তীকালে পদ্মা আরও পূর্ব্বদিকে সরিয়া যায় এবং আড়িয়লখাঁ ঢাকা জেলা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

পদ্মার এই আড়িয়লখাঁ স্রোত বেশ প্রাচীন, গ্রীকদের ভ্রমণ-কাহিনীতে ইহার নাম আছে Antibole. ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এ মোহানার সৃষ্টি হইয়াছে। (৭) বর্তমানে আড়িয়ল বিলের অন্তবর্ত্তী স্থানসমূহ বাসযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে প্রায়ই মাটির তলায় বহু গাছ এবং পীটজাতীয় জিনিষের স্তর দেখা যায়। উহা প্রায় ১২।১৪ ফিট মাটির তলায় এবং বহু সুবিস্তৃত। নবগঠিত ভূমির উপর বন জন্মাইলে তাহা নিম্ন চাপে এরূপ মাটির তলায় চলিয়া যায়। সুন্দরবনে এরূপ ভূগর্ভপ্রোথিত বন ১০।১১ ফিট নীচে দেখা গিয়াছে।(৮) ইহা হইতেও আড়িয়লখাঁ নদীর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। মাদারীপুরের [illegible] ক্ষুদ্র নদীটী আজও সেই আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন স্মৃতি বহন করিতেছে।

---

(৭) Antiquity of the Lower Ganges and its Courses. (Science and Culture Vol VII No 5, p 238)

(৮) R. K. Mukerji, Changing Face of Bengal p. 119.

পদকর্ত্তা জগদানন্দ সরকার ঠাকুর

শ্রীগৌরীহর মিত্র বি-এল্

শ্রীশ্রীজগদানন্দ সরকার ঠাকুর অনুমান ১৭০২ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বীরভূম জেলার অন্তর্গত (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলা) ই. আই. রেলওয়ের অণ্ডাল জংসন ষ্টেশনের চারি মাইল উত্তরে বা অণ্ডাল সাঁইথিয়া লাইনের উখড়া ষ্টেশনের তিন মাইল দক্ষিণে আমড়াতিহি দক্ষিণখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদি নিবাস নবদ্বীপ শ্রীখণ্ড। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। জগদানন্দের পিতা নিত্যানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া উক্ত দক্ষিণখণ্ডে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। পরে জগদানন্দ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ—এই তিন ভ্রাতার সহিত পৃথক হইলে তিনি বীরভূম জেলার সদর সিউড়ীর ১৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ও চৌকী দুবরাজপুরের পাঁচ মাইল দক্ষিণে হিংলো নদীর পশ্চিম উত্তর তীরবর্ত্তী জোফলাই গ্রামে তাঁহার শিষ্য মিত্র পরিবার গৃহে গোপীনাথ জীউ ঠাকুরসহ চলিয়া আসিয়া তাঁহাদের অনুরোধক্রমে তথায় স্থায়ীভাবে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। মিত্র উপাধিধারী শিষ্যগণ তাঁহাকে বাসস্থান ও উক্ত ঠাকুর সেবার জন্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। এই জন্য জগদানন্দ ঠাকুর এইখানেই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধামূর্ত্তি বিহীন শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। গোপীনাথ ঠাকুর আকারে ছোট।

আমি স্বয়ং দক্ষিণখণ্ড ও জোফলাই—এই উভয় স্থানই স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সম্বন্ধে জোফলাই গ্রামের বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীযুক্ত বিরজাকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় বলেন যে জগদানন্দ ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সেবা প্রকাশ করেন নাই। এখানে জ্ঞানদাস নামক এক বাবাজীর উক্ত সেবা ছিল। তিনি তাঁহার অন্তে এই গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দিরে তাঁহাকে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান। তদবধি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে গোপীনাথের মন্দিরেই রাখিয়া তাঁহারও সেবা পূজা হইতেছে।

জোফলাই গ্রাম দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত। নিতান্ত ছোট গ্রাম। গ্রামে প্রায় ছয় সাত শত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বাস। গ্রামে যাইবার ভাল রাস্তা নাই। পাঁচড়া ষ্টেশন হইতেও যাইবার রাস্তা অত্যন্ত কদর্য্য।

শ্রীখণ্ড নিবাসী অম্বষ্ঠ কুলপ্রদীপ নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর মুকুন্দ সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তম ভক্ত ছিলেন। নরহরি সরকার ঠাকুর আজীবন কৌমার ব্রত অবলম্বন করেন। মুকুন্দ সরকার ঠাকুর প্রথমতঃ গৌড়াধিপতির চিকিৎসকরূপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হন। ইনিও অগ্রে বিবাহ না করিয়া পরে মহাপ্রভুর আদেশানুসারে বিবাহ করেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ইঁহার পুত্র, ইনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এতই প্রিয় পাত্র ছিলেন যে লোকে ইঁহাকে মহাপ্রভুর বরপুত্র বলিয়া অভিহিত করিত। প্রবাদ এই যে ইঁহাদের কুলদেবতা শ্রীগোপীনাথ জীউ ঠাকুর এই বালক রঘুনন্দনের প্রার্থনামত প্রত্যক্ষরূপে ক্ষীরের লাড্ডু ভোজন করিয়াছিলেন। তদবধি মহাপ্রভুর আদেশমত কীর্ত্তন সমাজে শ্রীরঘুনন্দন সর্ব্বাগ্রে মাল্যচন্দন প্রাপ্ত হইতেন। ঠাকুর বংশীয়গণ অদ্যাবধি এই সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

জনশ্রুতি এই যে জগদানন্দ ঠাকুর বিবাহের পূর্ব্বেই জোফলাই গ্রামে আগমন করেন ও তাঁহার শিষ্যগণের অনুরোধে বিবাহ করেন। জগদানন্দের দুই বিবাহ। শ্রীখণ্ডে প্রথম বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে মাত্র এক কন্যার জন্মলাভ হয়। এই কন্যার এক পুত্রের নাম শ্রীকান্ত। দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম মাদু ঠাকুরাণী। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন ও অল্প বয়সেই বিধবা হন।

শ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের বংশ তালিকা এতৎসহ প্রদত্ত হইল।

শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর স্বপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ আদির সেবার নিমিত্ত কোনরূপ জমাদির তালিকা নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। তবে তদানীন্তন বীরভূমের রাজধানী রাজনগর রাজার দেওয়ান জোফলাই নিবাসী বক্সী পরিবার এই সেবা পরিচালন জন্য ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীযুক্ত বিরজাকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় বলেন যে বীরভূমের তদানীন্তন রাজনগরের রাজা আসাদ জমান খাঁ গোপীনাথের সেবার জন্য ১৪৩।১১৮ বিঘা পরিমিত ভূমি দেন। এই জমির প্রায় অধিকাংশই বিঘাপ্রতি ।০, ।৶০ ও ॥০ আনা জমায় প্রায় ২০০ বৎসর বন্দোবস্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। ঐ খাজনা বাবদ বাৎসরিক প্রায় ১৩০৲ টাকা আদায় হইয়া থাকে। এই টাকা হইতে এবং গোপীনাথের ৩০ বিঘা জমির উৎপন্ন ধান্য হইতে বর্ত্তমানে তাঁহার সেবা পূজা চলিতেছে। গোপীনাথের আরও যে বহু সম্পত্তি আছে তাহা দক্ষিণখণ্ডের ঠাকুরগণ ভোগদখল করেন—এ স্থানের জন্য তাঁহারা কেহ কিছুই দেন না।

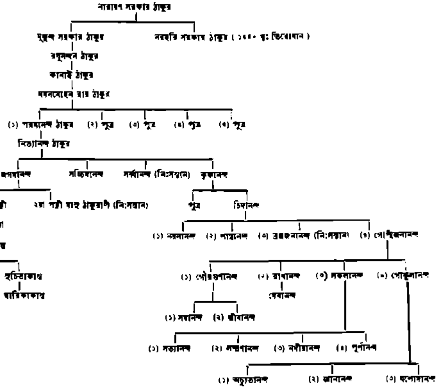

এতদ্ব্যতীত জগদানন্দ ঠাকুর পঞ্চকোট কাশীপুরাধিপতির নিকট হইতে স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমলাজোড়া, দুমুরী প্রভৃতি গ্রাম গোপীনাথ ঠাকুরের সেবা-পূজা পরিচালন জন্য প্রাপ্ত হন। এই গ্রামগুলি এখনও শ্রীগোপীনাথের সম্পত্তি। এই গ্রামগুলির প্রাপ্তি সম্বন্ধে ৺কালিদাস নাথ মহাশয় তাঁহার "জগদানন্দের পদাবলী" গ্রন্থের ।৶০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"জগদানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম প্রচারার্থে সর্ব্বদাই দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেন। তিনি একদিন পঞ্চকোট রাজ্যের আমলাজোড়া নামক গ্রামে গমন করিয়া একটি সুবৃহৎ সরোবর দর্শন করেন। ঐ সরোবরের মধ্যস্থানে অগাধ জল-বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল। কবিবর ঐ দ্বীপ দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে এই রম্য স্থানটি শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনের উপযুক্ত স্থান; এই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া শ্রীভগবানের লীলা স্মরণ করিলে মনের একাগ্রতা জন্মিবে। অতএব আমি যে পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিব সে পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বসিয়াই আহ্নিক কার্য্য সম্পন্ন করিব; কিন্তু সে স্থানে যাইতে হইলে জলযানের আবশ্যকতা; নৌকা বা ভেলা ব্যতীত সেখানে যাইবার অন্য কোন উপায় নাই। জগদানন্দ সাধনবলে বলীয়ান। তিনি অনায়াসে কাষ্ঠ পাদুকা অবলম্বন করিয়াই সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক প্রতিদিন আহ্নিককৃত্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ এই কথা পঞ্চকোটাধিপতির কর্ণে প্রবেশ করিল। মহারাজ লোকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না; সুতরাং তিনি স্বয়ং পাত্রমিত্রসহ আমলাজোড়া গ্রামে আগমন করিয়া জগদানন্দের অলৌকিক কীর্ত্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। সেই সময়ে মহারাজ জগদানন্দের উপর ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই আমলাজোড়া গ্রাম তাঁহাকে অর্পণ করেন। শ্রীজগদানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবাইতগণ অদ্যাবধি সেই গ্রাম ভোগ দখল করিতেছেন এবং সেই সময় হইতে উক্ত পুষ্করিণী "ঠাকুর বাঁধ" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। তিনি এইরূপ অনেক অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া সেই সময়ের অনেক ধর্ম্মত্যাগী ব্যক্তিদিগকে স্বধর্ম্মে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের পরকালের হিতসাধন করিয়াছিলেন।"

অপর জনশ্রুতি এই যে মুর্শিদাবাদের নবাব মীর্জাফর খাঁর আমলে পঞ্চকোটের মহারাজাকে রাজস্ব বাকীর জন্য মুর্শিদাবাদে তলব করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেই সময় পঞ্চকোট অধিপতি এই জোফলাই গ্রাম হইয়া মুর্শিদাবাদ যাইবার কালীন জগদানন্দ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন। জগদানন্দ ঠাকুর তাঁহার সহিত মুর্শিদাবাদ গিয়া তাঁহার জাতীয় শ্রীখণ্ডের ঠাকুরদের শিষ্য কাশিমবাজারের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ কান্তবাবুর সহায়তায় পঞ্চকোটাধিপতিকে নবাবের ক্রোধ হইতে রক্ষা করেন ও বাকী রাজস্ব বহু পরিমাণে মাফ করাইয়া দেন। ইহাতে পঞ্চকোটাধিপতি কান্ত বাবুকে তাঁহার রাজ্য মধ্যে ২১ ও ১১ মৌজা-মোট ৩২ মৌজা পত্তনী স্বরূপ সামান্য রাজস্বে বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং ক্রোরাণি পরগণার দমুরী প্রভৃতি দুই মৌজা ও সেরগড় পরগণার আমলাজোড়া প্রভৃতি দুই মৌজা জগদানন্দ ঠাকুরকে ৺গোপীনাথ জীউঠাকুরের সেবা-পূজার জন্য নিষ্কর দেবোত্তরস্বরূপ দান করেন।

জগদানন্দ ঠাকুর একজন সংসার বিরাগী সাধু ও বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন।

অতিথি সেবা তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। বহু ব্রাহ্মণ সন্তান জগদানন্দের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

জগদানন্দের অবর্তমানে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী দাস্ ঠাকুরাণী ও প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত দৌহিত্র টিকায়েৎ ঠাকুর প্রভৃতি এবং দৌহিত্র পুত্র যদুনাথ ঠাকুর প্রভৃতি জোফলাই গ্রামে বাস করিয়া উক্ত গোপীনাথ জীউঠাকুরের সম্পত্তির দ্বারা ঠাকুরের সেবা-পূজা, অতিথি সৎকার প্রভৃতি পরিচালনা করিতেন। সেই সময় তাঁহারা গোপীনাথ ঠাকুরের আয় আরও কিছু বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। দাস্ ঠাকুরাণী জীবিত থাকিবার কাল পর্যন্ত তাঁহাদের দ্বারা ঠাকুরের সমারোহে উৎসবাদি হইত; কিন্তু দাস্ ঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর জগদানন্দ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্রগণের সহিত ঐ সম্পত্তি ও সেবা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাতে ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্রগণ মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া জোফলাই-এর সেবা ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ঠাকুরের দৌহিত্র ও দৌহিত্র পুত্রগণ মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া শ্বশুরালয়ে কিম্বা মাতুলালয়ে গিয়া বাস করেন। দৌহিত্র পুত্র যদুনাথ শিয়ারসোলে চলিয়া যান। তাঁহার বংশধরেরা এখন তথায় বাস করিতেছেন। টিকায়েতের অপর পৌত্র রাধিকাকান্তের বংশধরগণ ঝিঁঝিতে বাস করিতেছেন।

জগদানন্দ একজন বিশিষ্ট পদকর্তা। "ভাষার্ণব" নামক অসম্পূর্ণ গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। এই গ্রন্থের কিয়দংশমাত্র ৺কালিদাস নাথ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রথম কল্লোল বা অধ্যায়ের শেষাংশ, দ্বিতীয় কল্লোল সম্পূর্ণ এবং তৃতীয় কল্লোলের প্রথমাংশ মাত্র আছে। এই গ্রন্থে ককারাদি অনুপ্রাসযুক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী আছে। প্রথম কল্লোলে কাদি নির্ঘণ্ট, দ্বিতীয় কল্লোলে খাদি নির্ঘণ্ট, তৃতীয় কল্লোলে গাদি নির্ঘণ্ট ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত নাথ মহাশয় জগদানন্দের একটি "শব্দা" প্রাপ্ত হন। ইহাতে কবি ককারাদি বর্ণমালাক্রমে এবং সমধ্বনিবিশিষ্ট শব্দমালার একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে সমধ্বনিবিশিষ্ট কতকগুলি শব্দ উদ্ধৃত হইল—অমল, বিমল, কমল, যুগল, চপল, উজল, উতল, শ্যামল, মুষল, চুমল, মুখল, বহিল, খোয়াল, বিরল, সরল, গরল, বেয়াল, হেলাল, কবিল, খবিল, বসিল, পশিল, রসিল, হসিল, মিলল, অলল, চলল, ঢলল, ভলল, পলল, টলল, ঝলল, বলল, কোল, গোল, তোল, ডোল, ঢোল, দোল, খোল, ভোল, মোল, রোল, অলক, ঝলক, তিলক, জানক, পলক, কনক, চলক ইত্যাদি।

জগদানন্দ ঠাকুর রাধাকৃষ্ণ লীলা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক বহু সংখ্যক পদ রচনা করিয়াছেন। এই পদাবলী মধ্যে তিনি ভাব অপেক্ষা শব্দ চয়নে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বর্গীয় কালিদাস নাথ মহাশয় 'জগদানন্দের পদাবলীর' ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"কি কবিত্ব, কি শব্দ লালিত্য, কি রচনা চাতুর্য্য, কি শব্দ বিন্যাস, কি চিত্রবোধ, ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কবিকুলের বরণীয় ও অগ্রগণ্য। যে কবিতে মুগ্ধ হইয়া ও যে রসে ডুবিয়া মানুষ কিয়ৎকালের জন্য শোকতাপ ভুলিয়া যায় জগদানন্দের কবিতা এই শ্রেণীর....।"

জগদানন্দের পদাবলী মূলতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) বর্ণ চিত্র—একই বর্ণের অনুপ্রাসযুক্ত পদাবলী; যথা—কি তব কেশব কুন্তল কি কবরে কুচ কোচলীরাই। কি জানি কতক্ষণে কব কি কৌতুক কহিতে থাকল রাই। ইত্যাদি, এইরূপ (খ), (গ) (ঘ) ইত্যাদি বর্ণে রচিত পদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(২) বহুচিত্র—এই শ্রেণীর কবিতার কোন বিশিষ্ট সংখ্যক পংক্তি পাঠ করিলে ভিন্ন কবিতা বাক্যাকারে পাওয়া যায়। এই কবিতার ৭ম, ৯ম, ১০ম এবং ১২শ বর্ণে অবরোহ আরোহ ক্রমে পাঠ করিলে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়। অপর অন্য একটি পদে প্রতি পংক্তির ১ম, ৫ম, ৭ম, ১২শ ও ১৩শ বর্ণ পূর্বোক্তরূপ ক্রমে পাঠ করিলে—"মহাপ্রভু তুমি। কি আর বলিব আমি। তব মন এক করি। চরণ যুগল ধরি। সদাশব তুয়া পায়। জগত আনন্দ গায়।" এই কবিতাটি পাওয়া যায়।

(৩) অনুকৃত—প্রাচীন কবিগণের অনুকরণে রচিত পদাবলী ও

(৪) সাধারণ

৺কালিদাস নাথ মহাশয় জগদানন্দ ঠাকুরের পদাবলী সংগৃহীত করিয়া ১৩০৬ সালে 'জগদানন্দের পদাবলী' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পদাবলী গ্রন্থে ও অন্যত্র প্রকাশিত অপরাপর পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থে জগদানন্দের যে সকল পদ প্রকাশিত হইয়াছে তদতিরিক্ত কয়েকটি পদ আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় শিবরতন মিত্র মহাশয় প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে জগদানন্দের বাসস্থান জোফলাই গ্রাম হইতে আমাদের "রতন-লাইব্রেরীর" জন্য সংগৃহীত করেন। এই সংগ্রহের কথা অধুনালুপ্ত বীরভূমি মাসিক পত্রিকায় ১৩৩০ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত পদগুলি এই স্থলে প্রদত্ত হইল। পদগুলি অধিকাংশই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক। (রতন-লাইব্রেরীর পুঁথি নং ১১৬৯—৫১)

(১)

অপরূপ—বসন্তরাগ

অপরূপ সব সুরধনী তুট মাহ। নিরখত হুহুঁই কোটি অনঙ্গ।
আবতে বিদিত নব জানি। গুণতি মুরারি গুণতি কহ আনি॥ ধ্রু
পহিলহিঁ বেকত সদয় ভেলে রঙ্গ। তাপর বড় বল নিরখিতে তুঙ্গ।
তিন অঙ্গ বিধার ধরব তিন আর। গৌরীসুত তিন পেখি ইহার।
তিবলে পঁচ বল পঁচ বল পীর। অন্তরে লখিতে মহাপুরুখ চীহ্ন।
সবহু মহিম ধর সুলছন গোই। কৈছনে ইহ বিহ মলব কোই।
নদীয়া নগরপুরে দেখ বিপরীত। চলকিয়ে অচল সচল পুলকিত।
জগদানন্দ মুদে গেল সব মনতাপ। কি জানি বা জগতের যাব তাপ পাপ।

(২)

কামোদ

তিটিপদ কমল ভানু বদন ঘন মদন দহন সমতাপ।
উভ ধর শ্রীমুখ মাণিক কটি ঘন দুর্লভিত কাম মুকুর।
গৌর অঙ্গ বলিহারি।
কটি সুললাট চারু উর পরিসর নিরখহু গুণত মুরারি॥ ধ্রু
পুন তিন অঙ্গ অরুণ অঙ্গ মোহন গিরি বা গহবাকার।
গভীর নাভি ঘুম মলো মনোহর নীবল পঁচ বল আর।
নাসা বাহু নয়ন বহু ভুজ পুন পঞ্চ সূক্ষ্ম সুবিচারি।
আঙুলি দশন লোম বিধ রেঁঠ কচ দাস জগত বিনিধারি।

(৩)

কামোদ

আতপ অরুণ কিরণ জিনি তনুরুচি তরুণারুণ জিনি বসনা।
যার কহত কত শরদ সরোরুহ যা দশনক জিনি রসনা।
বিহরই নব যুবরাজ।
কেশরী জিনি খিনি মাঝে রচিত বনি কিঙ্কিণী আভরণ সাজ॥ ধ্রু
নিরখিতে মুরলি চরণে পড়ি নীরতি রতিপতি মতি গতি খোই।
গুণপতি হংসগতি নহত গজাগতি কুলবতী ইতি উতি রোই।
রস পরিহাসে করত কত কৌতুক গদাধর সহচর মেলি।
জগদানন্দ কহ নদীয়াপুরে ঐছে করত নিতি খেলি।

(৪)

শ্রীরাগ

নবীন ভুবনে　নীল অম্বর　গৌর বরণক বেদি।
জনু উদয় ভূতলে　রাহু কবলিত　আধ রবি উঠি গেলি।
হরখিলে হরি হরি বোল।
জগত জনততি　নাম ধরি হরি　নাম ভই উতরোল।ধ্রু
সুরনীত পূরিত　নগরগত দিন　রজনী জান না জান।
নিতি যোত গান　পুরাণ গান বেহানে　দিক সনমান।
সাধু বিতরণে　ভুবনিত পুরগত　দীন হীন পরিপূর।
প্রেমধন সব　জগতজন নাম　জগত বাহির দূর।

(৫)

শ্রীরাগ

নিতুই নূতন　নিভৃত নিজ জন　নীরনিধি নিরমাই।
নিরত নিমগন　না জানেন নিশিদিন　নদীয়ানন্দ সবাই।
নটই নব　নটরাজ।
নকুল নরহরি　নিতাই নিরখিত　নগর নটন সমাজ।
নাগী নাগরী　নিকুঞ্জে না রহ　নিরখি নিরুপম কাঁতি।
নিকর নিরবধি　নয়ন নীরজ　নীর নীরদ ভাঁতি।
নিঠুর নিজ নিজ　নাহ নিন্দই　নিলয়ে নাহি অভিলাষ।
নিচয়ে নিবেদই　নবীন নিজজন　জগত আনন্দ দাস।

(৬)

শ্রীরাগ

চারু চাচর　চিকুর চূড়হি　চপল চম্পক দাম।
চন্দ্রমা চিতচোর　মুরতি চাহি　চমকিত কাম।
চৈতন্যচাঁদ　উজোর।
চরম চতুর　চকিত চাহনি　চকিত চেতন চোর।ধ্রু
চলিত চৌদিশে　চূর্ণ কুন্তল　চক্রীচয় দান।
চারু চিকণ　চীর চিবুকেতে　চামীকর দুকান।
চতুর কুলবতী　চিত চমকে　চিত্র চন্দন চন্দ।
চন্দ্র চিরদিনে　চলিত নহপুর　বনই জগদানন্দ।

(৭)

শ্রীরাগ

মিলিত মুরলিত　নীর যমুনা　সখীর সহ অতি রঙ্গ।
বিলাসগামিনী　তীর বিহরই　ধীর পদ অরবিন্দ।
দেখ গৌরবর　গুণধাম।
নিরখি শুভগ　গভীর কম্প　অখিল দামিনীদাম।ধ্রু
রুচির নাভি　গভীর ফুরহি　হৈমবর্ণ সরোজ।
ললিত নীলিম　চীর উপর　মঞ্জরী মধুর দোল।
করত রস　পরিহাস কত　দরবেশ বয়সহি মেলি।
জগত আনন্দ　হৃদয়ে মন্দিরে　এছে কর নিতি কেলি।

(৮)

শ্রীরাগ

দলিত দামিনী　দামবরণ　দেহদীপতি উজোর।
দীন দুরগত　দুখে দুখিত　দেখি দেয়ই কোর।
দিনরাত　দীন দয়াল।
দুলহ দরশন　দানবই দরশিণ　করল দয়াল।ধ্রু
দুঃসহ দারুণ　দুরিত দাহক　দাহে দপদপ দেশ।
দীন দরিদ্র　দুষ্ট দুর্জন　দমনে দূর কর ক্লেশ।
দয়িত দোসর　দামোদর দরশন　দলিত দিগন্ত।
দুরদৈবে দুর্বল　দিবস দীনদুখ　দাস জগদানন্দ।

জগদানন্দ ঠাকুর অনুমান ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই আশ্বিন বামন দ্বাদশীর দিন পরলোকগমন করেন। প্রতি বৎসর জোফলাইগ্রামে কবির স্মৃতি উদ্দেশে ঐ সময় তিন দিন ব্যাপী একটী এবং কবি পত্নীর মৃত্যু উপলক্ষে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে একটী—এই দুইটী মেলার অনুষ্ঠান হয়। মেলায় প্রায় দুই হাজার লোক সমাগম হইয়া থাকে।

জোফলাই গ্রামে কবিবরের প্রতিষ্ঠিত ৺শ্রীগোপীনাথ জীউ, বহু শালগ্রামশিলা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতির সেবা থাকিলেও বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরেরা কেহই নাই। তবে ঠাকুরদের সেবা পূজা ও অতিথি সৎকার প্রভৃতির জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ যথাবিধির বন্দোবস্ত আছে। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই বংশের চন্দ্রঠাকুর মহাশয় জোফলাই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের আদি নিবাস শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন।

জোফলাই গ্রামে শ্রীগোপীনাথ জীউ ঠাকুরের মন্দির সংলগ্ন দক্ষিণপার্শ্বে "গৌরাঙ্গ সায়র" বা "ঠাকুর বাঁধ" নামে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। কথিত আছে যে গ্রামে সে সময় কোনও ভাল কূপ বা পুষ্করিণী না থাকায় জগদানন্দ ঠাকুর আগত কতকগুলি অতিথির তৃষ্ণা নিবারণ করে স্বহস্তে খুন্তির দ্বারা কূপ খনন করিতে আরম্ভ করিলে মহাপ্রভু ভক্তের প্রতি সদয় হন এবং তথায় এক উৎসের প্রকাশ হইয়া এই জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। মহাপ্রভুর এবং জগদানন্দ ঠাকুরের নামানুযায়ী এই জলাশয় উক্ত উভয় নামেই পরিচিত।

কথিত আছে যে একদা পূজারী কর্ত্তৃক গোপীনাথ ঠাকুরের প্রস্তর পাত্র ভগ্ন হইলে তিনি জগদানন্দ ঠাকুরের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি তাঁহাকে উক্ত পাত্রের ভগ্ন অংশগুলি একত্র করিয়া তাহাতেই ঠাকুরের ভোগ দিতে অনুরোধ করেন। অনুরোধ মত কার্য্য করিবার পর দেখা যায় যে পাত্রটি পূর্ব্বের ন্যায় অবিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিগ্রহ মূর্ত্তির মন্দির সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে জগদানন্দ ঠাকুরের ভিটা এখন মূলা, বেগুন, লতা প্রভৃতির ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে তাঁহার বাড়ীর কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দির, নাটমন্দির প্রভৃতি এখন ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সেবাইত পূর্ব্বোক্ত নিত্যকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের কোন পুত্র নাই, তবে দৌহিত্র আছে। তাঁহার অন্তে ঠাকুর ও অতিথি সেবার যে কি অবস্থা হইবে তাহা কে বলিবে?

মহাকালের দেশ

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

সমতলভূমি থেকে প্রায় সাত হাজার ফিট উঁচুতে অবজারভেটারী হিল্‌—সেখান থেকে দেখা যায় সারা দার্জিলিং শহরের রমণীয় দৃশ্য। উঁচু নীচু পাহাড়ী-পথ, বাগান, অস্ট্রেলিয়ান পাম—উন্নতশির রডোডেনড্রন্‌ গুচ্ছ, পাহাড় আর পাহাড়, আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট বাড়িগুলি দার্জিলিংয়ের বৈশিষ্ট্য। নীচে লেবং-এর পথ এঁকে বেঁকে সরীসৃপ-রেখায় প্রবাহিত—দূরে গোলাকৃতি রেসকোর্স, চায়ের বাগান আর লামাদের কারখানাগুলি একখানা যেন ল্যান্ডস্কেপ্‌ ছবি। নীচের পাহাড় আর ঝরণা থেকে কুয়াশাগুলি ঘন রহস্যের অন্তরালে থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে উঠে উঁচুতে রৌদ্রালোকে মিশে যাচ্ছে, মাথার 'পর সোনার গুঁড়োর মতন শরতের সোনালী রোদ্দুর, আর তার কিছুদূরে অস্পষ্ট ধূসরতায় রেখালীন পাহাড়ের শ্রেণী। বিস্ময়ে হতবাক্‌ হ'য়ে আমরা দেখ্‌ছিলুম চিরতুষারের দেশ দার্জিলিং পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্যসম্ভার!

সত্যি এমন অপূর্ব! আমার মতন বাস্তবকীট লোকও এখানে ব'সে সংসারের কথা ভুলে যায়। এই বিরাটত্বের মাঝে সত্যিই কি আমাদের মনে হয় না যে আমরা অতুচ্ছ পুরুষ? প্রকৃতির এই অনন্ত রহস্যময় রূপ যান্ত্রিক সভ্যতাকে বর্বরতা ব'লে কি উপহাস করে না?

দূর পাহাড়ের মাথায় মাথায় যে মেঘরাশি অবগুণ্ঠিত ছিল, হঠাৎ কে রৌদ্রে তার আবরণ গেল খুলে। আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির মাঝে জেগে উঠলো তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা! ঝক্‌ঝক্‌ ক'রছে তার রূপালী দেহ দিগন্তের মাঝে তার ঢেউ খেলানো সুন্দর মূর্তি, রৌদ্রালোকে বিশ্বস্রষ্টার অনন্তলীলার মহিমা প্রকাশ ক'রছে। মহাকালের মন্দিরে বেজে উঠলো ঘণ্টাধ্বনি—ঢং, ঢং, ঢং!

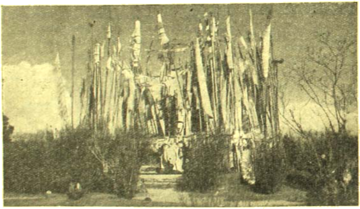

মহাকালের মন্দির

দার্জিলিঙে এসে চারজন রসিক বন্ধুর সাহচর্যলাভে দিনগুলি কাটছিল বেশ। হাসি গান, আহার-বিহার-মুহূর্তগুলি রূপায়িত হ'য়ে উঠছিল।

সাধারণের মিলন কেন্দ্র ম্যালের কাছে মিলিত হ'য়ে আমরা প্রোগ্রাম ঠিক ক'রে নিই। কোনদিন চ'লে গেলাম—লেবং-এর পথে। দু'পাশে চায়ের ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে নীচের দিকে যে বক্র পাহাড়ী-পথ-ভূমি নেমে গেছে, দৃশ্য তার চমৎকার!

ম্যাল আমাদের ভালো লাগে না। যান্ত্রিক সভ্যতা এখানে প্রকৃতিকে যেন ব্যঙ্গ প্রকাশ করে এবং ভ্রমবিলাসী বিলাসিনীদের যেরূপ এখানে দেখা যায় পরাধীন ভারতের তা চরম লজ্জা।

'বার্চহিলে'র নির্জনতা এবং মহাকালের উদারতর উদাস মূর্তি আমাদের ভালো লাগে, এখানে ব'সে ভাবুক মনের সংগে নির্জনে কতকটা আলাপ পরিচয় করা যায়।

সেদিন সপ্তমীর সকাল। শরতের প্রথম সূর্যালোকে দার্জিলিং হাসছে। মহাকালের নির্জন মন্দিরে এসে আমরা পাঁচজনে দাঁড়ালুম। অদূরে দার্জিলিংয়ের ঠাকুরবাড়িতে সার্বজনীন মহাপূজার সানাই বাজ্‌ছে—মহামায়ার পূজা আরম্ভ হ'য়েছে।

মহাকালের মন্দিরে তখন দু'একজন মাত্র পাহাড়ীর সমাবেশ হ'য়েছে। মহাকালকে প্রদক্ষিণ ক'রে তারা তাদের ভক্তি অন্তরের নৈবেদ্য দিয়ে দোলানো ঘণ্টায় মৃদু আঘাত ক'রে চ'লে গেল।

পাহাড়ীদের দেবতা মহাকাল—নির্জন পাহাড়ের মাথায় একটি শিলাখণ্ড। চারিদিকে তাঁর পতাকার নিশান—সামনের প্রবেশ পথে যে দু'টি সিংহমূর্তি তা বৌদ্ধ-শিল্পজাত। মহাকালের মন্দিরের মাথায় কোন আচ্ছাদন নেই—অনন্তরূপ যে মহাদেব-অনন্ত শক্তির তিনি প্রভু—তিনি অসীম—সুতরাং সীমার আড়াল দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখা যায় না। মন্দিরের চারিপাশে নানা বিচিত্রিত বস্ত্রখণ্ডে লামারা তাঁদের ধর্মের মর্য্যাদা টাঙিয়ে রেখেছেন।

মহাকালের পূজা আরম্ভ হ'ল। দু'একটি বাঙালী পরিবার সম্ভবতঃ মহাকালের পূজায় নৈবেদ্য দিতে হাজির হ'লেন। লামা পুরোহিতদের ধূপধূনার সুগন্ধময় আবেষ্টনীর মাঝে গানের কলির মতন যে মন্ত্র উচ্চারণ—তা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। অনেকক্ষণ ব'সে আমরা সেই পূজার রীতি এবং মন্ত্রপাঠ শুনলুম। মাঝে মাঝে মহাকালের ঘণ্টাধ্বনি মনে পবিত্র ভাবের উদ্রেক ক'রে।

মন্দিরের কাছাকাছি আরও কয়েকজন ব'সে স্তোত্র পাঠ ক'রছেন—সাধারণের দান ভিক্ষার মধ্যেই তাদের জীবিকাবৃত্তি চলে—কিন্তু আশ্চর্য কারুর কাছে কোন দাবী কিংবা প্রার্থনা নেই। পাহাড়ী দেবতা মহাকালের মন্দিরের এটি একটি বৈশিষ্ট্য, যা নাকি কোন ধর্মস্থানেই দেখা যায় না।

আমরা পাঁচজন মহাকালকে প্রদক্ষিণ করলুম এবং সেই দোলানো ঘণ্টা বাজিয়ে গৃহাভিমুখে ফিরে চললুম।

আশ্চর্য সুন্দর দেশ এই দার্জিলিং !

মেঘ আর রৌদ্র, রূপ আর রঙের যে বিচিত্রতর লীলা ক্ষণে ক্ষণে যে দ্রুত পরিবর্তন আনে তা ক্লান্তি কিংবা অবসাদ আনে না। হিমালয়ের কিরীটের সব সময়েই মনকে টেনে নেয় অসীমলোকে। যে বাড়িতে আমি আতিথ্য গ্রহণ করেছি নাম তার 'প্রভাতী'। দার্জিলিং উঁচু রাস্তার 'পর ছোট এই 'প্রভাতী' নীড় যেন ভাসমান জাহাজের একটি কেবিন। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যায় পাহাড়ের রূপ দিগন্ত ঢাকা প'ড়ে গেছে। রাত্রির অন্ধকারে দূরের ছোট বাড়ির মিটি মিটি আলোগুলো দেখে মনে হয় কোন স্বপ্ন বুঝি অনন্ত সমুদ্রের মাঝে জেগে র'য়েছে, আমাদের জাহাজ সেই বন্দরের পানে ছুটে চ'লেছে।

স্থির হ'ল 'টাইগার হিল্' যাওয়া হবে না—অনেক দূর এবং বাস এখন পাওয়া যায় না এবং আবহাওয়া খারাপ থাকলে সকল পরিশ্রমই পণ্ড হ'য়ে যাবে—অতএব আমরা জলাপাহাড়ের ওপর কাটা পাহাড় থেকে সূর্যোদয় দেখবো।

রাত সাড়ে তিনটার সময় লেপের ভেতর থেকে উঠে পড়লুম।

সেই নিস্তব্ধতায় ওভার কোট চাপিয়ে ফ্লাস্কে চা ভর্তি ক'রে নিয়ে টর্চের বোতাম টিপে পাহাড়ী পথ আমরা অতিক্রম করতে লাগলুম।

মনে আসছে অপূর্ব স্পন্দন—দূরে শুকতারা পাহাড়ের মাথায় জল্ জল্ ক'রে জ্বলছে। কবিগুরুর লাইন ক'টি মনের মাঝে বারবার গুঞ্জনধ্বনি ক'রে উঠলো—

"সুন্দরী তুমি শুকতারা সুদূর শৈল শিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা দর্শন দিয়ো দিক্ প্রান্তে।"

ঘুরে ঘুরে পাহাড়কে আবেষ্টন ক'রে যে পাহাড়ী পথ ওপরে উঠেছে বন নির্জনতায় আমরা সেই পথ বেয়ে পাহাড়ের 'পর উঠছি। কোথা দিয়ে ঝর্‌ঝর্ ধারায় ঝরণা ব'য়ে চলেছে—উঁচু উঁচু গাছগুলি নীচের নেমে যাচ্ছে—তারপর তারা দূরাকৃতির ক্ষুদ্রমূর্তির মাঝে যেন মিশে যায়। কত উঁচুতে আমরা উঠছি। আশ্চর্য সে অনুভূতি—বিস্ময় এবং আনন্দে সমতলভূমির ভাবপ্রবণ মন আমার অভিভূত হ'য়ে পড়ে।

উষার প্রাক্কালে কাটা পাহাড়ের একটি রমণীয় স্থানে এসে আমরা দাঁড়ালুম। প্রভাত পাখীর তখন বন্দনা গান সুরু হ'য়েছে। কিছুক্ষণ পরে দিগন্ত-সীমায় জেগে উঠলো রক্তিম রেখা—সূর্যোদয়ের প্রথম সূচনা। রঙ-বেরঙ, শুধু রঙের খেলা। পৃথিবীর মাঝে এত রঙ—এত রূপ—এত সৌন্দর্য যে আছে তা অনুভব করলুম পাহাড়ের মাথায় এই সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখে। কোন্ মহাশিল্পী পাহাড়ের মাথায় দিগন্ত সীমায় আকাশের পটভূমিকায় আপন মনে শুধু রঙের তুলি টেনে যাচ্ছেন—আর তার দর্শক আমি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ বাস্তব মানুষ মুহূর্তের স্পর্শে আপন অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে নির্বাক বিস্ময়ে শুধু এই দৃশ্য দেখলাম—প্রভাতের সূর্যালোকে যখন রূপালী রশ্মি মণ্ডিত হ'য়ে উঠলো তখন মাথায় দেখা গেল দৃষ্টির বিস্ময়—মহাসুন্দর হীরকোজ্জ্বল শুভ্রগিরি কাঞ্চনজঙ্ঘা! দৃষ্টির এই মহাসুন্দরতাকে প্রণাম জানিয়ে আমরা নামতে লাগলুম দার্জিলিং শহরে। পাহাড়ী ফুল আর গাছ—পাখীর গান আর ঝরণার ধারা পথ শ্রমণের ক্লান্তিকে ঢেকে দিতে লাগ্‌লো।

নামবার পথে জলাপাহাড়ের পোষ্ট অফিসে খানিকটা বিশ্রাম নিলুম। ওখানকার পোষ্ট-মাষ্টার বাঙালী-ভদ্রলোক—তাঁর সরল সুন্দর শিষ্ট-মনোজ্ঞ কোমল ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ ক'রেছিল।

বিদায়ের দিন সকাল থেকেই সানাই করুণ সুর ধরেছে। বাংলা দেশের সেই বিজয় বিসর্জনের করুণ বিদায় সঙ্গীত—'গিরিরাজ, আর প্রবোধ দিতে পারিনে উমারে।' মন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠলো—বিজয়া-মণ্ডপে অশ্রুসিক্ত শান্তি-বারি দার্জিলিংএর আকাশকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে—পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘের দল কুজ্ঝটিকা—বাংলা দেশের করুণ পরিস্থিতিকে স্মরণ করিয়ে দিলে।

দার্জিলিংএর বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় গৃহে চল্‌লো বিজয়া পর্ব। মিষ্টি মুখের মাঝে মনে হ'ল—

'পরকে করিলে নিকট বন্ধু
দূরকে করিলে ভাই—'

পাহাড়ী মেয়ে পুরুষের মাঝেও আজ উৎসবের আনন্দ। সব সকল পাহাড়ী ছেলেরা এবং বাঙালিনী মেয়েরা কপালে আলোচাল আর দইয়ের ফোঁটা এঁকে দুটি রঙিন বেশভূষার মাঝে তাদের জাতীয় উৎসবকে মুখর ক'রে রেখেছে। এদের জীবনধারা দেখ—সভ্যতার এবং শিক্ষার গর্ব এরা করে না—কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতা—দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য এরা সভ্য পৃথিবীর অধিবাসীদের মতন ক্ষীণ হীন এবং মুমূর্ষু-প্রাণ নয়। মেয়ে পুরুষে পরিশ্রম করে এবং সেই পরিশ্রমলব্ধ অর্থে দিন এদের কেটে যায় বেশ।

ম্যালের পথে ভিড় ক'রে বাঙালী গ্র্যাজুয়েট্ মেয়েদের বোঝা বহন ক'রে এরা যখন গর্বিত মাথা সোজা ক'রে টেনে চলে, তখন লজ্জায় আমাদের মাথা নীচু হ'য়ে যায়।

মধ্যাহ্নকাল পরে যখন আবার দার্জিলিংএর উচ্চ ভূমি ছেড়ে নীচের সমতল ভূমিতে নামবার আয়োজন করলুম—তখন প্রবাসের ক'টা দিনের রঙিন স্মৃতি মনকে আমার ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে। বিদায়ের দিন দেখে এলুম 'ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্'এর ঝরণা-ধারা—বোটানিক্যাল গার্ডেন এর নানা জাতীয় গাছ পালা আর ফুল ফল, আর মিউজিয়ামে নানা জাতি এবং নানা রঙের অজস্র প্রজাপতির মেলা।

থামিবে অশ্রুনীর

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম্-এ

জীবনে জীবনে চলেছে সাধনা
        লভিতে তাহার দেখা,
ছুটেছি অসীম যাত্রীর বেশে
        সারাদিন পথে একা।
    গিরি প্রান্তর বন উপবন,
    চরণের তলে করি লঙ্ঘন ;
প্রলয় ঝড়ের মাতনে মেতেছি
        ছুটিয়াছি অবিরল,
খুঁজেছি সুদূর পারের বঁধু
        নয়নে ভরিয়া জল।

হয়ত তাহার দেখা পাব না
        জীবন ব্যাপিয়া চলি,
হয়ত শূন্য রবে চিরকাল
        মোর ভিক্ষার ঝুলি।
    তবু জানি এই যাত্রার শেষে
    পথিকের বেশে চলে যাবে হেসে ;
পূর্ণ মিলন—প্রেম-ঘন-ছবি
        ভাতিবে নয়ন তীর।
সারাদিনমান বিরহ ব্যথার
        থামিবে অশ্রুনীর !

দোহাদের রীতিনীতি ও পালপার্ব্বণ

শ্রীজগদীশচন্দ্র বক্সী

দো-হাদ, দুইটি শব্দকে একত্র করিয়া হইয়াছে 'দোহাদ' এবং এই নামটির একটি অর্থ আছে যাহা এইস্থানে প্রযোজ্য। 'দো' মানে দুই এবং 'হাদ' মানে সীমানা। গুজরাট ও মালওয়াড়ের সীমানার মাঝখানে একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে এবং সেই ভূখণ্ডটির নামই দোহাদ। সমস্ত ভূখণ্ডটাই পাহাড়ে পরিপূর্ণ। পাহাড় কাটিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কাহারা আসিয়া শহর নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না, তবে শহরটি পুরানো দিনের তৈরী তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বোম্বে হইতে দিল্লী যাইবার বি, বি, এণ্ড, সি, আই রেলোয়ে মেন লাইনে বরোদার কয়েক ষ্টেশন উত্তর পূর্ব্বে দোহাদ একটি ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে দোহাদ শহর ও ষ্টেশন হইতে শহরের সমান্তরালভাবে ১ মাইল দূরে বি, বি, এণ্ড, সি, আই রেলোয়ে একটা বড় Loco Workshop আছে। সেই workshop-এর চারিদিকে প্রায় দুই মাইল পরিধি লইয়া একটি অতি সুন্দর কলোনী আছে। সে কলোনীটির নাম ফ্রিল্যাণ্ডগঞ্জ। পাহাড়ের কোলে কলোনীটি দেখিতে অতি সুন্দর। কলোনী এবং শহরের মাঝখানে খুব বড় একটি সরোবর আছে এবং সরোবরটির সম্পূর্ণ অংশই খুব বড় বড় পদ্মফুলে ভরা। এখান হইতে বোম্বে, বরোদা, আমেদাবাদ ইত্যাদি স্থানে পদ্মফুল চালান হইয়া থাকে। সরোবরটির নাম 'ছাব্ তলাব'। কোন একজন হিন্দু রাজার হুকুমে এই সরোবরটি একরাত্রে সম্পূর্ণ খনন করা হইয়াছিল। এত লোক নিযুক্ত হইয়াছিল যাহাতে প্রতি লোককে মাত্র এক ঝুড়ি মাটি খুঁড়িতে হইয়াছিল। গুজরাটিতে 'ছাব্' মানে এক ঝুড়ি, সুতরাং সরোবরটির নাম 'ছাব্ তলাব' হইয়াছে। সেই তলাবে এখনও অনেক দিনের পুরানো বাঁধা ঘাট এবং মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর দ্বীপ আছে, তবে উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে তাহার সে সৌন্দর্য্য এখন আর নাই।

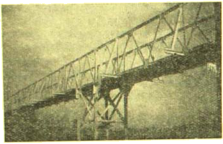
দোহাদ ওয়ার্কশপের সন্নিকটস্থ সেতু

ছাব্ তলাব

ফ্রিল্যাণ্ডগঞ্জে যাইবার পথ

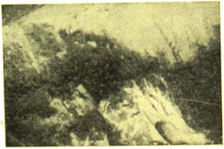
দোহাদের সন্নিকটস্থ পাহাড়তলা

ঐতিহাসিক দিক দিয়া দোহাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ভারত সম্রাট সাজাহানের সময় এ অঞ্চলে অনেকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে সাজাহানের নির্ম্মিত একটি খুব বড় দুর্গ আছে। দুর্গটির নির্ম্মাণ কৌশলে মনে হয় সেকালে দুর্গটি খুব সুরক্ষিত ছিল। দুর্গ হইতে অনতিদূরে একটি বড় মস্‌জিদ আছে। এখানের জনশ্রুতি, ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেবের জন্মস্থান নাকি এখানেই। ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেবের জন্মস্থান বলিয়া অনেকেই সেই মস্‌জিদটি দর্শন করিতে যান। সে সম্বন্ধে নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারা যায় যে আওরঙ্গজেবের নাড়ী কাটিয়া এখানে মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যতা জানি না, তবে আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে এই জনশ্রুতি এ অঞ্চলে খুব প্রচলিত।

দোহাদ হইতে কিছু দূরে 'ডাকুর' নামে একটি স্থানে বিখ্যাত

'রণছোড়জীর' একটি মন্দির আছে। 'রণছোড়জীর' মন্দির কিরূপে স্থাপিত হয় ইহা সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। 'রণছোড়জী' প্রথমে ছিলেন দ্বারকাতে এক বিখ্যাত মন্দিরে। সেখানে তৎকালীন রাজার কোন অন্যায় আচরণে 'রণছোড়জী' নিকটস্থ এক সাধুকে স্বপ্নে আদেশ করেন তাঁহাকে দ্বারকা হইতে অনেক দূরে কোথাও লইয়া যাইতে। আদেশ অনুযায়ী এক রাত্রে উক্ত সাধু পাথরের বিগ্রহকে চুরি করিয়া দ্বারকা হইতে পলায়ন করেন। পরদিন প্রভাতে বিগ্রহ চুরি হইয়াছে জানিতে পারিয়া রাজা চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন এবং হুকুম দিলেন যেমন করিয়াই হোক্ বিগ্রহকে আনিতে হইবে। এদিকে সাধু বিগ্রহ লইয়া কয়েক দিন চলিবার পর শ্রান্ত হইয়া এই ডাকুরের একটি নদীর ঘাটে বিগ্রহ নামাইয়া বিশ্রাম লাভ করেন। ইতিমধ্যে সেখানে রাজার লোক আসিয়া সাধুর নিকট বিগ্রহকে দেখিতে পাইয়া সাধুকে চোর মনে করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে বিগ্রহ সেখান হইতে কেহই নড়াইতে সক্ষম হয় না। নানা রকম আয়োজন করিয়াও যখন বিগ্রহকে সেখান হইতে লইয়া যাইতে পারা গেল না তখন রাজা সেখানেই মন্দির স্থাপন করিলেন। তখন হইতেই এ স্থান হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

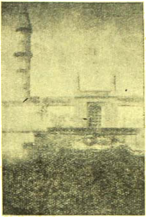
মসজিদ—আওরঙ্গজেবের জন্মস্থান

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই গুজরাটি। তবে কার্য্য উপলক্ষে নানা প্রদেশের লোকের সমাগম এখানে হইয়াছে। এদেশবাসীর জীবনযাপন প্রণালী অনেক দিক দিয়াই প্রশংসার যোগ্য।

পাওবগড়ার নিকটস্থ একটি ঝরণা

এখানে আসিবার পর অনেক পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়া তাঁহাদের জীবনযাপন সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। কি নারী, কি পুরুষ সকলেই খুব কর্ম্মঠ, স্বাবলম্বী ও মার্জ্জিত। এখানে কাহাকেই প্রায় বেকার থাকিতে দেখা যায় না। যাহার চাকুরী জোটে নাই তাহাকে কোন ব্যবসা করিতে দেখা যায়। ছোট ব্যবসা অল্প মূলধন লইয়া করিব না—এরূপ মনোভাব কাহারো আছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে এদিকের লোকের ঝোঁক খুব বেশী। পুরুষ সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকে বাহিরের কাজ লইয়া, আর নারী নিজ হাতেই বাড়ীর ভিতরের সমস্ত কাজ করিয়া থাকে। বড় পরিবারে খুবই চাকরকে কাজ করিতে দেখা যায় না। পুরুষরা যখন বাহিরের কাজে ব্যস্ত থাকে তখন মেয়েরাই তাহাদের দরকারী সওদা বাজারে যাইয়া যেখানে সুলভে সস্তার জিনিষ পাওয়া যায় সেখান হইতে তাহা খরিদ করিয়া লইয়া আসে। হঠাৎ কোন সময়ে বিশেষ দুর্ঘটনায় হাসপাতালে যাইবার দরকার হইলে মেয়েরা পুরুষের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। এখানে অনেক ধনী লোকের বাড়ীর মেয়েদেরও বাহিরে নানারূপ কাজ করিতে দেখা যায়। নারীদের অবাধ চলাফেরা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ২০ বছরের কোন যুবককে প্রায়ই অবিবাহিত দেখা যায় না। ইহাদের আর একটি বিশেষ গুণ আছে, ইহারা খুব মিতব্যয়ী। এরা মোটেই বিলাসপ্রিয় নয়। যে সহরে দশ হাজারের উপর লোকসংখ্যা এবং সকলেরই অবস্থা নিতান্ত খারাপ নয়—সে সহরের একটি সিনেমা হাউসও ভালরূপ চলে না। অথচ বাংলা দেশে দেখিয়াছি, ছোট একটি সাব্‌ডিভিসন সহরেও দুইটি তিনটি সিনেমা হাউস পুরাদমে চলে। আমরা হয়ত বলিব—এ দেশের লোক সৌখীন নয় ও শিল্প রুচি মোটেই নাই। কিন্তু আজ এই দুর্ভিক্ষের দিনেও এদেশের লোকের মুখে বিষাদের ছায়া এখনও পড়ে নাই। অযথা পয়সা ব্যয় না করিয়া সেই পয়সা দিয়া খাইয়া বাঁচিতেছে ও আনন্দ করিতেছে।

পাওবগড়ার নিকট আর একটী ঝরণা

এখানে আর একটি বিশেষ পাহাড়ী জাত আছে যাহাদের ভীল্ বলা হইয়া থাকে। আধুনিক সভ্যতার কোন সন্ধান তাহারা এখনও পায় নাই। পাহাড়ে পাহাড়ে তাহাদের বাস, তীর ধনুক তাহাদের প্রধান অস্ত্র, শিকার তাহাদের জীবিকা। পাহাড়ে নানারূপ কৃষি-কার্য্যাদিও তাহারা করিয়া থাকে, যথা

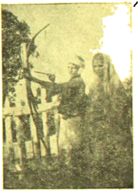
ভীল দম্পতি

ছোলা, চীনাবাদাম, মকাই ইত্যাদি। ইদানীং সহরের সংস্পর্শে আসিয়া সহরের আশেপাশের ভীলগুলি কতকটা সভ্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া সহর হইতে অনেক দূরে পাহাড়ের অভ্যন্তরের ভিলগুলি হিংস্র। কোন ভদ্রলোককে কখনো পাহাড়ে অর্থাৎ নিজেদের এলাকার মধ্যে পাইলে অলক্ষ্যে তীর ছুড়িয়া তাহাকে ঘায়েল করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যায়। তাহাদের তীরের লক্ষ্য কখনও ভ্রষ্ট হয় না। ভীলদের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এক-প্রকার দেশী-মদ প্রচুর পরিমাণে পান করে এবং ফলে সময় সময় তাহারা অত্যন্ত হিংস্র হইয়া থাকে। ভীলদের বিবাহ পদ্ধতি চমৎকার; বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে দুই জোড়া বলদ যৌতুক দিয়া তবে কোন ভীল্ কোন ভীল্ রমণীকে বিবাহ করিতে পারে। দুই জোড়া বলদ যৌতুক দিবার হাত হইতে রেহাই পাইবার একটি উপায় আছে যাহা ভীলদিগের মধ্যে খুব প্রচলিত। বিবাহের পূর্ব্বে কোন ভীল্ কোন ভীল্ মেয়েকে চুরি করিয়া লইয়া আসে। তারপর মেয়ের পিতা যখন সন্ধান পায় কে তাহার মেয়েকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে; তখন কন্যাপক্ষ এক রাত্রিতে দলবল লইয়া অতর্কিতে সেই ছেলের বাড়ী আক্রমণ করে। যদি যুদ্ধে ছেলে পরাজিত হয় তবে মেয়ের পিতা সেই ছেলেকে বাধ্য করে—সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী তাহার মেয়েকে বিবাহ করিতে। এক্ষেত্রে বরপক্ষ মাত্র একজোড়া বলদ কন্যাপক্ষকে যৌতুক স্বরূপ দেয় এবং সেই মেয়েকে সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী বিবাহ করে। তাহাদের শত্রুতারও অবসান হইয়া থাকে। এখানে ইদানীং ভীলদিগের পুত্রকন্যাদের শিক্ষাদিবার জন্য একটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্য শিক্ষাও দেওয়া হইয়া থাকে। ভীলদিগের দুইটি জিনিষ প্রশংসার যোগ্য। প্রথম তাহাদের সমবেত নৃত্য। এখানে এ নৃত্যকে ভীলনৃত্য বলা হইয়া থাকে ও নানারকম উৎসবে ভীল্-নৃত্য একটি আকর্ষণীয় জিনিষ। দ্বিতীয় তাহাদের বাঁশী। নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় অথবা নিশীথ রাত্রিতে ভীলদিগের বাঁশীর বাজানো সুর অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।

দোহাদ প্রবাসী বাঙ্গালী সমিতির বনভোজন

শিশু পুত্র-কন্যাসহ ভীল রমণী

এখানকার বাৎসরিক প্রধান উৎসব হোলী, দেওয়ালী ও গণপতি উৎসব। হোলী এবং দেয়ালী উৎসবের সহিত আমরা পরিচিত, কিন্তু গণপতি উৎসব আমাদের দেশে খুব বেশী প্রচলিত নাই। গণপতি উৎসব মানে গণেশ পূজা। ভাদ্রের শুক্লা চতুর্থী হইতে শুক্লা দশমী পর্য্যন্ত মহাসমারোহে স্থানীয় মন্দিরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এদেশে এ উৎসবের প্রধান আকর্ষণ নানারকম সঙ্গীত, ক্রীড়া ও এদেশের প্রসিদ্ধ 'গরবা' নৃত্য। বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীদিগের গরবা নৃত্য উৎসবের প্রধান অঙ্গ। কয়েকদিন উৎসবের মধ্যে একদিন কয়েক ঘণ্টা শুধু মেয়েদের উৎসব হইয়া থাকে। সে উৎসবের নাম 'হলদি কুমকুম উৎসব'। আমাদের দেশে পূজায় ব্যবহৃত তেল সিঁদুরের পরিবর্ত্তে এদেশে হলদি আর কুমকুমের প্রথা প্রচলিত। সেদিন মেয়েরা সমবেত 'গরবা' নৃত্য করিবার পর 'হলদিকুমকুমরঞ্জিত ভালে' হলদি কুমকুম লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে এবং একবৎসরকাল সযত্নে তাহা ঘরে রাখিয়া দেয়। দশমীর দিন মহাসমারোহে গণপতিদেবের বিসর্জন হয়। আমাদের দুর্গোৎসবের মতই এখানকার গণপতি উৎসব।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার পত্তন

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

ইংরাজ প্রথম বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার জন্য আসিয়াছিল। আমাদের আত্মকলহের সুযোগে ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তাহারা এ দেশে রাষ্ট্র শাসন ভারও গ্রহণ করিয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বিশাল ভারত সাম্রাজ্যে ইংরাজ বণিকদল ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অসি ও মসী বলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। তদানীন্তন রাষ্ট্রবিদ্‌গণের বুদ্ধি ও কৌশলে এদেশীয় নর-নারীর ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।

কোন ধর্মপ্রচার করাও তখনকার রাজকর্মচারীদের কোন নীতি ছিল না। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনেরও কোন চেষ্টা তখন করেন নাই। বরং ধর্মপ্রচারকগণ এ দেশবাসীর মধ্যে ধর্মপ্রচার করিবার সুবিধার জন্য এবং রাজকর্মচারীদের রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য এদেশের ভাষা শিখিবার নানা চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতে দেড় শত বর্ষেরও অধিক ইংরাজদের রাজশাসন ও বাণিজ্যের মূল কেন্দ্রস্থল ছিল। সেই জন্য বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার জন্য মিশনারীরা শ্রীরামপুরে প্রথম আড্ডা করেন। বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম ব্যাপটিষ্ট মিশনারী আসেন জন টমাস ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে। তিনি ও কেরী সাহেব বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি কর্ত্তা ও প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁহাদের অনুপ্রেরণায় রামরাম বসু গদ্য গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮০২ খৃঃ জুলাই মাসে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গদ্য পুস্তক ছাপা হয়। ইহাই বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম মুদ্রিত গদ্য পুস্তক।

এই শ্রীরামপুরের মিশনারী গোষ্ঠী (হালহেড,, চাম্বার্স্, টমাস, এডমনষ্টোন, উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান) সাহায্যে ও সৃষ্টি শক্তি বলে বাংলা গদ্য সাহিত্যের গোড়ার পত্তন করেন। "এ কথা আজ আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রধানতঃ এই সকল বৈদেশিক কর্মীর চেষ্টায় বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইয়াছে, ইহাদেরই উৎসাহে বাঙালী পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন।" (সজনীকান্ত দাসের উইলিয়াম কেরী পৃঃ ৭)

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা প্রথম বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন— ১৮০০ খৃষ্টাব্দ নাগাইত। হালহেড ও কেরী বাংলা ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। কেরী অভিধান প্রণয়ন ও মুদ্রণ করেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরাজ সিভিলিয়ানদের এদেশে পাঠাইতেন, তাঁহাদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন—তখনকার গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শেষের দিকে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ স্থাপিত হয়। কেরী সাহেব সেই বিভাগের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি আদি আট জন পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁহারা গদ্য পুস্তক, ব্যাকরণ, ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা শিক্ষার প্রচলন করিতে থাকেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত ইংরাজি শিক্ষা দিবার কোন প্রচেষ্টা ইংরাজরা করেন নাই— স্ত্রী শিক্ষার কথা ও একেবারে তখন উঠে নাই।

বাংলায় তথা ভারতে প্রথম স্ত্রী শিক্ষা কথা উঠিয়াছিল ১৮২১ সালের ২রা মে স্কুল সোসাইটীর বার্ষিক সভার অধিবেশনে। সেখানে [illegible] স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিতে সভাপতি তৎকালের চীফ্ জাষ্টিস ঈষ্ট, বলেন—"He had the gratification to know that some natives * * * were giving their attention to the subject; and in some instances privately endeavouring in their circles to give effect to their designs for the instruction of their females." ([illegible] Educational Records—1840 to 1859, page 35)

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার পণ্ডিত মহাশয় 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' পুস্তকে ভারতে নারীর স্ত্রী শিক্ষা কেমন ছিল এবং কি প্রকার হওয়া উচিত তাহার আলোচনা করেন।

ডেভিড হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে লেডীজ সোসাইটী ফর্ নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ১৮২৪ সালে কয়েকটী বালিকা বিদ্যালয় পরিচালন করেন। মিস্ কুক্ বিলাত হইতে আসিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ৫ বৎসর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের রাজবাটিতে সে স্কুলের ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত।

ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ও প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট)

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মে রাজা বৈদ্যনাথ ২০,০০০ টাকা দান করেন। সেই অর্থে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পূর্ব্বে একটি কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহপত্তন হয়। সেই স্কুলটিকে কেন্দ্র করিয়া মিস্ কুক্ কয়েকটী মিশনারী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সে গুলিতে খ্রীষ্ট ধর্মানুকূলে শিক্ষা দেওয়া হইত বলিয়া শিক্ষিত উচ্চ ঘরের মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইত না।

সরকার স্ত্রী শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উদাসীন ছিলেন। "Prior to the Despatch of 1854 from the court of Directors, female education was not recognised as a branch of the state system of Education in India" (রীচির এডুকেশনাল রেকর্ড পৃঃ ১৩) বেথুন সাহেবের আপ্রাণ চেষ্টায় গভর্ণমেন্ট অবশেষে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে সম্মত হন। হাওয়েল সাহেবের ভারতে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বেথুনের মতে বারাসতে দেশীয় লোকের কমিটির অধীনে একটি বালিকা বিদ্যালয়কে সর্ব্বপ্রথম স্বীকার করেন।

"The council warmly took up the proposal and the first female school recognised by the govt. was established under a committee of Native gentlemen at Barasat."

শ্রীমতী সরলা রায় (মিসেস্ পি. কে. রায়) শিল্পী মুকুল দে অঙ্কিত

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব কোন রকম ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইবে না—এই সর্ত্তে কলিকাতায় প্রথম সাধারণ প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন হেদুয়ার পশ্চিম কূলে ৭ই মে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে। পরে এই স্কুল বেথুন স্কুল ও বেথুন কলেজ নামে খ্যাত হইয়া আছে। বঙ্গ বালিকা বিদ্যালয় ইহার সহিত মিলিত হয়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডাইরেক্টারগণ গবর্ণর জেনারেল ডালহৌসীকে এক "ডেসপ্যাচ"—নির্দেশ লিপি পাঠান। সেই ডেসপ্যাচে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরগণ ভারতে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা, ভারতীয়গণকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষাবিভাগ প্রচলন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ভারতে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটী প্রদেশে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। এই ডেস্প্যাচ "দি ম্যাগনা চার্টা অব্ ইংলিশ এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া" নামে খ্যাত। লর্ড ডালহৌসী একটী শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পাঠান, তার ফলে ১৮৫৭ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। লর্ড ক্যানিং প্রথম চ্যান্সেলার ও প্রধান বিচারপতি স্যর জেমস্ কলভীল প্রথম ভাইস্ চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। চল্লিশ জন সিনেট সভার সভ্য মনোনীত হন—তাহার মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মৌলভী ওয়াজী প্রথম ভারতীয় সভ্য হইয়াছিলেন।

মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা এবং স্ত্রীশিক্ষা পরিদর্শনের জন্য শিক্ষাবিভাগে ভারত সরকার দপ্তর খুলিলেন বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষা পাইবার নিয়ম রহিল না।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব নবনির্ম্মিত বিরাট 'সিনেট হল' দালানে সম্পন্ন করিতে পারিলেন বলিয়া আনন্দ করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিশ বৎসর পর পর্য্যন্ত কোন মহিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার অধিকার ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৫ সালের ২৫শে জুন তারিখের সিণ্ডিকেট সভার কার্য্যবিবরণীর ১১ ধারা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার নিকট একটী ছাত্রী এনট্রেন্স পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সিণ্ডিকেট সভা মেয়েদের পরীক্ষা দিবার বিধি না থাকায় সেই ছাত্রীকে অনুমতি দিতে পারিলেন না। The syndicate are of opinion that in the Act of incorporation they have no power to admit any female to a University Examination and the applicant may be informed accordingly.

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাকে পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিলেন না, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হয় কিনা জানিতে চাহিলেন।' তাহার উত্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লিখিলেন—স্ত্রীলোকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার কথা বিবেচনা করা অবান্তর, কোন রমণী পরীক্ষা দিবার অনুমতি চাহেন নাই, এবং চাহিবার আশা নাই। That in the opinion of the syndicate, the question of the admission of females to the Univer sity—is an abstract question. No female has applied, or is expected to apply for Examination.

স্ত্রীলোকদের শিক্ষার প্রতি তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় এমনই উদাসীন ছিল। কিন্তু তার দেড় বৎসর পর ১৮৭৬ সালের ২৫শে নবেম্বর তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে—দেরাদূনের দেশীয় খৃষ্টান বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক রেভাঃ হেরণ চন্দ্রমুখী বসু নামক একটী খৃষ্টান বাঙ্গালী বালিকা এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে দিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদের পরীক্ষা দিবার কোন অধিকার বা বিধি না থাকায় চন্দ্রমুখী পরীক্ষা দিতে পারিলেন না, তবে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত এবং স্ত্রীলোকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য সেই বৎসরের ছাত্রদের প্রশ্নপত্র তাঁহাকে দেওয়া হয়। তিনি ছাত্রদের মতই উত্তর দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সাফল্য-সূচক হইয়া ১৮৭৭ সালের ১০ই মার্চ্চ তারিখে সমাবর্ত্তন সভায় ভাইসচ্যান্সেলার হবহাউস সাহেব তাঁহার প্রশংসা করেন ও আক্ষেপ করিয়া বলেন—'Our rules did not contemplate such a thing, and all we could do for her was to put her through the same Examination papers as were prepared for the candidates (Convocation Address Vol. 1. Page 335)

তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে যে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে—গৃহস্থালীতে মেয়েদের প্রভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সংসারের খরচ, শিশুপালন, পরিচারক ও পরিচারিকাদের নিয়ন্ত্রণ, প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা বিষয়ে পুরুষকে তাহার মাতা, স্ত্রী ও কন্যার উপর নির্ভর করিতে হয়। এইরূপ প্রথা প্রাচীন লোকেদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল, এই আদর্শই এখনও ইংলণ্ডে প্রতিপালিত হইতেছে, এবং আমার বিশ্বাস ভারতেও তাহা অনুসৃত হয়। আমরা মায়ের ক্রোড়ে বসিয়া আমাদের চরিত্র গঠন করি ও মাতৃভাষা শিক্ষা করি। সেই মায়ের জাতিকে সৎ ও উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিতে আমরা কি ইতস্ততঃ করিতে পারি। আমার বিশ্বাস যে জাতি তাঁর নারীকে শিক্ষা দিতে কুণ্ঠা করেন তাঁহারা তাহাদের জাতির অর্দ্ধেক শক্তি নষ্ট করিয়া থাকেন; এমন কি তার জন্য অপর অংশও পঙ্গু হইয়া পড়ে। My belief is that the nation which refuses to educate its women, wastes half its available power, and that it is doubtful whether it does not waste the more important half." (Convocation Address Vol. 1.)

কামিনী রায় (প্রথম অনার্সসহ গ্র্যাজুয়েট হন। ইনি দ্বিতীয় মহিলা গ্র্যাজুয়েট)

হবহাউস সাহেবের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত হইবার সূচনা হয়। তবে তিনি বলেন—"স্ত্রীলোকদের শিক্ষা তাহাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। পুরুষেরা যে ধারায় শিক্ষা পাইয়া থাকে তাহারই অনুরূপ হওয়া অপ্রয়োজন। বিষয়টী অতি জটিল, সরকারী মনোভাব লইয়া ইহার বিচার করা যায়।

ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজের রীতি ও নীতি যেমন, তেমনি অবগুণ্ঠনপ্রথা ও বাল্য-বিবাহ—স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়। বহু যুগ যাইবে এই সব সংস্কারের প্রভাব হইতে দূরে যাইতে। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি আমরা গায়ের জোরে অগ্রসর করিয়া দিতে পারি না—ইহা সময় সাপেক্ষ।

১৮৭৭ খৃঃ ২৭শে জানুয়ারী তারিখের সিণ্ডিকেট সভার কার্য্যবিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায়—বহু আলোচনার পর স্থির হয়—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রদানের সময় আগত। (২) সিণ্ডিকেট সভা ফ্যাকাল্টি অব্ আর্টস্ সভার সহিত পরামর্শ করিয়া মেয়েদের পরীক্ষা দিবার বিধি-নিয়ম গঠন করিবেন। ১৭ই মার্চ্চ তারিখের সভায় ভাইস-চ্যান্সেলর ম্যার্কীর প্রস্তাবে ও রেভাঃ কৃষ্ণমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সিণ্ডিকেট স্ত্রীলোকদের পরীক্ষা দিবার প্রস্তাব দুইটী অনুমোদন করেন।

১৮৭৭ খৃঃ ২২ই মে ফ্যাকাল্টি সভায় প্রথম স্থির হয় মেয়েদের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হউক। মেয়েদের পরীক্ষা ছেলেদের পরীক্ষারই অনুরূপ এবং সমান মানেরই হইবে। কেবল মহিলার তত্ত্বাবধানে পৃথক স্থানে মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে এবং সভা বি.এ. এম.এ ও ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষা বিষয় আলোচনার জন্য রেভাঃ কে. এম্. বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল লতিফ, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেঃ ফাইফ, বাবু প্যারীচরণ মিত্র, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, এ ক্রফ্ট্ খান, পাইন ও বাবু কালীচরণ ব্যানার্জিকে লইয়া একটী কমিটি গঠন করেন।

ইঁহারা মেয়েদের পরীক্ষা দিবার বিধি-নিয়ম প্রস্তুত করিয়া দিবার পর ১৮৭৮ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী সিণ্ডিকেট তাহা আলোচনা করেন। ২৭শে এপ্রিল সিনেট সভার অধিবেশনে কাজীন্ মার্জ্জীর প্রস্তাবে মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাগুলি দিবার অধিকার দেওয়া হইল। কিন্তু তখনও ভারত গভর্ণমেণ্ট মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুমোদন করিতেন না। ১৮৭৮ সালে ভারত সরকারের পক্ষে গভর্ণর জেনারেল লর্ড লীটন মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার অধিকার প্রদান মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

এই সুযোগে ১৮৭৮ সালে কুমারী কাদম্বিনী বসু (পরে গাঙ্গুলী) ও সরলা দাস (বর্ত্তমানে মিসেস্ পি. কে. রায়) এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। দুইজনই অনুমতি লাভ করেন। ডাঃ পি. কে. রায় মহাশয়ের সহিত সরলা দাসের বিবাহ হইয়া যাওয়াতে তাঁহার এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া হইল না। কাদম্বিনী পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কাদম্বিনীই প্রথম মহিলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৭৯ খৃঃ ১৫ই মার্চ্চের সমাবর্ত্তন সভায় ভাইস-চ্যান্সেলার স্যর আলেকজাণ্ডার আর্বুথনট্ কাদম্বিনীকে প্রশংসা করিয়া বলেন—এই ঘটনা অতি বিস্ময়কর ও স্মরণীয় ঘটনা (interesting and important); কাদম্বিনী এক নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগে পাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ করেন। স্যর আর্বুথনট্, স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে নানা যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তবে তিনি বলেন দেশের নর-নারীর শিক্ষা সেই দেশের লোকের হস্তে থাকাই প্রয়োজন। সরকার বা বিদেশীয় কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন—It is a matter in which neither the Gov., nor this university, nor any European Agency of any description can do much to help you. It is essentially an object demanding Native thought and efforts, must be attained by your own exertions by gradual conquest of ancient prejudices, and by a change of national customs which history of the world teaches us, it is by no means easy to effect. (Convocation Address, Vol. 1., Page 399) এদেশের শিক্ষিত পুরুষরাই স্থির করিবেন তাঁহাদের স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যাকে কি প্রকার শিক্ষা দিবেন। তবে সুখের বিষয় এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা স্ত্রীশিক্ষা দান বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। শিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমাদের দেশের সে যুগের মাতব্বর লোকেরা এই ইংরাজ মনীষীর সৎ উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। ক্রমশঃ বঙ্গদেশের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থার ভার বিদেশীয়দের উপরই গিয়া পড়িল। পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিবার নীতি রাজপুরুষগণ ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাহারা এদেশের মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। কিন্তু আমাদের পরাধীনতার দোষেই রাজার জাতির অনুকরণ করার স্পৃহা এমনই প্রবল হইল যে আমরা ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য মেয়ে স্কুল প্রবর্ত্তন করিলাম। বেথুন ফিমেল স্কুলের প্রথম ছাত্রী মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কন্যাদ্বয়—কুন্দমালা ও ভুবনমালা এবং রাজগোপাল ঘোষের কন্যা। বিক্রমপুর দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার উৎসাহ দিবার নিমিত্ত নিজ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ভুলিয়া কাদম্বিনী বসুকে বিবাহ করিলেন।

কাদম্বিনীর পরেই ১৮৮০ সালে কামিনী সেন (পরে রায়) প্রথম বিভাগে এন্ট্রেন্স পাশ করেন। তিনি প্রথম বাঙ্গালীর মেয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। তাঁর সঙ্গে Julia cazalet প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে পাঁচটী বঙ্গনারী এন্ট্রান্স পাশ করেন। বেথুন হইতে অবলা দাস (পরে লেডী বসু) কুমুদিনী খাস্তগীর, কানপুর হইতে ভার্জ্জিনীয়া মেরী মিত্র (পরে মিসেস্ পি. সি. নন্দী), দেরাদুন মিশন হইতে বিধুমুখী বসু, ফ্রী চার্চ্চ হইতে নির্ম্মলা মুখার্জ্জি (পরে সোম) পাশ করেন।

ভার্জ্জিনিয়া মেরী মিত্র এম্-বি (ডাঃ মিসেস্ পি-সি নন্দী)

১৮৮২, ১৮৮৩ সালে কোন বাঙ্গালীর মেয়ে এন্ট্রান্স পাশ করেন নাই। আটটী বিদেশী মহিলা পাশ করেন। ১৮৮৪ সালে একটীও মেয়ে পাশ করে নাই, ১৮৮৫ সালে ডভটন স্কুল হইতে শৈলবালা দাস, ১৮৮৬ সালে সরলা ঘোষাল (বেথুন কলেজ হইতে) সরা ঘোষ (অনুতলার আলেকবণ্ড) বিমলা গুপ্ত (ঢাকার ইডেন ফিমেল স্কুল হইতে) পাশ করেন। ১৮৮৭ সালে বেথুনের হেমলতা ভট্টাচার্য্য, জীবনবালা ঘোষ জামদা মিত্র, ক্রাইষ্ট চার্চ্চ স্কুলের বনলকুমারী বসু, এলাহাবাদ হইতে বীণা ও হেনা ঘোষ, লাহোর হইতে কমলা চক্রবর্ত্তী ও সুহৃদ বিবান এন্ট্রান্স পাশ করেন। যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দশ বৎসরে দশটী মেয়ে পাশ হয়, বর্ত্তমান বৎসরে দুই সহস্র ছাত্রী সেই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

১৮৮০ সালে কাদম্বিনী বসু তৃতীয় বিভাগে এবং চন্দ্রমুখী বসু দ্বিতীয় বিভাগে ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চন্দ্রমুখী বসু এন্ট্রান্স পাশ

করেন নাই বটে, অনেক আলোচনা ও বাদানুবাদের ফলে তিনি যে ১৮৭৭ সালে ঠিক পরীক্ষায় পাশের নম্বর রাখিয়াছিলেন তাহাই এন্ট্রান্স পাশরূপে গণ্য করিয়া এফ-এ পরীক্ষা দিবার অনুমতি পান।

১৮৮২ সালে কামিনী সেন এফ-এ পাশ করেন। তৎপরে বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনীয়া মেরী মিত্র ১৮৮৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু বেথুন ফিমেল স্কুল হইতে বি-এ পাশ করেন। তাঁহারাই ভারতে প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। তাঁহারা বি-এ পাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ডিগ্রী দিবার জন্য সিনেট সভার বিশেষ অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়।

১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ্চ সিনেট সভায় রেভা: ডা: কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও মহেশ ন্যায়রত্নের সমর্থনে তাঁহাদের ডিগ্রী দিবার অনুমতি প্রদত্ত হয়। That the two female candidates who passed the recent B. A. Examination be allowed to take degree at the ensuing convocation (Cal. Uni. Minutes—1883)

ঐ বৎসর সমাবর্ত্তন উৎসব সভায় ভাইস-চ্যান্সেলার রেনল্ড সাহেব চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনীর উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—The most memorable event however of the year, the event which will make convocation of to-day a landmark in the educational history of India. তিনি চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—I congratulate the women of India, of whom they are the representatives and the pioneers. The condition of the female education in India is still painfully backward. Here in Bengal more progress has perhaps been made than in the other parts of the country.

বঙ্গ রমণীরাই সারা উত্তর ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তিকা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

তাহার তিন বৎসর পরে ১৮৮৬ সালে সুপরিচিত মহিলা কবি কামিনী সেন (রায়) বেথুন ফিমেল স্কুল হইতে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করেন। তিনিই ভারতে প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট অনার্স লইয়া পাশ করেন। তৎপর বৎসর ১৮৮৭ সালে বেথুন কলেজ হইতে কুমুদিনী খাস্তগীর ও নির্ম্মলা সোম অনার্স লইয়া দ্বিতীয় বিভাগে বি-এ পাশ করেন। ইহারাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রাজুয়েট। ১৮৯০ সালে বেথুন কলেজ হইতে শ্রীমতী সরলা ঘোষাল (চৌধুরী) বি-এ পাশ করেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা ঠাকুর ১৮৯২ সালে দুইটী বিষয়—ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অনার্স লইয়া প্রাইভেট ছাত্রী হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ইন্দিরা ঠাকুরই (মিসেস্ পি. চৌধুরী) প্রথম ভারতীয় মহিলা ফরাসী ভাষার গ্রাজুয়েট। তাহার পর ১৯০০ সালে কুমারী লিলীয়ান পালিত (মাননীয় স্যার তারকনাথ পালিত মহাশয়ের কন্যা) ফরাসী ভাষায় অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে বি-এ পাশ করেন। বঙ্গ-বালার বিদেশীয় ভাষায় দখল দেখিয়া তাঁহাদের বিদ্যানুরাগে বিস্মিত হইতে হয়। তখনও স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শেখা পাপ কর্ম্ম ছিল। হিন্দুরা বিশ্বাস করিতেন যে বধূগণ ইংরেজি লেখা পড়া শিখার পাপে বিধবা হইবেন।

১৮৯৯ সালে বেথুন কলেজ হইতে সরলা রক্ষিত সংস্কৃতে, ১৮৯৯ খৃঃ হেমলতা মজুমদার অঙ্ক শাস্ত্রে অনার্স লইয়া পাশ করেন। যেখানে তিন বৎসরে ১০টীও গ্রাজুয়েট হয় নাই সেখানে বর্ত্তমান বৎসরে শতাধিক গ্রাজুয়েট দেখা যায়।

১৮৮৪ সালে চন্দ্রমুখী বসু দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম-এ পাশ করেন। ইনি ফ্রী চার্চ্চ কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষা দেন। ইনিই ভারতে প্রথম মহিলা এম-এ।

তাহার পর ১৮৯১ সালে নির্ম্মলাবালা সোম ইংরাজিতে এম-এ পাশ করেন। মিসেস্ সোম পুনরায় ১৮৯৪ সালে দর্শনে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনিই প্রথম ভারতের মহিলা ডবল এম-এ। ইহারা স্বামী-স্ত্রীতে এক বৎসরেই বি-এ পাশ করিয়াছিলেন। ডবল এম-এ হইয়া ডিগ্রী গ্রহণ সময়ে সমাবর্ত্তন উৎসবে ভাইস চ্যান্সেলার ক্রফ্ট সাহেব তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন—I think I am entitled to say in the name of senate, I congratulate her on the zeal and devotion to learning which have been manifested throughout her distinguished academical career.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তনের গোড়ায় কোন বৃত্তির ব্যবস্থা স্বীকার করেন নাই। ১৮৬৬ সালে ভাইস চ্যান্সেলার বেলি সাহেব সমাবর্ত্তন সভায়—বোম্বাই নিবাসী রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ কর্ত্তৃক দুই লক্ষ টাকা পি. আর. এস বৃত্তি স্থাপনের জন্য প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। তাহাতে

নির্ম্মলাবালা সোম

বাৎসরিক সুদ হইতে এম-এ পাশ করিবার পর শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে (পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে) দশ হাজার টাকা ১০,০০০৲ বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হয়। সেদিনটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হইয়া আছে যেদিন একজন মহিলা Miss Florence Holland ল্যাটিনে এম-এ ১৮৯১ সালে পাশ করিয়া ১৮৯৩ সালে পি. আর. এস্ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ হাজার টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ভাইস চ্যান্সেলার ক্রফ্ট সাহেব তাহাকে প্রশংসা করিয়া বলেন—She has now crowned a distinguished academical career by winning in an open competition the highest honour which the University has to bestow. (Convocation Address, VOL I Page 732) তাঁহাকে ল্যাটিনে পরীক্ষক করা হইয়াছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা পরীক্ষক, তাঁহার পর নির্ম্মলাবালা সোম ইংরাজিতে পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অদ্যাবধি—পি. আর. এস বৃত্তি কোন বঙ্গরমণীর ভাগ্যে ঘটে

নাই। তবে আধুনিক সময়ে অল্প পরিমাণ বৃত্তি শ্রীমতী বিভা মজুমদার পাইয়াছেন; এমন ভাবে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলারা সম্মান অর্জন করিতে লাগিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুইটী মহিলা গ্র্যাজুয়েটকে ডিগ্রী দিবার সময় আমাদের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে সমাবর্ত্তন সভায় রেনল্ড সাহেব সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

St. Paul has told us that the path of safety for woman has in the performance of the function in wifehood and mother-hood, that is to say, in the exerciise of the domestic duties and virtues. For the possession of those virtues—the mild unobtrusive virtues of the family and the home—the women of India have long been honourably distinguished. If there were reason to fear that the luster of those virtues would be dimmed, or their strength impaired, by mental culture and education; if the proficiency of the student were to imply the deterioration of the woman, we might well think that the honour of an academical degree would be dearly purchased at such a price, (Convocation Address. Vol. II. Page 467)

এইরূপে দেখা যায় নানা বাধা ও প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বিভাগে ছাত্রীদের পরীক্ষা দিবার সুযোগ হইয়াছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী উৎসবের সময় একজন মহিলা গ্র্যাজুয়েট ছিল না—আজ তার ৬০ বছর পর শত শত মহিলা বি-এ, এম-এ, এম-এস-সি, পি-এচ্-ডি (ডাঃ সুষমা মিত্র প্রথম মহিলা পি-এচ-ডি) পাশ করিতে ও ডিগ্রী লাভ করিতে দেখা যায়। এখন আর মেয়েদের স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা দিতে হয় না। অনেক সুযোগ তাঁহারা পাইয়া থাকেন। সহ-শিক্ষাও চলিতেছে, মেয়েদের বিদ্যানুরাগও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার সভ্য (ফেলো) মহিলা মনোনীত হইয়াছেন। যিনি প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার আবেদন ১৮৭৮ সালে করিয়া মেয়েদের পরীক্ষা দিবার অধিকার সাব্যস্ত করেন সেই সরলা দাস (মিসেস্ পি. কে. রায়) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বেসরকারী মহিলা ফেলো।

এই প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের সাধারণ বিভাগে এন্ট্রান্স, ফার্ষ্ট আর্ট, বি-এ, এম-এ পরীক্ষা দিবার অধিকার ১৮৭৮ পর্য্যন্ত ছিল না। তেমনই মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের ভর্ত্তি করার নিয়ম ছিল না। ১৮৮২ সালে শ্রীযুক্তা অবলা দাস (এক্ষণে লেডী বসু) এন্ট্রান্স পাশ করিয়া এবং কাদম্বিনী বসু এফ-এ পাশ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার আবেদন করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ নারীর জন্য দ্বার খুলিতে বিমুখ হইলেন। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ও সরকার বাহাদুরের সহিত বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অবলা দাস অনুমতি পাইলেন না, বিফল মনোরথ হইয়া মান্দ্রাজে ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিখিবার জন্য চলিয়া গেলেন। কাদম্বিনী দমিলেন না, স্ত্রীজাতির চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার দাবী লইয়া লড়িতে লাগিলেন। দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, রেভাঃ কে. এম. ব্যানার্জ্জী, দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়দের সাহায্যও পাইলেন, কিন্তু অধিকার পাইলেন না। বি-এ পড়িলেন ও পাশ করিলেন। তখন মেডিক্যাল কলেজে নিয়ম ছিল বি-এ পাশ করিলে কোন ব্যক্তির (Person) মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার পূর্ণ অধিকার থাকিবে। কাদম্বিনী বি-এ পাশ করিয়া এই আইনের সুযোগ লইয়া ডাক্তারী পড়িবার দাবী পুনঃ পেশ করিলেন। এখন তাঁহার ভর্ত্তি হইতে নিবারণ করিবার ক্ষমতা আইন অনুসারে কাহারও রহিল না। কাদম্বিনী ভর্ত্তি হইলেন।

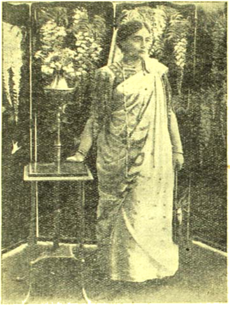

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী (ভারতে প্রথম ফরাসী ভাষায় মহিলা গ্র্যাজুয়েট)

তাঁহার পর মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী গ্রহণের নিয়ম সংশোধিত হয়, বিধুমুখী বসু ভর্ত্তি হন, তিনি ১৮৯০ সালে এম.বি পাশ করেন। তিনিই ভারতে প্রথম মহিলা এম.বি।

কড়ি ও কোমল

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

'আদেশ' কহিল "আমি কুলিশ-কঠোর,
জোর ক'রে সকলেরে বশে আনি মোর,"

'বিনতি' কহিল "আমি স্নেহে পায়ে ধরি'
অক্লেশে মান ভাঙি, হিয়া জয় করি।"

বাহির বিশ্ব

মিহির

ত্রিশক্তির সম্মিলন

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক ঘটনা মস্কোয় ত্রিশক্তি-সম্মিলনী এবং এই সম্মিলনীর সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত মুখ্যতঃ সামরিক এবং গৌণতঃ রাজনৈতিক। সামরিক বিষয়ে তিনটি শক্তি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছে; রাজনৈতিক বিষয়ে কোন মূলনীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে।

সামরিক বিষয়ে তিনটি শক্তির পক্ষ হইতে পুনরায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, শত্রুদেশগুলির সম্পূর্ণ পরাজয় অথবা বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে যুদ্ধ বন্ধ হইবে না। এই ঘোষণায় এক পক্ষে সোভিয়েট রুশিয়া এবং অন্য পক্ষে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি উপকৃত হইয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাবে যুদ্ধ যদি মধ্য পথে থামিয়া যায়, তাহা হইলে রুশিয়ার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। রুশিয়া চাহে, জার্ম্মানী ও তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সামরিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হউক, ইউরোপের গণশক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ নিষ্কণ্টক হউক। মস্কোতে রুশিয়া নূতন করিয়া আশ্বাস লাভ করিল—যুদ্ধ মধ্য পথে থামিয়া যাইবে না। পক্ষান্তরে, বৃটেন ও আমেরিকার এক শ্রেণীর লোক রুশিয়া ও জার্ম্মানীর স্বতন্ত্র সন্ধির আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছিলেন। জার্ম্মানীর প্রচার সচিব ডাঃ গোয়েবল্সও কৌশলে এই সম্পর্কে প্রচারকার্য্য চালাইতেছিলেন। রুশিয়া মস্কোতে স্পষ্টই তাহা জানাইয়া দিল যে, নাৎসী জার্ম্মানীর ধ্বংস সাধিত হইবার পূর্ব্বে সে অস্ত্র সম্বরণ করিবে না।

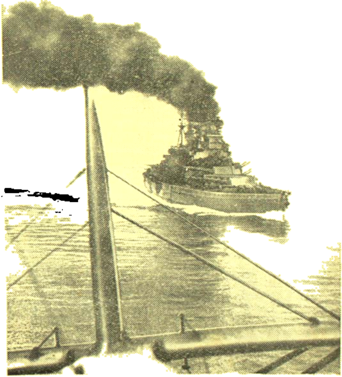

ব্রিটেনের অতি আধুনিক সুবৃহৎ রণতরী—"হো"

নাৎসী জার্ম্মানীর সামরিক পরাজয় ঘটিবার পরও জার্ম্মানীতে ও তাহার তাঁবেদার দেশগুলিতে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদের বীজ বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব। গণশক্তির দাবী অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিষ্ঠিত করাও অসম্ভব নয়। এই বিষয়ে রুশিয়া আশ্বাস পাইয়াছে যে, তাহার সহিত আলোচনা না করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি কোনরূপ ব্যবস্থা করিবে না। আবার আমেরিকার যে প্রতিক্রিয়াশীল দল রুশিয়ার বিরুদ্ধে তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, তাহাদের মুখ রুশিয়া বন্ধ করিয়াছে; সে আশ্বাস দিয়াছে যে, ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির সহিত পরামর্শ না করিয়া সে ইউরোপে কোনরূপ ব্যবস্থা চাপাইতে প্রয়াসী হইবে না। এই বিষয়ে ইতালী সম্পর্কিত ব্যবস্থা ভবিষ্যতে মন্ত্রীদের ঠিক করিবে। ইতালী হইতে ফ্যাসিস্টদের মূলোৎপাটনই যে মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্য, তাহা মস্কোতে সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধ পরিচালনকালে তিনটি শক্তির সহযোগিতার জন্য একটি পরামর্শ পরিষদ স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পরিষদ বহু পূর্ব্বেই স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। সে যাহা হউক, প্রস্তাবিত পরিষদ কার্য্যরত হইবার পর রাজনৈতিক কারণে সামরিক প্রয়োজনকে আর চাপা দেওয়া সম্ভব হইবে না বলিয়া মনে হয়। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ইতিপূর্ব্বে রাজনৈতিক কারণে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কিত প্রশ্ন চাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

যুদ্ধোত্তরকালে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তিনটি শক্তির সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা মস্কো-সম্মিলনীতে স্বীকৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। এই বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা বোধ হয় মস্কোতে হয় নাই, এই সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা হইয়াছে এবং কেবল মূলনীতিই আপাততঃ স্থির হইয়াছে।

মস্কো-সম্মিলনী আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রুশ কম্যুনিষ্ট দলের মুখপত্র 'প্রাভ্দা' ও রুশ সরকারের মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়ার' মন্তব্যে আভাস পাওয়া যায় যে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে কেবল যুদ্ধের কাল সংক্ষেপ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। ত্রিশক্তির সম্মিলনী সম্পর্কিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের কাল সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে তিনটি শক্তির ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। জার্ম্মানীকে অত্র প্রবল আঘাত করাই যুদ্ধের কাল সংক্ষেপ করিবার একমাত্র উপায়। মস্কো-সম্মিলনের ফলে এই সম্পর্কিত ব্যবস্থা কিরূপ দ্রুততা লাভ করে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সামরিক বিজয়ের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এখন স্বভাবতঃ অপ্রকাশ্য।

সিসিলি অভিমুখে আমেরিকান সৈন্য

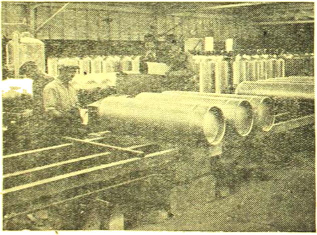

বিমানের চোঙগুলি স্থানান্তরিত করা হইতেছে

মস্কোর সিদ্ধান্ত শুনিয়া জার্ম্মানী অত্যন্ত নিরাশ হইবে। জার্ম্মানী এখন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ চালাইয়া কালক্ষয় করিতে চাহিতেছে; তাহার ধারণা—বহুকাল যুদ্ধ যদি চলে তাহা হইলে ক্রমে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত বৃটেন ও আমেরিকার—এমন কি বৃটেন ও আমেরিকার নিজেদের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দিবে। সেই মতবিরোধের সুযোগে সে উপকৃত হইবে। ইতিমধ্যেই পোল্যাণ্ড সম্পর্কে বৃটেন ও রুশিয়া একমত নয়, যুগোশ্লাভিয়া সম্বন্ধেও তাহাদের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। আমেরিকার একটী দল ইউরোপের প্রতি মনোযোগ প্রদানের বিরোধী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের আর মাত্র এক বৎসর বাকী। কাজেই, জার্ম্মানী মনে করিতে পারে যে, ওখানে এই বিরোধী পক্ষের মত উপেক্ষা করা রুজভেল্ট সরকারের পক্ষে দুষ্কর হইবে। জার্ম্মানী এখন আর ইঙ্গ-সোভিয়েট-মার্কিণ শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিবার কল্পনা করে না; ইহাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে পারস্পরিক বিচ্ছেদ ঘটায় সে সুবিধা লাভের আশা করে। মস্কো সম্মিলনীতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল—সম্মিলিত পক্ষের তিনটী শক্তির রাজনৈতিক আদর্শ ও স্বার্থ যাহাই হউক না কেন, নাৎসী জার্ম্মানীর সম্পূর্ণ পরাজয় সাধন সম্পর্কে ইহারা সকলেই একমত। মস্কোয় খোলাখুলি আলোচনা হওয়ায় এই বিষয়ে ইহাদের সহযোগিতা আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। জার্ম্মানীর বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের সহিত ইহারা যে কখনই আপোষ করিবে না, ইহা অত্যাচারী জার্ম্মানদিগকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্তে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। রুশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলে, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং সাধারণভাবে সমগ্র অধিকৃত য়ুরোপেই জার্ম্মানীদের যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহার জন্য পরোক্ষভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবেই বিশিষ্ট নাৎসী-নেতারা দায়ী। ইহাদের সহিত আপোষ দূরে থাকুক, ইহাদিগকে শাস্তি প্রদানের জন্য অত্যাচারিত দেশে প্রেরণ করা হইবে বলিয়া মিঃ চার্চ্চিল, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও মার্শাল ষ্টালিন্ ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘোষণার রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক।

ইউরোপের যুদ্ধোত্তরকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মস্কোতে কোনরূপ অপ্রীতিকর বিতর্কের উদ্ভব হয় নাই; বর্ত্তমানে যুদ্ধ পরিচালন সম্পর্কে যতটুকু রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন, তিনটি শক্তির প্রতিনিধিরা কেবল ততটুকু রাজনীতিই আলোচনা করিয়াছেন। রুশ নেতৃবৃন্দ ইহাই চাহিয়াছিলেন; তাঁহাদের নিশ্চিত ধারণা—নাৎসী-ফ্যাসী-বাদকে ইউরোপ হইতে নির্ম্মূল করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নাৎসী জার্ম্মানীর সামরিক শক্তি চূর্ণ করা প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিষ্ট মনোভাবাপন্ন কাহারও সহিত যাহাতে আপোষ

না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এই লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, তাহা হইলে ইউরোপের জনগণের আত্মকর্তৃত্বের পথে সকল বিঘ্ন দূরীভূত হইবে। মস্কোতে ঠিক এই বিষয়েই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। রুশিয়া তাহার অভিলষিত সিদ্ধিতে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ অবস্থার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শীঘ্রই আসন্ন, তখন বর্তমান সরকার ইউরোপের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে এখনই সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে স্বভাবতঃই ইতস্ততঃ করিবেন। মিঃ কর্ডেল হালের এই মনোভাবের জন্য মস্কোয় ইউরোপের ভবিষ্যত ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশ্ন আপাততঃ চাপা রাখা সহজ হইয়াছে।

ইংলণ্ডে শিক্ষার্থী ভারতীয় বিমান কর্ম্মচারীবৃন্দ

রুশ রণক্ষেত্রে যুদ্ধ

এই বৎসর গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সোভিয়েট রুশিয়া যে সামরিক বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। রুশিয়ার মিত্রশক্তিগুলিও তাহার এইরূপ বিজয় আশা করিতে পারে নাই। গত জুলাই মাসে কুর্স্ক অঞ্চলে জার্মান সেনাপতি ফন্ ক্লুগের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার পর হইতে অবিরাম রুশসেনা আক্রমণ চালাইতেছে। একই সময়ে দেড় হাজার মাইল রণাঙ্গনে দুই শত ডিভিসন সৈন্যের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ সমগ্র বিশ্বকে চমকিত করিয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে জার্মানীর বিশালতম ঘাঁটী—এক সময় পূর্ব্ব অঞ্চলে হিটলারের প্রধান কেন্দ্র স্মোলেন্স্ক আশাতীত অল্প কালের মধ্যে রুশ সেনার পদানত হয়। তাহার পর, সোভিয়েট বাহিনী শ্বেত রুশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। এই প্রদেশে জার্মানীর পরবর্ত্তী ঘাঁটী মিন্স্ক এখন তাহাদের লক্ষ্য। তিন দিক হইতে এই মিন্স্কের উদ্দেশে রুশ সেনার আক্রমণ চলিতেছে। অবশ্য প্রাকৃতিক কারণে এই অঞ্চলে আক্রমণের প্রাবল্য এখন কিঞ্চিৎ মন্দীভূত। এখন দক্ষিণ রাশিয়াতেই রুশ সেনার প্রচণ্ড আক্রমণ চলিতেছে। এই অঞ্চলে ক্রিমিয়া এখন স্থলপথে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন সংযোগ ; নীপার বাঁকের মধ্যে একটি বিশাল জার্মান বাহিনী প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত ; ইউক্রেণের রাজধানী কিয়েভ তিন দিক হইতে বিপন্ন।

গত চারি মাস সোভিয়েট বাহিনীর যে প্রতি-আক্রমণ চলিতেছে, তাহাতে জার্মানীর অনুকূলে বলিবার ছিল যে, কোথাও ষ্ট্যালিনগ্রাডের পুনরভিনয় হয় নাই। রুশ সেনা প্রত্যেকটি স্থান অধিকার করিবার পূর্ব্বে জার্মানরা তথা হইতে অপসরণ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দক্ষিণ রাশিয়ার যুদ্ধের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে মনে হয়, ক্রিমিয়ায় ও নীপারের বাঁকে জার্মানীর বহু সৈন্য ও সমরোপকরণ বিনষ্ট হইবে। জার্মান সমরনায়কেরা এখন আকাশপথে ও জলপথে ক্রিমিয়া হইতে সৈন্য অপসরণ করিতে প্রস্তুত হইবেন। সোভিয়েট বিমান বাহিনী এবং কৃষ্ণসাগরস্থিত রুশ নৌবাহিনী জার্মানদিগের এই উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য বাধা দান করিবে। এই বাধা অতিক্রম করিয়া ক্রিমিয়া হইতে সাফল্যের সহিত অপসরণ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না ; বিশেষতঃ কেবল জল ও আকাশপথে সম্পূর্ণ অপসরণ সম্ভবও নয়। এতদ্ব্যতীত নীপারের বাঁকে যে জার্মান বাহিনী পরিবেষ্টিত হইয়াছে, তাহারা পরিত্রাণ পাইবে কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। সোভিয়েট বাহিনী এখানে ষ্ট্যালিনগ্রাডের পুনরভিনয় করিবার চেষ্টাই করিতেছে।

ইতালীতে সঙ্কট

রুশিয়ার পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে—"ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি কর ; এই রণাঙ্গনে যেন রুশিয়া হইতে জার্মানীর অন্ততঃ ৬০ ডিভিসন সৈন্য অপসারিত হয়।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি—জার্মানী তাহার ২ শত ডিভিসন সৈন্য রুশিয়ায় নিয়োগ করিয়াছে। ইতালীতে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, ইহা প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন নয়,

পলায়নের পূর্ব্বে ইটালীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক
মোটর সাইকেল ধ্বংস করার দৃশ্য

এখানে জার্মানীর মাত্র ২৫ ডিভিশন সৈন্য ব্যাপৃত। কাজেই এই যুদ্ধের ফলে রুশ রণাঙ্গনে কোনরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নাই; ইহার জন্য জার্মান সমরনায়কগণ বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নন।

ইতালীতে যুদ্ধের গতিও উৎসাহজনক নয়। দুই মাস পূর্ব্বে বাদোগ্লিও-সরকার আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই দুই মাসে ইঙ্গ-মার্কিন সেনা ইতালীর এক-তৃতীয়াংশও অধিকার করিতে পারে নাই। জার্মানীর প্রবল প্রতিরোধ ভেদ করিয়া সেলার্ণোতে অবতরণ করিবার পর ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য একরূপ বিনা বাধায় নেপল্‌স্ অধিকার করিয়াছিল। কম্যুনিষ্টদের বিদ্রোহের ফলে জার্মানেরা বিনা যুদ্ধে নেপল্‌স্ ত্যাগ করে। ভল্‌টুর্ণো নদীর তীরে জার্মান সেনাপতি কেসেলরিং-এর প্রতিরোধ ভেদ করিতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটে। ইতালীর পূর্ব্ব উপকূলে ফোজিয়ার বিমানক্ষেত্র অধিকারের পর ইঙ্গ-মার্কিন সেনা ত্রিগ্নো নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। মোটের উপর ইতালীর এক শত মাইল রণাঙ্গনে সম্মিলিত পক্ষের সাফল্যের গতি অত্যন্ত মন্থর। নেপল্‌স্ নৌঘাঁটীর একদিনে সংস্কার হওয়া সম্ভব; কিন্তু এই পথে প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ অবতরণ করাইয়া জার্মানীকে প্রবলভাবে আঘাত করিবার চেষ্টা এখনও হয় নাই।

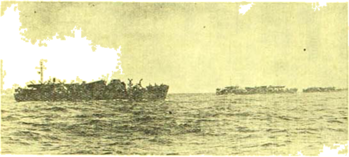

আমেরিকার জাহাজসমূহ কর্ত্তৃক ইউরোপে আসিবার জন্য আটলান্টিক পার হওয়ার দৃশ্য

ইতালীর নৌবহর হস্তগত হইবার পর সম্মিলিত পক্ষ ভূমধ্য সাগরে অপ্রতিহত প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কাজেই, দক্ষিণ ইতালীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই আড্রিয়াটিকের অপর তীরে বল্‌কানে তাঁহাদের আক্রমণ প্রসারিত হইবে বলিয়া সঙ্গতভাবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই; বল্‌কানে এখনও আক্রমণ প্রসারিত হয় নাই। অথচ বল্‌কান্ অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের বিদ্রোহ এখন অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। এই সময় বল্‌কানে সম্মিলিত পক্ষের আঘাত পতিত হইলে জার্মানীর পক্ষে একই সময়ে বাহিরের আক্রমণ এবং ভিতরের গণ-অভ্যুত্থান রোধ করা সম্ভব হইত না।

বাদোগ্লিও-সরকারের সহিত সম্মিলিত পক্ষের যে চুক্তি হইয়াছে, তদনুসারে তাঁহারা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইতালীর স্থানগুলি ব্যবহারের অধিকার পাইয়াছেন। কিন্তু ইজিয়ান্ সাগরের প্রবেশদ্বারে ডোডেকেনীজ দ্বীপপুঞ্জ তাঁহারা যথাসময়ে অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। অথচ বল্‌কানে আক্রমণ পরিচালনের জন্য এই দ্বীপমালার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক; গ্রীসে ও ক্রীট্ দ্বীপে এখান হইতে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করা সম্ভব।

ইতিমধ্যে টিরানিয়ান্ সাগরের কার্সিকা ও সার্ডিনিয়া হইতে জার্মানেরা বিতাড়িত হইয়াছে। ইহার ফলে সম্মিলিত পক্ষ ঐ সাগরে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই ঘাঁটি যথাযথ ব্যবহৃত হইবার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই।

সংক্ষেপে বাদোগ্লিও-সরকারের আত্মসমর্পণে সম্মিলিত পক্ষ যে অপ্রত্যাশিত সামরিক সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন, এখনও তাহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় নাই। মস্কো-সম্মিলনীতে এই সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে কিনা এবং সেই সিদ্ধান্তের ফলে সম্মিলিত পক্ষের সামরিক তৎপরতা সত্বর প্রবল আকার ধারণ করে কিনা, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রাচীর রণক্ষেত্র

প্রাচীর জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ—কোথাও তৎপরতা অধিক নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জেনারেল ম্যাক-আর্থার শত্রুকে ধীরে ধীরে আঘাত করিতেছেন। সম্প্রতি নিউগিনিতে লে, সালামোয়া ও ফিন্‌শা-ফেন্ সম্মিলিত পক্ষের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল অঞ্চল হইতে শত্রুকে বিতাড়িত করিতে অত্যন্ত সময় লাগিয়াছে। সম্প্রতি সলোমনে সম্মিলিত পক্ষের কিছু সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। এই অঞ্চলে জাপানের বিমানঘাঁটি রবাউলে সম্মিলিত পক্ষের বিমান প্রবল আঘাত করিতেছে।

এই অঞ্চলের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে আত্মরক্ষামূলক; অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ দূর করিবার জন্যই উহার নিকটবর্ত্তী ঘাঁটি হইতে জাপানীদিগকে

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পেট্রোলবাহী পাইপ—প্রত্যহ তিন লক্ষ ব্যারেল পেট্রল প্রেরণের ক্ষমতাসম্পন্ন

বিতাড়িত করিবার চেষ্টা হইতেছে। তবে এই অঞ্চলে জাপানের বহু বিমান ও জাহাজ বিনষ্ট হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল সংবাদ যদি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত না হয়, তাহা হইলে সমগ্র প্রাচীর যুদ্ধে ইহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। জাপানের নব-অধিকৃত বৈদেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য তাহার নৌ ও বিমানবাহিনীর একান্ত প্রয়োজন। কাজেই তাহার নৌ ও বিমান শক্তি যদি হ্রাস পায়, তাহা হইলে তাহার পরাজয়ের দিন নিকটবর্তী হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

কুইবেক সন্মিলনীতে লর্ড মাউন্টব্যাটেন্ পূর্ব্ব এশিয়ার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং চুংকিংএ যাইয়া সহযোদ্ধৃগণের সহিত আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে জাপানকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া চীনের শক্তি বৃদ্ধি করাই এখন জাপানকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিবার একমাত্র উপায়। ব্রহ্ম-অভিযানের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা এখন সৃষ্ট হইতেছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন্ও কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই সঙ্গতভাবেই মনে হইতে পারে যে, সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্মদেশ ও মালয় অভিযান আসন্ন।

এই সম্পর্কে প্রধান কথা এই যে, পূর্ব্ব ভারত হইতে কেবল স্থলপথে ব্রহ্মদেশে ব্যাপক অভিযান চালিত হইতে পারে না; ঐ অভিযানের জন্য সম্মিলিত পক্ষকে সর্ব্বপ্রথম ভারত মহাসাগরে পূর্ণ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশে ও মালয়ে আঘাত করিতে না পারিলে ব্রহ্মদেশ হইতে জাপানকে বিতাড়িত করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু এই বিষয়ে সম্মিলিত পক্ষের কোন আয়োজন এখনও প্রকাশ পায় নাই। কাজেই, ভারতবর্ষ হইতে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণাত্মক তৎপরতা আসন্ন বলে মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—ব্রহ্মবাসীকে সম্মিলিত পক্ষ এখনও স্পষ্টই তাহার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেন নাই। ভারতবর্ষে যে দৃষ্টান্ত তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। কাজেই, ব্রহ্ম অভিযানের জন্য সম্মিলিত পক্ষ রাজনৈতিক দিক হইতেও সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। তাঁহাদের অভিযানের সময় ব্রহ্মীরা যাহাতে সমগ্র জাতি হিসাবে তাঁহাদের বিরোধিতা না করে, তজ্জন্য রাজনৈতিক বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রয়োজন, ভারতবর্ষেও উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা আবশ্যক। নতুবা, ব্রহ্মদেশের সমগ্র জাতীয় শক্তি সম্মিলিত পক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে, জাপান হয়ত কৌশলী প্রচারকার্য্যের দ্বারা ব্রহ্মীদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে। সমগ্র জাতি যদি একযোগে কোন আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করে, তাহা হইলে সে প্রতিরোধ ভেদ করা কতদূর দুঃসাধ্য হয়, তাহার পরিচয় স্পেন, চীন ও রুশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসে পাওয়া গিয়াছে। ২।১১।৪৩

মহাকাব্যে 'ট্র্যাজেডী'

শ্রীভাস্কর দেব

প্রাচ্য দেশীয় নাট্য-সাহিত্যের ন্যায় মহাকাব্যের আসরেও ট্র্যাজেডীর কোন স্থান নাই। কারণ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে কোন কাব্য অথবা মহাকাব্য অশুভান্ত হওয়া অথবা কাব্যান্তে অশুভান্ত বর্ণনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ভামহ প্রভৃতি সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে জয় অথবা নায়কের যশ-প্রতিষ্ঠা দ্বারাই মহাকাব্যের সমাপ্তি ঘটাইতে হইবে। প্রাচ্য দেশীয় 'classical Literature' অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি সাহিত্য-স্রষ্টাগণই ছিলেন প্রাচ্য দেশীয় সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র-বিধির রক্ষক। কিন্তু এ হেন সংরক্ষণশীল মহাকবি কালিদাস সৃষ্ট মহাকাব্য 'রঘুবংশ' কি ট্র্যাজেডী নহে? বঙ্গীয় মহাকাব্যের প্রায় সব কয়টিই ট্র্যাজেডী। মাইকেল-হেম-নবীন সৃষ্ট মহাকাব্যাদির 'মেঘনাদ-বধ কাব্য', 'বৃত্র সংহার', 'কুরুক্ষেত্র' প্রভৃতি ইহারই সমর্থন করিতেছে। এমন কি এক দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রাচ্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও অমর মহাকাব্যদ্বয় 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' ও ট্র্যাজেডীর আখ্যা পাইতে পারে।

এখন রামায়ণ মহাভারতাদি মহাকাব্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত এই ট্র্যাজেডী পদার্থটি যে কি, তাহা সমালোচনা সাপেক্ষ। অনেকেরই ধারণা আছে যে, নিষ্ঠুর নিয়তি-লীলার মধ্য দিয়া অদৃষ্টের পরিহাসে জাগতিক-জীবনের যে বিপুল ও বিরাট ব্যর্থতার আবির্ভাব ঘটে তাহাই মহাকাব্যের ট্র্যাজেডী; কিন্তু এ সত্য আংশিক সত্য, পূর্ণ সত্য নহে। চরম ব্যর্থতার মধ্য দিয়া ট্র্যাজেডী আত্মপ্রকাশ করে একথা সত্য; কিন্তু পরিপূর্ণ সফলতার মধ্য দিয়াও প্রকাশিত হয় জীবনের সেই মূল্যহীনতা—সেই নৈরাশ্য—সেই ট্র্যাজেডীই অধিকতর দুঃসহ ঘোরতর গভীর। প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমর মহাকাব্য 'মহাভারত'-এর উদাহরণ দ্বারা উক্তির যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া যাক। উক্ত কাব্যের উপসংহারে দ্রৌপদীসহ পঞ্চ পাণ্ডবের মহাপ্রস্থানে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যে কোন সার্থকতাই থাকুক না কেন, শুধুমাত্র রসদৃষ্টি ও কাব্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে উহা জাগতিক জীবনের এমন একটী করুণতম ট্র্যাজেডীর দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে যাহার সমকক্ষ ট্র্যাজেডী প্রাচ্য মহাকাব্যে, এমন কি, সমগ্র প্রাচ্য সাহিত্যেও বিরল। ধর্ম্মরক্ষাপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বিরাট যুদ্ধায়োজন—দ্রোহ—স্বজন-শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিয়া হত্যা ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া যেদিন পাণ্ডব পক্ষের জয় পতাকা উড্ডীন হইল, সেদিন তাহারা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, এই কষ্ট-সাধ্য বিজয় যেন সত্যোপম নহে, তাহাদের মনের মানুষটী যেন এই জয় চাহে না—তখন তাহারা সেই পূর্ণ সফলতাকে দুই পায়ে ঠেলিয়া মৃৎপাত্রের ন্যায় আবার মৃত্তিকার কোলে ফেলিয়া দিয়া অপর একটী রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। এইখানেই জীবনের আসল ট্র্যাজেডী—ইহাই বাস্তব জীবনের শাশ্বত সত্যের চিত্র। ধর্ম্মনীতি রক্ষাপূর্ব্বক মানুষকে ঈশ্বরে ভক্তিমান করিতে মহর্ষি বেদব্যাস হয় তো নানা প্রকার দার্শনিক তত্ত্ব বিচারের দ্বারা বাস্তব জীবনে এই করুণতম ট্র্যাজেডীর সমাধানে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু আর্টের মুখরক্ষা করিতে সৃষ্টি-নিপুণ ব্যাসদেবের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই তাঁহার কবি-চিত্ত তদীয় সাহিত্যের মধ্যে সেই সযত্ন-প্রচ্ছাদিত ট্র্যাজেডীর পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিল। এই নিমিত্তই ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, একদিক হইতে বিবেচিত হইলে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, মহাভারতের ন্যায় ট্র্যাজেডীর উদাহরণ সমগ্র সাহিত্য-জগতেই বিরল।

যাহা হউক, রামায়ণ, মহাভারতের যুগ হইতে অপেক্ষাকৃত 'আধুনিক যুগ-সৃষ্ট মহাকাব্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে 'মেঘনাদ বধ', 'বৃত্রসংহার', 'কুরুক্ষেত্র' প্রভৃতির উপরে দৃষ্টি পতিত হয়। তন্মধ্যে মধুসূদন রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই উৎকৃষ্টতর মহাকাব্য, কারণ বঙ্গীয় সাহিত্যরস-পিপাসুসমাজে অদ্যাবধি 'মেঘনাদবধ কাব্য' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং এ হেন মহাকাব্যের ট্র্যাজেডীর সমালোচনা করিলেই মাইকেল-হেম-নবীন যুগের মহাকাব্যগুলির ট্র্যাজেডীর স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত হইবে।

কিন্তু এইরূপ সমালোচনার ভূমিকাতেই প্রশ্ন উঠিয়া থাকে যে, 'মেঘনাদবধ কাব্য' কি ট্র্যাজেডী? এই প্রশ্নাশ্রিত সমস্যার সমাধান না করিয়া আলোচ্য মহাকাব্যান্তর্গত ট্র্যাজেডীর স্বরূপ-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ইহার মীমাংসা করিয়া ট্র্যাজেডী নির্ধারণের পথে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ। এখন এই প্রশ্নটী সম্বন্ধে দুইদিক হইতে দুইটী পরস্পর বিরোধী উত্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। ঘটনা-প্রবাহের পরিণতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমগ্র মহাকাব্যটী সম্যকরূপে পর্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিলে আলোচ্য মহাকাব্যটিকে কোনক্রমেই ট্র্যাজেডী বলা চলে না, কারণ উপসংহারে ব্যর্থাভিলাষ রাবণ, তথা সমগ্র শোক-সাগরমগ্ন রাক্ষসকুল সবিস্ময়ে—

"* * * সচকিতে সবে
দেখিলা আলোর রথ; সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসব-বিজয়ী
দিব্য মূর্ত্তি! বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে;
চিরসুখ হাসি রাশি মধুর অধরে!"—

তখন কোথায় গেল রক্ষগণের শোকোন্মাদনা? পুত্রশোক-সন্তপ্ত রাবণ ও রক্ষ সৈন্যগণের ব্যথিত চিত্ত আবরিত করিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ হতচেতন ও বিমূঢ় করিয়া ফেলিল। অবশেষে যখন স-মেঘনাদ-প্রমীলা দিব্য আলোর রথ

"উঠিল গগন পথে * * বেগে;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি;"—

তখন রাবণ ও রাক্ষসগণের শোক-সিন্ধু-মথিত হৃদয়-তট-প্রক্ষালিত মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতা দেবানুগ্রহজনিত আনন্দ-আসারোচ্ছ্বাসে নির্ব্বাপিত হইল। অন্ততঃ রাক্ষসগণের পক্ষে জীবনান্তে সর্ব্বমঙ্গলময় মৃত্যুঞ্জয়-চরণপ্রাপ্তি অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাই রাক্ষস-তনয়-তনয়ার ভাগ্যোত্থিত-জীবন ধ্বংসান্তে যখন তাহাদের পারলৌকিক আত্মা পুনর্ব্বার স্বর্গীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাবণ ও রাক্ষসগণের চক্ষে পুনরাবির্ভূত হইল তখন,—

"পূর্ণিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ নিনাদে!"—

প্রাচ্য ধর্ম্ম-বিশ্বাসাশ্রয়ী যখন ধ্বংসের পর আবার নব-সৃষ্টি হইল তখন আখ্যান-বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে কোনক্রমেই ট্র্যাজেডী বলা চলে না।

কিন্তু আর্টের অনুশীলন-ব্যবস্থা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, আলোচ্য মহাকাব্যের মধ্য দিয়া রাবণের জীবনে আসিয়াছে একটী বিরাট ব্যর্থতাজনিত চরম ট্র্যাজেডী। রাবণ অধার্ম্মিক হইতে পারে, অধর্ম্ম-যুদ্ধে লিপ্তও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার সেই মহিমোজ্জ্বল আত্ম-মর্য্যাদা, তাহার বিশাল-বীর্য্য গর্ব্ব, তাহার সেই বীরত্বের অহঙ্কার-মহীরুহ যখন সমূলে ভাঙ্গিয়া ধূলায় আছড়াইয়া পড়িল তখন সেই বিরাট-ব্যর্থতার মুহূর্ত্তে প্রকট হইয়া উঠিল আত্মমর্য্যাদার অপমানজনিত যে চরম পৌরুষের অভিমান তাহাই তো বাস্তব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডী। এই ট্র্যাজেডী কুকর্ম্মের বিষময়-ফলই হোক অথবা নিয়তি লীলার অব্যর্থ পরিণামই হোক, রাবণের এই বিরাট ব্যর্থতা-জনিত ট্র্যাজেডী অস্বীকার করিবার মত কোন যথাযোগ্য যুক্তি যোগাইয়া ইহা কোনমতেই লুকাইয়া রাখা যায় না। সুতরাং আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিলে 'মেঘনাদবধ কাব্য' ট্র্যাজেডী বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

অতঃপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্যের অন্তর্গত ট্র্যাজেডীর প্রভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। মানব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সহিত নিয়তির তুমুল দ্বন্দ্ব অনুষ্ঠান অথবা নিয়তি-শক্তির বিজয়-পতাকা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় মহাকাব্য-সাহিত্য ক্ষেত্রেই উড্ডীন রহিয়াছে। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশীয় সাহিত্যেই নিয়তির এই দুর্নিবার দুর্দ্দমনীয় শক্তির প্রাধান্য মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু নিয়তির এই দণ্ড-প্রতিষ্ঠা দ্বারা বিপন্ন মানব-জীবনীশক্তির আমূল ধ্বংস সকল পাশ্চাত্য মহাকাব্যান্তে ট্র্যাজেডীর শেষ কথা হইলেও কোন প্রাচ্য দেশীয় মহাকাব্যই তাহা স্বীকার করিয়া লয় নাই। হোমার, ভার্জ্জিল, ট্যাসো প্রভৃতি যশস্বী প্রতিভাবান এপিক্ কবিগণের দৃষ্টিতে মানব-শক্তির ধ্বংসই হয় তো সর্ব্বশেষ দৃষ্টিগম্য অথবা চিন্তাশক্তি-গম্য ঘটনা, কিন্তু প্রাচ্য দেশীয় মহাকবিগণ ধ্বংসান্তে পুনর্ব্বার এক অভিনব সৃষ্টির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাই স্বর্গারোহণের পথে একমাত্র ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব্যতীত স-দ্রৌপদী ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের মৃত্যুর পর মহর্ষি বেদব্যাস অনন্ত-রসধারাবিল প্রবাহিত স্বর্গলোকের যে দিব্য-দৃশ্য অঙ্কিত করিলেন তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির, সভায় পাণ্ডব ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় ও দ্রৌপদীর স্বর্গীয়-কলেবরের দৃশ্যও প্রতিষ্ঠিত হইল। মানব-জীবনের ধ্বংসের পর পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের দৃষ্টি-শক্তি শক্তিহীন হইলেও প্রাচ্য দার্শনিকগণ ধ্বংসান্তে পুনঃসৃষ্টির দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন; তাই ধ্বংসই পাশ্চাত্য এপিকের শেষ অনুভূতি-গ্রাহ্য ঘটনা হইলেও প্রাচ্য দেশীয় মহাকাব্যের সর্ব্বশেষ ঘটনা ধ্বংসান্তে পুনঃসৃষ্টি। এইজন্যই উভয় দেশীয় ট্র্যাজেডী বিভিন্ন প্রকার।

'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাকালে মধুসূদন যে সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্য এপিক্ কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের রক্তের প্রভাবমুক্ত হওয়া স্বজাতিক্ষুব্ধ-বিদ্রোহী বাঙ্গালী মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিনি স্বয়ং একথা স্বীকার করিয়া রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,—

"I may borrow a waist-coat or a neck-tie, but not the whole suit." ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? মধুসূদন যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, যে দেশের সাহিত্য-সেবা করিয়া তিনি অমর হইয়াছেন, সেই দেশেই তাঁহার পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস, আদি কবি বাল্মিকী প্রভৃতি দেবতুল্য সাহিত্য-রথিগণ জন্মিয়া তদ্দৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়া মানব-জীবনের যে চরম সত্য-তথ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যথার্থ প্রতিভাবান কবি মধুসূদনের পক্ষে তাঁহার স্বজাতীয় পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের সেই সকল সত্যবাণী অবহেলা করা সম্ভবপর হয় নাই; সেই জন্যই তদ্দৃষ্টে আলোচ্য মহাকাব্যের উপসংহার যথার্থ প্রাচ্য মহাকাব্যের ন্যায় হইয়াছে। এই জন্যই বঙ্গীয় মহাকাব্য-সাহিত্যে 'মেঘনাদবধকাব্য' অদ্যাবধি অনুপম ও অদ্বিতীয়।

ট্র্যাজেডীর স্বরূপ ও লক্ষণ

ট্র্যাজেডীকে কেন্দ্র করিয়া ছোট বড়, স্থূল সূক্ষ্ম বহু বিষয়ই বিবেচিত ও আলোচিত হইল; এখন এ হেন ট্র্যাজেডীর স্বরূপ-লক্ষণটীর প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করা যাক্। ট্র্যাজেডীর স্বরূপটী কি? অথবা, কোন্ কোন্ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা ট্র্যাজেডী ট্র্যাজেডী হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে? সমস্যান্ধকারাচ্ছন্ন; সুতরাং স্বল্প কথায় সম্যক্ আলোক-সম্পাতপূর্ব্বক এ প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া দুষ্কর। ট্র্যাজেডী মানব জীবনের গভীর বেদনামুখর শাশ্বত বিষাদময় সমস্যা। যে মুহূর্ত্তে মানুষ ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞা অবহেলা করিয়া নিষিদ্ধ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদন করিয়াছে,—সেই Fruit of the Forbidden-tree whose mortal taste brought death',—সেই মুহূর্ত্তেই মানুষ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া স্বীয় জীবনে যাচিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে এই ট্র্যাজেডীকে। অতঃপর সেই জ্ঞান বৃক্ষ-ফলের নবরসাস্বাদনোন্মত্ত মানব তাহার অনুসন্ধানী বুদ্ধির দ্বারা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, সর্ব্বশক্তিমান ভাগ্যনিয়ন্তার হস্তে সে ক্রীড়া-পুত্তলী ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; সে

'জীবনের খর-স্রোতে ভাসিয়ে সদাই কূলের নাগে নাগে',—অথচ এই খর-স্রোত রুদ্ধ ও সংযত করিবার উপযুক্ত শক্তির কণামাত্র তাহার নাই—সে কত অসহায়। কিন্তু মানব-প্রকৃতির বৈচিত্র্য এই যে, সে সর্বগ্রাসী নিয়তির এই নিষ্ঠুর পরিহাসকে প্রাধান্য দিতে চায় না, তাহার দুর্জ্ঞেয়তাকে মানিয়া লইতে পারে না; সে জানে তাহার নিজের একটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আছে—একটা আত্মসম্মান আছে, তাই সে এক প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করিল নিয়তির বিরুদ্ধে—a great challenge to fate। সে তো একেবারেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে নাই; প্রথম সে চাহিয়াছিল সরল বিশ্বাসের পথে একান্ত বিশ্বস্তভাবে চলিয়া নিয়তির এই নিষ্ঠুর কুহেলিকা-জাল ছিন্ন করিতে, কিন্তু পরিণামে ব্যর্থতার বেদনায় বক্ষ ভরিয়া বিলাপ করিয়াছে,—'হতভাগ্য ভবের দুর্ভোগ চায় করিছি বিশ্বাস তত্ত্বের হয়েছে অনর্থ পরাজয়।' তথাপি এ পরাজয়ের গ্লানি মানুষ মানিয়া লইতে পারে নাই, তাই বারবার পরাজিত হইয়াও এক অমিত শক্তির (will to power) বলে সে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে। জীবনের এই প্রবল দ্বন্দ্বে যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী শক্তি নিয়ত লড়াই করিতেছে তন্মধ্যে একটি মানুষের একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ (Freedom within) এবং অপরটি আত্মনিরপেক্ষ নিয়তি-লীলা (Necessity without)। বিশ্ব-জীবনের দরবারে মানুষ যবে যবে তাহার ব্যক্তি-পুরুষটিকে যে অভ্রভেদী গৌরবাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল, নিয়তির নিষ্ঠুর চক্রান্তে যখন তাহারই শোচনীয় অধঃপতন ঘটে এবং তদনন্তরে সেই অধঃপতিত ব্যক্তি পুরুষটি আত্ম-মর্যাদার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য নিয়তির সহিত নিয়ত জীবন-দ্বন্দ্বে যুঝিয়া যখন বারবার পরাজিত হয় তখন ব্যক্তি পুরুষটির আত্ম-সম্মানের যে চরম অপমান ঘটিয়া থাকে তাহা অসহনীয়; তাহা মানুষের জীবন শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। বিরাট বনস্পতির এই যে প্রচণ্ড অধঃপতনজনিত অপমান ইহাই তো জীবনের বাস্তব ট্র্যাজেডী। আর জীবনের এই দুর্বিসহ ব্যর্থতাই তো তাহার স্পষ্ট লক্ষণ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডীর গতিপথ এই পর্যন্ত একই, কিন্তু ইহার পর তাহারা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রভেদটি ট্র্যাজেডীর পরিণাম বিষয়ে। ইতিপূর্বে 'মহাকাব্যে ট্র্যাজেডী' শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টি-ভঙ্গি বিশ্লেষণে ট্র্যাজেডীর বিভিন্ন রূপ ফুটাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহারই পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, এই দীর্ঘ আলোচনা প্রসঙ্গে ট্র্যাজেডীর আলোচ্য স্বরূপটুকু সকলের অনুভূতিগ্রাহ্য করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি, জীবনের যে সমস্যাবহুল কুহেলিকার আজ পর্যন্ত রহস্যভেদ সম্ভব হয় নাই তাহার স্বরূপের দীপ্তিটুকুও সকলের চক্ষে উদ্ভাসিত করিতে পারিলেই এ প্রয়াস সার্থক হইবে।

ট্র্যাজেডী সংঘটনে দায়ী কে? মানুষ, না নিয়তি?

আলোচ্য প্রশ্নের যথার্থ সমাধান আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই, তবে দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন প্রকার বিধান ইহার নিত্য নূতন উত্তর দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। এই প্রশ্নের মূলে একটি-মূলগত দ্বন্দ্ব থাকায় নানা প্রকার যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়া মানুষ নিয়তই এই বিরাট সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইহার যথার্থ মীমাংসা বা সর্বশেষ সমাধান যে কখনও সম্ভব হইবে এমত মনে হয় না। পরিবর্তনশীল জগতে মানবমনের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারা সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির দ্বারা কখনও নিয়তিকে, আবার কখনও বা মানুষকে ট্র্যাজেডীর কারণ নির্ধারিত করিয়াছে।

প্রাচীন পাশ্চাত্য সাহিত্যে অর্থাৎ গ্রীক সাহিত্যে (classical literature) নিয়তিই (Fate) একাধারে ট্র্যাজেডীর কারণ, কার্য ও পরিণতি হিসাবে পরিগণিত হইত। সেইজন্যই প্রায় সকল প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডীর বীর নায়কগণ নিয়তির ক্রোধে নিয়তই বিপর্যস্ত, লাঞ্ছিত এবং সর্বশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডীর এই যে দ্বন্দ্ব ইহাও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও অলঙ্ঘ্য-নিয়তি শক্তির দ্বন্দ্ব। কিন্তু জীবনের এই বিষাদময় পরাজয়, পৌরুষের এই চরম অপমান—ইহার জন্য তৎকালীন ট্র্যাজেডীকারগণ কোনমতেই মানুষ'কে অথবা তাহার কার্যকে দায়ী করিতে পারিতেন না। অতএব গ্রীক ট্র্যাজেডীকারগণ ক্রমশঃ মানবের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া দৈবরোষকেই ট্র্যাজেডীর কারণ হিসাবে অভিযুক্ত করিয়া ফেলিলেন। এই দৈবরোষ নিয়তির প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে,—তাই নিয়তির অসীম বলে বলীয়ান হইয়া সে মানবের পৌরুষবল ও স্বাধীন কার্যানুষ্ঠিক উপেক্ষা করিয়া আপনার খেয়াল-খুশিতে মানব জীবনে একের পর এক বিপর্যয় ঘটাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডীর মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে তাহা সর্বত্রই মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও দৈবরোষের মধ্যে নহে, মাঝে মাঝে সে দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মানবের অন্তর্জগতে তাহার পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে। সোফোক্লিসের (Sophocles) 'এ্যান্টিগনি'র (Antegone) দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ইহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তথাপি সত্যের মুখ চাহিয়া বলিতে গেলে গ্রীক ট্র্যাজেডীর দ্বন্দ্ব যে অনেকখানি বহির্মুখ ছিল একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্যযুগেও ট্র্যাজেডী সম্বন্ধে প্রাচীন মতটিই পরিচিত ছিল। মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডীতেও দেখা যায় নিয়তির সেই অব্যাহত শক্তির প্রাধান্য। পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ সমালোচক ব্রাডলের (Bradley) ভাষায় বলি, "A total reverse of fortune, coming unawares upon a man who 'stood in high degree' happy and apparently secure,—such was the tragic fact to the mediaeval mind."*—

অতঃপর পাশ্চাত্য সাহিত্যে আসিল সেক্সপীয়রের যুগ। যুগস্রষ্টা মনীষী নাট্যকার সেক্সপীয়র মানব জীবনের ট্র্যাজেডী সংঘটনে নিয়তির দুর্বারের কিঞ্চিৎ লাঘব সাধন করিয়া মানুষের অন্তর্জগতস্থিত পরস্পর-বিরোধী শক্তিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ শক্তির অর্পণের দাবী জানাইলেন। কিন্তু তথাপি তিনি দৈবরোষকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না, ফলতঃ নিয়তির শক্তির কিছু রহিয়া গেল।

পূর্বালোচিত নিয়তির কলঙ্ক কিঞ্চিৎ শুভ্র হইল আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যে। আধুনিক যুগের সাহিত্যিকগণ মানব জীবনের ট্র্যাজেডীর মূলানুসন্ধান করিয়া মানব চরিত্রেই ইহার উৎপত্তি বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ উপস্থিত করিলেন। যে প্রচণ্ড সমস্যা-ঝড়ের মধ্য দিয়া তাহারা এই সত্যের আলোক লাভ করিলেন—তাহাতে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যই সমস্যামূলক-সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত হইল। এই সম্পর্কে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা আলোচ্য বক্তব্য সমর্থনের ইচ্ছা ছিল কিন্তু অপ্রাসঙ্গিকতা দোষে দুষ্ট হইবে বলিয়া তাহার উল্লেখ করা হইল না। আমরা পাঠকগণকে ইব্‌সেন্, বার্নাড্ শ (Bernard Shaw) প্রভৃতি মনীষিগণের রচনার বিষয়বস্তুর সহিত আলোচ্য যুক্তির তুলনা করিতে অনুরোধ করি।

প্রাচ্য-সাহিত্যে একমাত্র রামায়ণ ও মহাভারত ব্যতীত যথার্থ ট্র্যাজেডী আর নাই। ট্র্যাজেডীর যথার্থ স্বরূপটুকু প্রকাশ করিতে হইলে কাব্যকে জীবনের চরম গভীরতার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত ব্যতীত আর কোন কাব্য জীবনের এই গভীরতম বিষাদময় সমস্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত? কিন্তু যে কারণে স্বকীয় সাহিত্যে আসল ট্র্যাজেডী গড়িয়া উঠিতে পারে নাই তাহা যে প্রাচ্য-আলঙ্কারিকগণের

---

* Shakespearean Tragedy—A. C. Bradley.

নিরেবাদো একথা আদৌ প্রযোজ্য নহে। মানব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও গুরুত্বের অভাবই এদেশে যথার্থ ট্র্যাজেডী জন্মাইতে দেয় নাই। জীবনকে দুঃখ স্বীকার করিলে জীবনের কোন দুঃখ বিপর্যয়ই মনে রেখাপাত করে না. তাই মুক্তি বাদী প্রাচ্য-সাহিত্য-ক্ষেত্রের অনুর্বর ভূখণ্ডে ও মায়াবাদের প্রতিকূল আবহাওয়ায় ট্র্যাজেডীর বীজ শুকাইয়া গিয়াছে। জীবন সংঘটিত যে করুণতম দুঃখের জন্য-আমরা মানুষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী করিতে অসমর্থ হইয়া নিয়তিকে বা দেবতাকে অভিসম্পাত করি তাহা স্বীকার করিয়া প্রাচ্য-দার্শনিকগণ সেই দুঃখের পশ্চাতে খুঁজিয়া দিলেন কর্মবাদের এক পূর্ণ অধ্যায় এবং তাহার যুক্তিপূর্ণ কুহেলিকাজালে বদ্ধ হইয়া মানুষ দেবতার প্রতি আপনার হঠকারিতায় লজ্জিত হইয়া ট্র্যাজেডীকে করিল অস্বীকার ;—অমনি অপমানিত ট্র্যাজেডী অভিমান ভরে পশ্চিম মুখে প্রস্থান করিল। এইজন্যই প্রাচ্যদেশের সাহিত্যে যথার্থ ট্র্যাজেডীর অনুপস্থিতি।

এতদ্দেশেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ যুগপ্রভাবে প্রভাবিত মধুসূদন তাঁহার পাশ্চাত্যদেশ প্রত্যাগত জ্ঞান ভাণ্ডারের ঝুলি হইতে কয়েকটি ট্র্যাজেডীকাব্য নামধেয় কাব্য নিচয় বঙ্গীয় সাহিত্যের দরবারে উপঢৌকন দিলেন এবং তাঁহার অনুসরণে অসংখ্য কাব্যকার নিজ নিজ সৃষ্টি বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই বিংশ শতাব্দীর প্রাক্-মধ্য কাল পর্যন্ত যত বিয়োগান্ত কাব্য (Tragedy) সৃষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে একটীও পাশ্চাত্য রুচি-সম্মত যথার্থ 'ট্র্যাজেডী'র মর্যাদা পাইতে সক্ষম নয়। তবে প্রাচ্য দেশীয় রুচি অনুযায়ী ইহারা 'ট্র্যাজেডী' বটে। যাহা হউক, আধুনিক যুগে যদিও 'ট্র্যাজিডী' আমাদের আয়ত্ত হইয়াছে তথাপি আমরা জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কারের দৌর্বল্য হেতু জীবনের এই ট্র্যাজেডী সংঘটনে যেন মানুষ ও নিয়তি ইহাদের মধ্যে কাহাকেও দায়ী করিতে পারিতেছি না ; শুধু অন্তরে কে যেন ক্ষীণস্বরে বলিতেছে জীবনের এই চরম দুর্দ্দশার জন্য দায়ী একমাত্র 'কর্মফল'। ইহাই প্রাচ্যের চির অব্যক্ত সুর।

বাঙ্গালী জীবনের ইতিহাস

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বাল্যকালে পল্লীগ্রামে পাঠশালে পত্তর বগলে
পড়িতে যেতাম, মেতে ছুটিতাম নন্দনের দলে।
গুরু মশায়ের গুরু গর্জনে চমকাত পিলে,
দুলিত আছোলা কঞ্চি একটুকু হাসিলে কাশিলে।
ভাবিতাম স্কুলে গেলে ক্লেশ হ'তে পাইব নিস্তার,
দাদা ত খায় না মার, বাধা নাই হাসি বা খেলার।

স্কুলে ত হ'লাম ভর্ত্তি, অবসর হ'লো তারপর,
মাস্টারের মিলনেতে স্ফূর্ত্তির কোথায় অবসর?
বাড়িল পুঁথির বোঝা বওয়া দায়, বওয়া নয় সোজা,
পড়ার তাগিদ কড়া, বহুপাঠও বাড়লাক বোঝা।
খেলার সময় কাটে হোমটাস্কে, ম্যাপে আর গ্রাফে
ছাড়িতে না পাই হাঁপ ঘনঘন পরীক্ষার চাপে।
ভাবিলাম বাঁচা যাবে খাঁচা হ'তে উড়িলে সজোরে
অর্থাৎ ছাড়িলে গ্রাম এর পরে ঢুকিলে কলেজে।

কলেজে-ও ঢুকিলাম, ছোট ছোট পরীক্ষার বদলে
বড় বড় পরীক্ষার উপদ্রব চলিল সকলে।
অস্থি-চূর্ণ পরিশ্রম, অধিকন্তু রাত্রি-জাগরণ।
কোথা স্ফূর্ত্তি, কোথা মুক্তি? অবরুদ্ধ অস্থির জীবন
ছাড়িয়া বইএর মোট, শুধু নোট করিলাম সার
মেড-ঈজি দিয়ে বাদ, তাও হ'লো হাড়ের পাহাড়।
কোন মতে ডিগ্রী নিয়ে একবার হইলে বাহির
বাঁচা যাবে, ভাবিলাম, বিদ্যা পরে করিব জাহির।

সার্থক হইল শ্রম। অর্থ ছাড়া চলেনাক আর,
'কত কাল ধ্বংস করি পিতৃ-অন্ন! হনু উমেদার
তৈল-ভাণ্ড হাতে লয়ে দ্বারে দ্বারে লাগিনু ঘুরিতে ;
বহিয়া রোহিত মৎস্য আম লেবু মিঠাই ঝুড়িতে।
ভিক্ষার লাঞ্ছনা লজ্জা অপমান ঘৃণার বিকারে
বর্ষ তিন কেটে গেল এই ভাবে চাকুরি শিকারে।
ভাবিলাম কাজ পেলে যাবে সর্ব্ব দুঃখ লাজ মুছে,
বঞ্চনার লাঞ্ছনার গ্লানি ধূলি যাবে ধুয়ে মুছে।

চাকরি মিলিল শেষে, উপরন্তু তার পরিশ্রম,
বলাই বাহুল্য এতে আপাতত মাহিনাটা কম।

রিটায়ার করিলেন পিতা, তাঁর নেই পেনসন,
প্রতিপাল্য মাতা দিদি ছোট ভাই বোন কয়জন।
দাদা গিয়াছেন চলি হানি শেল বাপমার বুকে,
রাখিয়া বিধবা পত্নী উঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে।
তা ছাড়াও একজন তার কথা লজ্জায় বলিনি
চাকুরির ব্যবস্থাটা পিতৃগুণে করেছেন যিনি।
দুচোখে দেখিনু ধোঁয়া তার মাঝে সরিষার ফুল,
বহুবার তরী'পরে জেনে শুনে পাইলাম কূল।
ভাবিলাম এই দুঃখ দিন দিন আসিবেই কমে,
ভাইরা সহায় হবে, মাহিনাও বাড়িবে ত ক্রমে।

ভাইরা হইল বড়, মাহিনাও বাড়িল বটেই,
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি দেখিলাম স্বপন কতই।
হেনকালে যমরাজ আসিলেন গৃহদ্বারে মম
পিতৃদায়, মাতৃদায়, ভগ্নীদায় অগ্নিদাহ সম।
সর্ব্বস্বান্ত করি মোরে এ ত্রিদায় লইল বিদায়।
ভাবিনু ভয় কি আর ভাই দুটি দাঁড়াবেই আয়।

যেমনি অর্থক্ষম হইলেন, মরিলেন তাঁরা,
এদিকে আমার দৃষ্টি বেষ্টিয়াছে ষষ্ঠীর বাছারা।
গৃহিণীর বরাতের অন্ত নাই ; নিত্য রোগজ্বালা,
ডাক্তার ঔষধ পথ্য, কোলাহলে কাণ ঝালাপালা।
ভাবিলাম কচি-কাঁচা ডাঁটো হ'লে, পেলে যৌবন,
সংসারে ফিরিবে শান্তি রবেনাক এত জ্বালাতন।

ছেলে-পুলে বড় হ'লো যৌবনে আজও গেল ছেড়ে।
শ্রাদ্ধদায় সব এসে কন্যাদায় সব নিল কেড়ে।
ইনসিওর করা ছিল কতকটা ছিলাম প্রস্তুত,
গৃহিণীর অঙ্গে আর অঙ্গে ছিল কতক অযুত।
বড়টির হলো পাস, ছেলেরাও দিল কটা পাশ,
ভাবিলাম এইবার ফেলিবই স্বস্তির নিশ্বাস।
দীর্ঘশ্বাস ফেলি কোরে বন্ধুগণ বলিলেন—"ভাই
তোমার ত পোয়াবারো, সুখে আছ, তাই দোয়া চাই।"

বৃথা আশা! পাইলাম একে একে শোকের আঘাত,
বাড়িল রক্তের চাপ ধরিল দু-পায়ে গেঁটে বাত।
কন্যাটি বিধবা হ'লো, কেটে গেল সব স্বপ্ন ঘোর,
পুত্রগণ স্বেচ্ছাচারী দেশসেবা-মদে তারা ভোর,
বিষ তাহাদের দৃষ্টি, নিঃস্ব হয়ে খেতে শুধু আসে,
দর্জ্জি ও ধোবার বিল তাহাদের শুধি মাসে মাসে।
গৃহিণীর নিত্য ব্যাধি সারাদিন শায়িত শয্যাতে।
আশ্রিত বিধবা ভগ্নী নিরুপায় পুত্রকন্যা সাথে।
ঠাকুর ছাড়িয়া গেছে, দাস-দাসী কথা নাহি শোনে।

দশ মাস ভাড়া বাকি, মহাজন সুদ শুধু গোণে।
দেশের সম্পত্তিটুকু জ্ঞাতিরাই করেছে দখল,
বিধবা বৌদির মোর মাসোহারা এখন সম্বল।
ষোড়শী বয়স্থা কন্যা, কনিষ্ঠাই হয় বিয়ে দিতে।
পারিনা প্রার্থিত পণ কোষ্ঠীর মিলন ঘটাইতে।
প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড হ'তে যৎসামান্যটি যদি হয় পার,
কনিষ্ঠার ভরসা ত মৃত্যুপর জীবন বীমার।

আফিস কামাই হয় ঘন ঘন, বড়বাবু কন—
"রিটায়ার ক'রে কেন কর্তৃপক্ষ আর কত সয়?
প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড নিয়ে মানে মানে স'রে পড় ভাই
বড়বাবু হইবার ও শরীরে আশা আর নাই।"
এড়াইয়া চলে কত আত্মীয়েরা পাছে চাই ধার
আপন সংসার নিয়ে কষ্ট আছে তাহারা জেরবার।

বাল্য হ'তে একদিন সুখী হ'ব শান্তি পাব বলি :
ঠেলিয়া আশার তরী এতদূর আসিয়াছি চলি'।
বারবারই ভুল হলো, এইবার হবেনাক ভুল,
একূল যা দেয় নাই অবশ্যই দেবে তা ওকূল।
জীবন যে শান্তি দিতে পারে নাই, দিবে তা মরণ।
তারি প্রতীক্ষায় আমি করিতেছি তারেই স্মরণ।

সাময়িকী

বিজয়া—

বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব মহাপূজার পর আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক প্রভৃতি সকলকে বাৎসরিক শুভাভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া নবোদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এবৎসর বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য লইয়া উপস্থিত—কাজেই তাহার মধ্যে থাকিয়া এবৎসর পূজায় সকলকে নিরানন্দেই দিনযাপন করিতে হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের করাল প্রবাহের পরও সকলে যেন আমরা আবার নূতন উদ্যমেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি, মহাশক্তির নিকট আজ আমরা সেই শক্তিরই প্রার্থনা জানাইতেছি।

পরলোকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—

সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও দেশসেবক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ৭৯ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগত হইয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশে ১৮৬৫ সালে তাঁহার জন্ম হয়। এম-এ পাশ করিয়া তিনি সাংবাদিকের ও অধ্যাপকের কার্য্যগ্রহণ করেন—১৮৯৫ সালে তিনি কায়স্থ পাঠশালার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়া এলাহাবাদে গমন করেন। কিছুকাল 'দাসী' ও 'প্রদীপ' পত্রের সম্পাদনার পর ১৯০১ সালে তিনি 'প্রবাসী' মাসিকপত্র প্রকাশ করেন এবং ১৯০৭ সালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া 'মডার্ণরিভিউ' প্রকাশ আরম্ভ করেন। প্রবাসী ও মডার্ণরিভিউ পত্রের লেখার মধ্য দিয়া তিনি দেশে যে নীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে বাঙ্গালার ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার নির্ভীকতা, সত্যপ্রিয়তা ও কর্ম্মনিষ্ঠা বাঙ্গালীমাত্রেরই অনুকরণযোগ্য। বাঙ্গালা দেশে স্বদেশী ও জাতীয়তা প্রচারে তাঁহার দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনে তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইবে। যৌবনে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিয়াও তিনি হিন্দু জাগরণ আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিতেন এবং হিন্দুর সংস্কৃতি রক্ষা করিবার জন্য জীবনব্যাপী সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

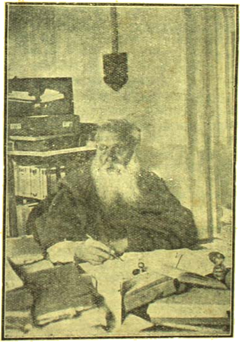

৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

দুর্ভিক্ষে মৃত্যুসংখ্যা—

বর্ত্তমান বৎসরে মৃত্যুসংখ্যা লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। অন্য কোথাও নয়, খাস লণ্ডনে মিঃ আমেরি যে সংখ্যা দিতেছেন, তাহা শুনিয়া ভারতের লোক বিস্ময়াভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান সভ্য জগতের নিকট লজ্জিত হইবার ভয়েই যে এরূপ করা হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রকৃত মৃত্যু সংখ্যা যে কত তাহা ভারত সরকার কেন, বাঙ্গালা সরকারও জানেন না। সে হিসাব রাখিবার বিশেষ চেষ্টাও হয় নাই। সারা বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে কি, তাহা প্রতি জেলা এমন কি, প্রতি গ্রামের ভয়াবহ দৃশ্য ও প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হইতে পাওয়া যাইতেছে। তাহার অধিক আর কিছুই হয়ত বলিবার নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কত সংখ্যক লোক অনশনে মৃত্যুবরণ করিল, তাহা জানিবার প্রয়োজন আছে। তদ্দ্বারা কেবল যে বর্ত্তমান গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে তাহা নহে, মৃত্যু সংখ্যা হইতে স্থান বিশেষের দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইলে সেই প্রদেশে অধিক মাত্রায় সাহায্য পাঠাইয়া বিপদ দূর করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। পল্লীর কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীর অবস্থা আলোচনা করিলে বাঙ্গালা তথা উৰ্দ্ধতন দুইটী গভর্ণমেণ্টের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও লণ্ডনস্থ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা না করিয়া পারা যায় না। ১৬ই ও ১৭ই আগষ্ট তারিখের হিসাব একত্র করিয়া প্রকাশ করা হয়। দুই দিনে ১২১ জন অনশনক্লিষ্টকে (তথাকথিত) হাসপাতালে

স্থানান্তরিত করা হয়; তাহার মধ্যে ১২ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ১২০ জনকে প্রকাশ্য রাজপথ হইতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য ইহার পূর্ব্ব হইতেই রাস্তায় বহু সংখ্যক মৃতদেহ পড়িয়া থাকিত,' কিন্তু ২১শে জুলাই তারিখের পূর্ব্বে কোনও পত্রিকা তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই। দুই দিনের সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পরই ১৮ই তারিখ হইতে রাজপথের মৃতদেহের সংখ্যা প্রকাশ বন্ধ করা হয়। হাসপাতালে স্থানান্তরিত রোগীর সংখ্যা ঐ দিন ১২৯ এবং তথায় মৃত্যু সংখ্যা ৯ জন। ২১শে হইতে ২৭শে (আগষ্ট) পর্য্যন্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত অনশন-ক্লিষ্টের সংখ্যা ১০০ অপেক্ষা কম থাকে, কিন্তু তাহার পর হইতে আর এত কম হয় নাই, প্রায়ই ২০০এর সন্নিকটে থাকে; ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে ৩২৫ হইয়া যায়। ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে সংবাদপত্রে সমস্ত সংখ্যা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; সম্ভবতঃ সরকার পক্ষ আশা করিয়াছিলেন, সংখ্যা প্রকাশ বন্ধ করিলে দুর্ভিক্ষ সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। দুই দিন বন্ধ করিবার পর সংবাদপত্রের তীব্র সমালোচনার ফলে আবার সংখ্যা প্রকাশ আরম্ভ হয়। তখন ডাইরেক্টর অফ্ ইন্‌ফরমেশন মৃত্যুকারণ লইয়া নব-বিভাগ করিয়া ফেলেন। তিনি বলিলেন "Death in the majority of cases was due to chronic ailments and ailments which had been neglected in the past." অর্থাৎ পুরাতন ব্যাধি অথবা অতীতে সেই সকল রোগ উপেক্ষিত হওয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। "পুরাতন ব্যাধি" কোন্ বাঙ্গালীর শরীরে নাই, তাহা বলা যায় না। কাহার হয়ত অত্যধিক মদ্যপানে যকৃৎ বিকৃতি রোগ আছে, কাহারও দেহে উপদংশ, কাহারও বা বাঞ্ছিত (নারী) বস্তুলাভে বিফলতাহেতু হৃদযন্ত্রের বৈকল্য, কাহারও মেদবৃদ্ধিহেতু উদর-স্ফীতি, কাহারও অকস্মাৎ অর্থলাভে শিরোঘূর্ণন, কাহারও ভাগ্যলক্ষ্মীর আবির্ভাবে কদলী বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গুলী-স্ফীতি প্রভৃতি রোগ আছে; তাহাতে কেহ মরে নাই। সভ্য জগতে প্রত্যেক শরীরে ক্ষয় জীবাণু এবং অপরাপর বহু রোগের জীবাণু অবস্থান করিতেছে; ইহার উপর যদি দিনের পর দিন অনাহার-হেতু মৃত্যু ঘটে, তখন শবব্যবচ্ছেদে যে সকল দৈহিক যন্ত্রের বিকলতা দৃষ্ট হয়, তাহাই মৃত্যুর কারণ বলিয়া বর্ণিত না হইয়া অনশনই মৃত্যুর কারণ বলিয়া ঘোষিত হওয়া উচিত। যাহাই হউক সরকারী আদেশ প্রচারিত হইবার পর কলিকাতায় অনশন ঘটিত মৃত্যু সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাইল। রোগী মাত্রেই হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় নাই, তাহা সকলেই জানেন। যে সকল মূর্ত্তি সচরাচর পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিই সরকারী শুশ্রূষাবাসে স্থান পাওয়া উচিত ছিল। তাহা না হইলেও কমবেশ ১২,০০০ রোগী তথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে; তন্মধ্যে অন্ততঃ ৪,০০০ লোকের জীবনান্ত হইয়াছে (১৮ই আগষ্ট হইতে ২৭শে অক্টোবর)।

যেভাবে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হয় তাহাতে মৃত্যু সংখ্যার কোনও হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পথে পড়িয়া অনাহার-ঘটিত একটা মৃত্যু সংখ্যা দেওয়া হইত; তাহাতে গড়ে ৩৫ জন পাওয়া যায়; তাহার পর হইতে হিন্দু-সৎকার সমিতি ও আঞ্জুমান মফিউদ্দুল ইসলাম যে সকল লোকের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করে তাহার সংখ্যা প্রকাশিত হয় (ইহাও কেবল ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় পাওয়া যায়)। ইহার মধ্যে হাসপাতালে মৃত লোকও আসিয়া পড়িয়াছে; কেহ হয়ত আত্মীয়-স্বজনের হাতে পড়িয়াছে। পুলিশ পক্ষে মৃতদেহ স্থানান্তর (Police Corpse Disposal Squad) করিবার এক ব্যবস্থা আছে; তাহারা মৃতদেহ লইয়া নিজেরাই সুব্যবস্থা করে কি না জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহার অধিকাংশই নিঃস্ব সৎকারকারীদিগের নিকট দেওয়া হইয়াছে। মোট সম্মিলিত সংখ্যা (২৭-১০-৪৩) ৮,৩০০।

বেশ চলিতেছিল, কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তা (Health Officer) বলিলেন—১লা আগষ্ট হইতে ১৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭,৯৮৪ জন নিঃস্ব (pauper) কলিকাতা সহরে মারা গিয়াছে; অর্থাৎ তাহাদের দেহ কেহ দাবী করে নাই, সম্ভবতঃ সরকারী ব্যয়ে তাহাদের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সকল লোকের অন্ন জুটিত না; তাহার উপর এই দুর্ভিক্ষের দায়ে তাহারা অনশনে মরিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

যদি কলিকাতার এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে মফঃস্বলের অবস্থা কিরূপ, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। কলিকাতায় অবশ্য অনেক লোক অন্নের আশায় আসিয়া পড়িল, তাহার মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা অনেক। কিন্তু সেখানে সরকারী হাসপাতালে অন্ততঃ ১২,০০০ হাজার লোক স্থান পাইয়াছে; কলিকাতার অধিবাসীরা অনেক পূর্ব্ব হইতেই অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং সরকারী ব্যবস্থাও কিছু কিছু হইয়াছে। সেই হিসাবে পল্লীর দিকে অনেক বেশী লোক মরিয়াছে; ভাল করিয়া সংবাদ কেহই রাখে নাই।

সরকারী হিসাবে সারা বাঙ্গালায় প্রতি সপ্তাহে আন্দাজ ১,০০০ লোক মরিতেছিল; ডাঃ হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সমস্ত অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া বলেন যে একটী বড় মহকুমায় প্রতিদিন অন্ততঃ সহস্র লোকের জীবনাবসান ঘটিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া মিঃ আমেরী ২৮শে অক্টোবর তারিখে স্বীকার করিলেন কেবল সহরে গত ৮ সপ্তাহে অন্ততঃ ৮,০০০ লোক মরিয়াছে; পল্লীর সমস্ত সংবাদ কেহ জানে না। ইহাতে সভ্যজগতে কাহারও নিকট গৌরব নাই; কেবল মিঃ সুরাবর্দ্দি স্বীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং তাহারা যে অপর ক্ষুধার্ত্তদিগের অন্নের জন্য জীবিতদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহায্য করিয়াছে, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিয়াছেন। মৃতেরা কি সান্ত্বনা বা গৌরব পাইল, জানা যায় নাই।

খাদ্য সরবরাহ ও বড়লাট—

নূতন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল নিজে কলিকাতার অবস্থা দেখিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়া ৩০শে অক্টোবর মেজর জেনারেল ওয়েকেলি ও মেজর জেনারেল রিচার্ডসনকে বাঙ্গালার খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন। সেই সঙ্গে আগামী আড়াই মাসে নিম্নলিখিতরূপ খাদ্য-শস্য সৈন্যদের জন্য মজুত খাদ্য হইতে বাঙ্গালায় পাঠান হইবে—৬১ হাজার টন চাল। ৭০ হাজার টন গম—(পাঞ্জাব ও অষ্ট্রেলিয়ার গম ছাড়া)। ৪০ হাজার টন বার্লি। ১৫ হাজার টন জোয়ার। ১০ হাজার টন ছোলা। তাহা ছাড়া পাঞ্জাব হইতে ৯০ হাজার টন গম পাঠান

হইবে। ১লা হইতে ২৫শে অক্টোবর এই ২৫ দিনে ৪১৪১৬৫ মন চাল, ৮৬৭ মন ধান, ১২০৫১ মন ছোলা, ৭৩৮২৯ মন ডাল, ৩৮৫৮৪৯ মন গম, ২৩৪৫৪ মন আটা, ১০২৯৩৬ মন বাজরা, ৩১৪৮৫ মন জোয়ার, ৮৫৩০ মন ভুট্টা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে ; তাহা ছাড়া সৈন্যদের খাদ্য ভাণ্ডার হইতে ১১৭৮৩ মন চাল বাঙ্গালাকে দেওয়া হইয়াছে। ঐ ২৫ দিনে পাঞ্জাব হইতে নিম্নলিখিতরূপ খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হইয়াছে—কলিকাতায়—গম ৫০০ মন, আটা ৭১৫০০ মন, বাজরা ৫০০ মন ও চাল ২৯০০০ মন। আটা—২৪পরগণায় ৫০০ মন, নদীয়ায় ৫০০ মন, খুলনায় ১০০০ মন, বর্দ্ধমানে ৪৬০০০ মন, বীরভূমে ৬৫০০ মন, বাঁকুড়ায় ২৪০০০ মন, মেদিনীপুর ৩০০০০ মন, হুগলী ২১৫০০ মন, হাওড়া ৯৭০০০ মন, রাজসাহী ৫০০ মন, দিনাজপুর ২০০০ মন, জলপাইগুড়ি ৮০০০ মন, দার্জ্জিলিং ২৩ হাজার মন, রংপুর ৩২৫০০ মন, পাবনা ২০০০ মন, মালদহ ৫০০ মন, ঢাকা ২৪ হাজার মন, মৈমনসিংহ ১০০০ মন, ফরিদপুর ৫৫০০ মন, বাখরগঞ্জ ৫০০ মন, চট্টগ্রাম ৪৫০০ মন, ত্রিপুরা ২৫০০ মন ও নোয়াখালি ৯০০০ মন। কিন্তু এই সকল মাল গেল কোথায় ? আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছি।

বাঙ্গালায় মৃত্যুর হিসাব—

ভারত সচিব বিলাতে কমন্স সভায় জানাইয়াছেন যে প্রতি সপ্তাহে বাঙ্গালা দেশে এক হাজার বা কিছু বেশী লোক মারা যাইতেছে। 'ষ্টেটসম্যান' প্রকাশ করিয়াছেন যে সমগ্র বাঙ্গালায় প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ ৪০ হাজার লোক মারা যাইতেছে। কোন হিসাবটি ঠিক জানিনা। তবে মৃত্যুর সংখ্যা যে অত্যন্ত অধিক, তাহা আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাইতেছি।

বাঙ্গালায় অন্নদান ব্যবস্থা—

বাঙ্গালা দেশে মোট ৫৬৪২টি কেন্দ্রে বিনামূল্যে খাদ্য-দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত ৩৮২১টি, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত ১২৪৭টি এবং বেসরকারী-পরিচালিত ৫৭৪টি। ঐ সকল কেন্দ্রে প্রত্যহ ২০ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮শত ৮৬জন লোক খাদ্য পাইয়া থাকে। মেদিনীপুরে ১২৩৮, চট্টগ্রামে ৫৯১, নোয়াখালিতে ৬০৫, ত্রিপুরায় ৩৭৭, ঢাকায় ২৬৩, বাখরগঞ্জে ২৮৯, বর্দ্ধমানে ২০১, বাঁকুড়ায় ২২২, হুগলীতে ২২১, ২৪পরগণায় ২৩৪, ফরিদপুরে ১৭২ ও অন্যান্য জেলায় বাকী আহার দান কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সরকারী বিবরণ—

ভারত সচিব বিলাতে যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে—'হৈমন্তিক ফসলের যতটা সম্ভব, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কিনিয়া লইবার ও অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ফসলটা ভালই হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু জানুয়ারীর মাঝামাঝি না হইলে ইহা বাজারে উঠিবে না। সুতরাং আগামী আড়াই মাসই বাঙ্গালার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল সঙ্কট।' এই চরম সঙ্কটের সম্ভাবনা এখন আর অনুমান মাত্র নহে। শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়—

গত ৩০শে অক্টোবর প্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক ও কবি স্বর্গত সুকুমার রায়ের স্মৃতি উৎসব এলগিন রোডে আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকারের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক কালিদাস নাগ, অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্ত্তী, বুদ্ধদেব বসু, দিলীপকুমার দত্ত প্রভৃতি সুকুমারবাবুর দানের কথা আলোচনা করিয়া সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পরলোকে আশুতোষ দেব—

গত ১৪ই অক্টোবর প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক আশুতোষ দেব মজুমদার মহাশয় ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার ২১।১ কামাপুকুর লেনস্থ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। হাওড়া জেলার পাতিহাল গ্রামে ১৮৬৬ সালে তাঁহার জন্ম হয়। অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি দেব সাহিত্য কুটীর, এ-টি-দেব, পি-সি-মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, বরদা টাইপ ফাউণ্ড্রী, দেব লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত অর্থপুস্তক, অভিধান, স্কুলপাঠ্য পুস্তক ও ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের সহিত বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই পরিচিত। তাঁহার তিন পুত্র ও বহু পৌত্রাদি বর্ত্তমান।

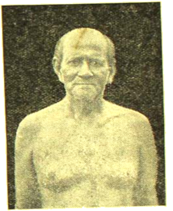

৺আশুতোষ দেব

সংবাদ সরবরাহ বন্ধের প্রতিবাদ—

ভারতে বর্ত্তমানে সংবাদপত্রসমূহকে সংবাদ সরবরাহ বন্ধ করার ব্যাপারে যে সরকারী নীতি চলিয়াছে, সে বিষয়ে গত ৩০শে অক্টোবর এক সভায় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মহাশয় বক্তৃতা করেন। তিনি বলিয়াছেন—যুদ্ধারম্ভের পর হইতে সংবাদ সেন্সার ব্যবস্থার আলোচনা করিলে ইহার তিনটি স্তর পরিদৃষ্ট হয—(১) সত্যাগ্রহ আন্দোলন (২) কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর হাঙ্গামা এবং (৩) বাংলার দুর্ভিক্ষ—এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে। দুর্ভিক্ষের ফলে রাজনীতিক কার্য্যকলাপ একরূপ বন্ধ হইয়াছে এবং দুর্ভিক্ষ কবলিত বাঙ্গালায় বাঁচিয়া থাকার প্রশ্ন ব্যতীত এখন আর অন্য কোন চিন্তা নাই। প্রত্যেকেই ইহা মনে করেন যে, অন্তত

এই বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে সংবাদ ও মন্তব্যাদি প্রকাশ—এমন কি অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা-অবলম্বন না করিলে সমগ্র অধিবাসীদিগের উপর ইহার ফল কিরূপ মারাত্মক হইবে তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিবার জন্ম সংবাদপত্রগুলিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়াই আবশ্যক। সরকারী কর্মচারীদের মনোভাবই এদেশের সেন্সর ব্যবস্থার মূল কারণ। নির্বুদ্ধিতা, আত্মদৌর্বল্য এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতাপ্রসূত ঔদ্ধত্যই এই মনোভাবের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলন বারবার ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই।

পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন—

যাহারা পল্লী অঞ্চল হইতে অন্নাভাবে তাড়নায় নিরুপায় হইয়া কলিকাতা সহরে আসিয়া ভিড় করিয়াছিল, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাহাদের গ্রামে পাঠাইবার প্রয়োজন বোধ করিয়া অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন। শুধু কলিকাতায় নহে, মফঃস্বলের প্রায় প্রত্যেক ছোট বড় সহরেই পল্লীর অসহায় নরনারীর দল খাদ্যান্বেষণে ভিড় করিতেছে। পল্লীর দুরবস্থার ইহাই অকাট্য প্রমাণ। পল্লীর লোক পল্লীতে থাকিয়া তাহাদের অভ্যস্ত বৃত্তি দ্বারা যদি জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত, তাহা হইলে পল্লী ছাড়িয়া সহরের অনভ্যস্ত ও অজানা পথে তাহারা কখনও পা দিত না।

বিদেশ হইতে আমদানী—

১লা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বিদেশ হইতে খাদ্যবস্তু লইয়া ৪ খানি জাহাজ ভারতে পৌঁছিয়াছে। তবে এই খাদ্যের পরিমাণ কত, তাহা জানা যায় নাই। পার্লামেণ্টে আমেরী সাহেবের উক্তিতে জানা যায়, ২৮ হাজার টন খাদ্যবস্তু ভারতে পৌঁছিয়াছে।

পরলোকে তারিণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—

২৪ পরগণা বেহালা নিবাসী তারিণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় গত ১৯শে আশ্বিন মাত্র ২২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম-এ পাশ করিয়া গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং নানা সাময়িক পত্রে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। তিনি সুলেখক শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৺তারিণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

কলিকাতায় বড়লাট—

ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ও তাঁহার পত্নী গত ২৬শে অক্টোবর মঙ্গলবার কলিকাতায় আসিয়া কয়দিন থাকিয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বাঙ্গালার দুর্গতদের অবস্থা এবং পল্লী অঞ্চলে যাইয়া সেখানকার অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন। দেখা যাউক, ইহার ফল কি হয়।

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি—

কলিকাতা বৈঠকখানার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩৪২ সালে সন্ন্যাস গ্রহণের পর 'স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি' নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইনি হরিদ্বারের স্বামী ভোলানাথ গিরির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পুরী, বাঁকুড়ার সন্তোষলঘাটি ও বর্দ্ধমান মেমারীর নিকট আমোদপুরে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে স্বামীজি আমোদপুরে থাকিয়া বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে আহার ও আশ্রয়দান করিতেছেন। চিকিৎসক জীবনে তাঁহার দানশীলতা ও পরোপকার প্রবৃত্তি সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তাঁহার সেবা লাভ করিয়া বাঙ্গালী ধন্য হইয়েছে। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন প্রার্থনা করি।

ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার—

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার কলিকাতায় অবস্থিত নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে আশ্রয়দানের জন্য কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে ৮টি আশ্রয় স্থলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বালীগঞ্জ রিলিফ হোমটি তাঁহারা বালীগঞ্জ ইনিষ্টিটিউটের সহযোগে পরিচালনা করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ঐ সকল আশ্রয়ে ১৪৮০ নিরাশ্রয়কে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭৮৩ জনকে নিজ নিজ গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমতী পণ্ডিতের বিবৃতি—

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মেদিনীপুর জেলা ঘুরিয়া আসিয়া গত ২৪শে অক্টোবর নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন—খড়্গপুর ও কাথির মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে আমি তিনটি মৃতদেহ ও ৫টি নর-কঙ্কাল দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কুকুরে একটি মৃতদেহ ইতিমধ্যেই ভক্ষণ শুরু করিয়াছে। শবের উদরের অংশ নাই। শকুন ও কুকুর দেহটির দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতেছে। অপর একস্থানে আমি এক বৃদ্ধের শব দেখিলাম। দেহটি তখনও সম্পূর্ণভাবে ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাই। শবের কঙ্কালসার দেহ ও মুখের চেহারা এত বীভৎস যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। এক স্থানে একটি নারীর মৃতদেহ দেখিলাম। সে একখণ্ড মলিন ছিন্ন বস্ত্র ও একটি মাটির ভাণ্ড আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। পরলোকযাত্রার প্রাক্কালেও সে তাহার যথাসর্ব্বস্ব ফেলিয়া যাইতে চাহে নাই। কতকগুলি স্থানে মৃতদেহ

পথিপার্শ্বস্থ খানা ডোবা ইত্যাদিতে ফেলা হইয়াছে। ফলে ঐ অঞ্চলগুলি গলিত শবের পূতিগন্ধে বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে। দরিদ্র কৃষক ও মজুরেরা ২।৩টি পয়সা বা ২।১ মুষ্টি তণ্ডুলের বিনিময়ে নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দিয়া খাদ্যের আশায় সহরের দিকে চলিয়া যাইতেছে। হাটের দিনে পথিপার্শ্বস্থ দোকানগুলিতে গৃহস্থের পিতলের বাসনপত্র ও স্ত্রীলোকের কাপড় অলঙ্কারাদি বিক্রয়ার্থ মজুত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।"

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—

ধর্ম্মপ্রচার, তীর্থ সংস্কার, সমাজ সংগঠন, শিক্ষা বিস্তার, মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা, রক্ষীদল গঠন প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কর্ম্মীরা বর্ত্তমান দুর্দ্দশার দিনে কলিকাতা, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, খুলনা, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা—প্রধানত এই কয়টি জেলার বিপন্নদের মধ্যে চাউল বিতরণ, অন্নসত্র খুলিয়া বুভুক্ষুদিগকে অন্নদান, শিশুদিগকে বার্লি ও দুগ্ধ দান, বস্ত্র বিতরণ, রোগক্লিষ্টদের চিকিৎসা প্রভৃতি কার্য্য করিতেছেন। এজন্য তাঁহারা কলিকাতা বালীগঞ্জ ২১১, রাসবিহারী এভেনিউতে সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন।

রিলিফ ক্যাম্প—

বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট কলিকাতা সহরের বাহিরে ৩০ মাইলের মধ্যে ৮টি রিলিফ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ সকল স্থানে নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে আশ্রয় দেওয়া হইতেছে। ৮টি কেন্দ্রে মোট ৪০ হাজার লোক বাস করিতে পারিবে।

বেতিয়ায় রবীন্দ্র-স্মৃতি—

বেতিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের উদ্যোগে সম্প্রতি তথায় ষ্টেট এঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর অমৃতগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে উকীল শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-স্মৃতি সভা হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় তরুণ শিল্পী পশুপতি মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের এক চিত্র সভায় প্রদর্শিত হয়। সঙ্গীত, কবিতা ও প্রবন্ধাদি পাঠের পর সভা ভঙ্গ হয়।

বেতিয়ায় রবীন্দ্র-স্মৃতি

পরলোকে ব্রজমোহন দাস—

হাওড়া সালিখা গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের সম্পাদক রবিবাসরের সদস্য কবি ও সাহিত্যিক ব্রজমোহন দাস মহাশয় গত ৭ই আশ্বিন শুক্রবার মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বন্ধুবৎসল ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিশু-বার্ষিকী 'আহরিকা' ও 'মাধুকরী'র নাম সর্ব্বজনবিদিত।

৺ব্রজমোহন দাস

আসামের দান—

আসাম গভর্ণমেন্ট বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টকে গত ২২শে অক্টোবর জানাইয়াছেন যে তাঁহারা কিছু অতিরিক্ত চাউল বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষ সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জের অবস্থা—

নারায়ণগঞ্জ ঢাকা জেলার মহকুমা-সহর ও পূর্ব্ববঙ্গের একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র। গত আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের বহু লোক খাদ্যাভাবে ভিক্ষার জন্য সহরে আসিয়া সহরের রাজপথে মারা গিয়াছে—ভিক্ষা পাওয়াও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই; ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত মিউনিসিপাল

কর্তৃপক্ষকে রাস্তাঘাট হইতে ৫৫৩টি বেওয়ারিশ মৃতদেহ উঠাইয়া দাহ করিতে হইয়াছে।

অর্দ্ধমূল্যে খেসারীর বীজ—

বঙ্গীয় বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রতীকার সমিতি কৃষকদিগকে খেসারী বুনিবার জন্য ২ হাজার মণ খেসারীর বীজ অর্দ্ধমূল্যে দিবেন। তাহাতে ১৬ হাজার বিঘা জমীতে খেসারীর চাষ হইবে। শ্রীযুক্ত গগনবিহারীলাল মেটা ঐ সমিতির সভাপতি। আর সকল কলাইএর বীজ কি দুর্লভ?

ছাত্রীর কৃতিত্ব—

ঢাকার খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ মহাশয়ের কন্যা কুমারী মীরা নাগ এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যেও প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।

পাবনায় জমী বিক্রয়—

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের ফলে পাবনা জেলায় ছোটখাট জমিদার, জোতদার ও কৃষকগণ সস্তাদরেও তাহাদের জমিগুলি ইজারা দিতেছে। একমাত্র বেড়া সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে প্রত্যহ শতাধিক বন্ধকী ও বিক্রয় দলিল উপস্থিত করা হইতেছে। দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রত্যহ বাজারে তাহাদের ঘরবাড়ীর করোগেট টিনগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে।

পরলোকে বিদুষী বাসন্তী দেবী—

চট্টগ্রাম জগৎপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিদুষী তপস্বিনী বাসন্তী দেবী ব্যাকরণসাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়া গত ১৪ই আগষ্ট ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ভারতীয় মহিলাগণের মধ্যে তিনিই প্রথম গভর্ণমেণ্টের সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন এবং পরে জগৎপুর আশ্রমে টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিচালন করিতেন। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারিণী ছিলেন।

বালিকাদের কৃতিত্ব—

১৯৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজি সাহিত্যে শ্রীমতী বাণী ঘোষ প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছেন। তিনি বেথুন বিদ্যালয়ের বি-এস-সি। কুমারী রমা নিয়োগী প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিতোষিক লাভ করিয়াছেন। রমা প্রসিদ্ধ দেশসেবক শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর কন্যা।

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ—

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ৫ দিন ধরিয়া উড়িষ্যার দুর্দশাগ্রস্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়া জানাইয়াছেন—উড়িষ্যার অবস্থা বাঙ্গালার মত ভীষণ না হইলেও উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। উড়িষ্যার বহু স্থানেই গ্রামবাসীরা না খাইয়া মরিতেছে।

পণ্ডিত কুঞ্জরুর অভিমত—

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সম্প্রতি বাঙ্গালার দুর্দশাগ্রস্ত স্থানগুলি দেখিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস বাঙ্গালা দেশে প্রতি সপ্তাহে অনাহারে ৫০ হাজার করিয়া লোক মারা যাইতেছে। তাঁহার বিশ্বাস, বাঙ্গালায় যাহা ঘটিতে দেওয়া হইয়াছে, ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও তাহা ঘটা সম্ভব হইত না। তিনি বলিয়াছেন, গ্রামে কৃষকদের নিকট জমা ফসল নাই। তাহা হইলে গ্রামে খাদ্যের এত অভাব হইত না।

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—

শ্রীনলিনী মোহন সান্যাল

শান্তিপুরবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল সম্প্রতি ৮৩ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করায় আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। হিন্দী ভাষায় মৌলিক গবেষণা করার জন্য তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন নাই। সান্যাল মহাশয় ৬১ বৎসর বয়সে এম-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা অনুকরণীয় বটে।

পরলোকে নলিনরঞ্জন বসু—

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা—বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের নলিনরঞ্জন বসু গত ৩১শে অক্টোবর অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি হাওড়া খোড়প গ্রামের অধিবাসী এবং বুদ্ধ গয়া মন্দিরের কিউরেটার স্বর্গত শ্রীগোপাল বসুর পুত্র। তাঁহার বিধবা পত্নী ও এক কন্যা বর্ত্তমান।

পরলোকে চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়—

গত ২১শে অক্টোবর কলিকাতা ৪১ কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের রায় বাহাদুর চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৯০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা হরমোহন চট্টোপাধ্যায় সরকারী শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টার ছিলেন। চণ্ডীবাবুও বড় সরকারী চাকরী করিতেন এবং বহুদিন মানমন্দিরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার সাহিত্যালোচনা সভায় যোগদান করিতেন। তাঁহার ৮৫ বৎসর বয়স্কা বিধবা পত্নী ও পুত্র কন্যাদি বর্ত্তমান।

রয়্যাল কমিশন নিয়োগ দাবী—

গত ১লা নভেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—"যে খাদ্য সঙ্কটের জন্য বাঙ্গালায় এতগুলি

লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি রয়াল কমিশন গঠন করিতে কর্পোরেশন ভারত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের নিকট আবেদন জানাইয়াছে।" কমিশন বসাইয়া লাভ কি হইবে ?

বাজরা ব্যবহারের অনুরোধ—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এ দেশের অধিবাসীদিগকে বাজরা ব্যবহার করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন—চাউল দুষ্প্রাপ্য, বাজরার সের সাড়ে ৪ আনা। বাজরার খৈ সহজে হজম হয়। বাজরার খিচুড়ী পুষ্টিকর। বাজরার আটায় রুটি বা পিঠা করা যায়। আমাদিগকে আরও কত নূতন জিনিষ খাইয়া বাঁচিতে হইবে কে জানে।

চাউলের অভাবে পড়া বন্ধ—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে জানাইয়াছেন—১লা নভেম্বর কলেজ খোলার কথা ছিল—তাহা না হইয়া ১৫ই নভেম্বর খুলিবে। যে সকল ছাত্র ছাত্রাবাসে বাস করে, তাহারা বাড়ী হইতে চাউল সঙ্গে করিয়া না আনিলে ছাত্রাবাসে খাইতে পাইবে না। অদ্ভুত আদেশ বটে !

কুমিল্লায় সাহায্য দান বন্ধ—

২৩শে অক্টোবর কুমিল্লা হইতে খবর আসিয়াছে যে চাউলের অভাবে তথায় দুঃস্থদিগকে সাহায্য দান কার্য্যও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সরকারী ব্যবস্থা চমৎকার।

যুক্তপ্রদেশের দান—

গত ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালায় মোট ১০ লক্ষ ৬২ হাজার ৫শত ৮মণ খাদ্য প্রেরণ করিয়াছেন। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কতটুকু।

ত্রিপুরা জেলায় মৃত্যু—

ত্রিপুরা জেলার গৌরীপুর ইউনিয়নের মধ্যে ২ মাসে ৫শত লোক মারা গিয়াছে—তন্মধ্যে ১৫০ জন কৈবর্ত্ত। শুধু গৌরীপুর বাজারে ২শত লোক মারা গিয়াছে। সুন্দলপুর ইউনিয়নে ১০০, দাউদকান্দি ইউনিয়নে ৫০০ ও ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নে ৩৬০জন মারা গিয়াছে। নদী ও নালাগুলিতে মৃতদেহ ফেলিয়া দেওয়ায় জল দূষিত হইতেছে। দুর্গন্ধের জন্য নৌকা চড়িয়া যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে।

সাধুজন পাঠাগার—

গত ২৮শে আশ্বিন বনগ্রাম (যশোহর) অবৈতনিক সাধুজন পাঠাগারের ৯ম বার্ষিক জন্মোৎসব সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করিলে পাঠাগারের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সাধু বার্ষিক কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর পাঠাগারের ৯ম বার্ষিক জন্মোৎসব সমিতির পক্ষ হইতে স্থানীয় সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানপত্র দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দত্তের গান এবং বিশিষ্ট সুধীবৃন্দের বক্তৃতা এবং পাঠাগার সম্পর্কে সভাপতির অভিভাষণ বিশেষ উপভোগ্য হয়।

অধিক খাদ্য উৎপাদন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রকাশ করা হইয়াছে, গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ১৫ লক্ষ ২ হাজার ৮শত ৩৫ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। উন্নত ভাবে বীজ বিতরণ করায় আউ ধান্যের চাষ শতকরা ২৫ ভাগ ও আমন ধানের চাষ শতকরা ১০ ভাগ অধিক জমিতে হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে, আউ ধান্য, আমন ধান্য ও রবি শস্য—সকল বাবদে মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বীজ চাষীদিগকে প্রদান করা হইয়াছে।

পরলোকে সত্যব্রত মজুমদার—

প্রসিদ্ধ কবি ও ভারতবর্ষের লেখক সত্যব্রত মজুমদার গত ১১ই ভাদ্র মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং বিশ্বভারতী হইতে ৬ বৎসর পূর্ব্বে বি-এ পাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা ও গল্প বাঙ্গালার সকল প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রেই প্রকাশিত হইত।

৺সত্যব্রত মজুমদার

বারাসত মহকুমার অবস্থা—

কলিকাতার সন্নিকটে ২৪পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অবস্থা অতীব শোচনীয়। খাদ্যের অভাবে প্রত্যহ ২।৩ জনের মৃতদেহ রাস্তার ধারে, হাটের সম্মুখে, কাছারির প্রাঙ্গণে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। বাজার, দোকান প্রভৃতিতে চাউল নাই। যাহাদের ক্রয় করিবার সঙ্গতি আছে, তাহারাও চাউলের অভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। উদর পূরণের জন্য গেঁড়ী গুগলী সিদ্ধ করিয়া খাওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

ময়মনসিংহ জেলার অবস্থা—

ময়মনসিংহ জেলার পল্লী অঞ্চলের অবস্থা যেমন মর্ম্মন্তুদ, তেমনই ভয়াবহ। কচু গাছ ও আরও নানা লতাজাতীয় গাছ আজকাল গ্রামে খুব কমই দেখা যায় ; গ্রামবাসীরা ইহাই তাহাদের বর্ত্তমানের একমাত্র সম্বল করিয়াছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেহই কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকায় না। রাস্তায় ঘাটে মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। নানাবিধ রোগও যেন সময় বুঝিয়া একে একে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কলেরা, স্থানে স্থানে বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। শত শত লোক প্রতিদিন এই জেলায় মারা যাইতেছে। সমস্ত জেলাটাই যেন শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

রাজবন্দীদের মুক্তি—

নূতন মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণের পর হইতে এ পর্যন্ত মোট ৩১১জন রাজবন্দীকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই সিকিউরিটি বন্দী।

বেঙ্গল রিলিফ কমিটী—

৩রা নভেম্বর পর্যন্ত বেঙ্গল রিলিফ কমিটী ২০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। বোম্বাই রিলিফ ফাণ্ড ৫ লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন; তাহার পরই দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমসের দান উল্লেখযোগ্য।

গভর্ণরগণের সহিত পরামর্শ—

ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল নিখিল ভারত খাদ্যনীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণরদিগকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছেন। গভর্ণরগণের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি নিজে সকল প্রদেশ দেখিবার জন্য সফরে বাহির হইবেন।

বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী—

২৫শে অক্টোবর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ৯ হাজার টনেরও অধিক গম লইয়া চতুর্থ জাহাজ বিদেশ হইতে ভারতীয় বন্দরে উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম ৩খানা জাহাজের মালের পরিমাণ জানা যায় নাই। মন্দের ভাল।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়—

আর্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সুপ্রসিদ্ধ বীমাকর্মী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক তাঁত শিল্প নিয়ন্ত্রণ পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঢাকেশ্বরী কটন মিলের অন্যতম ডিরেক্টার। যাহাতে বাঙ্গালা দেশে বস্ত্র ও সূতা ব্যবসায়ে অন্যায় লাভ বন্ধ হয় এবং দেশের লোক উচিত মূল্যে বস্ত্র ক্রয় করিতে পারে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আশা করি, সুরেশবাবুর নিয়োগ সার্থক হইবে।

সিন্ধু গভর্ণমেণ্টের মনোভাব—

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী বিনা ভাড়ায় তাঁহাদের জাহাজে করিয়া করাচী হইতে খাদ্যশস্য কলিকাতায় আনিয়া দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু সিন্ধু গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালায় প্রেরিত খাদ্যশস্যের পরিমাণের উপর লাভের লোভ ত্যাগ করিতে না পারায় তথায় কোন মাল পাওয়া যায় নাই, কাজেই সিন্ধিয়া কোম্পানীকেও মাল আনিতে হয় নাই। সিন্ধু গভর্ণমেণ্টের এই অতিলাভের লোভের কথা বিলাতে প্রচারিত শ্বেতপত্রেও আলোচিত হইয়াছে।

রয়াল কমিশন নিয়োগ দাবী—

৪ঠা নভেম্বর লণ্ডনে কমন্স সভায় যখন ভারতের দুর্ভিক্ষের কথা আলোচনা হইতেছিল, তখন পার্লামেণ্টের ৬ শত সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩৫ হইতে ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের দরদ এই সংখ্যা হইতেই বুঝা যায়। পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ কোভ দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে রয়াল কমিশন দ্বারা তদন্তের দাবী করিয়াছিলেন।

কাপড় ও কম্বল বিতরণ—

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রিলিফ ফাণ্ডে এ পর্যন্ত (৭ই নভেম্বর) ১১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল—তন্মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা মফঃস্বলে কাপড় ও কম্বল বিতরণের জন্য ব্যয় করা হইবে। সেজন্য দেড় লক্ষ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় ও ১ লক্ষ সূতি কম্বল ক্রয় করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ১ লক্ষ পাটের কম্বল প্রস্তুত হইয়া প্রেরিত হইবে। বাত্যা সাহায্য ভাণ্ডার হইতেও ১ লক্ষ ৬০ হাজার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় ও ৫৫ হাজার পাটের কম্বল ক্রয় করিয়া বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সৈন্যগণ কর্তৃক খাদ্য সরবরাহ—

সৈন্যগণ কি ভাবে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ নিবারণে সাহায্য করিতেছে, ভারতের জঙ্গীলাট সার ক্লড অচিনলেক তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—বাঙ্গালায় যে সব সৈন্য ছিল তাহারাই কার্যারম্ভ করিয়াছে। সৈন্যগণ মফঃস্বলে প্রেরিত হওয়ার পর হইতে মফঃস্বলের ১২০টি বণ্টন কেন্দ্রে প্রত্যহ ৯ শত টন খাদ্যশস্য পাঠানো হইয়াছে। ৬ই নভেম্বর হইতে প্রত্যহ ২ হাজার টন খাদ্যশস্য কলিকাতা হইতে জেলাগুলিতে পাঠানো হইতেছে। সৈন্যগণ মাল খালাস ও বণ্টন কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। তিন মাস কাল সৈন্যগণকে এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। সৈন্যগণ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় তাহাদের নিজেদের মজুরদিগকে খাওয়াইতেছে। শুধু বাঙ্গালাতে ঐ ভাবে ৫০ হাজার পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু খাদ্য পাইতেছে। বৃটীশ সৈন্যদিগকে চাউল দেওয়া বন্ধ করা হইয়াছে ও ভারতীয় সৈন্যদিগকে প্রদত্ত চাউলের পরিমাণ ১/৩ ভাগ কমাইয়া তাহার বদলে আটা দেওয়া হইতেছে। সৈন্যগণ নিজেরাই তাহাদের রেশন হইতে তাহাদের ক্যাম্প ও ব্যারাকের নিকটবর্ত্তী দুর্গত লোকদিগকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে দেশের লোক উপকৃত হইলেই মঙ্গল।

বিলাতে ভারত কথা—

গত ৪ঠা নভেম্বর লণ্ডনে পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় সাড়ে ৫ ঘণ্টা কাল বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সার জর্জ শুষ্টার সরকারী নীতির নিন্দা করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন—সার জর্জ ১৯২৮ হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব ছিলেন। তিনি বিলাতের ভারত-সচিব ও তাঁহার অফিসের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার জন এণ্ডারসন সরকার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

ক্যানাডা হইতে গমপ্রেরণ—

ক্যানাডার গভর্ণমেণ্ট ভারতের দুর্ভিক্ষ সাহায্যে এক লক্ষ টন গম পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন। জাহাজ পাওয়া গেলেই তাহা ভারতে প্রেরণ করা হইবে।

জমী বিক্রয়ের হিড়িক—

কুমিল্লা দাউদকান্দির সংবাদে প্রকাশ, তথায় এত অধিক জমী বিক্রয় হইতেছে যে সে জন্য একটি অতিরিক্ত সাব রেজেষ্ট্রী অফিস

খোলা হইয়াছে। ১২ শত দলিল রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে ও ৫ শত দলিল ফেরত দেওয়া হইয়াছে। লোক নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতেছে।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে আরিয়াদহ (২৪পরগণা) অনাথ ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের জন্য যথেষ্ট কাজ করিতেছেন। গত পূজার ষষ্ঠীর দিন তাঁহারা কয়েক শত বস্ত্র, প্রচুর চাল ও ডাল বিতরণ করিয়াছিলেন—শ্রীদুর্গা কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ চৌধুরী সেই বিতরণে সভাপতিত্ব করেন। মহাষ্টমীর দিন গোপালবাবুর অর্থসাহায্যে প্রায় ১৫ শত দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার্য্য দান করা হইয়াছিল। বেলঘরিয়ার মোহিনী মিলের ম্যানেজার মিঃ এম-এন-মেটা, সহকারী ম্যানেজার মিঃ ইউ-এন-গুপ্ত, কণ্ট্রাক্টার মিঃ এ-কে-পাই, বঙ্গেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজার শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ কার্য্যে সাহায্য করেন। সম্প্রতি কলিকাতা রিলিফ কমিটির সাহায্যে ভাণ্ডার গৃহে অন্নসত্র খুলিয়া প্রত্যহ প্রায় ৫ শত লোককে খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারের কর্ম্মীবৃন্দ

আরিয়াদহে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ

ধান চাষের পূর্ব্বাভাস—

সরকারী সংবাদে প্রকাশ ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জমীতে ধান চাষ করা হইয়াছিল ১৯৪৩-৪৪ সালে তদপেক্ষা ৪৫ লক্ষ ২০ হাজার একর অধিক জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এবার ধান চাষের জমির পরিমাণ শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফসলের অবস্থাও মোটের উপর ভাল। কিন্তু ইহা দ্বারা আমাদের চাহিদা মিটিবে ত?

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের অভিমত—

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক বিবৃতির মধ্যে জানাইয়াছেন—'শুধু অন্নসত্র খুলিয়া বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। বাঙ্গালায় ৫ হাজার ইউনিয়ন বোর্ড ও প্রায় এক হাজার মিউনিসিপালিটী আছে। যদি দেশকে বাঁচাইতে হয় তবে অবিলম্বে অন্ততঃ এই ছয় হাজার কেন্দ্রে চাউল, গম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পাঠাইতে হইবে। যানবাহনের অভাব আছে বলিলে চলিবে না। একত্রে ১৫ দিন যদি সাধারণ দৈনন্দিন কাজ বন্ধ রাখিয়া সমস্ত রেল, ষ্টীমার, নৌকা, মোটর-ভ্যান, মিলিটারী লরী ও গরুর গাড়ী প্রভৃতিকে কেবলমাত্র খাদ্যদ্রব্য বহন করার কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইত তাহা হইলে সমস্যা অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা হইবে কি?

মুক্তি-বিবৃতির দাবী—

বড়লাটের শাসন পরিষদের দুইজন ভূতপূর্ব্ব সদস্য স্যর হোমী মোদী ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার যুক্তভাবে এই বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ভারতের দাবী সম্পর্কে নূতন বড়লাটকে অবহিত করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী করিয়াছেন এবং সে দাবী রক্ষিত হইলে পরে ক্রিপস প্রস্তাবের ভিত্তিতে জাতীয় গভর্ণমেন্ট গঠন করিবার জন্য বড়লাটকে প্রকাশ্য আহ্বান জানাইতে বলিয়াছেন। নূতন বড়লাট এদেশে আসিবার পূর্ব্বে ভারতের দাবী সম্পর্কে অনেক

বড় বড় কথা বলিয়াছেন, এখন কার্য্যকালে কি করেন, তাহাই বিবেচনার বিষয়।

শিক্ষকগণের দুরবস্থা—

গত ৫ঠা নভেম্বর গৌহাটীতে আসামের সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলসমূহের শিক্ষকগণের এক সভায় শিক্ষকগণের দুরবস্থার কথা আলোচিত হইয়াছিল। শিক্ষকগণ সরকারী চাকুরিয়াদের মত মাগ্‌গী-ভাতাও পান না বা স্কুলভে চাল ডালও পান না। এই অভিযোগ শুধু আসামে নহে, বাঙ্গালায় আছে। কিন্তু শিক্ষকদের কথা কেহই ভাবেন না। তাঁহারা যে ভবিষ্যত জাতিগঠন কার্য্যে নিযুক্ত, সে কথা আমরা কখনও ভাবি না। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?

প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীর বিবাহ—

প্রাক্তন বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ গত ২৩শে অক্টোবর লণ্ডনে মিস্ ষ্টিভেন্সন নাম্নী ৫৫ বৎসর বয়স্কা এক কুমারীকে বিবাহ করিয়াছেন। মিঃ লয়েড জর্জ্জের বয়স এখন ৮০ বৎসর। তাঁহার প্রথমা পত্নী ১৯৪১ সালে মারা গিয়াছেন। মিস্ ষ্টিভেন্সন ১৯১৩ সাল হইতে মিঃ লয়েড জর্জ্জের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করিতেছিলেন। মিঃ লয়েড জর্জ্জ ১৯১৬ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

সরকারী সাহায্যের পরিমাণ—

গত ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মোট ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা রিলিফের জন্য দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা দান করা হইয়াছে, ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা লোককে খাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

সরকারী কার্য্যের নিন্দা—

ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত কয়েকজন বেসরকারী ভদ্রলোককে বিলাতে পাঠান হইয়াছে—এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গত ৮ই নভেম্বর দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ঐ নিন্দা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ৩৯জন ও পক্ষে ৪৩জন সদস্য ভোট দিয়াছিলেন। ঐ অধিবেশনে মাত্র ১০জন কংগ্রেসী সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বিলাতে রবীন্দ্র-স্মৃতি—

গত ১৩ই অক্টোবর লণ্ডনবাসী বহু ইংরাজ ও ভারতীয় সুধী এক আবেদন প্রচার করিয়া তত্রস্থ ঠাকুর সোসাইটী হইতে একটি গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সকলকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। পুলিন শীল, অমিয় বসু, বি-বি রায় চৌধুরী, পবিত্র মজুমদার, বিভূতি চৌধুরী প্রভৃতি আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঐ গৃহে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিদ্বদ্‌গণের মিলন ক্ষেত্র হইবে।

স্যার গুরুদাস স্মৃতিরক্ষা—

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদের সহিত স্বর্গত সুধী স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সংযুক্ত করিয়া রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস-চান্সেলার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় তাঁহার দান কম নহে।

বাঙ্গালায় ডাল প্রেরণ—

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা ও ভারতের অন্যান্য দুর্গত অঞ্চলে ১৫ হাজার টন ডাল পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে দুই আনা সেরের ডাল ১২ আনা সের দরে বিক্রীত হইতেছে। বাঙ্গালার লোক ডাল ভাত খায়—কাজেই মাদ্রাজের এই দানে বিশেষ উপকার হইবে।

স্যার যোগেন্দ্র সিংহের অভিজ্ঞতা—

ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সচিব সর্দ্দার স্যার যোগেন্দ্র সিং বাঙ্গালা দেশ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন—দেশের শতকরা ৩০জন স্থায়ী-ভাবে অনশনে দিনাতিপাত করিতেছেন এবং শতকরা আরও ৩০জন অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে।

চরকা পরিচালনের পরিকল্পনা—

বাঙ্গালার সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নিরন্নদের দ্বারা চরকায় সূতা কাটাইবার জন্য শ্রীযুক্ত গঙ্গাবিহারীলাল মেটা একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে যাহারা চরকা কাটিতে জানে তাহাদিগকে প্রথমেই চরকা ও সূতা ইত্যাদি দেওয়া হইবে। যাহারা সূতা কাটিতে জানে না তাহাদিগকে প্রথমে চরকা কাটা শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং পরে বিনামূল্যে চরকা ও তূলা ইত্যাদি দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে।

মাগ্‌গী-ভাতা নির্দ্ধারক কমিটী—

সকল সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের মাগ্‌গী-ভাতা প্রদান সম্পর্কিত নীতি নির্দ্ধারণের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট স্যার থিওডোর গ্রেগারীর নেতৃত্বে এক কমিটী গঠন করিয়াছেন। এই কমিটীতে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে দুইজন করিয়া সদস্য লওয়া হইবে। দুইজনের মধ্যে একজন মালিক প্রতিনিধি ও একজন শ্রমিক প্রতিনিধি থাকিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার দান—

বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ সাহায্যে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত জিনিষগুলি পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন—৫ লক্ষ পাউণ্ড চিনি বর্জ্জিত জমাট দুধ, ৫০ হাজার পাউণ্ড দুগ্ধ চূর্ণ, এক হাজার টন জ্যাম, ২ হাজার টন চিনি ও ৫ হাজার টন চাউলের গুঁড়া।

কর্পোরেশন ও মিঃ দে—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণ কর্পোরেশনের চিফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ বি-এন-দের কার্য্যকাল ৫ বৎসর বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই নিয়োগ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ—গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অসম্মত হন। তখন মিঃ দে'কে কর্পোরেশনের স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়। গভর্ণমেণ্ট

এ নিয়োগ মঞ্জুর করেন নাই। ইহাই আমাদের স্বায়ত্তশাসনাধিকারের নমুনা।

সাধক জগদীশচন্দ্র চট্টরাজ—

৺জগদীশচন্দ্র চট্টরাজ

মুর্শিদাবাদ জেলার খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্মী—পরবর্ত্তীকালে যোগ সাধনায় নিরত জগদীশচন্দ্র চট্টরাজ মহাশয় ১২ই আষাঢ় মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বগ্রাম নবগ্রাম কানকলা গ্রামে সমাধি অবস্থায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কে যাঁহারা একদিনের জন্যও আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার অসাধারণত্বে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও সুশ্রী—তাঁহার ব্যবহার ছিল অমায়িক ও সুমধুর। তিনি শিক্ষিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার পিতা শ্রীমাধব চট্টরাজ মহাশয় বি-এ পাশ করিয়া জিয়াগঞ্জ, পাকুড় প্রভৃতি স্থানের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন; জগদীশচন্দ্রের অগ্রজ শ্রীনন্দন চট্টরাজ এম-এ পাশ করিয়া যুক্তপ্রদেশের ফৈজাবাদে প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতেন। জগদীশচন্দ্র বি-এ পড়িবার সময় ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। বিদ্যালয়ে ও কলেজে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং ইংরাজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। মুর্শিদাবাদ কংগ্রেসের নেতারূপে তিনি জেলাবাসী সকলের শ্রদ্ধার ও স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। ইংরাজি ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে ভাটা পড়িলে জগদীশচন্দ্র হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিবার জন্য যখন কাশীধামে গমন করেন তখন সহসা বিশ্বনাথের মন্দিরে তাঁহার দীক্ষালাভ হয়। শৈশব হইতেই জগদীশচন্দ্র ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, এই সময় হইতে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় ও তিনি শ্রীঅরবিন্দ সাহিত্য পাঠ করিয়া যোগসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাহার পর তিনি নানা কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও সকল সময়ে ধর্ম্মসাধনার মধ্যে বাস করিতেন এবং তাঁহার সহকর্মী, বন্ধু প্রভৃতিদের ধর্ম্মজীবন গ্রহণ ও যাপনে সাহায্য করিতেন। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র ও সাধনার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, সেজন্য তিনি গীতা, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ-প্রভৃতি পাঠে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া নিজের জীবন উন্নত করিতেন। একখানি পত্রে তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন—"ভগবান মানুষকে কোন পথে কেমন করে নিয়ে যান, গড়ে পিটে তোলেন, সে রহস্য একান্তভাবে তাঁহারই রহস্য। সুখে অসুখে ও দুঃখে অসুবিধা হয়ে তাঁর নির্দ্দিষ্ট পথে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে এগিয়ে চলাই আমাদের একমাত্র কাজ। একটি জিনিষ থাকলে সব থাকে, গেলে সব যায়—সেটি হল ধর্ম্ম।" আর একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—"ভক্তিমান মানুষ আজও হাঁটা পথে তীর্থযাত্রা করে। মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা, অনুরাগের প্রাচীন পথ সকল বাধার মধ্যে বাধাহীন হয়ে বিস্তৃত আছে।"

ছাত্রজীবনের পর তিনি কয়েক বৎসর ব্যবসা প্রভৃতিতে মন দিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু জীবনের শেষ ১০ বৎসর তিনি আর স্বগ্রাম কানকলা হইতে বাহিরে কোথাও যান নাই। ঐ সময় তিনি সর্ব্বদা সাধনা ও তপস্যায় ডুবিয়া থাকিতেন—বারবার তাঁহাকে সমাধিস্থ অবস্থায় থাকিতে দেখা যাইত। তাঁহার দেহ বেশ সুস্থ ও সবল এবং নীরোগ ছিল। সেই অবস্থায় সহসা ১২ই আষাঢ় তিনি সকলকে বলিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চিরসমাধিতে মগ্ন হইয়াছেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব মহাপ্রয়াণ তাঁহার মত অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে।

বাঙ্গলা ১৩০৫ সালের ২০শে আষাঢ় গুরু পূর্ণিমায় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জিয়াগঞ্জ স্কুলে ও বহরমপুর কলেজে তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং নিজে উদ্যোগী হইয়া কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ দিয়াছিলেন।

তাঁহার রহস্যময় জীবনের কথা প্রকাশের চেষ্টা করা বৃথা। তিনি যে উদ্দেশ্যে সাধনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহা সার্থক হউক—ইহাই কামনা করিয়া আমরা তাঁহার আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নমস্কার জ্ঞাপন করি।

সুলভে চাউল দান—

শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিং সিংহী

সুপ্রসিদ্ধ ধনী জমীদার শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিং সিংহী মহাশয় ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাস হইতে এখন পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জ সহরে সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকেই সুলভ মূল্যে ও বিনামূল্যে চাউল প্রদান করিতেছেন। গত জুলাই মাস পর্য্যন্ত ঐ বাবদে তাঁহার প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। প্রায় ১৮ শত পরিবার ঐ সাহায্য লাভ করিতেছে। দাতা শতজীবতু।

নেত্রকোণায় বালিকা বিক্রয়—

নেত্রকোণার বেশ্যা পল্লীতে ৩ হইতে ১২ বৎসর বয়স্কা নিরাশ্রয় বালিকাদিগকে প্রত্যেকটি ১০ আনা হইতে দেড় টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছিল। পুলিশ খবর পাইয়া ১২টি বালিকাকে উদ্ধার করিয়াছে। দুর্দ্দশার আর বেশী পরিচয় কিসে হইবে?

ফরিদপুরে কলেরা—

২৩শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে শুধু ফরিদপুর জেলায় কলেরায় ২১৪ জন মারা গিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ২১২ জন মারা গিয়াছিল। গোয়ালন্দ ও মাদারীপুর মহকুমায় বেশী লোক মারা যাইতেছে। খাদ্যাভাবে অখাদ্য ভক্ষণের ইহাই পরিণাম।

কর্ত্তব্য কি ?—

১৩৫০ সালে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষে এ দেশের অধিবাসীদিগকে যে দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার পর যাঁহারা জীবিত রহিলেন, তাঁহারা যে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন এমন মনে হয় না। দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদনের হ্রাসপ্রাপ্তি যে এই কষ্টের অন্যতম কারণ তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু তথাপি এখনও এদেশে অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদনের চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। আখের চাষের অভাবে গুড় এ বৎসর ৩০ টাকা মণ পর্য্যন্ত দামে বিক্রীত হইতেছে…যে আখের চাষ বাড়াইলে গুড়ের সমস্যার সমাধান সমাধান হইবে, সে চাষও এবার তেমন বাড়ে নাই। বাঙ্গালা দেশে সকল ডালের কলাই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন না হইলেও মুগ, বিরি, মসুর, মটর প্রভৃতি কলাইয়ের চাষ যদি এবার বাড়ান হয়, তাহা হইলে আমাদের আগামী বৎসরে আর ডালের জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে না। চাষ করিলে বাঙ্গালায় প্রচুর উৎকৃষ্ট ফুলকপি উৎপন্ন হইতে পারে, অথচ আমরা কপির জন্য বিহারের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকি—গত বৎসর রেলগাড়ীর অভাবে বিহারের কপি বেশী পরিমাণে কলিকাতায় আনা সম্ভব হয় নাই। এবারে যদি বেশী কপির চাষ না হয়, তাহা হইলে এবারেও বাঙ্গালীর পক্ষে সুলভে কপি পাওয়া সম্ভব হইবে না। আসাম বা মাদ্রাজ হইতে আলু না আসায় এবার বাঙ্গালীকে ৬ মাস ধরিয়া এক টাকা সের দরের আলু খাইতে হইতেছে। ইহাতেও যদি বাঙ্গালীর চৈতন্য না হয় এবং বাঙ্গালী যদি অন্ততঃ দ্বিগুণ জমীতে আলুর চাষ না করে, তবে তাহার দুর্দ্দশা কেহই মোচন করিতে পারিবে না। বাঙ্গালায় বহু সৈন্যের আমদানী হইয়াছে এবং তাহারা এখনও কিছুকাল বাঙ্গালা দেশেই থাকিবে। কাজেই তাহাদের জন্য তরিতরকারী সরবরাহের ফলে আমরা অধিক মূল্যে তরিতরকারী খাইতে বাধ্য হইয়াছি। এ সময়ে বাঙ্গালী যদি এ বিষয়ে অবহিত হইয়া অধিক তরিতরকারীর চাষ করিত, তবে তদ্দ্বারা যে লাভবান হইত, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে সরকারী হিসাব উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে বাঙ্গালায় ধানের চাষ প্রতি বৎসর কিছু কিছু কমিয়া ৫ বৎসরে প্রায় একচতুর্থাংশ কমিয়া গিয়াছে। ইহার প্রতীকারের জন্য ধানের চাষের পরিমাণও যাহাতে বাড়ে, সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। লঙ্কা, হলুদ, সরিষা, ধনে, সুপারি প্রভৃতির চাষও এদেশে বৃদ্ধি করার বিশেষ প্রয়োজন আমরা এবার অনুভব করিয়াছি। কিন্তু সব দেখিয়া শুনিয়াও যদি আমরা পরবশ হইয়া বসিয়া থাকি, তবে আমাদের মৃত্যুতে কেহই বাধা দিতে পারিবে না। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বং আত্মবশং সুখং—যতদিন আমরা এ নীতির মর্য্যাদা রক্ষা না করিব, ততদিন আমাদের অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার উপায় হইবে না।

ডায়মণ্ডহারবারের অবস্থা—

২৪ পরগণা জেলায় ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার দক্ষিণাঞ্চলের অবস্থা শোচনীয়। গত বর্ষের প্লাবন ও ঝড়ে ঐ অঞ্চলের লোক সর্ব্বহারা হইয়াছে। প্রতি গ্রাম হইতে প্রত্যহ বহু অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে। শৃগাল কুকুরে নরমাংস ভক্ষণ করিতেছে। দিনের বেলা গ্রামের মধ্যে শকুনে মৃতদেহ ভক্ষণ করে। সৎকারের কোন ব্যবস্থা নাই। ট্রেণের মধ্যে মৃতদেহ, লঙ্গরখানায় মৃতদেহ, কন্‌ট্রোলের দোকানের সম্মুখে মৃতদেহ, গৃহে মৃতদেহ, পথিপার্শ্বেও মৃতদেহের অভাব নাই। কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ মহামারীরূপে চারিদিকে দেখা দিয়াছে। চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত নাই।—শুধু এক স্থানের নয়, সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অবস্থা এইরূপ। কাহার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে ?

"অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা"

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

রামপ্রসাদী সুর

এস মা আনন্দময়ী নিরানন্দ এ ভুবনে।
বিশ্ব যে আজ শ্মশান হলো চাহ কৃপা আঁখি-কোণে।
অনশন দাবানলে
দেশ যে হায় গেল জ্বলে
শ্মশান হবে আর মা দেরে (যদি) বাঁচাবি মুমূর্ষু জনে।
সচল কঙ্কাল যত, কাতরা জননী কত
শতছিন্ন বাসে ঢাকি শিশুরে মরণাহত ;
একি দৃশ্য ! হায় অদৃষ্ট ! দেখা যায় না দুনয়নে।
রণচণ্ডীর অট্টহাসি
তাও ভুলেছে উপবাসী
ক্ষুধার অন্ন মিলুক আগে, রণে লজ্জা নাই মরণে ;
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা নিরন্ন সন্তানগণে।

খেলা ধুলা

৺হৃষাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ঃ

হিন্দু ঃ ৫৩৯

মুসলীম ঃ ৮৪ ও ১২২

হিন্দুদল প্রথমে ব্যাটিং নিয়ে দিনের শেষে ৫ উইকেটে ৪০৮ রান করে। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ১১৫ রান উঠে ২ উইকেটে। প্রথম উইকেটের জুটিতে ১৮০ রানে উঠলে ১৯৪১ সালের রেকর্ড ভঙ্গ হয়। এই মোট রান সংখ্যায় ছিল পমনমলের ৭৩ এবং নরোত্তমের ৯৯ রান। ষষ্ঠ উইকেটের জুটিতে কিষণচাঁদ নট আউট ১১৫ রান এবং বিকাজী ৫৮ রান ক'রে মোট ১৪৪ রান তুলেছিলেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে কিষণচাঁদ এবং বিকাজী নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৫৩৯ রানে হিন্দুদলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। কিষণচাঁদ ১৮১ রান ক'রে ইব্রাহিমের বলে এল বি ডবলউ হ'ন। কিষণচাঁদ মোট ২৩৯ মিনিট উইকেটে ছিলেন এবং ১৯টা 'বাউণ্ডারী' করেন। ফাইনাল খেলার প্রথম ইনিংসে হিন্দুদল ১৮১ রান ক'রে এ বছরের পার্শীদের বিপক্ষে যে ৪৯০ রান তুলেছিল তার রেকর্ড ভঙ্গ করে। বিকাজী ৬৮ রান করেন। লাকদা ১৭২ রানে ৪টা উইকেট পান।

মুসলীমদলের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল। সূচনা কিন্তু ভাল হয়নি। মাত্র ৮৪ রানে মুসলীমদলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল। আব্বাস খাঁ দলের সর্ব্বোচ্চ ৩০ রান করেন। হিন্দুদলের বোলিং মারাত্মক হয়েছিল। সারস্বনী ৩১ রানে ৪, নওমল ১৮ রানে ৩ এবং পরশুরাম ১৯ রানে ২টা উইকেট পান।

মুসলীমদল দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলো। এবারও বিশেষ সুবিধা হ'ল না। মাত্র ৩৬ রানে ৫টা উইকেট পড়ে গেল। কুমারুদ্দীনের ১৮ রান দলের সর্ব্বোচ্চ ছিল। দুই ইনিংসের খেলায় ১২০ রানে মুসলীমদলের ১৫টা উইকেট পড়ে যায়।

হাতে আর মাত্র ৫টা উইকেট নিয়ে এবং ৪১৯ রান পিছনে থেকে মুসলীমদল তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করলো। দ্বিতীয় দিনের রানের সঙ্গে আর মাত্র ৮৬ রান যোগ হ'লে মুসলীম দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১২২ রানে শেষ হ'ল। মহম্মদ হোসেন দলের সর্ব্বোচ্চ ২৮ রান করেন। হিন্দুদলের তিকে সারস্বনী ৪৪ রানে ৭টা উইকেট পান। বোলিংয়ের এভারেজ ছিল :—২১ ওভার, ৭ মেডেন, ৫১ রানে ৭টা উইকেট। সব

এন জি ম্যাক্কার ফরওয়ার্ড খেলছেন

থেকে উল্লেখযোগ্য যে, সারভুনী একজন কলেজের ছাত্র! মাত্র ১৮ রান দিয়ে নওমল ৭টি উইকেট পেলেন।

ফাইনালে এক ইনিংস এবং ৩৩৩ রানে হিন্দুদল সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার বিজয়ী হ'ল।

অষ্ট্রেলিয়ার 'এম্পায়ার' একাদশ ঃ

যুদ্ধ বিরতির পর অষ্ট্রেলিয়ার এম্পায়ার একাদশ নামে একটি ক্রিকেট দল নিয়ে যাবার জল্পনা কল্পনা চলছে। অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহল নাকি এই ক্রিকেট একাদশের আগমন বার্ত্তা, মহা উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। এমন কি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে এই ক্রিকেট একাদশ দলের খেলোয়াড়দের একটি নামের তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। ইংলণ্ড থেকে মনোনীত হয়েছেন—হ্যামণ্ড (ক্যাপটেন), এড্রিচ, কম্পটোন, রাইট ও হাটন; দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নার্স এবং মিচেল; ওয়েষ্টইণ্ডিজ থেকে হেডলে কনস্টেনটাইন এবং মিলী; ক্যানাডা থেকে ডেভিস, নিউজিল্যাণ্ড থেকে কাউই এবং ভারতবর্ষ থেকে মুস্তাক আলির ন্যায় এই এম্পায়ার একাদশ দলে স্থান পেয়েছে।

ক্রিকেট খেলোয়াড় হব্স স্লিপে দাঁড়াবার নির্ভুল পন্থা দেখাচ্ছেন

ম্যাক্কাব ও ডন ব্রাডম্যানের অবসর গ্রহণ ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহলে খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় ষ্টান্লে ম্যাক্ক্যাবের ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সংবাদ নিতান্তই দুঃসংবাদ বলতে হবে। ম্যাক্কাব বিগত ২০টি টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলেছিলেন। তাঁর দক্ষতাপূর্ণ ব্যাটিং এবং লেগ-ব্রেক বোলিং অষ্ট্রেলিয়া দলের সম্মিলিত শক্তির বহুবার পরিচয় দিয়েছে। বারবার পায়ের প্রবল অসুস্থতার জন্য তিনি ক্রিকেট খেলা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন! ম্যাক্কাব অষ্ট্রেলিয়া ইম্পিরিয়াল ফোর্সের একজন সভ্য।

খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্রাডম্যানও গত তিন বছর ধরে কোন ক্রিকেট খেলায় যোগদান করছেন না। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে সৈন্য বিভাগ থেকেও অবসর গ্রহণ করতে হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহলে প্রকাশ, যুদ্ধের পর ডন ব্রাডম্যান ক্রিকেট খেলায় যোগদান করতে পারবেন কি না যথেষ্ট সন্দেহ।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় মোট ৮১ পয়েণ্টের মধ্যে ৪৭ পয়েণ্ট পেয়ে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ৩৪ পয়েণ্টে দ্বিতীয় হয়েছে।

বাঙ্গলার ক্রিকেট মরসুম ঃ

বাঙ্গলায় ক্রিকেট মরসুম আরম্ভ হয়ে গেছে। বিভিন্ন ক্রিকেট দলের মধ্যে খেলার তালিকা অনুযায়ী ত' খেলা হবেই উপরন্তু বেঙ্গল জিমখানার পরিচালনাধীনে একটি ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা চলবে। লীগ প্রতিযোগিতা আশানুরূপ প্রতিযোগিতামূলক হবে কিনা সন্দেহ। কারণ ক'লকাতার কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট প্রতিষ্ঠান এই লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে না। প্রকাশ, জিমখানার পরিচালকমণ্ডলীর

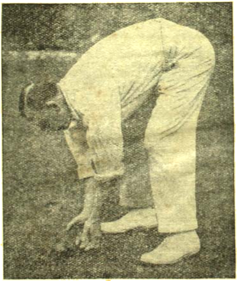

বল থামাবার ভুল পন্থা

বল থামাবার নির্ভুল পন্থা

সঙ্গে মতবিরোধ থাকায় দরুণ প্রতিযোগিতায় এই সব প্রতিষ্ঠান যোগদান করবে না। খেলাধূলার মধ্যে যে দলাদলি দেখা দিয়েছে অচিরে তার অবসান না হ'লে কোনদিনই বাঙ্গালী খেলাধূলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। ক্রিকেট খেলায় বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না; তার উপর যদি দলাদলিই প্রাধান্য লাভ করে তাহ'লে ক্রিকেট খেলায় বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের উন্নতির সমস্ত আশা নির্ম্মূল হয়ে যাবে।

রোভার্স কাপ ফুটবল টুর্ণামেণ্ট ঃ

রয়েল এয়ার ফোর্স ৩-০ গোলে সিটি পুলিশকে পরাজিত ক'রে ৪৭তম রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফাইনালে বিজয়ী হয়েছে। রয়েল এয়ার ফোর্স দলের খেলা খুবই দর্শনীয় হয়েছিল। এই দলের আউটের খেলোয়াড় বিলসন ওয়ার্থের খেলা সব থেকে উল্লেখযোগ্য। সিটি পুলিস কয়েকটি গোলের সুযোগ নষ্ট করে।

পৃথিবীর মুষ্টি যোদ্ধাগণের ক্রমপর্য্যায় তালিকা ঃ

আমেরিকার ন্যাশনাল বক্সিং এসোসিয়েশন মুষ্টি যুদ্ধের বিভিন্ন বিভাগে পৃথিবীর মুষ্টি যোদ্ধাদের নামের একটি ক্রমপর্য্যায় তালিকা প্রকাশ করেছেন। জো লুই সামরিক বিভাগে যোগদান করলেও তাঁর নাম হেভী ওয়েট বিভাগের প্রথমে আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য ইতিপূর্ব্বে জিমি বিভিন্স এক নম্বর মুষ্টি যোদ্ধা ব'লে ঘোষিত হয়েছিলেন।

হেভী ওয়েট বিভাগ :—১ম—জো লুই, ২য় বিলিকন, ৩য়—জিমি বিভিন্স।

লাইট হেভী ওয়েট বিভাগ :—১ম—গস, ২য়—লেসনেভিচ, ফ্রেডী মিলস।

মিডল ওয়েট বিভাগ :—১ম—টনি জেল, ২য়—জর্জিয়া আব্রামস, ৩য়—চিড বিলিয়ম।

লাইট ওয়েট বিভাগ :—১ম—স্যামি অগট, ২য়—লুথার হোয়াইট, ৩য়—বব মণ্টোগোমারী।

ফেদার ওয়েট বিভাগ : ১ম—ফিলিপ, ২য়—বারোপেতা, ৩য়—উলি পেপ, ৪র্থ—চকি রাইট

ব্যাণ্টম ওয়েট বিভাগ :—ম্যানুয়েল ওর্টিজ, ২য়—কুইকিং।

ফ্লাই ওয়েট : জ্যাকী প্যাটার্সন।

বাঙ্গালী মুষ্টি যোদ্ধাদের সাফল্য ঃ

'Throw-In' গ্রহণ করবার নির্ভুল পন্থা

বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গ্যারিসন থিয়েটারে অনুষ্ঠিত মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী মুষ্টিযোদ্ধারা ১৭-১১ পয়েণ্টে গোরা সৈন্যদলকে পরাজিত ক'রে বাঙ্গালীর নাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। প্রতিযোগিতার ৯টি বিভাগে বাঙ্গালী মুষ্টিযোদ্ধারা ৩টি বিভাগে নক্ আউট এবং ২টি বিভাগে টেকনিক্যাল নক্

আউটে বিজয়ী হন। এই প্রসঙ্গে বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

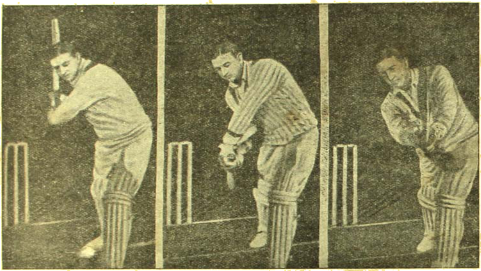

হ্যামণ্ড ফরওয়ার্ড খেলার নির্ভুল পন্থা দেখাচ্ছেন

ফলাফল :

ফ্লাই ওয়েট : এস চ্যাটার্জি ভাইভার ডাউকে প্রথম রাউণ্ডের লড়াইয়ে নক্ আউট করেন।

ব্যাণ্টম ওয়েট : বর্মার নার্শাল এক পয়েণ্টে এস আইচ রায়কে পরাস্ত করেন।

পি সেন টেকনিক্যাল নক্ আউটে পরাজিত করেন পার্সেলকে।

ফেদার ওয়েট : বি ঘোষ পয়েন্টে ইসলিংয়ের কাছে পরাজিত হন।

ওয়েল্টার ওয়েট : এ সি ফোডেন পয়েন্টে পি কে সেনকে পরাস্ত করেন। এইচ পাল তৃতীয় রাউণ্ডের লড়াইয়ে এস পার্কসকে নক্ আউট করেন।

লাইট ওয়েট : বি চৌধুরী দ্বিতীয় রাউণ্ডের লড়াইয়ে কর্পোরাল হ্যারিসকে নক্ আউট করেন।

লাইট হেভী ওয়েট : এস বসু টেকনিক্যাল নক্ আউটে জ্যাকসনকে পরাজিত করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীগৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অধীকার"—২৷০
বনফুল প্রণীত "বাহুল্য"—২৲, কাব্যগ্রন্থ "আহ্বনীয়"—১৷৵০
শ্রীরমেন চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "অসংলগ্ন"—২৷০
শ্রীরবীন্দ্রবিনোদ সিংহ প্রণীত "নিদাঘ সূর্য"—২৲
শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—"The famine of 1770" (ইংরাজি)—১৲
শ্রীসুরেন বিশ্বাস প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "মধুমতী"—১৲
স্বামী বামদেবানন্দ প্রণীত জীবনী ও গান "মীরাবাঈ"—১৷০
শ্রীকানাই বসু প্রণীত গল্পগ্রন্থ "পয়লা এপ্রিল"—২৲
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বর্ণবিচিত্রা"—২৷০
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "জাতির বরণীয় যাঁরা"—৸০
শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন শর্মা প্রণীত "অহৈতুকী ভক্তিকণা"—২৷০
শ্রীনরেন্দ্রকুমার দাশ প্রণীত শিশু-উপন্যাস "ভূতের পাহাড়"—১৷০
শ্রীমণিলাল অধিকারী প্রণীত শিশুপাঠ্য "আমপাতার"—১৲
পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "জগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত" পঞ্চভাগ ২য় খণ্ড—১৷০

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য—২০ অগ্রহায়ণের মধ্যে যে ষাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাইব, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মনিঅর্ডার করিলে ৩৷০ আনা, ভিঃ পিঃতে ৩৷৵০ টাকা। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ১৫ অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত